সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

ত্রয়োদশ ভাগ—প্রথম খণ্ড

১৩২০ সাল, বৈশাখ—আশ্বিন

প্রবাসী কার্য্যালয়,

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

প্রবাসী ১৩২০ বৈশাখ—আশ্বিন,
১৩শ ভাগ ১ম খণ্ড।

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২০

১ম সংখ্যা

বিনামূল্যে

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউবা আসে, কেউবা হাসে, কেউবা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট মাথে অস্ত্র হাতে রাজা এল রথে।
বললে হাতে ধরে', "তোমায়
কিনব আমি জোরে,"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে'।
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে'।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বললে
"কিনব দিয়ে সোনা,"
উজাড় করে' দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলার জোছনা নামে মুকুলভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বললে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে,"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে,
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে।

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে' বললে
"অমনি নেব কিনে।"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি *

১

প্রথম মহাসঙ্গীতি

স্থান—রাজগৃহ।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া পরিব্রাজক সুভদ্রকে উপদেশ প্রদান করা পর্য্যন্ত সমস্ত বুদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবান্ লোকনাথ বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস প্রত্যূষ সময়ে

* বিনয়-পিটক (চুল্লবগ্গ), সমন্তপাসাদিকা ও সুমঙ্গলবিলাসিনী প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

কুসিনারার উপনগরে মল্লগণের শালবনে শালতরুযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলে সমবেত ভিক্ষু-ও অন্যান্য জন-বর্গ এক সপ্তাহকাল তাঁহার সেই সুবর্ণবর্ণ শরীরকে গন্ধ-কুসুম-মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করেন, সপ্তাহকাল চিতাগ্নির নির্ব্বাণ হইতে লাগে, এবং আর এক সপ্তাহ তাঁহার অস্থি প্রভৃতি ধাতুর পূজা ও বিভাগে অতীত হয়। ধাতুবিভাগ জ্যৈষ্ঠের শুক্লপঞ্চমীর দিবস হইয়াছিল। পরিনির্ব্বাণের পর এইরূপেই একবিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া যায়।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণে ভিক্ষুসঙ্ঘে কিরূপ প্রবলভাবে শোকতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সঙ্ঘমধ্যে এরূপ লোকেরও অভাব ছিল না, যাহার হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হয় নাই। মহাপরিনির্ব্বাণের এক সপ্তাহমাত্র অতীত হইয়াছে। মহাকাশ্যপ কুসিনারায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে এক আজীবকের নিকট ঐ শোকসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অনুচর ভিক্ষুগণ সেই সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িল। যাহারা বীতরাগ ছিলেন, তাঁহারা সমস্তকেই অনিত্য ভাবিয়া স্থৈর্য্য লাভ করিতে লাগিলেন, আর যাহারা সেরূপ ছিলেন না, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। স্থবির মহাকাশ্যপ তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—'ভিক্ষুগণ, ভগবান্ ত পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন প্রিয়ের সহিত বিয়োগ বিচ্ছেদ হইয়াই থাকে। যাহা জাত হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা এই দেখা যাইতেছে, তাহা বিনষ্ট হইবে না, ইহা হইতে পারে না, ইহা হয় না। অতএব তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন কর।'

সেই ভিক্ষুপরিষদে সুভদ্র নামে এক বৃদ্ধ পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে ঐরূপ শোকে কাতর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'বন্ধুগণ, আপনারা শোক করিবেন না, বিলাপ করিবেন না। মহাশ্রমণের (বুদ্ধের) নিকট হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিয়াছি; তিনি সর্ব্বদাই "ইহা তোমাদের উচিত, ইহা তোমাদের অনুচিত" এই বলিয়া আমাদের প্রতি উপদ্রব করিতেন। এখন আমরা যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিব; আর যাহা ইচ্ছা হইবে না, তাহা করিব না।'

সুভদ্রের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহাকাশ্যপ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, শাস্তাকে অতীত হইতে দেখিয়া পাপ ভিক্ষুগণ অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার শাসনকে—সদ্ধর্ম্মকে তিরোহিত করিয়া ফেলিবে। তিনি আরও ভাবিলেন, ভগবান্ আনন্দকে বলিয়াছেন—'আনন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না যে, আমার অভাবে তোমাদের আর কেহ শাস্তা থাকিল না। আনন্দ, যতদিন এই ধর্ম্ম ও বিনয় থাকিবে, ততদিন তাহার শাস্তার অভাব হইবে না।' এই মনে করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, ধর্ম্ম ও বিনয়কে একত্র সম্মিলিত হইয়া গান করিতে হইবে—আবৃত্তি করিতে হইবে ("যন্নূনাহং ধম্মং চ বিনয়ং চ সংগায়েয্যং"), যাহাতে তাহা চিরকাল স্থির থাকিতে পারে।

মহাকাশ্যপ মনে মনে এইরূপ যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভিক্ষুগণের সহিত তাহা আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন, এবং ধর্ম্মসঙ্গীতি করিবার জন্য আনন্দ-প্রভৃতি পঞ্চশত ভিক্ষুকে নির্দ্ধারণ করিলেন। অনন্তর এই ধর্ম্ম-সঙ্গীতি কোথায় হইবে এই প্রশ্ন উত্থিত হইলে স্থবির ভিক্ষুগণ রাজগৃহেই তাহা করিবার জন্য মত প্রকাশ করিলেন। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের একবিংশ দিবসে—ধাতুবিভাগের দিবসে, মহাকাশ্যপ সমবেত মহান্ ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে সেই প্রস্তাব ("ঞত্তি"-জ্ঞপ্তি) এইরূপে বৈধভাবে উপস্থিত করিলেন:—"মাননীয় সঙ্ঘ অবগত হউন। সঙ্ঘ যদি ইহা এখন সমুচিত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি এই পঞ্চশত ভিক্ষুকে রাজগৃহে বর্ষাবাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও বিনয় সমবেতভাবে আবৃত্তি করিবার জন্য অনুমোদন করিবেন। অপর কোন ভিক্ষু সেখানে বর্ষাবাস গ্রহণ করিয়া বাস করিতে পাইবে না।" যথারীতি প্রস্তাব উত্থাপিত ও অনুমোদিত হইয়া গেল।

ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস গ্রহণের সময় সন্নিকট অবলোকন করিয়া স্থবির মহাকাশ্যপ ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রায় অর্দ্ধেক গ্রহণ করিয়া এক পথে রাজগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। স্থবির অনিরুদ্ধও প্রায় অর্দ্ধেক ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে লইয়া অপর এক পথে সেই স্থানেই যাত্রা করিলেন। স্থবির আনন্দ শ্রাবস্তী দর্শন করিয়া তাহার পরে রাজগৃহে

উপস্থিত হইবেন এই অভিলাষে ভগবানের পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চশত ভিক্ষুসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তী-অভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে তাঁহার ভিক্ষু সংখ্যা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি পথিমধ্যে যে-যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই সেই স্থানেই ভগবানের পরিনির্ব্বাণ-সংবাদে জনগণের কাতর পরিদেবনা ও রোদন-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা শ্রাবস্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ সমাগত হইয়াছেন জানিয়া জনগণ আনন্দে গন্ধমাল্যাদি গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল আনন্দ ভগবানকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহারা তাঁহার পরিনির্ব্বাণের সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহাদের শোক ও পরিদেবনার সীমা রহিল না। কুসিনারার উপনগরে মল্লগণের শালবনে ভিক্ষুসঙ্ঘের যে অবস্থা হইয়াছিল, শ্রাবস্তীতেও সেই সময়ে তাহারই পুনরভিনয় হইয়াছিল। সকলেই বলিতে লাগিল—'মাননীয় আনন্দ, পূর্ব্বে আপনি ভগবানকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন, আজ আপনি তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন!'

আনন্দ সেই সমবেত মহান্ জনসঙ্ঘকে অনিত্যতাশ্রিত ধর্ম্মকথা দ্বারা প্রবোধ প্রদান করিয়া কোনরূপে শান্ত করিলেন। অনন্তর তিনি শ্রাবস্তীর সেই সুপ্রসিদ্ধ অনাথপিণ্ডদের আরাম জেতবনে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ সেখানে দেখিতে পাইলেন ভগবানের ব্যবহৃত সেই গন্ধকুটী ঐরূপেই রহিয়াছে। তিনি বন্দনা করিয়া গন্ধকুটীর দ্বার উন্মোচন করিলেন। ভগবানের বসিবার আসনখানি (পীঠ) বাহির করিয়া আনিলেন, বহু দিনের অব্যবহারে তাহাতে ধূলি সঞ্চিত হইয়াছিল, তিনি তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলেন, গন্ধকুটী সম্মার্জ্জিত করিলেন, যেখানে যাহা কিছু অপরিষ্কার আবর্জ্জনা ছিল, তিনি তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার সমস্ত পরিষ্কার করিলেন। মঞ্চ-পীঠ প্রভৃতি বাহিরে আনিয়া পরিষ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। আনন্দ যখন এই-সমস্ত করিতেছিলেন, তখন ভগবানকে স্মরণ করিয়া তাঁহার কত কথাই মনে হইতেছিল এবং কতই না তিনি বিলাপ করিতেছিলেন। তিনি এক-একটি কার্য্য করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—'হা ভগবান, এই আপনার স্নানের সময়, এই সময়ে আপনি ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিতেন, এই সময়ে আপনি ভিক্ষুগণকে উপদেশ দিতেন, এই আপনার শয়নসময়!' এইরূপে তিনি ভগবানের গুণরাশি স্মরণ করিতেছিলেন আর বিলাপ করিতেছিলেন।

অনন্তর তিনি জেতবন বিহারের জীর্ণ সংস্কার করাইলেন, এবং বর্ষাকাল অতি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেইস্থানেই পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মসঙ্গীতির অন্যান্য ভিক্ষুগণও এইরূপে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজগৃহে সমবেত ভিক্ষুগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় উপোসথ করিয়া পরদিন প্রতিপদে বর্ষাবাস গ্রহণ করিলেন।

সেই সময়ে রাজগৃহে অষ্টাদশটি মহাবিহার ছিল, কিন্তু সবগুলিই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কেননা ভগবানের পরিনির্ব্বাণে সমস্ত ভিক্ষুই নিজ নিজ পাত্র ও চীবর গ্রহণ করিয়া সেই সমস্ত বিহার হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভগবানের বিহিত নিয়মানুসারে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাসের প্রথম মাসে মহারাজ অজাতশত্রুর সাহায্যে ঐ-সমস্ত বিহারের জীর্ণসংস্কার সম্পাদন করিলেন, এবং তদনন্তর মহারাজের নিকট পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিনয়-সঙ্গীতির কথা নিবেদন করিলেন। অজাতশত্রু তাহা অনুমোদন করিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষুগণ সঙ্গীতির উপযুক্ত একটি স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, এবং তিনি তাহাতে সম্মত হইলে বেভার পর্ব্বতের পার্শ্বে সপ্তপর্ণিগুহাদ্বারে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

অজাতশত্রু এক অতিরমণীয় সঙ্গীতিমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এই মণ্ডপের ভিত্তিস্তম্ভ ও সোপান সুবিভক্ত করা হইয়াছিল। নানাবিধ লতা ও মাল্যের চিত্রে মণ্ডপটি সুচিত্রিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিচিত্র চন্দ্রাতপ উত্তোলিত হইল। এই চন্দ্রাতপে রমণীয় বিবিধ কুসুমদাম অবলম্বিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। মণ্ডপের তলদেশ বিবিধ কুসুমোপহারে সুশোভিত হইল। সেই মণ্ডপের মধ্যে পঞ্চশত ভিক্ষুর পঞ্চশত মহার্ঘ আসন স্থাপিত করা হইল। দক্ষিণভাগে

উত্তরাভিমুখে স্থবিরাসন, এবং মধ্যে পূর্ব্বাভিমুখে ভগবান্ বুদ্ধের আসনের যোগ্য ধর্ম্মাসন ও তাহার পার্শে গজদন্তখচিত ব্যজন স্থাপিত হইল। 'এইরূপে মণ্ডপকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে অজাতশত্রু ভিক্ষুসঙ্ঘকে 'সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

পরদিন (শ্রাবণের শুক্ল পক্ষের) পঞ্চমী তিথিতে ভিক্ষুগণ আহারকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ও পাত্রচীবর যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ধর্ম্মসভায় সম্মিলিত হইলেন, এবং যথাবৃদ্ধভাবে নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করিলেন।

আনন্দপ্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু এইরূপে উপবিষ্ট হইলে সঙ্ঘস্থবির মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'বন্ধুগণ, ধর্ম্ম ও বিনয়* ইহার মধ্যে কোনটিকে আমরা প্রথমে আবৃত্তি করিব?' ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন—'মাননীয় মহাকাশ্যপ, বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ু, বিনয় থাকিলে বুদ্ধশাসন থাকিবে, অতএব প্রথমে আমরা বিনয়েরই আবৃত্তি করিব।' সঙ্ঘস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে অগ্রবর্ত্তী হইবেন?'

'আয়ুষ্মান্ উপালি।'

'কেন, আনন্দ কি সমর্থ নহেন?'

'তিনি যে সমর্থ নহেন, তাহা নহে; কিন্তু ভগবান্ জীবিত-অবস্থাতেই বলিয়া গিয়াছেন যে, বিনয়ধর-(বিনয়জ্ঞ) সমূহের মধ্যে স্থবির উপালিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা বিনয় আবৃত্তি করিব।'

অনন্তর মহাকাশ্যপ সঙ্ঘের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন যে, যদি সঙ্ঘের মত হয়, তবে তিনি উপালিকে বিনয় জিজ্ঞাসা করিবেন; এবং উপালিও নিবেদন করিলেন যে, যদি সঙ্ঘ অনুমোদন করেন, তবে তিনি মহাকাশ্যপ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বিনয়ের উত্তর প্রদান করিবেন। সঙ্ঘ অনুমোদন করিলে স্থবির উপালি নিজ আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং চীবর একস্কন্ধে ধারণ করিয়া ও স্থবির ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিয়া ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন, ও হস্তে পূর্ব্বোক্ত গজদন্তখচিত ব্যজন গ্রহণ করিলেন। স্থবির মহাকাশ্যপও স্থবিরাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

* বিনয়-শব্দে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবিষ্ট ভিক্ষু প্রভৃতির পরিচালনার নিয়মবিধি, এবং ধর্ম্ম-শব্দে বুদ্ধদেবপ্রচারিত ধর্ম্মমত বুঝায়।

অনন্তর মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন করিলেন—'বন্ধু উপালি, ভগবান্ প্রথম পা রা জি ক* কোথায় বিধান করিয়াছিলেন?' তিনি বলিলেন—'বৈশালীতে।' মহাকাশ্যপ বলিলেন—'কাহাকে লক্ষ্য করিয়া?' তিনি উত্তর করিলেন—'কলন্দকপুত্র সুদত্তকে।' এইরূপে মহাকাশ্যপ এক-একটি নিয়মের সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে তাহা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর উপালি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। এই প্রণালীতে ক্রমশ সমগ্র মহাবিভঙ্গ, ভিক্খুনীবিভঙ্গ, খন্ধক (মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ) ও পরিবার উল্লেখ করিয়া তাহার নাম বিনয়পিটক করা হইল। প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর শেষ হইলে সমবেত পঞ্চশত ভিক্ষু এক-এক গণে বিভক্ত হইয়া তাহা অধ্যয়ন করিলেন। এইরূপে বিনয়সংগ্রহ শেষ হইলে স্থবির উপালি দন্তখচিত ব্যজন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক বৃদ্ধ ভিক্ষুগণের বন্দনা করিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে পারা যায়। ভিক্ষুগণ স্থবির আনন্দের নাম করিলেন। আনন্দ যথাবিধি স্থবির ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিয়া দন্তখচিত ব্যজন গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলে স্থবির মহাকাশ্যপ প্রশ্ন করিলেন—'ভগবান্ ব্রহ্মজালসুত্ত কোথায় কাহাকে কিজন্য কিপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন?' আনন্দ তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। এইরূপে অন্যান্য সূত্রসম্বন্ধেও প্রশ্নোত্তর হইল, এবং নিকায়সমূহ (দীঘ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক) সংগৃহীত হইল। ইহারই নাম সূত্রপিটক। তাহার পর পূর্ব্ব প্রকারেই স্থবির অনুরুদ্ধকে ধর্ম্মাসনে স্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, যমক ও পট্‌ঠান আবৃত্তি করিয়া অভিধর্ম্মপিটক সংগ্রহ করিলেন।

অনন্তর আনন্দ স্থবির ভিক্ষুগণকে বলিলেন—'মাননীয়গণ, ভগবান্ পরিনির্ব্বাণকালে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, "আনন্দ, সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ তুলিয়া দিতে পারিবে।"' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—

* বিনয়পিটকের অন্তর্গত প্রাতিমোক্ষের প্রথম নিয়ম।

'আনন্দ, কোন শিক্ষাপদগুলি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র, তাহা কি আপনি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?' আনন্দ বলিলেন তিনি তাহা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন নাই। তখন সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে নানা ব্যক্তি নানারূপ মত প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, অমুক-অমুক শিক্ষাপদগুলি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। এইরূপ বিসংবাদ উপস্থিত হইলে মহাকাশ্যপ সঙ্ঘকে নিবেদন করিলেন—'মাননীয় সঙ্ঘ আমার কথা শ্রবণ করুন। গৃহীগণের সহিত আমাদের শিক্ষাপদসমূহের সম্বন্ধ আছে। আমাদের কি বিধেয়, এবং কি অবিধেয় গৃহীগণ তাহা জানেন। আমরা যদি এখন কতকগুলি শিক্ষাপদ তুলিয়া দিই, তাহা হইলে তাঁহারা এখনই বলিবেন যে, শ্রমণ গৌতম শ্রাবকগণকে যে শিক্ষাপদ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত থাকিবার জন্য; কেননা যত দিন শাস্তা (বুদ্ধ) জীবিত ছিলেন, তত দিন ইঁহারাও শিক্ষাপদ-সমূহ অনুসরণ করিয়া চলিতেন, আর যখন হইতে তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন হইতে ইঁহারাও তদনুসারে চলেন না। অতএব যদি সঙ্ঘের অভিমত হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ যাহা বিধান করেন নাই, সঙ্ঘ তাহা বিধান করিবেন না; এবং যাহা তিনি বিধান করিয়া গিয়াছেন, সঙ্ঘ তাহা তুলিয়া দিবেন না। তিনি যেরূপ শিক্ষাপদসমূহ বিধান করিয়াছেন, সেইরূপই থাকুক।' সকলেই মহাকাশ্যপের বাক্য অনুমোদন করিলে তাহা সেইরূপই হইল।

অনন্তর স্থবির ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন—'আনন্দ, কোন শিক্ষাপদগুলি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ইহা আপনি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা না করায় দুষ্কৃত আচরণ করিয়াছেন, অতএব আপনি তাহা স্বীকার করুন।' তিনি বলিলেন—'মাননীয়গণ, আমি অস্মরণ হেতু তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। ইহাতে আমি কোন দুষ্কৃত দেখিতেছি না। তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু আমি সেই দুষ্কৃত স্বীকার করিতেছি।' ভিক্ষুগণ এইরূপে আনন্দের আরো কয়টি দুষ্কৃতের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিলেন 'আনন্দ ইহাও আপনার দুষ্কৃত যে, তথাগত-উপদিষ্ট ধর্ম্ম-বিনয়ে স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিবার জন্য আপনি প্রয়াস করিয়াছিলেন।* অতএব আপনি তাহা স্বীকার করুন।' তিনি উত্তর করিলেন—'মাননীয়গণ, মহাপ্রজাবতী গৌতমী ভগবানের মাতৃস্বসা, তিনি তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন, স্তন্যপান করাইয়াছিলেন। ভগবানের জননী মৃত হইলে তিনিই তাঁহাকে স্তন্যদান করিয়াছিলেন। এই মনে করিয়াই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি কোন দুষ্কৃত দেখিতে পাইতেছি না। তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু আমি তাহা স্বীকার করিতেছি।'

সেই সময়ে পুরাণ-নামক এক প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু বহু ভিক্ষুর সহিত দক্ষিণাগিরিতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া ভ্রমণ করিতেন। ধর্ম্মবিনয়সঙ্গীতি হইয়া যাইবার পরে তিনি রাজগৃহে আগমন করিলে তত্রত্য ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সেই সংবাদ প্রদান করিয়া ঐ সঙ্গীতিকে স্বীকার করিবার জন্য বলিলেন। তিনি উত্তর করিলেন 'বন্ধুগণ, স্থবির ভিক্ষুগণ উত্তমরূপেই ধর্ম্ম ও বিনয়ের সঙ্গীতি করিয়াছেন। কিন্তু আমি ভগবানের সম্মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, যেরূপ গ্রহণ করিয়াছি, সেইরূপই ধারণ করিব।'

আনন্দ সেই সময়ে ভিক্ষুগণকে আবার নিবেদন করেন যে, ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ-সময়ে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, সঙ্ঘ ভিক্ষু ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিয়া ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রহ্মদণ্ড কি?' আনন্দ বলিলেন—'আমি ইহা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তর করিলেন "আনন্দ, ভিক্ষু ছন্ন যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে, কিন্তু ভিক্ষুগণ তাহাকে কিছু বলিবে না, কোন উপদেশ প্রদান করিবে না, এবং কোন অনুশাসনও করিবে না।"'

ছন্নের এই দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। সে এই দণ্ড পাইয়া পরে ক্রমশ উন্নতি লাভ করে ও অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণের রাজগৃহে এই ধর্ম্মবিনয়সঙ্গীতি কার্য্যে সাত মাস লাগিয়াছিল। পঞ্চ শত ভিক্ষু ইহাতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া এই সঙ্গীতি পঞ্চশতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথমে মহাপ্রজাবতী গৌতমীই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ইনি তজ্জন্য ভগবানের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলেও ভগবান্ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। পরে আনন্দের অনুরোধে স্বীকার করেন। স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা দিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা না দিলে তাঁহার ধর্ম্ম বহুকাল স্থায়ী হইত। দ্রঃ—চুল্লবগ্‌গ, ১০।

গীতাপাঠ

প্রশ্ন॥ তোমার পাথেয় দ্রব্যাদির মোট বাঁধা এখন তো হইয়াছে? তবে আর বিলম্ব কিসের? যাত্রারম্ভ করা হো'ক্। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমাকে আমি—সমাধি-মগ্ন অবস্থা এবং মুক্ত অবস্থার মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? এ প্রশ্নের একটা পরিষ্কার মীমাংসা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি আর আর যতই যাহা বল না কেন তাহাতে আমার মন প্রবোধ মানিতে পারে না।

উত্তর॥ যাত্রারম্ভের এই মুখ্য সময়টিতে আমার যদি হিতবাক্য শোনো, তবে আমাদের-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রের নিভৃত গুহামন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার যে একটি অমোঘ মন্ত্র-বচন আছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে সেইটি আমি তোমাকে স্মরণ করিতে বলি। সে মন্ত্র-বচনটি যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহার নাম প্রণব। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২৭ সূত্রে লেখে

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"

"তাঁহার (কিনা ঈশ্বরের) বাচক (কিনা পরিচয়-জ্ঞাপক সংজ্ঞা) প্রণব (কিনা ওঙ্কার)।" মা অম্বা mamma প্রভৃতি সানুনাসিক ওষ্ঠ্য বর্ণাত্মক দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক শব্দ কচি বালকের মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া ঐ ধাঁচা'র শব্দগুলা যেমন স্বভাবতই মাতৃবাচক, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানকালে ওঙ্কার-ধ্বনি ধ্যাতার মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া ওঁ-শব্দ স্বভাবতই ঈশ্বর বাচক। জগৎসঙ্গীতের এই যে তিন শ্রেণীর গীতস্বর

(১)	(২)	(৩)
বিবাদী	বাদী	সংবাদী
ভাঙন	গড়ন	ব্যবস্থাবন্ধন
বিয়োগ	উদ্যোগ	সংযোগ
প্রলয়	সৃষ্টি	স্থিতি

এই তিন শ্রেণীর গীতস্বর যেমন ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে মহত্তম আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুনাদিত করিয়া একতানে ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি ওঙ্কারের তিনটি অক্ষর—অ উ ম- উচ্চারকের কণ্ঠকুহর হইতে ওষ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত স্বর-নির্গমনের সমস্ত পথ অধিকার করিয়া একতানে ধ্বনিত হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ওঙ্কার-মন্ত্রের উচ্চারণ কালে শ্রদ্ধাবান সাধকের মনে দুইসূত্রে পরমাত্মার দুইরূপ ভাব উদ্দীপিত হয়;—সৃষ্টি-প্রবণ রজোগুণ, স্থিতিপ্রবণ সত্বগুণ, এবং ভঙ্গপ্রবণ তমোগুণ **কারণে** অন্তর্লীন রহিয়াছে—এই সূত্রে পরমাত্মার স্বরূপগত নির্গুণভাব উদ্দীপিত হয়; আর, **কার্য্যে** অভিব্যক্ত হইতেছে, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইতেছে—এই সূত্রে পরমাত্মার সগুণ ভাব উদ্দীপিত হয়। ওঙ্কার-মন্ত্রের উচ্চারণ তাই সাধকের পক্ষে ধ্যান-কালেও যেমন, আর, সাংসারিক শুভানুষ্ঠানের পথে যাত্রারম্ভ কালেও তেমনি, উভয়-কালেই পরম ইষ্টফল-প্রদ। অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রারম্ভ করা যা'ক।

ধ্যানকালে যখন সাধক সমস্ত জগৎসংসার হইতে মন'কে উঠাইয়া লইয়া পরমাত্মার স্বরূপগত নির্গুণভাবের প্রতি লক্ষ্য স্থিরীভূত করেন, তাঁহার তখনকার সেইরূপ সমাহিত অবস্থা যোগাদি শাস্ত্রে সমাধিনামে উক্ত হইয়া থাকে। তার সাক্ষী:—পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ৩য় ৪র্থ সূত্রে লেখে

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানং।
বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র।"

"তখন (কিনা সমাধি-কালে) দ্রষ্টা-পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। অন্য সময়ে দ্রষ্টা-পুরুষ বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া সেই-সেই বৃত্তির রূপ ধারণ করে।"

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ কয়প্রকার, তাহাও ঐ পাদের ৬ষ্ঠ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে এইরূপ:—

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার; যথা,—

"প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ।"

"প্রমাণ (কিনা সত্যজ্ঞান), বিপর্য্যয় (কিনা মিথ্যা-জ্ঞান), বিকল্প (কিনা—যেমন "সোণার পাথরবাটী" এই-রূপ শব্দমূলক অর্থশূন্য জ্ঞান), নিদ্রা, এবং স্মৃতি, এই পাঁচ প্রকার।"

তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি-কালে আত্মার স্বরূপগত নির্গুণ ভাব দ্রষ্টা পুরুষের সমস্ত মনোবৃত্তি গ্রাস করিয়া ফ্যালে; আর-আর সময়ে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাগতিকে দ্রষ্টা পুরুষের মনে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাদুর্ভাব হয়; কখনও বা

সহস্রবাহু অবলোকিতেশ্বর · তিব্বতীয় ।

বরুণ ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

সত্যজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা মিথ্যাজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা শব্দমূলক অর্থশূন্য জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা নিদ্রার প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদি-বিষয়ক স্মৃতির প্রাদুর্ভাব হয়।

এখন, তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, দ্রষ্টা পুরুষের এই যে দুই সময়ের দুইরূপ অবস্থা—(১) সমাধিকালের স্বরূপনিষ্ঠ অবস্থা এবং (২) আর-আর সময়ের বৃত্তিনিষ্ঠ অবস্থা, এই দুই কালের দুইরূপ অবস্থা ছাড়া—দ্রষ্টা পুরুষের সর্ব্বকালের আর একরূপ অবস্থা আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে—আত্মার বন্ধনশূন্য স্বাভাবিক অবস্থা বা সিদ্ধাবস্থা; আর, গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগতভাব এবং তাৎপর্য্যের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে তাহারই নাম মুক্ত অবস্থা।

প্রশ্ন। একটি কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি:—সংসার ধর্ম্ম ভাল, না সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভাল? আমি সোজাসুজি বুঝি এই যে, এরূপ যদি হয় যে, সন্ন্যাস ধর্ম্ম অপেক্ষা সংসার-ধর্ম্ম ভাল, তবে সব কাজ ছাড়িয়া সর্ব্বকালেই গার্হস্থ্য এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকা সাধকের পক্ষে শ্রেয়; পক্ষান্তরে যদি এরূপ হয় যে, সংসার-ধর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভাল, তবে সব ছাড়িয়া সর্ব্বকালেই যোগসাধনে নিযুক্ত থাকা সাধকের পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু এটা যখন স্থির যে, সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে অষ্টপ্রহর ব্যাপৃত থাকিলে ত্রিগুণের বন্ধন এড়ানো যাইতে পারে না, আর, এটাও যখন স্থির যে, যোগ-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ত্রিগুণের বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন, তখন এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধনের পথ বন্ধনের পথ বই মুক্তির পথ নহে—যোগ-সাধনের পথই মুক্তির পথ। আমি তাই বলি এই যে, যাহারা সংসারের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব সময়েই সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের মতো সিদ্ধপুরুষদিগের আটপহরিয়া তুরীয় অবস্থাকেই মুক্ত অবস্থা বলা সঙ্গত।

উত্তর। কেহ যদি তোমাকে বলেন—"কর্ম্ম ভাল—না বিশ্রাম ভাল?" আর, তাহার পরে যদি বলেন—"যদি এমন বোঝো যে, বিশ্রাম অপেক্ষা কর্ম্ম ভাল, তবে বিশ্রামে জলাঞ্জলি দিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা অনবরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা তোমার খুব উচিত; পক্ষান্তরে যদি এমন বোঝো যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বিশ্রাম ভাল, তবে সর্বকর্ম্ম ফেলিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা সর্ব্বক্ষণই হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা, অথবা যাহা আরো ভাল—হাত পা ছড়াইয়া নিদ্রা দেওয়া তোমার অত্যন্ত উচিত;" তবে তাঁহার সে কথার তুমি কী উত্তর দিবে জানি না, কিন্তু আমাকে যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি তাঁহাকে বলিব এই যে, রাত্রিকালে সুনিদ্রা না হইলে দিবসের কার্য্যে কাহারো রীতিমত উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; আবার, দিবসের কার্য্যে যথাবিহিত যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত শক্তি খাটানো না হইলে রাত্রি-কালে কাহারো সুনিদ্রা হইতে পারে না। কর্ম্মের সময় কর্ম্ম এবং বিশ্রামের সময় বিশ্রাম করিলে কর্ম্মও ভাল হয়—বিশ্রামও ভাল হয়; তাহার অন্যথাচরণ করিলে কর্ম্মও ভাল হয় না—বিশ্রামও ভাল হয় না। আবার, ক্রিয়াশক্তির পূর্ণোদ্যম এবং পূর্ণাবসানের মাঝের সোপানের প্রধান দুইটি ধাপ অর্দ্ধোদ্যম এবং অর্দ্ধাবসান; সে দুইটি ধাপ না মাড়াইয়া পূর্ণোদ্যম হইতে পূর্ণাবসানে নামিতে পারা কাহারো পক্ষে সম্ভবসাধ্য নহে। কোন্ ধাপে কখন্ পদনিক্ষেপ করিতে হইবে—প্রকৃতি মাতার সৌর ঘটিকার শব্দহীন ভাষায় তাহার সময় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে অতি সুন্দর প্রণালীতে। জীবজগতে তাই একথা দেশময় রাষ্ট্র—যে, ক্রিয়াশক্তির পূর্ণোদ্যমের মুখ্য সময়—পূর্ব্বাহ্ণ, অর্দ্ধোদ্যমের মুখ্য সময় অপরাহ্ণ, অর্দ্ধাবসানের মুখ্য সময় সায়াহ্ণ, পূর্ণাবসানের মুখ্য সময় রাত্রিকাল। বলা বাহুল্য যে, সময়ে আহার, সময়ে ক্রীড়াকৌতুক, সময়ে নিদ্রা, সময়ে জাগরণ পরস্পরের পথে পুষ্প নিক্ষেপ করে, আর, অসময়ে আহার, অসময়ে ক্রীড়াকৌতুক, অসময়ে কর্ম্মচেষ্টা, অসময়ে নিদ্রা, অসময়ে জাগরণ পরস্পরের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে। গীতাশাস্ত্রে লেখেও তাই; যথা,—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।"

ঠিক সময়ে ঠিকমতো আহার বিহার, ঠিক সময়ে ঠিক

মতো কর্ম্মচেষ্টা, ঠিক সময়ে ঠিকমতো ধ্যান-ধারণা, দুঃখনাশক যোগের প্রধান সোপান।"

তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি এই তিনটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

যেমন রাত্রিকালে ভাল করিয়া নিদ্রা না হইলে দিবসের কার্য্যে কাহারো রীতিমতো উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, তেমনি ধ্যানকালে সাধকের মন মোটজ্ঞানের মোট সত্যে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থিরীভূত না হইলে কার্য্যকালে তাহার মন ভরপুর উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

যেমন দিবসের কার্য্য যথোচিত প্রযত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত সুনির্ব্বাহিত না হইলে, রাত্রিকালে কাহারো সুনিদ্রা হইতে পারে না, তেমনি কার্য্যকালে সাধকের মন রীতিমত উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচালিত না হইলে, ধ্যানকালে তাঁহার মন পরম সত্য পরমাত্মাতে স্থিরীভূত হইতে পারে না।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

ধ্যানকালে সাধকের চিত্ত পরম সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কার্য্যকালে পরম মঙ্গলের পথে সহজেই তাঁহার মতিগতি হয়। তেমনি আবার কার্য্যকালে সাধক কায়মনোবাক্যে মঙ্গলের পথে লাগিয়া থাকিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, আর গীতার এ কথাটি বড়ই ঠিক যে,—

"প্রসন্ন-চেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।"

প্রসন্ন-চেতার বুদ্ধি পরম সত্যে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তোমার এই যে প্রশ্ন—যে, যোগ-সাধন যদি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হয়, তবে সব ছাড়িয়া সাধক সমস্ত জীবন রাত্রিদিন যোগসাধনে নিযুক্ত না থাকেন কেন, আর যদি সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হয়, তবে সব ছাড়িয়া সাধক সমস্ত জীবন দিবারাত্রি সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত না থাকেন কেন? তোমার এ প্রশ্নের সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় খুবই স্পষ্ট; তাহা এই যে, যাহাকে বলা যায়—সাংখ্যানুমোদিত যোগ-সাধন, তাহা জ্ঞানযোগের সাধন; আর, যাহাকে বলা যায় ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যসাধন, তাহা কর্ম্মযোগের সাধন; উভয়ই যোগ-সাধন, আর, উভয়ই ইষ্টফলপ্রদ। তা ছাড়া, গীতাশাস্ত্রের মতে ভজনও একপ্রকার সাধন—ভক্তিযোগের সাধন। ফলে, শিরের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে যেমন অঙ্গ নিষ্ফল হয়, তেমনি ভক্তিযোগের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে জ্ঞানযোগই বা কি, আর কর্ম্মযোগই বা কি উভয়ই নিষ্ফল হয়। এ সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের সার উপদেশ তিনটি :—

প্রথম উপদেশ।

পরাৎপর পরম সত্য পরমাত্মাতে বুদ্ধির যোগ-সাধন করিবে। ইহাই জ্ঞানযোগের উপদেশ।

দ্বিতীয় উপদেশ।

ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যের পথে মনের যোগ সাধন করিবে। ইহাই কর্ম্মযোগের উপদেশ।

তৃতীয় উপদেশ।

সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপন করিবে। ইহাই ভক্তিযোগের উপদেশ।

ভক্তিযোগের এই উপদেশটি অ্যাকা যে কেবল গীতা-শাস্ত্রেরই উপদেশ তাহা নহে, উহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেরই প্রধানতম উপদেশ। তার সাক্ষী :—বাইবেলের নব-বিধানের একস্থানে এইরূপ লেখে যে, ইহুদীদিগের একজন ধর্ম্মশাস্ত্রী যখন ঈসা-মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "Which is the great commandment in the law" "ধর্ম্মশাস্ত্রের শেরা উপদেশ কোন্‌টা?" ঈসা তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment" "তোমার পরম প্রভু পরমেশ্বরকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিবে —ইহাই প্রথম এবং প্রধান উপদেশ।"

পাতঞ্জল-দর্শনের ভোজরাজ-কৃত টীকায় "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রের অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ ;—

"ঈশ্বর-প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষঃ, বিশিষ্টং উপাসনং; সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং—বিষয়সুখাদিকং ফলং অনিচ্ছন সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ তস্মিন্ গুরৌ অর্পয়তীতি। তৎপ্রণিধানং সমাধেঃ তৎফলস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।"

ইহার অর্থ :—

"ঈশ্বর-প্রণিধান কি ? না ঈশ্বরেতে ভক্তি বিশেষ বিশিষ্ট রকমের উপাসনা — বিষয়সুখাদি ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরেতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। এইরূপ যে ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাই সমাধি এবং তাহার ফললাভের প্রকৃষ্ট উপায়।"

শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত সর্ব্ববেদান্তের সারসংগ্রহে আছে—

"অত্যন্তং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা গুরুমীশ্বরমাত্মনি।
যো ভজত্যনিশং শান্তঃ তস্য চিত্তং প্রসীদতি॥"

: : : :

"মনোঽপ্রসাদঃ পুরুষস্য বন্ধো মনঃ প্রসাদো
ভববন্ধমুক্তিঃ।"

ইহার অর্থ,

"অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত যিনি পরমগুরু পরমেশ্বরকে শান্তচিত্তে ভজনা করেন, তাঁহার মন প্রসন্ন হয়।

মনের অপ্রসন্নতাই পুরুষের বন্ধন ; মনের প্রসন্নতাই সংসারবন্ধনের মুক্তি।"

সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেরই মতে ভজন এবং সাধনের মধ্যে এইরূপ যখন হরিহরাত্মা সম্বন্ধ, তখন ন্যায্য বিধানমতে সাধকের উচিত ভক্ত হওয়া—ভক্তের উচিত সাধক হওয়া। কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলিব আমাদের দেশের মাটির গুণেই হোক্, আর, গ্রহবৈগুণ্যেই হোক্ ঘটনাক্রমে হইয়া দাঁড়াইয়াছে দোঁহার মধ্যে এক প্রকার সর্প নকুলের সম্বন্ধ। ভক্তিশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী নামজপাদি যদি চ সাধনেরই অঙ্গ, তথাপি তাহা ভজন প্রধান তাহাতে আর ভুল নাই ; তেমনি আবার, যোগশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ঈশ্বরেতে কর্ম্মসমর্পণ যদি চ ভজনেরই অঙ্গ, তথাপি তাহা সাধনপ্রধান তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এইজন্য আমাদের দেশের লোকসমাজে বৈষ্ণব শ্রেণীর সাধুরাই বিশিষ্টরূপে ভক্ত বলিয়া পরিচিত ; আর, যোগিতপস্বীরাই বিশিষ্টরূপে সাধক বলিয়া পরিচিত। এই রকম করিয়াই আমাদের দেশের পরমার্থপথের যাত্রীগণেরা ভক্ত এবং সাধক নামধারী দুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; আর, সেই সঙ্গে কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ একটা আড়া-আড়ি ভাবের সম্বন্ধ ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এ সম্প্রদায়ের পথ-যাত্রীরা যদি যা'ন উত্তর মুখে, ও-সম্প্রদায়ের পথযাত্রীরা তবে যা'ন দক্ষিণ মুখে। এরূপ স্থলে মুক্তি-সম্বন্ধে যে, উভয়ের মধ্যে মতবৈষম্য হইবে না, তাহার বড় একটা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না ; তাহা দূরে থাকুক্ উল্টা আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধকসম্প্রদায়ের যোগি-তপস্বীরা মুক্তি বলিতে বোঝেন সাংখ্যদর্শনে যাহাকে বলে কৈবল্য ; আর ভক্তসম্প্রদায়ের সাধুরা মুক্তি বলিতে বোঝেন — ভক্তিশাস্ত্রে যাহাকে বলে সালোক্য সামীপ্য অথবা সাযুজ্য। "সালোক্য" অর্থাৎ যেমন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ; "সামীপ্য" অর্থাৎ যেমন চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি, "সাযুজ্য" অর্থাৎ নর-নারায়ণের মধ্যে যেরূপ একাত্ম ভাব পুরাণে শুনা যায় ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে সেইরূপ ঘনিষ্ঠ একাত্মভাব। এই যে দুই বিরোধী সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী দুই বিরোধী শ্রেণীর মুক্তি—দুয়ের কোনটিই গীতাশাস্ত্রের অভিমত বলিয়া আমার বোধ হয় না এইজন্য যেহেতু আমার এইরূপ ধারণা যে, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো শাস্ত্র যদি অসাম্প্রদায়িক নামের যোগ্য হয়, তবে সে শাস্ত্র আমাদের দেশের গীতাশাস্ত্র। সাংখ্যদর্শনের কৈবল্য-প্রাপ্ত কেবলাত্মা জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমবর্জ্জিত গুণবর্জ্জিত ক্রিয়াবর্জ্জিত সর্ব্ববর্জ্জিত ; সুতরাং "কিছুই না" বলিয়া যদি কোনো পদার্থ থাকে, তবে সাংখ্যাভিমত কেবলাত্মা তাহারই আর এক নাম। সাংখ্যচিকিৎসকের মুক্তিপ্রণালী এইরূপ :

যাহাকে তুমি বলিতেছ নীরোগ শরীর, তাহার মধ্যেও কিছু-না কিছু রোগের সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব যে ব্যক্তি একান্ত পক্ষেই রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার উচিত উৎকট বিষপান করা ; তাহা হইলে তাহার প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর হইতে সমস্ত আধিব্যাধি সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আত্মা হইতে আত্মার সত্তা এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত জ্ঞান এবং আনন্দ উন্মূলিত করা হইলেই, সেই সঙ্গে আত্মা হইতে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা উন্মূলিত হইয়া যাইবে ; ইহা ব্যতীত ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই।

বেদান্ত চিকিৎসকের মুক্তিপ্রণালী অন্য প্রকার। তাহা এইরূপ :

যদি রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে বিধিমতে ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া রোগকে শরীর হইতে দূর করিয়া দেও, তাহা হইলেই রোগের পরিত্যক্ত স্থান আরোগ্যে ভরাট হইয়া যাইবে। অবিদ্যার ঘন-কুহেলিকা আত্মা হইতে নিঃশেষে সরিয়া গেলে অবিদ্যার পরিত্যক্ত স্থান ব্রহ্মানন্দে ভরাট হইয়া যাইবে। বেদান্তসম্মত মুক্তির সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা যাহা আমার বক্তব্য আছে, তাহা পরে হইবে এখন থাক্। সাধক সম্প্রদায়ের অভিলাষানুরূপ কৈবল্য মুক্তিতে কেন আমার মন সায় দায় না তাহা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি; ভক্তসম্প্রদায়ের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি সংজ্ঞক মুক্তিতেও আর এক কারণে আমার মন সায় দায় না। সে কারণ এই যে, কচি বালকেরা যেমন পুতুলখেলা লইয়া ভুলিয়া থাকে, সালোক্যাদির অনুপন্থীরা তেমনি ঈশ্বরের নানাপ্রকার মূর্ত্তি-কল্পনা লইয়া ভুলিয়া থাকেন, তা বই, সত্যাসত্যের অনুসন্ধানে যে, কোনো প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারা মনে করেন না।

প্রশ্ন॥ গীতাশাস্ত্রের মতানুযায়ী মুক্ত পুরুষের লক্ষণ তুমি তবে কী ঠাওরাও?

উত্তর॥ ধ্যানকালে যাহার চিত্ত ভূমাবের প্রতিপাদ্য পরম সত্যে সহজেই সমাহিত হয়; কার্য্যকালে যাহার মন নিষ্কাম এবং অনাসক্তভাবে মঙ্গলের পথে সহজেই পরিচালিত হয়, এবং সর্ব্বকালে ঈশ্বরপ্রেমে যাহার মন পরমানন্দে আনন্দিত—গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে তিনিই মুক্তপুরুষ।

প্রশ্ন॥ কিন্তু গীতাশাস্ত্রের পুঁথি খুলিয়া তোমাকে আমি দেখাইতে পারি যে, ত্রিগুণাতীত নিঃসঙ্গ কৈবল্যাবস্থাই গীতাশাস্ত্রোক্ত মুক্ত পুরুষের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; আর, এটাও তোমাকে আমি দেখাইতে পারি যে, গীতাশাস্ত্রের ১১শ অধ্যায়ে ভগবানের দুইরূপ মূর্ত্তির অবতারণা করা হইয়াছে একটির পরে আর একটি। প্রথমটি সহস্রমুখ-চক্ষু-মস্তক সহস্রবাহু সহস্র-পদ ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি; দ্বিতীয়টি স্নিগ্ধ মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। অতএব তুমি যাহাকে বলিতেছ শূন্যাত্মবাদ-দূষিত কৈবল্যসংজ্ঞক মুক্তি, তাহাও গীতাশাস্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে, আর, তুমি যাহাকে বলিতেছ ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-দূষিত সালোক্যাদি-সংজ্ঞক মুক্তি তাহাও গীতাশাস্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে।

উত্তর॥ কোনো একটি কাব্যগ্রন্থের নায়িকাকে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি যদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোঝো যে, সুন্দরী কন্যাটির মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চক্রাকৃতি, তবে তোমার সেই মার্জ্জিত বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো সূত্রে গ্রন্থকারের কর্ণগোচর হইলে যে ভাবে তিনি মনে মনে হাস্য করিবেন তাহা আর বলিবার কথা নহে; তেমনি, গীতাশাস্ত্রে মুক্ত পুরুষকে নিঃসঙ্গ এবং গুণাতীত বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি যদি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোঝো যে, মুক্ত পুরুষ জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমবর্জ্জিত সর্ব্ববর্জ্জিত কিছুই-না'র আর এক নাম; অথবা, গীতাশাস্ত্রে ভগবানের অদ্ভুত প্রকার বিভূতি বর্ণনা দেখিয়া শাস্ত্রকারের মর্ম্মগত অভিপ্রায় তুমি যদি এইরূপ বোঝো যে, ঈশ্বর সত্যসত্যই সহস্রমস্তক, সহস্রবাহু, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদিগের ন্যায় করাল দংষ্ট্রাবিশিষ্ট; অথবা গীতাশাস্ত্রে ভগবানের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিয়া শাস্ত্রকারের মর্ম্মগত অভিপ্রায় তুমি যদি এইরূপ বোঝো যে, পশুরা যেমন সত্যসত্যই চতুষ্পদ, জগৎপাতা ভগবান্ তেমনি সত্যসত্যই চতুর্ভুজ, তবে তোমার সেই চমৎকার বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো গতিকে শাস্ত্রকারের কর্ণগোচর হইলে, তিনিও সেইভাবে মনে মনে হাস্য করিবেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু সে যে হাস্য কী ভাবের হাস্য—পরম সন্তোষের হাস্য অথবা অধম অবজ্ঞার হাস্য, সে কথা না-তোলাই তোমার পক্ষে ভাল—কেননা লোক-সমাজে তুমি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত।

প্রশ্ন॥ তোমার ও-সকল ফেঁদো কথায় আমি ভুলি না। গীতাশাস্ত্রের ঐ ঐ স্থলে শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় সকলেই যাহা বোঝে, আমিও তাহাই বুঝি; তদ্ব্যতীত, তাহার ভিতরে নূতন-ধাঁচার আর যদি-কোনোরকম বুঝিবার বস্তু থাকে, তবে আমার তাহা স্বপ্নের অগোচর। গীতা-শাস্ত্রের ঐসকল স্থলে শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় তোমার আক্‌লার বুদ্ধিতে না জানি তুমি কিরূপ বুঝিয়াছ, সেইটি কেবল জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছে ; অতএব আর আর কথা ছাড়িয়া সেই কথাটি আমাকে খুলিয়া খালিয়া বলো।

উত্তর॥ আমার যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমি আমার আক্কেলার বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকি, আর, দশ জনের বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকি, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না ;—তাহা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে সকলের বুদ্ধিতেই তাহা ক্রোড় পাতিয়া সাদরে গৃহীতব্য ; পক্ষান্তরে, তাহা যদি অযৌক্তিক হয়, তবে কাহারো বুদ্ধিতে তাহা তিলমাত্রও স্থান পাইবার যোগ্য নহে। তা ছাড়া, তুমি চাহিতেছ কেবল তোমার কৌতূহলের চরিতার্থতা ; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা পরিষ্কার মীমাংসা হইলে অনেকের অনেক প্রকার মনের ধন্দ ঘুচিয়া যায় ; আর, সেইজন্য তোমার ঐ প্রশ্নটির সদুত্তর প্রদান করা খুবই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা তাড়াহুড়ার কর্ম্ম নহে— আগামী বারের অধিবেশনে ধীরেসুস্থে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিদি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক। অমরনাথ জমিদারের ছেলে, কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত ; সেখানে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। অমরনাথ বাল্যবিবাহ, পণগ্রহণ, অপ্রণয়ে বিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে খুব বড় বড় কথা বলিত। হঠাৎ অমরের পিতা তাহাকে না জানাইয়া এক জমিদার-কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন, এবং বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে অমরকে বাড়ীতে আনাইয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপার জানান। বাধ্য হইয়া অমরকে বিবাহ করিতে হয় ; কিন্তু স্ত্রীর সহিত অমর কোন সম্পর্ক রাখিল না। অমর লজ্জিত হইয়া দেবেন্দ্রকেও তাহার বিবাহের সংবাদ জানাইতে পারিল না।

এক সময়ে ছুটিতে অমর দেবেন্দ্রনাথের দেশে শিকার করিতে গিয়া একটি বালিকার সহিত পরিচিত হয়। দেবেন্দ্র যোগাড়যন্ত্র করিয়া সেই বালিকার মাতার মৃত্যুশয্যায় অমরকে উপস্থিত করে। বিধবা অমরের হাতে তাঁহার কন্যা চারুকে সঁপিয়া দিযাই মরিয়া গেলেন ; অমর যে বিবাহিত তাহা জানাইবার অবকাশও সে পাইল না। অগত্যা অমর চারুকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং অন্যত্র তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে যখন অমর বুঝিল যে চারু তাহাকে ভালোবাসে এবং সেও চারুকে ভালোবাসে তখন সেই চারুকে বিবাহ করিবে সঙ্কল্প করিল।

অমর তাহার পূর্ব্বপত্নী সুরমার ও পিতার অনুমতি লইবার জন্য বাড়ী গেল। কিন্তু সুরমার তেজস্বী ব্যবহারে ও পিতার তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে চারুকে বিবাহ করিল। অমরের পিতা অমরকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া তাহার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। অমর ও চারু দুজনেই সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ অগোছালো ; জিনিষপত্র বিক্রী করিয়া দিন চলিতে লাগিল।

যখন অমরের আর্থিক অবস্থা চরম শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তখন অমরের পিতার দেওয়ান অনেক বলিয়া কহিয়া অমরকে কিছু টাকা পাঠাইলেন। অমর তাহা ফেরত দিল। সে পিতার স্নেহের দান লইতে পারে ; করুণার দান কাহারও নিকট হইতে লওয়া যে অপমানজনক। এমন সময়ে অমরের পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। অমর সংবাদ পাইয়া আর অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, চারুকে লইয়া পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা সন্তানকে ক্ষমা করিয়া, দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, চারুকে সুরমার হাতে সঁপিয়া দিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন। সংসার ব্যাপারে অনভিজ্ঞা চারু সুরমাকে দিদি রূপে পাইয়া আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

সুরমা স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা বলিয়া তাহার শ্বশুর তাহাকে সমস্ত জমিদারী ও সংসারের কর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে সে সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সংসারে জমিদারীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল— অমর ও চারু ত কিছুই জানে না, পারে না। অগত্যা তাহারা সুরমার শরণাপন্ন হইল।

এইরূপে ক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিচয় হইল। অমর দেখিল সুরমার মধ্যে কি মনস্বিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মপটুতা ও একপ্রাণ বাৎসল্য স্নেহ আছে। অমর মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ক্রমে প্রণয়ের আকারে তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

সুরমা বুঝিল যে চারুর স্বামী তাহাকে ভালোবাসিয়া চারুর প্রতি অন্যায় করিতে যাইতেছে, এবং সেও নিজের অলক্ষ্যে চারুর স্বামীকে ভালোবাসিতেছে। তখন সুরমা স্থির করিল যে তাহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। চারুর অশ্রুজল, চারুর পুত্র অতুলের স্নেহ, অমরের অনুরোধ তাহাকে টলাইতে পারিল না। বিদায় লইবার সময় অমর সুরমাকে বলিল যাইবার পূর্ব্বে একবার বলিয়া যাও যে ভালোবাস। সুরমা জোর করিয়া "না" বলিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে কাঁদিয়া লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল "ওগো শুনে যাও আমি তোমায় ভালোবাসি।"

সুরমা পিত্রালয়ে গিয়া তাহার বিমাতার ভগ্নী বালবিধবা উমাকে অবলম্বনস্বরূপ পাইয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। সুরমার সমবয়সী সম্পর্কে কাকা প্রকাশ উমাকে ভালোবাসে, উমাও প্রকাশকে ভালোবাসে বুঝিয়া উভয়কে দূরে দূরে সতর্কভাবে পাহারা দিয়া রাখা সুরমার কর্ত্তব্য হইল।

এদিকে চারুর একটি কন্যা হইয়াছে ; এবং চারুর সম্পর্কে ভাইঝি মন্দাকিনী তাহার দোসর জুটিয়াছে। কিন্তু দিদির বিচ্ছেদ বেদনা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অমরও সান্ত্বনা পাইতেছিল না। শেষে স্থির হইল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতে হইবে।]

দশম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। স্থির হইল দেবেন্দ্রও সঙ্গে যাইবে। তাহাদের পরিবারের মধ্যে আর একটী প্রাণী বাড়িয়াছিল, অমর তাহার বিষয়ে কি করিবে ভাবিয়া

স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে বালিকা মন্দাকিনী। তাহাকে ডাকাইয়া অমর বলিল "মন্দাকিনী! আমরা পশ্চিমে যাব, তুমি একা বাড়ীতে থাকতে পারবে?"

মন্দাকিনী মৃদুস্বরে বলিল "পারব।"

"একা মন-কেমন করবে না?"

"না।"

"আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখে যাব, তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

"আচ্ছা।"

কিন্তু যাত্রার সময়ে অতুল মহা গণ্ডগোল বাধাইল। সে তাহার দিদিকে ফেলিয়া কোন মতে যাইবে না। চারু অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইল। মন্দাকিনী অতুলকে বিবিধপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিল কিন্তু অতুল নাছোড়। অগত্যা অমর বলিল "মন্দাকিনী তুমিও চল; অতুল তো মানবে না দেখছি।" অমর চারু মন্দাকিনী দেবেন্দ্র সকলে পশ্চিমে যাত্রা করিল।

প্রথমে গয়া, তারপরে এলাহাবাদ, আগ্রা, বৃন্দাবন, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি বেড়ান হইল। মাস খানেক পরে সকলে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাণ্ডা গঙ্গাপুত্র ও যাত্রীওলাদের দৃষ্টি দেখাইয়া হটাইয়া দিয়া দেবেন দুর্গা-বাড়ীর নিকটে একটি স্বাস্থ্যকর পছন্দসই বাড়ী ভাড়া করিল। স্থির হইল কিছুদিন কাশীতেই বাস করা হইবে।

অম্লান সূর্যকিরণে সেদিন দূরে সৌধমালাসঙ্কুলা নগরী হাসিতেছিল, কয়েকদিন মেঘাড়ম্বরের পর আজ ক্লান্ত প্রকৃতি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। চারিদিকে যেন একটা হাস্যোল্লাসের অজস্র প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছিল। অমর বলিল "চল আজ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখে আসা যাক।" চারুরও যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু খুকির একটু অসুখ করায় হইল না। দুই বন্ধুতে "যাত্রায়" বাহির হইল। দেবদর্শনোদ্দেশে গমনের নাম "যাত্রা" শুনিয়া দেবেন বলিল "আঁা! যাত্রা? আমরা কিনা যাত্রা করব? থিয়েটর, বল কিম্বা সার্কাস বললেও না হয় সহ্য করা যেত,—শেষে কিনা যাত্রা?"

"ওহে সে 'যাত্রা' নয়, ভূষণদাস কিম্বা রসিক চক্রবর্তী সদলে এসে পড়বেন না,—এ একেবারে 'রাম নাম সত্য হায়।' গঙ্গাযাত্রা বা কাশীযাত্রা একই!—"

"আমি খাটিয়ায় শুয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ওরকম আবিরফুল গায়ে ঢালতেও রাজী, তবু আমি সে চোগা চাপকানে গান শুনতে রাজী নই ভাই। ছোট বেলায় একবার রাবণবধ পালা শুনতে গিয়েছিলাম।—বাপ! তাতে যে জুড়ীরা উঠে দাড়ীটাড়ি চুমরিয়ে গেয়ে উঠেছে 'জানি প্রিয়তমে রাম দয়ানিধি—জানি' অমনি মাথার ভেতরে ডাঁস মাছিতে কটাস্ করে কামড় দিলে কুকুর যেমন করে উঠে ছোটে তেমনি"—

অমর বাধা দিল "থাম থাম যা বলবে তা একেবারে চূড়ান্ত করে বলা চাই তোমার!—"

"যা বলি তা নেয্য কথা কিন্তু।"—

"কিন্তু তোমার বাংলার যাত্রায় যখন এত অভক্তি তখন তোমার কাশীতে মুক্তি পাবার ভরসা নেই।"

"ভরসার চেয়ে দাবীর জোর কতখানি তা তুই কি জানবিরে মূর্খ?—এবার বাঙলার ম্যালেরিয়ায় ভুগে এবং সকলকে ভুগতে দেখে, বলি তবে, এতদিনে মার উপর একটু একটু অভক্তিও জন্মে গেছে। কবির বিখ্যাত সেই গানটা কি বলে—"নমো বঙ্গভূমি" তার আমি যা পাঠান্তর করেছি তা বুঝি তোকে শোনাই নি? শোন তবে।

নমো বঙ্গভূমি শ্যামলাঙ্গিনী!
দিকে দিকে জননী জ্বরপ্রসারিণী!
সুদূর নীলাম্বর-প্রান্ত সঙ্গে ম্যালেরিয়া-ধোঁয়া মিশিতেছে রঙ্গে,
চুমি পদধূলি চলে পীলেগুলি—রূপসী নরাশী পানা-পুকুরিণী!
তাল তমাল দল নীরবে বন্দে, কারণ উজাড় দেশ কলেরা বসন্তে
নীরবে ঘুমাও নীরব-গামিণী!
কিসের এ দুঃখ মাগো কেন এ দৈন্য, সে কথা আমরা
ছাড়া কে জানিবে অন্য
পালাই পালাই ডাক ছাড়ে পুত্রগণ!
বৎসর পরে যদি গ্রামে জোটে সবে, অমনি চাপিয়া ধর
জননী গরবে,
তখন ঝাট্‌ বৈদ্য না হয় পালাও সদা, চিনেছি তোমায়
পীলেরুগী-জননী!—

একটি প্রাচীন পারসিক ছবি।

"বিজলী চমকে"।

এ হেন মায়ালোবিয়ার ভূগে ভূগে যে কাশী আসে তাকে বাবা বিশ্বনাথ কোন প্রাণে না সগু মুক্তি দেবেন ? অবি মুক্ত বারাণসী যে তা দিতে বাধ্য, তার দাবী কতখানি জানিসরে নাস্তিক বর্ব্বর ?”

পিচ্ছিল পথে পা হড়্কাইয়া দেবেন পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

“দেখিস্! কেমন ? ভক্তির উৎসে পড়ে সদ্য মোক্ষ পাচ্ছিলি ত এখনি !”

গলিগুলি তখনো কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল! দুই জনে কাশীর গলিকে গালাগালি দিতে দিতে কোনক্রমে অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া শুনিল তখনো বিশ্বেশ্বরের মধ্যাহ্ন আরতির কিছু দেরী আছে। দেবেন বলিল “এস ততক্ষণ অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহস্থালী দেখে বেড়ান যাক্। এখন বাবা বিশ্বনাথের কাছে গেলে ভিড়ে চাপ্টা হতে হবে।” দুই জনে গরুর গলা চুলকাইয়া দিয়া, ময়ূরের লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া, হরিণের শিং ধরিবার চেষ্টায় তাহাকে বাগাইয়া, এইরূপে সেই যত্নপালিত পশুগুলিকে পরম আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আহারের বিষয়েও তাহাদের ফাঁকি দিল না। বড় বড় ষণ্ডগুলার বালকের ন্যায় আদরপ্রার্থী ভাব এবং আহার গ্রহণ করার কৌশল দেখিয়া তারিফ করিতে লাগিল। ষণ্ডগুলার নিস্কিরোধী ভাব এবং ময়ূরদের নির্ভীকতা দেখিয়া দেবেন অমরকে বলিল, “রে অর্ব্বাচীন ‘মা চাপলেতি’- দেখছিস্ না ‘মুক্তা ভুজং শান্তমৃগপ্রচারং’ এখনি নন্দী ভায়ার হেমবেত্র তোমার পিঠে পড়বে।”

অমর হাসিয়া বলিল “বাদ পড়ে সে সঙ্গদোষে।”

সহসা দেবেন অমরকে ডাকিয়া বলিল “ওদিকে দ্যাখ ব্যাপারখানা কি!”

দুই জনে দেখিল একটি মোটাসোটা ও বিপুল ভুঁড়িবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাণ্ডা, মালাওয়ালা, গঙ্গাপুত্র প্রভৃতি এবং অসংখ্য ভিক্ষুকে এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে যে সেরূপ স্থানেও বহুলোক সেই হাঙ্গামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। লোকটী বোধ হয় ধনী; কেন না সঙ্গে লাঠিধারী কয়েকজন বরকন্দাজ প্রভৃতিও রহিয়াছে কিন্তু প্রভুকে উদ্ধার করিবার সাধ্য কাহারো হইতেছে না। চারিদিক হইতে অযাচিত আশীর্ব্বাদবর্ষী হস্ত উপর্য্যুপরি তাঁহার কেশবিরল মস্তক আক্রমণ করিয়া বাকী কয়েকগাছিও স্থানচ্যুত করিয়া দিতেছে। দেবেন বলিল “চল চল পেছনে পেছনে মজা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া যাক।”

“সর্ব্বনাশ আর কি! দলটা এগিয়ে যাক্।”

“চলনা হে আমি রইছি ভয় কি ?”

“ভরসাই বা কি ? যে লোকগুলো ও লোকটার কাছে পৌছতে না পাবে তারা আমাদের দফা সারবে! আর একটু পরে বেরুনো যাবে।”

দেবেন বলিল, “আহা লোকটার জন্যে বড় মায়া হচ্ছে ইচ্ছে করছে ঘুসি থাপ্পড়ের বলে লোকটাকে উদ্ধার করে আনি।”

অমর বাধা দিয়া বলিল “বিদেশে আর অত মস্তানিতে কাজ নেই, বিশেষ এটা পাণ্ডাদেরই রাজত্ব। কিন্তু দেবেন, ঐ লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।”

“তার আর আশ্চর্য্য কি! তোমাদেরই জাত ভাই কেউ হবেন হয়ত! তবে জমিদারী করে করে উনি দিব্বি ভুঁড়িটি বাগিয়ে ফেলেছেন, তুমি এখনো ততদূর প্রমোশন পাওনি, এই যা প্রভেদ।”

“নাও এখন চল, শেষে জায়গা পাওয়া যাবে না।”

“জায়গা ঢের পাওয়া যাবে, পকেট হতে কিছু টাকা খসিও দেখি।”

বিষম ভিড়ের মধ্যেও দেবেনের সুযুক্তির গুণে তাহারা মন্দিরের দ্বারে স্থান পাইল। তখন দ্বিপ্রহরের আরতি আরম্ভ হইয়াছে; নয়জন পুরোহিত একসুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে নয়টি বৃহৎ বহুশিখাবিশিষ্ট আরাত্রিক-প্রদীপ লইয়া আরতি করিতেছেন, ধূপ ও কর্পূরের ধূমে চারিদিক প্রায় অন্ধকার, পুষ্প ও চন্দনের সৌরভে স্থান আমোদিত। অসংখ্য বাদিত্রের এককালীন বাদ্যের বিকট শব্দে স্থানটি নিনাদিত; অথচ কিছুক্ষণ পরে বোধ হইতেছে একটা গম্ভীর উদাত্ত স্বর সৃষ্টি করিবার জন্যই যেন এতটা শব্দের প্রয়োজন হইয়াছে। দুইধারে স্কন্দপ্রতিম দুইজন পাণ্ডা

বিশ্বেশ্বরকে চামর ঢুলাইতেছে। অমরের মনে আসিল, গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকামণ্ডল চমকে মোতি, ধূপ মলয়ানিল, পবন চৌরী করে, বহত ফুলন্ত জ্যোতিরে।

বিশ্ব তাহার উপযুক্ত আরতি বিশ্বনাথের পায়ে অবিরাম ঢালিতেছে, কিন্তু মানুষ কি নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবে? তাহার উপযুক্ত আরতি করিতে সেও ব্যগ্র। আরতির ক্ষুদ্র বৃহৎ নাই।

সহসা সম্মুখে দৃষ্টি পড়ায় অমর চমকিত হইয়া উঠিল। একি! এযে পরিচিত মুখ বোধ হইতেছে। দৃষ্টি-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই অমর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিল, কেননা সে ধারে অত্যান্ত স্ত্রীলোকের সমাবেশ। কিন্তু মনে যেন কেমন খট্‌কা লাগিয়া গেল—নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সঙ্কোচও গেল না। বিশ্বনাথের প্রতি চাহিল, সে প্রস্তরমূর্ত্তি তখন ফুল বিল্বপত্রের সজ্জায় সম্পূর্ণ আবরিত, চারিদিকে পূর্ণ উৎসাহে আরত্রিক-বাদ্য বাজিতেছে, বাদ্য ও জনকোলাহলে সকলের কর্ণ বধির। অমরনাথ ধীরে ধীরে আবার সম্মুখে চাহিল—হাঁ পরিচিতই বোধ হইতেছে, অত্যন্ত পরিচিত মুখ! পট্টবস্ত্রের অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে, বিশৃঙ্খল মুক্ত কেশের মধ্য হইতেও বেশ চেনা যাইতেছিল। চক্ষু ঈষৎ নমিত, দৃষ্টি আরতির মধ্যে একাগ্র, কণ্ঠে অঞ্চল জড়িত, যুগ্মহস্ত বক্ষের উপরে ধরিয়া যেন মূর্ত্তিমতী আরাধনা বিশ্বেশ্বরের পদতলে দাঁড়াইয়া আছে। দেবেন তাহাকে ধাক্কা দিয়া ডাকিল “দেখেছো সেই বুড়ো ব্যাচারীটী এখানে একখানি চৌকী পেয়েছেন। ব্যাটার পাণ্ডার দল কিন্তু এখনো গোটা কয়েক পেছু লেগে আছে? আহা ব্যাচারা একটু স্বস্তি পাক যে দশা হয়েছিল।” অমর উত্তর দিলনা, সেই লোকটি কে এখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল। দেবেন বলিল “ওহে চলনা, ব্যাচারার দুঃখে আমরা যে বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলাম সেটা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে ওর পাশের চৌকী একটু দখল করি।” অমর অসম্মত হইলে দেবেন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা অমর বলিল “লোকটি পরিচিত বোধ হচ্চে হে কাছে গিয়ে কাজ নেই।”

“কেন তাতে ভয় কি? তোমায় ত বিশ্বনাথের প্রসাদ বলে মুখে পুরবেনা?”

“বিচিত্র কি! এরকম স্থলে পরিচয় করারই বা দরকারটা কি?”

“কে হে লোকটি?”

“পরে বলব।”

আরতি তখনো চলিতেছে। দেবেন এবার ভিড়ের চোটে অমরের অতি নিকটে, প্রায় গায়ে গায়ে সংলগ্ন সম্মুখে দ্বারের দিকে বোধ হয় তাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছিল অমরকে মৃদুস্বরে বলিল “বড় অস্থানে স্থান পাওয়া গেছে হে সম্মুখে যাবার জো নেই।” অমরের গণ্ড সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল—মনে হইল সরিয়া যাই, কিন্তু পাছে দেবেন কিছু মনে করে তাই কোন’ উপায়ে দেবেনকে সরাইয়া দিবার চেষ্টায় বলিল “তোমার চৌকীর চেষ্টা একবার করে দেখ না, যদি জায়গা পাও।”

“তাহলে ব্যাচারীকে একবার আপ্যায়িত করে আসি?”

“ক্ষতি কি, কিন্তু ভদ্রলোকের মত কথা কয়ো,—অশিষ্টতা করনা।”

“রামঃ” বলিয়া দেবেন ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির হইয়া গেল। অমর আবার ঈষৎ চেষ্টা দ্বারা দৃষ্টিকে সম্মুখে প্রেরণ করিল, পরস্ত্রী দর্শনে লোকে যেরূপ সসঙ্কোচ দৃষ্টি প্রেরণ করে—চাহিতেও অনিচ্ছা,—অথচ একটা কৌতূহলও অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃশ্য তেমনি আছে, অনন্যচিন্তা, আরতির মধ্যে বদ্ধদৃষ্টি, স্থির ধীর পাষাণমূর্ত্তি অনাদি দেবতার সম্মুখে যেন নিপুণশিল্পী-রচিত পূজারতা পাষাণ পুত্তলী!

আরতি শেষ হইয়া গেল। চিত্রিত জনরেখা প্রণামের জন্য নমিত হইয়া গেল, সেই সঙ্গে বদ্ধ দৃষ্টিযুগলও স্থানচ্যুত হইয়া একটু উর্দ্ধে উঠিল, তার পরে বোধ হয় প্রণামের জন্য নমিত হইত; কিন্তু অর্দ্ধ পথে স্থির হইল। সে দৃষ্টিও বোধ হয় তাহার পরিচিত কোন’ স্থানে সহসা বাধিয়া গিয়াছিল। অমর সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল, অস্ফুটে ডাকিল, “দেবেন!” দেখিল দেবেন পশ্চাতে নাই,—সে দূরে জনসংঘ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। অমরকে তৎপ্রতি চাহিতে দেখিয়া দেবেন হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিল। অমর অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া সহসা মনে করিল দেবতাকে তাহার প্রণাম করা হয় নাই,- ঈষৎ ফিরিয়া

যোড়হস্তে দেবতাকে প্রণাম করিবা মাত্র, মুদাতুষ্ট পাণ্ডার হস্ত হইতে সেই মুহূর্তে মস্ত একগাছা গাঁদা ফুলের মালা তাহার কণ্ঠে পড়িল। এ অযাচিত অনুগ্রহ কাহার দেবতার না পাণ্ডার তাহা বুঝিতে না পারিয়া অমর একটু হাসিয়া আবার একবার মস্তক নত করিল। দুই একজন লোক ঠেলিয়া দু এক পা পিছাইয়া আবার একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিল অনেক স্ত্রীলোক আছে বটে পরিচিত কেহ নাই। মনে হইল একি ভ্রম নাকি! কিন্তু দূরে সেই পাণ্ডারাহুর মধ্যে অর্দ্ধগ্রস্ত বিপুল বপু দেখিয়া বুঝিল ভ্রম নয় বাস্তব ঘটনা।

দেবেন বলিল "ওহে লোকটা বড় সুবিধের নয় দেখ্‌লাম। ঐ বিনয়নম্র বচনে ওঁর ভুঁড়িটির মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে তার সঙ্গে আলাপটা জমাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমলই দিলে না, পাণ্ডা আর ভিখিরি নিয়ে মহা ব্যস্ত! লোকটা সুবিধের নয়, কেহে লোকটা?"

"শুনে কি হবে?"

"হবে আর কি একটু কৌতূহল! অমন ভুঁড়ীর যে পরিচয় না পেল তার বৃথাই জন্ম।"

অমর হাসিয়া বলিল "অত যে বকামি করছ যদি গুরু লোক সম্পর্কে হন?"

"গুরুলোক! বাপ্‌রে শুন্‌লেও ভয় করে! সম্বন্ধটা কি ঘনিষ্ঠ?"

"ঘনিষ্ঠ নয়ও বলা যায় না।"

"তবু?"

"শ্বশুর হন্ লোকে এই রকম বলে।"

"বল কি?"

অমর নীরব রহিল।

"ছি ছি তোমার বলা উচিত ছিল।"

"তাইত বল্‌ছি চুপ কর।"

"আমায় অপ্রস্তুত করে দিলে যে হে।"

"অপ্রস্তুত আর হয়ে কাজ নেই—এখন পালাই চল।"

"চল,—হাঁহে কতকগুলি মেয়েমানুষও দলটার মধ্যে দেখ্‌লাম,—গৃহিণী যদি কেউ থাকেন ওর মধ্যে; ভাগ্যে কিছু বলা হয়নি!"

অমর লজ্জিতভাবে দেবেনের পৃষ্ঠে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল "তিনি অনেক দিন মারা গেছেন।"

"তবে শ্বশুরের কন্যা ওঁর মধ্যে আছেন নাকি? শুনেছি তিনিই বাপের সন্তানের মধ্যে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্?"

"হ্যা।"

"কি হাঁ? তিনি বাপের এক সন্তান সেই হাঁ না তিনি ওর মধ্যে আছেন তাই হাঁ?"

"দুই-ই।"

"বল কি অমর তুমি দেখেছো?"

অমর নীরবেই রহিল। দুই বন্ধু অনেকটা পথ অতিবাহিত করার পর সহসা দেবেন বলিল "অমর, আমার বোধ হয় তুমি আমায় সব কথা বল নি।"

"এতে বলবার কি থাকতে পারে?"

"বোধ হয় আছে।"

"কিছুনা।"

"দাদা, তুমি বলছো এখানা গার্হস্থ্যচিত্র কিন্তু আমার বোধ হচ্চে যেন একখানা রোমান্টিক নভেল।"

অমর সজোরে হাসিয়া বলিল "তা যদি বল তাহলে জেনো একখানা ফার্স বই কিছু নয়।"

"বলিস কি, তুই এত পাষণ্ড! তোর কাছে যেটা ফার্স অন্যের কাছে সেটা একখানা প্রকাণ্ড কাব্য জানিস্? সারা জীবনটা—তবে হাঁ কেউ বলে কমেডি কেউ ট্রাজেডী এই যা প্রভেদ তা না ফার্স?"

"এ জীবনকে যে কাব্য বলে সে মহা মূর্খ—এটা কাব্য নাটক নভেল কিছু নয় যদি কিছু হয় তবে ফার্সই।"

উভয়ে বাটীতে আসিয়া দেখিল চারু অত্যন্ত অভিমান করিয়াছে। চারু বলিল "খুকীর জ্বরও হয়নি কিছুনা, কেবল কুড়েমী করে আমায় না নিয়ে যাওয়া।" তাহারা অসুবিধার পক্ষ অনেক সমর্থন করিয়া বুঝাইতে গেল, চারুর তাহাতে উত্তরোত্তর দুঃখ বাড়িতেই লাগিল। শেষে আর একদিন চারুকে লইয়া যাইবে প্রতিজ্ঞা করার পর তবে চারুর রাগ গেল।

ভোজনাদির পরে অমর শয়ন করিলে চারু আসিয়া নিকটে বসিল। "কেমন আরতি দেখলে?"

"বেশ।"

"সন্ধ্যের আরতি বলে আরও সুন্দর।"

"হবে।"

"একদিন সন্ধ্যে বেলা নিয়ে যাবে?"

"আচ্ছা।"

"এ আরতিও খুব চমৎকার না?"

"হ্যাঁ।"

চারু রাগিয়া উঠিল "ও কি রকম কথা কওয়া হয়েছে কি?

"ঘুম পাচ্চে।"

"দুপুর বেলায় ঘুম পাচ্চে? কই কোন বইও হাতে নাওনি সত্যি ঘুম পাচ্চে?"

"সেই রকম ত মনে হচ্চে।"

চারু একটু নত হইয়া বালিশে ভর দিল, তারপরে কোমল হস্তে স্বামীর ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "তবে ঘুমোও।"

অমর চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্বামীকে নিদ্রিত ভাবিয়া ধীরে ধীরে চারু উঠিয়া দাঁড়াইতেই অমর চক্ষু মেলিল। চারু আবার বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল "এই বুঝি ঘুম?"

অমরও হাসিল। "আসছে না ত কি করি।"

"কে সেধে ঘুম আনতে বলছে?"

"ঘুমকে না ডাকলে তুমি কি এতক্ষণ বসতে? কখন উঠে পালাতে!"

"আমি হলে এতক্ষণ কখন ঘুমিয়ে পড়তুম।"

"তোমার মতন নিশ্চিন্দি হবার জন্যে তোমার ওপর বড় হিংসে হয়।"

"তোমারি বা এত চিন্তা কিসের?"

অমর একটু হাসিল। চারু আগ্রহে বলিল "হাসলে যে? আচ্ছা তোমার কি এত চিন্তার বিষয় আছে বল শুধু আমি বড় চিন্তায় থাকি বল্লে ত' হবে না।"

অমর হাসিয়া বলিল "কে তা বলতে যাচ্চে?"

"তুমিই বলছো।"

"তাহলে ঘাট হয়েছে। সত্যি বলছি চারু, আমার মত সুখী খুব কম আমি কেন চিন্তা করব বল?"

"কিসে তোমার দুঃখ আছে তাও তো ভেবে পাইনে। কিন্তু আজকে বোধহয় তুমি কিছু ভাবছ।"

অমর একটু চমকিত হইয়া বলিল "নাঃ কে বললে? আমি কি ভাবব? তুমিই বলনা।"

"না বললে আমি কেমন করে বলব বল! তোমার বলার ভাবে বুঝেছি তুমি কিছু ভেবেছ তুমি যখনি সেটা ঢাকতে যাও তখনি কিন্তু আমি বুঝতে পারি। বলনা কি হয়েছে?"

অমর দেখিল অত্যন্ত অন্যায় হইয়া যাইতেছে, হয়ত এ ঘটনা চারু পরে জানিতে পারিবে। কিন্তু তখন ভাবিবে যে স্বামীর ইহা লুকাইবার এমন কি প্রয়োজন ছিল।তাহাতে নাজানি কি ভাবিবে। অমর একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল "কথা বেশী কিছু নয় আজ ত একজন পরিচিত লোককে মন্দিরে দেখা গিয়েছে।"

"পরিচিত লোক? কে তারা?"

"কালীগঞ্জ জান ও তার জমীদার।"

"বাবাকে দেখেছ? ছি ছি তার সঙ্গে বুঝি কোন সম্বন্ধ নেই তাই অমন করে বলছ? তিনি তোমায় দেখেছেন?"

"না।"

"আর তাঁর সঙ্গে কে কে আছে? দিদি আছেন নিশ্চয়?"

"হতে পারে।"

"হতে পারে কি? নিশ্চয় জাননা? দেখতে পাওনি?"

অমর গলা ঝাড়িয়া বলিল "পেয়েছি।"

"তবে? এতও কথা লুকুতে পার! আর উমারাণী এসেছে? প্রকাশ?"

"কই আর কাউকে দেখলাম না।"

"তোমায় তাঁরা দেখেন নি?"

"না।"

"তবে কি করে দেখা হবে কি করে দিদিকে জানাব যে আমরা এখানে আছি?"

"সে পরে দেখা যাবে।"

"তা হবে না; আমার মাথা খাও কিছু উপায় কর, করবেনা? করবেনা?"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"নইলে আমার দিদির বুঝলে ?"

"হাঁ।"

তার পরে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। চারুকে উতলা দেখিয়া মিথ্যা স্তোকে অমর তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। "খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কি করা যায় বল।" চারু তখন আর এক বুদ্ধি খেলাইল। তাহার দেবেন দাদাকে গিয়া ধরিল যে তাঁহাদের খোঁজ আনাইয়াই দিতে হইবে। অমরের নামেও অভিযোগ করিতে ছাড়িল না। কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেবেন্দ্র সেই দিনই বৈকালে বিশ্বেশ্বরের সেই পাণ্ডা প্রভুর যিনি অমরের শ্বশুরের চৌকীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাঁহার সন্ধানে বিশ্বনাথ দর্শনে যাত্রা করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা একটু শান্তভাবে অনেকটা বিস্ময় বহন করিয়া মন্দিরের অঙ্গনে নামিয়া আসিয়া পিতার সঙ্গে অনেক লোকের মধ্য দিয়া বাসা অভিমুখে ফিরিয়া চলিল, উমাও পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিল। কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বা কোন কথা কহিতে তখন যেন সুরমার ইচ্ছা হইতেছিল না। বিস্ময়ের কথা কিছুই নয় অথচ একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে তাহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম করিতে করিতে মনে হইল বিশ্বনাথকে প্রণাম করা হয় নাই! সে যে হৃদয়ের সমস্ত শ্রেষ্ঠদ্রব্য আজ বিশ্বেশ্বরকে নিবেদন করিয়া একান্ত নির্ভরের সহিত ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল কিন্তু সেই সময়ে আর একজনকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সেই আত্ম-সমর্পণকারী ভক্তিব্যাকুল হৃদয় সহসা স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। যেন তাহা যথাস্থানে নিবেদিত হইতেছিল না তাই বিশ্বনাথ তাহার উদ্যত অর্ঘ্য ফিরাইয়া দিলেন। সেই উৎসিত নিবেদিত সজ্জিত অর্ঘ্য সে এখন কোথায় ফেলিবে? কোথায় তাহার স্থান! সেই লঘু ফুলভার- অতি কোমল অর্ঘ্য যাহা দেবতাকেই শোভা পায় -সেই লঘু ভার তাহার বক্ষে পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছে। একি আর দেবতার উপলব্ধ আছে? এ অর্ঘ্য মৃত্তিকায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাই সুরমা আর ফিরিয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। সকলের সঙ্গে বাটী ফিরিয়া আসিল। সকলেই সানন্দে আরতির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। উমা সেও যেন একটু আনন্দিত প্রসন্ন হাস্যে সুরমাকে বলিল "কি চমৎকার আরতি মা -- সবাই যেন আহ্লাদে কি রকম হয়ে যায়, ঠাকুর যেন ঐখানেই পূজো নিতে রয়েছেন; ওখানে পূজো করতে এমন ভাল বোধ হ'ল, যেন সব ঠাকুরের চরণে গিয়ে পড়ছে!" কেবল সুরমারই মনে হইতেছিল আজ তার সকল পূজা সকল আয়োজন বৃথা হইয়াছে।

সেদিন তাহারা সবে সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখনো কিছুই গোছানো হয় নাই। কোনরূপে সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইল। রাধাকিশোর বাবু বলিলেন "মা পান কি আনানো হয় নি?"

সুরমার মনে পড়িল পৌঁছিয়াই পাছে কিছু অভাব হয় বলিয়া সে বাটী হইতেই সব জোগাড় করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে পিতার পানছ্যাচা পাত্রটি পর্য্যন্ত। একটু কুণ্ঠিত ভাবে সে পিতাকে পান ছেঁচিয়া দিল। প্রকাশ আসিয়া বলিল "এখনো দাদামশায়ের শোবার জায়গা ঠিক করা হয়নি যে।" সুরমা তাড়াতাড়ি শয্যা প্রস্তুত করিতে গেল।

বৈকালে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে নূতন গৃহস্থালী পাতিতেছিল। উমা আসিয়া ডাকিল "মা, বাবু বলছেন কেদার দর্শনে যাবে?"

আলস্যজড়িত কণ্ঠে সুরমা বলিল "আজ না, কাল।"

কয়েকটা কাজ শেষ করিয়া সুরমা কক্ষান্তরে গিয়া দেখিল প্রকাশ অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া অর্দ্ধমুক্ত বাতায়ন পথে চাহিয়া আছে। সুরমাও পশ্চাত হইতে কৌতূহলের সহিত বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিল বারান্দায় উমা বসিয়া রাধাকিশোর বাবুর আহ্নিকের কোশাকুশী প্রভৃতি মাজিতেছে। প্রকাশ যে কক্ষান্তর হইতে তাহাকে দেখিতেছে তাহা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না -সুরমা দেখিয়া বুঝিল। অন্যদিন হইলে সে তখনি প্রকাশকে তাহার অন্যায় বুঝাইয়া দিত, শাসন করিত, কিন্তু আজ বলিতে গিয়াও পারিল না,

মৃতপদে সরিয়া আসিল। প্রকাশের ধ্যানে বাধা দিতে তাহার আজ যেন একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

দুইদিন অন্যান্য দেবতাদি দর্শনে কাটিয়া গেল। তখন রাধাকিশোর বাবু সুরমাকে বলিলেন "তবে প্রকাশ কি আজ বাড়ী যাবে?"

"তাই যাক্।"

"কিন্তু বোধ হয় কিছু অসুবিধায় পড়্‌তে হবে।"

"কিছু অসুবিধা হবেনা বাবা, সবাই থাক্‌লে ওদিকে যে সব নষ্ট হবে—একজন যাওয়া চাই।"

"তবে যাক্।"

রাধাকিশোর বাবু একটু ক্ষুণ্ণ ভাবেই সম্মতি দিলেন, কেননা সুরমার বড় আপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশকে তিন-চারদিনের কড়ার করিয়া তিনিই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, রাস্তায় পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয় এই তাঁহার বিষম ভয়। ভাবিয়াছিলেন একবার প্রকাশকে লইয়া যাইতে পারিলে কন্যা তখন সুবিধা বুঝিয়া আর জেদ করিবে না। কিন্তু কন্যা কিছুই বুঝে না কি করিবেন!

সুরমা প্রকাশের সঙ্গে দিবার জন্য একটা ঝোড়ায় করিয়া কুল পেয়ারা প্রভৃতি সাজাইতে সাজাইতে প্রকাশকে ডাকাইয়া বাটীতে সেসব কাহাকে কাহাকে দিতে হইবে বুঝাইয়া দিল। প্রকাশ বলিল "কিন্তু বোধহয় আজ আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"অন্ততঃ কালকের দিনটা নয়ই!"

সুরমা একটু ভ্রুকুটিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল "কি হয়েছে? কেন?"

"অমর বাবুর বন্ধু কে একজন, দেবেন বাবু বলে আছেন চেনো?"

"থাকতে পারে, কেন?"

"তাঁরা কাশীতে আছেন, অতুলরা আছে, তিনি এসে তোমায় খবর দিতে বল্লেন—কাল তোমায় নিয়ে আমায় তাদের বাসায় যেতে অনুরোধ করে ঠিকানা দিয়ে গেলেন।"

"এই বুঝি যাওয়ার বাধা?"

"হাঁ।"

"ওতে বাধা দিতে পার্‌বেনা—তুমি গুছিয়ে নাও, বাড়ী না গেলেই চল্‌বে না।"

"তা নাহয় যাচ্চি—কিন্তু তুমি কাল সেখানে যাবে ত? তাঁরা এখানে আস্‌তে একটু সঙ্কোচ বোধ করেন, বুঝেছ? পাছে দাদামশায় বিরক্ত হন্ তাই। তুমি যেয়ো, বুঝেছ?"

সুরমা একটু হাসিয়া বলিল "সে হবে।"

"যাবে না বুঝি?"

"কেন, তাঁদের লজ্জা হয়, আমার হতে পারে না?"

"সে কি! তোমার যে আপনার ঘর।"

বাধা দিয়া সুরমা বলিল "তুমি আজই যাচ্চ ত?"

"না গিয়ে কি করি! বড় ইচ্ছে ছিল অমর বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি।"

"মনের ইচ্ছে মনে থাক্। তারপরে প্রকাশ, তোমার সঙ্গে আমার কিছু ঝগড়া আছে।"

"ঝগড়া? তবে আরম্ভ কর।"

"ঠাট্টা নয়, শোন! আচ্ছা সত্য করে বল তোমার নিতান্ত ইচ্ছা যে আর দুচার দিন থেকে যাও, না?"

প্রকাশ একটু থামিয়া গেল। একটু নীচুস্বরে বলিল "ভাল জায়গায় থাক্‌তে কার না ইচ্ছে হয়।"

"সুধু কি সেই জন্যে? প্রকাশ, আমার দিকে চেয়ে সত্য করে বল দেখি, সুধু সেই জন্যে?"

প্রকাশ সহসা ভয় পাইল, সুরমার উজ্জ্বল তীব্র চক্ষু দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "তবে কি জন্যে?"

"কি জন্যে তা কি আমি জানি না। তুমি অত্যন্ত অপরাধী! তোমার আজ আমি বিচারক, জান' তুমি কি অন্যায় করেছ?"

প্রকাশের মনে হইল তাহার পায়ের নীচে হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! কর্ণে যেন ঝিম্ ঝিম্ শব্দ হইতে লাগিল—স্তম্ভিত মূহ্যমান প্রকাশের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"জান তুমি কি অন্যায় করেছ? বালিকার সরল মনে কি বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছ। বাল বিধবার পবিত্র হৃদয়ে পাপের কি অঙ্কুর উদ্‌গত করতে চেষ্টা করেছ?"

ধূপদান।

গোকুল-ব্রত।
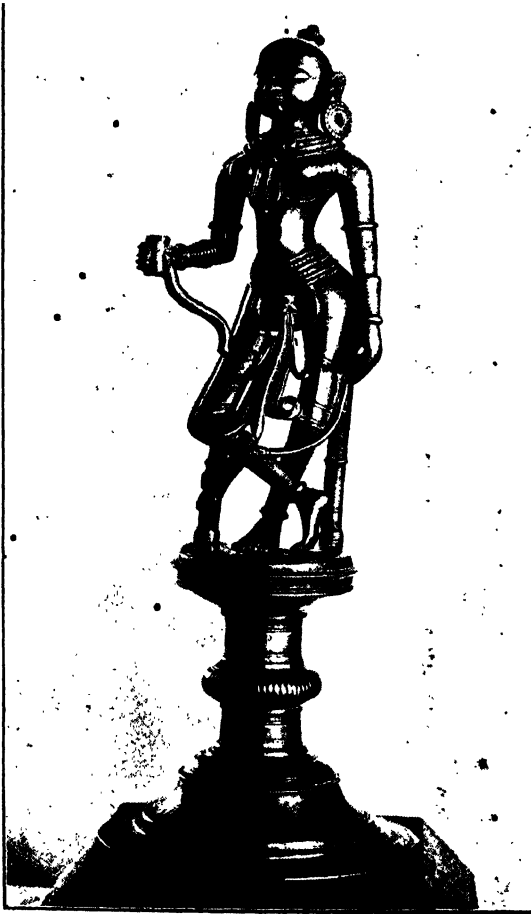
প্রকাশ ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। অস্ফুটে তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল "পাপ! পাপের কথা?"

"পাপের কথা নয় ত কি? কাকে পাপ পুণ্য বলে তুমি তার কি জান? সরল মনে গরল ঢাকিয়ে দেওয়া—বালিকাকে প্রলোভনে ফেলা পাপ নয়?"

"প্রলোভন? না না ওকথা বল' না।"—রুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ উত্তর করিল।

সুরমা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "প্রলোভন নয়? প্রলোভন কি কেবল এক রকমেরই হয়? ভালবাসা প্রলোভন নয়? তুমি তাকে যে ভাল বাস তা বোঝাতে চেষ্টা করেছ সে বালিকা আজন্ম স্নেহবঞ্চিতা—স্বামী কে—স্বামী। ভাল বাসা কি, জানেনা, সে ভালবাসার লোভে প্রলুব্ধ হতে কতক্ষণ? তার বয়সে লোকে আপনা হতেই স্নেহ পেতে স্নেহ দিতে উৎসুক হয়ে ওঠে, মানুষের এটা স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তি! সে কি এখন এ স্নেহ ন্যায় কি অন্যায় বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছে? তার মত সাংসারিকবুদ্ধিহীনা সরলা চিরদুঃখিনীকে গ্লানির এমন অগ্নিকুণ্ডে ফেলতে তোমার লজ্জা হয়নি? ছি ছি, তুমি কি পুরুষ?"

প্রকাশ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল "ক্ষমা করো! আর বলোনা—আর বলোনা।"

সুরমা থামিল না, "এইটুকুতেই তুমি এত কাতর, প্রকাশ? তুমি একটা পুরুষ, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন—তুমি বয়সেও যুবা। তুমি এই ক'টি কথা সহ্য করতে পারছ না আর সেই ফুলের মত কোমলপ্রাণ কি করে এত বড় গ্লানি সহ্য করবে যখন তার অন্তরাত্মা তাকে অশুদ্ধমনা দেখে তিরস্কার করবে তখন সে কি করে সহ্য করবে? যখন সকলে তাকে"—

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল "তার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। তাকে কেন তিরস্কার করবে—তাকে গ্লানি স্পর্শ করেনি"—

"ঈশ্বর করুন তার মনে কোন ছায়া না ধরে যেন। কিন্তু তুমি কি করেছ? তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

"যা আদেশ করবে।"

"তা করতে প্রস্তুত আছ ত?"

"এখনি।"

"দেখো কথা যেন ঠিক থাকে। জান এর সাক্ষী—ভগবান!"

"বল কি করতে হবে?"

"বিয়ে করতে হবে। আর-একজনকে ভাল বাসতে হবে, উমার মনে যেন স্বপ্নেও স্থান না পায় যে তুমি তাকে ভাল বাসতে বা বাস।"

প্রকাশ নীরবে শুষ্ক মুখে চাহিয়া রহিল, কণ্ঠ দারুণ শুষ্ক—মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

সুরমা বলিল "প্রকাশ, চুপ করলে যে? তোমার কি প্রায়শ্চিত্ত শুনেছ?"

"শুনেছি। বড় কঠিন শাস্তি সুরমা—তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এত নিদয়? আর কিছু বল।"

"আর কিছু নয়, এই তোমার শাস্তি—আর শাস্তিরই যে শাস্তির ভার তোমার মাথায় করে নিতে হবে। যত দেরী করবে জেনো তত বেশী অন্যায় করছ। কি বল প্রকাশ? পাপ করে তার শাস্তির ভয়ে এত কাতর? তুমি না পুরুষ? ছি ছি ছি।"

"ক্ষমা কর সুরমা ক্ষমা কর।" প্রকাশ বালিকার ন্যায় সেখানে লুটাইয়া পড়িল। সুরমা নির্জ্জল চক্ষে চাহিয়া বিধাতার মত কঠিন হৃদয়ে অটল স্বরে বলিল "ক্ষমা নেই। তুমি আজ বাড়ী যাও। জেনে রেখো প্রায়শ্চিত্ত শাস্তিরই করতে হবে। তবে যদি ভীরু পাপীর মত পাপ করে তার দণ্ড নিতে সাহস না থাকে তবে যেখানে ইচ্ছে পালিয়ে যাও, নিজের মনের সন্তাপে নিজে পুড়ে মরগে, একটা নির্দোষী বালিকাকে অকারণে পাপের সন্তাপের মধ্যে চির জীবনের মত ডুবিয়ে রেখে সুখী হওগে, কিন্তু জেনো দণ্ডদাতা বিধাতার হাত হতে তুমি নিস্তার পাবে না—আমি বা তোমায় কি দণ্ডের কথা বলেছি—এর শতগুণ দণ্ড তার তুলাদাড়িতে মেপে উঠবে।" সুরমা নীরব হইল। প্রকাশও অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। তারপরে সাশ্রুনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলিল "এর আর অন্যথা হবে না?"

"না।"

"কিছুদিন সময়ও কি পাব না?"

"না। তার সরল মনে এ পাপ সংস্কার বেশী দিন থাকতে দেওয়া হবে না।

প্রকাশ একটু বেগের সহিত বলিল "আমি জানি সে জলের মত নির্ম্মল—এ বিশ্বাসে তার কি ক্ষতি হবে?"

সুরমা ভাবিল প্রকাশ বুঝি ছলে জানিতে চায় উমা তাহাকে ভালবাসে কিনা,—ভাবিল এ সুখটুকুও তাহাকে দেওয়া হইবে না। সে এমনি কঠিন বিচারক। বলিল "হতে কতক্ষণ প্রকাশ? ওসব ছেলে-ভুলানো কথা আমি শুনিনা, এখন তুমি কি বল? সাহস হয়? সে ক্ষমতাটুকু আছে?"

বিদীর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ বলিল "আছে। যা বলেছ তাই হবে! কবে সে প্রায়শ্চিত্ত সুরমা? আজ কি? চল আমি প্রস্তুত।"

সুরমা ধীরে ধীরে বাতায়নের নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষের জল সে আর কোন মতে লুকাইতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল তখনো প্রকাশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। ধীরে নিকটে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া ডাকিল "প্রকাশ।"

প্রকাশ নীরবে মুখ তুলিল—সুরমাও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা চমকিত ভাবে দাঁড়াইয়া প্রকাশ বলিল "যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে যাই।"

"এস, ভগবান তোমায় শান্তি দিন! সুখে থাক,—প্রার্থনা কচ্চি আর না কষ্ট পাও, প্রকাশ!"

রুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ বলিল "কাঁদ কেন সুরমা? তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার আদর্শ চোখে দেখেও জ্ঞান পাইনি আজ বুঝছি তুমি কেন স্বামী ত্যাগ করে এসেছ"—

"ভুল প্রকাশ! আমার তুলনা দিয়োনা, তুমি আমার মত দুঃখী নও। আমার সব আছে অথচ কিছু আমার ভোগের নয়—আমি এমনি অভিশপ্ত! না পেলে ত' মনকে একটা প্রবোধ দেবার কথা থাকে যে আমি বিধির কাছেই বঞ্চিত। আমার রাজ ঐশ্বর্য্য অথচ আমি কাঙ্গাল। তুমি তবে এস।" প্রকাশ অগ্রসর হইল।

"প্রকাশ, পৌঁছে আমায় পত্র লিখো।"

প্রকাশ মস্তক সঞ্চালন করিল।

"আমায় কিছু লুকিয়ো না—আমায় বন্ধু মনে করো।"

প্রকাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"প্রকাশ, শোনো।" প্রকাশ দাঁড়াইল নিকটে গিয়া সুরমা মৃদুস্বরে বলিল "একবার দেখা করবে?"

প্রকাশ সবেগে বলিল "না না আর কেন—আর না! সেও ত আমায় এমনি অপরাধী পাপিষ্ঠ ভেবে রেখেছে, ছি ছি—এমুখ আর তাকে দেখাব না।"

প্রকাশ চলিয়া গেল। সাশ্রুনেত্রে সুরমা ভাবিল প্রকাশ দেখা করিতে না চাহিয়া ভালই করিল, তাহাতে হয়ত উমার পক্ষে আরও খারাপ হইত। বুঝিল তাহার এ প্রস্তাব করা ভাল হয় নাই! এ দুর্ব্বলতাটুকু তার মত কঠিন হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল আজ। ভগবান ভাগ্যে রক্ষা করিয়াছেন। উমা তখন কি একটা করিতেছিল। সুরমা তাহাকে একটুও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে দেয় না। রাত্রেও শয়ন করিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইয়া তাহার চিত্তকে সেই উচ্চ আদর্শ চরিত্রসকলের চিন্তায়ই নিবিষ্ট রাখে, ঘুমে যখন চোখ বুজিয়া আসে তখন ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত দিন কঠিন না হয় অথচ ছোটখাট কর্ম্ম সর্ব্বদাই উমার হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

সুরমা গিয়া ডাকিল "উমা।"

উমা মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল "কি?"

সুরমা আবার ডাকিল "উমা।"

বিস্মিত ভাবে উমা বলিল "কেন?"

"কি করছো?"

"চন্দন-গুঁড়োগুলোয় ছাতা ধরে উঠেছিল তাই রোদে দিয়ে তুলে রাখছি।"

সুরমা গিয়া দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দুএকবার চুম্বন করিল।

একটু লজ্জিতভাবে উমা মুখ টানিয়া লইল। একবার ভাবিল মার চোখে জল কেন, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা*

(De La Mazelierর ফরাশী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে, হিন্দু একেশ্বরবাদের দ্বিতীয় ক্রমবিকাশটি কিরূপ তাহা দেখ। এই সময়ে যে মতবাদগুলি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সুফীদিগের মতবাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়—আবার এই সুফীর মতবাদগুলিও হিন্দুদর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভক্তিযোগীদিগের মতে, একমাত্র ঈশ্বর কৃষ্ণ, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। তাঁহাকে ভক্তিযোগে আরাধনা করিতে হইবে। ইহার প্রতিদানস্বরূপ, তিনি তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তিযোগীদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ—ভগবদ্গীতা ও ভগবৎ-পুরাণ। উহাদের আদৃত কাব্য—জয়দেবের গীতগোবিন্দ; ভারতীয় গীতিকাব্যের মধ্যে, "গীতগোবিন্দ" একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ ইহাই উক্ত কাব্যের বিষয়। কৃষ্ণের প্রেমলীলা—উহারই রূপক। গোপীগণ—ইন্দ্রিয়ের রূপক; এবং কৃষ্ণের পত্নী রাধা,—মুক্ত জীবাত্মার রূপক, ধর্ম্মের রূপক।

গীতগোবিন্দের প্রথম গীতে,—কৃষ্ণ, গোপীদের উদ্দেশে রাধাকে পরিত্যাগ করিলেন। উহাতে যে একটি ভারতীয় নিসর্গ-সৌন্দর্য্যের চিত্র আছে, সেরূপ চিত্র আর কোন কবি চিত্রিত করিতে পারেন নাই। গগনমণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন। তাপপূর্ণ ও ঝটিকাগর্ভ। কুঞ্জবন আকাশ অপেক্ষাও তমসাচ্ছন্ন; তপ্ত ও সুরভিত মলয়-হিল্লোলে বৃক্ষশাখা আন্দোলিত হইতেছে; ললিত লবঙ্গ-লতা ও মাধবিকা প্রভৃতি পুষ্প সমূহের পরিমলে তরুণী ও ঋষিগণের মন মুগ্ধ হইতেছে। সর্ব্বত্রই ভ্রমরগুঞ্জন। এদিকে বকুল, ওদিকে পাটলীপুষ্প,—প্রেম-মদিরায় যেন মানব-চিত্তকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এই বসন্তকালে একাকী অবস্থান! কোকিলের মধুর তান অনুসরণ করিয়া নায়িকাগণ কুঞ্জবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তাহাদের পদক্ষেপে, তাহাদের বাক্যালাপ শ্রবণে, অশোক-পুষ্প আরক্তিম হইয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে। কেতকী বিরহীর হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। কেশরের পীতপুষ্প—কামদেবের রাজদণ্ড। আমমুকুল কি দিবাকরের প্রখর তাপে উন্মীলিত হইল? না, তাহা নহে বসন্ত-লক্ষ্মীর তপ্তচুম্বন নিদ্রানিমীলিত নেত্রকে ধীরে ধীরে জাগাইয়া তুলিল। আর অতিমুক্ত-লতাগুলি?—তাহারা প্রেমালিঙ্গনে যেন জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। তারপর যমুনাতীরে। বাতাহত বেতস-বনের মধ্য দিয়া, বিস্তৃত ও স্বচ্ছ যমুনা প্রবাহিত। গোপরমণীদিগের সহিত কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি স্বর্ণালঙ্কৃত, পুষ্পমালা-বিভূষিত, চন্দন-চর্চ্চিত, মণিরত্নে সজ্জিত। শৈবালশয্যায় শয়ান হইয়া, তিনি প্রলোভনে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রূপক গোপীগণঃ—কৃষ্ণের মস্তক বক্ষদেশে স্থাপন করিয়া কুসুম-রচিত তালবৃন্তের দ্বারা বাজন করিতেছে; শুষ্ক আকাশ হইতে যেন সৌরভবর্ষণ হইতেছে। দর্শনেন্দ্রিয়ের গোপী দীর্ঘপক্ষশোভিত নেত্র-যুগল হইতে বাসনাময় মদালস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোপী, কৃষ্ণের কানে-কানে মধুর বাক্য গুঞ্জন করিতে করিতে বদন চুম্বন করিতেছে। রসনেন্দ্রিয়ের গোপী, আম্র প্রভৃতি ফলবিভূষিত কুঞ্জকানন প্রদর্শন করিতেছে। আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের দেবী, নূপুরধ্বনিসহকারে দুই হাতে তালি দিয়া, নৃত্য করিতে করিতে একবার নিকটে আসিতেছে, আবার চটুল পদক্ষেপে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু শীঘ্রই ইন্দ্রিয়সুখে ক্লান্ত হইয়া কৃষ্ণ, রাধার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনীতে ভক্তিরঞ্জিত বিলাসের জ্বলন্ত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* * * * *

"গীতগোবিন্দে" জয়দেব যাহা গাহিয়াছিলেন, আর এক বাঙ্গালী—চৈতন্য (১৪৮৫-১৫২৭) সেই ভগবৎ-প্রেমের ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করিলেন। চৈতন্যের ভক্তগণ ভক্তিপূজাভিলাষী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া চৈতন্যকে অদ্যাপি পূজা করে। তাহাদের মতে, চৈতন্যের শৈশবকাল অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। সেই মায়ের কোলের দুধের শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইত; তখন হরির নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করা হইত। সে ঠাকুরদের ভোগের সামগ্রী আহার করিত, আর এই কথা বলিতঃ—"ঠাকুরদের মধ্যে আমিই সব চেয়ে বড়।" গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ ক্ষালন করিতে সে অস্বীকৃত হইত;

সে বলিত ভগবৎ-প্রেমেই পাপ ক্ষালন হয়। মা, স্ত্রী, শিশুসন্তানদিগকে ছাড়িয়া, পরমেশ্বর সেই হরির নাম প্রচার-উদ্দেশে চৈতন্য, সমস্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিলেন। সেই হরির নিকট জাতিভেদ নাই। প্রেমই সেই হরির নৈবেদ্য প্রেমই সেই হরির একমাত্র উৎসর্গসামগ্রী। শীর্ণকায় পাণ্ডুবর্ণ চৈতন্য, মাঠে, ঘাটে, রাজপথে দাঁড়াইয়া, শৈলশিখরে ও গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন: "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, প্রেম, প্রেম।" পরে তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন। রোগের আবেশে, চক্ষু দিয়া অশ্রুবর্ষণ হইত, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইত, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেন। এবং সেই স্থানে শতসহস্র নর নারীর মধ্যে, সহসা অন্তরে দেব-প্রসাদের আবির্ভাব অনুভব করিয়া, কাঁদিতেন, হাসিতেন, নাচিতেন, আর এই কথা বারম্বার আবৃত্তি করিতেন: "কৃষ্ণ কৃষ্ণ, প্রেম প্রেম।" সেই একই সময়ে, ভগবানে অনুপ্রাণিত হইয়া আর এক ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হন। চৈতন্য যেরূপ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেন, বল্লভ সেইরূপ ভোগ-ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার পূজাঞ্জলী দুঃখকষ্টের উদ্দেশে নহে, তাঁহার পূজাঞ্জলী আনন্দের পূজাঞ্জলী সেই আনন্দ যাহা জগৎস্রষ্টার মঙ্গলভাবের স্বরূপ।

মানব-আত্মাগুলি কি? উহা পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ; স্ফুলিঙ্গগুলি সেই অদ্বিতীয় সত্তা হইতে পৃথক হইলেও একই উপাদানে গঠিত, তাহারই অনলে প্রজ্বলিত, তাহারই সৌন্দর্য্যে সুন্দর। মানব-শরীরগুলি কি? সেই বরণীয় দিব্য স্ফুলিঙ্গের আবাসমন্দির। অতএব, এই আবাস-মন্দিরগুলিকে কি তুমি ঘৃণা করিবে, কষ্ট দিবে, কলঙ্কিত করিবে? না, প্রভুর সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মনে করিয়া, তাহারা নির্ব্বাচিত বিগ্রহ মনে করিয়া, তাহাদিগকে পূজা করিতে হইবে।

বল্লভের উত্তরবর্ত্তী আচার্য্যেরা এই মতবাদগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। অধুনা, গুজরাটের ধনশালী বণিকদিগের মধ্য হইতে এই সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি হইয়া থাকে। এই মতাবলম্বীরা ভক্তিধর্ম্মমূলক একপ্রকার ভোগবিলাসবাদ (epicurianism) সমর্থন করে। উহাদের আচার্য্য "মহারাজেরা" বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করে, রসনাতৃপ্তিকর অতীব সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন আহার করে, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখে একেবারে গা-ঢালিয়া দেয়; ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নর্ত্তকীরা উহাদিগকে দোলায় বসাইয়া দোলাইয়া থাকে।

* * *

এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিয়াছিল; একদিকে হিন্দুসভ্যতা যেরূপ ক্রমাগত কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল, তদ্বিপরীতে হিন্দুধর্ম্ম আশ্চর্য্য জীবনী-শক্তির পরিচয় দিতেছিল। প্রতি শতাব্দীতেই হিন্দুধর্ম্ম উত্তরোত্তর আত্মনিষ্ঠ ও ভাব-রসপ্রবণ হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিকে যেমন দার্শনিক ও মঠসন্ন্যাসীদিগের ধারা-প্রবাহ রক্ষা করিয়া যোগীরা, ধ্যানসমাধির দ্বারা ব্রহ্মের সহিত যোগ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পক্ষান্তরে ভক্তিবাদী ধর্ম্মসংস্কারকগণ, ভগবৎ প্রসাদে সফলীকৃত প্রেমের দ্বারা এইরূপ যোগের প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু ইতর-সাধারণ লোকেরা যোগীদের কঠোর তপশ্চর্য্যায় বিস্মিত ও ভক্তিবাদীদিগের জ্বলন্ত উৎসাহে বিচলিতচিত্ত হইলেও পূর্ব্বকালের মূর্ত্তিপূজায় তাহাদের আস্থা কিছুমাত্র কমিল না।

উৎসব যাত্রার প্রতি হিন্দুদিগের অনুরাগ, হিয়েন সিয়াং পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড বিগ্রহাদিসমন্বিত দেবমন্দিরের কথা তিনি বলিয়াছেন, প্রতিদিন যে-সকল অলৌকিক কাণ্ড ঘটিত তাহারও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। সমাজের অবনতি, রাজদরবার হইতে তাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের ভিক্ষাবৃত্তি, রাজপুতদের ধর্ম্মোন্মত্ততা এই সমস্ত হইতে কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠানাদির বৃদ্ধি হইল। পুরীতে, নগরের ন্যায় বৃহদায়তন দেবমন্দিরসমূহে, জ্বরজ্বালাদগ্ধ রোগীরা, বিকটাকার প্রস্তরময় পুত্তলিকার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল, বধিরেরা শ্রবণ করিতে লাগিল, কুষ্ঠরোগীদের চর্ম্ম হইতে শল্কগুলা খসিয়া পড়িল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা তাহাদের নির্ভর-যষ্টিগুলা গামের মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখিল। মধ্যাহ্নের সূর্য্যোত্তাপসহিষ্ণু শীর্ণকায় যোগীদিগকে দেখিবার জন্য, লৌহকণ্টক গাত্রে বিদ্ধ করিয়া দৃঢ় রজ্জুতে যাহারা ঝুলিতেছে সেই সকল প্রায়শ্চিত্তকারী সাধকগণকে দেখিবার

জন্য,—ললাটে শৈব বা বৈষ্ণব চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সকলেই অঙ্গনের মধ্যে হুড়াহুড়ি করিয়া প্রবেশ করিতেছে। এদিকে একটি পুণ্য-সরোবর ;—অসংখ্য স্নানকারীদিগের নীচে দিয়া তাহার জল অন্তর্হিত হইতেছে। ওদিকে পুরীর জগন্নাথের ন্যায় অসংখ্য যাত্রীর দল ;—প্রকাণ্ড রথ টানিবার জন্য, ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিতেছে ; বালক, বৃদ্ধ, বনিতা পিছলাইয়া পড়িয়া, চাকার চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে অথবা ধর্ম্মোন্মত্ত জনতা কর্ত্তৃক পদদলিত হইতেছে।*

অন্যত্র যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে ; একজন চণ্ডাল একটা মহিষ বা ছাগের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছে, এবং রমণীরা মুখে ও বাহুতে রক্ত মাখিয়া ছুটিয়াছে। দুর্ভিক্ষে অবসন্ন হইয়া মহামারী ও বিসূচিকা রোগে শত সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে ; কালীও নর বলি গ্রহণ করিতেছেন। তাহারাই ভাগ্যবান যাহারা অন্তত একদিনের জন্যও চৈতন্যদেবের "দয়াল হরি"কে ভাল বাসিয়াছিল!　　(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের গৃহধর্ম্মনীতি

অনেকে মনে করেন যে বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতারই অনুকরণের ফল। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হইতেই পারে না। জাপান তাহার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত যোগ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহাতেই তাহার বাহাদুরী।

হিরো শিমোদা নামক এক জাপানী লেখক তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বলেন যে বর্ত্তমান জাপানী সভ্যতা পিতৃরাজভক্তিরই বিকাশের ফল। স্মরণাতীত কাল হইতে রাজপরিবারের সঙ্গে প্রজাসাধারণের অপত্যবৎ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। জাপানীদের মধ্যে অনেক বিদেশী রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে। অনেক বিদেশী জাতি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও রাজা প্রজার স্নেহ-প্রীতিমূলক মধুর সম্বন্ধ কিছুমাত্রও শিথিল না হইয়া বরং আরও নিবিড় হইয়াছে। সমগ্র জাতি যেন একটি বৃহৎ পরিবার, আর সম্রাট তাহার গোষ্ঠীপতি। সম্রাট যে বৃহৎ জাতিপরিবারের পিতা, প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন পরিবার নিজেকে তাহারই অংশ বলিয়া মনে করে।

জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মূলসূত্র পিতৃভক্তি ও রাজভক্তি। এবং এই দুইটাই পরস্পর নির্ভরশীল। সে দেশে একটি প্রবাদ আছে যে "পিতৃভক্ত পুত্রই রাজভক্ত প্রজা হয়।" জাপানে যখন সামন্ত-শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন, লোকে সামন্তদের প্রতিই রাজভক্তি প্রদর্শন করিত। তাহারা সম্রাটকে এত পবিত্র জ্ঞান করিত যে তাঁহার নিকট অগ্রসর না হইয়া রাজপ্রতিনিধির সম্মুখেই অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত।

বিপ্লবের পর সম্রাট স্বয়ং যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই মধ্যবর্ত্তীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া প্রজাসাধারণের অন্তরের ভক্তিধারা সিংহাসনের দিকে ধাবিত হইল। এই রাজভক্তিকে আন্তরিক ও শক্তিশালী করিবার জন্যই বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই রাজভক্তি ও পিতৃভক্তির আদর্শ বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা জাপানীদের মনে ক্রমাগত বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই দুইটী নীতি হইতে এ দেশের জাতীয় জীবনে যে সুফল প্রসূত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত জাপানের ইতিহাসে পর্য্যাপ্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি নারীজাতিও এই সার্ব্বজনীন নীতির অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

জাপানে সন্তান স্বভাবতই পিতামাতাকে ভক্তি করে এবং পরিবারের সুখ শান্তির জন্য তাহাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। পিতামাতাও সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করেন। সন্তানকে বিনা বাক্যব্যয়ে পিতামাতার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী চলিতে হয়। সন্তানগণ উপার্জ্জনক্ষম হইলে বৃদ্ধ পিতা সংসারের গোলমাল হইতে অবসর লইয়া খেলায়, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে, উদ্যান-নির্ম্মাণে, চায়ের নিমন্ত্রণে, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

কোনও জাপানীর রাজভক্তি ও পিতৃভক্তির অভাব থাকিলে তাহাকে সকলে মানবসমাজে বাস করিবার অযোগ্য বলিয়া মনে করে। অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও পিতৃভক্তিহীন পুত্র সমাজে সম্মান লাভ করিতে পারে

* যাত্রীরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জগন্নাথের রথের চাকার নীচে পড়িয়া মরে—এরূপ বোধ হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্মে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ।

না। পাশ্চাত্য জগতে পুত্র সহজেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, জাপানে সেইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বিদেশীর নিকট ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য মনে হয় যে পুত্রবধূগণও বিবাহের পর হইতে শ্বশুর শাশুড়িকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তির চক্ষে দেখে এবং সন্তানের ন্যায় তাহাদের আজ্ঞাবহ হয়। জাপানের কোনও সতী রমণী এই নীতি অবহেলা করে না। বিবাহের সময় কন্যাকে পিতামাতা এই উপদেশ দেন "তুমি এই পরিবারে আমাদিগকে যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে, স্বামীগৃহে গিয়া শ্বশুর-শাশুড়িকেও সেইরূপ করিবে। তাঁহাদিগকে পিতামাতার ন্যায় জ্ঞান করিও। ইহার অন্যথা হইলে আমাদের নাম কলঙ্কিত হইবে।"

একটি জাপানী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে জাপানী রমণী বর্ত্তমান জগতে যাবতীয় গুণরাশিতে ভূষিত হইয়াও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা না করিলে প্রকৃত পত্নী হইতে পারে না। স্বামী যদি জানিতে পারে যে স্ত্রী তাহার পিতামাতার কথার অবাধ্য, তাহা হইলে সেই কারণেই বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। জাপানী ভাষায় স্বামী শব্দের স্থানে যে দুইটী অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহার প্রকৃত অর্থ "দিব্যপুরুষ"। স্ত্রীও স্বামীকে বাস্তবিকই স্বর্গ হইতে আগত পবিত্র পুরুষ জ্ঞানে সম্মান করে। সতী স্ত্রী স্বামীর কল্যাণার্থে তাহার সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত, উৎসর্গ করিবে ইহাই আদর্শ। তাহারা কেবল যে কর্ত্তব্য বোধে ত্যাগ স্বীকার করে তাহা নহে। এই ত্যাগকে তাহারা ক্ষতি বলিয়াও মনে করে না। পতির জন্য আত্মোৎসর্গেই তাহাদের আনন্দ।

পুত্রকন্যাকে তাহারা বাল্যকাল হইতেই এই আদর্শে দীক্ষিত করে। জাপানের বিধবা নারী পরলোকগত স্বামীর শেষ চিহ্ন স্বরূপ সন্তানগুলিকে পরম প্রেম ও ত্যাগের সহিত পালন করে ও শিক্ষা দেয়।

পুরুষগণও রমণীদের এই ত্যাগের সমাদর জানে। জাপানী নারী পরিবারে পত্নী রূপে প্রেম পায়, জননী রূপে সন্তানের নিকট অপরিমেয় সম্মান ও ভক্তি লাভ করে। তাহারা সুখশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। জাপানী রমণীগণ স্বভাবতই বড় নম্র, কিন্তু আবশ্যক হইলে সাহস ও বীর্য্য প্রদর্শনেও ইহারা সমর্থ। জাপানে অনেক বীরাঙ্গনার কাহিনী প্রচারিত আছে তাহা পাঠ করিলে স্পার্টা রমণীদের কথা মনে পড়ে। নানা বিষয়ে চিত্তের যোগ থাকিলেও তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ। গৃহকর্ম্মই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। জাপানীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বড় ভালবাসে। তাই স্ত্রীলোকদের উপর বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখা ও জিনিষপত্র সুসজ্জিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বাসগৃহে কোথাও একটু ধূলা পর্য্যন্ত জমিতে পারে না। প্রত্যেক গৃহে পূজার বেদী আছে। সেই বেদীর সামনে জাপানীরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার তর্পণ করে। প্রত্যেক পরিবারের আবার দেবতা আছে। তাহার কাছে তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করা হয়। বেদীর সম্মুখে তাহারা প্রার্থনা করে। স্ত্রীকে সেইসকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জাপানী বৃদ্ধা রমণীগণ এই বেদী ও মন্দিরের পার্শ্বে তাহার অবশিষ্ট শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে।

জাপানের পুনরুত্থানের পর ইহার অনেক প্রাচীন মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় সভ্যতার মূল সূত্র এখনও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। প্রাচীনকালে জ্ঞানচর্চ্চা অপেক্ষা নৈতিক উৎকর্ষ-সাধনই স্ত্রীশিক্ষার উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল। নারীদিগের মন সমাজ অপেক্ষা গৃহেই বেশী আবদ্ধ ছিল। গত কয়েক বৎসরে প্রাচীন মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানচর্চ্চা ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি জাপানী রমণীদের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইতেছে। তাহারা ক্রমেই বুঝিতেছে যে গৃহে পরিবারের প্রতি যেমন কর্ত্তব্য রহিয়াছে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন সাহিত্যের সংস্পর্শে এই পরিবর্ত্তন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাবরাশির তরঙ্গ জাপানের মহিলাকুলের চিত্তেও আঘাত করিতেছে। তাহারা স্ত্রীস্বাধীনতার কথা ভাবিতেছে। জীবনসংগ্রামে তাড়িত হইয়া বহু নারী গার্হস্থ্যজীবনের শান্তিপূর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কল কারখানা ও আফিসে চাকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ম্মসংগ্রাম জাপানের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎকে অনেকটা নিয়মিত করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যজগতে যেসকল সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, জাপান তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখি-

পুষ্প রাধা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রের প্রতিলিপি

য়াছে। সে একদিকে পাশ্চাত্য সমস্যাগুলিকে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত পর্য্যালোচনা করিতেছে, অন্যদিকে জাতীয় সভ্যতার মূল সূত্রটীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইতেছে। জগতের সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জাতীয় জীবনকে উন্নত করিবার জন্য জাপানীরা যত্নশীল হইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে যে পরিবর্ত্তনই আনয়ন করুক না কেন, জাপানের গার্হস্থ্য জীবন পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা যতই বিক্ষুব্ধ হউক না কেন, জাপানী সভ্যতার মূল সূত্র রাজভক্তি ও পিতৃভক্তির সেই উন্নত আদর্শ চির কালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপই মনে হইত। কিন্তু এখন এবিষয়েও পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ *

ছন্দ কবিতা নহে। সুতরাং ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা নীরস বোধ হইবে। তথাপি ভাষার ইতিহাসে ছন্দপ্রকরণ একটী প্রধান অঙ্গ। বাঙ্গালা কবিতা লিখিবার প্রণালীতে সংস্কৃত ছন্দ কতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক-ভাবে আলোচিত হইবে।

নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য লিখিত হইলে কিরূপ শুনায় তাহা বোধ হয় অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ দুইখানি পুস্তকের নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। পুস্তক দুইখানি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল ও দুই জন গ্রন্থকারের সংস্কৃত ছন্দ প্রচলনের বিফল প্রয়াস স্বরূপ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আধুনিক পুস্তকখানির উল্লেখ প্রথমেই করিতেছি। বাঙ্গালা ১৩১০ সালে কলিকাতা সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক দশানন-বধ মহাকাব্য নামে একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়। লেখক শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,

"কাহারও কাহারও মতে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অনুগামিনী হওয়া উচিত নহে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অনুগামিনী হওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।"

গ্রন্থকার এই সংস্কৃতপ্রিয়তা প্রযুক্ত সমগ্র গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মালিনী, বসন্ততিলক, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, শিখরিণী ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ শুদ্ধ সংস্কৃতছন্দ ছাড়াও গ্রন্থকার সংস্কৃতানুকারী প্রায় ২১টী স্বকীয় উদ্ভাবিত ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃতের অনুরূপ ইহাদের নামও দিয়াছেন। যথা, মধুমাধুরী, কুরঙ্গনর্ত্তন, বাসন্তী, কাঞ্চনমালা, ইত্যাদি। কবি স্বরচিত গীতিচ্ছন্দে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটি এই :

চমকি বিশ্ব নববালা তপন-রূপ রজনী রাজ্য অবসরে।
উদিত উদয়গিরি-কনক মঞ্চপরি গাজি মত্ত মণিবর্গে॥

এই প্রথম শ্লোক হইতেই গ্রন্থখানির অবশিষ্টাংশ কিরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। অভিধান ব্যতিরেকে উপরি লিখিত শ্লোকটীর অর্থ গ্রহণ করা কঠিন নয় কি ?

এই পুস্তকের যথা তথা হইতে আরও ২।৪টী শ্লোক পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য উদ্ধৃত হইল—

পজ্ঝটিকা।

অন্ধ তিমিরময় গগন কক্ষে,
মন্দ রশ্মিগত বহ্নি সমক্ষে,
প্রমুদিত হৃদয় বন্দিজন তুল্য
চিত্ত মম, শুনি শিববাক্য অমূল্য॥

সমানিকা।

বর্জ্জি লজ্জা, উগ্র দুঃখ,
রক্ষ অন্ন, বসি বাক্য,
পূর্ণ বিজ্ঞ রাজ্য ধন্য
ধৈর্য্য রক্ষ ধর্ম্ম জন্য।

ধৃতি।

ধিক শত কলুষিত নষ্টা
লঙ্ঘিবি উচিত স্থল, বধিব করি বিকল,
শান্ত হইবি পদ পিষ্টা।

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

মহাত্মন, ভবাজ্ঞা নিমিত্তে, অপায়ো,
চিত্ত শান্ত সম্যক জগদ্দ্বন্দ্বে কায়ো,
নাচেৎ সাধ্য শক্যং দোর্দণ্ড পাশে
ভব ধ্বস্তি নষ্টে দ্বিষদ্বর্গ হ্রাসে ?

* বারাণসীস্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে পঠিত।

উপযোগী ছন্দ প্রয়োগে কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, লালিত্য বাড়ে, অর্থবোধ সুস্পষ্ট হয়। ছন্দ ছাড়িয়া দিলে অনেক কবিতার কোন মাধুর্য্য থাকে না। মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা বাদ দিলে কোন অঙ্গ কিছুই থাকে না। কিন্তু বাঙ্গালায় ঐসকল ছন্দ প্রয়োগ করিয়া উপরি লিখিত কবিতাগুলির কোনও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি? এই দশাননবধ কাব্যে কবিকে অনেক অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের বিভিন্নতা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় ঐতিহাসিকতার অনুরোধেই আমরা বাঙ্গালা ভাষাতে হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। নতুবা তাহার কোন উপযোগিতা তো দেখা যায় না। এই হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণই সংস্কৃতছন্দের প্রাণ। বাঙ্গালায় তাহা নাই। অতএব সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দ নিতান্ত অনৈসর্গিক।

সংস্কৃতছন্দশাস্ত্রের নিয়ম (এবং ইহা বৈজ্ঞানিক নিয়ম), যে, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ গুরু বা দীর্ঘ উচ্চারণ হইবে। দশাননবধ কাব্য প্রণেতা বাঙ্গালা ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অভাব দেখিয়া ছন্দশাস্ত্রের এই নিয়মটীর উপর নির্ভর করিয়া সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার দ্বারা গুরুবর্ণ ব্যবহারের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে গ্রন্থখানি দুর্ব্বোধ, কটমটে অবাঙ্গালা শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে।

গ্রন্থখানি পড়িয়া মনে হয় যে, ইহা সংস্কৃতে লিখিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানির আরম্ভে সংস্কৃতপারদর্শী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত দ্বিতীয় একখানি ভূমিকা আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এরূপ কাব্য সাধারণের পক্ষে অনুপভোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

"এই কাব্য ভর্ত্তৃহরির কবিতার ন্যায় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত সম্প্রদায়েরই উপভোগ্য, কেবল ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্যগণ প্রথম দৃষ্টিতে রসাস্বাদনে কতদূর সমর্থ হইবেন বলা যায় না।"

বাঙ্গালা কবিতা বুঝিবার জন্য সংস্কৃতজ্ঞ হইতে হইলে আধুনিক সাহিত্যে সেরূপ কবিতার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বাঙ্গালায় সংস্কৃতছন্দের অনুবর্ত্তনে গুরু লঘু ভেদ ভিন্ন আরও অনেক ছোটখাট অন্তরায় আছে।

বাঙ্গালায় অন্ত্য 'অ' আমরা অনেক স্থানে উচ্চার করি না। যথা, 'জল'কে আমরা 'জল্' বলি। বাঙ্গালা সমাস বা সন্ধির গণ্ডির মধ্যে আমরা ততদূর আবদ্ধ নহি বাঙ্গালায় আমরা অনেক স্থলে হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ এবং দী স্বরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করি। অধিকন্তু, বাঙ্গালাভা সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক কম বিভক্তি-মূলক। সংস্কৃে যেসকল প্রক্রিয়া দ্বারা সংস্কৃতছন্দের প্রধান অঙ্গ অর্থা গুরু লঘু ভেদ সিদ্ধ হয়, বাঙ্গালায় তাহার সম্পূর্ণ অভাব অতএব অবিকল সংস্কৃতছন্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ বড় আয়াস সাপেক্ষ।

মাইকেলের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ বাঙ্গাল ১২৭৯ সালে ৺বলদেব পালিত 'ভর্ত্তৃহরি কাব্য' নাম সংস্কৃত ছন্দে রচিত একখানি কাব্য প্রকাশ করেন। শ্রীযু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ৬২৫ পৃষ্ঠাতে ইহার উল্লেখ আছে। এই পুস্তক এখ দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা বেঙ্গল লাইব্রেরীতেও ইহার এক কপি পাই নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকা পালিত মহাশয় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তক হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

মালিনী।

সুতনু সবিলেখা কলিতা দারবেশা ;
প্রণয় সলিল পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাক্ষ নেত্র ;
নিবিড় মধুকর-পালা পক্ষরাজী বিশালা
নয়ন-তট-অপাঙ্গে কজ্জলে উজ্জলাভা।

উপজাতি।

বারেক উচ্চে করিয়া সুদৃষ্টি
দেখ প্রিয়ে নব-শশী সরাগে
সমস্ত লোকের বিনোদি চক্ষুঃ
প্রাচী বধূ আস্য সহাস্যে চুম্বে।

পালিত মহাশয় মাইকেলের সম-সাময়িক ছিলেন মাইকেল যখন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত করিয়া বিদেশীয় ছন্দের অবতারণা করিলেন, তখনই বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের আয়ু অবসান হইল। পালিত মহাশয় মাইকেলের নূতন ছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেই সংস্কৃত ছন্দ প্রচলন করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিলেন। কিন্তু ছন্দ যুদ্ধে তাঁহারই পরাভব ঘটিল। তাহার পর প্রায় ৪০

বৎসর আর কেহ সংস্কৃতছন্দে বাঙ্গালা কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত 'দশানন বধ মহাকাব্য' বাঙ্গালার ছন্দ-স্রোত বিপরীত দিকে ফিরাইবার আর একটি বিফল চেষ্টা। পালিত মহাশয় সমরের আয়োজন অনেক করিয়াছিলেন। 'ভর্ত্তৃহরি' কাব্যের ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

'রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমার অনুরোধে উপজাতি ছন্দে 'বৃত্রাসুর বধ' নামক একখানি মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই কাব্য লিখিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাই নাই। কিন্তু তিনি ১২৮৩ সালে "মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী" নামক একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনটি কবিতা সংস্কৃত ছন্দে রচিত দৃষ্ট হয়। "মনের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক কবিতা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

তোটক।

ধরমের পথে মনভৃঙ্গ চল।
কুসুমের সুধা খুঁজিয়া চপল,
নমিতে কি হবে মরুভূমি যথা?
শুনিবে নরকে কি সুখ কথা?

শুনিয়াছি পালিত মহাশয় ছন্দ সম্বন্ধে মাইকেলের সঙ্গে পত্রালাপও করিয়াছিলেন। যাহাই হউক তাঁহার এই 'ভর্তৃহরি' কাব্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত না হওয়ায় তিনি ইহার পরে প্রচলিত পয়ারাদি ছন্দে "কর্ণার্জ্জুন কাব্য" নামক দ্বিতীয় আর একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যেও প্রত্যেক সর্গের শেষে ২।৩টি শ্লোক তিনি সংস্কৃত ছন্দে রচনা করিতে ছাড়েন নাই, এবং ভূমিকাতে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয় না বলিয়া বহু আক্ষেপ করিয়াছেন ও মাইকেলী ছন্দের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য' হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

বসন্ততিলক ছন্দ।

এরূপ নীতি-পরিপূর্ণ উদার বাক্যে
অঙ্গেশ কৌরবগণে করিলা নিবৃত্ত।
গ্রীষ্মে বনস্থিত গভীর নদীপ্রবাহ
রোধে যথা প্রবলবেগ দাবাগ্নি-দাহ।
সংক্ষুব্ধ কৌরব সভা হইতে সদর্পে,
নিঃশঙ্ক সিংহ সম বাহিরিলে ব্রজেন্দ্র,
দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীর সভাবসানে
কোলাহলে উঠিল উদ্ধত ক্রুদ্ধ চিত্তে।

গ্রন্থকারকে সংস্কৃত ছন্দ ছাড়িয়া পরে পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী নহে। পয়ার ও ত্রিপদীই বোধহয় বাঙ্গালা ভাষার মূল ছন্দ। যত প্রকার ছন্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, প্রায় সকলই পয়ার ও ত্রিপদীর প্রকারভেদ মাত্র। অধুনা যেসকল ছন্দ নূতন নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তর অথবা মিশ্রণফল। এই মূল ছন্দের উপর গঠিত না হইলে বাঙ্গালা ভাষায় কোনরূপ একেবারে বিজাতীয় বিসদৃশ ছন্দ স্থানলাভ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বাস্তবিক বিদেশী বস্তু নহে। মাইকেল তদীয় প্রতিভার বলে একটা বিদেশী আদর্শকে মাত্র খাটি দেশী কাঠামে পুরিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ার বাতীত আর কিছুই নহে। যে সময় উহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন বিদেশী আদর্শে হিন্দু সমাজ ও সাহিত্য মথিত হইতেছিল, তাই এই নূতন ছন্দকেও অন্যান্য নূতন ভাবের ন্যায় অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

কবি হেমচন্দ্র তদীয় মাইকেলের জীবনীর একস্থানে সংস্কৃত ছন্দে রচিত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি দুর্লভ, আমার হস্তগত হয় নাই। এই পুস্তকের নাম "ছন্দঃকুসুম" - রচয়িতা ভুবনমোহন চৌধুরী। গ্রন্থখানি আন্দাজ ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে পাণ্ডব-চরিত কবিতায় বিবৃত হইয়াছে। "সংস্কৃত চন্দ্রিকা" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় ইহার এক সমালোচনা বাহির হইয়াছিল এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ এই পুস্তকের বহুল প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকায় উদ্ধৃত অংশ হইতে নমুনা স্বরূপ একটি শ্লোক নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি—

মন্দাক্রান্তা।

শোভাযুক্তা ছিল তরুলতা আশ্রিতা পাণ্ডু অঙ্গে
ভাঙ্গে যে আশ্রয় তরুবরে এক্ষণে কালহস্তী।
মূলচ্ছেদে পড়িল ধরায় মোর এ দেহবল্লী,
আশু প্রাণ ত্যজিল রহিয়া পাণ্ডু রাজার সঙ্গে।

সংস্কৃত শ্লোকের মত উচ্চারণ করিয়া পড়িলেই উপরি লিখিত কবিতাগুলিতে ছন্দঘটিত মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে, নতুবা নহে।

উপরে যে সমালোচনা লিখিত হইল, তাহা হইতে আমি এরূপ বুঝাইতে চাহি না যে বাঙ্গালায় সংস্কৃতছন্দ প্রবর্ত্তনে

ভাল কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে না। বরং কোন কোন সংস্কৃতছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় বেশ খাপ খায়। তাহার উদাহরণ দিতেছি। আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, সংস্কৃত ছন্দের যে উপাদান, বাঙ্গালা ভাষায়, তাহার এখন অত্যন্ত অভাব। সুতরাং কবিতা লিখিতে বাঙ্গালা ভাষায় এখন সংস্কৃতছন্দ প্রয়োগ করা একটা স্রোতের ও স্বাভাবিকত্বের বিরুদ্ধে যাওয়া মাত্র।

বাঙ্গালার অনেক কবিই স্থল-বিশেষে বিষয়ের গৌরব বর্দ্ধিত করিবার জন্য সংস্কৃতছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ছন্দবৈচিত্র্যে পারদর্শী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার কবিতার অনেকস্থলে সংস্কৃতছন্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দ-কৌশলে ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে :—

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ সিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজুট্ট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥ ইত্যাদি।

এই বর্ণনাটী ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত। বোধ হয় মহাদেবের বিনাশলীলা এই দৃপ্ত গম্ভীর ছন্দ ছাড়া অন্য ছন্দে শোভা পাইত না।

ভারতচন্দ্র তোটক ও তূণক ছন্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। তূণকের উদাহরণ যথা :—

ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥ ইত্যাদি।

এসব স্থলে ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাস ও অর্থসংযুক্তবর্ণের (Onomatopoeia) প্রয়োগে ছন্দগুলি আরো বেশী অর্থ-দ্যোতক হইয়াছে। প্রকৃত কারিগরের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় প্রযুক্ত হইয়া অর্থগৌরব ও কাব্যের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে।

আধুনিক একখানা বাঙ্গালা অভিধানের ছন্দপ্রকরণে ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটককে বাঙ্গালার অন্যান্য ছন্দের সহিত উল্লিখিত দেখিলাম। তোটক ছন্দ বাঙ্গালায় অতি সুন্দর-ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নলিখিত বিখ্যাত কবিতাটী হইতে প্রমাণিত হইতেছে :—

কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে। ইত্যাদি।

সংস্কৃতছন্দ বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিলেই তাহা চারিচরণ-বদ্ধ শ্লোকাকারে গ্রথিত হইবে, এমন দাস্যভাব অবলম্বন করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে পালিত কবি বা দশাননবধ-কাব্য-প্রণেতার মত এত সংস্কৃতা-নুকারী না হইয়াই বোধ হয়, সংস্কৃতছন্দগুলিকে বাঙ্গালার ভিতরে অত অচেনা করিয়া বসাইতে পারিয়াছেন। এবং এই কারণেই হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য কাব্য-হিসাবে উৎকৃষ্ট হইলেও চারিচরণবদ্ধ শ্লোকাকারে লিখিত বলিয়া সাধারণের প্রীতিকর হয় নাই।

ভারতচন্দ্র ছন্দের আধারভূমি। তাঁহার ছোট ছোট ছন্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে সংস্কৃতের অনুকরণ বোধ হয় আরো বাহির হইতে পারে। আমার পক্ষে সামর্থ্যাভাবে এরূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার অবসর নাই।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সুকবি ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল" ইতি শীর্ষক কবিতাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি ভারতচন্দ্রের ছন্দ, ভাষা ও অনুরূপ বিষয় লইয়া "বাসবদত্তা" নামে একটী কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে তিনি যে এই কাব্যে সংস্কৃতছন্দ প্রচলন করিবেন তাহা বিচিত্র নয়। আমার বোধ হয়, ভাষার মাধুর্য্যে ও ছন্দের গৌরবে মদনমোহন ভারতচন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তবে তিনি পুরাতনের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'বাসবদত্তা' হইতে দুই একটি উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

পজ্ঝটিকা ছন্দ।

পুরহর কৈটভমর্দ্দন শৌরে,
গিরিশ খগাধিপ সুন্দর ধোরে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং
হে হরিহর হর দুঃখভারং॥ ইত্যাদি।

তোটক।

মগধাধিপতি-বৈভব-কীর্ত্তি শুনে।
বিমুখে চলিলা ধনী লাজ মনে॥
বলিছে সখি! এজন কোন কৃতি।
শুনিতে অভিলাষুক মোর মতি॥ ইত্যাদি।

উপরিলিখিত উদাহরণগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে :—

(১) ছোট সংস্কৃত ছন্দ, যথা তোটক, বাঙ্গালায় বেশী খাপ খায়।

(২) সংস্কৃতানুযায়ী গুরু লঘু ভেদ রাখিয়া বাঙ্গালা পদ্যের প্রধান অবয়ব চরণ শেষে মিল রাখা আবশ্যক।

(৩) সংস্কৃত ছন্দের চারিটী চরণই বাঙ্গালায় রাখিতে হইবে, এমন অস্বাভাবিক নিয়ম অনভিপ্রেত।

উপরিলিখিত নিয়মগুলি পালিত কবি বা দশানন-বধ কাব্য-প্রণেতা মানিতে চাহেন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত ছন্দকে একেবারে পূরা সংস্কৃত ভাবে বাঙ্গালায় প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছেন—তাহা অস্বাভাবিক, কাজেই তাহা আদৃত হয় নাই।

সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত ছন্দগুলি বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দসম্পদ বৃদ্ধি করিবার একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালার একটী প্রধান ছন্দ ত্রিপদী। মাত্রা-ত্রিপদী সংস্কৃত ছন্দের অনুকারী। উদাহরণ যথা :—

ঝন ঝন কঙ্কণ,　　নূপুর রণ রণ
　মঞ্জুমঞ্জু মঞ্জীর বোলে।
লটপট কুন্তল,　　কুণ্ডল ঝলমল
　পুলকিত ললিত কপোলে।
　　　　(ভারত)

আওল সরস বসন্ত,　　বিরহী তরন্ত,
　শোভিত বল্লরি লোলে।
পরিমল মলয় সমীরে　　কুঞ্জ কুটীরে,
　বর্হীত চ কোমল ভাবে।
　　　　(মদনমোহন)

নিম্নলিখিত ত্রিপদীটী দশানন-বধ কাব্য হইতে উদ্ধৃত। সংযুক্ত বর্ণের গুরুত্ব নিবন্ধন বড়ই শ্রুতিকটু হইয়াছে।

যত বাক্য বিগুম্ভিত,　　তক বিতর্কিত,
　নিষ্ফল নিশ্চিন্ত চিন্তি মনে।
ভুলি রঙ্গ সমর্জ্জন,　　অক্ষি সুনিঞ্চন,
　বঞ্চন মাত্র বিলুব্ধ জনে।

দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত প্রভাত বর্ণন—

"রাত পোহাল,　　ফরসা হ'ল
　ফুটল কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাতা　　নীল পতাকা
　জুটল অলিকুল।"

ঠিক প্রচলিত ত্রিপদী নহে। বরং ইহার ছন্দ মাত্রার উপর নির্ভর করে। এরূপ ত্রিপদী সংস্কৃতের মাত্রা ছন্দের অনুকারী বলিতে হইবে। খনার বচনগুলি কি এইরূপ মাত্রানুযায়ী খর্ব্ব পয়ার নহে? এখানে বলা আবশ্যক যে পয়ার আধুনিক কালেই চতুর্দ্দশ-অক্ষর-সমন্বিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে চতুর্দ্দশ অক্ষরের অধিক অক্ষর সমন্বিত পয়ারের অনেক উদাহরণ পুরাতন কাব্যগ্রন্থ হইতে দেওয়া আছে।

এই স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে বাঙ্গালায় এইরূপ যেসকল মাত্রাছন্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী মাত্রা গণনা করার প্রয়াস নাই। বরং বাঙ্গালার স্বাভাবিক উচ্চারণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এইসকল ছন্দ নিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এইরূপ ছন্দেই তাঁহার গুরু ও বাঙ্গভাবাপন্ন দুই রকম কবিতাই লিখিয়াছেন। যথা

হেমন্তে, নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুল-তলায় ঘাসের উপর একান্ত একেলা,
ধুলা নিয়ে আপন মনে খেলা করে খানিক
ঘুমিয়ে গেছে যাত আমার ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।
　　　　(আলেখ্য)

এখানে দ্রষ্টব্য যে এই চারি পংক্তিতে যথাক্রমে ১৫, ১৮, ১৬, ১৮ অক্ষর থাকিলেও উচ্চারণ হিসাবে মাত্র ১৪টী মাত্রাই বর্ত্তমান আছে। ইহাকে মাত্রা-পয়ার বলিতে পারি।

এই সমস্ত উদাহরণ বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই স্থির হয় যে, বাঙ্গালায় সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণই হইতে পারে, আসল ছন্দটী প্রবেশ করিতে দিতে বাঙ্গালাভাষা যেন অনিচ্ছুক। বাঙ্গালা ভাষাতে যে সংস্কৃতছন্দের মত ছন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অনেক কবিই উপলব্ধি করিয়া সংস্কৃতছন্দের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালায় সংস্কৃতছন্দের মত গাম্ভীর্য্য না পাইয়াই তাঁহার "দশমহাবিদ্যায়" হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত কবিতা পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করিয়াছেন। বাস্তবিক উক্ত কবিতা বাঙ্গালার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসারে পাঠ করিলে মাধুর্য্যশূন্য পরিলক্ষিত হইবে। বাঙ্গালা স্তোত্রাদি লিখিতে হইলেই আমরা একটা হ্রস্ব দীর্ঘের পারম্পর্য্য আশা করি। ইহা সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ। কবি রঙ্গলাল তদীয় 'কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী' কাব্যে প্রমাণিকা ছন্দে একটী স্তোত্র রচনা করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—

"নিশুম্ভ শুম্ভঘাতিনি, প্রচণ্ডচণ্ডতাপিনি,
প্রশান্ত দাস্থপালিনি প্রসাদ মুণ্ডমালিনি।"

প্রমাণিকা ছন্দটি স্তোত্রের বড়ই উপযোগী, কারণ এই ছন্দে লঘুর পর গুরু এই পারম্পর্য্য বরাবর চলিয়া গিয়াছে। প্রমাণিকার বৃহদাকার পঞ্চচামর ছন্দ। এই পঞ্চচামর ছন্দে আমাদের পালিত কবি "গঙ্গাস্তোত্র" লিখিয়াছেন। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রসাদ লোকলোচন, দ্বিপা পদে, বিরোচন,
প্রসন্ন শোকমোচন, প্রভো, সুধা-বিলোচন,
সুপর্ণ বংশধন ভ্রমি- ত্রিলোকরঞ্জন
প্রভাত নিরঞ্জন, সুপর্ণ ভূমিভূষণ।
(কর্ণাভরণ কাব্য।)

উপরিলিখিত স্তোত্রকে পালিত কবি চারিচরণে সম্বন্ধ সংস্কৃত আকার না দিয়া ছাড়েন নাই। তব পদান্তে মিল থাকায় বাঙ্গালা ভাব রক্ষিত হইয়াছে। এই দাসভাবের জন্যই সংস্কৃত ছন্দ আদৃত হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণই হইতে পারে, আসল ছন্দ টিকে নাই ও টিকিবে না। অনুকরণের সফলতা সম্বন্ধে আমি আর একটী উদাহরণ দিব। সংস্কৃতজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কটকের "মৃন্ময়ী" পত্রিকাতে গীত-গোবিন্দের একটী পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতেছিলেন। গীতগোবিন্দের কবিতাগুলি যে যে ছন্দে বা রাগে রচিত, তাহার প্রকৃতি অবিকল অনুবাদে প্রস্ফুটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ-রূপে সফল না হইলেও মূলের ছন্দমাধুর্য্য অনেকখানি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কবি হেমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দ রচনা হইতে পারে। * * * কিন্তু বোধ হয় যে, যতদিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয় ততদিন সে প্রণালীতে পদ্য রচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—উক্ত 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখনও বঙ্গভাষার প্রকৃতির ততদূর বৈলক্ষণ্য ঘটে, এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুযায়ী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর সে প্রণালীতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তৎপক্ষে সংশয় নাই।"* (মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা)

শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

* বাংলা ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না এমন নয়; তবে আমরা লিপি সংকেত অনুযায়ী উচ্চারণ করি প্রায় অন্যরূপ; তাহাতে যেখানে যেখানে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ ও দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করি সেখানে আমরা মনোযোগ রাখিতে পারি না। লেখাকে উচ্চারণের অনুযায়ী না করিতে পারিলে যাহাদের কান বেশ দুরস্ত নয় তাহাদের পক্ষে প্রচলিত বানানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ লেখা ত দূরের কথা, পড়া পর্য্যন্ত দুষ্কর। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুকরণে অনেকে লেখেন, ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন অল্প লোকেই। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দ লেখেন তাহা ঠিক বাংলার উচ্চারণের অনুযায়ী। কিন্তু তাঁহার খাঁটি সংস্কৃত ছন্দে রচিত কবিতার হ্রস্ব দীর্ঘ বাংলা উচ্চারণের অনুকূল নহে, তাহা সংস্কৃতানুযায়ী, বাংলার পক্ষে কৃত্রিম। এইরূপ কৃত্রিম হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণেই হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কাব্য রচিত। বাংলার উচ্চারণের ধাত বজায় রাখিয়া খাঁটি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কুহু ও কেকা" গ্রন্থে কয়েকটি আছে। ঐ রূপে বাংলা উচ্চারণের ধাত বজায় রাখিয়া বাংলা কবিতা সংস্কৃত ছন্দে রচিত হইলে বাংলা কবিতার ছন্দসম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।—প্রবাসী-সম্পাদক।

অষ্ট্রীয়ার রাজকীয় বীমা

অনেকদিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে "জার্ম্মানীর রাজকীয় বীমা" শীর্ষক প্রবন্ধে জার্ম্মানীতে যে অর্থনীতিবিষয়ক নূতনতর বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করা হইয়াছে তাহার বিষয় বলিয়াছি। দরিদ্র প্রজাদিগের ক্লেশ দূর করাই সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যাহাতে তাহারা অভাবে পতিত না হয়, সেজন্য রাজশক্তি এরূপ বীমার ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছেন যে অসময়েও কাহাকেও অভাবে পড়িয়া ক্লেশ পাইতে হইবে না। অসুস্থতায় বীমার ব্যবস্থা হইতে চিকিৎসার অর্থ পাওয়া যাইবে, দৈব দুর্ঘটনায় অক্ষম হইয়া পড়িলে রাজপথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না—ঐ ব্যবস্থা হইতে অর্থ মিলিবে। কর্ম্ম অভাবে বেকার বসিয়া থাকিতে হইলেও সাহায্য পাওয়া যাইবে। দারিদ্র্যের প্রকোপ দূর করিবার জন্য বহু দেশেই এইরূপ নানা প্রকারের আয়োজন চলিতেছে। য়ুরোপের নানা স্থানে এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোৎদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। বীমা ব্যাপারে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মানীর অনুসরণ করিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জার্ম্মানীর ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক বিষয়েই অষ্ট্রীয়া অনেক পিছনে পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু দুই একটা বিষয়ে সে অনেক জাতি অপেক্ষা আপন শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যেমন দরিদ্রেরা বড়ই নিঃসম্বল—এদেশে তেমন নহে। ছোট

ছোট জোৎদারের সংখ্যা বেশি থাকায় মধ্যবিত্ত লোকেরা অষ্ট্রীয়ায় মাথা তুলিতে পারে না। দেশে ছোট ছোট জোৎদারের অভাব দেশের প্রকৃত আর্থিক উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। ইহাতে দেশে একদিকে অর্থবান লোকের সংখ্যা যেমন কিছু বাড়ে অন্যদিকে দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন এবং একটু মাথা রাখিবার স্থানেরও সঙ্গতিহীন দীনদরিদ্রের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শত শত দরিদ্র লোকের ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া লইয়া তবে একটা লোক ধনবান হইতে পারে। অষ্ট্রীয়ায় যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র তাহাদেরও অনেকে পার্লামেণ্টের সভ্য। কাজেই, দেশের সামাজিক ব্যবস্থা এরূপ যে অপেক্ষাকৃত ধনবানেরা এইসকল দরিদ্রদিগকে সহজে শোষণ করিতে পারে না।

এক সময় আমাদের দেশেও এইরূপ ছিল, এখনো তাহার দুই একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা দেশে আজও অনেক ছোট ছোট জোৎদার আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা বাচিতে পারে, সহজে ধনবানদিগের কবলগত হইয়া না পড়ে, এরূপ কোনো রাজকীয় ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত নাই। ধনবানদিগের অত্যাচারে এইসকল ছোট ছোট জোৎদারদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। অতি সত্বর ইহাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

অষ্ট্রীয়ায় পার্লামেণ্টে সাধারণ শ্রেণীর লোক এবং কৃষিজীবীদিগের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকায়, অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা সে দেশের রাজশক্তির দৃষ্টি লোকসাধারণের মঙ্গলের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে জার্ম্মানীর মত অষ্ট্রীয়াতেও যাহাতে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বীমার ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে তাহার জন্য একটি আইন প্রস্তাবিত হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা অসুবিধায় তাহা এখনো কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। অষ্ট্রীয়া দেশটিতে বহুজাতীয় লোক বাস করে, সেই জন্য সে দেশে নূতন কোনো কিছু করিতে গেলেই নানা বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; — তাহাতে পুরাতন কিছু পরিবর্ত্তিত করিবার কিম্বা অর্থাদি-সম্বন্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে ত কথাই নাই। বহু জাতীয় লোক একত্র হইলেই দেখা যায় স্বার্থের সংঘর্ষ সেখানে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

অষ্ট্রীয়ার এই বিশেষ অসুবিধা ছাড়া পার্লামেণ্টের নিয়মগুলি আছে। আইন কানুনগুলির ভিতর দিয়া কোনো কিছুকে সহজভাবে বাহির করিয়া আনা একটা কঠিন ব্যাপার। এই জন্যই এই আইনটিকে বার বার পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করিতে হইতেছে এবং আইনটির পাণ্ডুলিপি জন্ম ঘুচিতে এত দেরী হইতেছে। এটিকে আরো কতদিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে কে জানে? শেষ পর্য্যন্ত কিসে গিয়া দাড়াইবে সে সম্বন্ধেই বা নিশ্চয়তা কি? জার্ম্মানীতে যাহা প্রাণ পাইয়াছে অষ্ট্রীয়ায় তাহার জড়ত্ব নাও ঘুচিতে পারে; প্রস্তাবটি লোকহিতকর হইলেও ব্যবস্থাবিপাকে পড়িয়া তাহা নাও গৃহীত হইতে পারে। এরূপ আইন যে একটা প্রস্তাবিত হইয়াছে এটাই দেশের উন্নতির পক্ষে সুলক্ষণ বটে।

এই পাণ্ডুলিপিটির স্থান কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নহে, এটি সাহিত্যেও স্থান পাইবার যোগ্য। কিসে সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও রক্ষিত হয় তাহা ইহাতে এরূপ তন্নতন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে যে এটি যদি সাহিত্য-সংসারে একটু স্থানের দাবী করে তাহা সাব্যস্ত করা কঠিন হইবে না। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে স্থানলাভ করিলেই ইহা সার্থকতা লাভ করিবে, এরূপ নহে; জনসাধারণের উপকারেই ইহার সার্থকতা। পার্লামেণ্টের ত্রুটিতে যে ইহা কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না ইহাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এই আইনটি কার্য্যে পরিণত হইলে জার্ম্মানীর অপেক্ষাও অষ্ট্রীয়ায় ভাল কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জার্ম্মানীতে অকর্ম্মণ্যদিগের সাহায্যের যে ব্যবস্থা আছে এই প্র [illegible] তদপেক্ষা অধিক ফলদায়ক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আইনটি কার্য্যে পরিণত হইলে অষ্ট্রীয়া এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য, জার্ম্মানীতে বা যেখানেই হৌক, যাহা কিছু প্রস্তাবিত হইয়াছে সমস্তই কার্য্যে দেখাইতে পারিবে। ইহার কারণ এই যে জার্ম্মানীর রাজকোষ হইতে যে পরিমাণ টাকা বীমা-ব্যাপারে খরচ হইতেছে, অষ্ট্রীয়া প্রজাদিগের জন্য

তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

অষ্ট্রীয়ার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই-সমস্ত লোকের সকলেরই অবস্থা যে একরূপ হইবে তাহা আশা করা যায় না; সেইজন্য বীমার প্রস্তাবে অভাবের মাত্রানুযায়ী অকর্ম্মণ্যদিগের জন্য ছয়টি এবং রোগ ও দুর্ঘটনা বীমার জন্য দশটি শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন প্রজাদিগকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া আনিয়া শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত কিন্তু চিকিৎসকেরা তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া সেটা হইতে দেয় নাই। যাহারা অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে তাহাদিগকেও বীমার সুবিধা দিলে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের অন্ন জুটিবেনা এবং দেশে চিকিৎসকের অভাব উপস্থিত হইবে; তখন আবার রাজশক্তিকে চিকিৎসকেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একজন লোক তাহার সমস্ত জীবনটাই সমভাবে উপার্জ্জন করে না। বয়স যতই বৃদ্ধি পায় উপার্জ্জনের পরিমাণও ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইজন্য বীমার জন্য দেয় অর্থ বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে লোকে বীমার টাকা দিতে নানারূপ অসুবিধা বোধ করে। অষ্ট্রীয়ার এই প্রস্তাবে উপার্জ্জনের অনুপাতে টাকা দিবার ব্যবস্থা থাকায় সে অসুবিধা উপস্থিত হইবে না এইরূপ আশা করা যায়।

অষ্ট্রীয়ার এই প্রস্তাবিত বীমার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে জনসাধারণের অনেক শ্রেণীতেই ইহার কাজ চলিবে। অল্প কারণেই দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এরূপ কার্য্যে যে-সকল লোকে লিপ্ত থাকে তাহাদিগকে বীমায় যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে। পিতা-মাতার আইনসঙ্গত বিবাহের প্রমাণ না থাকিলে পিতার দায়ভাগে সন্তানের কোনো অধিকার থাকে না; অষ্ট্রীয়ার প্রস্তাবটিতে এরূপ ব্যবস্থাও করা গিয়াছে যে ঐরূপ ক্ষেত্রেও পিতার কিম্বা মাতার আকস্মিক বিপদে সন্তান বীমা হইতে সাহায্য পাইবে। মৃত ব্যক্তির ঊর্দ্ধতন পুরুষ, পৌত্র, ভাই ভগ্নী পর্য্যন্ত বীমার টাকা পাইতে পারিবে। যেখানে আবশ্যক হইবে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, এমনকি অনেকে তাহাদের পাওনার দেড়গুণ টাকাও পাইতে পারিবে।

রোগবীমার ব্যবস্থাও বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রুসিয়ার পরই অষ্ট্রীয়ায় শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত বেশি, সেইজন্য দেশের মাতাদিগের প্রতি বীমার প্রস্তাবে এত দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। মজুর স্ত্রীলোকেরা যখন সূতিকাঘরে থাকে তখন তাহাদিগকে চার সপ্তাহ ধরিয়া অর্থ সাহায্য করা হইবে। এইসকল ক্ষেত্রে খরচপত্র খুব বেশি হয় বলিয়া সাহায্যের পরিমাণ কখনো কখনো স্ত্রীলোকটির দৈনিক মজুরীর উপর শতকরা ৬০ হইতে ৯০ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এছাড়া প্রসূতিদিগের জন্য আরো অনেক ব্যবস্থা করা হইবে।

জার্ম্মানীর বীমা ব্যাপারটি আইনকানুনের উপর দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া তাহা হইতে দেশে মকর্দ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ বিচারালয়েই বীমা-সংক্রান্ত মামলাগুলিরও বিচার হয় বলিয়া দরিদ্র মজুরদিগকে বীমার টাকা আদায় করিতে অনেক সময় বিশেষ বেগ পাইতে হয়। অষ্ট্রীয়ায় কেবল বীমাসংক্রান্ত মকর্দ্দমার বিচার করিবার জন্য একটি ছোট আদালত ও একটি বড় আদালত থাকিবে প্রস্তাবে এইরূপ আছে। এটি একটি সুন্দর ব্যবস্থা। জার্ম্মানীতেও এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে মজুরদিগের বীমার টাকা আদায় করার অসুবিধা অনেক কমিয়া যাইত।

আমরা সুদূর য়ুরোপের দুইটি দেশের একটা অর্থনৈতিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিলাম। আমাদের গৃহের দারিদ্র্যজনিত হাহাকার অষ্ট্রীয়ার কি জার্ম্মানীর অপেক্ষা কম মর্ম্মস্পর্শী নহে। দেখিয়া শিখিতে পারি, কিন্তু সে শিক্ষাকে কাজে খাটাইবার শক্তি এবং উপকরণ আমাদের আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা কত নীচে পড়িয়া আছি! বীমার ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, দেশের শিল্প বাঁচিয়া উঠুক, অনাহারক্লিষ্ট লোকেরা খাটিয়া খাইবার সুবিধা পাউক তাহা হইলেই আপাতত যথেষ্ট হইবে। বীমা অনেক দূরের কথা; কার্য্যাভাবে বেকার বসিয়া থাকিলে, বীমার টাকা

জোগাইবে কে? এই-সমস্ত বিষয়ে জগতে কি কি আন্দোলন চলিতেছে এবং আমরা কত পিছাইয়া আছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যই এই আলোচনা। এদেশে ইহার অন্য সার্থকতা আর কিছু আছে কি না জানি না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উদয়ন-কথা

(বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে গৃহীত)

(১)

অবন্তির রাজা প্রদ্যোত সভায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পাত্র, মিত্র, সৈন্য, সামন্ত, পাইক, চর! বল শুনি, আর কোন্ রাজার যশ আমার চাইতে বেশী?"

পাত্র বলিল—"মহারাজের চাইতে আর কার যশ বেশী থাক্‌তে পারে?"

মিত্র বলিল—"মহারাজের যশ মেঘভাঙ্গা শরৎপূর্ণিমার মত—ঘরে দোরে, বনে মাঠে, হাটে ঘাটে, পাহাড়ে নদীতে তার অজস্র বিকাশ! ওর তুলনা হয় না।"

সৈন্যগণ বলিল—"মহারাজের যশ রণভেরীর বজ্র-নির্ঘোষের মত—সমস্ত পৃথিবীকে স্তব্ধ করে' রেখে দিয়েছে! ওর উপমা মিলে না।"

সামন্তগণ বলিল—"মহারাজের যশ মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত—আকাশভরা কিরণ আর জগৎভরা আলো দিচ্ছে। ওর পরিমাণ হয় না!"

পাইক বলিল—"মহারাজের যশ আষাঢ়ের ঝঞ্ঝার মত—দেশ বিদেশে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওর বেগ কোথাও বাধা মানে না।"

তখন হাসিমুখে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আর তুমি কি বল চর?"

চর জোড়হাতে বলিল "মহারাজ, ভয়ে বল্‌ব, না নির্ভয়ে বল্‌ব?"

রাজা - নির্ভয়ে বল।

চর মহারাজের যশ শরচ্চন্দ্র! কিন্তু কুকুরগুলো পূর্ণচন্দ্রের পানে চেয়েও ঘেউ ঘেউ করে! ভয়ে বল্‌ব না নির্ভয়ে বল্‌ব মহারাজ?

রাজা—বলেছি ত—নির্ভয়ে বল!

চর বলিল "কি আর বল্‌ব সম্রাট? এমনও পাষণ্ড এ সংসারে আছে, যারা অবন্তিনাথের চেয়ে কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের যশ বেশী গায়!"

একটা কালো ছায়া রাজা প্রদ্যোতের মুখের উপর দিয়া চলিয়া গেল; চোখের ভিতরে যেন বিদ্যুৎ জলিতে লাগিল, আর তার উপর দিয়া দু'টি ভ্রূ দুইখণ্ড কাল মেঘের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। চর ভয়ে দুইপদ পিছাইয়া গিয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা কঙ্করের মত কঠোর ও অন্ধকারের মত গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন "সেনাপতি!"

সেনাপতি প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"সৈন্য সাজাও! কৌশাম্বী আক্রমণ কর।"

"দেবের যেমন অভিরুচি।"

তখন সৈন্যদের মধ্যে চেতনা জাগিয়া উঠিল। আস্তাবলের দুয়ার খুলিল, পিলখানার ফটক মুক্ত হইল, অস্ত্রাগারের শ' মন লোহার ডবল কবাট ঝন্ ঝন্ শব্দে সরিয়া গেল। হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্তে রাজধানী ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। মন্ত্রী দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "তা ত বটেই! কিন্তু কৌশাম্বীর রাজা যে ওদিকে মন্ত্রসিদ্ধ! তিনি চোখ তুলিয়া চাহিলে যে সৈনিকের পা অসাড় হইয়া যায়; রথের চাকা অচল হইয়া যায়; ধনুতে তীর আবদ্ধ হইয়া থাকে! আর তাঁর সৈন্যগুলি? সৈন্য ত নয়, যেন অস্ত্র ছুঁড়িবার কল! বড় আশঙ্কার কথা!"

তারপর মন্ত্রীতে ও রাজাতে কি কানাকানি হইল; যুদ্ধের উদ্যম হঠাৎ থামিয়া গেল; সেনাপতি বড় ক্ষুব্ধ হইয়া খাপ-খোলা তরবারি খাপে রাখিলেন।

(২)

রাজা প্রদ্যোতের এক কন্যা ছিল - সে একেবারে ইন্দ্রের কন্যার তুল্য সুন্দর; আর খুব বুদ্ধিমতীও। চাঁপাফুলের রংটি যেমন চমৎকার, ভোরের আকাশটি যেমন লালিম, আবার কি নির্ম্মল অগাধ আলোকে ভরা! রাজকুমারীরও তেমনি চোখ দুটিতে শৈশবের পবিত্রতা ছিল, ঠোঁট দুখানিতে স্বপ্নের মোহ ছিল, ললাটে অরুণের প্রতিভা ছিল। নাম ছিল তার বাশুলদত্তা।

রাজা প্রদ্যোত বড় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বসিয়াছিলেন—বাশুলদত্তা কাছে গিয়া ছোট্ট হাতখানিতে তাঁর উত্তপ্ত ললাটে অমৃত মাখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বাবা?"

"দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব মা? কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন—তার যশ নাকি আমার চাইতে বেশী!"

"তাতে কি হয়েছে বাবা?"

"কি হয়েছে, তুমি কি বুঝবে বাছা? সে সামন্ত রাজা, আমার চাইতে তার যশ বেশী থাক্‌তে নেই।"

"তা যদি সে যশের কাজ করে, তার যশ ত হবেই; তুমি তার কি করবে?"

"আমি তাকে থাক্‌তে দেব না।"

"সে কি কথা?"

"আমার চাইতে যদি কেউ বাড়্‌তে চায়, সে যম রাজার রাজ্যে গিয়ে বাড়বে;—আমার রাজ্যে নয়।"

"না বাবা, এ অন্যায় হবে।"

"অন্যায় কি বাছা? আমি সকলের উপরের রাজা; এই সাম্রাজ্যের জন্য আমার দায়িত্ব সকলের চাইতে বেশী; সকল তাতে আমার ভাগও থাকবে সকলের চাইতে বেশী!"

"যশ কি আর ধান চা'ল বাবা, যে, পরকে মেরে কেড়ে নেবে? ওযে পাগলা ভোলার মত উল্টো! ছাড়্‌তে চাইলেই বাড়্‌বে; আর পরের উপর ভাগ বসালে নিজের ভাগও উপে যাবে।"

"তবে তুই কী করতে বলিস্?"

"আমি বলি কি, তুমি ছাড়; ছাড়্‌তে ছাড়্‌তেই পাবে। কপিলবাস্তুর রাজকুমারের কথা শুনেছি—তিনি রাজ্য ছেড়ে, স্ত্রী ছেড়ে, পুত্র ছেড়ে কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল সেজে বেরিয়ে পড়েছিলেন—আজ কত লোক তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌ছে।"

"সে একটা ভণ্ড—সাধু সেজে দল পাকিয়েছে।"

বাশুলদত্তা চমকিয়া উঠিল—মুখের উপর দিয়া একটা ছায়া খেলাইয়া গেল; কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়ন-ঘরের দিকে তিনি চলিয়া গেল।

(৩)

কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন বসিয়া বসিয়া মহা ভাবনায় ডুবিয়া গেছেন। দুইটি গুরুতর পাপ করিয়া নিজের উপর বড় একটা ধিক্কার আসিয়াছে। একদিন—সে দিন বনোৎসব ছিল। রাজা ভোজনের পর একটু আরাম করিতেছিলেন; সাত সহচরীতে তাঁর চরণসেবা করিতেছিল; এমন সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু পিণ্ডোল আসিয়া ধর্ম্মের কথা তুলিলেন। স্তব্ধ নিশীথের চন্দ্রমার মত সে ঋষির মুখের জ্যোতি; বাতাহত গঙ্গা-কল্লোলের মত তাঁর পুণ্যবাণী; সহচরীগণ ক্ষণকালের জন্য রাজার পাশ ছাড়িয়া পিণ্ডোলের চারিদিকে গিয়া জড় হইল। সুখে ব্যাঘাত পাইয়া রাজা সেই তপস্বীর পিঠে লাল পিঁপড়ার বাসা বাঁধিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মহর্ষি পিণ্ডোল পিঁপড়ার বাসা পিঠে লইয়া অবিচল দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে বলিলেন "রাজা উদয়ন, আমার প্রিয়জন যারা চোখের আড়ালে পড়ে ছিল, আজ তুমি আমাকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হোক্।" এই বলিয়া পিণ্ডোল চলিয়া গেলেন, রাজার মনে পিঁপড়ার হুলের মত একটা বেদনা বিঁধিয়া রহিল।

সে ত গেল একদিনের কাণ্ড। আর একদিন যা হইল—ও সর্ব্বনাশ! শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সে মহারাণী সামবতীকে হত্যা! আহা, অন্তঃপুরের রত্ন ছিলেন রাণী সামবতী! ফুলের মত সুন্দর, ফলের মত গুণবতী, লতার মত ভক্ত! মুখের কথা মিঠা ছিল যেন চাঁদে সুধা, বুকে স্নেহ ছিল যেন সন্তরায় স্নিগ্ধরস; আর প্রাণ ছিল, সে আলোকের চাইতেও স্বচ্ছ, আর্শীর চাইতেও নির্ম্মল, পূজাঘরের সৌরভের চাইতেও পবিত্র! রাজ্যসুদ্ধ লোকে তাঁকে মা বলিয়া ডাকিত! আর সেই রাণী সামবতীকে রাজা সখীদের সহ শিবিরের মধ্যে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন! আজ তাই ভাবিয়া ভাবিয়া রাজা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন—অনুতাপের রাশি বুকের ভিতর জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

রাজসভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাত্র মিত্র যার যার বাড়ী চলিয়া গেছেন, শূন্য ঘরে বসিয়া রাজা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন; এমন সময় এক চর আসিয়া খবর দিল "মহারাজ, চমৎকার!"

"কিরে?"

"একেবারে পাহাড়ের মত উঁচু!"

"আরে কী ?"

"দাঁত দুটো যেন তিমি মাছের হাড় !"

"হাতী ? কোথায় দেখ্‌লি ?"

"আঁধুয়ী বনে !"

"একটা, না দল-বাঁধা ?"

"তা বল্‌তে পারব না।"

"তবে দেখ্‌লি কী ?"

"নিজে দেখিনিক, খবর পেয়েছি !"

রাজা একটু চুপ্ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন "শিকার—আর ভাল লাগে না। মনের ভার আর কত বাড়াইব ?" কুমতি সোহাগ করিয়া কহিল "যাও, যাওনা একবার ? -মনটা একটু পাতলা হইবে। বসিয়া বসিয়া খালি ভাবিলে যে শরীর টিকিবে না।" রাজা দেখিলেন এ মন্দ পরামর্শ নয়। বলিলেন "তবে ঘোড়া সাজাইতে বল।"

আদেশ লইয়া চর চলিয়া গেল, উদয়ন সাজ সজ্জা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাজ সজ্জা আজ আর তেমন গায়ে বসে না। মনটা নিতান্তই ভাঙ্গিয়া গেছে কিনা, তাই মাথাটি খাড়া করিয়া রাখাও আজ দুষ্কর। জোর করিয়া শরীর নাড়া দিয়া একবার সমস্ত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিলেন, পারিলেন না। পা টানিয়া টানিয়া আয়নার কাছে গিয়া গায়ে বর্ম্ম আঁটিলেন; মাথায় শিরোপাটি তুলিয়া দিতে দিতে তা দুইবার মাটিতে পড়িয়া গেল। পায়ে পাদুকা দিতে গিয়া নখের কোণায় মাণিক-কলার খোঁচা লাগিয়া গেল। তারপর অসি লইয়া কটিবন্ধে বাঁধিলেন। অস্ত্রের স্পর্শে শরীরের রক্ত কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল—হাতে পায়ে একটু শক্তি আসিল। রাজা উদয়ন আবার রাজার মত মুখ লইয়া ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন।

(৪)

নিবিড় অরণ্য পাহাড়ের মত পড়িয়া আছে, আর তারি একদিকে সুড়ঙ্গের মত জঙ্গল ভাঙ্গিয়া পথ করা। পথটি নিতান্ত একটুখানি নয়; তবে জঙ্গল খুব বেশী, আর বড় বড় গাছের ঘনাল পাতায় খুব ছায়া করিয়াছে, আর লতায় লতায় উপরে ছাউনি করিয়াছে, আলো তাই সে পথের ভিতর একেবারেই ঢোকে না।

রাজা উদয়ন ঘোড়া ছুটাইয়া ছুটাইয়া বেলা এক প্রহর থাকিতে এই অরণ্যের কাছে আসিয়া থামিলেন। আসিতেই পথ চোখে পড়িল, আর একশ হাতীর পায়ের চিহ্ন দেখা গেল। উদয়ন ভারী খুসী হইয়া সেই পথে আবার ঘোড়া ছাড়িয়া ছিলেন। কিছুদূর যাইতেই একটা হাতীর পেছন দিক্‌টা দেখা গেল; মনে হইল যেন হাতীটা প্রাণের ভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছে। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন "খাড়া রহো !" অমনি পশু যেন দাঁড়াইল। হাঁ, দাঁড়াইলই বটে ;—অই যে আর তার শরীরও নড়ে না, পাও নড়ে না, শুঁড়টিও নড়ে না। রাজা অগ্রসর হইয়াই তার পা বেড়িয়া ফাঁদ ফেলিয়া দিলেন। অমনি হাতীটা খান খান হইয়া গেল; আর তার ভিতর হইতে—ও সর্ব্বনাশ। একেবারে পাঁচশো সৈনিকপুরুষ! আর তারা সকলে মিলিয়া এককালে রাজা উদয়নকে ঘিরিয়া ফেলিল। উদয়ন প্রথমত অবাক হইয়া গেলেন। তাঁর হাত পা নিশ্চল হইয়া গেল। পরে যখন একটা সৈনিক তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁকে শৃঙ্খল পরাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, তখন হঠাৎ তাঁর চমক ভাঙ্গিল। এক লাথিতে সৈনিক পুরুষকে দশ হাত দূরে উড়াইয়া ফেলিয়া নিমেষ মধ্যে তরবারি উঠাইলেন। বীরের সেরা বীর উদয়ন! তাঁর হাতে যে অসি ঘুরিতে লাগিল, যেন রাধাচক্র! ঝড়ের মত সেই হাতের শক্তি, বিদ্যুতের মত তার ক্ষিপ্রতা, মন্ত্রের মত তার সন্ধান! মুহূর্ত্ত মধ্যে শ'দুইশ' মাথা উড়িয়া গেল। কিন্তু সৈন্য ত শুধু একশ দুইশ নয়; তারপর, উদয়নেরও হাত মানুষের হাত। তাঁর শক্তিরও একটা পরিমাণ আছে, তাঁর সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। সে শক্তি সে সহিষ্ণুতা ক্ষয় পাইয়া পাইয়া হাত অবশ হইয়া গেলে উদয়ন মূর্চ্ছা গেলেন; সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া অবন্তিরাজ্যে লইয়া চলিল। আর ঠিক সেই সময় কৌশাম্বীরাজের এক পাচিকা নিতান্ত অসাবধান ভাবে একটি তেলের পাত্র তুলিতে গিয়া তেল সমেত পাত্রটি উল্টাইয়া ফেলিল।

(৫)

যাঁর যশের প্রভায় অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের যশজ্যোতি ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল, যাঁর কীর্ত্তিগাথা অবন্তির কানে শেলের মত বাজিত, যাঁর কথা লইয়া প্রজাগণ দিনরাত

মাতিয়া থাকিত, যাঁর নাম শত্রুর অনুগ্রহের মত তিক্ত, ক্ষুদ্রের ঐশ্বর্য্যের মত অসহনীয়, বিজেতার নিশানের মত দম্ভী—সে আজ বন্দী। প্রদ্যোতের মুখ আজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! নগর ব্যাপিয়া খুব একটা উৎসব হইয়া গেল। সকলেই তাতে খুসী হইল, সকলেই আমোদ পাইল, আনন্দের স্রোতে সকলেই গা ঢালিয়া দিল, আর কৌশাম্বীকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল; নীরব হইয়া রহিল কেবল একটি প্রাণী—সে অবন্তির রাজকুমারী বাশুলদত্তা। পরাজয়ের উপর এত উৎসব, একরাজ্যের সর্ব্বনাশের উপর এত আনন্দ, প্রতারণা করিয়া অন্যায়ের এত আস্ফালন তার কাছে একেবারেই ভাল লাগিল না। সে গালে হাত দিয়া বাতায়নের পাশে বসিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল—মানুষ কি হিংসুক! দুদিন মাত্র ত আছি এই সংসারে! কোথায় এই ছোট খাটো জীবনটিকে শান্তির আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিব! তা না করিয়া বিবাদে বিসম্বাদে, দুঃখে দৈন্যে, দুশ্চিন্তায় দুষ্কর্ম্মে তাকে তিক্ত করিয়া ফেলি। দুটা দিন কি সহিয়া যাইতে পারি না? কেন মানুষ এমন কাপুরুষ! কেনরে হায়, মানুষের প্রাণ এমন দুর্ব্বল! মানিলাম, তুমি ঘা খাইয়াছ। কিন্তু ঘা খাইয়াই যদি ঘা ফিরাইয়া দিতে হয়, তবে তোমাতে আর জড় পদার্থে, তোমাতে আর মাংসাশী পশুতে কি প্রভেদ রহিল? বিষয়খণ্ড লইয়া সংসার-বিবরে খেঁকাখেঁকি করে—সে ত বন্য জীবে! কিন্তু স্বার্থের উপর ঘা খাইয়াও যিনি আকাশের মত নিষ্কম্প, আলোকের মত নির্ব্বিকার, পৃথিবীর মেরুদণ্ডের মত অটল, তাঁকেই ত বলি বীর! না না! আমরা বড় দুর্ব্বল! ওগো, কত কালে এ দুর্ব্বলতা দূর হইবে? কতকালে, আমায় বলে দাও না, হে ঠাকুর! কতকালে তোমার নীতি মানুষে বুঝিবে—পালিবে? প্রভু! দয়া কর, মানুষকে দয়া কর! বাশুলদত্তা সজলনেত্রে ব্যাকুলপ্রাণে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে ডাকিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অস্তরবির স্বর্ণচ্ছটা বাতায়নের কোণ হইতে সরিয়া সরিয়া গাছের উপর দিয়া মিলাইয়া গেল, কাকের দল দিনের কাজ শেষ করিয়া উৎসব করিতে করিতে বাসার দিকে উড়িয়া চলিল; আর রাজপুত্রের পোষা পায়রাগুলি পুচ্ছ মেলিয়া গলা ফুলাইয়া কুমারীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে উল্লাসের কলরব তুলিল।

এদিকে রাজসভাও ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে—চারণ রাজার বন্দনা গাহিতে লাগিল; সৈন্যগণ সকলে একস্বরে অবন্তিনাথের জয় ঘোষণা করিল; পণ্ডিতগণ "বিদাকী" পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং মহারাজ মুক্তহস্তে দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। সে রাশি রাশি ধন! সোনা রূপা মণিমাণিক্য অন্নবস্ত্র—সীমাসংখ্যা নাই। আর সৈন্যরা যে পুরস্কার পাইল—সে ত বলিবারই নয়! সর্ব্বশেষে মন্ত্রী গম্ভীর ভাবে রাজার আদেশ পাঠ করিলেন "অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে প্রাতঃসময়ে কৌশাম্বীরাজ উদয়ন রাজচক্রবর্ত্তী অবন্তিনাথের বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে শূলদণ্ডাগ্রে আরোপিত হইবেন।" আদেশ শুনিয়া সভাতল স্তব্ধ হইয়া গেল। কেহ বা খুসী হইল, কেহ বা জিভ কাটিয়া কানে হাত দিল, কিন্তু কাহারই মুখে কথা ফুটিল না। অবন্তিরাজ সভা ভঙ্গ করিলেন।

(৬)

রাত্রি একপ্রহর ধরিয়া রাজাতে মন্ত্রীতে কি জানি কি পরামর্শ হইল। ভোরবেলা স্বয়ং রাজা প্রদ্যোত কারাগারের দ্বারে উপস্থিত! সারারাত বহু চিন্তা করিয়া, সারা জীবনের পাপপুণ্যের হিসাব করিয়া, কৌশাম্বীর প্রাণপ্রিয় প্রজাদের কি দশা হইবে তাই ভাবিয়া ভাবিয়া এই ভোর বেলায় উদয়নের সবেমাত্র একটু ঘুম পাইয়াছিল, এমন সময় কারাদ্বারের ঝঞ্চনায় সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বন্দী রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন সাক্ষাতে নানা ভূষণ-মণ্ডিতা প্রভাতশুভ্রোজ্জ্বলা বেত্রধারিণী প্রতিহারী পার্শ্বে ছায়া-তরুর মত উন্নত-মস্তক রাজা প্রদ্যোত। প্রদ্যোত বলিলেন "উদয়ন্, তোমাকে প্রাণদান করিতে আসিয়াছি।" উদয়ন উত্তর করিলেন "অবন্তিনাথের অপার করুণা! কিন্তু উদয়ন রাজা! সে দান করতেই শিখেছে, নিতে কখনো শিখেনি।"

প্রদ্যোত মনে মনে বলিলেন "তেজ ত যথেষ্ট!" প্রকাশ্যে বলিলেন "দান নয়, প্রতিদান! তুমি আমাকে হাতী ধরিবার মন্ত্র শিখাও; তার বদলে আমি তোমার রাজ্য ও প্রাণ তোমাকে ফিরাইয়া দিব।"

"প্রাণ চাইনে, তবে শিখাতে পারি, যদি শিখিবার মতন হও।"

"সে কেমন?"

"যদি শিষ্যের মতন জানু পেতে' বসে' শিক্ষা চাও।"

প্রদ্যোতের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বেত্রবতীর কাঁধের উপর ভর করিয়া, হীরার মালায় ঝলক খেলাইয়া, চোখের বিদ্যুতে মুকুটরশ্মিতে ঘা দিয়া বলিলেন "বুঝিলাম, মৃত্যু তোমাকে ডাকিতেছে।"

উদয়ন স্থিরভাবে উত্তর করিলেন "বুঝ্‌লেন বলে' কৃতজ্ঞ রইলাম।"

সেদিন আকাশের মেঘে আর দিগন্তের বাতাসে খুব একটা লড়াই হইয়া গেল। মেঘ চায়, জল হইয়া মাটিতে নামিয়া আসিবে, বাতাস চায় তাকে উড়াইয়া দিবে; মেঘ চায় ক্ষেত ভাসাইয়া জল দিবে, বাতাস চায় শস্যের ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিবে; মেঘ চায় দান, বাতাস চায় অপহরণ! খুব লড়াই হইল; শেষে মেঘেরই জিত। কতক্ষণ ঘরদোর কাপাইয়া, বনবনানি কাঁপাইয়া, গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ছড়িয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া বাতাসের শক্তি ফুরাইয়া গেল; বহিল বৃষ্টি! ধারাবৃষ্টি! উদয়ন ভাবিলেন মানুষ কি চঞ্চল! একটুকুতেই কেমন বিচলিত হইয়া পড়ে! হায়, এই বৃষ্টি-ধারার মত এমন ধ্যানী, এমন তন্ময় কবে হইব? সেই সন্ন্যাসীর মত নির্ব্বিকার কবে হইব? পিণ্ডোল! পিণ্ডোল! তুমি দেবতা—আমি মানুষ, সংসারের কীট!

সহসা পিণ্ডোলের কথা মনে পড়িয়া উদয়নের মনে খুব একটা জোরও আসিল, খুব একটা ঝড়ও বহিল। সন্ধ্যার সময় প্রদ্যোত যখন আবার কারাগারে গেলেন, বন্দী তখন চোখ মুদিয়া আর শরীর সোজা করিয়া, আর হাত দুখানিতে বুকটি বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। রাজা ডাকিলেন "উদয়ন!" উদয়ন চাহিলেন, কিন্তু টলিলেন না, মাথাও নাড়িলেন না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আর-কেহ যদি তোমার শিষ্য হইতে চায়, তাকে তোমার মন্ত্র শিখাইতে পার?" "পারি" বলিয়া ধ্যানী আবার ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। "তবে একজন স্ত্রীলোক তোমার শিষ্য হইবে। সে তেমন কিছু নয়, কুঁজো আর কালো। তবে মেয়ে মানুষ কিনা, তোমার সাক্ষাতে আসিবে না; দুজনার মাঝখানে যবনিকা থাকিবে।" এই বলিয়া রাজা প্রদ্যোত মহাজন-ঘরের কোলাহলের মত অস্ত্রালঙ্কার ঝন্ ঝন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে হয়ত বলিলেন "আগে মন্ত্র উদ্ধার করি, তার পর তোমার অবজ্ঞার প্রতিফল।"

রাত হয় হয় কালে, কুমারী বাশুলদত্তা গোলপুকুরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া আলতাপরা পায়ে জল নাড়িতেছিলেন, এমন সময় রাজা সেখানে গিয়া হাজির। ফটিক তার নীল জল ঝুরঝুরা বাতাসে নাচিয়া নাচিয়া রাজকন্যার রাঙা পায়ে চুমো খাইতেছিল, আর অনুরাগে নিজেও রাঙা হইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার আঁধার চাঁদের ভয়ে গাছতলায় লুকাইয়াছে—আর ফুলতলায়ও লুকাইতেছিল। কুমারী রাজাকে বলিলেন "বাবা, তোমরা নিতি মারামারি কাটাকাটি নিয়ে ব্যস্ত থাক। দেখদেখি; আমার মাছগুলি কেমন খেল্‌ছে! আর ঐ চাঁদ—ওর আলোতে লালিমা নেই, বাবা! কেবল হাসি!" রাজা একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন "দেখ্ বাশুল, তোর চাঁদ, আর ফুল্, আর বায় আমার আর ভাল লাগে না।" "তা না লাগুক, একটা গান শোন!" বলিয়া বাশুল এক গান ধরিয়া বসিল।—দুষ্ট মেয়ে, তার দুরন্তপনার জন্য রাজা অস্থির; তবু তাকে ভালবাসেন। কিন্তু ভালবাসিলে কি হয়? তিনি যে এখন কাজের কথা লইয়া আসিয়াছেন; এখন কি গান শোনা যায়? ভাবিলেন বাধা দিই। এই এবার দেবো—এখনি আচ্ছা একটু পরে—তা এই চরণটা শেষ হইয়া যাক্! কই? চরণের পর চরণ চলিল, রাজা বাধা দিতে পারিলেন না।—মুখে কথা ফুটিল না। কাব্য পড়িতে পড়িতে যেমন গভীর রাত্রি হইয়া গেলে, প্রত্যেকবার পাতা উল্টাইয়াই মনে করি, এই পৃষ্ঠা শেষ হইলেই পুঁথি বন্ধ করিব, কিন্তু পৃষ্ঠা শেষ হইলে আবার কি জানি কেমন করিয়া নূতন পৃষ্ঠা আরম্ভ হইয়া যায়—রাজা প্রদ্যোতেরও তেমনি হইল। বাশুল গাহিতে লাগিলেন—

আয় তোরা কে দেখ্‌বি আজি, তারার হাটের মেলারে—
ধরার সনে চাঁদা মামার লুকোচুরি খেলারে!
তোরা জিতিস, তোরা হাসিস; তোরা হাসিস্, তোরা কাঁদিস্;
জিতেও হাসে, হেরেও হাসে,—একি হেলাফেলারে!
আলোছায়ায় গলাগলি—জয়-পরাজয় খেলারে!

এমনি সব গানের কথা। উঠিয়া পড়িয়া কাঁপিয়া খেলিয়া সে গান ত শেষ হইল; কিন্তু সুরের ঝাঁঝ আর কথার ইঙ্গিত দুটাতে মিলিয়া কানের কাছে কেবল ঘোরা ফেরা করিতে লাগিল। মন্দাকিনীর তরঙ্গের মত সে মূর্চ্ছনা; ফুলচন্দনের গন্ধের মত তার প্রীতি; অপরূপ দৈববাণীর মত তার ঝঙ্কার—বাগান-ভরা, বাতাস-ভরা, আকাশ-ভরা এক রাগিণীর জাল রচিয়া খেলিতে লাগিল সেই গান। প্রদ্যোতের অনেকক্ষণ লাগিল সে মোহ কাটাইতে। কুমারী এই অবসরে সিউলিতলায় ফুল কুড়াইতে ছুটিয়া গেলেন। রাজা যখন আপনাকে সামলাইয়াছেন, তখন বাশুল আর সেখানে নাই।

(৭)

রাত যখন দুই প্রহর, তখন উদয়নের কারাগারের দুয়ার খুলিল। উদয়ন তখনো বসিয়া বসিয়া পিণ্ডোলের ধ্যান করিতেছেন। পিণ্ডোল—অপূর্ব্ব পুরুষ এই পিণ্ডোল! —এমন স্থির—এমন অটল—এমন ধীর! সুখকে কে এমন ভাবে তুচ্ছ করিতে পারে? দুঃখকে কে এমন ভাবে হেলা করিতে পারে? বিধাতার ইচ্ছাকে কে এমন নির্ব্বিকার চিত্তে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে? ছি ছি! কি দুষ্কর্ম্মে জীবনটা কাটিয়াছে! কেবল রক্তারক্তি, কেবল নিষ্ঠুরতা, কেবল স্নেহহীন দৃষ্টিহীন জ্ঞানহীন খেলা! মন্দই কি? যদি ঘাতকের হাতে এ খেলাঘরটি ভাঙ্গিয়া যায়? এতে মহামারীর বীজ ঢুকিয়াছে, ভস্ম না করিয়া ফেলিলে শুদ্ধ হইবে না! উদয়ন ভস্ম হইয়া যাইবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিলেন শ্মশানের আগুনকে বরশয্যার ফুলের মত আলিঙ্গন করিতে সংকল্প করিলেন, আর সেই সন্ন্যাসীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। পিঁপড়ার বাসা পিঠে লইয়া সন্ন্যাসী সেই যে বলিয়াছিলেন "রাজা উদয়ন্, তোমার মঙ্গল হোক্!" সেই কথা তাঁর কানের কাছে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত বাজিতে লাগিল। তাতে এমন একটা আশার বেদনা সঞ্চিত ছিল, শূলে যাওয়ার ক্লেশ যার কাছে তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ।

হঠাৎ উদয়নের ধ্যানের উপর কার ছায়া পড়িল; আর যেন কার কণ্ঠস্বর দূর অতীতের স্মৃতির মত অতি মৃদু মৃদু কানে ঘা মারিল। তিনি চক্ষু মেলিলেন। মেলিয়া দেখেন —একি! এ কোন্ দেবতার মায়া? এ বালিকা কি বালিকা, না গুরুদেবের ছলনামূর্ত্তি?—এমন উজ্জ্বল—এমন স্নিগ্ধ—এমন পবিত্র! কেশের রাশি সর্ব্ব অঙ্গে কি স্বপ্নের ছায়া মেলিয়াছে! চোখ দুটিতে কি প্রাণগলানো করুণা, ঠোঁট দুখানির মাঝখানে কি ছেলে-ভুলানো স্নেহের রেখা! আনমনা উদয়ন অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বাছা রামধনুর দেশের মেয়ে?"

বালিকা কথা কহিল। মা'র মত মিষ্ট, বোনের মত সরল, ভাইয়ের মত স্নেহমাখা কণ্ঠে বলিল, "বন্দি! ফটক খুলিয়া আসিয়াছি, তুমি প্রস্থান কর!" উদয়ন বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বালিকা আবার বলিল "ভয় পাইও না; আমি রাজকুমারী বাশুলদত্তা। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম; তুমি আস্তাবল হইতে তোমার মনমত ঘোড়া একটা বাছিয়া লইয়া প্রস্থান কর। আমার আদেশে কেহ তোমার কেশাগ্রও ছুঁইবে না।"

উদয়ন স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে মুক্তি দেবার জন্য তুমি কি রাজার আদেশ পেয়েছ?" কুমারী মাথা নোয়াইয়া বলিল "না।" উদয়ন বলিলেন, "রাজকুমারীর অনুগ্রহ সম্ভব হ'লে জন্মজন্মান্তর মনে রাখ্‌ব; কিন্তু মার্জ্জনা করবেন, আমি মুক্তি চাই না!" নম্র কিন্তু এমন দৃঢ়কণ্ঠে বন্দী সংকল্প জানাইলেন, যে, কুমারী আর কথা বলিতেই সাহস পাইল না; অগত্যা ম্লান-মুখে ঘরে ফিরিল।

পরদিন খুব ভোরে প্রদ্যোত আবার বাশুলদত্তার সঙ্গে দেখা করিলেন। অত সকালে পিতাকে দেখিয়া বাশুল ভাবিল "সর্ব্বনাশ! রাত্তিরের ঘটনা বুঝি বাবা জান্‌তে পেরেছেন; এখন উপায়? উদয়ন পালিয়ে গেলে এক কথা ছিল! কিন্তু তিনি ত পালালেন না। আমি চোরের মত তাঁকে সাহায্য কর্ত্তে গিয়েছিলেম, কিন্তু তিনি ত বীর! তিনি অন্যায়ের সাহায্য লইবেন না! এখন আমার লজ্জা রাখ্‌বার স্থান কোথায়? আর উদয়নেরই বা নিষ্কৃতির পথ কোথায়?" বালিকা একটু বিচলিত হইল। আবার নিমেষের মধ্যে নিজেকে শক্ত করিয়া বলিল "কেন? কি এমন করেছি? পিতা অন্যায় করেছিলেন, আমি তা

খণ্ডাতে চেয়েছি মাত্র।" বলিয়া পিতার তিরস্কার স্থির ভাবে লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। কিন্তু পিতা আসিয়া সে-সব কোন কথা বলিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন "শোন, বাশুল; এক বামন তোমাকে আজ থেকে হাতী বশ করবার মন্ত্র শিখাবে। তুমি পর্দ্দার আড়ালে বসে' মন্ত্র শিখবে। কিন্তু সাবধান! কখনো পর্দ্দা সরিয়ে তাকে দেখা দিও না—তাহলে মন্ত্রশক্তি বন্ধ্যা হয়ে যাবে।" বাশুল মাথা নোয়াইয়া বলিল "পিতার যা আদেশ!"

সেদিন হইতে অবন্তির রাজকুমারী কৌশাম্বীর বন্দী রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

(৮)

দিন আসে, দিন যায়; মাস আসে মাস যায়; বছর আসে বছর যায়; বাশুল কেবল উদয়নের কথা ভাবেন। সেই যে কারাগারে দেখিয়াছিলেন—কি তেজস্বী—কি নির্ভীক্ এমন বিপদেও কি স্থির-মূর্ত্তি! আহা, কোন্ রাজ্যে বাজ পড়িয়াছে? কোন্ পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে? কোন্ নারীর সুখের কপাল ভাঙ্গিয়াছে? পারিলেন না, এত করিয়াও কুমারী সেই সুপুরুষকে মুক্তি দিতে পারিলেন না! এই দুঃখই ত তাঁকে বরাবর পীড়া দিতেছে! কুমারীর আর মন্ত্র তন্ত্রের দিকে মন যায় না। কোথাকার এক বামনের কাছে এ ঘ্যানঘেনানি শুনিবেন?—আবার উচ্চারণের কশরৎ! নিত্যি নিত্যি সকালবেলাটা এমন ভাবে কাটিয়া যায়—সেফালিতলা একলা পড়িয়া থাকে, ফুলের বাতাস সাথী না পাইয়া গাছের পাতায় হাঁপাইয়া মরে, পদ্মবর্ণ ভোরের আলো বাশুলের সেই পদ্মমুখখানির খোজে আসিয়া পুকুরের শূন্য ঘাটে আছড়াইয়া পড়ে,—চঞ্চল জলে ঝাঁপ দেয়—ডুব দিয়া মিলাইয়া যায়! আর বাশুলকে কিনা শ্লোকের উচ্চারণ করিয়া করিয়া সে সুখের প্রভাতটা প্রাচীরঘেরা কারাগারের কোঠায় কাটাইয়া দিতে হয়! বাশুলের মন কোন মতেই সে শ্লোকে গেল না; বাশুল কোন মতেই সে শ্লোক মুখস্থ করিতে পারিলেন না।

উদয়নের ধৈর্য্য শেষে একদিন টলিয়া গেল। তিনি রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন—"কুঁজী ত! এর চাইতে বেশী আর কি আশা করা যায়?" কুমারীরও তখন সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তিনিও সুর চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "বামন হইয়া বাশুলদত্তাকে কুঁজী বলে, এমন দম্ভ কার রে?" বলিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া ধরিলেন।—ও হরি! এই কি বামন? এই মদনের মত সুন্দর, কার্ত্তিকের মত তেজস্বী, ইন্দ্রের মত বিরাট পুরুষ! বাশুল স্তম্ভিত হইয়া চিনিলেন—ইনি কৌশাম্বীরাজ উদয়ন।

প্রদ্যোতের ছলনা এমনি করিয়া ধরা পড়িয়া গেল।

পরদিন ভোরে রাজকন্যা বন্দীর কাছে রাখী পাঠাইয়া দিলেন; আর লিখিলেন "তুমি ক্ষত্রিয়, আশা করি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন করিবে।"

উদয়ন অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিলেন। তারপর অবন্তি-পতিকে জানাইলেন "আমার শিক্ষাদান শেষ হইয়া গেছে। তবে মন্ত্রের জীবন বা প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সাধিকাকে অমাবস্যা রাত্রে এক গাছের শিকড় তুলিয়া আনিতে হইবে। দূরে জঙ্গলে সে গাছ। মহারাজের বড় হাতীটির তাই প্রয়োজন।"

প্রদ্যোত উত্তর করিলেন "আজই বুঝি অমাবস্যা; চারিজন লোক সন্ধ্যার সময় তোমাদিগকে সেই অরণ্যে লইয়া যাইবে।"

উদয়ন বিনয় করিয়া কহিলেন "তা হয় না। সাধিকাকে একলাই যাইতে হইবে। আমি মাত্র পথ দেখাইব।" অগত্যা রাজা তাতেই রাজী হইলেন।

(৯)

সেদিন ঝিঙ্গাফুল ফুটিতে না ফুটিতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। বৃষ্টি কি—অফুরন্ত বৃষ্টি। রাজা প্রদ্যোত শিকারে বাহির হইয়াছিলেন; একেবারে সন্ধ্যা মিলাইয়া যায়, তবু ফিরিলেন না। সেদিন ত আবার অমাবস্যা; সন্ধ্যার পরেই অন্ধকার—যেন যমপুরী; হাত মেলিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া চলিতে হয়। বিদ্যুৎ যদি দুই একবার চমকিয়া উঠে, তাতে কেবল সেই কাকের ডিমের মত কালো আকাশটাকে আরো ভীষণ দেখায় মাত্র, আর অন্ধকারটা আরো গাঢ় হইয়া উঠে। পথে ঘাটে জনমানুষের সাড়াশব্দটুকুও নাই। পশু বনে লুকাইয়াছে, পাখী পাতার আড়ালে বসিয়া ভিজিতেছে। ঝিঁ ঝিঁ যে ডাকিতেছে—উঠা নাই, নামা নাই, থামা নাই সে সুরের; নাড়ীর মত অবিরাম, ছাড়া-বাড়ীর মত রিম্‌ঝিম্ সে সুর, তার উপর ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি

আর সন্ সন্ বাতাস। কান বধির হইয়া যায়। রাজা এমন সময় কোথায় আশ্রয় লইয়াছেন কে জানে? দুষ্ট মেঘ, রাজাও জানে না, বাদ্শাও জানে না। কেবল হাঁড়ি হাঁড়ি জল ঢালে, আর ধড়ি ধড়ি গর্জ্জে। মানুষ সব ঘরে গিয়া লুকাইল।

এমন সময় রাজার বড় হাতী সাজাইয়া উদয়ন উপস্থিত। —"মন্ত্রী মশায়, আমার ছাত্রীকে আনাইয়া দেও। এখনি ঔষধ তুলিতে যাইতে হইবে। শীগ্‌গির আনাও।"

"এখনি?—এই দুর্য্যোগে?"

"হাঁ এখনি। নতুবা অমাবস্যা পার হইয়া যাইবে, সিদ্ধি মিলিবে না—আমার এত দিনের সাধনা সব পণ্ড হইবে।"

মন্ত্রী আর এখন করেন কি? তার উপর রাজার আদেশ রহিয়াছে অগত্যা বাশুলদত্তার কাছে খবর পাঠাইলেন; হাতীর উপর রূপার চৌদল উঠিল। তার চারিদিক ঘেরিয়া সোনালি পর্দ্দা পড়িল। উদয়ন ও বাশুল-দত্তা সেই জমাটবাঁধা-আঁধারের মত হাতীটার পিঠে চড়িয়া পৃথিবী-গ্রাস-করা আঁধারের মধ্যে ডুব দিলেন। আকাশ একবার চোরা কটাক্ষে চাহিয়া দুন্দুভি বাজাইয়া দিল।

এদিকে রাজা সারারাত্রি এক কাঠুরিয়ার ঘরে কাটাইয়া ভোর বেলা বাড়ী ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখেন বাশুলও নাই, উদয়নও নাই। কি হইল? কি হইল? রাণী বলিলেন "দাসী জানে।" দাসী বলিল "মন্ত্রী জানেন।" মন্ত্রী বলিলেন "উদয়ন জানেন।" কিন্তু উদয়নও যে নাই! তখন মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ, অভয় পাইলে বলি।" রাজা বলিলেন "বল বল, সত্বর বল!"

মন্ত্রী। আপনারই আদেশ-মত রাজকন্যাকে হাতীর পিঠে চড়িয়া ঔষধের গাছ আনিতে দিয়াছিলাম।

রাজা। আর এখনো ফিরে নাই? সর্ব্বনাশ!

তখন খোঁজ খোঁজ ডাক পড়িল। নৌকায় মাঝি ছুটিল, পায়ে পদাতি ছুটিল, ঘোড়ায় ঘোড়সোয়ার ছুটিল, হাতীতে মন্ত্রী ছুটিলেন। রাজা হুকুম দিলেন, সেনাপতি সৈন্য সাজাইলেন; রাণী ফটকে আর ফাটকে আনাগোনা করিতে লাগিলেন।

প্রহর বেলার সময় চর আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খবর দিল "উদয়ন রাজকুমারীকে লইয়া রাজার বড় হাতীতে চড়িয়া পলাইতেছেন।" রাজা গর্জ্জিয়া বলিলেন "উদয়নের এত বড় স্পর্দ্ধা? সেনাপতি! হাজার তরুক্‌সোয়ার লইয়া ধাইয়া যাও—উদয়নের ছিন্নমুণ্ড চাই।"

তখন সেনাপতির হাজার সৈন্য হাজার ঘোড়ায় চড়িয়া কোমরে হাজার অসি ঝন্ ঝন্ করিয়া উদয়নের পাছে ছুটিল।

উদয়ন দূর হইতে সেই রুষ্ট বাহিনীর গর্জ্জন শুনিয়া বাশুলদত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন "এখন উপায়?" বাশুল বলিলেন "উপায় ভগবান্।" বলিয়া হাতীর পিঠ হইতে দুই তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা পথের উপর ছড়াইয়া ফেলিলেন। প্রদ্যোতের সৈন্যগণ আসিয়া সোনা কুড়াইতে লাগিয়া গেল; সেই অবসরে উদয়নের হাতী বহুদূর চলিয়া গেল। মুদ্রা কুড়ান শেষ হইয়া গেলে সৈন্যগণ আবার ছুটিল। রক্তের গন্ধ পাইয়া ক্ষুধিত বাঘের দল যেমন ছুটে, একেবারে তেমনি ছুটিল। উদয়ন ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "আর রক্ষার পথ দেখি না। আমার অসি দাও; আমি যতক্ষণ পারি, ইহাদিগকে রোধ করি। মাহুত তোমাকে লইয়া কৌশাম্বী চলিয়া যাক্। সেখানে আমার এই আংটি দেখাইও রাণীর মত সম্মান পাইবে।" বাশুলদত্তা হাসিয়া বলিলেন "এখন তোমার আংটি রাখ; সম্প্রতি তোমাকে আর নামিতে হইবে না।" বলিয়া আরো দুই তোড়া সোনা ছড়াইলেন। সৈন্যগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাও কুড়াইয়া লইয়া আবার তাহাদের পাছে ছুটিল; বাশুল এবার তিন তোড়া ছড়াইলেন। এইরূপে সোনা ছড়াইতে ছড়াইতে যখন কৌশাম্বীর দুর্গচূড়া চোখে পড়িল, উদয়ন তখন শিঙ্গা বাজাইলেন। শিঙ্গার ডাক রাজধানীতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই উদয়নের সৈন্যগণ লাফাইয়া উঠিল। প্রদ্যোতের সৈন্যেরা যখন উদয়নের একতালি দূর, কৌশাম্বীর যোদ্ধাগণ তখন তাদের রাজাকে ঘেরিয়া চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছে। তাদের বিশ্বস্ত হাতে অব্যর্থ তীরের ঘা খাইয়া অবন্তি-সৈন্য অচিরে ভঙ্গ দিল। আর তার দুই দিন পরে কৌশাম্বী-রাণীর শূন্য আসন বাশুলদত্তার আল্‌তা-পরা পায়ের রাঙা আলোতে রাঙিয়া উঠিল।

শুনা যায়, পিণ্ডোলের উপদেশে উদয়ন আর বাশুল ভগবান্ বুদ্ধদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা।

মৃত্যু-মোচন

(কুশীলব)

আনা	প্রৌঢ়া নারী।
শাষা ... ... / লিজা	ঐ কন্যাদ্বয়।
ফিদিয়া	লিজার স্বামী।
মিশনা	ঐ পুত্র।
কারেনিনা	ধনী-বিধবা।
ভিক্তর	ঐ পুত্র।
প্রিন্স সার্জ্জিয়স ...	
আরিমক	ফিদিয়ার বন্ধু।
স্তাকব / বক্তেবিচ / করোকভ	আরিমকের বন্ধু।
আইভান	বৃদ্ধ বেদিয়া।
নাস্তাসিয়া	ঐ স্ত্রী।
মাশা	ঐ কন্যা।

মাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, প্রহরী, পুলিশ, ভৃত্য, দাই, দাসী প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

চায়ের টেবিলের পার্শ্বে আনা বসিয়া। আনা প্রৌঢ়া নারী, দেহ স্থূল, পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ আঁট সাঁট।

একটি চায়ের পিয়ালা হস্তে দাই প্রবেশ করিল।

দাই। কেট্‌লি থেকে একটু গরম জল নোব গা?

আনা। নাও না। খোকা একটু শান্ত হয়েছে?

দাই। ভারী অস্থির, গো দিদিমা। আর তাও বলি বাপু, ভদ্দর ঘরের মেয়ে তোমরা, তোমাদের এত ছেলে ঘাঁটা কেন? তোমাদের দুঃখ-কষ্টের ছায়ায় ছায়ায় বাছারা অবধি যে কষ্ট পায়! এই ছেলের মা—সারা রাত জেগে এত যে কান্নাকাটি কর, তাতে দুধটুকু অবধি বিষিয়ে ওঠে!

আনা। যাক্, সে-সব ত এখন চুকে বুকে গেছে—লিজা এখন কতক ঠাণ্ডা হয়েছে!

দাই। হুঁঃ—ঠাণ্ডা বলে, আমি কোথায় আছি! আহা, মার আমার মুখটির পানে চাওয়া যায় না। এই ত সারাক্ষণ কাঁদছিল, এখন বুঝি কাকে আবার চিঠি লিখছেন।

শাষা। (প্রবেশান্তে, দাইকে লক্ষ্য করিয়া) লিজা তোমায় ডাকছে, দাই।

দাই। এই যে যাই। (প্রস্থান)

আনা। হ্যাঁরে, লিজা নাকি এখনও কান্নাকাটি কচ্ছে, দাই বলছিল। এখনও তার এত কান্না, কেন?

শাষা। তুমি মা, অবাক করলে! এই যে সব কাণ্ড ঘটল—স্বামীর ঘর ছেড়ে ছেলে নিয়ে লিজা এখানে এসে উঠল,—এ সব কথা কি ভোলবার? না, সে ভুলতে পারে?

আনা। ভেবেই বা আর হবে কি? যা হয়ে গেছে, তা ত মুছে ফেলবার নয়, জানি, কিন্তু সে-সব ভেবে মিছে মন খারাপ করা বৈ ত না! এই যে সে ফিদিয়ার কাছ থেকে চলে এল, আমি ত মা, সন্তানের মঙ্গল খুঁজি, তবু আমিও বলি, ও বেশ করেছে। এমন করে দিন রাত ত্যক্ত করলে মানুষ বাঁচে কখনো? এখানে এসে জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়িয়ে মেয়েটা আমার নিশ্বেস ফেলে বেঁচেছে। তাই বলি, এখনও এ কান্নাকাটি কেন! পেটে যেটি হয়েছে, তাকে দেখ্‌ শোন্‌, না, কান্না, কান্না, কান্না! কেন?

শাষা। এ তুমি কি বলছ, মা? হয়েছে কি! ফিদিয়া করেছে কি? পরের ছেলে বলে একেবারে তার ঘাড়ে সব দোষটুকু চাপিয়ে দিয়ো না! সে করেছে কি? সে বদমায়েস, সে লক্ষীছাড়া, সে বাউণ্ডুলে—? এ-সব মোটে বিশ্বাসই করি না, আমি। তবে হ্যাঁ, সে খামখেয়ালি মানুষ! এই যদি তার দোষ হয়, ত—

আনা। খামখেয়ালি! বলিস কি, শাষা? এই ধর্‌ না—টাকা যদি তার হাতে পড়ল, তা সে যার টাকাই হোক না কেন—

শাষা। অমন কথা বলো না মা। পরের টাকাকড়ির সঙ্গে ফিদিয়া কোন সংস্রব রাখে না।

আনা। না, রাখে না, মস্ত মহামান্য লোক আমার! এই যে লিজার টাকাগুলো নিয়ে তছ্‌নছ করে দেয়—

শাষা। লিজার টাকা? সে টাকা ত তারি দেওয়া মা।

আনা। তা মানি, সেই যেন দিয়েছে। কিন্তু দিয়েছে যখন, তখন সে টাকা উড়ানোয় তার কি অধিকার আছে?

শাষা। ও সব অধিকার টধিকার নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে, মা। আমি শুধু এক কথা জানি যে, স্বামীর কাছ ছেড়ে চলে আসা মেয়েমানুষের সাজে না—বিশেষ ফিদিয়ার মত অমন স্বামী!

আনা। তুই তবে বলিস কি,—যে, ওখানে পড়ে পড়ে লিজা এই বাউণ্ডুলেগিরির প্রশ্রয় দেবে, তার বদ্ ইয়ারকির পয়সা জোগাবে—সেই পয়সা যত-সব ছোটলোক বেদে মাগীগুলোকে বাড়ী এনে, তাদের পায়ে সে ঢেলে দেবে, তাই দেখবে?

শাষা। এ সব মিছে কথা। কোন বেদে মাগীকে ডেকে ফিদিয়া ইয়ার্কি দেয় না।

আনা। নাঃ, সে দেখছি, তোদের সকলের চোখে নিচুলি মন্তর্ পড়ে দিয়েছে। না হলে তোরা দেখেও কিছু দেখতে পাস না! কিন্তু আমার চোখে কিছুই এড়িয়ে যাবার জোটি নেই। লিজার মত দশায় যদি আমি পড়তুম, তা হলে কোন্ কালে বাড়ী-ঘর-দোর ফেলে আমি চলে আসতুম, অমন সোয়ামীর মুখদর্শনও করতুম না।

শাষা। আর থাক্ মা, ও সব কথা।

আনা। না, না, এও যে তোরা ভুল করিস, বাছা! হাজার হোক্, আমি মা-মেয়ে যে আমার জামাইকে ছেড়ে এই শুকো মুখে ঘুরে বেড়ায়, এতে কি আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, না, আমি সোয়াস্তি পাই? গায়েরি জ্বালায় শুধু বলি বৈ ত না না হলে এই বয়সে ওকে সব সাধে জলাঞ্জলি দিতে দেখে, আমিই কি সুস্থির আছি? দু জনে যদি ফের ভাবসাব হয়, ঘর-ঘরণা করে, তবেই না দেখে বাঁচি, আমার জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োয়, আর তারি জন্যে না আমি কত দেবতার দোরে মাথামুড় খুঁড়ে মরছি! কিন্তু তা কি হবার?

শাষা। দেখ, এখন বরাতে কি আছে!

আনা। তা বলে এই বয়সেই কি ও সব সাধ মিটিয়ে হাত পা ধুয়ে বসে থাকবে?

শাষা। উপায়?

আনা। উপায়? উপায় ত এখনই হয়, ফিদিয়া যদি সত্যি সত্যি একটা কাটান-ছিড়েন করে! ওকে 'ডাইভোর্স' দেয়!

শাষা। মা-

আনা। তুই যে একেবারে আঁৎকে উঠলি! হয়েছে কি? কেন, ডাইভোর্সে দোষটা কি?

শাষা। দোষ! ভালই বা তাতে কি হবে, শুনি?

আনা। ভাল! ছেলেমানুষ আবার তা হলে ও বেচারী সুখের মুখ দেখতে পায় এই!

শাষা। তোমার ভীমরতি হয়েছে মা, কি যে বল! লিজা আর-একজন পুরুষকে ভালবাসবে? তাকে বিয়ে করবে?

আনা। কেন করবে না? কেন বাসবে না? তখন ও স্বাধীন হবে, তখন ত আর কারো কাছে ওকে জবাবদিহি করতে হবে না। তোমার মহামান্য ফিদিয়া বাহাদুরের চেয়ে রসজ্ঞ অনেক ভদ্দর লোকের ছেলে আছে, যারা লিজার মত বৌ পেলে বর্ত্তে যায়!

শাষা। বুঝেছি মা, তুমি কার কথা বলছ ভিক্তর! কিন্তু, ভারী বিশ্রী কথা, এ।

আনা। বিশ্রী কিসে? দশ বছর ধরে ওদের কি মাখামাখি ভাবই না ছিল! আমার বিশ্বাস, লিজা তাকে এখনো ভাল বাসে।

শাষা। তা বাসতে পারে কিন্তু তাকে স্বামী বলে মানবে, এমন ভাবে ভালবাসে না। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে দু'জনে খেলাধূলা করেছে, এরই দরুণ যা ভাব, এই,না?

আনা। এই ভাব থেকেই ভালবাসা দাঁড়ায়। অবিশ্যি যদি কোন বাধা-বিঘ্ন না ঘটে! (একজন দাসীর প্রবেশ) কিরে?

দাসী। ভিক্তর সাহেবের কাছ থেকে লোক এসেছে, চিঠির জবাব নিয়ে।

আনা। চিঠি!

শাষা। কার চিঠি ?

দাসী। লিজা দিদি চিঠি পাঠিয়েছিল, তারই জবাব।

আনা। লিজার চিঠি ?

দাসী। হাঁ, তা ছাড়া লোকটি বলে গেল, ভিক্টর সাহেব এখনই এখানে আসছেন।

আনা। বাঃ, কি অদ্ভুত—তার কথাই যে আমরা কচ্ছি, এখন! লিজা তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বুঝি। কিন্তু, কেন ? (শাষার প্রতি) তুই কিছু জানিস ?

শাষা। কে জানে, কেন! আমি ও সব জানি-টানি না।

আনা। তুই যেন রেগেই আছিস্ কেন ? মেয়েমানুষের এত তেরিয়া মেজাজ ভাল কি ? একটু ধীর হতে শেখ দেখি।

শাষা। লিজাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর না বাপু, কেন ডেকেছে! আমি ত আর তার মনের মধ্যে ডুব দিইনি যে মনের কথা জানতে পারব!

আনা। (মাথা নাড়িল ; পরে দাসীর প্রতি) এই চায়ের কেট্‌লি-পেয়ালাগুলো নিয়ে যা দেখি, বাছা। কখন্ থেকে পড়ে রয়েছে, তা কারো হুঁসই নেই এদিকে। নে, যা—কেটলিটায় ফের জল চড়িয়ে দিগে! (কেট্‌লি-পিয়ালা প্রভৃতি লইয়া দাসী প্রস্থান করিল। শাষাও এতক্ষণ বসিয়া ছিল, এখন গাত্রোত্থান করিল।) উঠছিস্ কেন ? বস্ না। (শাষা বসিল) লিজা তা হলে ভিক্টরকে ডেকে পাঠিয়েছে! কিন্তু কেন ?

শাষা। তুমি যা ভাবছ মা, তার জন্যে নয়, এ ঠিক জেনো।

আনা। কেন, তবে তুইই না হয় বল, শুনি।

শাষা। ভিক্টরকে ভালবাসবার জন্যে লিজা ত সারা হয়ে যাচ্ছে!

আনা। কথার,—পেটে একখানা, মুখে আর-খানা রাখিস, ওই তোর কেমন বদ স্বভাব! যা বলবি, খুলে বল্ না বাপু! গল্পগাছা করবে একটু, বোধ হয়—মনটা তবু জুড়োবে,—নয় কি ?

শাষা। কি জানি ?

(প্রস্থান)

আনা। (মাথা নাড়িয়া, কি ভাবিতে লাগিল ; পরে স্বগত) যাক্‌গে - কেনই বা ভাবা ? যা প্রাণ চায়, করুক সব - আমি ত কেউ নই। আমার পরামর্শ নেবে কেন ? আমি শুধু একটা দাসী বাঁদী বৈ ত না!

দাসী। (প্রবেশান্তে) ভিক্টর সাহেব এসেছেন মা।

আনা। এখানে ডেকে নিয়ে আয়, আর লিজাকে খপর দে।

(দাসীর প্রস্থান ; ভিক্টরের প্রবেশ)

ভিক্টর। (আনার সহিত করকম্পনান্তে) লিজা আমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছে। সন্ধ্যার সময় আজ আমি আসছিলুমই। চিঠিখানা পেয়ে ভাবলুম, যাই, এখনই না হয়, ঘুরে আসি।...তা, লিজা ভাল আছে ত ?

আনা। হাঁ, সে ভাল আছে, তবে ছেলেটার অসুখ আর সারছে না! সে এল বলে! (কণ্ঠস্বর ঈষৎ আর্দ্র করিয়া) আর আমাদের যে করে দিন কাটছে, বাবা! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল) তোমার ত কিছু অজানিত নেই! শুনেছ ত সব ?

ভিক্টর। হাঁ, শুনেছি। পরশু যখন তার চিঠি এল, তখন ত আমি এখানেই! ··· তাই কি সিদ্ধান্ত হল ?

আনা। তা না ত আর কি হবে, বল ? ভাঙা কাঁচ কি জোড়া লাগে ? এ ত মুছে ফেলবার ব্যাপার নয়।

ভিক্টর। সে ত ঠিক কথা—বিশেষ লিজার সম্বন্ধে ত অন্য কথা উঠতেই পারে না। কিন্তু এক সঙ্গে গাঁথা দুটো প্রাণ, এমন করে ছিঁড়ে পৃথক হয়ে যাওয়া—বড় কষ্টের কথা!

আনা। তা আর বলতে ? কিন্তু এ কাচে চিড় খেয়েছে অনেক দিন—বাইরের লোক জানতে পারে নি—এই যা! লিজা নাকি আমার বড় শান্ত মেয়ে, তাই কাকেও কোন দিন সে কোন কথা ভেঙে বলে নি। শেষে যখন সকল বরদাস্তের বার হয়ে পড়ল, আর ঢেকে রাখা যায় না, তখনই না এখানে এল। তা ফিদিয়াও আর সে অবধি নাকি বাড়ী ঢোকেনি শুনছি। কোন্ মুখেই বা ঢুক্‌বে ?

ভিক্টর। কেন ?

আনা। ঢুকবে ? ঐ অত কাণ্ডর পর ? কত করে দিব্যি গেলেছিল, আর কখনো এমন হবে না—যদি হয় ত

লিজাকে মুক্তি দেবে, স্বাধীনতা দেবে—স্বামীর অধিকার ত্যাগ করবে!

ভিক্তর। স্বাধীনতা দেবে কি ক'রে? মুখের কথায় কি কখনও অধিকার যায়? বিশেষ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার?

আনা। কেন, লিজাকে সে ডাইভোর্স করুক না! সে যে এতে গররাজী, তা ত নয়, সেও ত বাঁচে! এখন আমাদের একটু উঠে পড়ে হাঙ্গাম-হুজ্জুতটুকু শুধু সেরে নেওয়া।

ভিক্তর। কিন্তু লিজা তাকে এত ভালবাসে...সে...

আনা। অত্যাচারের তাপে সে ভালবাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, বাছা। দিনরাত নেশাভাঙ করবে, জুয়ো খেলে বেড়াবে, বদ্ সঙ্গী নিয়ে মেতে থাকবে,—স্ত্রীকে দেখবে না,—শুনবে না, এত অপমান, অবহেলা—কোন্ মেয়েমানুষের সহ্য হয়, বল ত!

ভিক্তর। তবু স্বামীর উপর স্ত্রীর ভালবাসা......

আনা। আবার বলছ, ভালবাসা? এমন লোককে ভালবাসতে কেউ পারে কি কখনো? স্ত্রী বলে ত আর সে কিছু বানের জলে ভেসে আসে নি! এমন অবিশ্বাসী স্বামী—যাকে কোন বিষয়ে এক তিল বিশ্বাস করা যায় না! তুমি ত জান, শেষের দিনের সে কাণ্ডখানা—(সতর্কভাবে দ্বারের দিকে একবার চাহিল এবং বক্তব্যটুকু একনিশ্বাসে চট্ করিয়া সারিয়া লইল।) আর ঢাক-ঢাক চলছিল না,—বুঝলে? সমস্ত জিনিস-পত্তর বাঁধা পড়েছে—দিনের খরচ চলা দায় হয়ে উঠেছিল। শেষে ওর কে খুড়ো আছে বড় লোক—তারই হাতে পায় ধরে এক হাজার টাকার জোগাড় হয়। টাকাটা লিজার নামেই পাঠিয়েছিল। গুণধর জামাই আমার সে সমস্ত টাকা নিয়ে সরে পড়লেন—ঐ ত রোগা পরিবার কি-ই বা তার বয়স, তার উপর ঐ রোগা নড়নড়ে ছেলেটা নিয়ে বাছা আমার সারা হয়ে যাচ্ছে! কে'ই বা দেখে? কেই বা শোনে? তা দেখে তাদের পথে বসিয়ে তিনি ত দিব্যি ইয়ার্কি দিতে সরলেন! আবার চিঠি লিখে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাঁর কাপড়-চোপড়, এষ্টেট-পত্তর, যা কিছু আছে, যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বোঝ একবার আক্কেলখানা।

ভিক্তর। এ সব কথা আমি শুনেছি।

(শাষা ও লিজার প্রবেশ)

আনা। ভিক্তরকে তুই ডেকে পাঠিয়েছিস, লিজা? দেখ্ তোর চিঠি পেয়েই বাছা আমার হুমকি-তুমকি হয়ে ছুটে এসেছে।

ভিক্তর। আরো আগে আমি আসছিলুম—একটা লোক পথে খানিক আটকে রাখলে। (শাষা ও লিজার করকম্পন করিল) তা কি দরকার বল দেখি, লিজা।

লিজা। একটা কাজ করতে হবে, তোমায়! আর কাকেই বা বলি বল, আমি? আমার আর এমন বন্ধু কে আছে, ভিক্তর?

ভিক্তর। সে কি লিজা,—তুমি সঙ্কোচ কচ্ছ? আমার কাছে ভূমিকা? কি করতে হবে, বল।

লিজা। তুমি ত সব শুনেছ।

ভিক্তর। হাঁ।

আনা। তোমরা কথা কও—আমার একটু কাজ আছে, সেরে ফেলি গে। শাষা, আয় ত মা, আমার সঙ্গে।

[আনা ও তৎপশ্চাৎ শাষার প্রস্থান।]

লিজা। সে একটা চিঠি লিখেছে। লিখেছে সে তাতে আমাতে আর কোন সম্পর্ক নেই। সব বোঝাপড়া চুকে গেছে। (অশ্রু রোধ করিয়া) চিঠিখানা পড়ে আমার কান্না এল—। যাক্, কি করব? এ বিচ্ছেদ সহ্য হবে না—কিন্তু উপায় কি! আমি লিখেছি, তোমার যখন এই ইচ্ছা হয়েছে, তখন বেশ, তাই হোক্। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।)

ভিক্তর। এত কাণ্ডর পরও এই কথা নিয়ে তোমার মনে কষ্ট হয়, লিজা?

লিজা। হাঁ হয়। আমার কান্না পাচ্ছে—কাল সারা রাত পড়ে কেঁদেছি—কেবলই কেঁদেছি—দুই চোখের পাতা এক করতে পারি নি।...এ কি ভাল হল? যাই হোক, তবু সে আমার স্বামী। তার সঙ্গে বিচ্ছেদ—জীবনের মত বিচ্ছেদ? এটা না লিখলেই ভাল হত। এই সে চিঠি (পত্র প্রদান)। চিঠিখানা তার হাতে তুমি দিয়ো। আর এক কথা—আমার এ দুঃখের কথাও তাকে বলো!—ভিক্তর, তাকে ফিরিয়ে আন।

ভিক্তর। (বিস্মিতভাবে) লিজা—

লিজা। তাকে বলো, যা হয়েছে, তা যেন সে আর মনে না রাখে, ভুলে যায়! আর—ফিরে—ফিরে আসে! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল) চিঠিখানা আর কোনো রকমে তার কাছে পাঠাতে পারতুম। কিন্তু তাকে আমি চিনি, তার মেজাজও জানি। সে বড় ভাল, তবে কেমন খেয়ালের ঝোঁকে সে থাকে। এ চিঠি পড়লে নিশ্চয় সে আসবে। কিন্তু যদি কেউ একটু বাধা দেয়, তা হলে সে আর ফিরবে না। মন যা চায়, পরের পরামর্শে, খেয়ালের ঝোঁকে ঠিক তার উল্টোটি সে করে বসে!

ভিক্তর। বেশ—আমায় যা করতে বলবে, আমি তাই করব।

লিজা। তুমি অবাক হচ্ছ—তোমায় এ কথা কেন বলছি?

ভিক্তর। না—অবাক কেন? তা—তব—কি জান, যথার্থ বলতে কি, একটু অবাক হয়েছি বটে!

লিজা। রাগ কর নি?

ভিক্তর। রাগ! তোমার উপর কবে আমি রাগ করেছি, লিজা?

লিজা। তোমায় বলছি কেন, জান ভিক্তর? এ জগতে শুধু তুমিই তাকে চেন, তাকে ভালবাস, তার একমাত্র সুহৃদ, আর কেউ চেনে না, ভালও বাসে না।

ভিক্তর। তাকে ভালবাসি সত্য—তোমাকেও বাসি, লিজা। এ ত তুমিও জান। তোমাকে তোমারই জন্য ভালবাসি—তোমার কাছ থেকে আমি কোন-কিছুর প্রত্যাশা করি না—প্রতিদানও চাই না কোন দিন। তুমি যে বিশ্বাস করে আমায় এ কাজের ভার দিয়েছ, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার যতটুকু সাধ্য, তা এখনই করব।

লিজা। জানি ভিক্তর, তা তুমি করবে। সব কথাই তোমায় বলব, কিছু গোপন করব না। আজ সকালে আমি আরিমবের কাছে গেছলুম—সে কোথায় আছে, তাই জানতে। তারা বললে, সে সেই বেদেদের দলে গিয়ে মিশেছে। শুনে অবধি আমার বড় ভাবনা হয়েছে। এই বেদেদের উপর তার কি যে ঝোঁক! এই বেলা যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে না পার, তা হলে বেদেদের দল থেকে আর তাকে ফেরানো যাবে না—তারা কি যাদু জানে, বশ করে ফেলবে। যেমন করে পার, তাকে ফিরিয়ে আন—আমার কাছে ফিরিয়ে আন। আনবে?

ভিক্তর। আমি এখনই যাচ্ছি, লিজা।

লিজা। যাও, তাকে গিয়ে নিয়ে এস। আর বলো, যা হয়ে গেছে, তা যেন সে ভুলে যায়, তার জন্যে আমায় যেন সে ক্ষমা করে। রাগ করে চলে আসা আমার উচিত হয়নি।

ভিক্তর। (উঠিয়া) কোথায় তাকে পাব, বল দেখি।

লিজা। বেদেদের আড্ডায়। আমি নিজে সেখানে গেছলুম—তাদের দোর অবধি। চিঠিখানা নিজেই কারো হাতে দিয়ে আসব ভেবেছিলুম, কিন্তু তখনই তোমার কথা মনে পড়ে গেল। শুধু চিঠিতে হবে না তাকে একটু বোঝানো চাই! এই নাও ঠিকানা—লিখে দিচ্ছি। (ঠিকানা লিখিয়া দিল) তাকে বলো, বলো সে যেন সব কথা ভুলে যায়। আমিও সব ভুলে গেছি। আমাদের দুজনকে তুমি বাঁচাও, ভিক্তর।

ভিক্তর। আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমি এখনই যাচ্ছি। (প্রস্থান।)

লিজা। (স্বগত) তার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ না, না, তা আমার সহ্য হবে না। আমি বাঁচব না, তা হলে—(চোখে অশ্রু নামিল—রুমালে চোখ ঢাকিল।)

(শাষার প্রবেশ)

শাষা। ওকে বললি?

লিজা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

শাষা। ও যাবে?

লিজা। যাবে।

শাষা। ওকে কেন বললি তুই, লিজা? এত লোক থাকতে—?

লিজা। কাকে তবে বলব, দিদি?

শাষা। তুই জানিস, ভিক্তর তোকে ভালবাসে?

লিজা। সে ত কোন্ ছেলেবেলাকার কথা! কাকে তুমি তবে পাঠাতে বল, দিদি? বল,—তোমার কি মনে হয়, সে কি ফিরে আসবে না?

শাষা। কেন আসবে না? নিশ্চয় ফিরে আসবে। সে ত অবুঝ নয়!

(আনার প্রবেশ।)

আনা। কৈ? ভিক্তর কোথা গেল?

লিজা। চলে গেছে।

আনা। চলে গেছে। বাঃ!

লিজা। আমারই একটা কাজে তাকে পাঠিয়েছি, মা।

আনা। কি কাজ? বলবি না, কোন গোপনীয়—?

লিজা। গোপনীয় আবার কি? তার হাত দিয়ে ওর কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছি—

আনা। ওর কাছে! —কার কাছে,—ফিদিয়ার কাছে?

লিজা। হাঁ।

আনা। আবার তাকে চিঠি লিখলি! অবাক করলি, বাছা! আমি ভাবলুম, তার সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে গেল, আপদ চুকল—

লিজা। সে আমার স্বামী—

আনা। আবার সেই কথা—?

লিজা। তাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, মা। ভুলতে এত চেষ্টা করলুম, পারলুম কৈ? আর যা বল, পারব মা, শুধু তাকে ছাড়তে বলো না।

আনা। তবে তাকে আবার আসতে লিখেছিস বুঝি?

লিজা। হাঁ।

আনা। সেই লক্ষীছাড়ার গোঁয়ার্তুমি আবার সহ্য করবি?

লিজা। মা, সে আমার স্বামী—আমার সামনে তাকে দুর্বাক্য বলো না - বলতে হয়, আড়ালে বলো!

আনা। ওমা, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে, চোর! অমন স্বামীর মুখ দেখতে আছে? বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কোর!

লিজা। মা—

আনা। একটা গোঁয়ার, বওয়াটে, মাতাল—তবু তার পায়ের তলায় পড়ে থাকতে হবে?

লিজা। জ্বালার উপর আর জ্বালা বাড়িয়ো না, মা। চুপ কর—মা হয়ে এমন কুকথাগুলো -

আনা। তা ত বটেই রে! পেটে জন্ম দিছি, জ্বালা বাড়াব বলে,—বটেই ত! থাক্ বাপু! এখন বড় হয়েছ, আপনার জন চিনেছ, আমি কোথাকার দাসী-বাঁদী মাগী—এ-সব কথায় থাকবার আমার দরকার কি? বেশ, আমি চললুম - আমায় কেন বিদেয় করে দে না কোথাও—বেশ নিঃঝঞ্ঝাটে থাকবি সকলে! আমি হয়েছি আপদ বৈ ত না! পেটের মেয়ে, তার দুঃখ আমি বুঝব না, অপরে হবে দরদী! এ সব কালের দোষ! থাক মা থাক—আমি আর কোন কথা বলতে আসব না। তোমরা দুটি বোনে এই পেটেই জন্ম নিয়েছ; কিন্তু আজও তোমাদের চিনতে পারলুম না—কিসে যে তোমাদের ভাল করা হয়, আর কিসে মন্দ, কিছুই বুঝলুম না! একবার বল, অমন স্বামীর মুখদর্শন করব না, আবার তার গা ঘেঁষে সোহাগ করতে ছোটো! আমাদের মনে অত ঘোর-প্যাঁচ নেই - যা বলব, তা করব, মুখ দেখব না ত দেখবই না—এতে আকাশই ভাঙুক, আর বাজই পড়ুক! বেচারা ভিক্তর - তাকে ডেকে পাঠালে, আমি ভাবলুম, তাকে বুঝি একবার পরখ করে দেখবে—বলি, যা হয়েছে, তা হয়েছে, এখন আখেরে না পস্তাই।

লিজা। মা, তুমি পাগল হয়েছ!

আনা। পাগল নই, বাছা, পাগল নই। যা বলি, তা তোমাদের ভালর জন্যেই বলি! এই যে ভিক্তর এসেছিল, সে কিছু আশা করে আসে নি, মনে ভাব? ভিক্তরই তোমায় প্রথম বিয়ে করতে চেয়েছিল, মনে আছে? ফিদিয়ারও আগে? এখন এই ডাইভোর্সটা চুকে গেলে তার সে সুযোগ আবার মিলত—তা তুমি সেই ভিক্তরকে পাঠালে কি না ফিদিয়াকে ফিরিয়ে আনাবার জন্যে!

লিজা। তুমি চুপ কর, মা, স্থির হও। তোমায় মিনতি কচ্ছি, স্থির হও। আর ও সব কথা বলো না। আমার ভাল লাগে না।

আনা। তা লাগবে কেন? সেই মহামান্য গুণধর স্বামীকে এনে তার পা পূজো কর, ভাল লাগবে! মা এখন চুলোয় যাক্! আমি কিন্তু এ-সব বরদাস্ত করতে পারব না! একটা বওয়াটে ছোঁড়া এসে যে হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে মারবে, তা সহ্য করব না, আমি। তার আগে আমি কিন্তু বিদায়

নোব—বলে রাখছি। এখন তোমাদের যাব যা খুসী কর গে—আমি বলে কয়ে খালাস রইলুম!

(সরোষে ক্ষিপ্রগতিতে প্রস্থান।)

লিজা। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) দিদি —

শাষা। কাঁদিসনে লিজা সব ঠিক হয়ে যাবে! মার এ রাগ এখনই পড়ে যাবে'খন।

[নেপথ্যে আনা। ঝী, ঝী, আমার ওভারকোটটা কাউকে এ ঘরে দিয়ে যেতে বল ত।]

শাষা। দেখ্ একবার কাণ্ডখানা। লিজা, তুই বস্—আমি আসছি। মা— (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেদিয়া-গৃহ।

মজলিস বসিয়াছে। বেদিয়ার দল গান ধরিয়াছে। ফিদিয়া একটা সোফায় পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া আছে। তাহার গায়ের কোট খোলা। আরিমব নিকটস্থ চেয়ারে উপবিষ্ট। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সুরা-পাত্র ও পিয়ালা রহিয়াছে। টেবিলের পার্শ্বে জনৈক রাজকর্ম্মচারী শ্লথভাবে বসিয়া। ও বাস্তকর প্রভৃতি।

আরিমব। ফিদিয়া, ঘুমোলে না কি?

ফিদিয়া। আঃ, চুপ কর! গাও, গাও "সাঁঝের বাতাসে--" গেয়ে যাও, থেমো না।

জনৈক বেদিয়া। মাশা গাইবে, মাশা।

ফিদিয়া। মাশা গাইবে? বেশ। গাও মাশা, "সাঁঝের বাতাসে—"

কর্ম্মচারী। (জড়িত স্বরে) না, না, অন্য গান, অন্য গান গাও।

বেদিয়া। অন্য গান গাইবে? বেশ, তাই হবে।

আরিমব। যা হয় গাও, বকো না।

কর্ম্মচারী। (বাস্তকরের প্রতি) সুর ধর, সুর ধর।

বাস্তকর। কি সুর ধরি বলুন ত, মশায়? হরঘড়ি আপনাদের মত বদলাচ্ছে। এমন করলে কি গান বাজনা জমে?

ফিদিয়া। আবার গোল করে! আঃ—ধর না, মাশা—এমন গান ধর, যাতে একেবারে উড়ে যায়, বুঝলে! যা প্রাণ চায়, গাও, তবে এমন গান গেয়ো যাতে প্রাণ একেবারে উড়ে যায়। নাও বীণটা তুলে নাও!

ফিদিয়া উঠিয়া মাশার সম্মুখে আসিয়া বসিল—মাশার মুখের পানে বিহ্বলনয়নে চাহিয়া রহিল। মাশা গান গাহিতে লাগিল। গান থামিলে,

ফিদিয়া। বাঃ, চমৎকার মাশা! চমৎকার গান,—তুমিও চমৎকার! এবার গাও, সেই গানটা—সেই "সাঁঝের বাতাসে"

আরিমব। থাম ফিদিয়া,—আগে আমার কবরের গানটা শুনে নি।

কর্ম্মচারী। কবরের গান! সে আবার কি?

আরিমব। কেন, যখন আমি মরব, সত্যি মরে যাব—আমার দেহখানা কফিনে তুলে দেবে, তখন এই বেদের দল গিয়ে কফিনের চারি ধার ঘিরে দাঁড়াবে। আমার পরিবারকে আমি এ কথা বলে যাব, বুঝেছ তার পর ওরা গান ধরবে—সে এক শোকের সুর! সে সুরে আবার আমি প্রাণ পেয়ে কফিন থেকে উঠে দাঁড়াব,—বুঝলে! হাঁ, সেই গান গাও তোমরা, সেই গান।

(বেদিয়ারা সমবেত কণ্ঠে গান ধরিল।)

কি? কেমন শুনলে, বল দেখি! কেমন গান? এখন সেই গান ধর "ভালবেসো, ভালবেসো, ওগো আমার প্রাণের প্রিয়"

বেদিয়ারা আবার গাহিল। আরিমব নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যগীত-সমাপনান্তে

বেদিয়া। বাঃ সাহেব, বাঃ! তুমি দেখছি, আমাদের নাচের হুবহু নকল করতে পার।

ফিদিয়া। গাও, গাও—আবার গাও,—"সাঁঝের বাতাসে" (মাশা গাহিল।) এই ত চাই! আঃ, সুন্দর গান! চমৎকার! কি হল? কি কথা? চমৎকার, চমৎকার! এত সুখ মানুষের প্রাণে ধরে—সুখের জন্য সেখানে এত জায়গাও আছে? আশ্চর্য্য, "ভরে যায় প্রাণ, সুমধুর এ কি উল্লাসে।"—তার পর?—নেই, আর কিছু নেই!

বাদ্যকর। বেশ গান।

ফিদিয়া। কথাগুলো যেন আমারই প্রাণের কথা!

আরিমব। যাও, এখন একটু জিরোওগে, তোমরা। ঢের মেহনত করেছ, বাবা।

বাদ্যকর। সুরটা খাসা।

ফিদিয়া। (উঠিয়া মাশার কাছে আসিয়া বসিল।) মাশা, মাশা—তুমি আমার প্রাণের কথা যেন টেনে বের করেছ!

মাশা। (সহাস্যে) বখশিশ্—?

ফিদিয়া। কি? টাকা চাও,—টাকা? (পকেট হইতে টাকা লইয়া মাশার হাতে দিল।) এই নাও, কত চাই? (মাশা হাসিয়া টাকা লইয়া বক্ষ-বস্ত্রে গুঁজিয়া রাখিল।) দুর্ব্বোধ জীব! আজও তোমায় চিনলুম না, মাশা। আমার সামনে যেন নন্দনের দ্বার খুলে দিয়ে দাঁড়ালে—কি আলো, কি সুর, কি আনন্দ! এত দিয়ে তার বিনিময়ে চাও কি—? টাকা! তুচ্ছ টাকা! আর কিছু না। মাশা, তুমি কি করেছ, জান?

মাশা। কি আবার করেছি সাহেব? তুমি আমায় ভালবাস, আমার গান শুনতে ভালবাস, তাই দুটো গান গেয়েছি—এই বৈ ত না—তাতে হয়েছে কি? আমিও তোমায় গান শুনিয়ে বড় তৃপ্তি পাই—সারা দুনিয়ার লোককে শুনিয়েও সাহেব, এমন তৃপ্তি পাই না।

ফিদিয়া। মাশা, মাশা, আমায় তুই ভালবাসিস্?

মাশা। তুমি কি তা বুঝতে পার না, ফিদিয়া?

ফিদিয়া। তোর চোখে যাদু আছে, মাশা,—তোর কথায় নেশা হয়। (মাশার অধরে চুম্বন করিল; বেদিয়ার দল চলিয়া গেল। মাশা শুধু বসিয়া রহিল। অবশিষ্ট দল গল্প জুড়িল। মাশার পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিয়া) কিন্তু আমার যে স্ত্রী আছে মাশা, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। আর তুইও বেদের মেয়ে তোর বাপ-মা শুনবে কেন?

মাশা। থাকুক বাপ-মা—আমার মনের উপর তা বলে তাদের কিসের জোর? আমি যদি কাউকে ভালবাসি ত তাদের বারণ মানব কেন? যদি কাউকে দেখতে না পারি, তা হলেই বা তারা কি করতে পারে! তারা না হয় বাপ মা! মন ত আমার নিজের, তাদের নয়। আমার যাতে সুখ হয়, আমি যাতে ভাল থাকি, তা আমি করবই। তাতে কার কি?

ফিদিয়া। মাশা, মাশা, এ তুই কি বকছিস্! আমাকে ভালবাসতে তোর এত সাধ, এত আগ্রহ? আমাকে ভালবেসে মনে তা হলে তুই এত সুখ পাস, আনন্দ পাস?

মাশা। সুখ-টুখ অত-শত খতিয়ে দেখিনি, ফিদিয়া। তবে যখন লোক-জন এসে হাসি-গল্পে আমাদের ছোট ঘরটাকে ভরিয়ে তোলে, তখন আমার বড় ভাল লাগে—প্রাণে আমি বড় সুখ পাই।

জনৈক বেদিয়া প্রবেশ করিল।

বেদিয়া। (ফিদিয়ার প্রতি) একটি ভদ্দর লোক আপনাকে খুঁজছে; সাহেব।

ফিদিয়া। কে ভদ্দর লোক?

বেদিয়া। কে, তা জানি না তবে বেশ জমকালো পোষাক বটে, পয়সা-ওলা মানুষ বলে মনে লয়।

ফিদিয়া। পয়সা-ওলা? বটে! তা বেশ, তাকে এখানে নিয়ে এস।

আরিমব। কে আবার এল হে, এখানে?

ফিদিয়া। কে জানে, কে! এখনই দেখতে পাব।

(ভিক্তরের প্রবেশ)

কে! ভিক্তর! আরে এস, এস! তার পর এখানে কি মনে করে? এখানে যে তোমার পদধূলি পড়তে পারে, তা আমার কখনো মনে হয় নি! যা হোক, বস জামাজোড়া খুলে ফেল, হাড়ে একটু বাতাস লাগুক। বলি, ঝড়ের কুটোর মত উড়ে এখানে এসে পড়লে, কি করে, বল দেখি! একটা গান শুনবে? এরা চমৎকার গায়—বিশেষ সেই "সাঁঝের বাতাসে" গানটা! শুনবে?

ভিক্তর। তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে, ফিদিয়া!

ফিদিয়া। আরে ব্যস! গোপনীয়? ব্যাপার কি, বল দেখি। তুই এ ঘর থেকে একবার যা ত, মাশা। (মাশার প্রস্থান)

ভিক্তর। এই চিঠিখানা আগে পড়।

ফিদিয়া। চিঠি! বহুৎ আচ্ছা! (পত্র পাঠ করিল। পাঠান্তে ফিদিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরে কোমল স্বরে) শোন ভিক্তর—চিঠিতে কি আছে, তুমি তা জান, বোধ হয়?

ভিক্তর। জানি। কিন্তু আমি কি বলি, তাও তুমি শোন—

ফিদিয়া। রসো - আগে আমায় বলতে দাও। ভেবো না ভিক্তর, যে, আমি মাতাল হয়ে ভুল বকছি। না, আমার কথা শোন, মন দিয়ে শোন - মদ আমি খেয়েছি বটে, কিন্তু মাথা বেশ সাফ আছে—ভুল বকব না।···আচ্ছা বেশ, তোমার কি বলবার আছে, আগে না হয় তাই বল, শুনি। তারপর আমার যা বলবার থাকে, বলব!

ভিক্তর। শোন তবে। তোমার স্ত্রী লিজা আমায় পাঠিয়েছে—তোমার জন্যে ভেবে সে সারা হয়ে যাচ্ছে—তোমায় না দেখে সে আর স্থির থাকতে পাচ্ছে না। তুমি চল। হাঁ সে আরো বলেছে, যা হয়ে গেছে, তার চারা নেই, সে-সব সে ভুলে গেছে, মনে রাখেনি। তুমিও সে-সব মনে পুষে রেখো না, ভুলে যাও।

ফিদিয়া। (ভিক্তরের পানে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া) আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—কি বলছ, তুমি?···

ভিক্তর। লিজা আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছে—সে আমায় বলতে বলেছে,—

ফিদিয়া। বলতে বলেছে—?

ভিক্তর। কিন্তু শুধু তার জন্যে নয়, ফিদিয়া, আমি নিজেও তোমায় মিনতি করে বলছি,—ফিদিয়া, ভাই, এস, আমার সঙ্গে ঘরে এস।

ফিদিয়া। ঘরে যাব? ভিক্তর, তুমি মহৎ, তুমি ভদ্র—আমার চেয়ে ঢের বেশী মহৎ, ঢের বেশী ভদ্র—কিন্তু যাক্, সেটা হওয়া ত বড় শক্ত কথা নয়! আমি কি? আমি বদমায়েস, আমি মাতাল, আমি বওয়াটে, তুমি ভাল, খুব ভাল, সচ্চরিত্র, তাই আমায় তুমি ফেরাতে এসেছ। কিন্তু আমার সঙ্কল্প শুনবে? শোন। আমি যাব না, ঘরে ফিরে যাব না। কেমন করে কোন্ মুখ নিয়ে ফিরব, বল দেখি!

ভিক্তর। বেশ, এখন যদি ঘরে না যাও, ত আমার সঙ্গে এস,—আমার বাড়ীতে এস! আমি লিজাকে বলব'খন, তারপর কাল না হয়—

ফিদিয়া। কাল? কালও কি এর কিছু তফাত দেখবে? তাই তুমি ভেবেছ? কিছু না বন্ধ, কিছু না—এতটুকু তফাত নয়। কালও আমায় ঠিক এমনি দেখবে। (উঠিয়া টেবিল হইতে বোতল লইয়া মদ্যপান করিল)—উঃ!...... শোন ভিক্তর, তাকে আমি বলেছিলুম, আর যদি কখনো কথার খেলাপ করি, তাহলে আমায় সে ছেড়ে যাবে। তার পরও আমি কথার খেলাপ করেছি, সে-ও চলে গেছে। বাস্! কড়ায়-গণ্ডায় শোধ-বোধ হয়ে গেছে। আমি মদ খাই, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখি।

ভিক্তর। তবু আমার কথায় এস।

ফিদিয়া। তুমি কেন এ মিনতি করছ, ভিক্তর। আমাদের বিয়ের বাঁধন থাকছে না, কেটে যাচ্ছে—কেন তুমি আবার তাতে গেরো কসছ?

(ভিক্তর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় মাশা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।)

এই যে মাশা—। মাশা, সেই গানটা এঁকে একবার শুনিয়ে দে ত,—সেই "ধানের ক্ষেতে ঢেউ লেগেছে"! গা' ত মাশা।

(বেদিয়ারা সকলেই আবার সে কক্ষে প্রবেশ করিল।)

মাশা। (জনান্তিকে, বেদিয়াগণের প্রতি) ফিদিয়াকে একটা গান শোনাই, আয় ভাই। ও বড় মনমরা হয়ে পড়েছে আজ।

(বেদিয়ারা গান ধরিল।)

ফিদিয়া। - কেমন শুনলে বল, ভিক্তর? বেশ, না?

ভিক্তর। ওদের কি বখশিস দেওয়া যায় বল ত।

ফিদিয়া। যা তোমার প্রাণ চায়। ওরা কোন ওজর করবে না। (ভিক্তর একজন বেদিয়ার হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বিরক্ত চিত্তে প্রস্থান করিল।) বাঃ, ভেসে পড়েছে! যাক্ গে—চুলোয় যাক্ ভিক্তর!

[মাশা ও ফিদিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

ফিদিয়া। মাশা—

মাশা। কি?

ফিদিয়া। ও কে এসেছিল, জানিস—? ও ভিক্তর, আমার বন্ধু।

মাশা। অমনি-অমনি বিদেয় করলে যে!

ফিদিয়া। বড় খাসা লোক ও, মাশা। ও কেন এসেছিল, জানিস? আমায় নিয়ে যেতে, ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—আমার বৌ আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে আমায় ভালবাসে কি না, মাশা, বুঝছিস, আমার বৌ আমায় ভালবাসে। অথচ দেখ, তাকে আমি কি যন্ত্রণাই না দি।

মাশা। কেন, ফিদিয়া, তার মনে কষ্ট দাও? দুঃখ দাও? আহা, একটুও দয়া হয় না তোমার?

ফিদিয়া। না মাশা, আমার প্রাণে কি দয়া আছে! এই দেখ, আমার বুকে হাত দিয়ে। (মাশার হাত টানিয়া আপনার বক্ষে রাখিল।) কি দেখলি? একেবারে পাষাণ!

মাশা। তুমি তাকে ভালবাস না তবে, বঝি—? তোমার বৌকে?

ফিদিয়া। তাই ত রে মাশা, তোর যে বেশ কথা ফুটেছে। তোর কি মনে হয়, বল দেখি!

মাশা। বলব?

ফিদিয়া। থাক্‌গে। তার চেয়ে আমায় একটা চুমো দে তুই—প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে তাতে। এখন গা মাশা, সেই গানটা, "ধানের ক্ষেতে ঢেউ লেগেছে—"

মাশা গাহিল।

ফিদিয়া। (চক্ষু মুদিয়া) আঃ, কি সুন্দর গান, মাশা! চমৎকার! এই গান শুনতে শুনতেই যেন আমার চোখ জড়িয়ে আসে! এমনি করে এই গানের সুরের মধ্যে ঝরে যদি মরতে পেতুম,—আর না জাগতে হত!......

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (ফাল্গুন)।

আমেরিকার চিঠি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ রবিবার। গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়ীগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে "আধ আঁচরে বস।" মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধূলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রাস্তার দুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মত এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাখীরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শুনা যায় না। বন্যা আসে বৃষ্টির শব্দে ডাল পালার মর্ম্মরে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবন্দনাধ্বনিঃ,—কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতে ছিলাম আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে, সংবাদ লইয়া কোনো দূত আসে নাই, সে কাহারো ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতেছেন। তাহার ঘর্ঘরনিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কশাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইঁহার শাদা পাখা মেলিয়া দিয়া, অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি, কোথাও তাহার সংঘাত নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগল্‌ভ দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় সুসম্বৃত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুভ্রতার নির্ম্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেল, আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্ম্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়োনা। তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুভ্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিয়া দাও।

অন্ধকার প্রভাতের এত অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড় শীত বড় কঠিন এই স্নান নিজেকে যে একেবারে শিশুর মত নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না—ঊর্দ্ধে শুভ্র অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র শিব এব কেবলম্—সমস্ত দেহ মনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।

বার্দ্ধক্যের কান্তি যে কি মহৎ, কি গভীর সুন্দর আমি তাহা দেখিতেছি। যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া

লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু এ ত মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শূন্যতা তো আলোকের মত সাদা নয় সে যে অমাবস্যার মত অন্ধকারময়। সূর্য্যের শুভ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তাহাকে ত বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তব্ধতার অন্তর্নিগূঢ় সঙ্গীত আমার চিত্তকে অন্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই, সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্য্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঁকার মন্ত্রটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্ত পুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায় তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; যতদূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভ পরিণয় আসিল, আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের পুণ্য আলোকে তাহার বার্ত্তা লিখিত আছে, এই তপস্যার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সঙ্গীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি, বিশ্বচক্ষুর অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্যাকে বরণ কর, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও, শুভ্র শান্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্ম্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এজীবনের সমস্ত আবর্জ্জনা একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক; তাহার পরে এই তপস্যার শুভ্র আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগদিগন্তর আনন্দ-কলসীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব।

ধর্ম্ম ও স্বাজাত্য—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রাচীনকালে সকল বড় ধর্ম্মশাস্ত্রকেই অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে। যেসকল মহাপুরুষ এই শাস্ত্রবাণীগুলিকে মনুষ্যলোককে দান করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ ভগবৎপ্রেরণার বলেই যে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রাচীনকালের ধর্ম্মের মধ্যে ইহা একটি নিগূঢ় বিশ্বাস। বহুকাল পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মেই এই অতিপ্রাকৃত- বা অপৌরুষেয়-বাদ চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার ফলে অতিপ্রাকৃত ও প্রাকৃতের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এ যুগে বিজ্ঞান সমস্ত জড়জগতের ন্যায় মানসজগৎকে এবং অধ্যাত্ম জগৎকেও অভিব্যক্তির লীলাক্ষেত্ররূপে দেখিতেছে, মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে যে একটি ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা বিদ্যমান এই আভাস লাভ করিয়াছে।

ধর্ম্মকে এরূপ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা আলোচনা করিয়া দেখিতে আমাদের দেশের অনেক লোক ভয় পান—তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি সংস্কার বলিয়া হর্বার্ট স্পেনসার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সংস্কার দুটি তাঁহার মতে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিবার কালে তথ্য-নির্দ্ধারণে ব্যাঘাত জন্মায় এবং কোন সাধারণ নিয়মে উপনীত হইতে দেয় না। একটি স্বাদেশিকতার সংস্কার, অন্যটি ধর্ম্মমতের গোঁড়ামির সংস্কার। প্রথমটি সত্যকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবার পক্ষে অন্তরায়; দ্বিতীয়টি মত-বিশেষকে সকল মানুষ সকল অবস্থা ও সকল কালের পক্ষে সমান উপযোগী বলিয়া মনে করে, মতের মূল্য যে আপেক্ষিকমাত্র একথা ভুলিয়া যায়। যাঁহারা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মকে আলোচনা করিতে চাহেন না, তাঁহারা ঐ দুই সংস্কারের অত্যন্ত অধীন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে নিজের ধর্ম্মকে তুলনা করিয়া কোন্‌টা ধর্ম্মের নিত্য দিক্ কোন্‌টা সাময়িক দিক্ তাহা তাঁহারা স্থির করিতে চান্ না। আগে তথ্যসংগ্রহ, তারপর তুলনা, তারপর বৈজ্ঞানিক প্রণালী খাটাইয়া নিয়মানুসন্ধান, এভাবে তাঁহারা ধর্ম্মকে না আলোচনা করিয়া নিজের দেশকেই একান্ত করিয়া জানেন এবং নিজের ধর্ম্মমতকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকেন।

তথাপি কেহ যদি বলেন যে এরূপভাবে তুলনা করিয়া ইতিহাস মিলাইয়া সত্য যাচাই করিবার দরকার কি, তবে না হয় তিনি নিজের দেশের ধর্ম্মের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখুন—তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে অস্বীকার করেন না অথচ পৌরাণিক দেবদেবীতেও তাঁহার আস্থা আছে, ইহার মধ্যে কি কোন অসামঞ্জস্য নাই এবং তাহার কোন কারণ নাই? তাঁহার আপন দেশের ধর্ম্মের এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা ইতিহাসের দিক্ হইতে কি আলোচনা করিতে হইবে না? ধর্ম্মের সঙ্গে স্বাজাত্যের (nationality) যোগ কোথায় ইহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাজাত্য বস্তুটি ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ, তাহাকে একটা ভাবুকতা মাত্র মনে করিলে ভুল হইবে। তাহাকে ভাল করিয়া বুঝা এবং ধর্ম্মকে ভাল করিয়া বুঝা একই প্রণালীর উপর নির্ভর করে; সুতরাং সেই প্রণালীকেই গোড়ায় অস্বীকার করিলে উভয়ের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। স্বাজাত্যের ভাবটির ক্রমবিকাশ সম্যক উপলব্ধ হইলে দেখা যাইবে যে ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ধারা তাহার সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—ভারতবর্ষে একে অপরের বিকাশের সাহায্য করিয়াছে। অতএব স্বাজাত্য বস্তুটি ভারতবর্ষে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

ইণ্ডিয়া একটা ভৌগোলিক নাম, সিন্ধুদেশকে গ্রীকরা ইণ্ডাস বলিত বলিয়া। ভারতবর্ষে নেশন আছে এ কথা বলিতে অনেক ইউরোপীয়ের আপত্তি হয়। ভারতবর্ষে জাতিবৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহারা এক কলেবর-বদ্ধ বিরাট নেশনরূপ ধারণ করে নাই, ইহাই তাঁহারা মনে করেন। বৌদ্ধ-যুগের অবসানকালে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্ম্মবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান জাগিয়াছিল, তখন প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘাত যেরূপ সুতীব্র হইয়াছিল, তাহার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসও সেইরূপই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। 'ভারতবর্ষ' এই নাম ভৌগোলিক নাম নয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'মহাভারত', বহু যুগের বিচিত্র লোককাহিনী ও ইতিহাস স্তরে স্তরে এই গ্রন্থে আবদ্ধ হইয়াছে, এমনকি দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় যে অপূর্ব্ব গ্রন্থে ঘটিয়াছে সেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'ভারত' যদি বিশেষ ভাবে স্বাজাত্যের সংজ্ঞারূপে অনুভূত না হইত, তবে যে গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে তাহার পরিচয় বহন করিয়াছে তাহার নাম 'মহাভারত' হইত না। ব্যাস শব্দের অর্থ পরিমাণ, বেদ অর্থে জ্ঞান—যিনি দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে পরিমাণ করিয়াছেন, একত্র করিয়াছেন তিনি বেদব্যাস—মহাভারতকে তাই পঞ্চমবেদ বলে। মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে তর্ক আছে, তবে যে যুগে ভারত আপনাকে প্রাচীনের সঙ্গে সঙ্গত করিয়াছে সেই সময়ে এগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে মনে করিলে ইহার গৌরব রক্ষা হয়। তবে সে কথা ঐতিহাসিকের বিচার্য্য।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে যে জ্ঞানের বা সাধনার একটা ধারাবাহিকতা থাকিলে এবং তাহার বোধ থাকিলেই কি নেশন হয়? ইউরোপে তো প্রাচীন গ্রীস রোম হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর একটি জ্ঞানের ও

সাধনার প্রবাহ বহিয়া আসিয়াছে, সুতরাং সেদিক দিয়া সমস্ত ইউরোপের ইতিহাস এক ইতিহাস। অথচ রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সেখানে স্বতন্ত্র কেন? স্বারাজ্য না হইলে কি নেশন হয়? সে কথা সত্য বটে, কিন্তু প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের একটা অঙ্গাঙ্গীযোগ বোধ ও সেই বোধ হেতু এক দেশের লোকের মধ্যে একটা ঐক্যানুভূতি যদি কোন নাম পাইবার অধিকারী হয় —নেশন বল আর নাই বল,—তবে ভারতবর্ষের সে অধিকার আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্ব্বগুলি এক বড় পরিণামের সূত্রে গাথা। ভারতবর্ষ বলিতে একটা বিশেষ আইডিয়া বুঝায় যাহা ইউরোপের বা আর কাহারও নয়। আর সেই আইডিয়াটি কি তাহাই তো আমাদের দেশের আধুনিক মনীষিগণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতবৈষম্য যতই থাকুক, একথা তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে বলিয়াছেন যে ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনার অভিব্যক্তির ইতিহাসই সমস্ত ভারতের ইতিহাস। সেই জন্যই তো ধর্ম্মকে অতিপ্রাকৃত রাজ্যে ঠেলিয়া রাখা যায় না বলিয়াছি, কারণ স্বাজাত্য-বোধের ভিত্তিই যে ধর্ম্মেরই উপর। ধর্ম্ম এক বিরাট কলেবরের প্রাণরূপী, আর সেই যে তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত সকল কালের বিভিন্ন প্রয়াসমালা এক কলেবর-প্রাপ্ত, তাহাতেই ভারতবর্ষের ভারতবর্ষীয়ত্ব বা নেশনত্ব বা যাই নাম দাও। সুতরাং ধর্ম্মকে সমস্ত ইতিহাসের মাঝখানে সজীব সক্রিয় শক্তি-রূপে অনুভব না করিলে স্বাজাত্য বোধ দাঁড়াইবে কিসের উপর? সেইজন্য ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনার আবশ্যকতার কথা পাড়িয়াছি।

অবশ্য ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনার বিপদ কোথায় তাহা পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্মদৌর্ব্বল্যের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্ম যে পরিমাণে বিজ্ঞান হয় সেই পরিমাণে ধর্ম্মত্ব হারাইতে বসে। ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হয়। মানুষের মনে প্রাচীন সংস্কারের পরিবর্ত্তে নূতন ভাব হঠাৎ প্রকৃতির গভীর মূল পর্য্যন্ত যায় না,—সে বুদ্ধিতে মানিয়া-লওয়া জিনিস হয়, তাহাতে হৃদয় সায় দেয় না। ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব বাঁচাইতে গেলে তাহার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইলে চলে না, তাহার মধ্যে এমন একটি নিত্যতার আদর্শ থাকা চাই যাহা ক্রমাগত কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। তা ছাড়া ধর্ম্মকে সমস্ত জীবনের অন্তরস্থিত শক্তিরূপে দেখিতে গেলে খণ্ডতা সমগ্রতার স্থান জুড়িয়া বসে,—উইলিয়ম্ জেম্সের ভাষায় বলিতে গেলে তখন ঈশ্বর তাঁহার ভূমারূপ ত্যাগ করিয়া ব্যবহারগত pragmatic সম্বন্ধেই ধরা দেন। আধুনিক ইউরোপে এই কাণ্ডটিই ঘটিয়াছে, তাহা সত্যকে আর দেশকালের বাধা ছাড়াইয়া অনন্তের মধ্যে দেখিতে পাইতেছে না। ঘুরিয়া ফিরিয়া ইউরোপ কেবলি স্থানকালের পরিবর্ত্তমান প্রবাহের মধ্যেই ওঠা নামা করিতেছে, সকল গতির মধ্যে যে স্থিতি আছেন এবং স্থিতি আবার যে নিয়ত গতির মধ্যে আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছেন এ ভাবটিকে ইউরোপীয় ধ্যানী কোথাও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

সেইজন্য বলিতেছি ধর্ম্মকে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক দিক্ হইতে আলোচনা করিতে গেলে ভারতবর্ষীয় মানুষকে ইতিহাসকে একটি বড়দিক্ হইতে দেখিতে হইবে। ইতিহাসের মধ্যে একটি নিত্য ও চিরন্তন আদর্শ যে বিদ্যমান থাকিয়া খণ্ডকালের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশমান করিতেছে একথা ভারতবর্ষের লোকেরই বলা উচিত। ইতিহাসকে চিরন্তন একটি অভিপ্রায়ের ক্রমবিকাশরূপে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক খণ্ড কালে প্রত্যেক খণ্ড অবস্থায় এমন কি কিছুই নাই যাহা স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যায় না, যাহা কালকে ও অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া নিত্যতার মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়? ইতিহাসকে এমন করিয়া দেখিলে একথা কি বলিতে পারি যে সত্য একেবারে কোন্ এক যুগে স্থির হইয়া চুকিয়া গিয়াছে?—এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শাস্ত্রবাক্য ও চিরাগত প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি—এই প্রাণহীনতাকেই আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতে পারি?—পক্ষান্তরে এমন কথাও কি বলিতে পারি যে অনন্ত কি চিরন্তন কোথাও নাই—আছে কেবল বৈচিত্র্যপরম্পরা কালের পরিবর্ত্তনমালা? না—আমাদিগকেই এই কথা বলিতে হইবে যে এক অভিপ্রায় এক নিয়ম এক সত্য আপনাকে যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে নানার মধ্য দিয়া ক্রমাগত লইয়া চলিয়াছেন, কোন যুগ কোন এক জাতিই তাহাকে তাহার সমগ্রতায় জানে না, যদিচ সমগ্রতার আভাস তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজিত।

কিন্তু যখন আমরা বলি যে ধর্ম্মকে স্বাজাত্যের ভিতর দিয়া পাইতে হইবে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, তখন কথা ওঠে যে ধর্ম্ম দেশকালের অতীত সার্ব্বভৌমিক পদার্থ—সুতরাং তাহাকে এক জাতির ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারার মধ্যে মিলাইতে যাওয়া কি সঙ্গত হয়? ধর্ম্মবোধকে সঙ্কীর্ণ করি কি করিয়া?

ধর্ম্ম যেমন দেশকালের অতীত তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ। ধর্ম্ম যদি বিশেষ কোন জাতির ঐতিহাসিক ধারাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ না পান্ তবে ধর্ম্ম আছে মাত্র একথার কোন সার্থকতা থাকে কি? সে দেহবিচ্ছিন্ন দেহীর মত। অথচ ঐতিহাসিক ধারার ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে দেখিতে গেলে পাছে তাহাকে খণ্ডকালের মধ্যে অবসিত করিয়া বসি, পাছে তাহার নিত্য দিকটি চাপা পড়িয়া যায় এইজন্য বলিলাম যে ইতিহাসকে ঘটনার জড়সমষ্টি করিয়া দেখা ভুল, তাহাকে একটি নিত্য ও চিরন্তন অভিপ্রায়ের ক্রমবিকাশরূপে দেখাই সঙ্গত। বর্ত্তমানকালে আমরা এই সত্যটিকেই অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছি—আমরা মনে করিয়াছি ধর্ম্ম বুঝি জোড়াতাড়ার ব্যাপার—সে বুঝি নানা বাগান হইতে অবচিত পুষ্পের একটি তোড়ার মত। সে যে জীবন্ত জিনিস—সকল জীবনের সঙ্গে যে তাহার অঙ্গাঙ্গীযোগ একথা না উপলব্ধি করিয়া আমরা তাহাকে দেশকালের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন আকাশকুসুম করিয়া তুলিয়াছি। একথা মনে করা ভুল যে তবে বুঝি অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ জিনিস নিজের দেশের অন্তর্গত করা চলে না। কিন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিতে হইবে, নিজের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। রামমোহন রায় ধর্ম্মকে কত বড় বিশ্বমানবক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেখিয়াও কোনদিন তাহার দেশীয় স্বরূপটিকে বিস্মৃত হন্ নাই। তিনি নিজ দেশীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সেই অতলমূলে পৌঁছিয়াছিলেন যেখান হইতে কত শাখা প্রশাখা কতদিকেই বাহু বিস্তার করিয়া দিয়াছে—অথচ এইসকল ভিন্নতা ভিন্নপর্য্যা হওয়া সত্ত্বেও মূলত এক—ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন বাধাই তাঁহার হয় নাই। রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক দিক্ ও দেশীয় দিক্ উভয়কে সম্মিলিতরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি উপনিষদের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের পরিপুষ্টি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া সেই কালের যে সকল সাময়িক মত ও সংস্কার নিত্য কালের মধ্যে স্থান পাইবার মতো নয় তাহাদিগকেও মাথায় তুলিয়া আপনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই।

সার্ব্বভৌমিকতা আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু দেশের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়াই সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্ম স্বরূপতঃ সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু দেশের ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া ধর্ম্ম ক্রমাগতই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। একদল তাহাকে দেশকাল হইতে ছাড়াইয়া অত্যন্ত জীবনহীন মত মাত্র করিয়া দেখিবে, অন্য দল কিছুমাত্র

সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া নিত্যে ও অনিত্যে তাল পাকাইয়া তাহাকে পাথা-ভারের মত করিয়া তুলিবে।

আর্য্যাবর্ত্ত (অগ্রহায়ণ)।

পুরাতন-প্রসঙ্গ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত—

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দানের কথার উত্থাপন করাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "আমার মত তারককে যাহারা বিশেষ ভাবে জানে, তাহারা তারকের এই দানে বিস্মিত হইবে না।

"আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স সেই সময় হইতেই তারকের সহিত আমার বন্ধুত্ব। আমরা প্রায় সমবয়সী। আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই তারকের প্রতি আমার একটু বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের অকুতোভয়তা, অল্পবয়সে ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ দখল, এই সব কারণে আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যই বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতাম, অল্পবয়স হইতেই কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতাম। বিদ্যাসাগর কখনও কখনও লাইব্রেরীতে আসিয়া হাসিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমার দাদাকে তিনি চারি খণ্ড folio মহাভারত পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত মহাভারতের সমস্ত খণ্ডগুলি আমি দশ এগার বৎসর বয়সের মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চায় রত থাকিয়া ইংরাজীতে পারিপাট্য লাভ করিবার অবসর তখন হয় নাই; সেই অল্পবয়সে তারক, যেরূপ ইংরাজী কহিতে পারিতেন, সেরূপ পারিপাট্য আর কাহারও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল।

"সে আজ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। সেই সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও আমাদের উভয়ের মনোমালিন্য জন্মে নাই।

"তারকের মত বিমলবুদ্ধি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। অল্পবয়স হইতেই তাহার ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল।

"ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারকের নিকট আমি যে কত জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না; তারকের ইংরাজী গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি যেরূপ মিষ্ট লাগিত আমার কাছে আর কাহারও আবৃত্তি কখনও সেরূপ মিষ্ট লাগে নাই। ইংরাজী গদ্যপদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এক প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative, চীৎকার, হাত পা নাড়া ইত্যাদি। আর এক প্রকার আবৃত্তি তরঙ্গবিহীন, একঘেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়েরই বহির্ভূত; ঠিক বুঝাইতে গেলে বোধ হয় তাহাকে serene বলা যাইতে পারে।

"তাঁহার বিমলবুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, Reason নামে আমাদিগের যে একটা attribute আছে উহার বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা, এই বৃত্তি তারকের যে প্রকার বলবতী দেখিয়াছি এরূপ আর আমি কাহারও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, Sentiment বা Impulse তাঁহার স্বভাবে কিছুমাত্র নাই। এতকালের সংসর্গের দ্বারা আমি ভালরূপই জানি, তাঁহার মধ্যে Sentiment কত প্রবল। এক দিনের কথা মনে পড়ে। চা-বাগানের এক 'সাহেব' একজন কুলিরমণীর প্রতি এরূপ পাশব বল-প্রয়োগ করে যে, উহাতে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। সে সময়ে সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমার কাছে ঐ কথা বলিতে বলিতে তারকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। তাঁহার মেজাজ কিছু গরম, তিনি অল্পেই চটিয়া উঠেন। সেরূপ মেজাজ গরম না হইলে বোধ হয় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট সমধিক সম্মানিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধেও আরও অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বভাবের দোষই বল আর গুণই বল, কোনরূপ অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারেন না; অন্যায় ছোটই হউক আর বড়ই হউক, দেখিলেই তিনি আগুন হইয়া উঠেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকেরা হয় ত অনেক সময়ে মনের ভাব চাপিয়া যায়; তারক সেইটি আদৌ পারেন না।

"তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি; এ দান তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব। বন্ধুবান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ দায়ে পড়িলে, পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা একবারে দান করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন।

"বদান্যতা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুক্রমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতার একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান তারকেশ্বরের নিকট অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন You are the architect of many a man's fortune in town। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার প্রধান বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, ঐ বাটী ৺কালীকিঙ্কর পালিত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালীকিঙ্কর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

"তারকের যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই স্বোপার্জ্জিত এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। এত পরিশ্রমের ধন অম্লানবদনে অকাতরে দান করা অসামান্য মহানুভবতাসূচক এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।

"কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তারক যে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা প্রথমেই ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথম উদ্যমে একবার মুৎসুদ্দিগিরির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার কিছু টাকা লোকসান হইল। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে স্যর মর্ডণ্ট ওয়েল্‌স্ নামক দুর্দ্ধর্ষ জজের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তারকের অকুতোভয়তা, ইংরাজী বলিবার পারিপাট্য, straightforwardness ইত্যাদি দর্শন করিয়া জজ এরূপ impressed হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রায়ের মধ্যে এই বাক্যটি তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, Here is a young man fresh from college who straightforwardly answers questions put to him, ইঁহাকে বিশ্বাস না করিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব? ইহার পর তাহার ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার বাসনা উপস্থিত হয়। তিন চার বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, কার্য্যাভিনিবেশ, অনন্যমনস্কতা ও অক্লিষ্ট পরিশ্রমের গুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালাভাষার একজন লেখক হইবেন এ প্রকার প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত 'ভ্রমভঞ্জিনী' নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। তদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে কিছুদিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম--"আপনার নিকট হইতে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তিনি বলিলেন--

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এক উচ্চবংশের কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী এই নামটা কোন এক সময়ে বোধ হয় Prime Minister এই প্রকার এক উন্নত রাজপুরুষকে বুঝাইত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে মাঘ কবি আত্মপরিচয় প্রদানকালে এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন।

"প্রসন্ন বাবু বসু বংশজ ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা-বিশেষের রাজ্যে ঐ পদ পাইয়াছিলেন, তদবধি তাঁহাদের বংশে নামটা স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে।

"প্রসন্ন বাবুর জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ গ্রামটি হুগলি জিলার অন্তর্গত। প্রসন্ন বাবুদিগের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল বোধ হয়, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় থাকিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে টাকাকড়ির অভাবে তাঁহাকে অনেক সময়ে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, এমন কি রাত্রিতে পাঠ করিবার জন্য প্রদীপের তৈল পর্য্যন্ত জুটিত না। তিনি রাস্তার লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া পাঠ্য গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন চারি বৎসর চল্লিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকবার সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর এই তিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত; সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা কম সুখ্যাতির কথা নহে। তখন যেসকল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত সেগুলি বাৎসরিক রিপোর্টে ছাপাইয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণের গোচর করাইয়া দিতেন। প্রসন্ন বাবুর একটি উত্তর আমি রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম। তিনি ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ যশস্বী ছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার অল্প অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা পাটিগণিত ও বীজগণিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালা পাটিগণিত প্রসন্ন বাবুর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। যখন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালার মফস্বল-প্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতির জন্য ইনস্পেক্টর, ডেপুটি ইনস্পেক্টর প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিস্তর নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন,--আন্দাজ ১৮৫৪, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ,--সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে ইংরাজী ধরণের কতকগুলি নূতন গ্রন্থ শিশুদিগের পাঠোপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। পাটিগণিত রচনা করিবার ভার প্রসন্ন বাবু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষণে বাঙ্গালা পাটিগণিত শাস্ত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার পরের সমস্ত পাটিগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সাহায্য না পাইলে অদ্যাবধি কেহ সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ চলন নাই; কারণ, বোধ হয় সে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত। এবং আমাদিগের দেশে সকল কার্য্যই সুপারিশের দ্বারা চলে, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাহা সাহায্য লইয়াই তাঁহার গ্রন্থকে পদচ্যুত করিয়াছে।

বাঙ্গালা পাটিগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া প্রসন্ন বাবুকে সকলে জানেন। তিনি দুই খণ্ড বহুবিস্তৃত বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু থাকিলে, গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধে ভাষা প্রতিষ্ঠা বিলক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিত।"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন। আমি বলিলাম "আপনার মুখে পূর্বে শুনিয়াছি যে, পাটিগণিত রচনা করিবার সময় প্রসন্ন বাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটিগণিত ও বীজগণিতের পরিভাষা সম্বন্ধে ঋণী ছিলেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লীলাবতী' প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না। তিনি নূতন ধরণে ইংরাজী প্রণালীতে অধ্যাপনার পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে 'লীলাবতী' প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট 'লীলাবতী' পড়ি; বিদ্যাসাগর ইঁহাকে পরে মুন্সেফ করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'লীলাবতী' পড়েন কলেজের এক খোট্টা পণ্ডিতের কাছে, তাঁহার নাম পণ্ডিত যোগধ্যান। পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত একজন না একজন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিদ্যাসাগর জয়নারায়ণের ছাত্র। শুনিয়াছি তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিন জন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাঁহাদিগের নাম একটি শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছিল।

কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দসূরেঃ
নাথুরামো প্রাপ্য বর্জ্জেপ্যনল্পং।
যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনায়॥

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম মল্লিনাথ প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণ কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কল কব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।"

এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের Moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না; পয়সার লোভে সৎপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এ গুণটা সাধারণতঃ আছে। তবে ছোট পণ্ডিতরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না, ঘুষ লইত।

মানসী—(ফাল্গুন)

কোজাগর-লক্ষ্মী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—

শঙ্খধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে'
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে?

ক্ষীরোদসাগর ছেঁচা চাঁদের টীপটি দেখি ললাটপুটে,
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটীর দ্বারে,
জ্যোৎস্না তরী বেয়ে এসে মুক্তাধবল ধরার পারে ?

কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তার মূর্ত্তি নাহি ?
সে বলে সে নয়ন মেলে' আজকে রাতে দেখুক চাহি' !
দেখুক এসে অবিশ্বাসী আমার মায়ের রূপটি কিবা,
চরণে তাঁর লুটায় কিনা লক্ষ চাঁদের রৌপ্য বিভা !
কোজাগরের লক্ষ্মী হের এলেন আজি মূর্ত্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্যবতি ;
গাঁথ মালা শুভ্র ফুলে সাজাও ডালা লাজের রাশে,
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুভ্র শাঁসে,
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর—
শঙ্খপরা গৌরহাতে ঘৃতের দীপটি তুলে' ধর,
আঁখিপরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল ধুয়ে—
শুভ্র পাদে শুভ্র বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।

প্রণাম কর ঐ দেখ হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে'
মায়ের আশিস কিরণ ধারা মাথার পরে পড়্‌ছে ঝরে'
চন্দ্রমনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্ত্তিখানি—
দেখরে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরাণী।

পুস্তক-পরিচয়

The Life and Work of Romesh Chander Dutt—by J. N. Gupta, M.A., I. C. S. (J. M. Dent and Sons Ltd., Aldine House, Bedford Street, London, W. C.). *2s. 6d.* net. With an introduction by His Highness the Maharaja of Baroda. Four Photogravure plates and ten other illustrations.

যে কৃতী পুরুষ তাঁহার বিদ্যাবত্তা, ক্ষমতা ধীরতা, নিপুণতা প্রভৃতি সদ্গুণে রাজদরবারে ও গণসাধারণের নিকট তুল্য সমাদর লাভ করিয়া সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন ইহা সেই স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত, তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। লেখক একে নিকট আত্মীয় তাহাতে আবার সরকারী কর্ম্মচারী—সুতরাং তাঁহার পক্ষে সকল কথা নিজে হইতে বলা সুবিধাজনক হইত না, এজন্য তিনি পরম নিপুণতার সহিত দত্তমহাশয়ের নিজেরই রচনা, বক্তৃতা, চিঠিপত্র প্রভৃতি হইতে বিবিধ বিষয়ক অংশ এমন ভাবে উদ্ধৃত করিয়া পারম্পর্য্য ও বিষয়ানুক্রমে সাজাইয়াছেন যে তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবনচরিত গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দত্ত মহাশয়ের রাষ্ট্রীয় সাহিত্যিক পারিবারিক প্রভৃতি বিভিন্ন জীবনপর্য্যায় পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। দত্ত মহাশয় নির্ভীক ও সমদর্শী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন ; ভারতের অতীত গৌরবান্বিত ইতিহাস ও বর্ত্তমান দুরবস্থার তুল্য অনুসন্ধিৎসু পর্য্যবেক্ষক ও জ্ঞাতা ছিলেন ; স্বদেশের সাহিত্যের উপাসক ছিলেন।—তাঁহার জীবনের এই সমস্ত বিভাগই এই গ্রন্থে পরিষ্কার ফুটিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ফুটিয়াছে আসল মানুষটির অন্তরঙ্গ ভাবটি যাহা শুধু আত্মীয় বন্ধুর গণ্ডির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

দত্ত মহাশয় দেশের শ্রেষ্ঠতম অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত গুণে ভূষিত হইয়াও বঙ্গের ছোটলাট হওয়া দূরের কথা থাক কমিশনর হইতেও পারেন নাই। তাহাতে দেশের লোকের মনে হইয়াছিল যে তিনি এদেশী বলিয়া গভর্মেণ্ট তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু গভর্মেণ্টের নির্ভীক সমালোচক দত্ত মহাশয় পারিবারিক চিঠিতে লিখিতেছেন—I think the "INDIAN MIRROR" is mistaken in thinking that Government intended to pass me over. দেশের লোক কিন্তু একথায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি রাজকার্য্য করিতেন নির্লিপ্তভাবে, সেই জন্য চাকরীর উন্নতি অবনতিতে তাঁহার কিছু আসিয়া যাইত না, তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত সাহিত্য ও দেশের সেবায়—An official career had always been his second love only ; other ambitions, literary and national, had always exercised a far stronger attraction over him.

তিনি নিজে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন ;—Lakshmi and Saraswati are always jealous of each other ; and in my case Lakshmi is chary of her favours, because, I suppose, she has a shrewd suspicion that I mean to serve Saraswati in the end ! * * I am the Amatya here (Baroda) * * but I feel I am proving false to my higher pursuits, false to my destiny ! ....I am longing to return from Baroda to the larger world of literature and political world.

তিনি সমাজের ক্ষুদ্রতা বা অত্যাচারের নিকট কখনো মাথা নত করিতেন না ; কিন্তু সমাজের আদেশ যখন পিতামাতার মুখে প্রচারিত হইত তখন তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। জীবনীলেখক গুপ্ত মহাশয় বিলাত হইতে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপার লইয়া তাঁহার পিতার সহিত যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল সেই উপলক্ষে লিখিত একখানি চিঠিতে দত্ত মহাশয়ের সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় মত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। (p. 189.)

তিনি আত্মীয়দিগকে যেসব চিঠি লিখিতেন তাহা একদিকে যেমন উচ্চভাবে ও বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ অপরদিকে তেমনি সরস। তিনি জামাতাকে লিখিতেছেন—There is no peace in life without some competence—as we are all finding to our cost.

সাহিত্যিক কর্ম্মপটুতার নিদর্শন তাঁহার পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রানুবাদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইংরেজি বাংলা নভেল রচনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ও আধুনিকতম সাহিত্য পর্য্যন্ত আলোচনা একই সঙ্গে চলিয়াছে এবং জ্ঞানের আস্বাদ নিজে পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, পুত্র কন্যা জামাতা যে যেখানে আত্মীয় আছেন তাঁহারা কে কি পড়িতেছেন লিখিতেছেন তাহার সংবাদ লওয়া এবং কোন পথে কি পড়া উচিত তাহার উপদেশ দেওয়া সকল চিঠিতে আছে।

তিনি নিজের জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখিতেন—(১) Boyhood passed in fresh village scenes, mostly under affectionate care of parents ; (2) a hard and studious scholastic career, culminatic in the success at the Open Competition of 1869 at London ; (3) harder struggle to get settled in life, to choose my sphere and make my mark in the world. এই তিন স্তর সম্বন্ধেই এই জীবনীতে যথেষ্ট পরিচয় আছে। বাংলার পল্লীজীবনের স্মৃতি

কবিত্বে কল্পনায় ভাবে মণ্ডিত হইয়া বহু পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে; ছাত্রাবস্থার একাগ্র সাধনার পরিচয় ভবিষ্যৎ মানুষটার সফলতার সূচনা সুস্পষ্ট জানাইয়া দেয়; এবং শেষ কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যে একটি শান্তির ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা ভারতবর্ষের সুসন্তানের প্রকৃত পরিচয় দেয়। তিনি কেমন দৃঢ়তার সহিত অসাফল্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াই কায়মন-একাগ্রতায় কার্য্য করিতেন তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়। I shall die a happy contented man who did what he could do, and did not make himself unhappy because he could not do more. আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—I have nothing before me but struggle, struggle, struggle! কেমন করিয়া সকল ক্ষেত্রে অদম্য সংগ্রাম করিয়া তিনি দেশকে সেবা করিয়া নিজে বড় হইয়াছিলেন, তাহা পড়িলে আনন্দ হয়, আশা হয়, হৃদয়ে বল পাওয়া যায়।

রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত (p. 262) তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শনের পরিচায়ক। তিনি এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

My "Ancient India" and "Epics" and "Economic History" will remain the most important productions of my rather prolific pen during the maturest period of my life. বাংলা নভেল সম্বন্ধেও তাঁহার আশা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরেও সেগুলি তাঁহার নাম বজায় রাখিতে পারিবে এবং সমাজ সংস্কারেও কিছু সহায়তা করিবে। কিসের দ্বারা তিনি সাহিত্যের অনুরক্ত হইয়াছিলেন তাহার একটি কৌতূহলজনক বিবরণ তাঁহার একটি প্রবন্ধে (p. 383) পাওয়া যায়; এবং তাঁহার জ্ঞান ও পাঠের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—I worked like a horse to have the partition upset. .. My appeals were successful at last.

তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে অকপট প্রশংসা করিতে পারিতেন; গোখলে, সুরেন্দ্র বাবু, নওরোজী প্রভৃতি ভারতমিত্রদিগের সম্বন্ধে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাঠ করিবার জিনিস।

লর্ড মর্লের Reform Scheme সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্টভাষী পত্রগুলি একাধারে ধীরতা নির্ভীকতা এবং দেশহিতৈষিতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিনি লর্ড মর্লেকে লিখিয়াছেন—

If the Indian Girondists fall, a spread of disloyalty and crime will spread over India, and the Government will have before it an endless prospect of fruitless coercion and profitless prosecutions. এই ভবিষ্যৎবাণী যে সত্য হইয়াছিল তাহা আমরা সকলেই জানি।

এইরূপ নির্ভীক মত প্রকাশ সত্ত্বেও তাঁহার "Moderate" বলিয়া অখ্যাতি ছিল। তাই তিনি লর্ড মর্লের "Moderate" ভাবকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন;—A reformer who is moderate is between two fires. He has no friends, as I have learnt to my cost.

শেষ বয়সে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কার্য্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের অধ্যাপনা এবং Encyclopaedia Britannicaতে প্রসিদ্ধ কয়েকজন বাঙ্গালীর বিষয় লেখা। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম মহৎ কীর্ত্তি।

তাঁহার দেশপ্রীতি সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা Modern Review পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দত্তমহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন;—Only to speak for ten minutes on India! I would go into a tiger's cage for that! ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন—The object of all he ever did was not his own fame, but the uplifting of India. He was one who stands amongst the fathers of the future, one who dreamt and worked at great things untiringly yet left behind him before his country's altar no offering so noble, no proof of her greatness so incontrovertible as that one thing of which he never thought at all—his own character and his own love!

এই লোকোত্তর-চরিত স্বদেশ প্রেমিক মহাত্মার জীবনচরিত সকলেরই পাঠ করিয়া দেশ-সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া উচিত। আমাদের পরাধীন দেশের সেবক যত বেশি দরকার এমন আর কোনো দেশের নয়। মহাপুরুষদের জীবনভস্ম হইতে ফিনিক্সের ন্যায় নবীন উদ্যমের জন্মলাভ হইয়া থাকে।

আমার খাতা—

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস ৫৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ফুলস্ক্যাপ ৮ অং ১৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ৺০ আনা।

লেখিকা ঠাকুর-বংশের কন্যা এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন পরম ভক্ত প্রিয়পাত্রের পত্নী। তিনি একখানি খাতায় নিজের জীবন কথা; দুটি একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণস্মৃতি; দুটি একটি গৃহিণীপনার সঙ্কেত এবং কয়েকটি গান; অবসর-সময়ে লিখিয়াছিলেন। তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। গৃহিণীপনার কথা এত সামান্য, ভ্রমণস্মৃতি এত অস্পষ্ট যে ঐগুলি বাদ দিয়া বইখানি ছাপিলেই ভালো হইত। গানগুলি ভগবদ্‌বিষয়ক এবং চলনসই। কিন্তু লেখিকা যেরূপ ভাবে নিজের জীবনস্মৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতি মনোরম হইয়াছে। যেমন ভাষা সরল ও সরস তেমনি বলিবার ভঙ্গি চমৎকার। পড়িতে পড়িতে ফরাসী লেখিকা মার্গারেট ওডুর "মারি ক্লেয়ার" নামক অসাধারণ জীবনস্মৃতির বইখানির কথা স্মরণ হইতেছিল। ইহার বিশেষত্ব এই যে বলার চেয়ে ব্যঞ্জনা হইয়াছে ঢের বেশি। এক একটি ছবি, এক একটি অনুভূতি এত সহজে এমন অল্প কথায় আভাসে প্রকাশ করা হইয়াছে যে তাহার অন্তরালের সৌন্দর্য্য ও গভীরতা মনকে একেবারে অভিভূত মোহিত করিয়া দেয়। লেখিকা কথায় কথায় নিজের জনক-জননীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, নিজেদের বাল্যজীবনের সুখ দুঃখের যে আভাস দিয়াছেন, বাল্যের কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির যে বর্ণনা করিয়াছেন সেকালের যে ছবি দিয়াছেন, তাহা যেমন অনাড়ম্বর তেমনি সুন্দর। আমরা তাঁহার পিতাকে ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও স্থির জ্ঞানতপস্বীরূপে দেখিতে পাই; তাঁহার মাতাকে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে আবির্ভূত হইতে দেখি; এবং লেখিকার ন্যায় শিশুদের সংসার-ব্যাপার না-বোঝার আড়ালে বুঝিতে-পারার এবং বুঝিবার ইচ্ছার যে খেলা দেখি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাই। দুরন্ত ছেলে ও শান্ত মেয়ের পাশাপাশি চিত্র, বাল্যের ঈশ্বরবিশ্বাস, খেলা, দুশ্চিন্তা, পারিপার্শ্বিক দৃশ্য—সব মিলিয়া একটি চমৎকার রোমান্স গড়িয়া উঠিয়াছে। লেখিকার দিদিমার কাল্পনিক খেলাগুলি কবিত্বে নূতনত্বে মণ্ডিত। বাগানের খেলা জগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়ার খেলা মনকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের যোগে আনন্দে ভরিয়া তোলে। কল্পনায় জগন্নাথক্ষেত্রে যাওয়ার খেলা জ্যোৎস্না রাতে হইত "জ্যোৎস্না বারান্দায় আসিয়া পড়িত, সেইটে আমাদের সমুদ্র হইত। কত আনন্দে আমরা সেই সমুদ্রে স্নান করিতাম, ঝিনুক কুড়াইতাম ও প্রসাদ ভোজন করিয়া গৃহে ফিরিতাম।" ধন্য সেই কবি দিদিমা যিনি

জ্যোৎস্না-তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্রের আভাস পাইয়াছিলেন, যিনি নাতনিদের জ্যোৎস্না-সমুদ্রে স্নান করাইয়া "জগন্নাথের" প্রসাদ পাইতে বাল্যকালেই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

লেখিকা বাল্যাবধি কিরূপ দয়াবতী ও শান্তস্বভাব ছিলেন তাহার পরিচয় এমন সহজে প্রকাশ পাইয়াছে যে কোথাও তাহা ন্যাকামি বা অহঙ্কার বলিয়া ঠেকে না। বাল্যাবধি লেখিকা এঁড়েদহে একটি বাগানবাড়ীতে শোভা-সম্পদের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার পিতার সেই বাগানটি বিক্রয় হইয়া যায়, তাহারা এক আত্মীয়ার বিবাহ-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া যাইতে পান নাই। "বিবাহ হইয়া গেলে, আমাদের আত্মীয়গণ পশ্চিমে চলিয়া গেলেন, আমরা সেই বাড়ীতেই রহিলাম। তারপর আমাদের বাগানে ফিরিবার আর কোন আয়োজন না দেখিয়া ভয়ে ভয়ে মার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা কবে যাইব? তখন মা আমাকে কোলে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আমাকে বলিলেন যে আর আমরা সেখানে যাইব না। মার কথা শুনিয়া আমিও মার কোলে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম।" এমনি ভাবে না বলিয়া অনেক বলা হইয়াছে বহু স্থলে। "আমাদের আগে অনেক দাসদাসী ছিল, এখানে আসিবার পর তাহাদের সকলকে ছাড়াইয়া দিয়া কেবল একজন ব্রাহ্মণ, একটি দাসী ও একজন চাকর রাখা হইল। একজন চাকর অনেক দিনের পুরাতন ছিল, সে বিনা বেতনে আমাদের বাড়ীতে রহিল, তাহাকে আমরা দাদাভাই বলিতাম। বাবা মহাশয়ের সেবার জন্য যেসব লোক ছিল তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়া সে ভার মা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।" ইহার পূর্ব্বে লেখিকা মার পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। তাহার এই নীরব সেবার অন্তরালে অনেকখানি করুণরস লেখিকা পাঠকের অজ্ঞাতসারে জমা করিয়া রাখিয়াছেন।

লেখিকার পিতা থিয়োজফিষ্ট ছিলেন; তাঁহার প্রভাবে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস লেখিকার অজ্ঞাতসারে কতদূর ছিল তাহাও কয়েকটি ঘটনায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ব্যাপারগুলি আগাগোড়া মনস্তত্ত্বের ইন্দ্রজালে ভরা।

এইসমস্ত বিবরণের মধ্যে একটি এমন হাস্যরসধারা অলক্ষ্যে প্রবাহিত আছে যে অনেক সময় হাসিকান্না একই মালার দানার মতো গাঁথা হইয়া গেছে। বিবাহের পর মাতার আশীর্ব্বাদ এবং মহর্ষির "নিস্তব্ধ বাড়ী আমাকে বরণ করিয়া লইল," একদিকে যেমন করুণ বা গম্ভীর, ভাজুর ছড়া, পাড়াগাঁয়ে শহরে কনের আবির্ভাব প্রভৃতি তেমনি কৌতুককর। "একটি গ্রামের কাছে যখন পাল্কি যাইতেছিল রৌদ্রান্ত কতকগুলি গ্রাম্য বালক রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল; বাহকদের শব্দে—ঐ বর কনে আসিতেছে—বলিয়া ছুটিয়া আসিল, আমার আপাদ-মস্তক দেখিল, ও আমার পরণের লাল কাপড় দেখিয়া বলিল—এই কনে যাইতেছে; আর একজন আমার পায়ে জুতা দেখিয়া বলিল—ওরে কনে নয়রে, দেখছিস না পায়ে জুতা আছে? ও বর।"

এমনি ছোটখাটো সরস ঘটনায় বইখানি আগাগোড়া ভরা। যদিও এইসমস্ত কাহিনী সুসংলগ্ন ভাবে পরিণত হইয়া উঠে নাই, সমস্তই আবছায়া আবছায়া, তবু ইহা সুন্দর। ছাপা নির্ভুল ও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল।

মুদ্রারাক্ষস।

বস্তুপরিচয় ও ইন্দ্রিয়পরীক্ষা—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা) প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৬৭; মূল্য ৷৵০ আনা।

নূতন শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। শিশুদিগের শিক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন।

সাধনা—

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, (অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ) প্রণীত। পৃঃ ৷৵+১৭১; মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থে এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে—১। বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা, ২। হিন্দু মুসলমান, ৩। নিম্ন জাতির অধিকার, ৪। সমাজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব, ৫। আমাদের কর্ত্তব্য, ৬। নেতৃত্ব, ৭। আধুনিক বঙ্গ সমাজ ও মালদহ, ৮। আমাদের জাতীয় চরিত্র, ৯। ভাবুকতা, ১০। আলোচনা-প্রণালী, ১১। ধর্ম্মের প্রকৃতি—অসীমের উপলব্ধি, ১২। ভাষা-বিজ্ঞান, ১৩। সাহিত্যসেবী, ১৪। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব, ১৫। হিন্দু সাহিত্য প্রচারক। "ধর্ম্মের প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধটী ম্যাকস্‌মুলারের তিনটি বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত। প্রবন্ধ সমুদয় সুলিখিত। গ্রন্থ লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

পাগলের কথা

(গল্প)

লোকে বলে আমি পাগল হইয়াছি, আমার বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে আঘাত লাগিয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে অধিক বিদ্যালাভ করিয়া আমার ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি যে আমার কিছুই হয় নাই, আমার মস্তিষ্ক বেশ সবল এবং সুস্থ আছে। এমন কিছু অধিক বিদ্যালাভ করি নাই বা এমন কিছু অধিক আঘাত লাগে নাই যাহার জন্য আমি উন্মাদ হইয়া যাইব। আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পূর্ব্বে, এখন সে কথা মনে হইলে একটু কষ্ট হয় মাত্র। আমি শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, সাধারণের মতানুসারে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলাম। হাঁ, আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মা এবং বড় বৌদিদিকে আমি বরাবরই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে আমার মনের কোনও বিকার হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল সে অনেকদিন পূর্ব্বে সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি কোনমতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমার শরীর সুস্থ এবং নীরোগ।

আমার এই কাল্পনিক রোগের কারণ সুরেন। সুরেন আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী এবং প্রতিবেশী। বাল্যকাল হইতে আমরা উভয়ের সাথী। আমাদের বন্ধুত্ব গ্রামে উদাহরণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। স্কুলে এবং কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়িয়াছি এবং বরাবরই একসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছি। সুরেন এখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং তাহারই জন্য তাহারই দোষে আমি এখন পাগল। সুরেনকে দেখিলে আমি এখন বড়ই চটিয়া যাই, সেইজন্য সেও আর বড় একটা আমার সহিত দেখা করিতে আসে না। বাড়ীর লোকে বলে যে তাহাকে দেখিলে আমার রোগ আরও বৃদ্ধি হয়, সেইজন্যই সে আর আসে না; মা এবং বড় বৌদিদি এইজন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মেজদার ছোটমেয়ে সুধা আমাকে একদিন বলিয়াছিল যে, সুরেন কাকা কাছারী হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যহ আমার সন্ধান লইয়া যায়। সুরেনকে দেখিলে এমন কি সুরেনের নাম শুনিলে বা মনে করিলে আমার কি মনে হয় জান? কোথা হইতে একটা অমানুষিক শক্তি আসিয়া আমার চোখের সম্মুখ হইতে কলিকাতা, বাসগৃহ, বিদ্যুতালোক এবং বর্ত্তমান সরাইয়া লইয়া যায়। মুহূর্ত্তের জন্য আমি সাত বৎসর পিছাইয়া যাই, দেখিতে পাই কীর্ত্তিনাশা-বক্ষে প্রবল ঝটিকাঘাতে তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য। দেখিতে পাই মাঝিরা পানসী রাখিতে পারিতেছে না, প্রবল বায়ুর সম্মুখে পড়িয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া নৌকা কোন দিকে যাইতেছে তাহা কেহ বলিতে পারিতেছে না। ঝড়ের শ্রবণভেদী শব্দের মধ্য হইতে পরিচিত স্বরে কে যেন বলিতেছে "ভয় নাই" "ভয় নাই"। যখন চড়ায় লাগিয়া নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, নগদ দশ সহস্র মুদ্রা এবং অর্দ্ধ লক্ষের অধিক মূল্যের অলঙ্কার-জড়িত নববধূকে যখন কীর্ত্তিনাশা গ্রাস করিল, তখনও দূর হইতে কে যেন জড়িত স্বরে বলিতেছিল "ভয় নাই" "ভয় নাই"। বস্তুতঃ যখন বিবাহের যৌতুক সমেত আমার নববধূ পদ্মার গর্ভে আশ্রয় পাইতেছিল তখন আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভয়ের উদয় হয় নাই। তখন আমি কি ভাবিতেছিলাম জান? যে আমাকে অভয় দিতেছে সে যেন আমার পরিচিত, সে যেন আমার প্রিয়, সে যেন আমা[য়] অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নৌকা য[খন] ডুবিল তখন পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মুটবিহারী মুখোপাধ্যা[য়] অলঙ্কারের বাক্স এবং সুরেন নববধূকে বাঁচাইব[ার] চেষ্টা করিয়াছিল। কি জানি কেন আমি তখন কাহাকে[ও] বাঁচাইবার চেষ্টা করি নাই, নিজেও বাঁচিবার চে[ষ্টা] করি নাই। যে আমাকে অভয় দিতেছিল, সে ে[যন] ক্রমশঃ নৌকার নিকটে আসিয়া বলিতেছিল "ভয় না[ই]" "ভয় নাই"। নৌকা যখন ডুবিল তখন স্পষ্ট দেখি[তে] পাইলাম, অলঙ্কারের ভারে মুখোপাধ্যায় তলাইয়া গে[ল]। পর্ব্বতপ্রমাণ একটা তরঙ্গ আসিয়া সুরেনের হা[ত] হইতে নববধূকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। তখন আমার হঠা[ৎ] মনে পড়িয়া গেল সে স্বর লীলার। লীলার কণ্ঠস্ব[র] চিনিতে পারি নাই এই ভাবিয়া লজ্জায় ঘৃণায় মর[মে] মরিয়া গেলাম, জীবন-মরণের কথা তখন স্মরণ ছিল না[।] কিন্তু কীর্ত্তিনাশা আমাকে গ্রাস করিল না, কে যে[ন] আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিল, সে ক[র]-স্পর্শ বড় মধুর, আমার চির পরিচিত। একাদশ ব[র্ষ] পূর্ব্বে নব বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে প্রথম সে কর স্প[র্শ] করিয়াছিলাম, এই কথা মনে পড়িয়া গেল। তখ[ন] ঝড়, নৌকা ডুবি, কীর্ত্তিনাশা, জীবন, মরণ, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একটা বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। গ্রীষ্মে সিত পক্ষে লীলার অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া ছাদে শুই[য়া] আছি। লীলা বলিতেছে "দেখ, আমি বোধ হয় আ[র] অধিক দিন বাঁচিব না।" তাহাকে শাস্তি দিবার জ[ন্য] মুষ্টি উত্তোলন করিতেছি, এমন সময় নীচে কে আমাকে ডাকিল। শুনিলাম মা বলিতেছেন "কে, সুরেন এলি[?] মণি ছাদে আছে।" ব্যস্তসমস্ত হইয়া লীলা তাহা[র] অঙ্ক হইতে আমার মস্তক নামাইয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেল[।] আমার নিকটে আসিয়া সুরেন যেন আমায় ডাকিল তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লীলা যতদিন বাঁচিয়া ছি[ল] মাঝে মাঝে এমনই করিয়া সে আমাকে জ্বালাইত।

চাহিয়া দেখিলাম বারিকণাসিক্ত বালুকাসৈকতে শয়ন

করিয়া আছি, সুরেন আসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, আর দূরে আর্দ্র শুভ্র বসন পরিধান করিয়া আমার লীলা আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তখন বুঝিলাম আমি বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে নহি। যে কোন উপায়ে হউক লীলাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। তখন উন্মত্তের ন্যায় "লীলা" "লীলা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ঝড়ের সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া আমার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। লীলা তাহা শুনিতে পাইল, হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সে যেন আমাকে ডাকিল। আমিও "যাই" বলিয়া তাহার দিকে ছুটিলাম, কিন্তু সুরেন আমাকে যাইতে দিল না। অকস্মাৎ কোথা হইতে তাহার দেহে অসুরের বল আসিল, আমি কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলাম না। তাহাকে মিনতি করিয়া পায়ে ধরিয়া, অবশেষে বল প্রয়োগ করিয়া গালি দিয়া প্রহার করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে কহিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না। আমার জন্য লীলা অনেকক্ষণ আর্দ্রবসনে পদ্মা-সৈকতে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ঝড়ের বেগ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, পূর্ব্বদিকে আলোকের ক্ষীণ রেখা দেখা দিল, হতাশ্বাস হইয়া লীলা বলিল "ওগো তুমি আসিবে না। আমি তবে যাই।" বড় করুণস্বরে লীলা কথাগুলি বলিল, তাহার কথায় আমার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আর একবার সুরেনের পায়ে ধরিয়া লীলার কাছে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, সে আমার কথা বিশ্বাস করিল না, হাসিয়া উঠিল, কিন্তু হাসির সহিত তাহার দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। লীলা আবার বলিল "তবে যাই"। ধীরে ধীরে তাহার দেবদুর্লভ মূর্ত্তি পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া গেল, আমি ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া সুরেনের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম, না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। সেই অবধি আমি পাগল, সেই অবধি আমি সুরেনকে দেখিলে চটিয়া যাই, বাল্যবন্ধুর দর্শনে ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হই। কিন্তু ইহার জন্য লোকে আমাকে পাগল বলে কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিলাম রৌদ্র উঠিয়াছে, সুরেন আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে, তাহার সিক্ত বসন রক্তাক্ত শতধা ছিন্ন, সে তাহা গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিয়াছে। উঠিয়া বসিলাম। লীলার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার যাতনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ বিদায়ের কথাগুলি মনে পড়িল, অবশেষে যে কঠিন শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া তাহার শীর্ণ ওষ্ঠ দুটিতে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলাম সে কথা মনে পড়িল, তাহার ক্ষুদ্র জীবন অবসান হইলেও সে যে আমাকে বিস্মৃত হয় নাই, আসন্ন মরণ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া সে যে আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; সহস্র সহস্র বৃশ্চিক যেন আমায় দংশন করিতেছিল, হঠাৎ যেন দিগন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলাম। দেখিলাম কিয়দ্দূরে মুখোপাধ্যায়ের দেহ তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নুটবিহারী পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, সে মরণেও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই, তখনও তাহার প্রাণহীন দেহ অলঙ্কারের বাক্স আকর্ষণ করিয়া ভাসিতেছিল। নুটবিহারী আমাকে বড় ভালবাসিত, শৈশবে আমাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, আমিও তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। একবার ভাবিলাম সে হয় ত বাঁচিয়া আছে, তাহাকে চেতন করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা পারিলাম না। চারিদিক আবার লাল হইয়া উঠিল, আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল, ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম। কোথায় দিয়া কোন দিকে যাইতেছিলাম মনে নাই। অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল, সূর্য্যের তেজ তখন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে লাল চেলী পরিয়া একটি বালিকা শয়ন করিয়া আছে। ভাবিলাম অগ্নিবৎ তপ্ত বালুকা কি তাহার দেহ দগ্ধ করিতেছে না? তাহার নিকটে সরিয়া গেলাম, দেখিলাম সে যেন কাহার নবপরিণীতা বধূ। বহুমূল্য মণিমুক্তাগুলি সুবর্ণের আসনে বসিয়া তাহার দেহের চারিদিক হইতে হাসিয়া উঠিল, আমাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কিসের জন্য তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মৃণাল-কোমল বাহুমূলে মস্তক রক্ষা করিয়া বালিকা ঘুমাইতেছিল, আমি তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম, স্পর্শে বুঝিলাম সে ঘুম ভাঙ্গিবার নহে। আবার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, কীর্ত্তিনাশার শত শত

তরঙ্গ তাহার সীমন্ত হইতে সিন্দুর-লেখা দূর করিতে পারে নাই, কপালের স্থানে স্থানে তখনও চন্দন-রেখা স্পষ্ট রহিয়াছে, সে যে আমার নব-বিবাহিতা, কাল সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধ পিতা যে তাহাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিলাম বুড়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, আর মনে করিতেছে তাহার কন্যা নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুরগৃহে পৌঁছিয়াছে। তাহার বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি দেখিয়া লোকে হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছে। এই কথা ভাবিয়া হাসি পাইল। হঠাৎ দেখিতে দেখিতে চেলীখানা যেন ঘোর লাল হইয়া উঠিল, পদ্মার জল লাল হইয়া উঠিল, শুভ্র বালুকা-সৈকত লাল হইয়া গেল, আকাশ লাল হইয়া উঠিল, জ্ঞানহীন হইয়া আবার ছুটিলাম। অনেকক্ষণ পরে মনে হইল কোথা হইতে শীতল বাতাস আসিয়া আমার কপাল স্পর্শ করিতেছে, আমি ধীরে ধীরে নদীতীরে চলিয়া বেড়াইতেছি, তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিলাম, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ডাকিলাম "লীলা!" ফিরিয়া দেখিলাম ছায়ার ন্যায় সুরেন আমার পশ্চাতে আসিতেছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিলাম তখন হইতেই সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছিলাম যে নিজে না দেখিয়া বিবাহ করিব না। পিতা আমার বিবাহ দিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আমার মত না থাকায় বিবাহ হইয়া উঠে নাই। ক্রমে একে একে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম, বিবাহের বাজারে আমার দর বাড়িল, অনেক কন্যাভারগ্রস্ত আমার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই আমার মন টলিল না। অবশেষে সুরেনই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। কথার ছলে আমার অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া লইয়া আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিল। কলিকাতার মেসে থাকি—কলেজে পড়ি, আত্মীয় স্বজনের অত্যন্ত অভাব, এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুরেন বলিল তিনি তাহার আত্মীয়। পরে শুনিয়াছিলাম সুরেনের বংশে কেহ কখনও তাহার নামও শুনে নাই। আহারের সময় মলিন-বস্ত্র-পরিহিতা একটি বালিকা আসিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়া গেল। মেসে ফিরিয়া সুরেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মেয়েটী কেমন?" আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম "মন্দ নয়।" এক সপ্তাহ পরে শুনিলাম আমার বিবাহ। সুরেন এমন ভাবে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল যে আর আপত্তি করিবার সুবিধা পাইলাম না। বসন্তোৎসবের দিনে মহাসমারোহে লীলাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলাম। বড়ই সুখে বিবাহিত জীবনের তিন বৎসর কাটিয়াছিল, এখনও সে কথা মনে করিলে স্বপ্নের মত বোধ হয়। লীলাকে দেখিলে যূথিবন বলিয়া ভ্রম হইত। ভাবিতাম স্পর্শ করিলেই ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে। যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইল, প্রথম প্রসব বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার যূথিবন সত্য সত্যই ঝরিয়া গেল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল "আমি তোমার কাছে থাকিতে পারিলাম না, তুমি কিন্তু আমায় ভুলিও না।" আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে সে চলিয়া গেল।

এই তিন বৎসরের মধ্যে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইয়াছিলাম, লীলার সহিত আশা ভরসা সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, সুতরাং ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে পুনরায় বিবাহের জন্য প্রস্তাব আসিতে লাগিল, আমার উপর রীতিমত উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পিতার কাতরতা, মাতার অশ্রুজল, ভ্রাতৃবধূগণের সবিনয় অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বিবাহ করিতে স্বীকার করিলাম। যেদিন মাতার নিকট বিবাহ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলাম সেই দিন রাত্রিকালে লীলার শয়নকক্ষে একাকী শুইয়াছিলাম। মহানগরীর কলরব তখন থামিয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের মধ্যভাগে নিশীথে ক্ষীণচন্দ্রালোক দেখা দিয়াছে, গ্রীষ্মকাল, গৃহের দরজা জানালাগুলি খোলা রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া গেল, সেই সময় দূরে কে যেন হা-হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

লীলা চলিয়া যাইবার পরে আমার চিন্তার শেষ ছিল না, নূতন বিবাহের প্রস্তাব হইয়া সে চিন্তা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে সেই সময়ে ঘরের ভিতর কে যেন আবার হা-হা—করিয়া উঠিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিল না, মনে হইল সে ঘরে সে হাসি যেন নূতন নহে, তাহার কণ্ঠস্বর যেন চির-পরিচিত। ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া শুভ্রবসন-পরিহিতা রমণীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, যেন স্পষ্ট দেখিলাম অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। তখন আমি সুপ্ত কি জাগ্রত বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার আকার, চলনের ভঙ্গী সমস্তই আমার পরিচিত, তাহার কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব যেন আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। সে লীলা, আমারই, অপর কেহ নহে। লীলা ঘরে ঢুকিয়া মুখ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল, আমি চিরদিন তাহাকে যেমন ভাবে ডাকিতাম তেমন ভাবেই ডাকিয়াছিলাম কিন্তু সে যে ভাবে আমার নিকট আসিত সে ভাবে যেন আসিল না। সে আসিল বটে কিন্তু দূরে রহিল, ভাবে বুঝাইয়া দিল যে এখন আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে, মিলনের একটা বাধা হইয়াছে, তখন আমার মনে ছিল না যে লীলা আর আমার নাই। রজনীর অধিকাংশ লীলার সহিত কথায় কাটাইয়াছিলাম। যখন জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম অতি সন্তর্পণে শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া আছি। একবার ভাবিলাম স্বপ্নে লীলাকে দেখিয়াছি, আবার ভাবিলাম স্বপ্নের ত সকল কথা মনে থাকে না, কিন্তু গত রাত্রির প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে রহিয়াছে। সে বলিয়া গিয়াছে আমি তাহারই, আর কাহারও নহি, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে আমি তাহারই থাকিব, আর কেহ আমাকে অধিকার করিতে পারিবে না। লীলার কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছিল, তখনও যেন লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া যাইতেছিলাম, সেই আমি অপরের হইতে চলিয়াছি। লীলা বলিয়া গিয়াছে সে ছায়ার মত অনুসরণ করিবে, আমি তাহারই সম্পত্তি থাকিব, সহস্র বার বিবাহ করিলেও তাহার সহিত সম্বন্ধ লোপ হইবে না। আমি ত তাহাকে ভুলিয়াছি কিন্তু মরিয়াও সে আমাকে বিস্মৃত হয় নাই।

তাহার কথা বলিতে গেলে ঐ রকম করিয়া চারিদিক লাল হইয়া আসে, চারিদিক কেন লাল হইয়া যায় বলিতে পারি না, আমার শিরায় শিরায় কেন বিদ্যুত প্রবাহিত হয় তাহা জানি না। সব বুঝিতে পারি, সমস্তই দেখিতে পাই, কিন্তু সময় সময় লালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই না। তবুও বলিতেছি তোমরা যাহা মনে করিয়া থাক তাহা সত্য নহে, আমি কখনও পাগল হই নাই। কি বলিতেছিলাম বিবাহের কথা? নগদ দশ সহস্র রজত খণ্ড ও অর্দ্ধলক্ষাধিক মূল্যের অলঙ্কার-মণ্ডিতা দশম বর্ষীয়া বালিকার পরিবর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলাম। নূতন শ্বশুরালয়ে যাইতে হইলে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে গিয়া লৌহজঙ্গ হইতে নৌকা গ্রহণ করিতে হয়। যাইবার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। অশনি গর্জ্জনের মধ্যে সম্প্রদান কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসরে উল্লসিতা রমণীবৃন্দ যখন আনন্দোৎসবে উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমি যেন কাহার কলহাস্য শুনিতেছিলাম, কে যেন ঘরের চতুষ্পার্শ্বে অন্তরালে থাকিয়া আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল, যেন বলিতেছিল সহস্র সহস্র বিবাহ করিলেও তুমি আমার থাকিবে, অপরের হইতে পারিবে না। বাসর-শয্যায় চন্দন-মালা চর্চ্চিত হইয়া যেন আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম হয়ত লীলা অন্তরাল হইতে আমাদের দেখিতেছে, সে আমার লীলা, কতবার শপথ করিয়া তাহাকে বলিয়াছি যে, ইহপরকালে আমি তাহারই, অপরের নহি।

বর বধূ যখন বিদায় হইল তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। বিলম্ব হইবার ভয়ে স্বরেন নৌকা ছাড়িয়া দিল, যখন ঝড় উঠিল তখন ক্ষুদ্র নৌকা কীর্ত্তিনাশার মধ্যস্থলে। তাহার পর যাহা হইল তাহা বলিয়াছি। পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, মাতার সাধের বধূ, দশ সহস্র অখণ্ড মণ্ডলাকার কীর্ত্তিনাশার চরে রাখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি তাহারই অপরের নহি।

শ্রীকাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্যবাস

ভূমিকা।

জীবনসংগ্রামে জয়লাভের একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্তকে যদি উপন্যাস বলা যায়, তাহা হইলে, "অরণ্যবাস" উপন্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু পাঠকবর্গকে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠে যেরূপ রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থপাঠে তাঁহাদের সেরূপ রসাস্বাদ করিবার আশা বা সম্ভাবনা অল্প। পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে অন্নক্লেশ-পীড়িত একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনসংগ্রামের আড়ম্বরশূন্য বৃত্তান্ত পাঠ করিতে যদি কাহারও কৌতূহল হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে আমি এই উপন্যাসটি পাঠ করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

এই উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ কাল্পনিক হইলেও, উপন্যাসের বিষয়টি কাল্পনিক বা অবাস্তব নহে। ছোটনাগপুরের বহুস্থান স্বচক্ষে দেখিয়া এবং খনিজ ও উদ্ভিজ্জ সম্পদে সেই স্থানসমূহের লোকপালিকা শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, আমি ১৩১২ সালে এই উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হই। নানা কারণে তখন আমি ইহা সমাপ্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে ইহা সমাপ্ত হইল। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যটি কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠক মহাশয়গণ বিচার করিয়া দেখিবেন। ইতি ২৩শে মাঘ। সন ১৩১৯ সাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার কোনও ভদ্রপল্লীতে একটী দ্বিতল বাটী। বাটীটি পুরাতন এবং সংস্কারাভাবে জীর্ণ। বাটীটি দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে গৃহস্বামীর অবস্থা ভাল ছিল। বহির্ব্বাটীতে দুইটী বৈঠকখানা ঘর। দুইটী ঘরের মধ্যস্থলে সদর দ্বার। সেই দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, একটী প্রশস্ত উঠানের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। উঠানের এক দিকে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বৈঠকখানা ঘর; বিপরীত দিকে উচ্চ ঠাকুর-দালান। ঠাকুর-দালানে এখন আর কোনও দেব-দেবীর পূজা হয় না। তাহার বড় বড় থামগুলি হইতে চু বালি খসিয়া পড়িতেছে এবং ছাদ জীর্ণ হইয়াছে। ঠাকুর দালানের এক কোণে কতকগুলি ভাঙ্গা বাক্স, পিপে, আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। বৈঠকখানা ঘর দুইটী সংস্কারাভাবে প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়াছে। আর তাহা কেহ ব্যবহার করে, তাহাও দেখিয়া বোধ হয় না। ঠাকুর দালানের বাম পার্শ্বেই অন্তঃপুর। অন্তঃপুরের উঠা স্বতন্ত্র। বহির্ব্বাটীর সহিত অন্তঃপুরের কোনও সম্প নাই। কেবল গতায়াতের জন্য একটী দ্বার আছে মাত্র।

এই বাটীটি কোনও গন্ধবণিকের। বর্ত্তমান গৃহস্বামী পিতামহ ব্যবসায় দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এ বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় মহাসমারো দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যান। তদীয় পুত্র অর্থা বর্ত্তমান গৃহস্বামীর পিতাও, তাঁহার আমলে দুই চারি বৎস পৈত্রিক উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপ কয়েকবার ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি ঋণজা জড়িত হইয়া পড়েন এবং বাটীখানি উত্তমর্ণের নিকট বন্ধ রাখিতেও বাধ্য হন। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তি অতিশয় চিন্তাকুল হন এবং অবস্থার উন্নতিসাধনার্থ প্রাণপ যত্ন করেন; কিন্তু তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই। না প্রকার ভাবনা চিন্তায় তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত ও স্বাস্থ্য ভ হইয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে তিনি অকালে কালগ্রা পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ক্ষেত্রনাথ বর্ত্তমা গৃহস্বামী। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আনুমানি পঁচিশ বৎসর ছিল। ক্ষেত্রনাথ বাল্যকালে স্কুল ও কলে পড়িয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার অবস্থান্ত ঘটায় বি-এ পাশ করিয়া আর অধিক পড়িতে পারেন নাই তিনি বাধ্য হইয়া কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার কাে সহায়তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদে ব্যবসায়ের উন্নতি হইল না। যাহা আয় হইত, তাহা সংসারে খরচেই নিঃশেষ হইতে লাগিল। এদিকে মহাজনের ঋণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সুদে মূলে ক্রমে ক্রমে তা বৃহদাকার ধারণ করিল। ইহার উপর পিতার শ্রাদ্ধা

কার্য্য সম্পন্ন করিতে এবং দুই বৎসর পরে একটী ভগিনীর বিবাহ দিতে ক্ষেত্রনাথকে আরও টাকা কর্জ্জ করিতে হইল। হাজার চেষ্টা করিয়াও ক্ষেত্রনাথ দুই সহস্র টাকার কমে ভগিনীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন না। এইরূপে ক্ষেত্রনাথ পিতা অপেক্ষাও অধিকতর ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁহার পরিবারবর্গও দিন দিন সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যাটি সর্ব্ব কনিষ্ঠা।

ক্ষেত্রনাথের পত্নী মনোরমা উচ্চবংশজাতা, সাধ্বী ও সুশীলা। স্বামীর দুরবস্থা দর্শনে মনোরমা অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার চিন্তাভার লাঘবের জন্য সামান্য খরচে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যখন দুঃসময় আসে, তখন হাজার চেষ্টাতেও দুরবস্থা নিবারণ করা যায় না। কন্যাটীর জন্মের পর, মনোরমা কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। ক্ষেত্রনাথ কষ্টেসৃষ্টে পত্নীর চিকিৎসা করাইয়া সে যাত্রা তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল। মনোরমার চিকিৎসা করাইতে গিয়া তাঁহার অলঙ্কারগুলিও ক্ষেত্রনাথকে বন্ধক রাখিতে হইল। সাধ্বীর করদ্বয় নিরাভরণ হইল। দুই চারি খান সামান্য মূল্যের কাচের চুড়ী পরিয়া মনোরমা সধবাচিহ্ন ধারণ করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই ভঙ্গুর চুড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে, সাধ্বী রমণী দক্ষিণ হস্তে লাল সূতা বাঁধিয়া কোনও প্রকারে সধবা-চিহ্ন রক্ষা করিতেন। এত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও, মনোরমা এক দিনের জন্যও নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন নাই, অথবা স্বামীর প্রতি সামান্য বিরক্তভাবও প্রকাশ করেন নাই। হৃদয় সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিলেও, তিনি সর্ব্বদা স্বামীর নিকট হাস্যমুখে উপস্থিত হইতেন এবং স্বামীকে নানা প্রকার উৎসাহ-বাক্যে আশ্বস্ত করিতেন। স্বামীকে মনোরমা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ক্ষেত্রনাথের এরূপ দুঃসহ কষ্টময় জীবনে মনোরমাই তাঁহার একমাত্র সুখের কারণ ছিলেন। কিন্তু মনোরমার ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন এবং মনে মনে ভাবিতেন, "মনোরমাই আমার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোক। মনোরমার জন্যই এখনও আমি সংসারে দাঁড়াইয়া আছি। হায়, মনোরমা মরিলে আমি কি করিব ?" যখনই ক্ষেত্রনাথের মনে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইত, তখনই তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বর্ষিত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল; জ্যৈষ্ঠমাস; রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। লোকে গরমের জ্বালায় "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িতেছে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তিরা বরফওয়ালার প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ ছাদে, কেহ বারাণ্ডায়, কেহ অন্যত্র শয়ন ও উপবেশন করিয়া শীতল বাতাসের অনুসন্ধান করিতেছে। মনোরমা দ্বিতলের বারাণ্ডায় একটী মাদুর পাতিয়া কন্যা ও দুইটী পুত্র সহ শয়ন করিয়া আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্র এখনও দোকান হইতে প্রত্যাগত হয় নাই। ক্ষেত্রনাথ আজ পনর দিন কার্য্যান্তরে মফঃস্বলে কোথায় গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অবধি বাড়ীতে কোনও চিঠি পত্র লিখেন নাই। মনোরমা স্বামীর কোনও কুশলসংবাদ না পাইয়া অতিশয় চিন্তাকুল আছেন। এদিকে সংসারেরও খরচপত্র নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে ভার হইয়া উঠিয়াছে। মুদীর দোকানে আর ধারে জিনিষপত্র পাওয়া যায় না; তাহার অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে। গোয়ালিনীর তিন চারি মাসের হিসাব নিকাশ হয় নাই; সেও দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। মনোরমা কচি মেয়েটীকে নিজ স্তন্যপান করাইয়া কোনওরূপে বাচাইয়া রাখিয়াছেন। ক্ষেত্রনাথের দোকানেও জিনিষপত্রের অভাবে বেচাকেনা এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। নগেন্দ্র দশ পনর দিনের মধ্যে যাহা বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স দিতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নানারূপ চিন্তায় মনোরমার রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় না। প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগরণে কাটিয়া যায়। অদ্যও মনোরমা মাদুরের উপর শয়ন করিয়া এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। বালক দুইটী ও কন্যাটী নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে। সহসা সদর দ্বারের কড়া নড়িল এবং পরক্ষণেই নগেন্দ্র "মা মা" বলিয়া মনোরমাকে ডাকিল। মনোরমা নীচে নামিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পুত্রের

সহিত উপরে আসিলেন। মনোরমা প্রদীপ জ্বালিয়া নগেন্দ্রের জন্য রক্ষিত আহারসামগ্রী বাহির করিয়া দিলেন।

আলোক প্রজ্বলিত হইবামাত্র, নগেন্দ্র দীপালোকের নিকট একটা কাগজ লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। পাঠ শেষ হইলে, তাহার মুখমণ্ডল চিন্তাকুল ও বিবর্ণ হইল। মনোরমা নগেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কিসের কাগজ, নগিন্?" নগেন্দ্র দুঃখিত মনে বলিল "আর কিসের কাগজ, মা? পনর দিনের মধ্যে মর্গেজের টাকা দিতে না পারিলে, আমাদের এই বাড়ীখানা বিক্রী হ'য়ে যাবে। তারই নুটীশ।"

মাতাপুত্রে আর কোন কথা হইল না। নগেন্দ্র চিন্তাকুল মনে আহার করিতে লাগিল। মনোরমা নগেন্দ্রের কথা শুনিয়া অবধি দাঁড়াইতে কিম্বা বসিয়া থাকিতে না পারিয়া মাদুরের উপর শয়ন করিয়া পড়িয়াছিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। কোলাহলময়ী কলিকাতানগরী নিস্তব্ধপ্রায়। কেবল মধ্যে মধ্যে রাস্তার উপর যে দুই একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী যাইতেছে, তাহাদেরই ঘর্ঘর শব্দ এবং একটা কালপেচার বিকৃত ও বিকট স্বর নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। নগেন্দ্রের কথা শুনিয়া অবধি, মনোরমার মস্তক ঘূর্ণিত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। আপনাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, মনোরমা চিন্তায় আকুল হইয়াছেন। বাটী বিক্রিয় হইয়া গেলে, হায়, তাঁহাদের দাঁড়াইবারও আর স্থান নাই! ভগবান্ কি তাঁহাদের অদৃষ্টে এতই কষ্ট লিখিয়াছেন? শেষকালে কি পুত্রকন্যা লইয়া মনোরমাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইবে? মনোরমার চক্ষে জল আসিল। চক্ষের জলে তাঁহার উপাধান ভিজিয়া যাইতে লাগিল। মনোরমা ভাবিতে লাগিলেন, "এই বেলা আমার মরণ হয়, তো বাঁচি।" সহসা মনোরমা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন "হে হরি, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, আমাদিগকে দয়া কর। আমাদিগকে এই বিপদে রক্ষা কর। প্রভু, তুমি বই আমাদের আর কেউ গতি নাই।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় মনোরমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল এবং তিনি কাতর হৃদয়ে মাদুরের উপর বসিয়া রহিলেন।

সহসা সদর দ্বারে আবার কড়া নড়িবার শব্দ হ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রনাথের কণ্ঠস্বরও শ্রুত হই ক্ষেত্রনাথ পুত্র নগেন্দ্রের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে নগেন্দ্র সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অভিভূ মনোরমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া সদর দ্বার খুলিয়া দিলে রাস্তায় গ্যাসের আলোকে ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে দেখি পাইয়া বলিলেন "কে? মনোরমা? ছেলেরা সব আছে তো? তুমি কেমন আছ?" মনোরমা হাস্য বলিলেন "হাঁ, সব ভাল আছে। চল, ওপরে চল।" বলিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপ ঘরে আসিলেন।

মনোরমা তাড়াতাড়ি আবার প্রদীপ জ্বালিয়া স্বা হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য একঘটী জল ও গামোছা ল আসিলেন। ক্ষেত্রনাথ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া পরিবর্ত্তন করিলেন। স্বামী রাত্রিতে কি আহার করি মনোরমা তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন গৃহে আহারসামগ্রী কিছুই সঞ্চিত নাই। এই কা মনোরমা ব্যাকুল ও কাতরনয়নে স্বামীর দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি কি খাব, তাই তুমি ভা বুঝি? আমি খেয়ে এসেছি; তার জন্য চিন্তা না মনোরমা স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিলেন না। ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রেলের গাড় আসিতে আসিতে তিনি বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উদর পূর্ণ ক খাইয়াছেন। আর কিছু খাইবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন ন মনোরমা সে কথায় বেশ প্রত্যয় করিলেন না; কিন্তু যখন বলিতেছেন যে, তাঁহার জন্য আহারসামগ্রীর প্রয়োজন নাই, তখন সাধ্বী আর কি করিবেন?

ক্ষেত্রনাথ পথশ্রম দূর করিয়া মাদুরের উপর উপ হইলে, মনোরমা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন স্বামীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সাংসারিক সুখদুঃখের কথা ব লাগিলেন। সংসার অচল হইয়াছে; তাহার উপর বিক্রয়ের এক নুটীশ আসিয়াছে। এই-সমস্ত কথা ব বলিতে মনোরমার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "

যে বিক্রী হ'য়ে যাবে, তা' আমি জানি। বাড়ীখানা কিছুতেই রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো না। এখন তোমার কি রকম বুদ্ধি শুদ্ধি যোগাচ্ছে, বল দেখি?"

মনোরমা বলিলেন "আমার আর বুদ্ধিশুদ্ধি কি? আমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে; দেখেশুনে, আমি বুদ্ধিহারা হয়েছি। ভগবান্‌কে তাই বলছিলাম—বলি, ঠাকুর, শেষকালে কি আমাদের পথের কাঙ্গালী ক'র্‌লে?" এই বলিয়া মনোরমা অঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "দেখ, মনোরমা, বিপদের সময় এরূপ অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? বিপদের সময় ধৈর্য্য চাই। আমি যে আজ পনর দিন বাড়ীতে ছিলাম না, তা আমি বিপদের প্রতীকারের জন্যই বিদেশে গিয়েছিলাম। আমি তো এক রকম ঠিক্ ক'রে এসেছি। এখন তোমার মত হ'লেই হয়।"

মনোরমা ব্যাকুলনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি, বল না?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "দেখ, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, আমাদের মতন লোকের কল্‌কাতায় বাস না করাই ভাল। যারা বড়লোক, যাদের অনেক টাকাকড়ি, তাদের পক্ষেই কল্‌কাতা ভাল। আর এ অবস্থায় আমরা কল্‌কাতায় থাক্‌তে গেলে, ছেলেপিলে নিয়ে মারা পড়্‌বো। দেখ, বাড়ীখানা তো যাবেই। কলকাতায় থাক্‌তে গেলে, এখন আমাদের বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌তে হ'বে। একে এই সংসারের খরচপত্র চালাতে পারি না; তার উপর আবার বাড়ীভাড়া! এখানে কাজকর্ম্মেরও আর তেমন সুবিধা নাই। আমি এই বাড়ীখানা বেচে ফেলবার ঠিক্ করেছি। যা' টাকা পাব তাতে সমস্ত দেনা শোধ ক'রে, আমাদের হাতে প্রায় সাত হাজার টাকা থাক্‌বে। এই টাকাতে কল্‌কাতায় একখানা বাড়ী হ'তে পারে বটে; কিন্তু খাবার যোগাড় কই? দোকান-পাট আর চল্‌বে না। যদি এখন এই টাকা নিয়ে অন্য কাজ করি, আর সে কাজেও লাভ কর্‌তে না পারি, তা হ'লে তো সবই যাবে; আমাদের বাঁচ্‌বার আর কোনও উপায় থাকবে না। এই কারণে আমি মনে করেছি, এই টাকা নিয়ে আমরা কিছু দিনের জন্য বিদেশে বাস করবো। পাড়াগাঁয়ে খরচপত্র কম; আর যেখানে আমরা যাব মনে করেছি, সেখানের জলবায়ুও খুব ভাল। তোমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তার তোমাকে পশ্চিমে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু টাকাকড়ির অভাবে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নাই। এখন অনায়াসেই তোমার পশ্চিমে থাকা ঘট্‌বে। আর সেখানে কাজকর্ম্মেরও সুবিধা আছে। যোগাড় করে কাজ চালাতে পার্‌লে, দুই পয়সা রোজগার হবারও সম্ভাবনা আছে। সেখানে থাক্‌লে, তোমাকে সংসারের খরচপত্রের জন্য আর কিছু ভাবতে হবে না।"

মনোরমা উৎসুক-হৃদয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে দেশ কোথায়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কলকাতা থেকে অনেক দূর; কিন্তু রেলে একদিনেই যাওয়া যায়। জায়গাটি ছোটনাগপুরে; রেলের ষ্টেশন থেকে তিন ক্রোশ দূরে। সেখানে বল্লভপুর নামে একটী গ্রাম আছে; সেই গ্রামটি ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকায় আমি খরিদ কর্‌বার কথাবার্ত্তা স্থির করেছি। গ্রামটিতে প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমি আছে। ষাট সত্তর ঘর প্রজা আছে। পাহাড় আছে; শালের জঙ্গল আছে। দেখ্‌লেই তোমার মন খুসী হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে আমাদের দেশের লোক নাই। যত লোক, সেই দেশেরই। তারা কেমন একরকম খোট্টা-বাঙ্গালায় মেশামিশি কথা বলে,—তা শুন্‌লেই হাসি পায়। কিন্তু লোকগুলি ভাল।"

মনোরমা স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অন্ধকার মধ্যে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইল। কিন্তু তিনি জীবনে কখনও কলিকাতার বাহিরে যান নাই। বিদেশে তাঁহারা একাকী কিরূপে থাকিবেন, তাহাই তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যা ভাল মনে কর্‌চো, তাই কর। আমি আর কি বল্‌বো? বলি, সে দেশে কি আমাদের দেশের কোনও লোক নেই?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "আছে বই কি? তবে আমরা যেখানে থাক্‌বো, সেখানে কেউ নাই বটে। দশ বার ক্রোশ দূরে আছে। তুমি যে তাকে চেনো না। ঐ চাঁপাতলার নীলমণি মুখুয্যে সেখানে মেয়েছেলে নিয়ে আছে।

তার সেখানে দুইখানা গ্রাম। সে রাজার মত সেখানে আছে। কোনও কষ্ট নাই। "নীলমণি আমাদের সঙ্গে প'ড়্‌তো, তারপর শালকাঠের জঙ্গল নিয়ে সেই দেশে কাঠের ব্যবসা কর্‌তে কর্‌তে সে এই রকম বিষয়পত্র করেছে। সেই তো আমাকে আমাদের কষ্টের কথা শুনে সব কথা বলে। তারই তো কথা শুনে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেই আমাকে বল্লভপুর গ্রামটি খরিদ ক'রে দিচ্ছে। তুমি কিছু ভেবো না। আমরা সেখানে গেলে, ভালই হ'বে। অন্নের সুখে অরণ্যে বাস। ভগবান দিন দেন, তো আবার আমরা কল্‌কাতায় আস্‌বো।"

সে রাত্রিতে আর বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। দুঃখ-দারিদ্র্যের এত যন্ত্রণার মধ্যেও, দম্পতির মনে সে রাত্রিতে যেন সুখের আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ দুই চারি দিনের মধ্যেই বাটী বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং বল্লভপুরে গিয়া তাহারও কোবালা সম্পাদিত ও রেজেষ্টরী করিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি পরিবারবর্গকে বল্লভপুরে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা শুনিয়া তাঁহাকে যারপর-নাই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন "ক্ষেত্তর, তোমার মত আহাম্মক লোক আর দুটী দেখি নাই, হে। আরে, কল্‌কাতা ছেড়ে কি কোথাও যেতে আছে? এখানে একবেলা শাকান্ন খেতে, তাও ভাল ছিল। কোথায় বন জঙ্গল, বাঘ ভালুক আর ধাঙ্গড়ের মধ্যে বাস করতে যাবে? সহুরে লোক কি পাড়াগাঁয়ে বাস করতে পারে? মারা পড়বে যে! দেখ্‌ছ না, পাড়াগেঁয়ে মেড়োরা পাড়াগাঁ ছেড়ে কল্‌কাতায় এসে বাস করছে, আর তুমি কিনা, সেই কল্‌কাতা ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে চল্লে! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, দেখ্‌ছি।" ক্ষেত্রনাথের শ্বশুর মহাশয় একজন অবস্থাপন্ন লোক। জামাতার কষ্টের সময়ে একবার তাঁহাদের খোঁজ খবরও লয়েন নাই। জামাতা এখন কলিকাতা ছাড়িয়া, ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া, বনজঙ্গলে বাস করিতে যাইতেছেন, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার উপর হইলেন এবং জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া আত্মীয় স্বজ কাছে বলিতে লাগিলেন "ওটা দত্তবংশে কুলাঙ্গার জন্মেছি পিতৃপিতামহের নাম লোপ কর্‌লে। ওকে আমি কো কথা বলতে চাই না। তার যা ইচ্ছা হয়, করুব ক্ষেত্রনাথের শাশুড়ী ঠাকুরাণী কন্যার দুঃখে দুঃখিত হ কাঁদিতে কাঁদিতে পাড়ার মেয়েদিগকে বলিতে লাগি "মণিকে আমি জলে ফেলে দিয়েছিলাম, গো, জলে ফে দিয়েছিলাম।" সকল কথাই ক্ষেত্রনাথ ও মনোর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষেত্র নিজ সঙ্কল্প হই বিচ্যুত না হইয়া বল্লভপুরে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন

কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার দিনে, মনোরমার হ বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিল। মনোরমা প্রায় সমস্ত ধরিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। স্বামীর পৈত্রিক ঘরবাড়ী—যেখানে মনোরমা কত সুখ, আ ও কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা চিরদিনের ছাড়িয়া যাইতেছেন। এই ঘরবাড়ী পরের হইবে। প ছেলেপিলে আসিয়া এইখানে আনন্দ করিবে। ত তাঁহার ছেলে মেয়েরা আজ বনবাসে চলিল! মনোর মনে যতই এইরূপ চিন্তা হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প অশ্রুবেগ সম্বরণ করা কঠিন কার্য্য হইল। এদি ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্রের সাহায্যে, সমস্ত দিন ধরিয়া জিনিষ প্যাক্ করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রের ছোট ভাই দুই উৎসাহের সীমা নাই। মধ্যম সুরেন ও কনিষ্ঠ মহোল্লাসে পিতার নিকট জিনিষপত্র বহিয়া আনি লাগিল। সুরেনের বয়স দশ এবং নরুর বয়স বৎসর মাত্র। সুরেন মাঝে মাঝে নরুকে ভয় দেখা বলিতে লাগিল "নরু, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখ বড় বড় পাহাড় জঙ্গল, বাঘ ভালুক, আর হাতী আছে নরু পাহাড় জঙ্গলকে বাঘ ভালুকেরই মত কোনও জানো মনে করিয়াছিল এবং তাহাদের আকার প্রকারের ক করিয়াও ভীত হইতেছিল। তাই সে মাঝে মাঝে দা বিরুদ্ধে বাবার নিকট অভিযোগ করিয়া কাতরস্বরে বলি লাগিল "দ্যাখ, বাবা"। কখনও বা সাহস করিয়া বীরদ সুরেনকে বলিতে লাগিল "আমি পাহাড়কে মেরে ফেল্‌বে

তাহার কথা শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও সকলে হাসিয়া উঠিতেছিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল।

রাত্রি দশটার সময় ক্ষেত্রনাথ সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। পাড়ার লোকে কেহ জানিতেও পারিল না। গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় মনোরমার হৃদয় ভাবাবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পক্ষে অশ্রুবেগ সম্বরণ করা কঠিন কার্য্য হইল। ক্ষেত্রনাথও পত্নীকে বিহ্বল দেখিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, এবং তাড়াতাড়ি সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া হাবড়ায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে জিনিষপত্র লগেজ করিয়া এবং টিকিট কিনিয়া যথাসময়ে সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। রেলগাড়ী অন্ধকার ভেদ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। নরেন, সুরেন প্রভৃতি কখনও রেলগাড়ীতে চড়ে নাই। সুতরাং তাহারা আর ঘুমাইল না। এক একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র তাহারা জানালার কাঁচে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আবার গাড়ী ছাড়িলে, শয়ন করে। ভোরের সময় গাড়ী আসানসোল ষ্টেশনে পঁহুছিল। সেখানে তাঁহারা সকলে নামিয়া বেঙ্গল নাগপুর লাইনের গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। দামোদর নদের উপর যে বৃহৎ সেতু আছে, তাহা পার হইবার সময় বেশ ফর্শা হইয়াছিল। এত বড় নদীর এক পার্শ্বে সামান্য স্রোত মাত্র ; অবশিষ্টাংশ বালুকারাশিতে ধূ ধূ করিতেছে। নদী দেখিয়া মনোরমা প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। ক্রমে পাহাড় পর্ব্বত দেখা যাইতে লাগিল। সুরেন নরুকে পাহাড়ের ভয় দেখাইয়াছিল বটে ; কিন্তু সে স্বচক্ষে কখনও পাহাড় দেখে নাই। পাহাড় দেখিয়া সে পিতাকে কত প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। নরু পাহাড়কে বাঘ ভালুকের মত না দেখিয়া আশ্বস্ত ও সাহসী হইল, এবং সুরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "দাদা, এই দেখ, পাহাড়। আমি পাহাড়কে আর ভয় করি না।" নরুর কথা শুনিয়া আবার সকলেই হাস্য করিতে লাগিল।

যথাসময়ে তাঁহারা গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। নীলমণি বাবু তাঁহাদের আগমনপ্রতীক্ষায় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথকে সপরিবারে তাঁহার আবাসস্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষেত্রনাথের কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বল্লভপুর সেখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী বলিয়া তিনি বল্লভপুরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

কর্ম্মীজনের মনের কথা

(Napoleon)

কর্তৃত্বের রাজটীকা লইয়া যে জন্মগ্রহণ করে সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে পারে না। সে শুধু অবস্থা দেখে, এবং গুরুত্ব অনুসারে ব্যবস্থা করে।

মহম্মদের ধর্ম্ম দশ বৎসরে অর্দ্ধ পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; খ্রীষ্টের ধর্ম্ম তিন শত বৎসরে কথঞ্চিৎ মাত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মানব-সমাজ স্বভাবতঃ মন্দ নহে। অধিকাংশ লোকই যদি দুর্বৃত্ত হইত এবং কোমর বাধিয়া কুকাজে লাগিয়া যাইত তবে তাহাদের দমন করিত কে ?

জাতীয় শিল্পশালায় যে যুদ্ধের অনুষ্ঠান হয় শত্রু মর্দ্দনের পক্ষে উহা অমোঘ। অধিকন্তু সে যুদ্ধে রক্তপাতের নাম গন্ধও নাই।

পরিণয় সব সময়ে প্রণয়ের স্বাভাবিক পরিণতি নহে।

রাজার ভালবাসা ধাত্রীর ভালবাসা নয়।

সহর-কোতোয়াল খোঁজ করিয়া যাহা বাহির করে, তদপেক্ষা বানায় বেশী।

রাষ্ট্রনীতির প্রচলিত ধারা অনুসারে বাক্যদানে এবং তদনুযায়ী কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশেষ কোনো নিকট সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না।

রাজসিংহাসন -- জিনিষটা কি ? খানিকটা কাঠ—মখমল-মোড়া।

একটা মাত্র তুচ্ছতম ঘটনায় যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণয় হইয়া যায় ; আবার অম্নিতর একটা মাত্র খণ্ডযুদ্ধে সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

খেলনার লোভ দেখাইয়া, মানুষকে দিয়া সবই করানো

যায়। চুষি-ঝুমঝুমি,—তা' সকল বয়সের উপযুক্তই তো আছে।

সকল রকম সুবিধার শুভ সম্মিলনের প্রতীক্ষায় যদি বসিয়া থাকি তবে কোনো বড় কাজেই আমরা হাত লাগাইতে পারিব না।

খেতাবে ও খাতিরে সকল লোকেই কিছু খুসী হইতে পারে না; সঙ্গে সঙ্গে নগদের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ভালবাসা নিষ্কর্ম্মার নেশা, যুদ্ধব্যবসায়ীর কৌতুক, সম্রাটের পথের কাঁটা।

হয় হুকুম করি, নয় তো মুখ বন্ধ করিয়া থাকি।

বিচারশক্তি অপেক্ষা স্মৃতিশক্তিকেই আমরা বেশী খাটাইয়া থাকি।

যে দিতে জানে না সে লইতেও পারে না।

পৃথিবীর পক্ষে বাতাস যেমন, মানুষের তেমনি উচ্চাভিলাষ; উভয়ের মধ্যে যেটিকেই বাদ দাও, জীবনের লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইবে।

যাহা কিছু পুরাতন, তাহা অন্যায় হইলেও আমরা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

যে জাতির অনুযোগ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় না, সে জাতি চিন্তাশক্তি হারাইতে বসিয়াছে।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে একটা পোষাকী ধর্ম্মবুদ্ধির আবরণ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতে হয়।

যদি নির্ব্বাচনের অবসর থাকে, তবে, অপরের দ্বারা গ্রস্ত হওয়ার চেয়ে নিজেই গ্রাস করিয়া ফেলা ভাল।

মনে রাখিয়ো, (বাইবেলের মতে) মাত্র ছয় দিনে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি হইয়াছে। আর-যাহা চাও দিতে পারি। কিন্তু সময় বাড়াইয়া দিতে পারি না। উহা আমার ক্ষমতার অতীত।

দেশের মধ্যে বুদ্ধিমান লোক যথেষ্ট আছে। এখন, যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেককে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিলেই হয়। যে লাঙ্গল ঠেলিতেছে সে হয় তো মন্ত্রণাগারে আসন পাইবার যোগ্য; আবার যিনি মন্ত্রী তাঁহাকে দিয়া লাঙ্গল ঠেলানই হয় তো সুব্যবস্থা।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে জয়ডঙ্কাই শ্রেষ্ঠ; উহা কখনো বেসুর বাজে না।

যোদ্ধার ধর্ম্ম যুদ্ধ—সুতরাং, আমি ধর্ম্মত্যাগী না[illegible] লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে সে তো মেয়েদের এবং পুরোহি[illegible]দের ব্যাপার। আমি যখন যে দেশ শাসন করি, [illegible] দেশের ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম। মিশরে আমি মুসলমা[illegible] ফ্রান্সে আমি রোমান্ কাথলিক্। যদি কখনো য়িহুদী[illegible] শাসনকর্ত্তা হইতে পারি তবে সলোমানের বিধ্বস্ত ম[illegible] পুনর্নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিব।

মানব-জাতির মানসপটে যেটুকু স্মৃতি রাখিয়া যা[illegible] যায়, আমার মতে, তাহাই অমরতা।

যাহাদের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, রা[illegible] কেবল তাহাদিগকেই ভালবাসেন। যতদিন সে সম্ভাব[illegible] থাকে, ভালবাসাও ততদিন।

মানুষ সৃষ্টিকরা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে; যাহা পা[illegible] যায় তাহাই কাজে লাগাইয়া লইতে হয়।

অব্যবস্থিতচিত্ত রাষ্ট্রনায়ক এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রো[illegible] উভয়েরই সমান অবস্থা। ইচ্ছা আছে, গতি নাই।

বন্ধুর ইষ্টচেষ্টা অপেক্ষা শত্রুর অনিষ্ট-চেষ্টা অনেক বে[illegible] প্রবল।

যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন দুইই কৌশলের কাজ।

কেবল নাচিয়া কুঁদিয়া মানুষ মানুষ হয় না।

ধ্বংসক্রিয়া এক মুহূর্ত্তেই সম্পন্ন হইতে পারে; গঠ[illegible] ক্রিয়া সময়ের কাজ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হেমকণা

কলিঙ্গের কতক অধিবাসী অবশেষে পরিত্রাণ পাইল[illegible] কলিঙ্গ মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল, মাগধ শাসনকর্ত্[illegible] কলিঙ্গশাসনে নিযুক্ত হইল। তখন মাগধসৈন্য ধীরে ধী[illegible] উত্তরাপথের পথ অবলম্বন করিল। সেই দিন হইতে সম্রাটের আচার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল পাটলিপুত্রে ফিরিয়া সম্রাট ধর্ম্মের কথায় অধিকত[illegible] মনোযোগী হইলেন, কিন্তু রাজসভায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রমণে[illegible] সম্মান বাড়িল, বিষ্ণুগুপ্তের পৌত্র ইন্দ্রগুপ্তের পরিবর্[illegible] বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন

মন্ত্রণা-সভায় রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র আদরণীয় হইয়া উঠিল, সুতরাং মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাধগুপ্তের বিশ্বদসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। নূতন পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে বিস্ময় ক্রমে দারুণ বিরক্তিতে পরিণত হইল। দানার্থ প্রতিবৎসর রাজকোষ হইতে যে পরিমাণ সুবর্ণ ব্যয় হইত, পূর্ব্বে তাহার অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণের হস্তগত হইত, কিন্তু কলিঙ্গ অভিযানের পর হইতে সম্রাটের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রমণের প্রতি শ্রদ্ধা বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, তদনুসারে রাজসভায় ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্তিও হ্রাস হইয়াছিল, তদনুপাতে কোপও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যেও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল, যাঁহারা পূর্ব্বে বেশভূষায় কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিতেন, তাঁহারা অকস্মাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুতে পরিণত হইলেন, যাহারা চীনাংশুক এবং বহুমূল্য কৌষেয় বস্ত্র ব্যতীত অপর কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, তাঁহারা মলিন কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন, ফলে চীন দেশীয় বণিকগণ পাটলিপুত্রের আঢ্যসমাজের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া গেল। হঠাৎ বিক্রয় বন্ধ হওয়ায় গৌড়বাসী গন্ধবণিকগণ নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইল, পরবৎসর চন্দন ও কর্পূর ব্যতীত অন্য কোন গন্ধদ্রব্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া দুষ্কর হইল। যাঁহাদিগের বিবিধ বর্ণের উষ্ণীষ দেখিয়া সভামণ্ডপে লোকে ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত, যাহাদিগের গন্ধলেপিত কুঞ্চিত কেশরাশি মাগধসুন্দরীগণের বেণীবন্ধনকে লজ্জা প্রদান করিত, তাঁহারা মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিকরঞ্জিত সামান্য উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন নর্ত্তকী- ও বারাঙ্গনা-মণ্ডলে হাহাকার উঠিয়া গেল, নগরের শৌণ্ডিকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিল, বিলাসিতা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। বালকগণ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল, যুবতী হাস্য বিস্মৃত হইয়া গম্ভীর আস্যে ভিক্ষুণীর দলে প্রবেশ করিল, দেখিতে দেখিতে পাটলিপুত্র নগর একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে পরিণত হইল। যাহার জন্য এত পরিবর্ত্তন হইতেছিল, তিনি তখনও মস্তক মুণ্ডন করেন নাই বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই, রাজসভা হইতে বিলাসিতার উপকরণ সমস্ত দূরীকৃত হয় নাই, সম্রাটের পরিবর্ত্তন শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজধানীর পরিবর্ত্তন সাধন হইয়া গেল। মনুষ্যপ্রকৃতি সকল সময়েই এইরূপ।

যাহার জন্য কলিঙ্গবাসীগণ প্রাণদান পাইয়াছিল, সে পাটলিপুত্রে আসিয়া এক বৃদ্ধ সৈনিকের গৃহে পালিত হইতেছিল; তাহার যৌবন উদ্গমের পূর্ব্বেই সে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের শরণাগত হইবার পূর্ব্বেই ভিক্ষুণীগণ তাহার কণ্ঠ হইতে সুবর্ণ মুদ্রার মাল্য গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘারামের ভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছিলেন, বালিকা কণ্ঠহার হারাইয়া কয়েকদিন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, অবিশ্রান্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘ অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সে সমস্তই ভুলিয়া গেল, আমি অযত্নে সঙ্ঘারামের নিম্নে ভূমধ্যস্থিত গহ্বরে পড়িয়া রহিলাম।

তাহার পর পাটলিপুত্র নগরে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে মগধ দেশ বৌদ্ধ সঙ্ঘে পরিণত হইল, ব্রাহ্মণগণ মগধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রাজকর্ম্মচারীগণ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইল, দেশে নূতন ধর্ম্মের বহুল প্রচারের সহিত মগধবাসীগণ নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইল, নূতন শক্তিলাভ করিয়া গৌতম বুদ্ধের নূতন পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সিন্ধু ও হিমালয়ও সে নূতন ধর্ম্মের স্রোত আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। বন্যার জলের ন্যায় উচ্চ কূলের বাধা না মানিয়া শাক্যসিংহের প্রেম উচ্ছলিয়া পড়িল, নূতন ধর্ম্মের মুখে বাহ্লিক ও কপিশা, উত্তর মরু ও উত্তর কুরু, যবন ও পারসিক দেশ ভাসিয়া গেল। দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায় লুপ্ত হইল, যোদ্ধৃগণ অসি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাপাত্র, বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চীর ধারণ করিলেন।

নূতন ধর্ম্মের যখন বড় সুসময় তখনও আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম একেবারেই বিস্মৃত হয় নাই, প্রকাশ্যে শ্রমণের আদর করিলেও তাহারা গোপনে ব্রাহ্মণের আদর করিত। রাজসভায় শ্রমণগণের লভ্যাংশ বৰ্দ্ধিত হইলেও প্রথমে ব্রাহ্মণকে আসন প্রদান করিয়া পরে শ্রমণকে আসন প্রদান করা হইত, ইহা পাটলিপুত্রের রাজসভার বহু প্রাচীন প্রথা, নূতন ধর্ম্ম

কখনও, ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু যে দিন জনপদে জনপদে প্রতি রাজপথে রাজাদেশে দূত ঘোষণা করিয়া গেল, যে, রাজা বলিয়াছেন "জম্বুদ্বীপে একদিন যাঁহারা দেবরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদিগের দেবত্ব কাল্পনিক," তখন আর্য্যাবর্ত্ত বাসীগণ ভীত হইল! তাহার পর যখন প্রকাশ্য স্থানে শিলাখণ্ডের উপরে চির স্থিতির জন্য রাজার উক্তি খোদিত হইল, তখন জনসাধারণ প্রকাশ্যে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইল। মহামাত্যগণ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন, প্রত্যন্তরক্ষকগণ সীমান্তরক্ষা বিস্মৃত হইয়া দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন, তখন দেশে দেশে শত্রুগণ বুঝিল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলিয়াছে। প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু গোপনে সকলেই প্রস্তুত হইতেছিল। দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য ও কেরলগণ এবং পশ্চিমে যবনগণ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সম্রাট যখন রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া চীর ধারণ করিয়াছিলেন, যখন সাম্রাজ্যের ভবিষ্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পারত্রিক মঙ্গল-লালসায় আকুল হইয়াছিলেন, যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যসঙ্কুল গিরিব্রজের পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেছিলেন, তখন মনে মনে প্রত্যন্তবাসী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

আমি অনেকদিন অযত্নে পড়িয়া ছিলাম, আমার উজ্জ্বল হরিদ্রাভবর্ণ বহুকাল মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে দীপহস্তে জনৈক ভিক্ষুণী ভূমধ্যস্থ গৃহে আসিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, অনেকক্ষণ অন্বেষণের পরে আমার মসৃণদেহে দীপালোক প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহার পর আমি ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্তোলিত হইলাম। ভিক্ষুণী তরুণী, ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কুৎসিত আচ্ছাদন তাঁহার দেহের লাবণ্য ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তাঁহার স্পর্শ বড় কোমল, আমি যখন বস্ত্রাভ্যন্তরে রক্ষিত হইলাম তখনও তাঁহার বক্ষোদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। বহির্জ্জগতে তখনও ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছিল, আমাকে লইয়া ভিক্ষুণী যেস্থানে উপস্থিত হইলেন সেখানে কাষায়-পরিহিতা অনেক-গুলি তরুণী রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। সম্মুখে জাহ্নবী বর্ষার জলে পরিপূর্ণা, নদীতীরে পুষ্পোদ্যান, তাহার পরে সঙ্ঘারাম আরম্ভ। সরলরেখায় সমান্তরালে স্থাপিত শত শত বিশাল স্তম্ভের উপরে সঙ্ঘারামের ছাদ স্থাপিত, প্রত্যেক স্তম্ভটি দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল, সেরূপ মসৃণ মৌর্য্যগণের অভ্যুদয়কাল ব্যতীত আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাই সঙ্ঘারামের তোরণ। স্তম্ভাবলীর পশ্চাতে সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে ধূসরবর্ণ পাষাণস্তূপ দেখা যাইতেছিল, উহাই মূল সঙ্ঘারাম ও বিহার। জাহ্নবী হইতে বারিকণা-সম্পৃক্ত হইয়া পুষ্পোদ্যান হইতে প্রস্ফুটিত ও প্রস্ফুটোন্মুখ পুষ্পদামের রেণুকা সংগ্রহ করিয়া শীতল বায়ু ধীরে ধীরে কঠিন পাষাণের দেহ স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তোরণের সোপানে সোপানে নানাভাবে নানা স্থানে অনেকগুলি ভিক্ষুণী উপবেশন করিয়া ছিলেন। যিনি আমাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে পুষ্পচয়ন করিয়া একজন বর্ষীয়সী মহিলা উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া তোরণে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তরুণীগণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার সঙ্কেত অনুসারে সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিল। তোরণের অভ্যন্তরে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত অঙ্গন, অঙ্গনের চারিদিকে পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যান পার হইয়া মূল সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিতে হয়। পুষ্পোদ্যানে একজন বৃদ্ধ পরিচারক পুষ্পচয়ন করিতেছিল। যিনি আমাকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন তিনি সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলিয়া গেলেন "আমি আজ পুষ্পচয়ন করিতে পারি নাই, তুমি আরতির পরে আমাকে পুষ্প দিয়া যাইও।" উদ্যানপালক মস্তকচালনা করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে ভিক্ষুণীমণ্ডলী সঙ্ঘারামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্ঘারামের মধ্যদেশে তৃণমণ্ডিত বিস্তৃত অঙ্গন, অঙ্গনের চতুষ্পার্শে শত শত ক্ষুদ্র গৃহ, প্রতিগৃহে এক একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সঙ্ঘারামে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষুণীগণ একে একে স্ব স্ব গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহগুলি অতি ক্ষুদ্র, কোনটিতে একটির অধিক বাতায়ন নাই, প্রত্যেকটিতে ভূতলে একটি ক্ষুদ্র শয্যা, দীপাধারে একটি মৃণ্ময় দীপ, গৃহকোণে মৃৎপাত্রে পানী

জল এবং প্রাচীরে লম্বিত কাষ্ঠাধারে দুই একখানি গ্রন্থ। তরুণী গৃহে প্রবেশ করিয়াই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে আমাকে গ্রহণ করিয়া শয্যার নিম্নে রক্ষা করিলেন। সেই সময়ে উদ্যান-পালক আসিয়া কদলীপত্রে একরাশি শ্বেতপুষ্প দিয়া গেল। তরুণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য রাত্রিতে?" বৃদ্ধ উত্তর করিল "দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে।" উদ্যানপালক চলিয়া গেল, সঙ্ঘারামের প্রান্তস্থিত বিহারে মঙ্গলারতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তরুণী ত্রস্ত হইয়া দীপ ও পুষ্পপাত্র লইয়া কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। সে সময়ে তোমরা যদি কেহ আসিতে তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে সঙ্ঘা-রামের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে সঙ্ঘের সমুদয় ভিক্ষুণী দীপ ও পুষ্পপাত্র হস্তে সমবেত হইয়াছেন, মঠস্বামিনীর নির্দ্দেশানু-সারে দুই দুই জন ভিক্ষুণী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিহারাভিমুখে চলিয়াছেন। সঙ্ঘারামের প্রান্তে পাষাণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বিহার, সেস্থানে একজন বৃদ্ধ পরিচারিক ঘণ্টানিনাদ করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল, তদ্ব্যতীত বিহারে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। ভিক্ষুণীগণ মঠস্বামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাতবার বিহার প্রদক্ষিণ করিয়া গর্ভগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, মঠস্বামিনী বেদীর সম্মুখ হইতে মাল্য, চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য লইয়া বেদীর উপরে স্থাপন করিলেন, প্রত্যেক ভিক্ষুণী পুষ্পপাত্র হইতে পুষ্পরাশি লইয়া নিক্ষেপ করিলেন, দেখিতে দেখিতে বেদী শুভ্র কুসুমে আচ্ছাদিত হইয়া গেল, তখন ভিক্ষুণীগণ বেদীর চতুষ্পার্শে চক্রাকারে ভূতলে উপবিষ্টা হইলেন। মঠস্বামিনী উজ্জ্বল দীপ লইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন, পরিচারক ও উদ্যানপালকগণ শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও ঢক্কার ধ্বনিতে ক্ষুদ্র বিহারটি কম্পিত করিয়া তুলিল। আরতি শেষ হইলে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ দুই দুই জন করিয়া স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, দেখিতে দেখিতে সঙ্ঘারামের দ্বার রুদ্ধ হইল, অধিকাংশ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, কক্ষের অধিকারিণীগণ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পূর্ণিমার চন্দ্র যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে তখন অলিন্দে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুত হইল, আমার অধিকারিণী নিদ্রিত হন নাই, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত উদ্যানপালক কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তরুণী শয্যার নিম্নদেশ হইতে আমাকে সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বৃদ্ধ সঙ্কেত করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে কহিল, অতি সন্তর্পণে অলিন্দ অতিক্রম করিয়া সঙ্ঘারামের দ্বারে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ নিঃশব্দে দ্বার অর্গলমুক্ত করিল ও উভয়ে সঙ্ঘারাম হইতে নির্গত হইয়া গেল। ক্রমে অঙ্গন ও উদ্যান পার হইয়া উভয়ে প্রাচীরের নিকটস্থিত বৃক্ষরাজির নিম্নে অন্ধ-কারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ কোথা হইতে একখানি অবতরণিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সাহায্যে তরুণী প্রাচীরের উপর আরোহণ করিলে বৃদ্ধ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল এবং অবতরণিকা উঠাইয়া লইয়া প্রাচীরের অপর পার্শ্বে স্থাপন করিল, তরুণী অবতরণ করিলে বৃদ্ধ নামিয়া গেল, তাহাদিগকে দেখিয়া দূরস্থিত বৃক্ষতল হইতে শুভ্রবসনপরিহিত একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিল, তরুণী বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইল। আগন্তুক নিজের মস্তক হইতে উষ্ণীষ লইয়া তরুণীকে প্রদান করিল, তরুণী তাহা পরিধান করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কাষায় দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পরে বৃক্ষতলে অশ্বারোহণ করিয়া আগন্তুক তরুণীকে নিজের সম্মুখে উঠাইয়া লইল। অশ্বারোহণ করিয়া তরুণী আমাকে উদ্যানপালকের হস্তে নিক্ষেপ করিল, আগন্তুকও মণিবন্ধ হইতে বলয় লইয়া বৃদ্ধের অঙ্কে ফেলিয়া দিল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও আমার রূপ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়া আনন্দে গলিয়া গেল, তাহার পর আমাদিগকে বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করিয়া কটিদেশে রক্ষা করিল ও অবতরণিকা লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

তাহার পর বহুক্ষণ কিছু বুঝিতে পারি নাই, ততক্ষণ বৃদ্ধ বোধ হয় পথ চলিতেছিল। গৃহে উপস্থিত হইয়া যখন দারুনির্ম্মিত উপাধানের নিম্নে আমাকে রক্ষা করিল তখন রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উপাধানের নিম্ন হইতে আমরা যখন বাহির হইলাম তখন দিবার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। বৃদ্ধ আমাদিগকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল, পাটলিপুত্রের সঙ্কীর্ণ ও বক্র দীর্ঘ পথসমূহ অতিক্রম করিয়া পাষাণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথে উপস্থিত হইল।

অশ্বপদশব্দ ও রথচক্রের ধ্বনিতে কিছুই শোনা যাইতে-
ছিল না, জনস্রোত অবিরামগতিতে পথের উভয় পার্শ্ব
দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, বৃদ্ধ অতিকষ্টে ধীরে ধীরে
অগ্রসর হইতেছিল। অপর দিন অপেক্ষা রাজপথে জনতা
অধিক বলিয়া বোধ হইতেছিল, যানবাহনে ও পদব্রজে
শত শত নাগরিক ও নাগরিকা দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন
করিতেছিল। রাজপথ অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ যতগুলি
বিপণীতে প্রবেশ করিল তাহার কোনটিতেই তাহার
অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। তখন সে হতাশ হইয়া রাজপথ
পরিত্যাগ করিল, পুনরায় সঙ্কীর্ণ বক্র পথ ধরিয়া নগর-
মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৃতীয় প্রহরের শেষে একটি
জীর্ণগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। গৃহস্বামী তখন
দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ
করিতেছিল, নূতন লোক দেখিয়া দাড়াইল। বৃদ্ধ বলিল
"আমি সুবর্ণ বিক্রয় করিতে আসিয়াছি।" গৃহস্বামী
তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল বলিল "তুমি কি
বিদেশী, আজ অপরাহ্নে প্রথম দেবযাত্রা হইবে তাহা
কি তুমি জান না?" বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া রহিল, গৃহস্বামী
তখন তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিল "চল, দেবযাত্রা
দেখিয়া আসি।" উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃদ্ধ পুনরায়
রাজপথে ফিরিয়া আসিল, রাজপথে তখন বিশেষ স্থানা-
ভাব, রাজপুরুষগণ দেবযাত্রার জন্য পথ পরিষ্কার
করাইতেছে। (ক্রমশঃ)।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

যৌবন-সীমান্তে

(থেরী অম্বপালি)

কোকড়ানো কালো চুল ছিল একমাথা,—
ভোমরার মত কালো চুল মাথাময়;
কালে সেও হ'ল শণের মতন শাদা!
বুদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

আমলার ডিবা ছিল এ কবরী হায়,
বাসে ভুর-ভুর ছিল তাহে ফুলচয়;
খরগোস-লোম-গন্ধ এখন তায়!
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

ঘন ছিল চুল গহন বনের মত,
কনকের ফুলে ছিল সে যে ফুলময়;
আজি সে শ্রীহীন বিতথ ইতস্তত!
বুদ্ধদেবের বাক্য মিথ্যা নয়।

মণিকাঞ্চনে শোভিত বিনোদ বেণী
শোভা-সৌরভে ভুবন করিত জয়,
আজি সে লুপ্ত,—অলক-অলির শ্রেণী!
সত্যবাকের কথা কি মিথ্যা হয়?

বাঁকা ভুরু জোড়া যেন পটুয়ার আঁকা,—
ভোমরা-ভোঁয়ার আলয় সে শোভাময়;
আজ ললাটের বলিতে পড়েছে ঢাকা!
সিদ্ধবাকের কথা কি মিথ্যা হয়?

নীলার মতন আনীল ছিল এ আঁখি,
আয়ত রুচির উজ্জ্বল নিরাময়;
জরায় আজিকে জ্যোতি তার গেল ঢাকি;
বুদ্ধের কথা বিফল হবার নয়।

কনকের চূড়া ছিল গো তুঙ্গ নাসা,
পরিপাটি তার পাটা দুটি কিশলয়;
জরা আজি হায় ভেঙে দেছে তার বাঁশা;
বুদ্ধবচন ব্যর্থ হবার নয়।

কাকনের তটে সুঠাম কল্কা হেন
যে কানের হায় শোভা ছিল অতিশয়,
জরায় সে আজি ঝুলিয়া পড়েছে যেন;
বুদ্ধের কথা কভু কি মিথ্যা হয়?

দাঁত ছিল মোর গর্ভ-মোচার কলি,—
সারি-গাঁথা, ঠাস্, বিমল, জ্যোতির্ময়;
জল্দা যবের মত সে পড়িছে গলি'!
সত্যবাকের কথা কি মিথ্যা হয়?

বনচারী ওই কোকিলের সাথে আমি
কণ্ঠ মিলায়ে লয়ে মিলায়েছি লয়;
আজি সে কণ্ঠ পদে পদে যায় থামি'!
সিদ্ধবাকের বাক্য মিথ্যা নয়।

গ্রীবা ছিল মোর মাজা সোনা দিয়ে গড়া,
কনক-কম্বু কমনীয় শোভাময় ;
ভেঙে দিল তারে নষ্ট করিল জরা !
বৃদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

বাটের আগল সদৃশ সুগোল বাহু
ছিল একদিন,—মিছে নয়, মিছে নয় ;
হীনবল তারে করিল গো জরা-রাহু ;
বৃদ্ধের বাণী অন্যথা নাহি হয়।

সাজিত রতন-মুদ্রিকা-জালে পাণি,
স্বর্ণভূষণে ছিল এ স্বর্ণময় ;
আজ শিকড়ের—যেন গো—চাবড়া খানি ;
সত্যবাকের কথা সে মিথ্যা নয়।

পীন উর-কলি শোভিত উরসু আগে,
বর্ত্তুল ঠামে মনো করিত জয় ;
এবে নিরুদক মোশকের মত লাগে !
বৃদ্ধবচন মিথ্যা হবার নয়।

কনক-ফলক সম সমর্থ কায়া,
আঁখির পলক যার মাঝে হ'ত লয় ;—
তাতেও তো প'ল পলিত বলির ছায়া !
বৃদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

নাগভোগ উরু শিখাত যে মৃত চলা,—
ভোগের সুখের আভাসে করিত জয় ;—
জরা তারে আজ করেছে বাঁশের নলা !
বৃদ্ধের কথা অন্যথা নাহি হয়।

সোনার গুজরি রজতের খিল আঁটা
ছিল যে চরণে,—সে চরণ শিরাময় ;
জরা-জর্জ্জর—হয়েছে তিলের ডাঁটা।
সিদ্ধবাকের বাক্য মিথ্যা নয়।

তুলা-ভরা পুরু ছিল যে পায়ের পাতা
কবিরা যাহারে 'পদপল্লব' কয়,
জরায় সে আজ হ'য়ে গেছে আট-ফাটা !
প্রভু বুদ্ধের কথা কি মিথ্যা হয় ?

কী ছিল ! কী হ'ল ! ··· জরা-ঘর আজি দেহ,
দিনে দিনে তার সুধালেপ হ'ল ক্ষয় ;
দুঃখ নিলয় ; ·· মিছে এর প্রতি স্নেহ ;
বুদ্ধের কথা মিথ্যা হবার নয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আগুনের ফুল্‌কি

(১)

কর্ণেল সার টমাস নেভিল তাঁহার কন্যাকে লইয়া ইটালি ভ্রমণ করিতে আসিয়া মার্সেঈয়ের এক নামজাদা হোটেলে উঠিলেন। তিনি জাতিতে আইরিশ, পেশায় ইংরেজ রেজিমেণ্টের সেনাপতি।

আগে ভাবপ্রধান পর্যাটকেরা যে-কোনো দৃশ্য দেখিলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন এবং তাহার প্রশংসায় মাতিয়া উঠিতেন। এই অতির বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতেও আবার অপর দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক চাপিয়াছে। আজকাল অনেক পর্যাটক আপনাদিগকে অসাধারণ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্যই বাড়ী হইতে একেবারে পণ করিয়া যাত্রা করেন যে কোনো-কিছুরই প্রশংসা কিছুতেই করা হইবে না। কর্ণেল নেভিলের কন্যা মিস লিডিয়া এইরূপ খুঁতখুঁতে পর্যাটকদেরই একজন। র‍্যাফেলের চিত্র তাহার চোখে পটের সামিল ; ভিসুভিয়াস অগ্নিগিরির ধূমোদ্‌গার বার্মিংহামের কলের চিমনির ধোঁয়ার চেয়ে বেশি কিছু জমকালো নয়। ইটালির বিরুদ্ধে তার প্রধান অভিযোগ, যে, দেশটার নিজস্ব একটা বিশিষ্টতা কিছু নাই। প্রথমে মিস লিডিয়া এই বলিয়া নিজেকে তারিফ করিতেছিল যে, আল্পস্ পাহাড়ে এমন কিছু সে দেখিয়াছে যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কাহারো চোখে পড়ে নাই, এবং ভদ্রসমাজে তাহা লইয়া সে বেশ একটু আসর জমাইতে পারিবে। কিন্তু শীঘ্রই তাহার পূর্ব্বগামী বহু যাত্রীর দেখা জিনিসের মধ্যে কিছুমাত্র নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া সে আপনাকে বিরুদ্ধ দলেরই সামিল করিয়া লইল। বাস্তবিক, ইটালির সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য ও বিশেষত্ব

সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলেই যখন অপরে বলিয়া উঠে—"তুমি অবিশ্যি অমুক জায়গার অমুক বাড়ীতে র‍্যাফেলের অমুক ছবিখানা দেখেছ? ইটালিতে ওর চেয়েও ভালো ভালো ছবি আছে!"—তখন বরদাস্ত করা দায় হইয়া উঠে, কারণ যিনি বিজ্ঞভাবে ঐ কথা বলিতেছেন তিনি হয়ত নিজে তা কখনো দেখেনই নাই। অতএব বিদেশে গিয়া বহুল দর্শনীয় জিনিসের মধ্যে যখন সব কিছু খুঁটিয়া দেখা সম্ভব নয়, তখন কোমর বাঁধিয়া সব জিনিসের নিন্দা করিতে লাগিয়া যাওয়া ঢের সোজা, কারণ প্রশংসা করিতে হইলে জিনিসটার সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক, কিন্তু পরিচয় না থাকিলেই নিন্দা করা সহজ হইয়া আসে।

হোটেলে গিয়াও মিস লিডিয়ার হতাশার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। সে বাছিয়া বাছিয়া প্রাচীন ধ্বংসের তোরণ প্রভৃতির নক্সা আঁকিতেছিল আর মনে করিতেছিল, এই জিনিসটা নিশ্চয় এর আগে আর কোনো চিত্রকরের চোখে পড়ে নাই। হঠাৎ একদিন লেডি ফ্রান্সেস ফেনউইচের সঙ্গে দেখা; তিনি লিডিয়াকে তাঁহার এলবাম দেখাইলেন—তাহার ভিতরে একটি সনেট আর একটি শুষ্ক ফুলের মাঝখানে আঁকা রহিয়াছে ঠিক সেই তোরণটি, পার্টাকিলে রং ধ্যাবড়ানো! মিস লিডিয়া তার তোরণের নক্সা তার ঝিকে দান করিয়া দিল, এবং প্রাচীন কালের সৌধসংগঠনের কৃতিত্বের উপর তাহার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রহিল না।

সমস্ত জিনিসই অপছন্দ হওয়ার ভাব কর্ণেল নেভিলেরও পুরা মাত্রায় দেখা যাইতেছিল, কারণ তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, সে সব তাহার কন্যার চোখ দিয়াই। তাঁহার কন্যাকে এমন করিয়া বিরক্ত করিয়া তোলাতে তিনি ইটালির উপর হাড়ে চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সেইজন্য ইটালি তাঁহার কাছে জগতের মধ্যে ওঁছা বৈচিত্র্যহীন দেশ বলিয়া ঠেকিতেছিল। অবশ্য, ন্যায্য কথা বলিতে গেলে, চিত্র ও প্রতিমার বিরুদ্ধে তাঁহার রাগ করিবার কিছুই কারণ ছিল না; কেবল তিনি জোর করিয়া ইটালির বিরুদ্ধে বড় জোর এই অভিযোগ আনিতে পারেন যে এদেশে শিকার মিলে না,—রোমের "দেহাদে" ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র মাথায় করিয়া দশ মাইল পথ না হাঁটিলে সামান্য গোটাকত পাখীও মারা পড়ে না।

মার্সেঈয়ে পৌঁছিবার পরদিন তিনি তাঁহার পুরাতন সহকারী কাপ্তেন এলিসকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। কাপ্তেন এলিসও ছয় সপ্তাহের ছুটি লইয়া কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কাপ্তেন খুব ঘটা করিয়া মিস লিডিয়ার কাছে কর্সিকার ডাকাতদের গল্প জুড়িয়া দিলেন। এসব ডাকাত ঠিক ডাকাত নয়, ফেরারী আসামী; রোম হইতে নেপল্‌স্ যাইবার পথে যেমনতর ডাকাতের সঙ্গে লোকের হামেশা সাক্ষাৎ ঘটে তারা তেমন ডাকাত নয়। আহারান্তে মিস লিডিয়ার প্রস্থানের পর কর্ণেল আর কাপ্তেন দুজনে মিলিয়া মদের বোতল সামনে করিয়া শিকারের গল্প সুরু করিলেন, এবং কাপ্তেনের কথায় কর্ণেল বুঝিলেন যে শিকারের সেরা জায়গা কর্সিকা—সেখানকার শিকার যেমন রকমারি, তেমনি প্রচুর। কাপ্তেন এলিস বলিলেন—"সেখানে? ওঃ দলে দলে বুনো শুয়োর! যেখানে সেখানে! ঘোরো কি বুনো ঠিক করাই দুষ্কর—দুবহু এক রকম! কিন্তু বুনো বলে ঘোরো মেরেছেন কি বিপদ! শুয়োরের মালিকের সঙ্গে দাঙ্গা! তারা অমনি পাঁচ হাতিয়ার বেঁধে বন থেকে দলে দলে পিল পিল করে বেরুবে। আপনাকে গ্রাহ্যই করবে না; মরা শুয়োরের বদলে আপনাকে মেরে তবে ক্ষান্ত হবে। এমনি তাদের গোঁ, এমনি তাদের রোক, এমনি তাদের প্রতিহিংসা! তা শুয়োর ছাড়াও ঢের শিকার আছে, বড় বড় রামছাগল—অমন আর কোথাও দেখা যায় না—ডাকসাইটে—কিন্তু মারা ভারি শক্ত! হরিণ, কৃষ্ণসার, পাখী-পাখালী অগুণতি! যদি আপনি শিকার করতে চান, তবে একবার কর্সিকায় চলুন; সেখানে যা খুসি শিকার করতে পারবেন, চড়াই থেকে মানুষ পর্য্যন্ত!"

চায়ের সময় কাপ্তেন এলিস লিডিয়ার কাছে কর্সিকার লোকের প্রতিহিংসার গল্প করিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিলেন। এ গল্প শিকারের চেয়েও উচ্ছ্বসিত ও ভীষণ। এ গল্পের উপসংহারে কর্সিকার বিচিত্র দৃশ্য, বন্যভাব অধিবাসীদের প্রকৃতির বিশিষ্টতা, আদিম কালের রীতিনীতি

ও আতিথেয়তার বর্ণনায় লিডিয়াকেও উৎসুক ব্যগ্র করিয়া তুলিলেন। অবশেষে কাপ্তেন এলিস লিডিয়ার পদতলে একখানি সুন্দর ছোট ছুরী রাখিয়া দিলেন—সেখানির বিশেষত্ব তার গড়নে বা পিতলের বাঁটে তত নয়, যত তার ইতিহাসে। সেখানি চারজন লোকের রক্তে ধোয়া একজন প্রসিদ্ধ ডাকাতের ছুরী—সেই সেখানি কাপ্তেনকে উপহার দিয়াছে। মিস লিডিয়া সেই ছুরীখানি আপনার নীবীবন্ধে গুঁজিয়া রাখিলেন; রাত্রে নিজের টেবিলে রাখিলেন; এবং ঘুমাইবার আগে ডজনবার খাপ হইতে খুলিয়া খুলিয়া দেখিলেন। এদিকে কাপ্তেন রাতে স্বপ্ন দেখিলেন তিনি সেই ছুরী দিয়া একটা অদ্ভুত রামছাগল শিকার করিয়াছেন; সেটার চেহারা শূকরের, শিং দুটো হরিণের, আর ল্যাজটা মোরগের!

কর্ণেল নেভিল তাঁহার কন্যার সহিত একত্র একান্তে আহার করিতে বসিয়া বলিলেন—"এলিস বলছিলেন কর্সিকাতে তোফা শিকার মিলে। যদি সে দেশ বেশী দূরে না হয়, ত দিন পনর সেখানে কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না।"

লিডিয়া বলিল—"মন্দ কি বাবা? যতক্ষণ তুমি শিকার করবে, ততক্ষণ আমি ছবি আঁকব; নেপোলিয়ন ছেলেবেলায় যে গুহার মধ্যে গিয়ে পড়া তৈরি করতেন, তার বর্ণনা কাপ্তেন এলিস করছিলেন, তার ছবি আমার খাতায় আঁকতে পারলে ভারি মজাই হবে!"

কর্ণেল কোনো কিছু ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এই বোধ হয় প্রথম কন্যার সায় পাইলেন। এই অসম্ভাবিত অঘটন ঘটনায় প্রীত হইয়া কর্ণেলের বুদ্ধি খুলিয়া গেল; তিনি তাঁর কন্যার এই প্রীতিকর খেয়ালটাকে উস্কাইয়া তুলিবার জন্য কয়েকটা বাজে ওজর তুলিলেন; সে দেশের বুনো প্রকৃতি, রমণীর পক্ষে জল-যাত্রার দুঃখ প্রভৃতির কথা তিনি কিন্তু বৃথাই তুলিতে লাগিলেন; লিডিয়ার কিছুতেই ভয় নাই; সে ঘোড়ায় চড়িতে খুব ভালো বাসে; খোলা জায়গায় রাত কাটানো সে ত বেশ মজা। তাহার বাবা যদি তাহাকে কর্সিকায় লইয়া যাইতে নারাজ হন, তবে সে এসিয়া মাইনরে তুর্কীদের কাছে যাইবে। মোট কথা, ইতিপূর্ব্বে আর কোনো ইংরেজ রমণী কর্সিকায় যখন যায় নাই, তখন তাহাকে যাইতেই হইবে। তাহা হইলে দেশে ফিরিয়া গিয়া কি আনন্দ! সকলে তাহার নক্সার খাতা দেখিয়া বলিবে—'হ্যাঁ ভাই, এটা কিসের নক্সা?'—সে অমনি গম্ভীর তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিবে 'ও তেমন বিশেষ কিছু না। ওটা কর্সিকার একটা নামজাদা গুণ্ডার নক্সা—সে আমাদের পাণ্ডা হয়েছিল।' অমনি সকলে শিহরিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিবে—'ওমা! বলিস কি? তুই কর্সিকায় গিয়েছিলি?......"

তখন কর্সিকায় যাওয়ার ষ্টিমার ছিল না। লিডিয়া বলিল সে যেমন করিয়া হোক দ্বীপ-যাত্রী জাহাজ খুঁজিয়া বাহির করিবে। কর্ণেল প্যারীতে থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন, সেইদিনই চিঠি লিখিয়া তাহা রদ করিয়া দিলেন এবং একখানা কর্সিকা-যাত্রী মাল জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে যাওয়ার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া ফেলিলেন। সে জাহাজে অমনি চলনসই রকমের দুটিমাত্র কামরা। ইহারা তাহা রসদেই বোঝাই করিয়া তুলিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন বলিল যে তাহার জাহাজের একজন বুড়ো খালাসি তোফা রাঁধে, তাহার মতো মাছের ঝোল রাঁধিয়ে সে তল্লাটে মেলা ভার; শ্রীমতীর কোনো কষ্টই হইবে না, সুবাতাস আর স্থির সমুদ্রে সহজেই পাড়ি জমিয়া যাইবে। অপর পক্ষে কন্যার ইচ্ছা-মত কর্ণেল কাপ্তেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে সে জাহাজে সে আর কোনো যাত্রী লইতে পারিবে না, আর জাহাজ এমন ভাবে কিনারায় কিনারায় লইয়া যাইতে হইবে যাহাতে কর্সিকার উপকূলের পর্ব্বত নীলিমার উপর দিয়া চোখ বুলাইতে বুলাইতে যাইতে পারা যায়।

(২)

যাবার দিন সমস্ত মোটমাটারি বাঁধাছাঁদা হইয়া সকাল হইতে জাহাজে বোঝাই হইতে লাগিল; জাহাজ সন্ধ্যা বেলা ছাড়িবে। জাহাজ ছাড়ার সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া কর্ণেল তাঁহার কন্যাকে লইয়া মার্সেঈয়ের বন্দর পর্য্যন্ত প্রসারিত সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটিতে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন জাহাজ হইতে ডাঙায় নামিয়া কর্ণেলের কাছে আসিল,—সে তার এক আত্মীয়কে ঐ জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য কর্ণেলের অনুমতি চায়। সেই আত্মীয়টির জন্মস্থান কর্সিকায়, বিশেষ

জরুরি কাজের তাড়ায় তাহাকে বাড়া যাইতেই হইবে এবং সম্প্রতি কর্সিকাযাত্রী আর কোনো জাহাজ পাওয়ারও সম্ভাবনা নাই।

—সে খুব ভালো ছেলে; সে সৈনিক, পদাতিক সেনাদলের অফিসার; যদি নেপোলিয়ন রাজা থাকতেন তা হলে এতদিনে সে কর্ণেল হয়ে যেত।

কর্ণেল বলিয়া উঠিলেন—ও! সেও তবে মিলিটারী লোক!... আমাদের সঙ্গে তাকে যেতে দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই...

লিডিয়া ইংরেজিতে বলিয়া উঠিল—বাবা, তোমার মিলিটারী হলেই হল! এ ভারি ত মিলিটারী! পদাতিক সৈন্যের হাবিলদার, হয় ত মুখখু গোয়ারগোবিন্দ, সমুদ্রে পড়ে অসুখবিসুখ করে আমাদের সব সুখটুকু একেবারে মাটি করে' দেবে!

কাপ্তেন ইংরেজির এক বর্ণও বুঝিল না; কিন্তু সেই সুন্দর মুখখানির সিঁটকনো ভাব দেখিয়া সে ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করিয়া লইল; এবং তাড়াতাড়ি মিস লিডিয়ার কাছে আপনার আত্মীয়টির তিনদফা প্রশংসা পেশ করিল আজ্ঞে সে খুব সভ্যভব্য ভদ্রলোক, হাবিলদার বংশে তার জন্ম; আর সে কর্ণেল সাহেবের কিছুমাত্র অসুবিধার কারণ হবে না, তাকে এমন এক কোণে রেখে দেবো যে তার টিকি পর্য্যন্ত দেখা যাবে না।

কর্ণেল আর মিস নেভিল দুজনেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে কর্সিকাতেও এমন পরিবার আছে যাহার বাপদাদা হইতে ছেলে পর্য্যন্ত বংশধারার সবাই পুরুষানুক্রমে হাবিলদার! কিন্তু ইহাঁরা তাহাকে পাইক সৈন্যের হাবিলদার ঠাওরাইয়া মনে করিলেন সে নিশ্চয় একটা লক্ষ্মীছাড়া গোচের লোক, কাপ্তেন দয়া করিয়া মোফ্‌তে তাহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবে। যদি সে ব্যক্তি উঁচুদরের অফিসার হইত তবে ত কোনো কথাই ছিল না, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আলাপ করিয়া একত্র যাইতে পারিতেন; কিন্তু একজন হাবিলদারের জন্য নিজেদের অসুবিধা করিয়া ভদ্রতা করার কিছুই দরকার নাই সে ত একটা বাজে লোক, বিশেষ যখন তাহার সঙ্গে তাহার সৈন্যদল সঙিন উঁচাইয়া তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে আসিতেছে না।

হঠাৎ কি ভাবিয়া লিডিয়া শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল আপনার আত্মীয়টির খুব সমুদ্রপীড়া হয়?

—আজ্ঞে কখ্‌খনো না; একেবারে ডাকাবুকো যেমন ডাঙায় তেম্‌নি জলে।

—আচ্ছা! তবে তাকে নিতে পারেন।

কর্ণেলও কন্যার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া - হ্যাঁ, আপনি তাকে নিতে পারেন।—বলিয়া পুনরায় পায়চারি আরম্ভ করিলেন।

সন্ধ্যা পাঁচটার সময় কাপ্তেন তাঁহাদিগকে জাহাজে উঠিবার জন্য ডাকিতে আসিল। বন্দরে জলিবোটের নিকট তাঁহারা দেখিলেন একজন লম্বাচোড়া জোয়ান দাঁড়াইয়া আছে—তাহার রং রৌদ্রদগ্ধ, চোখদুটি পাকা জামের মতো কালো কুচকুচে; সে বেশ চটপটে, প্রাণবন্ত; তাহার মুখশ্রী সরল; গায়ে তার নীলরঙের কোট গলা পর্যন্ত আঁটা। তার চালচলন, ছোট্ট গোঁফের সঙীন্‌-উঁচানো মূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই তাহাকে মিলিটারী লোক বলিয়া চেনা যায়;—কারণ এই সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে গোঁফরাখা তত রেওয়াজ ছিল না।

যুবক কর্ণেলকে দেখিয়া তাহার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল এবং বেশ সপ্রতিভভাবে দ্বিধা মাত্র না করিয়া ভাষায় তাহার উপকার করার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইল।

কর্ণেল মাথা নাড়িয়া তাহার প্রতি প্রীতি জানাইয়া মুরুব্বিয়ানা ধরণে বলিলেন—তোমাকে সাহায্য করতে পেরে আমিও খুসি হয়েছি, বাবা।

তাঁহারা নৌকায় উঠিলেন।

যুবক জাহাজের কাপ্তেনকে ইটালিয়ান ভাষায় চুপি চুপি বলিল—তোমার ইংরেজটি দেখছি বেশ সাদাসিধে লোক, আদব-কায়দার তত ধার ধারে না।

কাপ্তেন ইসারা করিয়া বলিল, ইংরেজটা ইটালিয়ান ভাষা বোঝে, আর লোকও তত সুবিধের নয়। যুবক মুচকি হাসিয়া ইসারায় বলিল, সব ইংরেজেরই মাথায় একটু গোলমাল আছে। তারপর সে বসিয়া বসি

একমনে পরম আগ্রহে তাহার রূপসী সহযাত্রিণীটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কর্ণেল ইংরেজিতে কন্যাকে বলিলেন—"ফ্রান্সের সৈনিকগুলোর চেহারা দেখছি বেশ খাসা! ওরই জোরে ওরা চটপট অফিসার হয়ে পড়ে।" তারপর ফরাশী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোকরা বীর, তুমি কোন্ রেজিমেন্টে কাজ কর?"

সে তাহার আত্মীয় কাপ্তেনকে কনুইয়ের এক গুঁতা দিয়া শ্লেষাত্মক একটু হাসি চাপিয়া বলিল, সে নেশানেল গার্ডের ৭ নম্বর ফৌজে কাজ করে।

—তবে তুমি ওয়াটালুর যুদ্ধে গিয়েছিলে? তুমি যে নেহাৎ ছেলেমানুষ!

—আজ্ঞে কর্ণেল, আমার ভাগ্যে সবে মাত্র সেই একটি যুদ্ধেই যাবার সুযোগ ঘটেছিল।

কিন্তু সে যুদ্ধ একটাই যে দুটোর সমান!

যুবক কর্সিক তাহার অধর দংশন করিল।

মিস লিডিয়া ইংরেজিতে বলিল—বাবা, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, কর্সিকেরা তাদের বোনাপার্টকে কি খুব ভালোবাসে?

কর্ণেল এই প্রশ্নটাকে ফরাশী ভাষায় তর্জ্জমা করিবার আগেই যুবক বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলিল—"আপনি ত জানেনই, কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। আমরা নেপোলিয়নের দেশের লোক, আমরা হয় ত তাঁকে ফরাশীদের মতন ভালো বাসতে পারিনি। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার পরিবারে আর তাঁর পরিবারে শত্রুতা ছিল, তবু আমি তাঁকে ভালো বাসি, ভক্তি করি"।

কর্ণেল বলিয়া উঠিলেন—আঁা! তুমি ইংরেজি বলতে পার?

—অমনি কোনো রকমে—সে ত আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।

লিডিয়া যুবকের অগ্রাহের ভাবে কতকটা অবাক হইয়া গেলেও, একটা হাবিলদারের সঙ্গে একজন সম্রাটের শত্রুতার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ইহা তাহার কাছে কর্সিকদের বিশেষত্বের পূর্ব্বাভাস বলিয়া ঠেকিল এবং সে তাহার ডায়েরিতে এই কথাটি টুকিয়া রাখিবে ঠিক করিল।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বোধ হয় বন্দী হয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে না। আমি ফ্রান্সে থেকেই খুব ছেলেবেলাতেই আপনাদের জাতেরই একজন বন্দীর কাছে ইংরেজি শিখেছিলাম।

তারপর লিডিয়াকে বলিল কাপ্তেন বলছিল যে আপনারা ইটালি থেকে আসছেন। আপনি নিশ্চয় টস্কানির বিশুদ্ধ ইটালিয়ান বলতে পারেন; আমার ভয় হচ্ছে, আপনার হয় ত আমাদের প্রাদেশিক কথা বুঝতে একটু কষ্ট হবে।

কর্ণেল বলিলেন—ও ইটালির সকল প্রদেশের ভাষাই বুঝতে পারে। ভাষা শেখবার ওর খুব শক্তি আছে। আমার মেয়ে আমার মতন একেবারেই নয়।

—আপনি আমাদের কথা বুঝতে পারেন? তবে আমাদের কর্সিক গানের এই চরণ দুটিও বুঝতে পারবেন—রাখাল তার গোপিনীকে বল্‌ছে—

থান্‌ জোদী পুণি
জাই জোদী স্বগ্‌গে,
ফিরা আম্‌ এ'হানে
ক্যাবল্‌ তোরি লগ্যে।

লিডিয়া ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল। কিন্তু যুবকের এরূপ ভাবের গান আওড়ানো, বিশেষ কথার সঙ্গের চাহনিটি, তাহার কাছে অত্যন্ত বেয়াদবি বলিয়া মনে হইল। সে লজ্জায় লাল হইয়া জবাব দিল বুঝেছি।

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছ?

—না কর্ণেল। সরকার থেকে আমায় হাফ পেন্সন দিয়ে বিদেয় দিয়েছে—কারণ বোধহয় আমি ওয়াটালুর যুদ্ধে ছিলাম, আরো আমি নেপোলিয়নের দলের লোক। গানে যেমন আছে না, "শূন্য পকেট লয়ে নিরাশার পথ চেয়ে" আমি বাড়ী ফিরে চলেছি।

এই কথা বলিয়া যুবক আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কর্ণেল আপনার পকেট হইতে একটা গিনি তুলিয়া আঙুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাঁহার গরিব দুঃখী সঙ্গীটিকে দিবার জন্য একটা বেশ মোলায়েম রকমের ভূমিকা খুঁজিতে খুঁজিতে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন আমারও ঐ দশা----আমাকেও হাফ-পেন্সনে বিদেয় দিয়েছে; কিন্তু ...... তোমার মাইনের অর্দ্ধেকে তোমার কিই বা হয়, তামাকটুক্ কিনতেও কুলোয় না। এই নেও হাবিলদার।

যুবক নৌকার পাশি ধরিয়া বসিয়া ছিল; কর্ণেল গিনিটি তাহার মুঠির মধ্যে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যুবক প্রথম লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তারপর খাড়া হইয়া বসিল, এবং দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া গম্ভীরভাবে কিছু বলিতে গিয়াই সহসা হাসিতে উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হইয়া গলিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কর্ণেল গিনিটি হাতে করিয়া একেবারে হতভম্ব।

যুবক চট করিয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সহজ ভাবে বলিল কর্ণেল সাহেব মাফ করবেন, আমি আপনাকে দুটি উপদেশ দেবো কখনো কোনো কর্সিককে টাকা পয়সা দেবেন না, কারণ আমার দেশভাইয়ের মধ্যে এমন গোঁয়ার ঢের আছে যে সেই টাকা তারা তৎক্ষণাৎ আপনার মাথায় ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে যা নয় তাকে তা বলে ডাকবেন না। আমাকে আপনি হাবিলদার বললেন, আমি বাস্তবিক কিন্তু লেফটেনাণ্ট। অবিশ্যি তফাৎটা খুব বেশি নয়, কিন্তু ......

সার টমাস বলিয়া উঠিলেন— লেফটেনাণ্ট! অ্যাঁ লেফটেনাণ্ট? তবে যে কাপ্তেন বল্লে যে আপনি হাবিলদার, এমন কি আপনার বাপদাদা সবাই হাবিলদার?

এই কথা শুনিয়া যুবক পিছন দিকে হেলিয়া পড়িয়া এমন হাসি হাসিতে লাগিল যে জাহাজের কাপ্তেন আর তার দুজন মাঝিও হাসিয়া কুটিকুটি হইতে লাগিল।

অবশেষে একটু দম লইয়া যুবক বলিল—কর্ণেল, ক্ষমা করবেন। ভারি মজার ভুল হয়েছে তা আমি আগে বুঝতে পারি নি। সত্যিই, আমাদের পরিবার হাবিলদারের পরিবার বলে' গর্ব্ব করে থাকে বটে; কিন্তু আমাদের দেশে হাবিলদার পদের মানে একটু আলাদা—এদেশের হাবিলদারদের উর্দ্দিতে জরি-জড়াও তকমা চাপরাস থাকে। ১১০০ সালে আমাদের দেশের কতক লোক বিদেশী রাজার অত্যাচারে বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের যে রাজা নির্ব্বাচন করেছিল তার পদবী রেখেছিল হাবিলদার। আমরা সেই বংশের লোক বলে আমাদের দেশে আমাদের খ্যাতি আছে।

কর্ণেল লজ্জিত হইয়া বলিলেন—ক্ষমা করবেন, মাফ করবেন। আপনি বুঝতেই পারছেন আমি ভুল করেছিলাম। বুঝতে পারিনি, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

তিনি যুবকের কাছে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

যুবক বিশেষ ভদ্রতার সহিত তাঁহার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল কর্ণেল, আমার মনে মনে পদমর্য্যাদার যে একটু অহঙ্কার ছিল, এ তার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে— এর জন্যে আপনাকে আমি একটুও দোষ দিচ্ছিনে। আমার বন্ধু কাপ্তেন দেখছি আমার ঠিক পরিচয় দেন নি; এখন আমিই আমার পরিচয় দিচ্ছি মাফ করবেন। আমার নাম অর্সো দে-লা রেবিয়া, হাফ-পেন্সনে বরখাস্ত লেফটেনাণ্ট। আপনার এই প্রকাণ্ড কুকুর দুটো দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি কর্সিকায় শিকার করতে চলেছেন— যদি আমার আন্দাজ সত্যি হয়, তবে আপনার সঙ্গে আমার দেশের পাহাড় জঙ্গলের পরিচয় করিয়ে দেবার অধিকার পেলে আমি বিশেষ সৌভাগ্য মনে করব...... ..

এই বলিয়া যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

নৌকা আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। যুবক লিডিয়ার হাত ধরিয়া জাহাজে তুলিয়া দিয়া কর্ণেলকেও উঠাইয়া দিল। সার টমাস তখনো তাঁহার বিশ্রী ভুলের অপ্রতিভ ভাব সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই; তখনো তিনি ভাবিতেছিলেন যে ১১০০ সালের পুরাতন রাজবংশের লোকটির প্রতি যে বেয়াদবি করা হইয়াছে তাহা তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া দেওয়া যায়; তাই তিনি পুনরায় তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া ও তাহার করকম্পন করিয়া কন্যার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে রাত্রে তাঁহাদের সহিত আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। লিডিয়া বেশ একটু ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিল, কিন্তু হাবিলদারের যথার্থ মানে জানিয়া সে যে বিশেষ নারাজ হইয়াছিল তাহা মনে হইল না; এখন তাহার অতিথিটিকে তাহার

নিতান্ত মন্দ ঠেকিতেছিল না, এমন কি তাহার মধ্যে সে একটা অভিজাত-মর্য্যাদার আভাস দেখিতে পাইতেছিল; কেবল তাহার অতিরিক্ত সরলতা আর অতিরিক্ত চঞ্চল আনন্দ উপন্যাসের নায়কের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল না।

হাতে মদের গেলাস ধরিয়া কর্ণেল ইংরেজি কায়দায় নমস্কার করিয়া বলিলেন—লেফটেনাণ্ট, আপনাদের বংশের অনেক লোককে আমি স্পেনে দেখেছি যুদ্ধে ওস্তাদ প্রসিদ্ধ পাইক সৈন্য।

যুবক লেফটেনাণ্ট গম্ভীর হইয়া বলিল—হাঁ, স্পেনে গিয়ে অনেকেই বাস করেছে।

ভিট্টোরিয়ার যুদ্ধে এক ফৌজ কর্সিকের বীরত্ব আমি কখনো ভুলব না, সে কথা আমার এইখেনে গাথা আছে (বলিয়া কর্ণেল আপনার বুক দেখাইলেন)। সমস্ত দিন ধ'রে তারা বাগানের বেড়ার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছে, আমরা যে তাদের কত লোক কত ঘোড়া মেরেছি তার লেখা জোখা ঠিক ঠিকানা নেই; শেষে তাদের সরে যাওয়াই ঠিক হ'লে সকলে জড়ো হয়ে সারবন্দি হতে লাগল। আমরাও ঠিক করলাম এই গাধাগুলোকে····· অ্যা ওর নাম কি, মাফ করবেন লেফটেনাণ্ট, সেই সব বীরপুরুষদের আমরা বেশ জব্দ করে দেবো।—তারা এখন একজায়গায় জড়ো হয়েছে, এখন আর টিক ফস্কাবার কোনো সম্ভাবনাই রইল না। সেই ব্যূহের মাঝখানে, এখনো যেন আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে, একটা ছোট কালো ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন একজন সেনাপতি; তিনি পতাকার ঠিক কাছে কাছেই একটা চুরুট ফুঁকছিলেন, যেন নেমন্তন্নে চলেছেন এই রকম বেপরোয়া ভাবটা। তারপর যেন আমাদের অবজ্ঞা করে তারা আমাদের কানের কাছে ভেঁপু ফুঁকে রওনা হল।......আমি আমার ৩ রেজিমেণ্ট সৈন্য নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ...বাঃ! তাদের ব্যূহের সামনের সার ভাঙতে না পেরে আমার সৈন্যেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পাশে হটে যেতে লাগল, অনেক ঘোড়াই সোয়ার-শূন্য পিঠ নিয়ে পালাতে লাগল!......আর সেই সঙ্গে সেই শিঙা বাদ্য! যখন ধোঁয়ার পর্দ্দা সরে গেল, দেখলুম পতাকার পাশে সেই সেনাপতি তেমনি খাতিরনাদা ভাবে চুরুট ফুঁকছে! রাগের চোটে আমি নিজে সবার আগে গিয়ে আবার তাদের আক্রমণ করলুম। তাদের বন্দুক ক্রমাগত আওয়াজ করে' করে' আর যখন আওয়াজ করা চলে না, তখন তারা ঘোড়ার মাথার ওপর বন্দুক পেতে সঙ্গিন উঁচিয়ে ছ চৌপারে যখন দাঁড়াল, সে যেন লোহার দেয়াল! আমি চীৎকার করে আমার সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে ঘোড়ার পেটে যখন রেকাবের গুঁতো কসিয়ে এগুব, তখন সেই যে সেনাপতি যার কথা বলেছি সে, মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে হাত দিয়ে তার লোকদের আমায় দেখিয়ে দিলে। আর যেন বললে—ঐ সাদা চূড়ো! আমার টুপিতে শাদা পালকের চূড়া ছিল। তার হুকুম বৃথাই আমার কানে যায় নি, সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলিও আমার বুকের মধ্যে বাসা নিলে।—তোফা ফৌজ, এর কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

গল্প শুনিতে শুনিতে অসোর চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—হাঁ, তারা তাদের পতাকা বাঁচিয়ে চলে যেতে পেরেছিল; কিন্তু সেই বীরপুরুষদের বেশির ভাগ সেই ভিট্টোরিয়ার ক্ষেত্রেই রয়ে গেল।

— আপনি সেই সেনাপতিকে চেনেন?

—তিনি আমার বাবা। সেই দিনের যুদ্ধে তিনি মেজর থেকে কর্ণেল হয়েছিলেন।

— আপনার বাবা! যথার্থ বীরপুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মূর্ত্তি আমার মনে গাথা হয়ে আছে, দেখলেই চিনতে পারব। তিনি বেঁচে আছেন ত?

যুবক মলিন পাংশুবর্ণ হইয়া বলিল—না।

— ওয়াটার্লুতে তিনি ছিলেন?

—ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুর সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।......তিনি দেশেই মারা গেছেন......৩ বৎসর হ'ল। বাঃ! সমুদ্রটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে......দশ বৎসর পরে আজ সমুদ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ।.....আচ্ছা মিস লিডিয়া, মহাসমুদ্রের চেয়ে ভূমধ্যসাগর আপনার সুন্দর মনে হয় না?

বড্ড বেশি নীল মনে হচ্ছে··· আর ঢেউগুলোও তেমন জমকালো নয়।

—আপনি কি বুনো দৃশ্য ভালো বাসেন? তবে কর্সিকা আপনার ভালো লাগবে আশা হচ্ছে।

কর্ণেল বলিলেন—আমার মেয়েটির পছন্দ কিছু অসাধারণ রকমের। তাই ইটালি ওর একটুও ভালো লাগে নি।

অর্সো বলিল—আমি পিজা ছাড়া ইটালির আর কিছুই দেখিনি; পিজাতে কিছুদিন আমি কলেজে পড়েছিলাম। সেখানকার কথা মনে হলেই কাম্পো সান্তো গোরস্থান আর ডুম গির্জ্জার কথা মনে পড়ে, আর আমি অবাক হয়ে যাই। কাম্পো সান্তো গোরস্থানে অর্কাগ্নার আঁকা ছবি 'মৃত্যু' আপনাদের মনে পড়ে নিশ্চয়ই। আমার মনে সেটা এমন বসে গেছে যে মনে হয় যেন আমি সেটা এঁকে দেখাতে পারি।

লিডিয়ার ভয় হইতেছিল যে লেফটেনাণ্ট সাহেব আবার উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা না জুড়িয়া বসে। তাই তাহার কথার মাঝখানে সে বলিল—হাঁ, সেটা খুব সুন্দর বটে।—বাবা, তোমরা কিছু মনে কোরো না, আমার বড় মাথা ধরেছে, আমি আমার কামরায় চল্লুম।

সে পিতার মস্তকে একটি চুম্বন করিয়া, রাজরাণীর কায়দায় মাথা নত করিয়া অর্সোকে নমস্কার করিয়া, আপনার কামরায় নামিয়া গেল। যোদ্ধা দুজন তখন যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্পে মাতিয়া উঠিল।

কথায় কথায় জানা গেল যে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তাঁহাদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল আর পরস্পরে পরম আগ্রহে গুলি ছোড়াছুড়িও হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের প্রীতি দ্বিগুণ প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহারা নেপোলিয়ান, ওয়েলিংটন আর ব্লুকারের সমালোচনা জুড়িয়া দিলেন, তারপর ভবিষ্যতের কল্পনায় একসঙ্গে অনেক বরাহমৃগ শিকারও করিলেন। যখন রাত্রি গভীর এবং শেষ বোতল শূন্য হইল তখন কর্ণেল লেফটেনাণ্টের করকম্পন করিয়া শুভরাত্রি কামনা করিলেন, এবং যে পরিচয় এমন হাস্যকর ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা যে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে এই আশা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা যে যার জায়গায় শয়ন করিতে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের মায়া

(গান)

(King Nicholas of Montenegro)

"দেশের 'পরে কিসের মায়া?"—
সুধায় কে ও? বল্ গে ওরে,—
বাধা যে মন দেশের সনে
গানের প্রাণের লক্ষ ডোরে।
টানে আমার রক্ত টানে
মুক্ত হাওয়ার মুক্তি পানে,
দুঃখ-সুখের তীব্র মধুর
মৌন স্মৃতি টান্‌ছে মোরে।
চোখ-জুড়ানো আকাশ পাথার,—
পাহাড় সে কাতারে কাতার,—
সাঁতার দিয়ে হৃদয় ফেরে
তারেই ঘিরে জনম ভ'রে।
এইখানে যে সোনার আলো,
বাইরে খালি আঁধার কালো,
হেথাই চলে জীবন ধারা
আপন বেগে আপন জোরে।
ফুলের গন্ধ প্রেমের স্মৃতি
সোনার স্বপন পুণ্য গীতি
স্নিগ্ধ ছায়া মায়ের মায়া
দেশের মায়ায় মূর্ত্তি ধরে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি

রাঁচি জেলা ভারতবর্ষের আদিম জাতিসমূহের একটি প্রধান আবাসভূমি। ওরাওঁ দ্রাবিড়জাতির অন্তর্ভুক্ত, সংখ্যায় ইহারা আদিম জাতিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশিষ্টতায় ইহাদের স্থান মুণ্ডাদিগের পরেই। ছোটনাগপুর স্থানটি খুব উঁচে অবস্থিত, বনানীমণ্ডিত বন্ধুর

মাতৃমূর্ত্তি।

জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেল কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

COLOUR BLOCKS AND PRINTING BY U. RAY & SONS, CALCUTTA

ওরাওঁ পঞ্চায়েত।

শৈলশ্রেণী ইহার চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া রাখিয়াছে, সেই কারণেই বোধ হয় এখানে বহু পুরাতন রীতিনীতি আচারব্যবহার প্রভৃতি এখনো দেখা যায়।

দশ বৎসরের মধ্যে (১৯০১—১৯১১) ইহাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা পঁচিশ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১১ সালের গণনায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বাদ দিয়া ইহাদের সংখ্যা হইয়াছিল ৭৫১,৯৮৩। পুরুষ ৩৭৩,০৯৫, ও স্ত্রীলোক ৩৭৮,৮৮৮। তন্মধ্যে ১৫৭,৪১৪ জন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, বাদবাকি ৫৯৪,৫৬৯ জনের ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারণা নাই।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অখৃষ্টান ওরাওঁদের সংখ্যা এইরূপ—

বেহার ও উড়িষ্যা	...	৪৭৪,৬৭৩
বঙ্গদেশ ...	...	১৬৫,৬২৮
বেরার ও মধ্যপ্রদেশ	...	৮৩,০৪৯
আসাম ...	...	২৮,৫৮৩

কেবলমাত্র রাঁচি জেলাতেই অখৃষ্টান ওরাওঁএর সংখ্যা ৩১০,১২১ ও পালামৌ জেলায় ৩৬,৬১১ জন।

অন্যান্য দ্রাবিড়বংশীয়দের মত ওরাওঁদের আকৃতি খর্ব্ব, মাথা সরু ও নাক চ্যাপ্টা। ইহাদের গাত্রচর্ম্ম ঘোর বাদামি, চুল কালো খসখসে, কখনো বা সামান্য কোঁকড়ানো। মাথায় চুল যথেষ্ট থাকিলেও গাল ঠোঁট ও শরীরের অন্যান্য অংশে তেমন হয় না। সামান্য যা গোঁফদাড়ি তাও প্রায়ই বিশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে বাহির হয় না। ইহাদের চক্ষু মাঝারি আকারের, চক্ষুতারকা কালো ও অক্ষিপল্লবের ব্যাস বাঁকা নয়। উঁচু চোয়াল ও পুরু ঠোঁট। পায়ের ডিম সুপুষ্ট।

খর্ব্বাকৃতি হইলেও ইহাদের সুন্দর স্বাস্থ্য, সদানন্দ ভাব ও সারল্যহেতু যুবক-যুবতীগণকে কতকটা সুন্দর দেখায়। কিন্তু মধ্যবয়স পার হইলেই কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই কুশ্রী হইয়া পড়ে।

ওরাওঁ বলিষ্ঠদেহ, মাথা উঁচু করিয়া চলে। শরীরে বেশ

সুসজ্জিত ওরাওঁ যুবক।

ওরাওঁ বৃদ্ধ।

ওরাওঁ রমণীর জল বহন।

ধনুর্দ্ধর ওরাওঁ বালক।

ওরাওঁদিগের যুদ্ধ তাণ্ডব।

ইহারা ধাক্কা মারিয়া নড়ায়; টানিয়া নহে। ভারতবর্ষে সাধারণত যে ভাবে কুঠার ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহারাও সেইরূপ করে, দুই হাতে হাতল ধরিয়া মাথার উপর উঠায়, তারপর কর্ত্তনীয় দ্রব্যটির উপর আঘাত করে।

ওরাওঁ পাহাড়ে উঠিতে বেশ দক্ষ। ইহাদের ছেলেরা কতকগুলা ডালপালা লইয়া পাহাড়ে ওঠে ও সেখানে প্রত্যেকে এক একটা ডালের উপর সারি দিয়া পা ছড়াইয়া বসে ও পাহাড়ের গা বাহিয়া হড় হড় করিয়া নামিয়া আসে। এ খেলাটা ছেলেদের খুব প্রিয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই গাছে চড়িতে সক্ষম। কখন কখন স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার প্রধান কারণ দেখান হয় যে সে গাছে চড়িতে পারে না! ইহারা অনেক রকম গাছের পাতা খাইয়া থাকে, উহা সংগ্রহ করা স্ত্রীর সাধারণ কাজের মধ্যে। গাছে চড়িবার জন্য ইহাদের কোনো বিশেষ রীতি বা যন্ত্রপাতি নাই।

ঘোড়ায় চড়া প্রচলিত নাই, কারণ সাধারণ ওরাওঁএর ঘোড়া কিনিবার সঙ্গতি নাই। তবে ইহাদের ছেলেরা চরাইবার সময় বা ক্ষেত্রকর্ষণের পর বাড়ী ফিরিবার সময় মহিষের পিঠে চড়ে। সাধারণত যুবকেরা দৌড়িতে ও লাফাইতে পটু। এক টানে প্রায় তিন মাইল পথ দৌড়িতে সক্ষম। রাঁচি জেলায় নদী ও পুকুরের অভাব। সেইজন্য অনেকে দাঁড় বাহিতে বা সাঁতার দিতে পারে না। ইহারা ভাল তীর ছুড়িতে পারে।

ব্যায়াম যখন না করে তখন প্রাপ্তবয়স্ক ওরাওঁ চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে থাকিতে সমর্থ ও ব্যায়ামের সময় প্রায় বারো ঘণ্টা অনাহারে কাটাইতে পারে। সাধারণত প্রতিরাত্রে ইহারা সাত ঘণ্টা নিদ্রা গেলেও প্রয়োজন হইলে অক্লেশে সারারাত অনিদ্রায় কাটাইয়া যায়। উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা এক রকম না ঘুমাইয়া নাচ গানে দুই তিন বা ততোধিক রাত্রি অতিবাহিত করে।

একটা সামঞ্জস্য আছে, সে দৃঢ়ভাবে পা ফেলিয়া হাটে। পা দুটি সোজা কিন্তু বেড়াইবার সময় বা দৌড়িবার সময় পায়ের আঙুলগুলি অল্প ছড়াইয়া পড়ে। বেড়াইবার সময় হাত যখন না দোলে তখন ঝুলিয়া থাকে, হাতের চেটো সামনে থাকে। সহজ অবস্থায় যখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন হাত দুইখানি পাশে ঝুলিতে থাকে ও একটি পা আগাইয়া থাকে। নিদ্রার সময় ইহারা পাশ ফিরিয়া শয়ন করে ও আহারের সময় দুই হাঁটু উঁচু করিয়া বসে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সাধারণত দুই মণ ওজন অনায়াসে ঘাড়ে করিয়া বহন করে। এই ওজন ঘাড়ে করিয়া দিনে সে ৩০।৩৫ মাইল চলিতে পারে; কেবল একদিন নয়, একাদিক্রমে কয়েকদিন চলিতে সমর্থ। ভারি বোঝা কাঁধে করিয়া পাঁচ ঘণ্টারও কমে একজন ওরাওঁকে তেইশ মাইল অসমান রাস্তা হাঁটিতে দেখা গিয়াছে, ভ্রমণের পর তাহাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখায় নাই এবং সে বলিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে সে সেই দিনই আরো চলিতে সমর্থ। অথচ সে ব্যক্তি মোট বহন করিতে অভ্যস্ত বা অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন, এমন নয়!

সাধারণত ইহারা বাঁকে করিয়া মোট বহন করে। স্ত্রীলোকেরা জলের কলস বা অন্য কিছু বহন করিবার সময় মাথায় বসাইয়া লইয়া যায়। ভারি জিনিস নড়াইতে হইলে

ওরাওঁ রমণীর নৃত্যোৎসব।

অনাবৃত মস্তকে সূর্য্যের উত্তাপ ও ঠাণ্ডা উভয়ই ইহারা সহ্য করিতে পারে।

যৌবনে পুরুষ ও নারীর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য, মনের আনন্দ, শারীরিক পরিশ্রমে আশক্তি; আর বার্দ্ধক্যে কর্ম্মে অনিচ্ছা, নিরানন্দ ভাব; ও দেবতার কোপ এড়াইয়া কোনো রকমে জীবন কাটাইয়া দিয়াছে—এই চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইয়া সুরাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া—ইহাই এক কথায় ওরাওঁ-জীবনের মোটামুটি ইতিহাস।

রাঁচি। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

পঞ্চশস্য

গুপ্তচরের দ্বারা রাজ্যশাসন—

Twentieth Century নামক আমেরিকার একটি মাসিক পত্রে আমেরিকার রাষ্ট্রশাসনতন্ত্রে গুপ্তচরের উৎপাত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের পাঠকদের কাছেও কৌতূহলজনক ঠেকিবে জানিয়া নিয়ে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে গুপ্তচরেরা মনুষ্যের মধ্যে ঘৃণ্যতম জীব বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। আমেরিকার কর্ত্তৃপুরুষগণ বিষয়টি এত উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহারা জনসাধারণের মন হইতে এই ঘৃণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের নামটাকে মনোরম করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন। এইসকল গোয়েন্দাদিগকে এখন "বিশেষ প্রতিনিধি" (Special Agents) "পরিদর্শক" (Inspectors) প্রভৃতি সাধু নামে অভিহিত করা হইতেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে গোয়েন্দাপরায়ণতা যে বদ্ধমূল হইতেছে, এইসকল ভদ্র নামকরণের চেষ্টায় তাহা প্রমাণ হয়।

আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের কর্ত্তৃগণ কোন সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগের এই প্রণালীর (অর্থাৎ যাহার দ্বারা তাঁহাদিগের সত্তা রক্ষা হইয়া থাকে তাহার) একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিয়া পড়েন; এবং তাঁহাদের পশ্চাতে একদল "হুজুগে" আছেন,

ধর্ম্মনীতিকে যাঁহারা দুর্ব্বলতা জ্ঞান করেন ও হাতুড়ে বৈদ্যের মত মুষ্টিযোগের চিকিৎসাকেই যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ভবরোগের একমাত্র চিকিৎসা বলিয়া জানেন, তাঁহারাই গুপ্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিতান্ত বিবেচনাশূন্য হইয়া গলাবাজি করিয়া থাকেন। আর রাষ্ট্রের মাতব্বর মুরুব্বিরা ত নূতন বিধিব্যবস্থা করিবার একটা উপলক্ষ পাইলে উৎসাহিত হইয়া উঠেনই। তাঁহারা গুপ্তচরদিগকে নূতন নূতন বিষয়ে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। এই গুপ্তচর বিভাগ রক্ষার জন্য আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট যে নব্বই লক্ষ ডলার (এক ডলার=৩৷৵০) ব্যয় করিয়া থাকেন অতি অল্প সংখ্যক লোকই ইহার ফলাফল সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন। এবং রুযভেল্টের ইচ্ছানুযায়ী ইহার ব্যয় দ্বিগুণিত করিলে যে কি কাণ্ড হইবে তাহা মনে করিলে ভয় হয়।

সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ গুপ্তচরই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যাপারের অনুসন্ধানে সময়োপযোগী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অল্পকালের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের বেতন ৭৫ হইতে ১০০ ডলার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাতেই ইহাদের যোগ্যতা ও মূল্য বুঝা যাইবে। সর্দ্দার গোয়েন্দাগণ অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পাইয়া থাকেন এবং বিশিষ্টতর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সম্ভবত গোয়েন্দা পিছু বৎসরে গড়ে ১৫০০ ডলারের অধিক বেতন কখনো ধার্য্য হইবে না। অর্থাৎ আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ সংরক্ষণের জন্য যে নব্বই লক্ষ ডলার ধার্য্য আছে তাহার দ্বারা প্রায় ৬০০০ ছয় সহস্র গুপ্তচর নিযুক্ত হইতেছে। শান্তপ্রকৃতি ও স্বাধীনতাপ্রিয় (?) সভাপতি রুযভেল্ট সম্ভবতঃ ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই ইহার সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রায় এক কোটি নির্ব্বাচকের (Voters) গতিবিধি অনুসন্ধানের জন্য প্রায় বার হাজার গোয়েন্দা অথবা প্রতি আট শত জনের পিছু একটি করিয়া গোয়েন্দা নিযুক্ত হইত। গভর্ণমেণ্টের এই অসংখ্য গোয়েন্দার সহিত যদি Blackmailing Society (লোকনিন্দার ভয় দেখাইয়া ঘুস আদায় করা যাহাদের ব্যবসায়), মুনিসিপ্যাল গোয়েন্দা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন নামধারী গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচরের সংখ্যা যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে প্রতি ৪০০।৫০০ নির্ব্বাচক পিছু একজন করিয়া গোয়েন্দা নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক কি উপায়ে ইহাদের কার্য্যাবলী পরিচালিত হয়।

যাহারা অপরাধ করিয়াছে তাহাদের দোষানুসন্ধানই যে গোয়েন্দার একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা নহে। এমন কি আমেরিকার ডাক বিভাগের গোয়েন্দাগণ কোনরূপে কাহাকেও নিয়মভঙ্গে প্ররোচিত করা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের একটা বিশেষ অঙ্গ বলিয়া মনে করে; কারণ তাহারা যে পরিমাণে দোষীর সংখ্যা জুটাইতে পারে সেই পরিমাণে তাহাদের পুনঃ পুনঃ গোয়েন্দা রূপে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা বাড়িতে থাকে। বালিকাদিগকে অসদ্ব্যবসায়ে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার মকদ্দমায় ঠিক ঐরূপ একটী ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে গোয়েন্দাগণ কাহাকেও দোষী খুঁজিয়া না পাইয়া প্রায় চারি সহস্র ডলার ঘুস দিয়া কাহারও দ্বারা উক্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। অপরাধ নিবারণ করিতে গিয়া অপরাধ সৃষ্টি করা অবশ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নহে, কিন্তু গুপ্তচরের সাহায্যে যেখানে একটী অমঙ্গল উৎপাটিত হইবে সেখানে অনেকগুলি অমঙ্গলের বীজ রোপিত হইতে থাকিবে ইহা অনিবার্য্য। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" এই বুধবচনটীর অনুসরণে আত্মশত্রুবিমর্দ্দন ও জবরদস্তি অর্থগ্রহণের এমন সুযোগ অনেকেই ছাড়িতে পারে না।

কেবলমাত্র গুপ্তচর বিভাগের কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে নিজের সততা প্রমাণ করিবার জন্য কিরূপে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হয় তাহার বিবরণ যদি কেহ জানিতে উৎসুক হন তবে তাঁহার "যুক্তরাজ্য গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক" (The Shame of the United States Government) নামক পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। ইহাতে মিঃ কোর্টল্যুর (Cortlyou) অত্যাচারকাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি সেণ্টলুই, মিসোরীর, লিউইস পাবলিশিং কোম্পানীকে জব্দ করিবার জন্য উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য ইঁহাদিগকে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতে হইয়াছে।

এসকল ছাড়া লোকের সর্ব্বনাশ করিবার, লোকের ব্যবসা ভাঙিবার আরও একটা উপায় আছে। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে একজন ব্যবসায়ী, গোয়েন্দা বিভাগের কোন কর্ত্তা বা ঐ কর্ত্তাদিগের বন্ধু কোন রাজনৈতিক প্রধান পক্ষকে কোনরূপে অসন্তুষ্ট করিয়াছেন। অমনি অপমানকারীর পশ্চাতে পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগান হইল। তাহারা ডাকের চিঠি খুলিয়া, তাহার পাড়ার ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া, কয়েকমাসের মধ্যেই তাহার বন্ধুবান্ধব ও সহব্যবসায়ীদিগের নাম ধাম কাজ কর্ম্ম সব আয়ত্ত করিয়া লইল। তারপর সুধু ইহার দ্বারাই তাহাকে ফাঁসাইতে আর কতক্ষণ লাগে। কিন্তু তাঁহারা সুদ্ধ ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন না। ঐ ব্যক্তির সহব্যবসায়ীদিগের নিকট তাঁহারা অতি সংগোপনে এবং বন্ধুভাবে তাঁহাদিগের প্রতি উহার ব্যবহার ভাল কিনা জানিতে চান; এমনকি যদি কোন ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য থাকে ত নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত হন। ফল এই হয় যে ভাগ্যক্রমে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু খুঁজিয়া না পাইলেও তাঁহার সহব্যবসায়ীগণ তাঁহাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে এবং আস্তে আস্তে ও ভয়ে ভয়ে তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করে। কেন যে তাহার প্রতি সকলে বিমুখ হইল তাহা জানিবারও উপায় থাকে না।

অর্থ বা রাজনৈতিক সম্মান লাভের ইচ্ছা যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন গুপ্তচরবিভাগের মত এমন একটা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে। যদিই বা ভাগ্যক্রমে কর্ত্তারা উদারপ্রকৃতি ও উচ্চমনা হন তথাপি তাঁহাদিগের সেই উদারতা ও উচ্চভাব তাঁহাদের সেই দশহাজার অনুচরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করান সম্ভব নয়।

কর্ত্তারা সংশ্লিষ্ট থাকুন বা না থাকুন তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ যে আপন আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীচ প্রথা-সকল অবলম্বন করিতে ছাড়িবে না ইহা নিশ্চয়। কারণ দোষীর সংখ্যা যাহার ভাগে যত বেশী পড়ে তাহার পদোন্নতি তত শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাহারা ঐসকল কার্য্য নিষ্পন্ন করে তাহা মোটে দেখা হয় না।

আরো বহু উপায়ে গোয়েন্দাসর্দ্দারগণ লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। হয়ত 'ক'য়ের উপর একজন গোয়েন্দা সর্দ্দারের কুনজর পড়িল। অমনি 'ক'য়ের পশ্চাতে বহু গোয়েন্দা লাগিয়া পড়িল। গোয়েন্দাকে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের হিসাব দিতে হয়। এবং ঐ গোয়েন্দাকে সাধারণতঃ গোয়েন্দাপ্রভুগণ এত অবিশ্বাস করেন যে উহার পশ্চাতে আবার আর একটা গোয়েন্দা নিযুক্ত হয় এবং কখনও কখনও ঐ দ্বিতীয়টার পশ্চাতে তৃতীয় একটাকেও লাগান হয়। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলে। যখন প্রথম গোয়েন্দা তাহার রিপোর্ট দাখিল করে এবং তাহা দ্বিতীয়ের সহিত মিলাইয়া দেখা হয়, তখন প্রায়ই ঐ দুই রিপোর্টের মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ করিয়া যাহার রিপোর্টের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাহাকে তাহার রিপোর্ট সংশোধন করিয়া আনিতে অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ যাহা চান তাহা লিখিয়া আনিতে বলা হয়। ইহাতে যদি সে আপত্তি করে তবে তাহাকে যথেষ্ট ভয় দেখান হয়। সুতরাং ইহার পর লিখিয়া দিতে সে আর কোন বিশেষ আপত্তির কারণ খুঁজিয়া পায় না; বিশেষ যখন পশ্চাতে প্যায়দার গুঁতার ভয় আছে। সে দিব্য নিশ্চিন্তমনে লিখিয়া দেয়। হঠাৎ বৎসরেক পরে হয় ত সে যাহা মিথ্যা বলিয়া লিখিয়াছিল তাহাই সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে তাহার ডাক পড়ে। জজ ও জুরীগণের এইরূপ সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কোন প্রকাশ্য কারণ নাই। সুতরাং নিতান্ত নিরপরাধ সেই 'ক' একেবারে মারা পড়ে।

ইতিহাসের আরম্ভ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সব দেশেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। এবং মার্কিনরাজ্যও ইতিহাসবহির্ভূত নহে। সুতরাং প্রত্যেক দেশপ্রাণ ব্যক্তিরই এই প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত। প্যাটারসন্ (Patterson) নামক জনৈক ইংরাজ আইনব্যবসায়ী তাঁহার "Liberty of the Press" নামক গ্রন্থে এই গুপ্তচরতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক সুধী ব্যক্তির মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই

একবাক্যে ইহার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক টাসিটসের একটী কথা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

It was said that in Trajan's time (100 A. D.) as his highest praise, that every man might think what he pleased, speak what he thought, and that the only persons who were hanged were the spies and informers, who used in former reigns to make it their trade to discover crimes.

শ্রীজীবনময় রায়।

জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম (Shin Bukkyo):—

নব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুখ-পত্র শিন্ বুককিয়োতে জাপানের সুধী লেখক ডাক্তার এনরিয়ো ইনুয়ি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি দেশের লোকের বীতরাগের জন্য ক্ষোভ করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, জাপানে এখন চারিদিকে আশা ও আনন্দের যে রাগিণী জাগিয়া উঠিয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের দুঃখ-বাদ তাহার সহিত ঠিক সুর মিলাইতে পারে না। মহাযানের উদ্বোধন না করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি জাপানীর এ বীতরাগ লুপ্ত হইবার আশাও বড় দেখি না। শিল্পবাণিজ্যে ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান যেরূপ অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাহার আস্থা ও শ্রদ্ধাও ঠিক সেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অথচ প্রাচীন জাপানের উপর এই ধর্ম্মের কি অভাবনীয় প্রভাবই না বিস্তারিত হইয়াছিল। বিষয়টা সম্বন্ধে আর নিশ্চেষ্ট থাকা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, রীতিমত আলোচনা করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় এখন আসিয়াছে। বর্ত্তমান কালের জাপানী শিক্ষা শুধু মস্তিষ্কটাকেই বিকশিত করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত; হৃদয়ের পানে ফিরিয়াও চাহে না। ইহারই ফলে বহু যুগযুগান্তের এই প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ দ্রুত শিথিল হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ সামুরাইগণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মে আর বড় বিশ্বাস রাখেন না। ধর্ম্মের প্রতি এই বীতরাগের একটি প্রধান কারণ, অবশ্য রাজ অবহেলা, তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে ধর্ম্ম কালের পরিবর্ত্তনে তাহার রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতার মাত্রা আপনা হইতেই শিথিল করিয়া সংস্কারের চেষ্টা না করে, এই কর্ম্মময় যুগে সে ধর্ম্মের পক্ষে টিঁকিয়া থাকা কঠিন ও একরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। জাপানেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আজ সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর চারিদিকে এখন কর্ম্মের আহ্বান পড়িয়া গিয়াছে, ব্যস্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চারিদিকে চেষ্টার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, অবসাদ জর্জ্জরিত ধর্ম্ম এখন দুঃখ বাদের করুণ সুর জাগাইয়া তুলিলে, লোকের চিত্ত অবজ্ঞায় অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিবেই। সে ধর্ম্মের শাসন এড়াইবার জন্য তখনই তাহারা উদ্যত হইবে। সময় থাকিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সতর্ক হওয়া উচিত। হীনযানের সুর ছাড়িয়া মহাযানের উদ্বোধন সুর ধরিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাপানীর চিত্তে আবার আত্মপ্রভাব জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, নহিলে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ বড় শুভ নহে। এই আশার রাগিণী ধরিতে পারিলে তবেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম আধুনিক জাপানীর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইতে সক্ষম হইবে; ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ও আর দেখা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আপনাকে সুসংস্কৃত করিয়া লইলে, আবার তাহার লুপ্ত প্রভাব-গৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে। এইভাবে লোকের চিত্তে আবার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, রাজ-অবহেলার সহস্র বিঘ্নও তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

পারস্যের নব নারী (The Moslem World):—

এনি উডম্যান্ ষ্টকিং লিখিয়াছেন, পারস্য তাহার মোহ-নিদ্রার পাশ কাটাইয়া আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। এ জাগরণের তরঙ্গ পারস্যের নারী সমাজকেও স্পর্শ করিয়াছে। মোটা পর্দার আবরু কাটাইয়া, পারস্য নারী আজ সহকর্ম্মিণীরূপে পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চোখে সুরমা টানিয়া, সজ্জিত বেশে পারস্য নারী আজ শুধু বাতির আলোয় আলো করা শয়ন-কক্ষটির মধ্যে স্বামীর আদর-সোহাগের প্রতীক্ষায় পুতুলটির মত বসিয়া থাকেন না; আজ তিনি পুরুষের হাত ধরিয়া বাহিরের কাজেও তাহাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া, বিশ্রী মোটা জুতা পায়ে দিয়া, বিদেশীর বিদ্রূপ হাসি জাগাইয়া, পারস্য নারীর পথে সে নাকাল হইয়া চলা—এ দৃশ্য আজ আর কাহারও চোখে পড়িবে না। এখন তাঁহার পরিচ্ছদে একটা পরিপাটী শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। পথে চলিবার সময় পারস্য নারী তাঁহার পাশ্চাত্য ভগিনীর "স্কার্টের" অনুরূপ বেশ পরিধান করেন—মাথা ও গা বেড়িয়া চাদর টানিয়া দেন। পূর্ব্বে মাসে একবার কেশ রচনা করিতেন, এখন তাহা প্রত্যহই করিয়া থাকেন।

গৃহে অতিথির সমাদর তেমনই প্রগাঢ় আছে; তবে এখন অনর্থক আর অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আহার্য্য সাজাইয়া, ঐশ্বর্য্যের বহর দেখাইয়া, পারস্য নারী অতিথির তাক্ লাগাইবার চেষ্টা করেন না—ইহা যে অপব্যয়, এবং এ অপব্যয়ে কল্যাণ দেশ ছাড়িয়া পলায়, এ কথা পারস্য নারী আজ বুঝিতে পারিয়াছেন। যেটুকু আহার্য্য-প্রয়োজন, যেটুকু শোভন, সেইটুকুই সুন্দর করিয়া সযত্নে তিনি অতিথির সম্মুখে ধরেন—আতিথ্যের সে আড়ম্বর নাই, বিনয় বচনের জাল বুনিয়া অতিথির মন যোগাইবার আয়াস নাই, সে সকল প্রকার বাহুল্য ত্যাগ করায় আতিথ্যের মধ্যে পারস্য নারী আজ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয়খানি ঢালিয়া দিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে অতিথিকে ঘিরিয়া দাসী বাঁদীর দল দাঁড়াইয়া থাকিত, একটা কথা বলিতে হইলে সহস্র আদব-কায়দার ভূমিকা ফাঁদা হইত, অতিথিও, বিশেষ সে অতিথি বিদেশী হইলে—সঙ্কোচে যেন এতটুকু হইয়া পড়িত। সে ভাব এখন কাটিয়া গিয়াছে। এখন এই লোক প্রথিত পারস্য আতিথেয়তায় একটি নির্ম্মল সদানন্দময় সরলতা, ও অনাড়ম্বর সুকুমার শান্তি সূচিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে অতিথির সম্মুখে দাঁড়াইয়া পারস্য নারী যেখানে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বড় বড় সেলামান্তে নিবেদন করিতেন, "হে খানুম্, আমরা পারস্যের রমণীগুলা বর্ব্বর, নিতান্তই বর্ব্বর,—আদব কায়দার কিছুই জানি না, সহস্র ত্রুটি ঘটিতেছে, ক্ষমা করিবেন," এখন সেখানে তিনি শুধু বলেন, "ছেলেবেলায় শিক্ষা ত তেমন কিছু পাইনি; তখন তার কোন বন্দোবস্তও কিছু ছিল না, তাই—যা হল এতে দোষ থাকলেও ধরবেন না।"

পারস্যে বাল্যবিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সে মেয়েরা পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করিয়া হারেমের মধ্যে পুরা-দস্তুর গৃহিণীপনা সুরু করিয়া দিত, এখন ঐ বয়সে, মেয়েরা স্কুলে যায়, লেখাপড়া করে, সংসার বা প্রায়-চিন্তার কোনই ধার ধারে না। সম্প্রতি এক পারস্য নারীকে বলা হইয়াছিল, "আহা, তোমার প্রথম সন্তানটি ছেলে না হয়ে মেয়ে হল। প্রথমে ছেলেটি হলেই বেশ হত।" এ কথায় পারস্য নারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাতরতার এতটুকু লক্ষণ দেখাইলেন না—বেশ তীব্র

দৃপ্ত স্বরেই বলিলেন, "সে কি? মেয়ে হওয়াতে আমার ত খুব আহ্লাদ হয়েছে। মেয়েই ত চাই। মেয়েকে আমি ভাল করে শিক্ষা দেব, তারপর এই শিক্ষিতা মেয়ে যখন ছেলে প্রসব করবে, তখন কি সুখ, কত লাভ। যতদিন না পারস্যের ঘরে ঘরে সুমাতা বিরাজ কচ্ছে, ততদিন দেশে সুসন্তান জন্মাবে কোথা থেকে! তবে কেন?" মুক্ত কণ্ঠে কি সতেজ উত্তর! এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে আর একজন পারস্য নারীর কাছে সমবেদনা জানাইতে গেলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আত্মীয়টি মারা গেছেন, তাঁকে আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না—এই যা দুঃখ। কিন্তু এ মৃত্যুতে দেশের কত লাভ হয়েছে। এক একটি বৃদ্ধ কতখানি উন্নতি আটকে বসে আছে! এক একটি বৃদ্ধ মারা যাচ্ছে, আর উন্নতির কতখানি করে বাধা সরে যাচ্ছে। নূতন ভাবের স্বাদ পেয়ে আমরা তেজে বলে বলী হয়ে উঠ্‌ছি কিন্তু এ বুড়ার দল—সে ভাবের বন্যায় এতটুকু টলছে না।"

নারীকে শিক্ষিতা করিবার জন্য পারস্যে বিবিধ চেষ্টা হইতেছে। পারস্য নারী আজ সমস্বরে সুর ধরিয়াছেন, "আমাদের মারিতে হয় মারিয়া ফেল—কিন্তু শিক্ষা দাও—ওগো, জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া মনগুলাকে উজ্জ্বল করিয়া তোল।" দেশে বহু স্ত্রী শিক্ষা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। শিক্ষার জন্য নারীর প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে—শিক্ষার দিকে অনুরাগও তাঁহাদিগের অসাধারণ। শুধু কোরানই এখন আর পাঠ্য নহে—আরব, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা ত শিখিতেই হয়—তাহা ছাড়া শিল্প, বিজ্ঞান এ-সবের প্রতিও একটুক্ অবহেলা নাই। স্ত্রীসমিতিও বহুস্থানে গঠিত হইয়াছে। স্ত্রীলোক বক্তৃতা দিতেছে, এ দৃশ্য আজ পারস্যে বিরল নহে।

গত ডিসেম্বর মাসে যখন পারস্যের প্রতি রুশের জোর-তলব পড়িয়াছিল, তখন দেশের নারীশক্তি অল্প কাজ করে নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সে দুর্দ্দিনে পারস্য নারীর কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। শত শত নারী পারস্যের পতাকা বহিয়া পার্লামেন্টে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, পুরুষকে সুস্পষ্ট স্বরে কহিয়াছিলেন, "তোমরা পুরুষ যদি রুশের সহিত লড়াই না কর, ত আমরা নারী, আমরা যুদ্ধে যাইব। রণক্ষেত্রে প্রাণ যায়, অম্লানচিত্তে তাহা বিসর্জ্জন দিব, কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক আমাদিগের স্বদেশ ধ্বংস, বা গৌরব লুণ্ঠিত হইতে দেখিব না।" পথে ঘাটে ফিরিয়া সদ্য-নিদ্রোত্থিত পারস্য পুরুষকে এমনই ভাবে নারী সচেতন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বীর বাণী রুশ দ্রব্য বয়কটে অদ্ভুত কাজ করিয়াছিল। এক দিকে স্বামী ভ্রাতা পুত্রকে যেমন তিনি রুশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই মসজিদে মসজিদে গিয়া, দেবতার আরাধনা করিয়া, তাহার আশীর্ব্বাদ-কামনাতেও তাঁহাদিগের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়াছিল।

পারস্যে মোসলেমনারী আজ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—এ জাগরণ কাহিনী বিশ্ব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে তাহার ভবিষ্যৎ গৌরবের আভাস দিতেছে।

লোক-শিক্ষা (Hindusthan Review):—

ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। একটি একটি করিয়া লোক জড় করিয়া সমাজের সৃষ্টি হয়। সমাজ গঠনে জাতির প্রত্যেক প্রাণীর সহায়তা প্রয়োজন। দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গটির প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিতে হয়—আঙুলে এতটুকু ছড়িয়া গেলে সারা দেহেই সে বেদনার আভাস লাগে। সমাজেরও তেমনই একটি প্রাণী দুর্ব্বল, অক্ষম হইলে সমগ্র সমাজেরই তাহাতে ক্ষতি। বিরাট সমাজ হস্তীও যে মশক-দংশনে এতটুকু বিচলিত হয় না, এমন নহে।

সমাজকে সুস্থ রাখিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা উচ্চ নীচ উভয় স্তরের পক্ষেই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। সমাজের প্রত্যেক প্রাণী যদি জীবনের সার্থকতা, জীবনের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে, তবে ব্যক্তিগত সংযম অবলম্বন করিয়া একটি স্বাস্থ্য-পরিপূর্ণ সতেজ সমাজ-দেহ গঠনে সক্ষম হয়। সুতরাং সমাজের নিম্ন স্তরের প্রাণী যাহারা এমনসব লোককেও শিক্ষিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষায় হৃদয় বিকশিত হয়; মানব-জীবনের দায়িত্ব উপলব্ধি হয়। শিক্ষার ফলেই মানব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়,—প্রকৃত সুখের অধিকারী হয়। জীবনে বহু বিঘ্ন, বহু বাধার আঘাত সহিতে হয়। শিক্ষা সেই-সকল বাধা-বিঘ্ন-অতিক্রমের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অশিক্ষিত নিরক্ষর চাষা সহস্র কুসংস্কারের মধ্যে থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য জানিবার অবসর পায় না,—তাহার গ্রামটিই তাহার কাছে সমগ্র পৃথিবী! না জানে সে স্বাস্থ্যের কোন বিধান, না জানে নিজের ও কাজের কোন ঠিক-ঠিকানা! একটু বিপদ আপদের আঘাত লাগিলে, সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে, কখনও-বা অবসাদে প্রাণ হারায়। সমাজও তাহার একটি অঙ্গ—যত ক্ষুদ্রই সে অঙ্গ হোক—অবহেলায় হারাইয়া বসে।

শিক্ষা মানুষকে আত্মসম্মানে সচেতন করে, পরনির্ভরতার পাশ ছেদনে ইঙ্গিত করে—অলসতা যে দোষের, ইহা বুঝাইয়া তাহাকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলে। কর্ম্মচক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে। সে চক্র চালাইতে মূর্খ অভাগা তর্জ্জনীটি অবধি দিতে আসে না—অথচ তাহার তর্জ্জনী-স্পর্শের ক্ষমতা নিতান্ত উপেক্ষণীয়ও নহে। একজন মূর্খের তর্জ্জনীতে আর কত বল! কিন্তু দশজন, শতজন, সহস্র জন মূর্খ চাষা যদি এই কর্ম্মচক্র ঘুরাইতে তর্জ্জনী লাগায়, তবে কতখানি নবশক্তির স্পর্শলাভ ঘটে! দেশে নিরক্ষর মূর্খের সংখ্যাই অধিক। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে জীবনের মহাযজ্ঞ-সাধনে সমাজ কোথা হইতে নবশক্তি পাইবে! অথচ যে আমরা নিম্ন স্তরের শিক্ষা-ব্যাপারে এখনও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই নাই, ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে।

বর্ণ-কাহিনী (The Crisis):—

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে নিগ্রো। বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সে কিছুদিন শিক্ষকতাও করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তার পর সে বিবাহ করিল; পুত্র-কন্যাও জন্মিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিবিল সার্বিস পরীক্ষাও সে পাশ করিল। ডাকবিভাগে একটা কর্ম্ম পাইতে বিঘ্ন ঘটিল না। সে হইল, এক ডাকের পিয়াদা। বর্ণের জন্য আর কোন তারতম্য ঘটিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"উচ্চ বর্ণের" নিকট হইতে একদিন সে এক পত্র পাইল। পত্র-লেখক আপনাকে তাহার বন্ধু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিল। পত্রখানি এইরূপ,—

১২ এপ্রিল, ১৯১২।

……নিগ্রো পোষ্টম্যান—

আর যেন তোমায় চিঠি বিলি করিতে না দেখি। বুঝিলে, এই ১৩ই এপ্রিলের পর হইতে। কথাটা ভুলিয়ো না।

যদি দেখি, তাহা হইলে প্রাণ হারাইবে। তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ,—এই ইঙ্গিতই বোধ হয় যথেষ্ট।

তোমার জন্য যেন আমাদিগকে শেষে দুঃখ করিবার অবসর দিয়ো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। "তোমার দিন নিতান্তই ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাজ ছাড়, ছাড়, ছাড়— নহিলে মৃত্যু নিশ্চয়—মৃত্যু, মৃত্যু!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিগ্রোর নিকট হইতে আমরা এক পত্র পাইয়াছি। তাহাতে লেখা আছে, "এখনো আমি চাকরি করিতেছি।"

ইহাকেই বলে, সাহস!

যবদ্বীপের সুপ্তি-ভঙ্গ (The Socialist Review):

—যবদ্বীপে সর্ব্বসমেত তিন কোটি লোকের বাস—এই তিন কোটি লোকের অধিকাংশই মূর্খ, নিরক্ষর। দেশের শাসন-ভার ডচ্ গবর্ণমেণ্টের হাতে। ডচ্ গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার ডচ্ মন্ত্রী-সভা লইয়া যবদ্বীপের ভাগ্য-পরিচালনা করেন। যবদ্বীপে লোক-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং কৃষির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। যবদ্বীপের আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরব কিন্তু পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

যবদ্বীপের শাসন-প্রথাও নিতান্ত সরল নহে। উচ্চ পদের জন্য হলাণ্ড হইতে লোক আনা হয়। যে সিবিল সার্বিসে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের একরূপ একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন তাহা অনেকটা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে অসুবিধা বিস্তর, অর্থব্যয়ও বিষম।

দেশের কুলি ও চাষা হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিটি অবধি টেক্স দিয়া এই যে বিদেশী লোকের উদর পূর্ত্তি করিতেছে, ইহাতে দেশের কত টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। সিবিল সার্বিসের উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে, ট্যাক্স, কষ্টম, বিচার, পূর্ত্ত, ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের মোটা বেতনের কর্ম্মচারীটি অবধি হলাণ্ড হইতে আমদানি। দেশের লোক, যাহার জমিদারী আছে—সেই জমিদারী হইতেই সে অর্থ-সংগ্রহের উপায় দেখে, কুলি চাষার দল সারা দিনরাত খাটিয়া, মোট বহিয়া কোনমতে দুই বেলার মত অন্নসংস্থান করিবার সুযোগ পায়। তাহার উপর আছে, অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের মোটা পেন্সন! এমন ভাবে কাজ চলিলে দেশের টাকা দেশের বাহিরে যে চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

এটি যে বিরাট ভ্রম—ডচ্ গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পুষ্করিণী হইতে অনবরত জল তুলিয়া লইলে, পুষ্করিণী শুকাইয়া যায়। তাহাতে জল ভরিবারও একটা ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, নহিলে জল শুকাইলে, জলের জন্য শেষে কাহার কাছে ছুটিব?

পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় অধিবাসীগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কোন উপায়ই করেন নাই—কাজেই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজকার্য্য-সমূহের জন্য দেশীয়গণ উপযুক্ত পারদর্শিতা দেখাইবারও কোন সুযোগ পায় নাই। হলাণ্ড হইতে লোক আনাইতেও বিস্তর অর্থব্যয়—তাই এক্ষণে ডচ্ গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া যবদ্বীপে স্কুল-কলেজ স্থাপনে মন দিয়াছেন। প্রজার মনও আরাম পাইয়াছে—এতদিন দেশের টাকা হলাণ্ডে চলিয়া যাইতেছিল বলিয়া তাহারা অনুযোগ করিতে ত্রুটি করে নাই—আজ সৌভাগ্যক্রমে তাহাদিগের সে অনুযোগ সফল হইয়াছে। ১৭০০০ মাইলের ব্যবধান হইতেও নিত্য লোক আনায়, হাঙ্গামা ও অর্থব্যয় অতিরিক্ত, ইহা আজ ডচ্ গবর্ণমেণ্টের নজরে পড়িয়াছে।

যবদ্বীপের মাটিতে সোনা ফলিতে সুরু করিয়াছে। পেট্রোলিয়ম, টিন, সোনা ও কয়লার কারবারে লক্ষ্মী আজ আসন পাতিয়া বসিয়া গিয়াছেন। প্রায় দুই শত চিনির কারবার হইতে ১৯১১ সালে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার চিনি বাহির হইয়াছে। ইহার উপর রবার, তামাক, চা, কফি ও নারিকেলের চাষে অসম্ভব লাভ ঘটিয়াছে।

দেশের অর্থ নিত্য বাড়িয়া উঠিতেছে—বাহিরের লোককে অত মাহিনা যোগাইবার পরিবর্ত্তে, এই অর্থ দেশে রাখিয়া বিস্তীর্ণতর কারবারে খাটাইতে পারিলে আরো অধিক অর্থাগম যে হইবেই এ কথা যবদ্বীপের গবর্ণমেণ্ট ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। এখন দেশীয়গণের মধ্যে মূর্খের সংখ্যাই অধিক। দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিতে পারিলে তাহারা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া শক্তিটুকু আরও অধিক কাজে খাটাইতে সমর্থ হইবে—তাহাতে দেশেরও কল্যাণ বাড়িবে। ইহা বুঝিয়া দেশীয় শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের সংখ্যা (১৯১০ সাল অবধি) ১০২০টি। চিকিৎসা বিদ্যালয় শীঘ্রই খোলা হইবে। তাহা হইলে ব্যবসায়াদির মহাঘাত কমিয়া লোকের অবস্থাও সচ্ছল হইতে পারিবে। শিল্পবিদ্যালয় খোলা হইতেছে—তথাপি শাসনপ্রণালীতে এখনও রীতিমত শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠে নাই।

কিছুকালপূর্ব্বে যবদ্বীপের কয়েকজন যুবককে শিক্ষার জন্য ভারতে পাঠানো হইয়াছিল। শিক্ষালাভান্তে দেশে ফিরিয়া তাহারা অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা প্রমাণ করিয়াছেন, শিক্ষা পাইলে দেশীয় লোকও সর্ব্ব বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় তুল্যশক্তির পরিচয় দিতে পারে। পূর্ব্বে যবদ্বীপের লোক মূর্খতার মধ্যে পড়িয়া কুসংস্কারের দাস হইয়া উদর পূরণেরই শুধু চেষ্টা দেখিত—আর কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না—রাখিবার প্রয়োজনও সে অনুভব করে নাই; এখন শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চোখ ফুটিয়াছে—নিজের ও অপরের পানে সে চাহিতে শিখিয়াছে। জীবন-যজ্ঞের মহাব্রত সাধনেও প্রয়াস পাইতেছে। জড়ের মত আজ সে বসিয়া থাকিতে চাহে না—মানুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

ভেরী বাজাইয়া যাঁহারা এই জাগরণের উন্মেষ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবদ্বীপের এক নারীর নাম গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করা যায়। এই নারীর নাম—রাদেন আজেং কার্ত্তিনি। অল্প বয়সেই ইঁহার মৃত্যু হয়—মৃত্যুর পর ইঁহার কয়েকখানি চিঠিপত্রগাছা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাশ্চাত্য জাতিও মুগ্ধ হইবেন। তাঁহারা বুঝিবেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্তে কোনরূপ বৈষম্য নাই—উভয় চিত্তই তুল্য শক্তির ভাণ্ডার! শিক্ষার অভাবে আজ যাহা মরিচা ধরিয়া রহিয়াছে—কালই শিক্ষায় শানাইয়া লইলে তাহার ধারে পাহাড় কাটা যাইবে। এই নারী পাশ্চাত্য শিক্ষার আস্বাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রাবলী ডচ্ ভাষায় লিখিত। সাহিত্যরস না থাকিলেও তাঁহার রচনায় তেজ আছে,—শক্তি-উন্মেষের মন্ত্র সে রচনার মধ্যে নিহিত আছে।

এই নারীর পিতা একজন সংরক্ষণশীল বৃদ্ধ ছিলেন—কন্যাকে শিক্ষা দিতে তিনি একান্ত নারাজ ছিলেন। সেই পিতাকে ধীরভাবে সস্নেহে তিনি শিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়াছিলেন—পাছে প্রগল্ভতা প্রকাশ পায়, পাছে পিতার মনে আঘাত লাগে, ইহার জন্য পরম সঙ্কোচে, একান্ত বিনয়ের সহিত তিনি পিতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রে পাশ্চাত্য নারীর দর্পিত সুর নাই; তাহা যেন চরণে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণের মিনতি-উচ্ছ্বাস! এই নারী তাঁহার দেশবাসীকে প্রাচীন যবদ্বীপের আচার-ব্যবহার, শিল্প ও কলার প্রতি অনুরাগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন; তাহার গৌরব কার্ত্তিনাই প্রথম তাঁহার স্বদেশীয়গণকে সরল ভাষায় বুঝাইয়া গিয়াছেন—আর বাহিরের বিশ্ব-রহস্যও উদ্ঘাটন করিতে ভুলেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, শুধু মাটি চষিয়া, জন খাটিয়া দিন কাটাইলে চলিবে না—মাথা বাহির করিতে হইবে, কল তৈয়ার করিতে হইবে, পৃথিবীর অন্য জাতির পাশে আপনাকে জাতি বলিয়া প্রচার করিতে হইবে। মোস্লেম্ আবহাওয়ার মধ্যে, আশৈশব অবহেলা ও অবজ্ঞার মধ্যে লালিত হইয়া এই নারী শিক্ষার অমৃত স্পর্শ লাভ করিয়াই সমগ্র বিশ্ব-জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে চিত্তবিকাশ শুধু

পাশ্চাত্যের একচেটিয়া নহে, প্রাচ্য জাতিরও চিত্ত আছে, মস্তিষ্ক আছে, এবং সে চিত্ত, সে মস্তিষ্কের বিকাশ, আকাশ-কুসুমেরই মত একটা অসম্ভব কল্পনা নহে।

যবদ্বীপের অধিবাসীর নিদ্রা ভাঙিয়াছে। আর সে জড় হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে না। আজ তাহার কণ্ঠ খুলিয়াছে, স্বর ফুটিয়াছে। উন্নতির জন্য সে আজ আকুল! অত্যাচার করিলে তখনই তাহার প্রতিকারের জন্য সে উদ্যত হইয়া উঠিবে—বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্ন-সংগ্রহ করিবার জন্য সে উন্মুখ, ব্যগ্র হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার অনুরাগ ও সম্ভ্রম ফুটিয়াছে—শিক্ষার মাহাত্ম্য সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। এই সকলের মূলে কার্ত্তিনার দৃষ্টান্ত আজ জ্বল জ্বল করিতেছে।

যে লোক মাটি চষিয়া, জন খাটিয়া, খাজনা শোধ করিয়া দিনের কাজ শেষ হইল মনে করিত, আজ সে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতার মূল্য বুঝিয়াছে, ইহা অল্প আশ্বাসের কথা নহে। বিশ্বমাতার আর একটি জাতি-সন্তান আসিয়া জ্ঞানোন্নত অপর জাতিগুলির পার্শ্বে তাহাদিগের ভাই বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে, ইহা বড় আনন্দের কথা।

উচ্চ-ভারতেও এই তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিয়াছে। উচ্চ-ভারতের অধিবাসী আর্গেষ্ট ডুয়ে দেকার আজ হলাণ্ডের মন্ত্রীসভায় যবদ্বীপের পক্ষ হইতে উচ্চ শিক্ষা ও স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী লইয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহার গম্ভীর বাণীতে যবদ্বীপের সকল অধিবাসীর চেতনা হইয়াছে, একতায় আবদ্ধ হইয়া যবদ্বীপের লোক আজ অটলভাবে দাঁড়াইতে চাহে! যাহারা যবদ্বীপের লোক, যাহারা যবদ্বীপের পুত্র—তাহারা দেশের মঙ্গল অগ্রে সাধন কর, পরে হলাণ্ডের মঙ্গল সাধিয়ো—ইহাই তাহাদিগের এক কথা।

এ প্রচেষ্টায় সেখানকার দীন দুঃখীর চর্চ্চা করিয়া আজই কোন দুঃখ না ঘুচিলেও, ভবিষ্যতে যে ঘুচিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যে আজ দেশের টাকা হুড় হুড় করিয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে—যাহার নামে নিত্য অভাব, নিত্য দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত তাহাদিগের কুটির দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিতেছে,—যাহার ফলে চাষা বা কুলির সেই যে হাতে মাথিতে তৈল আর পায়ে কুলায় না—এমন অভাব, তাহা ত শীঘ্রই ঘুচিবে! শিক্ষা পাইলে, গতরের দামও তাহারা বুঝিতে পারিবে—য়ুরোপীয় প্রতিযোগিতায় কোনখান দিয়া তাহাদিগের দেশের শিল্প-ব্যবসায়ে ঘা লাগিতেছে, তাহা বুঝিয়া সেই ঘা প্রতিরোধ করিতে তাহারা সক্ষম হইবে। এবং সেইদিন তাহাদের এ দুর্দ্দিন ঘুচিবে।

শিক্ষা! শিক্ষা! শিক্ষা! মানুষকে মানুষ করিবার জন্য এমন মন্ত্র আর নাই। যেখানে যে জাতি কষ্ট পাইতেছে, দুঃখ সহিতেছে, সেখানেই কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিভীষিকা চারিধার ঘিরিয়া রাখিয়াছে—তাহারই ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া মানুষ হাবুডুবু খাইতেছে, দুঃখ এড়াইবার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না - সেই শিক্ষা যেখানে যে-দেশের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যে-পরিমাণে সক্ষম হইতেছে, সেই খানে ঠিক সেই পরিমাণেই সে-দেশ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থা বাহির করিয়া ফেলিতেছে। একের পরিশ্রমের অন্নটুকু অন্যে মারিয়া দিতেছে, এইটুকু নজরে পড়িলেই না, চক্ষু ফুটিবে, অন্ন বাঁচিবে ও নিজের ক্ষুধা মিটিবে!

জাপানে নব বর্ষ (Japan Magazine):—

১লা জানুয়ারি তারিখে জাপানে মহাসমারোহে নববর্ষ উৎসব হয়। সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা, ১লা জানুয়ারি হইতে জাপানে বর্ষ গণনা সুরু হইয়াছে। সপ্তাহ ব্যাপিয়া উৎসব চলে। পূর্ব্বে নববর্ষের দিন প্রজারা সকলেই রাজভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ সম্রাটের নিকট সাধ্যানুযায়ী ভেট পাঠাইত। সম্রাটের আদেশে এই প্রথা রহিত হইয়া অবধি সকলে এখন গৃহদ্বার সবুজ পাতা-লতায় ভূষিত করে—তাহার উদ্দেশ্য শুধু, ভগবানের নিকট সম্রাটের দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যকামনা করা! যতই শীত হৌক, তুষার-বর্ষণের বিরাম নাই ঘটুক, তথাপি জাপানীরা তাহাদিগের শীতবাস ত্যাগ করিয়া বিচিত্র জমকালো উৎসবের বেশে সাজিয়া পথে বাহির হয়। ইহা যেন শুধু নববর্ষেরই উৎসব নহে, প্রকৃতিও এ সময় নব প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে তাহাকেও এই সঙ্গে অভিনন্দন করা! এ সময় জাপানী ফুলের গাছ নূতন ফুলে ভরিয়া উঠে—গাছপালায় নব পল্লব উঁকি দিতে থাকে—তাই প্রকৃতির নব জাগরণের দিনে নব বর্ষের উৎসবও অত্যন্ত সমীচীন বলিয়াই জাপানীদের বিশ্বাস।

সারা দেশে আনন্দের ধূম বাধিয়া যায়। নববর্ষের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই চারিধারে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত পুরুষেরা দল বাঁধিয়া সবুজ লতাপাতা লইয়া লোকের ঘরদ্বার সাজাইয়া বেড়ায়। যে দরিদ্র, অত্যন্ত কষ্টে যাহার দিন গুজরান হয় সেও আপনার ভগ্ন কুটিরখানির দ্বারে লতাপাতার ঝালর ঝুলাইয়া দেয়। ধনীর গৃহদ্বারে 'কাদোমৎসু' (তোরণ) রচিত হয়—ছোট ছোট বাঁশের মাথায় দেবদারুর ঝাড়! সকলেই দ্বারের মাথায় খড়ের দড়ি টাঙাইয়া দেয়—তাহাতে একটি ফল কিম্বা বড় চিংড়ী মাছ বাঁধা থাকে—দড়িটি ধর্ম্মের চিহ্ন—ফল ধরণীর আশীর্ব্বাদ ও চিংড়িটি নববর্ষের শুভ ইচ্ছা—অর্থাৎ তুমি এত দীর্ঘ জীবন লাভ কর যে, পিঠ তোমার ওই বড় চিংড়িটার মতই বাঁকিয়া যাক্! এমনই ভাবে সকল জাপানী নববর্ষের উৎসবে মাতিয়া উঠে। সে সময় পথে বাহির হইলে মনে হয় যেন কুঞ্জবনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি! রাত্রে সারা সহর যেন বিচিত্র দীপের মালা গলায় দুলাইয়া দেয়—নানা বর্ণের, নানা আকারের অসংখ্য জাপানী ফানুস—তাহার উদ্ভাবনে কি সে বিচিত্র কৌশল—সে যেন আলোর ফুল, সে যেন এক স্বপ্নরাজ্য!

প্রত্যেক জাপানীরই উৎসবটিকে পরিপূর্ণ সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য অনুরাগ ও অসাধারণ চেষ্টা! এ উৎসবের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে, যদি কাহারও তেমন পয়সা না জুটে, তবে সে অন্য ব্যয় সংক্ষিপ্ত করুক, একেবারে অন্য খরচ ছাঁটিয়া দিক!

উৎসবের জন্য বৎসরের সময় পাওনা আদায়ের জন্য সকলেই সচেষ্ট হইয়া উঠে—বাকী বকেয়া চুকাইতেই হইবে। এসময় টাকার বাজার একেবারে সরগরম। এসময়ে যে দেনদার দেনা শোধ না করিবে নববর্ষে তাহার পক্ষে কোথাও কর্জ্জ গ্রহণ করা দায় হইয়া উঠিবে!

উৎসবে ক্রীড়াকৌতুকের আর অন্ত নাই, বিরাম নাই! দশদিন কাহারও আর অন্য কোন কাজকর্ম্ম থাকে না। সরকারী আফিস আদালত তিনদিনের জন্য বন্ধ থাকে। বড়দিনে যেমন প্লম পুডিঙের ব্যবস্থা আছে, জাপানেও তেমনি নববর্ষে একরূপ পিঠা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা আছে। পিঠার নাম মোচি। প্রধানতঃ চাউল হইতেই মোচির সৃষ্টি, তাহার উপর জাপানীর নানারূপ মালমসলার সাহায্যে রচনার কারচুপিও আছে। নববর্ষের পিঠা ভোজনের সময় জাপানী ছেলেমেয়েরা উদরের পরিমাণ ও পরিপাক-শক্তির বহর ভুলিয়া যায়। ইহার ফলে উৎসবান্তে অনেকেরই গৃহে ডাক্তারের ভিড় জমে। পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি-মন্দিরে এই মোচির ডালি পাঠানো হয়—এ ভেট পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য, শুধু মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মাকে চরিতার্থ করা।

নববর্ষদিনে মিকাদো রাজকীয় দেবমন্দিরে দেবপূজার জন্য সমাগত

হন। মন্দিরের চারিকোণে ফিরিয়া ফিরিয়া তিনি পূজা করেন। এই পূজার নাম, "শিয়োহাই"। এভাবে পূজা করার তাৎপর্য্য, পৃথিবীর সকল দেবতাকে তুষ্ট করা।

এই উৎসবের সময় প্রধান প্রধান দোকানপাট অবধি বন্ধ থাকে, স্কুলের ছেলেরা দুই সপ্তাহের ছুটি পায়—তাহাদের আর এ কয়দিন আনন্দের সীমা থাকে না।

সৌ।

নব্যতুরস্কের বীর (Current Opinion) :—

নব্যতুরস্কের বীর আনওয়ার বে বয়সে নবীন, অসমসাহসী। আবদুল হামিদ সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার তিনিই একজন প্রধান পাণ্ডা। ইতালির সহিত বিফলযুদ্ধে তুর্কীদের মধ্যে একমাত্র তাহার নামই উল্লেখযোগ্য। ছদ্মবেশে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া তিনি দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান, তাহার গুপ্তচর চারিদিকে। ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না; তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত, যেখানে যান সেইখানেই আগুন জ্বালাইয়া তোলেন। অবিশ্বাসীর বুকে সাহস আনিয়া দ্যান, জড়ের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন, নিরীহ শান্তপ্রকৃতি লোকও তাহার সংসর্গে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, অতি বড় উদাসীনও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত করিতে লাগিয়া যায়।

তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ, তিনি অতি সুপুরুষ। শান্ত অবস্থায় তাঁহার বিশাল ভাসাভাসা চোখ দুটি সুন্দরীর নয়নের মতই মিনতিতে ভরা; আবার অন্তরে আগুন যখন জ্বলিয়া ওঠে তখন সেই চোখই অসিফলকের মত ঝলসিতে থাকে। তাঁহার মাতা মিশরদেশীয়া, ধনীর নন্দিনী। মাতার শারীরিক সৌন্দর্য্যের তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

তাহার বেশভূষা অতি পরিপাটি। বহুদিন জর্ম্মানির সৈন্যদলে বাস করিয়া জর্ম্মান কর্ম্মচারীদের মত গোঁফের দুই প্রান্ত পাকাইয়া উচ্চে তুলিয়া দেওয়ার অভ্যাস লাভ করিয়াছেন। বাল্যকালেই তিনি জর্ম্মানিতে কামান ছোড়া শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পোষাকের পারিপাট্য দেখিয়া বোধ না হইলেও, বাস্তবিক তিনি অসাধারণ কর্ম্মী। রাজসভার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করিবার সময় যেমন, আফ্রিকার মরুভূমির দারুণ গ্রীষ্মেও তেমনিই তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট থাকে। তাঁহার অন্যান্য দেশবাসীর মতই অশ্বচালনে তিনি তেমন পটু নন, কিন্তু সুলতানের সৈন্যদলে নবাগতদিগকে গড়িয়া পিটিয়া পাকা সৈনিক করিয়া তুলিতে পারেন তিনিই।

আচার ব্যবহারে তিনি য়ুরোপীয়ের মত হইলেও স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে তিনি সদাই প্রস্তুত, বিনা যুদ্ধে কাহাকেও সূচ্যগ্র ভূমি অধিকার করিতে দিতে রাজি নন। সুলতানের এক ভ্রাতৃকন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, আর অন্য স্ত্রী নাই।

প্রাণের জন্য তাঁহার এতটুকু মায়া নাই, বহুবার তিনি প্রাণ হাতে করিয়া বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সময় স্যালনিকা হইতে সেনাদল লইয়া যাত্রা করেন, ছদ্মবেশে ট্রিপলি গিয়া আরবদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সহস্র বিপদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাঁহার আনন্দ। রিভলভার ছোড়ায় অসাধারণ দক্ষতার জন্যই এতদিন তিনি বাঁচিয়া আছেন। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে তিনি রুদ্ধ দ্বারে গিয়া কখনো আঘাত করেন না বটে কিন্তু দ্বার ভাঙিবার সময় উপস্থিত হইলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উহা ভাঙিয়া ফেলেন। মাত্র বারো জন লোক সঙ্গে লইয়া তিনি ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধ আবদুল হামিদের দাড়ি ধরিয়া টানিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন! কিছুদিন পূর্ব্বে চুরাশি বৎসর বয়স্ক প্রধান সচিব বৃদ্ধ কিয়ামিল পাশা যখন বলকানজাতিদের সঙ্গে লজ্জাকর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন আনওয়ার পিস্তল হাতে দ্বার ভাঙিয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন ও বৃদ্ধ সচিবকে তৎক্ষণাৎ কার্য্যত্যাগে বাধ্য করিলেন। শুভমুহূর্ত্ত যখন উপস্থিত হয় তখন তিনি শারীরিক বলপ্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। এইজন্যই তাহার সহকর্ম্মীরা তাহাকে এত ভালবাসে। সেকেলে অতিবৃদ্ধ তুর্কীদিগকে পদাঘাতে দূর করিবার প্রয়োজন হইলে নব্য তুর্কীরা আনওয়ারের শরণ লন। আনওয়ারের মনে বিদ্বেষভাব স্থায়ী হয় না। আজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহাকে মুষ্টিপ্রয়োগ করিয়া ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন, পরদিন প্রাতেই তাহাকে লইয়া বন্ধুর মত প্রাতরাশ করিতে বসিয়া যান; মনটা তাঁহার বড়ই সরল।

তাঁহার মন্ত্রণা দিবার শক্তি নাই, নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সৈন্যদলে তাঁহার প্রতিপত্তি অসাধারণ, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে। তিনি মুক্তহস্ত, যেখানে যান গল্পগুজবে হাস্যপরিহাসে আসর জমাইয়া তোলেন।

সম্প্রতি তিনি ছুরিকাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রায় চল্লিশবার এরূপ ঘটিয়াছে।

জাপানে প্রজাশক্তির উন্মেষ (Current Opinion):

—সম্প্রতি জাপানে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এতকাল জাপানীরা সম্রাটকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মানিয়া আসিতেছিল, তাহার বাক্য বেদবাক্য, তিনি সোজাসুজি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন ইহাই বিশ্বাস করিতেছিল। মিকাদো মুৎসুহিতোর মৃত্যুর পর বর্ত্তমান সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতেই লোকেরা এই কুসংস্কারের মোহ কাটাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন রাজ্যসংক্রান্ত যা-কিছু সবই পার্লামেণ্ট মহাসভায় আলোচিত হইত বটে কিন্তু সকল কথার মীমাংসা করিতেন সম্রাট; তাহার প্রবীণ রাজনীতিবিৎদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া। এই কয়েকজন প্রবীণ রাজনীতিবিদদিগকে জাপানীরা "গেনরো" বলে; নামে প্রজাপ্রতিনিধিগণ মহাসভার সভ্য থাকিলেও কাজে এই "গেনরো" মহাশয়েরাই যা খুসি তাই করিতেন। কেহ কিছু বলিতেও সাহস করিত না, সম্রাট যদি অসন্তুষ্ট হন!

এই সেদিন সাইওনজি প্রধান সচিব হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রজাতান্ত্রিক মতামতের জন্য তিনি যথেচ্ছাচারী "গেনরো"দের চক্ষুশূল হইলেন। তাহারা সম্রাটকে মন্ত্রণা দিলেন সাইওনজিকে পদত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হউক। সম্রাটও তাহাই করিলেন এবং প্রিন্স কাৎসুরাকে প্রধান সচিব নিযুক্ত করিয়া মন্ত্রীদল গঠন করিতে আদেশ দিলেন।

বিগত রুশজাপান যুদ্ধের ফলে জাপানীদের করভার বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর আরো বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছিল। প্রধান সচিব কাৎসুরা সৈনিক। সম্রাট ও "গেনরো"দের মতে কোরিয়ায় যে সৈন্য আছে তাহা যথেষ্ট নয়, আরো দুই দল বাড়ানো দরকার, আর দেশরক্ষার জন্য 'ড্রেডনট' যুদ্ধজাহাজ তৈয়ারি করা দরকার। কাৎসুরা এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু জনসাধারণ আপত্তি করিল, শান্তির সময় তাহারা আর নিত্যনূতন কর দিতে অসমর্থ। তাহাদের প্রতিনিধিরাও মহাসভায় আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এই যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করিবার জন্য জাপানীরা ক্ষেপিয়া উঠিল, তোকিও সহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইল, ক্রুদ্ধ জনসাধারণ গবর্ণমেণ্ট তরফের সংবাদপত্র-আপিস ও মন্ত্রীদের বাড়ী ইট মারিয়া ভাঙিয়া দিল, ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া উঠিল যে পরিশেষে কাৎসুরা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিয়াছেন—আর পূর্ব্বেকার

প্রণালীতে রাজশাসন করিলে চলিবে না। দেশে প্রজাসাধারণের মনোমত গবর্ণমেণ্ট হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এ কথা কিছুদিন পূর্ব্বে বুঝিলে তাঁহাকে এ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। থ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

"সরস্বতী-যাত্রা"।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা, কতকগুলি বিষয়ে অসুবিধা আছে। শীতপ্রধান দেশেরও তাহাই। এইরূপ সমতল ও পার্ব্বত্য প্রদেশেরও সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। ভারতবর্ষের সুবিধা এই যে এখানে গ্রীষ্মপ্রধান ও সমতল প্রদেশ যেমন আছে, শীতপ্রধান ও পার্ব্বত্য প্রদেশও তেমনি আছে। এই জন্য ভারতবাসীরা উদ্যোগী হইলে শীত, গ্রীষ্ম, সমতল ও পর্ব্বত, সমুদয়েরই সুবিধা ভোগ করিয়া শক্তিশালী ও উন্নত হইতে পারে।

কাল ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে, দেশ যেরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, তাহাতে সমতল প্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িলে বড় ভাল হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া ও ছোটনাগপুরের অনেক স্থান স্বাস্থ্যকর। তথায় সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়া উচিত। এ বিষয়ে বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু শীত-প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের কোন চেষ্টাই বাঙ্গালীরা করেন নাই।

ভারতের ইতিহাসে কাব্যে পুরাণে সাধনে শিক্ষায় হিমালয়ের স্থান অতি উচ্চ। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হিমালয় হইতে আর্য্যাবর্ত্তের সকল নদী উৎপন্ন হইয়া তাহাকে ধনধান্যে ঐশ্বর্য্যশালী এবং সভ্যতায় অগ্রসর করিয়াছে। হিমালয়ে মানুষ সাধনবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। আর সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায়, হিমালয় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তির আকর।

বিতস্তা নদীর উপত্যকায় মিনালি গ্রামের উপকণ্ঠ।

শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত মানুষের বাড়িবার, গঠিত হইবার সময়। এই সময়ে মানুষ যদি স্বাস্থ্যকর স্থানে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের হাওয়ায় বাড়িতে পায়, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল হয়। আজ-

ভারতের আর যে-কোন প্রাচীন স্থানেই যান, দেখিবেন ভারত ধ্বংসাবশিষ্ট ও জরাজীর্ণ প্রাচীন অতীত গৌরবের সাক্ষী মাত্র। হিমালয়ের উপর কালের এই ছায়া পড়ে নাই। চিরযৌবনসম্পন্ন এবং শরীরের ও আত্মার নব-

কুলু প্রদেশস্থ মিনালি উপত্যকা।

যৌবনদাতা হিমালয়, মানুষকে এখনও নূতন দীক্ষা, নূতন ...তন ব্রত, উদ্দীপনা, নূতন সাহস, নূতন সাধনা, নূতন সিদ্ধি, ...তন পবিত্রতা, সংযম ও শক্তি দিতে সমর্থ। হিমালয়ের ...র্ম্মল বায়ু, হিমালয়ের নিষ্কলঙ্ক তুষারাচ্ছাদিত দিব্যালোকে ...দ্ভাসিত আকাশস্পর্শী চূড়া, হিমালয়ের নির্ভীক আত্ম-...মাহিত যোগমগ্ন ভাব, হিমালয়ের ভীমকান্ত শোভা, ...মালয়ের দৃঢ়তা, হিমালয়ের নিভৃততা ও নিস্তব্ধতা, ...মালয়ের নির্ব্বাক অটল কর্ম্মিষ্ঠতা ভারতবাসীর অতুল ...ম্পদ্। কিন্তু এই সম্পদ্ আমরা গ্রহণ করিতেছি ...; সন্তানগণকে দিতে চেষ্টা করিতেছি না। হিমালয়ের পার্ব্বত্য নগর ও গ্রামসকলে ইউরোপীয় ইউরেশীয় বালক-বালিকাদের জন্য কতই না বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে! কিন্তু ভারতবাসীরা বালকদের জন্য কেবল হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী গুরুকুল স্থাপন করিয়াছেন। গণনার জন্য দার্জিলিঙের মহারাণী বালিকা-বিদ্যালয়ও উল্লেখযোগ্য।

হরিদ্বারের গুরুকুল পঞ্জাবের সুসন্তান মহাত্মা মুন্শীরাম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা হরিদ্বার সহর হইতে দূরে এক রম্য স্থানে হিমালয়ের ক্রোড়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ছিল। এখানে বালকেরা ষোল বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী রূপে বাস করে, এবং সংস্কৃত, হিন্দী, ও আধুনিক রীতি অনুসারে ইতিহাস বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করে। সম্বৎসর খালি মাথায় খালি পায়ে সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দে বাস করে। শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে। কোন বিলাসিতার ধার ধারে না। এই ষোল বৎসর তাহারা বাড়ী যাইতে পায় না; যদিও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী দেখা করিতে আসিলে দেখা করিতে পায় এবং তাঁহাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে। এখানকার ছেলেরা যে ভবিষ্যৎ-জীবনে ওকালতী বা সরকারী চাকরী করিয়া খাইবে, এরূপ সম্ভাবনার লেশও নাই। তথাপি, এরূপ কঠোর নিয়মেও, দুইশতেরও অধিক বালক তথায় শিক্ষা লাভ করিতেছে। এখানে গুরুকুলের আদর্শ বা শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করিব না। মহাত্মা মুন্শীরাম প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি যেরূপ বুঝিয়াছেন, দৃঢ় বিশ্বাস, একাগ্রতা ও সাহসের সহিত তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহাকে ভক্তি করি। টাকার অনেক প্রয়োজন হইয়াছে। টাকা আসিয়াছেও। ধনীরা যে টাকা দেন নাই, তাহা নয়; কিন্তু অধিকাংশ দাতা দরিদ্র। ধনীর প্রাচুর্য্য হইতে অনায়াসদত্ত ধন অপেক্ষা গরীবের পাঁজরের এক-একখানা হাড়ের মত যে মুষ্টিভিক্ষা, তাহার মূল্য ও ফলবত্তা কখনই কম নহে। বঙ্গে যাঁহারা স্কুল কলেজের বা অন্য কাজের জন্য টাকা চান,
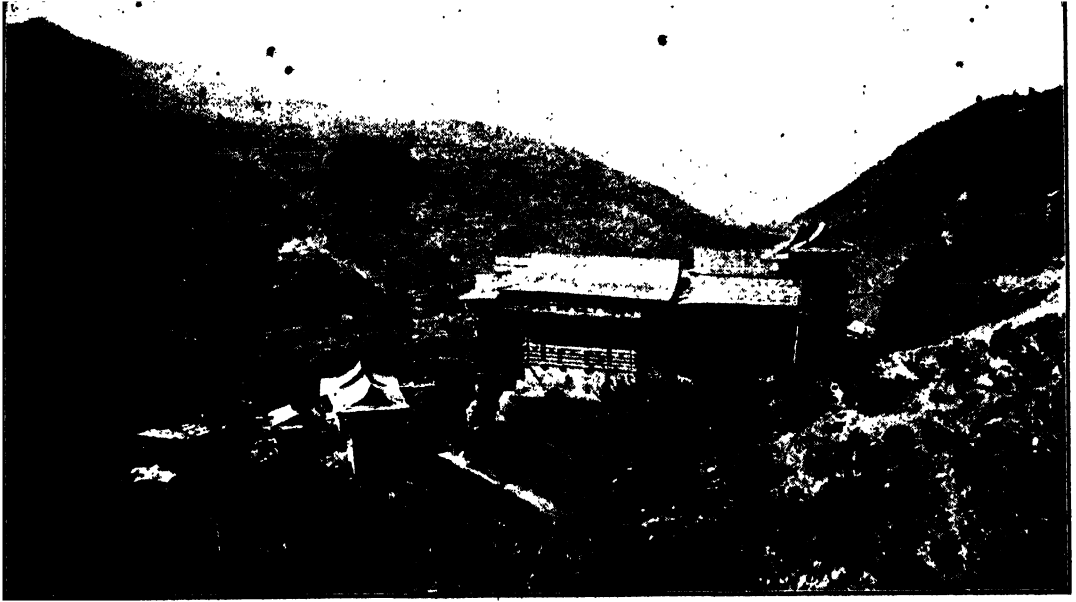
হিমালয়-শিখরের সৌধ।

মণ্ডি রাজ্যের ভাদোয়ানি সরাইয়ে গুরুকুলের বিশ্রাম।

তাঁহারা গরীবের হৃদয় স্পর্শ করন দেখি। সেখানে কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার বিশ্বকর্ম্মার অনন্ত শক্তি সঞ্চিত আছে। গুরুকুলের বার্ষিক উৎসবে প্রতি বৎসরই শত শত নরনারী উপস্থিত হন, এবং হাজার হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি গত চৈত্রে যে উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে পঁচাত্তর হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাহার অধিকাংশ গরীবের দান। নারীরা অকাতরে দেহের অলঙ্কার খুলিয়া দান করিয়াছেন।

হিমালয়ের ভারবাহী পশুপাল।

সমস্ত দিন পথহাঁটার পর আহার।

এই গুরুকুলের ছাত্রেরা শীতপ্রধান পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং দেশী বিদেশী নানাবিধ পুরুষোচিত ক্রীড়া করে। অধিকন্তু, তাহাদিগকে আরও শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু, এবং আকস্মিক বিঘ্ন বা বিপৎপাতে অটল ও প্রত্যুৎপন্নমতি করিবার জন্য, পর্ব্বতের মুক্ত বায়ু আরও অধিক পরিমাণে দিবার জন্য, নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিবার জন্য, প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত করিবার জন্য, প্রকৃতির

বিরাট সত্তার মধ্যে আসীন হইয়া চিন্তা ও ধ্যানের সুযোগ দিবার জন্য, এক কথায়, তাহাদের মনুষ্যত্ব সকলদিকে ফুটাইয়া, গড়িয়া তুলিবার জন্য, "সরস্বতী-যাত্রা"র অর্থাৎ শিক্ষার জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণের বন্দোবস্ত আছে।

শ্রীযুক্ত মাইরন ফেল্পস্।

ইউরোপ ও আমেরিকার ছাত্রগণ ও মস্তিষ্কোপজীবিগণ গ্রীষ্মের ছুটি পাইলেই দলে দলে পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি ছাইয়া ফেলে। অনেকে পদব্রজে নিজের মোট বহিয়া এই প্রকৃতি-তীর্থ-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। দুঃখের বিষয় গুরুকুল ভিন্ন আমাদের দেশে আর কোনও বিদ্যালয় "সরস্বতী"র অর্থাৎ বিদ্যার ও শিক্ষার অন্বেষণে হিমালয়রূপ তীর্থে যাত্রার বন্দোবস্ত করেন না। এখন যে গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইতেছে, তাহাতে অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রও "সরস্বতী-যাত্রা" করিলে সুখের বিষয় হইবে।

"বেদিক ম্যাগাজিনে"র চৈত্র-বৈশাখ যুগ্মসংখ্যায় এবং "মডার্নরিভিউয়ের" এপ্রিলসংখ্যায় ভারতভক্ত শ্রীযুক্ত মাইরন্ ফেল্প্স গুরুকুলের এইরূপ একটি সরস্বতী-যাত্রার

মহাত্মা মুন্‌শীরাম।

বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। যাত্রীদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৫। তন্মধ্যে ১৯ জন ছাত্র, গুরুকুলের অধ্যাপক ১ জন, ফেল্প্স্ সাহেব ১ জন; বাকী ৪জন ভৃত্য। ফেল্প্স্ বলেন যে পাশ্চাত্য দেশে অনেক ছাত্র যেমন নিজেই নিজের মোট বহেন, এখানেও সেইরূপ করা যাইতে পারে। তাঁহারা প্রথমে রেলে পাঠানকোট পর্য্যন্ত আসেন। তাহার পর পদব্রজে কুলু উপত্যকা হইয়া সিমলা পর্য্যন্ত যান। মোট ৩৫০ মাইল হাঁটা হইয়াছিল। মোট বহিবার জন্য আটটি অশ্বতর ছিল। সাধারণতঃ রোজ ১০।১২ মাইল হাঁটা হইত; কচিৎ ১৫ মাইল, এবং একদিন ২২ মাইল হইয়াছিল। রেলভাড়া বাবদে প্রত্যেক যাত্রীর দৈনিক খরচ আট আনারও কম হইয়াছিল। অশ্বতরগুলির মালিকদিগকে ২৫০ টাকা দিতে হইয়াছিল। সুতরাং সকলে নিজের নিজের মোট বহিলে খরচ আরও কম হইত। ফেল্প্স্ বলেন তিনি ছাত্রাবস্থায় অন্যান্য অনেক মার্কিন-ছাত্রের মত স্বদেশে ছুটির সময় দুবার নিজের মোট বহিয়া

৩০০ মাইল করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং এদেশেও ইহা করা অসম্ভব নহে।

হিমালয়ে ভ্রমণ করিবার সুযোগ সকলের না হইতে পারে; কিন্তু যে পাহাড় পর্ব্বত যাঁহার নিকটতম তাঁহার সেখানেই ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য।

হিমালয়ের যে ছয়টি দৃশ্যের ছবি দেওয়া হইল, তাহা ফেল্প্‌স্ সাহেব নিজে তুলিয়াছেন।

ছাত্রদের যুদ্ধশিক্ষা।

যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর ও ভীষণ ব্যাপার। মানুষ যত রকম পাপ করিতে পারে, যুদ্ধকে অনেক সময় তাহার সমষ্টি দুষ্ট জাতির দমন ও স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে জানা ও পারা সকল জাতিরই কর্ত্তব্য। নানা প্রকারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা যাইতে পারে। এক হইতেছে, যুদ্ধে সুশিক্ষিত সুবৃহৎ বেতনভোগী সৈন্যদল রাখা। কিন্তু ইহার অনেক অসুবিধা। সৈন্যদের বেতন দিতে রাজস্বের প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়। দেশের বলবান্ প্রাপ্তবয়স্ক হাজার হাজার লোক চাষবাস বা শিল্পকার্য্য দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি না করিয়া আলস্যে কালযাপন করে। এইরূপ বৃহৎ স্থায়ী সৈন্যদল রাখিলে তাহারা ও তাহাদের নেতারা নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দেখাইবার জন্য যুদ্ধ বাধাইবার অছিলা খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং অনেক সময় অকারণ যুদ্ধ বাধায়।

ছাত্রদের যুদ্ধকৌশল শিখিতে যাত্রা।

ছাত্রগণ লক্ষ্যভেদ করিতেছে।

বলা যাইতে পারে। এই জন্য অনেকে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের অন্তর্ধান প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই সুদিন না আসা পর্য্যন্ত মানুষ গৃহস্থ পরিবারী হইয়া বাস না করিলে, সাধারণতঃ অসচ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা বেশী, এবং তাহাদের দ্বারা
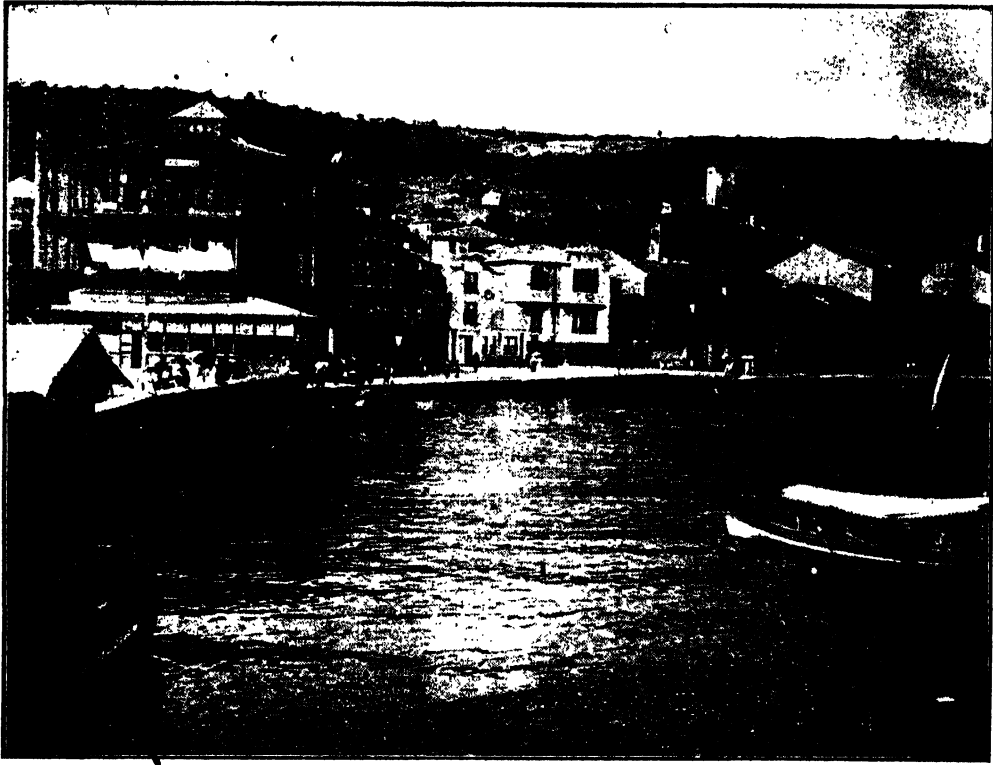
কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের বন্দর ও সুদৃশ্য সৌধমালা।

মনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সৈন্যদের ত র্ম্মশিক্ষা কম, নানা দেশের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ইতেও এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। এবম্বিধ নানা কারণে মনেক জাতি সুবৃহৎ স্থায়ী সৈন্যদল রাখিতে চান না। াপানীরা যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সৈন্যদিগকে চাষ শিক্ষা দেয়। ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-াণকে দুই বা তিন বৎসরের জন্য সৈনিকের কাজ শিখিতে ৷ করিতে হয়। লর্ড রবার্টস্ প্রমুখ অনেকে ইংলণ্ডে এই নয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের আন্দোলনের রোক্ষ ফলস্বরূপ কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা লিতেছে যে, যে-সকল ছাত্র যুদ্ধশিক্ষা করে নাই, তাহারা বি, এ, উপাধি পাইবে না। এবিষয়ে কেম্ব্রিজ অক্‌স্‌ফোর্ডের হকারিতা চাহিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমেরিকার াত্রদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। এখানে ইরূপ শিক্ষাধীন ছাত্রদের দুইটি ছবি দেওয়া গেল। কটিতে দেখা যাইতেছে যে ছাত্রগণ সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলে তাঁবুতে বাস করিয়া যুদ্ধকৌশল শিখিতে যাত্রা করিতেছে। আর একটি, লক্ষ্যস্থির করিয়া বন্দুক ছুড়িবার চিত্র। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের সৈনিক হইবার বা যুদ্ধ শিখিবার অধিকার পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে।

তুর্কের পরাজয়।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়েরা এবং তাহাদের বংশজাত মার্কিনেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হয় রাজত্ব নয় প্রভুত্ব করিতেছে। তাহাদের জ্ঞাতি নয় এমন জাতিদের মধ্যে একমাত্র জাপানীরাই তাহাদের সমকক্ষতা করিতেছে, এবং রুশিয়ার মত শক্তিশালী জাতিকে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন এশিয়ার অনেক জাতি ইউরোপের অনেক দেশ জয় করিয়াছিল। তুর্কদের ইউরোপে রাজত্ব তাহারই শেষ চিহ্ন। আদ্রিয়ানোপল্ অধিকৃত হওয়ায় তুরস্কের শত্রুগণ এখন রাজধানী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের আরও নিকটে আসিয়াছে। কত প্রাচীনস্মৃতিবিজড়িত এই
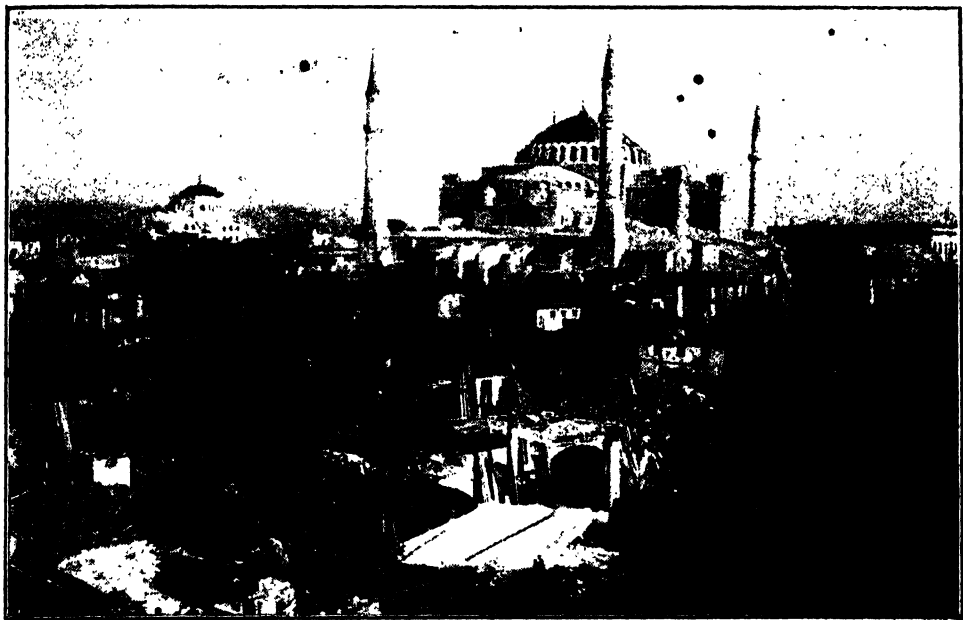
সেণ্ট-সোফিয়ার মস্‌জিদ
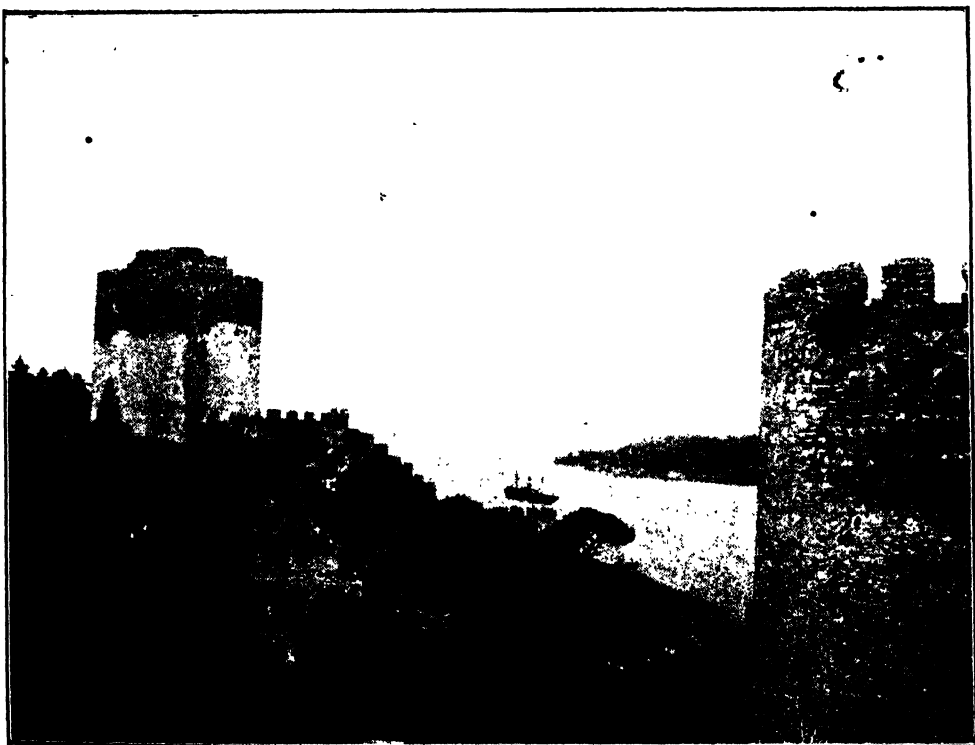
বস্পরাস প্রণালী

কাশীর গঙ্গাতীর।

সুন্দর নগরের ভাগ্যে কি আছে কে জানে! তুরস্কের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এশিয়াবাসীর হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। মুসলমান ভ্রাতাদের গভীর বেদনা অবর্ণনীয়।

তুর্কেরা যেরূপ অধ্যবসায় ও সাহসের সহিত শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে বস্তু আছে। এরূপ জাতির ভবিষ্যৎ কথনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে পারে না। তাহারা উপযুক্ত নেতাদের পরামর্শ অনুসারে দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থার উন্নতিতে মন দিলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাঙ্গলা দেশে কায়স্থ আদি ভিন্ন ভিন্ন জা'তের উন্নতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সভা স্থাপন বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এরূপ সভা ২৫ বৎসর আগেও ছিল। আমরা যখন এলাহাবাদে থাকিতাম, তখন একদিন এইরূপ একটি বিষয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "কায়স্থ কন্‌ফারেন্স, ক্ষত্রিয় কন্‌ফারেন্স, বৈশ্য মহাসভা প্রভৃতি আছে বলিয়া আমাকে অনেকে অনেক বার বলিয়াছে যে আপনি একটা ব্রাহ্মণ কন্‌ফারেন্স বা মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করুন না কেন? আমি সে চেষ্টা করি নাই। আমার ধারণা, ব্রাহ্মণ সকলের হিতের জন্য; সে স্বার্থচিন্তা করিবে না"। মালবীয় মহাশয়ের ঠিক কথাগুলি মনে নাই; কিন্তু ভাবটি স্পষ্ট মনে আছে। তাহাই নিজের ভাষায় বলিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব অবশ্যই হওয়া উচিত। অধিকন্তু, আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উচ্চ আদর্শ সকল শ্রেণীর লোকেরই হওয়া উচিত, কেবল ব্রাহ্মণে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

পণ্ডিত মদনমোহন এখন কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন যে নিজের আদর্শ অনুসারে কাজ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এপর্য্যন্ত আশি লক্ষ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আদায় কুড়ি লক্ষ টাকার উপর হইয়াছে। অঙ্গীকারের তুলনায় আদায় কম হইয়াছে। অন্যূন ৫০ লক্ষ আদায় না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে না।

নূতন দিল্লীর স্থাপত্য।

এখন যেখানে দিল্লীনগর অবস্থিত, তাহার নিকটে অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে। এই সমগ্র ভূখণ্ডকেই দিল্লী বলা হয়। এই ভূখণ্ড কত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, কত সাম্রাজ্যের, কত রাজবংশের উদ্ভব, অভ্যুদয় ও পতন দেখিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা যায় না। সকলেরই কিছু-না-কিছু কীর্ত্তি এখানে আছে। হিন্দু কীর্ত্তি, বৌদ্ধ কীর্ত্তি, পাঠান কীর্ত্তি, মোগল কীর্ত্তি, সমস্তই এখনও এখানে বিদ্যমান। কিন্তু কীর্ত্তিগুলির নামকরণ যে-ধর্ম্মসম্প্রদায় বা রাজবংশের নাম অনুসারেই হউক না কেন, সেগুলি যে ভারতবাসীদেরই কীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে বিদেশী কিছুই নাই, এমন নয়। কিন্তু বিদেশীকে

অনুসারে নির্ম্মিত হইবে, না ভারতীয় রীতি অনুসারে হইবে। ভারিতবর্ষের স্থাপতিবংশ ত উচ্ছেদ পায় নাই। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিস্ময়কর দুর্গ, প্রাসাদ, মস্‌জিদ, দেবমন্দির, সমাধিমন্দির আদি গড়িয়াছিল, তাহারা এখনও আছে, এবং তাহাদের নৈপুণ্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং নূতন দিল্লীনির্ম্মাণে তাহাদের সাহায্য লওয়া উচিত। ইংরাজ স্থপতি ইমারতের নক্‌সা আঁকিয়া দিবে, আর দেশী রাজমিস্ত্রীরা গাঁথিয়া

কাশীর গঙ্গাতীরে মহাত্মা তুলসীদাসের গৃহ।
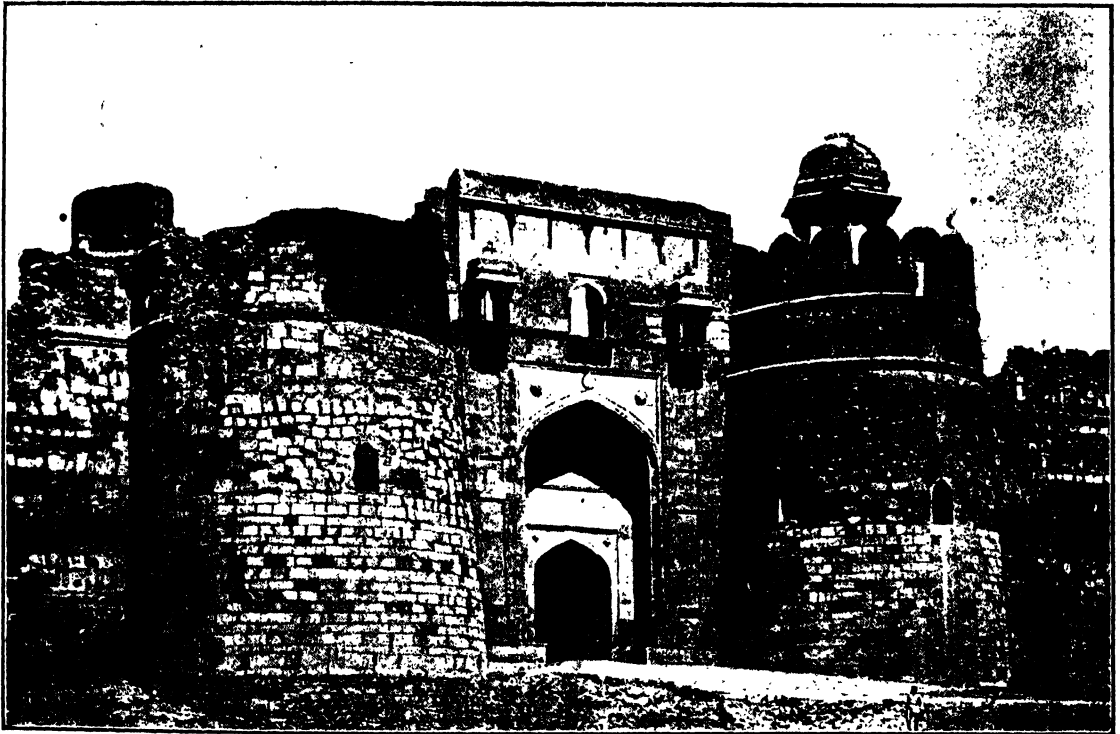
প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের উপর নির্ম্মিত পুরাতন কেল্লার সম্মুখ-দৃশ্য।

ভারতবর্ষ নিজস্ব করিয়া লইয়াছে; প্রাণটা ভারতীয়। এখন দিল্লীকে বৃটিশ-ভারতের রাজধানী করা হইয়াছে। ভারতে ও বিলাতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে যে নূতন রাজধানীর অট্টালিকা-সকল ইউরোপীয় কোন স্থাপত্যরীতি

যাইবে, শুধু এরূপ হইলে হইবে না। ইমারতগুলি কিরূপ ধরণের হইবে, তাহা নির্দ্ধারণেও দেশী শিল্পীর পরিকল্পনা-শক্তির সাহায্য লওয়া দরকার।

ঠিক্ পুরাতন কোন একটি বাড়ীর মত বা মন্দির
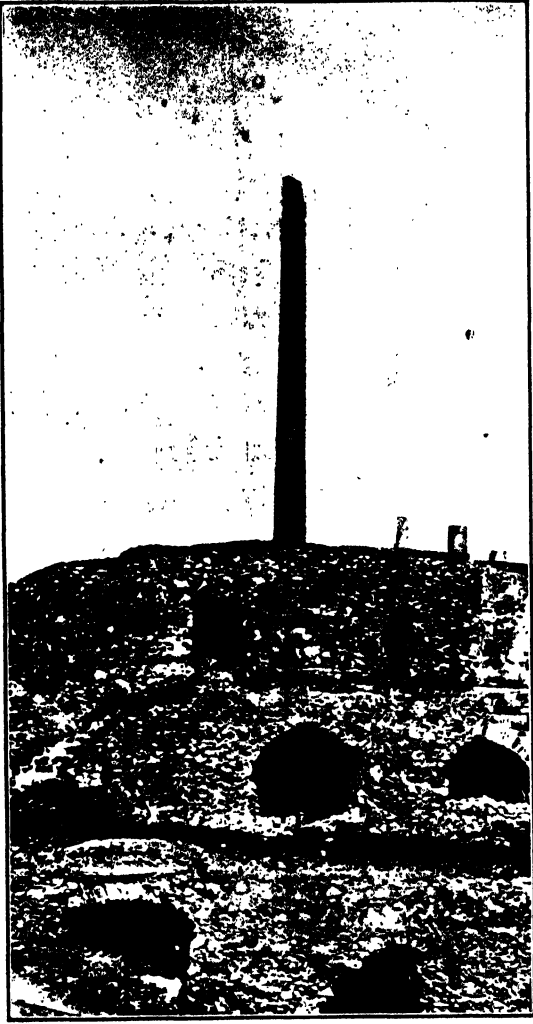
দিল্লীতে হুমায়ুন্ বাদশার কবরে যাইবার পথে অশোকস্তম্ভ।

কুতুব মিনারের বিরাট খিলান।

মস্‌জিদ্ কবরের মত করিয়া নূতন দিল্লীর বাড়ীগুলি নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এমন ফরমাইস্ করা হইতেছে না। আমাদের নূতন কাব্যগুলি প্রাচীন সংস্কৃত বা পুরাতন বাঙ্গলা কাব্যগুলির অনুকরণ নহে। বর্ত্তমান যুগের দেশী বিদেশী নানা উপাদান কবিদের হৃদয়-মনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা কতকগুলিকে পরিহার, কতকগুলিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন ভারতীয়ই আছেন, তাঁহাদের মানসসন্তান কাব্যগুলিও তেমনি ভারতীয়। এইরূপ আমাদের নব্য চিত্রকরসম্প্রদায়ও কেবল প্রাচীনের নকল করিতেছেন না; তাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা প্রভাবের অধীন হইলেও ভারতীয় থাকিয়া ভারতীয় চিত্রই আঁকিতেছেন। নূতন দিল্লীর স্থাপত্য-রীতি আমরা এই ভাবে ভারতীয় দেখিতে চাই; কোন পরিবর্ত্তনই হইবে না, এমন কথা কেন বলিব? মোগলেরাও ঠিক্ পুরাতন একটা কিছুর নকল করেন নাই।
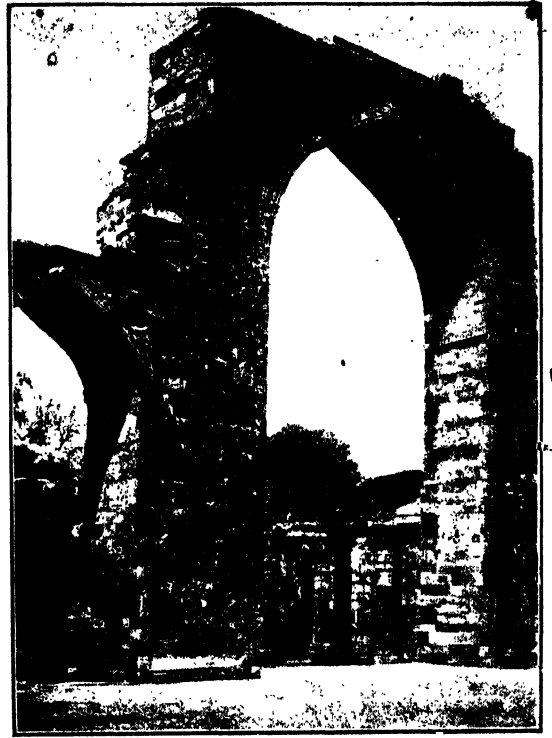
অনেকে শিল্পের মধ্যে বিশেষ কোন গৌরব বা প্রয়োজন দেখিতে পান না। কাব্যে যেমন জাতির প্রাণের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, শিল্পেও তেমনি। গ্রীস্ পাথর কাটিয়া ভীনস্, আপলো আদি দেবতার মূর্ত্তিতে দৈহিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষ একযুগে অসংখ্য শান্তসমাহিত বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়াছে, বাহ্য অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে দৃক্‌পাত করে নাই। স্থাপত্যেও এইরূপ জাতীয় বিশেষত্বের সূচনা আছে। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিতে শিখিতে হয়। গাড়ী জুড়ি কোম্পানীর কাগজ, কিছুই অনাবশ্যক নয়।
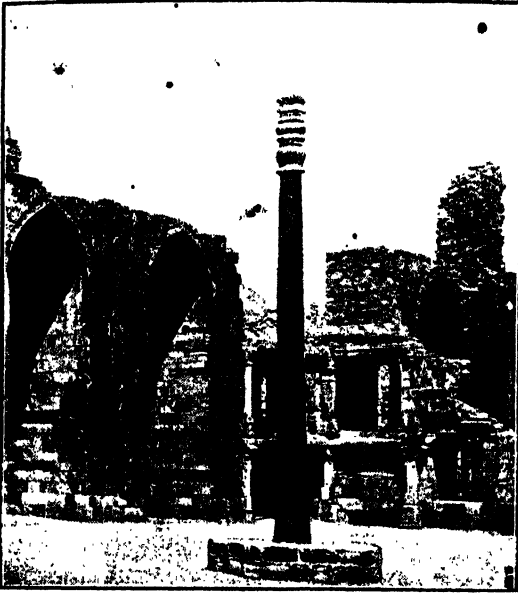
কুতুব মিনারের নিকটে বৈষ্ণব রাজার নির্ম্মিত
(খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) লৌহ স্তম্ভ।

কিন্তু জাতীয় সম্পদ ইহাতে নাই। ধর্ম্মে দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে শিল্পে জাতীয় ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত থাকে।

বীরত্বের আদর।

শিবপুরের কলেজঘাটে নৌকাডুবি হইয়া অনেকের

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার হালদার।
(হিন্দু পেট্রিয়ট্ হইতে)

মৃত্যু হয়। সেই বিষয়ের যে সরকারী তদন্ত হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার রিপোর্টে, মজ্জমান লোকদের প্রাণরক্ষার জন্য যাহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন ও কয়েকজনের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ১ জন ইংরেজ ৬ জন ভারতবাসী। ইহাঁদের নাম মিঃ মিল্‌নার, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার হালদার, অপূর্ব্বরঞ্জন বড়ুয়া, রোহিণীরঞ্জন বড়ুয়া, বিনয়কৃষ্ণ গুপ্ত, প্রবোধকুমার ঘোষ, ও প্রকৃতিকুমার ঘোষ। এই বীরহৃদয় যুবকদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এবং বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণ পদক দিবার জন্য ভারত-সঙ্গীত-সমাজ গৃহে গত ১১ই মার্চ্চ এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সাহস ও আত্মোৎসর্গের একটি মাত্র কাজেও জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য দূর করিতে পারে। সুতরাং এরূপ সাহসী পরার্থপর যুবকদের জন্মভূমি তাঁহাদের আচরণে যে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপূর্ব্বরঞ্জনবাবু। বিজয়কৃষ্ণবাবু। প্রবোধকুমারবাবু। রোহিণীরঞ্জন বাবু।

পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শি[illegible]র [illegible]ন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জা[illegible] বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্টস্ ফ্যাকাল্টির [illegible] অধিবেশনে শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঈ, বী, হাভেল সাহেবের এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ছাত্রগণের বিদ্যানুশীলন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য, সাহিত্যদর্শনাদির সঙ্গে সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা হওয়াও বাঞ্ছনীয়।* ইহার পর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য আদি কলার চর্চ্চার কোনই বন্দোবস্ত

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

করেন নাই। অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়েও এরূপ বন্দোবস্ত নাই। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে পরোক্ষভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া অগ্রণী হইয়াছেন। ছাত্রগণ যে-সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেয়, তাহার মধ্যে কোন কলা এখনও সন্নিবিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এবিষয়ে, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে চিত্রপ্রদর্শন দ্বারা বিশদীকৃত বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে লাহোরে এইরূপ পাঁচটি বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে চারিটির সহিত ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখান হইয়াছিল। বঙ্গের পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয় এই যে তরুণ চিত্র-শিল্পী শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বক্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদ্যানুশীলন-চেষ্টাকে নূতন পথে চালিত করিবার জন্য যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্য। যোগ্যতা ব্যতিরেকে এরূপ সুযোগ মিলে না। চিত্র আঁকিতে, এবং চিত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে তাঁহার ক্ষমতা আছে। চিত্র-বিদ্যায় তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। তাঁহার বয়স অল্প; একাগ্র সাধনা দ্বারা সিদ্ধির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে সমস্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য বিষয়েও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

* "That in the interest of general culture, Art should not be excluded from the Arts' courses of the University."

আমেরিকায় একজন বাঙ্গালী ছাত্র।

ঢাকা নিবাসী শ্রীমান্ রজনীকান্ত দাস ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় গিয়া তিন বৎসর ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কৃষিবিদ্যায় বি, এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ কৃতিত্ব দেখান, তাহারই বলে তিনি মিশৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-বৃত্তি (Research Fellowship) লাভ করেন। নিজের গবেষণা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি মিসৌরীর এম্-এস্‌সি হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি উইস্‌কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেণ্ডেলীয় বংশানুক্রমণ নিয়ম (Mendelian Law of Heredity) সম্বন্ধে গবেষণা করেন, এবং তথাকার সম্মানিত সদস্য (honorary fellow) নির্ব্বাচিত হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যায় এম্-এ উপাধি পান। তিনি বর্ত্তমান বৎসরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পীএইচ, ডী, পরীক্ষা দিবেন, এইরূপ কথা ছিল; কিন্তু পারিবারিক কোনও কারণে তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। তিনি আবার আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস।

স্বামী বিবেকানন্দ।

বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ও শিকাগো সহরের য়ুনিটি পত্রের সম্পাদক লয়েড জেঙ্কিন্স জোন্সের ভ্রাতুষ্পুত্র ওরেন্ লয়েড জোন্সের নিকট হইতে আমরা রজনী বাবুর কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সংবাদগুলি পাইয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণ।

ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি শিষ্যগণ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন। তৎসম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার লিখিত একখানি বহি* অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বেশী অবসর না থাকায় মনে করিয়াছিলাম বহিখানির দুই চারি পাতা পড়িয়া দুই চারি ছত্র লিখিয়া দিব। কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। বহিখানি পড়িয়া মনে হইল, এরূপ এক জন অসামান্য ব্যক্তির সহিত ভারত-ভ্রমণ কি সৌভাগ্য! একটিও তুচ্ছবিষয়ক কথা নাই, সমস্তই উচ্চ জীবনের কথা। অথচ বহিখানি নীরস নয়। নির্ম্মল আনন্দে ভরা। যেমন সুন্দর ভাষা, ভাবে চিন্তায় তেমনি বিচিত্র। সচরাচর এইরূপ দেখা যায় যে মানুষ মনে করে যে যাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মতের মিল নাই, কেমন করিয়া তাহাকে প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেওয়া যায়? কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে কোনও আর একজনের সব বিষয়ে মত এক হইবে, ইহা অসম্ভব। ইহা আশা করাই অনুচিত। সত্য শিব সুন্দরের অনন্ত রূপ, শক্তির অনন্ত বিকাশ; ইহার সমস্তটা কোন মানুষই দেখিতে পায় না; সকলে ঠিক্ একই অংশও দেখে না। তাই বাস্তবিক যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, কর্ম্মী ও ভাবুক, তাঁহারা, মতের মিল না থাকিলেও, অপর সত্য-দ্রষ্টা কর্ম্মী ও ভাবুকদের মর্য্যাদা বুঝেন ও সম্মান করেন। এইজন্য, দেখিতে পাই, বিবেকানন্দ সকল সম্প্রদায়ের

---

* Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda by Sister Nivedita. Udbodhan Office, Bagbazar, Calcutta, Rs. 1-4-0.

লোকেরই গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মকে ক্রিয়াশীল, অধর্ম্মের সহিত সমরপন্থী এবং দীক্ষা দ্বারা অহিন্দুকেও নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দানে যত্নবান্ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানের, সকল জাতির, অন্ন ও জল গ্রহণ করিতেন, এবং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।*

ভগিনী নিবেদিতা।

বুদ্ধদেব তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা নিজেই নিজের আলোক হও; নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের মোক্ষ সাধন কর।" বিবেকানন্দও ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা বিফল হয় নাই।

সম্পাদক

* "He spoke of the inclusiveness of his conception of the country and its religions; of his own distinction as being solely in his desire to make Hinduism active, aggressive, a missionary faith; of 'don't-touch-ism' as the only thing he repudiated." P. 155.

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

গত ঈষ্টার ও দোলের ছুটিতে চট্টগ্রামে বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল। বঙ্গের নানা জেলা হইতে ছোট, বড়, প্রবীণ, নবীন সাহিত্যিকেরা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বৎসরান্তে এক-একবার এইরূপ সম্মিলন দ্বারা সাহিত্য-সেবীদিগের মধ্যে পরস্পরে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এবারে বহু ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব্বতন সভাপতিদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কোনো মহিলা প্রতিনিধি এবারে আসেন নাই; স্থানীয় মহিলারা দর্শকরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বহু প্রবন্ধ পঠিত ও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যে স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে এমন একটিও প্রবন্ধ শুনিতে পাওয়া যায় নাই; ইহা আমাদের সাহিত্যের দীনতার পরিচায়ক এবং অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সভাপতির অভিভাষণটি দীর্ঘ ও বহু চিন্তনীয় বিষয়ে পূর্ণ ছিল; ছোটখাটো অবান্তর বিষয় ছাড়িয়া দিলে অভিভাষণে দুটি প্রধান বিষয় পাওয়া যায়—চলিত ভাষায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এবং বঙ্গের স্বাস্থ্য-সমস্যা। চিন্তাশীল ব্যক্তির দুইটি বিষয়েই চিন্তা ও সমাধান করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই বিশেষ সুলিখিত ও মৌলিক তত্ত্বালোচনায় পূর্ণ ছিল, এবং সেইজন্য শ্রোতাদের বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ডাক্তার রায়ের "বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা," অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "উপবাসতত্ত্ব," অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত নির্ণয়," শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "যোয়ানের জল" এবং ভূবিদ্যা-শিক্ষার্থী ছাত্রদের চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে বাড়বানল সম্বন্ধে গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ বিভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ
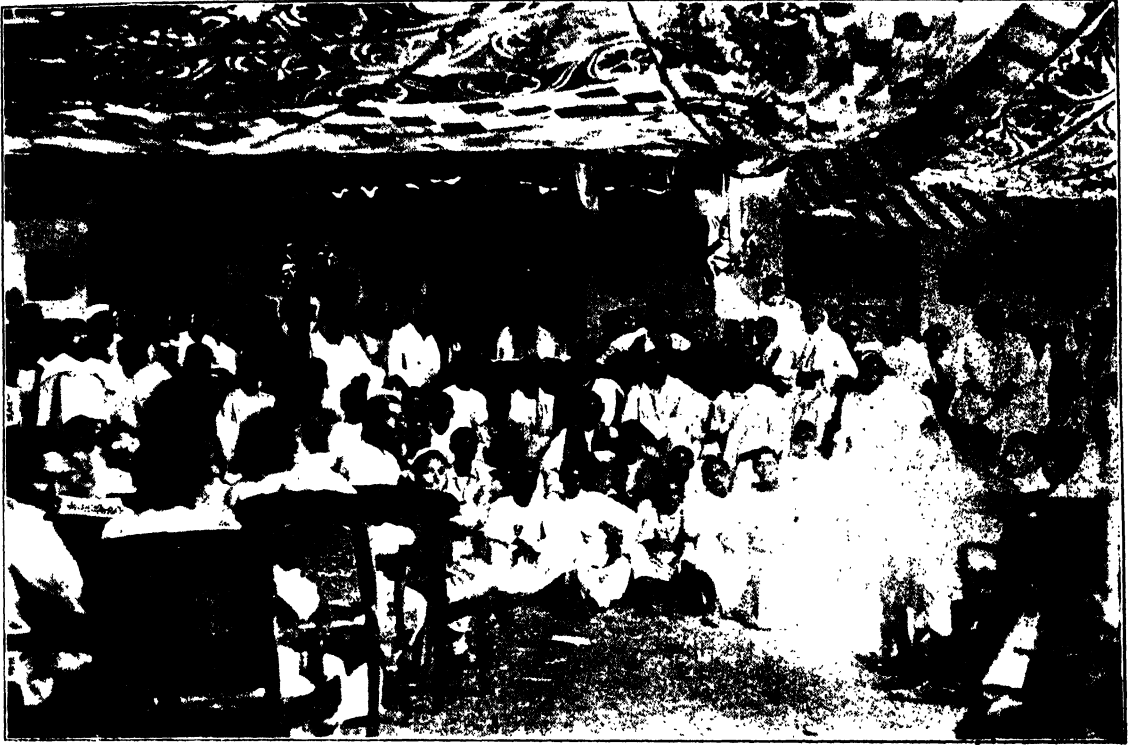
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, চট্টগ্রাম।

ভাষা ও ভাবে সম্পূর্ণ মৌলিক না হইলেও গুছাইয়া লেখার গুণে সকলের কাছে সমাদৃত হইয়াছিল।

এই সম্মিলনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো সাহিত্যিকের পশ্চিমবঙ্গীয়দিগের প্রতি অভিমান স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকাশ্য সভায়, আলাপের বৈঠকে, যত্রতত্র পূর্ব্ববঙ্গীয় এই সাহিত্যিকগণ এমনভাব প্রকাশ করিতেছিলেন যেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্বেষবশত তাঁহাদিগকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছে; তাঁহাদের সাহিত্য-প্রতিভা স্বীকৃত ও সম্মানিত হয় না, তাঁহাদের প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকায় স্থান পায় না, তাঁহাদের পুস্তকের অনুকূল সমালোচনা হয় না। বিশেষ করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ শুনা গেল 'প্রবাসী'র বিরুদ্ধে। কিন্তু এই-সমস্ত অভিযোগ একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা। কবি আলাওল হইতে নবীনচন্দ্র সেন ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কাছে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গ তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু দিতে পারেন নাই; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি এখনো যে সম্মান পাইতেছেন তাহা অনেক পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিকের পক্ষে দুর্লভ ও স্পৃহণীয়। পত্রিকার প্রবন্ধাবলির অনুপাত করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে কোনো ইতরবিশেষ নাই। সমালোচনাতেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থকার নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাই পান এবং পূর্ব্ববঙ্গের গ্রন্থকার নিন্দাভাজন হন এমন কথা কোনো সত্যসন্ধ ব্যক্তি বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। প্রবাসীর যে কয়েকজন লোক পুস্তক সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী; সুতরাং তাঁহারা যদি স্বীয় প্রদেশার্দ্ধের প্রতি ন্যায়সঙ্গত গুণগ্রাহিতা দেখাইতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে তাহা প্রবাসীর অপরাধ নহে। মোটকথা ইহা জোর করিয়া বলা যায় যে অতি সামান্য মাত্রও সাহিত্যশক্তি বা সাহিত্য সাধনার পরিচয় যেখানে আছে, পশ্চিমবঙ্গ বা প্রবাসী তাহা স্বীকার করিতে কখনো কুণ্ঠিত হয় নাই। তবে প্রত্যেকেই যদি নিজের প্রত্যেক লেখা ছাপা দেখিতে বা নিজের প্রত্যেক পুস্তকের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা পাইতে আশা করিয়া নিরাশ হন এবং তারপরই তাড়াতাড়ি একটা অভিমত স্থির করিয়া বসেন, তবেই এইরূপ ধারণা হইতে

পারে, নতুবা বিচারক্ষম ব্যক্তির এরূপ ধারণা হইতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক শোভাসম্পদের কথা না বলিলে কথা সম্পূর্ণ হইবে না। চট্টগ্রাম পর্ব্বতসঙ্কুল দেশ; ছোট ছোট পাহাড় গাছপালায় সবুজ, আশেপাশের সমতল ক্ষেত্র হইতে অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া তুলিয়া উঠিয়াছে, দেখিতে অতি চমৎকার। চট্টগ্রামের শস্যক্ষেত্রগুলিও বেড়া দিয়া ঘেরা এবং সেই বেড়াতেও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় ও পারিপাট্য আছে, যেমন-তেমন করিয়া কাজ-সারা গোচের নয়। চট্টগ্রাম শহরটির মধ্যেও স্থানে স্থানে টিলা এবং টিলার মাথায় সুদৃশ্য বাড়ী আছে; অধিকাংশ সুন্দর টিলাই গবর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করিয়াছেন। ফেয়ারী হিলের উপর হইতে খরস্রোতা কর্ণফুলীর বিস্তৃত পরপার, শাখা-প্রশাখা এবং শহরের হরিৎ শোভা একখানি ছবির মতো। এই টিলার উপর উঠিয়া শহরের ঘরবাড়ী বড একটা নজরে পড়ে না, মনে হয় যেন একখানি সাজানো বাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। এইজন্য চট্টগ্রামের নাম শহর-ই-সবজ্ বা সবুজ শহর। টিলা হইতে দূরে সমুদ্রের আভাস দেখা যায়। চট্টগ্রামে বহু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানও আছে।

চট্টগ্রামের এই শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম—মনে পড়িল O Caledonia, stern and wild, meet nurse for a poetic child! আরো মুগ্ধ হইয়াছিলাম চট্টগ্রামবাসীর অতিথি-সৎকারে। উদ্যোগ আয়োজন সুন্দর ও প্রচুর হইয়াছিল; এবং যদি বা কিছুও ত্রুটি থাকিয়া থাকে, তাহা পূরণ হইয়া ছাপাইয়া গিয়াছিল কর্ম্মকর্ত্তাদের সহৃদয় যত্নে। বয়স্কদের হৃদ্যভাব এবং বালক ভলাণ্টিয়ারদিগের বিনীত সেবা বহুদিন মনে থাকিবে। গোয়ালন্দ ষ্টিমার হইতেই ইহাঁরা অভ্যাগত ডেলিগেটদের সন্ধান লইতে আরম্ভ করেন; এবং চাঁদপুরে আহারাদির পর্য্যন্ত প্রচুর যোগাড় ছিল।

চট্টগ্রাম মুসলমানপ্রধান দেশ; তাহাতে আবার পূর্ব্বে মগের মুল্লুক ছিল। রাস্তায় ঘাটে স্ত্রীলোক একটিও চোখে পড়ে নাই। পুষ্করিণীর ঘাটগুলি বাড়ী হইতে গভীর জল পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গের আকারে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। বাঁশের কাজ করিতে চট্টগ্রামবাসী খুব নিপুণ দেখিলাম—ঘরের চাল পর্য্যন্ত ছেঁচা বাঁশ দিয়া ছাওয়া, দেখিতে খুব সুন্দর, টালির ছাঁদের মতো। বংশশিল্পে নিপুণ চীন দেশের নৈকট্য চট্টগ্রামে গেলে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়।

টিকটিকি পুলিশের অতিরিক্ত সতর্ক পাহারা সময়ে সময়ে সকল আনন্দ নেহাৎ নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছিল; ইহাই একমাত্র দুঃখের কারণ কাঁটার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে।

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পর বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর দে।

(এই ছবি হিন্দু পেট্রিয়টের ছবি হইতে প্রস্তুত)

গণিত বিদ্যায় তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি অসাধারণ নিষ্ঠার সহিত এই অনাড়ম্বর মহৎ কার্য্য

করিতেছিলেন। তিনি যশঃপ্রার্থী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ছিলেন না। নীরবে নিভৃতে কাল কাটাইতে ভাল বাসিতেন। এইরূপ অমায়িক সাধুপ্রকৃতির লোক সমাজের অলঙ্কার। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়, প্রভৃতি অনেক প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

সম্পাদক।

অনুরাগী

সাজান কুসুম কাঁপিবে বলিয়া,
হেলিবে বলিয়া সাজান ছবি,
জানালা দুয়ার রুধিব আমার
নিবারি পবন আবরি রবি?
কাননে ফুলের খোলা নওরোজ
ঘোমটা খসায়ে গোলাপ বেলা,
নিয়ত আকাশ করে পরকাশ
শত ধরণের চিত্র-মেলা!
কাল যে কুসুম ফেলে দিতে হবে,
যে ছবি ভাঙিতে আটক নাই,
তাহারি কারণে বদ্ধ-সমীরণে
রুদ্ধ ভবনে রব না ভাই।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন চট্টগ্রামে হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য দুটি। তাহা তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি। প্রথম বক্তব্য এই—

"আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষাকে জীবন্ত প্রাণবন্ত করিতে বা রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের নিম্নস্তরের ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। ভাষাতে যাদুঘরের মত রাশি রাশি কঙ্কাল, পেটে-মসলা-পুরা পশুপক্ষী রাখিলে চলিবে না; চিড়িয়াখানার মত জীবন্ত পশুপক্ষী বন্দী করিয়া রাখিলেও চলিবে না, সেখানেও প্রাণ কম। ভাষাকে একটি বড় দেশী মেলার মত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে জনতা চাই, ক্রেতাবিক্রেতার চলাচল চাই; জনতার মধ্যে উচ্চরোল চাই, হর্ষের উল্লাস চাই, বিষাদের বার্ত্তা চাই, সুখ দুঃখ জড়িত উচ্চ নীচ মানবসংঘের সংঘর্ষণ চাই—অর্থাৎ চলন্ত প্রাণ চাই।"

"ভাষা যত অধিক লোকের বোধগম্য হয়, তত ভাল। এবার বলিতেছি যে, প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি; নিম্নস্তরের লোকের এখনও যৎকিঞ্চিৎ প্রাণ আছে,—তাহাদের ভাষা অসাধু বা অকুলীন বলিয়া অবহেলা না করিয়া সংস্কৃতসম বা সংস্কৃতোদ্ভব ভাষার সহিত ভূয়োপরিমাণে দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে তাহাই প্রাণ থাকিবে বা হইবে।"

"ভাষার তেজ, আবেগ, বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষায় অধিকতর সংস্রব রাখিতে হইবে।"

"প্রাণ নিম্নস্তরে; নিম্নস্তরের ভাষা আমাদিগকে লইতেই হইবে। লিখিত ভাষা যত কথিত ভাষার কাছাকাছি থাকিবে, তত লিখিত ভাষায় জীবন পাওয়া যাইবে। লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যতদূরে ফেলিয়া রাখিবে, ততই আপনি জীবন হারাইবে।"

"ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।"

উপরে অক্ষয় বাবুর যে মতের আভাস দেওয়া গেল, তাহাতে মোটের উপর আমাদের সায় আছে। কেবল দুটি বিষয়ে সাবধান থাকা আবশ্যক। "করিলাম" পুস্তকের ভাষা। ইহা বাংলার সকল লোকেই বুঝে ও ব্যবহার করে। কিন্তু কথিত ভাষায় ইহা করলাম, করলেম, করলুম, কল্লম, করনু প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করে। সত্য বটে রাজধানীর ভাষাই ক্রমশঃ সমস্ত প্রদেশের ভাষা হইয়া উঠে; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সর্ব্বত্র ক্রিয়াপদগুলির রূপ আরও একাকার না হইতেছে, ততদিন পুস্তকে "করিলাম" এবং তদ্বিধ প্রয়োগ রাখাই সকলের চেয়ে সুবিধাজনক। উপন্যাস ও নাটকের কথোপকথনে ক্রিয়াপদের কথিত রূপই ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয় কথা এই যে অনেক দেশজ শব্দ কেবল কোন একটি বা দুটি জেলায় বা জেলার কোন একটি অংশে প্রচলিত। সেগুলি পুস্তকে ব্যবহার না করাই ভাল। তবে যদি কোনটি এমন শব্দ হয় যে তাহাতে যে জিনিষটি বা ভাবটি বুঝায়, তাহা বুঝাইবার তেমন সংস্কৃত, সংস্কৃতোদ্ভব বা অধিকতর প্রচলিত দেশজ শব্দ আর নাই, তাহা হইলে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। কেবল, কোথাও পাদটীকায় বা পরিশিষ্টে তাহার অর্থটি বুঝাইয়া দিলেই হইবে।

অক্ষয় বাবুর দ্বিতীয় বক্তব্যে আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ

এক মত। কিন্তু ইহার সহিত সাহিত্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে।

"আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, পল্লীগ্রাম লইয়াই পৃথিবী। সহর, নগর,—ব্যবসায় বাণিজ্যের স্থান, সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্য স্থান। প্রধানত পল্লী লইয়াই প্রদেশ। কিন্তু পল্লীগ্রামের উপর কাহারও দৃষ্টি নাই। যিনি একটু 'মাথাতোলা' হইলেন, তিনিই সহরে গিয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। বলেন দেশের উন্নতি করিতে হইবে। দেশ কি কেবল কলিকাতা আর ঢাকা?

"পল্লীর উন্নতি দূরে থাকুক, এমন কি পল্লীর স্থিতির জন্য কাহারও কোন উদ্যোগ নাই। পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইতেছে, কত বিশিষ্ট গণ্ডগ্রাম হইতে গোরু বাছুর বাঘে লইয়া যাইতেছে, জ্বরে ওলাউঠায় দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে; * * *। এ সকল কথা আমরা প্রায়ই ভাবি না। কিন্তু এখন দিন কতক আমাদের ঘরের কথা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, নহিলে আর যে চলে না।"

এখন অক্ষয় বাবুর কয়েকটি অবান্তর বক্তব্যের আলোচনা করিব। তিনি বলেন ভারতবাসীর ও য়্দীয়াবাসীর মনে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব অধিক পরিমাণে উদিত হয়। "সেই জন্যই অন্যজাতি বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হইলেও ভারতবাসী ও য়ুদী আজিও জীবন্ত রহিয়াছে, শত নির্য্যাতনেও তাহারা জীবন্ত।" সরকার মহাশয় অবশ্য জানেন যে চীনেরা খুব প্রাচীন জ্ঞানী ও শিল্পী জাতি। তাহারা বোধ করি ভারতবাসী ও ইহুদী অপেক্ষা কম বাঁচিয়া নাই। আমাদের অহঙ্কার নষ্ট করিবার জন্য আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই।

অক্ষয় বাবু বলেন,—

"যদি কোন পথে আমাদের প্রকৃত সম্মিলন হয়, উন্নতি হয়, বিকাশ হয়, তবে এই সুকুমার সাহিত্যের পথেই হইবে। * * * আমাদের প্রকৃত পুরাতন সনাতন সমাজ, অসাড়, অনড়, নিস্পন্দ, নিষ্কম্প বিরাট দেহে বিশাল বক্ষে ভর করিয়া ভূমি লইয়া পড়িয়া আছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে,—নাচিতেছেন নীতি-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ সংস্কারক!!! সংস্কার লইয়া সম্মিলন হয় না। ভাঙ্গার পর গড়া হইলে সম্মিলন হয়।" ইত্যাদি।

সাহিত্যের পথে যে সম্মিলন, উন্নতি ও বিকাশ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল ঐ পথেই হয়, ইহা ভ্রান্ত কথা। ইহাও সত্য নয় যে সাহিত্যক্ষেত্রে বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই, বা হইতে পারে না। আর যদি সাহিত্যকেই মিলন, উন্নতি ও বিকাশের একমাত্র পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, অক্ষয়বাবু ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, সাহিত্যকে প্রাণ দেয় ঐ নিন্দিত সংস্কারকগণ। এখন বুদ্ধদেবের, চৈতন্যমহাপ্রভুর, লুথরের, উইক্লিফের ভক্ত অনেকেই আছেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহাদের জীবিত কালে তাঁহারা সংস্কারক বলিয়া নিন্দিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। অথচ এই বুদ্ধের ও বুদ্ধশিষ্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় অনাদৃত পালি সাহিত্যরত্নরাজিতে ভূষিত হইয়াছে। এই চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যদের প্রভাবে বঙ্গভাষা অমৃত-নিষ্যন্দিনী হইয়াছিল। লুথরকে আধুনিক জার্মেন ভাষার পিতা বলিলেও চলে। আধুনিক ইংরাজী গদ্য উইক্লিফের নিকট কি পরিমাণ ঋণী, তাহা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। আধুনিক কালে মিশনরী কেরী সাহেব, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, প্রভৃতি, ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, কোন-না-কোন ক্ষেত্রে "সংস্কারক" ছিলেন। তথাপি, তাঁহাদের বঙ্গসাহিত্যসেবা বোধ হয় সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহাদের এই সেবা ব্যতিরেকে বঙ্গভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না। জীবিত "সংস্কারক" সাহিত্যিক-দের নাম করিবার প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মের, সমাজের, নীতির উন্নত আদর্শ হইতেই সাহিত্য প্রাণ পায়। "সংস্কারক"গণ এই আদর্শকে উন্নত রাখিবার চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁহাদের সকল মত বা সকল কার্য্যপ্রণালী অভ্রান্ত বা সুফলপ্রদ না হইতে পারে। কিন্তু স্থাণুরাই যে সর্ব্বমঙ্গলাকর, তাহাও ত নয়। সাহিত্যের প্রশংসা করিতে গিয়া সংস্কারকদের নিন্দা করা, গাছের শিকড়ে কোপ মারিয়া পাতায় জল ঢালার মত। ইহাও সত্য নয় যে সংস্কারকেরা কেবল ভাঙেন, গড়েন না।

অক্ষয় বাবুর মতে বঙ্কিমচন্দ্র "কুক্ষণে ইংরাজী হইতে নায়ক-নায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন"। নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিতে "আদর্শচরিত্র নাই"। অক্ষয়বাবু এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারতের আদর্শ চরিত্রগুলির সহিত বর্ত্তমান যুগের কাব্যের চরিত্রগুলির তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু "আদর্শ চরিত্র" কথা দুটির মানে বুঝা দরকার। স্বয়ং ভগবান্ এ পর্য্যন্ত এমন মানুষ একটিও গড়েন নাই, যাঁহার জীবনে একটুও খুঁত বাহির করা যায় না। সুতরাং কোন কবির বা সাহিত্যিকের সৃষ্ট কোন চরিত্রও নিখুঁত হইতে

পারে না। অতএব, আদর্শ চরিত্র মানে নিখুঁত চরিত্র নয়। উহাতে গুণের ভাগ খুব বেশী, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই অর্থ অনুসারে বঙ্কিমবাবুর দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, প্রভৃতিতে আদর্শ চরিত্র নাই, ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। নায়কনায়িকার অবতারণা বঙ্কিম বাবু প্রথমে করিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে উহা ছিল না, ইহা সত্য নহে। অক্ষয় বাবু "নায়ক নায়িকা" কথা দুটি হয় ত নিজস্ব কোন অশ্রুত পূর্ব্ব অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। নতুবা, ইহা কি সত্য যে মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, অভিজ্ঞানশকুন্তল, প্রভৃতিতে নায়কনায়িকা নাই, কবিরা কেবল আদর্শ চরিত্র গড়িতেই ব্যস্ত ছিলেন?

অক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের কাব্যে "সেই যে কুরুক্ষেত্র সমরের অবসর-সময়ে রাত্রিকালে হিন্দু রমণী দীপ লইয়া হতাহতের অনুসন্ধান করিতেছেন - সেটি কি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের একরূপ সংস্করণ নয়?" সরকার মহাশয় ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি ব্যাধিগ্রস্ত কল্পনা হইতে প্রসূত বলিয়া মনে করি:—"যদি স্বামিসেবা বিস্মৃত হইয়া কুলবধূ পরপুরুষের হতাহতের সেবায় ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে সেই আদর্শ [সধবা কুলবধূর আদর্শ] থাকে কি?" "পরপুরুষ" কথাটার সঙ্গেই এমন এক দুষ্য আনুসঙ্গিক ভাবে (association) জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গে উহার ব্যবহারই আমরা গর্হিত মনে করি। যদি কোন নারী নিঃসম্পর্ক আহত পুরুষের সেবায় ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে, তিনি স্বামিসেবা বিস্মৃত না হইয়া কি তাহা করিতে পারেন না? স্বামীর সম্মতি, অনুমোদন, আদেশ অনুসারে কি তাহা হইতেই পারে না? পাশ্চাত্য দেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। জাপানের, চীনের, তুরস্কের প্রাচ্য নারীরাও ত যুদ্ধে আহত পুরুষদের সেবা করেন। তাঁহারা কি হেয়? অক্ষয় বাবু কেবল সধবা কুলবধূর আদর্শের কথাই বলিয়াছেন। এইজন্য ভারতীয় বিধবা বা ভারতীয় অবিবাহিতা সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে সেবাব্রতধারণের সম্ভাব্যতা বা উপযোগিতার বিচার করিলাম না।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। যিনি বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ও "তন্ মন ধন" দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার উপর এই ভার দেওয়া অতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা"। তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধটির কিছু সারোদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"বর্ত্তমানকালে [বঙ্গ] ভাষা যেরূপ পরিপুষ্ট ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইহার সাহায্যে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাদান অনায়াসে চলিতে পারে।" "বাংলা ভাষার একটি বড় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে। ইংরাজি, জর্ম্মান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু বাংলার * * * বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পুস্তক নাই বলিলেই হয়। এই জন্য বলিতে হইবে আমাদের ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় নাই।" "এখন এই যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা অগ্রসর হইল না, ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অভাব।"

"সকল দেশেই জীবিকার সহিত যে-বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লোকে তাহারই আদর করিয়া থাকে। এ দেশে বৈজ্ঞানিকের কাটতি ছিল না, কাজেই বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য লোকের আমদানী হইল না। অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, আইন আদালত ও সরকারি আফিস স্থাপনের পর, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এ দেশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে-সকল সরকারী বিভাগের সৃষ্টি হইল, সে-সকল বিভাগেও দেশবাসিগণকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের জীবিকার্জ্জনের কোন পন্থাই পরিদৃষ্ট হইল না।"

"যে দিন দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া বৈজ্ঞানিকের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, ও বৈজ্ঞানিক বিভাগ সমূহে ভারতবাসীদের প্রবেশাধিকার হইবে, সেই দিন হইতে বিজ্ঞানের যথোচিত আদর হইবে। তখনই এমন একদল লোক জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিবেন।"

"বঙ্গদেশে সাধারণের জন্য কি প্রকার জ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অধিক বিতণ্ডার আবশ্যক নাই। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম প্রয়োজন সুস্থ সবল দেহে জীবন যাপন করা। তৎপরে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তদুপযোগী শিল্প শিক্ষা করা। স্পেন্সার দেখাইয়াছেন যে, বিজ্ঞানশিক্ষাই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। কাব্য ললিত-কলার শিক্ষা পরে প্রয়োজন।"

"বঙ্গদেশে একাল পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই বিজ্ঞানশিক্ষা হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচলন হয়, তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিবার সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির নিকট হইতেই শিক্ষালাভ। উহা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। একটা বিদেশীয় ভাষার কবলে উহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে।"

"বাঙ্গালাদেশে যে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্যক ফলদায়ক হয় নাই তাহার দুইটী কারণ: প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্টের বিবিধ বৈজ্ঞানিক-বিভাগে দেশীয়-দিগের প্রায় প্রবেশাধিকার ছিল না। কাজেই সুবিধার অভাবে তাহাদের শিক্ষা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী-ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এদেশের লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় চারি

আনা আন্দাজ অর্থাৎ লাখের মধ্যে ২॥০ জনের বেশী বিজ্ঞানের ধার ধারে না। কাজেই অবশিষ্ট অগণ্য লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যদি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা হইত তাহা হইলে এতদিনে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে কত ভাল ভাল পুস্তক লিখিত হইত। সেই সকল পুস্তকের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত আরও অনেক লোকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিত। ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের উন্নতি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকের অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের লোকের দ্বারাই অধিক হইয়াছে। যদি ইংলণ্ডে সমুদায় বিজ্ঞানচর্চ্চা জাপানী-ভাষায় হইত তাহা হইলে সেখানে কি ফ্যারাডে বা ডেভি জন্মিতে পারিত?

"প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয় সত্য বলিয়া অবধারিত হইলে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্র তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভাষাশিক্ষার্থীকে পুস্তকের কথা ও শিক্ষকের বাক্যকে প্রতি পদেই বিনাবিচারে মানিয়া লইতে হইবে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, ভাষা-শিক্ষার সময়ে মানসিক চিন্তা যে প্রণালীগত হয়, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রায় তাহার বিপরীত চিন্তা-প্রণালীর প্রয়োজন। এই কারণে যে সকল ভারতীয় ছাত্রের বাল্যকাল ভাষাশিক্ষাতেই অতিবাহিত হয়, পরবর্ত্তীকালে তাহারা মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জাপানী ছাত্রগণকেও ত বিদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিতে হয়। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, জাপানীরা আজিও মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। আর জাপানীদের বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালীদের ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষা অনেক সহজ। তাহারা ইংরাজী ভাষায় উচ্চারণ ও Idiom এর বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। শুধু ইংরাজী ও জার্ম্মান ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।"

"এসিয়া-খণ্ডে যে জাতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, আমাদের যে তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করা উচিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জাপানি ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্য জাপানীরা উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা ইংরাজি ও জর্ম্মান ভাষায় প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি কলেজের লেক্‌চার পর্য্যন্ত জাপানী ভাষায় দিতেছেন। জাপানীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রথমতঃ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চ্চা সমধিক বাঞ্ছনীয়।"

অধ্যাপক রায় মহাশয় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

একটি অবান্তর বিষয়ে তিনি বড় ভুল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—"রুশিয়ার ভাষা অনার্য্য ভাষা; সংস্কৃত গ্রীক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আর্য্যভাষা সমূহের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই। সেই জন্য রুশিয়ান ভাষা শব্দসম্পদে বড়ই দীনা।" প্রকৃত কথা এই যে রুশীয় ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতিরই মত আর্য্যভাষা, এবং তাহাদের সহিত উহার সম্পর্ক আছে। এই তথ্যটি এত সুপরিচিত যে প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যাপক বসুর নূতন আবিষ্ক্রিয়া।

বিলাতের রয়্যাল সোসাইটী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমিতি। গত ৬ই মার্চ্চ ইহার এক অধিবেশনে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাহাতে তাঁহার একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ও তাঁহার উদ্ভাবিত যে বিস্ময়কর যন্ত্রসহযোগে ঐ আবিষ্ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আছে। রয়্যাল সোসাইটীতে প্রবন্ধ পঠিত হওয়া গৌরবের বিষয় বটে; কিন্তু আবিষ্ক্রিয়াটিই ভারতবর্ষের পক্ষে নিরতিশয় আনন্দ ও গৌরবের সংবাদ। সকলেই জানেন, মানুষের কোন অঙ্গে সুখ বা বেদনা বোধ হয়, যখন সেই অঙ্গের স্থানীয় 'উত্তেজনা' মস্তিষ্কে পৌঁছে। তেমনি মস্তিষ্ক হইতে আদেশ প্রেরিত হইলে আমরা নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন করি। মস্তিষ্কের সহিত এই যে নানা অঙ্গের যোগাযোগ, ইহা যে সূক্ষ্মতন্তুগুলির দ্বারা সাধিত হয়, তাহাদিগকে সচরাচর স্নায়ু বলা হয়। অধ্যাপক বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাণীদেহে যেমন স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রেরণা আছে, উদ্ভিজ্জ-দেহেও তদ্রূপ উত্তেজনা ও প্রেরণা আছে; মস্তিষ্কের মত ইন্দ্রিয়ও আছে। এবিষয়ে এপর্য্যন্ত সুবিখ্যাত জর্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক পেফের ও হেবারলাণ্ট সাহেবদিগের মতই গৃহীত হইত। তাঁহারা ঐরূপ উত্তেজনা ও প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বসু মহাশয় তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার যন্ত্রটির ক্রিয়া এরূপ সূক্ষ্ম যে ইহা নিজে নিজেই এক সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ পর্য্যন্ত সময় পরিমাণ করিতে পারে। কালের হিসাবে বসু মহাশয়ের এই আবিষ্ক্রিয়াটি নূতন নহে। ইহা দশ বৎসর পূর্ব্বে সাধিত হয়। তিনি একটি নূতন তত্ত্ব বাহির করিবা মাত্রই তাহা প্রকাশ করেন না। অনেক বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার পর যখন আর তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, তখন তাহা প্রচার করেন। "নূতন" আরও এই অর্থে বলা যায় যে বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের দশ বার বৎসর লাগে, দেখিতেছি।

বসু মহাশয় আমাদের স্বদেশবাসী, ইহা বলিয়া বড়াই করা অশোভন। আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী বলিয়া

পরিচিত হইবার যোগ্য নই। দীনভাবে ইহা স্বীকার করিয়া, এই যোগ্যতা লাভের জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

"কাজকর্ম্ম জুটে না।"

আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, অমুক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বাড়ীতে বসিয়াই আছেন, কাজ কর্ম্ম জুটে না। দেশে এত অজ্ঞানতা, এত রোগ, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে এত বিবাদ, এত দুর্নীতি, অথচ কাজ কর্ম্ম জুটে না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আশানুরূপ টাকা রোজগারের উপায় জুটে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু কাজ কর্ম্ম জুটে না, ইহা ঠিক্ নয়। আমি এত বড় পণ্ডিত, আমি এরূপ গুণশালী, এ কাজ কি আমার উপযুক্ত? এরূপ না ভাবিয়া, লোকশিক্ষা, রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা, বিবাদভঞ্জন, সুনীতি বিষয়ে উপদেশ দান, প্রভৃতি যে কাজ যিনি পারেন, বা যাহার যেরূপ সুযোগ ঘটে, তিনি তাহাই করুন। তাহা হইলে কাজ জুটিবে, আলস্য ঘুচিবে, প্রাণে আশা ও উৎসাহ আসিবে। অন্নের অভাবও হইবে না। ভিখারীরও অন্ন জুটে। আর যিনি পরিশ্রম করিবেন, বিধাতা তাঁহাকে অন্ন দিবেন না? কিন্তু যদি সকলেই ধনশালী হইতে চান, তাহা হইলে সকলের আশা পূর্ণ না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু 'কাজ জুটে না' ও 'আশানুরূপ ধন জুটে না', এই দুটি অভিযোগ এক নহে।

সম্পাদক।

ব্যর্থ-প্রয়াস

মানসে আমার যে কমল ফোটে
কুমুদ হয় যে ম্লান,
যে আলোক এসে মৃদু মধু হেসে
দিন করে আগুয়ান,
সে আলোক সেই কুসুম আমার
তোমারে দেখাতে সাধ;
এত প্রাণপণ মসীর লিখন
কেবলি সাধিছে বাদ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

থেরীগাথা।

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত (প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারি, ঢাকা) পৃঃ ১৬১, মূল্য একটাকা।

গ্রন্থকার বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত; নানা বিভাগে ইঁহার মস্তিষ্ক ও লেখনী চালিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অধুনা নূতন ব্রতে ইনি ব্রতী হইয়াছেন, এবং এখানেও ইঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইতেছি। থেরীগাথা বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল পালি, মূলের অনুবাদ এবং টীকা দেওয়া হইয়াছে। এই টীকার সাহায্যে পাঠকগণ মূল পালিও পড়িতে পারিবেন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি।

Pali Text Society রোমান্ অক্ষরে এই গ্রন্থ (থেরগাথা সহ) মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহার মূল্য দশ শিলিং ছয় পেন্স (৭৸৵০) এবং ইহার যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূল্য ৫ পাঁচ শিলিং (৩৸০) মূল ও অনুবাদের মূল্য ১১৸৵০। কিন্তু বিজয় বাবুর সংস্করণে এক টাকায় মূল ও অনুবাদ উভয়ই পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থের অনুক্রমণিকাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"থেরীগাথা ভারতের প্রাচীন গৌরবের অতি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নারীজাতির সুশিক্ষা ও নারীজাতির প্রতি যথার্থ সম্মানের এমন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালের স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের দৃষ্টান্তে কেহ কেহ খনা ও লীলাবতীর নাম করিয়া থাকেন; তাঁহারা হয় ত জানেন না যে এই দুইটিই কল্পিত নাম। খুঁজিয়া পাতিয়া কল্পিত নামের দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকেরা হতাশ হইয়া মনে করিতে পারেন যে, এদেশে হয় ত প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না। উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনীদিগের নাম এবং অন্যান্য দুচারিটি দৃষ্টান্ত প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে; কিন্তু পালি নামে খ্যাত প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যে নারী-মাহাত্ম্যের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"থেরীগাথা গ্রন্থে ৭৩ জন পূতশীলা নারীর পদ্য রচনা সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-রমণীগণ কর্ত্তৃক যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কত, সে কথা সুধী পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ভগবান বুদ্ধদেব যখন মুক্তির নব সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী মুক্তিকামনায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে রমণীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৩ জন রমণীর রচনা এই থেরীগাথায় পাওয়া যায়।

"থেরী শব্দের অর্থ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা। জ্ঞানবৃদ্ধ থের বা জ্ঞানবৃদ্ধা থেরীগণ কেহ বা যৌবনে কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে এবং কেহ বা বার্দ্ধক্যে বুদ্ধদেবের নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। থেরীদিগের জীবনচরিত এবং রচনা দেখিয়াই পাঠকেরা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের যুগে ভারত-সমাজে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা কিরূপভাবে প্রচলিত ছিল। যাঁহারা স্ব স্ব গৃহে শিক্ষিতা হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুদ্ধদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর আপনাদের জীবনচরিত এবং ধর্ম্মজ্ঞানের কথা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

বহু শত থেরীর মধ্যে কেবল ৭৩ জনের জীবনচরিত এবং রচনা থেরী-গাথায় নিবদ্ধ আছে। গাথাগুলির অনুবাদে থেরীর জীবনচরিতের যে আভাস পাইবেন, পাঠকেরা তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে প্রাচীন সমাজ কতদূর উন্নত এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুকূল ছিল।

"থেরীগাথা বৌদ্ধ বেদ বা ত্রিপিটকের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পিটকের নাম সুত্তপিটক; এই সুত্তপিটকের প্রধান ভাগ, কয়েকখানি নিকায় গ্রন্থ লইয়া। ঐ নিকায়গুলির অন্তর্বর্ত্তী বর্গে ১৫ খানি খুদ্দক নিকায় পাওয়া যায়, থেরীগাথা সেই খুদ্দকনিকায়ের একখানি নিকায়। অপদান নামে যে খুদ্দক নিকায় গ্রন্থখানি প্রচারিত আছে, তাহাতেও থেরীগণের কোন কোন রচনা এবং জীবনচরিত সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অপদান গ্রন্থখানি যে সময়ে সংগৃহীত বা রচিত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধদেবের নামে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত হইয়াছিল। এই জন্য অপদানকার শ্রমণ-শ্রমণীদিগের জীবনের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস পর্য্যন্ত দিয়াছেন। সে কথাগুলিও ধর্ম্মের ইতিহাসের জন্য উপযোগী। লিপি প্রচলিত থাকিলেও এ দেশে, সে কালে এবং এ কালে অনেক গ্রন্থ মুখস্থ রাখিয়া আবৃত্তি করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। থেরীগাথাগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রমণ-শ্রমণীগণ মুখস্থ রাখিয়া আবৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন এবং পরে মৌর্য্য রাজাদিগের সময়ে ঐ গাথা-গুলি কেবলমাত্র দীর্ঘতার বিচারে বিভক্ত হইয়া সঙ্গীতকারদিগের দ্বারা পরে পরে সজ্জিত হইয়াছিল। থেরধর্ম্মপাল থেরীগাথার পরমত্থদীপনী নামক একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই টীকার একস্থানে লিখিয়াছেন যে, থেরীগণ যে গাথা গাহিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা "একজ্ঝংকত্বা," "একনিপাতাদি বসেন সঙ্গীতম্ আরোপয়েংসু।" কাজেই অপদানের অনেক কথা এবং টীকাকারের অনেক ইতিহাস সতর্ক হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে স্থানে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি, তাহা অনুবাদের সময়ে টীকায় নির্দ্দেশ করিলাম।

"থেরীদিগের জীবনচরিত এবং রচনার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে থেরীসঙ্ঘ সৃষ্টির কিঞ্চিৎ ইতিহাস দিতেছি। থেরীগাথার মধ্যে একজন থেরীর নাম মহাপজাপতী গোতমী। পালিভাষায় পজাপতী শব্দ অনেক স্থলে স্ত্রী বা ভার্য্যা অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়; মহাপজাপতী অর্থ রাজার প্রধানা মহিষী। ভগবান্ বুদ্ধদেবের মাতার মৃত্যুর পর ইনি শুদ্ধোদন দেবের প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন, এবং এই অঞ্জনরাজকুমারী মাতৃহীন বুদ্ধদেবকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। যখন মহাপুরুষের পরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন এই পুণ্যময়ী গোতমী দেবীর প্ররোচনায় বুদ্ধদেব স্বতন্ত্রভাবে ভিক্ষুণী আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজেই বলিতে পারি, যে, গোতমী দেবী থেরীসঙ্ঘের জননী ছিলেন। ইঁহার করুণায় ধর্ম্মচর্চ্চা এবং ধর্ম্মপ্রচারের পথে রমণীর অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। আশা করি যে, নারীজাতির হিতসঙ্কল্পে এ কালে যে-সকল অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার কোন একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানে করুণাময়ী মহাপজাপতী গোতমীর নামাঙ্কিত হইবে।

"ইউরোপীয় সমালোচকেরা থেরীদিগের রচনা এবং জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতরমণী যে সুশিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। থেরীগাথা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ রীস্ ডেবিডস্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন :—It (থেরীগাথা) affords a very instructive picture of the life they (থেরীগণ) led in the valley of the Ganges in the time of Gotama the Buddha. It was a bold step on the part of the leaders of the Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women But it is quite clear that the step was a great success, and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments, as they were for religious earnestness and insight.

Buddhism, P. 72.

"গোতম বুদ্ধের সময় থেরীগণ গঙ্গানদীর উপত্যকায় যেরূপ জীবন-যাপন করিতেন, থেরীগাথা হইতে তাহার একটি অতি উপদেশপ্রদ চিত্র পাওয়া যায়। নারীগণকে এত স্বাধীনতাপ্রদান এবং তাহাদিগকে এত উচ্চস্থান দেওয়া বৌদ্ধ সংস্কারের নেতাদিগের পক্ষে সাহসের কাজ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, এই কাজটি খুব সফল হইয়াছিল এবং এই মহিলাগণের অনেকে ধর্ম্ম বিষয়ক আন্তরিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, উচ্চ মনস্বিতার জন্যও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাবতী হইয়াছিলেন।

"প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পরে আবার এই ভারত-গৌরব রমণী-গণের জীবনী এবং গাথা গৃহে গৃহে পঠিত এবং আলোচিত হউক।"

'মহাপজাপতী গোতমী' সম্বন্ধে গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন "ইঁহারই পরামর্শে ভগবান্ বুদ্ধদেব স্ত্রীজাতির অধিকার উন্মুক্ত করিয়া-ছিলেন।" প্রকৃত ঘটনাটি এই :—মহাপ্রজাবতী গোতমী এক সময়ে গোতমকে এই প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন—"হে ভদন্ত! তথাগত যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম অনুসরণ করিবার জন্য যদি স্ত্রীলোকদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে মঙ্গল হয়।" গোতম বলিলেন "হে গোতমি! তুমি এ প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিও না।" গোতমী তিনবার এই প্রকার অনুরোধ করিলেন, বুদ্ধও তিনবারই ঐ একই উত্তর দিলেন। ইহার পর মহাপ্রজাবতী কেশচ্ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বহুসংখ্যক শাক্য রমণী সমভিব্যাহারে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। (এই সময়ে বুদ্ধ বৈশালীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন)। পথশ্রমে তাঁহার পদ স্ফীত ও দেহ ধূলিরাজিতে ধূসরিত হইয়াছিল; তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও দুর্ম্মনা হইয়াছিলেন, চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল এবং তিনি রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া এবং সমুদয় ঘটনা অবগত হইয়া আনন্দ বুদ্ধ সমীপে গমন করিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মে অধিকার দিবার জন্য আনন্দ বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেব বলিলেন "আনন্দ, তুমি এ প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিও না।" আনন্দও তিন বার এই প্রকার অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ তিনবারই ঐ প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন। ইহার পর আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তথাগত যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ করিয়া এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে সমর্থ কিনা? এবং তাহারা 'স্রোতাপন্ন' 'সকৃদাগামী' 'অনাগামী' এবং 'অর্হৎ'—এই সমুদয় পদলাভ করিবার উপযুক্ত কিনা?" বুদ্ধ বলিলেন "হাঁ, ইহারা সমর্থ।" তখন আনন্দ বলিলেন—"স্ত্রীলোক যখন সমর্থ, এবং মহাপ্রজাবতী গোতমী যখন তথাগতের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন, তিনি যখন মাতৃস্বসা, মাতার মৃত্যুর পর তিনি যখন তথাগতকে পালন করিয়াছেন এবং স্তন্যদান করিয়াছেন—তখন স্ত্রীলোকদিগকে তথাগত-প্রচারিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিবার জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অধিকার দেওয়াই উচিত।" ইহা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন "গোতমী যদি আটটী বিশেষ নিয়ম পালন করিতে প্রস্তুত হন, তবে তাঁহাকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যাইতে পারে।" গোতমী

আনন্দের সহিত এই সমুদয় নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে ভিক্ষুণীদল গঠিত হইল।

গ্রন্থকার একজন সুকবি, অনুবাদেও তাঁহার কবিত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। অম্বপালী নামক একজন পতিতা-রমণী থেরী ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবার পর একটি গাথা রচনা করিয়াছিলেন। এই গাথা কি সুন্দর ভাবে অনূদিত হইয়াছে পাঠকগণ ইহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন :—

ভ্রমরের মত কাল ছিল কেশ বর্ণে,
কুঞ্চিত ছিল বেণী-পর্ণে ;
আজি যে জরায় মাথা, শণের মতন সাদা ;
প্রভুর বচন জাগে মর্ম্মে।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

সুগন্ধি চূর্ণকে ছিল কেশ সুরভি,
গুঁজিতাম চম্পক করবী ;
শশকের লোম-প্রায়, গন্ধ এখন তায় ;
যাবে সব ; সারহীন গরব-ই—
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

যবে কেশ—কাননের মত ঘন রোপিত—
স্বর্ণ-সূচিতে হত গ্রথিত,—
ফুটিত কানন পরে, পল্লব শোভাভরে ;
আজি যে বিরল আর পলিত।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

সুরভিত কাল কেশে বেণী হত রচিত
স্বর্ণ-ভূষণে হয়ে খচিত ;
ললিত শোভায় সাজি, স্খলিত জরায় আজি ;
আজি মোর শির কেশরহিত।
সত্য বচন তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

নীল রঙ্গে তুলি দিয়া যেন পটে লিখিত
ভ্রূযুগল সুন্দর লখিত।
জরায় তখন তথা, পেশীগুলি অবনতা,
সুন্দরী আমি আজ নহিত।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

মণি সম সুরুচির ভাস্বর আলোকে
সুনীল আয়ত আঁখি, পলকে
করিল মলিন যে তে ! জরা প্রবেশিয়া দেহে !
আদরিবে হেন ধন বল কে ?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

উচ্চ নাসিকা মোর স্বর্ণের বরণে
কি শোভিত ! পড়ে শুধু স্মরণে।
শুকায়ে পড়েছে ঝুলে, যেন রে মুগের ফুলে ;
দলিত এ দেহ জরা-মরণে।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

কঙ্কণ সম তার সুগড়ন, বর্ণ,—
এমনি শোভিত মম কর্ণ ;
বরণে, গড়নে তার, কোথায় সে শোভা আর ?
এ জরায় সে যে লোল-চর্ম্ম।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

নবোদ্গত কদলীর মত ছিল দন্ত
সার বাঁধা—আজি শোভা অস্ত ;
যবের মতন পীত ; শোভা তার অপনীত
পড়ে খসি ! জরা বলবন্ত।
সত্য বচনে তাঁর—অন্যথা কোথা বা ?

উপবনে কোকিলার মত আমি নিতি গো
গাহিতাম সুস্বরে গীতি গো।
গেছে সে মধুর স্বর ! তবু কেন করে নর
এ দেহের পরে এত প্রীতি গো ?
সত্য বচনে তাঁর—অন্যথা কোথা বা ?

সোনার শাঁখের মত ছিল যার শোভা গো,
এই কি আমার সেই গ্রীবা গো ?
জরায় গিয়াছে ভেঙ্গে, ঝুলিয়া পড়েছে নেমে।
এ দেহের গৌরব কিবা গো ?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

বাহু দুটি ছিল যেন বর্ত্তুল অর্গল ;
এখন হয়েছে নত, দুর্ব্বল।
জরা-বশে হল বাঁকা, যেন পাটলীর শাখা।
হায়রে জীবের বল-সম্বল !
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

স্বর্ণ-মুদ্রিকা আর বিভূষণ-ন্যস্ত
শোভিত আমার দুটি হস্ত।
জটা-বাঁধা শিরা তায়, গাছের শিকড়-প্রায় ;
জরা-ভরে চারুশোভা গ্রস্ত।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

সুগোল পৃথুল উঁচু কুচযুগ নমিত ;
যেন তারা রাজে—জল-গলিত
চর্ম্ম-মোশক প্রায়, শুষ্ক বাঁশের গায়,
কোথা আজি চারুশোভা ললিত ?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

কাঞ্চন ফলকের সুমসৃণ বন্ধ,—
এমনি সুঠাম ছিল অঙ্গ ;
জরা আসি আজি তায়, শুকায়ে দিয়াছে হায় !
আজি দেহভরা লোল চর্ম্ম।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

করিকর সম মম গুরু উরু শোভিত ;
হয়েছে সেদিন আজি অতীত।
রসহীন, দুর্ব্বল, যেন রে বাঁশের নল !
আজি সারা দেহ জরামথিত।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

স্বর্ণ-নূপুর আদি বিভূষণ যতনে
সাজাইয়া রাখিতাম চরণে ;
তিলের ডাঁটার প্রায়, শিরা-তোলা দেখি তায়।
অভিভূত দেহ জরা-মরণে।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা ?

তুলা-ভরা তুলতুলে রক্তিম ললিত—
পদতলে কত শোভা ফলিত!
ফেটে গেছে পদতল, নহে আর সুকোমল;
জরাবশে দেহ আজি গলিত।
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা?

এমনি ত জর্জ্জর-দেহ দুখ-গেহটি
তার পানে ফিরে চাহে কেহ কি?
দেয়াল হইতে ঝরে' রূপের প্রলেপ পড়ে!
গরবের ধন এই দেহ কি?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা?

কয়েকটি স্থলে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। পালি 'দোস' শব্দের অর্থ 'দ্বেষ'। গ্রন্থকার কোনস্থলে (গাথা ১৮) এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে (গাথা ২১, ৪৪) ইহার অনুবাদে 'দোষ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একস্থলে লিখিয়াছেন "আসব শব্দ অসুঃ=জীবন হইতে মনে করি" কিন্তু আমাদিগের মনে হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাই ঠিক—"আসব= আস্রব"। জৈন সাহিত্যে ইহার ব্যবহার রহিয়াছে, তত্ত্ব সমূহের মধ্যে ইহা একটী তত্ত্ব। ৬০ সংখ্যক গাথাতে গ্রন্থকার "সতীমতী" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন হস্তলিপিতে পাঠান্তরও রহিয়াছে—সতিমতি, 'সতিমতী' ইত্যাদি পাঠও পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের মতে ইহার অর্থ শ্রদ্ধাবতী, কিন্তু আমাদিগের মনে হয় ইহার অর্থ "স্মৃতিমতী"।

গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

ভ্রম-সংশোধন

গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে আমার 'তাতার লৌহের কারখানা' নামক প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল ছিল। সেজন্য আশা করি, পাঠকবর্গ আমায় মার্জ্জনা করিবেন।

সম্প্রতি সাঁকচী (কালীমাটী) হইতে তাতার লৌহের কারখানা ও তৎসম্বন্ধীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ও তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আমার সেই ভুলগুলি নির্দ্দেশ করিয়া পত্র লিখিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ভুলগুলি এই,—

১। ইস্পাত প্রস্তুত করিবার শেডটির দৈর্ঘ্য আমি ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলাম ৩৫০০ ফুট, উহা সুবৃহৎ জলাশয় বা cooling tankটির এক দিকের একটি প্রকাণ্ড বাঁধের দৈর্ঘ্য; শেডটি লম্বে ৬৫০ ফুট। উহার উচ্চতাও আমার প্রবন্ধে লিখিত উচ্চতা অপেক্ষা কম।

২। এখনকার যে হাঁসপাতাল, তাহা কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থায়ী হাঁসপাতাল এখনো নির্ম্মিত হয় নাই। তাহার জন্য কোম্পানী ৫০,০০০এর অনেক বেশী টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। হাঁসপাতালে nurse বা ধাত্রী তিন জন নাই, আপাততঃ একজন আছে।

৪। শ্রীযুক্ত কান্তি বাবু লিখিয়াছেন যে Rankin সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই অথচ Scientific Americanএ প্রকাশ, হইয়াছিলেন।

৫। ইংরাজ বা আমেরিকানদের পৃথক হোটেল নাই। মোটে একটি হোটেল ছিল তাহাতেই ইংরাজ, জর্ম্মান ও আমেরিকানরা ভোজন করিত; তাহাও সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে।

৬। অল্পদিনের মধ্যে সাঁকচীতে আরো অনেকগুলি দোকান হইয়াছে। আমার প্রবন্ধে বর্ণিত দোকানের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোম্পানী দোকানের জন্য অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

মাঘ মাসের প্রবাসীতে "আলিগড় প্রবাসী বাঙ্গালী" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, মহাশয়, আলিগড় কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আদি বাসস্থান পাবনা জেলার অন্তর্গত ভারেঙ্গা গ্রামে, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এ কথাটী ঠিক নয়। তাঁহার আদি বাসস্থান পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ সব-ডিভিজনের অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে। বর্ত্তমান বাসস্থান সিরাজগঞ্জ টাউনের উপরে।

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

চৈত্রের প্রবাসীতে (৬৩৩ পৃঃ) Capellaকে "অগস্ত্য" বলা হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তে Capellaর নাম "ব্রহ্ম-হৃদয়"। ধ্রুবক ৫২।০ 52° অক্ষাংশ ৮।০ 8°N. অতএব ভুলের সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে "অগস্ত্য"র ধ্রুবক ৮৭।০ (মতান্তরে ৯০।০) অক্ষাংশ ৭৭।০ দ 77°S (মতান্তরে ৮০।০ দ)। অতএব অগস্ত্য Capella হইতে পারে না। অগস্ত্য দক্ষিণাকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ইংরাজি নাম Canopus, কর্কট রাশিতে লুব্ধক Sirius (Dog Star) অপেক্ষা ৩৭° অংশ দক্ষিণে।

বর্ণ-শিখা "প্রায় ৬০,০০০ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে" বলা হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য বল (Sir Robert Ball) তাঁহার গ্রন্থ The Story of the Heavens-র ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠায় আচার্য্য ইয়ং (Young) বর্ণিত ৭ই অক্টোবর ১৮৮০ সালের ৩,৫০,০০০ সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল দীর্ঘ শিখার কথা লিখিয়াছেন। অবশ্য সচরাচর যে এত দীর্ঘ শিখা দেখা যায় না তাহাও বলিয়াছেন।

প্রবাসীর জনৈক পাঠক।
হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মৃত্যুর মাধুরী।

দান্তে গেব্রিয়েল রসেটীর অঙ্কিত চিত্রের প্রতিরূপ।

Three colour blocks by U. Ray & Sons

Kuntaline Press, Calcutta.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

২য় সংখ্যা

সৃষ্টি-প্রলয়ের অনাদ্যনন্ত পর্য্যায়ের পৌরাণিক কল্পনা

বৈদিক ঋষি ব্রহ্মবাদী, এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু। দার্শনিকের মাপকাটীতে তাঁহার মাপ করা চলে না। সৃষ্টি আদি কি অনাদি, বৈদিক ভক্ত কবির নিকটে আমরা সে প্রশ্নের দার্শনিক বিচার আশা করিতে পারি না। তাঁহার নব-উন্মেষিত ভক্তিবিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদিমান্ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। বাহ্য বস্তু সকলের দৈনন্দিন উৎপত্তি এবং বিনাশ, তিনি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। সৃষ্টির আদিমত্ব কি কেবল আমাদের এই বিশ্বসম্বন্ধী, অথবা বিশ্বান্তর সম্বন্ধেও সেই কথা? সৃষ্টি কি কালপ্রবাহ সম্বন্ধেই মাত্র আদিমান, অথবা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও আদিমান? বৈদিক ঋষির মনে এ-সকল জটিল দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হয় নাই। আবার সৃষ্টি বলিলেই বৈচিত্র্য বা নানাত্ব বুঝায়। সৃষ্ট হইতে গেলেই দেব, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ্ এবং প্রস্তরাদি সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে বৈষম্য বা আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ অনিবার্য্য। সেই বৈষম্যের জন্য কি কেহ দায়ী? যদি দায়ী হয়, তবে কে দায়ী? ঈশ্বর যিনি "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" তিনি কি পক্ষপাতী? তিনি কি দেবাদির প্রতি অনুগ্রহ এবং পশু-প্রস্তরাদির প্রতি নিগ্রহ করিয়া থাকেন? বৈদিক ঋষির মনে এ-সকল প্রশ্নেরও উদয় হয় নাই। আবার বিনা প্রয়োজনে কেহ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ঈশ্বর যাঁহাকে পূর্ণকাম বলা যায়, তাঁহার এমন কি প্রয়োজন হইয়াছিল, যে, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও বৈদিক ঋষি যত্ন করেন নাই।

কালক্রমে দার্শনিকের অভ্যুদয়। দার্শনিক বৈদিক ঋষি বা দ্রষ্টার স্থান অধিকার করিল। শঙ্করাচার্য্য একজন কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিক। সৃষ্টি আদি কি অনাদি, তাঁহার মনে এ প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি দেখিলেন সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে, আকস্মিকত্ব দোষ অনিবার্য্য। বালক অথবা ক্ষিপ্তের ন্যায় আকস্মিক হুজুকের অধীন (Caprice) হইয়া, বিনা প্রয়োজনে ঈশ্বর সহসা কোন এক সময়ে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শঙ্কর এরূপ মত পোষণ করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে পরমেশ্বরের পূর্ণকামত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বরিক গুণের ব্যাঘাত হয়। সৃষ্টির আদি স্বীকার করিয়া ঈশ্বরেতে আকস্মিকত্ব দোষ আরোপ করিতে শঙ্কর অনিচ্ছুক। এজন্য তিনি বলিতেছেন "অনাদিত্বাৎ সংসারস্য" (ব্রহ্মসূত্র ২-১-৩৫)। শঙ্কর দেখিলেন দেব-তির্য্যক্-নরাদির মধ্যে সুখ-দুঃখের অত্যন্ত বৈষম্য। স্রষ্টা হইতে সৃষ্টি, তিল হইতে যেমন তৈল হয় (Nothing is evolved, but what is involved)। বালি হইতে তৈল হয় না, তিল হইতেই হয়, কারণ তিলে প্রচ্ছন্নভাবে (Implicit) তৈল আছে, বালিতে তৈল নাই। স্রষ্টার মধ্যেও কি তবে সেইরূপ বৈষম্যাদি দোষ প্রচ্ছন্নভাবে (Implicit) আছে? স্রষ্টার মধ্যে বৈষম্যাদির কলঙ্ক আরোপ করাও শঙ্করের মত দার্শনিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমরা পূর্ব্বে

মৃত্যুর মাধুরী।

দান্তে গেব্রিয়েল রসেটীর অঙ্কিত চিত্রের প্রতিরূপ।

Three colour blocks by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press, Calcutta.*

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

২য় সংখ্যা

সৃষ্টি-প্রলয়ের অনাদ্যনন্ত পর্য্যায়ের পৌরাণিক কল্পনা

বৈদিক ঋষি ব্রহ্মবাদী, এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু। দার্শনিকের মাপকাটীতে তাঁহার মাপ করা চলে না। সৃষ্টি আদি কি অনাদি, বৈদিক ভক্ত কবির নিকটে আমরা সে প্রশ্নের দার্শনিক বিচার আশা করিতে পারি না। তাঁহার নব-উন্মেষিত ভক্তিবিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদিমান্ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। বাহ্য বস্তু সকলের দৈনন্দিন উৎপত্তি এবং বিনাশ, তিনি সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। সৃষ্টির আদিমত্ব কি কেবল আমাদের এই বিশ্বসম্বন্ধী, অথবা বিশ্বান্তর সম্বন্ধেও সেই কথা? সৃষ্টি কি কালপ্রবাহ সম্বন্ধেই মাত্র আদিমান, অথবা ব্রহ্ম সম্বন্ধেও আদিমান? বৈদিক ঋষির মনে এ সকল জটিল দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হয় নাই। আবার সৃষ্টি বলিলেই বৈচিত্র্য বা নানাত্ব বুঝায়। সৃষ্ট হইতে গেলেই দেব, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ্ এবং প্রস্তরাদি সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে বৈষম্য বা আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ অনিবার্য্য। সেই বৈষম্যের জন্য কি কেহ দায়ী? যদি দায়ী হয়, তবে কে দায়ী? ঈশ্বর যিনি "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ" তিনি কি পক্ষপাতী? তিনি কি দেবাদির প্রতি অনুগ্রহ এবং পশু-প্রস্তরাদির প্রতি নিগ্রহ করিয়া থাকেন? বৈদিক ঋষির মনে এ-সকল প্রশ্নেরও উদয় হয় নাই। আবার বিনা প্রয়োজনে কেহ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ঈশ্বর যাঁহাকে পূর্ণকাম বলা যায়, তাঁহার এমন কি প্রয়োজন হইয়াছিল, যে, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও বৈদিক ঋষি যত্ন করেন নাই।

কালক্রমে দার্শনিকের অভ্যুদয়। দার্শনিক বৈদিক ঋষি বা দ্রষ্টার স্থান অধিকার করিল। শঙ্করাচার্য্য একজন কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিক। সৃষ্টি আদি কি অনাদি, তাঁহার মনে এ প্রশ্নের উদয় হইল। তিনি দেখিলেন সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে, আকস্মিকত্ব দোষ অনিবার্য্য। বালক অথবা ক্ষিপ্তের ন্যায় আকস্মিক হুজুকের অধীন (Caprice) হইয়া, বিনা প্রয়োজনে ঈশ্বর সহসা কোন এক সময়ে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শঙ্কর এরূপ মত পোষণ করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে পরমেশ্বরের পূর্ণকামত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বরিক গুণের ব্যাঘাত হয়। সৃষ্টির আদি স্বীকার করিয়া ঈশ্বরেতে আকস্মিকত্ব দোষ আরোপ করিতে শঙ্কর অনিচ্ছুক। এজন্য তিনি বলিতেছেন "অনাদিত্বাৎ সংসারস্য" (ব্রহ্মসূত্র ২-১-৩৫)। শঙ্কর দেখিলেন দেব-তির্য্যক্-নরাদির মধ্যে সুখ-দুঃখের অত্যন্ত বৈষম্য। স্রষ্টা হইতে সৃষ্টি, তিল হইতে যেমন তৈল হয় (Nothing is evolved, but what is involved)। বালি হইতে তৈল হয় না, তিল হইতেই হয়, কারণ তিলে প্রচ্ছন্নভাবে (Implicit) তৈল আছে, বালিতে তৈল নাই। স্রষ্টার মধ্যেও কি তবে সেইরূপ বৈষম্যাদি দোষ প্রচ্ছন্নভাবে (Implicit) আছে? স্রষ্টার মধ্যে বৈষম্যাদির কলঙ্ক আরোপ করাও শঙ্করের মত দার্শনিকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমরা পূর্ব্বে

দেখিয়াছি (২৫-চ) শঙ্কর সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া, ঈশ্বরকে বৈষম্যাদি কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার মানসে, সেই সঙ্গে জীবের কর্ম্মকেও অনাদি স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর জীবাদির সুখ-দুঃখ-বৈষম্যের কারণ নয়। "নচেশ্বরো বৈষম্য-হেতুঃ।" তাঁহার মতে জীবাদির কর্ম্ম-বৈষম্যই তাহাদের সুখ-দুঃখ-বৈষম্যের কারণ। সৃষ্টির আদি স্বীকার করিলে, যেহেতু সৃষ্টি বলিলেই নানাত্ব এবং তারতম্য বুঝায়, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে স্রষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, কর্ম্মবৈষম্যও ছিল না, তবে প্রথম সৃষ্টিতে জীবের সুখ-দুঃখ-বৈষম্যের জন্য কে দায়ী? স্রষ্টা ভিন্ন যেহেতু অন্য কিছুই ছিল না, তখন স্রষ্টা ভিন্ন অন্য কেহ সেজন্য দায়ী হইতে পারে না। কিন্তু শঙ্কর স্রষ্টাকে দায়ী করিতে সম্মত নহেন। এজন্য তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আরও তিনটী পদার্থকে অনাদি কল্পনা করিতেছেন;—(১) সৃষ্টি অনাদি, (২) কর্ম্ম অনাদি, (৩) কর্ম্মকর্ত্তা জীব অনাদি। যাহা অনাদি তাহা অনন্ত। কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি হইলে, তাহা অনন্তও হইবে। কিন্তু শঙ্কর তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ তাহা হইলে মোক্ষকল্পনা অসিদ্ধ হয়। সে যাহা হউক শ্রুতিতে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির আদিরই উল্লেখ আছে। কোথাও এমন কথা নাই যে সৃষ্টি অথবা কর্ম্ম অথবা জীব অনাদি। বেদান্তের মতে সৃষ্টিক্রিয়া ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ। শঙ্কর নিজেও বলিতেছেন "আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি যেমন কোন বাহ্য প্রয়োজনকে লক্ষ্য না করিয়া স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হয়, পরমাত্মার পক্ষে সৃষ্টিও সেইরূপ।" "নহি স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে।" তিনি বলিতেছেন "নাপ্য প্রবৃত্তিঃ" সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের অপ্রবৃত্তি নাই। ২-১-৩৩। কাল-প্রবাহ সম্বন্ধে সৃষ্টি অনাদি এরূপ বলাতে কোন দোষ হয় না। বরং তাহাতে সৃষ্টিকার্য্যের আকস্মিকত্ব দোষ নিরাকৃত হয়। কালপ্রবাহ সম্বন্ধে সৃষ্টি অনাদি হয় হউক, কিন্তু ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে, বা ঈশ্বরকে সৃষ্টির আদি বলিতেই হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে জীবাদি ব্যক্তি, এবং জীবাদি সম্বন্ধে তাহাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মও সেই অর্থে আদিমান্ বলিতেই হইবে। কালপ্রবাহ সম্বন্ধে এ-সকলকে অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত বলিতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু যদি ঈশ্বর জীবের আদি না হন; যদি ঈশ্বর সম্বন্ধেও জীবাদি অনাদি হয়, তবে তাহাদিগকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলা যাইবে কিরূপে? অথবা জীবাদি যদি তাহাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মের আদি না হয়, অথবা জীবাদি সম্বন্ধে যদি তাহাদের ব্যক্তিগত কর্ম্ম অনাদি হয়, তবে সেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব বা কৃতকত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন "যৎকৃতকং তদনিত্যং" (শ্বেতাশ্বতরভাষ্যারম্ভ)। কর্ম্ম তবে অনাদি হইবে কিরূপে? অথবা কর্ম্ম অনাদি হইলে জীব তাহার কর্ত্তা, অথবা তাহার জন্য দণ্ডপুরস্কারের ভাগী হইবে কিরূপে? এই সমস্যা পূরণের জন্য পৌরাণিক সময়ে সৃষ্টিপ্রলয়ের এক অনাদ্যনন্ত পর্য্যায় কল্পিত হইয়াছিল, যদিও ঋগ্বেদে সৃষ্টিপ্রলয়ের এরূপ পর্য্যায়ের কোন প্রমাণ নাই। বরং ঋগ্বেদে বলা হইতেছে;—"সকৃদ্ দ্যৌর্ অজায়ত সকৃদ্ ভূমির্ অজায়ত। পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্ তদ্ অন্যো ন অনুজায়তে।" ৬-৪৮-২২। "দ্যুলোক একবার মাত্র উৎপন্ন, পৃথিবী একবার মাত্র উৎপন্ন, পৃশ্নি বা আকাশের দুগ্ধ একবার মাত্র দোহন করা হইয়াছে। তাহা ভিন্ন আর সেরূপ হয় নাই।" সৃষ্টি-প্রলয়ের অনাদ্যনন্ত পর্য্যায় কল্পনা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অগম্য, শ্রুতি-প্রমাণেরও বিরুদ্ধ। অতএব গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হইবারই কথা। তথাপি পৌরাণিক মতে, এবং সেই সঙ্গে শঙ্করেরও মতে "অতীত এবং অনাগত কল্প-সকলের পরিমাণ নাই।" ব্রহ্মসূত্র ২-১-৩৬। প্রতি কল্পের অবসানে, তাহাদের মতে, এক এক বার মহাপ্রলয় হয়। তখন দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি সমস্ত জীবজগৎ ঈশ্বরেতে, এবং ঈশ্বর স্বয়ং নির্গুণ বা নেতি নেতি স্বরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই প্রলয়কালেও জীবের পূর্ব্বকৃত অভুক্ত কর্ম্ম-সকল বীজরূপে ঈশ্বরেতে, এবং ঈশ্বরও বীজরূপে নেতি নেতি বা নির্গুণ ব্রহ্মেতে অবস্থান করেন। প্রলয়াবসানে নূতন কল্পের আরম্ভ হয়। কিন্তু কল্পারম্ভ কিরূপে সম্ভব?

পুরাণের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—"নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং"। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের পক্ষে কল্পারম্ভ করা কিরূপে সম্ভব? প্রশ্ন হইতেছে এই যে কল্পের পর কল্প বলা হইতেছে, তাহা কি কেহ আরম্ভ করে, অথবা তাহা আপনা হইতেই আরম্ভ হয়? যদি কেহ আরম্ভ করে স্বীকার করা যায়, তবে তিনিই ঈশ্বর।

মহাপ্রলয়েও তাঁহার প্রলয় হয় নাই, তিনি চিরকাল সক্রিয়। আর যদি বলা যায় কল্প-সকল আপনা হইতেই আরম্ভ হয়, তবে একপ্রকার নিরীশ্বরবাদই দাঁড়ায়। মহা-প্রলয়ে ঈশ্বরের লয়- বা নিদ্রা-প্রাপ্তি স্বীকার করিলে সেই লয়-প্রাপ্ত বা নিদ্রিত ঈশ্বরকে জাগাইবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে অথবা তাঁহার উপরে আর একজন নিত্যজাগ্রত পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়। মহাপ্রলয় স্বীকার করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্যও বাধ্য হইয়া বলিতেছেন: -"ব্রহ্মের দুইটি রূপ জানা যায়, (১) নাম-রূপ-বিকার-ভেদাত্মক উপাধি-বিশিষ্ট, এবং (২) তদ্বিপরীত সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত।" ব্রহ্মসূত্র ১-১-১১। মহাপ্রলয়ে, শঙ্করের মতে, সোপাধিক ব্রহ্মেরই লয় হয়, নিরুপাধিক ব্রহ্মের লয় হয় না। কিন্তু যিনি কল্পারম্ভ করিবেন তিনি সম্পূর্ণ নিরুপাধিক হইতে পারেন না, কারণ "ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াদি-শক্তিযুক্ত" না হইলে নিরেট নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইতে কল্পারম্ভ বা স্বষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং নচেদ এবং দেবো ন খলু কুশল স্পন্দিতুমপি" আনন্দলহরী ১॥ শিব অথবা ব্রহ্ম যখন শক্তিযুক্ত হয়েন তখনই তিনি প্রভুত্ব লাভে সক্ষম। তাহা না হইলে সেই দেব চলিতেও অক্ষম। সে যাহা হউক, তাহাদের মতে কল্পারম্ভে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সঙ্গে জীব, এবং জীবের সঙ্গে তাহার পূর্ব্বকল্পের কৃত অভুক্ত কর্ম্মবীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। এইরূপে স্বষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর স্বষ্টি, অথবা কর্ম্ম-বৈষম্য হইতে স্বষ্টিবৈষম্য, স্বষ্টিবৈষম্য হইতে কর্ম্মবৈষম্য, বীজাঙ্কুরের ন্যায় চক্রাকারে উভয়ে উভয়ের কার্য্যকারণরূপে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দিনের পর যেমন রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন, সেইরূপ স্বষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর স্বষ্টি। এইরূপে তাহাদের মতে ব্রহ্ম স্বয়ং এই স্বষ্টিবৈষম্যের জন্য কোনরূপ দোষের ভাগী হইতেছেন না। কর্ম্ম হইতে স্বষ্টি, স্বষ্টি হইতে কর্ম্ম এই পৌরাণিক মত চক্রকহেত্বাভাস দোষে দুষ্ট হইলেও (arguing in a circle) তাহাদের মতে ইহা অপরিহার্য্য। বস্তুত এই মতে স্বষ্টি, স্রষ্টা, ইত্যাদি শব্দের কোন সার্থকতা থাকে না। এমন কি জীবের উৎপত্তিমত্ত্ব শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন না। বৈষ্ণব মত খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন:—"উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্য অনিত্যত্বাদয়ো দোষঃ প্রসজ্যেরন্"—উৎপত্তিমত্ত্ব স্বীকার করিলে জীবের অনিত্যত্বাদি দোষ অপরিহার্য্য। কিন্তু অপর দিকে বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তও জীবেশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। জীব অথবা তাহার কর্ম্ম যদি মহাপ্রলয়েও ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রভাবে বীজরূপে অবস্থান করে বলা যায়, তবে যেমন ঈশ্বরকে জীবের স্রষ্টা বলা যায় না, সেইরূপ জীবকেও আপন স্বকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা বলিবার প্রকৃত কারণ থাকে না। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ যেমন স্বতঃই বিকাশলাভ করে, জীব এবং জীবের কর্ম্মও সেরূপ স্বতঃই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীব-বীজ এবং কর্ম্ম-বীজ হইতে বিকাশ লাভ করিবে। অপর দিকে যদি বীজ বলিবার উদ্দেশ্য এই হয় যে মহাপ্রলয়ে জীব অথবা জীবের কর্ম্ম ঈশ্বরের স্বষ্টিশক্তি বা মায়া রূপে অবস্থান করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের সেই স্বষ্টিশক্তি বা মায়াকেই জীবের সুখ দুঃখ বৈষম্যের জন্য দায়ী করিতে হয়। "গুণ গুণীর অভেদ"। "মায়ী মহেশ্বর" তাঁহার মায়াশক্তি হইতে অভিন্ন। অতএব সেই মায়ী মহেশ্বরকেই জীবের সুখ দুঃখ-বৈষম্যের জন্য দায়ী করিতে হয়। এইরূপে আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ পরিহারার্থ স্বষ্টি-প্রলয়ের অনাগ্যনন্ত পর্য্যায়ের কষ্ট-কল্পনা নিরর্থক। সেই সঙ্গে কর্ম্মের নিত্যত্ব কল্পনাও নিরর্থক।

তবে কর্ম্মের নিত্যত্ব কল্পনা শঙ্করের প্রতিপক্ষ পৌরোহিত্য-প্রধান পৌরাণিক কর্ম্মবাদীদিগের বিশেষ অনুকূল। "ফলপ্রদঃ কর্ম্ম" "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ" ইত্যাকার কর্ম্মের নিত্যত্ব অথবা প্রাধান্য কল্পনার উপরেই বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের এবং সেই সঙ্গে পৌরোহিত্যেরও গৌরব প্রতিষ্ঠিত। এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার পালক পিতা নন্দ ঘোষকে বলিতেছেন—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥ অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্য কর্ম্মণাং। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বং স্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং। অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাং॥ স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং॥ দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা। শত্রুমিত্র-মুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১০-২৪-১৩ হইতে ১৬।

"কর্ম্ম দ্বারা জীবের জন্ম, কর্ম্ম দ্বারা জীবের জয়, কর্ম্ম দ্বারাই জীব সুখ দুঃখ ভয় এবং কল্যাণ লাভ করে। যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন তিনিও জীবের কর্ম্মফলদাতা মাত্র, তিনিও কর্ম্মানুসারেই কর্ম্মকর্ত্তার সেবা করিয়া থাকেন। যাহার কর্ম্ম নাই তাহার সম্বন্ধে তিনি প্রভু নহেন। প্রাণীগণ যখন স্ব স্ব কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করে, যখন ইন্দ্রও লোকের স্বভাব-বিহিত গতির অন্যথা করিতে পারে না, তখন ইন্দ্র দ্বারা লোকে কি করিবে? লোক-সকল স্বভাবতন্ত্র, স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করে। দেবাসুর মানব সকলেই স্ব স্ব স্বভাবেতে অবস্থিত। কর্ম্মানুসারেই জীব উচ্চ অথবা নীচ দেহ লাভ করে এবং ত্যাগ করে। অতএব কর্ম্মই জীবের শত্রু মিত্র অথবা উদাসীন। কর্ম্মই লোকের গুরু এবং কর্ম্মই 'ঈশ্বর'।" ১০—২৪—১২ হইতে ১৬॥

শঙ্কর নিজে যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু যে সময়ে তাঁহার অভ্যুদয় সেই সময়ে যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই দেশময় প্রচলিত ছিল। দার্শনিক হইয়াও তিনি যেন তাঁহার সময়ের উপরে উঠিয়া নির্ম্মুক্ত ভাবে যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের নিত্যত্বে সন্দেহ করিতে সাহসী হন নাই। বস্তুতঃ শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। "অয়মেব হি সর্ব্বস্য সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেতি"— মাণ্ডুক্য-ভাষ্য ৬। আথর্ব্বনিক ব্রহ্মসূক্তে বলা হইতেছে:- "ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা-উত।" ইহার উল্লেখ করিয়া শঙ্কর ব্যাখ্যা করিতেছেন: দাশ যাহারা কৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ, দাস যাহারা প্রভুর নিকটে আত্মসমর্পন করে, আর যাহারা কিতব বা দ্যূতবৃত্তি তাহারা সকলেই ব্রহ্ম। হীন জন্তুর উদাহরণ দ্বারা নামরূপ কৃত-কার্য্য-করণ-সঙ্ঘাত-প্রবিষ্ট সকল জীবেরই ব্রহ্মত্ব বলা হইতেছে। ব্রহ্মসূত্র ২-৩-৪৩॥ শঙ্করের মতে সকলেরই মধ্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জ্ঞাতারূপে প্রকাশমান। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সেই ব্রহ্মেরই স্বভাব। শঙ্করের মতে যখন পরমাত্মাই একমাত্র জ্ঞাতা, তখন সেই একই পরমাত্মার মধ্যে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের দোষারোপের কোনও স্থানই থাকে না।

একজন আর একজনের প্রতি পক্ষপাতী হয়, একজন আর একজনের প্রতি নিষ্ঠুর হয়, কিন্তু নিজের প্রতি নিজে পক্ষপাতী বা নিষ্ঠুর হওয়া কথাই বিরুদ্ধ। শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত মতে ঈশ্বর স্বয়ংই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবলে অবিদ্যার বা আপেক্ষিক বা অনিত্য সম্বন্ধী জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, সুখ দুঃখ বৈষম্য ভোগ করিতেছেন। অবিদ্যা ঈশ্বরেরই মায়া-শক্তির প্রকাশ মাত্র। বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ের যোগেই ব্রহ্মের পূর্ণত্ব। যীশুর একটী উক্তিও শঙ্করের সিদ্ধান্তের বিশেষ অনুকূল। যীশু বলিতেছেন যে বিচারের দিনে বিচারপতি ধার্ম্মিকদিগকে বলিবেন "আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, তোমরা আমায় আহার দিয়াছিলে; আমি পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলাম, তোমরা আমায় পানীয় দিয়াছিলে; আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমায় বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলে" ইত্যাদি (Math. xxv, 35)। ইহা দ্বারা মনে হয় যে যীশুর মতেও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ংই জীব অথবা জ্ঞাতারূপে জগতের সমস্ত দুঃখ-পাপের রস আস্বাদন করিতেছেন। এরূপ মত যে যুগপৎ স্থিতি-গতির ন্যায় বিরোধদোষে দুষ্ট নয় স্থানান্তরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। শঙ্করের ন্যায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর পক্ষে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের আপত্তি নিতান্তই ভিত্তিশূন্য হইতেছে। বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের আপত্তি বিদূরিত হইলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জীবের, এবং জীবের সম্বন্ধে তাহার কৃত কর্ম্মের অনাদিত্ব কল্পনার কোন প্রয়োজন থাকে না। সেই সঙ্গে সৃষ্টি-প্রলয়ের অনাদ্যনন্ত পর্য্যায়ের পৌরাণিক কল্পনারূপ বালির অট্টালিকাও ধরাশায়ী হইয়া পড়ে।

সৃষ্টি-প্রলয়ের উক্তরূপ অনাদ্যনন্ত পর্য্যায় কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরকে স্রষ্টাপদচ্যুত করিয়া, তাহার স্থলে কর্ম্মকে অভিষিক্ত করার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্য্য যদিও ঈশ্বরের সহিত জীবের উপকার্য্য-উপকারক সম্বন্ধ স্বীকার করেন,—তথাপি তিনি ঈশ্বরের সহিত জীবের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে যেন কুণ্ঠিত। শঙ্কর বলিতেছেন:— "জীবেশ্বরের উপকার্য্য-উপকারক ভাব উক্ত হইতেছে। সংসারে পরস্পর সম্বদ্ধ বস্তুদ্বয়ের মধ্যেই তাহা দৃষ্ট হয়— যেমন স্বামী এবং ভৃত্য, অথবা অগ্নি এবং তাহার স্ফুলিঙ্গ। জীবেশ্বরের উপকার্য্য-উপকারক ভাব স্বীকার করাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, তাহাদের সম্বন্ধ কি স্বামী-ভৃত্যের ন্যায়, অথবা অগ্নি এবং বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়? অগ্নি সম্বন্ধে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে অংশ। জীব ঈশ্বরের অংশই হওয়া উচিত। অংশ বলার

উদ্দেশ্য অংশ-তুল্য, কারণ মুখ্য অর্থে নিরবয়বের অংশ হয় না। ব্রহ্মসূত্র ২-৩-৪৩॥ অংশাংশী সম্বন্ধের সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের বিরোধ নাই, তথাপি আমরা দেখিতে পাই শঙ্করের মতে জীবেশ্বরের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের ভাব যেন স্থান লাভ করে নাই। ইহার ফলে শঙ্করের মধ্যে না হউক তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট সংসারের প্রতি জীবের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য পালনের ভাব (The Royal Law of Duty) বিশেষভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। ইহার চিহ্ন আমাদের দেশীয় লোকের সাধারণ চরিত্রের মধ্যেও যে লক্ষিত না হয় এমন নয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টীয় সাধুদিগের তুলনায় আমাদের সাধু সন্ন্যাসীগণ যে জীবের সেবা করা অপেক্ষা সেবা গ্রহণেই অধিকতর আগ্রহযুক্ত তাহা হয়ত অনেকেই অস্বীকার করিবে না।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের মতের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হেগেল বলেন "বিশুদ্ধ সত্ব এবং শূন্য এক"। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে গ্রাহক-চৈতন্য (Subject) শূন্যের ধারণারও নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। হেগেল যাহাকে বিশুদ্ধসত্ব (Pure Being) বলিতেছেন, শঙ্কর এবং বেদান্ত তাহাকেই 'নির্ব্বিশেষ' চৈতন্য বলিতেছেন। হেগেল যাহাকে শূন্য (Nothing) বলিতেছেন, বেদান্ত এবং শঙ্করের মতে তাহাই "নেতি, নেতি" স্বরূপ, বা ইহা নয়, উহা নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায় তাহাই নয়। কিন্তু গ্রাহক-চৈতন্য স্বরূপ নির্ব্বিশেষ আত্মা ভাবপদার্থ সম্বন্ধে যেরূপ, অভাবপদার্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। সেই নির্ব্বিশেষ আত্মাতেই হেগেল-কথিত বিশুদ্ধসত্ব, এবং শূন্যের একত্ব (Pure Being and Nothing are identical)। মাণ্ডূক্য উপনিষদে বলা হইতেছে, সেই নির্ব্বিশেষ আত্মা "একাত্ম প্রত্যয়সার।" শঙ্কর তাহার অর্থ করিতেছেন:— "জাগ্রদাদি অবস্থাভেদ সত্ত্বেও আত্মা এক। এই অব্যভিচারী প্রত্যয় দ্বারা আত্মার অনুসরণ করা যায়। অথবা তুরীয় আত্মা সম্বন্ধী জ্ঞানবিষয়ে আত্ম-প্রত্যয়ই একমাত্র প্রমাণ।" ৭॥ গ্রাহ্য আত্মার যোগেই সেই নির্ব্বিশেষ গ্রাহক আত্মার বিশেষত্ব, অথবা ব্যক্তিত্ব, অথবা জন্ম। গ্রাহ্য অনাত্মার দ্বারাই নির্ব্বিশেষ গ্রাহক আত্মা আপনার "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার" পরিচয় লাভ করে এবং প্রদান করে। অনাত্মার যোগেই আত্মার পূর্ণত্ব, এবং আত্মা অনাত্মা এক। স্পিনোজা বলিতেছেন "আত্মা এবং অনাত্মার ভেদ আত্মার স্বকৃত; অতএব ক্ষণিক।"* জীবের সৃষ্টি বা উৎপত্তি না বলিয়া দেহাদি অনাত্মাতে আত্মার অনুপ্রবেশ বলাই শঙ্করের অভিপ্রায়—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশয়ৎ।" ইহাতে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যের কোন স্থান নাই, কারণ আত্মা এক।

এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মতে ধর্ম্ম এবং নীতি কিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে শ্রৌত প্রমাণ এবং বিচার দ্বারা শঙ্কর তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে:— "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুময়ঃ" ইত্যাদি। ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"এই যে সংসারী আত্মা (জীব) তাহাও পরব্রহ্মই,—বিজ্ঞানময় বা বুদ্ধিময়,—যেহেতু বুদ্ধিত্ব ধর্ম্ম সেই আত্মাতে আরোপিত হয়। আবার বুদ্ধির সহিত মনের সন্নিকর্ষ হেতু আত্মা মনোময়। প্রাণ বা দৈহিক চৈতন্য দ্বারা সেই আত্মা দৈহিক চৈতন্য-যুক্ত, অতএব আত্মা প্রাণময়। রূপ দর্শনকালে আত্মা চক্ষুময়, শব্দ শ্রবণকালে আত্মা শ্রোত্রময়। যখন যে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার উৎপন্ন হয়, আত্মা তখনই সেই ইন্দ্রিয়ময় হয়। তাহার ফলে আত্মা শরীরারম্ভক পৃথিব্যাদি-ভূতময় হয়। এইরূপে বিপরীত-প্রত্যয় যুক্ত হইলে পর আত্মাতে বাসনার উদ্রেক হয়, এবং বাসনার উদ্রেক হইলে আত্মা কামময় হয়। সেই কামে দোষ দর্শন করিয়া বাসনা প্রশমিত হইলে, এবং চিত্ত প্রসন্ন, কলুষরহিত, এবং শান্ত হইলে আত্মা অকামময় হয়। কামের পথে কেহ বিঘ্ন জন্মাইলে সেই কাম ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া, আত্মা ক্রোধময় হয়। ক্রোধের নিবৃত্তি হইলে আত্মা অক্রোধময় হয়। এইরূপে কাম-ক্রোধ দ্বারা অথবা অকাম-অক্রোধ দ্বারা তন্ময় হইলে আত্মা অধর্ম্মময় অথবা ধর্ম্মময় হয়। কামক্রোধাদি বিনা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।

* The opposition between Self and Not-self is self-made, and being self-made is transient.

ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারাই আত্মা সর্ব্বময় হয়। যাহা কিছু ব্যাকৃত সে-সমস্তই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মা তন্ময় হয়। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, যাহার যেরূপ কার্য্য সেইরূপই তাহার গতি। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। তন্ময়ত্বের অর্থ অত্যন্ত তৎপরতা। কাম ক্রোধাদির দ্বারা পুণ্যাপুণ্যকারিত্বই আত্মার সর্ব্বময়ত্বের হেতু, এবং সংসারগতির, এবং দেহ হইতে দেহান্তর সঞ্চারের কারণ। পুণ্যাপুণ্য দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহান্তর গ্রহণ করে, অতএব পুণ্যাপুণ্যই সংসারগতির কারণ। পুণ্যাপুণ্যই বিধি-প্রতিষেধের বিষয়। তাহাতেই শাস্ত্রেরও সফলতা।" (পৃ ৮৫১, জীবানন্দ)। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ঋগ্বেদে পুনর্জ্জন্মবাদের কোন উল্লেখ নাই। বরং জীবাত্মার অমরত্বেরই উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ প্রভৃতি সূক্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য। "মর্ত্ত্য শরীরের সহিত একত্র বা একমূল হইতে উৎপন্ন, মৃতব্যক্তির অমর্ত্ত্য বা অমর জীবাত্মা সুধা ভক্ষণ করতঃ (পিতৃগণের সহিত) বিচরণ করে।" ১-১৬৪-৩০। "জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভির্ অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা স যোনিঃ।" আবার সোমপান দ্বারা অমরত্ব লাভের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। "অপাম সোমং অমৃতা অভূম।" আমরা সোম পান করিব, আর অমর হইব। ৮-৪৮-৩। সৃষ্টি-প্রলয়-পর্য্যায়ের মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য শঙ্কর এই অমরত্বকে আপেক্ষিক অমরত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যদি শুদ্ধাদ্বৈতমতে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের প্রশ্নের স্থান না থাকে, এবং সেই সঙ্গে যদি পৌরাণিক কল্পিত সৃষ্টি-প্রলয়ের অনাদ্যনন্ত পর্য্যায়ের কল্পনারও স্থান না থাকে, তবে শঙ্করাচার্য্য এই উভয় মত সমর্থন করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্রই বলা যায় যে, তাঁহার সময়ে এই-সকল মতে লোকের বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তিনি তাহার বিরুদ্ধচিন্তা মনে স্থান দিতেও সাহসী হন নাই। শঙ্কর যে কাম্য-কর্ম্মের বিরোধী ইহাতে কোন সংশয় নাই। তথাপি যেন অভিমন্যুর ন্যায় তিনি সৃষ্টি-প্রলয়-পর্য্যায়ের ব্যূহে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মবাদী সপ্তরথীর হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন নাই। জৈমিনি বেদবাক্যের সংজ্ঞা করিতেছেন 'প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের অগোচর বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্যই বেদ-বাক্য' ("প্রমানান্তরা গোচরার্থ-প্রতিপাদকং হি বাক্যং বেদবাক্যং"), এবং বলিতেছেন যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বেদ-বাক্যকে অগ্রাহ্য করা আর "মম মাতা বন্ধ্যা" বলা এক কথা। জৈমিনির মত যে বেদ অপৌরুষেয়, অতএব ধর্ম্ম বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ "বেদস্য অপৌরুষত্বয়া স্বতঃসিদ্ধং ধর্ম্মে প্রামাণ্যং" (স-দ-সং)। শ্রুতির স্বতঃ-প্রামাণ্যে শঙ্করেরও বিশ্বাস ছিল। তিনি যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের বিরোধী হইলেও জৈমিনির ন্যায় তাঁহারও মতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র শ্রুতিগম্য। "তস্মাচ্ছব্দ-মূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ।" ২-১-২৭॥ "অতএব অতীন্দ্রিয় বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান শব্দ অর্থাৎ বেদ-মূলক।" তাঁহার মতে ব্রহ্মতত্ত্ব এবং কর্ম্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব উভয়ই একমাত্র আগমগম্য। "রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ, নানুমানাদীনামাগম, মাত্র সমধিগম্য এবত্বয়মর্থো ধর্ম্মবৎ" ২-১-৬॥ "রূপাদির অভাব হেতু প্রত্যক্ষের অগোচর, অনুমাপক লিঙ্গাদির অভাব হেতু অনুমানাদির অগোচর, অতএব ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মও একমাত্র আগমগম্য।" আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে একমাত্র নৈয়ায়িকগণই শ্রুতির স্বতঃ-প্রামাণ্যে কথঞ্চিৎ সংশয় করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। গৌতম সূত্র করিতেছেন "তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ" বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহা অসত্য, বিরুদ্ধ, এবং পুনরুক্তদোষে দুষ্ট। তিনি বলিতেছেন, বেদের প্রামাণ্য, মন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায়—"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যং" অর্থাৎ বক্তার যথার্থজ্ঞান মূলকত্বাদি-জনিত "বক্তৃ-যথার্থ-জ্ঞানমূলকত্বাদিনা।" ন্যায়মতে আগমের উৎপত্তি ঈশ্বরের অধীন। মীমাংসকদিগের মতে বেদ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। কণাদ অনেক বিষয়ে গৌতমের সহিত একমত, বৈশেষিক সূত্রের শেষে তিনি বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিতেছেন: "ঈশ্বরের বাক্য এ জন্য বেদের প্রামাণ্য"—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি।" এমন কি কপিল, "ঈশ্বর

বিষ্ণু।
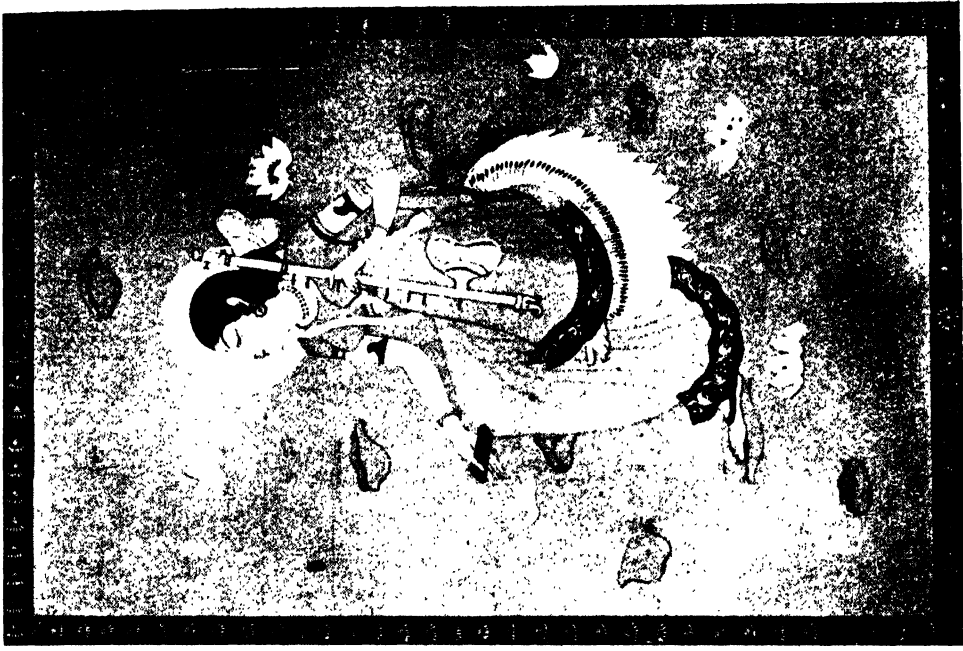
তামার হল-করা পিতলের পুরাতন নেপালী মূর্ত্তির ছবি।

সরস্বতী।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।
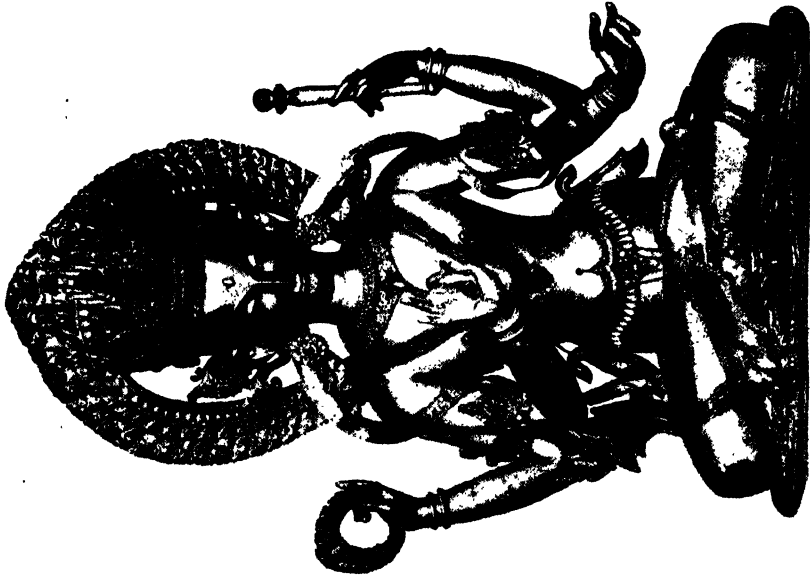
অসিদ্ধ" বলিতেও যিনি কুণ্ঠিত হন নাই তিনিও, সাংখ্যসূত্রে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিতেছেন (সাংখ্যসূত্র, ৫-৫১)। অনেকে মনে করেন সাংখ্যমত একপ্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত। বুদ্ধদেব বেদের অপ্রামাণ্য জনসমাজে প্রচার করাতে বৌদ্ধগণ বেদবাহ্য পাষণ্ড মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এমন কি শঙ্কর নিজেই সুগত (বুদ্ধ) সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ—"বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, এবং শূন্যবাদ সুগত (বুদ্ধ) এই তিন প্রকার বিরুদ্ধ মতের উপদেশ করিয়া আপনার অসম্বদ্ধ প্রলাপিত্বই প্রমাণ করিতেছেন। অথবা এই বিরুদ্ধ প্রলাপ দ্বারা তিনি প্রাণীগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন মাত্র, যেন প্রাণীগণ মোহগ্রস্ত হয়।" ব্রহ্মসূত্র ২-২-৩০॥ অনেকে সংশয় করেন যে বুদ্ধের ন্যায় বৈদিক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাষণ্ড মধ্যে পরিগণিত হইবার ভয়ে সাংখ্যগণ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। চার্ব্বাক যদিও বলিয়াছেন যে "বেদকর্ত্তাগণ ভণ্ড, ধূর্ত্ত অথবা নিশাচর, "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচরাঃ"—তাঁহার উক্তিকে উন্মত্তের প্রলাপ মনে করিয়া যেন তাহা সকলেই তুচ্ছ করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে শ্রুতিসকল যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া" এবং "ক্রিয়াবিশেষবহুলা"। জৈমিনি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিতেছেন "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদ্ অর্থানাং" যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানই বেদের উদ্দেশ্য, যে-সকল বেদবাক্য ক্রিয়াকে লক্ষ্য করে না, সে-সকল নিরর্থক। বেদের অপৌরুষেয়ত্বে এবং অভ্রান্তত্বে বিশ্বাসই শঙ্করের এই অবৈদিক সৃষ্টি-প্রলয়ের পর্য্যায় সমর্থনের মূল কারণ। বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের এবং সেই সঙ্গে বেদেরও গৌরব এই মতেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদকে অভ্রান্ত স্বীকার করিয়া শঙ্কর যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলিতে পারেন না, কারণ যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের গৌরবের সহিত বেদের গৌরব এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাতে শঙ্কর বলিতেছেন "জ্ঞান-রহিত যজ্ঞরূপ কর্ম্ম অসার, দুঃখমূলক, বিনাশশীল, এবং অস্থির।" শঙ্করের সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইহার অধিক বলা, অথবা যজ্ঞাদি বৈদিক কাম্যকর্ম্মের কুহক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হওয়া আমরা শঙ্করের নিকটে আশা করিতে পারি না। বেদেরও যে প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, জৈমিনির ন্যায় শঙ্করও তাহা স্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি শঙ্করেরও মত যে বেদ নিত্য এবং জগৎ বৈদিক শব্দ* হইতে উৎপন্ন। শঙ্কর বলিতেছেন "অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্দেবাদিকঞ্জগৎ প্রভবতি (ব্র-সূ ১-৩-২৮)। শঙ্কর তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেনঃ—"গবাদি শব্দ এবং তাহার অর্থের পরস্পর সম্বন্ধের নিত্যত্ব দৃষ্ট হয়; যদিও গবাদি ব্যক্তি-বিশেষ (Individuals) উৎপত্তিমান, তাহা বলিয়া গবাদি আকৃতি বা জাতি (genera) উৎপত্তি-মান নয়। দ্রব্য, গুণ, এবং কর্ম্মের ব্যক্তি বা প্রকাশ-বিশেষেরই (Individuals) উৎপত্তি হয়, আকৃতি বা জাতির (Genus) উৎপত্তি হয় না। সেই আকৃতির বা জাতির সহিতই শব্দাদির সম্বন্ধ, ব্যক্তি-বিশেষের সহিত নয়। কারণ ব্যক্তির অনন্তত্ব হেতু তাহার সহিত শব্দের সম্বন্ধ অসম্ভব। ব্যক্তি-সকলের উৎপত্তি হইলেও আকৃতি বা জাতি নিত্য। জগতের শব্দপ্রভবত্ব ব্রহ্মপ্রভবত্বের ন্যায় উপাদান কারণত্ব অর্থে উক্ত হয় না। তবে কিরূপ? শব্দ নিত্য, এবং অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধও নিত্য। সেই স্থিতিবাচক শব্দের দ্বারা শব্দ ব্যবহারের যোগ্য বস্তুর প্রকাশ সাধিত হওয়াতেই জগতের শব্দপ্রভবত্ব। জগতের শব্দপ্রভবত্ব কিরূপে জানা যায়? প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা। প্রত্যক্ষ বলিতে শ্রুতি, কারণ শ্রুতির প্রামাণ্য অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। অনুমান বলিতে স্মৃতি, কারণ স্মৃতির প্রামাণ্য অন্য প্রমাণ সাপেক্ষ। শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ে দেখাইতেছে যে সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বা। 'ইহারা' এই বলিয়া প্রজাপতি দেবগণকে, 'শরীরে রমণকারী' (অসৃগ্রং) এই বলিয়া মনুষ্যদিগকে, 'চন্দ্র' এই বলিয়া পিতৃগণকে, 'পবিত্র সোমস্থানের অতীত' এই বলিয়া গ্রহগণকে, এবং 'সৌভাগ্যযুক্ত' এই বলিয়া অপর সকল প্রজাকে সৃষ্টি কারলেন (ছন্দোগব্রাহ্মণ)। কোন ব্যক্তি

* "They had called attention to the mysterious double nature of language as an incarnation of reason in sense and materiality." (Wallan's Kant, p. 50.)

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গেলে, লোকে তাহার বাচক শব্দ পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ইহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ। প্রজাপতিও সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দ-সকল (Creative types in thought) স্মরণ করিয়া তাহারই অনুরূপ বস্তু-সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি "ভূ" এই বলিয়া ভূমির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (Compare "The word was made flesh" John I. 14)। 'যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদ্যাত্মক জগৎ বেদ শব্দ হইতে উৎপন্ন, অতএব বেদ শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়" "বেদ শব্দ নিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যং" (১-৩ ২৮, ২৯)। বাইবেলের মতেও সৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা। "আলো হউক" ঈশ্বর এইরূপ বলিলে পর, আলো উৎপন্ন হইয়াছিল, ইত্যাদি। (God said, Let there be light and there was light.—Gen. I. 3)। আমরা দেখিতে পাই বেদের উপরে যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। "কর্ম্ম ব্রহ্মসমুদ্ভবং।" যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপরে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পৌরোহিত্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত। সেই ব্যবসায়ের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হয়। তদনুসারে ভাগবতাদি পুরাণে কর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ঈশ্বরের স্থানে যেন কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলা হইতেছে:-"কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ" "কর্ম্মই গুরু এবং ঈশ্বর।" ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা যেন কর্ম্মকে অর্জ্জুন করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের সহচর শিখণ্ডীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। আবার বেদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেই যজ্ঞাদি কর্ম্মেরও ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এজন্য মীমাংসকগণ শ্রুতির নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব, এবং স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। মীমাংসকগণ বেদের সংজ্ঞা করিলেন:— "প্রমাণান্তরাগোচরার্থপ্রতিপাদকবাক্য" এবং এই সংজ্ঞাকেই যেন প্রমাণরূপে গণ্য করিয়া বেদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদি প্রমাণান্তরকে অধিকারচ্যুত করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা প্রমাণ নয়। আকাশকুসুমেরও সংজ্ঞা করা যায়, কিন্তু তাহা দ্বারা আকাশকুসুমের সত্তা প্রমাণ হয় না। ইহা দেখিয়া মীমাংসকগণ শব্দের (words) এবং শব্দার্থের (concepts) সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপরে বেদের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে কোষকৃমির কোষের ন্যায় এক-প্রকার নিত্য বা বৈদিকশব্দ (Logoi) কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে সেই কোষের ভিতরে আবদ্ধ করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা জনসাধারণকে বেদপাঠের অধিকারচ্যুত করিয়া আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ সুবিধা করিলেন। বেদও ক্রমে দেশে লোপ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু মীমাংসকগণ দেখিলেন যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় শিখণ্ডীবৎ করিলে তাঁহাকে হয়ত কেহ স্বীকার করিবে না, এবং যজ্ঞাদির বালির অট্টালিকা আমূল ধূলিসাৎ হইবে, এজন্য তাঁহারা সৃষ্টিপ্রলয়ের এই অনাদ্যনন্ত পর্য্যায় কল্পনা করিয়া ঈশ্বরকে নিতান্ত শিখণ্ডীর অবস্থা হইতে রক্ষা করিলেন।

সে যাহা হউক শঙ্কর নিজে জ্ঞানমার্গের পথিক। তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁহার মতে জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ-সিদ্ধি। যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের ফলদায়কত্ব স্বীকার করা না করা উভয়ই তাঁহার পক্ষে তুল্য। তথাপি তিনি দেখিলেন যে শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের ফলভূত স্বর্গাদি লাভের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। তিনিও পরম্পরাগত শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্য এবং নিত্যত্ব স্বীকার করিলেন। এরূপ অবস্থায় যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের ফলদায়কত্ব শঙ্কর সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই; তবে তাঁহার মতে কর্ম্মচিত স্বর্গাদি অনিত্য, এবং অকিঞ্চিৎকর। কর্ম্মপ্রধান শ্রুতির নিত্যত্ব এবং স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করিয়াই যেন শঙ্কর তাহার প্রতিপক্ষভূত কর্ম্মীদিগের সহিত একমত হইয়া কর্ম্মেরও নিত্যত্ব এবং সৃষ্টিবীজত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই সঙ্গেই তিনি কর্ম্মবাদীদিগের সহিত মিলিত হইয়া পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রলয়ের অনাদ্যনন্ত পর্য্যায়ের মতও সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

পুত্রকন্যা জন্মের কারণ ও অনুপাত *

একটী দম্পতির কয়টী পুত্র ও কয়টী কন্যা হইবে তাহা অনেকটা তাহাদের বংশক্রমের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় একটি কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের সেন্সস-বিবরণ পাঠ করিলে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা যায় এই, যে, হিন্দুগণের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যার অপেক্ষা অধিক। ইংলণ্ড প্রভৃতি অপরাপর দেশে এবং এমনকি এদেশেরও মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যার অপেক্ষা কম। ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য সেন্সসের অধ্যক্ষগণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সন্তোষজনক কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এসম্বন্ধে কিছুকাল চিন্তা করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এই :—

সেন্সসের কর্ত্তাগণের মধ্যে অনেকে বলিতেছেন যে হিন্দু-সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়ায়, তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই, কেবল কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে বাল্যবিবাহের জন্য ও অবরোধপ্রথার জন্য হিন্দুরমণীগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং তাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু একটা কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আমাদের পুরুষদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও জীবিকার্জ্জনের জন্য যেরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে অনেকেরই আয়ু কমিয়া যায়, স্ত্রীলোকদিগকে সে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। আর, এক সহর ভিন্ন পল্লীগ্রামে অবরোধপ্রথার জন্য মুক্ত বায়ু সেবনের বিশেষ বাধা হয় না। আর, সহরেই বা কয়জন পুরুষ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পান ?

তাঁহারা বলিতেছেন আমরা বিধবাদিগকে কষ্ট দিই এই জন্য অনেক বিধবা অল্প বয়সে মারা যান। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে ব্রহ্মচর্য্যের গুণে বিধবাগণ প্রায়ই সুস্থকায়া ও চিরজীবিনী হইয়া থাকেন। এই-সকল বিদেশীয় সেন্সসকর্ত্তাগণ আমাদের বিরুদ্ধে আরও সাংঘাতিক একটা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। আমরা নাকি ইচ্ছা করিয়া নবজাত কন্যা সন্তানের প্রতি এতদূর তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করি যে তাহাতে কন্যাসন্তান অধিক সংখ্যায় মারা যায়। এসম্বন্ধে কিছু পরে আলোচনা করিতেছি।

যাহা হউক এইরূপ কতকগুলি অনুমান হইতে কোনও সত্যনির্ণয়ের আশা নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সেন্সস-রিপোর্ট খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে দেখিলাম, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বরোদার সেন্সস-রিপোর্টে এসম্বন্ধে বেশ সুন্দরভাবে আলোচনা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেশাই নামক যে হিন্দু কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে এই রিপোর্ট লিখিত হইয়াছে, তিনি সাহেবদের দ্বারা উল্লিখিত কারণগুলি সন্তোষজনক নহে দেখাইয়া নূতন একটা কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বরোদার হিন্দুগণের মধ্যে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তান কিরূপ অনুপাতে জন্মায় এবং ৫ বৎসর বয়সে তাহাদের অনুপাত কত দাঁড়ায় তাহা দেখাইয়াছেন। এক বৎসরের অনধিক বয়সের সন্তানগণের সেন্সস লইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১০০০ ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা হিন্দুদিগের মধ্যে ৯৭৮, মুসলমান দিগের মধ্যে ৯৮০, জৈ অসভ্যজাতিগণের মধ্যে (Animists) ৯৯৯। বরোদায় যেরূপ, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও সেইরূপ মেয়ের অপেক্ষা ছেলে অধিক সংখ্যায় জন্মায়। পাঁচ বৎসর বয়সে, মুসলমান, জৈন, পার্শী ও অসভ্য জাতিগণের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ছেলের অপেক্ষা বেশি হইয়া যায়, কিন্তু হিন্দুগণের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ছেলের অপেক্ষা কিছু কম থাকিয়া যায়*। অর্থাৎ যদিও সকল সমাজেই মেয়ের অপেক্ষা ছেলে অধিক জন্মায় তথাপি হিন্দু ভিন্ন অন্য সমাজে মেয়ের তুলনায় ছেলে এত বেশি মরে যে শেষটা মেয়ের সংখ্যাই বেশি হইয়া যায়। হিন্দু সমাজেও মেয়ের তুলনায় ছেলে বেশি সংখ্যায় মরে, তবে এত বেশি মরে না যে তাহাদের সংখ্যা মেয়ের সংখ্যার অপেক্ষা কম হইয়া যাইবে।

এখন শ্রীযুক্ত দেশাই ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে (চট্টগ্রামে) পঠিত।

* Baroda Census Report, 1911, Pp. 134-135.

চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবদের মতে হিন্দু পিতামাতা কন্যা-সন্তানকে অত্যন্ত অনাদর করাতেই কন্যাসন্তান অপরাপর সমাজের অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় মারা যায়। কিন্তু দেশাই বলিতেছেন "অবশ্য কন্যার প্রতি অনাদর কিছু পরিমাণে কন্যার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বটে; কিন্তু সম্প্রতি এ সম্বন্ধে লোকের মনোভাব অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং অধিকাংশ জাতের (caste) মধ্যেই পুত্র ও কন্যা সমান আদর যত্ন পাইয়া থাকে। কন্যার জীবনের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব আজকাল একটা গুরুতর কারণ বলিয়া বোধ হয় না; আর, বাস্তবিক পক্ষে, সেন্সস হইতে দেখা যাইতেছে যে যদিও ছেলের প্রতি বেশি যত্ন করা হয় তথাপি প্রথম কয় বৎসর বয়সে মেয়ের অপেক্ষা ছেলেই বেশি বেশি মরে।"*

এই সম্পর্কে আমি বলি যে সকলেই জানেন ইংলণ্ডে মেয়ের অপেক্ষা ছেলে বেশি জন্মায় অথচ ছেলে এত বেশি মরে যে কয় বৎসর পরেই ছেলের অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা বেশি হইয়া যায়। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে ইংরাজ পিতামাতা মেয়ের চেয়ে ছেলের উপর কম যত্ন করেন বলিয়াই ছেলে বেশি মরে? আসল কথা হইতেছে, ছেলে ও মেয়ের জীবনশক্তি বা বাঁচিবার শক্তি (vitality) ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য সমাজে ছেলের জীবনশক্তি মেয়ের জীবনশক্তি অপেক্ষা অনেক কম; হিন্দুসমাজেও ছেলের জীবনশক্তি মেয়ের জীবনশক্তি অপেক্ষা কম, তবে অন্যান্য সমাজের মত এত কম নয়।

হিন্দুসমাজে ছেলের জীবনশক্তি অন্য সমাজের অপেক্ষা বেশি হইবার কারণ কি? পণ্ডিতবর ওয়েষ্টারমার্ক তাঁহার সুবিখ্যাত "মানব-বিবাহের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে পুত্র বা কন্যা জন্মিবার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি কারণের আলোচনা করিয়াও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি এই একটা কারণের উল্লেখ করিয়াছেন যে পিতামাতার মধ্যে যদি পিতার বয়স মাতার অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশি হইবে এবং যদি মাতার বয়স পিতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মেয়ের সংখ্যা বেশি হইবে।* আমরা এস্থলে ধরিয়া লইতে পারি যে, যে কারণে ছেলে অধিক সংখ্যায় জন্মায় সেই কারণেই ছেলের জীবনশক্তিও অধিক হয়। ওয়েষ্টারমার্ক বলিতেছেন যে ইউরোপীয় গবেষণাকারীগণ এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই।† কেন পারেন নাই তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আর একটী গুরুতর কারণ, বংশক্রমের প্রভাব, এ বিষয়ের অনুসন্ধান বড়ই দুষ্কর করিয়া দিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অপরিজ্ঞাত এই হিন্দু সমাজের সংবাদ জানিতে পারিলে তথ্যনির্ণয়ের কিছু সুবিধা হইতে পারে এই আশাই আমাকে বর্তমান গবেষণাকার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে।

অন্যান্য সমাজে দেখা যায় কোনও কোনও স্থলে পিতার বয়স বেশি, আবার কোনও কোনও স্থলে মাতার বয়স বেশি, কিন্তু হিন্দু সমাজে সকল স্থলেই পিতার বয়স মাতার বয়সের অপেক্ষা অধিক। সম্ভবতঃ এই কারণেই হিন্দুদের মধ্যে পুত্রের সংখ্যা অধিক অর্থাৎ পুত্রের জীবনশক্তি অধিক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

---

* Baroda Census Report, 1911, p. 137

* Ever since Aristotle's days inquirers have sought to discover the causes which determine the sex of the offspring; but no conclusion commanding general assent has yet been arrived at. The law of Hofacker and Sadlu, according to which more boys are born if the husband is older than the wife, more girls if the wife is older than the husband, has attracted the greatest number of adherents. But Noirot and Breslan have lately come to the opposite result and, from the data of Norwegian statistics, Berner has shown that the law is untenable.--Westermarck's History of Human Marriage (2nd Edn.) p. 469.

† In the English Census Report for 1881, the view was repeated "that there are some reasons for believing that one at any rate of the causes that determine the sex of an infant, is the relative ages of the father and mother, the offspring having a tendency to be of the same sex as its elder parent.—Bengal Census Report, 1901, p. 240.

কবি দান্তে।

জিওত্তো কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

যুদ্ধে জাতীয় অধঃপতন

পণ্ডিতেরা এতকাল যুদ্ধের বিরুদ্ধে কেবল নীতির দোহাই এবং রাজনীতির নজীর দেখাইয়া যুদ্ধপিপাসু জাতিদিগকে এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে শারীর-বৈজ্ঞানিক কারণে যুদ্ধ যে জাতীয় অধঃপতন আনয়ন করে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; উদার ধর্ম্মবোধ বলিতেছে যুদ্ধ নৃশংস; অর্থনীতি বলিতেছে যুদ্ধ ব্যবসায়ের কণ্টক স্বরূপ;—কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও সাংঘাতিক কারণ রহিয়াছে যে জন্য মানবের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি এবং এখনো শুনিয়া থাকি যে অনেক জাতি কালে কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। আমরা দেখিতেছি যে অনেক জাতি তেজে, বীর্য্যে, শারীরিক বলে, দৈর্ঘ্যে এবং জন্ম-সংখ্যায় দিন দিন কমিতেছে।

দারিদ্র্য ও দৈন্য কোনো জাতির বিনাশসাধন করে নাই; বিলাসও ধ্বংসের একমাত্র কারণ হয় নাই। যাহা জাতির সর্ব্বোত্তম লোকের ক্ষয়সাধন করে না তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হইতে পারে না। ইতিহাসে জাতীয় অধঃপতন ও লোপের প্রধান কারণ দেখা যায় জ্ঞানে ও শক্তিতে সর্ব্বোত্তম লোকের অভাব বা মৃত্যু।

কোন দেশের সীমান্তে যুদ্ধ লাগিলে স্বদেশপ্রেমিক বীর কখনো ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে পারে না, যুদ্ধের আহ্বান শুনিবামাত্র তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকে,—সে যুদ্ধে বাহির হইয়া পড়িয়া বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করে; কেবল যাহারা দুর্ব্বল ও ভীরু, তাহারাই অবশিষ্ট থাকে। এই দুর্ব্বল ও ভীরু পিতামাতার সন্তান সন্ততিও তাহাদের মতই হইয়া থাকে। কতকগুলি পশুর মধ্য হইতে সর্ব্বোত্তম পশু-গুলিকে মারিয়া ফেলিয়া কতকগুলি ক্ষীণ, দুর্ব্বল পশু ভবিষ্যৎ বংশোৎপাদনের জন্য রাখিয়া দিলে তাহাদের বংশধরেরা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে—এ যেমন নিম্নশ্রেণীর জীবরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতি সম্বন্ধেও সেই একই নিয়ম খাটে। যুদ্ধে না গমন করিয়া যে ভীরু ও দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিরা গৃহে সুখালস্যে বাস করিতেছিল তাহারাই ভবিষ্যদ্বংশের পিতা হইয়া জাতীয় অধঃপতন আনয়ন করে।

জাতীয় ধ্বংসের প্রধান কারণ কি কি? একটি কারণ দেশের লোকের দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করা। উৎসাহী, সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকেরাই বিদেশে গমন করিয়া ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। তাহারা দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলির চাষের ভার দেশে যে-সকল দুর্ব্বল কৃষক অবশিষ্ট থাকে তাহাদের উপর সমর্পণ করিয়া যায় বলিয়া দেশের কৃষি দিন দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপে স্বদেশ পরিত্যাগে সমগ্র পৃথিবীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, এক দেশের লোকে অপর দেশে বাস করিয়া সেখানকার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। পৃথিবীর কোনো-না-কোনো স্থানে তাহারা কাজ করে। কিন্তু যুদ্ধ তাহাকেও পৃথিবীর এক স্থান হইতে অপর এক স্থানে লইয়া যায় না, সে সকলকে একেবারে লোকান্তরে লইয়া উপস্থিত করে। এই ক্ষতি কেবল জাতিগত নহে,—সমগ্র মানবসমাজের ক্ষতি।

গ্রীকেরা এককালে সভ্যতায় ও বীরত্বে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইয়াছিল, কিন্তু কালে তাহাদেরও অধঃপতন হইল—তাহারাও পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। গ্রীসের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ জাতির সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিরা অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছিল। গ্রীকেরা আপনাদের মধ্যেই ভীষণ কাটাকাটি মারামারি করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানগণকে হারাইয়াছে। বর্ত্তমান-কালের গ্রীকেরা লিওনিডাস্ বা মিল্টাইডিসের বংশধর নহে, ইহারা যুদ্ধের উদ্বৃত্ত কাপুরুষদিগের বংশধর।

তাই আজকাল গ্রীসের অবস্থা এমন শোচনীয়। যে গ্রীস্ এককালে পারস্যসম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিল, যে গ্রীস্ একদিন সকল অত্যাচার অবিচারের প্রধান শত্রু ছিল, সেই গ্রীস্‌কেই পরবর্ত্তীকালে তুরস্কের নিকট হইতে আপনাদের স্বাধীনতা ফিরাইয়া

পাইবার জন্য সমগ্র য়ুরোপের সম্মুখে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভিক্ষাভাও লইয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল।*

গ্রীস্ তো এইরূপেই গেল। কয়েক শতাব্দী পরে প্রবল প্রতাপান্বিত রোমেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। রোম কি কখনো ভাবিয়াছিল যে তাহার অগণিত সুশিক্ষিত সৈন্য এবং তাহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের এমন সুশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও তাহার পতন হইবেই? অসংখ্য বর্ব্বরজাতি সুশিক্ষিত রোমক সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল বলিয়া রোমের ধ্বংস হইয়াছে তাহা নহে; অধর্ম্ম, অহঙ্কার, বিলাস ও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়া সে তাহার ধ্বংস আনয়ন করিয়াছে তাহাও নহে। রোমেরও অধঃপতনের কারণ যুদ্ধ। পণ্ডিত সিলি (Seely) বলেন "রোমসাম্রাজ্য কেবল মানুষের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" সকল ঐতিহাসিকই এইরূপ প্রকৃত মনুষ্যের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধ যে সেই অভাবের কারণ তাহা কেহই বড় নির্দ্দেশ করেন নাই। ওটোসিক্ Prof. Otto Seeck's "Downfall of the Ancient World") তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে সৎ ও উপযুক্ত মানুষের অভাবই রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। রোমসম্রাট মরিয়াস (Marius) ও সিনা (Cinna) রোমের শত সহস্র সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। অপর একজন সম্রাট, সুল্লা (Sulla) প্রজাশক্তির ভয়ানক বিরোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়ে অসংখ্য প্রজাতন্ত্রপরায়ণ লোকেরা নিহত হইয়াছিল। আবার যখন 'ট্রায়ামভিরেট্' (Triumvirate) রোমে প্রাধান্য লাভ করিল, তখন তাহারা অবশিষ্ট সদ্বংশীয় লোকদিগকে সংহার করিয়াছিল।

এইরূপে সম্ভ্রান্তবংশীয়, সৎসাহসী, উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা যথেচ্ছাচার ও যুদ্ধে নিঃশেষিত হইয়া গেলে কেবলমাত্র কাপুরুষেরাই অবশিষ্ট থাকিল। পরবর্ত্তীকালের রোমকেরা ইহাদেরই বংশধর, কাজেই তাহাদের নিকট হইতে আর বেশি কি আশা করা যায়?

বেরি (Berry) বলেন যে রোমে যুদ্ধের পর কৃষকদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া আসিয়াছিল এবং যেসকল দাস যুদ্ধে গমন করিত না তাহাদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোমে আন্টনাইনদের রাজত্বের সময়ে জন্মসংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল যে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার জন্য সম্রাট্ আগষ্টাস্ বিবাহে সরকার হইতে অর্থদান করিতে আরম্ভ করেন।

এই প্রকারেই গ্রীস্ এবং রোম্, কার্থেজ্ এবং মিশর, আরব ও তুর্কি কালে কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—কারণ, যথার্থ বীর্য্যশালী ব্যক্তিদের ক্ষয় হওয়াতে দাস ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা দেশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করায় তাহাদের দুর্ব্বল সন্তানেরা বংশপরম্পরাক্রমে জাতির পুষ্টি সাধনকরিতে থাকিলে সেই জাতি দিন দিন অধঃপতিত তো হইবেই।

জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই জাতি অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ জাপান দুই শতাব্দী ধরিয়া শান্তিতে বাস করিতে পাইয়াছে, কোনো জাতির সহিত তাহার সংগ্রাম বাধে নাই। দেশ যখন শান্তিতে থাকে তখন সেখানকার শ্রেষ্ঠ লোকই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বল ভীরু ও অলস টিঁকিতে পারে না। সেইজন্য জাপান দুই শতাব্দীর শান্তির পর এমন শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে রুসিয়ার অগাধ বাহিনীকেও সে পরাস্ত করিতে পারিয়াছে।

পৃথিবীতে কতশত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই যুদ্ধের ক্ষতি পূর্ণ করিতে উভয় পক্ষকেই বহুশত বৎসর ধরিয়া বেগ পাইতে হইয়াছে। অনেকে যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যথার্থতঃ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নহে। সকল লোককে তাহার প্রাপ্য অধিকারে বাধা না দিলে, কাহাকেও তাহার প্রাপ্য কোনো সুবিধা, কোনো ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত না করিলে, এবং সকলের সহিত মনুষ্যত্বপূর্ণ সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার করিলে, পৃথিবী আপনিই শান্তিনিকেতন হইয়া দাঁড়াইবে, তখন আর যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু যতদিন তাহা ঘটিয়া না উঠিতেছে, ততদিন যুদ্ধ লোপেরও কোনো আশা নাই; যুদ্ধ অনেক সময় অত্যাচারীকে ন্যায় কার্য্যে বাধ্য করিয়া থাকে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

* এই প্রবন্ধ ইটালীর সহিত তুরস্কের এবং তুরস্কের সহিত গ্রীস বুলগেরিয়া প্রভৃতির যুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এখন গ্রীকেরা আবার বীরত্বের জন্য খ্যাতিলাভ করিতেছে। কারণ, জাতীয় কাপুরুষতা চিরস্থায়ী হয় না। ইটালীয়েরাও রণদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে।

আওরঙ্গাবাদ ও রোজা

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ও চরিত্র সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ইহা সত্য যে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মের উপর তাঁহার শুভদৃষ্টি ছিল না। তিনি ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্মকে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন মনে করিয়া অনেকে তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনের ঘটনাপরম্পরা অধ্যয়ন

আওরঙ্গজেব-মহিষীর সমাধি-মন্দির, আওরঙ্গাবাদ।

করিলে বুঝা যায় যে, তিনি অনেক সংগুণেরও আধার ছিলেন। জীবনে কখনও তিনি মদ্যপান করেন নাই, তাঁহার সমগ্র জীবন একটী দৃঢ় নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাকে নিজের জন্য নয়, পরের জন্য খাটিতে এই জগতে পাঠাইয়াছেন! আমার প্রকৃতিপুঞ্জের সুখহেতু আমার যতটুকু সুখ পাওয়া উচিত তদপেক্ষা এক কণিকাও অন্বেষণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু হায়! মানুষের প্রকৃতিই সুখান্বেষণ করা।"

তাঁহার সামরিক গুণাবলী সম্বন্ধেও বিবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং বহুবার সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিজয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি প্রায়ই কুচক্রীর ক্রূর পরামর্শ অনুযায়ী চলিতেন। সেইজন্য বিজয় লাভ সত্ত্বেও রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। তাঁহার দীর্ঘ কার্য্য-পরম্পরার বিবরণ লিখিতে গেলে অনেক প্রবন্ধের প্রয়োজন, কিন্তু এস্থলে আমরা তাঁহার মৃত্যুর বারের অভিযানের কথা লিখিব।

দাক্ষিণাত্য বহুদিন হইতে মোস্লেমকরায়ত্ত। আজ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের প্রধান করদরাজ্য মুসলমান পরিশাসিত। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ইতিহাসের সহিত আওরঙ্গজেব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহার দাক্ষিণাত্যের রাজধানী ছিল আওরঙ্গাবাদ। এখানে তিনি বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এ নগরের এখন আর সে সম্পদ নাই, কিন্তু তাহার অতীত গৌরবের চিহ্ন এখনও সে বুকে ধরিয়া আছে। যিনিই নিজামপদে অধিষ্ঠিত
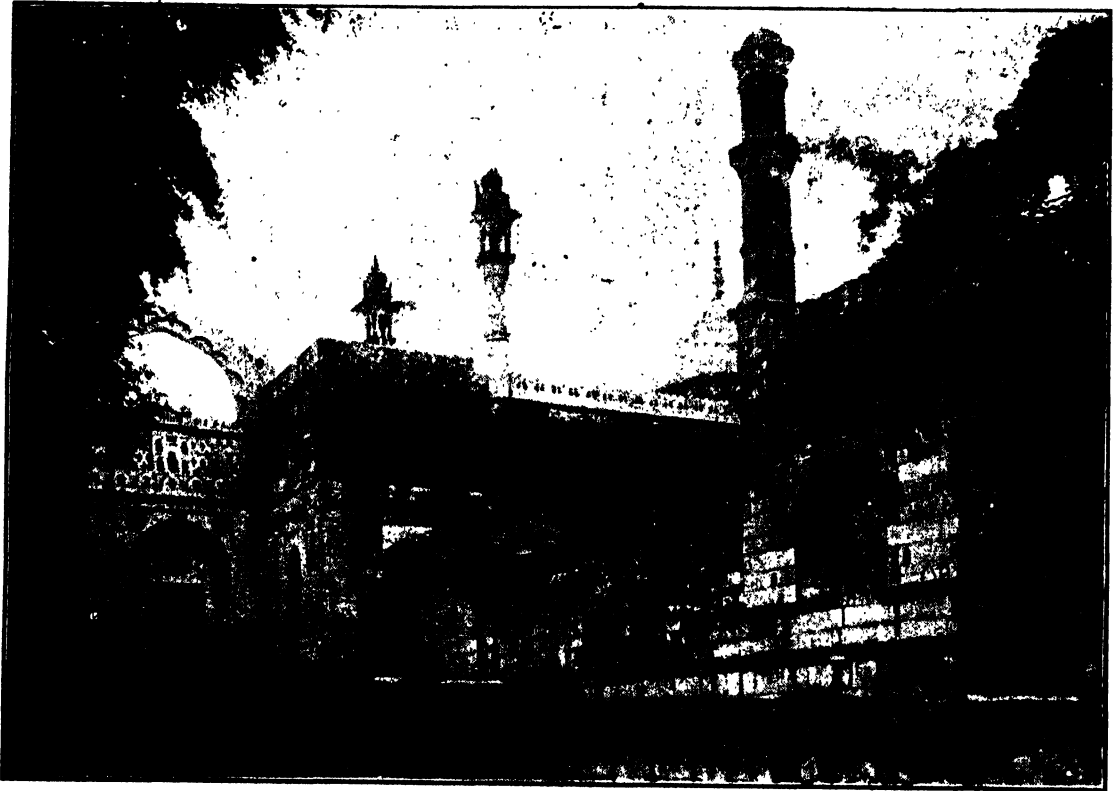
আওরঙ্গজেবের সমাধি-মন্দির ও মসজিদের প্রবেশপথ, রোজা।

হইবেন তাঁহাকেই কয়েকটী ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের জন্য এই ধ্বংসময় নগরে আসিতে হয়, তাহা না হইলে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। ১৬৬০-৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেব আওরঙ্গাবাদে অবস্থান করেন। এইখানেই তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রাবিয়া তুরাণীর সমাধি বিরাজমান। সমস্ত সহরের মধ্যে এই সমাধিমন্দিরটী দেখিতে সুন্দর। ষোল মাইল দূরে রোজা নামক ক্ষুদ্র সহরটীতে তাঁহার নিজের সমাধিও রহিয়াছে।

নিজামরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে আওরঙ্গাবাদ অবস্থিত। বোম্বাই হইতে ইহা ১৭৫ মাইল ও হাইদরাবাদের রাজধানী হইতে ২৭০ মাইল। সহরের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই কমিতেছে। ১৮২৫ খৃঃ লোকসংখ্যা ছিল ৬০,০০০, বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ২০,০০০। দৌলতাবাদ ও ইলোরার সুবিখ্যাত গুহামন্দিরের অতি সন্নিকটে আওরঙ্গাবাদ, অবস্থিত। যদিও ইহা দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে তবুও ইহার বাড়ীগুলির বিশেষত্ব অন্তর্হিত হয় নাই। ঐতিহাসিক বিশেষত্ব ব্যতীত বাড়ীগুলির শিল্পজনিত বিশেষত্বও আছে প্রচুর। মালিক অম্বর একজন আবেসিনীয় দাস। তিনি স্বীয় চরিত্রবলে ও সমর-নৈপুণ্যের সাহায্যে আহম্মদনগর রাজ্যের রাজাভিভাবক হন। তিনি ১৬১০ খৃঃ সহরটী প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন ইহার নাম ছিল কির্কি। সহরটীর চতুর্দ্দিক অৰ্দ্ধবৃত্তাকার প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীরের উপর প্রহরীদের জন্য মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত দুই তিনটী প্রবেশপথ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু রাজপ্রাসাদ ও রাজকীয় অন্যান্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ যাহা রহিয়াছে তাহা যৎসামান্য। দুর্গপ্রাকারের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। দুর্গের মধ্যে মক্কা তোরণের নিকট একটী প্রপাত-সংযুক্ত পুষ্করিণী বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাকে দেশী ভাষায় পানি-চাক্কি বা পান-চাক্কি বলে। এই-সকল সুদৃশ্য সৌধাবলীর মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আওরঙ্গজেবের পত্নী সাহনওয়াজ খাঁ সফাওয়ীর কন্যা দিলরাস বানু বেগমের সমাধি। সম্রাটের এই পত্নীর পাঁচ পুত্র ও চারিটী কন্যা
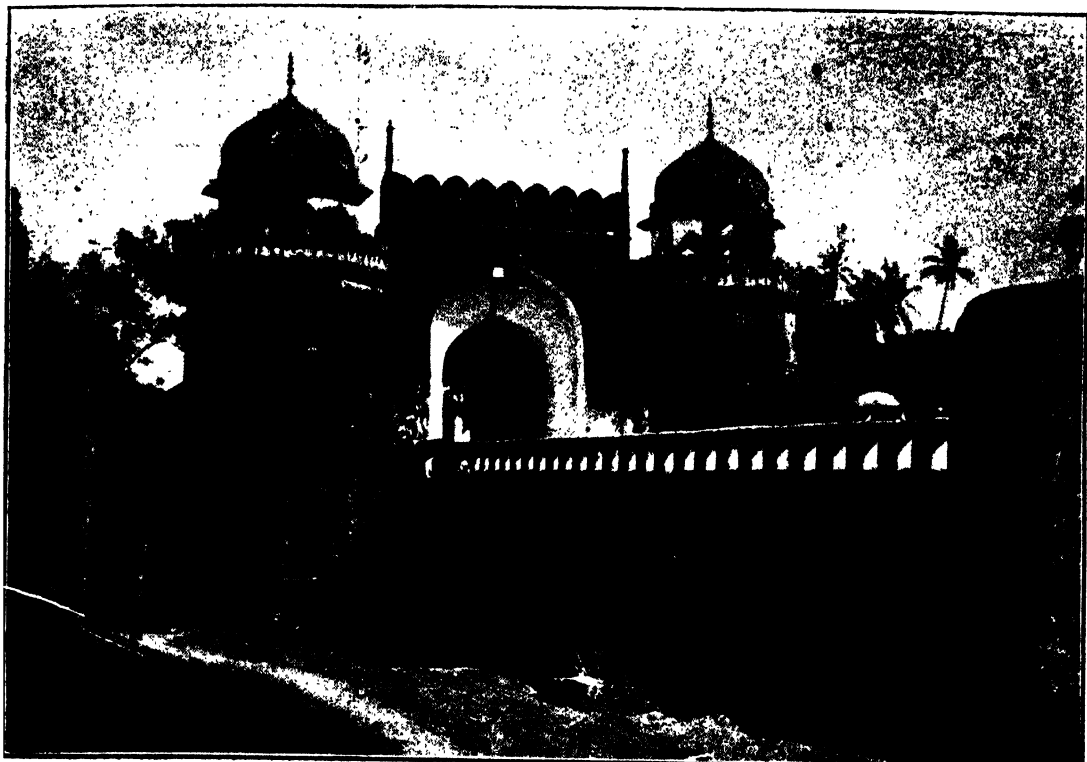
মক্কা তোরণ
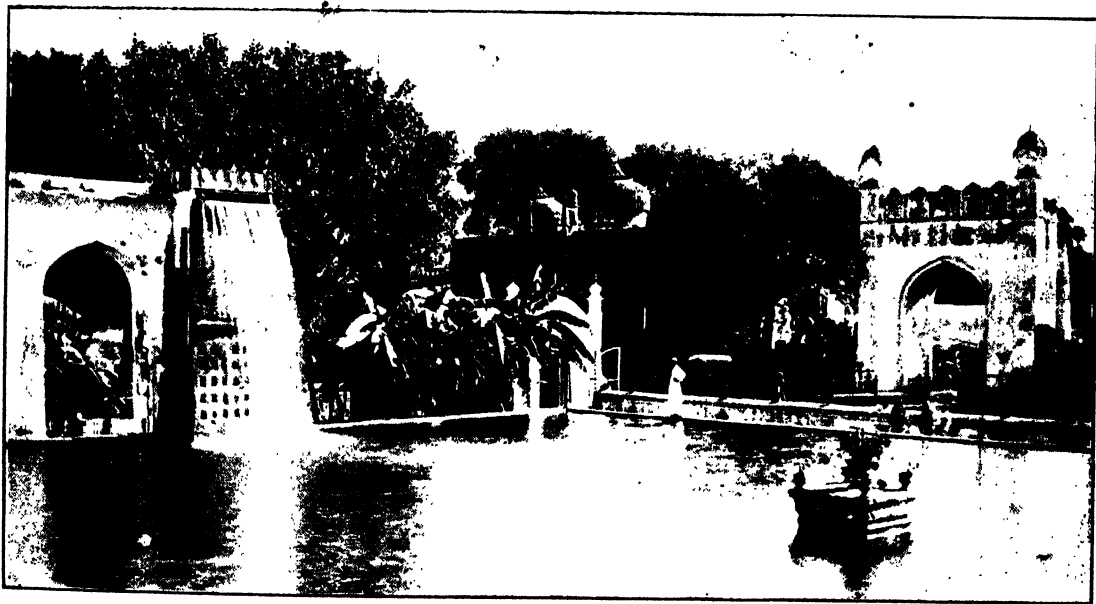
পান-চক্কী।

হইয়াছিল। গৃহটীর দৃশ্য দূর হইতে অতি চমৎকার, কিন্তু নিকটে গেলে একটু হতাশ হইতে হয়। ইহাকে গৃহ-

আওরঙ্গজেবের সমাধি এবং মর্ম্মর জালায়ন।

আওরঙ্গাবাদের দুর্গে যাইবার রাস্তা।

সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে অধিরোহণ করে এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কোনও বাহ্যিক চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। অথচ তাঁহার রাজত্ব-কালে কোনো সদৃশ্য সৌধ সংগঠিত হইতে দেখা যায় না। লোকে মনে করিতে পারে যে, তিনি গম্ভীরস্বভাবহেতু গৃহ-নির্ম্মাণে অধিক অর্থব্যয় করেন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ অদ্ভুত ধর্ম্মোন্মত্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতি নির্ম্মাণে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়ার ত কথা নয়। কিন্তু তাঁহার সময়ে কোনো সুন্দর মস্‌জিদও নির্ম্মিত হয় নাই।" ফার্গুসন সাহেবের এই উক্তির যাথার্থ্য আওরঙ্গজেবের নির্ম্মিত গৃহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আওরঙ্গজেব-মহিষীর সমাধি-মন্দিরের তোরণের দ্বার পিত্তল দ্বারা আবৃত। ইহার ধারে লিখিত আছে "এই মহলের দ্বার ১০৮৯ হিজরীতে হায়াৎ খাঁ দ্বারা শিল্পী আতাউল্লার নির্দ্দেশানুযায়ী নির্ম্মিত হয়।" দ্বারের নিকটে একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। সেখানকার লোকেরা, যে বলে যে আমি এই মহল দেখিয়াছি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে তুমি দ্বারের ক্ষুদ্র পাখীটি দেখিয়াছ কি না? সে যদি বলে না দেখি নাই তবে তাহারা বলে তুমি কখনও ঐ মহলে যাও নাই। এই বলিয়া তাহারা ঠাট্টা করে। ভিতরের কিছু কিছু শিল্প মনোহর বটে, বিশেষতঃ ড্রাগনের চিত্র কয়েকটীতে জাপানীশিল্পের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। নিজাম গভর্ণমেণ্ট আরকিওলজিক্যাল রিপোর্টে এই

সৌন্দর্য্যের চরম সৃষ্টি তাজের নকলে নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাজের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। তাজের সেই মনোহর সৌন্দর্য্য সেই বিপুল শিল্পনৈপুণ্যের এক কণিকাও ইহাতে নাই। আওরঙ্গজেবের সময় হইতে মোস্লেম শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। "তাঁহার সময় সৌধ-সংগঠন-রুচির পরিবর্ত্তন এত অধিক হইয়াছিল যে অন্য কোনও বিষয়ের এত অধিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। তাঁহার সময়েই মোগলসাম্রাজ্য

মসজিদের অভ্যন্তর, রোজা।

গৃহগুলির নাম ভুক্ত করিয়া ইহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই গৃহগুলির প্রধান দোষ যে প্রবেশপথগুলি তত উচ্চ নহে।

সমগ্র ভারতে "পানচাক্কি" মস্‌জিদ্‌ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর মসজিদ বলিয়া খ্যাত। বাবা সাহ মুজাফর নামক জনৈক মুসলমান মহাপুরুষ উক্ত সমাধি-মন্দিরে অন্তিম-শয্যায় শায়িত আছেন। ইনি আওরঙ্গজেবের গুরু ছিলেন। সমাধি-মন্দিরটী একটী ক্ষুদ্র উদ্যানে অবস্থিত এবং একরকম ঈষৎবর্ণাভ মর্ম্মর-প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। মক্কা তোরণ, জুম্মা মসজিদ্‌, মালিক অম্বরের মসজিদ প্রভৃতিও দর্শনযোগ্য। এই-সকল স্থান এক সময় বিবিধ কণ্টক বৃক্ষ লতাদিতে পূর্ণ ছিল। সার সালার-জঙ্গের আদেশমত এই জঙ্গল পরিষ্কার করিলে দেখা গেল যে, এখানে অসংখ্য পুষ্করিণী, জলপ্রপাত প্রভৃতি রহিয়াছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমির ওমরাহ সকলেই আওরঙ্গাবাদ ছাড়িয়া দিল্লীতে উঠিয়া যান। ইহার পরও কিছুদিন এখানে রাজধানী ছিল। লোকজন উঠিয়া যাওয়ায় নগর দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আওরঙ্গাবাদের নিকটে কয়েকটী বিখ্যাত গুহা আছে। এগুলি সুন্দর বটে কিন্তু ইলোরার মত অত সুন্দর নহে।

নিকটেই রোজা নামক আর একটী সহর আছে। আওরঙ্গজেবের সমাধি এই ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত। আওরঙ্গাবাদ হইতে ইহা মাত্র ১৫ মাইল দূরে এবং ইলোরার অতি নিকটে অবস্থিত। যাতায়াতের কোনও অসুবিধা নাই। ইলোরা হইতে আসিতে হইলেই রোজা অতিক্রম করিতে হয়। রোজাতে আরও অনেক বিখ্যাত মুসলমানের সমাধি রহিয়াছে। আওরঙ্গজেবের পুত্র আজিম সাহের, হাইদ্রাবাদ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আসফ ঝার, নিজামসাহি রাজ্যের মন্ত্রী মালিক অম্বরের এবং দুই তিন জন মুসলমান ফকিরের সমাধি রোজাতে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ তোরণের ঠিক

আসফঝার সমাধি-মন্দির, রোজা।
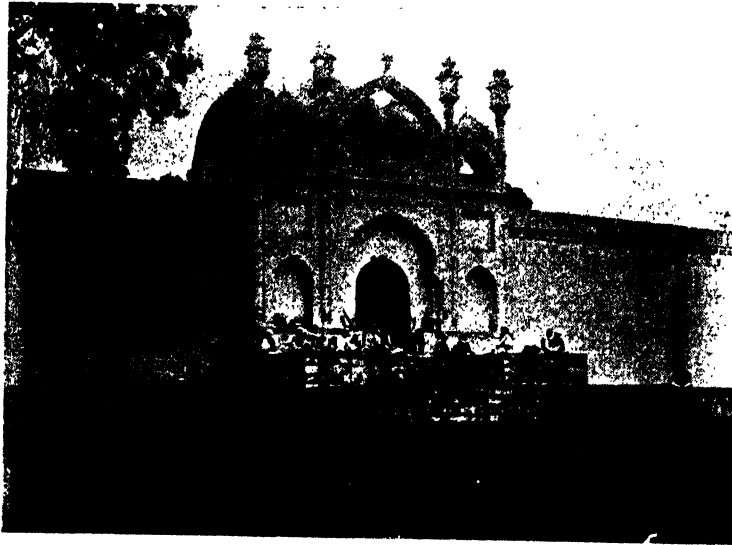
মহাপুরুষ ফকির সাহেবের সমাধি-মন্দির, রোজা।

সেই শিল্পীর হাতেই তাঁহার এই সৌন্দর্য্যশূন্য সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটা গল্প প্রচলিত আছে যে তিনি অন্তিম-ইচ্ছাপত্রে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যে-সকল টুপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তদ্‌বিক্রয়লব্ধ অর্থের সাহায্যে তাঁহার সমাধির ব্যয় যেন নির্ব্বাহিত হয়। সেই টুপি-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বড়জোর ৮।৯৲ টাকা হইয়াছিল; তাঁহার যতগুলি কোরান ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া যে ৮০৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহা গরীব দুঃখীকে দেওয়া হয়। ৫ ফুট উচ্চ একটী মর্ম্মর প্রস্তরের আবরণ ব্যতীত তাঁহার সমাধির অন্য কোনও বৈভব নাই।

এই-সকল সমাধির বিপরীত দিকে আসফঝার সমাধি। এই সমাধিমন্দিরের দ্বারে একটী বিশাল চতুষ্কোণ গৃহ বর্ত্তমান। আসফঝার সমাধির নিকটেই ফকির সৈয়দ হজরত বুরহান-উদ্দীনের সমাধি আছে। ইনি ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি উত্তর প্রদেশ হইতে ১৪০০ জন শিষ্য লইয়া দাক্ষিণাত্যে ইসলাম্ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। প্রবাদ আছে যে, "এই মন্দির নির্ম্মিত হইবার কিছুদিন পর সৈয়দের শিষ্যগণ এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন যে, তাঁহারা মন্দিরটী মেরামত করিতে অথবা নিজেদের আহার সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া পড়েন। তারপর শিষ্যগণ মন্দিরে যাইয়া মৃত সৈয়দের নিকট ইহা জানাইলেন। অমনি রাত্রিতে গৃহচত্বরে রজতবৃক্ষ সমুদয় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ও শিষ্যগণ প্রত্যহ সেই-সকল লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই রজতবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের চলিতে লাগিল

মধ্যপথে আওরঙ্গজেবের মহল অবস্থিত। আওরঙ্গজেবের সমাধি একটী ক্ষুদ্র গৃহে রক্ষিত ও অল্পব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। অদৃষ্টের পরিহাস, হিন্দুর পবিত্র তুলসীগাছ হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী সম্রাটের সমাধির উপর জন্মিয়া ক্রমশঃ বংশ বিস্তার করিতেছে। কথিত আছে মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্রাট বলিয়া গিয়াছিলেন যে কোরানের বিধানমত তাঁহার সমাধি যেন জাঁকজমকশূন্য অতি সাদাসিধাভাবে হয়। যে শিল্পী তাঁহারই পত্নীর সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিল

এবং মন্দিরটীও সংস্কৃত হইল। এই রকম রজতবৃক্ষ ফোটা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে। এদিকে মন্দির রক্ষার জন্য শিষ্যগণ এক জায়গীর পাইলেন। জায়গীর প্রাপ্তির পর হইতেই রজতবৃক্ষ ফোটা বন্ধ হইয়া গিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে কতকগুলি রজতপুষ্প ফুটিত এবং দিন হইবামাত্র তাহা আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত।”

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

পুরোহিতের প্রতি ছাগ

শিরে সিন্দূর, গলে ফুলহার!
কেন এত সম্মান?
স্বর্গ স্বর্গ বলি', পুরোহিত,
কেন খাও মোর কান্?

কেন এ আচার ধর্ম্ম-বিচার,
উপচার-সম্ভার?
তব মন্ত্রে কি চেতনা জাগিবে
জড়-জগদম্বার?

যদি জাগে, তবে 'স্রষ্ট' সে হবে,
তুমি সে সৃজনকারী;—
তব ঈশ্বরী হয় সে কি করি?
ঈশ্বর তুমি তারি!

জগৎ যুড়িয়া নির্ঝর সম
ঝরে কারুণ্য যাঁর,
সেও কি কখন রক্ত শুষিবে
ভাঙ্গিয়া আমার ঘাড়?

আমি অজ!—তুমি ধর্ম্মধ্বজ!
বুঝিয়াছি তব ভান;
চল একান্তে;— দেব-মন্দির
নহে বধ্যস্থান।

শ্রীরঘুনাথ সুকুল।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De-La Mazelierর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

মুসলমান আক্রমণ।—প্রথম-যুগ। উত্তর-পশ্চিম-ভারত কর্ত্তৃক বিদেশীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার। গিজ্‌নিরাজবংশ (১১৫২ পর্য্যন্ত) মাহ্‌মুদ (১০০১—৩০)। ইরাণে সাহিত্য-আন্দোলন। ফির্দ্দৌসী। মহম্মদ-ঘোর এবং আফ্‌গান্-রাজবংশ। (১১৫২—১২০৬)।—দ্বিতীয় যুগঃ—ভারতবিজয় এবং ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যসমূহের মূলপত্তন। "দাস-রাজা"দিগের অধীনে দিল্লি। শিল্প সাহিত্য। উর্দ্দু ও ফার্সি। খোস্‌রৌ। তৈমুর-লং-এর ভারত-আক্রমণ। গৃহ-যুদ্ধ। মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপন।

কি করিয়া হিন্দু-মুসলমান-সভ্যতা গঠিত হইল এক্ষণে তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে তিনটী মুখ্য তথ্য পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানেরা যেরূপে ভারতজয় করিয়াছিল তাহার মত' শ্রমসাধ্য ব্যাপার আর কিছুই নাই। সমস্ত হিন্দুজাতি, বিশেষতঃ রাজপুত, মারাঠা ও তামুলগণ অতীব দৃঢ়তার সহিত মুসলমানদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সপ্তম শতাব্দী হইতে আরবদিগের আক্রমণ আরম্ভ হয়; অষ্টম শতাব্দীতে উহারা সিন্ধুদেশে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর রাজপুতেরা উহাদিগকে সিন্ধুদেশ হইতে অপসারিত করে। একাদশ শতাব্দী হইতে মধ্য-এসিয়ার অধিবাসী জাতিবর্গের আক্রমণ আরম্ভ হয়; ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উহারা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করে; টালিকুটের যুদ্ধে বিজয়নগর একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সমস্ত হিন্দুরাজ্য মুসলমানের সর্ব্বাধিপত্য স্বীকার করিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে, মরাঠারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়; উহারা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করে। হিন্দুরা যখন মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়াছে এমন সময় ইংরাজেরা আবির্ভূত হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয়কেই বশীভূত করিল।

যেমন ধর্ম্মে, তেমনি দৈহিক গঠনে, আচার ব্যবহারে, পরিচ্ছদে, ঐ দুই দলের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

এক দিকে,—হিন্দুরা, তামুলেরা, এবং দেশীয় লোক-দিগের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহারা ভারতে

বাস করিত সেই রাজপুতেরা। কামানো দাড়ী, গোঁপ, পেঁচাল পাগ্‌ড়ী।(১) সচরাচর স্বল্প পরিচ্ছদ, সাদা কাপড়। যুদ্ধের জন্য, ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, ধনু, তূণ, বল্লম, তলোয়ার, অস্ত্র-চিহ্নিত গোলাকার ঢাল; মানুষ ও ঘোড়া উভয়ই বর্ম্ম-জালে সুরক্ষিত। একদিকে রাজপুত অশ্ব-সৈন্য, প্রত্যেক সর্দ্দার বা 'ঠাকুর'এর সঙ্গে একএকজন সম্ভ্রান্ত অনুচর; আর এক দিকে, হিন্দু-সৈন্য; দুই তিন লক্ষ পদাতিক; তন্মধ্যে কতকগুলি, শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্মধারণ করে, এবং আর কতকগুলি, একপ্রকার শিরোবেষ্টন ও সূতী-কাপড়ের আলখাল্লা পরিধান করে, পায়ে ভাল জুতা নাই, কিংবা একেবারে খালি-পা। স্থূল ধরণের অস্ত্রশস্ত্র,—কুড়াল, বল্লম, আসা-সোঁটা, টাঙ্গী, অঙ্গুষ্ঠ স্থাপনের জন্য খাঁজ-কাটা তলোয়ার। তাহাদের হইতে আরও দূরে, সাজসজ্জায় সজ্জিত হস্তী; হস্তি-দন্তে পরিধৃত "কাস্তে"-অস্ত্র; হাওদার উপর তীরন্দাজ। দূরে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুসজ্জিত হাতীর উপর, অর্দ্ধ-নগ্ন রাজা; দাসেরা ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা ব্যজন করিতেছে, সুগন্ধী ধূপ পুড়াইতেছে, হাত বাড়াইয়া পিক্‌দানী ধরিয়া আছে, তাহার মধ্যে রাজা পানের পিক্ ফেলিতেছেন। চারিধারে, অশ্বসৈন্য অথবা বীরাঙ্গনা শরীররক্ষক, বাজপক্ষী হস্তে লইয়া কতকগুলি শূলধারী সৈনিক; শিকারের জন্য শিক্ষিত কতকগুলা নেকড়ে বাঘ। অন্য হাতীর উপর,—কোথাও বা রমণীবৃন্দ; কোথাও বা বিকটাকার দেবতার মূর্ত্তি, তাহার নিকট বলি দেওয়া হইবে, সম্ভবত নর-বলি দেওয়া হইবে। অধিকাংশ স্থলেই রাজা দূর হইতে যুদ্ধ দেখেন; কখন কখন আত্মমর্য্যাদার লাঘব করিয়া যুদ্ধে যোগ দেন!—সোনার বা রূপার বর্ম্ম, বহুমূল্য নানারত্নে খচিত; বেশভূষায় সুসজ্জিত একটি হাতী, তার পায়ে নূপুর, এবং কপালের উপর শিরোভূষণ।(২)

পক্ষান্তরে, আরবেরা; মুসলমানের প্রিয় যে দীর্ঘ শ্মশ্রু সেই দীর্ঘ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট পারসীকেরা; উহারা বর্ম্মজাল ও স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত গোলাকার কালো ঢাল ধারণ করে, এবং ডামাস্কস্ নগরে নির্ম্মিত খুব সূক্ষ্মধার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। সর্দ্দারেরা উচ্চবংশজাত অশ্বে আরোহণ করে; অশ্বের পুচ্ছ ও কেশ দীর্ঘ, উহা বর্ম্মসাজে সজ্জিত, উহার জিন ও লাগাম বহুমূল্য রত্নাদিতে খচিত। উটের সারি; তন্মধ্যে কতকগুলি,—একের পশ্চাতে আর একটা রজ্জু-বন্ধনে আবদ্ধ; উহারা একটা পাল্‌কী বহন করিয়া লইয়া যায়। লম্বা সাদা আলখাল্লা-পরা আফ্রিদিরা; উহাদের মাথায় পশমি টুপি; তুর্কম্যান, মোগল,—ইহারা মধ্য-এসিয়ার মরুপ্রান্তর-জাত টাট্টু ঘোড়ায় আরোহণ করে, প্রান্তভাগ উত্তোলিত কাঠের জুতা ব্যবহার করে; আঁক্‌ড়ীর ন্যায় জুতার বাঁকানো গোড়ালী জিনের রেকাবে বেশ লাগিয়া থাকে; ইস্পাৎ কিম্বা সিদ্ধ করা চামড়ার শিরস্ত্রাণ, অথবা পশমী টুপী; টুপীতে 'পর'-লাগানো শিরোভূষণ; বর্ম্মস্বরূপ একটা চামড়ার আলখাল্লা, তার উপর সিদ্ধ-করা বা গালা-লাগানো চাম্‌ড়ার কতকগুলা টুক্‌রা বসানো। দুইটা ধনু, তিনটা তূণ, বাঁকা তলোয়ার, একটা বড় হাঁড়ি, নদী পারাপার হইবার জন্য একটা লম্বা চাম্‌ড়ার থলে। চীন, আরব, য়ুরোপীয়, মধ্য এসিয়ার লোক—ইহারা সকলেই "অস্ত্র-অস্ত্র" ও "গ্রীক্ আগুনের" (গ্রীকদের উদ্ভাবিত একপ্রকার আতসবাজি যাহা জলের মধ্যে পোড়ান যায়) ব্যবহার জানিত। মুসলমান-দিগেরই রীতিমত সৈন্য ছিল; ইসলামদের আক্রমণ এবং অষ্টম শতাব্দীর অন্যান্য আক্রমণ—এই যে দুই শতাব্দীর ব্যবধান—এই সময়ের মধ্যে, মুসলমানেরা চীন ও পারসীক-দিগকে সৈন্য ধার দিত, এবং এইরূপে উহারা পর-বেতনভুক্-পেষাদার সৈন্য হইয়া পড়িয়াছিল। জেঙ্গিসখাঁই উহাদিগকে জটিল রণ-কৌশলে অভ্যস্ত এবং খুব কড়া নিয়ম-শাসনের বশীভূত করে। সামরিক আজ্ঞাপালনের সঙ্গে

(১) আজকাল অনেক রাজপুতই দাড়ী বা 'গাল-পাট্টা' রাখে, এবং পরিচ্ছদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে আবৃত করে; কিন্তু যে সময়ে উহারা মোগল সম্রাটদিগের শরীর-রক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়, সেই সময় হইতেই এই-সমস্ত আরম্ভ হইয়াছে।

(২) হিন্দুদের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে মুখ্য প্রমাণ এইগুলি:—বারহুতের তক্ষণশিল্প, সাঞ্চির তক্ষণশিল্প, পুরীর অমরাবতীর তক্ষণশিল্প, দ্রাবিড়ীয় মন্দিরসমূহের তক্ষণশিল্প. অজন্তার চিত্রাবলী, শক-রাজাদিগের মুদ্রা; নাটক ও আখ্যায়িকাদির (যেমন সোমদেবের) কতকগুলি বাক্যাংশ, মাশূদি, আলুবিরুনী প্রভৃতি ঐতিহাসিকদিগের লেখা; আরও পরে বাবর ও জাহাঙ্গিরের স্মৃতিলিপি; আইন-আক্‌বরী; কিন্তু এই সময়ে হিন্দুদের অস্ত্রশস্ত্র রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। South Kensington Museumএ ভারতবর্ষীয় অস্ত্র শস্ত্রের একটা সংগ্রহ আছে। Lord Egerton's, "Description of Indian and Oriental Armour" দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে, ধর্ম্মের আজ্ঞাপালন; তুর্কেরা অন্ধভাবে তাহাদের সেনাপতির অনুসরণ করে; মুসলমানেরা মহম্মদের প্রতিনিধি ইমামের বাক্য ধর্ম্মান্ধের ন্যায় পালন করিয়া থাকে।

একাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে, যেসকল যুদ্ধবিগ্রহে ভারত শোণিতাপ্লুত হইয়াছিল, সেই-সকল যুদ্ধবিগ্রহকে ধর্ম্মঘটিত যুদ্ধবিগ্রহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ যেন কল্পনা করা না হয় যে, স্বদেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত হিন্দুই বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; তদ্বিপরীতে, একটি বিরাট সাম্রাজ্যের উপর, কোটি কোটি জনসঙ্ঘের উপর, মুসলমানেরা যে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কারণ, রাজাদের মধ্যে দলাদলি, জনসাধারণের উদাসীনতা। অনেক সময়ে, মুসলমান রাজ্যের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধ বাধিত। প্রত্যেক পক্ষ সাহায্যের জন্য হিন্দুদিগকে আহ্বান করিত। সর্ব্বত্র ও সবসময়েই, আবার সেই সামন্ততন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়কার ভারতের অবস্থা, ঐ একই যুগের স্পেনদেশের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। স্পেনে, কতকগুলি সামন্ততন্ত্রী রাজ্য, মুসলমান ও খৃষ্টান; ভারতে কতকগুলি সামন্ততন্ত্রী রাজা, মুসলমান ও হিন্দু। বিদেশীয় ও স্বদেশীয়, কখন শত্রুপক্ষ, কখন মিত্রপক্ষ। গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হইয়া, স্পেন ও ভারত উভয় দেশই একতার অভিলাষী হয়। কিন্তু একদিকে যেমন স্পেনবাসীরা মুরদিগকে দূরীভূত করিয়া স্বদেশীয় রাজবংশ স্থাপন করিল, অপরদিকে সেই সময় ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। একথা সত্য, সার্দ্ধ এক শতাব্দী পরে এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়; হিন্দুরা আবার আক্রমণকারীদিগের উপর জয়লাভ করে।

তৃতীয় তথ্যটির প্রতি এখন লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই সর্ব্বপ্রথমে ভারত এমন এক বিদেশীয় জাতির শাসনাধীনে আসিল—যাহারা হিন্দুদিগের রীতিনীতি, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করে। হিন্দুধর্ম্মের উপর তুর্ক ও মোগলদের কেন যে এত বিদ্বেষ, মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলেই, তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু, ভারত-ইতিহাসে, একাদশ শতাব্দী, একটা সঙ্কট-কাল; যে দেশের লোকেরা সমস্ত এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করে, তাহারা নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত বর্ব্বরদিগের মধ্যে সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করিবার বল হারাইয়াছিল।

***

একাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে, মুসলমান দিগ্বিজয় দুই যুগে বিভক্ত (৩)।

প্রথম যুগে, আক্রমণকারীদিগের রাজধানী ভারতের বাহিরে ছিল; বশীভূত প্রদেশগুলি, এক বিদেশীয় সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত ছিল।

তুর্কসর্দ্দার, পরে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান—ঘজনীর মামুদ (১০০১—৩০) কালিফের আধিপত্য হইতে প্রাচ্যখণ্ডের প্রদেশগুলি ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। বিধর্ম্মীদিগকে শাস্তি-দিবার জন্য, তাহাদের শস্যাদি দগ্ধ করিবার জন্য, তাহাদের সমস্ত দেবমন্দির বিধ্বস্ত করিবার জন্য, তিনি সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ করেন। সার্দ্ধ-একশতাব্দী ধরিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পঞ্জাবকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছিল। গ্রন্থকারগণ, সালাদিনের ন্যায় মামুদের স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন। অনেকগুলি কাহিনীতে তাঁহার সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন এক বৃদ্ধার পুত্র দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়; বৃদ্ধা মামুদকে ইহার প্রতিশোধ লইতে বলে।

---

(৩) ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-অভিযানের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

পশ্চিম-উপকূলে আরবদিগের প্রথম-আক্রমণ (? ৬৪৭-৬৬২-৬৬৪)।

সিন্ধুদেশ,—কালিফ্-শাসনাধীন প্রদেশ (৭১১—৮২৪)।

প্রথম রাজবংশ :—ঘজনি-বংশ (তুর্ক) (১০০১—১১৪৬)। মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে। ১৩ বার পঞ্জাব, একবার কাশ্মীর, আর তিনবার ধনরত্ন লুট করিবার জন্য কনৌজ, গোয়ালিয়ার ও গুজরাটস্থ সোমনাথ আক্রমণ করে।

দ্বিতীয় রাজবংশ :—ঘোরের আফ্‌গানেরা (হিরাটের ১২০ মাইল দক্ষিণে (১১৮৬—১২০৬)। ঘোরের মুহম্মদ (১১৯১—১২০৬)। বিহার-বিজয় (১১৯৯), দক্ষিণ বঙ্গবিজয় (১২০৩)।

তৃতীয় রাজবংশ :—দাস-রাজগণ (১২০৬—১২৯০)। আলতামাস্ (১২১১—৩৬) এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজা।

চতুর্থ রাজবংশ :—খিলাজ নামে প্রসিদ্ধ (? তুর্ক) আলাউদ্দীন (১২৯৫—১৩১৫) সমস্ত উত্তর-ভারত পুনর্ব্বার জয় করিলেন; তাঁহার সেনাপতি কাফুর অ্যাডাম-সেতু পর্য্যন্ত উপনীত হন।

পঞ্চম রাজবংশ :—তুঘলক্-নামে প্রসিদ্ধ (তুর্ক) (১৩২০—১৪১৪)। তামুর লঙ্গের অভিযান (১৩৯৮—৯৯)।

ষষ্ঠ রাজবংশ :—সৈয়েদ-বংশ (১৪১৪—৫০)।

সপ্তম রাজবংশ :—লোড়ি (আফ্‌গান) (১৪৫০—১৫২৬)।

অষ্টম রাজবংশ :—তামুর লঙ্গের উত্তরাধিকারী মোগোলেরা (১৫২৬ ১৮৫৭)।

মামুদ উত্তর করিলেন, "আমার রাজ্য অতীব বৃহৎ, আমি উহার সর্ব্বত্র আমার আইন কানুন বজায় রাখিতে পারি না।" বৃদ্ধা প্রত্যুত্তর করিল, "যতগুলা রাজ্য শাসন করা তোর সাধ্যায়ত্ত, তা-অপেক্ষা বেশী রাজ্য যদি তুই জয় করিস, তাহলে তোর মঙ্গল নাই।" মামুদ নতশির হইয়া তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলেন।

আফগানিস্থানের অন্তর্ভূত ঘাজ্‌নি, এসিয়ায় সাহিত্যিক রাজধানী হইয়া উঠিল। সেখানে সুন্দর উদ্যান, প্রাসাদ, গম্বুজবিশিষ্ট বড় বড় মসজিদ, প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনসকল দৃষ্ট হইত। উহা কবিদিগের মিলনস্থান ছিল। ঐখানে ফির্দ্দৌসী "শা-নামা" রচনা করেন। তিনি প্রভুর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈর্ষ্যাপরায়ণ মন্ত্রীদিগের আক্রোশে পড়িয়া, স্বধর্ম্মত্যাগের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

মামুদের বিরুদ্ধে তিনি যে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ কবিতার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

"ওরে অত্যাচারী, জানিস্‌, পৃথিবীতে আমাদের জীবন অল্পদিনই স্থায়ী হয়। অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, আর মানবজাতিকে কষ্ট দিস্‌না। একটি পিপীলিকারও অনিষ্ট করিস না; দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে, সে বাঁচিয়া আছে, এবং জীবন সকলের নিকটেই মধুর। আর আমি, আমি—যাকে তুই দৃঢ়চরিত্র, গম্ভীর ও সাহসী বলিয়া জানিস,—সেই আমার সমাধিস্থানকে তুই কিনা রক্তকলুষিত করিতেও ভয় করিস না? কি উদ্দেশে তুই এই জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্‌?... জনতার পদতলে, হস্তীর পদতলে আমাকে বিদলিত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিস্‌!...আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করি না; যে একমাত্র সিংহাসনের সম্মুখে আমার মস্তক অবনত করি, সে অনন্তের সিংহাসন।"

পরে ফির্দ্দৌসী মামুদের নীচ-জন্ম ধরিয়া মামুদকে বিদ্রূপ করিলেন;—ঐ মহাসম্রাটের জনকজননী কাফ্রির মত কালো। অবশেষে কতকগুলি শ্লোকে, তাঁহার গ্রন্থের অমরতা সম্বন্ধে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি Horaceএর পদাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়।

একদিন মামুদ নিদাঘ-তাপে দগ্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন,—কবিতার কতকগুলি শ্লোক তাঁর কর্ণগোচর হইল:—উহা কবিত্বপূর্ণ প্রেমের বর্ণনা, গৌরবান্বিত বীরত্বের বর্ণনা। মামুদ জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার এ কবিতা?"—"ফির্দ্দৌসীর"। "আমি তবে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম; এই উপহারগুলি তাঁহার নিকট পাঠান হউক!" উপহার-সম্ভার লইয়া একদল উট আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু তুস-নগরের পূর্ব্বদ্বার যেমন পার হইবে অমনি বিপরীত দ্বার দিয়া, দুঃখ কষ্টে বিগত-প্রাণ কবির শব বহন করিয়া শোকতপ্ত অনুযাত্রীগণ বাহির হইল। (৪)

এইরূপে, ভারত যাহাদের শুধু ধর্ম্মান্ধতার কথাই জানিত, সেই মুসলমানেরা ভারতীয়-ভাবাপন্ন একটি নগরকে উহাদের সাহিত্যিক সভ্যতার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ যুগেরই কাছাকাছি, আরবদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দার্শনিক ও চিকিৎসক—আভিসিএন্‌, বোখারায় শিক্ষা লাভ করিয়া ইরানে দর্শন বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার করেন।

সাদ্ধ একশতাব্দী পরে, আফগানেরা ঘাজ্‌নী-বংশকে ধরাশায়ী করিল। ঘোরের মহম্মদ ও তাঁহার সেনাপতিগণ হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশ জয় করিল। এক বিদেশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, হিন্দুস্থান মুসলমান-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, পারসীক ও কালিফদিগের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন ও শাসনপ্রণালীও গ্রহণ করিল। মনে হইতে পারে, ভারত-ভূমির মৌলিকতা বুঝি এইবার চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বজ্রদূত

বজ্রকে দূত করি আজ তুমি
পাঠায়েছ মোর ঘরে,
সকল দগ্ধ করিছে সে, তব
বার্ত্তা প্রচার তরে।
ছিন্ন, ভিন্ন, চূর্ণ হয়েছে
সাধের বাসর মম,
অন্তর তবু করিছে স্বীকার
তুমি অন্তরতম॥

(৪) এই সম্বন্ধে Henri Heineএর একটি প্রসিদ্ধ গাথা আছে।

বুঝি বিশ্বাস হারায়েছিলাম
তোমার বিধান বেদে,
অথবা আঁধারে ভ্রমিতেছিলাম
অভিমান, ক্ষোভ, খেদে,
তাই দয়া করে' জেলে দিলে তুমি
ক্ষণিক অনল-শিখা
দেখাইতে মোরে পড়িবে কখন
কোনখানে যবনিকা ॥

যাক্ পুড়ে যাক্ এ অনলে মোর
দীনতা হীনতা যত;
থাকে যদি কিছু থাকিবার মতো
রহিবে তা' অক্ষত।
দূরে পড়ে' রবে ঝঞ্ঝা ঝটিকা
লজ্জা, বিপদ, ভয়,
আমি আপনারে বুঝে লয়ে গা'ব
বজ্রদূতের জয় ॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দক্ষিণ ভারতের তমিড় জাতি ও তমিড় সমাজ

দক্ষিণভারতের পূর্ব্ব উপকূলে দ্রাবিড় জাতির বাস। এক-কালে এই দ্রাবিড়ের শৌর্য্য বীর্য্য ও স্থপতি-বিদ্যা ভারতের নানা স্থানে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই জাতি ভারতের বাহিরেও আপনার বাণিজ্য বিস্তার করিত। পারস্যে, বাবিলোনে, আফ্রিকার উপকূলে মিশর দেশেও আপনার পরিচয় দান করিতে বিরত হয় নাই। এই জাতিরই এক শাখা অন্ধ্রবংশ নামে বঙ্গদেশে রাজত্বও করিয়াছিল। প্রাচীন রামায়ণাদি পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি এই দেশেই লঙ্কাধিপতি রাবণের জন্ম এবং তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেশেই হনুমানের ন্যায় অকুতোভয় বীর এবং সম্পূর্ণ আত্মবিলোপী প্রভুভক্তের জন্ম হয়। আমরা আবহমানকাল ধরিয়া ইহাদিগকে রাক্ষস ও বানর জাতি বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সেই ঘৃণার ভ্রূকুঞ্চন ও উপেক্ষার মৃদুহাস্য এখনও তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে বুধমণ্ডলী যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আর্য্য-গৌরবের কৃতিত্বে আমাদের দাবীর বিষয় যে কতটুকু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাই মনে হয় এই দ্রবিড় দেশবাসী তমিড়্-ভাষা-ভাষী তথা-কথিত অনার্য্য রাক্ষস জাতির সংবাদ লইবার বোধহয় সময় এখন আসিয়াছে। এই জাতির প্রাচীনত্ব যে কতদূর অতীতের গৌরব-সম্ভার মস্তকে লইয়া অধুনা সভ্য জগতের সমক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিরা বিচার করিয়া বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন। আর আমরা আফ্রিকার নিগ্রোজাতির কথা আলোচনা করি, কিন্তু আমাদের প্রতিবাসী চিরদিনের সুখদুঃখের সঙ্গীর কথা একবার ভাবিয়াও দেখিতে ইচ্ছা করি না। একজন বোম্বাইবাসী বন্ধু একবার বলিয়া-ছিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডে তিন বৎসর যে কষ্ট পান নাই মান্দ্রাজে তিন দিবস বাস করিয়া তাহার অধিক কষ্ট পাইয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান না থাকায় প্রতিবাসী পর হইয়া গিয়াছে, আর দূরদেশবাসী সর্ব্ব-বিষয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন আচারের লোক হইয়াও নিতান্ত আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে এই দ্রবিড় দেশ চারি ভাগে বিভক্ত—তেলেঙ্গা, তমিড়্, মালাবার ও তুলু। তুলুদেশে কুকুনী ও সারস্বত ব্রাহ্মণের বসবাস আছে কিন্তু তাঁহারা প্রায় মারাঠা জাতির ন্যায় আচারব্যবহার-সম্পন্ন। তাঁহাদের ভাষাও বহুলপরিমাণে ভাঙ্গা-হিন্দি ও ভাঙ্গা-তুলুর মিশ্রণ। বঙ্গের নিম্নে ওড়িয়া দেশ, তাহার নিম্নে তেলেঙ্গা, তাহার নিম্নে তমিড়্, তমিড়ের পশ্চিমে, মালাবার এবং মালাবারের পশ্চিমোত্তর পার্শ্বে তুলু-ভাষা-ভাষীর দেশ। যদিও এই শেষোক্ত দেশের প্রধান ভাষাই কর্ণাটী বা ক্যানারিস্। এই চারি জাতির মধ্যে তমিড় জাতিই সর্ব্বপ্রধান। আমরা ইংরাজী বানানের অনুসরণ করিয়া তমিড়কে তামিল বলিয়া থাকি; কিন্তু তাহা ঠিক্ উচ্চারণ নহে। ভাষার দূর প্রসারে, সভ্যতার প্রাচীনত্বে, ধর্ম্ম-চিন্তার নব নব উদ্ভাবনী শক্তিতে, স্থপতি-বিদ্যার সৌষ্ঠব-

রামেশ্বরম্।
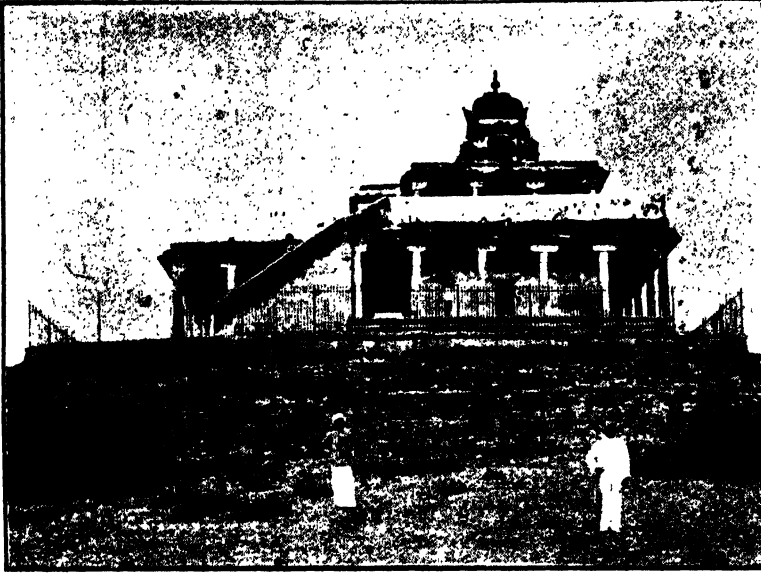
(এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে হনুমান এই স্থান হইতে লঙ্কায় লম্ফ দিয়াছিলেন।)

এই তমিড় দেশকে ভাল-বাসিবার ও শ্রদ্ধা করিবার অনেক বিষয় থাকিলেও এক হিসাবে বঙ্গদেশবাসীর নিকট ইহা যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের সহিত ইঁহাদিগের প্রথম পার্থক্য আমরা অনুভব করি ভাষায়। তদনন্তর আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সামাজিক রীতি-নীতি সমস্তই যেন বিভিন্ন। এদেশে মহিলার মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই অথচ পুরুষের মস্তকে সুদীর্ঘ বেণী আছে। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে উভয়েই বেণীগুচ্ছ পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত করেন। এদেশীয় পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে সাধারণতঃ কচ্ছ নাই; অথচ অনেক মহিলার শাটীর কচ্ছ আছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই হস্তে সুবর্ণ-বলয় ও কর্ণে কর্ণাভরণ আছে, উভয়েরই বদনমণ্ডলে শ্মশ্রু গুম্ফের চিহ্ন-রেখা দেখা যায় না।

এবং আমাদের শস্য-শ্যামলা, নদীতড়াগ-স্রোতস্বিনী-বিধৌতা, কোকিল-কূজন-রতা, কুঞ্জবন-পরিশোভিতা বঙ্গ-সুন্দরীর সুবিমল হাস্যময়ী মূর্ত্তি এখানে নাই। এখানে আছে গিরি-কন্দর-পরিশোভমানা, সফেন-সাগর-তরঙ্গ-শালিনী তাল-তমালাভরণা সুন্দরী প্রকৃতি। বঙ্গের স্বভাব-শোভা মানবকে আত্মহারা করিয়া দেয়। আর এই প্রদেশের জড় প্রকৃতি আপনার উচ্ছ্বাস-বহুল, শান্তি-ছায়া-বিরল বক্ষে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। বঙ্গের স্বভাব-শোভা নীড়ের বিহঙ্গকেও যেন অনন্ত আকাশের উদার বক্ষে ভাসাইয়া দেয়; আর নদীর স্বচ্ছ প্রবাহের উপর দিয়া ভাসাইয়া মানব-মনকে কোন দূর সুদূরে লইয়া যায়। আর দ্রবিড় দেশের প্রকৃতিসুন্দরী আপনার আকুল উচ্ছ্বাসে অনন্তকে ডাকিয়া বলে "ওগো এস, কাছে এস, আমার

কুশলতায় এবং অন্যান্য কোন কোন কারণে তমিড়ের প্রাধান্য সর্ব্বত্র। বর্ত্তমান সময়ে যে তিনজন প্রধান হিন্দু দার্শনিকের কথা সকলেই শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই এই দ্রবিড়বাসী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য এই তমিড়দেশের লোক। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "শ্রীভাষ্য" যে-মনীষীর পুস্তকের উপর প্রধানরূপে নির্ভর করে তাঁহার নাম তমিড়াচার্য্য, তিনি এই দেশেরই লোক। শৈবসিদ্ধান্ত দর্শন, যাহার কথা আমরা পূর্ব্বে বড় জানিতাম না কিন্তু বর্ত্তমানকালে যাহার সমাদর আরম্ভ হইয়াছে তাহা, এই দেশেরই গৌরব সম্পত্তি। এই দেশে মাণিক্যভাষ্যায়, আপ্পায়, সুন্দরয়, সম্বন্ধয় প্রভৃতি বড় বড় ভক্তের জন্ম হইয়াছে এবং ইঁহাদিগের সঙ্গীতাবলী ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকেও মুগ্ধ করিতেছে। এই দেশই সড়গোপাচারী, যমুনাচারী, রামানুজাচারী, দেশিকা-চারী ও মানবল মহামুনি প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তের লীলাস্থান। আরও কত দিক দিয়া ইহার কত যে কীর্ত্তি-স্মৃতি আছে তাহা ভাবিলে আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে। এত যাহার মহিমা-গৌরব তাহাকে আমরা এতদিন উপেক্ষা করিয়াছি বলিয়া লজ্জায় অভিভূত হইয়া যাই।

প্রস্তর-তক্ষণের সুন্দর নমুনা।

নিভৃত নির্জন প্রান্তরে বস, আমার প্রস্তর-বেষ্টিত বালুকাময় বক্ষের বিরহ-উত্তাপ নির্ব্বাণ কর।”

বাহ্য-প্রকৃতির মধ্যে যাহা দেখি, মানব-প্রকৃতির মধ্যেও যেন সেই ছবি সদা জাজ্বল্যমান। বঙ্গ-রমণী যেন উদাস-নয়না, শ্লথ-বেশা বিরহিনী, আর দ্রাবিড় রমণী যেন প্রফুল্ল-নয়না, উৎসব বেশা আনন্দিতা। এবং কর্ম্ম কাতর, বিলাস বিভোর, হাস্য কলরব মুখর বাঙ্গালী পুরুষের পার্শ্বে কর্ম্ম-ক্লান্ত, অর্থ-সর্ব্বস্ব, পরিচ্ছদ-বিরল, গম্ভীর দ্রাবিড় পুরুষের সমাবেশ নিতান্ত বিভিন্নতা-জ্ঞাপক।

নিতান্ত স্থূলভাবে একজন দ্রুতগামী পর্য্যটকের চক্ষে এদেশকে দেখিলেও অতি সহজেই বঙ্গদেশের সহিত এই দেশের পার্থক্য নেত্রগোচর হয়। বাঙ্গালীর চক্ষে এই দেশের মন্দিরের দৃশ্যাবলী বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। এদেশে উচ্চচূড়, আকাশ-চুম্বী মন্দির ত অলিতে গলিতে। এই-সকল মন্দিরের সুন্দর গঠন-প্রণালী, সুবিশাল “গোপুরম্” বা প্রবেশদ্বার, সুবিস্তৃত প্রাকার, সুচিত্রিত প্রাঙ্গন ও সঙ্কীর্ণ “মূলস্থানম্” বা দেবতার পীঠস্থান সমস্তই মনোমুগ্ধকারী। এই-সকল মন্দির শোভা বাহ্য-প্রকৃতির নগ্নতাকে কদর্য্যতর করিয়া যাবতীয় নরনারীকে আপন বিকশিত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিতেছে, আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

সংখ্যায় এই-সকল মন্দির প্রায় অগণন। বারাণসীর অসংখ্যমন্দিরশ্রেণী দেখিয়া দেশবাসীর ধর্ম্ম প্রচেষ্টার কথা ভাবিয়াছি; বৃন্দাবনের সুন্দর সুঠাম মন্দির সকল চিত্তের পুলক সম্পাদন করিয়াছে; এবং এখন এই তমিড় দেশের মন্দির বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগাইয়া দিতেছে। এই দেশের এক-একটা মন্দির যেন এক-একটা দুর্গ বিশেষ। তাঞ্জোরে দেখিলাম যে মন্দিরের এমনই সুন্দর গঠন-প্রণালী যে দিবসের কোন সময়েই মন্দির-ছায়া ভূমিতে পতিত হয় না। মহাদেবের বাহন প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ বসিয়া আছে যেন একটা পর্ব্বত। শ্রীরঙ্গমে দেখিলাম সমগ্র সহরটাই মন্দির-প্রাকারের অভ্যন্তরে। সে যেন আপনার সুবিশাল পক্ষপুটে সকলকে আশ্রয় দিয়াছে।

গোপুরম্।

(উচ্চতম গোপুরম্ বা তোরণ।)

গোপুরম্।

(ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত গোপুরম্ বা তোরণ; তোরণের দ্বারপথের মধ্য দিয়া ভিতরে অসম্পূর্ণ স্তম্ভ দেখা যাইতেছে।)
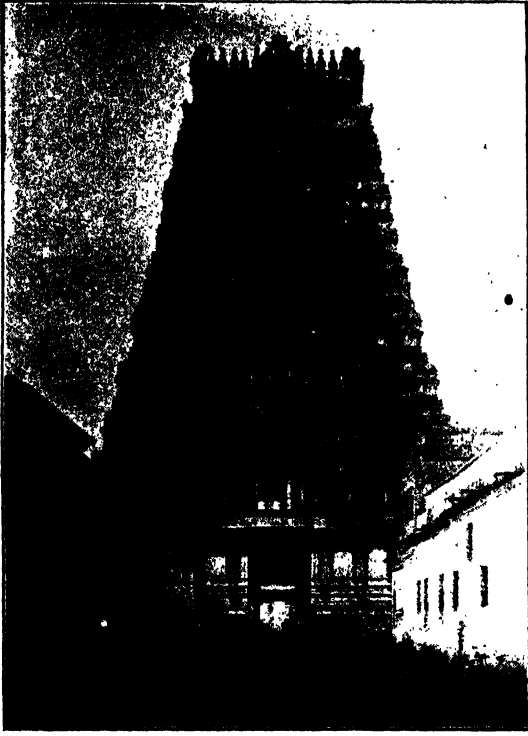
এই মন্দিরের সাতটি প্রাকার,—ইহারই মধ্যে নগরের হাসি ও অশ্রু, জন্ম ও মরণ; ইহারই মধ্যে পুণ্যের অক্ষয়কীর্ত্তি এবং নরকের নাক্কারজনক বীভৎস মূর্ত্তি; দেবতার কোলের মধ্যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সাধুতা ও অসাধুতা পাশাপাশি বসিয়া যেন পরস্পরকে কোলাকুলি করিতেছে।

মন্দির যে কেবলমাত্র নগরের সীমা-বিশিষ্ট কলেবর তাহা নহে। মন্দির এদেশের নাট্যশালা, মন্দির চিত্রশালা, মন্দির স্ত্রীপুরুষের মিলন-স্থান; ইহারই মধ্যে স্নানের তড়াগ, ইহারই মধ্যে বিপণি-শ্রেণীর সমারোহ। যদি তুমি কর্ম্ম-কাতর হইয়া থাক তবে মন্দির-প্রাঙ্গনে যাও, তথায় অগণন জন-প্রবাহ, নরনারীর কলকল্লোল তোমার শরীর মনের ক্লান্তি অপনোদনে সমর্থ হইবে। এই মন্দির-প্রাঙ্গনেই প্রণয়ী-প্রণয়িনীগণ মিলিত হয়, এবং দেবদাসী-আখ্যাতা নর্ত্তকীবৃন্দ প্রতি সায়াহ্নে নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত দর্শকের মন হরণের সুবিধা অন্বেষণ করে।

মাদুরায় দেখিলাম মন্দিরের প্রস্তর-মণ্ডিত প্রাঙ্গন যেন একটী প্রকাণ্ড চিত্রশালা; কেবল চিত্রশালা নহে তাহা যেন সমুদায় হিন্দু পুরাণের প্রস্তর-খোদিত লিপি-মালা। স্তরে স্তরে, পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে সমুদায় পুরাণ যেন দেহধারণ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই পাষাণ-প্রতিমা দেখিবার বস্তু, বুঝি বা বর্ণনার বিষয় নহে। পুরাণের নানা রস-মিশ্রিত কল্পনার সজীব মূর্ত্তিগুলি যেন এখানে আসিয়া পাষাণে জড়ীভূত হইয়া নির্জীবভাবে যুগ-যুগান্তর অবধি দাঁড়াইয়া আছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কত অগণ্য নরনারী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই-সকল দেখিয়াছে, আরও কত সহস্র চক্ষের আনন্দ-দৃষ্টি ভবিষ্যতেও এই-সকল দেখিবে!

আর রামেশ্বর, বাঙ্গালির চির-পরিচিত রামেশ্বর তীর্থ, আপনার মন্দির-দেহকে এক মহিমাময় আচ্ছাদনে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে
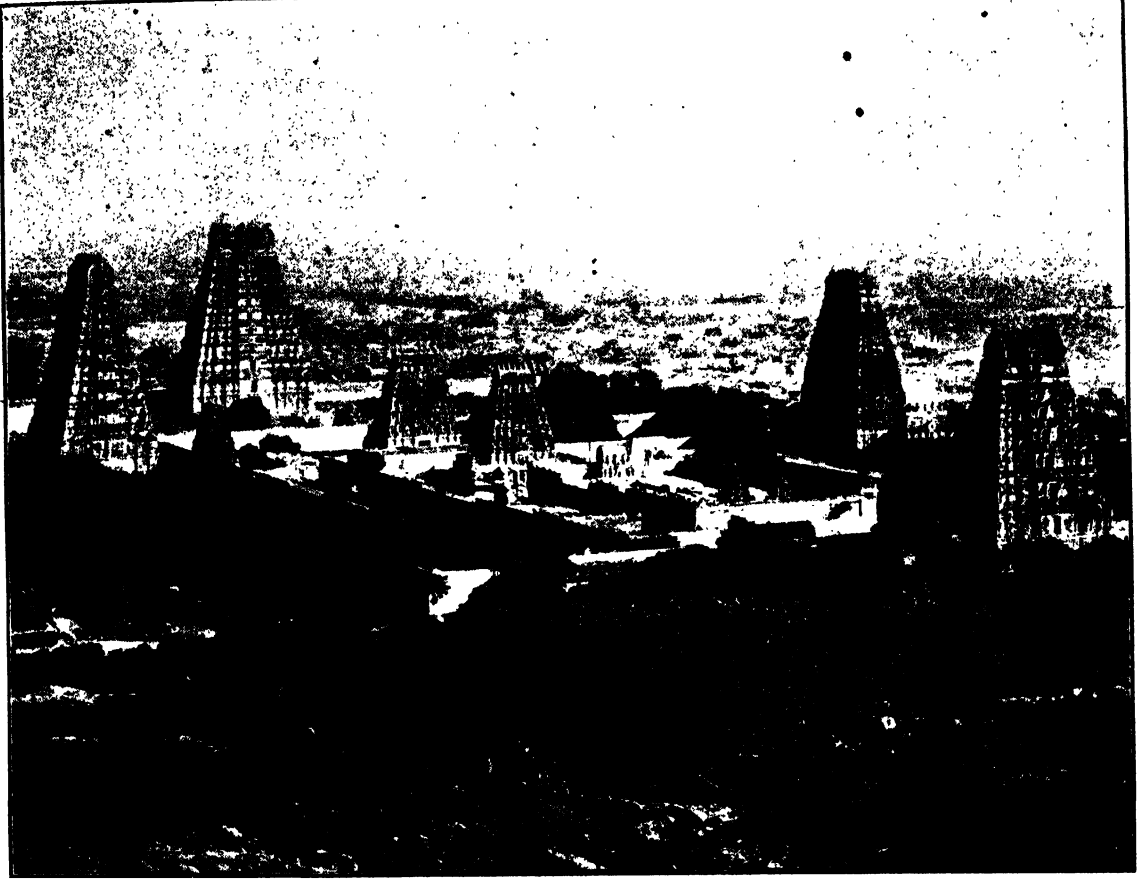
শ্রীরঙ্গম-মন্দির।

(দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম মন্দির ; মন্দির ও মন্দিরের বেষ্টন প্রাচীর-পরম্পরা দ্রষ্টব্য।)

হয় যেন কোন চির অন্ধকার দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করিতেছি। বাল্যকালে ঠাকুর্মার ক্রোড়-পার্শ্বে শয়ন করিয়া দৈত্যপুরীর মধ্যে লুপ্ত-চেতনা শয্যাশায়িতা রাজকন্যার গল্প শুনিতাম, আর মনে মনে সেই অগণ্য প্রকোষ্ঠ এবং তোরণ-বিশিষ্ট সুবৃহৎ পুরীর কথা কল্পনা করিতাম। এই মন্দিরে যাইয়া মনে হইল বুঝি বা সেই-সকল শৈশব-কল্পনা মূর্ত্তিধারণ করিয়া সম্মুখে উদয় হইয়াছে। অগণন যাত্রীদল আলোক ও অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মন্দিরে গতায়াত করিতেছে।

দিবা দ্বিপ্রহরে মাদুরার মন্দিরে যাইয়া দেখি যেন পৃথিবীর সমুদায় অন্ধকার ঘনতর হইয়া সেই মন্দির-মধ্যে স্থিতিশীল অবস্থায় বসিয়া আছে। দুজন বন্ধু হস্তধারণ করিয়া আমাকে অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় দেশে লইয়া গেলেন।

সর্ব্বত্রই দেখিলাম দিবস অপেক্ষা রজনীযোগেই মন্দিরে অধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। দিবসের এই অন্ধকার-বাহুল্যই কি তাহার এক কারণ? সন্ধ্যা-সমাগমে সমুদায় মন্দির আলোক-সজ্জায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। মন্দিরের তোরণে তোরণে আলোকচ্ছটা, দেবতার সর্ব্বাঙ্গে আলোক-মণ্ডন, "মূলস্থানমের" সমীপবর্ত্তী "মণ্ডপম্" বা নাট-মন্দিরে আলোকের বিচ্ছুরণ, সমুদায় প্রাঙ্গন আলোকমালায় ঝলমল করিতে থাকে। এই আলোক-শোভার সহিত সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার, সানাইয়ের সুমিষ্ট স্বর-লহরী, নর্ত্তকীর নৃত্য-কলা ও চঞ্চল অঙ্গ-সঞ্চালন, এবং বাদ্যোদ্যমের মধ্যে
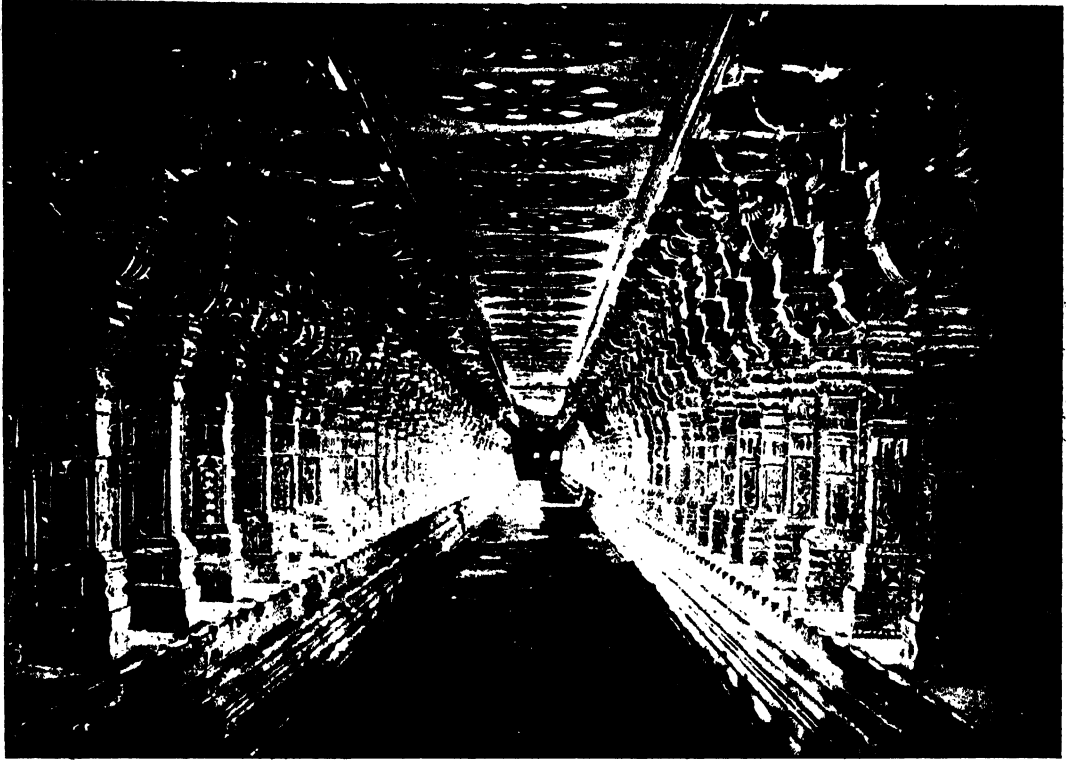
রামেশ্বরম্ মন্দিরের দীর্ঘ পথ (Corridor)।

পুরোহিতের প্রজ্বলিত-কর্পূর-দীপধার হস্তে আবর্তি সমুদায় জনমণ্ডলীকে যেন মোহমুগ্ধ করিয়া দেয়। এই-সকল দৃশ্য সম্ভোগ করিবার জন্য দলে দলে নরনারী মন্দিরে যে আসিবে ইহা আর কি বিচিত্র কথা? সন্ধ্যা সমাগমে প্রকৃতিরাণী যখন অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া আপনার নিভৃতকুঞ্জে গমন করেন, এ দেশের নরনারী তখন মন্দিরে যায়। তাহারা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য যায় কি না, জানি না। তবে এই কথা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, মন্দিরের এই-সকল আকর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি আপন কক্ষে বসিয়া থাকিতে পারে সে হয় বাসনা-ত্যাগী যোগী, আর না হয় বিরহ-কাতর সংসারী।

সন্ধ্যাকালে ইংরাজ ক্লাবে যায়, বাঙ্গালি বৈঠকখানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানে, আর তমিড়্ দেশের নরনারী মন্দিরে যাত্রা করে। এই রমণীর অবরোধ-প্রথা-বর্জ্জিত দেশে, স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী এই স্থানেই এই মন্দিরালোকের ছায়ায়, এই সঙ্গীতলহরীর তরঙ্গ-সঙ্কেতে, নর্ত্তকীর চঞ্চল দৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া হৃদয়ানন্দের উৎসদ্বার খুলিয়া দেয়। তুমি আমি বাঙ্গালী অবরোধ-নিগড়ে প্রতিপালিত হইয়া এই সকল দৃশ্যের নিকট আসিলেই ভ্রূকুঞ্চন করিয়া নিন্দার ছড়া কাটাই; কিন্তু এদেশের ইহাই নিত্য দৃশ্য। বিশেষ বিশেষ দিবসে বিশেষ লোক সমাগম হইলেও প্রত্যহই অল্প বিস্তর এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির প্রাঙ্গন এই জাতির সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থান। এই স্থানই তাহার আনন্দের উৎস, এই স্থানই তাহাদের আরামের স্বচ্ছ ও সুবিমল ছবি, এই স্থানই তাহাদের প্রণয়ের প্রমোদ-কানন, এই স্থানই তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থাপক সভা। এই জাতিকে চিনিতে হইলে এই মন্দির-প্রাঙ্গনে আসিয়াই বসিতে হয়।

এই-সকল মন্দিরাধিপতি দেবতার ঐশ্বর্য্য বিলাসের কথা আর কিই বা বর্ণনা করিব? ইহার সম্পূর্ণ বর্ণনা অসম্ভব। প্রাচীন নরপতিগণের ঐশ্বর্য্য ও পরিচ্ছদ-বাহুল্যের অনেক গল্প শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহাদের বিলাস বিভব ও

বিনায়ক। নটরাজ। মীনাক্ষী।

(মাদুরা-মন্দিরের দেবতা)।

দেখিলাম যে দেবতা মন্দির ত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনা-গৃহে গিয়াছিলেন। ইহাতে অভিমানস্ফীতা গৃহিণী আম্মাল অর্থাৎ দেবী ক্ষুণ্ণা হইয়া স্বগৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে নিশাবসানে স্বামী যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দ্বার খুলিল না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, অনেক আক্ষেপ বিক্ষেপের পর, অনেক অপরাধ স্বীকারের পর দ্বার খুলিল, ঠাকুর ঘরে গেলেন। দর্শকমণ্ডলী হাস্য-কলরবে গগন বিদীর্ণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইরূপে লোকে দেবতাকেও কলুষিত মানবধর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে।

ভোগেচ্ছার অনেক বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তমিড় দেশের দেবতারা সে-সকল বহু-শ্রুত অসম্ভব বর্ণনাকেও পরাজয় করিয়াছেন। রজত স্বর্ণ ত ধূলিমুষ্টির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর! এক এক দেবতার অঙ্গে কত যে মণি মাণিক্য হীরক জহরৎ তাহার সংখ্যা করে কে? দর্শকমণ্ডলী দেখে নিত্য নব বেশ, নিত্য নব অলঙ্কার, নিত্য নব লীলা। আসল দেবতা যিনি তিনি "মূলস্থানমের" বাহিরে আসিতে পারেন না। তাহাতে তাঁহার অপবিত্র হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার এক সহযোগী দ্বিতীয় (Double) আছে। তিনি শঙ্খ ঘণ্টা, তূরী ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাইয়া সুসজ্জিত দোলায় আরোহণ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কত সময় যে এই-সকল দেবতা কত লোকজন, কত হস্তী অশ্ব, কত বাদ্যভাণ্ড লইয়া শোভাযাত্রায় বহির্গত হন তাহা বর্ণনার অতীত। এত হস্তী অশ্ব যাহার, এত সম্পদ ঐশ্বর্য্য যাহার, তাহার প্রতি কি সাধারণ জনমণ্ডলী উদাসীন থাকিতে পারে?

সর্ব্বোপরি এই-সকল "স্বামীর" অর্থাৎ দেবতার লীলার ছলনাই না জানি কতই অদ্ভুত প্রকারের। সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহারও ভোগেচ্ছা আছে এবং তাঁহার ভোগেও মানবীয় দুর্গন্ধ আছে। একস্থানে একদিন

দূর হইতে এই তমিড় জাতিকে যত ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম নিকটে আসিয়া সে-সকল প্রাচীন ধারণা লোপ পাইয়াছে। এখন দেখিতেছি ইহারাও প্রখর-বুদ্ধি-শালী, ইহারাও তীক্ষ্ণ-মেধা-সম্পন্ন। তবে ইহাঁদিগের মেধার সহিত বঙ্গীয় মেধার এক বিশেষ পার্থক্য আছে। ইহাঁদিগের চিন্তা ও কার্য্য সমস্তই যেন বস্তু-তন্ত্রতাময়। অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের সহিত ইহাঁদিগের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। যদিও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে শঙ্কর ও বেদান্তের কথা পথে ঘাটেও, তথাপি বাস্তব জীবনে ব্যবহারিকতারই সম্পূর্ণ প্রভাব। পারমার্থিক তত্ত্বের কথা কেবল বচনে। ঘোর মায়াবাদীও মহা কলরবে ব্যবহারিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি পালনে যত্নবান, অথবা পালন অপেক্ষা প্রদর্শনে অধিক সচেষ্ট। ইহাঁদের নগর-সঙ্কীর্ত্তন দেখিলাম, তাহা তাল মান লয়ের সুসংবদ্ধ ঝঙ্কার; তাহা যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার অঙ্গুলি-সঙ্কেত এবং কণ্ঠধ্বনির লীলা-চাতুর্য্য। আমাদের বাঙ্গলার সঙ্কীর্ত্তনের সেই শিথিল অঙ্গের আবেশ, সেই বিরহকাতর গলদশ্রুধারা, সেই উদ্দাম নৃত্য ইহাঁদের কল্পনারও অতীত। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আপনার মহিমায় গৌরবসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বহিস্তোরণ।

এমন কি এই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার গীতাঞ্জলির অনুবাদ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রের সেই কবিতা-কল্পনা-লতা এই তমিড় জাতির মধ্যে বিশেষ আদর পাইবে না। রসের সফলতা লইয়া ইহাঁরা কাব্যের বিচার করিবেন না। ইহাঁরা বিচার করিবেন ভাষার লীলা-চাতুর্য্য ও বর্ণন-ভঙ্গি। বাঙ্গালী কাব্যে দেখে প্রকাশের অন্তরালবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন ও গোপন রস-সমুদ্র, আর তমিড় দেশীয়েরা দেখেন প্রকাশের প্রোজ্জ্বল মহিমা-ভূষণ।

হিন্দুসমাজে সর্ব্বত্রই জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান। কিন্তু উত্তর ভারতে চতুর্বর্ণেই তাহার প্রধান বিভাগবিধি পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং বঙ্গদেশে অনাচরণীয় জাতি-সকলকেও শূদ্রই বলা হয়। কিন্তু এদেশে তাহারা পঞ্চম জাতির পংক্তিতে নিহিত হইয়াছে। অনাচরণীয়েরা "পঞ্চমা" নামে অভিহিত। তাহারা ভিন্ন জাতি। এই পঞ্চমারা দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। পঞ্চমা মন্দিরে প্রবেশ করিলে ঠাকুর অশুদ্ধ হইয়া যাইবেন। অতএব তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু সকলই বাহিরে করিতে হয়। তাহার আবার পূজা কি? সে যদি ইচ্ছা করে তবে সে বহিঃ-প্রাঙ্গনের ক্ষুদ্র বাক্সে তাহার পূজার অর্থ নিক্ষেপ করিয়া যাইতে পারে। তাম্রখণ্ড বা রজতখণ্ডের স্পর্শ-দোষ নাই, দেবতা তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন। পঞ্চমা ব্রাহ্মণকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহাতে ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ হইবেন।

এই দেশে জাতিভেদের প্রভাব সাম্যবাদী খ্রীষ্টানকেও স্বীকার করিতে হয়। যখন টিনেভেলী গিয়াছিলাম তখন, শুনিলাম গির্জায় বসিবার স্থান লইয়া সেখানকার আদালতে "সানার" জাতীয় খ্রীষ্টানদিগের সহিত উচ্চ জাতীয় খ্রীষ্টানদিগের মকদ্দমা হইতেছে। ব্রাহ্মণের সম্মুখে "সানার" আসন গ্রহণ করিবে, উহা অসহ্য। হউক না সে খ্রীষ্টান, তাহা বলিয়া কি সানারের সহিত সমপংক্তিতে ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান বসিতে পারে? কন্যাকুমারীর নিকট

শিবমন্দিরের পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে যাত্রীনিবাস ও মধ্যস্থলে জলটুঙ্গি।
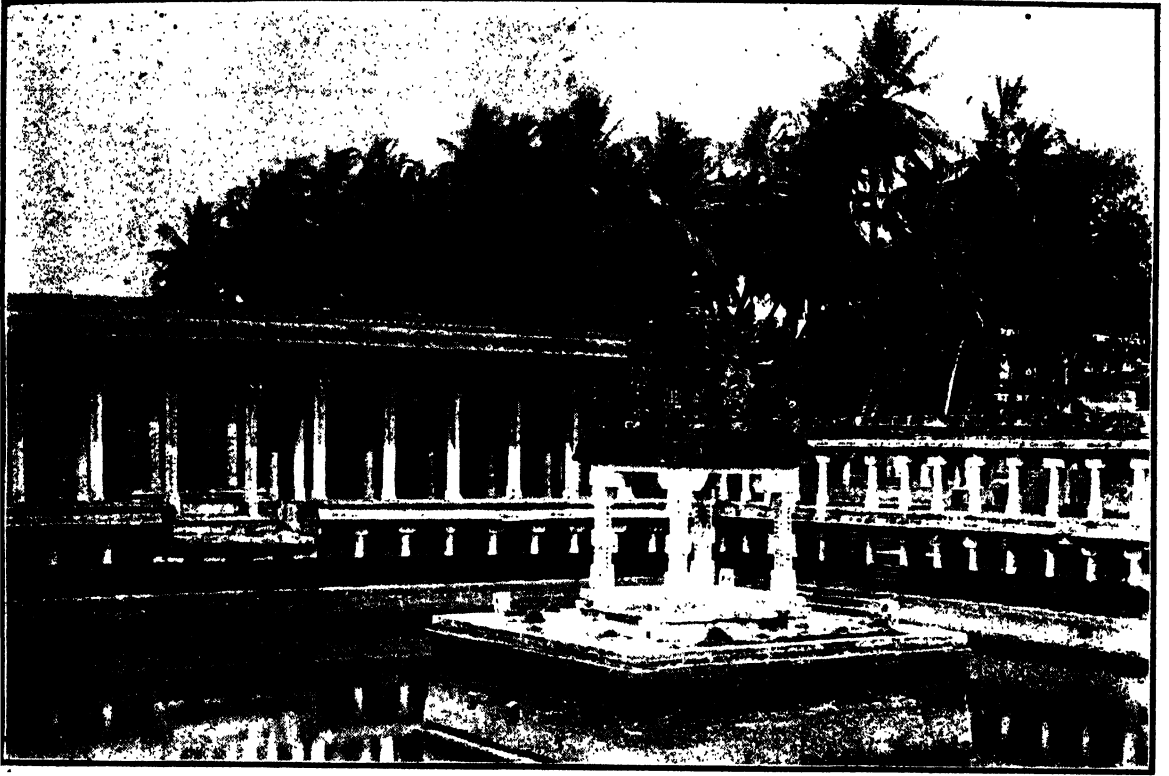
াগ্রেরকইলে দেখিলাম এক ব্রাহ্মণবংশীয় খ্রীষ্টানের ব্রাহ্মণীর র্ভজাত পুত্র, শূদ্রাণীর গর্ভজাত সন্তানের সহিত আহার যবহার করেন না। হউন তাঁহাদের পিতা এক, মাতা ' ভিন্ন, পিতা শূদ্রাণী বিবাহ করিলেন তাহাতে কি? াহ্মণ বিবাহ করিলেই কি শূদ্রাণী ব্রাহ্মণীর সমতুল্য হইবে? ংরাজ পাদরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাঁহারা াধ্য হইয়া এইরূপ জাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। কননা এই প্রথার অন্যথা করিলে এদেশে নাকি খ্রীষ্টানি কিবে না। একদিন এক "পাটারি" পারেয়াপল্লীতে যাইয়া দখিলাম যে সেই ক্ষুদ্র অপরিষ্কার পল্লীর মধ্যেও খ্রীষ্টধর্ম্ম াচারের আয়োজন আছে। সপ্তাহে দুই দিবস সাহেবরা থায় প্রচার করিতে শুভাগমন করেন, একজন ইংরাজি-থন-পটু পারেয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে খ্রীষ্টান ন না। সে বলিল, I no Christian, Sir; Chris-an no good. Brahmin Christian not allow ariah in the Church. (আমি খ্রীষ্টান নই, মহাশয়। খ্রীষ্টান হইয়া কোন লাভ নাই। ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টানেরা পারেয়াকে গির্জ্জার ভিতর যাইতে দেয় না।) সে তাহার এই অদ্ভুত ইংরাজিতে মাদ্রাজের খ্রীষ্ট সমাজের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিল। এই পঞ্চমাজাতির কথা বর্ণনা করিবার স্থান এ প্রবন্ধে হইবে না। ইহাদিগের অবস্থা স্মরণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। হায় হায়, এই সকল হতভাগ্য জীব মনুষ্যদেহে জন্ম গ্রহণ না করিয়া কুকুর বিড়াল রূপে জন্মিলে বুঝিবা অধিকতর আদর ও সম্মান পাইত!

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বপ্রধান। হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়ও সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিরাজমান; কিন্তু বোধ হয় মালাবার ও তমিড়দেশের ন্যায় কোন দেশেই ইহার নিগড় এত কঠোর ও নির্ম্মম নহে। এ প্রবন্ধে মালাবারের কোন কথা লিখিব না, কেবল তমিড় ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিব। এই তমিড় ব্রাহ্মণের দুই শ্রেণী—প্রথম "আইয়ার", দ্বিতীয় "আইয়েঙ্গার"। বঙ্গদেশের বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় এই

দুইটি কেবল নামে মাত্র নহে। এই দুই নামের সহিত সমুদায় সমাজের আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কিত। এই দুই নামধারী ব্যক্তির মধ্যে সামান্য সামান্য বিষয়েও এত প্রভেদ যে বাঙ্গলার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসুতেও তাহার এক-চতুর্থাংশ প্রভেদ নাই।

আইয়ার নাম শুনিলেই বুঝিতে হইবে তিনি অদ্বৈতবাদী ও শঙ্করশিষ্য এবং শিবোপাসক। আইয়েঙ্গার হইলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, রামানুজ-শিষ্য এবং বিষ্ণুর উপাসক। উভয়ের নামেরই যে কেবল পার্থক্য তাহা নহে। আচার-ব্যবহারে, সামাজিক রীতি-নীতিতে, আহার্য্য বিষয়ের রন্ধন-প্রণালীতে, পরিচ্ছদ পরিধানের বিধানে, ললাটে তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রকৃতিতে ইঁহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কোন আইয়ার-ভবনে আইয়েঙ্গারের অন্ন-গ্রহণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন গ্রহণ অপেক্ষা শতগুণে দূষণীয়। একদিন পথে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম এক শৈব দেবতার—সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কার্ত্তিকের মিছিল বাহির হইয়াছে। মহা সমারোহ, বাদ্য-ভাণ্ডের প্রবল নিনাদে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, প্রকাণ্ড চতুর্দ্দোলায় উপবেশন করিয়া স্বর্ণময় দেবতা হাস্যমুখে শোভা-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে অগণিত জনশ্রেণী সলিল-প্রবাহের ন্যায় খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন গৃহের সম্মুখে ঠাকুর গৃহস্থের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, কর্পূর প্রজ্বলিত হইতেছে ও ঝুনা নারিকেল চূর্ণিত হইতেছে। মহাসমারোহ। চারিদিকে মহা হুলস্থূল। সকলেই আগ্রহ-দৃষ্টিতে দেখিতেছে। কিন্তু হরি, হরি, ওকি, আমার পার্শ্ববর্ত্তী সেই আইয়েঙ্গার পথিক কোথায় যাইলেন? তিনি সম্মুখের এক বাটীতে প্রবেশ করিয়া পথের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তিনি বৈষ্ণব, শৈব মূর্ত্তি দর্শন করিবেন? ইহাও কি সম্ভব?

এই আইয়েঙ্গার সম্প্রদায় আবার দুই দলে বিভক্ত। শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার "শ্রীভাষ্যে" যে প্রপত্তি বা আত্ম-সমর্পণের কথা বলিয়াছেন তাহারই ব্যাখ্যা লইয়া এই উভয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এক দলের নাম "তেঙ্গেলে", ও অপর দলের নাম "ভাড়গেলে"। তেঙ্গেলে সম্প্রদায়ের নেতা মানবল মহামুনি, আর ভাড়গেলে সম্প্রদায়ের নেতা বেদান্ত দেশিকাচারী। মহামুনি পুস্তক লিখিলেন তমিড় ভাষায়, আর দেশিকাচারী পুস্তক লিখিলেন প্রধানতঃ সংস্কৃতে। দুই দলের মধ্যে এখন মধ্যে মধ্যে এরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় যে আদালতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়। বিবাদের কারণ মিছিলের মধ্যে তেঙ্গেলে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, না ভাড়গেলে প্রথম স্থান পাইবে। আইয়ার ও আইয়েঙ্গারের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন সাধিত হইতে পারিলেও ভাড়গেলে জামাতা শ্বশুরের সহিত এক পংক্তিতে অন্নগ্রহণে অনুমতি পাইবে না। সেন্সসরিপোর্টে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিলাম। এক আইয়েঙ্গার-পরিবারের বধূর অনুপস্থিতিকালে তাহার মাতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বেহানের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন তিনি গ্রহণ করিলেন না, স্বপাকে আহার করিলেন। মাতা ও শ্বশ্রূ উভয়েই কিন্তু সেই কন্যা বা বধূর হস্তের অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর একটি ঘটনা শুনিলাম, এক ভাড়গেলে-গৃহের তেঙ্গেলে জামাতা শ্বশুরের সহিত আহার করিতে বসিলেন। কিন্তু এক পংক্তিতে নহে অথবা উভয়ের চক্ষুর সমক্ষে নহে। একই কক্ষে উভয়ে উভয়ের দিকে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট ভোজন-ক্রিয়া দেখাইবেন না, তাহাতে দৃষ্টি-দোষ হইবে। ইত্যাদি প্রকারে কত সামান্য সামান্য বিষয়েও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কত পার্থক্য আছে তাহা বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব।

সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে থাকিলেও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষও অপ্রকট নহে। বিশেষতঃ "ভেড্ডালা" জাতির সহিত ব্রাহ্মণের যেন অহি-নকুল সম্বন্ধ। বঙ্গদেশের প্রাচীনকালের শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদের ন্যায় ইঁহারা পরস্পরের সহিত বিশেষ পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন। এই বিদ্বেষ-বহ্নি আফিসে আদালতে, সভা সমিতিতে, রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলন-আলোচনা-ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই বিদ্যমান। কোন কোন রাজপুরুষও এই জাতীয় ঈর্ষা অবলম্বন করিয়া শাসন-প্রণালীর অক্ষ-ক্রীড়া করিয়া যশস্বী হইতেছেন। এমন কি অল্প কয়েক দিবস পূর্ব্বে

"ইশলিংটন কমিশনে" সাক্ষ্যদানের সময় কোন রাজপুরুষ অম্লান বদনে বলিলেন যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণেরাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি-সকল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অতএব এই প্রথা দূষণীয়। কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু এই একটা কথা লইয়া দেশময় সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইয়াছে। রিজলি সাহেব বাঙ্গালাদেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ বৈদ্যে যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন। আর এ দেশে বেনসন্ সাহেব ব্রাহ্মণে ও "ভেড্ডালায়" কলহ বাধাইয়াছেন।

বাস্তবিক "ভেড্ডালা" জাতিকে বাদ দিলে তমিড় সমাজের সকলই প্রায় বাহিরে থাকিয়া যায়। এই ভেড্ডালা কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভূমি-কর্ষণকারী অর্থাৎ চাষী। ইহারই ফলিতার্থ ভবিষ্যতে হইয়াছে ভূম্যধিকারী; সংস্কৃত আর্য্য শব্দেরও অর্থ তাহাই। এই ভেড্ডালাগণই এই দেশের আদিম অধিবাসী। ব্রাহ্মণগণ পরিশেষে আসিয়া উত্তর ভারতের সভ্যতা এই দেশে প্রচার করিয়াছেন। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে ভেড্ডালা জাতির এই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ কেবলমাত্র ধর্ম্ম-বিদ্বেষ-প্রসূত নহে, ইহা বহুল পরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক বিদ্বেষ, বিজেতার প্রতি বিজিতের বিদ্বেষ। এখন সেই বিদ্বেষের কারণ অন্তর্হিত হইলেও এই জাতি-গত বিদ্বেষাগ্নি অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহাঁরা বংশ-পরম্পরাক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে এই বিদ্বেষভাব পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছেন।

এই ভেড্ডালা জাতি হিসাবমত এক জাতি হইলেও ৮০০ শত শাখায় বিভক্ত। কোন কোন বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে আর্য্য-প্রভাব বিস্তার লাভ করিলেও ইহারা যথাসাধ্য আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে—যেমন বিবাহ-প্রথা। আর্য্যসভ্যতার প্রথম কথা "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী", অতএব যথাসম্ভব শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণের গৃহে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা অবিবাহিতা থাকিতে পারে না। এদেশের এ প্রথা বাঙ্গালাদেশেরই মত। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বিবাহ-সংস্কার-সভায় কোন ইংরাজ মহিলা প্রচারিকা এই রাজধানীতে আসিয়া এক প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অনেক গণ্য মান্য বরেণ্য ও বদান্য ব্রাহ্মণ-কুল-গৌরবগণ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রচার করেন যে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তবে তাঁহারা তাহাদিগের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। দুইমাসের মধ্যেই দেখা গেল কোন কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ খ্যাত-নামা প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ-কারী মহানুভব নেতা দশম বা একাদশ-বর্ষীয়া কুমারীর বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সমাজের এই অবস্থা। কিন্তু কোন "ভেড্ডালা"-গৃহে বিংশতি-বৎসরের অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ-আয়োজন নিতান্ত বিরল ঘটনা নহে। এই সমাজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কন্যার বিবাহদান বিধি। কেবল ভেড্ডালা নহে, চেট্টি বা শ্রেষ্ঠী (বৈশ্য) সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন পরিবার ব্রাহ্মণের অনুকরণে পুত্রকন্যার অল্প বয়সেই বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই ভেড্ডালা সম্প্রদায়ের মধ্যে "মুদলেয়ার" ও "পিলে" সর্ব্ব-প্রধান। মুদলেয়ার শব্দের অর্থ প্রথম, এবং পিলের অর্থ পুত্র। এই দুই নাম অবলম্বন করিয়া ইহারা আপনাদিগের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। ভেড্ডালা সম্প্রদায় অনেকটা আমাদের বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মত। ইঁহারা "ন দিবা ন রাত্রি" সন্ধ্যার মত, না স্বর্গবাসী না ভূতলবাসী ত্রিশঙ্কুর মত, আপনাকে লইয়াই আপনি মহান। উপনিষদে ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?" (সেই ঐশ্বর্য্যশালী কোথায় বাস করেন)। উত্তর হইল, "স্বে মহিম্নি"। (আপনার মহিমাতে)। ইহারাও সেইরূপ। ব্রাহ্মণও নহেন শূদ্রও নহেন, অথচ ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছায়া আছে এবং তথা-কথিত শূদ্রেরও ছাঁচ আছে। ইহাদিগের জাতি-পর্য্যায় নির্ণীত নাই হইল? ইহারা বুদ্ধিমান, ইহারা তেজস্বী, এবং সমাজে অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই ভেড্ডালা জাতির বর্ত্তমান কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা সমগ্র তমিড়, কেবল তমিড় নহে, সমগ্র দ্রাবিড় জাতির পুরাতত্ত্বের আলোচনায় আসিয়া উপস্থিত হই। ইহারা আর্য্য না অনার্য্য? কোন জাতি আদি

সভ্যজাতি? ইহাদিগের পুরাণ কথা কতদূর জানা যায়? এবং ইহাদিগের সহিত ভারতের আর্য্য জাতির কি সম্বন্ধ? এই-সকল কথা বর্ত্তমান সময়ে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববিদ্ ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা নানাভাবে আলোচিত হইতেছে। এই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে এইস্থলে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যাঁহারা এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা Tamil Antiquary নামক পুস্তক-সকল এবং Taylor, Heckel, Keane, Bishop Caldwell, Vinson, Dr. Pope এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী যেন পাঠ করেন।

তমিড়-পুরাতত্ত্ব-আলোচনা-সমিতির সভ্যেরা (Members of Tamilian Archaeological Society) বলেন যে ভারতভূমির সভ্যতার আদি কেন্দ্রস্থান মলয় পর্ব্বতের দক্ষিণভাগ, অর্থাৎ বর্ত্তমান তমিড়দেশের দক্ষিণ অংশ। পুরাণ ও বাইবেলে বর্ণিত মহা-জল-প্লাবনের পর যে মানব পর্ব্বতগাত্রে যাইয়া অবরোহণ করেন, তিনিই মনু, আর সেই পর্ব্বত এই মলয় পর্ব্বত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত। এই পর্ব্বত তখন দেবতাগণের অধিষ্ঠান-ভূমিতে পরিণত হয়। ক্রমে এই পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে সভ্যতা বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। এই পর্ব্বতের উত্তর দিকেও ইহাদিগের এক শাখা যাইয়া সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও রাজত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতেও লোকজন আসিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সন্ধি সখ্যতা স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয় এবং পরস্পরের ভাবের ও সভ্যতার আদান প্রদান হইতে থাকে। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। এবং কালবশে এবং কতক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ইহারা পরস্পরের একত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। শেষে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে গতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় উত্তরের তমিড়জাতি দক্ষিণের তমিড় ভ্রাতার কথা ভুলিয়া গেল। কেবল এক স্মৃতি থাকিল যে দক্ষিণদিকে এক দেশ ও এক রাজত্ব আছে এবং ধর্ম্মরাজ যম সে দেশের এক পরম প্রতাপশালী রাজা।

এই দক্ষিণ দেশের তমিড় রাজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল "কুমরী", বর্ত্তমানের কন্যাকুমারী বা Cape Comorin. এই কুমরী রাজধানীর দক্ষিণে বর্ত্তমান সময়ে সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ-মালার স-ফেন মর্ম্মোচ্ছাস দেখিতে পাই, কিন্তু তখন সেখানে ভূমি ছিল। এই স্থান হইতে অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা পর্য্যন্ত সমুদায় এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড ছিল। এই কুমরী ছিল তাহার প্রথম রাজধানী। ক্রমে আধুনিক সময়ে অন্যান্য স্থানেও তাহার রাজধানী হইয়াছে। যথা মাদুরা ও তঞ্জোর। এই ভূমিখণ্ডের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে Tamil Antiquarian Vol. I হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া ইহাঁদিগের মত দেখাইতেছি :—

It (tradition) speaks of a large continent which once existed contiguous to Southern India and which was submerged by the ocean, during a certain inundation, at a time not far removed from human recollection. According to this the submerged land was bounded by the river *Pattuli* and the mount *Kumari* and consisted of 49 districts to the south of the present Cape Comorin, covering an area of 700 yojans. * * * * * * * The author of Silap, "The Epic of the Anklet," which belongs to the 2nd Century A.D. refers to this tradition in Canto XI, lines 19-20, which runs thus:—"পট্‌টুলী ইয়াট্টুড়ণ পণমলৈ ইয়াড়ুকত্তুক্ কুমীরকোড়ু কেড়ুক্কটল কোল্ল" (*i.e.*, the price of land originally situated between the river *Pattuli* and mount *Kumari* was swallowed up by the ocean).

এইভাবে ইহাঁদের প্রাচীন সহিত্য হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া হিন্দু পুরাণাদির সহিত মিলাইয়া এই তমিড়-প্রত্নতত্ত্ব-আলোচনাকারী বুধমণ্ডলী বলিতেছেন যে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হয়। পরলোকগত পণ্ডিত অধ্যাপক সুন্দরম্ পিল্লে বলিতেছেন,

"The attempt to find the element of Hindu Civilisation by the study of Sanskrit in Upper India is to begin the problem at its worst and most complicated point * * * * * . The scientific historian of India then ought to begin his study with the basin of the Krishna, the Caveri and the Vaigai rather than with the Gangetic plains as it has been now long, too long, the fashion."

এই প্রকার বহুতর আলোচনায় ইহাঁরা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে উত্তর ভারতের সভ্যতা অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা প্রাচীনতর এবং উত্তর ভারত প্রধানতঃ

দক্ষিণ দেশের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই আপনাদিগের মনমত পুরাণ ইতিহাস গঠনে প্রয়াসী হইয়াছেন। এমন কি রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত উত্তর ভারতের ঘটনাবলীও তাঁহারা এই তমিড়ে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার স্থান এই প্রবন্ধে হইবে না। কিন্তু এই আলোচনা করিতে পারিলে পাঠকবর্গকে অনেক আশ্চর্য্য কথা জানাইতে পারিতাম। ইহাঁদিগের আলোচনা-সকল পাঠ করিয়া এক এক সময় মনে হয় বুঝিবা আরব্য উপন্যাসের ন্যায় কোন তমিড় উপন্যাস পাঠ করিতেছি। কিন্তু ইহা উপন্যাস নহে, ইহা প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা। সত্যভাবে এই-সকল তত্ত্ব আলোচনা করিতে সক্ষম হইলে কালে ইতিহাসের অনেক অন্ধকার কক্ষ আলোকমালায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এবং হয়ত বা ভারতের এই দুই প্রাচীন অধিবাসীর মধ্যে সানুরাগ ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইয়া ভগবানের প্রেমরাজ্যের বিস্তার হইবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চির-যৌবন

শ্লথ হবে তনু মোর, দৃষ্টি হবে ক্ষীণ,
দেহের লাবণ্যধারা হয়ে যাবে লীন,
নিবিড় নিকষ-কৃষ্ণ কুন্তল আমার
হবে জানি কোন দিন চূর্ণিত তুষার,
পরাণের তরুণিমা ঘুচিবে না কভু;
হে অমর প্রিয়তম তুমি যেথা প্রভু!

দীপ্ত নয়নের আলো লুপ্ত হয়ে যাবে,
সঙ্গীতের অধিকার শ্রবণ হারাবে,
কণ্ঠে আসিবে না গান, যাবে স্পর্শ-সুখ,
দিবে মনোরথ ভাঙি চরণ বিমুখ!
পরাণের তরুণিমা ঘুচিবে না কভু;
হে অমর প্রিয়তম তুমি যেথা প্রভু!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পঞ্চশস্য

জগতের জাগরণ (The Survey, U. S. A.):—

সমগ্র জগতের আধুনিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেছে; এ জাগরণের উদ্দেশ্য নিজেদেরকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। যেখানে যত রকম মিথ্যা, অন্যায়, ক্ষুদ্রতা জমা হইয়া আছে, তাহার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের দাবি উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে; ইহার ফলে ধর্ম্মশাস্ত্রের দাসত্ব, সমাজের দাসত্ব, রাষ্ট্রীয় দাসত্ব, সংস্কারের দাসত্ব, কোনো-কিছুরই দাসত্ব কেহই আর মানিতে চাহিতেছে না; আত্মাকে সকল বন্ধন-নির্ম্মুক্ত উদার আত্মবোধের উপরই স্থাপন করিবার প্রয়াস চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলস্বরূপ জগতের ইতিহাসে বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। আমেরিকার উপনিবেশীরা অধিকাংশই ইংলণ্ডবাসীর বংশধর হইয়াও ইংলণ্ডবাসীর অন্যায় অবিচার মাথা পাতিয়া সহিতে পারিল না, নিজেরা স্বতন্ত্র স্বাধীন হইয়া গেল। ফ্রান্সে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণসাধারণ উদ্যত হইয়া নিজেদের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিল। ইহা বহুকালের পুরাতন কথা। অধুনা জগতের সর্ব্বত্র তাহারই জের চলিয়াছে। মেক্সিকো স্পেনের অধীন ছিল, তাহারা অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করিতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের অসভ্য জাতিরা স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রনীতির বিশেষত্বের ফলে তাহাদের স্বাধীনতা লাভ নিকট হইয়া আসিতেছে। পোর্ত্তুগালের জনসাধারণ অত্যাচারী রাজাকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা দেশশাসনভার লইল, এ ত সেদিনকার কথা। সম্প্রতি পারস্য তাহার শাহকে বিতাড়িত করিয়া গণতন্ত্র-শাসন-প্রণালী স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে; চীন বিদেশী মাঞ্চু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বাধীন হইয়া গণতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তুর্কী মুসলমান সমাজের মহামহিমান্বিত খলিফা সুলতানকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া গৃহসংস্কারে মন দিয়াছে; এবং তুর্কী যে য়ুরোপে বিজেতা, য়ুরোপের মাটিতে তাহার কোনো স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার নাই, তাহাই স্মরণ করিয়া গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, সার্ভিয়া প্রভৃতি দেশ নিজেদের অতীত অপমানের প্রতিকার করিবার জন্য বিজেতা জাতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। যবদ্বীপ ডচ্ অধীনতা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না; কিউবা দ্বীপ স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্যোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিগ্রো জাতি, যাহারা আবহমানকাল পরের দাসত্ব গোলামী করিয়াই আসিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা গোলামের জাতি বলিয়াই জানি, যাহাদের নিজের দেশ বলিয়া কোনো দেশ নাই তাহারাও আর পরের পায়ে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না। শ্বেতাঙ্গেরা তাহাদিগকে পশুর মতো ব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে; তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন সদাশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গেরাই তাহাদের ওকালতি করিয়া আসিয়াছেন; এখন তাহারা নিজের নেতার অধীনে সমবেত চেষ্টা করিতে শিখিতেছে; প্রবলের দয়ার দান যে অপমান তাহা তাহারা বুঝিয়াছে; স্ব-চেষ্টায় কর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তি এতদিন দাসত্বের চাপে অসাড় হইয়া ছিল, এখন তাহা আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র খুঁজিতেছে। আমেরিকার নিগ্রোদের নেতা বুকার ওয়াশিংটন শিক্ষায় চারিত্রে কর্ম্মকুশলতায় বিশ্বমানবের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানব। নিগ্রোরা নিজে-দের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় সতর কোটি টাকা মূল্যের ৩৫

হাজার ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়া ৪০ লক্ষ লোককে একতাসূত্রে গ্রথিত করিতে পারিয়াছে। তাহারা বৎসরে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে। নিগ্রোদের তত্ত্বাবধানে ও নিজেদের খরচে চালিত ২০০ স্কুল কলেজ ৪০ বৎসরে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। নিগ্রোদের ভূসম্পত্তি করার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; যাহাতে তাহারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারে তাহার জন্য আইন করিবারও চেষ্টা চলিতেছে। এই-সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৮৯০ সালে নিগ্রোদের চাষের খামার ছিল ১,২০,৭৮৩; ১৯০০ সালে হইয়াছিল ১,৮৭,৭৯৯; ১৯১০ সালে হইয়াছিল ২,৩০,০০০। এই সমস্ত নিগ্রোসম্পত্তির মূল্য ৯০ কোটি টাকা বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে নিগ্রোসম্পত্তির মোট মূল্য ঐ অনুপাতে ১৬১ কোটি টাকা ধরা যাইতে পারে। এই-সমস্ত আর্থিক উন্নতি ছাড়াও তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও কম হয় নাই। ডানবার ও ব্রেথওয়েটের কবিতা, মিলার ও গ্রিমকের সন্দর্ভ, রোজামণ্ড জনসনের সঙ্গীত, ট্যানারের চিত্র যে-জাতির সম্পত্তি তাহারা নিতান্ত নগণ্য নহে;—এক্ষণে ঐ সমস্ত বিষয় বিশ্বমানবের উপভোগের সামগ্রী ও উন্নতির সহায় হইয়াছে। ইহারা আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে পর-মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজেদেরকে ত উন্নত করিতে, প্রমুক্ত স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিতেছেই, সঙ্গে সঙ্গে জগতের স্বাধীনতার অভিযানে অগ্রযায়ী হইয়া স্ত্রীস্বাধীনতা, সার্ব্বভৌম শান্তি, গণতন্ত্র শাসন, সম্পত্তির সাম্য এবং বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

ভারতবর্ষে পুলিস-জুলুম (East and West):—

বোম্বাইয়ের পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনেরাল এডমণ্ড কক্স বলেন যে পুলিশ বেচারার নামে যত কলঙ্ক রটে বাস্তবিক বেচারা তত দোষী নহে। আসামীর দোষ কবুল করাইবার জন্য পুলিশ কখনো কখনো যে জুলুম না করে এমন নহে, তবে তাহা কদাচিৎ, কারণ আসামীকে দোষ কবুল করাইয়া তাহার কোনো লাভ নাই। পেনাল কোড ও ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড পুলিশ-জুলুমের গোড়া একেবারে মারিয়া রাখিয়াছে—পুলিশের কাছে একরার সাক্ষ্য বলিয়াই গ্রাহ্য নহে; যে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ অফিসার নহেন তাঁহার নিকটের একরারও যখন জজের কাছে আসামী অস্বীকার করিলে সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য প্রায়ই হয় না, তখন পূর্ব্বাহ্ণে একরার করাইয়া পুলিসের লাভ কি? অনেক সময় আসামী পাপকার্য্য করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির তাড়নায় ছুটাছুটি আসিয়া পুলিসের কাছে একরার করিয়া ফেলে; পরে মগজ ঠাণ্ডা হইলে কথা পাল্টাইবার জন্য পুলিশের ঘাড়ে জুলুমের দোষ চাপাইয়া নিজে সাফাই হইতে চাহে। ভারতের সহকারী সচিব মণ্টাগু প্রস্তাব করিয়াছেন যে কোনো আসামীকে পুলিশ হেফাজাত হইতে অন্তত একদিন তফাতে না রাখিয়া কোনো একরার লিপিবদ্ধ করা হইবে না; একরারের পর আর তাহাকে পুলিস-হেফাজাতে রাখা হইবে না; হাজতে পুলিশের প্রবেশের অধিকার থাকিবে না। কিন্তু এইরূপ কার্য্য আরম্ভ হইলে পুলিসের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া যাইবে, এবং যাহাদের হাতে দেশের শান্তিরক্ষার ভার তাহাদের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা না থাকিলে দেশে শান্তিরক্ষা করাই দায় হইয়া উঠিবে। ইহার একমাত্র প্রতিকার বিচারের পূর্ব্বে একরার-নামা লেখা একেবারে তুলিয়া দেওয়া! বিচারের সময় একরার করিল ভালো, নয়ত অন্য বলবৎ প্রমাণ না থাকিলে আসামী খালাস পাইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে তখন পুলিশও আর একরারের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে না, অন্য প্রমাণ সংগ্রহে বুদ্ধি নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইবে। অবশ্য এরূপ হইলে আইন লইয়া উকিলদের যাদু খেলা অনেক পরিমাণে ত্যাগ করা আবশ্যক হইবে। যাহাই হোক পুলিশের কলঙ্ক ক্ষালনের উপর ইংরেজ-শক্তির সুনাম ও স্থায়িত্ব যখন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, তখন যাহা হয় একটা হেস্ত-নেস্ত সংস্কার ও মীমাংসা শীঘ্রই করিয়া ফেলা ভালো।

সামাজিক কল্যাণসাধনে আর্টের হাত (East and West):—

জীবনের যেরূপ অবস্থা হইলে মানুষকে প্রতিবেশীর সহিত বিশেষ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে সক্ষম করে তাহাই সামাজিক কল্যাণ। বন্ধুত্ব বা সহযোগিতা মানে শুধু নিজে পবিত্র ও উন্নত হইয়া সুকুমার ভাবের অনুভূতি সম্ভোগ নহে, পরন্তু যাহার সঙ্গে মিলন ঘটে তাহাকেই ভূমানন্দ দান করার নাম বন্ধুত্ব। এই আনন্দ স্বাস্থ্য ও চারিত্রের উপর নির্ভর করে। অতএব সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক সন্নীতি একই কথা। আর্ট মানুষের এই সন্নীতিপরায়ণতাকে উদ্বোধিত করে, বর্দ্ধিত করে, পালন করে। যাহা সুন্দর তাহা মনকে উন্নত করে, পবিত্র করে, মধুর করে, আনন্দিত করে। এই জন্য ললিত কলা ব্যবহারিক শিল্পে পর্য্যন্ত আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নরনারী সুন্দর সুকুমার জিনিসপত্র লইয়া ঘর করিতে গিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে আনন্দ সঞ্চয় করিতে থাকে। ছিটের কাপড়, ঘটী বাটি, ডালা টুকরি, গৃহস্থালীর সমস্ত উপকরণের মধ্যেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টা বর্ত্তমান—এবং এই-সমস্ত তুচ্ছতম জিনিসেও যদি এতটুকু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টা বর্ত্তমান থাকে তবে তাহা শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের সুন্দর চিত্র বা সুন্দর সুগন্ধ ফুলের অপেক্ষা কম রসায়ন নহে। মেরী ও যশোদার মাতৃমূর্ত্তি রমণীকে মাতৃত্বের আনন্দ শিক্ষা দেয়; নিউ ইয়র্ক ও প্যারীর স্বাধীনতা-মূর্ত্তি লোককে স্বাধীনতার জন্য সত্যের জন্য উদ্বোধিত করে। এইরূপে আর্ট মানুষের সুপ্ত সুভাব উদ্বোধিত করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে চালিত করিয়া তাহার আত্মত্যাগ সহজ করিয়া আনে, এবং তাহাতে করিয়া সে চরিত্রে ধর্ম্মে উন্নত হইয়া প্রতিবেশীর সহিত বাস করিবার অধিক উপযোগী হয়। যাহা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারা যায় তাহাতেই সেই বিশ্বকর্ম্মার সৌন্দর্য্যনিপুণতার আভাস পাইয়া মন পুলকিত হইয়া উঠে; এইজন্য সৃষ্টিমাত্রই সৃষ্টিকর্ত্তাকে সমাজের উপযোগী ও কল্যাণের কারণ করিয়া তোলে। জার্ম্মান আর্টিষ্ট-কবি প্লাটেন বলিয়াছেন যে, যে যত বেশি জিনিস জানে ও সম্ভোগ করিতে পারে, সে তত বেশি জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। এই আনন্দই সামাজিক কল্যাণের কেন্দ্র। এইজন্য জুতা-গড়া হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সকল-কিছু জানার এত মাহাত্ম্য। ইহার দ্বারা নিজে জ্ঞানের আনন্দ পাইয়া পরকে অভাবমোচনের আনন্দ দিতে পারা যায়। বর্ব্বর অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় উপনীত হইবার পথ কেবল মাত্র এই সৌন্দর্য্যবিকাশের অনুভূতির ক্রমোন্নতি; বর্ব্বরের হাড়ের মালা বা উল্কি পরিয়া সং সাজা হইতে সভ্য সমাজের প্রসাধন পর্য্যন্ত সমস্তই এই সুন্দরের উপাসনা এবং নিজেকে প্রতিবেশীর প্রীতিকর করিয়া তুলিবার চেষ্টা। ছেলেদের হাতে শিশুবোধকের ছবি, চাষার ঘরে বটতলার রামায়ণের ছবি, সৌখীন দরিদ্রের ঘরে সস্তা-ছাপা ছবির নকল, বিবাহের আলপনা, অন্নপ্রাশনের বড়ি, শুভকর্ম্মের শ্রী—সকল তাতেই যে সৌন্দর্য্যের আভাস আছে তাহা মনকে উন্নত পবিত্র করে; পাপচিন্তা, পাপকার্য্য হইতে বিরত রাখে। আজকাল সাধারণ লোকের মধ্যে যে অসন্তোষের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে তাহারও মূলে এই আর্ট। আজকাল

মাতা যশোদা।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে, প্রাচ্য শিল্পের ভারতীয় সমিতির অনুমতিক্রমে মুদ্রিত

মুটেমজুর কেবলমাত্র ভাতকাপড় উপার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, চিত্তপ্রসাদন আরো কিছু তাহার চাই। ভাগ্যবিধাতা ভগবান মানুষের ভাগ্যে এক অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া জড়ের মতো বসিয়া থাকা লিখেন নাই। আমরা যে অগ্রসর হইতেছি, উচ্চতর কিছু পাইতে চাহিতেছি, এই জ্ঞানেই আমাদের মুক্তি তিনি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিছু একটা হইতে হইবে, কিছু একটা পাইতে হইবে--জড় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা মানুষের ধর্ম্ম নয়। আজিকার যাহা আকাশ-কুসুম কাল যে তাহা করায়ত্ত হইয়া যাইতেছে চোখের সামনে নিত্য দেখিয়া কেমন করিয়া চুপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকা যায়! চাই চাই, চাই—যাহা সুন্দর, যাহা সত্য, যাহা কল্যাণ! তা যেমন করিয়াই হোক, প্রাণ দিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া। অসন্তোষ ভগবানের দান; তাহাতে মানবচিত্ত প্রসারিত হয়, অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়, জগতের দুঃখ জ্বালা দারিদ্র্য নিবারিত হয়। সে দরিদ্রই হোক বা ধনীই হোক, নিষ্কর্ম্মা লোকমাত্রেই সমাজের কলঙ্ক, সমস্ত পাপের অনুষ্ঠাতা। আর্ট সৃষ্টিতে নিযুক্ত করে, এবং কর্ম্মের ললিত গতির সংস্রবে আসিয়া অলসও প্রাণ পায়। আর্ট মানবের নিত্য নুতন অভাব সৃষ্টি করিয়া আবার নিজেই তাহা পূরণ করে এবং তাহার দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি জগতের বিপুল কর্ম্মধারা বিধৃত হইয়া থাকে। জগতের শিল্পশালাগুলি জনসাধারণের রুচি ও চরিত্র উন্নত করিবার উপায়, অবসর বিনোদনের সহায়। আর্টের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক লাভ না হইলে সমাজের কল্যাণ অসম্ভব। আর্টে রুচি মানুষকে অসুন্দর, অপরিচ্ছন্নতা, বিশৃঙ্খলা, মলিনতা হইতে দূরে রাখে। এইজন্য রস্কিন ও উইলিয়াম মরিস প্রভৃতি মনীষীগণ সমাজগঠনে সুন্দরের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। আজকাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে জীবন ও সমাজকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিয়াছে। আমাদের পিতৃপিতামহের যাহা উত্তরাধিকার আমরা পাইয়াছি তাহাকে অজ্ঞানতার উপেক্ষার উপর জয়ী করিয়া তুলিয়া আমাদের উত্তরবংশের জন্য সত্য শিব সুন্দরের বোধ আমরা সহজ করিয়া দিয়া যাইব এই হইবে আমাদের প্রাণের সাধনা!

সুদৃশ্য চিম্‌নি।

সক্রেটিস বলিয়াছিলেন যে যাহা কর্ম্মের উপযোগী তাহাই সুন্দর, যাহা কর্ম্মের অনুপযোগী তাহাই অসুন্দর। তাঁহার মতে ময়লাফেলা কদর্য ঝুড়ি সুন্দর সোনার ঢালের চেয়ে সুন্দর জিনিস। কিন্তু এ মত এখন আর সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞদের কাছে সমাদৃত হইতেছে না। কেজো জিনিসকেও সুশোভন, দৃষ্টিসুখকর করিয়া গড়িতে হইবে; এইজন্য মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজসপাত্র কাপড়চোপড় বাক্সপেটরা সমস্তই নয়ন-সুভগ করিবার চেষ্টা দেখা যায়। আধুনিক বৈষয়িক প্রাধান্যের দিনে কলকারখানা প্রভৃতিও সুন্দর করিয়া নয়নরঞ্জক করিয়া গড়িবার চেষ্টা য়ুরোপে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। কলঘরের ধূমোদগারী চিমনীগুলি বড়ই কুদৃশ্য; আশেপাশের সমস্ত শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যকে কলের চিমনীগুলি যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে থাকে। এইজন্য লণ্ডনের আশেপাশের কলওয়ালারা চিমনীগুলিকেও শিল্প সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। The Literary Digest হইতে এইরূপ একটি চিমনীর চিত্র উদ্ধৃত করা হইল।

পরাধীন জাতির স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা (La Croix) :—

পোলাণ্ড মধ্য-য়ুরোপে। রুশ, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়া তিন শক্তিতে আপোস করিয়া এই দেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। প্রবলের এই অন্যায় অত্যাচার এই বীর জাতি এখনো ভুলিতে পারে নাই; সাহিত্যে বক্তৃতায় গুপ্তমন্ত্রণায় রাজদ্রোহিতায় তাহারা স্বদেশের অপমানের ব্যথা নিরন্তর প্রকাশ করিয়া নির্য্যাতিত হইতেছে তবু আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছে না। কত লোক কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, কত লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তবু তাহাদের চিন্তা ধ্যান শুধু স্বদেশের কল্যাণেই নিয়োজিত আছে।

অধুনা বলকান রাজ্য লইয়া রুশের সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার বেশ মন-কষাকষি চলিতেছে। য়ুরোপীয় রাজশক্তিদের রকম অনেকটা কথামালার শৃগালের মতন, বাঘ ভালুকে লড়াই বাধাইয়া মধ্য হইতে শিকার লইয়া চম্পট দেন শৃগাল ধূর্ত্ত। বলকান রাজ্য তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে, বিজিত রাজ্যের ভাগ চাহিতেছে রুশ ও অষ্ট্রীয়া। দুজনে এখনো আপোস হয় নাই তাই রক্ষা, এখনো কেহ কিছু গ্রাস করিতে পারে নাই। অষ্ট্রীয়া একাকী রুশের সঙ্গে লড়াই বাধাইতে তত সাহস করিতেছে না; সে অন্যের সাহায্য খুঁজিতেছে। রুশের খবরের-কাগজওয়ালারা সন্দেহ করিতেছে যে অষ্ট্রীয়া তলে তলে রুশের অধীন পোলাণ্ডকে হাত করিয়া বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে; অষ্ট্রীয়ার অধীন পোলাণ্ড-অংশকে স্বাধীনতা দিয়া রুশের অধীন পোলাণ্ড-অংশের সহিত যুক্ত করিয়া দিলে কৃতজ্ঞ পোলাণ্ড অষ্ট্রীয়াকে সাহায্য করিবেই, তখন রুশের আর উচ্চবাচ্য করা চলিবে না। এই উদ্দেশ্যে অষ্ট্রীয়ার রাজপরিবারের সহিত পোলাণ্ডের প্রাচীন রাজপরিবারের খুব ঘন ঘন বৈবাহিক আদানপ্রদান চলিতেছে; য়ুরোপের বিশ্বাস এই-সব বিবাহের অন্তরালে মস্ত একটা রাষ্ট্রনৈতিক চাল আছে। যে তিন ডাকাতে পোলাণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে অষ্ট্রীয়াই বিজিত জাতির সহিত কথঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিয়াছে; রুশ ও জর্ম্মানীর অধীন পোলাণ্ডের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এক্ষণে নিজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অষ্ট্রীয়া যদি নিজের অধীন পোলাণ্ডকে মুক্তি দেয়, তাহা হইলে পোলাণ্ডের অপর দুই অংশেরও মুক্তিলাভ সহজ হইয়া

আসিবে। এই আশায় পোলাণ্ড অষ্ট্রীয়ার দিকে তাকাইয়া আছে।

অধীন জাতি স্বাধীন হইবে ইহা জগতেরই আনন্দের ও কল্যাণের কথা। কিন্তু সেই স্বাধীনতা যদি অপরের অধীনতা দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে তাহা মনুষ্যোচিত হইবে না।

ক্ষুধা ব্যাপারটা কি? (The Literary Digest) :—

ক্ষুধা মানে অবশ্য খাদ্যের অভাব। কিন্তু এই অভাব কেমন করিয়া এই সর্ব্বজনপরিচিত অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহা লইয়া নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারো কাহারো মতে স্নায়ু কোষের পুষ্টির অভাবজনিত যন্ত্রণার নাম ক্ষুধা। এই মতে ক্ষুধা শুধু ঔদরিক ব্যাপার নহে, ইহা সার্ব্বাঙ্গিক। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্লসন পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ক্ষুধা সর্ব্বাঙ্গের ব্যাপার নহে; তাহা হইলে ক্ষুধা লাগিয়া থাকিত, একবার লাগিয়া ক্ষণেক পরে ক্ষুধা পড়িয়া যাইত না। ক্ষুধার সময় না খাইলে ক্ষুধা পড়িয়া যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে আবার ক্ষুধা পায়, ইহা আমরা সকলেই জানি। তাহার কারণ ক্ষুধা পাকাশয়ের একরূপ সঙ্কোচন মাত্র; পাকাশয়ে খাদ্যের অভাব হইলে পাকাশয় তালে তালে সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইতে থাকে; সঙ্কোচের অনুভূতি ক্ষুধা এবং বিস্ফারণের অনুভূতি ক্ষুধা পড়িয়া যাওয়া। ক্ষুধার সময় মুখরোচক খাদ্য চর্ব্বণ দ্বারা মুখের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইলে লালা প্রভৃতি পাকরস নিঃসরণ করে, এবং তাহার ফলে পাকাশয়ের সঙ্কোচ বন্ধ হইয়া ক্ষুধার উপশম হয়। ক্ষুধার সময় সুখাদ্যের দর্শন বা ঘ্রাণমাত্র পাকাশয়ের স্পন্দনের কোনো তারতম্য ঘটাইতে পারে না। পাকাশয়ের এই সঙ্কোচ ঔষধ দ্বারা নিবারণ করা যায় না; কিন্তু জল, চা, কাফি, মদ প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে তাহা নিবারণ করে। তাহার মধ্যে জলের সঙ্কোচনিবারিণী শক্তি সব চেয়ে কম। ক্ষুধা যখন প্রথম লাগে তখন শূন্য পাকাশয় ঘন ঘন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, পরে বিলম্বিত হয়। কার্লসন একটি রোগী পাইয়াছেন, তাহার গলনালী কষ্টিক-সোডা দ্রাবণ পান করাতে বুজিয়া গিয়াছে; পেটে একটা ছিদ্র করিয়া তাহার আহারের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; এই ছিদ্রপথে পাকাশয়ের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

আরণ্য বিদ্যালয় (Les Documents du Progres) :—

য়ুরোপের লোকের এতদিনে চৈতন্য হইতেছে যে বালক বালিকাদিগকে স্কুল-ঘরে বদ্ধ করিয়া বেঞ্চির উপর আড়ষ্ট হইয়া বসাইয়া কৃত্রিম পরিবেষ্টনের মধ্যে যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা তাহা স্বাভাবিক ত নয়ই অধিকন্তু মারাত্মক। মুক্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সহজভাবে যাহা পাওয়া যায় সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুক্তস্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নানা স্থানে শুনা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে পথ দেখাইয়াছে শার্লত্তাবুর (Charlottenbourg) শহরের শিক্ষা-পরিষৎ। শহর হইতে দূরে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; সেখানে শহরের ছেলেমেয়েরা থাকে এবং পড়াশুনা করে। শহরের কোলাহল ও ধূলিধূম হইতে দূরে দেবদারুকুঞ্জের ভিতর তাজা হরিৎ শোভার কোলে লাল্‌-লাল বাড়ীগুলি বালক-বালিকার অবাধ আনন্দেই যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে মাত্র সকালবেলা সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ক্লাশ হয়; ক্লাশের সময় চল্লিশ মিনিট করিয়া চার ঘড়িতে ভাগ করা। প্রত্যেক ঘড়ির পর কয়েক মিনিট করিয়া ছুটি থাকে, এবং ঘড়ি যত বাড়ে ছুটির পরিমাণও তত বেশী হয়। ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মাটিতে ঘাসের আসনে বসিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে; এবং প্রকৃতির এই প্রমুক্ত প্রাঙ্গনে মাষ্টার মশায় তাঁহার ভীষণ গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া গিয়া শিশুর সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে শিখেন। সকল মুখগুলিই যেন আনন্দ আশা উৎসাহের পদ্মাসন। একজন শিক্ষক কুড়িজনের বেশি ছাত্রের ভার লন না। ইহাতে শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের মানসিক বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া তাহার শক্তির অনুকূল করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে পারেন।

এখানকার ছাত্রেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে; ইহাতে স্বাবলম্বন ও পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুশীলিত হয়। শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহারা চিন্তা করিতে ধ্যান করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে।

এখানকার খাদ্যের বরাদ্দ নিতান্ত মোটামুটি। কিন্তু মুক্ত বাতাসে সদানন্দ ভাবে থাকিয়া যে ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহাতে সেই মোটা ভাতই রাজভোগের মতো লাগে। যে-সব রোগা-পটকা ছেলে মেয়ে এখানে আসে, কয়েক সপ্তাহ পরেই ডাক্তারের রোজনামচায় দেখা যায় যে তাহাদের ছাতির বেড় আর ওজন বাড়িয়া গিয়াছে।

স্কুলের ছুটির পর দেখা যায় কোনো বালিকা এক দেবদারুর তলে বসিয়া হয় ত একটি গাছের পাট করিতেছে; কোথাও ছেলে মেয়ে একত্র হইয়া ভূত পরী দৈত্যদানার গল্প করিতেছে; কেহ বা পাতা গাঁথিয়া বিবিধ জিনিস গড়িতেছে; কেহ বা বনের পশু বশ করিয়া করিয়া নিজের একটি পশুশালা গড়িয়া তুলিতেছে; কেহ বা বিবিধ গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিজ্জ জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতেছে; কেহ বা উদ্যান রচনা করিতেছে।

এই-সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কোনো পিতাই আর ছেলেকে আরণ্য বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ইতস্তত করে না, এবং নিজেরা পেটে না খাইয়াও ছেলেদের পড়ার খরচ জোগাইতেছে। সহরের কর্ত্তারাও বিনা ওজরে প্রতি বৎসর আরণ্য বিদ্যালয়ের জন্য বজেটে বেশ একটা মোটা খরচের বরাদ্দ করিয়া আসিতেছেন।

আরণ্য বিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদের ভারতবর্ষে পুরাতন। আমাদের প্রাচীন তপোবন ও আশ্রমের আদর্শ হারাইয়া আমরা দুপুর রৌদ্রের গরমে ছোট্ট ঘরে একপাল ছেলে ভরিয়া রুদ্রমূর্ত্তি মাষ্টার মশায়কে পাহারা রাখিয়া দিয়াছি, পাছে তাহাদের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, পাছে সেই-সব কচি মুখে হাসি বা স্বাস্থ্যের জ্যোতি দেখা দেয়! এই অস্বাভাবিকতা প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত আধুনিক কালের তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রথম, বোলপুরের ব্রহ্মবিদ্যালয়, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়, হরিদ্বারের গুরুকুল ও ঋষিকুল। এরূপ বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

নব্য তুর্কী রমণী (The Literary Digest) :—

Les Documents du Progres নামক ফরাশী পত্রিকায় সেদিন দেখিলাম এক ফরাশী লেখক তুর্কী রমণীদের বিষয়ে লিখিতে গিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বড়ই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তিনি বলেন যে তুর্কীরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংস্কার করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা এখনো ভয়ঙ্কর বর্ব্বর রকমেরই আছে। কোনো স্ত্রীলোক ঘোমটা খুলিয়া পথে বাহির হইতে পারে না; যদি দুঃসাহসিকা কেহ ঘোমটা খুলিয়া বাহির হয় তবে স্ত্রীপুরুষ যে কেহ তাহাকে দেখে সেই তাহাকে অপমান করে, ঢেলাধুলা ছুড়িয়া তাহার লাঞ্ছনার একশেষ

করে। একজন গ্রীক একটি তুর্কী রমণীকে ভালো বাসিয়াছিল, ভালো বাসাও পাইয়াছিল; সে রমণীর পিতামাতার নিকট আপনার প্রণয়িণীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাঁহারা প্রত্যাখ্যান ত করিলেনই, অধিকন্তু কন্যাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন—বিদেশী বিধর্ম্মীর সহিত বিবাহে বাধা দিবার জন্য ততটা নহে যতটা পর্দ্দার বাহিরে গিয়া কন্যার আবরুহানি হইবে বলিয়া। অবশেষে প্রণয়ীযুগল মিলনের অন্য কোনো উপায় না পাইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু উত্তেজিত জনসঙ্ঘ শীঘ্রই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল।

কিন্তু The Literary Digest তুর্কী সংবাদপত্র 'ইকদম' হইতে তুর্কী রমণীদের যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা ঠিক উল্টা। তুর্কীরা গৃহসংস্কার আরম্ভ করিয়া বলসঞ্চয় করিবার উপক্রম করিবার মুখেই পরশ্রীকাতর য়ুরোপীয় শক্তিরা তাহার উন্নতির পথে বারবার বাধা উপস্থিত করিতেছে, পাছে অখৃষ্টান জাতি বলবান হইয়া তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠে। এইজন্য তুর্কীর নব্য সম্প্রদায় রক্ষণশীল ও অত্যাচারী সুলতানকে পদচ্যুত করিয়া যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারে ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ে ইটালি তুর্কীর দূরস্থ রাজ্য ত্রিপলি আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লইল; সে উৎপাত চুকিতে না চুকিতে তুর্কীর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি ভূতপূর্ব্ব বিজেতার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া সমর ঘোষণা করিল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া তুর্কী ক্রমাগত পরাজিত হইতেছে। ইহার ফলে তুর্কীদের মন একেবারে দমিয়া গেছে; আত্মপ্রত্যয় তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে; দেশহিতৈষণা তাহাদের শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তাহারা যে য়ুরোপবিজয়ী বীর তুর্কীদেরই বংশধর, তাহাদের বীরত্ব ও বিজয়ের উত্তরাধিকার যে বড় সামান্য নয়, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তুর্কী নামে পরিচয় দিতে তাহাদের হৃদয়ের রক্ত গর্ব্বে গৌরবে নাচিয়া উঠে না; ইংরেজ, জার্ম্মান, রুশ প্রভৃতির সমকক্ষ বীর বলিয়া সে তাহাদের পাশে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না; তাহারা নিজের দেশকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতে পারিতেছে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে য়ুরোপীয়েরা তাহাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দুর্ব্বলকে হয় ঘৃণা করিতেছে নয়ত কৃপা দেখাইতেছে।

দেশের ও দেশের পুরুষদের যখন এই অবস্থা তখন সেই দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য পুরুষদিগকে উদ্বোধিত করিবার ভার লইয়াছেন পুরুষের সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী রমণীরা। দেশের এই দুর্দ্দিনে পুরুষেরা যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছে তখন রমণীরা আর হারেমের গণ্ডির ভিতর বিলাস ব্যসনে নিশ্চিন্ত হইয়া নাই; তাঁহারা এতকালের প্রথা ও সংস্কার একই দিনে ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়াছেন এবং পুরুষদিগকে অতীত গৌরবের কাহিনীতে উদ্বোধিত করিয়া ভবিষ্যতের মুক্তির বাণী শুনাইতেছেন। এখন যেখানে-সেখানে প্রকাশ্য সভায় মহিলারা বক্তৃতা দিয়া দেশপ্রীতির ও বীরত্বের নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে বিধূনিত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছেন, দেশরক্ষার জন্য সমর যজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে পুরুষদিগকে তাঁহারা আহ্বান করিতেছেন। পুরুষেরা রমণীর এই শক্তি ও পটুতা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছে।

কনষ্টান্টিনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের এক সভা হয়; সুলতানা নীমৎ হানুম এই সভার নেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। তুর্কীর প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হালেদ হানুম জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশরক্ষার জন্য আপনার দেহের সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিয়া যখন দান করিলেন, তখন সভায় যেন আগুন ধরিয়া গেল; দেখিতে দেখিতে বারোটি বাক্স ভূষণ-জহরাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"নাই বা থাক আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, চাই শুধু প্রবল দেশপ্রীতি! নর নারী শিশু বৃদ্ধ প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যদি আমরা গতিরোধ করি, জগতে এমন কোনো নৃশংস শক্তিশালী শত্রু নাই যে সে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে, আমাদিগকে বধ করিতে পারে। নিজের দেশ ও জাতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই এক জাতিকে অপর জাতির কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখে। এই অনুরাগই অতীতকালে তুর্কীকে এত বড় এত দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছিল। এখনো চাই শুধু সেই দেশানুরাগ! তাহার অভাবে আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা! আমাদের গোয়ালা প্রজা বুলগারেরা সেদিনও আমাদের দুধের জোগান দিত; এই দেশানুরাগে আজ তাহারা আমাদের বিজেতা, সমগ্র জগতের চক্ষে গৌরবান্বিত!

"কিন্তু আমাদের হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। এই ত ফ্রান্স বৎসর চল্লিশ আগে জার্ম্মানীর হাতে কি অপমানিতই না হইয়াছিল; কিন্তু পঁচিশ বৎসরে সে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীস একদিন তুর্কীর অধীন ছিল, এখন গ্রীস তুর্কীর প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা তুর্কী মাতারা আমাদের স্তনদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের অন্তরে তীব্র দেশানুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দিব এই হইবে আমাদের ব্রত! কাপুরুষ সন্তান আমাদের থাকিবে না। তুর্কী জাতিকে আমরা মরিতে দিব না! আশা মুহাম্মদকে বল দান করুক, আশা সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়া নরনারীকে দেশসেবায় নিযুক্ত করুক! তখন কোনো বাধাই বাধা বলিয়া মনে হইবে না, কোনো ত্যাগই ক্লেশকর বোধ হইবে না। মরণের ডাক পড়িলে আমরা যেন বলিয়া যাইতে পারি—'আমার দেশের জন্য আমি রাতে ঘুমাই নাই দিনে বিশ্রাম করি নাই!' তখনই আমার দেশ সকল স্বাধীন শক্তিমান জাতির পার্শ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সকলে তাহাকে গৌরবের আসন ছাড়িয়া দিবে।"

আর একটি সভায় সলমা হানুম নেত্রীত্ব করিয়াছিলেন এবং ফাতিমা আলি হানুম বক্তৃতা করিয়াছিলেন; এই সভাতেও সকলে আপনাদের দেহ নিরাভরণ করিয়া দেশহিতে সমস্ত অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন।

'তসবিরি আফকিয়ার' নামক সংবাদপত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—আমাদের রমণীদের মধ্যে যে কি আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত আছে তাহা এই-সমস্ত সভা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। যে জাতির এমন সম্পত্তি বর্ত্তমান তাহার আর মার নাই, তাহার ভবিষ্যৎ স্থির হইয়াই আছে। আমরা এই প্রথম আমাদের জাতীয় শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারিলাম, আর বুঝিতে পারিলাম যে পুরুষ এই রমণী-মাহাত্ম্যের কাছে কত খর্ব্ব কত দুর্ব্বল!

ইকদম বলেন—আমাদের রমণীরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের আশা ভরসা। তুর্কী জাতির যে অর্দ্ধাঙ্গকে এতদিন গ্রাহ্য বা স্বীকারই করা হইত না, আজ তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ স্থিতির একমাত্র আশ্রয় রূপে দেখা দিয়াছে।

ব্রহ্মের রমণী (The Hindusthan Review :—

ব্রহ্মের রমণীরা যেন বায়ুর মতো অবাধ, কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং আনন্দিত। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের ফল। বৌদ্ধধর্ম্মে গুণের তারতম্যেই মানুষে মানুষে যা কিছু পার্থক্য, অন্যথা সকল মানুষই সমান। এইজন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারী-সমাজ যে-সমস্ত অধিকারের জন্য লালায়িত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সে সমস্তই ব্রহ্মরমণীর আয়ত্ত হইয়া আছে। ব্রহ্মরমণীরাই সংসারের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করে; অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করে, এমন কি নিজের নিষ্কর্ম্মা স্বামীগুলির গ্রাসাচ্ছাদনের ভারও তাহাদেরই। এইজন্য ব্রহ্মরমণীকে বড় বড় চালের আড়তদারী, কাঠের কারবার, তেলের ব্যবসায় প্রভৃতি করিতে দেখা

যায়; ব্রহ্মরমণীর দ্বারা চালিত ছাপাখানা ও দৈনিক খবরের কাগজ, খনির কাজ, প্রভৃতি নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে।

সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধেও ব্রহ্মরমণীর সুবিধা বিস্তর। স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের সম্পত্তির মালিক। যদি উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা হয়, তবে সম্পত্তিও অর্দ্ধ-অর্দ্ধি ভাগ হয়। পুরুষের বহু বিবাহের প্রথা থাকিলেও প্রথমা পত্নীর সম্মতি ব্যতীত দ্বিতীয়বার বিবাহ অসিদ্ধ; যদি কেহ প্রথমা পত্নীর অসম্মতিতে বিবাহ করে, তবে প্রথমা স্ত্রী স্বামীর সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে উভয়ের সম্পত্তি জীবিত ব্যক্তিতে বর্ত্তে; কেবল জ্যেষ্ঠ সন্তান সিকি ভাগ পায়। স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত স্বামী কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না; কিন্তু স্ত্রী তাহার স্ত্রীধন স্বয়ং হস্তান্তর করিতে অধিকারিণী।

ব্রহ্মরমণী যাহাকে খুসি বিবাহ করিতে পারে। ভারতের বিবাহে যেমন পাত্র বি-এ পাশ কি ফেল দেখিয়াই কন্যাসম্প্রদান করা না করা স্থির করা হয়, অথবা পণের পরিমাণ বুঝিয়া পাত্র নির্ব্বাচন করা হয়, তেমনি ব্রহ্মদেশে বরকন্যার মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে কিনা দেখা হয়। ইহাই বিবাহের স্বাভাবিক ও সমীচীন বিধি। ব্রহ্মদেশে বাল্যবিবাহ না থাকাতে বালিকা বিধবাও নাই; এবং বিধবারও পুনর্বিবাহে কোনো বাধা নাই; যাহাদের সঙ্গতিতে কুলায় না তাহাদের কুমারী থাকাতেও লজ্জা বা নিন্দা নাই। ব্রহ্মরমণী সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

তাহাদের মধ্যে বর্ণজ্ঞানহীনা অশিক্ষিতা প্রায় দেখা যায় না; তাহারা বাল্যকাল হইতেই গৃহস্থলীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া নিপুণ গৃহিণী হয়।

ভারতবর্ষ, তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রাচীন প্রথার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার কোনোরূপ পরিবর্ত্তন ঘটানো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ঐ-সব দেশের স্ত্রীলোকেরা আবহমানকাল পুরুষের অধীনতা করিয়া এমন জড়ভরত হইয়া যায় যে স্বামীর মনোরঞ্জন করিতেও পারে না; নির্ব্বোধ পুতুলের মতো তাহাদের অতিবশ্যভাব এবং লীলার ছলের অভাব পুরুষকে আকৃষ্ট করে না; কোনো কথা উত্থাপন করিলেই স্বামীর মতে সায় দিয়া তখনি বলে 'হঁ, তুমি যখন বলিতেছ।' এমন অবস্থায় হয় ত ঘরসংসার করা চলে, কিন্তু সখিত্ব ও সহযোগিতার আনন্দ হইতে চিরবঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহাদের তুলনায় ব্রহ্মরমণী সকল অংশে শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ (The International Review of Missions):—

আমেরিকার নিগ্রোদিগের নেতা বুকার ওয়াশিংটন লিখিয়াছেন—বাল্যকালে আমি কয়লার খনিতে কাজ করিতাম। তখন শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাতে নিজের জা'তটার উপর ঘৃণা ছাড়া শ্রদ্ধা হইতই না। তাহার উপর শুনিতাম যে আমাদের পিতৃভূমি আফ্রিকায় ভীষণ অরণ্যে বন্যপশুর সহিত আমাদের জ্ঞাতিরা উলঙ্গ বর্ব্বর অবস্থায় নৃশংস জীবন যাপন করে। আমি যে তাহাদেরই একজন, শ্বেতাঙ্গের কৃপায় তবুও একটু সভ্য হইয়াছি এই কথা মনে করিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতাম! কিন্তু তখনি মনে হইত, যে জা'তের মধ্যে আমার মাতার ন্যায় লোক আছেন সে জা'ত কখনো একেবারে গুণহীন বর্ব্বর হইতে পারে না।

তারপরে আমেরিকার নিগ্রো দাসদিগকে মুক্তি দিবার প্রসঙ্গে আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের পর নিগ্রোদের জন্য যে স্কুল স্থাপিত হয়, সেই স্কুলে আমাদের দেশ ও জাতির মধ্যে লিভিংষ্টোন প্রভৃতি সদয়-হৃদয় মিশনরিদের কার্য্যকলাপের সহিত যখন পরিচিত হইতে লাগিলাম, তখন প্রথম মনে হইল যে আমার জ্ঞাতিদের চরিত্র ও আচরণে লজ্জিত হইবার বিশেষ কারণ নাই।

নিগ্রোরা বহিঃসংসারের সহিত যোগহীন হওয়াতে প্রবল লোকেরা তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিত। এমনি করিয়া দেশের বাহিরে কাফ্রি জাতি দাসের জাতি বলিয়াই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই দাসত্বের মধ্যেও কাফ্রি জাতি তাহাদের অকপট সেবা, প্রাণাপ্ত বিশ্বাস, এবং প্রভুর ধনমান রক্ষার জন্য অসাধারণ সাহস বল-বীর্য্য দেখাইতে ক্রটি করে নাই। এই-সমস্ত কাহিনী পড়িয়া শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল যে, কাফ্রিরাও মানুষ! তাহারা একটুখানি ভালো ব্যবহার পাইলে, অনুকূল অবস্থা পাইলে শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইতে পারে; শ্বেতাঙ্গ যদি তাহাকে উত্তেজিত না করে তবে সে শ্বেতাঙ্গের শত্রুতা কখনো করিতে পারে না। মানুষ যদি মানুষকে ঠিক করিয়া বুঝিতে না পারে এবং পরস্পরের মধ্যে যদি সহানুভূতি না থাকে তবেই বিপদ—শত্রুতা বিবাদ সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। পরস্পরকে বুঝিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার এবং অজ্ঞতার বিনাশ।

জগৎ ব্যাপারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কালো ধলো সকল জাতি এখন পরস্পরের পাশে আসিয়া পড়িতেছে, এখন যে যার দেশে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার আর উপায় নাই। এই জীবনসংগ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে জাতির সহিত জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে; কৃষ্ণাঙ্গেরও মনুষ্যত্বের দাবি থাকিতে পারে ইহা তাহারা বুঝিতেই চাহে না। ইহার ফলে কৃষ্ণাঙ্গেরাও শ্বেতাঙ্গদিগকে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; শত্রু বলিয়া, অন্নের-গ্রাস-লুণ্ঠনকারী বলিয়া মনে করিতেছে। এই দারুণ অবস্থার প্রতিকারের উপায় জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ক্ষমা। উভয় দলেই এই তিন গুণের বিস্তার হইলে তবেই প্রতিবেশী জাতি বর্ণবৈষম্য ভুলিয়া পরস্পরের জীবনযাত্রা মানাইয়া লইতে পারিবে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় দাসত্বপ্রথা উন্মূলিত করিবার জন্য কত না অর্থ, কত না জীবন নষ্ট হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু উঠিয়া গিয়াছে কি সত্য? যতদিন মানুষ অজ্ঞ অশিক্ষিত থাকিবে, যতদিন সে কর্ম্মদক্ষ ও আত্মনির্ভর না হইবে, ততদিন দাসত্ব নানা ছদ্মবেশে মানুষকে ঘিরিয়া থাকিবেই। কঙ্গো ও পেরুর রবার-ক্ষেত্রে, আফ্রিকা ও আমেরিকার ইক্ষুক্ষেত্রে এখনো এক জাতি অপর জাতির দাস! এই বাহ্যিক দাসত্ব হয়ত আইন করিয়া রদ করা যাইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞতা দূর না হইলে দাসত্বের বীজ মরিবার নহে। মানুষের মনে দাসত্বের সংক্রামকতা লাগিয়াছে, তাহাকে জ্ঞানের আগুনে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এই শিক্ষা-সমস্যাই জগতের মুক্তি-সমস্যা!

এই কথা ভুলিয়া গিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ যদি কৃষ্ণাঙ্গের দেশকে কেবল মাত্র নিজেদের পকেট ভরিবার লুণ্ঠনক্ষেত্র মনে করে, এবং দেশবাসীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইয়াই থাকে, তবে জগতের সদ্ভাব শান্তি ও মুক্তির সমস্যাকে দিন দিন শুধু জটিলতরই করিয়া তুলিতে থাকিবে। চা।

অয়কেন (Current Literature):—

অয়কেন (Rudolph Eucke) প্রতিভায় মনীষি ব্যার্গস্ঁ ও হ্যানাকের সমকক্ষ। এই তিন জনই আজকাল য়ুরোপের চিন্তারাজ্যের অধিনায়ক ও পরিচালক। অয়কেন জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তাহার পুস্তকগুলি বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গেছে।

তিনি মানুষকে কাজ করিতে উপদেশ দেন, প্রার্থনা বা ধ্যান করিতে নহে। যীশুখ্রীষ্টের মানবত্বে তিনি বিশ্বাস করেন, দেবত্বে নহে। ঈশ্বর বলিতে তিনি বোঝেন একটি নিখুঁত সম্পূর্ণ ধর্ম্মজীবন। ধর্ম্মজীবন মানে আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হওয়া, সংগ্রামে জয়ী হওয়া। ইতিহাস তাহার মতে ক্রমবিকাশ নহে, একটি সংঘর্ষ বিশেষ—যাহাতে প্রণালী প্রণালীর বিরুদ্ধে ও ব্যক্তি ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। অতীত মৃত নহে অথচ ইহা আমাদিগকে শাসন করে না। ইহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইবে আবার প্রয়োজন হইলে মিলিতেও হইবে।

অধ্যাপক অয়কেন।

ঈশ্বর ও মানুষের মাঝামাঝি আর কেহ নাই; যীশুখৃষ্ট মানুষ। সাধারণ মানুষ না হইলেও তিনি মানুষই, ইহা নিশ্চিত। আমরা তাঁহাকে নেতা হিসাবে, বীর হিসাবে, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই হিসাবে সম্মান করিতে পারি। কিন্তু বে-করারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পারি না।

ব্যার্গস্ঁ (Literary Digest):—

আঁরি ব্যার্গস্ঁ (Henri Bergson) সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। তিনি সম্প্রতি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণ করা যায় না, এবং অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করিতে হইলে প্রমাণ করিবার প্রয়োজনও নাই। যে অবিশ্বাসী সেই প্রমাণ করুক যে আত্মা বিনশ্বর। কোনো কিছু কখনো শেষ হইবে না ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারে না, সেরূপ করিবার চেষ্টাও বিড়ম্বনা। কিন্তু যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে বস্তুর সহিত মনের যোগ স্থাপন করাই মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট কাজ, এবং আমাদের মানসিক জীবনের অধিকাংশই মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধবিরহিত, তাহা হইলেই অব্যাহত স্থিতির সম্ভাবনা প্রমাণিত হইবে।
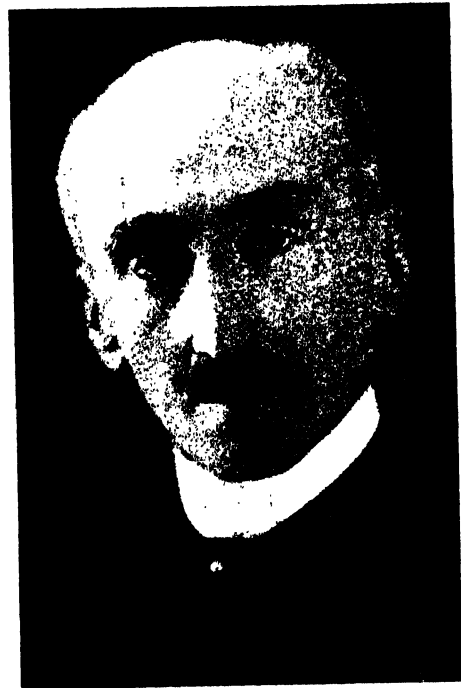
আরি ব্যার্গস্ঁ।

বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন মানুষ কি চায়? নিশ্চয়ই আমরা সর্ব্বদা সুখের সন্ধান করি না। সন্ধান তাহাই করি যাহাকে তোমরা বল পারদর্শিতা বা দক্ষতা। এই কথাটি ক্রমবিকাশের গতিটিকে প্রকাশ করিতেছে; আমাদের ভিতরকার যে মূল প্রবৃত্তি, সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

আমরা পারদর্শিতা খুঁজি, কিম্বা হয় ত ইহাই বলা ঠিক যে, পারদর্শিতার যা সাক্ষাৎ ফল সেই আনন্দ চাই। আনন্দ সুখ নহে, উহা সৃষ্টি করার তৃপ্তি। শিল্পী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে সুখী হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন সে দেখে তাহার তুলিকাসম্পাতে চিত্র গড়িয়া উঠিতেছে, যখন সে বোঝে বিশ্বে একটা নূতন কিছুর সৃষ্টি করিতেছে, কেবল তখনই তাহার আনন্দ। কোনো-না-কোনো রূপে এই আনন্দই মানুষ চাহিতেছে।

শিল্প আমাদিগকে বস্তুর বাস্তবরূপ দেখায়। দর্শনেরও তাহাই করা উচিত। দর্শনে বাস্তবের স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা উচিত।

বিজ্ঞান বাহির হইতে সকল জিনিসের পর্য্যালোচনা করে, দর্শন করে ভিতর হইতে।

রবীন্দ্রনাথ (Christian Register, U. S. A.) :—

সম্প্রতি আমেরিকায় The Congress of the National Federation of Religious Liberals হইয়াছিল। সেই মহাসভায় জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষের তরফ হইতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি Race Conflict সম্বন্ধে এক বক্তৃতা পাঠ করেন, উহা আমাদের Modern Review নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পাশ্চাত্য সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। আমেরিকার Christian Register নামক সংবাদপত্র বলেন যে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় মহাসভার সমস্ত সুর এক উচ্চ গ্রামে উঠিয়া পড়িয়াছিল; কংগ্রেস মঞ্চে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাহিত্য খ্যাতি সম্পন্ন বা অধিকতর উচ্চভাবপূর্ণ কথা বলিতে সক্ষম ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। বহুচেষ্টায় কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতা শোনা সৌভাগ্য বলিয়া মনে হয়। সে সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অয়কেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের দুই হাত ধরিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে জর্ম্মানীর জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বার্গস আমেরিকায় উপস্থিত থাকিলেও কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হইয়া চিঠি লিখিয়াছেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিয়া য়ুরোপের এই শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সমাদর করিতেছেন। সমগ্র য়ুরোপ আমেরিকায় তাঁহার যশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; বহু পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। সু।

আদর্শ ভিক্ষুক সংশোধনাশ্রম (Fortnightly Review) :—

হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে দরিদ্র ও ভিক্ষুককে সাহায্য করিবার জন্য অনুশাসন রহিয়াছে যথেষ্ট। ভিক্ষাপ্রার্থীকে ভিক্ষা দিলে পুণ্য সঞ্চিত হয়, না দিলে পাপ আছে, আমাদের দেশের গৃহস্থদের এইরূপ বিশ্বাস। এখনও ভারতবর্ষের কোনো হিন্দু ভিক্ষুককে রিক্ত হস্তে বিদায় করে না—বরং একমুষ্টি চাউল দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে না পারিলে আপনাদিগকেই নিতান্ত দুর্ভাগ্য মনে করে।

য়ুরোপের সভ্যতার সহিত আমাদের এবিষয়েও যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভিক্ষা করা বা ভিক্ষা দান করা ভাল কি মন্দ সে কথার বিচার এখন থাকুক। তবে বর্ত্তমান য়ুরোপে ভিক্ষা করিলে বা কাহারও নিকট কোনো কারণে কৃপাপ্রার্থী হইলে তাহাকে জেলে যাইতে হইয়া থাকে এটা, আমরা হিন্দু, আমাদের নিকট ভালো বোধ হয় না। য়ুরোপীয় গৃহস্থেরা ভিক্ষুককে অন্ন দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাকে ধরিয়া পুলিশে দেয় এবং পুলিশ তাহার রিক্ত হস্তে লোহার শৃঙ্খল পরাইয়া তাহাকে জেলে চালান করে। য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য এরূপ কঠোর আইন আছে—কিন্তু তাহাদের জীবনরক্ষার কোনো উপায় অনেক দেশেই নাই। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়ার গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ আইন প্রণয়ন দ্বারা ভিক্ষুকের প্রতি অত্যাচার করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছিল এবং দেশের কেহই যাহাতে এক ফোঁটা জল দিয়াও ভিক্ষুকের সাহায্য না করে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ঘোষণা করা হইয়াছিল যে সুস্থ ও সবল দেহের কেহ অপর কাহারও নিকট কোনো বিষয়ের জন্য কৃপাপ্রার্থী হইলেই তাহাকে তিন মাসের জন্য সশ্রম কারাবাস সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু নানা কারণে এত কঠোর আইনও ভিক্ষুক বংশকে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে অনেক ভিক্ষুক তিন মাস জেলে যাইতেও স্বীকৃত, কিন্তু কোনো শারীরিক পরিশ্রম করিতে স্বীকার করে না এবং জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই দিনই ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া আবার জেলে যাইবার পথ প্রস্তুত করে।

সুতরাং যখন অষ্ট্রীয়ার গবর্ণমেণ্ট দেখিল যে সমস্ত কঠোরতাই বিফল হইল তখন ভিক্ষুকদের জন্য একটী সংশোধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিল। ডাক্তার স্কফেলের অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল।

আশ্রমের কার্য্যকারী সমিতির রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে আশ্রমটি ভিক্ষুকদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই; তাহাদের সংশোধনই আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য; এখানে সমস্ত কার্য্য ভিক্ষুকদের দ্বারা করান হইবে, কাজ করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং কাজের প্রতি একটা আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়া হইবে,—এই-সকল উদ্দেশ্য লইয়া আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যই যে আশ্রমে সফল হইয়াছে তাহা নহে, তবে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর অষ্ট্রীয়ার ভিক্ষুক-সংখ্যা যে কমিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ভিক্ষুকদের সংখ্যা অত্যধিক ছিল। অনেক স্থানে ভিক্ষুকেরা দাবী করিয়া ভিক্ষা আদায় করিয়াছে এবং এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে ভয় দেখাইয়া ভিক্ষা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া তাহারা বলপ্রয়োগও করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রদেশে আর কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে ভিক্ষা করিতে দেখা যায় না, এবং ভিক্ষা করা অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষুকের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন কম হইয়াছে।

ভিয়েনা নগরের কয়েক মাইল মাত্র দূরে কোর্ণয়বুর্গ নামক একটী গ্রামে এই আশ্রমটী স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমে বহুসহস্র লোককে স্থান দেওয়া হয়। একটা দালানেই প্রায় এক সহস্র ভিক্ষুকের স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রথম দেখিলে ইহাকে একটা দুর্গ বলিয়া মনে হয়। ইহার চতুর্দ্দিক উন্নত প্রাচীরে বেষ্টিত। দরজায় সর্ব্বদাই সঙ্গীন বন্দুকধারী সৈন্যগণ পাহারা দেয়। সেখানে আলস্য করিলে অন্ন জোটে না, পরিশ্রম করিয়া সকলকেই অন্নের সংস্থান করিতে হয়। সাধারণ জেলের কয়েদীদের সহিত ইহাদের পার্থক্য এইটুকু যে ইহারা নিজেদের সংব্যবহার ও কার্য্যতৎপরতা দ্বারা সহজেই মুক্ত হইতে পারে। অবশ্য কাহাকেও একবারে তিন বৎসরের অধিক কাল সেখানে রাখিবার নিয়ম নাই। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ধারণা যে যাহারা সেখানে প্রবেশ করে তাহারা সকলেই অকর্ম্মা ও অপদার্থ।

কোর্ণয়বুর্গের আশ্রম কেবল অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষদিগের জন্য। সেখানে পাঠানোর পূর্ব্বে ১৮৮৫ সালের "ভিক্ষুক আইন" অনুসারে সেখানে যাইবার যোগ্যতা বিচার করিয়া পাঠাইতে হয়। বিচারক ইচ্ছা করিলে সেখানে না পাঠাইয়া জেলেও পাঠাইতে পারেন। অবশ্য কেহ যদি প্রমাণ করিতে পারে যে সে সাধুভাবে কাজের অনুসন্ধান করিতেছিল কিন্তু পায় নাই তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয় না।

১৯০১ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯০২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে কোর্ণয়বুর্গের আশ্রমে ৮১১ জন লোক ছিল। তাহার মধ্যে ২৯৩ জন সেই এক বৎসরেই আসিয়াছিল। সেই ২৯৩ জনের মধ্যে—

৮১ জনের বয়স ১৮ হইতে ২৪এর মধ্যে
৫২ " " ২৪ " ৩০ "
৬৪ " " ৩০ " ৪০ "
৬৬ " " ৪০ " ৫০ "
২৭ " " ৫০ " ৬০ "

এবং ৩ জনের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক। ইহার মধ্যে সূত্রধর, মিস্ত্রী, মুচি, মেথর, নাপিত, মজুর প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ব্যবসায়াবলম্বী লোকই ছিল। ১৪৪ জন চুরী, জুয়াচুরী প্রভৃতি অপরাধে ইতিপূর্ব্বেই শাস্তি পাইয়াছিল এবং ২৯৩ জনের মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিল বিবাহিত।

লোকগুলিকে পৃথক পৃথক তিনভাগে ভাগ করিয়া রাখা হয়। নূতন কেহ আসিবামাত্র তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়; প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন না পাইলে কাহাকেও তিন বৎসরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। প্রত্যেক শ্রেণীর লোককেই সর্ব্বদা কাজ করিতে হয়। প্রাতে ৫ টার সময় নিদ্রাভঙ্গের ঘণ্টা পড়ে এবং ৬ টার মধ্যে হাত মুখ ধোয়া, পোষাক পরা ও আহারাদি শেষ করিয়া তাহাদিগকে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ৬টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজের সময় এবং তাহার পরেই আহার। আহারাদির বন্দোবস্ত খুব ভাল এবং যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করান হয় তদনুসারেই বলকারী আহার দেওয়া হয়। সাড়ে এগারটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময়, শীতকালে সাড়ে চারটা হইতে ৬টা এবং গ্রীষ্মকালে ৭টা পর্য্যন্ত পুনরায় কাজ করিতে হয়। এক ঘণ্টা বিশ্রামের পরে সান্ধ্য আহার। শীতকালে রাত্রি ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত পুনরায় কাজ করিতে হয়।

কাজে অবহেলা করিলে তাহাকে কোনো অনুগ্রহ দেখানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্জ্জন একটা গৃহে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপযোগী সামান্য রুটী ও জল ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। অধিকাংশ লোকেই সেখানে মনোযোগ সহকারে কাজ করে, এবং কাজ না করার জন্য খুব অল্প লোককেই শাস্তি পাইতে হয়। এমন দৃষ্টান্তও অবশ্য আছে যে একজন নানা শাস্তি বহন করিয়াও তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও কোনো কাজ করে নাই। রীতিমত কাজ করিলে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি পাইবে এই আশায় সকলেই কাজে প্রাণপণ যত্ন করে। যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা কাজে সামান্য একটু আলস্য প্রকাশ করে, ততদিন তাহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হয় এবং মনোযোগ দিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে হইলে কয়েদীর শুধু ভাল কাজ করিলেই চলেনা, তাহার ব্যবহার ভাল হওয়া চাই এবং সে যে বিশ্বাসের পাত্র ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক। এই শ্রেণীতে যাহারা থাকে তাহাদিগকে কাজের জন্য যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, এবং সেখানে যাহা তাহাদের খরচ হয় তাহা বাদে অবশিষ্টের অর্দ্ধাংশ তাহারা আত্মীয় বন্ধুদের নিকট প্রত্যেক সপ্তাহেই পাঠাইতে পারে। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা জমা রাখিতে হয় এবং বাহিরে আসিয়া যাহাতে পুনরায় ভিক্ষা করিতে না হয়, সেজন্য খালাস পাওয়ার সময় সেই সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোকেরা নানাবিধ কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা ঘর ঝাঁট দেওয়া রান্না করা প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করানো হয়; আশ্রমে কোনো স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রথম শ্রেণীতে আরো একটা বন্দোবস্ত আছে। বাহিরের লোকে মজুরের কাজ করার জন্য তাহাদের ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্তই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত করিতে হয় এবং আবশ্যক-মত ইহাদের প্রত্যেক দলে একজন বা ততোধিক করিয়া ওভারসিয়ার কার্য্য পরিদর্শন ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দেওয়া হয়। যদি কেহ পলাইতে চেষ্টা করে, তবে পুনরায় তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হয়।

আশ্রমের সমস্ত কার্য্যভারই একজন ডাইরেক্টর বা অধ্যক্ষের উপর নির্ভর করে। সাধারণ জেলের জেলরদের অপেক্ষা তাহার কার্য্য অনেক কঠিন। লোকগুলিকে শাস্তি দেওয়া ও শাসনে রাখাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, তাহাদের ভিক্ষা প্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহাদের মনে একটা আত্মসম্মানের ভাব জাগাইয়া দেওয়াই তাহার কার্য্য। শাস্তি দেওয়াও যেমন তাহার কাজ তেমনি কাহারও ভিতরে কার্য্য করিবার বিন্দুমাত্র স্পৃহা দেখিলে তাহাকে উৎসাহ দেওয়াও তাহার একটা কর্ত্তব্য। এইরূপ সময়মত উৎসাহ না পাইলে এই-সমস্ত অপদার্থদিগকে সংশোধন করা সম্ভব নহে। শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতির প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। মিঃ হর্‌লান্‌-ডার একদিন ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আশ্রমের এত উন্নতি হইয়াছে।

সমস্ত কার্য্যে, অধ্যক্ষের স্বাধীনতা থাকিলেও তিনি যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। প্রতি মাসে দুইবার করিয়া কার্য্যকারী সমিতির অধিবেশন হয়। আশ্রমের ডাক্তার পুরোহিত এবং অধ্যক্ষ তাহার সভ্য। সেই সভায় সকলকেই আপন আপন কর্ম্মের জন্য কার্য্যের জবাবদিহী করিতে হয়। কেহ যদি মনে করে যে অধ্যক্ষ তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন তবে সে নিজেই সমিতির কাছে নালিশ করিতে পারে। এ সুযোগ হইতে যাহাতে কেহ বঞ্চিত না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতে একটা বিচারসভা গঠন করিয়া অধ্যক্ষ গত ২৪ ঘণ্টার সমস্ত কার্য্য ও অভাব অভিযোগের মীমাংসা করেন, তাঁহার পার্শ্বে একজন কেরাণী থাকেন তিনি সমস্ত কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্যদের দ্বারা বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়, কারণ সময় সময় কয়েদীগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়া নানা বিপদ ঘটাইয়া থাকে। বিচারের সময় অনেক কয়েদীই অতি সুন্দর ভাবে নিজ পক্ষ সমর্থন করে এবং দুই এক জনকে এমনও দেখা যায় যে কৌন্সিলের মত বিপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কখনও তাহাদের ভয় পাইতে দেখা যায় না। অধ্যক্ষের ন্যায়পরায়ণতায় ও সদাশয়তায় তাহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এবং অনেকে তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করে। অবশ্য নিম্ন কর্ম্মচারীদের তাহারা তেমন ভাল চোখে দেখে না। অধ্যক্ষকে যে-সমস্ত অপরাধের বিচার করিতে হয় তাহার কোনোটাই তেমন গুরুতর নহে, কারণ অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ হইলে তাহাকে সাধারণ বিচারালয়ে পাঠানো হয়। বিচারের সময় আসামীর অতীত ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়; কাহাকেও তিরস্কার করা হয়, কাহাকেও বা সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, আবার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া নির্জ্জন কারাবাসেরও আদেশ দেওয়া হয়।

আশ্রমটী এমন সুন্দর ও এমন সুসজ্জিত যে দেখিলে কেহ ভিক্ষুকদের বাসস্থান বলিয়া ঠিক করিতে পারে না। ঘরগুলি সুন্দর এবং সেগুলিতে যথেষ্ট বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেককেই একখানি করিয়া খাট, একটী মাদুর একটী বালিশ ও দুইটী বড় গরম কম্বল দেওয়া হয়। কাজ করিবার সময় বাজে গল্প সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সাধারণ জেলের কয়েদীদের অপেক্ষা ইহারা অধিক দুর্দ্দান্ত, এবং ইহাদের মুখে ধূর্ত্তামি প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়।

নির্জ্জন কক্ষগুলি সাধারণতঃ ইংরেজদের জেলখানার নির্জ্জন কক্ষগুলির মত। যাহারা আর কিছুতেই সংশোধিত না হয় তাহাদিগকে

এইখানে রাখা হয়। একজন সৈন্য তিন বৎসর পর্য্যন্ত নানাবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও কোনো কাজ করে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিয়াছিল, "বাহিরে থাকিতে আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজের অনুসন্ধানে ঘুরিয়াছি, তখন আমাকে কেহ কাজ দেয় নাই। তখন কাজ দিলে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে করিতাম, কিন্তু এখানে মরিয়া গেলেও আমি কোন কাজ করিব না।" সপ্তাহে তিনদিন তাহাকে উপবাস করানো হইয়াছে, তবুও কিছুতেই সে সংকল্পচ্যুত হয় নাই। কাজ না পাইয়াই সে ভিক্ষা চাহিয়াছিল; সে আর যাহাই হোক ভিক্ষুক নহে। তবু পুলিশ তাহাকে যখন গ্রেপ্তার করিয়াছে, তখন কাজ সে কিছুতেই করিবে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক এখানে বদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত নয়।

কোর্ণয়বুর্গ আশ্রমের খরচ সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির আয় হইতেই চলে না। আশ্রম স্থাপনের সময় গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতির খরচ সমেত মোট ৫৪৮৭৫৫ ফ্লোরিণ (এক ফ্লোরিণ প্রায় পাঁচসিকা) খরচ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৩০০০০০ ফ্লোরিন্ অষ্ট্রীয়ান্ গবর্ণমেণ্ট এবং অবশিষ্ট স্থানীয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট্ দিয়াছেন। এক বৎসরে আশ্রমে আহারাদির ব্যয় সহ মোট ৩৩৯০০৮ ফ্লোরিণ ব্যয় হইয়াছিল, এবং সেই বৎসরে আশ্রমে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করিয়া ২৭৮৫০৪ ফ্লোরিণ পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং এক বৎসরে ৬০৫০৪ ফ্লোরিণ অর্থাৎ ৭৫৬৩০ টাকার অভাব হইয়াছিল। এই-সমস্ত অভাবই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। অষ্ট্রীয়ান গবর্ণমেণ্ট একবার কোনো আশ্রমের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেলে আর কোনো সাহায্য দেন না। গড়ে আশ্রমের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বাৎসরিক আয়ের ৮/১০০ ব্যয় করে।

ভিক্ষুকদের শাস্তি দিবার বা সংশোধন করিবার পক্ষে কোর্ণয়বুর্গের আশ্রম বেশ কাজ করিতেছে। ১৯০১-০২ সালের ৩৩০ জন লোকের মধ্যে ২৮০ জন তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা দেখা যায় যে আশ্রমে থাকায় অনেকেরই কাজ করিবার স্পৃহা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। সেখান হইতে একবার আসিলে পুনরায় সেখানে যাইতে বড় একটা দেখা যায় না। ২৯৩ জনের মধ্যে কেবল ৭ জনকে পুনরায় আশ্রমে পাঠাইতে হইয়াছে।

সকল দেশেই এইরূপ আশ্রম স্থাপিত হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ভিক্ষুক ও দরিদ্র সকল দেশেই আছে। তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া কিম্বা একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ফেলা যখন সম্ভব নহে তখন এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব সৎ ও সম্মানের পথে আনিবার চেষ্টা করা সকল দেশেরই রাজশক্তির ও গণশক্তির একটা কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুরেশ।

নির্ব্বাচন

ছন্দ গেঁথে কাব্য লেখা
সে যে বড় শক্ত;
চৌদ্দ গুনতে হদ্দ হ'য়ে
চোকে উঠে রক্ত।

প্লট এঁকে ছোট গল্প—
লিখেছিলেম চা'রটে;
সমালোচক ব'লে দেছেন—
মারা গেছে আর্টে!

ইতিহাসটা লিখতে আমার,
খুবই ছিল ইচ্ছে;
প্রতিবাদের জবাবদিহি
বড্ড বিতিকিচ্ছে!

ভাষাতত্ত্ব লিখতে গিয়ে
আগাগোড়া পণ্ড;
পণ্ডিতের গণ্ডগোলে
সবি লণ্ডভণ্ড!

যত্ন ক'রে প্রত্নতত্ত্ব
লিখেছিলেম মাত্র;
আমি পড়ি "জৈত্রবর্ম্মা"
তিনি পড়েন "জাত্র"!

যেদিক দিয়ে হাতটী বাড়াই
সেদিক দিয়েই খট্‌কা;
কোনোটাতে বোমা ফাটে
কোনোটাতে পট্‌কা!

এখন আমার সাধ হ'য়েছে—
সমালোচন ধর্ব্বো;
ডি, এল, রায়ের "টীয়ে"র মত
সুধুই "ছি ছি" কর্ব্বো!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

কঞ্জীবরম হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়

আজ পর্য্যন্ত যে-সকল জাতীয় হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয় দেখিয়াছি তন্মধ্যে দুইটির কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। জলন্ধরের কন্যা-মহাবিদ্যালয় ও কঞ্জীবরমের হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়। শেষোক্তটি যে আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সোমসুন্দর শাস্ত্রী।

বাস্তবিকই ইহা একটি আদর্শ বিদ্যালয়। আট বৎসর পূর্ব্বে দেওয়ান বাহাদুর সোমসুন্দর শাস্ত্রী (সভাপতি) ও শ্রীযুক্ত রামনাথন শর্ম্মা (তত্ত্বাবধায়ক) কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া, প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী ও অন্যান্য শিক্ষকের যত্নে বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। ৫ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের হিন্দু-বালিকারা এখানে শিক্ষালাভ করে। পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় পাঁচ বৎসর। যে বালিকা পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে সে দশ বৎসরে পাঠ শেষ করিবে। সাধারণতঃ

শ্রীযুক্ত রামনাথন্ শর্ম্মা।

বালিকাদের বয়স ৭ হইতে ১২র মধ্যে। শিক্ষণীয় বিষয় :—তামিল ও তেলুগু সাহিত্য, সাধারণ ভূগোল, ভারতবর্ষের ইতিহাস, অঙ্ক, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম, সঙ্গীত ও অঙ্কন। ব্যায়ামের প্রতি তাহাদের খুব লক্ষ্য ; মধ্যে মধ্যে দল বাঁধিয়া তাহারা বনভোজন বা ভ্রমণ করিতে বাহির হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে তাহাদিগকে জন্তু-

কঞ্জীবরম হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী (মধ্যস্থলে) এবং ছাত্রীবৃন্দ।

জানোয়ার ও গাছপালা দেখাইয়া উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিতত্ত্ব শিখান হয়।

মান্দ্রাজে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত না থাকাতে বালিকারা দুই জন বা চার জন করিয়া দল বাঁধিয়া পদব্রজে ইস্কুলে আসে। বন্ধ-গাড়ীর মধ্যে ভরিয়া বাড়ী হইতে স্কুলে এবং স্কুল হইতে বাড়ীতে আজাড় করিয়া ফিরিবার ব্যবস্থা নাই। আলো বাতাস স্বাধীনতা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।

স্কুলে পৌঁছিয়া দেখিলাম মেয়েরা সকলে পাঁচটি সারে দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক সারে একজন করিয়া বালিকা রেকাবিতে কুস্কুম ও চন্দন লইয়া দাঁড়াইয়া। তাহারা সকলের কপাল উহা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া প্রার্থনাসঙ্গীত গাহিল। ইতিমধ্যে শিক্ষকেরা ছাত্রীদিগকে দেখিয়া লইলেন—সকলের স্বাস্থ্য ভালো আছে কি না, বা কেহ অনুপস্থিত আছে কি না। সকালে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ইস্কুলের কাজ চলে এবং দুপুর বেলায় ইংরাজি, সংস্কৃত প্রভৃতি বিশেষ ক্লাশের অধিবেশন হয়।

এই বিদ্যালয়ের সবিশেষ দর্শনযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার শিক্ষাদানপ্রণালী। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে ইহাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই, অথচ পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে যে পরিমাণ শিখাইয়া দেওয়া হয় ছেলেদের ইস্কুলে দশ বৎসরেও ততটা শিক্ষা হয় না। আপাততঃ ছয়টি ক্লাশ আছে। মেয়েদের মাতৃভাষা তামিল ও তেলুগুর সাহায্যেই শিখান হয়। শুনিলাম তামিল ভাষায় যুক্তাক্ষর লইয়া সর্ব্বসমেত তিন শত অক্ষর। সেগুলির আকার আবার এতই জটিল যে উহা আয়ত্ত করিতে শিশুদের প্রায় দেড় বৎসর লাগে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রণালীতে মেয়েরা দু' তিন মাসের মধ্যে অক্ষর চিনিয়া লয়। সকল তামিল অক্ষরেই পাঁচটি বক্র-রেখা আছে। এগুলি অক্ষরেরই অংশবিশেষ। বক্ররেখার সহিত সাদৃশ্য আছে মেয়েদের পরিচিত এমন কোনো গার্হস্থ্য দ্রব্যের নামে রেখাগুলিকে নির্দ্দেশ করা হয়। কোনো বক্ররেখার সঙ্গে হয়ত 'কোলহাক' নামক চওড়া আংটার সাদৃশ্য আছে, সেইজন্য সেই রেখাটিকে 'কোলহাক' নামে নির্দ্দেশ করা হইল। প্রত্যেক অক্ষরের জন্য একটি বিশেষ নিয়মে ব্ল্যাকবোর্ডের উপর বক্ররেখাগুলি অঙ্কিত করিয়া মেয়েরা অক্ষরগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিখে।

অঙ্কের মত নীরস বিদ্যাও শিশুদিগকে মুখে মুখে

কঞ্জীবরম্ বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী ও প্রত্যেক শ্রেণীর এক-একটী ছাত্রী।

ন্যায়। শব্দ লিখিতে শিখিলেই শিশুদিগকে তাহাদের ভাঙা ভাঙা ভাষায় শ্লেটে লিখিতে বলা হয় —তাহারা বাড়ী ফিরিবার পথে কি দেখিয়াছে, বাড়ীতে কি করে ইত্যাদি। ক্রমশ যখন তাহারা উপরের ক্লাশে ওঠে তখন শ্লেটের পরিবর্ত্তে কাগজ ব্যবহৃত হয়, আঁকাবাঁকা লেখা সুন্দর হস্তলিপিতে পরিণত হয় ও অসম্বদ্ধ রচনা ধারাবাহিক রোজনামচার আকার ধারণ করে। রোজনামচা লেখার দরুণ মেয়েদের চিন্তিত বিষয় প্রকাশ করিবার অভ্যাস হয়, শিক্ষকেরাও জানিতে পারেন ছাত্রীরা কি উপায়ে দিন কাটায়। ছাত্রীরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে, উদাহরণ স্বরূপ একটি উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধটি আকবরের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে, শর্ম্মা মহাশয় ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন।

একীকরণ নীতি—তিনি সাম্রাজ্যের খণ্ডাংশগুলিকে দৃঢ় অথচ কোমল হস্তে এক করিয়াছিলেন।

তুষ্টিসাধন নীতি—রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষার জন্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি বিজিত হিন্দুপ্রজাদের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করিয়াছিলেন ও হিন্দু মুসলমানের বিবাহে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

উদার নীতি—তিনি তাঁর সকল প্রজাকেই স্ব স্ব ধর্ম্মে বিশ্বাস করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। সকলেই নিজ নিজ রীতিনীতি অনুসারে চলিতে পারিত।

এই উদার মত ও দূরদর্শিতার সাহায্যেই আকবর মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনে হয় প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য তিনি খুব সচেষ্ট ছিলেন।

অতি সহজে শিখান হয়। ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক শিশুই ১ হইতে ৪, ৫ পর্য্যন্ত গুণিতে পারে। শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন—'এ ক্লাশে তোমার কোনো বন্ধু আছে?'—'হ্যাঁ আছে।' 'তাদের বেছে নিয়ে এক ধারে দাঁড় করাও। কজন হ'ল?'—'পাঁচ।' 'ওদের দু দলে ভাগ কর। এক এক দলে কজন ক'রে হ'ল?' .. শিক্ষক এই উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে শিশুটিকে যোগ, বিয়োগ, গুণ প্রভৃতি শিখাইয়া থান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহাদের কোনো মুদ্রিত নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। বৎসরকে তাহারা দুইটি অসমানভাগে বিভক্ত করে। প্রথম অংশ অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালস্থায়ী। এই সময়ে শিক্ষকেরা সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক হইতে বিশেষ বিশেষ পাঠ নির্ব্বাচন করিয়া এবং উহা ছাত্রদের উপযোগী টীকা সম্বলিত করিয়া শিখান। বৎসরের শেষাংশ বিদ্যালয়ের পাঠ্য-নির্ব্বাচন-কমিটি, তামিল ও তেলুগু রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, বীর সাধু ও কবির জীবনী হইতে প্রত্যেক ক্লাশের উপযোগী পাঠ নির্ব্বাচন করেন। তারপর শিক্ষকেরা সেই পাঠগুলিতে টীকা সংযোজনা করিয়া দ্যান।

পাঠ সমাপনান্তে ছাত্রীগণকে পাঠের সারাংশ নিজের কথায় বিবৃত করিতে হয়। শিক্ষক উহা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিলে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য ছাত্রী উহা রাখিয়া

মান্দ্রাজে জঘন্য বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের মেয়েদের বারো বৎসর বা তৎপূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া বিভিন্ন দেশের ইতিহাস বা বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস শিখানো সম্ভব নয়। প্রাচীন মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের ভারতের অবস্থা,

কঞ্জীবরম হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি।

সভ্যতা ও উন্নতির পরিচায়ক ও ভারতের উন্নতি ও অবনতির কারণ নির্দ্ধারক কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া পড়ানো হয়।

ছাত্রীরা অঙ্গভঙ্গী সহকারে নানাপ্রকার গান গাহিতে শেখে। যেমন স্ত্রীলোকের কাজ দেখাইবার সময় তাহারা হস্তসঞ্চালন করিয়া দেখায় কেমন করিয়া সে বাড়ী পরিষ্কার করে, জল আনে বা রুটি তৈয়ারি করে। চাষীর জীবন-যাত্রা দেখাইবার সময় অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা দেখায় কেমন করিয়া সে ক্ষেত্রকর্ষণ বা বীজবপন করে, কিরূপে শস্য কাটে ইত্যাদি। কয়েকজন বালিকা কালিদাসের শকুন্তলার মূক অভিনয় করিয়াছিল। যেখানে মনের যে ভাব হওয়া উচিত সেখানে সেই ভাব মুখে তাহারা চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। শকুন্তলার কতক অংশ তাহারা ইংরাজিতে ও সংস্কৃতেও অভিনয় করিয়াছিল।

মেয়েরা প্রস্তুত না হইয়াই বক্তৃতা দিতে পারে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর তিনটি বালিকাকে যে-কোনো বিষয়ে বক্তৃতা দিতে বলাতে তাহারা মাতৃভাষায় (তেলুগু) রাণী সংযুক্তা, চন্দ্রগুপ্ত ও তামিল সাধ্বী রমণী করকল দেবীর বিষয়ে প্রায় দশ মিনিট করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিল।

এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, এখানে ছাত্রীরা কেমন করিয়া ভাবিতে হইবে ও কি ভাবিতে হইবে তাহা শিক্ষা করে।

বিদ্যালয় ছাড়িয়া পরের ঘরে বধূ হইয়াও ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত নিয়মিত পত্রব্যবহার করে, তাঁহাকে তাহাদের নূতন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী জানায়। পড়াশুনার চর্চ্চাও তাহারা ছাড়ে না। নিম্নে এইরূপ দুইখানি পত্রের অনুবাদ দেওয়া গেল :—

(১)

পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী,—

আজ তিনমাস পরে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ ও ননদেরা আমাকে কতক কতক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট ননদটি বড়ই দুষ্টুমি করিত, মার কাছে আমার নামে নালিস করিত। আমি কিন্তু এসব অন্যায় অভিযোগ শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকিতাম, সত্য নিরূপণ করিবার ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়া কোনো দোষ বা ভুল করিলে আমি নিজে গিয়াই মার কাছে স্বীকার করিতাম ও নীরবে বকুনি সহ্য করিতাম। এখন এঁরা আমাকে সম্মান ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই এঁরা আমার সম্যক পরিচয় লাভ করিবেন। শর্ম্মা মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকদিগকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

(২)

পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী,—

"বালিকা-ভূষণ" শেষ করিয়াছি। বইখানি আমার বিশেষ ভালো লাগিল না। মূল উপাখ্যানটি নানা অবান্তর কথার ভিড়ে চাপা পড়িয়াছে। গল্পের প্লট নির্ব্বাচনে গ্রন্থকারের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া

কুমারী মঙ্গলা।
তেলুগু জাতীয়া এই বালিকা প্রস্তুত না হইয়াই রাণী সংযুক্তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, এবং দময়ন্তীকে ত্যাগ করার জন্য নলের খেদ আবৃত্তি করে।

কুমারী সুব্বালক্ষ্মী।
এই বালিকা সাধ্বী করকাল দেবী সম্বন্ধে বক্তৃতা করে।

শকুন্তলা নাটকের মূক-অভিনয়-কারিণী।
অর্থাৎ বায়োস্কোপে যেমন কেবল অঙ্গভঙ্গী দ্বারা গল্পটি বুঝান হয়, তদ্রূপ অভিনেত্রী।

শকুন্তলা নাটকের ইংরেজি ও সংস্কৃত অভিনয়কারিণী বালিকাবৃন্দ।
দ্বিতীয় সারের ডাহিন দিকে কুমারী বেঙ্কাম্মা চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিল।

যায় না। ইহা দ্বারা কোনো নীতিশিক্ষা হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। যদি পয়োজন বোধ করেন ত আমি ইহার একটা চুম্বক লিখিয়া দিব।

আপনার পত্রে জানিতে পারিলাম যে মহিলা-পরিষদের সভা নিয়মিতরূপে আমাদের ইস্কুলে বসিতেছে। মহিলারা যে এখন এবিষয়ে এত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন ও নারীসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকেন ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতে পিতার নিকট তামিল সাহিত্য, সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা একজন উৎকৃষ্ট কবি ও লেখক ছিলেন। বেদবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, অনেক বেদগান তিনি তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী দেবীর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে শিক্ষয়িত্রীগণের কলেজে পড়াইতে অনুরোধ করেন। এইখানে সাড়ে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। প্রথমে তিনি মান্দ্রাজের বিজয় নগরের মহারাজার বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত হন। তারপর কাঞ্চিপুরের হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল, পার্ব্বতী দেবীর বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রায় তিন বৎসর পল্লীগ্রামে চুপচাপ বসিয়া ছিলেন। এমন সময় কঞ্জীবরম বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতারা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া কর্ম্মগ্রহণ করাইলেন। এটি ১৯০৪ সালের কথা, তখন বিদ্যালয়ের বয়স মাত্র এক বৎসর।

বিদ্যালয় হইতে মাসে মাসে বৃত্তিস্বরূপ তাঁহার পঁচিশ

শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী।

টাকা করিয়া পাইবার কথা, কিন্তু বিদ্যালয়ের অর্থাভাব হেতু এ টাকাও তিনি নিয়মিতরূপে পান নাই। শুধু তাহাই নয়, অনেক সময় তিনি বিদ্যালয়ের খরচ চালাইবার জন্য স্বীয় অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন!

কঞ্জীবরমের যে-সব পরিবারে বালিকা আছে সে সকল পরিবারেরই তিনি যথার্থ বন্ধু। গৃহিণীদের নিকট গিয়া তিনি নারীগণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দ্যান। ছাত্রীদের বাড়ী গিয়া তিনি কেবল তাহাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির খোঁজ করেন এমন নয়, রোগের সময় তাহাদিগকে স্বহস্তে শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করেন।

তাঁহার কার্য্য কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে নিবদ্ধ নহে। কঞ্জীবরমের বয়স্কা মহিলাদিগকে লইয়া সভাসমিতি গঠন করিয়া তিনি তাহাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি-বিধানে সর্ব্বদা সচেষ্ট।

মুকুন্দি লাল।

গীতাপাঠ

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি॥ ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনাদি'র সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগত অভিপ্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি কিরূপ বুঝি —এই না তোমার জিজ্ঞাসা? ঐ শাস্ত্র-রহস্যটি আমি কিরূপ বুঝি তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি আপনি কিরূপ বোঝো তাহা যদি তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে —আমি বেস্ বলিতে পারি যে, তাহার সদুত্তর পাইতে তোমার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না, কেননা, আমি আমার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি যে, তুমি যে-সমাজের একজন মাথালো গোচের কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি, এমন কি নেতা বলিলেই হয়, সে সমাজে (অর্থাৎ কৃতবিদ্য সমাজে) এ কথা না-জানে এমন লোকই নাই যে শাস্ত্রীয় রহস্যের সাংকেতিক ভাষার বাহিরের অর্থ যাহা চাসাভূসা শ্রেণীর অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বোধসুলভ তাহা স্বতন্ত্র, আর, তাহার ভিতরের অর্থ যাহা ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে "বুঝিতে পারি না" বলা নিতান্তই লজ্জার বিষয়, তাহা স্বতন্ত্র; নারিকেলের ছোব্‌ড়া স্বতন্ত্র, আর, নারিকেলের সাঁশ স্বতন্ত্র*; দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের দেশের নিখিল পুরাণশাস্ত্রের এই যে একটি সুপ্রসিদ্ধ কথা যে, অনন্তসর্পের সহস্র মস্তকের উপরে সসাগরা পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, এ কথার মূলে যদি কোনো সত্য থাকে তবে তাহা এই যে, "অনন্ত সর্প" কিনা অনন্ত কাল বা অনন্ত আকাশ; "সহস্র মস্তক" কিনা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের সমবেত আকর্ষণী শক্তি। পুরাতন গ্রীসের তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা "আপনার ল্যাজ আপনি গিলিতেছে" এইরূপ একটা সর্পমূর্ত্তি আঁকিয়া আদি-অন্ত-বিহীন মহাকালের ভাব রূপকচ্ছলে জ্ঞাপন

---

* সাঁশ-শব্দ সারাংশ-শব্দের অপভ্রংশ; আর, সেই জন্য তাহার প্রকৃত বানান "সাঁশ" এইরূপ; "শাঁস" এরূপ নহে।

করিতেন, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। আমার তাই এইরূপ মনে হয় যে, গণিত-শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অসীমতা-জ্ঞাপক সাংকেতিক চিহ্নটি, [৪] এই চিহ্নটি একটা স্বলাঙ্গুলগ্রাসী সর্পমূর্ত্তির অপভ্রংশ। অতএব এ বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই যে, অনন্তনামধারী সর্প অনন্ত মহাকালের তথৈব অনন্ত মহাকাশের একটা রূপকচিত্র ছাড়া অর্থাৎ পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে বলে Hieroglyphic তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। শাস্ত্রীয় ভাষার রহস্য-মন্দিরে এ-যেমন একটা রূপক চিত্র দেখা গেল—জগৎপাতা ভগবানের চতুর্ভুজমূর্ত্তি সেইরূপ একটা রূপক চিত্র বই আর কিছুই নহে। তার সাক্ষী:—

বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তে শঙ্খ কিনা শব্দগুণের আধার আকাশ; আর এক হস্তে চক্র—কিনা কাল-চক্র; আর এক হস্তে গদা—কিনা মৃত্যু; আর এক হস্তে পদ্ম কিনা জীবনের বিকাশ। এই রূপক চিত্রটির মুখ্যগত অর্থ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; তাহা এই যে, আকাশ, কাল, এবং সমস্ত দেশ কাল জুড়িয়া জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গ-দোলা যাহা নিরন্তর দোলায়মান হইতেছে সমস্তই ঈশ্বরের হস্তের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি তাই দেখিতে বলি এই যে, একটা চন্দ্র-মণ্ডলের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে প্রেয়সীর মুখাকৃতি মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা, অথবা, একটা সহস্র মস্তক সর্পের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে অনন্তের ভাব মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা যেমন নিতান্তই একটা বিসদৃশ চেষ্টা, তেমনি, চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির একটা ছবি বা প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে ভগবানের সর্ব্বব্যাপী নিত্য এবং আদ্যন্তবিহীন ঐশ্বর্য্যের ভাব মনে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা নিতান্তই একটা বিসদৃশ চেষ্টা। এ-সকল রূপক-চিত্রের (অর্থাৎ Hieroglyphic এর) প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তাহা কাব্য-প্রণেতা কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও যাহা বলিবেন, আর, শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও তাহাই বলিবেন;—করুণার্দ্রচিত্তে তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া উভয়েই তোমাকে একবাক্যে বলিবেন "তোমাকে তোমার মনোমধ্যে কোনো প্রকার ছবি আঁকিতে বলিতেছি না; বলিতেছি কেবল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে। সে যে ভাব রূপাতীত! আর, রূপাতীত বলিয়া তাহা অপরূপ-শব্দের বাচ্য।* তাহার রূপ চর্ম্মচক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না, মনশ্চক্ষের সম্মুখেও গড়িয়া দাঁড় করানো যায় না; তাই তাহাকে বলা হয় "অপরূপ"। তুমি যদি ভাবুক বা প্রেমিক হও, তবে ভাব-চক্ষে অতি-সহজে তাহা দেখিতে পাইবে; আর, তুমি যদি শুষ্ক তার্কিক হও তবে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও তাহা দেখিতে পাইবে না - বাহিরেও না—ভিতরেও না।" কবি বলিবেন "সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য ভাবে-হৃদয়ঙ্গম করিবার বস্তু, তা বই, তাহা চক্ষে-দেখিবার বস্তুও নহে—পটে-আঁকিবার বস্তুও নহে;—লেখ্যপটেও না—চিত্তপটেও না।" শাস্ত্রকার ঋষি বলিবেন "ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অপরিসীম, এবং অনির্ব্বচনীয়! তাহা ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভক্তির সহিত প্রশান্ত-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার বস্তু, তা বই তাহা লেখ্যপটে বা মানসপটে আঁকিবার বস্তু নহে।" কবি বলিবেন "সুন্দর বদনের রূপমাধুর্য্য বর্ণনাতীত বলিয়া আমরা উজ্জ্বল এবং সুন্দর বস্তু যাহা যখন হাতের কাছে পাই তাহারই সঙ্গে তাহার তুলনা দিই, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না;—সুন্দর মুখের অনুপম শ্রীকে পূর্ণচন্দ্রনিভ বলিয়াও আমাদের মন তৃপ্তি মানে না; তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তাই বলি 'ইন্দুবিনিন্দিত,' বলি—'চন্দ্রকে তাহা লজ্জা দ্যায়'। মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র জুলিয়েটের রূপ-মাধুর্য্যের কথা যাহা রোমিওর মুখ দিয়া বাহির করাইয়াছেন—তা তো তুমি জানো! রোমিও বলিতেছে—

> 'But soft! What light through yonder window breaks!
> It is the east, and Juliet is the sun!—
> Arise, fair sun, and kill the envious moon,
> That thou, her maid, art far more fair than she!'

ইহার টীকা

পুরাতন গ্রীসের পুরাণ-শাস্ত্রে লেখে—Diana নাম্নী দেবী চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (সংক্ষেপে—চন্দ্রদেবীর) পরি-চারিকা; আর সেই সঙ্গে এটাও লেখে যে, Diana দেবী কুমারী কন্যাদিগের আদর্শভূতা চিরকুমারী। Romeo'র

---

* একজন নৈয়ায়িক তর্কচূড়ামণি বলিতে পারেন—"অপরূপ রূপ" "অকথিত বাণী" "অনাহত শব্দ" এ-সকল বাক্য বদতো ব্যাঘাত দোষে দূষিত। তিনি তো তাহা বলিবেনই! কবির ব্যথা কবিই জানে।

প্রেম-চক্ষে জুলিয়েট্ সেই Diana দেবী। Romeo তাই চন্দ্রদেবীকে বলিতেছে—'ঈর্ষান্বিতা'; কেননা, চন্দ্রদেবীর পক্ষে এটা কম লজ্জার বিষয় নহে যে, তাঁহার পরিচারিকা (অর্থাৎ Diana দেবী Juliet) তাঁহারা অপেক্ষা শত সহস্রগুণ সুন্দর।"

অতএব এটা তুমি স্থির জানিও যে, পূর্ণচন্দ্রনিভ-বিশেষণটির অর্থ পূর্ণচন্দ্রনিভ নহে; তাহার অর্থ অপরূপ শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভমান।

কাব্য-প্রণেতা কবি তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা বলিলাম; শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি যাহা বলিবেন তাহাও বলিতেছি:—

বলিবেন তিনি—

"উপনিষদে লেখে—

'বিশ্বশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ'

'সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ,' আবার, এটাও লেখে যে,

'অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'

'তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন; চরণ নাই অথচ দ্রুত চলেন; চক্ষু নাই অথচ দেখেন; কর্ণ নাই অথচ শোনেন।'

উপনিষদের দুই স্থানের এই যে দুইটি শ্লোক, এ দুইটি শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে অর্থ এই: -

"সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু"—কিনা তিনি সর্ব্বদর্শী; "সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ" কিনা তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ; "সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু" কিনা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; "সর্ব্বত্র তাঁহার পদ" কিনা তিনি সর্ব্বগত; তা বই, উহার অর্থ এ নহে যে, ঈশ্বর সত্য সত্যই সহস্র-মুখ-চক্ষু-হস্তপদ-বিশিষ্ট বিকটাকার পুরুষ।

প্রশ্ন॥ যদিই বা তোমার এ কথা সত্য হয় যে, গীতা-শাস্ত্রোক্ত নানামুখ-চক্ষুবিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি, তথৈব, চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, একটা রূপক-প্রতিমা মাত্র; কিন্তু এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, গীতাশাস্ত্রের প্রণেতা মহা ঋষি গীতাগ্রন্থের প্রতিছত্রে নর-মূর্ত্তিধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করিতে একটুও বচন-কৌশলের ত্রুটি করেন নাই। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের তৃতীয় চতুর্থ শ্লোক দুইটির সঙ্গে কখনো কি তোমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই? সে দুইটি শ্লোক এই:—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ন মে বিদুঃ সুরগণা প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

"আমার গোড়ার তত্ত্ব দেবতারাও জানেন না, মহর্ষিরাও জানেন না। দেবতাদিগেরও আমি আদিপুরুষ, মহর্ষিদিগেরও আমি আদিপুরুষ। মর্ত্ত্যের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া আমাকে যে ব্যক্তি জানে জন্মবিহীন অনাদি লোকমহেশ্বর, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।"

উত্তর॥ কোন্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "আমি জন্ম-বিহীন"? যিনি দেবকী-গর্ভে জন্মিয়াছেন, সে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—"আমি জন্মবিহীন," তবে আমিও বলিতে পারি—আমি জন্মবিহীন, তুমিও বলিতে পার—তুমি জন্মবিহীন। অতএব যাহার কিছুমাত্র সম্ভবাসম্ভব বা সঙ্গতাসঙ্গত বোধ আছে নিশ্চয়ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, গীতাপ্রণেতা মহাঋষির মর্ম্মগত অভিপ্রায় শুধু এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যিনি শ্রীকৃষ্ণ—আত্মার যিনি আত্মা—সর্ব্ব-জীবের সেই অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা দেবকীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া—কুন্তীর গর্ভজাত অর্জ্জুনের মধ্য দিয়া, বক্তার মধ্য দিয়া—শ্রোতার মধ্য দিয়া, গুরুর মধ্য দিয়া শিষ্যের মধ্য দিয়া, এবং সমস্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া—নিস্তব্ধ গম্ভীর শব্দ-হীন বাক্যে বলিতেছেন "আমি জন্মবিহীন অনাদি লোকমহেশ্বর"। এইরূপ যিনি জন্মবিহীন লোক-মহেশ্বর - যাঁহার পিতা-মাতা নাই -কে তাঁহার নাম রাখি-লেন "শ্রীকৃষ্ণ"? অতএব তাঁহার নাম "শ্রীকৃষ্ণ" হইতেই পারে না।

ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগত অভি-প্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি যেরূপ বুঝি, তাহা তোমাকে পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া খালিয়া বলিলাম। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আমার বুদ্ধিতে আমি তাহা যেরূপ বুঝি, তোমার বুদ্ধিতেও তুমি তাহা সেইরূপই বোঝো; কেবল

—দশজনের মন রক্ষা করিয়া তোমার প্রযত্ন-পোষিত দালপত্যের বিষ-বৃক্ষটির মূলে জলসিঞ্চন করিবার মানসে মুখে শুধু বলিতেছ এই যে, জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে গীতা শাস্ত্রের অভিপ্রায় দশজনে যাহা বোঝে তুমিও তাহাই বোঝো, তাহার অধিক কিছুই বোঝো না। বলিতে কি—তোমার মতো সুপণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখে অমনধারা একটা বিসদৃশ অজ্ঞতা'র ভাণ আমার কাণে বিস্বাদ ঠ্যাকে এম্নি যে, তাহার তিক্ত আস্বাদে নাক মুখ শিট্‌কাইয়া আমার মন অধীরে বলিয়া ওঠে—"এ যে বিনয়ের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি!"

প্রশ্নকর্ত্তা ॥ ঈশ্বরের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে তুমি যেমন বলিলে—কাব্যের অলঙ্কার, অত্যুক্তিকে আমি তেমনি বলি—ভাষার অলঙ্কার। প্রকৃত কথা এই যে, "আমি কিছুই বুঝি না" এটা যেমন অত্যুক্তি, "আমি সবই বুঝি" এটাও তেমনি অত্যুক্তি; দুইই সমান অত্যুক্তি। এটাও কিন্তু বলি যে, মনুষ্যের ন্যায় মর্ত্ত্য জীবের মুখে নরম সুরের ঐ প্রথম অত্যুক্তিটি যেমন শোভা পায়, চড়া-সুরের ঐ দ্বিতীয় অত্যুক্তিটি তেমন শোভা পায় না।

উত্তর ॥ তাহা তো শোভা পায়ই না। কিন্তু ঐ চড়া সুরের অত্যুক্তিটা'র সঙ্গে কী-সূত্রে তুমি যে আমাকে জড়াইতেছ—তাহার বাষ্পও আমি বুঝিতে পারি না। তুমি যদি বলো যে, হিমালয় পর্ব্বত তালগাছের মতো উচ্চ, আর, আমি যদি বলি যে, হিমালয় পর্ব্বতের সঙ্গে তালগাছের তুলনাই হয় না; তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, আমি হিমালয় পর্ব্বতের আদি-অন্ত-মধ্যের সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি। তেমনি, তুমি যদি বলো—"ঈশ্বর সহস্রশিরোমুখগ্রীবাবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষ," আর, আমি যদি বলি যে, "অনাদ্যনন্ত ঈশ্বরের সহিত শিরোমুখ-বিশিষ্ট জীবের তুলনাই হয় না," তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, আমি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

প্রশ্ন ॥ তোমার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমার উদ্দেশ্য কেবল এইটি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া—যে, যে-দুই প্রকার অত্যুক্তির কথা আমি উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে যে-টি চড়াস্বরের অত্যুক্তি সেইটিই কেবল নিন্দনীয় অন্যটি (অর্থাৎ নরম সুরেরটি) মার্জ্জনীয়। এসকল বৃথা বাদ-বিতণ্ডায় কালক্ষেপ না করিয়া তুমি যদি আমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা সদুত্তর দেও, তবে আমার বড়ই উপকার কর। তুমি বলিতেছ যে, যেরকমের মুক্তি গীতা-শাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহার তুমি নিগূঢ় সন্ধান জানিতে পারিয়াছ;—জানিতে পারিয়াছ যে, তাহা ঈশ্বরের মূর্ত্তি-কল্পনা-দূষিত সালোক্যাদি-সংজ্ঞক মুক্তিও নহে, আর, শূন্যাত্মবাদ-দূষিত কৈবল্যসংজ্ঞক মুক্তিও নহে। তাহা যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাহা কোন্ রকমের মুক্তি? তাহা পদার্থটাই বা কি, আর তাহার ভেদ-পরিচায়ক নামই বা কি?

উত্তর ॥ গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুক্তির নাম যদি কিছু থাকে, তবে শাস্ত্রীয় ভাষায়—তাহার নাম জীবন্মুক্তি।

প্রশ্ন ॥ জলাশয়-পানে চাহিয়া কী দেখিতেছ?

উত্তর ॥ দেখিতেছি—রহস্য মন্দ না! মার্ত্তণ্ড-দেবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া জলাশয়ের সলিলেরও যে দশা, আর, আমার শরীরেরও সেই দশা; উভয়েরই দশা সমান; সলিল এবং শরীরের মধ্যে "ডলয়োরলয়োরভেদঃ।" অতএব আজ এই অবধিই ভাল। বর্ষার শুভাগমন হইলে জলাশয়েরও জলপূরণ হইবে, শরীর-মনেরও বলপূরণ হইবে, আর, গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুক্তির সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহারও বাকি-পূরণ হইবে; পাকা আমের সঙ্গে সঙ্গে পাকা-কথার আমদানি হইবে—কিছুরই অপ্রতুল হইবে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যু-মোচন

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের সারমর্ম্ম: স্বামী ফিদিয়ার সহিত লিজার বনি-বনাও ছিল না, নিত্য ঝগড়া খিটিমিটি বাধিত। একদিন লিজা অভিমান করিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া মাতা আনার কাছে চলিয়া আসিল। ফিদিয়া লিজাকে এক পত্র লিখিয়াছিল যে দুইজনে যখন এতটুকু মনের মিল নাই, তখন তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হোক! লিজাও উত্তর দিল, "বেশ, তোমার যখন এই ইচ্ছা, তখন তাই হোক!" কিন্তু দুই চারিদিনের মধ্যেই লিজার অভিমান কাটিয়া গেল, স্বামীর প্রতি অনুরাগ আবার ফুটিয়া উঠিল। তখন সে বহু

মিনতি করিয়া, মার্জ্জনা চাহিয়া স্বামীকে ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিল। পত্রখানি বাল্য সুহৃদ্ ভিক্তরের হাত দিয়া ফিদিয়ার কাছে পাঠানও হইল।

বেদিয়া-গৃহে বন্ধুবান্ধবের সহিত ফিদিয়া তখন মজলিস জমাইতেছিল। বেদিয়াদের মেয়ে মাশা বড় সুন্দর গাহিতে পারে। তাহার গান শুনিয়া ফিদিয়া আপনার অন্তর্বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় লিজার পত্র লইয়া ভিক্তর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ফিদিয়া লিজার পত্র পাঠ করিল। পরে ভিক্তর ফিদিয়াকে গৃহে ফিরিবার জন্য বহু অনুনয় করিল। লিজার কত দোহাই পাড়িল, কিন্তু ফিদিয়ার সঙ্কল্প অটল। সে কিছুতেই গৃহে ফিরিতে সম্মত হইল না। ভিক্তর তখন নিরাশ হইয়া বিরক্ত চিত্তে চলিয়া আসিল।]

(পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আনার গৃহ। একটি কক্ষ।

ভিক্তর ও আনা বসিয়া আছে। শাষা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভিক্তর। খপর কি ?

শাষা। ডাক্তার বললে, ভয়টা এখন কেটে গেছে। তবে একটু সাবধানে রাখতে হবে, ছেলেকে ঠাণ্ডা না লাগে।

আনা। কদিনের ভাবনায়-চিন্তায় লিজা আমার যেন কি হয়ে গেছে !

শাষা। ডাক্তার বললে, রোগটা কিছুই নয়, এমনি বুকে ব্যথা। (নিকটে একটি ছোট টুক্‌রি পড়িয়া আছে, দেখিয়া) এতে আবার কি এল ?

আনা। কিসে ? ও, ঐ টুকরিটায় ? ওতে কতকগুলো আঙুর আছে। ভিক্তর এনেছে।

ভিক্তর। দুটো মুখে দিয়ে দেখ না।

শাষা। নাঃ থাক্ ! লিজা আঙুর ভালবাসে—সে বরং দুটো নিয়ে মুখে দিক্, একটু উপকারও পাবে তাতে !

ভিক্তর। দু' রাত্তির চোখে ঘুম নেই—তার উপর দাঁতে একটা কুটো অবধি কাটেনি—!

শাষা। (মৃদু হাসিয়া) তোমরাই বা কোন্ একটু চোখ বুজেছ, না, দাঁতে কিছু কেটেছ !

ভিক্তর। আমাদের কথা ছেড়ে দাও।

(লিজা ও ডাক্তার প্রবেশ করিল। ডাক্তারের মুখভাব গম্ভীর।)

ডাক্তার। হ্যাঁ ; তা হলে যা বললুম,—আধ ঘণ্টা অন্তর পুল্‌টিশটা বদলে দেবেন। অবশ্য যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে আর বিরক্ত করবার দরকার নেই। গলার মধ্যে ঐ ওষুধটা পেণ্ট্ করাও তাহলে বন্ধ রাখবেন। হাঁ, তবে গে, ঘরটা বেশ গরম রাখবেন—অর্থাৎ যেন এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া না গায়ে লাগে। এই আর কি, সাদা কথা ! তার পর—

লিজা। আবার যদি সে রকম দম আটকায় ?

ডাক্তার। নাঃ, সে ভয় আর বড় নেই—সে ঝোঁকটা কেটে গেছে তবে যদি তার উপক্রম দেখেন, তা হলে গলায় ওষুধটা পেণ্ট্ করে দেবেন, না হয়। আর ঐ যে পুরিয়াটা দিয়েছি—ঐ সাদা গুঁড়োটা—কাগজে মোড়া আছে,—তার ঐ সকালে একটা আর রাত্রে একটা দেবেন। হ্যাঁ, তার পর আর একটা প্রেসক্রপসনও আমি এই সঙ্গে লিখে দিচ্ছি। ওষুধটা আনিয়ে রাখবেন।

আনা। ডাক্তার সাহেব, আপনি একটু চা খান আগে।

ডাক্তার। আজ্ঞে না, মাপ করবেন। চা খাবার সময়ই নেই। এখন আর আমি বসতে পারছি না। বিস্তর রুগী আবার আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, তা হলে একটু কাগজ - প্রেসক্রপসনটা লিখে দি। (চেয়ারে বসিল। শাষা কাগজ কলম ও দোয়াত আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল।)

লিজা। তা হলে, আপনি বলছেন, হুপিং কফটফ নয় ? সে ভয়ও কিছু নেই ?

ডাক্তার। (হাসিয়া) না, না, এ আমি জোর করে বলতে পারি। (প্রেসক্রপসন লিখিতে লাগিল।)

ভিক্তর। (লিজার প্রতি) লিজা, তুমি এবার এই এক পেয়ালা চা অন্তত পক্ষে মুখে দাও। তার পর একটু ঘুমিয়ে জিরিয়ে নাও। ক' দিনের ভাবনায় কি হয়ে গেছ, একবার আর্শিতে দেখ দেখি। একটু চা খাও, আগে।

লিজা। থাক খাব 'খন ! আঃ, এতক্ষণে যেন নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। দেহে প্রাণ এসেছে ! তোমার ঋণ

কথনো শোধ দিতে পারব না। এ দুর্দ্দিনে কী বন্ধুর কাজ যে করেছ তুমি—কী অনুগ্রহ—(শুনিয়া শাষা বিরক্ত হইয়া ঈষৎ সরিয়া গেল।)

ভিক্তর। থাক্ থাক্, আমি আর কি করেছি বল, যে, আমাকে এত কথা বলছ!

লিজা। তোমার জন্যই ছেলেকে আবার ফিরে পেয়েছি, নইলে কি যে বরাতে ঘটত! এই যে দু' দিন নিজের ঘর দোর ছেড়ে তুমি এখানে এসে পড়ে আছ, দু রাত্তির সমানে রোগা ছেলের শিয়রে বসে জেগে রয়েছ, —এই যে, নিজে চাড় করে, যত্ন করে ভাল ভাল ডাক্তার ডেকে এনেছ—

ভিক্তর। তোমার ছেলে সেরে উঠেছে এই যে মস্ত লাভ, এতেই যে আমার সব পাওনা শোধ হয়ে গেছে, লিজা। তার উপর, তোমার এত যত্ন, এত—

লিজা। (জনান্তিকে)...ভাল কথা। ডাক্তার সাহেবের ভিজিটের এই টাকা ক'টা নিজের হাতে আমি দিতে পারব না, আমার কেমন লজ্জা করে।

ভিক্তর। ওটা আর আমিও হাতে করে দেব না—ভাল দেখাবে না।

আনা। কেন, এতে আর লজ্জা কি?

লিজা। লজ্জা নয়, মা? আমার ছেলের জীবনটাকে যে ফিরিয়ে এনে দিয়েছে, তার ঋণ কি এই ক'টা টাকায় শোধ হয়? নিজের জীবন দিলেও সে ঋণ শোধ যায় না।

আনা। আচ্ছা, তুই আমার হাতে দে দেখি। আমি দেবো 'খন! ওর কাজই হল এই! এতে আবার লজ্জা কি?

ডাক্তার। (প্রেসক্রপশন লিখনান্তে লিজার হাতে কাগজ দিয়া) এই যে নূতন পুরিয়াটা দিলুন, একটা গুঁড়ো ওষুধ আসবে, তাই এক চাম্‌চে গরম জলে ঢেলে গুলে নিতে হবে। তার পর··· (লিজাকে ঔষধ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে রত; ভিক্তর পিয়ালায় চা ঢালিয়া পান করিতে লাগিল। আনা ও শাষা জনান্তিকে কথা কহিতেছিল।)

শাষা। আমি মা, এ-সব দু চক্ষে দেখতে পারি না, তা যাই বল, যাই কও! ভিক্তরের সঙ্গে এত মাথামাথি—

আনা। তুই বাপু যেন কি!

শাষা। এ-সব আমার ভারী বিশ্রী লাগে।

(লিজার সহিত করকম্পনান্তে ডাক্তারের প্রস্থান; আনা তাহার অনুসরণ করিল।)

লিজা। (ভিক্তরের প্রতি) কতদিনের পর ছেলে আমার চোখ মেলে চেয়েছে। দুটি ঠোঁটে কি মিষ্টি হাসি কতদিন পরে ফুটেছে। যাই, আমি একবার তাকে দেখে আসি গে। এখনি আসছি আমি। তুমি কিছু মনে করো না।

ভিক্তর। আগে একটু চা খেয়ে নাও লিজা,—ছেলে ত ভাল আছে; নিজের মুখে কিছু দাও দেখি।

লিজা। না, না, এখন না—এই যে, আমি এখনি ঘুরে আসছি। আঃ, কি যে ভাবনা হয়েছিল, আমার! (লিজা কাঁদিয়া ফেলিল।)

ভিক্তর। তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, লিজা।

লিজা। আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে। যাই, একবার তাকে দেখে আসি। তুমি আসবে?

ভিক্তর। চল।

লিজা। এস,—দেখবে এস।

(লিজা ও ভিক্তরের প্রস্থান)

আনার প্রবেশ।

আনা। টাকা দিলুম—তা দিব্যি হাত পেতে নিলে! আর নেবে নাই বা কেন? ··· কিরে শাষা? তুই কি ভাবছিস?···

শাষা। লিজার এই ধরণ ধারণগুলো আমার কেমন ভাল ঠেকে না, মা—তুমি কি কিছু দেখতে পাও না?

আনা। কেন, করেছে কি সে? তোর মনের মধ্যে সদাই যেন জিলিপির প্যাচ চলেছে! ভারী সন্দিগ্ধ মন তোর—

শাষা। বেচারা ফিদিয়া—তার কথা কেবলই আমার মনে পড়ছে। আহা, বেচারা—বেচারা ফিদিয়া! ভিক্তরের সঙ্গে লিজার এত মাথামাথি—ছি!

আনা। তোর এ-সব টিপ্পনী আমার ভাল লাগে না, বাপু। তুই থাম্ দেখি। এই ভিক্তর, এ বিপদে কি করণাটাই না কর্‌লে! টাকা বল, দেহ বল, পাত করে ফেললে একেবারে, তেমন লোকের পানে মন কি টানে না?

না টানলে অধর্ম্ম হবে যে! এর পর যদিই লিজা ভিক্তরকে বিয়ে করে, আর ভিক্তরের তাতে অমত না হয়, তা হলে আমি ত তা ভাগ্যি বলে মানব!

শাষা। যত সব বিশ্রী, অনাসৃষ্টি কাণ্ড! অসহ্য!

(শাষা বিরক্তভাবে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।)

(ভিক্তর ও লিজার পুনঃপ্রবেশ। ভিক্তর আপনার গৃহে প্রস্থান করিল। শাষা উভয়ের পানে বিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া তীব্র বিরক্তির সহিত কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।)

লিজা। (গমনোদ্যতা শাষার পানে চাহিয়া রহিল; সে চলিয়া গেলে, মাতার প্রতি) দিদির কি হয়েছে, মা?

আনা। কে জানে, বাছা, কি হয়েছে! মেয়ে যেন পলকে প্রলয় দেখে বেড়াচ্ছে!

লিজা। (কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, ধীরে ধীরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরিমবের গৃহ। বসিবার ঘর।

টেবিলের উপর কয়েকটি সুরাপাত্র রক্ষিত। আরিমব, ফিদিয়া, স্তাকব, বক্কেবিচ্, করোকভ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ সমাসীন।

করোকভ। আমি বলছি, ওঁর কম্ম নয়, এবার জেতা। লা-বেল-বোয়ার মত ঘোড়া সারা ইউরোপে নেই, তার সঙ্গে আর চালাকি খাটছে না! আমি এতে বাজি অবধি রাখতে রাজী আছি।

স্তাকব। আরে, থামো, থামো। তোমার কথার ত ভারী দাম্ তোমার বাজি ও ত গলাবাজি! তা এখন বন্ধ কর!

করোকভ। আমি বলছি দাদা, তোমার কাত্‌শ্ ঘোড়ার দফা এবার রফা হয়ে যাবে!

আরিমব। ঝগড়া রাখ হে, ঝগড়া রাখ—আমি তোমাদের তর্কের মীমাংসা করে দিচ্ছি। ফিদিয়াকে জিজ্ঞাসা কর ও ঠিক বলে দেবে। তুমি কি বল হে ফিদিয়া?

ফিদিয়া। দুটো ঘোড়াই ভাল, তবে সবই এখন নির্ভর করছে জকির উপর! জকি যার ভাল হবে—

স্তাকব। তাই ধরি! তোমার গুশেভ জকি ত ভারী জকি, ওঃ—তার মাথার ঠিক থাকে না, বেহুঁসিয়ার—

করোকভ। তোমার বাজে কথা রেখে দাও। গুশেভ জকিটা ফেল্‌না হল, না? তোমার কথায়?

ফিদিয়া। আচ্ছা, ওহে শোন, আর একদিক দিয়ে মীমাংসা করা যাক্!

উভয়ে। কোন দিক দিয়ে?

ফিদিয়া। বলি, এবার ডার্বি জিতেছে কে?

করোকভ। ওঃ, তাইতেই অমনি সব প্রমাণ হয়ে যাবে? সে ত দৈবাৎ এবার জিতে গেছে, নেহাৎ বরাত-জোরে। ক্রাকাসের যদি ব্যায়রামটা না হত ··· কে—?

একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল।

আরিমব। কি রে? কি?

ভৃত্য। একটি ইস্তিরী মানুষ এসে ফিদিয়া সাহেবকে খুঁজছেন—কি কথা আছে!

আরিমব। কে—মেয়ে মানুষ?

ভৃত্য। আজ্ঞে, তা জানি না—তবে ভদ্দর ঘরের ইস্তিরী বটেন!

আরিমব। ওহে ফিদিয়া—এক ভদ্দর ইস্তিরী মানুষ তোমায় খুঁজছেন—কি কথা আছে।

ফিদিয়া। কোথা থেকে এসেছে?

আরিমব। সে পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নি।

ভৃত্য। ওদিককার ঘরে তাঁকে বসতে বলব কি?

ফিদিয়া। থাক্—আমি দেখে আসছি। কোথায়, চল

[ভৃত্যের সহিত ফিদিয়ার প্রস্থান।

করোকভ। কে এল হে? মাশা নয় ত?

স্তাকব। মাশা হন্ কে?

করোকভ। ঐ যে হে, সেই বেদেদের মেয়েটা ফিদিয়ার জন্যে সে একেবারে পাগল,—বুঝি বা মরে!

স্তাকব। বটে! প্রেমোন্মাদিনী! বাঃ—! ওহো, সে মেয়েটা! তা সে দেখতে ত মন্দ নয়, বাবা! বয়স কম,—তার উপর গায়ও বেশ!

আরিমব। তোফা গলা! তানিশা আর মাশা—দুটোরই গলা বেশ—খাসা গায় দুজনে! কাল রাত্রে পিটারে মজলিসে দুজনেই গেয়েছিল—কম তারিফটা পেয়েছে

দুশোখানি 'বাহবা' একেবারে গোণা দুশোখানি, একটা কম নয়।

স্তাকব। ফিদিয়ার বরাত ভাল, যাই বল, ভায়া!

আরিমব। বরাতটা ভাল কিসে? মেয়েগুলো তার পেছনে ঘোরে,—প্রেমে পড়ে—তাই? এটা বুঝি ভাল বরাতের চিহ্ন—? আমি ত বলি বাবা, এর চেয়ে ঝঞ্ঝাট, দুর্গ্রহ আর কিছু নেই!

করোকভ। হ্যাঃ—এই বেদেদের মেয়েগুলো—এরা আবার মানুষ! দেখলে ঘৃণা হয়—নোঙরা লক্ষীছাড়া জাত!

বক্তেবিচ। আরে ছ্যাঃ!

করোকভ। যত অসভ্য বুনো জানোয়ার। না জানে দুটো কথা, না জানে কিছু খাতির!

আরিমব। এই রে, শুচিবাইয়ের মুখে খই ফুটতে সুরু হয়েছে। না, দেখি, কে এল।

(প্রস্থান)

স্তাকব। ওহে, ওহে, মাশা হয় যদি ত এখানে একবার ডেকে এনো। দুটো গান শোনা যাবে। এখনকার বেদে-গুলো তবু চলনসই! ছিল বটে সে একজন—তানিয়া—আঃ, বেটি একের নম্বর শয়তান!

বক্তেবিচ। ওহে ভায়া, ও জাত তখনও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিটি আছে! জাতসাপ কি কখনো বিষছাড়া থাকে রে ভাই?

স্তাকব। না, না, ওরা গায় বেশ, তা যাই বল! বেশীর ভাগেরই দেখেছি, দিব্যি মিহি গলা। তোফা!

বক্তেবিচ। ছাই গায়! গাইত বটে দু এক জন সে আগেকার আমলে। Ballad গানগুলো এরা মন্দ গায় না।

করোকভ। থামো। গানের ত তারা সবই বোঝে! আচ্ছা, আসুক, গাইতে বলা যাবে,—যদি সুরজ্ঞ হও ত শুনে আপাদমস্তক জ্বলে উঠবে 'খন। ও পাচমিশালি সুরে খাটি রাগ-রাগিণীর শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দেয় একেবারে! বলি, গান শিখলে কোথায় সে গাইবে!

স্তাকব। হোক পাঁচমিশালি সুর—শুনতে ভাল লাগে! তা কিন্তু স্পষ্ট বলছি—তোমার হেঁড়ে গলায় ও খাঁটি রাগের বাঘ-গর্জ্জনের চেয়ে ঢের ভালো!

বক্তেবিচ। কী, ওস্তাদী গানের নিন্দে করছ! তোমার ও লম্ব কর্ণে তা ভাল লাগবে কেন?

করোকভ। থাক্, থাক্, ছেড়ে দাও। ওর সঙ্গে আবার তর্ক করে! খাঁটি রাগ-রাগিণীর মর্ম্ম কি যে-সে লোক বোঝে রে দাদা! সে বুঝতে হলে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি চাই। এই যে আরিমব।

(আরিমবের পুনঃপ্রবেশ)

আরিমব। না, মাশা নয়। ও আর এক জন। এ ঘরটা তা হলে ছেড়ে দিতে হবে। বিস্তর কি সব দর-কারী কাথাবার্ত্তা ওদের আছে। এ ঘরে না হলে, কোথাই বা ওরা বসে। বিশেষতঃ যিনি এসেছেন, তিনি আবার একজন মহিলা! মহিলার সম্মান আগে রাখতে হবে। চল, আমরা বিলিয়ার্ডের ঘরটায় যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(ফিদিয়া ও তৎপশ্চাৎ শাষা প্রবেশ করিল।)

শাষা। (মৃদু শান্ত স্বরে) তোমায় বিরক্ত করলুম বলে রাগ করো না, ফিদিয়া। কিন্তু দোহাই তোমার, যা বলতে এসেছি, তা বেশ মন দিয়ে শোন। (শাষার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।)

ফিদিয়া। কি? (বলিয়া সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।)

শাষা। (বসিয়া, ফিদিয়ার পানে চাহিয়া) বাড়ী চল।

ফিদিয়া। বাড়ী? কে যাবে?

শাষা। তুমি যাবে। কেন যাবে না, ফিদিয়া—তুচ্ছ একটা অভিমান নিয়ে এমনি করে জ্বলে বেড়াবে?

ফিদিয়া। তুচ্ছ অভিমান নয় শাষা। তবে শোন। আমি দেখেই বুঝেছি, তুমি কেন এসেছ! তুমি বড় ভাল—তাই এসেছ। কিন্তু তুমি যদি শাষা না হয়ে ফিদিয়া হতে, আর আমি শাষা হতুম, তাহলে আমিও এমনি করে তোমায় ফেরাতে আসতুম! এমনি করেই সমস্ত মিটমাট করবার চেষ্টা পেতুম! কিন্তু এ মেটবার নয়, শাষা! তখন তুমিও বুঝতে, যদিও আমার মত লক্ষীছাড়া তুমি কখনও হতে না, তবু যখন ধরে নিচ্ছি তুমি ফিদিয়া তখন তুমিও ঠিক বুঝতে, এ মেটবার নয়। বুঝে আমার মতই তুমি সরে

থাকতে, আর কারো সুখে হন্তারক হবার জন্যে ফিরতে চাইতে না!

শাষা। সুখে হন্তারক! কি বলছ ফিদিয়া, কার সুখে হন্তারক হবে তুমি? তুমি কি ভাব, তোমায় ছেড়ে লিজা বড় সুখে আছে, না সুখেই সে থাকবে?

ফিদিয়া। কোন অসুখ হবে না, বরং সে শান্তিতে থাকবে, তুমি দেখে নিও। আমার কাছ থেকে সে কী পেয়েছে? কিছু না। এতটুকু সুখ, কি এতটুকু শান্তি, তাও আমি দিইনি তাকে। আমায় ছেড়ে এবার সে ঢের সুখে ঢের শান্তিতে থাকবে।

শাষা। কখনো না, ফিদিয়া—এ তোমার ভুল।

ফিদিয়া। আমার ভুল নয় শাষা, তোমার ভুল! (শাষার একটি হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল) শাষা—(হাত ছাড়িয়া দিয়া) তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না! আসল কথা কি জান, শাষা—ঠিক সেই পুরোনো জীবনটিতে আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া এখন অসম্ভব! তুমি একখানা তাস নিয়ে ভাঁজ কর, দেখবে—তাসখানা ভাঁজ হবে, কিন্তু ছিঁড়বে না। এই রকম দশ বারোটা ভাঁজ করে ফেলো, তবু সে ছিঁড়বে না, দশ বারোটা ভাঁজই পড়বে শুধু। কিন্তু সেই ভাঁজকরা তাসটাকে উল্টো দিকে একবার ভাঁজ করো দেখি, তাসখানা টি কবে না, তখনই ছিঁড়ে যাবে! লিজার আর আমার মধ্যে ঠিক এমনিভাবেই ভাঁজ চলে এসেছে—ফিরতি ভাঁজে মিলনের এ তাস ছিঁড়ে যাবে বৈ জোড়া থাকবে না। যা হয়ে গেছে, এর পর আমিও তার মুখের পানে চাইতে পারব না, সেও আমার পানে চাইতে পারবে না। এ কথা বিশ্বাস কর, শাষা। যদিও আমার বুকটা পলে পলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তবুও কি করব—উপায় নেই! এ ভাঙা রোধ করবার কোন উপায় নেই!

শাষা। না, না,—ফিদিয়া, তুমি এ সব কি বলছ!

ফিদিয়া। তুমি "না" বলছ, শাষা, কিন্তু আমি ঠিক কথাই বলছি!

শাষা। আমি যদি আজ লিজার মত এমনি দশায় পড়তুম,—উঃ, সত্যি ফিদিয়া, তা হলে এ কথা শুনে এক দণ্ডও বাঁচতে পারতুম না!

ফিদিয়া। হাঁ—তোমার পক্ষে, অবশ্য...(ফিদিয়ার কথা সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল।)

শাষা। তা'হলে তোমার সঙ্কল্প টলবে না?

ফিদিয়া। না—আমায় মাপ কর, শাষা—আমার ফেরবার কোন উপায়ই আমি দেখছি না! উপায় রাখিও নি।

শাষা। না, ফিদিয়া, না—তুমি এস—আমার সঙ্গে এস, বাড়ী এস।

ফিদিয়া। শাষা, আমার মত হতভাগার উপর তোমার স্নেহ অগাধ। এ স্নেহের কথা আজীবন আমার মনে থাকবে! কিন্তু আর আমায় এ অনুরোধ করো না—যাও, তুমি বাড়ী যাও—আমি ফিরব না—আমার ফেরবার শক্তি নেই, সাধ্য নেই। থাকলে, তোমার কথায় নিশ্চয় ফিরতুম! এখন তবে বিদায়—

শাষা। না, না, বিদায় কি? বিদায় নয়—এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না ফিদিয়া, যে, তুমি ফিরবে না, আজ রাগ করেছ বলে কখনো ফিরবে না—

ফিদিয়া। তবে শোন, শাষা। কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা কর, তোমায় যা বলব, সে কথা তুমি প্রকাশ করবে না, কারো কাছে না! বল—

শাষা। কারো কাছে প্রকাশ করব না।

ফিদিয়া। তবে সব কথা তোমায় খুলে বলি, শাষা—শোন...আমি লিজার স্বামী, আমাদের ছেলেও হয়েছে—তবু আমি লিজার কেউ নই—না, কেউ নই।...আশ্চর্য্য হয়ো না,—আমি কেউ নই......বাধা দিয়ো না, শুনে যাও সব। ভেবো না যে, আমি রিষের জ্বালায় এ সব বলছি,—মন আমার সন্দিগ্ধ? তা নয়—রিষই বা কিসের জন্য হবে? প্রথমতঃ, এতে রিষ করবার অধিকার আমার নেই—তা ছাড়া তার কারণও ঘটে নি কিছু। ভিক্তর তার বন্ধু—ছেলেবেলাকার বন্ধু—আমারও সে বন্ধু অবশ্য। কিন্তু তাতে কি? ভিক্তর লিজাকে ভালবাসে, লিজাও তাকে না ভালবেসে থাকতে পারে না।

শাষা। না—না—এ সব কি কথা!

ফিদিয়া। শোন, ভালবাসে। লিজা ভিক্তরকে সত্যই ভালবাসে। অগাধ অসীম সে ভালবাসা—কিন্তু বড়

গোপন, বড় রুদ্ধ! তবে সে সতী, সে জানে, যে, তার এ ভালবাসা অন্যায় - স্বামী ছাড়া অপর পুরুষকে তার ভালবাসতে নেই—বাসা পাপ—তবু সে ভিক্তরকে ভালবাসে! কি করবে? নিরুপায়! এর জন্য আপনার মনের সঙ্গে সে অনেক যুদ্ধ করেছে, মনকে সে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই এ ভালবাসার বেগ সে রোধ করতে পারে নি! না পেরে মহা অশান্তির বোঝা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! বেচারী লিজা! আমিই তার এ সুখের পথে মহা বাধা—এ বাধা সরে গেলে ভিক্তরকে ভালবাসতে তার আর কোন বিঘ্ন থাকবে না—নিশ্চিন্ত মনে তখন তাকে সে ভালবাসতে পারবে। তার সেই বাধা নিজের হাতে আমি সরিয়ে দেব শাষা—ওদের মনে এতটুকু সুখ নেই—আহা, সুখী হোক—লিজা ভিক্তর দুজনে ওরা সুখী হোক! (কথার শেষ দিকে ফিদিয়ার স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল।)

শাষা। এ সব কি বলছ তুমি, ফিদিয়া? পাগলের মত - ?

ফিদিয়া। পাগল? আমি পাগল নই শাষা, পাগল তুমি! তুমি কি কিছু বুঝছ না—কিছু না? যে, এর আগাগোড়া সত্য, একবিন্দু আমি মিথ্যা বলিনি। ওরা যদি সুখী হয় ত সে সুখ দেখে সত্যই আমি আনন্দ পাব। আমার কি? একটা জীবন শুধু! আর ওরা… এই শুধু একমাত্র উপায়। আমি ওদের দুজনকেই এ দ্বন্দ্ব এ যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার করতে চাই—এ দুঃখের দারুণ বন্ধন থেকে মুক্তি দেব। এই কথাটুকু শুধু তাদের তুমি বলো। আর কোন কথা বলবার দরকার নেই। এখন ত শুনলে সব। তা হলে আর আমায় ফিরতে অনুরোধ করো না—বুঝলে ত, কেন আমার ফেরবার উপায় নেই, পথ নেই। যাও, শাষা, তুমি বাড়ী যাও।

শাষা। ফিদিয়া, তোমার মন উচ্চ, এ আমি জানতুম, কিন্তু তুমি এত মহৎ, তা জানতুম না। তোমায় স্নেহ করতুম, আজ থেকে শ্রদ্ধা করব। তবে আসি উপায়ই যখন নেই—

ফিদিয়া। বিদায় শাষা!

[শাষার প্রস্থান।

ফিদিয়া। (স্বগতঃ) আর কি—অন্য আর কি উপায় আছে? কিছু না! এই ঠিক—! (ঘণ্টায় ঘা দিল।—ভৃত্য প্রবেশ করিল। ভৃত্যের প্রতি) তোর মনিব কোথায় রে? তাকে একবার খবর দে—এখানে একবার আসতে বল্। (ভৃত্যের প্রস্থান। আত্মগত) এই হোক—এ ছাড়া মুক্তির আর কোন উপায় দেখছি না ত! এই যে আরিমব!

(আরিমবের প্রবেশ)

আরিমব চল, এবার একটু বেরুনো যাক্!

আরিমব। কি? কথাবার্ত্তা হল? গোল চুকল?

ফিদিয়া। হাঁ একদম চুকে গেছে! কোন পক্ষের আর এতটুকু ক্ষোভ কি অসন্তোষ থাকবে না—সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে।……যাক্—বাঁচা গেছে। (চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।) এরা সব কোথায় গেল?

আরিমব। কোথায় আর যাবে! মহা সমারোহে সব বিলিয়ার্ড খেলতে লেগে গেছে।

ফিদিয়া। বটে! চল না, আমরাও গিয়ে তা হলে খেলা সুরু করে দি। বাঃ! (উভয়ের প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রবাসী বাঙ্গালী

স্বর্গীয় ভূপতিচরণ ঘোষাল।

ভূপতিচরণ দেশময় বিখ্যাত না হইলেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যে নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতি জনসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাঁহার দ্বেষ-হিংসা-রহিত স্বভাব, ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত তাঁহার মিষ্টালাপ তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়াছিল। তিনি দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণেও বিভূষিত ছিলেন।

ভূপতিচরণ কলিকাতা জানবাজারের ঘোষাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি ভূকৈলাশ রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ গোলকচন্দ্রের নিকট জ্ঞাতি ছিলেন। রামহরির ৭টী কিস্তিসুলুপ বা নৌকা ছিল। তাহার সাহায্যে তিনি লবণের ব্যবসায় করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় পুত্র রামদুলাল অল্প বয়সে মৃত হন। তাঁহার

ভূপতিচরণ ঘোষাল।

সহধর্ম্মিণী একমাত্র পুত্র শিবচন্দ্রকে দেবর রামজয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হন। শিবচন্দ্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে নিজ বিষয় সম্পত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। একটী তুচ্ছ কারণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া তিনি জানবাজারের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে দারিদ্র্য-সমুদ্রে ভাসাইয়া যান। তাঁহার পুত্রের নাম রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণের পুত্রের নাম ভূপতিচরণ।

রাজনারায়ণ ধনীর পুত্র ছিলেন কিন্তু অবস্থাবিপর্য্যয়ে দরিদ্র হন। তিনি তাঁহার মাতুল রূপচাঁদ পাকড়াশীর কর্ম্মস্থান আগ্রায় কমিসারিয়েট দপ্তরে ২০৲ টাকা মাসিক বেতনে একটা কর্ম্ম পান। তাহাতেই তিনি বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। ভূপতিচরণ আগ্রায় ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১২৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। (কার্ত্তিক বদী দশমী ১৮৯৩ সম্বৎ ৩রা নভেম্বর ১৮৩৬)।

৫ বৎসর বয়সে তাঁহার "হাতে খড়ি" হয়। তিনি পিতার মাতুলগ্রাম বাসুদেবপুরে গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা আরম্ভ করেন। ৯ বৎসর বয়সে তিনি আগ্রায় আসিয়া কালেজে ভর্ত্তি হন। কালেজে ৯।১০ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এই সময়ের মধ্যে নিজ পিতৃদেবের সংসারের অনটন নিবারণকল্পে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌সট্রক্‌শন আফিশে প্রায় ৩ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ান্তে তথা হইতে কাজ ছাড়িয়া পুনঃ কালেজে ভর্ত্তি হন এবং এগার মাস অধ্যয়ন করিয়া ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ সালে উচ্চ ছাত্রবৃত্তি বা Senior Scholarshipর শেষ পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইংরাজিতে বিশেষ যোগ্যতার জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ৪ বৎসর কাল ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম দুই বৎসর তিনি ৮৲ টাকা ও শেষ দুই বৎসর ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষার পর কালেজ ছাড়িবার সময় কর্ত্তৃপক্ষগণ মার্চ্চ ১৮৬৯ সালে তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক (gold medal) প্রদান করেন। উহার একদিকে তাজমহলের ওভরালো চিত্র (in relief) ও ভূপতিচরণের নাম লিখিত, অপর দিকে ইংরাজিতে Knowledge is Power সংস্কৃতে বিদ্যাসর্ব্বার্থসিদ্ধি ও ফারসীতে ইল্‌ম্ কোহ্‌ তিন ভাষায় বিদ্যার প্রশংসাব্যঞ্জক বচন লিখিত আছে। তিনি তিন মাস মাত্র গৃহে বসিয়াছিলেন। তারপর জুন ১৮৫৯ সালে ফয়জাবাদে Executive Engineerএর দপ্তরে ৫০৲ বেতনে কর্ম্মপ্রাপ্ত হন। অক্‌টোবর ১৮৫৬ সালে প্রতাপগড় সদরে ১০০৲ টাকা বেতনে অনুবাদকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। প্রতাপগড় তখন জঙ্গলময় ছিল, কর্ম্মচারীগণের থাকিবার গৃহ পাওয়া যাইত না। তাই ভূপতিচরণ এলাহাবাদ Secretariate দপ্তরে ১৫০৲ বেতনের একটী খালি কর্ম্মের জন্য আবেদন করেন। তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল এবং তাঁহাকে সাতদিনের মধ্যে নব কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। তিনি নিয়োগপত্র তাঁহার প্রভু ডিপুটী কমিশনর Hogg সাহেবকে প্রদর্শন করেন। সাহেব তাঁহাকে যাইতে দিলেন না এবং নিজ দপ্তরেই ১৫০৲ বেতনের কাজ দিলেন। অপিচ Secretariat দপ্তরে ভূপতিচরণের না যাইবার কারণ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রাজা অজিতসিংহকে বলিয়া

ভূপতিচরণকে "বেলা" নামক স্থানে ১৷৷০ বিঘা ভূমি মৌরশী-মোকররী জমায় প্রদান করান। তথায় ভূপতিচরণ খোলার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ভূপতিচরণের কার্য্যকর্ম্মের পারিপাট্য দক্ষতা ও শৃঙ্খলার জন্য তাঁহার প্রভু ডিপুটী কমিশনরগণ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার কর্ম্মপুস্তকে (Service Book) প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রতাপগড়ে ১০ বৎসর বাস করেন। এই সময়ের মধ্যে অক্টোবর ১৮৬৭ সালে Higher Standard পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৬৯ সালে ওকালতী পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী করিবার উপযুক্ত স্থির হন। পাছে দেশীয়ের নামের নিম্নে ইংরাজের নাম লিখিত হইলে তাঁহারা অপমানিত বোধ করেন ও তাঁহাদের সম্মানের (prestige) হানি হয় এই কারণে গেজেটে দেশীয় ও ইংরাজের তালিকা পৃথক পৃথক্ প্রকাশিত হয়। Native officer-গণের তালিকার শীর্ষস্থানে ভূপতিচরণের নাম ছিল এবং তাহার পার্শ্বে with great credit পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ এই বিশেষণটী সংযুক্ত ছিল।

তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া রায়বেরিলীর কমিশনর ক্যাপর (Capper) সাহেব তাঁহাকে নিজ দপ্তরে বদলী করাইয়া লন। ১৮৬৮ জুন মাসে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া ২০০৲ টাকা হয়। রায়বেরিলীতে দপ্তরের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তিনি উর্দ্দু ফারসী শিক্ষা করেন। ক্যাপর এই সময় ছুটী লইয়া বিলাত যান। তাঁহার স্থানে কারনেগী (Carnegie) অস্থায়ীরূপে কমিশনর হন। ইনি আইন বড় ভাল বুঝিতেন না। তিনি ভূপতিচরণকে বিচারে রায় লিখিতে দিতেন। ভূপতিচরণ তাহা এমন যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন যে কারনেগী তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হন, এবং তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। গভর্ণমেণ্ট দেশীয়কে দেশীয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া কিরূপে স্বীয় অভিসন্ধি সফল করেন এ খবরটীও Revenue billএর সমর্থনে কারনেগীর লিখিত পত্রে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ক্যাপর বিলাত হইতে আসিলে ফয়জাবাদে কমিশনর নিযুক্ত হন। তিনি ভূপতিচরণকে নিজ দপ্তরে পরিবর্ত্তিত করাইয়া লন। ভূপতিচরণ রায়বেরিলীতে ৪ বৎসর থাকিয়া ১৮৭৩ সালে ফয়জাবাদে বদলী হন। এই স্থানে থাকিতে ক্যাপর তাঁহাকে Extra Assistant Commissioner অর্থাৎ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসার সহিত অনুরোধ করেন। তখন Sir George Cooper অযোধ্যা প্রদেশের চীফ কমিশনর। ইনি বড় বাঙ্গালীবিদ্বেষী ছিলেন সুতরাং ভূপতিচরণের উক্ত পদ-প্রাপ্তি মঞ্জুর হইল না।

ভূপতিচরণ অতঃপর ভাদ্র ১৮৭৬ সালে তিন মাসের প্রাপ্য ছুটী লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ স্বীয় মাতুলগ্রাম বাসুদেবপুরে একটী বাটী নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করান। তিনি বাটী অসম্পূর্ণ রাখিয়া লোকান্তরিত হন। ভূপতিচরণের বঙ্গদেশে আসিবার প্রধান কারণ এই কার্য্যের সম্পূর্ণতা সম্পাদন।

তিন মাস পরে ভূপতিচরণ ফয়জাবাদে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার লক্ষ্ণৌয়ে বদলী হয়। ক্যাপরও তাঁহার পূর্ব্বে তথায় কমিশনর হইয়া গিয়াছিলেন। ১৮[illegible] সালে ক্যাপর পুনঃ তাঁহার সম্বন্ধে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। এবার তাঁহার কথা গ্রাহ্য হয় কিন্তু ইহাতেও কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালীবিদ্বেষ প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ক্যাপর ভূপতিচরণের নাম নির্ব্বাচিত ব্যক্তির তালিকার শীর্ষে লেখেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা কাটিয়া তৃতীয় করিয়া দেন এবং প্রথম স্থানে একজন হিন্দুস্থানীর নাম বসাইয়া দেন। এই পদ প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিচরণ বহরাইচে নিয়োজিত হন। ১৮৮০ সালে তিনি নানপারায় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুনসিফ হন। এইরূপে ৫।৬ বৎসর উংরৌলা বিলগ্রাম হরদোই লক্ষ্ণৌ আদি স্থানে মুনসিফ থাকিয়া ১৮৮৬ সালে প্রতাপগড়ে সবজজ হইয়া আগমন করেন। এই স্থানে প্রথমে তিনি বিচারে ন্যায়নিষ্ঠা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হন। ১৮৮৮ সালে তিনি বহরাইচে পরিবর্ত্তিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি ২য় শ্রেণীর সব-জজ হন। এসময় তিনি ৭০০৲ টাকা বেতন পাইতে থাকেন। এস্থানে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা

বিখ্যাত সৈয়দ মালাবের মামলায় প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার যশোভাতি অযোধ্যা প্রদেশময় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই মোকদ্দমায় তিনি Secretary of Stateএর বিরুদ্ধে উক্ত স্থানের মতওয়াল্লী বা সেবায়তগণকে এক লক্ষ টাকার ডিক্রী দেন। ইহার অব্যবহিত পরে অসুস্থতা প্রযুক্ত তিনি পেনশনের জন্য আবেদন করেন। তাঁহাকে প্রতাপগড়ে বদলী করা হয় এবং মার্চ্চ ১৮৯৪ সালে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করা হয়।

জুন মাসে তিনি কলিকাতায় নিজ বাটীতে আগমন করেন। এই স্থানে ১৮ বৎসর বাস করিয়া গত ১২ই আষাঢ় বধবার ১৩১৯ সালে (২৬শে জুন ১৯১২) হৃদরোগে ৭৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ঈশ্বরলাভ করেন।

ভূপতিচরণ আমরণ নিষ্ঠাবান হিন্দুর আচার ও রীতি নীতি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। শেষে রুগ্ন অবস্থায়ও ঈশ্বরারাধনা ব্যতিরেকে তাঁহাকে এক বিন্দু জল পান করাইতে কেহ সক্ষম হয় নাই।

তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবগত হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব একে একে তাঁহার সম্মুখে কালগ্রাসে পতিত হইতেছিলেন। ইহাতে তিনি সংক্ষুব্ধ বা শোকার্ত্ত হইতেন কি না বহিদৃষ্টিতে তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যাইত না, কেবল একমাত্র ঈশ্বর আরাধনার সময়েই তাঁহার কাতরতাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি ইষ্টদেবের প্রতি অস্ফুট আত্মনিবেদনে পরিস্ফুট দৃষ্ট হইত। তিনি ইংরাজি ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শন পড়িয়াছিলেন কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া হিন্দু দর্শনশাস্ত্র তাঁহার পাঠ করা হয় নাই, তবে তাঁহার মানসিক চিন্তা সাংখ্য বৈশেষিক ও ভক্তিদর্শনের অনুমোদিত পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না, পরিবারবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত পেনশন অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নলিখিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ভূপতিচরণের সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন। বাহুতা নিবাসী জয়পুর মহারাজার মন্ত্রী ৺ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; কোলুটোলা বৈদ্যকুলোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয় জয়পুরাধিপের Private Secretary ও মন্ত্রী ৺ সংসারচন্দ্র সেন; বারাবঙ্কীর জুসরিম লালা ঝুমক লাল, লক্ষ্ণৌ ছোট আদালতের জজ লালা নারায়ণ দাস, বারাসাত নিবাসী রুড়কী কালেজের ছাত্র ইঞ্জীনিয়র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভূপতিচরণের তিন পুত্র বর্ত্তমান। প্রথম কানাইলাল কৃষ্ণানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। দ্বিতীয় নন্দলাল বস্থায় ওকালতী করিতেছেন। তৃতীয় রামলাল মেটকাফ হল ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাজ করিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁহার পিতার বিস্তারিত জীবনী লিখিয়াছেন।

শ্রীহারাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

স্বর্গীয় পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য।

পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য প্রয়াগের হিন্দুসমাজের একজন বিশিষ্ট মান্যগণ্য প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু লেখা হইয়াছিল। প্রয়াগ বা এলাহাবাদ নামক সচিত্র ইংরাজী পুস্তকেও বিশিষ্ট প্রয়াগপ্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম বলিয়া তিনি উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার জন্ম প্রয়াগে হয়, এবং উনআশী বৎসর বয়সে প্রয়াগেই মৃত্যু হইয়াছে। চিরকাল তিনি প্রয়াগেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুরে।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল বঙ্গসন্তান পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আসিয়া ঘটনাচক্রে এ প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং স্থানীয় সমাজ, ভাষা ও পরিচ্ছদাদির অনুরাগী হইয়া এদেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের বিস্তারিত পরিচয় প্রবাসীর পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কৃত তিথিতত্ত্বের টীকাকার বঙ্গের সুবিখ্যাত পণ্ডিত কাশীরাম বাচস্পতির পৌত্র ৺ রাজীবলোচন ন্যায়ভূষণ তাঁহাদের অন্যতম। ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে বারাণসী আগমন করেন এবং সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক হন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্ণেল উইলফোর্ড তখন এখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৮২৮ সালের কলেজ রিপোর্টে ন্যায়ভূষণ

পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য।

মহাশয়ের নামোল্লেখ আছে। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী কাশীর সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজ কর্তৃক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অধিকারের সময় হইতেই বাঙ্গালীদিগের শিক্ষাবিভাগে প্রবেশের ইঁহারা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। চন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে বরাবর ন্যায়ের গদী বাঙ্গালী পণ্ডিতের হইয়া আসিতেছিল। কয়েক বৎসর হইতে ৺ মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুর পর অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে শিরোমণি মহাশয়ের এক বাঙ্গালী ছাত্রকে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালীর ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচায়ক হইয়া স্বদেশের সম্মানরক্ষা করিতেছেন।

ন্যায়ভূষণ মহাশয় কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা গোপীনাথ দেবের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু রীওয়াঁর (Rewa State, Baghelkhand) বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহ জয়সিংহ দেব ও পিতামহ বিশ্বনাথসিংহ দেব "গ্রাম পায়-পথাল" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে তেওঁহার পরগণার অন্তর্গত বেহড় গ্রাম দান করেন এবং এলাহাবাদ কীডগঞ্জে যমুনার ধারে একটী বাড়ী দেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতিপালক এবং পণ্ডিতদিগের বন্ধু এই রাজারা এই প্রকারে রাজীবলোচনের বৃন্দাবন যাত্রা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রয়াগে স্থায়ী করেন। তদবধি তিনি প্রবাসী হইলেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাই তাঁহার পুত্রস্থানীয়া হন। সুতরাং তিনি দেশ হইতে কন্যাকে আনাইয়া এলাহাবাদে স্থায়ী করেন। সে প্রায় ৮০ বৎসরের অধিক দিনের কথা। শাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়ভূষণ মহাশয় "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" এই শাস্ত্রীয় বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কন্যাকে যথারীতি শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। পিতার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কন্যা সংস্কৃত ভাষা ও বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন। জ্যোতিষে তাঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্মকালে তিনি সূতিকাগারেই স্বহস্তে তাঁহার জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। তাঁহার হস্তলিখিত সেই জন্মপত্রিকা মহামহোপাধ্যায় চিরকাল শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার হস্তলিখিত প্রয়াগ-মাহাত্ম্যকে তাঁহার প্রতিকৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ নিত্য অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রথম পুত্র পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম, এ। জননীর নিকটেই প্রথমে উভয়ের বিদ্যারম্ভ হয়। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি স্কুলে বা কালেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন নাই। তখন প্রয়াগে স্কুল ও কলেজ ছিল না। বাঙ্গালী

প্রতিবাসীদিগের নিকট লুকাইয়া ইংরাজী পড়িতেন। কারণ সেকালে ভট্টাচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়া চাকরী করা মর্য্যাদার হানিকর ছিল।

তিনি বহুবর্ষ ইংরাজসরকারে সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়া পেন্সন ভোগ করেন। ইনি স্বীয় চরিত্রবলে এদেশীয়গণের এতদূর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন যে, স্থানীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি কয়েকবার মিউনিসিপাল কমিশনর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। তিনি ১৮৫৫ অব্দে পূর্ত্ত বিভাগে "রাইটার" স্বরূপ প্রবেশ করেন। তাহার পর এলাহাবাদ আর্সিনাল অফিসে এবং পরিশেষে ২৬ বৎসর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট আফিসে কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি যখন আর্সিনালে কর্ম্ম করিতেন তখন এখানে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় এলাহাবাদের অবস্থা যে কি ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই অনুভব করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ দুর্গের সন্নিহিত কীডগঞ্জবাসীদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না। গুণ্ডাদের অনেকেই কীডগঞ্জে বাস করিত। বিদ্রোহের সময় তাহারা কীডগঞ্জ বস্তীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া লুটতরাজ আরম্ভ করে। এলাহাবাদের বিদ্রোহ-দমনকারী কর্ণেল নীল এই পল্লী গুণ্ডার আড্ডা বলিয়া হুকুমজারি করেন যে, কেল্লার এত নিকটে বস্তী রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাতে কীডগঞ্জের বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান বাজেআপ্ত হইয়া যায়। সেই সঙ্গে তাৎকালীন বাঙ্গালী ধনকুবের রামধন মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদও নষ্ট হয়। এই সীমার মধ্যে পণ্ডিত-মহাশয়দিগের বাড়ী ছিল। বেণীমাধব বাবু ইতিপূর্ব্বে অগ্নি-সংযোগের সংবাদ পাইয়াই পরিবারবর্গ আহিয়াপুর নামক পল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার বাড়ী ক্রোক হইল বটে, কিন্তু তিনি এলাহাবাদ আর্সিনালের কমাণ্ডাণ্ট কাপ্তেন রাসেলের নিকট হইতে রাজভক্তির সার্টিফিকেট (Loyalty Certificate) লাভ করায় ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন রাসেল লিখিয়া দেন —

"Certified that Babu Beni Madhab Bhattacharjee, * * * * is a loyal servant of Government and in no way connected with the mutiny or rebellion."

এই দুর্দ্দিনে যেমন সরকার বাহাদুরকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, নিরীহ প্রজাকুলকেও তদ্রূপ বিদ্রোহ দমিত হইবার পরও বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রয়াগধাম হিন্দুর মহাতীর্থ, বিশেষতঃ এখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপমোচন হইবে, এই বিশ্বাসে দলে দলে হিন্দু নরনারী কত স্বার্থত্যাগ করিয়া বহুদূর হইতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু এই পুণ্যতীর্থ সে সময় জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের ছাড়পত্র ব্যতীত কাহারও সঙ্গমে স্নান করা সম্ভব হইত না। এতদ্দ্বারা বিদেশী হিন্দু সিপাহীরা জব্দ হইয়াছিল কিনা বলা যায়না, স্থানীয় লোকের খুব কষ্ট হইয়াছিল। এই সময় অর্থাৎ ১৮৫৮ অব্দে বেণীমাধব বাবু গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্নলিখিত ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—

"This is to certify that Babu Beni Madhab Bhattacharjee * * * is a man of character and respectability deserving the indulgence of receiving a pass to bathe at the junction of the rivers."

বলা বাহুল্য, অতি সম্ভ্রান্ত, চরিত্রবান্ এবং গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র ব্যতীত কেহ এই রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের সংখ্যাও অতি বিরল। সেই বিরল সংখ্যার মধ্যে পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য একজন। সিপাহীযুদ্ধের অবসানে এলাহাবাদে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত হইতে যাঁহারা দেখেন ও শুনেন, পণ্ডিত বেণীমাধব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আর একজনের নাম রায় বাহাদুর লালা রামচরণ দাস। ইনি এখনও জীবিত আছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং যে যে সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া যশস্বী হয়েন। তিনি এ প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটেরিয়েটে ২৬ বৎসর প্রভূত সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ তাঁহাকে যে বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা হইতে নিম্নে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত হইল। কেরাণীর কার্য্যে পদস্থ রাজপুরুষদিগের এতদূর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করা আজিকার দিনে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে

হেনভি সাহেব তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার একস্থানে আছে:—

"* * * I take great interest in watching the progress of all my friends, among whom I reckon you as one.* *"

এলিয়ট সাহেব (যিনি পরে সার উপাধি পান এবং বঙ্গের ছোট লাট হন) লিখিয়াছেন

"Benimadhub is a tower of strength of the Secretariat."

১৮৮২ অব্দে সেক্রেটারী রবার্টসন সাহেব লেখেন :—

"I have rarely met a government servant of whom I have a higher opinion. He is threatening to retire on pension. I hope, he will abandon the intention and continue to serve while he has strength. He sees, how his labours are appreciated. My successors will, I am sure, have as high an opinion of him as my predecessors have had, and I shall be sorry to hand over the office *minus* one of its most efficient men."

সেক্রেটারী ব্যারী সাহেব লেখেন:—

"* * * * I have found him * * * * a man of thought and reflection and wide views with whom it was a pleasure to discuss any question. * *"

গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটরী রবার্ট স্মীটন, সি-এস, মহোদয় যে সুদীর্ঘ প্রশংসাপত্র লেখেন তাহাতে আছে:—

(1) I consider him to be a man of very much more than average ability. His work especially of late has been such as to require for its performance the qualifications rather of an Assistant Secretary than of an office clerk; and it has been done.

(2) I consider him to be a man of very much more than average character. He has always shown himself upright and conscientious in his dealings, and I entertain for him a very great respect."

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নানাবিধ প্রশংসাপত্র পাঠ করিলে এই ধারণা হয় যে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর প্রতি সে সময়ের ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষেরা শ্রদ্ধার ও সদাশয়তার সহিত ব্যবহার করিতেন।

১৮৯৬ ও ১৮৯৭ অব্দে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে যে ভয়ানক মন্বন্তর হইয়াছিল তাহার কবল হইতে নিঃসম্বল নরনারীকে উদ্ধার করিতে নানা স্থানে অন্নসত্র ও সাহায্যভাণ্ডার খোলা হয়। এলাহাবাদেও এরূপ উদ্ধারসমিতি খোলা হইয়াছিল। এই সমিতির পক্ষ হইতে ইনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন তাহার জন্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন ও তাঁহার সাহায্যলাভের জন্য প্রকাশ্য রিপোর্ট প্রভৃতিতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ১৮৯১ সালে সেন্সস বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াও তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।

সম্প্রতি উন-আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম্,এ, মহাশয়ের ন্যায় বেণীমাধব বাবুও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ ও চালচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অনাবৃত মস্তকে কখনও বাটীর বাহিরে বা প্রকাশ্য সভাদিতে যাইতেন না। তা বলিয়া বাঙ্গালীর সহিত যে তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল না, তাহা নয়। তিনি হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী সকলের সহিতই হৃদ্যতা রাখিয়া চলিতেন। তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত বেশ কার্য্যক্ষম ছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি শালগ্রামের পূজা নিত্য করিতেন। পাছে প্রয়াগ ছাড়িয়া নৈনীতাল পাহাড়ে যাইতে হয় ও তথায় হিন্দুয়ানী রক্ষা না হয়, এই কারণে জোরজবর করিয়া সেক্রেটারী রবার্টসন্ সাহেবের অনিচ্ছায় পেনশন লইয়া চাকরী হইতে অবসর লয়েন। তিনি যেমন ইংরাজী স্কুলে না পড়িয়া ইংরাজীতে নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ টোলে সংস্কৃত শিক্ষা না করিয়া সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও বেদান্তাদির মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি পূজাপাঠ নিত্যক্রিয়ায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে প্রহরাধিক কাল উপাসনাকার্য্যে রত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র একটি সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর নিষ্ঠাবান্ লোক মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি পেন্‌শন লইবার পর আর চাকরী করেন নাই বটে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সম্মানভৃতিক (honorary) রাজকীয় নানা কার্য্য ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে নিরত ছিলেন। তিনি মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হওয়ার পর মাঘমেলার অব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধার করিতে ব্রতী হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এই সময় পাইয়োনীয়র পত্রের বিশেষ সংবাদাতা হইয়া হিন্দুযাত্রী-

দিগের নানা প্রকার উৎপীড়ন-ক্লেশ ব্যক্ত করেন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দাদামহাশয় মাঘমেলা কমিটিতে মেলার অব্যবস্থা উদ্ঘাটিত করেন। তাহাতে মেলার অনেকটা দোষ শোধন হইল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনেক যন্ত্রণা ও ক্ষতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহাদিগের অযথা অর্থোপার্জ্জনে তিনি বাধা দিয়াছিলেন তাহাদিগের যড়যন্ত্রে এক মিথ্যা মোকদ্দমা ভট্টাচার্য্যের নামে খাড়া করা হইল—পুলিশের নিম্ন কর্ম্মচারীরা তাহাতে যোগ দিল। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সার ওয়াণ্টার কলভিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং প্যাটারর্সন্ সাহেব কলেক্টর ও লরেন্স্ সাহেব কমিশনার তাঁহার নির্দ্দোষিতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে অনারারি মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৮৮৬ সালে হয়। তাহার পর জীবন শেষ পর্য্যন্ত সতেজে নিজ উপনগর দারাগঞ্জের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পাকা গলি করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা তাঁহার মেম্বরীতে যত হইয়াছিল পরে তাহা আর হয় নাই। দারাগঞ্জ মিউনিসিপাল স্কুল কমিটির সভাপতি চিরকাল থাকিয়া স্কুলকার্য্য নিয়মমত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। দুর্ভিক্ষ-সময়ে তাঁহার হস্তে অন্নাদি বিতরণের ভার ন্যস্ত হয়। ফুলার (Sir J. B. Fuller) প্রভৃতি কলেক্টরের তৎসম্বন্ধে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। আবার National Congress মহাসভার সভ্য (delegate) হইয়া মান্দ্রাজে গিয়াছিলেন ও রামেশ্বরাদি তীর্থ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮০ সালে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি সম্প্রদায়ের সভ্য (fellow) হন---এবং প্রয়াগ থিয়সফিকাল সোসাইটীর সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি "মহাত্মার" দর্শনপ্রাপ্তির জন্য এক আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় এক কড়া জবাব পাইয়াছিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা হয় যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদৃশ ঈশ্বরবিশ্বাসী ও বর্ণাশ্রম আচারের পক্ষপাতী ও বৌদ্ধ-শত্রু ব্রাহ্মণের সহিত মহাত্মারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তদবধি তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হয়। সে পত্রটা পাইয়োনীয়র পত্রের তাৎকালিক সম্পাদক সিনেট্ সাহেবের হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল। সে পত্রের প্রামাণ্য জীবদ্দশায় মাদাম ব্লাভাট্স্কী ও কর্ণেল অলকট্ অস্বীকার করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এরূপ নাস্তিক্যের পরিচয় পাইয়াও আস্তিকেরা চুপ করিয়া ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যোগাভ্যাসের প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। যোগাভ্যাসীর পোষণ কার্য্যে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাই প্রথম প্রথম থিয়সফিক্যাল সোসাইটীতে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে মহাত্মারা মহা যোগী ও স্বীয় যোগবলে সাহেব ও মেমদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছেন। শেষে বুঝিলেন সবই ভুয়া।

তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ কন্যাসন্তানদিগকে বিভক্ত করিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ দেবোত্তর করিয়া দিয়া ঠাকুরের পূজা অতিথি-সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বনবিষ্ণুপুরে কাঁটাবনীতে ঠাকুর-সেবার ও প্রয়াগের বসত বাটীর শালগ্রামের সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুস্থানী প্রতিবাসীরা ও নগরের রায় রামচরণ দাস বাহাদুর ও পণ্ডিত রামচরণ শুক্ল প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা তাঁহার বিশেষ সম্মান করিতেন। কেহ কেহ এত ভক্তি করিতেন যে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তদবস্থায় তাঁহার পাদোদক লইয়াছিলেন। ১১ দিবস গঙ্গাযাত্রা করাইয়া তাহাকে গঙ্গাতটে রাখা হয় এবং অন্তর্জলী অবস্থায় তাঁহার প্রাণবায়ুর উৎক্রমণ হয়। হিন্দুমাত্রেই ধন্য ধন্য করিয়া তাঁহার গুণগান করিয়াছে ও হিন্দু সমাজের এক বড় পৃষ্ঠপোষক চলিয়া যাইবার বিয়োগশোক প্রকাশ করিতেছে।

স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল।

বাবু সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে আগমন করেন। নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে আসিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়-বলে যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন, সারদাবাবু তাঁহাদের একজন। ছাত্রজীবনে ইঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল; উত্তর কালে তাঁহার কর্ম্মজীবনেও তাহা হীনপ্রভ হয় নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন; তাঁহাদিগকে "Exhibition Scholars" বলা হইত। সারদাবাবু কটক গবর্ণমেণ্ট

সারদাপ্রসাদ সান্যাল।

স্কুলের চরম পরীক্ষায় অঙ্ক শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান হইয়া এই শ্রেণীভুক্ত হন। ইঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে সার রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, কুচবিহারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত, বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব সবজজ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সারদাবাবু যে-সকল জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত যশোলাভ করিতে পারিতেন। ১৮৬৮ সালে ডিপুটি কালেক্টর স্বর্গীয় বাবু কল্লুলালের উদ্যোগে এলাহাবাদের আহিয়াপুর পল্লীস্থ "ব্যাসজীর বাগানে" এলাহাবাদ ইনষ্টিটিউট্ (Allahabad Institute) নামে একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা স্থানীয় জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করে। সারদাবাবু ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সহকারী হইলেও প্রকৃত পক্ষে সম্পাদকীয় যাবতীয় কার্য্য ইনিই সম্পাদন করিতেন। যে মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ আজি উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থল রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সারদাবাবু কর্ত্তৃক প্রথম উত্থাপিত হয়। শুভক্ষণে একদিন সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপ্ত হইলে সভাগণ-সমক্ষে সারদাবাবু এ প্রদেশে উচ্চশিক্ষার উপযোগী কলেজ সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। সারদাবাবু "এলাহাবাদে একটি কলেজ স্থাপনার্থ চাঁদার তালিকা" ("Donations for a College at Allahabad") শীর্ষক এক খণ্ড কাগজ সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। বাবু নীলকমল মিত্র তৎক্ষণাৎ এক সহস্র টাকা দান স্বাক্ষর করিলেন এবং প্যারীমোহন বাবু ও লালা গয়াপ্রসাদ প্রত্যেকে এক সহস্র করিয়া দান স্বাক্ষর করিলেন। এই রূপে এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইল। অনন্তর সারদাবাবুর যত্নে ক্রমে প্রায় ১৫০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইল। তখন সভা হইতে দাতাগণের নাম সহ গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন প্রেরিত হইল। সে সময় বিদ্যানুরাগী সার্ উইলিয়ম মিওর উত্তর-পশ্চিমের ছোট লাট। তিনি আবেদন গ্রাহ্য করিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি উচ্চ শিক্ষার কলেজ এবং একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে উভয় কলেজের ভিত্তি স্থাপনা হইল। প্রথমেই মিওর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু মিওর সাহেবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর মেডিক্যাল কলেজ মেঝে (Plinth) পর্য্যন্ত উঠিয়া রহিত হইয়া গেল। সেই ভিত্তির উপর এখন ডাফরিন হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। কলেজের প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে এ বিষয় লিখিত আছে। উ. হ. কেরী সাহেবের সম্পাদকতায় যখন "The North-West Literary Gazette" (দি নর্থ-ওয়েষ্ট লিটারারী গেজেট) নামক সাপ্তাহিক পত্র এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত, সারদাবাবু তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সেই সময় "The Reflector" (দি রিফ্লেক্টর) বলিয়া একখানি সংবাদপত্রের জন্ম হয়। এ প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচারের ইহাই প্রথম উদ্যম। যোদ্ধা মুন্সেফ বলিয়া পরিচিত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু নীলকমল মিত্র উহার প্রবর্ত্তক। বাবু রামকালী চৌধুরী এবং সারদা বাবু ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া হিন্দীকে আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে মহা আন্দোলন চলিয়াছিল এবং নাগরী-প্রচারিণী-সভা প্রভৃতি হইতে নানা পুস্তিকা ও পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, সারদাবাবু তাহার মূল— একথা বলিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে এ বিষয়ে ইনি আলিগড় ইনষ্টিটিউট্ গেজেট, রিফ্লেক্টর, প্রভৃতি পত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তুমুল আন্দোলন করিয়া ইহার বীজ রোপণ করিয়া-

ছিলেন। তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা সার সৈয়দ আহমদ তাহার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করেন এবং উভয়ের বাদ প্রতিবাদ উক্ত পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই-সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মিওর মহোদয় সারদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠান। প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকালী চৌধুরী, নীলকমল মিত্র এবং লালা গয়াপ্রসাদ, এই চারিজনের সমভিব্যাহারে সারদাবাবু, লাট সমীপে উপনীত হইলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর কেম্পসন সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। লাট বাহাদুর ইঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সারদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছি আপনারা বাঙ্গালী, এদেশে চাকরি উপলক্ষে আসিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। আদালতে উর্দ্দু থাকাতে আপনাদের ক্ষতি কি?" তখন উন্নতমনা তেজস্বী রামকালীবাবু দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষিপ্ত অথচ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন—"মনুষ্য-মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে-দেশে বাস সেই দেশীয় লোকের হিত-চিন্তা ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নপর হওয়া। বাঙ্গালী জাতি এত স্বার্থপর নহে যে এরূপ অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইবে।" তৎপরে তিনি হিন্দী প্রচলনের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ছোটলাট এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন,—"হিন্দী ভাষার এখনও এমত অবস্থা হয় নাই যে উর্দ্দু ভাষার সমকক্ষ হইতে পারে। যখন দেশীয় লোকের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য পুস্তক হিন্দীতে লিখিত হইবে, তখন হিন্দীভাষা আদালতে গৃহীত হইতে পারিবে; এখন নহে।" ইহার পর হইতে সারদাবাবু এ বিষয়ে নীরব রহিলেন। কিন্তু রামকালীবাবু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পক্ষ অবলম্বন ও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। সারদাবাবু যে-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, সার এণ্টনি ম্যাকডনেল মহোদয়ের কৃপায় তাহা অঙ্কুরিত হয়।

সারদাবাবু একাউন্টেন্ট জেনেরালের আপিসে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ৩০ বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া মাসিক দুই শত টাকা পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। পেন্সন লইয়াও ইনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ১৮৯২ সালে আগ্রা সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ টাকার অধিক কারবার করিয়াও বিপন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহাকে একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হইলে বঙ্গদেশীয় অনেক বিধবা ও নাবালক নিঃস্ব হইয়া পড়ে দেখিয়া ইনি বিনা বেতনে উক্ত পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সার গ্রীফিথ ইভান্‌স ও অন্যান্য সাহেবদিগের ইচ্ছায় ব্যাঙ্ক বন্ধই করিতে হইল। সারদাবাবুর বয়ঃক্রম যখন ষাটেরও অধিক, যখন শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং শরীরও অপটু হইয়াছিল, তখনও তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা পূর্ব্ববৎ বলবতী ছিল। বিজ্ঞান তাঁহার অধ্যয়নের প্রধান বিষয় ছিল। ৬৫ বৎসর বয়সেও সমগ্র এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা ক্রয় করিয়া দিবারাত্র অধ্যয়ন করিতেন। জড় ও প্রাণিজগতের শক্তি ও গঠন-প্রণালী, আলোক, নক্ষত্র ও আকাশ সম্বন্ধে ইঁহার অনেক অভিনব ধারণা ছিল। সেই-সকলের প্রমাণ সংগ্রহে তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্প্রতি ২রা এপ্রেল ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জাতি-সংঘাত *

মানবের ইতিহাসে জাতিসংঘাতের সমস্যা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল বড় সভ্যতার মূলে এই সংঘাত লক্ষ্যগোচর হয়। জড় জগতে কতগুলি মূল পদার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে যে জটিল বস্তুসমষ্টি ও জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠে—তাহারি সহিত ইহার তুলনা মিলে।

ভিন্ন পরিবেষ্টনের মধ্যে এবং জীবনের ভিন্নরূপ আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া যে-সকল জাতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যখন সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন তাহার ফলে নানা জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠান আপনিই গড়িয়া উঠে। সকল সভ্যতাই এইরূপ বিচিত্র জিনিসের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে—কেবল অসভ্য অবস্থাকেই সরল ও অবিমিশ্রিত বলা যায়।

এইরূপ জাতিগত বৈষম্যগুলিকে যখন গণ্য করিতেই হয় এবং ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলিবার যখন কোন উপায় থাকে না, তখন বাধ্য হইয়া মানুষকে এমন একটি

* নিউইয়র্ক রচেষ্টারে আহূত উদার-ধর্ম্মমতাবলম্বিগণের মহা-সভায় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত এবং এপ্রিলের মডার্ণরিভিয়ু পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

ঐক্যসূত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যাহা সকল বিচিত্রতাকে এক করিয়া গাঁথিতে পারিবে। সেই অন্বেষণই যে সত্যের অন্বেষণ—বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির অন্বেষণ।

স্বভাবতই, আরম্ভে এই ঐক্যের রূপটি নিতান্ত সাদাসিধা ও স্থূল রকমের হইয়া থাকে। আদিম মানব-জাতির মধ্যে প্রায়ই কোন সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে পূজা করিতে দেখা যায় এবং তাহাই সেই জাতির ঐক্যের চিহ্নস্বরূপ ধরা হয়। প্রায়ই এই চিহ্নগুলি অতিশয় কুৎসিত ও ভীতিপ্রদ হইয়া থাকে। কারণ, বাহিরের কোন মানদণ্ডের উপর যখন মানুষের সম্পূর্ণ নির্ভর, তখন তাহাকে যতদূর সম্ভব জ্বলজ্বলে করিয়া তোলা দরকার—আর প্রাচীনকালের মানুষের কাছে ভয়ের মত এমন প্রবল জিনিস আর তো কিছুই নাই।

কিন্তু সমাজ যতই বড় হইতে থাকে এবং যুদ্ধজয় ও অন্যান্য উপায়ের দ্বারা ভিন্নাচার ও ভিন্নসংস্কারবিশিষ্ট জাতিগণ যতই মিলিত হয়, এই বিগ্রহগুলি ততই বাড়িয়া উঠে এবং এক দেবতার স্থানে বহু দেবতার সমাবেশ ঘটে। তখন জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সহায়রূপে এই চিহ্নগুলিকে আর ব্যবহার করা চলে না—তাহাদের শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে। তখন এমন কোন জিনিস তাহাদের স্থানে আমদানি করিতে হয় যাহা কেবল ইন্দ্রিয়ের কাছেই সুগোচর নয়—যাহার মধ্যে একটি বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ভাব আছে।

এইরূপে ক্রমেই সমস্যাটি জটিলতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ইহার সমাধানও গভীরতর ও অধিকতর দূরগামী হইয়া উঠে। এবং মানবের ঐক্যমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি চিরন্তন ও ব্যাপক সত্যের উপর নিজ নিজ ভিত্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়। সকল ইতিহাসের মধ্যে এই একটি অভিপ্রায় কাজ করিতেছে দেখিতে পাই—জীবনের ক্রমশ বিকাশ ও বিচিত্রতার গতিবেগের প্রেরণায় বহু জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মানুষ সত্যকে ক্রমাগত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

পৃথিবীতে এক সময় ছিল যখন গমনাগমনের সুযোগ অবাধ না হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতি ও উপজাতি-সকল অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং তাহাদের সামাজিক বিধিবিধান ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদি খুব একটি বিশিষ্ট ও তাৎস্থানিক রূপ লাভ করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং পরজাতির প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। পরদেশীয় লোকের সহিত কি করিয়া বনিবনাও করিয়া লইতে হয় সে শিক্ষার সুযোগ তাহাদের অল্পই ঘটিত। যদি কখনো সংঘাত বাধিত, তবে তাহারা একেবারেই চরম উপায় অবলম্বন করিত—অর্থাৎ হয় পরজাতিকে ঝাড়েমূলে ধ্বংস করিয়া বিদায় করিত, নয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিত।

আজও পর্য্যন্ত নিজ নিজ জাতিগত গণ্ডীর মধ্যে অচলপ্রতিষ্ঠভাবে অবস্থান করিবার এই অভ্যাস মানুষের যায় নাই। পরজাতিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার পুরুষ-পুরুষাগত সংস্কার (যাহা জীবজন্তুদেরও আদিম সংস্কার) মানুষের মনের উপর আজিও চাপিয়া আছে। নিজ গণ্ডীর বাহিরে অন্য কোন জাতির নিকটসম্পর্কে আসিয়া লেশমাত্র খোঁচা খাইলেই তাহার সেই লুক্কায়িত হিংস্র স্বভাব একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে। অন্য জাতিকে বিচার করিবার সময়ে অথবা তাহার সহিত ব্যবহার করিবার বেলায় তাহার নিরপেক্ষ উদারতা বড় দেখা যায় না। যাহারা নিকটও নয়—পরিচিতও নয়, তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে দৃষ্টিকে যে ভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তাহা মানুষ আজিও ভাল করিয়া জানিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নিজের ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠতা ও স্বকীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য সে প্রাণপণ করে—একথা স্বীকার করিতে পারে না যে, সত্য কেবল সত্য বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল বাহ্য প্রভেদের উপরেই অধিক দৃষ্টি দিতে তাহার ঝোঁক দেখা যায়—যে অন্তরতর সামঞ্জস্যে সকল ভেদ লুপ্ত হইয়া যায় সে দিকে তাহার চোখ পড়ে না।

অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে "ঘোরো" শিক্ষায় বর্দ্ধিত হইবার ফলেই এই-সকল ঘটিয়াছে—বিশ্বের মানুষ হইবার পক্ষে মানুষ উপযুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল তো এ অবস্থা চলিতে পারে না—তাই বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারের এই নবযুগে আজ মানুষ মানুষের যেরূপ নিকটে

আসিয়া পড়িয়াছে, এমন আর কোন কালেই আসে নাই। সেই জন্যই মানুষকে আজ ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সে এই জাতি-সংঘাতের সমস্যা।

ইতিহাসের বৃহত্তর প্রসারের মধ্য দিয়া মানবের গভীরতর অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে—সেই অপেক্ষায় এই যুগযুগব্যাপী প্রশ্নটি অপেক্ষা করিয়া আছে। ইহা তো কেবলমাত্র বুদ্ধিগত বা অনুভূতিগত বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে আমরা এমন সকল মহাপুরুষ লাভ করিয়াছিলাম যাঁহারা সকল মানবের সাম্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এমন দর্শন ও সাহিত্য পাইয়াছিলাম যাহা জাতিগত সংস্কার ও আচারের গণ্ডীর বাহিরে আমাদের দৃষ্টিকে বৃহত্তর সত্যের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই জাতিসমস্যা কখনই তাহার এই প্রভূত জটিলতা লইয়া আমাদের সম্মুখে এমন করিয়া উপস্থিত হয় নাই—ইহার সহিত আমাদের জীবনের এমন করিয়া যোগ ঘটে নাই। কচি মেয়ে যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির ভাব লইয়া কতকটা সেই ভাবেই মনুষ্যসাধারণ এতকাল পর্য্যন্ত খেলা করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে যে সত্য ভাব নিহিত হইয়া আছে তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের ভিতর দিয়া তাহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে নাই। কিন্তু এখন সেই ক্রীড়ার সময় চলিয়া গেছে, যাহা কেবলমাত্র অনুভবের বিষয় ছিল তাহা এখন গুরুতর দায়িত্বের আধার হইয়া জীবনের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে।

আমার মনে হয়, সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষেই এই জাতিসমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া দেখা দিয়াছিল। বহুযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষকে জাতিবৈচিত্র্যের অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক কঠিনগ্রন্থিবিশিষ্ট জট একটু একটু করিয়া উন্মোচন করিবার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপে যে-সকল জাতি জড়ো হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খুব বেশি বৈষম্য ছিল না—তাহারা অধিকাংশই একই মূলজাতি হইতে উৎপন্ন ছিল। সুতরাং যদিচ ইউরোপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্যে কলহ বিবাদ যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, কিন্তু রঙের ও মুখাবয়বের ভেদে যে জাতি-বিদ্বেষ জন্মায়, তাহা সেখানে কদাচ ছিল না। ইংলণ্ডে নর্ম্মান ও স্যাকসনদিগের মিলন ঘটিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। কেবল বর্ণে ও শারীরিক গঠনে নয়, জীবনের আদর্শেও পাশ্চাত্য জাতিগণ পরস্পরের এত নিকটতর যে বস্তুত তাহারা সকলে মিলিয়া এক-মনপ্রাণ হইয়া তাহাদের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এমনটি ঘটে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভকালেই শুভ্রকায় আর্য্যগণের সহিত কৃষ্ণকায় ও অসভ্য আদিম অধিবাসিগণের সংগ্রাম বাধিয়াছিল। তারপর এইখানে দ্রাবিড়জাতি ছিল এবং তাহাদের এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিল। তাহাদের দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি, ও সামাজিক রীতিনীতি আর্য্যগণের পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ছিল। একেবারে বর্ব্বর অবস্থার চেয়ে এইরূপ সভ্য অবস্থার বৈষম্য অনেক বেশি প্রবল তাহাতে সন্দেহ নাই।

শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে জীবনসংগ্রাম অত্যুগ্র নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবনযাত্রার উপকরণ অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রকৃতিমাতাও তাঁহার সম্পদ বিতরণে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না—সুতরাং এইসকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের মধ্যে বিবাদবিরোধ নব নব উত্তেজনার অভাবে শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে সেই জন্য খুব কঠিন সংগ্রামের পরে ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন আচার, ভিন্ন মুখাবয়ব ও ভিন্ন প্রকৃতির জাতিগণ পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে বসবাস করিয়াছিল দেখা যায়। কিন্তু মানুষ তো আর জড় বস্তু নয়, সে প্রাণবান্ পদার্থ—সুতরাং এই নানা বিভিন্ন জাতির একত্রাবস্থান ভারতবর্ষের পক্ষে এক চিরন্তন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অথচ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও এই বৈচিত্র্যই এখানকার মানুষের মনকে নানার মধ্যে এককে বাহির করিবার দিকে উদ্বোধিত করিয়াছিল। এই কথা তাহাকে জানাইয়াছিল যে বিগ্রহ অথবা বাহ্য আচারের বৈষম্য যতই হোক্ না কেন, যে-ভগবানকে উপলব্ধি করিবার ইহারা সহায় তিনি এক বই দুই নন্ এবং তাঁহাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করা মানে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে তাঁহাকে জানা।

বৈষম্যগুলি যখন অত্যন্ত উৎকট ও উগ্র হয়, তখন

মানুষ কেমন করিয়া তাহাদিগকে চরম বলিয়া স্বীকার করিবে! সুতরাং হয় সে রক্তের দ্বারা সকল অনৈক্যকে মুছিয়া শেষ করিয়া ফেলে, নয় জবরদস্তির দ্বারা একটা ভাসা-ভাসা নিতান্ত স্থূল সাম্যে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখে— কিম্বা সকলের চেয়ে যে বৃহৎ সত্য, যাহার মধ্যে সকল বিচ্ছেদের অবসান, তাহাকেই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষ এই তিনপ্রকার মীমাংসার মধ্যে শেষটি গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জন্য তাহার যুগযুগব্যাপী সকল রাষ্ট্রীয় দশাবিপর্য্যয় ও উত্থানপতনের মধ্যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি অপরাজিত বেগে আপনার কাজ করিয়া চলিয়াছে—যদিচ তাহার সহগামিনী গ্রীস ও রোমের সভ্যতা বহুপূর্ব্বেই তাহাদের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া বসিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত সেই তাহার অন্তরাত্মার অন্তর্নিহিত গৌরব ম্লান হয় নাই। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা বলিতেছি না যে জাতিবৈষম্যের জন্য যে-সকল বাধাবিপত্তি অবশ্যম্ভাবী তাহা ভারতবর্ষে বিদ্যমান নাই। উল্টা বরং হইয়াছে এই যে, নব নব বৈষম্য আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে এবং নূতন নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে জগতের সকল বড় বড় ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষের মাটীর মধ্যেই নিজ নিজ মূল নিখাত করিয়াছে। এই বিপুল বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্যে বাঁধিতে গিয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ ও অভিপ্রায় যুগে যুগে নানা ভাঙাগড়া, নানা সংকোচ ও প্রসারণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার সর্ব্বশেষ প্রয়াস হইয়াছে—বিধিনিষেধের কঠিন গণ্ডী রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গোলযোগ ও সংঘাত নিবারণ করিবার উদ্যোগ।

কিন্তু এ প্রকারের অভাবাত্মক আয়োজন তো দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না—মানবসমাজে যান্ত্রিক বন্দোবস্ত কখনই ভালমত কাজ করিতে পারে না। যদি দৈবক্রমে এমন কতকগুলি জাতি এক জায়গায় একত্রিত হয় যাহাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র, যাহারা একরূপ প্রথা ও আচারের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হয় নাই, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন ভাবাত্মক প্রেমমূলক বিস্তৃত ঐক্যের ভিত্তি তাহারা আবিষ্কার না করে, ততক্ষণ তাহাদের শান্তি হইতেই পারে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষে এই ভাবাত্মক ঐক্যমূলক আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে—সুপ্ত হইলেও তাহা প্রাণহীন হয় নাই—তাহা ভিতরের ঐক্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া বাহিরের সকল অনৈক্যকে মানিয়া লইবার শক্তি রাখে। আমি নিশ্চিত-রূপে অনুভব করি যে ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান ও প্রেমের কারখানা-ঘরে সেই সোনার চাবিটি তৈরি হইয়াছে যাহা এক দিন অর্গলবদ্ধ সকল দ্বার উন্মোচন করিয়া দীর্ঘ-কাল ধরিয়া ব্যবহিত ও বিচ্ছিন্ন জাতিসকলকে প্রেমের এক মহা-নিমন্ত্রণে সম্মিলিত করিবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুদূর কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত এখানকার সকল মহাপুরুষগণ এই কাজই তো করিয়া আসিতেছেন। ভগবান বুদ্ধ যে বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনেক পূর্ব্বের আর এক ধর্ম্মান্দোলনের ফলমাত্র। নানা বিগ্রহ, অনুষ্ঠান, ও ব্যক্তিগত সংস্কারের বিচিত্রতার ভিতরে সেই ধর্ম্মান্দোলন আধ্যাত্মিক সত্যের এক পরম ঐক্যের মধ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

মুসলমান-শাসন ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা এদেশে আসিল তাহা নহে, ধর্ম্মে ও সামাজিক প্রথাতেও নূতন নূতন ভাব প্রবলভাবে এ দেশের জনগণের মনোমধ্যে উপস্থিত হইল। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে ইহা বিরুদ্ধ ও বিদ্বেষী কোন আন্দোলনের সৃষ্টি করিল না। বরং এই সময়ে ভারতবর্ষে যে-সকল ধর্ম্মবীর মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে এই নূতন ভাবকে এক গভীরতর সমন্বয়ে অন্বিত করিয়াছিলেন। এই মধ্যযুগের আন্দোলনগুলির ভিতর দিয়া এদেশের জনসমূহের নিকটে বারম্বার এই আহ্বানই আসিয়াছিল যে তাহারা যেন জাতি-ধর্ম্মের সকল বিরোধ ভুলিয়া নারায়ণের প্রেমে মিলিত সকল নরকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করা মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ অধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়।

আবার ইংরাজ-আগমনে খৃষ্টীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আধুনিক যুগে সেই একই ব্যাপার পুনরায় ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন কিসের আন্দোলন?

তাহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে ধর্ম্মের বন্ধনে মিলাইবার উদ্যোগ—উপনিষদের গভীর অধ্যাত্মজ্ঞানের উদার ভিত্তির উপর সেই মহৎমিলনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ। পুনরায় এ দেশবাসীর নিকট বাহ্য আচার প্রথা ও জাতিভেদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবানের নামে সকল মানুষকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিবার আহ্বান আসিয়াছে।

জগতের আর কোন দেশেই ভারতবর্ষের মত সকল দিক্ দিয়া বিভিন্ন জাতি-সম্মিলন এমন বিপুল আকারে ঘটে নাই। সেইজন্য "নেশন" মাত্র গড়িয়া এই সমস্যার একটা সহজ মীমাংসা করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভাবনীয় হয় নাই। নিয়ত বিরোধশীল এত বৈচিত্র্যকে "নেশন" কেমন করিয়া সামঞ্জস্য দান করিবে—সুতরাং মানুষের সর্ব্বোচ্চশক্তি, তাহার অধ্যাত্মশক্তির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই—সকল বিরোধের সেতু ঈশ্বরের শরণ লইতেই হইবে। বরাবর ভারতবর্ষে তাই একদিকে প্রাণহীন আচারবিচারের কঠিন গণ্ডী রচনা, অন্যদিকে অধ্যাত্মবোধপ্রসূত সকল মানবের ঐক্যকে স্বীকার করা—এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। একদিকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে এক পংক্তিতে পানাহার করার বিরুদ্ধে নিষেধ রহিয়াছে; অন্যদিকে প্রাচীন কাল হইতে বাণী আসিতেছে—আপনার আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে যিনি উপলব্ধি করেন, তাঁহারি উপলব্ধি সত্য। আর সেইজন্য আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই যে মানুষের মধ্যে এই অধ্যাত্মবোধের প্রেরণা পরিণামে জয়লাভ করিবে এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তাহা এমন করিয়া গড়িবে যাহাতে তাহারা তাহার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ না করিয়া অগ্রসর করিয়াই দিবে।

কোন সমস্যা জীবন্ত না হইলে মানুষের মন যে তাহার মীমাংসার জন্য উদ্যত হয়না কেবল ইহাই দেখাইবার জন্য ভারতের ইতিহাসের এই দৃষ্টান্তটি আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করিলাম। বর্ত্তমান যুগে এ সমস্যা যে বাস্তবিকই জীবন্ত সমস্যা। যে-সকল জাতি ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি, প্রভৃতি সকল বিষয়ে অত্যন্ত অধিক ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র, তাহারা আজ পরস্পরের খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক মানুষের কাছে সমগ্র মানবজগৎ এত বৃহৎ ও প্রসারিত হইয়াছে যাহা পূর্ব্বকালে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু আমরা যে এই পরিবর্ত্তনের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত নহি তাহা প্রতিদিনই বেদনার সহিত সুস্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। জাতিবিদ্বেষ অধুনা অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ অন্য সকল জাতির বিরুদ্ধে একটা উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য-পরায়ণতা জাগাইয়া তুলিতেছে। শারীরিক শক্তির ভয় দেখাইয়া দুর্ব্বল জাতিদিগকে শোষণ করিবার অধিকার নিজেদের জন্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া তাহারা নিজ নিজ দেশে দুর্ব্বল জাতিদিগের প্রবেশের দ্বার অতিশয় রূঢ় ও বর্ব্বরভাবে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে। দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চগুণ প্রকাশ্যে অবজ্ঞাত হইতেছে এবং বিশ্ব-যশস্বী কবিগণ মহোল্লাসে পাশব বলের জয়কীর্ত্তন করিতে-ছেন। বহুযুগের জড়তার পর গা ঝাড়া দিয়া যে-সকল জাতি জাগিয়া উঠিতেছে ও বৃহত্তর জীবন লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাদিগকে পিছাইয়া ঠেলিয়া রাখিবার জন্য সৌভাগ্যবান জাতিসকল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং তাহাদের এই নূতন অবস্থার বিশৃঙ্খলাকে নিজেদের সুযোগলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তুলিবার অপেক্ষায় আছে। যাহারা সর্ব্ববিধ দুর্গতিতে নীচে পড়িয়া আছে, তাহাদের প্রতি দয়া ও বিচারের অভাব এবং অমানুষিক অত্যাচার শক্তিমদগর্ব্বিত ও বর্ণগরিমায় স্ফীত শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতিদিগের মধ্যে কিছুমাত্র বিরল নহে। কিন্তু এ-সকল বিপরীত ব্যাপার ঘটিতে দেখিলেও, আমি একথা জোরের সঙ্গেই বলিব যে বাধা ও বিপদ যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার মোচনের উপায় তখনই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও সুনিশ্চিত হয়। আজ যে সুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতি-সংঘাতের সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবার কথা। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষ যে নবজন্ম লাভ করিয়াছে, ইহাই এ যুগের সকলের চেয়ে গর্ব্ব করিবার বিষয়। সূতিকাগৃহে এই নবশিশুটির শয্যার আয়োজন কোথায়—সে যে দারিদ্র্যের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—তাহার শৈশব যে এখন পথের ধারের ভগ্ন কুটীরের মধ্যে ধনসম্পদের দ্বারা অনাদৃত অবজ্ঞাত হইয়া—অবহেলায় কাটিতেছে। কিন্তু তাহারি

বিজয়ের দিন আর দূরে নাই। সেই মহাজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য কবি ও ঋষি ও বহু অখ্যাত বিনম্র কর্ম্মীদলের অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে—তাঁহাদের আসিতেও আর বিলম্ব নাই। মনুষ্যত্বের মহা আহ্বান যখন সমুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত, তখন মনুষ্যের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে! জানি, শক্তি ও জাতীয় গর্ব্বের মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসবনিশীথে মানুষ সেই আহ্বানকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাকে শূন্য ভাবুকতা ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া ঠেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু সেই মত্ততার মধ্যেই,—তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল, তাহার প্রবল আক্রমণ যখন বিচারমূঢ় ও ন্যায়-ঘাতী—সেই সময়েই, এই কথাই তাহার মানসপটে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে নিজের অন্তর্নিহিত সর্ব্বোচ্চ সত্যকে আঘাত করা আত্মঘাতের চরমতম রূপ। যখন ব্যূহবদ্ধ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যপরতা, পরজাতিবিদ্বেষ, এবং বাণিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃতভাবে তাহার বীভৎসতম রূপ প্রকাশ করে, তখনি মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে, কিম্বা সামাজিক কোন যন্ত্রবদ্ধ নূতন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নাই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ব্ববাধা হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের যথার্থ মুক্তি।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

হেমকণা

পথের উভয় পার্শ্বে দলে দলে নাগরিকগণ সমবেত হইতেছিল, রাজপথে শান্তিরক্ষকগণ সমান্তরালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কাহাকেও তাহাদিগের হস্তস্থিত রজ্জুর সীমা অতিক্রম করিতে দিতেছিল না। উভয় রজ্জুর মধ্যস্থিত পথে রাজপুরুষগণ বংশদণ্ড প্রোথিত করিতেছিল, কেহ কেহ বংশদণ্ডগুলি পত্রপুষ্পে আচ্ছাদিত করিতেছিল। তাহাদিগের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে আর একদল পরিচারক আসিয়া রজ্জুনিবদ্ধ নানাবর্ণের পতাকা দণ্ডশীর্ষে সংলগ্ন করিয়া গেল। বাহকগণ আসিয়া ধূলিনিবারণের জন্য পথে কলসের পর কলস শীতল জল ঢালিয়া গেল, বারিসিঞ্চনে যেস্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল সেস্থান হইতে পরিচারিকাগণ কর্দ্দম উঠাইয়া লইয়া বালুকা নিক্ষেপ করিয়া গেল। পথ প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়া আসিল। পথিপার্শ্বে তখন জনতা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, উভয় পার্শ্বের গৃহসমূহের গবাক্ষ, বাতায়ন ও ছাদ এরূপ জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে নূতন লোক আসিয়া রাজপথে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না। দূরে তূর্য্যধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ বিশাল জনতার কোলাহল থামিয়া গেল! কে একজন বলিয়া উঠিল দেবযাত্রা আসিতেছে। তাহার পর কথায় কথায় ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় কোলাহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তূর্য্যধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, প্রাসাদের তোরণের সম্মুখে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, লোকে বুঝিল দেবযাত্রা প্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে যাত্রার পুরোভাগ নয়নগোচর হইল, নানাবর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণ-দণ্ডাগ্রে-সংলগ্ন পতাকা লইয়া বাহকগণ দেখা দিল, তাহাদিগের মধ্যদেশে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া চারিজন বালক তূর্য্যধ্বনি করিতেছিল। পতাকাবাহকদিগের পরে মণিরত্নবিভূষিত বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত সহস্র সহস্র হস্তী একে একে চলিয়া গেল। হস্তীযূথের পরে অশ্বারোহীসেনা এবং তাহাদিগের পরে রথশ্রেণী নয়নগোচর হইল। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময়ে রাজধানী পাটলিপুত্রে যতদূর সমারোহ সম্ভব তাহা সেইদিন প্রদর্শিত হইয়াছিল। শেষ রথখানি অতিক্রম করিলে কাতারে কাতারে উল্কাধারী পদাতিকসেনা আবির্ভূত হইল, তাহাদিগের মধ্যে সমান্তরালে এক একটি তৈলসিক্ত-বস্ত্রজড়িত দারুময় স্তম্ভ যাইতেছিল, একজন নাগরিক তাহা দেখিয়া বলিল অগ্নিস্তম্ভ যাইতেছে। পদাতিক সৈন্যশ্রেণী শেষ হইলে উল্কাধারী রাজপুরুষপরিবৃত বৌদ্ধভিক্ষুগণ দেখা দিলেন। প্রতি পংক্তিতে চারিজন করিয়া মুণ্ডিত-মস্তক, নগ্নপদ ভিক্ষু চলিতেছিলেন, তাঁহাদিগের উভয় পার্শ্বে উল্কাধারী পুরুষগণও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছিল। সর্ব্বশেষে দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, বিরলকেশ একজন ভিক্ষু আসিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া

জনতার মধ্যে যাহারা কথা কহিতেছিল তাহারা হঠাৎ নির্ব্বাক হইয়া গেল। যে ব্যক্তি দূরস্থিত গ্রাম হইতে দেবযাত্রা দেখিতে আসিয়াছিল সে তাহার পার্শ্বস্থিত একজনকে জিজ্ঞাসা করিল "এ লোকটি কে?" তাহার পশ্চাৎ হইতে আর একজন অযাচিত হইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে সে-ব্যক্তি প্রশ্নকর্ত্তার পিতা! তাহার পশ্চাৎ হইতে আর একজন বলিয়া উঠিল "তুমি কি উহার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছুক?" পশ্চাতস্থিত প্রাসাদশীর্ষ হইতে তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "উপগুপ্ত, তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণের যম।" দীর্ঘাকার পুরুষ একবার মাত্র মস্তকোত্তলন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ শান্তিরক্ষকগণ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল, ভয়ে নাগরিকগণ পথ ছাড়িয়া দিল, যে-ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল সে পলাইতে পথ পাইল না, দেবযাত্রা অগ্রসর হইল। তাহার পর শুভ্রবসন-পরিহিতা শতাধিক সুন্দরী পরিচারিকা দীপহস্তে পথের উভয় পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে শুভ্রবসন-পরিহিত খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ একজন পুরুষ নগ্নপদে চলিতেছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে একজন পরিচারক আবশ্যকতার অভাব সত্ত্বেও বৃহৎ শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া চলিতেছিল, অপর দুইজন পরিচারক ব্যজন করিতেছিল। নাগরিকগণ নীরবে সম্রাটের আগমন দেখিতেছিল। উপগুপ্ত আসিলে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল সে ব্যক্তি পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে একজন বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, চারি পাঁচজনে তাহার দেহ উত্তোলন করিয়া পশ্চাতস্থিত সঙ্কীর্ণ পথমধ্যে ফেলিয়া দিল। আমার বর্ত্তমান অধিকারীর পশ্চাতে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের মধ্যে একজন অপরকে বলিতেছে শুনিতে পাইলাম—

"তোমরা জয়ধ্বনি করিবে কিনা বল?"

"ব্রাহ্মণপল্লীতে আর জয়ধ্বনি না হইল।"

"ব্রাহ্মণপল্লীতেই জয়ধ্বনি আবশ্যক, বৌদ্ধেরা ত স্বেচ্ছায় জয়ধ্বনি করিবে।"

"সকলে ত আমার কথার বাধ্য হইবে না।"

"জানাইয়া দিও বাধ্য না হইলে তোমাদিগের পল্লীতে শীঘ্রই অগ্নিকাণ্ড হইবে।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "সম্রাটের জয় হউক।" তাহার সহিত আরও দুই দশজন জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেবযাত্রা কিয়ৎকালের জন্য থামিল, পরিচারকগণ তখন উল্কাহস্তে ইতস্ততঃ ধাবন করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে উল্কা, দীপ ও অগ্নিস্তম্ভ সমূহ জ্বলিয়া উঠিল। নাগরিকগণের গৃহের সম্মুখে বহু দীপ প্রজ্বলিত হইল, বৃদ্ধ একমনে আলোকমালা দেখিতেছিল। এই সময়ে তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে একজন অতি সন্তর্পণে তাহার কটীদেশে হস্তার্পণ করিয়া আমাকে খুলিয়া লইল, বৃদ্ধ তখন তাহা জানিতে পারিল না। যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল সে অনেকক্ষণ বৃদ্ধের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে জনতার মধ্যে সরিয়া গেল। দেবযাত্রা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, অগ্নিস্তম্ভ সমূহ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন বৃদ্ধ হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল যে কে তাহার সুবর্ণখণ্ডগুলি অপহরণ করিয়াছে। চোর তখন ক্রমশঃ জনতা ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে মিলিয়া গেল।

অনুভবে বুঝিতে পারিলাম রাজপথ ও জনতা পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছি। রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইলে আমার অধিকারী আমাকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইল, গৃহের বহির্দ্বারের সম্মুখে আমাকে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। রজনী শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে ব্যক্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং আমাকে গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বদিন প্রভাতে বৃদ্ধের সহিত নগরের যে অংশে আসিয়াছিলাম পুনরায় সেই অংশেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে ব্যক্তি জনৈক সুবর্ণবণিকের বিপণিতে আমাকে বিক্রয় করিল এবং আমার পরিবর্ত্তে রজতমুদ্রা লইয়া চলিয়া গেল। বিপণিস্বামী আমাকে পূর্ব্বসঞ্চিত সুবর্ণরাশির সহিত একত্রে লৌহ-পেটিকায় নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যখন বন্ধনমুক্ত হইলাম তখন আবার অন্ধকার আসিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে আমাদিগের কয়জনকে লইয়া এক ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রাধারে বন্ধন করিল, তাহার পর বস্ত্রাধারটি পরিধেয় মধ্যে গোপন করিয়া বিপণি পরিত্যাগ করিল। রাজপথ অবলম্বন

করিয়া সে ব্যক্তি বহুদূর চলিয়া গেল, রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইলে ধীরে ধীরে সভয়ে একটি জীর্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহদ্বারে বসিয়া একটি বৃদ্ধ দীপালোকে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল, আগন্তুককে দেখিয়া মস্তকোত্তলন করিল এবং তাহার পর মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল "যাও"। নবাগত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল এবং প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় কক্ষের দ্বার-দেশে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় কক্ষটি সম্পূর্ণ অন্ধকার, দ্বারের পার্শ্বে অন্ধকার-মধ্যে একব্যক্তি লুক্কায়িত ছিল, সে প্রশ্ন করিল "তুমি কে?" উত্তর হইল "বণিক নয়ন-দত্তের পুত্র মদনদত্ত।" তাহার পর আদেশ হইল "যাও"। আগন্তুক দ্বিতীয় কক্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় কক্ষের দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইল, সে কক্ষটি দ্বিতীয় কক্ষ অপেক্ষা অধিক অন্ধকার, সেখানেও দ্বারের পার্শ্বে অন্ধকার-মধ্যে অপর একজন লুক্কায়িত ছিল, আগন্তুক কক্ষের দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" আগন্তুক পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল "কিজন্য আসিয়াছ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল "দেবদর্শনে।" আবার জিজ্ঞাসা হইল "কত অর্থ আনিয়াছ?" আগন্তুক উত্তর করিল "শত সুবর্ণ।" তাহার পর আদেশ হইল "চলিয়া যাও।" তৃতীয় কক্ষটি দ্বিতীয় কক্ষ অপেক্ষা আকারে দীর্ঘ, আগন্তুক বুঝিতে পারিল যে অন্ধকার কক্ষমধ্যে বহু লোক লুক্কায়িত রহিয়াছে, কারণ অন্ধকারে তাহার পথভ্রম হইলে বহু লোক তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহার গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। আগন্তুক তৃতীয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহের অঙ্গনে উপস্থিত হইল, অন্ধকারে অঙ্গনের বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু আগন্তুক অনুভবে বুঝিতে পারিল যে অঙ্গন নিতান্ত জনশূন্য নহে, সে অঙ্গন অতিক্রম করিয়া আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটি বৃহদায়তন এবং জনাকীর্ণ, গৃহের মধ্যদেশে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে একটি বৃদ্ধ বসিয়া ছিল, তাহার সম্মুখে দ্বিতীয় কাষ্ঠাসনে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং একখানি ধাতুপাত্রে কতকগুলি সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা পতিত ছিল। আগন্তুক গৃহের বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "মদনদত্ত কোনদিনই আমাদিগকে বিস্মৃত হয় না।" আগন্তুক গৃহমধ্যে অগ্রসর হইয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বস্ত্রাধারটি গ্রহণ করিল এবং আমাদিগকে ধাতুপাত্রে ঢালিয়া দিল। সুবর্ণ দেখিয়া বৃদ্ধের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সমবেত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন "বন্ধুগণ, পাটলিপুত্রের প্রধান শ্রেষ্ঠী নয়নদত্তের পুত্র মদনদত্ত পিতার খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কেহ নয়নদত্তের বংশে ভাববিপর্য্যয় লক্ষ্য করে নাই। তোমাদিগের অনুগ্রহ-বশে আমরা এখনও পাটলিপুত্রে বাস করিতে সমর্থ হইতেছি, কিন্তু এইরূপ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগের কতদিন চলিবে? আমাদিগের জীবিকা-উপায়ের পথ বোধ হয় চিরদিনের মত রুদ্ধ হইতে চলিল, ভগবানের অনুগ্রহে তোমরা আঢ্য বটে, কিন্তু তোমরা কতকাল আর সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবে? তোমরা সকলেই অবগত আছ যজ্ঞার্থ পশুবলি নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই যাগযজ্ঞ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। দাসীপুত্রের বংশজাত সম্রাট দেবতার রোষের ভয় রাখেন না, কারণ তিনি নূতন দেবতা পাইয়াছেন। উপগুপ্তের সাহায্যে তিনি বহু পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন যে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন দেবমণ্ডলী কাল্পনিক ও দৈবশক্তিহীন। রাজদ্বারে দেবতা ও ব্রাহ্মণের আর কোন ভরসা নাই। প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ-গণের মর্য্যাদার লাঘব হয় নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজের বিশেষ হানি হইয়াছে। রাজা প্রকাশ্যে পার্ষদগণের সম্মান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার আদেশে প্রচ্ছন্নভাবে ধর্ম্মমহামাত্যগণ সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে নিযুক্ত আছে। অন্তঃপুরে পুরমহিলাগণ স্বাধীনতা হারাইয়াছেন। প্রকাশ্য-ভাবে কুলাচার ও ব্রতনিয়মাদি নিষিদ্ধ না হইলেও স্ত্র্যধ্যক্ষ-মহামাত্যগণের কঠোর শাসনে তৎসমুদয় বহুপূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজা প্রকাশ্যে উদারনৈতিক, কিন্তু অশোক-বর্দ্ধনের ন্যায় সঙ্কীর্ণচেতা রাজা অদ্যাপি আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে নাই। শীঘ্র ইহার প্রতীকার না হইলে দেশ হইতে সনাতন ধর্ম্ম তাড়িত হইবে, শতবর্ষ পরে আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণের নাম শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইবে।" বৃদ্ধের সম্মুখে ভূমির উপর শুক্লকেশ আর একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বিনীতভাবে বৃদ্ধকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন; "প্রভু চিরদিন সমান যায় না। দুঃখের পর সুখ ও সুখের পর দুঃখই আসিয়া থাকে, চিরদিন কখনই এরূপভাবে অতিবাহিত হইবে না, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া জীবিত রহিয়াছে, সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহা যে আর্য্যাবর্ত্তে নির্ম্মূল হইবে তাহা বোধ হয় না। শীঘ্রই আর্য্যধর্ম্মের শুভদিন আসিবে, তখন দুর্দ্দিনের কথা স্বপ্নের ন্যায় মনে হইবে। আপনি বিজ্ঞ ও বহুশাস্ত্রদর্শী, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, আপনি অধীর হইলে ব্রাহ্মণসমাজ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবে হয়ত সমাজকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যতদিন আমরা জীবিত আছি ততদিন আমাদিগের শ্রেণীর মধ্যে বিপরীত ধর্ম্মভাব প্রবেশাধিকার পাইবে না, আবশ্যক হইলে আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় নিয়োজিত হইবে, ততদিনে কি ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইবে না? রাজা শূদ্রজাতীয়, দেবদ্বিজে তাঁহার তদ্রূপ আস্থা নাই, বিশেষতঃ তিনি নূতন ধর্ম্মের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জীবনকালে পুরাতন ধর্ম্মের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইবার আশা অতি সামান্য। পূর্ব্বকালে রাজগণ যখন কেবল মগধের অধীশ্বর ছিলেন তখন তাঁহারা মগধবাসীদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেন। রাজগণ এখন বিশাল ভারতবর্ষের অধীশ্বর, অপরাপর দেশের ন্যায় মগধ তাঁহাদিগের রাজ্যের অংশমাত্র, সুতরাং রাজদ্বারে মগধবাসীদিগের বিশেষ কোন অধিকার নাই, সুতরাং এখন ধৈর্য্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।" বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন, অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন "শ্রেষ্ঠীবর, তুমি যাহা কহিয়াছ তাহাই সত্য, বর্ত্তমান সময়ে ধৈর্য্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ভরসা করি পক্ষান্তরে আবার তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।" তিনি কাষ্ঠাসন হইতে উত্থিত হইলেন, তাঁহার সহিত সমবেত জনসঙ্ঘের সকলেই দণ্ডায়মান হইলেন। একজন পরিচারক আসিয়া ধাতুপাত্রস্থিত সুবর্ণ ও রজতমুদ্রাগুলি চর্ম্মপেটিকায় আবদ্ধ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সমবেত শ্রেষ্ঠীগণ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরিচারক প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন চর্ম্মপেটিকার আবরণ উন্মুক্ত হইল তখন রজনী অতীত হইয়াছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কক্ষমধ্যে শয্যায় উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চর্ম্মপেটিকার আবরণ উন্মুক্ত হইল, পেটিকা হইতে আমি উত্তোলিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের করতলগত হইলাম। বৃদ্ধ আমাকে সযত্নে বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের চুম্বক — অমরনাথ জমিদারের ছেলে; কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত; সেখানে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। অমরনাথ বাল্যবিবাহ, পণগ্রহণ, অপ্রণয়ে বিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে খুব বড় বড় কথা বলিত। হঠাৎ অমরের পিতা তাহাকে না জানাইয়া এক জমিদার-কন্যার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন, এবং বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে অমরকে বাড়ীতে আনাইয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপার জানান। বাধ্য হইয়া অমরকে বিবাহ করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীর সহিত অমর কোন সম্পর্ক রাখিল না। অমর লজ্জিত হইয়া দেবেন্দ্রকেও তাহার বিবাহের সংবাদ জানাইতে পারিল না।

এক সময়ে ছুটিতে অমর দেবেন্দ্রনাথের দেশে শিকার করিতে গিয়া একটি বালিকার সহিত পরিচিত হয়। দেবেন্দ্র যোগাড়যন্ত্র করিয়া সেই বালিকার মাতার মৃত্যুশয্যায় অমরকে উপস্থিত করে। বিধবা অমরের হাতে তাঁহার কন্যা চারুকে সঁপিয়া দিয়াই মরিয়া গেলেন; অমর যে বিবাহিত তাহা জানাইবার অবকাশও সে পাইল না। অগত্যা অমর চারুকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং অন্যত্র তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে যখন অমর বুঝিল যে চারু তাহাকে ভালোবাসে এবং সেও চারুকে ভালোবাসে তখন সে-ই চারুকে বিবাহ করিবে সঙ্কল্প করিল।

অমর তাহার পূর্ব্বপত্নী সুরমার ও পিতার অনুমতি লইবার জন্য বাড়ী গেল। কিন্তু সুরমার তেজস্বী ব্যবহারে ও পিতার তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে চারুকে বিবাহ করিল। অমরের পিতা অমরকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া তাহার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। অমর ও চারু দুজনেই সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ অগোছালো। জিনিষপত্র বিক্রী করিয়া দিন চলিতে লাগিল।

যখন অমরের আর্থিক অবস্থা চরম শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তখন অমরের পিতার দেওয়ান অনেক বলিয়া কহিয়া অমরকে কিছু টাকা পাঠাইলেন। অমর তাহা ফেরত দিল। সে পিতার স্নেহের দান লইতে পারে; করুণার দান কাহারও নিকট হইতে লওয়া যে অপমানজনক। এমন সময়ে অমরের পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। অমর সংবাদ পাইয়া আর অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না; চারুকে লইয়া পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পিতা সন্তানকে ক্ষমা করিয়া, দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, চারুকে সুরমার হাতে স'পিয়া দিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন। সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞা চারু সুরমাকে দিদি রূপে পাইয়া আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

সুরমা স্বামী-সোহাগে বঞ্চিতা বলিয়া তাহার শ্বশুর তাহাকে সমস্ত জমিদারী ও সংসারের কর্ত্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে সে সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সংসারে জমিদারীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল—অমর ও চারু ত কিছুই জানে না, পারে না। অগত্যা তাহারা সুরমার শরণাপন্ন হইল।

এইরূপে ক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিচয় হইল। অমর দেখিল সুরমার মধ্যে কি মনস্বিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মপটুতা ও একপ্রাণ ব্যথিত স্নেহ আছে। অমর মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ক্রমে প্রণয়ের আকারে তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

সুরমা বুঝিল যে চারুর স্বামী তাহাকে ভালোবাসিয়া চারুর প্রতি অন্যায় করিতে যাইতেছে, এবং সেও নিজের অলক্ষ্যে চারুর স্বামীকে ভালোবাসিতেছে। তখন সুরমা স্থির করিল যে ইঁহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। চারুর অশ্রুজল, চারুর পুত্র অতুলের স্নেহ, অমরের অনুরোধ তাহাকে টলাইতে পারিল না। বিদায় লইবার সময় অমর সুরমাকে বলিল, যাইবার পূর্ব্বে একবার বলিয়া যাও যে ভালোবাস। সুরমা জোর করিয়া "না" বলিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে কাঁদিয়া লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল "ওগো শুনে যাও আমি তোমায় ভালোবাসি।"

সুরমা পিত্রালয়ে গিয়া তাহার বিমাতার ভগ্নী বালবিধবা উমাকে অবলম্বনস্বরূপ পাইয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। সুরমার সমবয়সী সম্পর্কে কাকা প্রকাশ উমাকে ভালোবাসে, উমাও প্রকাশকে ভালো বাসে বুঝিয়া উভয়কে দূরে দূরে সতর্কভাবে পাহারা দিয়া রাখা সুরমার কর্ত্তব্য হইল।

এদিকে চারুর একটি কন্যা হইয়াছে; এবং চারুর সম্পর্কে ভাইঝি মন্দাকিনী তাহার দোসর জুটিয়াছে। কিন্তু দিদির বিচ্ছেদ-বেদনা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অমরও সান্ত্বনা পাইতেছিল না। শেষে স্থির হইল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতে হইবে। পশ্চিমের নানা স্থানে বেড়াইয়া অমর সপরিবারে অবশেষে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন দেবদর্শনে বাহির হইয়া অমর তাহার শ্বশুরকে দেখিতে পাইল। তারপর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা করিতে গিয়া দেখিল সুরমা ভক্তিগদগদ চিত্তে বিশ্বেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিতেছে। সুরমা যেমন প্রণাম করিতে যাইবে অমনি অমরের সহিত চোখোচোখি হইল! কাহারই আর বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করা হইল না; উভয়েই উন্মনা হইয়া গৃহে ফিরিল। অমরকে উন্মনা দেখিয়া চারু জেরা করিয়া জানিতে পারিল যে তাহার দিদিও কাশীতে আসিয়াছে। সে দিদির সহিত দেখা করিবার জন্য অমরকে ধরিয়া বসিল। যখন দেখিল যে অমর সুরমার খোঁজ করিবার গা করিতেছে না, তখন চারু তাহার দেবেন দাদাকে ধরিয়া সুরমাকে সংবাদ পাঠাইল, দিদি যেন একবার তাহাদের বাসায় আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়, একবার উমারাণীর মুখখানি দেখাইয়া যায়।

সুরমা প্রকাশের মুখে এই সংবাদ শুনিল। প্রকাশের ইচ্ছা যে সে কাশীতে আর কয়েক দিন থাকিয়া অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়। কিন্তু সুরমা দেখিয়াছিল যে প্রকাশ অন্তরাল হইতে কর্ম্মনিরতা উমাকে একদৃষ্টে দেখে; তাই সে কঠোর ভাবে প্রকাশকে বাড়ী যাইতে আদেশ করিল এবং তাহাকে জানাইয়া দিল যে বিলম্বের চেষ্টা অমরের সহিত সাক্ষাতের জন্য যত না, উমার নিকটে থাকিবার জন্য যত।

প্রকাশ এই অভিযোগে কাতর হইয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হইল। সুরমা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিল প্রকাশকে বিবাহ করিয়া উমাকে বুঝাইতে হইবে যে সে তাহাকে ভালো বাসে না।]

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় বারোটা। উমা পূজা শেষ করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; চুলগুলা বড় ভিজা আছে, না শুখাইলে সুরমা বকিবে। এক হাতে চুলের মধ্যের নির্ম্মাল্যটি লইয়া নাড়িতে নাড়িতে আর এক হাত সে চুলে দিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু হাত যথাস্থানে পৌঁছিতেছিল না; সে অত্যন্ত অন্যমনা। সুরমা সামান্য ক্ষণের জন্যও তাহাকে চিন্তা করিতে দেয় না, তাই সে এক মুহূর্ত্তও একা বা নিষ্কর্ম্মা হইলেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। আজও নির্ম্মাল্যের ফুলটি লইয়া সেই ঠাকুর-দালানের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল সেদিন কি দারুণ যাতনাই তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়াছিল। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেল, কারণও মনে পড়িল প্রকাশের সেই সব কথা। সে কথা-গুলা ত এখনো মনে পড়িতেছে; কিন্তু কই তাহাতে ত আর তেমন উগ্র বেদনা বোধ হইতেছে না। সেদিন যেন তাহার কি হইয়াছিল! প্রকাশেরও বোধহয় সেদিন কি হইয়াছিল নহিলে আর কখন ত এমন বলে নাই বা বলে না! এই যে প্রকাশ চলিয়া গেল—কই দেখাও ত করিয়া গেল না, ইহা ভাবিয়াই তাহার কেমন দুঃখ হইল; কিন্তু দুঃখ বোধ হইল বলিয়াই বালিকার শরীর লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দেখা করা এমন দোষের কথা কি! সকলেই ত সকলের সঙ্গে দেখা করে তবে তাহার বেলা এমন কেন হয়! তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। বুঝিল সেই কথাগুলার জন্যই প্রকাশ তাহার সঙ্গে দেখা করে না, সেও করিতে পারে না! ছি ছি প্রকাশ এমন কাজ কেন করিল! না করিলে এমন সম্বন্ধহীনের মত ভাব ত হইত না। পরের যে অধিকার আছে তাহার তাহাও নাই!

সুরমা ঘর হইতে ডাকিল "উমা খেতে আয়!" উমা বলিল "যাচ্চি।" সুরমা কথায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল "যাচ্চি না, এখনি আয়, জল আন্ দেখি।" উমা আজ্ঞা পালন করিল।

আহারাদির পরে উভয়ে বারান্দায় আসিয়া বসিল। রামায়ণ হাতে লইয়া সুরমা বলিল "আজ সীতার বনবাস। শোন দেখি কি সুন্দর! কত দুঃখের!" সরল ছন্দে সুরমা পড়িয়া যাইতে লাগিল আর উমা একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিল। যখন রামের অব্যক্ত গভীর খেদে এবং সীতার দুঃখে তাহার কোমল হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল তখন ঝি আসিয়া খবর দিল "গাড়ী করে একটা ছেলে আর মেয়ে বেড়াতে এসেছে।" "কে এল?" বলিয়া সুরমা পুস্তক বন্ধ করিল। উমা সাগ্রহে বলিল "তা হোক না, তুমি পড়।" "দূর ক্ষেপি তা কি হয়? কে এসেছে দ্যাখ দেখি।"

"ঐ যে তারা আসছে" বলিয়া উমা বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। সুরমা দেখিল একজন দাসীর ক্রোড়ে অতুল আর সঙ্গে একটী কিশোরী বালিকা। সুরমা অনুভবে চিনিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এসো মা!" দুই হস্ত বিস্তার করিতেই অতুল ক্রোড়ে আসিয়া স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া নীরবে রহিল, সুরমা ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে মেয়েটির পানে ফিরিয়া বলিল "তোমারি নাম বুঝি মন্দাকিনী?" বালিকা নীরবে তাহাকে প্রণাম করিয়া নত মুখে রহিল। অতুল মাতার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় বলিল "ও দিদি!" সুরমা হাসিয়া বলিল "আর এ কে দ্যাখ দেখি?" বালক সবিস্ময়ে উমার পানে চাহিল, তারপরে "দিদি" বলিয়া তাহার দিকে ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিল। উমা অতুলকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার পশ্চাতে মুখ লুকাইল, কি জানি তাহার কেন কান্না আসিতেছিল। সুরমা বলিল "যা, ওকে বাঁদর দেখিয়ে আন গে।" উমাও তাহাই চায়, অতুলের মৃদু আপত্তিকে কয়েকটা প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুরমা হাত ধরিয়া বালিকাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার পিসিমা কি কচ্চেন?" বালিকা মৃদুকণ্ঠে বলিল "বসে আছেন। আমাদের আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন আপনাকে আজই যেতে হবে।" সুরমা বালিকার ধীরকণ্ঠে প্রীত হইয়া বলিল "আমিও তোমার পিসিমা হই তা জান?"

"জানি।"

"কিসে জানলে?"

"পিসিমা বলে দিয়েছেন।"

"তুমি এর আগে কখন' তোমার পিসিমাকে দেখেছিলে।"

"না, কোথায় দেখবো?"

সুরমা এসব জানিত, কিন্তু বালিকার সঙ্গে কি কথা বলিয়া আলাপ করে তাই এসব কথা পাড়িতেছিল। "তোমার বাবা ওখানে থাকতেন, বেশ ভাল লোক ছিলেন, আমরা তাঁকে অনেক দিন দেখেছি।" বালিকা নীরবে রহিল। "তোমার বাবা তোমায় খুব ভালবাসতেন?"

"বাসতেন।"

"তাঁকে কত দিন দেখেছ?"

"খুব ছোট বেলায়, আর যখন ব্যারাম হয়ে নিয়ে গেলেন।"

"তিনি কি আগে কখনো তোমাদের খোজ নিতেন না?"

"না।"

"তবে কিসে ভালবাসতেন বুঝলে?"

"আমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তিনি গেছেন। আমায় খুব ভাল বাসতেন।"

"তুমি কার কাছে মানুষ হয়েছিলে?"

"দিদিমার কাছে—তিনি মারা গেলে মামাদের কাছে।"

"বাপ মারা গেলে আর মামারা রাখলেন না?"

"না।"

"কেন?"

বালিকা মস্তক নত করিল। সুরমা তাহার নিকটে আর একটু সরিয়া বসিয়া তাহার হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইয়া বলিল "কষ্ট পাও তো বলে কাজ নেই। আমায় তুমি চেননা, আমিও তোমার পিসিমা।"

বালিকা নত মস্তকে বলিল, "মামারা বলেন বিয়ের যুগ্যি এত বড় মেয়ে আমরা ঘরে রাখতে পারব না, এই-সব বলেন।"

"যতদিন তাদের ওখানে ছিলে খুব কষ্ট পেতে বোধ হয়?"

"কষ্ট আর কি? আমি সব কাজই কর্ত্তে পারতাম, কেবল বাবার খবর পেতাম না বলেই যা কষ্ট ছিল।"

"কি কি কাজ করতে হত ?"

"সেখানে কত লোকে সে সব কাজ করে!—ধানভানা বাসনমাজা, ঘরনিকোনো, এই-সব।"

"কষ্ট হত না ?"

"আমার খুব অভ্যাস ছিল।"

"এখন ত কোন কষ্ট নাই ?"

"না, সেখানে কখনি না কখন বাবা ফিরে আসবেন বলে একটা আশা ছিল. কিন্তু এখানে আসার আগেই সে আশাও শেষ হয়ে গেছে।"

সুরমা এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "সে জন্যে দুঃখ কোরো না, তিনি স্বর্গে গেছেন।"

"দুঃখ ত করি না, অসুখে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন--স্বর্গে তিনি সুখে থাকুন।"

"তোমায় তোমার পিসিমা কেমন ভালবাসেন ?"

"খুব দয়া করেন। পিসে মশাইও ভালবাসেন।"

"কে বেশী বোধ হয়।"

"দুই জনেই সমান।"

"অতুল তোমার খুব অনুগত—না ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার পিসিমা তোমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছেন না ? তাতে লজ্জা কি মা ? চেষ্টা করেন ?"

বালিকা তথাপি নীরবে রহিল।

"করেন না ?"

"করেন বোধ হয়—আমি ভাল জানি না।"

সুরমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু মন্দাকিনী আর অবকাশ দিল না। বলিল "আপনি যাবেন না ?"

"যাবো—আজ নয়, আর একদিন। তোমার পিসিমাকে বলো।"

মন্দাকিনী বলিল "তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি কি আসবেন, না, আপনি যাবেন ?"

সুরমা ভাবিয়া বলিল "তাঁকে কাল সকালে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে বলো, আমিও যাব।"

"আচ্ছা।"

"তুমিও যেয়ো।"

"আমি হয়ত অতুলকে নিয়ে বাড়ীতে থাকব, ভিড়ে তার কষ্ট হয়।"

সুরমা উমাকে ডাকিল। দেখিল অতুল মহা বিষণ্ণ ভাবে তাহার ক্রোড়ে রহিয়াছে। সুরমাকে দেখিয়া উমার ক্রোড় হইতে নামিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল; সন্দেহাকুল নেত্রে উমার পানে চাহিয়া বলিল "ও তো দিদি নয়।" সুরমা হাসিয়া বলিল, "অতুল কি বলে রে উমা!" উমাও একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "ভাল চিনতে পারছেনা বোধ হয়!"

সুরমা একটু গম্ভীর হইল. যে অম্লান হাসিতে উমাকে বিশেষ চেনা যাইত, সত্যই এখন তাহার অভাব হইয়াছে। সুরমা বলিল "উমা, দেখদেখি কেমন মেয়েটি।"

উমা চাহিয়া দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বেশ।"

"একটু আলাপ করলিনে ? মন্দা তোর বয়সীই হবে বোধ হয়। নয় মন্দা ?"

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল "আমিই বোধ হয় বড় হব।"

"বড় হবে না—ওর অমনি ছেলেমানুষী মুখখানা—যাওনা তোমরা দুজনে একটু গল্প করগে।"

মন্দাকিনী চকিতে একবার উমার মুখপানে চাহিল, উমার অনিচ্ছাকুণ্ঠিত মুখ দেখিয়া বলিল "পিসিমা শিগ্‌গির করে যেতে বলেছেন।"

"সঙ্গে আর কে আছে ?"

"দেবেনবাবু এসেছেন, তিনি বাইরে বসে আছেন বোধ হয়।"

সুরমা ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বলিল "ছিছি আমার যেন কি হয়েছে। জল খাওয়ান হলোনা উমা, তুই বস, আমি জোগাড় করছি।"

সুরমা অতুলকে লইয়া চলিয়া গেল, অগত্যা উমা নতমুখে বসিয়া রহিল। মন্দাও নীরবে রহিল।

সুরমা গিয়া দেখিল দেবেনবাবু গাড়ী আনিয়া অতুলকে আহ্বান করিতেছেন, অতুলের দ্বারা অনেক উপরোধ করাইয়া সুরমা তাঁহাকে জলযোগ করাইল। পিতাকে সংবাদ দিতে তাহার ইচ্ছা হয় নাই, কেননা জানিত এসব ব্যাপার পিতা ভাল বাসেন না। সেই ভয়েই সুরমা চারুকে আসিতে বলিল না। মন্দাকে জল খাওয়াইতে ডাকিতে

গিয়া দেখিল, তখনো তাহারা অপ্রস্তুত ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। উমা বুঝিতেছে এটা ভাল হইতেছে না তথাপি কি আলাপ করিবে ভাবিয়াও পাইতেছিল না, কাজেই আগন্তুক মন্দাও অপ্রস্তুত।

প্রভাতে উঠিয়া সুরমা উমা ও একজন লোকমাত্র সঙ্গে লইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনে চলিল। পিতা বলিলেন "আজ থাক্‌না, কাল আমিও যাব।"

সুরমা বলিল "আমার আজ বড় ইচ্ছা হচ্চে।"

"তবে যাও।"

বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সুরমা সেদিনের কথা মনে করিয়া মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করিল, কিন্তু মনে হইল সবই যেন বিফল, অনুতাপের শেষে ক্ষমা-প্রাপ্ত একটা নির্ম্মল শান্ত ভাব কই প্রাণে তো আসিল না। উমার পানে চাহিয়া দেখিল, উমা বিগ্রহকে প্রণাম করিতেই তাহার নীলতারা-শোভিত শ্বেতপলাশ হইতে ঝর ঝর করিয়া শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সুরমা বুঝিল তাহার কষ্ট সে দেবতার চরণে এইরূপে নিবেদন করিতেছে, সে ক্ষমা পাইয়াছে। সুরমা উমার অজ্ঞাতে একবার তাহার মস্তকে হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিল।

চারুর সঙ্গে দেখা হইল। প্রণাম করিয়া স্নেহকরুণ মুখে সে বলিল "এত শীগ্‌গির যে আবার দেখা হবে তা আর ভাবিনি।"

সুরমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, অতুলকে দেখিয়া বলিল "ওকেও এনেছ ?"

"তুমি আস্‌বে শুনে ও কিছুতে থাক্‌লনা—ওঁরা রাম-নগর গেলেন—ও গেল না।"

"মন্দা কই আসে নি ?"

"না, সে বড় কোথাও যেতে চায় না।"

"বেশ মেয়েটি।"

"আহা, মেয়েটা জন্মে- কখনো স্নেহের মুখ দেখেনি !" বলিয়া চারু উমার নিকটে গিয়া একহাতে তাহার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া অন্য হাতে মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল "উমারাণী ! চিন্‌তে পারছিস না নাকি ?"

উমার মনটা তখন একটু শান্তিস্নিগ্ধ হইয়াছে—সলজ্জে হাসিল।

"কথা কচ্ছিস না যে ?"

উমা চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল "এমন হয়ে গিয়েছিস্ কেন মা ? কই মাসীমা বলে ত' ডাক্‌লি না ?"

উমা তথাপি কথা কহিতে পারিল না, কেবল নত মুখে একটু হাসিল। চারু সুরমার পানে চাহিয়া বলিল "তোমার ভোরের ফুল শুকিয়ে গেছে কেন দিদি ? হাসিটুকু যেন আর কার ! তোমার সে উমা কি হ'ল ?"

উমা চারুর কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরমা গম্ভীর মুখে বলিল "চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকে, উমার এখন বুদ্ধি হয়েছে।"

"বুদ্ধি যে ওকে মানায় না ! ওকে সেই মুখখানি, সেই হাসিখানিই যে বেশী মানায় !"

সুরমা একথা চাপা দিবার জন্য বলিল "এখন আর কতদিন থাকা হবে ?"

"মাস দুই হতে পারে। আর তোমায় যেতে বল্‌ব না, মধ্যে মধ্যে দেখার কি হবে ?"

সুরমা হাসিয়া বলিল "যেতে বল্‌বিনা কেন ?"

"সে কথায় আর কাজ কি !"

"অতুলকে মধ্যে মধ্যে পাঠাস্।"

"আচ্ছা ! আর আমার সঙ্গে দেখার দরকার নেই বুঝি ?"

সুরমা তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল "দুদিনের জন্যে মায়ায় কাজ কি।"

"মায়া নাই কল্লে, দেখায় কি দোষ ?"

"এই ত' হ'ল, যেদিন দুর্গাবাড়ী কি বটুক-ভৈরবের দিকে যাবি খবর পাঠাস্ যাব।"

চারু নীরবে রহিল।

"আর মন্দাকে মধ্যে মধ্যে পাঠিয়ে দিস্।"

"আচ্ছা ! উমাকে আমার কাছে দুদিন দাওনা দিদি।"

সুরমা উমার মুখের পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "ওর শরীরটা বড় খারাপ—এখন ত আছিস্।"

চারু ক্ষুণ্ণভাবে রহিল। তারপর আরও অনেক কথা হইল—সুরমার পিতার কথা, সংসারের কথা। চারু বলিল

তাহার অসুখের কথা, খুকীর কথা, সংসারের কথা। অমরের কথা সুরমা কিছু জিজ্ঞাসা না করায় সেও কিছু বলিল না। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইল।

সেই দিনই বৈকালে অতুলকে লইয়া মন্দা বেড়াইতে আসিল। চারুর অস্থিরতা এবং আগ্রহ দেখিয়া সুরমা ক্ষুণ্ণভাবে একটু হাসিল। অতুল তাহার দিদির হাত ধরিয়া আনিয়া মহা বিজ্ঞ ভাবে বলিল "মা, আমি দিদিকে ধরে এনেছি।" সুরমা এজন্য তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া উমাকে ডাকিয়া অতুলকে বলিল "এটা কে রে?"

অতুল বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "দিদি নয়।"

অন্য সময় হইলে উমা অভিমানে ফুলিয়া উঠিত কিন্তু এখন একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র। অতুলকে ক্রোড়ে লইতে গেল, অতুল আসিল না, দুই হাতে মন্দার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দা কুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে বলিতে লাগিল "যাওনা, উনিই যে তোমার দিদি।"

অতুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না, তুমি দিদি! তোমায় আমি শ্বশুরবাড়ী যেতে দেবই না।"

সকলে হাসিয়া উঠিল, মন্দা লজ্জিত নতমুখে রহিল, সুরমা অতুলকে আদর করিয়া বলিল "তোর দিদি শ্বশুরবাড়ী যাবে নাকি?"

"আমি যেতে দেবই না।"

"ওঁরা কি সম্বন্ধ খুঁজছেন, কই চারু ত' কিছু বল্‌লে না।"

মন্দা নত মুখে বলিল "পিসিমা ওকে আজ ঐ বলে ভয় দেখিয়েছেন তাই ওর ভয় হয়েছে।"

অন্যান্য কথা বার্ত্তার পরে সুরমা উমাকে বলিল "দুজনে গল্প কর, আমি আস্‌ছি।"

অতুল বলিল "আমি বাঁদর দেখবো।"

"আয় দেখিয়ে আনি—মন্দা উমার সঙ্গে কথা কও।"

অতুলকে লইয়া সুরমা চলিয়া গেল। মন্দা দুই একবার উমার পানে চাহিয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিল। উমা বুঝিল মন্দার কথা কহিতে সাহস হইতেছে না, তাহার কথা না বলা অত্যন্ত বিসদৃশ কাজ হইতেছে। অনুতপ্তা উমা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল "তোমার বাপের বাড়ী কোথায়?" সমবয়স্কার সহিত জীবনে সে কখনো সখীত্ব সম্বন্ধ জানে নাই, তাই মূঢ়ের মত একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল। মন্দা তাহার দিকে চাহিয়া উত্তর দিল "বাপের বাড়ী কখন জানিনা, মামার বাড়ী কুসুমপুর।" "তোমার মাকে মনে আছে?" "না, জ্ঞানে তাঁকে দেখিনি।" উমা করুণায় গলিয়া গেল। "মামারা তোমার ভাল বাস্‌তেন না বুঝি?" মন্দা নত মুখে বলিল "হাঁ বাসতেন বৈ কি।" "তবে যে মাসীমা মাকে বল্লেন মেয়েটি জন্মে কখনো স্নেহের মুখ দেখেনি।" উমার নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ সরল প্রশ্নে মন্দা ক্ষুণ্ণ হইতে পারিল না, কেবল একটু ম্লান হাসিয়া বলিল "তিনি খুব ভাল বাসেন কি না।" উমা সরল ভাবে বলিল "মাও তোমায় খুব ভাল বাসেন, সুখ্যাতি করেন।" মন্দা তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল "তা হ'লে তোমার কথাও বল্‌তে হয়, পিসিমারও তোমার কথা ভিন্ন মুখে কোন কথা নেই। আমি তোমার মত হ'তে পারিনি বলে আমার সময়ে সময়ে বড় ক্ষোভ হ'ত।" উমা বলিল "কেন?" "তা হলে পিসিমা বোধ হয় বেশী সন্তুষ্ট হতেন।" উমা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিতে জানিল না যে 'আমি আর কি ভাল' বা 'আমার মত কারু হয়ে কাজ নেই'। সে বিনা আপত্তিতে প্রশংসাগুলা নির্ব্বোধের মত মস্তক পাতিয়া লইয়া বলিল "তোমায় মাসিমা বেশী ভাল বাসেন—না—মামারা বাস্‌তেন?" মন্দা একটু ভাবিয়া বলিল "দু জনেই স্নেহ করেন।" "তাঁরা তোমায় এত কষ্ট দিতেন তবু বল সমান ভাল বাসতেন?" মন্দা তাহার বড় বড় স্থির চক্ষে উমার পানে চাহিয়া বলিল "তাঁরা আমার আজন্মের আশ্রয়, মা-বাপ-হীন অবস্থায় মানুষ করেছিলেন, সামান্য একটু আধটু কষ্টে কি করে বলব যে তাঁরা ভাল বাস্‌তেন না? পিসিমা পিসে মশাই আমায় বড় বেশী সুখে রেখেছেন, কিন্তু যদি তা না রাখতেন তবু কি তাঁরা আমায় স্নেহ করেন না ভাবতে পারতাম্? নিঃস্নেহ হ'লে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় কেউ?" উমার সুনীল চক্ষে জল ভরিয়া আসিল,—মন্দার নিকটে একটু সরিয়া আসিয়া মন্দার একখানা হাত নিজ

হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিল "তোমার বড় ভাল মন।" মন্দা অপর হস্তে উমার অন্য হাতখানি ধরিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল—"তুমি ভাল তাই জগতকে ভাল দেখ।" উমা চক্ষু মুছিয়া বলিল "তা হলে তোমার মামাদের জন্যে মন কেমন করে?" "না, মন কেমন করতে দিই না।" "কেন?" "তাঁরা আমায় নিয়ে যে দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন, যে রকম বল্‌তেন, তাতে নিজের প্রাণের ওপর বড় ঘৃণা হ'ত। ভগবান যে এখন আমায় অন্য জায়গায় আশ্রয় দিয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করেছেন এ আমার ওপর ভগবানের বড় করুণা।" উমা বুঝিতে না পারিয়া বলিল "কি দুর্ভাবনা ভাই?" মন্দা ঈষৎ নীরব থাকিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বলিল "বুঝ্‌তে পার্‌লে না? মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিতে না পারার ভাবনা!" "কেন তাঁরা বিয়ে দিলেই ত' পার্‌তেন।" "কে নেবে? আমার মতকে কি কেউ সহজে চায়?" "কেন ভাই, তুমি ত বেশ সুন্দরী।" "ওকথা ছেড়ে দাও, আমি যে অনাথ, টাকা না দিলে ত' বিয়ে হয় না, আমার মা বাপের ত' কিছু ছিল না।" উমা ক্ষণেক ভাবিল, পরে হাসিয়া বলিল "এখানে সে দুর্ভাবনা ভাব্‌বার কেউ নেই ত?" মন্দা বিষণ্ণ স্বরে বলিল "আমি যেখানে যাব সেই খানেই ভাবনা! পিসে মশাই মধ্যে মধ্যে ভাবেন বই কি!" "তোমার বোধ হয় সকলকে এ ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে খুব ইচ্ছা হয়?" "হয় বই কি! কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি কেউ আছে যে আমার মতকে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিতে পারে! তাই ইচ্ছা করেও বেশী কিছু ভাবিনা, মনে করি এখন যে রকম অবস্থায় ভগবান রেখেছেন এতে অসন্তুষ্ট হওয়া বড় অকৃতজ্ঞের কাজ।" উমা মন্দার কথা সব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বোধ হয় তুমি খুব দুঃখী।" মন্দা কিছু বলিল না, নীরবে উমার পরদুঃখকাতর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেছিল "দুঃখের সমুদ্রে ডুবেও তুমি পরের দুঃখই বেশী মনে করছ! তবে এ বিষয়ে তুমি সুখী, কেননা তোমার নিজের অবস্থা ভগবান তোমায় ভাল করে বোঝান নি।" মন্দা তাহার বালবৈধব্য নিরাশ্রয়ত্বের কথা চারুর মুখে শুনিয়াছিল। মন্দা জানিত না যে জ্ঞানই দুঃখের মূল, এ গাছের ফল যে খাইয়াছে সেই দুঃখী, নহিলে সুখ দুঃখের প্রভেদ বড় অল্প।

মন্দা ও অতুল চলিয়া গেলে সুরমা উমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি রে, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেছিস্?" "হ্যাঁ।" "কেমন মেয়েটি?" "বড় দুঃখী।" "আর কিছু নয়? ভাল না মন্দ?" "বেশ ভাল!" "খুব বুদ্ধিমতী আর বেশ স্থির ধীর; নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট; না?" উমা তখন সুরমার প্রশ্নে একে একে তাহাদের সব কথাগুলি বলিয়া ফেলিল। সুরমা শুনিয়া নীরবে রহিল। সে দিনটা সেই প্রসঙ্গেই গেল।

দুই দিন পরে সুরমা উমাকে বলিল "চল, আজ দুর্গা-বাড়ী যাবি?" "সে দিন যে গিয়েছিলে?" "আজ চারু সেখানে যাবে।" "আজ আর আমি যেতে পারছি না।" "চল্ না, মন্দার সঙ্গে তোর দেখা হবে।" উমা একটু ভাবিয়া বলিল "আর একদিন দেখা করব, আজ ভাল লাগছে না।" সুরমা বুঝিল উমার নিরুদ্ধম বিষণ্ণতা ক্ষণেক চাপা থাকে মাত্র।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাবাড়ীর অভ্যন্তরে গোল বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া চারু বলিল "এস, এইখানে বসে একটু গল্প করি।"

সুরমা বলিল "লোকে কি মনে করবে?"

"যা ইচ্ছা। এ ভিন্ন ত উপায় নেই।"

"মন্দাকে সঙ্গে আননি কেন? বড় ভাল মেয়েটি।"

"বারণ কর্‌লেন। তার বিয়ের একটা সম্বন্ধ করা হচ্ছে।"

"মন্দার? পাত্র কোথাকার?"

"এইখানেরই। কথা ঠিক হলেই দেখ্‌তে আস্‌বে।"

সুরমা একটু বিমনা হইল, ভাবিয়া বলিল "পাত্রটি কেমন?"

"বেশ ভাল, তবে বড্ড চায়।"

"তোমরা স্বীকৃত হয়েছ?"

"না হ'য়ে কি করা যায়, বিয়ে ত' দিতে হবে।"

"এইখানেই বিয়ে দিয়ে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, উনি বল্লেন আর বিয়ের দেরী করা উচিত নয়, এখানে ক'টি পাত্রের কথা এসেছে, এখন যেটি হয়।"

সুরমা ভাবিয়া বলিল "আর কিছুদিন পরে দিলে হ'তো না।"

"কেন দিদি? মেয়ে ত ছোটটি নয়।"

"আমার ইচ্ছা হচ্চে যে মেয়েটিকে আমি নি।"

"তুমি নেবে? কার জন্য? প্রকাশ কাকার জন্য?"

"হ্যাঁ।"

চারু আনন্দ-গদ্গদকণ্ঠে বলিল "ওর কি তেমন ভাগ্যি হবে? তুমি ঠাট্টা করছ না ত?"

"সত্যই বল্‌ছি। তবে কথা এই যে, যদি কিছুদিন দেরী করতে পারতে ত ভাল হ'ত।"

চারু নিরাশ স্বরে বলিল "তাহলে হয় ত হবে না দিদি। আমি প্রকাশ কাকার কথা ওঁর কাছে বলেছিলাম, তাতে উনি বলেন যে তোমাদের পক্ষ হতে এ কথা উঠ্‌লে উনি স্বীকার হতেন। এখনো স্বীকার হবেন, কিন্তু দেরী আর করবেন না, ওর বিয়ে দিয়ে তার পরে কিছুদিনের মত উনি বেড়াতে বেরুবেন। পাত্রও হাতের কাছে পেয়েছেন দেরী করতে বল্লে হয় ত শুনবেন না।"

সুরমা ক্ষণেক নীরবে রহিল। তারপরে বলিল "বেরুনো, কোথায় বেরুনো হবে?"

"কি জানি দিদি! রাজপুতানার দিকে যাবেন বল্লেন।"

সুরমা হাসিয়া বলিল "সঙ্গ ছেড়ো না যেন, কত দেশ দেখা হবে।"

"তা আর বল্‌ছ! যে মানুষ, শরীর-বোধ একেবারে নেই, ও মানুষ কি একা ছেড়ে দেওয়া যায়?"

"কত দিনের মত বেরুনো হবে?"

"তা বল্‌তে পারি না। বলেন ত যে ঐদিকে কোথাও গিয়ে বসবাস করবেন আর ডাক্তারী করবেন, বাড়ীতে বসে বসে থাকা আর ভাল লাগে না।"

"সত্য নাকি? তারপরে, বিষয় আশয় কে দেখবে?"

"কাকা থাক্‌বেন, আর কখনো দরকার পড়্‌লে নিজে আস্‌বেন।"

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

চারু বলিল "যে কথা বল্লে তার কি বল্‌ছ?"

"ওঃ, মন্দার বিয়ের কথা? হ্যাঁ—ওকে আমিই নেব।"

"তাহলে কিন্তু এই মাসেই বিয়ে দিতে হবে।"

"কি করি, অগত্যা! কন্যাকর্ত্তার মত হবে ত?"

"তা নিশ্চয় হবে, অমন পাত্র—মত হবে না? তবে কন্যাকর্ত্তা কি দিনক্ষণ স্থির করতে দেনা পাওনা স্থির করতে বরকর্ত্তার কাছে যাবেন?"

সুরমা হাসিয়া বলিল "বরকর্ত্তা ত বাবা। তাঁকে গিয়ে আমি সব বল্‌ব, আর তুমি না হয় কন্যাকর্ত্তার প্রতিনিধি দেবেন বাবুকে বাবার কাছে পাঠিও। দেনা পাওনা তোমার কাছে আমার অফুরন্ত,—মেয়েটি আমি চাই—ছেলেটা তোমার,—দিতে পার্‌বে ত?"

চারু হাসিল।

এমন সময়ে তেওয়ারীর কোলে চড়িয়া অতুল বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া নালিশ করিলেন যে অকৃতজ্ঞ বানরেরা প্রচুরপরিমাণে চানা ভাজা প্রাপ্তি সত্ত্বেও তাঁহার হাতির-দাঁতের সুন্দর ছড়িগাছটি লইয়া পলাইয়াছে, অকর্ম্মণ্য তেওয়ারী ও লছমনিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। সুরমা তাহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বুঝাইল যে অকৃতজ্ঞ বানরদের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া অতুলের শ্বশুরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা জব্দ হইবে। শুনিয়া অতুল কিছু আশ্বস্ত হইল।

তেওয়ারী বলিল "বহুমা, আউর কেত্‌না দেরী হোবে?"

"আর দেরী নেই" বলিয়া সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অগত্যা চারুও উঠিল। সুরমা বলিল "কন্যাকর্ত্তার মত কি রকমে জান্‌তে পারব?"

"আমি তেওয়ারীকে দিয়ে কাল সকালে পত্র লিখে পাঠিয়ে দেব। বারে বারে আর এমন করে দেখা ঘট্‌বে না হয় ত, উনি যে ঠাট্টা করেন, বলেন তীর্থ যে তোমার মহাতীর্থ হয়ে উঠ্‌ল।"

সুরমার গণ্ড ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল, ক্ষুণ্নভাব গোপন করিয়া একটু হাসিয়া বলিল "তা ত বলবেই, তোমার ত ন্যায় অন্যায় বোধ নেই! তীর্থ করতে এসেছ, কোথায় দুজনে দেখে বেড়াবে, না দিদি দিদি করেই ঘুরবে।"

চারু লজ্জিত হাস্যে বলিল "তা বই কি! রাস্তায় রাস্তায় ওরকম ঘুরতেই আমার ভাল লাগে না।"

"কাল একবার মন্দাকেও পাঠিয়ে দিও, গোটা দুই কথা কব।"

"কেন দিদি, সাহেবদের মত পছন্দ জিজ্ঞাসা করবে নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"তা তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না।"

"তোর জিনিষ খাঁটি, তাই তোর ভয় নেই; আমার একটু ভয় আছে, পাঠিয়ে দিস্, বুঝেছিস্? তাকে বাবাকে একবার দেখাব।"

"তাঁর যদি মত না হয় ?"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

প্রভাতে সুরমা চারুর পত্র পাইল, অমরের সম্মতি আছে, তবে কার্য্যটা এই মাসেই নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বৈকালে মন্দা অতুলের সহিত বেড়াইতে আসিল। অতুল আজ উমাকে দেখিয়া একবার 'দিদি' বলিয়া গিয়া ধরিল, আবার মন্দার কাছে পলাইয়া গেল। মন্দা উমার সহিত আলাপ করিতে গিয়া দেখিল সে নিবিষ্ট মনে একটা কি বুনিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে অন্যমনা দেখিয়া মন্দা নীরবে সরিয়া আসিল। সুরমা তাহাকে উমার কাছে পাঠাইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলে সুরমা ম্লান হাস্যে বলিল "সে ক্ষেপির বুঝি এখন গল্প করা ভাল লাগ্‌লনা। মন্দা, ওটাকে তোমার কিরকম বোধ হয়?" মন্দা সঙ্কুচিত হইল, উত্তর দিতে পারিলনা। সুরমা বুঝিয়া বলিল "তাতে লজ্জা কি? আমার এরকম জিজ্ঞাসা করা একটা রোগ, তোমাকে এখন আমার আপনার মেয়ের মত বোধ হয় তাই জিজ্ঞাসা করছি। কেমন মেয়েটি?" মন্দা মৃদুস্বরে বলিল "বড় সরল আর—" "আর কি?" "বড় ছেলেমানুষ! এখনো যেন সংসারের সব জ্ঞান হয়নি।" বলিয়াই মন্দা কুণ্ঠিত ভাবে সুরমার পানে চাহিল, ভাবিল কি জানি হয়ত সুরমা অসন্তুষ্ট হইবে। সুরমা তাহা হইল না, উপরন্তু একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "ভগবান ওকে চিরদিন ছেলেমানুষই রাখেন যেন, এই প্রার্থনা।" মন্দাকিনী নীরবে রহিল। তারপর সুরমা বলিল "শোন মন্দা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।" মন্দাকিনী তাহার পানে চাহিল। "আমার একটী সম্পর্কে কাকা আছে অথচ আমরা দুই ভাই বোনের মত, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। এতে তোমার পিসিমা পিসে মশাই সম্মত, এখন তুমি কি বল?" মন্দাকিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত মুখে নীরবে রহিল। তথাপি সুরমা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করায় অগত্যা বলিল "আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁদের মতে আমার কেন অমত হবে?" "তাঁরা তোমার বিয়ে দিয়ে খালাস্, কিন্তু তারপরের ভার ত' সমস্ত তোমারই, তাই তোমার মতটা জেনে নিচ্ছি।" মন্দা স্থির চক্ষে সুরমার পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "তার পরের সমস্ত ভার আমার বলছেন, যদি আমায় সে ভারের অযোগ্য ভাবেন তা হলে আপনি সম্মত কেন হবেন!" সুরমা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "তোমায় যদি আমি অযোগ্য ভাব্‌ব তবে তোমায় চাইব কেন মা? কিন্তু যদি আমি তোমার যোগ্য জিনিষ না দিতে পারি, তখন? সেই ভারের কথা আমি বল্‌ছি মা।" মন্দা একটু নীরবে রহিল। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, বলিতে বলিতে তাহার গণ্ড লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, "আপনি একথা বলছেন শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি! পিসিমা বল্‌ছিলেন আমিই অযোগ্য, আমার মত—" মন্দা আর বলিতে পারিল না, থামিয়া গেল। সুরমা বুঝিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "তোমার জন্য তোমার পিসেমশাই অন্য জায়গায়ও সম্বন্ধ করছিলেন, হয়ত প্রকাশের চেয়ে সে পাত্র ভাল, হয়ত তুমি তাতে বেশী—" বাধা দিয়া মন্দা বলিল "শোনেননি কি তাঁরা তিন চার হাজার টাকা চান? অত টাকা পেলে তবে আমার মত মেয়েকে তাঁরা ঘরে নিতে পার্ব্বেন।" "তাতে তো তোমার পিসিমা পিসে-মশাই কাতর নন্।" মন্দা অবনত মুখে অপরিস্ফুট কণ্ঠে বলিল "তাঁরা নন্, আমিই কাতর! আমায় তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন তাই তাঁদের বুঝি এই দণ্ড? অমনি আমায় একটু আশ্রয় দিতে পারে এমন কি কেউ নেই?" মন্দার অস্ফুট কণ্ঠ ক্রমে বুজিয়া গেল। সুরমা তাহাকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল "আশীর্ব্বাদ করি তুমি প্রকাশকে পেয়ে সুখী হও, সেও তোমায় পেয়ে সুখী হোক্ শান্তি পাক। সে এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, পৃথিবীর কিছু চেনেনি; যদি সে তোমায় না চিন্‌তে পারে, তুমি তাকে আশ্রয় দিও স্নেহ দিও, সুদিনে দুর্দ্দিনে মান অভিমান ত্যাগ করে তার চিরসাথী হয়ো।" মন্দা সুরমাকে প্রণাম

করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। সুরমা মন্দার চিবুকে হস্তস্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি চুম্বন করিল এবং স্নেহপুলকিত স্বরে বলিল "চল, বাবাকে প্রণাম করবে।"

রাধাকিশোর বাবু তখন সান্ধ্যভ্রমণে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। প্রণতা মন্দাকিনীকে দেখিয়া বলিলেন "এই মেয়েটি বুঝি? বাঃ দিব্য মেয়েটি।" সুরমা বলিল "তবে আর আপনার আপত্তি নেই?" "আপত্তি কিসের! তবে বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়্ল! তা আর কি করা যাবে! কাল ওঁদের পক্ষের কাউকে তবে আস্তে বলে দাও, কথাবার্ত্তা স্থির করে যাবেন।" যে ঘরে কন্যা দান করিয়া নিজেকে তিনি অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিতেন তাহাদেরও তাঁহার কাছে কন্যাদানের জন্য অবনত হইতে হইতেছে মনে করিয়া রাধাকিশোর বাবু অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। আর সুরমা ভাবিল যদি বিধাতা অন্য কোন অঘটন না ঘটান তো প্রকাশ হয়ত কখন' না কখন' সুখী হইতে পারিবে।

দুই পক্ষের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। দিন স্থির হইল। অবশ্য এসমস্ত কাজ দেবেন্দ্রনাথই সম্মুখীন হইয়া করিতেছিল, অমর শ্বশুরের সহিত কোন'মতেই দেখা করিতে পারিল না, কিজানি এবিষয়ে তাহার কি একটা দুর্নিবার লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রমে দিন নিকটে আসিল, কেবল যাহার বিবাহ সেই এস্থানে উপস্থিত নাই। রাধাকিশোর বাবুকে পত্রে সে লিখিয়াছিল যে "হাতে এখন কাজ বেশী। পূর্ব্বে যাইতে পারিব না। বিবাহের দিন সকালের ট্রেনে ওখানে গিয়া পৌঁছিব।" সুরমা উমাকে কিছু বলে নাই কিন্তু অন্যান্য সকলের মুখে উমা যে এ সংবাদ পাইয়াছে তাহা জানিত। তাই অতি সন্তর্পণে উমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। উমা কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন নীরব এখন তদপেক্ষাও নীরব। তবে যেন একটু বেশী দুর্ব্বল, একটু অধিক ক্লিষ্ট বোধ হইত। বাড়ীতে বিবাহের উদ্যোগ, তাহার নায়ক প্রকাশের নাম প্রায় সকলেরি মুখে, উমা যেন ক্রমশঃ ঘরের কোণের মধ্যেই স্থান করিয়া লইতেছিল। তাহার নাম যেন আর সে কানে শুনিতে পায়ে না, হৃদয়ে এত বল নাই যে সর্ব্বদা তাহার নাম শ্রবণের উত্তাপ সহ্য করে। উমার যে আবার নূতন করিয়া ক্ষতি হইতেছে, নাজানি প্রকাশ সম্মুখে আসিলে সে কি অবস্থায় পড়িবে, তাহাই ভাবিয়া সুরমা চিন্তিত হইয়া পড়িল। বিবাহের আর একদিন মাত্র সময় আছে, সুরমা সহসা গিয়া পিতাকে ধরিল বহু আলাপী লোক বৃন্দাবনে যাইতেছে, সেখানে দুই দিন পরে একটী মহা পুণ্যযোগ, সে তাহা দর্শন করিতে চায়। পিতা বিস্মিত হইলেন। একদিন পরে প্রকাশের বিবাহ, এখন এ কিরূপ প্রস্তাব! সে না থাকিলে কি চলিতে পারে! সুরমা তাঁহাকে বহু প্রকার বুঝাইল যে এ তো কন্যার বিবাহ নয় যে না থাকিলে চলিবে না, আর এখানে ত' তেমন ধুমধামও হইতেছে না, বাটী গিয়া পাকস্পর্শে ধুম হইবে। তাঁহারা কল্য বিবাহ দিয়া আনিবেন এবং দু একদিন পরেই ত' বাটী যাইবেন, সুরমা তখন আসিয়া জুটিবে। নিতান্ত না জুটিতে পারে ত তাঁহারা দেশে চলিয়া যাইবেন। তাহার সঙ্গে ভবচরণ দাদা আর বিধু ঝি থাকিবে, অনায়াসে সুরমারা বাটী যাইতে পারিবে। এত নিকটে আসিয়া এ পুণ্যটি সঞ্চয় করিয়া না যাইতে পারিলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। কর্ত্তা তথাপি সম্মত হন্ না। তখন সুরমা বুঝাইল যে এ বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে হয়ত তাহার সপত্নী তাহাকে লইতে আসিবে, তখন চক্ষুলজ্জার দায়ে হয় ত যাইতেও হইবে, তদপেক্ষা এই অছিলায় দূরে যাওয়াই সঙ্গত। এইবারে রাধাকিশোর বাবু সম্মত হইলেন। কর্ম্মচারী ভবচরণ ও বিধু ঝি ক্ষুণ্ণভাবে বোচ্কা বাঁধিল। উমাও শুনিয়া একটু বিস্মিতভাবে চাহিল কিন্তু আপত্তি করিল না। রাত্রের ট্রেনে তাহারা বৃন্দাবন যাত্রা করিবে এবং প্রভাতে প্রকাশ আসিবে। সেই দিন রাত্রেই তাহার বিবাহ! সুরমা চারুকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। লিখিল "চারু, ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। প্রকাশের সঙ্গে আমার কতখানি স্নেহ-সম্বন্ধ তাহা তুমি জান। অনিবার্য্য কারণে ইহা ঘটিল। অন্যে যে যা মনে করুক, তুমি যেন কিছু মনে করিও না। আমি জানি প্রকাশও মনে ক্ষোভ করিবে না, কেননা সে আমায় ভালরূপই জানে। ফিরিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া তবে বাটী যাইব। ইতি তোমার দিদি।"

আর একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া গেল তাহা প্রকাশের জন্য। লিখিল "প্রকাশ, কাল তোমার বিবাহ, আমরা আজ বৃন্দাবনে চলিলাম। বিবাহের সব মিটিলে

তবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। জজে ফাঁসীর হুকুম দেয় সত্য, দেখিতে পারে কয়জনে? দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় বুঝিয়াছ। পাছে তাঁহার মনে কোন আঘাত লাগে সেই ভয়ে। তোমার নিশ্চল প্রতিজ্ঞা দেখিয়া সুখী হইয়াছি, এত শীঘ্র যে তুমি পারিবে তাহা সম্পূর্ণ আশা করি নাই। ঈশ্বর তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে যে শৃঙ্খল তুমি লৌহ-নির্ম্মিত বলিয়া কণ্ঠে তুলিয়া লইতেছ তাহা ফুলের মালা হইবে। আমি জানি তুমি আমাকে এ বিবাহে আনন্দ করিতে না দেখিলে সন্তুষ্টই হইবে। সেই ভরসায় সকলের কাছে এমন নিন্দনীয় কার্য্য করিলাম। ঈশ্বর তোমায় সুখী করিবেন, শান্তি দিবেন, এই আমার প্রার্থনা। ইতি সুরমা।" (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (বৈশাখ)।

তীর্থযাত্রা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—

মহাত্মা কবীরকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম অরূপ না সরূপ। তিনি এক না দুই? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র অরূপ বলিলেও মিথ্যা বলা হয়—তিনি বিশেষ কোন রূপ বলিলেও মিথ্যা বলা হয়। তিনি সর্ব্বরূপেই আছেন—কারণ তিনি আছেন বলিয়াই তো রূপ আছে। তাঁহাকে ছাড়া যে একটি পরমাণুরও এক নিমেষের স্থিতি নাই। অথচ তিনি সর্ব্বরূপে আছেন বলিয়াই তো তিনি বিশেষ কোন রূপের অতীত। আবার তিনি সর্ব্বরূপের সমষ্টি মাত্রও নন—তাহারও অতীত, সেই হিসাবে তিনি অরূপ। এক হিসাবে আমরা তাঁহাকেই প্রতিমুহূর্ত্তে ধরিতেছি, ছুঁইতেছি; তাঁহারই নীচে, তাঁহারই উপরে, চলিতেছি ফিরিতেছি—আবার অন্যদিকে তিনি আমাদের সকল পরশ সকল বোধের অতীত, অনন্ত। একই কালে তিনি উভয় স্বরূপ। কাজেই তাঁহাকে কেবলমাত্র অরূপ বা সরূপ বলিলে ভ্রম করা হয়। তিনি যদি সর্ব্ববিধ বন্ধনের অতীত হন তবে রূপই বল আর অরূপই বল কোন বন্ধনেই ধরা দিবেন না। আর তিনি যদি সর্ব্ববিধ বন্ধনেরই অতীত হইলেন তবে কি তিনি কেবলমাত্র সংখ্যার বন্ধনেই আবদ্ধ হইয়া গেলেন! তিনি একও নহেন, দুইও নহেন—তিনি সংখ্যার অতীত। তিনি সর্ব্ববিধ বন্ধন ছাড়াইয়া শেষে কি সংখ্যার গারদে পড়িবেন?

আগে অনেক বিচার ভৌ, রূপ অরূপ তহি কুছ নাহী।
বহুত ধ্যান ধরি দেখিয়া, নহি তাহি সংখ্যা আহী॥

ব্রহ্ম যে একই কালে অসীম ও সসীম এ কথা ভারতে তো নূতন নহে। উপনিষদে এই তত্ত্ব নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্মের এই যে অপার বৈচিত্র্য ইহা বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে বৈষ্ণব সাধনায়। বৈষ্ণব সাধকগণ দেখিয়াছেন যে একদিকে তিনি অচ্যুত পরিপূর্ণ অনাদ্যনন্ত বিভু; তাহা হইতেই জন্ম, তাঁহাতেই স্থিতি লয়। আবার তিনি নারায়ণ হইয়া সকল নরের সাথে সাথে য করিয়াছেন। ভক্তের সাধনার বিচিত্রতায় তিনিও বৈচিত্র্য ও হইতেছেন। আমার হৃদয়ের স্বামী তোমার হৃদয়ের স্বামী নহে এক এক দেশের সাধনার নিকট তাঁহার এক এক বিশেষ রূ নারায়ণ রূপে তাঁহাতে বিচিত্রতার আর অন্ত নাই।

এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেন বলিয়াই, বৈষ্ণব সাধকদের কৃ ভারতীয় সাধনা নানাবিধ বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তার মধ্যে এ সাধনা তীর্থযাত্রা। উপনিষদের সাধকেরাও নানা আশ্রমে নানা আচা সাধনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণবের তীর্থযা বৈচিত্র্যরস তাহাতে নাই বলিয়া তাঁহাদের তীর্থযাত্রা বৈষ্ণবদের গভীর ও ব্যাপক হয় নাই।

নানা সাধকমণ্ডলীর নানা সাধনায় নারায়ণের নানাবিধ রস সৌন্দর্য্য হয় বলিয়া নানা সাধনতীর্থে নারায়ণের নানা মূর্ত্তি। বৈচিত্র্যই অমৃত। বৈচিত্র্যই প্রত্যেক সাধনা প্রত্যেক সাধনাক্ষেত্র প্রত্যেক সাধককে অমৃতত্ব দান করিয়াছে। রবিদাস বলিয়াছেন,—

"বইচিত্র সাধনকে অমৃত হৈ, বইচিত্র সাধক মাহিঁ।
বইচিত্র মন্দিরকে অমৃত হৈ, সাঁঈ বইচিত্র অবগাহী॥"

"বৈচিত্র্যই সাধনার অমৃত, সাধকেরও অমৃত বৈচিত্র্য, মন্দির অ তীর্থেরও অমৃত বৈচিত্র্য, কারণ যিনি স্বামী তিনি বৈচিত্র্যের অমৃ অবগাহন করেন।"

আমি যে তোমা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ আমার ন্যায় যে এই বিশ্বব্রহ্ম আর কেহ, বা আর কিছুই নাই ইহাতেই আমার অমৃত। ব্রহ্ম আপ আনন্দকেই নানা ব্যক্তি ও নানা রূপের মধ্যে বিচিত্র করিয়া সং করিতে চাহেন। তিনি যদি বৈচিত্র্যপিপাসু হন্ তবে আমার ম যে একটি স্বতন্ত্র বিচিত্রতা আছে তাহাতেই আমার রক্ষা। আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হই তবে তিনি যে উপবাসী থাকিবেন—অতএব বিশ্বব্রহ্মা সকল সংহারিণী শক্তির সমবেত চেষ্টাও আমাকে লুপ্ত করিতে প না। পাপে যখন এই হৃদয় মলিন, এই আত্মা কলুষিত, সকল ম যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে, তখনও তিনি আমার স সাথে আছেন। প্রতিদিন সজল নেত্রের অনুনয় লইয়া, সবেদন বাঁশ সঙ্গীত আমার হৃদয়পুরে শ্রবণ করাইয়া, সপুলক পরশে আমাকে সচে করার প্রয়াস লইয়া, আমার সাথে সাথে সেই আমার হৃদয়-কম বিচিত্ররসপিয়াসী রসিকবর আছেন। তিনি যে আমার চিত্তকম রস চাহেন। আমার হৃদয়-কমলের যে রস তাহা তো আর কো নাই। তাই সকলে আমার আশা ছাড়িলেও তিনি তো আমার ত ছাড়িতে পারেন নাই। তাই তিনিও আমার সাথে নানা দুঃখ ন বন্ধন স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। তাই বাউলরা গাহিয়াছেন—

"হৃদয়-কমল চলছে গো ফুটে
কত যুগ ধরি,
তাতে আমিও বান্ধা তুমিও বান্ধা
আমি উপায় কি করি!
ফোটে ফোটে ফোটে কমল, ফোটার না হয় শেষ;
এই কমলের যে এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
আমায় ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পার না যে তাই
ওগো তুমিও বান্ধা আমিও বান্ধা মুক্তি কোথাও নাই!
পার যদি যাও না ছেড়ে,
তুমি ছাড়বে কি করি।"

এই যে আমার বিশেষত্ব, ইহাই আমার অমৃতত্ব। আমার ন্যায় যদি কেহ বা কিছু থাকিত তবে আমাকে বাদ দিলেও বিশ্বেশ্ব

রসলীলার কোন ক্ষতি হইত না; কিন্তু তা যে নাই। তাই তো উপনিষদের সাধক বলিয়াছেন—"আত্মানং বিদ্ধি।" যে আত্মাকে জানিয়াছে সে "অমৃতত্বমেতি" সে অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে যে অমৃত সেই সম্বাদ জানে।

এই তত্ত্ব যেই মুহূর্ত্তে সাধকের উপলব্ধ হয় সেই মুহূর্ত্তেই সাধকের যুগপৎ মহানন্দ ও মহা বেদনা। আনন্দ, আমি অমর। বেদনা, যে তিনি প্রতিদিন আমার অন্তরদ্বারে উপবাসী হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তাই "ইয়ম্ শ্রবণ মাতলো" সঙ্গীত বড় দুঃখে জ্ঞানদাস গাহিয়াছেন। এই বিশেষত্ব এই বৈচিত্র্যই আমাদের পরম আশার ভূমি। "আমাকে পাপ তাপ কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিবে না, আমি সকলের উপর জয়ী হইবই" এই তত্ত্ব ইহাতে উদ্ঘোষিত। কারণ ব্রহ্মের যেখানে রসলীলা হইবে তাহাকে আচ্ছন্ন করে কে? তাহার পরাভব কয় দিনের?

সাধনার মধ্যে যে বৈচিত্র্য তাহাতে সাধনা অমর। তীর্থের মধ্যে যে বৈচিত্র্য তাহাতে তীর্থ অমর।

এখন সাধকের চেষ্টা যদি হয় সাধ্য দেবতাকে তৃপ্ত করা, তবে তাঁর অভিষেককেও সর্ব্ব বৈচিত্র্য দান করিতে হইবে। এই জন্য বৈষ্ণব সাধক যখন তাঁহার মুখ্যতীর্থে কাম্য দেবতার কাছে দীক্ষা লয়েন, তখন যদি তিনি কেবল সেই তীর্থেরই বারি লইয়া সেই দেবতার অভিষেক করেন, তবে তাহা "সামান্যাভিষেক"। আর যদি সকল তীর্থের জল লইয়া তাঁহার দেবতাকে অভিষেক করাইতে পারেন, তবে তাহা "মহাভিষেক"।

এই ভারতের সাধকগণ কাম্য তীর্থে কাম্য দেবতার চরণতলে বীজমন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্কন্ধে তীর্থযাত্রীর বাঁশের ঝাঁপির বাঁক দোলাইয়া সর্ব্ব-তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। সম্মুখের ঝাঁপিতে থাকে কাম্য দেবতার অভিষেকামৃত। আর পশ্চাতের ঝোলায় তার লোটা কম্বল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এক এক তীর্থ যায় আর সেই সেই তীর্থের চরণামৃত লইয়া তার তীর্থসলিল-পাত্রে রাখে—সর্ব্ব তীর্থ ঘুরিয়া আসিয়া সর্ব্বতীর্থোদকে পরম দেবতাকে মহাস্নান করাইয়া পরিতৃপ্ত করে।

যাঁহারা মরমিয়া বা অন্তরের সাধক, তাঁহারা বলেন যে, এই আমাদের জন্ম-মৃত্যুও এক বিপুল তীর্থযাত্রা। সেই পরম মুখ্য দেবতার সিংহাসন-তল হইতে আমরা যাত্রা করিয়া, নানা লোক-তীর্থ দর্শন করিয়া, আমাদের চিত্ত-পাত্রে সকল তীর্থের দেবচরণামৃত লইয়া চলিয়াছি। সকল তীর্থের জলে যখন চিত্ত পূর্ণ হইবে, তখন সেই সর্ব্বতীর্থোদকে তাঁহার অভিষেক করিয়া আমাদের নিখিল লোকযাত্রা সার্থক হইবে।

এই যে পৃথিবী ইহাও এক তীর্থ। এইখানে দেবতা পঞ্চরসে দীপ্যমান। অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় দেবতার মহামন্দিরের পাঁচটা বাতায়ন এই লোকে উন্মুক্ত। অন্য লোকে, অন্য কোন্ কোন্ বাতায়ন দিয়া কোন্ রূপ কোন্ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় কে জানে? এই লোকের দর্শন রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে। এই পঞ্চামৃত-রস অন্তরে গ্রহণ করিয়া এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। এই জগতে তাঁহার যে বিশেষ রূপ, তাহাকে যদি পরিপূর্ণ একটি প্রণাম করিতে না পারি—সমগ্র জীবনের ধ্যানে, বচনে, সেবায় একটি পরিপূর্ণ প্রণতি করিয়া যদি এই জগতের ভুবনামৃত গ্রহণ করিতে না পারি, তবে সেই মহাভিষেকের দিনে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, "কই আমার সেই ভুবন-তীর্থের অমৃত কোথায়?" তখন যে হায় লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। অতএব একটি পরিপূর্ণ প্রণাম কর—অন্তর ভরিয়া এই লোক-দেবতার চরণামৃত লও, নহিলে আবার যে সর্ব্বতীর্থযাত্রায় বাহির হইতে হইবে। জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ পাপের শাস্তি নহে, সে যে দেবতার অভিষেক-বারি সংগ্রহের পুণ্যযাত্রা। অতএব "ত্বরান্বিত হও, অভিষেকের লগ্ন যে পিছাইয়া যাইতেছে; অতন্দ্রিত হও, দেবতা যে সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; অগ্রসর হও, তিনি যে পথ চাহিয়া আছেন; উদ্যত হও, বিরহের জ্বালা যে ব্যাকুল করিতেছে।"

কিন্তু হায়, এই জগতে জন্ম-পরিগ্রহ যে আমাদের একটি তীর্থযাত্রা ইহা আমরা ভুলিয়া যাই; কেবল তীর্থধামের ধর্ম্মশালায় বসিয়া গোলমাল করি, আর দেবতার অভিষেকামৃতপাত্র পশ্চাতে লইয়া, সম্মুখে রাখি সংসারের অনিত্য প্রয়োজন-সাধন লোটা-কম্বলের ভার। আর প্রাণপণ চেষ্টায় কেবল সেই ভারকেই স্ফীত করিয়া তুলি। যাইতে যে হইবে তাহা তো কবে ভুলিয়া গিয়াছি। হঠাৎ যখন এখান হইতে বাহির হইতে হয় তখন যে শূন্য পাত্র লইয়া যাত্রা করিতে হয়। হায় এই দুঃখ দূর করিতে হইলে ধ্যানে, বচনে, সেবায় পূর্ণ একটি প্রণতি করা চাই। পঞ্চামৃতরসে দীপ্যমান দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলা চাই—"এই যে তোমার রূপ দেখিলাম, প্রাণ ভরিল, এখন আমি আনন্দে যাত্রা করিব।"

এই তীর্থযাত্রার গুরুও তিনিই। আমি যে লোকে লোকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছি, তিনিই আবার কালে কালে আমার হস্তে তাঁহার নব নব প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। প্রতি ঋতুতে ঋতুতে নব নব কুসুম-অর্ঘ্য আমার সম্মুখে তিনি স্থাপন করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন।

কেবল যে আমি তাঁহাকে পাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছি তাহা নহে, তিনিও যে আমাকে পাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। আর তাঁর যে নানা লীলা তাহাতেও তিনি ক্রমশ আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁর যে অনন্ত স্বরূপ তাহাতে তিনি আমার কাছে আসিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দয়া করিয়া নারায়ণ রূপে আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া, সখা হইয়া, স্বামী হইয়া, দাস হইয়া, দিন দিন আমার অন্তরের ঘনিষ্ঠ হইতেছেন। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি কিন্তু প্রেমের লীলায় আমার মূল্য তো সামান্য নহে। তিনিই যে আমার অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছেন—ইহা দেখিয়াই তো আমি তাঁহার অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছি। তাঁহার কাছেই শিক্ষা। মানুষকে ক্রমাগত শিক্ষা দিতেছেন, "তীর্থযাত্রী, তীর্থযাত্রার কথা ভুলিও না।"

তাই ভারতের সাধকমাত্রই ইহলোকেই নানা সাধন-তীর্থে যাইয়া যাইয়া সেই নিখিল তীর্থযাত্রাকে স্মরণে রাখিতে চাহেন। এই জগতেই নানা সম্প্রদায়ের নানা রসকে অগ্রাহ্য করিব না—অগ্রাহ্য তো করিবই না বরং হৃদয় ভরিয়া প্রণাম করিয়া সর্ব্ব বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া তাঁহার মহাভিষেক পূর্ণ করিব।—এই বোধই তো উদারতার বীজমন্ত্র। এই বোধ হইলে আর কি মানব অন্যের বৈচিত্র্যকে ঘৃণা করিতে পারে? না নিজের প্রবলতার দ্বারা অভিভূত করিতে পারে? যখন কেহ কাহারও বৈচিত্র্যকে পরাভূত করে তখন সে যদি জানে যে আমি ব্রহ্মের এক অপরূপ মূর্ত্তিকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছি, তবে কি সে আর এক মুহূর্ত্তও সাহস পায়! যে পরাভব স্বীকার করে সে যদি জানে ইহাতে আমি ব্রহ্মের এক স্বরূপকে পরাভূত হইতে দিতেছি, তবে কি আর সে দীন হইয়া পড়িতে পারে? এক জাতি যখন অন্য জাতির নিকট পরাভূত হয় বা এক জাতি অন্য জাতিকে পরাভূত করে তখন সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ভয়ের কথা ইহাই। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নারায়ণের বিচিত্র বিচিত্র রূপ। জগতের সকল জাতিকে যদি একবার হৃদয় ভরিয়া প্রণাম করিয়া করিয়া আসিতে পারি, তবে জীবন্ত নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিতে পারি। কিন্তু যখন এক জাতি অন্যের দাস হইয়া তার বৈচিত্র্যকে হারাইয়া অন্যের কাছে আত্মবিসর্জ্জন করে, তখন যে বিষম ক্ষতি হয় তাহা ধনের নহে, জনের নহে। তখন আমরা নারায়ণের এক স্বরূপকে হারাইয়া বসি। জগৎ হইতে তাঁহার এক বিচিত্র লীলা আমরা লুপ্ত করিয়া দেই। এই পাপ যে করে এবং এই পাপ যে সহে,

তাহারা উভয়েই ব্রহ্মদেহে আঘাত করে। দেবতার মূর্ত্তিমাত্র ধ্বংস করিলে যদি কালাপাহাড় হইতে হয়, তবে যে এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতার অঙ্গে আঘাত করে, তাহাকে কি হইতে হইবে?

যাঁহারা তীর্থ-যাত্রী তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা তীর্থযাত্রা করিতে পারিলেন না, এই ভারতে তাঁহারা নিজেকে অতিশয় কৃপাপাত্র মনে করেন। এই হেতু যখন সাধকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ তীর্থযাত্রায় বাহির হন, তখন সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বলে, "সমস্ত দেহের প্রণামকে হস্ত যেমন প্রকাশ করে, তুমি তেমনি আমাদের মণ্ডলীর হস্ত হইয়া সকল তীর্থের দেবতার চরণামৃত স্পর্শ করিয়া আইস। সমগ্র বৃক্ষের পিপাসা যেমন পল্লবরূপে তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আকাশের বর্ষণ পবন ও আলোককে অঞ্জলি ভরিয়া অন্তরে গ্রহণ করে, তেমনি সমগ্র মণ্ডলীর পল্লবের ন্যায় তুমি বাহিরে যাত্রা করিয়া, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিখিল তীর্থামৃতরস গ্রহণ করিয়া, এই আশ্রমের সকলের মধ্যে সেই নব জীবনরস সঞ্চার কর।"

আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

(১)

সিকাগো, ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

বস্তুত বাইরে যখন সমস্তই অনুকূল হয় তখনই নিজেকে সত্য রাখা শক্ত হয়ে উঠে কারণ, সত্যের তখন কোনো পরীক্ষা হয় না—তখন মনে হয় সত্যকে না হলেও যেন চলে, আসবাব থাকলেই যথেষ্ট; এই জন্যই ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যের অধিকার দুর্লভ। টাকার প্রতি আমাদের যে অন্ধ বিশ্বাস কোনোমতেই আমাদের ছাড়তে চায় না, তার জাল আমি ছিন্ন করে ফেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে চাই—"চাইনে কিছু"র দেশে পরমানন্দ-মনে বাসা বাঁধতে চাই। এ দেশের লোকে মনের এই ভাবটাকে fatalism বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এ fatalism নয়! যারা জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলে fatalism তাদেরই ধর্ম্ম—তারাই অদৃষ্টকে স্পর্শ করবার জন্য অন্ধকারে ঢেলা মারে—এ দেশে তাদের অভাব নেই। কিন্তু আমি ত অদৃষ্টকে হাৎড়ে খুজে বের করতে চাইনে—যে পূর্ণতা আমাকে ঘিরে আছেন ভরে আছেন তাঁকেই আমি উপলব্ধি করতে চাই। বাইরের অভাবেই যে তাঁকে বেশী করে পাওয়া যায়—রাণীর সাজসজ্জা যতই দামী হোক্ স্বামীর ঘরে গিয়ে সে সমস্ত খুলে ফেল্‌তে হয়—মূল্য যেমনি হোক্ কিন্তু স্বামীর কাছে এই সাজ খুলে ফেলা ত দারিদ্র্য নয়। আমাদের আশ্রমে সেই স্বামীর সঙ্গেই আমাদের কারবার—এইজন্যে সেখানে দারিদ্র্যে আমাদের লজ্জা নেই—আমরা রিক্ত একেবারে রিক্ত হয়েও পূর্ণ হব। আমাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, কিছু নেই—তোমরা নিরুদ্বিগ্ন হও, আনন্দিত হও এই আমি দেখতে চাই—অন্ধভাবে নয়—সমস্ত জেনে শুনে বুঝে পড়ে—চক্ষু মেলে, দুই হাত আকাশে তুলে, বক্ষ প্রসারিত করে। অভাব জিনিষটা পিছনে থাকবার জিনিষ, কিন্তু আমরা যখন তাকে সামনের দিকে ধরে তাকাই তখন তার কোনো মানে বুঝতেই পারিনে, সমস্তই ফাঁকা দেখ্‌তে থাকি—এ ঠিক যেন ছবির পিছন দিকটাকে সামনে করে দেয়ালের উপর টাঙিয়ে রাখা। কেবল দেখি ফাঁকা ক্যানভাস—চিত্রকরের উপর বিশ্বাস একেবারে চলে যায় এবং নিজে যে এই ফাঁকা কেমন করে ভর্ত্তি করব তা ভেবে পাইনে—তখন আর কোনো উপায় দেখিনে, এর উপরে পর্দ্দা ফেলে কোনমতে এই শ্রীহীনতা ঢাক্‌তে চাই—সেও যে শূন্যকে দিয়ে শূন্য ঢাকা—যতই পর্দ্দা বাড়াই না কেন সে শূন্যতা ত কোনোমতেই যাবার নয়—কিন্তু একবার কেবল ছবির দিকটাকে পাল্‌টে ধরলেই সমস্ত ধাঁদা এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায়। ছোট ছেলে অন্ধকারটাকে সত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করে বলেই তাকে ভু ভয় দিয়ে ভরিয়ে তোলে—আমরাও অভাবটাকে তেমনি করেই নি তাকে এমন ভয় দিয়ে ভরিয়েছি যে, সে ভয় বাইরের দিক ঘোচানো অত্যন্ত শক্ত,—সে ভয় বস্তুত নেই এ কথা জানলেও মন সা মানে না, এবং বাইরের দিক থেকে সে ভয় ঘোচাতে চেষ্টা করি— ঘুচবে কেন? অন্ধকারের সীমা কোথায়? তাকে ভেঙেচুরে ধু ফেল্‌ব কোন্‌খানে? অথচ ভাবের দিকে কতই সহজ—একটু ছোট আলোর শিখা। অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন দেখি তখন ডালপালাসমেত একটা বটগাছকে এমন প্রকাণ্ড যাদু বলে বোধ কিন্তু ভাবের দিকে একটি মাত্র ছোট বীজ। এইটেই বিধাতার কৌ হাস্য—তিনি অভাবটাকেই প্রকাণ্ড দৈত্যদানবের মত গড়েন, কার হাতে তার পরাভব ঘটান? ভীমসেনকে দিয়ে নয়—ছোট তার তৃণ নিয়েই তাকে জয় করে। তার না-সরোবর অতলস্পর্শ, কূল দেখা যায় না, তার জল মৃত্যুর মত কালো—কিন্তু তাঁর হাঁ- এরই ভিতর থেকে মাথা তুলে জেগে ওঠে। সে ত প্রকাণ্ড ব্য নয়, সে ত পর্ব্বত পাহাড় নয়; সে একটি ফুল, সে আপনার মধ্যেই সব চেয়ে বড় তার কোনো হাঁকডাক নেই, সে হাসি সমস্ত জয় করেছে—সে বার বার মুদে যায়, ঝ'রে পড়ে, কিন্তু অ ফুটে ওঠে, তার অমরতা মৃত্যুহীন অমরতা নয়, সে মৃত্যুর ভিতর দি অমর, তার পূর্ণতা অভাবের ভিতর দিয়েই পূর্ণতা। সে যে প্রবল বল দিয়ে নয়, বলকে বিসর্জ্জন দিয়েই প্রবল। পৃথিবীতে এই অভা দিকেই যারা চোক মেলে আছে তারা অহরহ ভয়েতে চিন্তাতে উ হয়ে রয়েছে, তারা বিস্ময়ের বস্তা বয়ে বয়ে এনে এই মায়া-গর্ত্ত ভর জন্যে ইহজীবন গলদঘর্ম্ম হয়ে খেটে মরচে—পৃথিবীতে ভাবের যাঁদের চোখ পড়েছে তারাই মানুষকে চির সম্পদ চির সান্ত্বনার দেখিয়েছেন—তাঁরা দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে যে দুঃখ থেকে মানু নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তা নয়—তাঁরা দুঃখকে মৃত্যুকে গ্রহণ ক মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন। তাঁরা ছবির উল্টো পিঠটাকে মেরে খেদিয়ে নাই, ছবি সুদ্ধ তাকে সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরাই মানু অসঙ্কোচে অসাধ্য সাধন করবার উপদেশ দেন—তাঁরাই বলেন বিশ্ব জোরে পর্ব্বত টলানো যায়—তাঁরা সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে তাঁরা কলসীর বাইরের তলায় জল খুঁজে খুঁজে বেড়ান না— নিশ্চয় জেনেছেন কলসীর ভিতরটা জলে ভরা। যারা তাঁদের সে বিশ্বাস করে না, তারা কলসীর নীচেকার বিড়ে নিংড়ে জল বের ক চেষ্টা করচে—সেইটেকেই তারা সহজ প্রণালী মনে করে—কে বিড়েটাকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়, কলসীর ভিতরটা যে ঢাকা।

(২)

সিকাগো, ৩রা ম

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্বপ্রকৃ সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই—কতক বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয় কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মি দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কত বড় তা এদেশে এসে আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এ মানুষের শক্তির মূর্ত্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্ত্তি সে পরি দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামা জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির এ জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকে আপনার সীমার যোগ্যতা লাভ করবার জন্যে উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগ করার কোনো সাধনা নেই। এ রকম জাতিভেদের উপযোগিতা

দিনের জন্যে ভাল। যেমন কোনো কোনো সবজির বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল করে আজ্জিয়ে নিতে হয়, তার পরে তাকে ক্ষেতের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেই রকম! শক্তিকে তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথা সময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই দেখি নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে সে বেশি ভাল বাস্‌তে শেখে—এই জন্যে টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেকবারে মহা দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্ত্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এদেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেচে—সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাৎড়ে বেড়াচ্ছে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্চে এই যে, এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে যা কিছু আবশ্যক সমস্তকে এরা কলে তৈরি করে নিতে চায়—সেটি হবার জো নেই। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত-উৎস আছে এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না—এইজন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলি কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চ্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিষটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন, আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠচে অথচ তার ফল নেই এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্য্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত, সেটি আকাশের ও আলোকের অনির্ব্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি বিরাট প্রাণসমুদ্রের লহরীলীলার কলস্বর—সে কারখানাঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হয়েও সে বড়, কোমল হয়েও সে প্রবল—সে কেবলমাত্র চোক মেলা, কেবলমাত্র জাগরণ; সে কুস্তি নয়, মারামারি নয়, সে চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মত সেই জিনিবটি ফুটিয়ে তোলো—কেননা সবই যখন তৈরি হয়ে সারা হয়ে যাবে—মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ করে উঠবে, তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হতে পারবে না, মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে, পূজা যখন সমাধা হবে, তখনি সংসারসংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে—কেবল অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জয় হবে না এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আমাদের কাজ আমরা যেন নিঃশব্দে করে যেতে পারি।

(৩)

আর্ব্বনা, ইলিনয়, ১০ মার্চ্চ।

এখানে বিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সকলেই এর বিবরণ বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। কাল Atlantic Monthlyর Editorএর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—তিনি লিখ্‌চেন—"I want to ask you whether it would not be possible for you at your leisure to write for us a general description of your school, but more especially of the Philosophy of Education which underlies it. To the Atlantic's audience a discussion of this kind would be exceedingly interesting." এই পত্রিকা এদেশে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাশালী, সুতরাং এখানে যদি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হয় তা হলে সেটা শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটার দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কিছু হবে কি না হবে সে কথা নিশ্চয় জানিনে, কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় লাভের কথা আছে। আমাদের কাজের ক্ষেত্রকে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে পারলে আপনিই তার সমস্ত কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়কে যদি দেশে কালে সঙ্কীর্ণ করে জানি তাহলে আমাদের শক্তি ম্লান হয়ে থাকে, আমাদের নৈবেদ্যের পরিমাণ কমে যায়। কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণভাবে মানুষ করে তোলা যেতে পারে এই ভাবনা আজ সমস্ত সভ্যজগতে জেগে উঠেচে—নানা জায়গায় নানা রকম পরীক্ষা হচ্ছে—সমস্ত পৃথিবীর সেই ভাবনা যে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবিত হচ্চে এবং সমস্ত পৃথিবীর সভায় এর হিসাব আমাদের দাখিল করতে হবে এই কথা মনে রাখতে পারলে চেষ্টার দীনতা ঘুচে যাবে। তা হলেই এ জিনিসটাকে আমরা একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল মাত্র করে তুল্‌তে লজ্জা পাব। পৃথিবীতে এণ্ট্রেন্স স্কুলের অভাব অতি অল্প—মানুষের শক্তির প্রতি সে অভাবের দাবীও অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু ছেলেরা আশ্রম-জননীর কোলের উপর শুয়ে বিশ্বজীবনের বিগলিত অমৃত স্তন্যধারা পান করে পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে উঠবে এ অভাব সমস্ত পৃথিবীর অভাব—আমাদের সমস্ত জীবন দিতে না পারলে এ অভাব মোচনের আমরা আয়োজন করতে পারবো না। কিন্তু কোণের মধ্যে বসে বসে কাজ করতে করতে এ কথা আমরা কেবলি ভুলে ভুলে যাই—আমাদের সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ধূলায় আবৃত হয়ে যায় এবং আমাদের শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সেই জন্যে আমাদের সেই প্রান্তর-প্রান্তের বিদ্যালয়কে বিশ্বদৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে পারলে আমরা নিজেকে নিজে সত্যভাবে দেখতে পাব—সেই দেখতে পাওয়াই আমাদের সকল ধনের চেয়ে বড় ধন! সকলের কাছে এই আমাদের প্রকাশ আমাদের গর্ব্বের বিষয় নয়, আমাদের লজ্জার বিষয়ও হতে পারে। কেবল মাত্র সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার উপায় মাত্র বলে একে গণ্য করতে হবে—সত্যের দ্বারা সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগের পথ উদ্ঘাটন করতে হবে—ইস্কুল-মাষ্টারি করে সে কাজ হবে না। আমাদের প্রত্যেককে সাধক হতে হবে, তপস্বী হতে হবে।

ভারতী (বৈশাখ)।

যুগ্মতারা (গল্প)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

অসিধার নখাঘাতে দিল্লীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া শ্যেনপক্ষীর মত নাদির শাহ যে দিন হিন্দুস্থানের তখ্‌তে-তাউস ছিনাইয়া লইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন সেদিন অক্ষম বাদশাহ রঙ্গীলে মহম্মদশাহকে দিল্লীর জগৎবিখ্যাত দেওয়ানি-আমে শূন্য রত্নবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছিল অনেকেই—

"—সামতে আমালে মা, ইঁ সুরতে নাদির গিরিফ্‌ত্‌"

কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আমারই কর্ম্মফল নাদির-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের ন্যায় হতভাগ্য সেই মহম্মদ শাহের কপালের দোষ দিয়াছিল অনেকেই এবং তাঁহারই কর্ম্মফল যে ফলিতেছে তাহাও বারবার বলিতে বাকি রাখিল না অনেকেই,—সালেবেগ ছাড়া। সালেবেগ ছিল বাদশাহের মুন্সী এবং চিত্রকর। গীতানুরাগী বাদশাহ সারাদিন ধরিয়া যে-সকল গান রচনা করিতেন সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজাইয়া বিচিত্র চিত্রে ফুটাইয়া বাদশাহের কুতুবখানায় ধরিয়া দেওয়াই তাহার কায ছিল। সে ছিল রঙ্গীলে মহম্মদশাহের 'জর্দ্দরী কলম'—সুবর্ণ লেখনী।

আম-দরবারের মণি-ভিত্তি আলোকিত করিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে "ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এইখানে এইখানে"। ঠিক তাহারই নিম্নে হৃতসর্ব্বস্ব মহম্মদ শাহ।—এই ছবিটা সালেবেগের প্রাণে তীরের মত আসিয়া বিঁধিতে বিলম্ব ঘটে নাই। সুতরাং যে সময়ে আর সকলে অদৃষ্টের ফের লইয়া ব্যস্ত সেই সময়ে কথামাত্র না বলিয়া নির্ব্বাক বাদশাহকে যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দরবার হইতে চলিয়া আসিল ও বাড়ী আসিয়া একটুকরা কাগজে সেইদিনের ছবিটা আর সেই ছবির নীচে মহম্মদ শাহের কাতর অর্দ্ধোক্তিটুকুও লিখিয়া নিজের রং তুলি, একখানি রুটী, এক ছুরি গুছাইয়া লইয়া অবিলম্বে সালেবেগ দিল্লী ছাড়িয়া কাবুলের পথ ধরিল। সালেবেগের ঘরে এমন কেহ ছিল না যে মহম্মদ শাহের সুবর্ণ লেখনীর খবরদারি করে,—না বিবি না বেটা। সঙ্গীর মধ্যে ছিল এক পোষা বুল্‌বুল্; খাঁচা খুলিয়া দিতেই একদিকে সে উড়িয়া পালাইল। পরদিন কলমের সন্ধানে লোকের উপর লোক আসিয়া যখন বাদশাহকে গিয়া শূন্য খাঁচা ও খালি ঘরের সংবাদ দিল, কলমের কোন সন্ধানই দিল না, তখন মহম্মদ শাহ বড় দুঃখেই বলিয়া উঠিলেন—

"হায় ব্যথিতের আর্জি দুঃখের নিবেদন লিখিয়া প্রচার করিবার উপায় পর্য্যন্ত রহিল না! আজ অবধি মনের দুঃখ মনেই থাক, প্রকাশে কায নাই।"

* * * * *

চতুরঙ্গ বাহিনী চলিয়াছে, জয়দুন্দুভি বাজাইয়া নাদির চলিয়াছে, মরুদের মরুভূমির উপর দিয়া খর রৌদ্রের ভিতর দিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীর মত মোগল বাদশাহের রমণীয় সুখশয্যা ময়ূর-সিংহাসন চলিয়াছে; আর চলিয়াছে সেই সিংহাসন স্কন্ধে বহিয়া জর্‌রী কলম সালেবেগ সিপাহীর ছদ্মবেশে। অদূরে খর্জ্জুর-বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় রোজা ইমাম মুসিরেজা; আরো দূরে মরুদের সুদৃঢ় কেল্লা। নাদিরি ফৌজ শাহার হুকুমে তখ্‌তে-তাউস ইমাম রোজায় উপঢৌকন দিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিল। বহু অশ্রুপাত বহু রক্তপাতে কলঙ্কিত ময়ূর সিংহাসন পবিত্র মোকবারায় উপহার দিয়া আপনাকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী জানিয়া নাদির পরম সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার নাদিরি হুকুম তামিল হইল না, মোকবারা হইতে ময়ূর-সিংহাসন কে জানে কে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি টানিয়া ফেলিতে লাগিল। চতুর্থ দিনে ক্রোধান্ধ নাদির তলোয়ার খুলিয়া ইমামের রোজার সম্মুখে সদর্পে দাঁড়াইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন "রজা আজ মন্ জঙ্গ মি খাহদ্" যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি। প্রতিবারেই ইমাম মুসিরেজার শূন্য রোজা হইতে প্রতিধ্বনি আসিল "আজ মন্ জঙ্গমি খাহদ্ জঙ্গমি খাহদ্"। সত্য সত্যই সেই রাত্রে সুখসুপ্ত নাদিরের নিকট যুদ্ধের আহ্বান পৌঁছিল এবং তাহার জীবনযবনিকা শোণিতাক্ত করিয়া ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাহার জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে ভীষণ অঙ্কপাত করিয়া গেল।

* * * * *

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। যমুনার উপর দিয়া দক্ষিণবায়ু বহিতেছে—রঙ্গমহালের সুপ্রশস্ত খোলা ছাদের উপরে সুন্দরী কাহারিয়াগণের স্কন্ধে সোনার তামদানে মহম্মদ শা সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশে দুইটি মাত্র তারা দুই খণ্ড কোহিনুরের মত জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। ঘরে ঘরে তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই। এই সময় তাতারী প্রহরিণী আসিয়া বাদশাহের হস্তে একখানি তসবীর দিয়া জানাইল—নাদির আর নাই; সালেবেগ এইমাত্র মরুদ হইতে সে সংবাদ লইয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাদশাহের জন্য এই সামান্য উপহার হুজুর-দরবারে দাখিল করিয়াছে। মহম্মদশা তসবীরখানি যত্নের সহিত উঠাইয়া লইলেন। তসবীরের এক পৃষ্ঠায় দেওয়ানী-আমের দৃশ্য,—শূন্য সভায় হৃতসর্ব্বস্ব মোগল বাদশা! এই করুণ দৃশ্য ঘিরিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে—'সামনে আমালে মা ই সুরতে নাদির গিরিফ্‌ত্'। তসবীরের অন্য পৃষ্ঠায় নাদিরের রক্তাক্ত দেহের উপরে ছুরিকাহস্তে সালেবেগ আর সেই ছবি ঘিরিয়া রক্তের অক্ষর মাণিক্যের মত জ্বলিতেছে—

ব-এক গর্দ্দিসে চরখ্ নীলুফরি
না নাদির বজা মুন্দ, নে নাদরী।

সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় নীলাকাশ একটিবার মাত্র আবর্ত্তিত হইয়াছে কি না ইহারি মধ্যে নাদিরের সঙ্গে নাদিরি হুকুম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

বাদশাহ যখন তসবীর হইতে মুখ তুলিলেন তখন আকাশে কেবলমাত্র একটি তারা যমুনার জলে ছায়া ফেলিয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান (বাসগৃহ)—শ্রীচুনীলাল বসু

বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। নিম্ন বঙ্গদেশে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, এজন্য এপ্রদেশে বাসগৃহগুলি উত্তর দক্ষিণমুখী হইলে ভাল হয় এবং যাহাতে বাটীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খানিকটা খোলা জায়গা থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

আমরা বাটীর মধ্যে সচরাচর দুইটা অঙ্গনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। কিন্তু বাটীর চতুঃপার্শ্বে খোলা জায়গা না থাকিলে এরূপ চকবন্দি বাটী কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বাটীর মধ্যে অঙ্গনের বন্দোবস্ত না করিয়া যদি বাটীর চতুঃপার্শ্বে খানিকটা খোলা জায়গা রাখা যায় তাহা হইলে কোন গৃহেই বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে না। আমরা "ঠাণ্ডা" লাগিবার অমূলক আশঙ্কায় রাত্রিকালে অনেক সময়ে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকি। এ বিশ্বাসটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও প্রভূত অনিষ্টের কারণ। বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শয়নগৃহে কেন, শীত বা বর্ষাকালে খোলা জায়গায় থাকিলেও "ঠাণ্ডা" লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। রুদ্ধ গৃহে দূষিত বায়ু সেবনের দ্বারাই কাশ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঘর খোলা থাকিলে "ঠাণ্ডা" লাগিয়া কখনই ঐসকল রোগ উৎপন্ন হয় না। সূর্য্যালোক এবং বায়ুস্থিত অক্সিজেন্ এই-সকল রোগের বীজাণুর পরম শত্রু। "Where the Sun does not enter, the Doctor does"—সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গৃহমধ্যে আলোক-প্রবেশ ও বায়ু-সঞ্চালনের যথোচিত বন্দোবস্ত থাকিলে শুশ্রূষাকারী সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে যক্ষ্মারোগে আমরা রোগীকে রুদ্ধ গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে নিরাপদ বিবেচনা করি, সেই দুঃসাধ্য রোগ এক্ষণে, যথায় সর্ব্বদা বরফ পড়িতেছে, এরূপ অত্যধিক শীতল স্থানে উন্মুক্ত বায়ুমধ্যে থাকিয়া, প্রশমিত ও আরোগ্য হইতেছে। সাধারণ হস্পিটালের দরজা জানালা, কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল ঋতুতেই, দিবারাত্র মুক্ত রাখা হয়, অথচ তাহাতে রোগীদিগের কোন অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না।

নানাবিধ সামাজিক কারণ ও আর্থিক অভাব নিবন্ধন আমরা বহু পরিবার লইয়া ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য হই। শিশুসন্তানগণ

অনেক সময়ে শয্যার উপরেই রাত্রিকালে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে এবং গৃহিণীদিগের আলস্যবশতঃ তাহা সমস্ত রাত্রি সেই রুদ্ধ গৃহের এক পার্শে সঞ্চিত থাকে। এইরূপে গৃহবাসীদিগের শ্বাসক্রিয়া, রোগীর শরীর হইতে পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ এবং গৃহমধ্যে সঞ্চিত মলমূত্র দ্বারা শয়নগৃহের বায়ু শীঘ্র অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অনেক সময়ে গৃহমধ্যে একটা আলোক রাখিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ুস্থিত অক্সিজেনের অংশ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং বায়ুমধ্যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ প্রভৃতি দূষিত পদার্থের অংশ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেবল ইলেকট্রিক্ আলোক দ্বারা বায়ু দূষিত হয় না। এই দূষিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কিন্তু যাহারা গৃহমধ্যে বাস করে, তাহারা বার বার উহা নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়, সুতরাং গৃহবাসীরা উক্ত দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু বাহির হইতে অন্য ব্যক্তি রুদ্ধ গৃহমধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেই উক্ত দুর্গন্ধ সবিশেষ অনুভব করিয়া থাকে। আমরা বার মাস ত্রিশ দিন এইরূপ অবস্থাপন্ন শয়নগৃহের মধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য যে ভঙ্গ হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

এজন্য কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, কি দিবা, কি রাত্রি, যে গৃহে বাস করা যায়, তাহার বায়ুপথসমূহ রুদ্ধ করা নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য।

যাহাতে এক গৃহের দূষিত বায়ু অপর গৃহে প্রবেশ না করে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। প্রশ্বাসত্যক্ত বায়ু ও দীপালোক-সম্ভূত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ উষ্ণতা হেতু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, সুতরাং দেওয়ালের উপরিভাগে ছাদের নিম্নে কতকগুলি ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা ঐ দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং মুক্ত দরজা ও জানালা দিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার স্থান অধিকার করে।

গৃহের মধ্যে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের শ্বাসক্রিয়া দ্বারা গৃহমধ্যস্থ বায়ু এত শীঘ্র এবং এত অধিক পরিমাণে দূষিত হয় যে বায়ুপথ সমূহ উন্মুক্ত থাকিলেও বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে শীঘ্র পরিষ্কৃত করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য প্রত্যেক গৃহের মধ্যে (বিশেষতঃ শয়ন-গৃহে) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকের বাস করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ইংলণ্ডে সৈন্যাবাস ও সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ বা রোগীর জন্য ৬০০ ঘন ফুট্ পরিমিত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডের ভাড়াটিয়া বাটীগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থানের জন্য ৩০০ ঘন ফুট্ পরিমিত স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু শয়ন-গৃহের পক্ষে ৩০০ ঘন ফুট্ পরিমিত স্থান একজন মনুষ্যের পক্ষে একেবারেই পর্য্যাপ্ত নহে; শয়ন গৃহে এরূপ অল্প পরিমাণ স্থান হইলে গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহারা দুর্ব্বল হয় এবং রক্তহীনতা (Anaemia) রোগ জন্মে। আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীও ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ন্যূনসংখ্যা এই পরিমাণ স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। ১০০০ ঘন ফুটের যদি সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ৬০০ ঘন ফুট্ স্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

গৃহের মধ্যে গৃহসজ্জা (Furniture) যত অধিক থাকিবে, ঐ গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে। এজন্য শয়নগৃহে গৃহসজ্জার পরিমাণ যত অল্প হয়, উহা ততই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল।

আমরা সচরাচর বাটীর নিম্নতলে সুবিধামত কোন একটী গৃহে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। ইহাতে বাটীর মধ্যে এত অধিক ধূঁয়া হয় যে বাটীতে থাকা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। ধূমের জন্য বস্ত্রাদি অতি সত্বর মলিন হইয়া যায়। রন্ধনশালা বসতবাটী হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং তন্মধ্য হইতে ধূম নির্গমনের জন্য সুবন্দোবস্ত করা উচিত। স্থানাভাব বশতঃ স্বতন্ত্র স্থানে পাকশালা প্রস্তুত করিবার সুবিধা না হইলে বাটীর ছাদের উপর পাকশালা নির্ম্মাণ করিলে ধূঁয়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। উনানের সহিত একটী চিমনির বন্দোবস্ত করিলে নীচের তলে রান্নাঘর হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।

রান্নাঘরটী গোশালা, অশ্বশালা বা পাইখানার নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত নহে। রান্নাঘরের নিকট কোন আবর্জ্জনা সঞ্চিত করিয়া রাখা উচিত নহে; ইহাতে রান্নাঘরের মধ্যে মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে। মাছি তাড়াইবার জন্য রান্নাঘরের জানালাগুলি সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত হওয়া উচিত এবং দরজায় একখানি চিক্ ফেলিয়া রাখা আবশ্যক।

গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী রাখিবার স্থান ও পাইখানা বাটী হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। পাইখানা, গোশালা বা অশ্বশালার মেঝে "পাকা" হওয়া উচিত এবং পশুগৃহের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর না রাখিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। গৃহের "চাল" দুধারে একটু বেশী গড়ানে হইলে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে পশুগণ সুন্দরভাবে রক্ষিত হইতে পারে অথচ চতুর্দ্দিক্ খোলা থাকিবার জন্য বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় না। পল্লীগ্রামে বাসগৃহ হইতে বহুদূরে ভূমি খনন করিয়া মল, মূত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনা তন্মধ্যে প্রোথিত করা উচিত। কালে এই-সকল পদার্থ উৎকৃষ্ট "সারে" পরিণত হয়, তখন উহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হইতে পারে।

বাটীর নিকটে দুই চারিটী ছোট গাছ এবং ফুল গাছ থাকিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই—কিন্তু বেশী গাছপালা বা কোন বৃহৎ বৃক্ষ বাটীর নিকটে থাকিলে বায়ুসঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় এবং অনেক সময়ে ছোট গাছপালার জন্য মশকের উপদ্রব হইয়া থাকে।

মাটীর ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রত্যেক গৃহে অধিক সংখ্যক ঋজু ও প্রশস্ত বায়ুপথ রাখা উচিত, নতুবা প্রচুর পরিমাণ আলোক ও বায়ুর অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মেঝে চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে যথেষ্ট উচ্চ হওয়া উচিত এবং সিমেণ্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লইলেই ভাল হয়। যদি মাটীর মেঝে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে উহা হইতে কয়েক ইঞ্চি মাটী তুলিয়া লইয়া নূতন মাটী দিয়া পিটিয়া তদুপরি "লেপ্" দেওয়া উচিত। ভূমি নিতান্ত আর্দ্র হইলে কাঠ বা বাঁশের "মাচান" করিয়া তাহার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা উচিত। এক কথায়, বাটীখানিকে ছবিখানির মত করিয়া রাখিবে; ইহাতে নিজের চিত্ত এবং যাঁহারা বাটীতে শুভাগমন করিবেন, তাহাদেরও চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে।

আমার বোম্বাই প্রবাস—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

আমার হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় পরীক্ষা শেষ হইলে আমি আহমদাবাদে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর রূপে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। Sir Bartle Frere তখন বোম্বায়ের গবর্ণর ছিলেন। তিনি বিনয়-সৌজন্য-গুণে, ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্টালাপে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। যাহাতে আমার সেই প্রথম কর্ম্মভূমির পথ পরিষ্কৃত ও সুগম হয় সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রথম দুই এক বৎসর কলেক্টরি কর্ম্মে আমার ডিষ্ট্রিক্টের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইত—পরে যথা সময়ে ঐ প্রদেশের আসিষ্টণ্ট জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আমি যখন ধূলিয়ায় আসিষ্টণ্ট জজ হইয়া কর্ম্ম করি, তখন সেখানকার

মাজিষ্ট্রেট প্রিচার্ড সাহেব আমার কোর্টে চারিজন আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্যের মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। সেই মকদ্দমায় তিনি নিজে ফরিয়াদি, নিজেই সাক্ষী। তাঁহার একতরফা সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে এই বলিয়া আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছিলাম। এই বিচারে প্রিচার্ড সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল আনিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ভাগ্যে হাইকোর্ট আমার পক্ষ লইয়া আমার রায় বাহাল করিলেন, তাই আমাকে আর বিশেষ কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইল না, কেবল ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হওয়াই আমার শাস্তি হইল। খানদেশ হইতে পুণা, আমার শাপে বর হইল। আমার বিদায় উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা আমাকে এক মানপত্র, (address) দেয়—ইহাতে কর্তৃপক্ষেরা আরো চটিয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন কেন এইরূপ অ্যাড্রেস লওয়া হইল—অমনি তার কৈফিয়ৎ তলব। সেই অবধি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন সরকারী কর্ম্মচারী অ্যাড্রেস গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই কড়াক্কড় নিয়ম জারী হইল। আমার সমুদয় সর্ব্বিসের মধ্যে আমার উপরিওয়ালাদের সঙ্গে এই যা একটু গোলযোগ বাধিয়াছিল, তা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মতান্তর ঘটে নাই। আমার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে আমার বিশেষ কিছু দোষ ধরিবার নাই। পুণায় বদলী হইয়া অবধি জজীয়তী কার্য্যে আমার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। মাঝে মহারাজা হোলকর ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোচারণের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে আমাকে উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিতে হয়। এইটি ছাড়া উত্তরে সিন্ধুদেশ হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জজের কর্ম্মেই আমার সর্ব্বিসের সমুদায় কাল অতিবাহিত হয়। পুণার জজের হাতে সেখানকার সর্দ্দারদের সম্বন্ধে একটু Political কাজ আছে—তিনি দক্ষিণী সর্দ্দারদের Political Agent, আমিও এই কাজে দুই বৎসর জজের সহকারী ছিলাম। এই উপরি কাজ অতি সামান্য, সর্দ্দারদের খোঁজ খবর নেওয়া আর বৎসর অন্তর একবার দরবারের আয়োজন করা, এই বৈ নয়। এইরূপে ৩০ বৎসরেরও উপর জুডিস্যাল খাতায় নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিয়া অবশেষে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি।

আমার সার্ব্বিসের মধ্যে দুইবার ফর্লোর ছুটী পাওয়া যায়। প্রথমবার সপরিবারে ইংলণ্ডে যাত্রা করি। দ্বিতীয়বার ১৮৯৩ সালে এদেশেই নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবকাশ-কাল যাপন করি।

নাসিকে একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, তাহার নাম আবদুল হক। লোকটা খুব মিশুক, চতুর ও উদ্যমশীল, নিজগুণে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে দাসীরূপে বশ করিয়া লয়। আমাদের সঙ্গে তিনি ভাই বোন পাতাইয়াছিলেন—আমি তাঁর ভাইসাহেব, আমার স্ত্রী ভানসাহেব। আমাদের বাড়ী সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেন ও আপনার জীবনের সমস্ত ভাবী সঙ্কল্প লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। সে সময়ে তিনি পুলিশের এক সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে হাইদ্রাবাদে গিয়া নিজামের চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমে নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রমে উচ্চপদে আরোহণ করিলেন ও যিনি সামান্য আবদুল হক নামে পরিচিত ছিলেন তিনি সর্দ্দার দিলার-উদ্দৌলা উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবী উপার্জ্জন করিলেন। হাইদ্রাবাদে তিনি নিজামের ষ্টেট রেলওয়েতে নিযুক্ত হইয়া সেই সংক্রান্ত কার্য্যে ইংলণ্ডে গিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বোম্বায়ে তিনি বিস্তর বিষয় সম্পত্তি করিলেন এবং সেখানকার এক নামাঙ্কিত বড় হোটেল (Watson's Hotel) ক্রয় করিয়া তাহার অধিস্বামী হন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তিনি তাঁহার গরীব ভাইবোনকে ভোলেন নাই। আমরা যখনি বোম্বায়ে যাইতাম, নিজ হোটেলে আমাদের আতিথ্য করিতেন, আমাদের খাইখরচার বিল পাঠাইতেন না। ভান সাহেবের খাতিরে আমরা তাঁর হোটেলে গিয়া দিব্য আরামে কাল কাটাইতাম। অনেক বৎসর হইল, তাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

আমি বোম্বায়ে যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি, তন্মধ্যে কারওয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে সর্ব্বাগ্রগণ্য, কারওয়ার কর্ণাটকের প্রধান নগর। ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি সুন্দর বন্দর, গিরি নদী উপবনে সুশোভিত। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউ গাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার দু গিরিবন্ধুর উপকূল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে। জজের বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্ম্মিত, সমুদ্রতীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন প্রথমে অসহ্য বোধ হয়, ক্রমে অভ্যাসবশতঃ তাহার কঠোরতা মন্দীভূত হইয়া যায়। সমুদ্রের দৃশ্য সকল সময়েই মনোরম, আর সমুদ্র-স্নানে বড়ই আরাম। সমুদ্রে সাঁতার দিবার আরাম, এমন অন্য কোথাও ভোগ করা যায় না। বন্দরের এই শৃঙ্খলবদ্ধ সমুদ্র পুরী সমুদ্র অপেক্ষা অনেক শান্ত, সাঁতার দিয়া অনেক দূর যাওয়া যায়। বাঙ্গলার ক্রোশভর দূরে গুঢেলী নামে একটি ছোট্ট পাহাড় আছে, উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, সেখানে গিয়া আমাদের অনেক সময় বন-ভোজন হইত। সমুদ্রের নানা জাতীয় সুস্বাদু মৎস্য আমাদের ভোগে আসিত; মৎস্যভোজীর ভাগ্যে এমন স্থান সহজে মেলে না। বন্দরে আঞ্জদ্বীপ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়, পোর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ইউরোপ হইতে ভারতে আসিয়া যেখানে প্রথম পদার্পণ করে সে এই দ্বীপ। কালানদীতে অনেক সময় আমরা নৌকা করিয়া বেড়াইতাম। তাহার পরপারে হাইদার আলির গিরিদুর্গ একটি দেখিবার স্থান। কানাড়া জেলায় আরো কত কত দর্শনীয় জিনিস আছে তন্মধ্যে গেরসপ্পা জলপ্রপাত ভুবনবিখ্যাত। তীর্থস্থানের মধ্যে গোকর্ণ তীর্থ উল্লেখযোগ্য। আমরা কারওয়ারে থাকিতে সেই তীর্থে গিয়া মহাদেবের মন্দির দর্শন করিলাম।

বোম্বাই, কারওয়ার প্রভৃতি এইসকল সমুদ্রতীরের জায়গায় একটা পরব হয় যা অন্যত্র নাই—তার নাম "নারেল পুনম," শ্রাবণ পূর্ণিমা তার সময়। এই সময় বর্ষা ঋতুর অবসান বলিয়া ধার্য্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক, পি এণ্ড ও কোম্পানির জন্য নয়) সমুদ্রপথ উন্মুক্ত, শুভযাত্রা উদ্দেশে ফলফুল নারিকেল উপহার দিয়া সমুদ্রের আরাধনা করিতে হয়। হিন্দুগণ ছোট বড় সকলে সাজসজ্জা করিয়া নারিকেল ও পুষ্পহস্তে সমুদ্রাভিমুখে বাহির হয়। লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগর অর্চনায় সম্মিলিত—পুরোহিতের মন্ত্রপূত চাউল দুধ নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী-সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবের ভোগে আইসে তাহা নয়। নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একদল কুলী তাহা সাঁতার দিয়া ধরিতে যায় ও কাড়াকাড়ি করিয়া যে পারে বরুণের ধন লুট করিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না, বরং উদার হস্তে তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করেন। বোম্বায়ে এই উৎসবে লোকের বিশেষ উৎসাহ; ময়দানে মেলা বসিয়া যায়। কোথাও খ্যালনা বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পালওয়ানের মল্লযুদ্ধ চলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জেতার প্রতি দর্শকমণ্ডলীর করতালি সাবাসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও একদল নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের জন্য কত প্রকার ফন্দী করিয়া ব্যাড়াইতেছে। ওদিকে

একজন গণক্যাঠাকুর হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণিয়া দিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই তাঁহাতে দৈবশক্তি মূর্ত্তিমতী। অন্যত্র নাগর-দোলায় বালকেরা ঘুরপাক দিতেছে। নানা দিক হইতে লোকজনের যাতায়াত, সকলেই দুদণ্ডের জন্য আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তৎপর।

কানাড়ায় চন্দনবৃক্ষ জন্মে, সেখানকার চন্দন-কাঠের উপর নক্সাকাটা বাক্স টেবিল পরদা প্রভৃতি অনেক জিনিস তয়ের হয়। তাহাদের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। অনেকানেক কারিগর এই কাজ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কারওয়ারের কর্ণাটী নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত লোভনীয়। আমরা কারওয়ারে একবার একটি নর্ত্তকীর মুখে জয়দেবের কাব্যগীত শুনিয়াছিলাম। গান অতি চমৎকার। আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের বড় বড় পণ্ডিতের মুখে শুনা যায় না। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকদের প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিবার রীতি আছে, কিন্তু সংস্কৃত যে তাহাদের মুখে কত ভাল শুনায় তাহা বুঝিতে পারিলাম।

বিবিধপ্রসঙ্গ

ময়ূরভঞ্জে লৌহ আবিষ্কার।

গত বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে তাতা'র সাকচীস্থ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার একটি সচিত্র বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল। ঐ বৃত্তান্তটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ইহা জানা দরকার যে, এই কারখানায় যে মিশ্র লৌহকে বিশুদ্ধ লৌহ ও ইস্পাতে পরিণত করিয়া তাহা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকর কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা অনেকে জানেন না যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ই এই আবিষ্কার করিয়াছেন। বসু মহাশয় অনেক দিন হইতে জানিতেন যে মধ্যপ্রদেশে, বিশেষতঃ রাইপুর ও জব্বলপুর জেলায়, লৌহ পাওয়া যায়। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিবরণীতে (Records of the Geological Survey of India) এই বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত জামশেদ্‌জি নসেরবানজি তাতা লৌহকারখানা স্থাপন করিবার জন্য ১৯০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে লৌহের অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি রাইপুর জেলার দল্লি বা ধল্লী নামক স্থানে লৌহের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হন। বসু মহাশয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আকর আবিষ্কার করেন; এতদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিবরণীর বিংশ-খণ্ডের প্রথম ভাগে (Records of the Geological

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, বি,-এস-সি (লণ্ডন)।

Survey, Vol. XX, Part I) প্রকাশিত হয়। বসু মহাশয় পেন্‌সন লইলে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মহোদয় কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জের খনিজ সম্পদ নির্ণয় করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। বসু মহাশয় গুরুমাইশানি পাহাড়ের পার্শ্ব ও পাদদেশে অপর্য্যাপ্ত লৌহের অস্তিত্বের প্রমাণ পান। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য খনিজ দ্রব্যও আবিষ্কার করেন। গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব-বিবরণীর একত্রিংশ খণ্ডের তৃতীয় ভাগে তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাতা মহাশয় মধ্যপ্রদেশে লৌহের অনুসন্ধান করিতেছেন, জানিতে পারিয়া, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রমথ বাবু তাঁহাকে জানান যে, ময়ূরভঞ্জে লৌহ আছে। তিনি তাঁহাকে জানান, যে, এই লৌহক্ষেত্র বহুবিস্তৃত, ইহার লৌহের পরিমাণ খুব বেশী, এবং ইহা বঙ্গের কয়লার খনি সকলের নিকটবর্ত্তী। বসুমহাশয় মধ্য-প্রদেশের লৌহ-ক্ষেত্র-সকলের কথা আগে হইতেই জানিতেন; সুতরাং তিনি উভয়ের তুলনা করিয়া সহজেই ময়ূরভঞ্জকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাতা মহাশয়ের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা পিতার কাজটি ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁহারা প্রমথ বাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা পেরিন সাহেব নামক একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া স্থির করিলেন। পেরিন সাহেব বসু মহাশয়ের সহিত ময়ূরভঞ্জ পরিদর্শন করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ সাক্‌চীতে কারখানা স্থাপিত হইল।
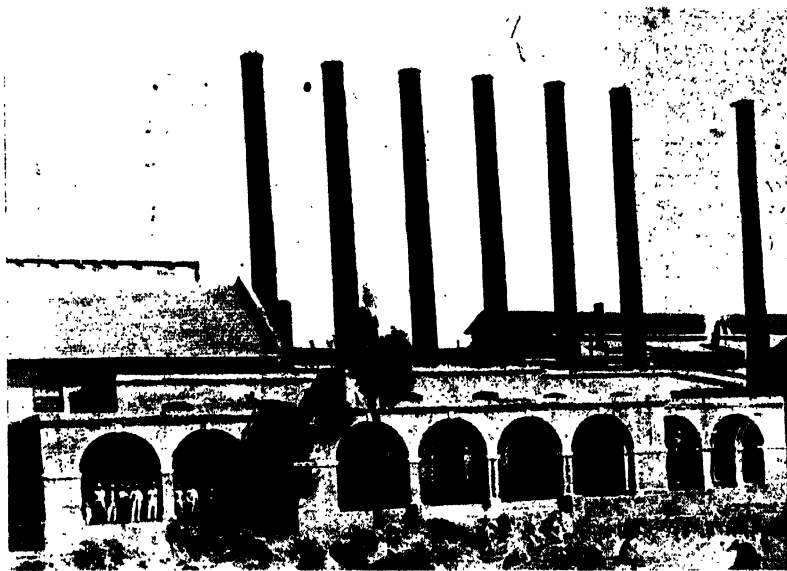
সাকচী ধাতু-পরীক্ষাগার।

প্রমথ বাবু পাটিয়ালা রাজ্যেও বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত লৌহের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু নিকটে কয়লার খনি না থাকায় এখনও তথায় কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই।

সাক্‌চীতে ধাতু-পরীক্ষাগার।

শ্রীযুক্ত তাতা লৌহের কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার চেষ্টা করেন। গবর্ণমেণ্ট বৎসরে অন্যূন ২০,০০০ টন্ ইস্পাতের রেল ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু এই সর্ত্ত করেন যে রেলগুলির উৎকর্ষ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইবে। এই উৎকর্ষ পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্‌চীতে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে শেফীল্ড লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা সমূহের কেন্দ্রস্থল। শেফীল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ম্যাকৃউইলিয়ম সাহেব এই পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ, এবং শ্রীযুক্ত আলোকনাথ বসু ও আরউইন সাহেব তাঁহার সহকারী। এই পরীক্ষাগারে "পাস্" করিয়া না দিলে গবর্ণমেণ্ট কোন রেল ক্রয় করেন না।

তাহার কারখানা সম্বন্ধে একটি দুঃখের বিষয় এই যে ইউরোপ ও আমেরিকায় উপযু[ক্ত] শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন কোন ভারতী[য়] যুবক থাকা সত্বেও এই কারখানা[র] সমুদয় বৈজ্ঞানিক কাজ বিদে[শী] (প্রধানতঃ জার্ম্মেন ও আমেরিকা[ন]) দিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এই-সব কাজে কোন ভার[ত]বাসীকে নিযুক্ত করা হয় না। তাহারা যাহাতে পরে উচ্চত[র] কাজের যোগ্য হইতে পা[রে] নিম্নতর কাজে নিযুক্ত করি[য়া] তাহাদিগকে এরূপ সুযোগও দে[ওয়া] হয় না। অন্ততঃ এরূপ সুযো[গ] দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

রাণাড়ের প্রস্তরমূর্ত্তি।

ভারতের জন্য বিশেষ কিছুই করেন নাই, হয়ত ভারতে ইষ্ট না করিয়া অনিষ্টই করিয়াছেন, এমন অনেক লোকে[র] জন্য গৃহ নগর আলোকমালায় ভূষিত হইয়াছে, এমন অনে[ক] লোকের প্রস্তর বা ধাতুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কি[ন্তু] অনেক ভারতভক্ত ভারতসেবকের কোন স্মৃতিচিহ্ন এপর্য্য[ন্ত] স্থাপিত হয় নাই। এইজন্য বোম্বাই সহরে দেশভক্ত মহাদে[ব] গোবিন্দ রাণাড়ের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া প্রকৃত ভারতবা[সী] হইতে চায়, স্বদেশে প্রবাসীর মত থাকিতে চায় না। এইজ[ন্য] অনেক দিন হইতে আন্দোলন ও নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপে ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক প্রথা, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে অবনতির পথ রোধ এবং উন্নতির প[থ] আবিষ্কারের চেষ্টা এবং সেই পথে চলিবার ও চালাইবা[র] আয়োজন অনেক দিন হইতে চলিতেছে। সকলে সক[ল] ক্ষেত্রে চেষ্টা করেন না, করিতে পারেন না, অনেকে সক[ল] ক্ষেত্রে এরূপ চেষ্টার প্রয়োজন বা উপকারিতা স্বীকা[র] করেন না। কিন্তু বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা বুঝাইতে চে[ষ্টা] করিয়াছেন, যে, কোন এক ক্ষেত্রে উন্নতি অপর সক[ল] ক্ষেত্রে উন্নতির সাহায্য করে, আবার তাহাদের উন্নতি

রাণাড়ের ম্হাত্রে-নির্ম্মিত প্রস্তর-মূর্ত্তি।

উপর তাহার উন্নতি নির্ভর করে; সর্ব্ববিধ উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ। আধুনিক ভারতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব প্রথমে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এইজন্য তাঁহারই চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে বহুমুখে ধাবিত হইয়াছিল। মহামতি রাণাড়েও সর্ব্ববিধ উন্নতির পরস্পর-সাপেক্ষতায় বিশ্বাস করিতেন। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, রাষ্ট্র-নীতি, অর্থবিজ্ঞান, শিল্প, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার মত জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল নেতা, বক্তা ও লেখক আধুনিক কালে ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তৃতি বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিতেন; তিনি মনে করিতেন যে বিধাতা ভারতবাসীর হাতে মহত্তম কাজের ভার দিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান কোন দুর্ব্বলতা, কোন অবনতি, কোন বিষয়ে হীন দশা তাঁহার এ বিশ্বাস টলাইতে পারিত না। তাঁহার স্বদেশভক্তি ধর্ম্মভাবের মত প্রগাঢ়, দৃঢ় ও পবিত্র ছিল। ভারতের এই সন্তানরত্নকে অর্ঘ্য দিয়া বোম্বাইবাসী ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গণপত্ কাশীনাথ ম্হাত্রে।
(প্রবাসীর জন্য গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে।)

শ্রীযুক্ত গণপত্ কাশীনাথ ম্হাত্রে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ
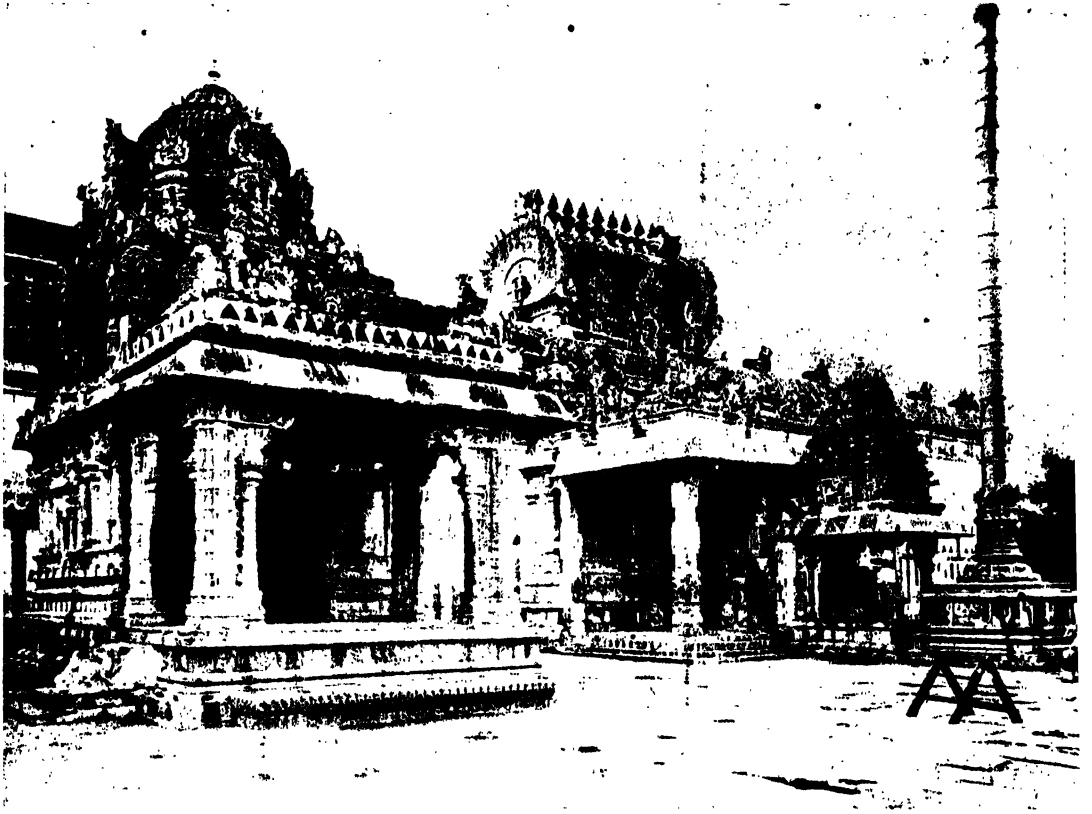
গণেশ-মন্দির।

করিয়াছেন। মূর্ত্তিটি ঠিক্ রাণাড়ের মত হইয়াছে। এবং ইহাতে তাঁহার চরিত্রও দ্যোতিত হইয়াছে। ম্মাত্রের শিল্পনৈপুণ্যের সকলেই প্রশংসা করিতেছেন। ১৮৯৬ সালে যখন তিনি "মন্দিরপথবর্ত্তিনী," "সরস্বতী," প্রভৃতি মূর্ত্তি খড়িতে গড়েন, তখন আমরা "প্রদীপে" তৎসমুদয়ের প্রতিচ্ছবি মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে পরিচিত করিয়াছিলাম। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদে তাঁহার নির্ম্মিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। তখন উহা আধুনিক ভারতবাসী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাঁহার যশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী। কাহারও প্রস্তরমূর্ত্তির প্রয়োজন হইলে আর বিদেশে বরাত দিবার আবশ্যক নাই।

গণেশ মন্দির।

বাঙ্গালাদেশে গণেশের পূজা আছে, কিন্তু গণেশে মন্দির বেশী দেখা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যা প্রদেশে গণেশমন্দিরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। মান্দ্রা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তিরুবন্নমলই নামক স্থানের এক সুন্দর গণেশমন্দিরের ছবি এখানে দেওয়া হইল। ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দেবতার পূজার সমধি প্রচলনের কারণ এবং এক সময়ে এক দেবতার ও অ সময়ে অন্য দেবতার প্রাধান্যের কারণ, বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ভাবে আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু এপর্য্যন্ত এরূপ আলোচনার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই।

স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্য্যের জন্য খ্যাতি-

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার মত কৃতিত্ব ও যশ সকলে লাভ করিতে পারেন না। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি যেখানে যেখানে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেখানেই লোকের মনে নিজ ধর্ম্মভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার অনেক সময় যাপিত হইত। তিনি ছাত্রদিগকে ভালবাসিতেন, এবং ছাত্রেরাও তাঁহাকে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। হৃদয়ের যোগের দ্বারাই মানুষ অপরের প্রকৃত উপকার করিতে পারে। এই জন্য অনেক ছাত্র তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল। দরিদ্র নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ভগবদ্ভক্তি তাঁহার সকল শক্তির উৎস ছিল। ভগবদ্ভক্তিই তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধীরভাবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। এমন একটি মানুষের মত মানুষ ৪৫ বৎসর পূর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন, ইহা গভীর শোকের বিষয়।

এডিনবরা ভারত-সভা।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এডিনবরাপ্রবাসী কতিপয় ভারতীয় ছাত্রের মিলামিশার সুবিধার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। তখন প্রধানতঃ বিতর্ক- ও আলোচনা-সভার বন্দোবস্ত করাই

সার উইলিয়ম টার্ণার, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল।

ইহার কাজ ছিল। তাহার পর গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। এখন ইহাদের সামাজিক ভাবে একত্র সম্মিলনের একটি স্থানের

প্রয়োজন হইয়াছে। প্রধানতঃ মান্দ্রাজের অন্তর্গত বিজয়-নগরমের মহারাণীর প্রদত্ত ৫০,০০০ টাকা ও অন্যান্য দানের সাহায্যে ১১নং জর্জ স্কোয়ারে একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সার উইলিয়ম টার্নার এই গৃহের দ্বার উন্মোচন করেন। ইহাতে বিতর্ক-কক্ষ, পাঠাগার, পুস্তকাগার, লিখনাগার, কথোপকথন-কক্ষ, স্নানাগার, বিলিয়ার্ডক্রীড়ার কামরা, প্রভৃতি আছে। এই-সকল বন্দোবস্তের আবশ্যকতা বুঝা যায়। কিন্তু একটি যে ধূমপান-কক্ষ আছে, তাহার হিতকারিতা বুঝিতে পারিলাম না। ধূমপান ছাত্রদের সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

এডিনবরা ভারত-সভা (Edinburgh Indian Association) তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সুবিধা অসুবিধা, ব্যয়, ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। ঠিকানা ১১নং জর্জ স্কোয়ার (11, George Square)।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত পরিচ্ছেদত্রয়ের সারাংশ :—ক্ষেত্রনাথ দত্তের বাড়ী কলিকাতায়। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণজালে জড়িত হন। ক্ষেত্রনাথ বি-এ পাশ করিয়া পিতার সাহায্যার্থ পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া ও একটী ভগিনীর শুভবিবাহ সম্পাদন করিতে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায় এবং ঋণদায়ে পৈত্রিক বাটী উত্তমর্ণের নিকট আবদ্ধ হয়। অর্থাভাবে, ক্ষেত্রনাথের কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল ও সংসার চালাইবার কোনও উপায় রহিল না; তাহার উপর স্ত্রী মনোরমা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এদিকে উত্তমর্ণও ঋণের দায়ে বাটী নিলাম করাইতে উদ্যত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং বাটী বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এবং এক বন্ধুর পরামর্শক্রমে উদ্বৃত্ত অর্থের কিয়দংশ দ্বারা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম জেলায় বল্লভপুর নামে একটী মৌজা ক্রয় করিলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় করিবেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে রুগ্না স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও একটী শিশুকন্যা সহ তিনি বল্লভপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলেন।]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের মাতব্বর চারি জন প্রজা ক্ষেত্রনাথের আদেশানুসারে তাহাদের গোগাড়ী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। গাড়ীগুলির উপরে ঘর বাঁধা; ঘরের মধ্যে খড় আস্তীর্ণ। ক্ষেত্রনাথ ও নরেন্দ্র, প্রজাদের সাহায্যে, দুইটী গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করিল। অপর দুইটী গাড়ীতে ত খড়ের উপর সতরঞ্চ ও বিছানা পাতা হইল। ক্ষে মনোরমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন "এই গাড়ীতে উঠে ব'স। এখানে ঘোড়ার গাড়ী ন মনোরমা তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; সুতরাং স্ব প্রত্যুত্তরে ঈষদ্ধাস্য মাত্র করিয়া কন্যা ও নরুকে একটী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। নগেন্দ্র ও সুরে সহিত ক্ষেত্রনাথ অপর একটী গাড়ীতে আরোহণ করিলে

ষ্টেশন হইতে বল্লভপুরাভিমুখে চারিখানি চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর পাকা রাস্তা। রাস্তার উপর গাড়ী বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল। পরই কাঁচা রাস্তা। কোথাও উঁচু নীচু, কোথাও খন্দর, কোথাও ছোট নদী ইত্যাদি। এইরূপ রা উপর চলিতে চলিতে গাড়ীগুলি ক্যাঁকোচ্ ম্যাঁকোচ্ ঠে ঢোকশ্ করিতে লাগিল। কোথাও আরোহীরা পরস্প গায়ে পড়িয়া যায়, এবং কোথাও পরস্পরের ঠোকাঠুকি হয়; আর অমনি সকলের মধ্যে হাসি প যায়। এইরূপে যাইতে যাইতে তাহারা একটি পা নদী পার হইল। তাহার নাম কালী নদী। নদীর পার্শ্বে বালুকার উপর দিয়া কাচের মত স্বচ্ছ জল ব যাইতেছে। গাড়ীগুলি সেই নদীর উপর দিয়া হইতে লাগিল। সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া সেই ন জলে মুখ হাত ধুইলেন। জল কোথাও একহাঁটুর নহে। জলের মধ্যে নানা বর্ণের গোল গোল ছোট পাথর ও নুড়ি রহিয়াছে। বালকেরা প্রত্যেকেই দশটি নুড়ি সংগ্রহ করিল। নদীর ঠিক উপরিভা পাহাড়শ্রেণী উচ্চ দেওয়ালের মত দণ্ডায়মান রহিয়া পাহাড়ের গায়ে কত প্রকার গাছ ও লতা এবং বাঁ বন রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর কোথাও রাখাল বাল গরু চরাইতেছে। কোথাও কোল ও মুণ্ডারি বালিক কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চ যাইতেছে। নদীর একপার্শ্বে কতকগুলি স্ত্রীলোক ধুইয়া কি বাহির করিতেছে। ক্ষেত্রনাথ ও ন তাহাদের নিকটে গিয়া জানিল যে, তাহারা বালু ধু সোণা বাহির করিতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য দে

সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। গাড়ীগুলি নদী পার হইয়া দুই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের মধ্যস্থল দিয়া গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার সময় ভ্রমক্রমে ছেলেদের জন্য বেশী খাবার আনেন নাই। সামান্য খাবার যাহা ছিল, তাহা সুরেন ও নরু ষ্টেশনেই খাইয়াছিল। কিন্তু নদী পার হইয়া নরুর ক্ষুধাগ্নি পুনর্ব্বার প্রবল হইল এবং সে খাবার পাইবার জন্য জননীকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। জননী তাহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিলেও নরু শান্ত হইল না এবং ক্রন্দন আরম্ভ করিল। ক্ষেত্রনাথ নরুর ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া চিন্তিত হইলেন। গাড়োয়ান বলিল, সম্মুখে মাধবপুর নামে যে গ্রাম রহিয়াছে, তাহাতে মাধব দত্তের বাড়ী। মাধব সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার বাড়ী হইতে দুগ্ধ আনিয়া দিবে। ক্ষেত্রনাথ গাড়োয়ানকে দুগ্ধের মূল্য দিতে চাহিলেন; কিন্তু গাড়োয়ান জিভ্ কাটিয়া বলিল, মাধব দত্ত সম্ভ্রান্ত লোক; তিনি কখনও দুগ্ধ বিক্রয় করেন না। তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ বড় কড়ার এক কড়া দুগ্ধ হয়। চাহিবা-মাত্র তিনি এক ঘটী দুগ্ধ দিবেন। গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যে মাধব দত্তের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, গাড়োয়ান একটী ঘটী লইয়া তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে দুগ্ধ লইয়া বাহির হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হুকায় তামাক খাইতে খাইতে একটী স্থূলাকার প্রবীণ ব্যক্তিও বাহির হইলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথের গাড়ীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশাই কোথায় যাবেন?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বল্লভপুরে।"

"সেখানে কি উদ্দেশে যাওয়া হচ্ছে?"

"সেখানে আমরা থাক্‌বো।"

"ওঃ, তবে আপনিই বুঝি বল্লভপুর খরিদ করেছেন।"

"হাঁ।"

"আপনারা?"

"গন্ধবণিক্?"

প্রশ্নকর্ত্তা উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। "মশাইরা কোন্ আশ্রম?"

"সত্রীশ।"

"সত্রীশ? সত্রীশের কি?"

ক্ষেত্রনাথ প্রশ্নটি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন "আমার নাম শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত; আমরা হর্ব্বিষ্ দত্ত।" অর্থাৎ উচ্চ ঋষিগোত্রের দত্ত।

"হর্ব্বিষ্ দত্ত? কুলীনসন্তান? কি পরম সৌভাগ্য! নমস্কার, মশাই, নমস্কার। আমিও সত্রীশ আশ্রমের গন্ধবণিক; এই জঙ্গল দেশে পড়ে আছি। আজ আমার কি সুপ্রভাত যে, এখানে আপনাদের দর্শন পেলাম। আপনারা গাড়ী হতে নামুন। আজ আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা না দিয়ে যেতে পার্‌বেন না। আমিও শাণ্ডিল্য দত্ত মশাই। হুগলী জেলায় বাড়ী। এই দেশে প্রায় ২৫ বৎসর হ'ল বাস করছি। আপনার নিবাস কল্‌কাতায়, তা আমি শুনেছি। কিন্তু আপনি যে গন্ধবণিক্ তা জান্‌তাম না। কি পরম সৌভাগ্য, কি পরম সৌভাগ্য!"

ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্ত মহাশয়ের সাদর সম্ভাষণ ও আত্মীয়তা দেখিয়া বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি বল্লভপুরে তখনি যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাধব দত্ত বলিলেন "সে কি হয়? এই মধ্যাহ্ন উপস্থিত বল্লভপুর এই নূতন যাচ্ছেন। সেখানে সমস্ত নূতন বন্দোবস্ত কর্‌তে হ'বে। আজ আমার বাড়ীতে অবস্থিতি করে কাল সেখানে যাবেন। আমি নিজে গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দিব। কি পরম সৌভাগ্য, কি পরম সৌভাগ্য! আপনি গন্ধবণিক্? হর্ব্বিষ্ দত্ত? কুলীন-সন্তান? আজ বহুকাল পরে আমি কুটুম্ব-নারায়ণ পেয়েছি! আজ কুটুম্বের সেবা করে আমি ধন্য হ'ব। আসুন, আসুন, সকলে নেমে আসুন।"

ক্ষেত্রনাথ, মাধব দত্ত মহাশয়ের সৌহার্দ্দ্য ও আত্মীয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব হইল। এদিকে মাধব দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র গৃহে জননীকে সকল সংবাদ বলায়, তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বাহিরে মনোরমার গাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। মনোরমা কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে ক্ষেত্রনাথ নিকটে আসিয়া বলিলেন "ওগো,

নাম; দত্ত মহাশয় আমাদের স্বজাতি, কুটুম্ব। তাঁর অনুরোধে আজ আমাদের এবেলা এখানে থাক্‌তে হ'বে। তাঁর অনুরোধ ঠেলা ভার।"

সকলেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সুরেন, নরেন ও কন্যাকে লইয়া মনোরমা অন্তঃপুরে গেলেন। গাড়ীর বলদগুলিকে জোয়াল হইতে খুলিয়া দেওয়া হইল এবং গাড়ীগুলিকে মাধব দত্তের বৈঠকখানার সম্মুখে রাখা হইল। মাধব দত্তের বৈঠকখানা ঘর প্রশস্ত। বাড়ীখানি ইষ্টক-নির্ম্মিত, পাকা, ও একতলা। মাধব দত্তের পুত্রেরা ক্ষেত্র-নাথের হস্ত পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত এক গাড়ু জল ও গামোছা আনিয়া দিল এবং বাঁধা হুকায় তামাক সাজিয়া দিল। মাধব দত্তের আতিথেয়তা দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন।

এদিকে মাধব দত্ত পুষ্করিণী হইতে মাছ ধরাইবার বন্দোবস্ত করাইয়া দিয়া, কুটুম্বগণের আহারাদির সুব্যবস্থা করিলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে লক্ষ্মীশ্রী দেখিলেন, তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। অন্তঃপুরের বৃহৎ উঠান। উঠানের মধ্যে অনেক ছোট বড় ধানের গোলা ও মরাই। উঠানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। থালা, ঘটী, ঘড়া, তৈজসপত্র রাশীকৃত রহিয়াছে। পুরুষেরা সকলে একত্র ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে, মাধব দত্ত কন্যাদিগকে ও পুত্রবধূকে ডাকিয়া ক্ষেত্রনাথকে প্রণাম করিতে বলিলেন। সকলেই একে একে আসিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া গেল। ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্ত মহাশয়ের আচার ব্যবহার ও আত্মীয়তা দেখিয়া তাঁহাকে পরমাত্মীয় মনে করিলেন।

আহারাদির পর, মাধব দত্ত মহাশয় ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গোলা প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। গোলা ও মরাই সমূহে প্রায় পাঁচ হাজার মণ ধান্য মৌজুৎ আছে। এই সমস্ত ধান্য তাঁহার নিজ জোতে উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার মণ ধান্য জন্মে। ভাণ্ডার-গৃহে ক্ষেত্রনাথ গিয়া দেখিলেন, তাহা চাউল, গম, কলাই, ছোলা, অড়হর, মুগ, সরিষা, গুজা প্রভৃতি শস্যে পরিপূর্ণ। এই সমস্তই মাধব দত্তের জমীতে উৎপন্ন হয়। লবণ, মসলা, ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যতীত তাঁহাকে প্রায় আর কিছুই ক্রয় করিতে হয় না। জমী হইতে শস্যাদি আনীত হইয়া যে মাড়াই ও ঝাড়াই হয় তাহার নাম খামার-বাড়ী। (নাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারও ' প্রকাণ্ড। সেই উঠানের একপার্শ্বে পর্ব্বতাকার খ' বিচালী স্তূপীকৃত রহিয়াছে। এই সমস্ত খড় কাঁচা ছাওয়া ও গবাদির আহার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তৎ' গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে দশটি দুগ্ধবতী গাভী তাহাদের বৎসগুলি বাঁধা রহিয়াছে ও জাব খাইতে ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া অ' হইলেন যে, তাঁহার গৃহে প্রত্যহ প্রায় অর্দ্ধমণ-পরি দুগ্ধ হইয়া থাকে। এই দুগ্ধ হইতে বাটীর স্ত্রীলো' সর, ছানা, মাখন, দধি ও ঘৃত প্রস্তুত করিয়া থাবে ক্ষেত্রনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, ' সময়ে কৃষাণেরা কুড়িটি লাঙ্গল ও বলদ সহ সেই গোয় বাড়ীতে প্রবেশ করিল। মাধব দত্ত বলিলেন "এই লা' গুলি দিয়ে প্রাতঃকাল থেকে আমার খাসখামার জমী হচ্ছিল।"

ক্ষেত্রনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশান্বিত ও ' সাহিত হইলেন। অপরাহ্ণ হইলে, ক্ষেত্রনাথ বল্লভপ' যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মাধব দত্ত মহাশয় তাঁ' দিগকে সেদিন তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিবার ' অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যাইবার জন্য ক্ষেত্রনা' আগ্রহ দেখিয়া আর অধিক জেদ করিলেন না। মা' দত্ত মহাশয় বলিলেন "চলুন, আমিও বল্লভপুরে গি' আপনাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসি। বল্লভপ' এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূর মাত্র। আমি স' নাগাইদ বাড়ী ফিরে আসবো।" মাধব দত্তের পরিবা' বর্গের নিকট বিদায় লইয়া মনোরমা ও ক্ষেত্রনাথ ছেলেমে' দিগকে লইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন মাধব দত্ত মহাশয়ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের নিকট যে-সকল পাহাড় আছে, ঐ-সক' পাহাড়ে স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। এ' পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলেই স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ে

ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৃষ্টির জলে পর্ব্বতগাত্র হইতে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলে, মৃত্তিকা-প্রোথিত স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাট কেহ কেহ কদাচিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলে স্বর্ণ পাওয়া যায় না। তৎপরে পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলের বালুকা ধৌত করিয়াও অনেকে স্বর্ণ-কণা সংগ্রহ করে। এই অঞ্চলে স্বর্ণের খনি আছে, এইরূপ একটী প্রবাদ বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া, স্বর্ণ উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে, কতিপয় ইংরাজ একটী কোম্পানী গঠন করেন। তাঁহারা যে উপায়ে প্রভূত লাভের আশা দিয়া জনসাধারণের মনে বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে আর বলিব না। ফলতঃ তাঁহারা লোকের মনে কুবেরের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন। জনসাধারণেও তাঁহাদের কুহকে ভুলিয়া গিয়া অত্যল্প দিনের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ার-সমূহ ক্রয় করিয়া ফেলিল। বহু লক্ষ টাকা কোম্পানীর হস্তগত হইল। সেই টাকা লইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ কার্য্যারম্ভ করিলেন। তাঁহাদের বাসের জন্য বল্লভপুরে একটী বাটী নির্ম্মিত হইল। কতিপয় মাস মহাড়ম্বরে কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু স্বর্ণ আর সংগৃহীত হইল না। স্বর্ণের খনি কোথায় যে তাহা হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হইবে? কিছুদিন পরে কোম্পানী কার্য্য তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র লোকও নিঃস্ব হইয়া পড়িল।

বল্লভপুরের সহিত কোম্পানীর এইরূপ সর্ত্ত হইয়াছিল যে, কোম্পানী যতদিন কার্য্য করিবেন, ততদিন তাঁহাদের বাটী প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকারে থাকিবে; কিন্তু কোম্পানীর কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে তাহা ভূস্বামীর দখলে আসিবে। কোম্পানী কার্য্য তুলিয়া দিলে, এই সর্ত্ত অনুসারে, কর্ম্মচারিবর্গের বাটীটি ভূস্বামীর দখলে আসিল। কিন্তু ভূস্বামীর বাস অন্যত্র থাকায়, তিনি তাহাতে বাস না করিয়া, তাহা কাছারী-বাটীতে পরিণত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ যখন বল্লভপুর ক্রয় করেন, তখন তৎসঙ্গে এই বাটীও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল।

ক্ষেত্রনাথ এই বাটীতেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া পরিবারবর্গকে বল্লভপুরে লইয়া গেলেন। বাটী দ্বিতল এবং গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত। ইংরাজগণের প্রবাসের উপযুক্ত করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইলেও, একটী বাঙ্গালী পরিবার ইহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। বাটীর চারিদিকে বিস্তর স্থান পড়িয়া ছিল; তন্মধ্যে আম্র কাঁটাল প্রভৃতি দুই চারিটি ফলবৃক্ষও রোপিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ পূর্ব্বেই বাটীর আবশ্যক-মত সংস্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরিবারবর্গ বল্লভপুরের বাটীতে উপনীত হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। মাধব দত্ত মহাশয় তাঁহাদের গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং দুই এক দিন অন্তর তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মনোরমা এবং বালকেরা তাহাদের নূতন আবাস-বাটী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে বাটী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোনও কথাই বলেন নাই। সুতরাং বাটী দেখিয়া মনোরমার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কলিকাতার আবাস-বাটী বিক্রীত হওয়াতে মনোরমার মনে যে দুঃখ হইয়াছিল, এই সুন্দর ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাটী দেখিয়া তাঁহার সে দুঃখ তিরোহিত হইল। মনোরমার দুই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল! প্রাতঃকালে গ্রামের প্রজাবর্গ তাঁহাদের নূতন ভূস্বামীর আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া দলে দলে "কাছারী-বাটীতে" উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ এক এক টাকা নজর দিয়া নবীন ভূস্বামীকে অভ্যর্থনা করিল। নগেন্দ্র পিতার পার্শ্বে বসিয়া ছিল। সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রজাবর্গও অনিমিষলোচনে বালকগুলির সুন্দর মূর্ত্তি ও পরিষ্কার বেশভূষা অবলোকন করিতেছিল। প্রজাবর্গ বিদায় লইয়া একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলে সুরেন্দ্র জননীর কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল "মা, ওরা সব বাবাকে কত টাকা দিয়ে গেল! হ্যাঁ মা, ওরা বাবাকে কেন টাকা দিলে?" মনোরমাও জানিতেন না, লোকে কেন তাঁহার স্বামীকে টাকা দিল। সুতরাং পুত্রের কথার কি উত্তর দিবেন,

স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে ক্ষুদ্র নরু হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "মা,—মা,— এই দ্যাখ আমি একটা টাকা পেয়েছি; বাবা আমাকে দিয়েছে!" এই বলিয়া সুচারু দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া, ও টাকাটী মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ করিয়া, হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষেত্রনাথ আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সহাস্যমুখে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের বল্লভপুরের প্রজারা এসে আজ আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। শুধু হাতে দেখা করার নিয়ম এদেশে নাই। তাই তারা প্রত্যেকে এক একটী টাকা নজর দিয়ে দেখা করলে। এতেই আজ প্রায় সত্তর টাকা আদায় হয়েছে। তুমি এই টাকাগুলি রেখে দাও। এই আমাদের লক্ষ্মী!" মনোরমা টাকাগুলি বাক্সের মধ্যে সযত্নে রাখিলে, ক্ষেত্রনাথ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কেমন আছ? দেশটী কেমন লাগ্‌ছে?" মনোরমা ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন "আমার বিশেষ কোনও অসুখ নাই। আর দেশটী বেশ চমৎকার বোধ হচ্ছে। চারিদিকে পাহাড়, বন। আর আমাদের বাড়ীটীও বেশ হয়েছে। বাড়ীর চারিদিকে কত ফাঁকা জায়গা। কল্‌কাতায় আমরা যেন হাঁপিয়ে মরতাম। কল্‌কাতা ছেড়ে এসেছি ব'লে আমার মনে এখন আর কোনও কষ্ট নাই। অল্পক্ষণ আগে এখানকার মেয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল! দেখছি এখানে বাঙ্গালী বামুন কায়েতও আছে। বামুনদের মেয়েগুলি দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। তবে এদেশের মেয়েদের কথাগুলি কিছু বাঁকা বাঁকা। আমি তাদের সব কথা বুঝ্‌তে পারি নাই। তাদের হাতে সব রূপার গয়না ও শাঁখা; পরণের কাপড়ও মোটা। মেয়েগুলির মনে কোনও অহঙ্কার নাই; বড় সাদাসিদে। দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছে। তা'রা বিকেল বেলায় আবার আস্‌বে বলেছে। দেখ, এখানে এসে আমার মনে বড় স্ফূর্ত্তি হচ্ছে। আমার অসুখ আপনিই সেরে যাবে। আহা, বাতাস কেমন পরিষ্কার! আমাদের ইন্দারার জলও ঠিক কলের জলের মতন।" বলিতে বলিতে মনোরমার কি মনে হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, ঐ যে জমী, পাহাড় ও জঙ্গল দে যাচ্ছে, ঐ সমস্তই কি আমাদের?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, ঐ সমস্তই আমা বটে; কিন্তু ওগুলির মধ্যে কতক প্রজাদেরকে বন্দো করা আছে, আর কতকগুলি আমাদের খাসে আ পাহাড়ের উপর যে জঙ্গল দেখ্‌ছ, তা আমাদের খা ঐ পাহাড়ের নীচে যে ধানের জমী দেখ্‌ছ ত আমাদের খাস, আর এই বাড়ীর উত্তরদিকে যে ড দেখ্‌ছ তাও আমাদের খাস। আমাদের নিজের এ একশত বিঘা ধানের জমী খাসে আছে। তা ছা ডাঙ্গা জমী অনেক আছে। কৃষাণ রেখে আমরা এইগু নিজে চাষ করবো।"

মনোরমা বলিলেন, "তা হ'লে তো আমাদিকেও ব আর লাঙ্গল রাখ্‌তে হ'বে?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "তা হ'বে বই কি? আ আজ পাঁচজোড়া বলদ ও দুইজোড়া মহিষ (মহিষকে এখা কাড়া বলে) কিনে আন্‌তে পাঠিয়েছি। প্রজারা আম অনুরোধে কতক কতক জমীতে চাষ দিয়ে রেখেছে কিন্তু তাদের নিজের জমীও তো আছে। তারা তো আ আমার সমস্ত জমী চাষ দিতে পার্‌বে না। এইজন্য আমা নিজের লাঙ্গল ও বলদ চাই। লাঙ্গল, বলদ, মহিষ দুইটী গাই কিন্‌তে প্রায় ২০০৲ টাকা খরচ হবে।"

মনোরমা বলিলেন "গরু, মোষ রাখবে কোথা?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তুমি দেখ নাই বঝি? ঐ দে পূর্ব্বধারে একটী খড়ো ঘর প্রস্তুত হয়েছে। ঐখানে এ তাদের রাখা হ'বে। আমি তোমাদের আন্‌ যাবার আগেই ঐ ঘর তৈয়ার করবার বন্দো করেছিলাম।"

মনোরমা আবার বলিলেন, "ধান হ'লে ধান রাখ কোথায়?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "তারও বন্দোবস্ত করছি। এ ধান বোনা হ'বে। কিন্তু ধান পাক্‌বে সেই অগ্রহা মাসে। তখন ধানের খামার প্রস্তুত ক'রে ফেল্‌বে এই বাড়ীটা ছিল সাহেবদের, তাদের বাড়ীর চারিদি প্রাচীর থাকে না। মাঠের মাঝে ফাঁকা যায়গায় এব

বাড়ী। আমি তাড়াতাড়ি প্রাচীর দেওয়াতে পারি নাই। বাড়ীর দক্ষিণদিক্‌টা সদর হ'বে। দক্ষিণদিকের নীচের ঘর আমাদের বৈঠকখানা ঘর হ'বে। এই উত্তরদিক্‌টি ঘিরে প্রাচীর দেব, এই দিকেই তোমার অন্দর হবে। কিন্তু এখানে ইট কিনতে পাওয়া যায় না। যার দরকার হয়, সে ইট পুড়িয়ে নেয়। কাজেই এখন প্রাচীর দিতে পার্‌ছি না। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটা শেষ হ'লে ইট তৈয়ার করিয়ে পোড়াব। তাবপর প্রাচীর দেওয়া হবে; এখন শাল গাছের রোলা* পুতে প্রাচীর দেওয়া হবে। তাও খুব শক্ত হবে। গোয়ালঘরের চারিদিকেও এই বেড়ার প্রাচীর হবে। আমাদের জঙ্গলে রোলার অভাব নাই। আমি রোলা কাট্‌তে হুকুম দিয়েছি।"

স্বামীর মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনোরমার মন প্রফুল্ল হইল। মনোরমার চক্ষে সকলই নূতন। তাঁহার মনে ক্রমশঃই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মনোরমা সকলই দেখিতে ও জানিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

আগুনের ফুলকি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের চুম্বক :—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ইটালি হইতে তাঁহারা কর্সিকা দ্বীপে যাইবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা একখানা জাহাজ ভাড়া করিলেন এবং জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে সর্ত্ত হইল যে সে সেই জাহাজে আর কোনো যাত্রী লইতে পারিবে না। জাহাজে উঠিবার কিছুক্ষণ আগে কাপ্তেন আসিয়া কর্ণেলকে জানাইল যে তাহার এক যুবক আত্মীয়কে বিশেষ জরুরি কাজে কর্সিকায় যাইতে হইবে; কর্সিকায় তাহার বাড়ী; কর্ণেল যদি অনুগ্রহ করিয়া ঐ জাহাজে যাইতে অনুমতি দেন; সে ফরাসী সৈন্যের অফিসার, হাবিলদার-বংশেই তাহার জন্ম। মিলিটারী লোক শুনিয়াই কর্ণেল রাজি; কিন্তু মিস লিডিয়া বিরক্ত হইল, সে একটা গোঁয়ার অভব্য লোকের সঙ্গে এক জাহাজে কেমন করিয়া যাইবে। তখন জাহাজের কাপ্তেন তাহার যুবক আত্মীয়টির নানাবিধ প্রশংসা করিয়া বলিল যে সে তাহাকে এমন করিয়া রাখিয়া দিবে যে কেহ তাহার টিকি দেখিতে পাইবে না। তখন লিডিয়া রাজি হইল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল একটি সুসজ্জিত সুসভ্য বহুভাষাভিজ্ঞ সুপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে; সে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে কর্ণেলকে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইল। কিন্তু সে যে পদাতিক সৈন্যের হাবিলদার এই মনে করিয়া তাঁহাদের মন তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াই রহিল।

নৌকায় উঠিয়া কথায় কথায় কর্ণেল জানিলেন যে যুবকের নাম অর্সো; সে ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে ছিল; এখন হাফ-পেন্সনে বরখাস্ত হইয়া বাড়ী যাইতেছে। সামান্য বেতনের কর্ম্মচারীর হাফ-পেন্সনে বরখাস্ত হওয়ার সংবাদে দয়াপরবশ হইয়া কর্ণেল যুবককে বকশিশ দিতে গেলেন। যুবক হাসিয়া কর্ণেলকে অপ্রস্তুত করিয়া নিজের পরিচয় দিল যে সে কর্সিকার স্বাধীন থাকা কালের রাজবংশের লোক; সে লেফটেনাণ্ট। কর্ণেল অপ্রস্তুত হইয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া তাহার মন হইতে তাহার প্রতি অবজ্ঞার গ্লানি মুছিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং যুবক মুগ্ধনেত্রে তাহার সহযাত্রিণী সুন্দরীর রূপ দেখিতে লাগিল এবং কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে কর্সিকার প্রাদেশিক ভাষার নমুনা শুনাইবার ছলে শুনাইয়া দিল যে—

যাহে জোদী পুণি জাই জোদী সগগে।
ফিরা্যা আমু এ'হানে কাবল তোরি লগো॥

এমনি করিয়া পুরুষ দুজনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু লিডিয়া বিরক্ত হইয়া অর্সোর সান্নিধ্য পরিহার করিয়া চলিতে লাগিল।]

(৩)

জ্যোৎস্না রাত্রি। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চাঁদের এক-একটি চুমা পড়িতেছে আর ঢেউগুলি হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। মৃদু বায়ুহিল্লোলে জাহাজ মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছিল। এমন রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইতে লিডিয়ার একটুও ইচ্ছা হইতেছিল না; কেবল একজন অসভ্য লোকের জ্বালায় সে আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছিল, নতুবা এমন শান্ত সমুদ্রে জ্যোৎস্নার আলোতে যার প্রাণে একবিন্দু কবিত্বরস আছে সে কি স্থির হইয়া কামরার মধ্যে বন্ধ থাকিতে পারে? অনেকক্ষণ ছটফট করার পর অবশেষে যখন মনে হইল যে এতক্ষণে সেই যুবক লেফ্‌টেনাণ্ট, নিরেট গণ্ড ধাতের লোকের যেমন ধারা, অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে উঠিয়া গায়ে একটা লম্বা জামা জড়াইয়া ঝিকে জাগাইয়া জাহাজের উপর তলায় উঠিল। কোথাও একটিও জনমানব নাই, কেবল একটা খালাসি হাল ধরিয়া বসিয়া বসিয়া এক রকম একঘেয়ে বুনো সুরে কর্সিক ভাষায় গান গাহিতেছিল। এই নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ শান্তির মধ্যে বিদেশী ভাষার এই সঙ্গীতেরও একরকম মোহিনী মাদকতা আছে। লিডিয়া গানের সব কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না; মাঝে মাঝে এক-একটা বেশ রসালো পদ তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু বেশ ভালো করিয়া অর্থবোধটি জমিবার মুখে আসিয়া এমন দু-একটা প্রাদেশিক কথায় গিয়া

---

* সরু সরু সরল শালগাছের খুঁটির নাম "রোলা" বা রলা। কোথাও কোথাও ইহাকে কোড়া বলে।

হঠাৎ বাধা পাইতেছিল যে তাহা বুঝিতে না পারাতে আগাগোড়ার সমস্ত অর্থটাই অস্পষ্ট আবছায়া হইয়া উঠিতেছিল। মোটের উপর সে বুঝিল যে এ একটা খুনোখুনির বিষয়ে গান—খুনেদের প্রতি অভিসম্পাত, প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা, মৃতব্যক্তির প্রশংসা, এই সমস্ত একত্র জটপাকানো। শুনিতে শুনিতে সেই গানের কয়েকটি পদ তাহার মুখস্থ হইয়া গেল—

আরে, বন্দুকে কোন্ দুখে করবে সে ভয় ?
সেযে বাজপাখী, গিধ্‌নাকি তার মিতে হয় !…
ওরে রাখ্ মধু চাক্-ভাঙা,— মিতেয় দিতে,
আর দুষ্‌মনে ডহরের নুন্-পানি দে !……
ওগো চাঁদ-পারা মিতে মোর,— মেজাজ-শীতল,
তবু দুষ্‌মনে সুষ্যি সে,— দণ্ডে কেবল !…
ওরে নাক-তোলা থাক্-বাঁধা থাক্ না কামান,
রণে ধীর বীর মিতে,— নির্ভয়-প্রাণ।…
যার চোখে চোখ্ চোখাইতে করে লোক ভয়
"পিঠে তার গুলি মার্" শয়তানে কয় !…
তাই তুষ ঢাকা দুষ্‌মনও বুক বেঁধেছে,
দূর থেকে বাহাদুর তীর বিঁধেছে !…

* * * * * *

মোর রক্তেতে রাঙা এই উর্দ্দিটি নাও,
মোর বিছানার পাশে ওই দেয়ালে টানাও।…
ওগো আর নাও এই ক্রুশ, কষ্টে পাওয়া,—
শিরোপা এ গরবের,— রাজার দেওয়া।…
ওগো দূর দেশে ছেলে মোর প্রবাসে আছে,
ফির্‌লে সে দিয়ো দুই তাহারি কাছে।…
ব'লো "উর্দ্দিতে দুই ফুটো, দেখ্‌রে বুঝে,—
দুই ফুটো করা চাই উর্দ্দি খুঁজে।…
ব'লো তার আঁখি মোর হ'য়ে ওৎ পাতিবে,
তার বাহু মোর হ'য়ে তীর গাঁথিবে।…
ব'লো "তার হিয়া মোর হ'য়ে ভুঞ্জিবে জয়,
ঋণ শোধ— প্রতিশোধ চাহিবে নিশ্চয় !"

খালাসি হঠাৎ থামিয়া গেল।

লিডিয়া জিজ্ঞাসা করিল—থামলে কেন মাঝি ? গাও না।

খালাসি মাথার ইসারায় তাহাকে দেখাইল জাহাজের খোল হইতে একজন কে বাহির হইতেছে। সে অর্সো, চাঁদের আলোয় একটু বেড়াইতে আসিতেছে।

লিডিয়া তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া খালাসিকে বলিল—মাঝি, তোমার গানটা তুমি শেষ করে ফেল, আমার বড় ভালো লাগছিল।

খালাসি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া চুপি চুপি বলিল এসব 'খুনের চাপান' আমি কারু সামনে গাইনে।

—কেন ? এখনি ত…… ?

খালাসি কোনো জবাব না দিয়া অন্যমনস্ক ভাবে দিতে দিতে হালের চাকায় ঘন ঘন পাক দিতে লাগিল।

অর্সো লিডিয়ার নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল এই যে মিস নেভিল, আপনি ধরা পড়ে গেছেন ! আমাদের ভূমধ্যসাগর নাকি আপনার ভালো লাগে না ! এমন চাঁদের আলো আর কোনো সমুদ্রে পাবেন না, সেটি আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

—আমি আপনার ভূমধ্যসাগর দেখতে আসিনি, আমি কর্সিক ভাষার আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম; এই মাঝি একটি ভারি করুণ গান গাইছিল; বেশ জমে এসেছে এমন সময় হঠাৎ থেমে গেছে।

খালাসি যেন ভালো করিয়া দেখিবার জন্য কম্পাসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, আর লিডিয়ার জামা ধরিয়া জোরে এক টান দিল। লিডিয়া বুঝিল যে সেটা এমন একটা গান যাহা অর্সোর সম্মুখে গাহিতে খালাসি রাজি নয়।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—কি গাচ্ছিলে খালাসি ? মোটের গান ? শ্রীমতী তোমার গান বুঝতে পেরেছেন, শেষটা শুনতে চাচ্ছেন।

—আমি ভুলে গেছি, হুজুর।

লিডিয়া গান শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না; সে ইহার রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। কিন্তু লিডিয়ার ঝি, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া অর্সোকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মশায়, খুনের চাপান মানে কি ?

লিডিয়া তাহাকে কণুইয়ের গুঁতা দিয়া বারণ করিল, কিন্তু তখন প্রশ্ন শেষ হইয়া গেছে।

—খুনের চাপান! কোনো কর্সিকের কেউ যদি বিশেষ রকম অপকার করে, আর সে যদি তার প্রতিহিংসা না নেয়, তবে তাকে যে নিন্দা তিরস্কার করা হয় তাকে বলে 'খুনের চাপান'। তোমাকে খুনের চাপানের কথা কে বল্লে?

মিস লিডিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল কালকে মার্সেঈয়ে জাহাজের কাপ্তেন ঐকথাটা কথায় কথায় বলেছিলেন।

অর্সো উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কার সম্বন্ধে বলছিল?

—ও, সে অনেক কালের পুরোণো একটা গল্প তিনি আমাদের কাছে বলছিলেন...সেই যে কি ভালো ওর নাম··· সাম্পিরো কর্সোর গল্প ··· কর্সিকার রাখালের ছেলে তিনি, ক্রমে ক্রমে সেনাপতি হয়েছিলেন; জেনোয়া-বাসীদের কবল থেকে নিজের দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে তিনি প্রাণপণ করে উঠে পড়ে লেগেছিলেন; একদিন তাঁর সন্দেহ হল যে তাঁর নিজের স্ত্রী তাঁর দেশের স্বাধীনতা-লাভের ষড়যন্ত্র শত্রুপক্ষের কাছে প্রকাশ করে সব আয়োজন পণ্ড করে দেবার জোগাড় কচ্ছেন; সেদিন তিনি নিজের হাতে নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে বধ করেছিলেন; এই স্বদেশপ্রেমিক পুরুষসিংহকে জেনোয়ার রাজশক্তি এঁটে উঠতে না পেরে শেষে তাঁর খানসামাকে ঘুস দিয়ে বশ করে; সেই খানসামার বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

—ও! সাম্পিরোর গল্প? আমাদের বীরটিকে আপনার কেমন লাগে?

—তাঁর স্ত্রীকে বধ করাটা কি আপনার খুব বীরপণা বলে মনে হয়?

—দেশ কাল বিবেচনা করে তাঁকে বিচার করবেন। তাঁর দোষের জন্যে সেদেশের সেকেলে বুনো রকমের রীতিনীতিই কতকটা দায়ী। আরো তখন জেনোয়ার সঙ্গে তাঁর মরণপণ বিবাদ চলেছে; যে তাঁদের সমস্ত আয়োজন শত্রুর কাছে প্রকাশ করে দিয়ে পণ্ড করতে প্রস্তুত, তাকে যদি তিনি তখন শাস্তি না দেন তবে তাঁর ওপরে তাঁর সঙ্গীদের বিশ্বাস থাকে কেমন করে?

খালাসি বলিয়া উঠিল—সাম্পিরো বেশ করেছিল গলা টিপে মেরেছিল। শত্রুকে মারবে না!

লিডিয়া বলিল—কিন্তু সে যে তার স্বামীর ভালো বাসার জন্যেই অমন করতে যাচ্ছিল; সে ত তার স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই জেনোয়া সরকারের দয়া ভিক্ষা করতে যাচ্ছিল।

অর্সো বলিয়া উঠিল—সে কি তাকে বাঁচানো, না তাকে হতমান করা!

লিডিয়া বলিল—তা যাই বলুন, কিন্তু নিজের হাতে নিজের স্ত্রীর গলা টিপে মারা! কি ভয়ানক পৈশাচিক দানবীয় কাণ্ড!

—আপনি হয়ত জানেন না যে সে প্রার্থনাই করেছিল যে তার মৃত্যু যেন তার স্বামীর হাতেই হয়। আপনাদের ওথেলো, তাকে কি আপনি এই রকম দানব মনে করেন?

—দুজনের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সে বেচারা সন্দেহে অন্ধ; আর সাম্পিরোর শুধু অহংকারের তৃপ্তি!

—সন্দেহ আর অহংকার কি খুব তফাৎ? সন্দেহ প্রেমের অহংকার! আপনি অবশ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা করে বিচার করবেন।

লিডিয়া সম্ভ্রম-সন্তোষভরা দৃষ্টিতে যুবকের দিকে একবার চাহিয়া, মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল,—জাহাজ কখন বন্দরে ভিড়বে?

—আজ্ঞে পরশু, যদি এমনি বাতাস চলে।

—আঃ, কবে যে ডাঙায় নাবব, জাহাজে আর ভালো লাগে না।

লিডিয়া উঠিয়া ঝিয়ের হাত ধরিয়া জাহাজের ডেকের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। অর্সো হালের কাছেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল তাহারও ঐ সঙ্গে পায়চারি করা উচিত, না যে আলাপ তাহার মোটেই প্রীতিকর নয় তাহা হইতে তাহার দূরে থাকাই সঙ্গত।

খালাসি লিডিয়ার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—খোদার কসম, পরীর মতন খাপসুরৎ!

লিডিয়া তাহার রূপের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয়

শুনিতে পাইয়াছিল, কারণ সে তৎক্ষণাৎই নিজের কামরায় নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অর্সোও চলিয়া গেল। অর্সো যেই চলিয়া গেল অমনি ঝি উপরে উঠিয়া আসিয়া খালাসিকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া খুনের চাপানের সমস্ত রহস্য-ব্যাপার জানিয়া গিয়া মিস লিডিয়াকে জানাইল—অর্সোর আগমনে যে গান থামিয়া গেল সে গানটি অর্সোরই পিতা দে-লা-রেবিয়ার মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে কে খুন করিয়াছে। অর্সো নিশ্চয়ই সেই খুনের প্রতিশোধ লইবার জন্যই দেশে ফিরিতেছে এবং পিয়েত্রানরা গ্রামে অল্প দিনেই রক্তের পিচকারিতে হোলি খেলা সুরু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দু তিন জন লোককে অর্সো সন্দেহ করে যে তাহারাই তাহার পিতাকে খুন করিয়াছে; তাহাদের নামে নালিশ করাও হইয়াছিল, কিন্তু বিচারে তাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস পাইয়াছে; শোনা যায় যে জজ, উকিল, পুলিশ সবই তাহাদের হাতধরা ছিল, এমন কি হাতের মুঠোর ভিতর; অর্সো নিশ্চয় সেই দুইতিনজনকে নিজের হাতে শাস্তি বিধান করিতেই বাড়ী চলিয়াছে। কর্সিকায় বিদেশী রাজার আদালতে নালিশ করিয়া বিচার পাওয়া যায়ই না; সেখানে আদালতে কৌঁসলী দেওয়ার চেয়ে ভালো বন্দুক থাকিলে বরং ন্যায়বিচার পাওয়া যায়। শত্রু যদি থাকে, তবে সে দেশে তিন 'ব' ছাড়া চার উপায় নেই—বন্দুক, বর্শা, আর বন।

এই সমস্ত কৌতূহলজনক সংবাদ শুনিয়া অর্সোর সম্বন্ধে লিডিয়ার ধারণা ও তাহার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ইতি-কর্ত্তব্যতা অনেকটা নূতন রকমে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এই মুহূর্ত্ত হইতে সেই রসভাবিনী ইংরেজ রমণীটির নিকটে অর্সো একজন লোকের মতো লোক হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সকল বিষয়ে অগ্রাহ্যের ভাব, তাহার সেই খোস মেজাজ, তাহার মনখোলা কথাবার্ত্তা, যা এতক্ষণ তাহার দোষ বলিয়াই মনে হইতেছিল, এক্ষণে তাহার বিশেষ গুণ বলিয়াই মনে হইতে লাগিল; অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের ন্যায় তাহার অন্তরের সকল উষ্মা সকল তেজ বাহিরের হরিৎ শোভায় আবৃত—মন্ত্রগুপ্তির জন্য এই রকমই ত চাই! অর্সো যেন জেনোয়ার স্বাধীনতা লাভের ষড়যন্ত্রকারী কাউণ্ট ফিয়েস্কোর অবতার, বিরাট ষড়যন্ত্র আনন্দ-চপল আবরণে ঢা[কা]। স্ত্রীলোকেরা বীর পুরুষ অপেক্ষা বোধহয় উপন্যাসের ন[ায়ক] ধরণের পুরুষদেরই বেশি পছন্দ করে ও ভালো বা[সে]। সেইদিন লিডিয়া লক্ষ্য করিল যে সেই যুবক লেফটেনা[ন্টের] চোখ দুটি দিব্য বড় আর টানা, দাঁতগুলি মুক্তার ম[তো] উজ্জ্বল, আকারটি উন্নত, লেখাপড়া বোধের সঙ্গে স[ঙ্গে] সংসারের অভিজ্ঞতাও বেশ আছে। সে পরদিন বার [বার] তাহার সহিত যাচিয়া আলাপ করিল, এবং তাহার কথাব[ার্ত্তা] তাহার খুব ভালোই লাগিতেছিল। লিডিয়া অনেক[ক্ষণ] ধরিয়া তাহাকে তাহার দেশের কথাই জিজ্ঞাসা কর[িতে] লাগিল, এবং সেও বেশ গুছাইয়াই উত্তর করিতেছি[ল]। অর্সো অতি বাল্যে দেশ ছাড়িয়া প্রথমে কলেজে, প[রে] সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বদে[শের] চিত্র তাহার অন্তরে কবিত্বের বিচিত্র বর্ণেই চিত্রিত হ[ইয়া] আছে। তাহার দেশের পাহাড় পর্ব্বত, জলা জঙ্গল, লো[ক]জন, রীতিনীতির কথা বলিতে বলিতে সে দীপ্ত উচ্ছ্ব[সিত] হইয়া উঠিতেছিল, এবং তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে খু[ন] প্রতিহিংসার উল্লেখ অনেকবারই তাহাকে করিতে হই[য়া]ছিল। কর্সিকার কথা বলিতে গেলে কর্সিকার লোকে[র] ধাতুগত অনুষ্ঠান প্রতিহিংসার কথা না বলিলে চলে [না]; তা হয় তার বিরুদ্ধেই বল, না হয় তার সমর্থনই ক[র]। অর্সো তাহার জাতভাইদের এই প্রকারের অফুরন্ত হিং[সা]দ্বেষ খুনোখুনির ব্যাপারটাকে সাধারণভাবেই নি[ন্দা] করিতেছিল দেখিয়া লিডিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল[।] আবার, প্রতিহিংসা লওয়াটা গরিবের ন্যায়ের দা[য়] বই আর কিছু না, বলিয়া সে উহা সমর্থন করিবারও চে[ষ্টা] করিতেছিল। সে বলিতেছিল—বাস্তবিক তারা ন্যায় চায়—অন্যায় করার আগে তারা আত্মহত্যা করতে প্রস্তত। দুজন শত্রু পরস্পরকে হত্যা করতে প্রবৃ[ত্ত] হবার পূর্ব্বে যেন তারা পরস্পরকে বলে নেয় "তুমি সাবধান, আমিও সাবধান।" সকল দেশের চে[য়ে] আমাদের দেশে খুনোখুনি বেশি হয় বটে, কিন্তু সম[স্ত] খুনের মধ্যে একটি খুনেও নীচতা বা অন্যায়ের পরিচ[য়] পাওয়া যায় না; আমাদের দেশে খুনী আছে অনেক, কি[ন্তু] চোর নেই একটিও।

যখনি সে প্রতিহিংসা আর খুনের কথা বলিতেছিল তখনই লিডিয়া তাহাকে খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে উত্তেজনার লেশটুকুও ধরিতে পারিতেছিল না। অর্সোর সমস্ত ইতিহাস জানিয়া শুনিয়া লিডিয়া ঠিক করিয়া বসিয়াছিল যে অর্সোর মনের জোর যতই থাকুক আর স্বভাব যতই কেন চাপা হোক না, বিশ্বের চোখে ধূলা দিলেও সে তাহাকে ফাঁকি দিয়া ঠকাইতে কিছুতেই পারিবে না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে কর্ণেল দে-লা-রেবিয়ার তৃষিত আত্মা যে তর্পণের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তাহা পাইতে তাহার আর বেশি বিলম্ব নাই।

কর্সিকার উপকূল দেখা দিয়াছে। কাপ্তেন বিশেষ বিশেষ স্থানগুলির পরিচয় দিতে দিতে যাইতেছিল। সে-দেশের সমস্তই লিডিয়ার কাছে নূতন, সুতরাং নূতনের পরিচয়ে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। কর্ণেল নেভিলের দূরদৃষ্টি দেখিতে পাইল যে একজন দ্বীপ্রবাসী খাকি পোষাক পরিয়া, লম্বা বন্দুক লইয়া, একটা ছোট টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া ছাড়তকে ছুটিয়া চলিয়াছে। লিডিয়া যাহাকে দেখে তাহাকেই মনে করে লোকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ খুনে, পিতার খুনের শোধ লইতে চলিয়াছে; কিন্তু অর্সো তাহাকে আশ্বাস দিতেছিল যে, সে কোনো নিরীহ চাষা, আপনার বেসাত করিতে হাটে বাজারে যাইতেছে; বাবুরা যেমন ছড়ি ছাড়া চলে না, বন্দুক লইয়া যাওয়াটা শুধু তেমনি সে দেশের সখ বা রীতি মাত্র। তখন লিডিয়ার মনে হইল, যদিও বন্দুকটা তরবারির তুলনায় বিশ্রী ও কবিত্বহীন অস্ত্র, তবু পুরুষের হাতে লাঠির অপেক্ষা বন্দুকটাই সাজে ভালো, এবং এমন কি লর্ড বাইরনের সমস্ত নায়কই গুলির আঘাতে মরিয়াছে, কেহই সেকেলে তরবারির ধার ধারে নাই।

তিন দিন পাড়ির পর আজাকসিয়োর উপসাগরের মনোরম দৃশ্য দেখা গেল; আজাকসিয়োর চারিদিকে শুধু জঙ্গল, আর তাহার পশ্চাতে পর্ব্বতের ধূসর ঢেউ; না আছে একখানি গ্রাম, না আছে একখানি কুটির; কেবল এখানে সেখানে, শহরের পাশে পাশে টিলার উপর সবুজের মধ্যে শাদা শাদা গোরস্তম্ভগুলি নজরে পড়ে। সমস্ত দৃশ্যটা কেমন একটা গম্ভীর বিষণ্ণ রকমের।

শহরের দৃশ্যটিও তাহার চতুঃসীমার দৃশ্যেরই অনুকূল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল নাই, সোর গোল নাই; মাঝে মাঝে চাষাগুলি পাখীর মতন নিঃশব্দে তাহাদের বেসাত বেচিতে চলিয়াছে; কোথাও একটি স্ত্রীলোক নাই। এখানকার নাগরিকেরা হাসে না, গাহে না, গলা খুলিয়া কথা কহে না। স্থানে স্থানে পথের ধারের গাছের ছায়ায় বসিয়া দশ বারো জন চাষা তাস খেলিতেছে; তাহারা চেঁচামেচি করিতেছে না, ঝগড়াঝাটি করিতেছে না; যখন খেলাটা খুব জমিয়া উঠিতেছে তখনই পিস্তলের আওয়াজে সেটা ঘোষণা হইয়া যাইতেছে, নতুবা সব চুপচাপ। কর্সিকেরা স্বভাবত গম্ভীর আর স্বল্পভাষী; সন্ধ্যার সময় পথে পথে অনেক লোক হাওয়া খাইতে বাহির হয় বটে, কিন্তু সবাই যেন সবার অপরিচিত, কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী। দেশের বাসিন্দারা তাহাদের দরজার সম্মুখে বসিয়া বসিয়া বাসা হইতে বাজপাখীর মতো চারিদিকে তীক্ষ্ণ সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানিতে থাকে।

(৪)

নেপোলিয়নের জন্মস্থান প্রভৃতি দেখিয়া কর্সিকায় দুই দিন কাটিল। তার পরেই লিডিয়াকে কেমন একটা বিষণ্ণতা ঘেরিয়া ধরিতে লাগিল। অজানা দেশে অসামাজিক লোকের মধ্যে অল্প দিনেই কেমন নিজেকে নিঃসঙ্গ একাকী বলিয়া মনে হয়। সে যে এখানে আসিতে স্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়াছিল তাহার জন্য এখন তাহার অনুতাপ বোধ হইতেছিল; কিন্তু আসিয়াই চলিয়া গেলে তাহার পাকা পর্য্যটকের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে তাহাকে চাপিয়া যাইতে হইল। যেমন করিয়া হোক সময়ত কাটাইতে হইবে। রং তুলি লইয়া সে দৃশ্যপটে নক্সা করিতে লাগিয়া গেল; পাকা-দাড়ি-ওয়ালা রোদপাকা উগ্রমূর্ত্তি তরমুজ-ওয়ালা এক চাষার নক্সা আঁকিল। কিন্তু এই-সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ ও আনন্দ না পাইয়া সে শেষকালে যুবক হাবিলদারের দিকেই মন দিল, এবং অপর পক্ষকেও বিশেষ দুর্লভ বলিয়া মনে হইল না—আর্সো বাড়ী যাইবার নামটি পর্য্যন্ত করে না, আজাকসিয়ো শহর যেন তাহার বড়ই ভালো লাগিয়া গিয়াছে, অথচ একদিনও তাহাকে শহরে বাহির হইতে দেখা যায় না।

অধিকন্তু শ্রীমতী লিডিয়া হাতে একটা গুরু কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছে—সে এই বন্য বর্ব্বরটিকে সভ্য করিবে, যে-হত্যাসঙ্কল্প লইয়া সে দেশে চলিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। এমন তরুণ সুপুরুষকে বিনাশের পথে ছুটিয়া চলিতে দেখিয়া সে কোনপ্রাণে উদাসীন থাকিবে? অধিকন্তু একজন কর্সিককে সভ্য করিতে পারায় গৌরবও ত আছে!

আমাদের পর্য্যটকদের দিনগুলি অমনি একরকমে কাটিতেছে।—সকালে উঠিয়া কর্ণেল আর অর্সো শিকার করিতে যান, লিডিয়া ছবি আঁকে বা তার বন্ধু বান্ধবদের কর্সিকার ঠিকানা দিয়া চিঠি লেখে; সন্ধ্যাবেলা পুরুষ দুজন শিকার বহিয়া লইয়া বাড়ী ফিরে, তারপর আহার হয়। আহারান্তে লিডিয়া গান করে, কর্ণেল ঝিমন, আর তরুণ-তরুণী দুইজনে অনেক রাত পর্য্যন্ত পরস্পরের কানে মৃদুগুঞ্জন করে।

বৃদ্ধের নিদ্রা ও তরুণ-তরুণীর আলাপে ব্যাঘাত ঘটাইয়া, একদিন কোথা হইতে কেমন করিয়া খবর পাইয়া শহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ণেলের সহিত দেখা করিতে আসিয়া উপস্থিত। দেশে একজন ইংরেজ আসিয়াছে, সে একে ধনী তায় সুন্দরী কন্যার পিতা, তাঁহার সহিত শহরের কর্ত্তার দেখা করা ত কর্ত্তব্য। অনেকক্ষণ বকিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়া তবে তিনি বিদায় হইলেন। কয়েকদিন পরে ভদ্রতার খাতিরে কর্ণেলও ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পাল্টা সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। কর্ণেল সদ্য খানার টেবিল হইতে উঠিয়া আসিয়া সোফার উপর আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া একটু ঘুমের জোগাড় করিতেছেন; একটা ভাঙা পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহার কন্যা গান ধরিয়াছে; এবং অর্সো গায়িকার পাশে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বর-লিপির পাতা উল্টাইয়া দিতে দিতে তরুণী গায়িকার অনাবৃত শুভ্র স্কন্ধ আর দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি বুলাইতেছে। এমন সময় খবর আসিল ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন। পিয়ানো থামিয়া গেল, তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল, অর্সো সরিয়া দাঁড়াইল; কর্ণেল চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কন্যার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিচয় করিয়া দিলেন।

—ম্যসিয় দে-লা-রেবিয়ার পরিচয় আপনাকে আ দিতে হবে না, আপনি ত ওঁকে চেনেনই।

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে ইনিই কর্ণেল দে-লা-রেবিয়ার ছেলে?

অর্সো উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

কথাবার্ত্তার বাঁধিগৎ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। ক ঘন ঘন হাই তুলিতে লাগিলেন; অর্সো গুম হইয়া ব রহিল; একা বেচারা লিডিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত চালাইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গল্প থামিতে দিতেছিল য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ সমাজের সকল নামজাদা লোকের স অভিজ্ঞ একজন তরুণীর সহিত পারী প্রভৃতি শহ বড় বড় মজলিসের গল্প করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আগ্র উৎসাহের বিশেষ জোর দেখা যাইতেছিল। গল্প ক করিতে তিনি মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকমের কৌতূহলী দৃ অর্সোকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি লিডিয়াকে জিজ্ঞ করিলেন—ম্যসিয় দে-লা-রেবিয়ার সঙ্গে আপনা আলাপ বুঝি ফ্রান্সেই হয়েছে?

লিডিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল যে তাহার স আলাপ সবে এই কর্সিকায় আসিবার জাহাজে।

ম্যাজিষ্ট্রেট গলা নামাইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, অতিশয় যুবা, যেমন হতে হয়।—তারপর আরো গলা নামা বলিলেন—উনি কী উদ্দেশ্যে দেশে এসেছেন তা কি আ নাকে কিছু বলেছেন?

লিডিয়া তাহার রাজরাণীর মতো দৃপ্ত ভাব ফুটাইয়া বলিল—আমি তা জিজ্ঞাসা করিনি, দরক থাকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট চুপ করিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে অর্সো কর্ণেলের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলিতে শুনিয়া তি বলিলেন—আপনি দেখছি অনেক দেশ বেড়িয়েছে আপনি হয়ত কর্সিকার সব ভুলে গেছেন……এদে রীতিনীতি কিছু মনে আছে?

—হ্যাঁ, আমি খুব ছেলেবেলাই দেশ ছেড়ে বিদে গেছি।

—আপনি সৈনিক বিভাগেই কাজ করেন?

—আমার পেন্সন হয়ে গেছে।

—আপনি তাহলে অনেক দিন ফরাশী সৈনিক বিভাগে কাজ করেছেন, ··· আপনি তা হলে একেবারে ফরাশী বনে' গেছেন নিশ্চয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট এই শেষের কথাগুলি বেশ স্পষ্ট জোর দিয়া বলিলেন।

বিজেতা জাতির সামিল হইয়া নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়াছে বলিলে কোনো কর্সিক লোকই সেটাকে প্রশংসা বলিয়া মনে করে না। তারা চায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে, এবং পরাধীন জাতি যতদূর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে ততদূর সেই রকমেই চলে। অর্সো একটু রুষ্ট হইয়া বলিল—আজ্ঞে আপনি কি মনে করেন যে ফরাশী সরকারে গোলামী না করলে কোনো কর্সিক মানুষ বলে গণ্য হতে পারে না ?

—না না, আমি ত তা বলতে চাইনি; আমি শুধু এদেশের এমন কোনো কোনো রীতিনীতির কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম, যেগুলো একজন শাসনকর্ত্তার চোখে পড়া উচিত নয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট রীতিনীতি শব্দটায় একটু জোর দিয়া বলিলেন, এবং যতদূর সম্ভব খুব ভারিকৃথী ভাব ধারণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক হইল লিডিয়া একদিন তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিয়া গেলে লিডিয়া বলিল—কর্সিকায় এসে একটা জিনিস নতুন দেখা গেল—ম্যাজিষ্ট্রেট! জীবটা মন্দ নয়।

অর্সো বলিল—আমার কিন্তু ঠিক উল্টো মত। ওর ঐ ভারিকৃথী চালচলন আর হেঁয়ালি ধরণের কথাবার্ত্তা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না।

কর্ণেল তখন ঝিমনো অবস্থাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। লিডিয়া তাঁহার দিকে একবার তাকাইয়া স্বর নামাইয়া বলিল—আপনি যতটা ওকে হেঁয়ালি মনে করছেন, আমার কিন্তু মনে হয় ততটা নয়, কিছু কিছু বোঝা যায় বৈ কি!

—মিস নেভিল, আপনি একটু বেশি চালাক দেখছি; আপনি যদি ওর কথায় কোনো অর্থ পেয়ে থাকেন তবে সে শুধু আপনিই তাতে নিজের মনগড়া অর্থ যোগ করেছেন বলে'।

—আপনি কি আমার বোধশক্তির প্রমাণ চান? আমি একটু আধটু গুনতে জানি; যে লোককে আমি দুবার দেখি তার মনের কথা আমি গুনে বলতে পারি।

—বলেন কি? আপনি যে আমায় ভয় লাগিয়ে দিচ্ছেন! যদি আপনি আমার মনের কথা টের পেয়ে থাকেন তবে আমি খুসি হব কি ক্ষুণ্ণ হব ঠিক করতে পারছি না।

লিডিয়া লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—আমাদের আলাপ এই অল্প দিনের। কিন্তু সমুদ্রে আর বর্ব্বর দেশে, আপনি ক্ষমা করবেন, লোকের সঙ্গে চট করেই বন্ধুত্ব হয়। যা নিয়ে কোনো অপরিচিতের আলোচনা করা অন্যায় এমন কোনো গূঢ় কথা যদি আমি আপনাকে বন্ধু ভেবে বলি, তা হলে আপনি অপরিচিতের ধৃষ্টতা দেখে রাগ করবেন না।

—অমন কথা মুখে আনবেন না, মিস নেভিল; অপরিচিতের চেয়ে বন্ধু শব্দটাই বিশেষ সুশ্রাব্য।

—আমি চেষ্টা না করেই আপনার গোপন কথা কিছু কিছু জানতে পেরেছি, আর তার জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনার পরিবারে কি দুর্ঘটনা ঘটেছে তাও আমি জেনেছি। আপনাদের দেশের লোকের প্রতিহিংসা নেওয়ার স্বভাব আর ধরণের সম্বন্ধেও অনেক গল্প শুনেছি। ······ম্যাজিষ্ট্রেট কি এই সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করছিল না?

অর্সো মড়ার মতো বিবর্ণ হইয়া বলিল—মিস লিডিয়া তা ভাবতে পারেন!

—আজ্ঞে না, আমি জানি যে আপনি ভদ্রলোক, নীচ প্রতিহিংসার অতীত। কিন্তু আপনিই বলেছেন যে আপনার দেশের লোকেরা প্রতিহিংসা নেওয়াটাকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ বলে মনে করে······

—আপনি কি তবে মনে করেন যে আমি খুন করতেও পারি?

লিডিয়া তাহার দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—আমি যখন আপনাকে একথা খুলে বলেছি, তখনই আপনার বোঝা

উচিত ছিল যে সে সন্দেহ আমার নেই। এই সমস্ত বর্ব্বর প্রথার মধ্যে থেকেও সেই বর্ব্বরতা বাঁচিয়ে চলার যে সাহস ও মনের জোর দরকার তার জন্যে অন্তত একজন আপনাকে শ্রদ্ধা করে, একথা আপনি দেশে ফিরে গেলে বুঝতে পারবেন।

তারপর লিডিয়া মাথা তুলিয়া বলিল যাক সে কথা, ওসব আলোচনা থাক ; মনে হলে প্রাণ কেঁপে ওঠে। রাতও হয়েছে ঢের। আসুন আমরা ইংরেজি ধরণে রাতের মতো বিদায় নি……

লিডিয়া তাহার হাতখানি অগ্রসর করিয়া ধরিল।

অর্সো গম্ভীরভাবে হাতখানি নিজের হাতে ধরিয়া বলিল—কখনো কখনো আমার জাতীয় প্রকৃতি আমার মনের মধ্যে ফণা তুলে ওঠে … যখন বাবার কথা মনে পড়ে তখন ঐ ভয়ঙ্কর ভাবটা আমায় যেন পেয়ে বসে। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমাকে মুক্তি দিলেন।

অর্সো লিডিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হইতেছিল। লিডিয়া তাড়াতাড়ি একখানা চামচে লইয়া ফেলিয়া দিল, সেই শব্দে কর্ণেলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

— দে-লা-রেবিয়া, কাল পাঁচটার সময় শিকারে যেতে হবে, ঠিক থেকো।

— যে আজ্ঞে কর্ণেল। (ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্য

সুপ্রসিদ্ধ হুতম পেচা তাঁহার চিরস্মরণীয় "নক্‌সা" গ্রন্থের ভূমিকায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা ভাষাটিকে বে-ওয়ারিস মাল মনে করিয়া, বে-ওয়ারিস লুচির ময়দা বা তৈরি কাদার মত উহা লইয়া যে-কোন নিষ্কর্ম্মা আপনার খেয়ালের অনুরূপ যাহা-কিছু গড়িয়া খেলা করিয়া থাকেন। সে দিনের পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এখনও বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহারে যথেচ্ছাচার ছাড়া কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আমরা স্বাধীনতার নামে অনেক স্থলেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দিতেছি ; একটা সুস সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে কুণ্ঠিত হইতে মতের স্বাধীনতা এবং ভিন্নতা দেখিলে মনে হইতে পারে অনেকেই যখন ভাষার উন্নতির জন্য চিন্তা করিতে তখন শুভ ফল ফলিবে। কিন্তু অন্য দিকে যদি দেখি পাই যে কেহই কাহার কথা শুনিতে চাহেন না, সকলেই আপনার দাম্ভিকতায় নিজের পথেই চলিয়া তখন ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। পদ্ধতিতে শব্দগুলিতে স্বরব্যঞ্জনের সংযোগ করা হয়, ত জটিল পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, কেহ নিজের খেয় একেবারে "যুক্ত" লিখিতে গিয়া "য-উ-ক-ত-অ" লিখি পারেন না। তিনি দশ জনের কাছে তাঁহার নূতন প্র উপস্থাপিত করিতে পারেন ; কিন্তু দশ জনে ঐ প্রথা গ না করিলেও জেদ করিয়া ঐরূপভাবে শব্দে স্বরব্যঞ্জন সং করিয়া লিখিতে পারেন না। যে ইউরোপে স্বাধীনতা অত আদৃত, সেখানেও কোন অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নি এইরূপ নূতনত্ব সাহিত্যে চালাইতে পারেন না ; কে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন মাত্র। যথেষ্ট সুবিধাজ মনে করিলেও, ইংলণ্ডের সুতন্ত্রিত ভাষায় পরিচালিত কে পত্রিকায় সহজ রকমের নূতন বর্ণবিন্যাসে কেহ কাহা প্রবন্ধ ছাপাইতে পারেন না ; তবে সুপণ্ডিতের নূতন সুবিধার কথা লইয়া সর্ব্বত্রই বিচার হইবার সম্ভাবন বিচারের পর ঐ প্রথা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে প্রবর্ত্তিত প্রথা মানিয়া চলিতে হয়।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সকলেই কু সকলেই দাম্ভিক, এবং সকলেই পরকে উপেক্ষা করি চলিয়া সুখী হই। যিনি আমাদের ভাষাবিজ্ঞান এ ব্যাকরণ সম্বন্ধে অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যশ হইয়াছেন, সেই যোগেশচন্দ্র রায়কেও এই দোষে দো দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। যে-সকল মূর্খ চটকদার লেখকে কেবলমাত্র "নূতন কিছু" করিয়া নাম জাহির করিতে চা আমরা তাহাদের নূতন রকমের বাণান উপহাস করি উড়াইয়া দিতে পারি, এবং দিয়াও থাকি। যোগেশ ব ভাষাতত্ত্ববিৎ ; তিনি বাণানে এবং শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি কিছুমাত্র নূতনত্ব সৃষ্টি করেন নাই,—কারণ তিনি প্রচলি

এবং সিদ্ধ রীতির যুক্তিযুক্ততার তত্ত্ব অবগত আছেন। তাঁহার পরিবর্তন ঠিক্ ভাষা সম্বন্ধে না হইলেও, তাঁহার মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যে-প্রথা জিদ্ করিয়া অবলম্বন করা উচিত নহে, তাহার কথাই বলিলাম। আমাদের অসংযত এবং অনিয়ন্ত্রিত সমাজে দাম্ভিকেরা যেরূপ একগুঁয়ে ব্যবহার করিয়া থাকে, যোগেশ বাবুর নিকট সে ব্যবহারের আশা করিতে পারি না।

বাঙ্গলা ভাষার বাণান এবং শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতিতে যে-সকল যথেচ্ছাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উৎপত্তির অনেক কারণ আছে। যাঁহারা ভাষাশিক্ষা না করিয়া বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থকার হইয়া উঠেন, তাঁহাদের ত্রুটির কারণ বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে না। স্বয়ং কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে, কুম্ভীরশাবকের সন্তরণকৌশলের মত বিদ্যা জিনিসটা বাঙ্গালীর জন্মমাত্রেই লব্ধ হইয়া থাকে। কাজেই কাহাকেও কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। এক শ্রেণীর দাম্ভিক লেখকেরা মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় কিছু লিখিতেছি, ইহাই দেশের এবং ভাষার সৌভাগ্য; কাজেই আমরা যাহা কিছু লিখি, তাহাই সকলকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গলা ভাষার একটা সুপ্রাচীন ধারাবাহিকতা নাই; সুনির্দ্দিষ্ট সুসংবদ্ধ নিয়ম নাই; কাজেই এই অনিয়ন্ত্রিত "শিশু" ভাষাকে যেমন করিয়া খুসি, মারিয়া পিটিয়া উঁচু দিকে বাড়াইয়া তোলা চলে। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুরচিত "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" গ্রন্থের গোড়ায় এই কথাটি বুঝাইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষা ঠিক্ মহাত্মা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রথম ব্রাহ্ম সংবৎসরে সৃষ্ট হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গলা ভাষার বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ বিষয়ে যে উপাদেয় অমূল্য গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষার শব্দ এবং প্রয়োগের যে ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গলা ভাষা শিশু ত নহেই; বরং উহার বয়সের গাছ-পাথর আছে কি না, তাহা সযত্নে খুঁজিয়া দেখিতে হয়।

শিশু না হইলেও অবস্থার ফলে অনেক বয়স্ক ব্যক্তিকেও Court of Wards-এর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। বয়সের হিসাবে আমাদের সাহিত্যটি "বালীগ্" হইলেও, এখনও মুরুব্বিদলের হাতেই উহার "হিজান-ত্" রহিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা ভাষা এবং সাহিত্যকে চিরদিনই হতাদর করিয়া আসিয়াছেন; কাজেই সাহিত্য অনাদৃত বেয়াড়া বালকের মত হাটেমাঠে গান গাহিয়া, বৈষ্ণবের আখ্ড়ায় সঙ্কীর্ত্তনের খোল বাজাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। যিনিই একটু অনুগ্রহ করেন, তিনিই উহার মুরুব্বি হইয়া দাঁড়ান। বৈষ্ণব কবিদের কবিত্বের মঠে পুষ্টিকর সুখাদ্যের প্রাচুর্য্য ছিল; কবি-ঝুমুরের আসরে স্ফূর্ত্তিদায়ক রঙ্গরসের অভাব ছিল না; এবং যাত্রা ও পাঁচালির ভাণ্ডারে অলঙ্কার এবং সাজসজ্জা যথেষ্টই ছিল; কাজেই আমাদের সাহিত্য সুখেস্বচ্ছন্দেই বাড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল, বলিতে পারি। এখন আমরা এই সাহিত্যের জন্ম এবং পরিবর্দ্ধনের ইতিহাস খুঁজিবার সময় একে একে বলিতে পারি যে, উহার পীত-ধড়াটি কাহার দেওয়া, চূড়াটি কাহার হাতের বাঁধা এবং বাঁশীটিই বা কাহার দেওয়া। কিন্তু তবুও এই কথাটি লইয়া সন্দেহ বা তর্ক রহিয়া যায় যে, উহার দুলালী ধরণের শরীরখানি দেবকীর দেওয়া, না মা যশোদার দেওয়া। কথা এই—উহার জন্ম খাঁটি সংস্কৃত কুলে, না কোন দেশ-প্রচলিত প্রাকৃতের কুলে। টোলের পণ্ডিতেরা এখন এই সুপুষ্ট সাহিত্যকে আপনাদের বলিয়া দাবি করিতেছেন; এবং উহার পীতধড়া অশোভন মনে করিয়া উহাকে রাজ-বেশে সাজাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু এতদিন যাহারা উহাকে ননী-ছানা দিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহারা এ দাবি গ্রাহ্য করিবে কেন? তাহারা বলে যে, যদি রাজা করিতে হয়, তবে আমরাই এ সাহিত্যকে রাখালরাজা করিয়া সাজাইব,—সংস্কৃত রীতি কুলীনের মেয়ে হইলেও উহার পাশে সাহিত্যকে বসিতে দিব না। সংস্কৃত রীতির কুল-গৌরব যতই থাকুক, প্রাকৃতের চক্ষে ঐ রীতিঠাকুরাণী বড়ই কুব্জা।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" গ্রন্থখানিতে যে-সকল শুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, উহা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের নিয়মে শাসন করা অসম্ভব। ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে,

কোন ভাষা অন্য একটি ভাষার মুখাপেক্ষী নহে; এবং সকল ভাষাই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। যখন একটা ভাষা প্রাচীন যে-কোন ভাষা হইতে ক্রমবিকাশের ফলে অথবা পরিবর্তনের অন্য নিয়মে নূতন ব্যাকরণ গড়িয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন প্রাচীন ভাষার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই থাকে না। সংস্কৃত নামে খ্যাত ভাষাটি একটি "প্রাকৃত" ভাষাই হউক, অথবা ঘষামাজা একটা সাহিত্যের ভাষাই হউক; ঐ ভাষা বাঙ্গলা ভাষার জননীই হউক, অথবা বাঙ্গলা ভাষা উহার কাছে কেবল মাত্র শব্দ-বিশেষের জন্যই ঋণী হউক; বাঙ্গলা ব্যাকরণের সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন সম্পর্কই নাই। ভাষা—ব্যাকরণ লইয়া; শব্দ লইয়া নহে।

যে ছান্দস ভাষা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি, যাহার ব্যাকরণটিকে টানাটানি করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠাম-রূপে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সে ছান্দসে এবং সংস্কৃতে কত প্রভেদ! সংস্কৃত নামে প্রচলিত ভাষাকে বৈদিক ভাষা হইতে অভিন্ন বলিয়া কাল্পনিক উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে গিয়া অনেক অদ্ভুত সূত্রের রচনা হইয়াছিল। সূত্র রচনা করিয়াও যখন এক সাধারণ নিয়মে প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন প্রয়োগগুলিকে মিলাইতে পারা যায় নাই, তখন "নিপাতন," "আর্ষপ্রয়োগ" প্রভৃতি ফাঁকি সৃষ্টি করিয়া দুকূল বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। উহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। ললিত বাবু অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্তে, "বর্ণচোরা শব্দ," "ভোল ফেরা শব্দ" এবং লিঙ্গবিভ্রাটের দৃষ্টান্তে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, সংস্কৃতভাষায়ও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ছান্দসের সহিত কৃত্রিমরূপে ধারাবাহিকতা রাখিতে গিয়া, সংস্কৃত যে খানায় পড়িয়াছিল, সাধু প্রয়োগের ভাণ করিতে গিয়া বাঙ্গলাকেও সেই খানায় পড়িতে হইয়াছে।

বৈদিক ভাষায় "দম" অর্থ গৃহ (ঋগ্বেদ—১,৮; ৬১,৯; ৭৫,৫ ইত্যাদি); কাজেই "দম্পতি" অর্থ গৃহপতি (ঋ ১, ১২৭,৮ প্রভৃতি)। বৈদিক ভাষার বিকৃতি বা পরিবর্তনে "গৃহিনী" এবং "গৃহ" লোকব্যবহারের ভাষায় এক হইয়া উঠিয়া, সাধারণ ব্যবহারে "দম্পতি" অর্থে গৃহরূপ গৃহিনী এবং তাঁহার পতিকে একসঙ্গে বুঝাইত। প্রচলিত শব্দ যখন পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই, তখন উহার ব্যুৎপত্তি বাহির করিয়া জায়া+পতি হইতে "জ[ম্পতি]" এবং "দম্পতি" বাহির করা হইয়াছিল। কস্মিন্[কালেও] বৈদিক ভাষায় "ধব" শব্দ এবং তাহার স্বামী অর্থ প্রা[চলিত] ছিল না। "বিধু" শব্দের অর্থ ছিল একা; এবং [উহা] হইতে স্বামীবিরহিণীর নাম হইয়াছিল "বিধবা"; অন্য শব্দের সঙ্গে উহাকে অলীক সাদৃশ্যে জুড়িয়া গিয়া একটা "বি"কে উপসর্গ সৃষ্টি করিয়া "ধব" শব্দ তাহার নূতন অর্থের আমদানি করিতে হইয়াছিল। ইট[...] ভাষাতে প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত vidova আ[...] কিন্তু কোন কালেই তাহার একটা "ধব" ছিল [না]। বৈদিক "র" প্রত্যয় দ্বারা উগ্র (উগ্+র)=ক্ষমতা[...] বিপ্র (বিপ্+র)=মন্ত্রযুক্ত, ক্ষত্র (ক্ষত্+র)=সম্প[...] —প্রভৃতি শব্দ সিদ্ধ হইয়াছিল। অর্ব্বাচীন যুগে উ[...] উৎপত্তি খুঁজিয়া না পাইয়া যাহার যেমন খুসি, উৎ[পত্তি] স্থির করিয়াছে। কবি কালিদাস ব্যাকরণের কোন [...] না থাকার সুবিধায় নিজের কল্পনায় "ক্ষতাৎ কিল ত্রায়[...]" প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। অরণ্যচারিণী একটা কাল্প[নিক] nymph গোছের দেবীর নাম ছিল "অরণ্যানী"; [সে] দেবীর যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সংস্কৃতে [...] অর্থে "অরণ্যানী" ব্যবহৃত হইল। "বনানী" কথা[টা] চলিয়া থাকে (সম্ভবতঃ ক্বচিৎ ব্যবহৃত), তবে উ[...] সনাতন প্রথায়ই চলিয়াছে। "বৎ" প্রত্যয়ের সাধ[ারণ] নিয়মে ফেলিয়া সম্বোধন পদের "ভগবঃ" আর [...] মিলাইতে পারা গেল না, তখন উহাকে "আর্ষ" বা[...] উৎসর্গ করা হইল; কিন্তু পালি ভাষায় "ভগবা" চা[লু] ছিল; এবং দশম শতাব্দীর তাম্রলিপিতেও প্রাকৃত-মি[শ্র] সংস্কৃতে "ভগবা" পাইয়া থাকি; অথচ সাহিত্যের ঘষাম[াজা] সংস্কৃত ভাষায় উহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। "ভার[ত]" কথা অবলম্বনে রচিত বলিয়া যে "মহাভারত" নাম হইয়া[ছে] তাহা যে-কেহ বুঝিতে পারে; অথচ মহাভারতের [...] বিশেষ আদৃত গ্রন্থের মধ্যেও ঐ শব্দের যে হাস্যকর ব্যুৎ[পত্তি] আছে, তাহাও পণ্ডিত-সমাজে অগ্রাহ্য হয় নাই। ও[...] ঐ গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল বলিয়া না[...] মহা+ভার হইতে "মহাভারত" নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অন্য রকমের আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বৈদিক ভাষায় কামারের নাম হইল "কর্ম্মার"; পালিতেও ঠিক্ পাই "কম্মার,"—আমাদের ভাষাতেও ঠিক্ সেই কথা হইতে "কামার" কথা হইয়াছে। সংস্কৃত নামক ভাষার ব্যাকরণে কোনরূপে উহা শুদ্ধ বিবেচিত হয় নাই বলিয়া প্রাকৃতের "ম্মার"কে অপভ্রংশ মনে করিয়া উহাকে ঘষিয়া মাজিয়া "কর্ম্মকার" করা হইয়াছিল। "শুতুদ্রী" নদীর কোন অর্থ হয় না মনে করিয়া প্রথমে উহার শত ধারা কল্পিত হইল; এবং তারপর উহার নাম হইল "শতদ্রু"। বৈদিক "আকু" প্রত্যয় বিস্মৃত হওয়ায় "মৃন্থাকু," "পৃদাকু," "ইক্ষ্বাকু" প্রভৃতির অনেক অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বনাম শব্দের প্রাচীন "অম্," "আম্" প্রভৃতি প্রত্যয় ও প্রাচীন শব্দরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবার পর সুবন্ত প্রকরণে যে-সকল অদ্ভুত প্রত্যয় ও সূত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কারের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত করা হইয়াছে। অহ্+অম্ (একবচন), ব+অম্ (দ্বিবচন) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে-সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিস। ঋগ্বেদে (যথা—৬,৫৫) "বাম্" অর্থ "আমরা দুজন"; পরবর্ত্তী সংহিতায় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে উহার স্থলে "আবম্" পাওয়া যায়; আবার আরও পরবর্ত্তী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় "আবাম্"। "তু" হইল ঠিক্ "তুমি," যেমন লাটিন ও ইটালীয় ভাষায় আছে; এই তু+অং উচ্চারণে যাহা, "ত্বং" ঠিক্ তাহাই। বেদে অনেক স্থলে তু—অম্ স্বতন্ত্রভাবেই পাওয়া যায়। অকারান্ত পদে কেবলমাত্র আকার দিয়া করণ-কারক-জ্ঞাপক তৃতীয়া বিভক্তি প্রকটিত হইত; দৃষ্টান্ত, যথা—পুংলিঙ্গে ঘনা, ঘৃণা, চন্দ্রা, চমসা, যজ্ঞা, হিমা; ক্লীবলিঙ্গে উক্‌থা, কবিত্বা, রত্নধেয়া; রথি-আ, বীরি-আ, সখি-আ ইত্যাদি বৈদিক ভাষায় সর্ব্বনামে যেমন ময়া এবং তু-আ বা "ত্বা" প্রভৃতি আছে, তেমনি অন্য স্থলেও ঐ নিয়মের অনেক ব্যবহার আছে। যাহা হউক, প্রাচীন বৈদিক সর্ব্বনাম এবং উহার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া উহার সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কথা বলিব না।

যে অপরাধে এখন বাঙ্গলা ভাষা অপরাধী, সংস্কৃত নামে পরিচিত ভাষাও ষোল আনা সেরূপ অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। মূল ভাষায় বা বৈদিকে যে শব্দগুলি যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে যে তাহাদের সে অর্থ রক্ষিত হয় নাই, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করিবেন বলিয়া ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত না দিলেও চলে। "অধঃ" বা "অধর" হইল নীচু অর্থে ঠিক্ "উত্তর" কথার বিপরীত ক্রিয়ার-বিশেষণ পদ; অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে "অধরোষ্ঠ" শব্দের "ওষ্ঠ" কাটিয়া "অধর" দ্বারাই ঠোঁট বুঝান হইয়াছে। "কতি" (how many), অতি (so many), যতি (as many) প্রভৃতি খাঁটি adverb শব্দগুলি উড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু "কতি"কে "কতিপয়"রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আমাদের "পুনরায়" কি দোষ করিল? বৈদিক "উপর" অর্থ হইল "নীচু" (lower); কিন্তু এখন নীচুই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

"ব্যাকরণবিভীষিকা"র সংজ্ঞা অনুসারে কয়েকটি "বর্ণচোরা" এবং "ভোলফেরা" শব্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি। লম্বা-শার্টকোটাবৃত লোককে দেখিলে যেমন ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়, তেমনি সংস্কৃতের অনেক অতিরিক্ত ব্যঞ্জন-যুক্ত শব্দকেও বৈদিক কুলজাত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি। প্রাচীন "অমলা" হইতে আমরা খাঁটি "আমলা" পাইয়াছি; কিন্তু উপনিষদের যুগের সংস্কৃতেও উনি একেবারে "আমলক" হইয়াছেন। সোমরসের অভাবে যে "আদার" ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রাকৃত ভাষাতে বরাবরই "আদা" নামেই চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃতে "আর্দ্রক" প্রভৃতি রূপে উহার ঝাল বাড়ান হইয়াছে। বৈদিক সংস্কৃতে "গ্না" হইল কুলনারীর নাম; যে "গ্না" নহে সে হইল ন-গ্না; এই "নগ্না" অর্থ হইল বারনারী বা "বিশ্যা" (সংস্কৃতে "বেশ্যা" বটে; কিন্তু বৈদিকে নয়); যে লজ্জাহীনতার জন্য নগ্না শব্দের নূতন অর্থ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু ন+গ্না হইতে উৎপন্ন নগ্না শব্দের একটা নূতন পুংলিঙ্গ "নগ্ন" গায়ের জোরে করা। আমরা যখন সংস্কৃতের নগ্ন-নগ্নাকে শাসন করিতে পারি না, তখন ললিত বাবুর ব্যবস্থায় বাঙ্গলার "পাগলিনী", "উলঙ্গিনী"র সাত খুন মাপ করিতে

হয়। ইতিপূর্ব্বেই "বিশ্যা" শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। যে হতভাগিনী বৈদিকযুগে "বিশ" বা লোকসাধারণের ভোগ্যা হইত, সেই হইত "বিশ্যা"। সংস্কৃতে তাহাকেই বেশভূষার জাঁকে "বেশ্যা" করা হইয়াছে। "ঝটিকা" প্রভৃতি শব্দ যখন দেশী ঝড়েরই প্রবর্দ্ধিত রূপ, এবং উহার উৎপত্তি যখন বৈদিক কোন শব্দ হইতে নহে, তখন "কুঝ্‌টিকা" অপসারিত করিয়া "কুহেলিকা"র উদরে ভীত হইবার কারণ নাই। প্রাকৃতের ঘরের দরিদ্রের পক্ষে অল্প ব্যঞ্জন অগৌরবের কথা ছিল না; কিন্তু সংস্কৃতের রাজভোগের জন্য অনেক ব্যঞ্জনের আয়োজন করিতে হইত। সেই জন্য অনেক ছোট ছোট দেশী কথা কেবল মাত্র বহুব্যঞ্জন-যোগে সংস্কৃত বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছে। সকল কথারই সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি খুঁজিতে গিয়া এ কালেও আমরা অনেক দেশী কথাকে অদ্ভুত আকারে সাজাইয়া তুলিতেছি। "গড়া" কথাটা খাঁটি দেশী; এবং ঐ দেশী শব্দটি মহারাষ্ট্র ভাষায় পর্য্যন্ত দেশী রূপেই চলিতেছে। আমরা ঐ "গড়া"কে "পড়া"র সঙ্গে যুড়িয়া "পঠ্" হইতে পড়ার মত "গঠ্" হইতে "গড়া"র সৃষ্টি করিতে চাহিতেছি। বৈদিকের "সায়" শব্দটি কেবল "সায়াহ্ন" এই যুক্ত পদেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিকের ক্রিয়ার-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত "সায়ং" সর্ব্বত্রই চলিয়াছে। বৈদিকের "ইদানী" এখন আর অনুস্বারযুক্ত না হইলে একেবারেই ব্যবহার হয় না। গোটাকতক অনুস্বার যোগ না করিলে যদি সংস্কৃত শব্দ মুখরোচক না হয়, তবে ললিত বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসারে ভুলপ্রয়োগ হইলে, অনুনাসিক-যুক্ত "পাঁচন"-এ এত অরুচি কেন? দৃষ্টান্ত বাড়াইব না; তবে ললিত বাবুর উদাহৃত কয়েকটি শব্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া রাখি যে, "বিদ্রূপ" শব্দ খাঁটি বাঙ্গলা; এবং "মোতি" শব্দটি "মুক্তা" বা "বিমুক্তা"র অপভ্রংশ নহে; উহা খাঁটি বিদেশের শব্দ। মূর্ত্তিনির্ম্মাতা অর্থে হুগলি জেলার কোন কোন স্থানে এবং বর্দ্ধমানের অনেক স্থানে "ভাস্কর" শব্দটি দেশী শব্দরূপে প্রচলিত। ভাব প্রকাশের জন্য স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্ত এই প্রাদেশিক শব্দটিকে প্রচলিত করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়াই সংস্কৃত প্রয়োগের কথা শেষ করিব। আগেই বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষায় সাদামাটা শব্দের কোন আদর নাই। আমাদের গৃহের প্রয়োজনীয় অনেক সামগ্রীর নাম সংস্কৃতে বস্তুবিশেষ বা পাত্র-বিশেষ মাত্র; কিন্তু বৈদিক এবং প্রাকৃত ভাষাগুলিতে সেগুলির ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে; স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে দৃষ্টান্তগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা আছে। এখানে সুপণ্ডিত যোগেশ-চন্দ্র কর্ত্তৃক উদাহৃত কয়েকটি ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের "গোরু" এবং ওড়িশার "গৌড়" জাতির নাম বৈদিক "গৌর" হইতে, —"গো" হইতে নহে। বৈদিক "বল্ক" metathesis বা বর্ণব্যত্যয়ে "বক্ল" হইয়াছিল; এবং তাহা হইতেই "বাকলা" হইয়াছে। বৈদিক "বল্ক"-এর শেষে প্রাকৃতের শেষ "ল" টি ভুলক্রমে যুড়িয়া রাখিয়া সংস্কৃত "বল্কল" হইয়াছে; কাজেই "বল্কল" হইতে "বাকলা" আসে নাই। ঐরূপে অনেক বৈদিক শব্দই সংস্কৃতের রাজদরবারে না গিয়াই সোজা প্রাকৃত-পথে আমাদের কাছে আসিয়াছে।

কথা এই, অবস্থায় পড়িয়া এবং প্রয়োজনের খাতিরে নূতন ভাষাকে নূতন রূপে গড়িয়া উঠিতে হয়, কোন যুগেই কেহ প্রাচীন ব্যুৎপাদক ভাষা খুঁজিয়া সেই প্রাচীন ভাষার নিগড়ে উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। যে-সকল বৈয়াকরণ এই অসাধ্য সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ঠিক্ বৈয়াকরণপাশঃ বলিয়া তিরস্কার করিতে চাহি না; কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে পাশ সংযত করিতে অনুরোধ করি। শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচারের প্রসঙ্গে সুচতুর ললিত বাবু এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা বাঙ্গলাই, সংস্কৃত নহে। যোগেশ বাবু শুদ্ধ-অশুদ্ধের কোন বিচার না করিয়া খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শব্দাদির প্রকৃতির এবং প্রয়োগপদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনার এই পদ্ধতিই বিজ্ঞান-সম্মত। ব্যাকরণ যে জীবন্ত ভাষায় রচিত হইতে পারে, এবং এ প্রকার রচনা দ্বারা যে ভাষার উন্নতির পথে কোন বাধা হয় না, এ কথা উভয় পণ্ডিতের গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, জীবন্ত ভাষা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে ও পরিবর্ত্তিত হয় বটে, "কিন্তু স্বভাবেরও স্বভাব আছে", এবং সেই স্বভাবটুকু কি, তাহা ধরিয়া

ফেলাই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। ললিত বাবুর ভাষায় বলিতে পারি যে "অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ পরিলক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করাই" ব্যাকরণের উদ্দেশ্য।

"ব্যাকরণবিভীষিকা" গ্রন্থে এবং অনুপ্রাস বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে-ভাবে প্রচলিত প্রয়োগগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে একজন কেহ অন্যের সাহায্যে ঐরূপ লিখিয়া ফেলিলে তাঁহার অত্যধিক খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি হইত। ললিত বাবুর সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, রায় সাহেব যোগেশ-চন্দ্রের সম্বন্ধে সেই কথা আর একটু বেশি করিয়া বলিতে হয়। নিজে অস্ত্র গড়িয়া মাটি খুঁড়িয়া যদি কেহ ধাতু সংগ্রহ করে, এবং সেই ধাতু নিজেই গলাইয়া অলঙ্কার গড়িয়া তুলে, তাহা হইলে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। একাকী পরিশ্রম করিয়া তিনি যেভাবে শব্দ ও প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া ভাষার নিরুক্ত, ব্যাকরণ এবং কোষগ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তাহাতে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইতে হয়। ইতি-পূর্ব্বে কোন কোন নামজাদা লেখকের কয়েকটি অসার চটকদারী প্রবন্ধ পত্রিকাবিশেষে পড়িয়া, এই কল্পনাপ্রিয় জাতির অক্ষমতার চিন্তায় অনেককেই নিরাশ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যাপকদ্বয়ের অনুসন্ধান দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত মনে ভাবিতেছি যে ফাঁকা আওয়াজ ও বাহিরের চটকই আমাদের সমগ্র সম্পত্তি নহে। এখন বাঙ্গালীর কীর্ত্তিস্তম্ভের সূচনা দেখিয়া কে না গৌরব অনুভব করিবেন? এখন এক দুই করিয়া বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি মন্তব্য লিখিতেছি।

(১) বাঙ্গলা ভাষাটা বাঙ্গলা,—অন্য ভাষা নহে। এই আবিষ্কারটা অত্যাশ্চর্য্য না হইলেও কথাটা বলিবার প্রয়োজন আছে। ভাষা হইল ব্যাকরণ লইয়া,—শব্দ লইয়া নহে। আমাদের সর্ব্বনাম শব্দ এবং ক্রিয়া পদ লইয়া তাহার সংযোগপদ্ধতি কোন ভাষার সঙ্গেই মিলিবে না; অথচ আমরা ইংরেজি হউক, সংস্কৃত হউক, ফরাসি হউক, নানা শব্দ আমদানি করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, এবং করিতেছিও, তবে অন্য কোন ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিবার সময় সে ভাষা না জানিয়া শব্দ সংগ্রহ করা চলে না। এটাও খুব অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার নহে; ধরুন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরপূর্ণ স্থানের ঠিক্ বাঙ্গলা কথা না পাইয়া আমরা বৈদিক "কিংশিল" শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিতেছি; তখন উহাকে বিকৃত করিয়া "কিংশাল" প্রভৃতি রূপে ব্যবহার করিতে পারি না। বালিশের একটা ভাল নাম খুঁজিতে গিয়া যদি সংস্কৃত "উপধান" ব্যবহার করিতে হয়, তবে উহাকে নূতন আ-কার দিয়া "উপাধান" লিখিতে গেলে ভুল হইবে। পৃথিবীর লোকসম্বন্ধীয় বুঝাইতে হইলে "বিশ্বজনীয়" লিখিতে হইবে; এবং সকল শ্রেণীর লোক-সমষ্টি বুঝাইতে গেলে, অথবা সকলের হিতার্থে বুঝাইতে হইলে "বিশ্বজনীন" বা "বিশ্বজন্য" লিখিতে হইবে। এসব স্থলে উৎকট মৌলিকতা চলিবে না। ললিত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিবার সময়ে লেখক সম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে-সব কৃত্রিম পদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, আমার ইহা সঙ্গত বিবেচনা হয় না।

(২) তবে কথা এই যে, অনেক সংস্কৃত কথা বহুদিন হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; এখন তাহা উল্‌টাইয়া দেওয়া চলে না। "মীমাংসা" শব্দের অর্থ হইল বিচার,—সিদ্ধান্ত নহে; অথচ ললিত বাবুর মত পণ্ডিতও "ব্যাকরণ-বিভীষিকায়" উহাকে সিদ্ধান্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন,—সকলেই করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঐ অর্থ এখন সম্পূর্ণ প্রচলিত। ইংরেজি-নবিসেরা ইংরেজি obliged কথার তর্জ্জমা করিতে গিয়া সংস্কৃত ভাণ্ডারে শব্দ খুঁজিয়াছিলেন; কিন্তু জ্ঞানের অভাবে একটি ভুল পদের সৃষ্টি করিয়াছেন—সেটি "বাধিত"। "বাধিত" শব্দের অর্থ পীড়িত, তবুও অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আমরা ঐ কথাটির ভুল ধরি না; অথচ নিজেরাও ব্যবহার করি না। "তত্রাচ" এবং "মর্ম্মন্তুদ" এই শ্রেণীর অদ্ভুত সৃষ্টি; ভাষায় উহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, কিন্তু "কাজেকাজেই" অর্থে "সুতরাং", "and" অর্থে "এবং" প্রভৃতি ভুল প্রয়োগ হইলেও, কোনরূপে পরিত্যাগ করিবার পথ নাই। বিদেশ হইতে সংগৃহীত অনেক শব্দও পরিবর্ত্তিতরূপে ব্যবহৃত হয়। "নীস্তনাবুদ" আমাদের অত্যাচারে "নাস্তানাবুদ" হইয়াছে। "আবরু" (ধাতুগত অর্থ "মুখ") শব্দের অর্থ হইল সম্মান ও গৌরব; কিন্তু আমরা

শব্দটিকে আবরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভাবিয়া "পরদা" অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। "ভরোশা" শব্দটিকে আমরা ভর (নির্ভর)+আশা ভাবিয়া থাকি; হয় ত বা কোন পণ্ডিত ভাষা শুদ্ধ করিতে গিয়া এক দিন "ভরাশা" লিখিয়া বসিবেন।

(৩) বাঙ্গলা ভাষাটা সংস্কৃত নয়; কাজেই আমাদের ভাষায় যে-সকল সংস্কৃত, প্রাচীন প্রাকৃত, কিংবা বৈদিক শব্দ ব্যবহৃত আছে, সেগুলি খাঁটি বাঙ্গলা প্রত্যয় প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেখানে সংস্কৃত প্রত্যয় না দেওয়ায় কোন দোষ হয় না; বরং দেওয়াই অন্যায়। পালি ভাষার ধাঁচা অনুসারে "চোর" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "চোরী" কথার ব্যবহার আছে। ওড়িয়া ভাষার প্রাকৃতিক ধাঁচায় স্ত্রী চোরকে "চোরণী" বলে। উহাতে কোন দোষ নাই, বৈদিক ভাষায় মনু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "মানবী",—সংস্কৃতের ধাঁচায় অন্যরূপ; প্রাকৃতেও অন্যরূপ হইয়াছে। যে-সকল শব্দ অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর ঘরে বসবাস করিতেছে, তাহাদের বাঙ্গালীর পোষাক পরিচ্ছদ না পরিলে চলিবে কেন? বাঙ্গলায় "অধিক" কিংবা "বিশেষরূপে" অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য একটি "স" কতকটা উপসর্গের মত শব্দে যুক্ত হইয়া থাকে। চেহারা দেখিয়া এই "স"কে সংস্কৃত সহ = "স"এর সহিত এক বলিয়া কেহ ভুল করিবেন না, যথা—বিশেষরূপে ঠিক্—"সঠিক্", কিংবা অধিকরূপে বিশেষ এই অর্থে "সবিশেষ"—"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি" (ভারতচন্দ্র)। এই অর্থে ই আমাদের "সশঙ্কিত", "সজাগ", "স-টান্" (সটাং) প্রভৃতি প্রচলিত। তবে নিরক্ষর জমিদারি সেরেস্তার গোমস্তাদের হাতের "সবিনয়পূর্ব্বক" প্রভৃতি ভাষার গৌরব বাড়াইবার হাস্যকর চেষ্টার দৃষ্টান্ত মাত্র। যাহারা "শুদ্ধ" করিয়া লিখিবার জন্য "ঘৃত" কে "ঘ্রত" লিখিত; "সহনীয়", "গণ্যনীয়" প্রভৃতি লিখিত, তাহাদের কথা গণনার মধ্যে না আনাই উচিত। আমাদের নামজাদা পুরুষেরা যদি "সকাতরে", "সকৃতজ্ঞহৃদয়ে" প্রভৃতি লেখেন, তবে অল্প একটু সমালোচনার চিম্‌টি কাটিলে চলিবে। যোগেশ বাবু ঠিকই লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলার "আ" বা "ইয়া" প্রত্যয়, কিংবা "ঈ" প্রত্যয় ঠিক্ সংস্কৃতের কোন প্রত্যয় নহে। দক্ষিণ দেশের অর্থে "দক্ষিণিয়া" বা "দক্ষিণা"; "পশ্চিমে", "কর্ম্মনাশা", "নির্জ্জলা", "নিস্ফলা" প্রভৃতি এই শ্রেণীর। বৈশাখের উৎসব অর্থে "বৈশাখী" উৎসব; এখানে "বৈশাখী" স্ত্রী প্রত্যয় বা সংস্কৃত কোন প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। এইটি ধরিয়া লয়েন নাই বলিয়া ললিত বাবু অনেক যথার্থ ভুল প্রয়োগের সঙ্গে কতকগুলি প্রাকৃতভাবে শুদ্ধ প্রয়োগকেও যুড়িয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গলায় যে-সকল স্ত্রী প্রত্যয় প্রচলিত আছে, কিংবা অন্য তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয় চলিত আছে, তাহা সংস্কৃত মনে না করিলেই "গোপিনী", "ননদিনী", "নাপিতানী", "শূদ্রানী", "পণ্ডিতানী", "জ্ঞানত", "রাগত", "পারত" প্রভৃতি দোষযুক্ত মনে হইবে না। দেশে চল ছিল বলিয়াই চণ্ডীদাস "রজকিনী" চালাইতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহার সে "রজকিনী" আবার "রামী", ইনি "শ্যামী", "বামী", "ক্ষেমী"দিগের সহচরী।

(৪) খাঁটি সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গলায় চলে না। Etc. অর্থে যে আমাদের "ইত্যাদি" প্রযুক্ত হইয়া থাকে, উহা একটা আস্ত শব্দ; সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে গৃহীত; উহার সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি যাহাই থাকুক উহা বাঙ্গলা "ইতি" ও "আদি" যোগে সিদ্ধ নয়; আমাদের "ইতি" এখন "সমাপ্ত" অর্থে ব্যবহৃত। ঐরূপ আমরা আস্ত "মনোহর" শব্দ সংস্কৃত হইতে লইয়াছি। বাঙ্গলায় "মনস্" শব্দ নাই,—আছে "মন" শব্দ। কাজেই "মন-কষ্ট", "মনমোহন" প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গলা কথায় কোন দোষ নাই। "মনোমোহন"এর বেলায় "মনস্" দিয়া সন্ধি করিয়া বুঝাইলে, "মন-গড়া", "মন-ভুলান" প্রভৃতি স্থলে গোলে পড়িতে হইবে। কাজেই সর্ব্বত্র বাঙ্গলা ঠাটই বজায় রাখা উচিত। "মহিমা" কথার সংস্কৃত মূল ধরিয়া বিচার করিয়া যাঁহারা "মহিমাময়" শব্দের আ-কার সম্বন্ধে তর্ক তুলেন, তাঁহারা বাঙ্গলা প্রয়োগের বিচার করেন না। যোগেশ বাবু তাঁহার ব্যাকরণে "ধর" প্রভৃতি বাঙ্গলা ধাতু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—সংস্কৃত "ধৃ" প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই; ইহা বড়ই উপযুক্ত হইয়াছে।

(৫) ললিত বাবু বলিয়াছেন যে, ইংরেজিতে সংক্ষেপে নাম লিখিতে গেলে উপাধির পূর্ব্ববর্ত্তী নামের পদদ্বয় বা পদত্রয় একত্র লেখা উচিত; একথা সর্ব্বত্র খাটে না। "ললিতকুমার" কথায় নামটি সমাসযোগে এক শব্দ হইতে

পারে; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ নামের পদদ্বয় পরস্পর অসংযুক্ত। নামে "চন্দ্র", "নাথ", "লাল" প্রভৃতি যোগকরা বাঙ্গলা নামকরণের বিশেষত্ব। "রবীন্দ্রনাথ", "দ্বিজেন্দ্রলাল", "যোগেশচন্দ্র" প্রভৃতি নামে দ্বিতীয় পদগুলি অতিরিক্ত পদমাত্র; কাজেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সময় R. N., D. L., J. C. প্রভৃতি থাকাই সঙ্গত।

(৬) যাহাকে খাঁটি বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলে, যোগেশ বাবুর গ্রন্থ তাহার প্রথম অনুষ্ঠান। ব্যাকরণ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই যোগেশ বাবু যে সুবিস্তৃত কোষগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, আমি তাহার কিয়দংশ দেখিবার সুবিধা পাইয়াছি। কীর্ত্তিমান্ যোগেশচন্দ্র অন্যের সাহায্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া, নিজের বুদ্ধি এবং পরিশ্রমে যাহা লিখিতেছেন, তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত হইলেই ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে অন্যে ঐ অংশবিশেষের সমালোচনা করিতে পারিত; এবং যোগেশ বাবুও সেই সমালোচনা লক্ষ্য করিয়া আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন কার্য্যটি পরিশিষ্টভাগে করিতে পারিতেন।

যোগেশ বাবু নিজের উদ্ভাবিত পন্থায় শব্দের বর্ণসংযোগ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থখানি পড়িতে বড়ই অযথা সময়ক্ষেপ হইয়া থাকে। তিনি ভাল জিনিস লিখিয়াছেন বলিয়াই এ জুলুম সহ্য করিতে হইল। যোগেশ বাবুর লিপিকৌশলের একটি দোষেও তাঁহার এই গ্রন্থখানি পড়িতে গিয়া অনেক পাঠক উৎসাহহীন হইতে পারেন। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, বাঙ্গালী পাঠককে ভুলাইয়া ব্যাকরণ পড়াইবার জন্য পণ্ডিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত রঙ্গরসের সৃষ্টি করিতেই হইবে। কিন্তু এ কথাও বলিতে পারি না যে, ব্যাকরণের কথা লিখিতে গেলেই ভাষাকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। খাঁটি বক্তব্যটুকু পরিমিত কথায় সরলভাবে প্রকাশ করা খুব ভাল; কিন্তু ঐ প্রথায় রচনাকে একেবারে নীরস করিয়া তোলা উচিত নয়। "বাক্যে মূল শব্দের অন্ত্য পরিবর্ত্তন হয়। তৎসহ অর্থের সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন হয়। বাক্যে স্থিতি অনুসারেও মূল শব্দের অর্থের ও অন্বয়ের বিশেষ হয়।" এই বাক্য কয়েকটি পড়িতে হইলে অনেককেই যে হাঁপাইতে হইবে, এ কথা বহুদর্শী অধ্যাপক একেবারেই চিন্তা করেন নাই। অতিরিক্ত ক্রিয়া পদের সমাবেশ, কিংবা কোন বাক্যে সম্পূর্ণ করিবার জন্য অতিরিক্ত সর্ব্বনামের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় বড় সুবিধার নয়। যদি কেহ লেখে— "তোমাকে একটি কথা বলিব," তাহা হইলে ক্রিয়া দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, "আমি" কথা উহ্য আছে; বাঙ্গলা রচনায় অনেক স্থলেই ঐরূপ সর্ব্বনাম না দিলেই চলে; এবং দিলেও বিশেষ কিছু লাভ হয় না। ইংরাজিতে ক্রিয়া পাদের রূপের হিসাবে সর্ব্বনাম কর্ত্তাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না; কিন্তু ইটালীয় ভাষা প্রভৃতিতে খাসা চলে। Temo che piova কিংবা non amo punto il vino প্রভৃতি পদে আমি অর্থে "io" যোগ না করিলেও অর্থবোধ হয়; বরং যোগ না করিলেই বাক্য সুশ্রাব্য হয়। বাঙ্গলা ভাষার সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই কথা। "তোমার এ কার্য্য করা উচিত" পর্য্যন্ত লিখিয়া, যদি কেহ সন্তুষ্ট না হন, এবং বাক্যটির শেষে "হয়" যোগ করেন, তাহা হইলে ভাষা কর্কশ হইয়া উঠে; এক সঙ্গে অনেক ছোট ছোট বাক্য সাজাইলেও আমাদের ভাষার মাধুরী নষ্ট হয়।

বাঙ্গলার বর্ণ-উচ্চারণের প্রকৃতি-নির্ণয়ে, বাণানের বিশেষত্ব বিচারে, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া এবং কৃৎ-তদ্ধিত প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সংগ্রহে অধ্যাপক রায় যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, এবং সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা না পড়িলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না। গ্রন্থকারের জন্ম রাঢ় দেশে; কাজেই তিনি প্রধানতঃ রাঢ়ে প্রচলিত প্রয়োগগুলিরই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন; এবং সেই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রয়োগ দেখাইতেও ছাড়েন নাই। রাঢ়ের প্রয়োগকে আদিম বলিয়া ধরিবার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কারণও আছে; কিন্তু যোগেশচন্দ্র তাহার উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, যোগেশচন্দ্র কর্ত্তৃক এই পদ্ধতিতে লিখিত নিরুক্ত এবং ব্যাকরণ পড়িলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এখন দূর পূর্ব্ববঙ্গে যে ভাষা প্রচলিত আছে, উহার সহিত রাঢ়ের প্রাচীন প্রয়োগের কত অধিক মিল! অর্থাৎ পাঠকেরা উহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, এক দিন রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গে একই ছাঁচের ভাষা প্রচলিত ছিল; দেশের মধ্যভাগেই ঐ ভাষা অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং এখন আবার ধীরে ধীরে সর্ব্ব

দেশের ভাষার সহিত প্রাচীন কালের ন্যায় একটা নূতন মিলন হইবার পথ পরিষ্কার হইতেছে।

যোগেশ বাবু তাঁহার ব্যাকরণে এবং কোষগ্রন্থে অধিকাংশ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধেই বড় সুবিচার করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে টানিয়া-বুনিয়া সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি বাহির করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। একে একে সকলগুলি শব্দের বিচার করা কোন প্রবন্ধেই সম্ভবপর নয়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, তাঁহার গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইলে দশ জনের অল্পবিস্তর সমালোচনায় বড় উপকার হইত। তাঁহার কীর্ত্তি নিঁখুত হউক, মনে করিয়াই এই কথাটা লিখিলাম।

শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের কথা লিখিতেছি। আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যে যত শব্দই সুরক্ষিত থাকুক না কেন, উহার সকল শব্দই মৌলিক শব্দ নয়; অনেক শব্দ সাধারণ প্রাকৃতিক শব্দের সাহিত্যিক সংস্করণ মাত্র। সে স্থলে বলা চলে না যে, সাহিত্যিক শব্দ হইতেই আমাদের প্রচলিত শব্দের জন্ম হইয়াছে; বরং উল্টাটি ভাবাই বেশী সঙ্গত। আর্য্যজাতির ভাষার কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলেও দেখিতে পাই যে, পিতা অর্থে পাপা, বা, বাপ্, বাবা, আব্, আবা, আদা, তাত প্রভৃতি এবং মাতা অর্থে মা, আমা, এমা, অনা, এনা, নানা প্রভৃতি অত্যন্ত নিঃসম্পর্কিত আমেরিকা, ভারত, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। মানবশিশুর প্রথম উচ্চারণের এই বিশেষত্বের কথা লইয়া ঐসকল উদাহরণ অবলম্বনে Buschmann প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। কাজেই এ কথা বলা কঠিন যে, আমাদের মা-বাপ শব্দ পিতৃ-মাতৃ শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিংবা ঐ পিতৃ মাতৃ শব্দই পা-মা হইতে উদ্ভূত।

এ শ্রেণীর বিচার ছাড়াও শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যবিধ বিচার করিবার প্রয়োজন আছে। সংস্কৃত ব্যতীত অনেক খাঁটি দেশী, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি শব্দ হইতেও উৎপত্তি বাহির করিতে হয়। সে কথা যোগেশ বাবু বিলক্ষণ জানেন। সেই জন্যই বলিতেছি যে, তিনি একা পরিশ্রম করিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা যাহাতে দশের সমালোচনায় অনেক পরিমাণে নিখুঁত হইয়া তাঁহার চিরস্থায়ী কীর্ত্তিকে নিষ্কলঙ্ক করে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চিত্রপরিচয়

দান্তে ও বেয়াত্রিচে।

ইতালির শ্রেষ্ঠ কবি, এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রচয়িতা দান্তে ইতালির প্রসিদ্ধ কবিত্বপূর্ণ ফ্লোরেন্স অর্থাৎ পুষ্পনগরের অধিবাসী ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর তখন একদিন তাঁহার প্রতিবাসীর কন্যা সমবয়সী বেয়াত্রিচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; বেয়াত্রিচের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য ও অমায়িক ব্যবহার বালকের মন এমন প্রণয়রসার্দ্র করিয়া দেয় যে তাহাতেই তাঁহার মনে কবিত্ব অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। সেই দিন হইতে মুগ্ধ বালক সেই বালিকার দর্শন লাভের জন্য সমুৎসুক হইয়া থাকিতেন, কিন্তু কখনো চেষ্টা করিয়া দর্শন করিতে পারিতেন না। তাঁহার মনে হইত বেয়াত্রিচে যেন কোনো দেবকন্যা, তিনি তাঁহার মুগ্ধ পূজারী; দূর হইতে সসঙ্কোচে শ্রদ্ধা-প্রেমের নীরব অর্ঘ্য সাজাইয়া লইয়া তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন, নিবেদন করিবার সাহস ও যোগ্যতা তাঁহার নাই। সেই একদিনের দেখার পর এমনি উৎসুক অপেক্ষায় নয় বৎসর কাটিয়া গেল। দান্তে এখন যুবক; বেয়াত্রিচে যুবতী। একদিন পথে যাইতে যাইতে দান্তে দেখিলেন তাঁহার আরাধ্য দেবী বেয়াত্রিচে দুইজন বয়স্কা মহিলার সহিত আসিতেছেন; দান্তে সঙ্কুচিত হইয়া পথের এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বেয়াত্রিচে তাঁহার রূপমুগ্ধ নাগরিকদের পশ্চাতে তাঁহার ভক্ত দান্তেকে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিজেই হাসিমুখে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। আরাধ্য দেবীর সহিত দ্বিতীয় দিনের এই সাক্ষাৎ ও তাঁহার প্রতি বিশেষ করুণা দান্তের জীবনের চরম সম্পদ হইয়া রহিল। সেই দিন তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহার যে ভীরু প্রণয় মনের গোপন গুহায় গুমরিয়া মরিতেছে তাহাকে কবিতায় প্রকাশ

করিতে হইবে এবং সে কবিতা পুষ্পনগরীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর ও কবির বন্দিতার যোগ্য করিয়া রচনা করিতে হইবে। দুই দিনের মাত্র ক্ষণিক-দেখা প্রণয়িনীর ধ্যানেই কবির আনন্দ, কবি আর কিছু চাহেন নাই এ প্রেম পূজারই প্রতিরূপ। কবি দান্তে বেয়াত্রিচেকে এমন ভালো বাসিয়াছিলেন যে বেয়াত্রিচের পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনিয়া দান্তে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন, বেয়াত্রিচের এতটুকু দুঃখের সংবাদ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এমনি কাতর করিয়া তুলিত।

বেয়াত্রিচের প্রতি তাঁহার এই মুগ্ধ আসক্তি তিনি প্রাণপণে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন, পাছে তাঁহার এই পূজার ভাবকে কেহ চপল কামনা বলিয়া অপমান করে। তথাপি মৃগনাভির গন্ধের মতো মনের কোণের গোপন প্রেম চাপা থাকিল না। সে কথা লইয়া দুষ্ট লোকে নানা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। সে কথা ক্রমে বেয়াত্রিচের কানেও উঠিল। বহুদিন পরে তৃতীয়বার যেদিন বেয়াত্রিচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল, সেদিন বেয়াত্রিচে কবির প্রতি করুণা দৃষ্টিপাত করিলেন না; এই উপেক্ষার বেদনা কবিকে বিষম রকমই বাজিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহার জন্য কুৎসাকারীদিগের প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার আত্মজীবনী Vita Nuova (নব-জীবন) নামক গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—বেয়াত্রিচেকে দেখিলেই আমার অন্তর প্রেমে এমন পরিপূর্ণ হইয়া যাইত যে বিশ্ব আমার কাছে মধুময় লাগিত, বিশ্বমানবকে বন্ধু বলিয়া মনে হইত, তখন শত্রু কেহ থাকিত না। বেয়াত্রিচের পিতৃবিয়োগের দুঃখে পীড়িত হইয়া দান্তের মনে হইল যে মৃত্যু একদিন তাঁহার বন্দিতা বেয়াত্রিচেকেও এ জগৎ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে এই চিন্তায় বিচলিত হইয়া দান্তে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে বেয়াত্রিচের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বেয়াত্রিচের মুখে যেন লেখা রহিয়াছে—আমি পরম শান্তির সম্মুখীন হইয়াছি। সেই দিন হইতে দান্তে বুঝিলেন যে শান্তিতেই আনন্দ, উদ্বেগে চঞ্চলতায় সুখ নাই। যে সুন্দরী পথে বাহির হইলে নগরের লোক কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ছুটাছুটি ভিড় করিত, সেই তাঁহার প্রণয়িণীর অদর্শন কবিকে আর কাতর করিতে পারিল না। এই সময় বেয়াত্রিচে বিবাহ করেন। কিন্তু দান্তে তাঁহার 'নব-জীবন' লাভের কাহিনীতে এ কথার উল্লেখ করেন নাই। বিবাহের তিন বৎসর পরে বেয়াত্রিচের মৃত্যু হয়। কবি লিখিয়াছেন বেয়াত্রিচের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ কাঙাল হইয়া গিয়াছিল, সমগ্র দেশ শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর দান্তে পুনরায় স্বপ্ন দেখেন। স্বর্গগতা প্রণয়িনীকে অপূর্ব্ব পুণ্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প করেন যে সেই মহিমাময়ীর বিষয়ে কিছু বলিতে বা চিন্তা করিতে হইলে তাঁহাকেও সেইরূপ পবিত্র পূজারী হইতে হইবে, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে বেয়াত্রিচের মৃত্যুর পরও বাঁচাইয়া রাখিলে তিনি এমন কবিতা লিখিবেন যেমন অর্ঘ্য কখনো কোনো রমণীর জন্য রচিত হয় নাই। এই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন। Vita Nuova, Inferno, Paradiso প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি বেয়াত্রিচের কথায় পূর্ণ। কবি তাঁহার কাব্যে মৃত্যুর পরপারে স্বর্গের নদীতে লালসার লেশটুকুও ধুইয়া ফেলিয়া পবিত্র দেহমন লইয়া স্বর্গে বেয়াত্রিচের ভক্ত পূজারী হইবার অধিকার পাইয়াছেন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; কখনো বেয়াত্রিচেকে লাভ করিবার, সম্ভোগ করিবার কল্পনাও তিনি করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেম এমনি কামনা-লেশ-শূন্য অনাবিল পবিত্র মানস ব্যাপার মাত্র ছিল।

দান্তের প্রণয়-অর্ঘ্য তিনখানি পুস্তকে বিভক্ত—Inferno, Purgatory, Paradiso. এই বই তিনখানি তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া য়ুরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশেষ কষ্ট অসুবিধার মধ্যেও শেষ করিতে পারিয়াছিলেন কেবল মাত্র বেয়াত্রিচের প্রতি প্রেমের বলে। এই পুস্তকগুলি অবশেষে তাঁহার স্বদেশে এমন সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়াছিল যে ইহার নাম রাখা হইয়াছিল Divina Comedia.

দান্তে শেষ জীবনে বিবাহ করিয়াছিলেন, পুত্র কন্যাও হইয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ফলে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি পারিবারিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন

ইহা বোধ হয় তাঁহার মানস-প্রতিমার প্রতি নিষ্ঠাহীনতার অপরাধে বিধাতার দণ্ড।

দান্তে-বেয়াত্রিচের এই আধ্যাত্মিক প্রণয়-কাহিনী যুগে যুগে বহু কবি ও চিত্রকরের কাব্য ও চিত্রের বিষয় হইয়াছে। এক বাইবেল ছাড়া আর কোনো পুস্তকের এত সংস্করণ বা অনুবাদ বা তাহার বিষয় লইয়া এত চিত্র ও কাব্য রচিত হয় নাই। 'দান্তের স্বপ্ন' নাম দিয়া বহু প্রসিদ্ধ চিত্রকর বিবিধ ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তাঁহার তরুণী পত্নীর মৃত্যু হইলে শোকার্ত্ত পতি যে চিত্র-পরিকল্পনায় সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন তাহার নাম দিয়াছিলেন তিনি 'দান্তের স্বপ্ন'। কবি দান্তের সহিত নিজের নামসাদৃশ্য এবং দান্তে-বেয়াত্রিচের প্রণয়কাহিনীর মাধুরী চিত্রকরকে এই চিত্র-পরিকল্পনায় নিযুক্ত করিয়াছিল বোধ হয়। মৃতা প্রেয়সীর মুখের আদর্শেই চিত্রখানি অঙ্কিত হয় এবং পূর্ণ এক বৎসরে চিত্রখানি তিনি সম্পূর্ণ করেন। এই চিত্রের মধ্যে মৃত্যুর মাধুর্য্য ও শান্ত শোকের একটি গম্ভীর ভাব সুস্পষ্ট হইয়া আছে। দান্তে যে স্বপ্নকাহিনী তাঁহার নব-জীবন (Vita Nuova) নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন তাহাই রসেটি চিত্রে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—বেয়াত্রিচে মৃত্যুর আহ্বানে অনন্ত শান্তির আধার সত্য শিব সুন্দরের সম্মুখীন হইয়া বসিয়াছেন; লালরঙের পাখীটি মৃত্যুর দূত, মুখে করিয়া চিরনিদ্রা ও বিরতি বিশ্রামের চিহ্ন আফিম-ফুলটি বহন করিয়া সে আনিয়াছে। বেয়াত্রিচের বাম দিকে দূরে 'প্রেম' এবং ডাহিন দিকে 'কালচক্রের' সম্মুখ দিয়া 'দান্তে' অগ্রসর হইয়া বেয়াত্রিচের কাছাকাছি আসিতেছেন, এবং চলিতে চলিতে তাঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখিতেছেন।

এই চিত্রখানিই নাকি রসেটির মনে আমরণ মৃতা প্রেয়সীর প্রণয়কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল, কখনো তাঁহার চিত্ত অন্য রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইলে এই চিত্র তাঁহাকে একনিষ্ঠ থাকিবার বল দান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত।

দান্তের চিত্রখানি তাঁহার বন্ধু চিত্রকর জত্তোর (Giotto) আঁকা, কবির প্রথম বয়সের চিত্র। তখন কবি প্রণয়ে মুগ্ধ, আনন্দে উৎফুল্ল। দান্তের মুখে সেই প্রণয়মুগ্ধ শান্ত কবিপ্রতিভার আভাসটি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কবির নির্ব্বাসনের দুঃখের দিনের চিত্র নহে।

বিষ্ণু ও সরস্বতী।

বিষ্ণু ভগবানের পালনশক্তির প্রতিরূপ। নেপালী মূর্ত্তিটিতে সেই শান্ত প্রসন্ন পালন-ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। চিত্র অপেক্ষা মূর্ত্তিতে ভাব প্রকটিত করিয়া তোলা কঠিন কার্য্য। কিন্তু ভারতীয় ভাস্করগণ তক্ষণ ও মূর্ত্তিশিল্পে ভাবপ্রকাশের অদ্ভুত নিপুণতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

সরস্বতী বিষ্ণুর শক্তি, তিনি জ্ঞানশক্তি। পালনী শক্তির দুই রূপ - এক ধনসম্পৎশক্তি বা লক্ষ্মী, দ্বিতীয় জ্ঞান-শক্তি বা সরস্বতী। সরস্বতীর চিত্রখানিতে জ্ঞান ও ললিত-কলার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। পদ্ম পালনী শক্তির, শ্রীর, সৌন্দর্য্যের, ললিতকলার, কোমলকান্ত ভাবের চিহ্ন; জ্ঞানশক্তির চারিদিক ঘিরিয়া পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে; সরস্বতীর বাহন শুভ্র সুন্দর মহিমান্বিত রাজহংস, তাহার আভাস শিল্পী বিশেষ নিপুণতার সহিত শাড়ীর পাড়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

মাতা যশোদা।

য়ুরোপের সাহিত্যে ও চিত্রে মেরি যেমন শাশ্বত মাতা, সকল মাতার প্রতিনিধি তিনি, বঙ্গসাহিত্যে তেমনি মাতা যশোদা এবং ভারতীয় সাহিত্যে মাতা কৌশল্যা মাতার আদর্শ। সেই মাতৃভাবটি এই চিত্রে চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতার মুখে স্নেহমুগ্ধভাব এবং শিশুর মুখে আনন্দ, শিল্পী অতি নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। চিত্রের পারিপার্শ্বিক বিষয়সংস্থানও অতি সুন্দর ও সুসমঞ্জসভাবে করা হইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যুর মাধুরী।

ভিক্টোরিয়াযুগের ইংরাজীশিল্পে যাঁহারা একটী নূতন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেন দান্তে গেব্রীয়েল রসেটী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ছয় জন প্রতিভাশালী ইংরাজযুবক ১৮৪৮

সালে "Pre-Raphælite Brotherhood" নাম গ্রহণ করিয়া রয়েল একাডেমীর প্রচলিত মামুলী পন্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র ধারণ করেন। রাপেলের পরগামী ইতালীয় শিল্পে রাপেলের প্রদর্শিত আদর্শের প্রভাব যে কৃত্রিমতা ও অসাড়তার অবসাদ আনয়ন করে এবং তাহার প্রভাবে তৎকালের ইংলণ্ডের চিত্রশিল্প, এই প্রাচীনতার বন্ধনে যে প্রাণহীন নিশ্চলতায় আক্রান্ত হয়, রসেটীপ্রমুখ নূতন শিল্পীগণ কেবল যে উহাকে মুক্তির পথে লইয়া যান, তাহা নহে, পরন্তু এই সূত্রে, ইংলণ্ডের জাতীয় শিল্পের ভিত্তি স্থাপনা করেন। তাঁহাদের মতে, রাপেলের পরগামী চিত্রশিল্পের কৃত্রিমভাব ও নির্জ্জীব আদর্শ অননুকরণীয় বলিয়া, রাপেলের পূর্ব্বগামী (Pre-Raphælites) চিত্রশিল্পীগণের চিত্রাবলী হইতে এই নূতনপন্থীগণ তাঁহাদের নূতন শিল্পের আদর্শ আহরণ করিয়াছিলেন।

এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পের প্রধান বিশেষত্ব—আদর্শপ্রবণতা ও নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতা। এই ভাবের অনুরূপ ও পরিপোষক যে শ্রেণীর মুখাবয়ব ও ভঙ্গীর অবতারণা তাঁহাদের চিত্রে দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতন ও ভাবব্যঞ্জক। রসেটীর চিত্রিত মূর্ত্তিগুলির মুখাবলী প্রায়ই গভীর আধ্যাত্মিক-চিন্তায় ক্লিষ্ট ও পাণ্ডুর অথচ এক নূতন অতি-পার্থিব মহিমায় মণ্ডিত ও রমণীয়।

রসেটীর সুবিখ্যাত চিত্র "বিয়েটা বিয়েট্রিক্স" তাঁহার বিশিষ্টভাব ও প্রতিভার উত্তম নিদর্শন। দান্তে ও বেয়াত্রিচের অপূর্ব্ব প্রণয়কাহিনী সাহিত্যানুরাগীমাত্রেরই অবিদিত নাই। দান্তের আত্মকাহিনী ও তাঁহার প্রণয়ের আধ্যাত্মিক পরিণতি তাঁহার Vita Nuova গ্রন্থে অমর হইয়া আছে। তাঁহার প্রণয়িণীর মৃত্যুর পর দান্তে এক অলৌকিক স্বপ্ন দর্শনে শান্ত ও আশ্বস্ত হন। তাঁহার পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন:—"যিনি সমস্ত জীবের প্রাণস্বরূপ তাঁহার যদি ইচ্ছা হয় যে আমি আরও কয়েক বৎসর জীবন ধারণ করিব, আশা আছে, সেই রমণীর সম্বন্ধে এমন কিছু লিখিব যাহা পূর্ব্বে কোনও রমণী সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই। তারপর যিনি করুণার প্রভু তাঁহার ইচ্ছা হউক যে ইহলোক ত্যাগ করিয়া আমার আত্মা উহার ঈশ্বরীর প্রভা ও সৌন্দর্য্যের অভিমুখে যাত্রা করুক—আমার আত্মার ঈশ্বরী, সেই প্রভামণ্ডিত সৌন্দর্য্যশালিনী বেয়াত্রিচে, যিনি এখনও অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহারই পানে চাহিয়া আছেন, যিনি সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার ও সমস্ত শোভন বস্তুর শোভা।"

রসেটী দান্তের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলি আশ্রয় করিয়া তাঁহার চিত্ররচনা করিয়াছেন। রসেটী আপনার স্ত্রী-বিয়োগের পরেই এই চিত্রটী রচনা করেন এবং তাঁহার মৃতপত্নীর আদর্শেই বেয়াত্রিচের মুখভাব কল্পনা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅঃ।

আলোচনা

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ।

বৈশাখের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ" নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "কবি হেমচন্দ্র তদীয় মাইকেলের জীবনীর একস্থানে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি দুর্লভ, আমার হস্তগত হয় নাই। এই পুস্তকের নাম "ছন্দঃকুসুম"—রচয়িতা ভুবনমোহন চৌধুরী। গ্রন্থখানি আন্দাজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে পাণ্ডব-চরিত কবিতায় বিবৃত হইয়াছে।" (প্রবাসী ৩০ পৃঃ)। মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা খুলিয়া দেখিলাম হেমবাবু পুস্তক ও গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন, প্রকাশের তারিখ বা বিবৃত বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। উল্লিখিত পুস্তকখানি আমি ১৯১১ নভেম্বর মাসে হেরিসন রোডে অবস্থিত একটি পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি আজও আমার নিকট আছে। তাহার টাইটেল পেজে এইরূপ লিখিত আছে—ছন্দঃকুসুম—সংস্কৃত ছন্দঃ সমূহ ভাষাতে প্রচলিত করণের নিয়মযুক্ত ভাষাছন্দোগ্রন্থঃ অথচ কাব্যচ্ছলে কৃষ্ণলীলা মানভিক্ষোপন্যাস—শ্রীভুবনমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক রচিত। কলিকাতা মির্জ্জাপুর অপার সারকিউলার রোড, নং ৫৮।৫, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শ্রীযদুনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৭০ সাল। ফাল্গুন। মূল্য দুই টাকা। হেমবাবু গ্রন্থকারের নাম "ভুবনচন্দ্র রায়চৌধুরী" ও আশুতোষ বাবু "ভুবনমোহন চৌধুরী" বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যে পুস্তকখানি পাইয়াছি তাহাতে ভুবনমোহন রায়চৌধুরী রহিয়াছে। নামের এই সামান্য বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা তিনজনে একই পুস্তকের কথা বলিতেছি, ইহাতে বোধহয় কোন সংশয় নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পুস্তকখানি ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত নহে, ১২৭০ সালে। ১২৭০ সাল অবশ্য ইংরাজী ১৮৮৪র অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ও পাণ্ডবচরিত নহে, "কৃষ্ণলীলা মানভিক্ষোপন্যাস।" প্রবাসীর পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই সংবাদটি দিলাম। পুস্তকখানি বড় কৌতুকাবহ। এতদবলম্বনে ভবিষ্যতে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

পুস্তক-পরিচয়

রঙ্গমল্লী —

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১২৯ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা। ছাপা কাগজ প্রভৃতি বাহ্যদৃশ্য সুন্দর।

এই পুস্তকে চার দেশের চারখানি নাটকের অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের আধুনিক শ্রেষ্ঠ নাটককার ষ্টিফেন ফিলিপ্সের "আয়ুষ্মতী"; ফ্রান্সের আধুনিক শ্রেষ্ঠ রূপককবি ও নাটককার মেটার-লিঙ্কের "দৃষ্টিহারা"; চীনদেশের প্রাচীন নাটক "সবুজ সমাধি"; এবং জাপানের রহস্য নাটিকা "নিদিধ্যাসন"। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি প্রবাসীতে ও শেষ দুইটি ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুখানি য়ুরোপের ও দুখানি এসিয়ার ভাবাভিব্যক্তির নিদর্শন।

'আয়ুষ্মতী' নাটিকাটির অন্তর্নিহিত বিষয় স্বদেশের সেবার জন্য প্রিয়তম বস্তুর বলিদান। লিচ্ছবীসেনা বৈশালী আক্রমণ করিয়াছে; পুরঞ্জয়কে পুরবাসীরা সেনাপতিত্বে বরণ করিতে আসিয়াছে। পুরঞ্জয় যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে দেবীমন্দিরে গিয়া যুদ্ধের ফলাফল জানিতে চাহিলে বাকসিদ্ধা বলিলেন যে যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইবে—

কিন্তু যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার
তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে,—
হোক পশু হোক নর,—বলি দিতে হবে জেন' তারে।

দেবীর বরে পুরঞ্জয় যুদ্ধ জয় করিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন; তাঁহার মাতৃহারা একমাত্র কন্যা তাড়াতাড়ি সর্ব্বাগ্রে বিজয়ী পিতাকে অভিনন্দন করিতে আসিল। পুরঞ্জয় কন্যাকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি নিজেকে সম্বৃত করিয়া নিজের হাতে নিজের একমাত্র সন্তানকে দেশের কল্যাণের জন্য বলি দিতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। এই এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে-কন্যা ভাবী বিবাহ-কল্পনায় দয়িতমিলনের সুখস্বপ্নে মগ্ন ছিল, এখন তাহাকে পিতার হাতে জীবন দিতে হইবে। তাহার ভাবী স্বামী আর্য্যধন ব্যথিত বিদ্রোহী হইয়া পুরঞ্জয়কে বাধা দিতে উদ্যত হইল; কিন্তু বীরের কন্যা আয়ুষ্মতী স্বদেশের বলিপ্রার্থনা অবহেলা করিতে পারিল না, বলিল—

এ যেন স্বর্গের ডাক!
পিতার মমতা-পাশ, পতিপ্রেম, সন্তানের সাধ,
সকলের চেয়ে বড়,—সব চেয়ে বড় এ আহ্বান!

* * * *

এমন মরণ হয় কার? হেন গৌরবের মৃত্যু?
ত্যাগ তোরা বৈশালীর লোক। বৈশালী সে রক্ষা হল,
আমি মরিলাম; মোরে বলি দিয়ে—মুক্ত হল দেশ।

* * * *

গৌরবের এ মরণ, তুচ্ছ বাঁচা এর তুলনায়।

পুরঞ্জয় আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন, যদিও

বিনা দুঃখে হয়নি সে কাজ, হয়নি সে বিনা শোকে!

শোক-দুঃখে হৃদয় মথিত হইলেও আপনার প্রিয় হইতেও প্রিয় সামগ্রী নিজ হাতে স্বদেশ-দেবতার চরণে বলি দিতে না পারিলে শত্রুর কবল হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিতে পারা যায় না, ইহাই এই নাটিকা-খানির ইঙ্গিত।

এই ভাবময় সুন্দর নাটকখানির প্রতি পংক্তি কবিত্বে ও প্রচ্ছন্ন করুণ রসে মণ্ডিত।

যেমন আসল নাটকখানি ভাবে রসে কবিত্বে সুন্দর, অনুবাদও তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। সরল স্বচ্ছ কবিত্বময় ভাষায়, অনাহত গম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে, একেবারে দেশী ছাঁচে অনুবাদটি আশ্চর্য্য রকম পরিপাটী হইয়াছে। কোথাও একটু জটিলতা, আড়ষ্ট ভাব, বা বিদেশী গন্ধ নাই। আর্য্যধন ও আয়ুষ্মতীর ভাবী সুখকল্পনা, শাশুড়ী ও বধূর কথা, পিতা-পুত্রীর বাক্য বিচিত্র রসে ও কবিত্বে মন মুগ্ধ করে। অতি অল্প কথার মধ্য দিয়াই সব চরিত্র কয়টিই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'দৃষ্টিহারা' নাটিকাটি গদ্যে রচিত। এই নাট্যের পাত্রপাত্রী সকলেই অন্ধ; তাহাদের মধ্যে একটি তরুণী, বাকি অপর সকলেই বৃদ্ধ; একটি স্ত্রীলোক উন্মাদ, তাহার কোলে একটি শিশু। দৃশ্য একটি দ্বীপের মধ্যে, সেস্থান অরণ্যময়। সময় মধ্যরাত্রি, আকাশ নক্ষত্রপ্রচুর ও গম্ভীর। অন্ধেরা একটা মঠ হইতে আসিয়াছে; একজন সন্ন্যাসী তাহাদের পথ-প্রদর্শক ছিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনো সাড়া না পাইয়া তাহারা মনে করিতেছে যে তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যেই মরিয়া পড়িয়া আছেন।

এই রূপকের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই:—সন্ন্যাসীরূপী ধর্ম্মানুশাসন বা শাস্ত্রকথা অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজের নেতা; সে কিছুদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া নিজেই মরিয়া পড়ে, অন্ধদিগকে পথ দেখাইতে পারে না। গভীর রাত্রির গহন-জটিল নীরবতার মধ্যে দূরে অনাবিষ্কৃত রহস্যসমুদ্র গর্জ্জন করিয়া অন্ধদিগকে ডাক দিয়া আরো ডরাইয়া তুলে; কিন্তু তাহারা জানে না যে অন্ধকারের মধ্যেও জাগিয়া আছে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র-রূপী অনন্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-সমুদ্রের অনন্ত প্রবাহ। সন্ন্যাসী অন্ধদের চালক বটে, কিন্তু তাহার নিজের অক্ষমতার আশঙ্কা সে নিজেই পদে পদে অনুভব করে; এবং যতই সে আপনাকে অক্ষম মনে করে ততই সে তরুণ হৃদয় অধিকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। যখন সে একেবারে মরিয়া গেল, তখন অন্ধরা কিছুক্ষণ গোলমাল করিয়া শেষে নিজেদের বুদ্ধিরূপিণী তরুণীর ইঙ্গিতে নূতন আশা ও বিশ্বাসের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া সকলে অন্ধ স্থবিরার কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "দয়া কর গো! অন্ধজনে দয়া কর।" উন্মাদ অন্ধের কোলে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুটি কেবল তখন দেখিতে পায়; সে কিজানি কি দেখিয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে আকুল হইয়া ভয়ঙ্কর কাঁদিতে লাগিল। ইহা নূতন জ্ঞান পাইবার ব্যাকুলতা।

শাস্ত্রে নির্ভর ও গুরুর প্রতি অন্ধ ভক্তি প্রভৃতিতে প্রাচীন ধর্ম্ম যখন কুসংস্কার ও যুক্তিহীন বিশ্বাসে পঙ্কিল আড়ষ্ট হইয়া উঠে তখন তাহাকে সুসংস্কৃত করিয়া গতিশীল করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি, এবং নূতন জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা—ইহাই রহস্যবিৎ কবি ইঙ্গিতে রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ রূপক রচনায় মেটারলিঙ্ক সিদ্ধহস্ত। অনুবাদকার্য্যটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মূলের রস কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

চীনের "সবুজ সমাধি" নাটকখানি করুণ মর্ম্মস্পর্শী প্রণয়কাহিনী, প্রাচীন প্রথানুসারে গদ্যে পদ্যে লিখিত। ইহা অনুবাদ-কুশলতায় আয়ুষ্মতীর পরেই স্থান পাইবার যোগ্য।

জাপানী রহস্য-নাটিকা "নিদিধ্যাসন" হাস্য-রসাত্মক। ধর্ম্মসাধনের ছলে ধূর্ত্তের নিজের মতলব হাসিল্ করিবার চিত্র! এই নাটিকাখানির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য নাই; তবে নরচিত্তের ভাবলীলা যে একেবারে নাই তাহাও নহে; ইহা শুধু সেই দিক হইতেই কথঞ্চিৎ উপভোগ্য।

এই নাটক সমষ্টির ভূমিকায় কবি অনুবাদক লিখিয়াছেন—

"বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তানে সুরে মৃত পল্লবি' উঠে

রাগিণী বিশ্বলীনা!
জীবন-রঙ্গ। শত তরঙ্গ
চির-ভঙ্গিমাময়,
স্ফুরি' নীহারিকা ফুটায় তারকা
অপরূপ অভিনয়।"

তাহা এই রঙ্গমল্লীর মধ্যে সুন্দর বিচিত্রতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

সতীশচন্দ্রের রচনাবলী—

৺সতীশচন্দ্র রায় লিখিত। প্রকাশক শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২৭৩ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাংলা দেশের লেখকদের মধ্যে প্রকৃত মনস্বিতা, ভাবুকতা, নিজস্ব মৌলিকতা বড় কম; তাঁহাদের রচনা পড়িতে পড়িতে তাহাতে ভাবের দৈন্য, কলাকুশলতার অভাব, জ্ঞানের পরিধির সঙ্কীর্ণতা, রুচির ক্ষুদ্রতা মনকে পীড়া দেয় এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় তাহারা যে কত খর্ব্ব তাহা মনে হইলে লজ্জিত হইতে হয়। সকল বিষয়ে দরিদ্র এই দেশে যদি বা কদাচিৎ কখনো দু-এক জন প্রকৃত ভাবুক লেখক নিজের মৌলিকতা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন তবে তাঁহারা দেশবাসীর কাছে যোগ্য সমাদর পান নাই। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যখন খাঁটি কবিত্বরস লইয়া একান্তে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন আমাদের দেশ অপরাপর স্বল্পভাব ও স্বল্পরস লেখকের রচনার প্রশংসায় একেবারে উন্মত্ত। বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ অখ্যাত অবজ্ঞাত হইয়াই আছেন, আধুনিক পাঠকের কয়জন তাঁহাদের কাব্যের নাম শুনিয়াছেন?

ইংলণ্ডে চ্যাটারটন ও কীটস্ অল্প বয়সেই মারা গিয়াছিলেন, এ বেদনা ইংলণ্ডের সাহিত্যিক সমাজ আজও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের স্বল্প জীবনের তরুণ রচনার মধ্যে ভাবীকালের যে পরিণতির আভাস ছিল তাহাতেই তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া আছেন; আর পরের মুখে ঝাল খাইতে পটু আমরাও সেই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমাদের বঙ্গজননীর কোলের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্র যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন তাহার বেদনা ত আমাদিগকে ব্যথিত করিতে দেখি না। ইঁহাদের ভাবসম্পদ দরিদ্র বাঙালীর শূন্যভাণ্ডারে ত মাথার মাণিক; য়ুরোপের ধনীর ভাণ্ডারেও এগুলি ফেল্‌না নহে।

সতীশচন্দ্র মাত্র ২২ বৎসর বয়সে লোকান্তরে গিয়াছেন। ইহারই মধ্যে উচ্চ আদর্শের খাতিরে দেশহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ, সংযম, নিষ্ঠা ও চরিত্রের দৃঢ়তা এবং স্বভাবের মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিতদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর সর্ব্বসাধারণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্বল্প রচনা। এই রচনার কিয়দংশ কবিতা, কিছু সমালোচনা, দু-একটি রস-রচনা ও সন্দর্ভ, এবং সামান্য ডায়ারি।

কবিতাগুলি এমন একটা সতেজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল যে একেবারে পাঠকের মনের উপর একটি ছাপ বসাইয়া দেয়; কোথাও যেন কিছু বাধা নাই, ভাবের দৈন্য নাই,—যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা অবলীলাক্রমে বলা হইয়া গেছে। ছন্দের মধ্যেও বেশ একটি তেজালো প্রবাহ আছে; প্রকাশের ভাষা একেবারে মাজাঘষা ঝকঝকে, কবিত্বরসে লাবণ্যযুক্ত। নমুনা দিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম—মনে হয় দুশ্চেষ্টা; সমস্তই তুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে। পাঠকেরা এক-একখানি বই কিনিয়া নিজেরা বিচার করিয়া দেখিলে মুগ্ধ হইবেন নিশ্চিত। আমি বইখানি হঠাৎ খুলিয়া দুই এক স্থান হইতে দুই চারি পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদূর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙিয়া পড়েছে চূর চূর—
যেথা ওই ঊর্দ্ধভাগে—সন্ধ্যার কালিমা লাগে
মর্ম্মর প্রাকার যেথা বনান্ত সুদূর—
—(দুঃখদেবতার মূর্ত্তি)।

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগর-মাঝে পড়ি
ডুবিয়া আছে তরী!
—(দিবাভাগে চাঁদ)।

অকস্মাৎ উড়ে গেল অগ্নিমুখো তীর—
কক্ষচ্যুত তারা যেন কালো যামিনীর—
অন্ধকার সরি যায় পিছে পিছে তারি—
চতুরঙ্গ চমূ হ'তে মোহ যায় ছাড়ি!
—(জামদগ্ন্য)।

আজি যদি পূর্ণ হত আজিকার মাঝে!
—(আজি)।

সকল কবিতাবই আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সমস্তই ভাবে এমনি সুন্দর, প্রকাশে এমনি অনবদ্য! প্রাচীন বঙ্গদর্শন ও সাধনার পর নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম আমলে প্রকৃত সমালোচনার পরিচয় আমরা কিছু কিছু পাইয়াছিলাম। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নূতনভাবে বিশ্লেষণ যেমন আমাদিগকে আশ্চর্য্য করিয়া দিতেছিল; অপরদিকে তরুণ সতীশচন্দ্রের বিচার ও বিশ্লেষণশক্তি, বিষয়ের মধ্যে গূঢ় অনুপ্রবেশ, ভাবপ্রকাশের পটুতা, জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছিল। ব্রাউনিং, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্যের তিনি যেরূপ গোছালো জমকালো নিপুণ সমালোচনা লিখিয়া সমালোচনার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন তেমন সমালোচনা একাল পর্য্যন্ত কদাচিৎ চোখে পড়িয়াছে।

ডায়ারির মধ্যে যেখানে তিনি নিজের একা, সকলের অন্তরালে নিজের মনটিকে খাতির চক্ষুলজ্জার তোয়াক্কা না রাখিয়া যেখানে খুলিয়া ধরিতে পারেন, সেখানেও আমরা তাঁহার হৃদয় মনের শুচিতা, জ্ঞান বোধশক্তি, কোমল অনুভূতি, কবিত্ব প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। এই ডায়েরির পাতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে একটি পরিচয় দিয়াছেন তাহা পরম উপভোগ্য।

এই সমস্তর মধ্যে তাঁহার ভাবের ঐশ্বর্য্য সব চেয়ে বেশি করিয়া চোখে পড়ে। এই প্রতিভা বয়সের অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞানে পরিপক্ব হইবার অবসর পাইলে কি উঁচুদরের সাহিত্যই সৃষ্টি করিতে পারিত তাহা হইল না। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য!

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার এই রচনাবলী প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের ধন্যবাদ-ভাজন। রসজ্ঞ পাঠকের নিকট ইহার সমাদর হইবে।

সনেট-পঞ্চাশৎ—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য আট আনা। ছাপা কাগজ পরিষ্কার।

সনেট ইটালির নিজস্ব জিনিস। তাহা এদেশে আমদানি করেন মাইকেল, বাংলার পয়ার ছন্দের ছাঁচে ঢালিয়া। প্রমথ বাবু সনেটের জন্মদাতা পেত্রার্কার ছন্দপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পঞ্চাশটি সনেট লিখিয়াছেন। প্রমথ বাবুকে ভাবুক গদ্য-লেখক বলিয়া জানিতাম; এবার জানিলাম তিনি ভাবুক কবিও বটে। সনেটগুলির মধ্যে খুব একটা সতেজ পুরুষালি ভাব আছে—ইহাই আমার মনে হয় ইহার প্রধান বিশেষত্ব; তারপর ছন্দের ও মিলের বাহার, বাক্যচয়নের কৃতিত্ব

প্রকাশে কবিত্ব প্রভৃতিও প্রচুর আছে; এই সমস্ত পরিপাটী পরিচ্ছদ পরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এক একটি জমাট ভাব। বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও রসের মাধুর্য্যে আগাগোড়া বইখানি ঝলমল করিতেছে।

সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক ওড়িয়া হইতে ভাষান্তরিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বামড়া রাজ্যের মিত্ররাজা শ্রীযুক্ত রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব ওড়িয়া ভাষায় যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহারই কতকগুলি এই গ্রন্থে অনুবাদিত হইয়াছে। ভূমিকায় বিজয় বাবু লিখিয়াছেন—"কবিতাগুলির অনুবাদ হইতেই পাঠকেরা কবির বিজ্ঞানানুরাগ এবং সাহিত্যচর্চ্চার পরিচয় পাইবেন। যদি এই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে মূল ওড়িয়া রচনা মুদ্রিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন যে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ এবং বিভক্তি প্রভৃতির জন্য যে-সকল পরিবর্ত্তন না করিলে চলে না, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পরিবর্ত্তন করি নাই। যথাসম্ভব কবির ভাষা এবং ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়াছি। * * * * যে-সকল স্থানে ওড়িয়া ছন্দ বাঙ্গলা রচনায় ঠিক জমাট বাঁধে না, সেই-সকল স্থলে ছন্দের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ওড়িয়ায় অনেক কবিতা গানের ছন্দে রচিত হয়।"

এই গ্রন্থে ১২টি কবিতা আছে। বিজয় বাবু সুকবি; তাহার সরস অনুবাদের পরিচয়ে মূল কবিতাও সুন্দর সরস বলিয়া মনে হয়। পরলোকগতা কন্যার প্রতি কবিতাটি করুণ অশ্রুসিক্ত। অনেক কবিতা বৈজ্ঞানিক তথ্যে ও কল্পনায় বেশ গম্ভীর। প্রকৃত কবিত্বেরও অসদ্ভাব নাই।

'বৈদিক প্রকৃতি' কবিতায় তিলকের মেরুনিবাস বিষয়ক তত্ত্ব বেশ গম্ভীর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার শেষ কয়েক ছত্র নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—

প্রতি দৃশ্যপটে
আঁকিছে প্রকৃতি দেবী নব বিচিত্রতা,
ফুটায়ে মাধুরী দিব্য চিত্র-তুলিকায়।
শত নব বিহগের গীত-মুখরিত
কুঞ্জতলে সঞ্চরিছে বিমুগ্ধ অনিল,
শীতল-শীকর-মাখা সুরভি লভিয়া;
নবীন যৌবনে ধরা নব কুসুমিতা।
হেরি সে ভবিষ্য চিত্র চারু চিত্তপটে
কোমল সৌন্দর্য্যরস-প্লাবিত অন্তরে
জাগিল আকাঙ্ক্ষা নব জীবনদায়িনী।
প্রেম-মুকুলিত নেত্রে চাহিল যুবক
যুবতীর অনুরাগরঞ্জিত বদনে।
কুসুম-সুবাস-ভরা যুবতীর শ্বাস
যুবার কপোলতলে ধীরে পরশিল।

ভীষ্ম, কাদম্বরী, গঙ্গাবতরণ, অনঙ্গ প্রভৃতি কবিতাও কবিত্বে মণ্ডিত।

এইরূপ অনুবাদ দ্বারা একদিকে বাংলা সাহিত্যের যেমন পুষ্টি হয়, তেমনি আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাবসম্পদের সহিত পরিচয়-লাভ ঘটে। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরও অনুবাদ বাংলা ভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজয় বাবু তাহারই পথ দেখাইয়াছেন; আশা করি এপথে কৃতবিদ্য যাত্রীর অভাব ঘটিবে না।

ভাবুকের গান

স্বর্গীয় মুন্সী কুলচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত। প্রকাশক শ্রীমতী হেমাঙ্গি চৌধুরী, কুমিল্লা। [illegible] ৮৩ পৃষ্ঠা, ভূমিকা ২১ পৃষ্ঠা। মূ[ল্য] ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগগনচন্দ্র সেন, টুণ্টা পোষ্ট আফিস, জে[লা] ত্রিপুরা।

ভগবদভক্তি, প্রার্থনা, নিবেদন, তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক ১০২টি গা[ন] আছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নবম সংস্করণ, ৮৩০ পৃষ্ঠ[া]। মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৲ এবং বাঁধাই ১।০। অষ্টম সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে। আকার বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে আগে মূল্য ছিল ১।০ ও ১৸০ আনা।

ইহাতে অষ্টম সংস্করণ অপেক্ষা ৪০০ গান অধিক সন্নিবেশি[ত] হইয়াছে। এখন মোট সঙ্গীত-সংখ্যা হইয়াছে ১৫০০। ইহাতে বঙ্গের একেশ্বরবাদমূলক প্রসিদ্ধ গানের প্রায় সমস্তই সংগৃহীত দেখ[া] যায়; এজন্য এই সংগ্রহপুস্তকখানির দুই দিক হইতে উপকারিত[া] আছে—প্রথম, ধর্ম্মসাধনের সাহায্যের দিক হইতে, এবং দ্বিতীয়[ত] সাহিত্যের দিক হইতে। এমন সঙ্গীতসংগ্রহ আর দ্বিতীয় আ[ছে] কি না সন্দেহ। সাহিত্যের হিসাবেও যেমন, ধর্ম্মসাধনের দিক দিয়াও তেমনি, এই গানগুলি অতুলনীয় এবং বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

এই সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে সঙ্গীত-রচয়িতাদে[র] নাম সংগৃহীত হইয়াছে। এই নাম-তালিকার প্রতি দৃষ্টিপা[ত] করিলেই দেখা যাইবে যে কত বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তেরা আমাদে[র] বঙ্গসাহিত্য ও বাঙালীর ভাবপ্রণালীকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছেন; এবং ইহা হইতে আরো বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মানে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়; ইহা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম, উদার বুদ্ধিমূলক সাধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিশিষ্টে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বীকৃত মূল সত্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে ব্রাহ্মসমাজের মত সাধারণে জানিতে পারিবেন, এবং বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদেরই দেশের চিন্তা ও সাধনপ্রণালীর বিকাশ, এবং ব্রাহ্মসমাজ আমাদেরই হিন্দুজীবনযাত্রাকে (অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান, অনাচরণীয় অস্পৃশ্য নির্ব্বিশেষে সমগ্র হিন্দুস্থানের জীবনযাত্রাকে) আধুনিক কাল ও অবস্থার সহিত মানাইয়া চলিবার চেষ্টা মাত্র। আশা করা যায় এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সুলভ হওয়াতে প্রতি গৃহে ইহা স্থান পাইবে।

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখের প্রবাসীতে ছাপা "বিজলি চমকে" ছবিখানির রচয়িতার নাম সূচীপত্রে শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহ লেখা হইয়াছিল। উহা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

বৈশাখের প্রবাসীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রসঙ্গক্রমে আমার প্রবন্ধের যে নামোল্লেখ হইয়াছে তাহা ভুল। "যোয়ানের জলের" পরিবর্ত্তে উহা "গন্ধ-তৈল পরীক্ষা-প্রণালী" হইবে।

নিবারণ বাবুর প্রবন্ধের নাম "উপবাস ও ক্লান্তি" হইবে; 'উপবাস-তত্ত্ব' নহে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, "কুন্তলীন প্রেসে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
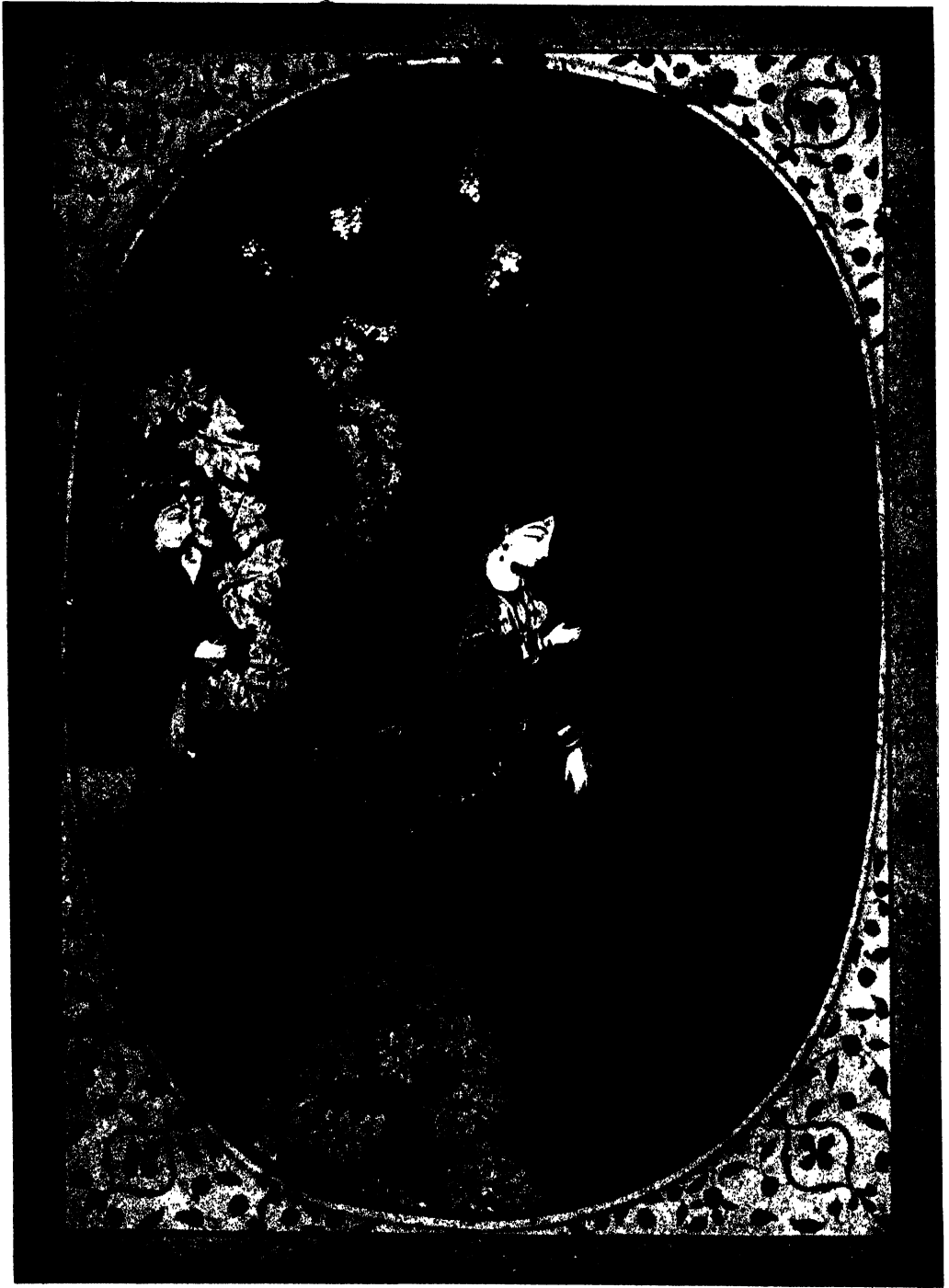
বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী,
গাঢ় ছায়া সারাদিন, মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২০

৩য় সংখ্যা

বর্ষা ঋষি

এস বারিধর, ঋষিবর, ওগো
ধারা-উপবীত-ধারী!
গভীর মন্দ্রে গাও হে ছন্দ,
গগন-কাননচারী!

নিমেষে নিমেষে কর উন্মেষ
বিজলী-যজ্ঞানল,
কোটী কোটী শত বিন্দু-মন্ত্রে
বাঁচাও পরাণীদল।

তবে যারা শুধু ইন্দ্রিয়হারা,
বৃথা সুখ-পানে রত,
সে সবারে ঘোর বজ্রাভিশাপে
মুহূর্ত্তে কর হত।

এস মুনিবর, পরহিতপর,
কৃষ্ণ-অজিনধারী!
কর অজস্র বিতরণ, শুভ
শুভ্র শান্তি-বারি।

অন্তিমে ধরি অমল কান্তি,
অনন্তে হও লীন;
নীরবে বাজুক্ ইন্দ্রধনুতে
তব মঙ্গল-বীণ্।

শ্রীরঘুনাথ সুকুল।

ধর্ম্মসমন্বয়

জগতের ইতিহাসের এক দীর্ঘ যুগ ধরিয়া দেখিতে পাই একত্বের প্রতি মানবের একটা প্রগাঢ় ভক্তি, এব বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একা আগ্রহ। ধর্ম্মবিষয়ে এই একত্বনিষ্ঠা যে প্রকারে আপনা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে অপর কোন বিষয়ে সেরূ হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগ একমাত্র সত্যধর্ম্ম আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ভাবিয়া তাহার প্রচারে ও সেই উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। অর্ব্বাচীনকালে এই একত্বনি অন্য ভাবে দেখা দিয়াছে। সমুদয় ধর্ম্মেই সত্যের পরিচ দেখিয়া এক শ্রেণীর লোক স্থির করিয়াছেন সমুদয় ধর্ম্মের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া এই সত্যসমূহে সমষ্টিকে সত্যধর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে এইজন্য বিবিধ ধর্ম্মচর্চ্চা ও প্রত্যেক ধর্ম্মের ভিতর হইতে তাহার শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা বর্ত্তমা যুগের একটি বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত করা যায়।

এই সমুদয় চেষ্টারই মূল সূত্র জগতে একধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা এমন একটা সত্যধর্ম্ম আছে যাহা জগতের সকল লো সমভাবে মানিয়া লইতে পারে, সেই ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভা সকল ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, ইহাই এ সমুদয় চিন্তাশীল ধর্ম্মনায়কদিগের অভিপ্রায়।

এইরূপ ভেদহীন ঐক্য ধর্ম্মে সম্ভব কি না? প্রকৃত ধর্

পদবাচ্য কিছু এইরূপ সার্ব্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

ধর্ম্মবিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা হইলে ইতিহাস আলোচনার দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে যে এইরূপ ভেদহীন ঐক্য ধর্ম্মে সম্ভব নয়। প্রথমতঃ মনে রাখা আবশ্যক যে ধর্ম্ম কেবল মাত্র বুদ্ধিসাপেক্ষ নহে। তাই বলিয়া ধর্ম্মকে ন্যায়বিরোধী (Irrational) হইতে হইবে, কিম্বা বুদ্ধি (Reason) দ্বারা ধর্ম্মের তথ্য-সকল হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না, একথা বলিতেছি না। কিন্তু যে-সকল তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানের ভিতর ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য নিহিত আছে তাহার সমস্তই কেবলমাত্র বুদ্ধির মানদণ্ডে পরিমাণ করিলেই চলিবে না ;—ধর্ম্মের করণ (organ) বুদ্ধি নহে, আমাদের সমুদয় সত্তা। যাহাতে আমাদের সমুদয় সত্তা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। তাহার মূল তথ্যগুলি সুনিয়োজিত বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি এবং তৎসমুদয় ন্যায়যুক্তির অবিরুদ্ধ, তাহাও হয়তো স্থির করিতে পারি। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা এইভাবে ধর্ম্মকে জানিলেই তাহার সত্য স্বরূপ নিঃশেষ করিয়া জানা হইল না, তাহা আয়ত্ত করিতে হইলে সমস্ত জীবন দিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া জীবনের সহিত সমন্বিত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে জীবনে ধর্ম্ম অনুস্যূত হইলে তাহার যে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি হয় তাহাই ধর্ম্মের স্বরূপ অনুভূতি ও স্বরূপ জ্ঞান। মানবের অস্থি পঞ্জর, মেদ মজ্জা, রস রক্ত প্রভৃতি সমুদয় শারীরিক উপাদানের স্বরূপ স্বভাব ও সংস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিলে মানব-শরীর এবং তাহাতে জীবনের ক্রিয়া সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে বটে, এবং সে জ্ঞান সাধারণ লোকের জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ বটে, কিন্তু জীবিত ব্যক্তি আপনার জীবনের ভিতর যে প্রাণের অনুভূতি পায় একমাত্র তাহাতেই জীবনের স্বরূপ জ্ঞান জন্মায়, এবিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। সেইরূপ ধর্ম্মবিজ্ঞান (Science of Religion) বা দার্শনিক ধর্ম্ম-তত্ত্বের (Natural Theology) সহায়তায় ধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে আমরা এক প্রকার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করিতে পারি বটে ; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যতই সুস্পষ্ট হউ না কেন, যে পর্য্যন্ত আপনার জীবনের ভিতরে ধর্ম্মে আয়ত্ত করিতে না পারি সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের স্বরূপ-জ্ঞা লাভ করিয়াছি বলিতে পারি না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় কথা স্মরণ রাখা আবশ্য যে, ধর্ম্ম কেবল কয়েকটি তত্ত্বের সমষ্টি নহে। কয়েক নিগূঢ় সত্যের রহস্য উদ্ঘাটন করাই যদি ধর্ম্মের কার্য হইত তবে হয় তো কেবল জ্ঞানচর্চ্চায় ধর্ম্মের স্বরূ আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু সত্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠ অপেক্ষাও জীবনগঠন ধর্ম্মের অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্য অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম হইতে ছাঁটিয়া ফেলিলে তাহার যাহ অবশিষ্ট থাকে তাহা বিজ্ঞান (Philosophy) পদবাচ হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম কেবল ঈশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, ইহার প্রধা কার্য্য ঈশ্বর সান্নিধ্য-সম্পাদনের চেষ্টা। এই উদ্দেশ্য সাধনে জন্য পূজা উপাসনা যোগ প্রভৃতি নানা জাতীয় অনুষ্ঠানে সৃষ্টি হয় এবং সেই সমুদয় অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের প্রাণ। একথ অবশ্য স্বীকার্য্য যে এ সমুদয় অনুষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য এক— ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সংযোগ ও আদান প্রদানে ভাব সৃষ্টি। কিন্তু সামাজিক আচার ও সংস্কার এবং ব্যক্তি-গত সংস্কার ভেদে এই এক উদ্দেশ্যেই নানা দেশে নানা অনুষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে।

আরও একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ধর্ম্মকে কোনও জাতি বা সমাজের সমগ্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে চলিবে না। জাতীয় জীবন ও ধর্ম্ম পরস্পরের ভিতর ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত এবং উভয়ে উভয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও গঠিত। ধর্ম্মানুষ্ঠান নানা দেশ ও নানা জাতির আচার ভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে এবং একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে সংস্কার ভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানও সকল দেশেই অল্পবিস্তর ধর্ম্মের দ্বারা নিয়োজিত ও গঠিত। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক কালের সামাজিক জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কয়েকটি সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমাজ এখন পর্য্যন্তও ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত। বিবাহ তাহার

মধ্যে একটি। অবশ্য বর্ত্তমান কালে প্রায় সকল দেশেই Civil Marriage বা ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য চুক্তিমূলক বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে বিবাহ আইনসঙ্গত করিবার জন্য দম্পতি এই প্রকার বিবাহ-অনুষ্ঠান করিয়াও আবার তাহার সহিত একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান যোগ করিয়া থাকেন। আর কেবল মাত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ হইলেও স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যে সম্পর্ক স্থাপিত করা হয় তাহা কেবল মাত্র চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধ।

বৈবাহিক সম্বন্ধ কেবল মাত্র চুক্তির (Contract) উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এবং সাধারণ চুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থার (Law of Contract) দ্বারা স্বামীস্ত্রীর সমুদয় সম্বন্ধ নিয়োজিত হওয়া উচিত, অনেক ব্যবহারবিৎ এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন। এবং বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ইংলণ্ড ও আমেরিকায়, এ বিষয়ে খুব আলোচনা হইতেছে। কিন্তু স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কেবল মাত্র সুখের দিক হইতে দেখিলেও Common Life (Consortium vitæ) বা একাত্মতার ভাব ব্যতীত বিবাহসম্বন্ধ কখনও স্থায়ী বা সুখপ্রদ হইতে পারে না। চুক্তিমূলক সমুদয় সম্পর্ক জীবনের ক্ষুদ্র অংশ সম্বন্ধেই চলিতে পারে ; কিন্তু যেখানে সমস্ত জীবনের আদান প্রদান, সমস্ত জীবনের প্রতি কার্য্য প্রতি চিন্তায় পরস্পরে সংযোগ, সেখানে চুক্তির ব্যবস্থা খাটাইতে গেলে সে ব্যবস্থা অচল হইবে এবং জীবনের সকল প্রবৃত্তির সহিত কঠোর সংঘর্ষে হয় সে ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, না হয় দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে। এ পরিণতি নিবারণের একমাত্র উপায় একাত্মভাব ; ইহা থাকিলেই দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হইতে পারে, ইহা না থাকিলে দাম্পত্য জীবনে স্থায়িত্ব অসম্ভব। রোমীয় ব্যবহার-শাস্ত্রে বিবাহসম্বন্ধ যতদূর চুক্তিমূলক করা হইয়াছিল এ পর্য্যন্ত জগতে কোথাও তাহা হয় নাই। তাহার ফলে রোমরাজ্যে বিবাহে স্থায়িত্ব এক রকম উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। দাম্পত্য সম্বন্ধ অতি অল্পই স্থায়ী হইত, এবং জুভেনাল (Juvenal) একটি রমণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন যিনি ৫ বৎসরের ভিতর ৮টি স্বামীর সহিত পর পর পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহ-সংস্কার বা একাত্মভাব ভিন্নও স্থায়ী সম্বন্ধ কোনও কোনও স্থানে হওয়া সম্ভব ; কিন্তু জাতীয় ব্যবস্থায় সে সম্ভাবনা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত কোনও জাতি বা কোনও সমাজে এমন ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই যাহার ফলে কেবল মাত্র চুক্তির বলে দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থায়ী হইয়াছে। অপর পক্ষে একাত্মভাব দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে ইহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের বাহিরে খুঁজিতে যাইতে হইবে না, বাহিরে খুঁজিলেও কোনও বিরোধী দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে না। বিবাহ সম্বন্ধে স্থায়িত্ব যদি বাঞ্ছনীয় হয় তবে বিবাহে এ একাত্মতা আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিবাহ সম্বন্ধে এ ভাব জন্মিতে পারে না। এই জন্যই সকল দেশে অদ্যাপি বিবাহ সম্বন্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইতেছে এবং দম্পতির পরস্পরে সম্বন্ধ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মমতের সহিত অনুষ্ঠানের সমাজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে স্বীকার করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যীশুখৃষ্ট যে ধর্ম্মম[illegible] জগতে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সহিত কোনও নূতন উপাসনা-পদ্ধতি বা কোনও নূতন সমাজ গঠনের চে[illegible] তাঁহার ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তিনি সম্ভব[illegible] য়ীহুদি সমাজে থাকিয়া য়ীহুদি পূজা-পদ্ধতি অনুস[illegible] করিয়াই তাঁহার নূতন তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলে[illegible] কিন্তু শীঘ্রই খৃষ্টীয় সমাজের সৃষ্টি হইল এবং খৃষ্টীয় অনুষ্ঠ[illegible] এবং খৃষ্টীয় সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে [illegible] নূতন জীবনের সৃষ্টি হইল। গুরু নানক যে ধর্ম্ম প্রব[illegible] করিয়াছিলেন তাহার অনুষ্ঠানেরও কোন বিশেষত্ব [illegible] না। প্রত্যুত তিনি যতদূর সম্ভব আনুষ্ঠানিক কুসং[illegible] দূর করিয়া কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক ধর্ম্ম সংস্থাপনের [illegible] করিয়াছিলেন, এবং গুরুপূজা তীর্থগমন প্রভৃতি [illegible] ষ্ঠানের যাহাতে সৃষ্টি না হয় এবং নানকপন্থীরা [illegible] সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের উপাসক হন এবং একটী বিশিষ্ট

সম্প্রদায়ে পরিণত না হন, সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শীঘ্রই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও গ্রন্থসাহিবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে অনুষ্ঠান স্বরূপে অবলম্বন করিয়া শিখ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। কিন্তু অনুষ্ঠানের অল্পতা ও সমাজবন্ধনের অভাব বশতঃ ধর্ম্ম বিশেষভাবে পুষ্ট হইতে পারিতেছে না এবং নানকের বিশুদ্ধ মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অবনতির দিকে যাইতেছে দেখিয়া গুরুগোবিন্দ যখন খালসাদিগকে একটী অপেক্ষাকৃত অনুষ্ঠানবহুল ধর্ম্মসম্প্রদায় রূপে গড়িয়া তুলিলেন, তখনই শিখ ধর্ম্মের প্রবল জীবনের প্রথম অভ্যুদয় হইল।

অতি আধুনিক কালের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও এই শিক্ষাই সুস্পষ্ট। রাজা রামমোহন রায় যে শত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া বসিবেন এ কল্পনা তাঁহার ছিল না। তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিতে এবং অনুষ্ঠানশূন্য আন্তরিক উপাসনা প্রচলন করিতে। কিন্তু এইরূপ অনুষ্ঠান-শরীর-শূন্য অবস্থায় কেবলমাত্র ধর্ম্মমত অধিককাল জীবিত থাকিতে বা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে না দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীক্ষামন্ত্র ও উপাসনাপদ্ধতির ফলে ব্রাহ্মসমাজ একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। সামাজিক বিধিব্যবস্থাও যে এই সম্প্রদায়ের জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা নববিধান এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান রহিয়াছে। এই সমাজ ও এই অনুষ্ঠানের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি কার্য্যক্ষেত্র ও অবলম্বন পাইয়া পুষ্ট ও পরিণত হইতেছে এবং জীবনে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসম্পাদনে সক্ষম হইয়াছে।

অপর পক্ষে ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মতত্ত্ব অনুষ্ঠান ও সমাজের অবয়ব ব্যতিরেকে যে স্থায়ীভাবে মানব-জীবনে আপনার অধিকার প্রচার করিতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্পীনোজার (Spinoza) দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্বের একটি পূর্ণাবয়ব শাস্ত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার সহিত কোনও অনুষ্ঠান বা সমাজ সংশ্লিষ্ট না থাকায় ধর্ম্মরূপে ইহা জগতে কোনও স্থান পায় নাই আমাদের দেশেও সাংখ্য ও বেদান্ত মত এইরূপ পূর্ণা পরমার্থতত্ত্ব; কিন্তু সাংখ্য বা বেদান্তের সহিত কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা সমাজ সংশ্লিষ্ট না থাকায় সাংখ্যধর্ম্ম বেদান্তধর্ম্ম সৃষ্টি হইতে পারে নাই। অপর পক্ষে রামান ও চৈতন্যের ধর্ম্মমতের সহিত অনুষ্ঠান ও সমাজের বন্ধ থাকায় তাহা জাগ্রত ধর্ম্মরূপে ভারতে প্রচারিত হইয়াছে

এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যাহ আমাদিগের সমস্ত সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সমস্ত জীবনে তৃপ্তিদান করিতে পারে তাহাই ধর্ম্ম। কেবলমাত্র ধর্ম্মতে আমাদের সত্তার তৃপ্তি হয় না। সত্যধর্ম্ম ও ঈশ্বরে প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত হইলে তাহাতে বুদ্ধি তৃপ্তি হইতে পারে কিন্তু আমাদের সমগ্র জীবন তাহাে পরিতৃপ্ত হয় না। ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং আমাদিগের কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে আমরা উৎসুক হই। ফলতঃ প্রেম বা ভক্তি ও কর্ম্ম ব্যতিরেকে আত্মার ঈশ্বর-সম্বন্ধের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। তাহা ছাড়া জগতের নিয়ন্তা, সমস্ত কার্য্যের দ্রষ্টা ও বিচারকর্ত্তা জগদীশ্বরের সমক্ষে দাঁড়াইয়া ধার্ম্মিকের স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় সমস্ত জীবনের ভিতর, সমস্ত ভাব চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর জগদীশ্বরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করাইতে এবং তাঁহার মহিমাময় রাজ্য সংস্থাপন করিতে। একবার এ মদিরা হৃদয়ে আসিলে জীবনের সকল সম্পর্ক সকল কার্য্যকলাপ ভিন্ন-আকার ধারণ করে। প্রাণ আর জীবনের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, আপনার সঙ্কীর্ণ জীবনের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া ভগবানের সেবায়, জগতের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য লোলুপ হয়। সুখ দুঃখ আপনার ভিতর লুকাইয়া রাখা যায় না, আনন্দে ইচ্ছা করে জগদীশ্বরকে আমার আনন্দের সাক্ষী করিতে, দুঃখে সাধ হয় তাঁহার নিকট কাঁদিতে। জীবনে যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, বা যে সুখ দুঃখ অনুভব করি, সকল বিষয়ে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করিতে চাই।

যে ধর্ম্মমত কেবলই সত্যতত্ত্বের বিবরণ, তাহাতে

জীবনের এই সমুদয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। এ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ভিন্ন ধর্ম্ম কখনও জীবনের ধারার সহিত মিশিতে পারে না। ধর্ম্মচর্চ্চা ধর্ম্মজ্ঞান যেন কোনও বাহিরের জিনিষের জ্ঞানের মতন জীবন-স্রোতের প্রধান ধারার সহিত অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। শবব্যবচ্ছেদসঞ্জাত শারীরজ্ঞান যেমন প্রাণের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না, এই ধর্ম্মতত্ত্বও সেইরূপ ধর্ম্মের স্বরূপ আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিতে পারে না, ধর্ম্মের প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের স্পর্শ হয় না। এই সমুদয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সেই জন্যই সমুদয় ধর্ম্ম প্রথমে যতই কেন নিরনুষ্ঠান ভাবে সৃষ্ট হউক না কেন, শেষে আপনার একটা আনুষ্ঠানিক অবয়ব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এবং ইহার জন্য একটা বিশিষ্ট সমাজেরও প্রয়োজন, সামাজিক ব্যবস্থার ভিতর এই বিশেষ ধর্ম্মের অনুগত অনুষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র হওয়া আবশ্যক। কারণ দৈনিক গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সকল অনুষ্ঠা-নের ভিতর তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্মমতকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে না পারিলে ধার্ম্মিকের মন তৃপ্ত হয় না। আরও এইরূপ অনুষ্ঠান-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে সেই সমাজধর্ম্ম সকলের মনেই সেই বিশিষ্ট-ধর্ম্মভাব অল্পবিস্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠে বলিয়া ধর্ম্মমতের স্থায়িত্ব ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয় তবে একটা ভেদরহিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম যে জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা সম্ভব নয়। ধর্ম্মের কয়েকটী মূল তত্ত্ব এমন বাহির করা অসম্ভব নয় যাহা সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর লোক অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে। কিন্তু এই তত্ত্বসমষ্টি ধর্ম্ম নয়। সজীব ধর্ম্ম হইতে হইলে ধর্ম্মশরীরের এই কঙ্কালকে রক্ত মাংসে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে, ইহার ভিতর একটী এমন শক্তি অনুস্যূত করিতে হইবে যাহাতে মানবের সমস্ত জীবনকে উদ্বুদ্ধ ও তৃপ্ত করিতে পারে। এরূপ করিবার শক্তি যাহা হইতে আইসে তাহাতেই ধর্ম্মের বিশেষত্ব। মানবপ্রকৃতি দেশে দেশে ও কালে কালে ভিন্ন ভাব ধারণ করে বলিয়া সে বিষয়ে ঐক্য কখনও সম্ভব নয়।

মানবের ইতিহাসের যে অধ্যায় অনুশীলন করা যায় তাহাতেই দেখা যায় যে মানুষ কখনও *abstract* অর্থাৎ বস্তুনিরপেক্ষ ভাবের অনুশীলন করে না। খাঁটি সত্য (Absolute Truth) এমনি একটা abstract বা বস্তুনিরপেক্ষ পদার্থ, যাহা সকল সত্যের ভিতরই অনুস্যূত আছে অথচ কোনও সত্যের সহিত ঠিক এক নয়। উইলিয়ম জেম্‌স্ প্রমুখ Pragmatistগণ এই খাঁটি সত্য বস্তুর সত্তা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে যাহা আমাদিগের সত্তাকে তৃপ্ত করে তাহাই আমরা সত্য বলিয়া মানি এবং আমাদের স্বভাবই সত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ামক। সুতরাং আমার পক্ষে যেটা সত্য, তোমার পক্ষে ঠিক সেইটা সেই অর্থে সত্য নহে; কেননা তুমি ও আমি ঠিক সকল বিষয়ে এক নহি; তবে তোমার ও আমার ভিতর কতকটা মিল আছে বলিয়াই কতক বিষয়ে তুমি ও আমি একই বিষয় সত্য বলিয়া মানি। এ কথার ভিতর এইটুকু সত্য অবধারিত যে মানুষে মানুষে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য কখনও সম্ভব হয় না, এবং পরস্পর অনৈক্যের কারণ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও তাহাদিগের সংস্কার ও ধারণার পার্থক্য। সুতরাং আমার সংস্কার ও ধারণা ও আমার সমুদয় সত্তার সহিত যেটা মিলিয়া যায় সেই-টাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমার সত্তার সহিত সেটা না মিলিলে তুমি সেটাকে অসত্য বলিয়া অবিশ্বাস করিবে। ইহা হইতেই মতের বৈষম্য উপস্থিত হয়।

কিন্তু এই যে মতবৈষম্য ইহাও চরম বৈষম্য নয় ইহা একটি চরম সাম্যের উভয় পক্ষে আংশিক অনুভূতি মাত্র। যাহা লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতেছি তাহার ভিতরে একটা গূঢ় সত্য আছে। আমরা উভয়েই সেই সত্যের ছায়া আমাদের স্বভাবের দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতেছি; দর্পণের আকৃতিগত তারতম্যে আমাদের উভয়ের কল্পনা ভিন্ন হইতেছে কিন্তু উভয় কল্পনার বিষয়গত মূলবস্তু এক সত্য। প্রকৃত কথা এই যে আমরা সকলেই মৌলিক সত্যের আশে পাশে ফিরিতেছি, প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট মার্গ ধরিয়া তাহার নিকট ঘুরাফির

করিতেছি, কিন্তু কখনও ঠিক সেই খাঁটি সত্যকে স্বরূপ ভাবে ধরিতে পারিতেছি না।

আমাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মগুলিও সেইরূপ এক সত্যকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোনও একটিই নিভাঁজ খাঁটি ধর্ম্ম নহে। এরূপ খাঁটি ধর্ম্ম আমাদিগের অনধিগম্য। আমরা যদি খাঁটি বুদ্ধি (Pure Reason) হইতাম তবে হয় তো সে খাঁটি সত্য আমরা ধারণা করিতে পারিতাম; কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নানাবিধ ভাব, সংস্কার ও ধারণার সমষ্টি; সেই সমুদয় ভাব সংস্কার ও ধারণা আমাদিগের বুদ্ধিকে রঞ্জিত ও বিকৃত করিয়া রহিয়াছে বলিয়া সত্য যে-বেশে আমাদিগের এই সংস্কারসমষ্টিকে তৃপ্ত করিতে পারে সেই বেশেই আমরা তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, অন্য কোনও বেশে তাহাকে সত্য বলিয়া চিনিতে পারি না, তাহার স্বরূপ অবস্থায়ও তাহাকে ধারণা করিতে পারি না। সমস্ত ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে সার সত্য তাহা যদি আমাদিগের নিকট উপস্থাপিত করা হয় তবে আমরা তাহা সত্য বলিয়া চিনিব না। ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক সমুদয় তত্ত্ব ও অনুষ্ঠানাদির সহিতই তাহা আমাদিগের সত্তাকে তৃপ্ত করিতে পারে, কেবল মাত্র ধর্ম্মের স্বরূপ সে তৃপ্তি আমাদিগকে দিতে পারে না।

"একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—এ কথা নিখুঁত সত্য। কিন্তু নানা মুনির মতের ভিতর কোনওটিকেই সত্য বলা চলে না। এই সমুদয় সৎপদার্থের নানা অভিব্যক্তি এইরূপে বৈদান্তিকের মায়ার ন্যায় "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়া"। ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঠিক তাই। ধর্ম্ম এক, কিন্তু নানাভাবে ব্যক্ত, কিন্তু ধর্ম্মের সেই নানা প্রকাশের কোনওটিকেই অধর্ম্ম বলা চলে না। এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র পরিচালক আমাদিগের আপনার সত্তা। যাহা আমার সমগ্র সত্তার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে তাহাই আমার ধর্ম্ম, যাহা সেরূপ করে না তাহা আমার পক্ষে ধর্ম্ম নহে।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হওয়া উচিত। বাস্তবিক তাহা সত্য। তবে মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত তারতম্য সব সময় গুরুতর হয় না বলিয়াই এক সমাজে এক দেশে এক যুগে প্রায়ই ব্যক্তিগত ধর্ম্মে কোনও বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয় না। আরও আমরা ধর্ম্মবিষয়ে সাধারণতঃ মানুষকে ব্যষ্টিভাবে না দেখিয়া সমস্ত ভাবে দেখি বলিয়াই, খুব গুরুতর পার্থক্য না দেখিলে পার্থক্যের দিকে বেশী দৃষ্টি দেই না। কিন্তু খুব ভাল করিয়া অন্তরের দিক হইতে দেখিলে দেখিতে পাই, যে, এক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত ধার্ম্মিক দুই ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক নহে; প্রত্যেকেরই একটা বিশেষত্ব আছে। একজন ধর্ম্মের যে-অঙ্গে তৃপ্তি লাভ করেন, অপরজন ঠিক সেই অঙ্গে সেইরূপে তৃপ্তি লাভ করেন না। অবশ্য যে-সকল সাধারণ লোক অন্তরে ধর্ম্ম তত বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি না করিয়া অনুষ্ঠানে নিমগ্ন আছেন, তাঁহাদের ভিতর এই পার্থক্য ততটা উপলব্ধি হয় না। কেননা তাঁহাদের ধর্ম্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তাহা শ্রুত ও বিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম জগতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহার প্রথম কারণ এই, যে, খাঁটি সত্যধর্ম্মের স্বরূপ মানুষের আয়ত্ত হয় না। প্রত্যেকে তাহা আপন আপন সংস্কার ও সাধনা অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ এই ধর্ম্মমত খাঁটিভাবে কখনও ধর্ম্মরূপে জগতে থাকিতে পারে না; অনুষ্ঠান ইহার অত্যাজ্য অঙ্গ। যে অনুষ্ঠানে একের তৃপ্তি হইবে তাহাতে অপরের তৃপ্তি হইবে না, সুতরাং সংস্কার ধারণা বুদ্ধি সাধনা প্রভৃতি অনুসারে অনুষ্ঠানগুলি নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা ভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে। তাহার পরিবর্তে কোনও এক অনুষ্ঠানমালার দ্বারায় সকল জাতি ও সকল ব্যক্তির তৃপ্তি সম্পাদন হইবে না। তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম যদি সমাজের ও সমাজব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ সজীব ও ক্রিয়াবান হইতে পারে না। সমুদয় মানবসমাজকে এক ব্যবস্থা-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চিন্তা অলীক কল্পনা। কিন্তু ইহা না হইলে ধর্ম্মের ঐক্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে না।

ইতিহাস আলোচনায় এই সত্যই সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে, কারণ ইতিহাসের সর্ব্বত্র মানবসমাজের সমুদয় অনুষ্ঠানের গতি দেখিতে পাই বৈষম্যের দিকে, ঐক্যের দিকে নয়। ধর্ম্মমত যেখানে এক হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া

কালের গতিতে তাহাও অনেক ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এবং ইহাদের ভিতর আবার কত শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। মুসলমানের মধ্যে শিয়া ও সুন্নী, আবার ইহার মধ্যে কত শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর তো মতভেদ শাখাভেদের অন্তই নাই। এইরূপে বৈষম্যবৃদ্ধির দিকেই ইতিহাসের গতি।

তবে কি সমন্বয় অসম্ভব? ভেদহীন এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাই যদি সমন্বয় হয় তবে আমার বিবেচনায় ধর্ম্মসমন্বয় অসম্ভব। কিন্তু সমন্বয়ের অপর এক পন্থা আছে,—জগতে সেই পথেই ধর্ম্মের সমন্বয় হইবে। ধর্ম্মের পথ ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু সকলের পরিণতি এক। আমি কোনও অলৌকিক পরিণতির কথা বলিতেছি না। এই পৃথিবীতেই দেখিতে পাই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রকৃত সাধক দুইজনের মধ্যে বৈষম্য অপেক্ষা সাদৃশ্যের ভাগ অধিক। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন মার্গে সাধনা করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ধর্ম্মমতের ভিতর অনেক অনৈক্য ছিল, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও উভয়ে উভয়ের একত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের যাহা হইয়াছিল সকল সাধকেরই তাহা হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনামার্গে পরিণতি লাভ করিলে এইরূপ ঐক্যই স্বাভাবিক। হিন্দু মুসলমান শিখ ও খ্রীষ্টান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুশীলনে একটা উচ্চ স্তরে উপনীত হইলে তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর যে একত্বভাব সূচিত হয়, তাঁহাদিগের নানা বৈষম্য নানা আচার ও বিশ্বাস ভেদের ভিতর দিয়া যে আন্তরিক ঐক্যের অনুভূতি তাঁহারা লাভ করেন, তাহাতেই সর্ব্বধর্ম্মের প্রকৃত সমন্বয় লাভ করা যায়। ধর্ম্ম যে-আকারে যাহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে, সে স্বাধীন ভাবে সেই আকারে তাহার অনুশীলন করিলে শেষে জগদীশ্বরের সান্নিধ্যের অনুভূতি ও তাঁহার সেবার গৌরবে সকল ধর্ম্মের সাধকের সহিত এক হইয়া যায়, তখন আর তাহার বৈষম্য থাকে না। তাহার ধর্ম্মমত যাহাই থাকুক না কেন, যে অনুষ্ঠান দ্বারা সে সাধনা করুক না কেন, ভাবের ঐক্যে সে সকল সাধকের সহিত এক হইয়া যায়—ইহাই ধর্ম্মের চরম পরিণতি, ইহাইধর্ম্মের সমন্বয়।

কিন্তু এই ঐক্য ও সমন্বয় সাধনার শেষের কথা, গোড়ার কথা নয়। এই ঐক্যের মূলতত্ত্বগুলি কোনও সাধক ঠিক করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ, কারণ সকলের ভিতর যে-অনুভূতির ফলে তাঁহারা এক তাহা একটা অনুভূতি মাত্র, ভাষায় বা কল্পনায় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তোলা যায় না। তাহা সাধনার পরিণতি, তাহা লইয়া আরম্ভ চলে না। সাধকের শেষ পরিণতিতে যে সাক্ষাদ্দর্শন (Intuition) হয় তাহা লইয়া সাধনা আরম্ভ করা চলে না, শুধু সেইটুকু লইয়া ধর্ম্মগঠন হয় না। নানা বিশিষ্ট ধর্ম্মের নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ঐকান্তিক সাধনার দ্বারায় এই সমন্বয় লাভ করিতে হইবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

আজমীর উর্স্

এবার বাংলা আষাঢ় মাসে আরবী রজব মাস পড়িয়াছে। রজব মাসে আজমীরে মুসলমান তীর্থযাত্রীদের বিরাট মেলা হয়; আফগানিস্থান প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গরিব-নওয়াজ খ্বাজা ময়নুদ্দিন চিস্তি একজন প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ছিলেন। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কোনো পীরের মৃত্যুদিবসে তাঁহার সমাধিমন্দির দরগায় ভক্তেরা সমবেত হইয়া যে উৎসব উপাসনাদি করেন তাহাকে বলে 'উর্স্'। খ্বাজা সাহেব ভারতবর্ষের সকল পীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত; এজন্য তাঁহার সম্মানের জন্য যে 'উর্স' হয় তাহাতে লোকের মেলা, উৎসাহ, উৎসব প্রভৃতি খুব জাঁকালো রকমেই হইয়া থাকে।

আজমীর উর্স ১লা রজব হইতে আরম্ভ হইয়া ৬ই পর্য্যন্ত থাকে। অমাবস্যার দিন হইতেই যাত্রীসমাগম আরম্ভ হয়। প্রতি রজনীতে হাজার হাজার দীপের আলোতে দরগা রোশনি করা হয়; রঙিন ফানুসে ঢাকা বিচিত্র ধরণের দীপের মালা পরিয়া দরগা এক অপূর্ব উৎসবশ্রী ধারণ করে। এ কয়দিন দিবারাত্রি দরগা খোলা থাকে, এবং দিবারাত্রিতে দর্শনার্থী যাত্রীর ভি
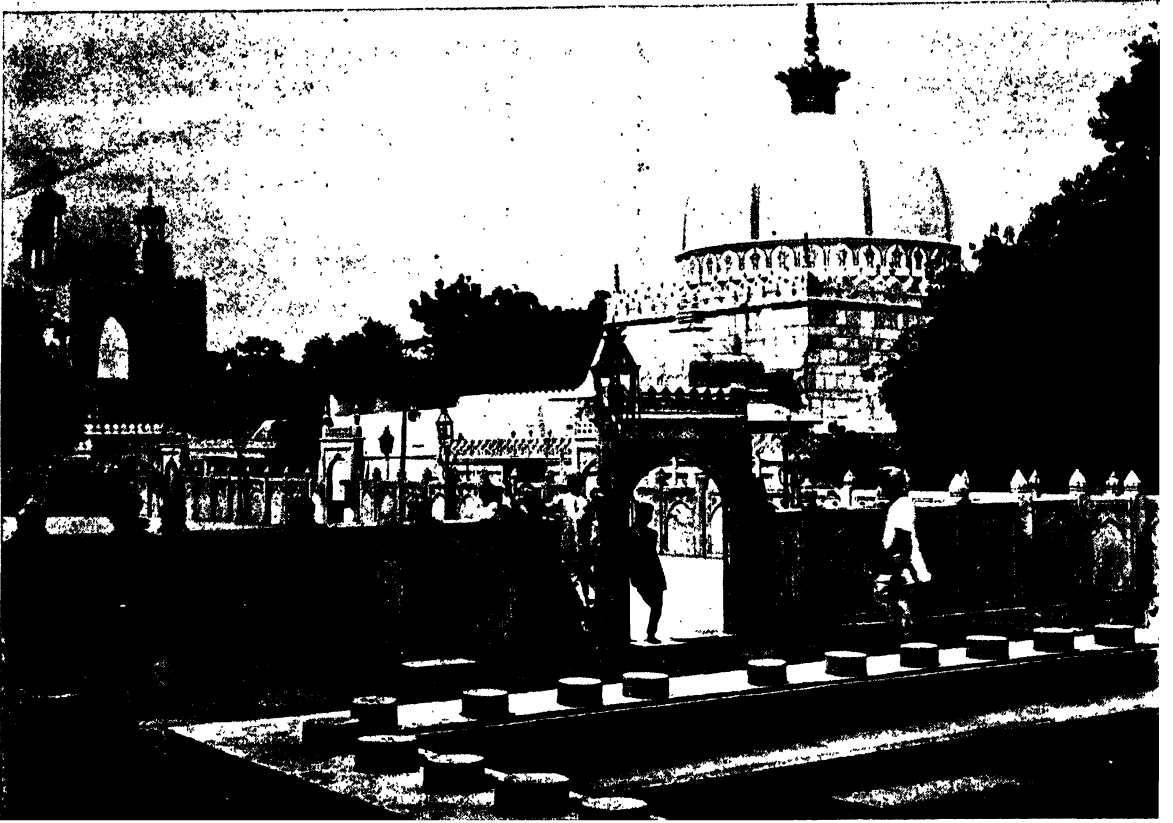
শাজাহানের মসজিদ হইতে খাজা সাহেবের দর্গার দৃশ্য।

সমান থাকে। দরগার অভ্যন্তরে পীরের মার্বেল পাথরের কবর পর্য্যন্ত যাইতে হইলে প্রথমে খাদিম বা পাণ্ডার সাহায্য ভিন্ন প্রবেশ করিবার উপায় থাকে না।

দরগার তোরণের দুই ধারে সারবন্দি দোকান বসে। সেই-সব দোকান হইতে যাত্রীরা পূজার ফুল, চন্দন, ধূপ ধুনা, লোবান, নৈবেদ্য প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লয়; বিবিধ খেলনার দোকানে ভিড়ের অবধি থাকে না, বাঁশি বাজনার বিপুল কলরবে কান পাতা দায় হইয়া উঠে। এই কলরব ভেদ করিয়া শুনা যায় ফেরি-ওলা তাম্বুলীর পান বেচার সুর, আর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ভিক্ষুকদের বাজখাঁই কণ্ঠে খাজা সাহেবের গুণকীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষার প্রার্থনাগীতি।

দরগার ভিতরেও বৈচিত্র্যের অভাব নাই। মাদারিয়া ও জালালিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ফকিরদের অদ্ভুত ও ভয়াবহ চীৎকার আকাশ বিমথিত করিয়া খাজা সাহেবের আশীর্ব্বাদ আদায় করিতে থাকে। গাছ হইতে বাদুড়ের মতন ঝুলিতে থাকে কত লোক, তাহারা এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া খাজাসাহেবের করুণা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার আশা করে। চঞ্চল জনসংঘ হইতে দূরে এক কোণে দীর্ঘ দাড়ি লইয়া মাথা গুঁজিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে কত 'মাশিক' বা প্রেমিক ভগবদ্‌ভক্ত। নক্কর-খানা হইতে নৌবতের নাফিরি (বাঁশীর) সুর থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে। চৌবাচ্চার ধারে কোনো মাল্‌কাজান বা জান্‌কী বাই গানের মজুরা লাগাইয়া আসর জমাইয়া তুলে। সন্ধ্যাকালে ভক্ত 'মেওয়াতি' নরনারী শিশুবৃদ্ধ ঘিয়ের প্রদীপ লইয়া খাজা সাহেবের ভজন গাহিতে গাহিতে আরতি করে। অন্ধকার গাঢ় হইলে দরগায় গানবাজনার সঙ্গে আরতি আরম্ভ হয়।
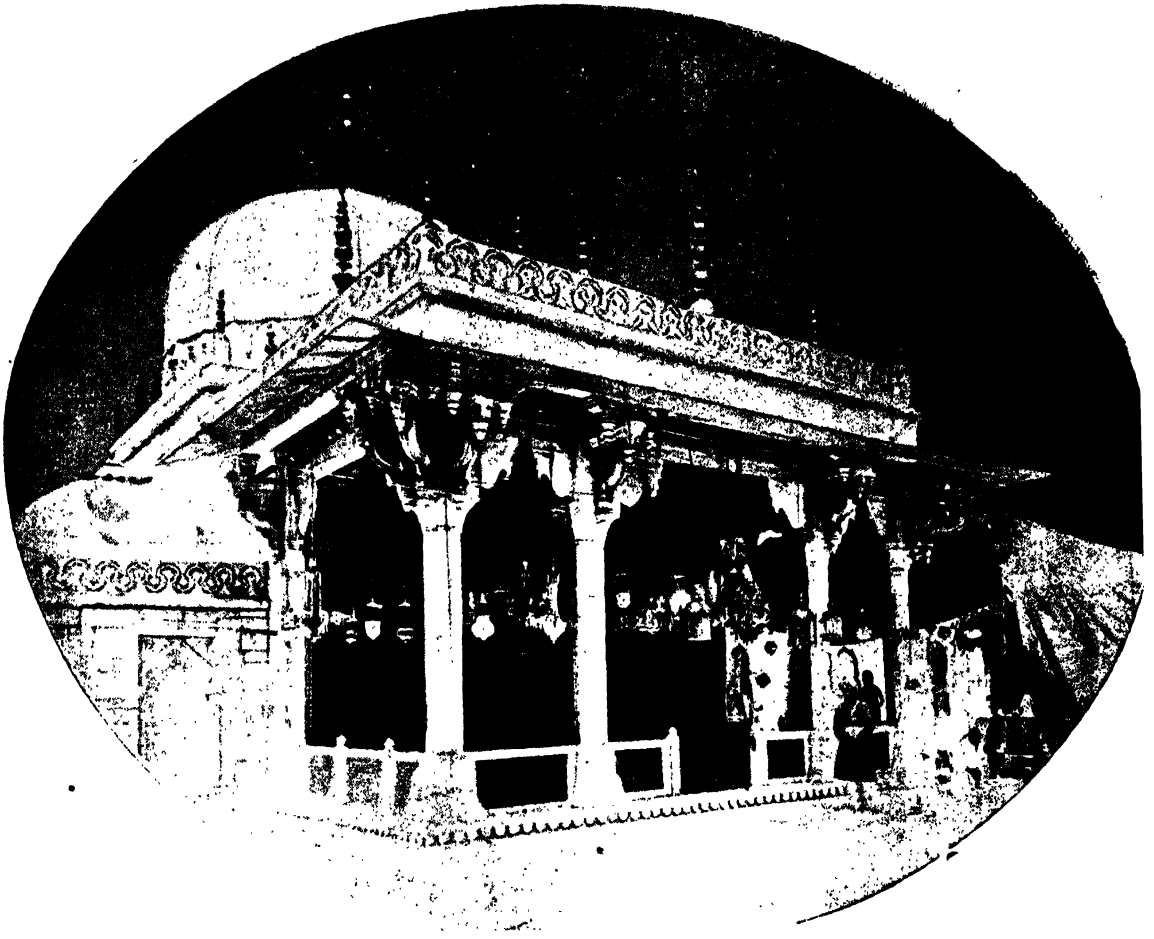
দর্গা প্রবেশের গড়-দরজা।

জিয়ারত বা তীর্থযাত্রার সুফল দিবার অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে খাদিম বা পাণ্ডারা। প্রত্যেক যাত্রীর এক একজন পাণ্ডা নির্ব্বাচন করিতে হয়; সে যাত্রীর বাসের আহারের পূজার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া খুসি হয়। উর্সের সময় খাদিমেরা শিকার ধরিবার জন্য রেলষ্টেসনে' ঘুরিতে থাকে; যাত্রী দেখিলেই গ্রেপ্তার করিবার জন্য হুটাপুটি লাগাইয়া দেয়। পাণ্ডার সঙ্গে দরগায় গেলে সে যাত্রীর নিকট হইতে টাকা লইয়া পূজার উপকরণ কিনিয়া গুছাইয়া লইয়া যাত্রীকে কবরের কাছে লইয়া যায়; যাত্রী পূজা করিয়া নত হইয়া শীতল কবরের উপর তাহার উষ্ণ ওষ্ঠ ঠেকাইয়া চুম্বন করে; এবং তখন পাণ্ডাজী জ[রি] কাজ করা কবরের আচ্ছাদনবস্ত্র যাত্রীর মাথার উ[পর] তুলিয়া ধরিয়া খুব দীর্ঘ মন্ত্র পড়িয়া যাত্রীকে আশীর্ব্ব[াদ] করিতে থাকে। ইহার পর যাত্রীকে কবরের [...] দিকে লইয়া গিয়া পাণ্ডাজী দুই হাত তুলিয়া ফতে[...] পড়িতে থাকে, যাত্রী সেই সঙ্গে যোগদান ক[রে]। তারপর কবরের উপর ফুল ও মালা চড়ানো হয়। পুনর[ায়] প্রণত যাত্রীর মাথার উপর কবর-ঢাকা কাপড়খা[না] তুলিয়া ধরিয়া পাণ্ডাজী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়ি[য়া] যাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করেন। তখন জিয়ারত শেষ [...] সুফল হয়। ইহার পর আর খাদিমের উৎপাত থা[...]

মহফিলখানায় উর্সের জনতা।

না; যাত্রী যখন খুসি তখন দরগার যেখানে খুসি সেখানে অবাধে ভিড় ঠেলিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতে পারে।

কব্বালী বা দরগার সঙ্গীত উর্সের একটি বিশেষ অঙ্গ। বহু শ্রোতা সমবেত হইয়া সঙ্গীত শুনে। সন্ধ্যার সময় মহফিলখানা (নাটমন্দির) আলোকাকীর্ণ করা হইলে সঙ্গীত সুরু হয়। এই মহফিলখানা হাইদরাবাদের স্যর আসমান ঝা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা শামিয়ানার আকারে প্রস্তুত একটি প্রকাণ্ড চতুষ্ক; ইহার নীচে সাত হাজার লোক বসিতে পারে। বৃহৎ চতুষ্কের মধ্যস্থলে প্রশস্ত পথ-ঘেরা আর একটি ছোট চতুষ্ক; এই চতুষ্কের উপর বেদির আকারে মসনদ সজ্জাদা (উপাসনার আসন); তাহাতে দিওয়ানজী (খ্বাজা সাহেবের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী) এবং মুতওল্লী (দরগার রক্ষক) বসেন। সজ্জাদার সম্মুখে কব্বাল বা গায়কেরা তাহাদের প্রাচীন ধরণের যন্ত্রপাতি লইয়া বসে। আর চতুর্দ্দিকে পা মুড়িয়া বিশেষ সম্ভ্রম ভক্তির ভাব লইয়া বসে অসংখ্য তীর্থযাত্রী নরনারী। ধূপধূনার ধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া চারিদিকে সুগন্ধ বিতরণ করে। দেওয়ানজীর হুকুম পাইবামাত্র তবলা, সারেঙ্গী, সেতার এক মধুর সঙ্গীতে বাজিয়া উঠে, আর তাহার সঙ্গে গান হয় হাফিজ, রুমি প্রভৃতি সুফী সাধুদিগের সুমিষ্ট গজল। নিস্তব্ধ শ্রোতাদের কানে মধু-ধারা বর্ষণ করিয়া গীত চলিতে থাকে। গান শুনিতে শুনিতে হঠাৎ কোনো সুফী ভক্তের 'দশা' লাগে; সে চীৎকার করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, মুখ খিঁচাইয়া, চোখ পাকাইয়া এক মহা পাগলামি হুলুস্থুল বাধাইয়া তোলে; সহস্র চক্ষুর কৌতুক দৃষ্টির দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও থাকে না; কব্বালেরা যে পদটিতে তাহার ভাব আসিয়াছে সেই পদটি বারবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া
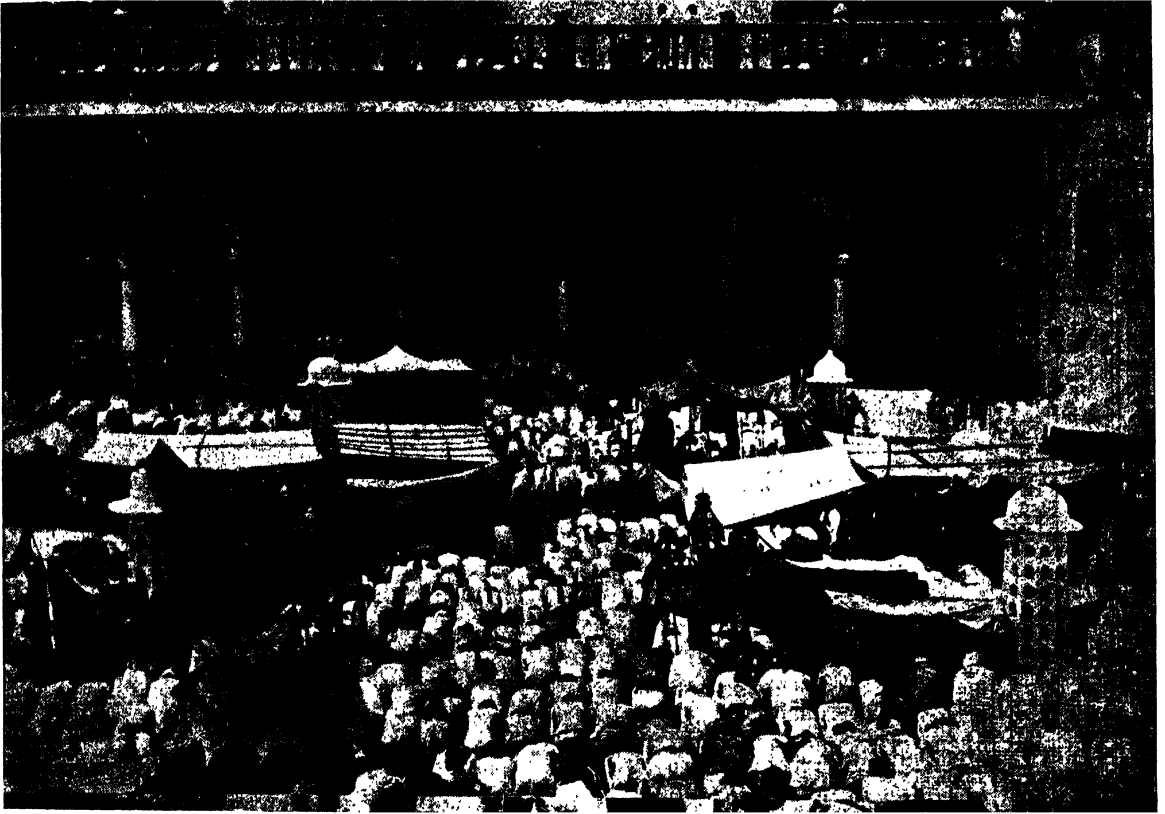
উর্সের সময় জুমা-নমাজ।

গাহিতে থাকে ; অনেকক্ষণ ধরিয়া একঘেয়ে গানে সকলে যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে তখন তাহার দশা ছাড়ে।

রাত্রি বারোটার সময় সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দেওয়ানজী ও মুতওল্লী ভক্ত যাত্রীদের দ্বারা সমাবৃত হইয়া কবরের ঘুসল্ বা অভিষেক দেখিতে যান। দুইজন পূজারী কবর প্রক্ষালন করিয়া তাহার উপর চন্দনচূর্ণ ছড়াইয়া দেয়। কবর-প্রক্ষালিত জল বোতলে ধরিয়া খাদিমেরা তীর্থযাত্রী-দের কাছে বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করে। কবরের উপর ছড়ানো গোলাপ ও চন্দনও তীর্থযাত্রী-দিগকে আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যরূপে দেওয়া হয়।

ঘুসল্ বা গোসল শেষ হইলে দেওয়ানজী ও মুতওল্লী মহফিলখানায় ফিরিয়া আসেন। সজ্জাদার সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াইয়া ফতেহা-গায়কেরা কোরান শরীফের 'সুরা' আবৃত্তি করিতে থাকে।

তারপর শিরণী বিলি হইলেই মহফিল বা জনতা চলিয়া যায়।

ছয়দিনই এইরূপ অনুষ্ঠান হয়। কেবল শেষ দিনে অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় আরম্ভ না হইয়া প্রত্যুষেই আরম্ভ হয়, এবং সমস্ত দিন খুব উৎসব চলিতে থাকে। শেষ দিনের উৎসবকে 'কুল' অর্থাৎ শেষ বা সমস্ত বলে। 'কুল' উৎসব রাত্রি ২টার সময় ভাঙে ; সেই সঙ্গে উর্সও শেষ হইয়া যায়।

তারপর রোশনি বা দীপদানের উৎসব। গন্ধবাতি কিনিয়া লইয়া যাত্রীরা দরগার সম্মুখে সারবন্দি হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেকের সামনে এক একটি খাঁচার আকৃতির 'সহন চিরাঘ' অর্থাৎ শামাদান বা বাতিদান রাখা হয় ; সেগুলি দরগারই সম্পত্তি। গন্ধবাতি তাহাতে পরাইয়া জ্বালিয়া দিয়া মিহি মসলিনের ঘেরাটোপ ঢাকা দেওয়া

বলন্দ দর্ওয়াজা।
বামদিকে বড়া ডেগ ও ডাহিনে ছোটা ডেগ দেখা যাইতেছে। ছত্তরিওয়ালা বেদী হইতে ডেগলুটের সময় ফতেহা পড়া হয়। খুর্পারি-কাটা স্তম্ভগুলিতে আলো দেওয়া হয়।

হয়; তখন প্রত্যেক যাত্রী আপন আপন সহন চিরাঘ মাথায় তুলিয়া লয়; সঙ্গে সঙ্গে নৌবতে নার্ফিরি সুর বাজিতে থাকে। বড় বড় পাগড়ীবাঁধা টুপিওয়ালা মাথার উপর জলন্ত শামাদানের দৃশ্য চমৎকার হয়। তখন দু'তিন জন করিয়া ক্রমে ক্রমে দরগার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সারবন্দি হইয়া দাঁড়ায়, এবং একজন খাদিম ভজন গাহিতে থাকে। তারপর সেই সব বাতিদান হইতে বাতি খুলিয়া কবরের রূপার বেড়ার উপর খাঁজে খাঁজে বসাইয়া দেওয়া হয়।

উর্স উৎসবের মধ্যে ডেগ-লুট ব্যাপারটিই সবিশেষ কৌতুকাবহ। বলন্দ দরওয়াজা বা উচ্চ তোরণ দিয়া দরগার হাতার ভিতরে প্রবেশ করিলেই দুটি প্রকাণ্ড ডেগ দেখিতে পাওয়া যায়—একটার নাম বড়া ডেগ, অপরটি ছোটা ডেগ। পাকা ইটের উনুনের উপর পোক্ত করিয়া ডেগ দুটি একেবারে গাঁথা; সিঁড়ি দিয়া ডেগের মুখের কাছে যাইতে হয়। কোনো ধনী যাত্রী ইচ্ছা করিলে এক ডেগ খানা দিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারেন। বড় ডেগের এক ডেগ রান্না করিতে হাজার টাকা খরচ পড়ে, ছোট ডেগে তাহার অর্দ্ধেক খরচে হয়। ইহা ছাড়া শো দুই টাকা দরগার লোকদের বক্শিশ দিতে লাগে। বস্তা বস্তা চাল, চিনি, মেওয়া, আর হাঁড়া হাঁড়া ঘি ও জল ঢালিয়া সমস্ত রাত প্রচণ্ড জ্বাল লাগাইয়া সকাল বেলা পোলাও নামে—নামে বলা ঠিক নয়, রাঁধা শেষ হয়। আঠারো হাঁড়ি পোলাও বিদেশী যাত্রীদের জন্য তুলিয়া লওয়া হইলে আজমীরের

জনসাধারণ ও খাদিমেরা সেই গরম আগুন পোলাও লুট করিতে ঝুঁকে। পুড়িয়া যাইবার ভয়ে লুটেরারা আপাদমস্তক কাপড় দিয়া জড়ায়। মুতওল্লী চাঁদনি-ঢাকা বেদির উপর দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া ফতেহা পড়িয়া ভগবানকে পোলাও নিবেদন করিয়া দ্যান। তারপর তিনি সরিয়া কোনো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিলে বালতি হাতে লোকেরা পোলাও লুটিতে ছুটে; তখন সিঁড়িতে আগে উঠিবার জন্য হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি লাগিয়া যায়; আগের লোক নীচে পড়িয়া গিয়া পিছাইয়া যায়, পিছের লোক সেই সুযোগে আগে গিয়া পৌঁছে। গরম ডেগের মধ্যে বালতি ডুবাইয়া ধোঁয়া-ওঠা গরম পোলাও ঘন ঘন তুলিতে থাকে আর দলের লোকের হাতে হাতে বালতি নিরাপদ স্থানে চালান হইতে থাকে। ডেগ খালি হইয়া আসিলে বালতিতে দড়ি বাঁধিয়া কূপের জল তোলার মত করিয়া পোলাও তোলা হয়; যখন আর তাহাতেও উঠে না, তখন অসমসাহসী মরিয়া কেহ লাফাইয়া ডেগের ভিতরে নামিয়া পড়ে; দেখাদেখি আরও পাঁচ সাত জন লাফ মারে; দেখিতে দেখিতে ডেগ চাঁচিয়া মুছিয়া সব পোলাওটুকু উঠিয়া শেষ হইয়া যায়। লুণ্ঠিত পোলাও শেষে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। পীরের দোয়াতে নাকি এই ভীষণ হাঙ্গামায় কোনো লোক খুন জখম হয় না। তথাপি সাবধানের মার নাই, পুলিশের বন্দোবস্ত ঠিক থাকে। মহফিলখানার উপর হইতে এই লুট দেখাই সুবিধা ও নিরাপদ।

এই দরগা সোনা রূপার আসবাবে বিশেষ সজ্জিত, ইহা বহু ধনীলোকের নিকট সাহায্য পাইয়া থাকে। মুসলমান বাদশাহদের দেওয়া জায়গীর কতক খাদিমেরা এবং কতক দেওয়ানজীর পরিবারের লোকেরা ভোগ করিতেছে। নজরানা আদায়ও অর্দ্ধেক দেওয়ানজীর ও অর্দ্ধেক খাদিমদের প্রাপ্য। এই দরগার ধনসম্পদ যথেষ্ট।

এই দরগা আলতামাশের রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়া হুমায়ুনের রাজত্বকালে শেষ হয়। বলন্দ দরওয়াজা আধুনিক কুরুচিতে বিশ্রী রঙে ঢাকা পড়িয়া গেলেও উহাতে জৈন স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই তোরণ কেহ বলে সুলতান মহমুদ খিলজির তৈয়ারি, কেহ বলে সম্রাট আকবরের তৈয়ারি। দরগার মধ্যে সুলতান মহমুদ খিলজি, আকবর এবং শাজাহাঁর তৈয়ারি মসজিদ আছে; শাজাহাঁর মসজিদে জুম্মা নমাজ হয়। বড় ডেগটি আকবরের এবং ছোটটি জাহাঙ্গীরের দেওয়া। পরে ঐ ডেগ দুটি পুরাতন হইয়া যাওয়াতে হাইদরাবাদের স্যর আসমান ঝা ও নবাব আলব আলি খাঁ দুজনে দুটি বদলাইয়া নূতন ডেগ দিয়াছেন। এই দরগায় দুটি প্রকাণ্ড পিতলের সহন চেরাঘ বা বাতিদান আছে; নক্করখানায় দুটি প্রকাণ্ড নাকাড়া আছে। কেহ কেহ (Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, p. 48.) বলে যে সেগুলি আকবর বাদশাহ চিতোর জয় করিয়া আনিয়া দরগায় উপহার দিয়াছিলেন; আবার তবকাত-আকবরী নামক ইতিহাস-প্রণেতা মৌলানা নিজামুদ্দিন লিখিয়াছেন—"১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের রমজান মাসের গোড়ার দিকে আজমীরের আকাশ বাদশাহী ঘোড়ার কস্তূরীবর্ষী পায়ের সুগন্ধী ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বাদশাহ ধূলাপায়ে খ্বাজা সাহেবের দরগায় গিয়া যথাবিধি পূজার্চ্চনা করিয়া বঙ্গ হইতে বিজয়লব্ধ এক জোড়া বড় নাকাড়া নক্করখানায় দান করেন।" অন্যান্য মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও বলিয়াছেন যে, এই নাকাড়া ও বাতিদান বঙ্গের সুলতান দাউদ খাঁর সম্পত্তি ছিল।

এই দরগার হাতার মধ্যে শাজাহাঁর কন্যা হারুননিসার কবর আছে।

এই দরগায় মুসলমান ছাড়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সে নিষেধ প্রীতির খাতিরে কেহ মানে না। হিন্দুরা পর্য্যন্ত খ্বাজা সাহেবের সমাধির কাছে যাইতে পায়। আমি যখন আজমীর গিয়াছিলাম, আমি খ্বাজা সাহেবের কবরে ফুল ও ধূপ দীপ চন্দন উৎসর্গ করিয়াছিলাম, কেহ আপত্তি করে নাই।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঁচ আঙ্গুলের খেলা

জগতে আমরা যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। যদি ইহা সম্ভবও হইত তাহা হইলে সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা যাইতে পারিত না। বস্তুর আকার ও বর্ণ কতকটা অনুকরণ করা সহজ ও সম্ভব। কিন্তু কেবল
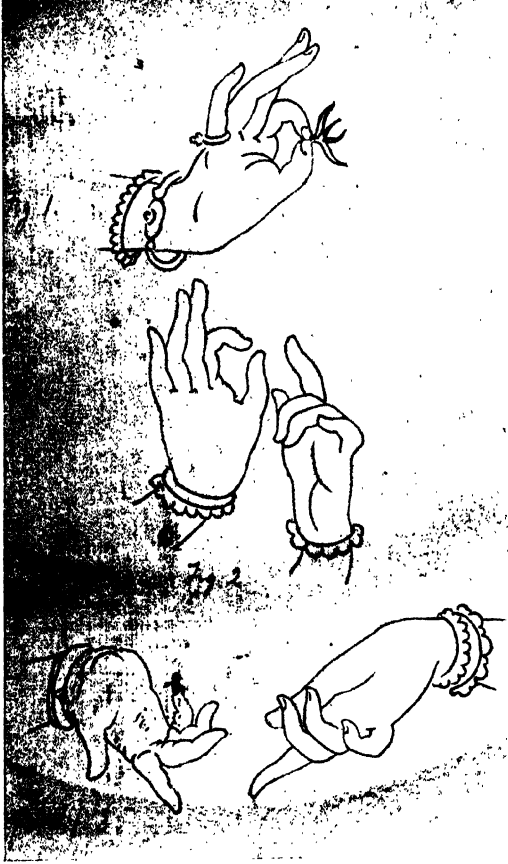
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ১।

আকার ও বর্ণের একটা অসম্পূর্ণ প্রতিরূপকে শিল্পলিপি বলা চলে না। ফুলটি ফোটে, তাহার সৌন্দর্য্য আশ-পাশের লতাপাতাকে স্পর্শ করে, বাতাসের সঙ্গে তার স্নিগ্ধ সৌরভ মিশাইয়া দেয়। ফুলের আকার ও বর্ণ কতকটা নকল করা সম্ভব, কিন্তু সে নকলে আসল ফুলের কতটুকু সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হয়? চিত্রিত ফুলে স্বাভাবিক ফুলের কোমলতা, পবিত্রতা ও সৌরভ কোথায়? প্রত্যেক রূপ, প্রত্যেক আকার, প্রত্যেক দৃশ্য কোন একটি ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকেই। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটি আঁকা তখনই সার্থক যখন শিল্পী তাহার আঁকা ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের কোমলতা পবিত্রতা ও সৌরভের আভাস দিতে পারে।

কোন একটি দৃশ্য দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া শিল্পী যে ভাবটি অনুভব করে তাহার একটি অসম্পূর্ণ প্রতিরূপের আভাস দেওয়া শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। শিল্পের যত মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব এই ভাব প্রকাশে। ভাবটি যত সুন্দর ও গভীর হইবে শিল্পের সাফল্য ততই সৌন্দর্য্যপূর্ণ, ততই শ্রদ্ধেয় হইবে।

বাক্য ও ভাষার মত কলাবিদ্যাও মানসিক ভাব প্রকাশের একটি উপায় বিশেষ। কিন্তু উক্ত দুইটি প্রকাশের উপায় অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বলিয়া অনেক সময় কাব্য সঙ্গীত ও চিত্রের মর্ম্ম চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হয়। কল্পনার সাহায্য না লইলে কি কাব্য কি সঙ্গীত কি চিত্র কোনটির মাধুর্য্যেরই পূর্ণ সম্ভোগ হয় না। কল্পনাকে পৃথক রাখিয়া যদি বাস্তব জগতের কেবল যে জিনিষগুলি চোখের সাম্‌নে পড়ে সেইগুলিকেই লইয়া নাড়া চাড়া করা যায়, তাহা হইলে কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রের অস্তিত্ব থাকে না।

কবির কাব্য স্বপ্নরাজ্যের কল্পিত ছবি। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে কোথাও ঠিক কবির কল্পনার মত কোন ছবি দেখা যায় না। প্রতিধ্বনি যেমন অনুভব করা যায় অথচ কোথায় কেমন করিয়া থাকে বোঝা যায় না, কবির কল্পনাও কোথায় যেন আছে বলিয়া মনে হয় অথচ খুঁজিয়া বেড়াইলে কোথায় আছে জানা যায় না। কাব্যের রস পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে নিজের কল্পনাশক্তি মুক্ত করিয়া কবির কল্পনার সহিত ছুটাইয়া দিতে হয়।

সঙ্গীতের মাধুর্য্যও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য কতকটা কল্পনার সাহায্য লইতেই হয়। সঙ্গীতের ভাবই চিত্তকে মুগ্ধ করে। কেবল শব্দ বা কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর হইলেই যে তাহাতে মোহিনী শক্তি থাকে এমন নয়। সময় বিশেষে শব্দ বা স্বরে মধুরতার অভাব সত্ত্বেও তাহার মধ্যে মাধুর্য্য আসিয়া পড়ে। সে মাধুর্য্য প্রাণ স্পর্শ করে, কেবল
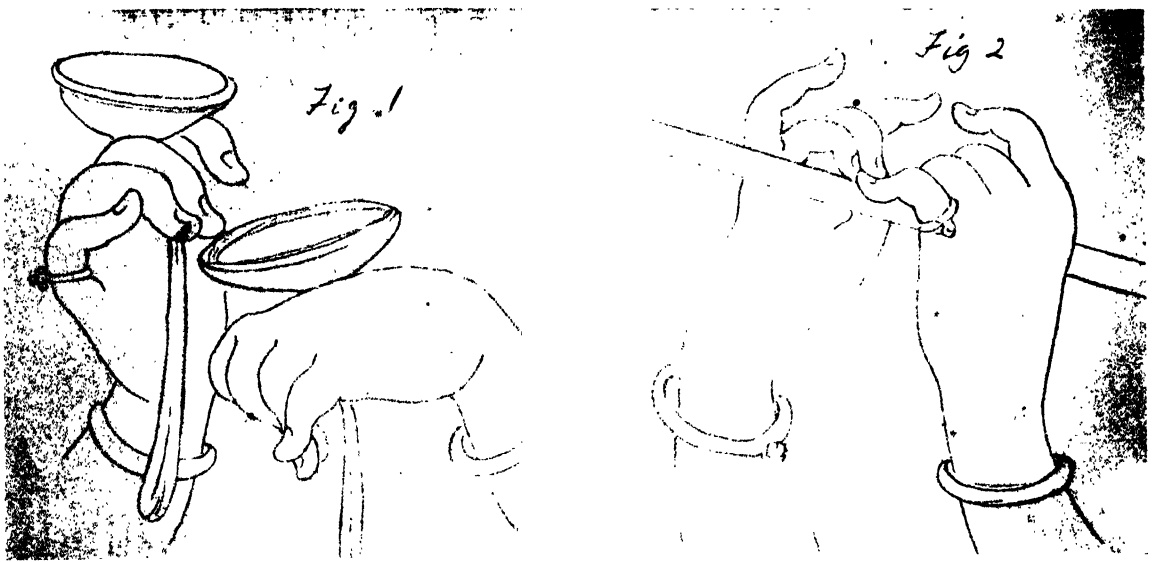
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ২।

কানে বাজে না। বাসন-বিক্রেতা যখন কাঁসর বাজাইয়া মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা নির্দ্দয় ভাবে ভাঙ্গিয়া দেয় তখন সে শব্দ বড় কর্কশ শুনায়। কিন্তু সন্ধ্যারতির ধূপধুনার গন্ধের সঙ্গে যখন সেই কাঁসরের শব্দ মিশিয়া যায় তখন সে শব্দে কেমন একটা কোমলতা, কেমন একটা আবেগপূর্ণ আবেদনের আভাস মনে আসে। সুকণ্ঠ হইলেই যে গায়ক হয় এমন ত নয়। গান ত অনেকেই গায় কিন্তু কয় জনের গান একবার শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা করে? কণ্ঠস্বর যেমনই হউক না কেন, যে সঙ্গীতে ভাব দিতে পারে সেই প্রকৃত গায়ক। অধিকাংশ গায়কের গানই কেবল কানে বাজে, মরমের কোথায়ও স্পর্শ করে না। কিন্তু এমনও ত গায়ক হয় যাহার গান একবার শুনিলে সর্ব্বদা সেই তান কানে বাজিতে থাকে, যাহার গানে কত ভক্তের ভক্তি, সাধকের সাধনা, প্রেমিকের প্রেমের কথা মনে পড়াইয়া দেয়! কত আকাঙ্ক্ষা, কত নৈরাশ্য, কত কাতরতা, কত কোমলতা, কত ছলনা, কত মিনতি, কত মান, কত মোহের আভাস মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করে, লুকান হৃদয়-তন্ত্রীর তারগুলি সজাগ করিয়া দিয়া প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়!

চিত্রের মাধুর্য্যও এমনি করিয়াই কল্পনার সাহায্যে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হয়। চিত্রের বিষয়টি কল্পনা করিয়া চিত্রকর প্রথমে কিছু আনন্দ অনুভব করিয়াছে, তাহার পর শিল্পে সেই ভাবটি প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। চিত্রকর যতই সুদক্ষ হউক না কেন তাহার মনের ভাবটি তাহার শিল্পে কখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা চিত্রকরের দোষ নয়, কারণ ভাব জিনিষটাই এমন যে কোন আকারের মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপে ধরা দেয় না। চিত্রে যে ভাবটি প্রকাশ পায় না অথচ যাহার একটা অস্পষ্ট আভাস চিত্রের সঙ্গে জড়িত থাকে, কল্পনার সাহায্যে সেই ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিল্প ভাব প্রকাশের একটি ভাষা বিশেষ। ভিন্ন দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে তেমনই বিভিন্ন দেশে শিল্পের আদর্শ ও শিল্পচর্চ্চার প্রণালী বা ধরণ বিভিন্ন প্রকারের।

রেখাঙ্কন (Drawing) চিত্রের ভিত্তি। কোন বস্তুর সাদৃশ্য দেখাইতে হইলে সেই বস্তুর আকারের অনুরূপ একটি রেখাঙ্কন (Drawing) একান্তই আবশ্যক। রেখাঙ্কন যেমন ভাল বা মন্দ হইবে চিত্রটি সেই পরিমাণে সুন্দর বা অসুন্দর হইবে। আঁকিতে শেখা বড় বিশেষ কঠিন নয়। কিন্তু ভাল

আঁকিতে পারাই প্রকৃত চিত্রকরের ক্ষমতা। রং করিতে পারা কারিকুরি বটে, কিন্তু সে নৈপুণ্য নিতান্ত হাল্কা রকমের। রং যেমনই হউক না কেন রেখাঙ্কনটি যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে ছবিটি সুন্দর হইবে, কিন্তু রেখাঙ্কনে যদি কোন গলদ থাকে তাহা হইলে কোন রংই সে

পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৩।

দোষ ঢাকিতে পারে না। ভাব প্রকাশ করে রেখাঙ্কন, বর্ণ নয়। যে রেখাঙ্কনটি সুন্দর করিতে পারে সেই প্রকৃত চিত্রকর; যে কেবল রং ফলাইতে পারে সে রং-সাজ। চিত্রকরের প্রধান শিখিবার জিনিষ এই রেখাঙ্কন। কিন্তু কেবল শিক্ষায় কাহাকেও চিত্রকর করিয়া দেয় না। শেখা যায় কেবল মাত্র গোটাকতক সাঙ্কেতিক কথা, গঠন প্রণালীর গোটাকতক বাঁধা নিয়ম। কি গড়িতে হইবে কোন শিক্ষক শিখাইতে পারে না; তাহার শিক্ষক কল্পনা ও প্রতিভা। উন্নত, সরল ও সুন্দর কল্পনার সহিত যদি রেখাঙ্কনটিও সেইরূপ ভাববিশিষ্ট সরলতাপূর্ণ ও

পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৪।

সৌন্দর্য্যময় হয় তাহা হইলে সে চিত্রের সাফল্যও পূর্ণ পরিমাণে হয়। চিত্রের বিষয় বাছিয়া লইতে ও তাহার ভিতরের ভাবটি ফুটাইবার চেষ্টায়, চিত্রকরের আদর্শ ও ক্ষমতার পরীক্ষা হয়।

ছবি আঁকিবার ধরণ যাহাই হউক না কেন, যখন চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ তখন কেবল সেইটি করিতে পারিলেই শিল্পীর শ্রম সার্থক। ছবি আঁকিবার ধরণ ত অনেক প্রকার। একা য়ুরোপেই ত কয়েক

প্রকার ছবি আঁকিবার ধরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য দেশের শিল্প যদিচ এককালে চীনদেশের শিল্পের কাছে ঋণী ছিল, তবুও সে ধার শোধ করিয়া সে একটা নিজের স্থান পাকাপাকি অধিকার করিয়া লইয়াছে। জাপানী শিল্পও জাপানীদের আদর্শের অনুরূপ। ভারতবর্ষেও এককালে শিল্পের একটা স্বতন্ত্র ছাঁদ ও গঠনপ্রণালী ছিল। কিন্তু অতীতের অনেক জিনিষের সঙ্গে সে শিল্পচর্চ্চার স্মৃতিটা বিস্মৃতি-রাজ্যের এক অন্ধকার কোণে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে! সময় থাকিতে পরিত্যক্ত বিস্মৃত সেই ভারতশিল্পের আদর্শ যদি উদ্ধার করিয়া তাহার আরাধনা করা হয়, তাহা হইলে হয়ত কোন দিন ভারত-শিল্পের সে অতীত গৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহার উদ্ধার প্রায় আশার অতীত এমন একটা পুরাতন পরিত্যক্ত জিনিষকে
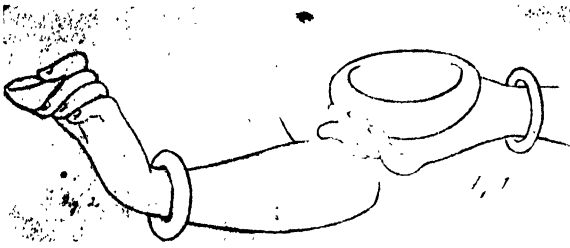
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৫।

লইয়া এত নাড়া চাড়া কেন? এবং ইহাও বলিতে পারেন যে আরও ত অনেক দেশের শিল্প রহিয়াছে সেইগুলির মধ্যে কোনটা গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি?

উত্তর ঃ— পুরাণ হইলেও জিনিষটা যে আমাদেরই! দম না দিয়া আমাদের শিল্পের ঘড়িটি বন্ধ করিয়া বসিয়া আছি। দোষ ঘড়িটির, না আমাদের? চর্চ্চা না রাখিলে শিল্পের আয়ু শেষ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বেলা হইয়াছে মানি, কিন্তু আমাদের ঘড়িটি যে ভোর বেলায়, যখন ঊষার আলোক সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই তখন, বন্ধ হইয়া গেছে! এখন ত আবার দম দিতে হইবে, পৃথিবীর অন্য ঘড়ির সঙ্গে চালাইতে হইবে, হোক না না হয় কাঁটা ঘুরাইবার সময় বেমানান ভাবে অসময়ের গোটাকতক ঘণ্টা বাজিবে!

দ্বিতীয় উত্তর ঃ—ঘরে ধন থাকিতে পথে ভিক্ষা চাহিব কেন? রাস্তায় না হয় মশাল জ্বলিতেছে কিন্তু তাহাতে ত ঘরের আঁধার দূর হইবে না। নিজের ঘরের মাঝে স্নিগ্ধ শান্ত প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে—হইলই বা ছোট—কিন্তু যে আঁধারটা আমাদের ঘিরিয়া আছে সেটা সে-ই দূর করিয়া দিবে, নিজের জিনিষ কোথায় কি ভাবে আছে সে-ই দেখাইয়া দিবে।

স্বতন্ত্রতা (Individuality) শিল্পকে বড় করে, তাহার মাহাত্ম্যকে বজায় রাখে। আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রে একটি সুন্দর ভাবপূর্ণ স্বতন্ত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়।
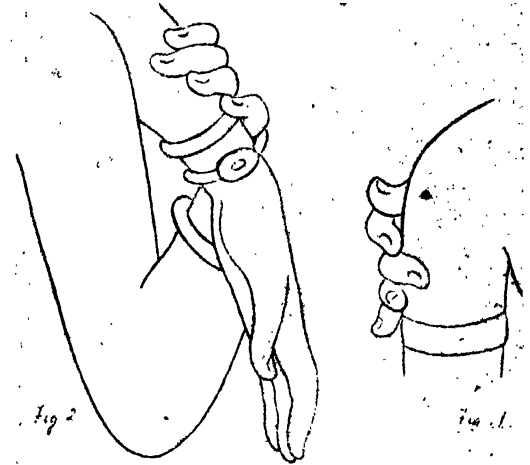
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৬।

এই বিশেষত্বই ভারতশিল্পকে এককালে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এই প্রাচীন শিল্প অধিকাংশই কালের করাল স্পর্শে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য যাহা-কিছু এখনও ধ্বংসাবশিষ্ট আছে কেবল তাহাই দেখিলে এককালে আমাদের দেশে শিল্পচর্চ্চা কতটা পূর্ণতা কতটা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রেখাঙ্কনেই চিত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। আমাদের প্রাচীন চিত্রে কতখানি সৌন্দর্য্য ছিল, অজণ্টা গুহা হইতে গৃহীত কয়েকটি রেখাঙ্কন তাহার পরিচয় দিবে। যে-সকল চিত্র হইতে এগুলি গৃহীত হইয়াছে সে-গুলি ষষ্ঠ ও সপ্তম (খৃষ্টীয়) শতাব্দীতে অঙ্কিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

প্রথম চিত্র ঃ—কয়েকটি হাতের প্রতিরূপ। সকলগুলির গঠনেই কেমন একটি সরল লাবণ্যের ভাব আছে। কেবল যে-কয়টি রেখার প্রয়োজন সেই কয়টি রেখাই আছে, কোন অপ্রয়োজনীয় বাজে রেখা অঙ্কিত হয় নাই। ১ম নক্‌সায় একটি ললনার হাতে একটি কুঁদফুল; ফুলটি ধরিবার ভঙ্গী কেমন সুন্দর! ২য় নক্‌সা জ্ঞানমুদ্রা; শিক্ষার ভাবটি স্পষ্ট প্রকটিত। ৩য় নক্‌সা নৈরাশ্য-ভাব-ব্যঞ্জক।
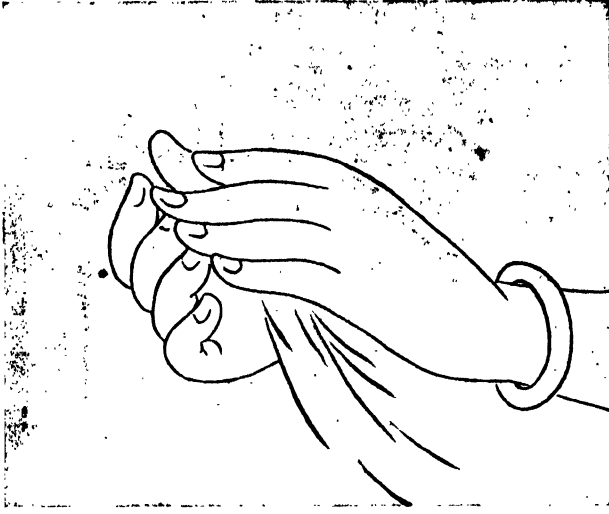
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৭।

দ্বিতীয় চিত্র ঃ—১ম নক্‌সা একটি রমণী করতাল বাজাইতেছে। হাত দুইটির গঠন এমন যে দেখিলেই মনে হয় যেন করতালটি কোন সুরের সঙ্গে তালে তালে বাজিতেছে। ২য় নক্‌সা বংশীবাদকের দুই হাত। আঙ্গুলগুলিতে কেমন একটি মৃদু স্পর্শ ও সাবলীল ক্রীড়ার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

তৃতীয় চিত্র ঃ—একটি চিন্তামগ্না রমণী। হাতটি গালে রাখায় চিন্তার ভাবটি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ চিত্র ঃ—একটি সৌখীন বাবুর হাত। সৌখীন বাবুদের অভাব কোন কালেই ছিল না—সেকালেও না। গহনা-পরা বাবুর হাতে একটি ফুল। ফুলের মত হাতের পাঁচটি আঙ্গুলও প্রফুল্ল বিকশিত।

পঞ্চম চিত্র ঃ—১ম নক্‌সা ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবের হাত। ভিক্ষাপাত্রে কেমন একটি শান্ত আহ্বানের আভাষ রহিয়াছে। ২য় নক্‌সায় একটি রমণীর হাতে পেয়ালা রহিয়াছে। পানীয়পূর্ণ পাত্রটি রমণী তাহার প্রিয়কে তুলিয়া দিতেছে। হাতটিতে লজ্জা ও সঙ্কোচের ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ চিত্র ঃ—প্রেমিক ও প্রেমিকার হাত। ১ম নক্‌সায় রমণীর স্কন্ধে তাহার প্রিয়তমের হাত রক্ষিত হইয়াছে। কেবল আঙ্গুলের আগাগুলি দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহাতেই কোমল স্পর্শের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ২য় নক্‌সায় রমণীর হাত সরলভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, প্রেমিক সেই হাতখানি তাহার নিজ বাহুপাশে বাঁধিয়াছে। হাতে হাতে কেমন সুন্দর স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে কেমন যুগল মিলন!

সপ্তম চিত্র ঃ—ভক্তের দুইটি হাত। প্রভুবুদ্ধের কাছে ভক্ত তাহার অন্তরাত্মার সকল ভক্তির অঞ্জলি দিতে আসিয়াছে যুক্তকরের এই নিবেদন।

অজণ্টা গুহার প্রাচীরে আঁকা মানুষের চরণের রেখাঙ্কন হাতেরই মত মনোরম ও ভাবব্যঞ্জক।

অষ্টম চিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বড় চরণটি একটি রমণীর। ইহাতে গতির ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। নিম্নে একটি রমণীর চরণযুগল। তাহার দক্ষিণে যে-সৌখীন বাবুর হাত চতুর্থ চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে তাহারই পা। পায়ের গঠন সুগোল, কিছু আরামপ্রিয় সৌখীনি রকমের। তদুপরি একটি প্রণত বালিকার চরণ। পায়ের তলদেশে যুগল-রেখা অলক্তক-চিহ্ন।

নবম চিত্র ঃ—একটি নর্ত্তকী। পাছে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সংসারের উপর বৈরাগ্য জন্মে সেই জন্য তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে সকল সময়ই আমোদ প্রমোদে নিযুক্ত রাখিতেন। এই নর্ত্তকী সিদ্ধার্থের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। নৃত্যের বিভোর ভাবটি তাহার হাতের ঐ পাঁচটি আঙ্গুল ব্যক্ত করিতেছে,—সুর তাল লয় সবই ঐ পাঁচটি আঙ্গুলের খেলার মধ্যে রহিয়াছে। সুরের আকুল আহ্বান, তালের কাল পরিমাণ, লয়ের পূর্ণতা, নৃত্যের গতি, সবই ঐ পাঁচটি আঙ্গুলে! অন্য হাতটির ছবি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাতেও যে এক অদ্ভুত
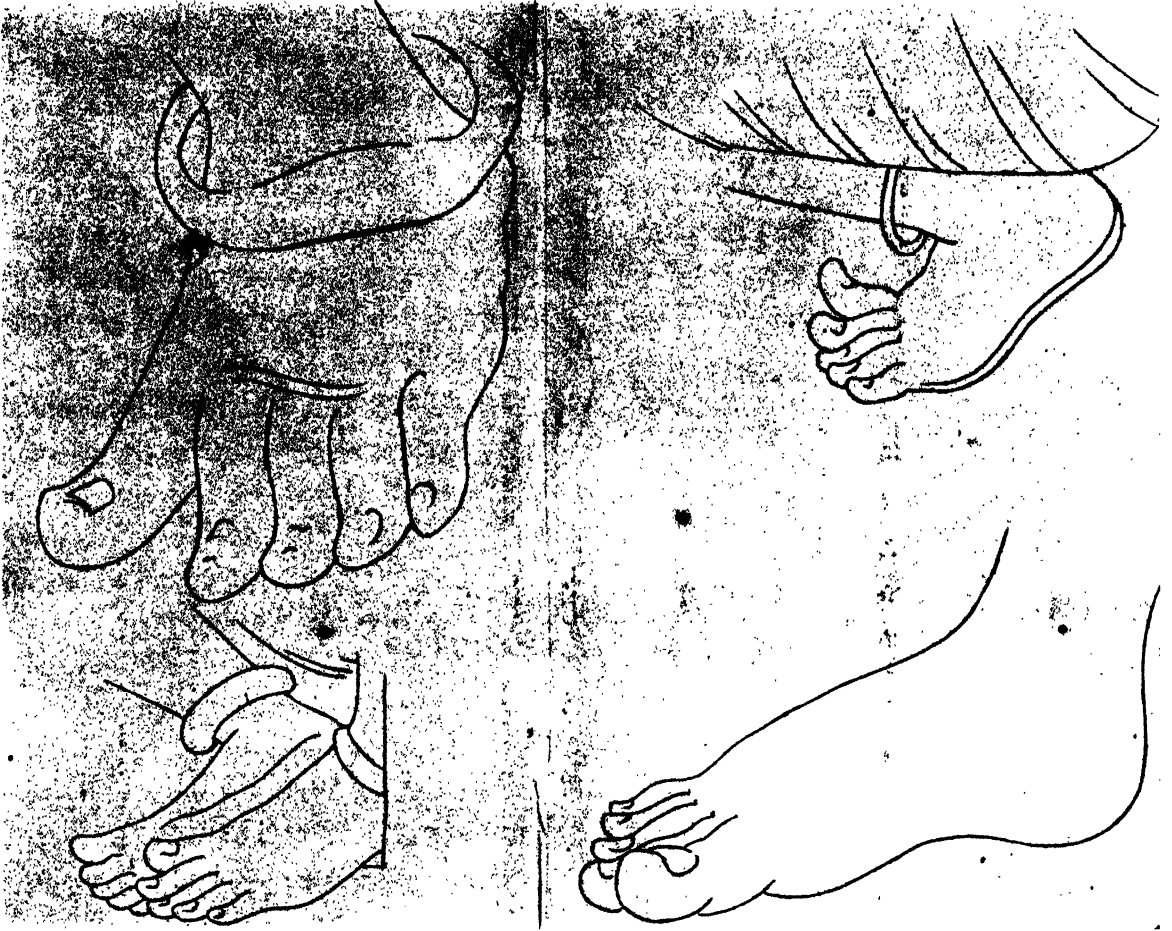
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৮।

মোহিনী শক্তি ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

দশম চিত্র :—পূর্ণপ্রস্ফুটিত শতদলের উপর বুদ্ধদেবের যুগল চরণ। পায়ের গঠন পূর্ণ ও সুললিত, শান্ত ও গম্ভীর—ভক্তের হৃদয়ে রাখিবার উপযুক্ত পদপল্লব।

অজণ্টার প্রাচীন শিল্পীদের শিল্প কি ভাবে কতটা সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছিল তাহা এই কয়টা রেখাঙ্কনের প্রতিলিপি হইতেই কিছু আভাস পাওয়া যায়। অজণ্টা গুহার ছবিগুলি কালের স্পর্শে ও অযত্নে অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাতেই অপরিমিত শিখিবার বিষয় আছে। কেবল যদি পাঁচটি আঙ্গুলের রেখাঙ্কন লওয়া যায় তাহা হইলে কত অসংখ্য অপূর্ব্ব সুললিত গঠনের নমুনা পাওয়া যায়। পাঁচটি মাত্র আঙ্গুল লইয়া কি করিয়া এই প্রাচীন শিল্পীগণ এইরূপ অসংখ্য গঠন গড়িয়াছিল ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। প্রত্যেক রেখাঙ্কনের প্রত্যেক রেখায় এক অপরূপ সৌন্দর্য্য এক উল্লাসপূর্ণ সরল খেলার ভাব। মনে হয় যেন শিল্পীদের চেষ্টা করিয়া কষ্ট করিয়া এ-সকল রচনা করিতে হয় নাই। যেন তাহাদের সাধনা এত ছিল, যেন তাহাদের মন এমন এক ভাবে বিভোর ছিল, যে, তুলির খেলায় তাহাদের মনের আদর্শটি বায়ুস্পর্শে পদ্মকোরকের মত আনন্দে অধীর হইয়া শতদল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিত। ভারতশিল্পের সেই এক গৌরবের দিন ছিল।

পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ৯।

অনেকে বলেন অতীতের নষ্টপ্রাণ শিল্পের উদ্ধার সম্ভব নয়। কথাটা সত্য বটে। কিন্তু ভারতশিল্প ত মৃত নয়, পরিত্যক্ত মাত্র। মৃত ও পরিত্যক্ততে প্রভেদ আছে। জলের অভাবে গাছ শুকাইয়া যায়, মৃতপ্রায় হইয়া যায়। জল হইলেই সেই শুষ্ক ডাল আবার ফুলপল্লবে শোভিত হয়। পরিত্যক্ত বলিয়া ভারতশিল্প আজ
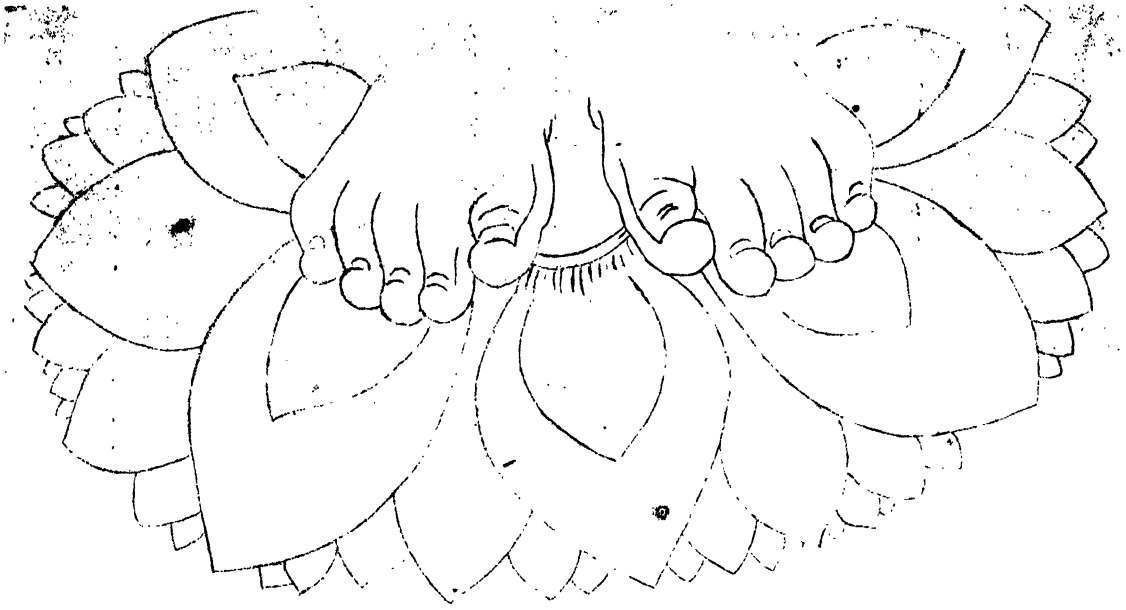
পাঁচ আঙুলের খেলা—চিত্র ১০।

আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত মৃতপ্রায় বলিয়া মনে হয়, হইবে নাই বা কেন? পরমুখাপেক্ষী হইয়া পথের কাঙ্গাল হইলে ঘরের লুকান ধনের সন্ধান জানিব কেমন করিয়া? সাধক আসুক, সাধনফলের অভাব হইবে না। অজণ্টার প্রাচীন শিল্পীদের কৃতিত্ব, সাফল্য, উদ্যম ও আরাধনা যেন আমাদের আদর্শ হয়। আদর্শ সর্ব্বোচ্চই হইয়া থাকে। অজণ্টা অপেক্ষা উচ্চতর পবিত্র আদর্শ কোথায়? আরাধনা-মন্দিরে ইষ্টদেবের পূজার স্থানে শিল্পের শ্রেষ্ঠরত্নের নিবেদন হইয়াছিল এই অজণ্টায়!

নক্সা থাকিলে স্তূপাবশিষ্ট ভাঙ্গাবাড়ীও পুনরায় খাড়া হইতে পারে। কারণ নক্সাটাই ভাঙ্গাবাড়ীর আকার ও গঠন কি ছিল বলিয়া দেয়। প্রাচীন শিল্পের আদর্শ, প্রাচীন শিল্পীদের সাধনা আমাদের জাতীয় শিল্পের নক্সা। কবে সেই নক্সার সাহায্যে আমাদের এই ভাঙ্গা শিল্পমন্দির উদ্ধার হইবে, তাহাতে আবার মঙ্গলারতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, শিল্পী নিজের সাধনফল অঞ্জলি দিয়া অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনিবে?

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

নির্ব্বাক

ভালবাসা থাক দৃষ্টি ভরিয়া
নির্ব্বাক চির দিন,
আলোকে আঁধারে আকাশের মত
অসীম-মহিমা-লীন!
বর্ষণে আর বিদ্যুতালোকে
খণ্ড মেঘের প্রায়
ক্ষণিক মোহের মুখর প্রকাশে
দীন করিব না তায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।
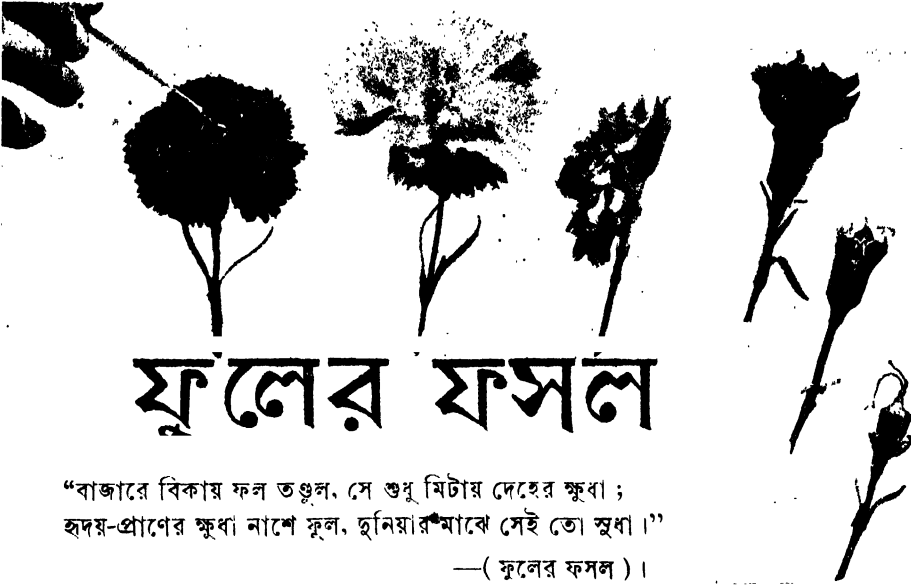
ফুলের ফসল

"বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল, সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা ;
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল, দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।"
—(ফুলের ফসল)।

মানব-মনের উপর পুষ্প ও পুষ্পোদ্যানের প্রভাব অতি পুরাতন। দেশে দেশে কালে কালে কত কবি ফুল ও ফুল-বাগানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন; কত শত ভক্ত ফুল দিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া প্রীত হইয়াছেন; কত প্রণয়ী প্রণয়িণীর মিলনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে এই ফুল আর ফুলবাগান; কত ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ ও কত পাপীর পাপেচ্ছা প্রশমিত করিয়াছে ইহারা। কাশ্মীরের শতদ্রু নদীর উপত্যকার দৃশ্য দেখিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল কাশ্মীরী শালের হাসিয়া; ফুলের নমুনায় ঢাকাই শাড়ীতে গুল, চুনুরী কাপড়ে নক্সা, ছিটের উপর বুটি। ফুল প্রসাধন ও প্রসাদন দুইই।

জগতের প্রাচীন সাহিত্যে বিলাসিনীর শ্রেষ্ঠ পুষ্পাভরণ স্বরূপে যে-সকল পুষ্পের নাম উল্লিখিত আছে তাহার স্মৃতি লইয়া কেহ যদি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কোন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই-সকল পুষ্পের পরিবর্ত্তে অভিনব কুসুমপুঞ্জের মনোহারী দৃশ্য দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্ময়াভিভূত হইতে হইবে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্যান-দেবতার রাজ্যেও অধুনা এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে যে, দিন দিন তাহা এক অতীন্দ্রিয় নন্দন-কাননের শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছে। বস্তুতঃ পুষ্পরাজ্যের এই সমৃদ্ধি এত অল্পদিনে ঘটিয়াছে যে, বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বকার কোন উদ্যানের সহিত বর্ত্তমান সময়ের কুসুমকাননের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। এই প্রভেদ কেবলমাত্র উদ্যান ও উদ্যানবাটিকার রচনা-পারিপাট্যে নহে, উদ্যানের বৃক্ষলতা পুষ্পের আকার প্রকারেও যথেষ্ট। বাগানের কেয়ারির বিবিধ সুসমঞ্জস আকার এবং স্বভাবত সুবৃহৎ বৃক্ষের খর্ব্বতা বা ক্ষুদ্র পুষ্পের বৃদ্ধি সাধন ও একই বৃক্ষে বিবিধ আকারের ও বর্ণের পুষ্পফলের সৃষ্টি আধুনিক উদ্যান-বিদ্যার বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনেকেই জানেন, এক জাতীয় প্রাণীর সহিত অপর এক জাতীয় প্রাণীর সহযোগে (cross breeding) আজকাল অনেক নূতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে। পুষ্প-সমূহের বিকাশ ঘটাইবার জন্য বা সৌষ্ঠব ও পর্য্যায় বৃদ্ধি করিবার পক্ষে এইরূপ বিভিন্ন বা একই জাতীয় দ্বিবিধ পুষ্পের বীজসংযোগও আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া থাকে।

কোনো জাতীয় পুষ্পকে বিশেষ আকার দিতে হইলে, সেই জাতীয় পুষ্পের মধ্যে ঈপ্সিত আকারের আভাস যে পুষ্পে অধিক পরিমাণে আছে এইরূপ দুইটি পুষ্প বাছিয়া লইতে হয়। তারপর নির্ব্বাচিত পুষ্প দুইটি হইতে খুব ধারালো ছুরি দিয়া একটির পুং-পরাগকেশর
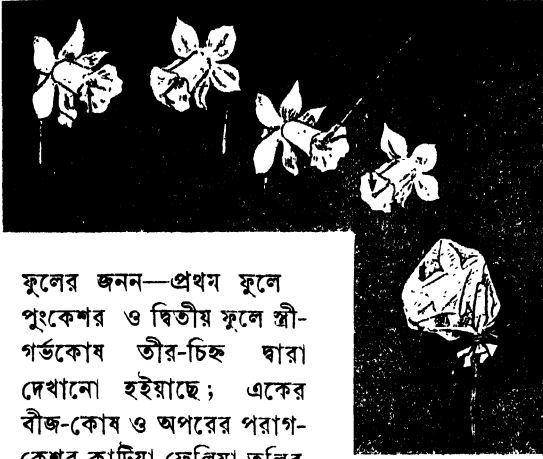
ফুলের জনন—প্রথম ফুলে পুংকেশর ও দ্বিতীয় ফুলে স্ত্রী-গর্ভকোষ তীর-চিহ্ন দ্বারা দেখানো হইয়াছে; একের বীজ-কোষ ও অপরের পরাগ-কেশর কাটিয়া ফেলিয়া তুলির দ্বারা পরাগকেশর হইতে বীজকোষে পরাগ-নিষেক করিয়া পুষ্পকে জালসমাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে।

ও অপরটির স্ত্রী-গর্ভকোষ কাটিয়া বাদ দিতে হয়। তার পর নরম উষ্ট্রলোমের তুলি বা অভ্যস্ত হইলে আঙুলে করিয়া একটি ফুলের পরাগ অপর ফুলের গর্ভকোষের

ফুলের আকার বৃদ্ধি—প্রবন্ধের শীর্ষদেশে প্রদত্ত চিত্রের বাম দিকের দুইটি ফুলকে জনকজননী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের হইতে উৎপন্ন বীজ-সঞ্জাত সন্তান এই রাইরঙ্গিণী ফুলটি, আকারে প্রকারে ও বর্ণে জনকজননী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

গায়ে আঠালো স্থানে প্রলিপ্ত করিয়া দিতে হয়। এখন গর্ভকোষ-যুক্ত ফুলটিকে ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন, নতুবা পতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা অনির্ব্বাচিত নিকৃষ্ট ফুলের পরাগ

মটর বা সুইট পী ফুলের পরিণতি; উহার আদিম ক্ষুদ্র আকার চিত্রের উপর দিকের ডাহিন কোণে তুলনার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রলিপ্ত হইয়া গর্ভকোষে নির্ব্বাচিত পরাগের ভাল বীজ না হইতেও পারে। গর্ভকোষ বীজ ধারণ করিলে পাপড়িগুলি ক্রমশ শিথিল হইয়া ঝরিয়া পড়ে এবং বীজকোষটি

ডালিয়া পুষ্পের পুরাতন প্রাথমিক রূপ।

ফলের গুটির আকার ধারণ করে (প্রবন্ধের শিরোনাম-যুক্ত চিত্র দ্রষ্টব্য)। সেই ফল পুষ্ট হইলে তাহার বীজও বাছিয়া আজ্জাইতে হয়। এই নির্ব্বাচিত বীজ হইতে আবার যে ফুল হয় তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুল বাছিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রক্রিয়া করিতে হয়। বারবার এইরূপ করিতে করিতে বংশানুক্রমের নিয়মে একটি গুণ অবশেষে প্রধান হইয়া উঠে। তাহার ফলে ক্ষুদ্র ফুল বৃহৎ, বা বিশেষ আকারের আভাসমাত্র সুস্পষ্ট করিয়া তোলা কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার হয় না। পুষ্প-পরিণতির সময় পুষ্পবিতানে বৈদ্যুতিকপ্রবাহ পরিচালনা কিংবা ভেষজ-প্রলেপ বা উষ্ণ বারিধারা প্রয়োগ করিলে ফলোৎপাদিকা শক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানতঃ এই-সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই নিত্য নূতন ফুলের ফসল জন্মাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। ফলে, বর্ত্তমানযুগের বনজাত সামান্য কুসুমও শোভাসৌন্দর্য্যে প্রাচীন রাজোদ্যানের পুষ্প-মহিমা নিষ্প্রভ করিতে পারিয়াছে। এক্ষেত্রে সুদক্ষ লুথার বারবাঙ্কের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে প্রবাসীতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। একই জাতীয় দ্বিবিধ পুষ্পের বীজসংযোগে মূল পুষ্পের

ডালিয়া পুষ্পের মাধ্যমিক অবস্থায় চন্দ্রমল্লিকার সাদৃশ্য লাভ।

আকৃতিপ্রকৃতির যে পরিণতি ঘটে, প্রবন্ধানুসঙ্গিক চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ডালিয়া পুষ্পের পরিণত অবস্থা—ইহার পাপড়িগুলি অন্তর্ম্মুখীন ও কুঞ্চিত এবং আকারে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

রাইরঙ্গিণী বা কার্ণেসন্ আদিম অবস্থায় পাঁচটি পাপড়িযুক্ত অকিঞ্চিৎকর বন্যকুসুমস্বরূপে পরিচিত ছিল
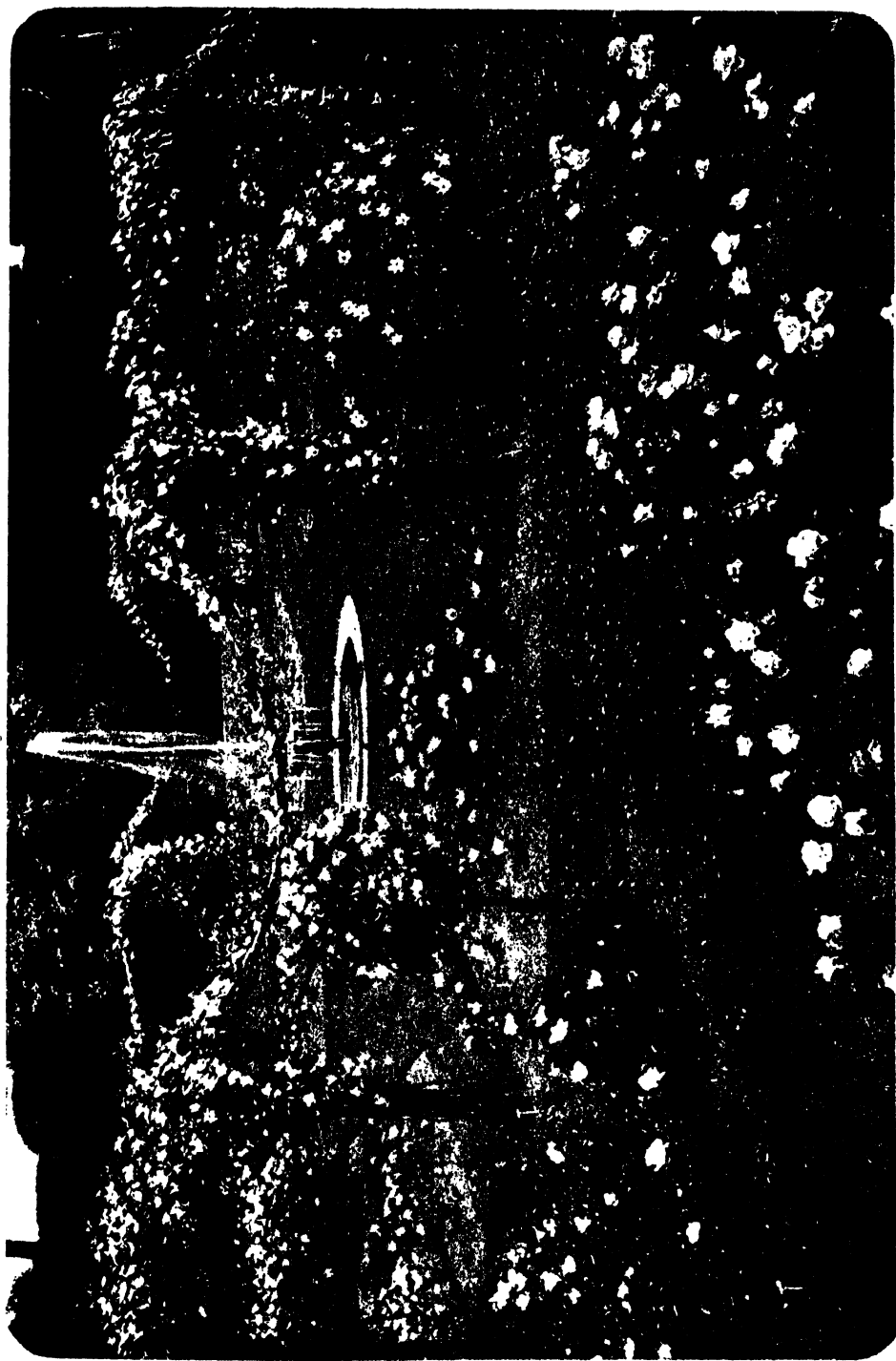
গোলাপের বাগান।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজসংযোগের ফলে কালে ইহা বৃহত্তম ও রমণীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাক্ষস-মুখী ফুল।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মটর বা সুইট পী পুষ্পের নয়টী মাত্র পর্য্যায় দৃষ্ট হইত; অধুনা তৎস্থলে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে তিন শতেরও অধিক। পূর্ব্বে একই নালে

ব্যাঘ্রমুখী-ফুল।

এই কুসুমের দুইটীর অধিক বিকশিত হইতে দেখা যাইত না; কিন্তু এখন ঐ অবস্থায় ইহাদের পাঁচটী ছয়টী, এমন কি কখনও কখনও সাতটী পর্য্যন্ত একত্র দৃষ্ট হয়। প্রকার ভেদে সুইট পী এখন গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতেই ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।
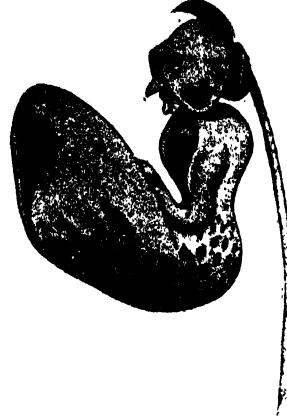
স্তাবুড়ী-ফুল।

গোলাপ, ড্যাফোডিল ও ডালিয়া পুষ্পের বিকাশেও বীজসংযোগের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণ-ও-গঠন-বৈচিত্র্যে এবং সুরভি-সম্পদে এই-সকল ফুল দিন দিন এত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে যে, মূল পুষ্পের সম্পর্কে এখন ইহাদের পরিচয় লওয়া কঠিন।

রাইরঙ্গিণী, টগর, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের বিকাশ প্রায় একই প্রকার প্রণালীতে সংঘটিত হয়। কুসুম-কর্ণিকায় বা ফুলের বীজকোষে পুংপরাগের সমাবেশ দ্বারা পরিপুষ্ট বীজলাভের ব্যবস্থা করাই এই প্রণালীর উদ্দেশ্য।

বীজসংযোগের সময়ে কার্ণেসনের বীজাধারটীকে সূক্ষ্ম চুল দ্বারা প্রায় একদিন বেষ্টিত করিয়া রাখা প্রয়োজন। ইহার পর মূল কুসুমটীর শুষ্ক দলগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া কর্ণিকাটীকে বীজধারণের উপযুক্ত করা হয়। এই বীজ পরিপক্ক হইতে প্রায় ছয় সাত সপ্তাহ সময় লাগে।
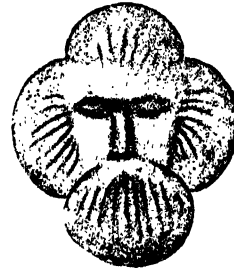
মানব-মুখাকৃতি ফুল।

মটর বা সুইট পী পুষ্পের ক্ষেত্রটীকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ, হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য প্রথমাবধি অতি সূক্ষ্ম কাপড় বা কাগজে আবৃত করিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ অনেক সময় কীটপতঙ্গের শরীর-সংলগ্ন পরাগ দ্বারা নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ পরাগ-নিষেকের ফলাশা প্রতিহত হইয়া যায়। উষ্ট্রের লোমনির্ম্মিত তুলির সাহায্যে স্ত্রীকোষে পুং-পরাগ মিলিত

করা হয়। বীজসংযোগের সময়ে বীজাধারটীকে বাহিরে বা আদ্রস্থানে রাখা নিরাপদ নহে।

গোলাপফুলের বীজসংযোগ উষ্ণ স্থানে কাচগৃহে হওয়া আবশ্যক। বীজসংযোগের পূর্ব্বে কর্ণিকাটীকে বীজ ধারণের উপযোগী করিবার নিমিত্ত পুষ্পাভ্যন্তরস্থ কিঞ্জল্কগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর বীজকোষের উপর একটী থলি কয়েকদিন যাবৎ দৃঢ় ভাবে আঁটিয়া রাখিলেই উহা বীজধারণের উপযোগিতা লাভ করে। এই সময়ে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা উৎকৃষ্ট পুষ্পপরাগ কোষমূলে সংলিপ্ত করিয়া দিলে ঐ ক্ষেত্রে গোলাপের উৎকৃষ্ট বীজ প্রস্তুত হইতে পারে।

নলটুনী ফুলের মাকড়সার রূপ প্রাপ্তি।

ড্যাফোডিলের বীজসংযোগ ভিজা উষ্ট্রলোমের তুলির সাহায্যে নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকগণ নবোদ্ভাবিত প্রণালীতে এই পুষ্পের বীজ সংগ্রহ করিয়া বর্ণ ও আকৃতিবিভেদে ইহার অসংখ্য মূর্ত্তি সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

একই জাতীয় পুষ্পের পরস্পর সংযোগে যেমন কুসুমের মূল অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়, বিভিন্ন প্রকার পুষ্পবীজের সংমিলনে তেমনি অভিনব পুষ্প উৎপন্ন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ গত দশ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া এক্ষেত্রেও অশেষ কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ডচেস্ প্রিমুলা (Duchess Primula) নামক নবোদ্ভিন্ন কুসুম তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতার এক বিশেষ উদাহরণ। রক্তরাজ (Crimson King) জাতীয় প্রিমুলা প্রসূনের সহিত কৃষ্ণবৃন্তধারী শ্বেতবর্ণ এক প্রকার প্রিমুলার সংযোগে এই পুষ্পের উদ্ভব হইয়াছে। এই নূতন ফুলের মধ্যদেশ লোহিত-রঞ্জিত এবং বহির্ভাগ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট।

সম্রাজ্ঞী (Her Majesty), অরুণ সুন্দরী (Pink Beauty), রৌপ্য তারকা (Silver Star) প্রভৃতি নামক নবজাত পুষ্পগুলিও এ বিষয়ের অন্যতম নিদর্শন। উপর্য্যুপরি বীজ সংযোগ দ্বারা উৎকৃষ্টতম বীজ আহরণ পূর্ব্বক এই-সকল ফুল সৃষ্টি করা হইয়াছে। মূল পুষ্পের তুলনায় আকৃতি প্রকৃতিতে ইহাদের বৈচিত্র্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এইরূপে পুষ্পসমূহের আকৃতি-প্রকৃতিগত উৎকর্ষসাধনে পুষ্প-বিজ্ঞান বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যে কার্য্য করিয়াছে তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যৎ বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইহা ফুলের ফসলে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। প্রত্যুত কুসুমবিশেষের গাত্রস্থ চিহ্নকে কোন নির্দ্দিষ্ট অবয়বে পরিণত করিবার জন্য কেহ যদি এখন যত্নশীল হন, তাহা হইলে ঐ সময় মধ্যে এক্ষেত্রেও কৌতূহলোদ্দীপক উন্নতির সূচনা হইতে পারে। অর্কিড জাতীয় পুষ্পের মধ্যে বিবিধ জীবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; হাঁস, মোরগ, প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ আকারের ফুল জন্মে। যে-সকল ফুলে ঐরূপ কোনো জন্তুর আকারের বা বর্ণের ঈষৎ সাদৃশ্য আছে, বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে তাহার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা ঐ-সকল পুষ্পকে অনুরূপ জন্তুর আকার দেওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধান্তর্গত ভায়লা (Viola) ভেরোনিকা (Veronica) প্রভৃতি কুসুমের ভবিষ্যৎ সংস্করণের চিত্রে আমরা এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

ভায়লা পুষ্প নানাপ্রকারের আছে। তন্মধ্যে যেগুলির

১। প্রজাপতি ফুল। ২। ময়ূরপুচ্ছ ফুল। ৩। শুক্তি ফুল।

উপর বিশেষ কোন চিহ্ন বর্ত্তমান, তাহার রূপ ও বর্ণের উৎকর্ষ জন্মাইয়া তাহাকে প্রজাপতি, ময়ূরপুচ্ছ ও শুক্তির আকারে পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব নহে।

ভেরোনিকা নামক এক প্রকার পুষ্পের উপর অস্পষ্ট মুখাকৃতি একটী চিহ্ন আছে। ক্রমোৎকর্ষের বিধানে ঐ চিহ্নটী সহজেই কেশ-দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত ক্ষুদ্র একখানি মুখমণ্ডলের আকার প্রাপ্ত হইতে পারে। এণ্টির্হিনাম (Antirrhinum) ফুলের গঠন যেরূপ অদ্ভুত তাহাতে ইহাকে অচিরে রাক্ষসের মুখাকৃতি প্রাপ্ত হইতে দেখিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। কেলসিওলেরিয়া (Calceolaria) নামক পুষ্পের এক শ্রেণী উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাঘ্রমুখ ও অন্য এক শ্রেণী "সুতা-বুড়ী"র অবয়ব ধারণ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সাইক্লামেন(Cyclamen), অতসী (Jesipa), কেঁচুর ফুল (Corgona), মুকুট-ঝাড় (Hollyhock) ও নলটুনী (Columbine) ফুলের আকৃতিও কালে অভিনবরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা। পুষ্প-বিজ্ঞানের যে উন্নতি পুষ্প-সমূহের আকৃতি প্রকৃতির এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সক্ষম, কালে যে তাহা বনদেবতার রচনা-কৌশল জয় করিয়া লোকের অভিরুচি অনুসারে নূতন কুসুমসাম্রাজ্য

ফুলের ঘড়ী। এডিনবার্গের একটি বাগানে বিভিন্ন বর্ণের ফুলের কেয়ারি সাজাইয়া এই ঘড়ীটি নির্ম্মিত; তাড়িতবলে ঘড়ীর কাঁটা ঘুরাইয়া ঠিক সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ফুলের বাগান।
এই বাগানটির বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে বাঁধা পথ নাই; কেবল ফুলের কেয়ারি আর শষ্পক্ষেত্র।

প্রতিষ্ঠিত না করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ, তখন হয়ত জগতের সমস্ত ফুলই শোভাসম্পদে এমন রমণীয় হইয়া উঠিবে যে, কোন্ ফুলের মালায় কবিতা-সুন্দরীর বক্ষস্থল সজ্জিত করা যাইতে পারে, কবি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

এমনি বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্প একত্র অনেক অথচ সামঞ্জস্যের সহিত জন্মাইয়া কেয়ারি রচনার বৈচিত্র্যের মধ্যেই আধুনিক উদ্যানের বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রাচীন কালের সরল শান্ত উদ্যানশ্রী এখন বিপুল জাঁকজমকে পরিণত হইতেছে। উদ্যান রচনার উদ্দেশ্য এই যে সংসারের কর্ম্মকোলাহল হইতে মনকে অন্তত ক্ষণেকের জন্যও বিমুক্ত করিয়া একান্তে নির্জ্জন শান্ত সুষমার মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারা যায়; 'যে গান কানে যায় না শোনা সে গান সেথায় নিত্য বাজে; সেখানে সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে'; সেখানে মন প্রাণ কল্পনা ও আনন্দের রাজ্যে বিচরণ করিয়া শিব সুন্দরের পরিচয় পাইতে পারে; আত্মার কল্যাণের জন্যই উদ্যান। কিন্তু আজকালকার উদ্যানের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর মনকে বিশ্রাম করিবার অবসর দেয় না; বর্ণে গন্ধে সুষমায় উদ্যান-গুলি এমন তীব্র ভাবে তাকাইয়া থাকে, যে, মন সেখানে আপনাকে ভুলিতে পারে না, সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সেখানে চেনা ফুলকে চিনিবার জো নাই; বড় ফুলটা হয়ত এতটুকু হইয়াছে, ছোট্ট ফুলটা বড় হইয়াছে, এক আকারের ফুল বিচিত্র উদ্ভট আকার লাভ করিয়াছে। সেখানে চেনা বৃক্ষলতাকে চিনিবার জো নাই; বৃহৎ বনস্পতি খর্ব্ব বামন হইয়া পড়িয়াছে, একই গাছে বিবিধ প্রকারের ফুল ফল ধরিয়াছে। গন্ধেও তাহাদের পরিচয় পাইবার জো নাই; কাহারো গন্ধ বদলাইয়াছে,
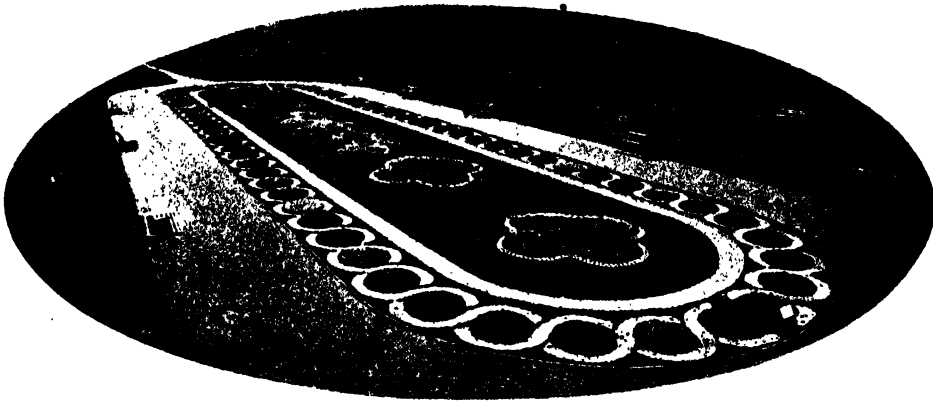
নক্সাদার উদ্যান।

কিংবা গন্ধপুষ্প, গন্ধতৃণ, গন্ধ-তরুলতা এমন হিসাব করিয়া লাগানো হইয়াছে যে তাহাদের মিশ্রগন্ধ একটি অপূর্ব্ব গন্ধ সৃষ্টি করিতেছে। তবে এই-সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক যুগের প্রশংসার বিষয় এই যে তাহার প্রভাবে এখন গৃহ পর্যান্ত ক্রমশ উদ্যানে পরিণত হইয়া মনকে প্রফুল্ল রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

জৈন ধর্ম্মগ্রন্থাবলী

জৈন ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে এক প্রধান ধর্ম্ম। বহু ধনশালী বণিক্ এই ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে এবং জৈনমন্দিরসমূহ ইঁহাদের অজস্র অর্থব্যয়ে পরম রমণীয় বলিয়া, জৈন ধর্ম্মের পরিচয় অনেকেই অবগত। কিন্তু জৈনসাহিত্যে যে-সকল অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার সন্ধান এ পর্য্যন্ত অল্পই হইয়াছে। এমন কি জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের একটি শাখা এ বিশ্বাস ইতিহাসে পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে—জৈন ধর্ম্মগ্রন্থাবলী ও অন্যান্য পুস্তকাবলীর সহিত অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ।

যথার্থতঃ জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা নহে। ইহা পৃথক ধর্ম্ম। ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করিয়া বহু তীর্থঙ্কর এই ধর্ম্মের প্রচারে সহায়তা করেন। তন্মধ্যে পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের নাম সুপ্রথিত। জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা কি না তাহা বিচারের ইহা স্থল নহে। এ প্রবন্ধে জৈন ধর্ম্মগ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

ধর্ম্মগ্রন্থগুলি শ্রুতি নামে কথিত। এই শ্রুতিজ্ঞান জৈনগণের সকলেরই পরম আদরণীয়। জৈনশ্রুতিগুলি অঙ্গ ও অঙ্গবাহ্য এই দুইভাগে বিভক্ত। অঙ্গের সংখ্যা দ্বাদশটি *। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১। আচারাঙ্গ। ইহাতে জৈন সাধুগণ কিরূপ আচার প্রতিপালন করিবেন তাহার বর্ণনা আছে। জৈনেরা বলেন যে জ্ঞান কোন কার্য্যে পরিণত হয় না, তাহা বৃথা। তাই জৈনসাধুগণকে অহিংসাব্রত পালন করিতে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে, কত প্রকার প্রাণী আছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর এই বিবিধ-প্রাণীহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মধ্যেই জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনীর উপাদান বিদ্যমান আছে। মহাবীরের বহু ক্লেশ সহ্য করার কথা ও আদর্শ সাধুজীবনের উদাহরণ তাঁহার জীবনেই পাওয়া যায়, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

২। সূত্রকৃতাঙ্গ। ইহাতে জ্ঞান এবং বিনয় প্রভৃতি গুণ ও বিবিধ ধর্ম্মাচার বর্ণিত হইয়াছে। জৈনধর্ম্মের নিয়মাবলীর সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের নিয়মাবলীর তুলনা

---

* Jaina Gazette. 1905. Vol. II. No 9. December 11. 133-140 দ্রষ্টব্য।

করা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে যে জৈনধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা অহিংসা এই ধর্ম্মের মূল। জৈন সাধুগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে জৈনধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হইত। ইহাতে বিবিধ প্রকার অহঙ্কার তিরস্কৃত হইয়াছে। বিনয়ই প্রধান ভূষণ ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ ছন্দ বিদ্যমান। ছন্দে রচিত বলিয়া ইহার একটু বিশেষত্বও আছে।

৩। স্থানাঙ্গ। জৈনমতে দ্রব্য ছয়টি,—জীব (Soul), পুদ্গল (Matter), ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল ও আকাশ। এই কয়টিকে বিবিধ প্রকার 'স্থান' হইতে বুঝান হইয়াছে। জীব যদি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় তবে তাহার নাম সিদ্ধ জীব। সিদ্ধজীব আবার স্থান কাল হিসাবে 'অবগাহন' প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। যে-সকল জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে 'সংসারী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সংসারী জীব আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। স্থাবর, সকলেন্দ্রিয় ও বিকলেন্দ্রিয়। এইরূপ অন্য দ্রব্যগুলির স্বরূপের পরিচয় ও বিভাগ স্থানাঙ্গে বর্ণিত আছে।

৪। সমবায়াঙ্গ। এই গ্রন্থে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব এই চারি বিষয় হইতে যে সাদৃশ্যের উৎপত্তি হয়, তাহার বর্ণনা আছে। দ্রব্য বলিয়া ধরিতে গেলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এক পর্য্যায়ে পড়ে। প্রথম স্বর্গ ও প্রথম নরক যথাক্রমে ইন্দ্রক-বিমান ও ইন্দ্রক-বিল রূপে ক্ষেত্রহিসাবে এক পর্য্যায়ে পড়ে। কাল হিসাবে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী নামক দুইটি কাল এক পর্য্যায়ে অবস্থিত। পরাভক্তি ও পরাজ্ঞানও ভাব হিসাবে এক।

৫। ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি। (ইহা কোন কোন স্থলে ভগবতী বলিয়া কথিত হইয়াছে*)। এ গ্রন্থখানিতে কতকগুলি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর আছে। প্রশ্নগুলি মহাবীরের প্রধান শিষ্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত। মহাবীর সে-গুলির উত্তর দিয়া শিষ্যগণের সন্দেহভঞ্জন করিয়াছেন।

৬। জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ। ইহা 'ধর্ম্মকথাঙ্গ' নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে মহাবীরের গণধরগণ তাঁহাকে যে-সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি প্রশ্ন উত্তর সহ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত পদার্থের বিশদ বর্ণনা ইহাতে আছে। সেই পদার্থের মধ্যে—জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ, পুণ্য ও পাপ ধরা হয়। এই নয়টিকে নবতত্ত্ব সংজ্ঞাও দেওয়া হইয়া থাকে। জীব (Soul) ও অজীব (জীবব্যতিরিক্ত সমস্তই) ছাড়িয়া দিলে, যে কয়েকটি থাকে তাহার মধ্যে পাপ ও পুণ্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য কথাগুলির অর্থ প্রদত্ত হইতেছে।

কর্ম্ম যখন জীবকে আশ্রয় করে, সেই আশ্রয় করাকে আশ্রব বলা হয়। নূতন কর্ম্ম যাহাতে আশ্রয় করিতে না পারে এরূপ প্রতিষেধের নাম সংবর। কর্ম্মবন্ধনকে বন্ধ, কর্ম্মধ্বংসকে নির্জরা ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিকে মোক্ষ বলে।

জৈনদর্শনে কর্ম্ম ও তাহার বন্ধন বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৭। উপাসকদশাঙ্গ*। যাহারা জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করে তাহারা জৈন সাধু বা যতি; কিন্তু যাহারা গৃহী তাহারা শ্রাবক নামে কথিত হয়। ইহাদের আচারসমূহ সর্ব্বাংশে সাধুদের তুল্য হইতে পারে না। কেননা সংসারত্যাগী যে-সকল অনুষ্ঠান করিতে পারেন, গৃহীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। এই গ্রন্থে জৈন গৃহীগণের পালনীয় আচার বিবৃত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের উপদেশাবলী শুনিয়া যদি মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার নিরসনের উপায়, বিবিধ প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার উপদেশ, উপভোগ হইতে নিবৃত্তি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবান্ মহাবীরের আনন্দ প্রভৃতি দশজন গৃহী শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের আচারব্যবহার উদাহরণস্থলে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সেই সময়কার জৈন বণিক্ ভূস্বামী প্রভৃতির দৈনিক জীবনের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ বিলাসের দ্রব্য তাঁহারা ব্যবহার করিতেন, কোন্ কোন্ প্রয়োজনে তাঁহাদের অর্থ ব্যয়িত হইত, কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহারা পরিধান করিতেন, প্রভৃতি সকলই এই গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়।

*History and Literature of Jainism. P. 101 দ্রষ্টব্য।

* এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। 'উবাসগদসাও' Edited by A. F. R. Hoernle.

৮। অন্তকৃদ্‌দশাঙ্গ। জৈনদের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। গৌতম প্রভৃতি তাঁহাদের দশজন শিষ্যের কঠোর সাধনাপূর্ণ জীবন ও শেষে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উপাসকদশাঙ্গে গৃহীর জীবনের বর্ণনা গৃহী জৈনদিগকে উপযুক্ত পথে চালিত করিবে, অন্তকৃদ্‌দশাঙ্গ হইতে সংসারত্যাগী জৈনগণ গৌতম প্রভৃতির আদর্শে নিজ নিজ জীবন গঠিত করিবে।

৯। অনুত্তরোপপাদকদশাঙ্গ। অনুত্তরবিমান জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থবর্ণিত স্বর্গ। এই অনুত্তরবিমান পাঁচটি। বিজয় প্রভৃতি তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে। কঠোর তপস্যায় এই-সকল স্বর্গ লাভ হয়। তীর্থঙ্করগণের জলি প্রভৃতি দশজন শিষ্য ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় ঐ-সকল স্বর্গ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১০। প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ। অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দিতে হইবে তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। চারপ্রকার 'কথনী'র বিষয় ইহাতে আছে। এই চারপ্রকার কথন যথাক্রমে আক্ষেপণী, বিক্ষেপণী, সংবেদনী ও নির্বেদনী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১১। বিপাকসূত্রাঙ্গ। ইহাতে কর্ম্ম ও তাহার প্রকৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত। কর্ম্মের উৎপত্তি, কর্ম্ম-বন্ধন, বিবিধ প্রকারের কর্ম্ম, কর্ম্মবন্ধন মোচন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। মাতৃগুপ্ত, সুবাহু প্রভৃতির জীবনী হইতে এ বিষয় প্রতিপাদনার্থ বহু উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১২। দৃষ্টিপ্রবাদাঙ্গ। ইহা সুবৃহৎ। বহু অংশে বিভক্ত। ইহার মূলগ্রন্থ লুপ্ত। ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সমবায়াঙ্গে ও নন্দিসূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পরি-কর্ম্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, চুলিক ও পূর্ব্বগত এই কয় ভাগে বিভক্ত ছিল।

(ক) পরিকর্ম্ম পাঁচটি—চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি, সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তি, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি, দ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি ও ব্যাখ্যা-প্রজ্ঞপ্তি। চন্দ্রের গতি, গ্রহণ প্রভৃতি চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির বিষয়। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ গ্রহ উপগ্রহের বর্ণনা প্রভৃতি সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তিতে ছিল। তৃতীয়টিতে সুমেরুপর্ব্বত, নদী, হ্রদ প্রভৃতির সহিত জম্বুদ্বীপের বর্ণনা, ও চতুর্থটিতে জৈনমন্দির সমূহের বর্ণনা ছিল। জীব, অজীব প্রভৃতি পদার্থের বর্ণনা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাইত।

(খ) সূত্র। অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে যে-সকল মত প্রতি-পাদিত হইয়াছে তাহার অসারতা প্রতিপাদন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কেহ বলিয়াছেন জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না। কেহ বলিয়াছেন জীব কর্ম্মফল ভোগ করে না। এ-সকল মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া যথার্থ মতের প্রতিষ্ঠা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

(গ) প্রথমানুযোগ। এই গ্রন্থে ৬৩ জন ধার্ম্মিক পুরুষের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছিল। জৈনধর্ম্মের প্রসিদ্ধ পুরুষগণ এইরূপে বিভক্ত—২৪ তীর্থঙ্কর, ১২ চক্রবর্ত্তী, ৯ নারায়ণ, ৯ প্রতিনারায়ণ এবং ৯ বলিভদ্র।

(ঘ) চুলিকা। এ গ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় বড়ই কৌতূহলজনক। চুলিকাগ্রন্থ পাঁচটি—জলগতচুলিকা, স্থলগতচুলিকা, মায়াগতচুলিকা, রূপগতচুলিকা ও আকাশগতচুলিকা। প্রথমটিতে জল রোধ করা, জলের উপর দিয়া পদব্রজে গমন, অগ্নিমধ্য দিয়া গমন প্রভৃতি কিরূপে করা যাইতে পারে তাহার উপায়স্বরূপ মন্ত্রসমূহ ও পূজার বিধি ছিল। দ্বিতীয়টিতে পূজা ও মন্ত্র দ্বারা কিরূপে মেরুপর্ব্বতে গমন, দ্রুতবেগে ভ্রমণ প্রভৃতি করা যাইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তৃতীয়টিতে আশ্চর্য্য বস্তু প্রদর্শন, নানাপ্রকার হস্তকৌশল-সঞ্জাত ক্রীড়া প্রভৃতির উপায় প্রদত্ত ছিল। চতুর্থটির বিষয়—পূজা, মন্ত্র ও তপস্যার বলে মানবের হস্তী, সিংহ, ঘোটক প্রভৃতিতে পরিণত হওয়া, বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বৈচিত্র্য উৎপাদন, উদ্ভিদ্‌জগতেও পরিবর্ত্তন সাধন। এই চতুর্থটিতে পুরাকালীন Alchemistদের বর্ণনা থাকা সম্ভব। আকাশগতচুলিকাতে শূন্যমার্গে গমন প্রভৃতির উপায় লিখিত ছিল।

এই চুলিকাগ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে, এগুলি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব যত হউক না হউক, মন্ত্রবলে ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রভৃতির সৃষ্টিই

প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণনা করিত। অথর্ব্ববেদ যেমন ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের পর মন্ত্রতন্ত্র লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, জৈন চুলিকাগ্রন্থাবলীও সেইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারের পরে এই-সকল ব্যাপার লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

(৬) পূর্ব্বগত ১৪টি। "উৎপদ-পূর্ব্বে" জীব, পুদ্গল, কাল প্রভৃতির বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের বর্ণনা ছিল। 'অগ্রয়ণীয়-পূর্ব্বে' ৭ তত্ত্ব, ৯ পদার্থ, ৬ দ্রব্য প্রভৃতির বর্ণনা ছিল। 'বীর্য্যানুবাদ-পূর্ব্বে' জীবের ক্ষমতা, নরেন্দ্র বলদেব প্রভৃতি জৈন মহাপুরুষগণের ভাববীর্য্য, তপোবীর্য্য প্রভৃতির বর্ণনা ছিল। 'অস্তিনাস্তিপ্রবাদ-পূর্ব্বে' জীব ও দ্রব্যের অস্তিত্ব বা তাহার বিপরীত অবস্থার বিষয়ে আলোচনা ছিল। 'জ্ঞানপ্রবাদ-পূর্ব্বে' পাঁচ প্রকার যথার্থ জ্ঞান (মতি, শ্রুত, অবধি প্রভৃতি) ও তিন প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের (কুশ্রুত, কুমতি প্রভৃতির) বর্ণনা ছিল। 'সত্যপ্রবাদ-পূর্ব্বে' কথা বলা ও নীরব থাকা কখন সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহার বিচার ছিল; কোন্ কোন্ বাক্য সত্য, কোন্ কোন্ বাক্য মিথ্যা, প্রভৃতিরও বর্ণনা ছিল। 'আত্মপ্রবাদ-পূর্ব্বে' জীব কিরূপে কর্ম্মফল ভোগ করে তাহার সবিশদ আলোচনা ছিল। 'নিশ্চয়' ও 'ব্যবহার' এই দুইপ্রকার ভাবেই ইহার আলোচনা হয়। 'কর্ম্মপ্রবাদ-পূর্ব্বে' কর্ম্মের বিবিধ কারণ ও বিভাগ বর্ণিত ছিল। 'প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বে' কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, কোন্ কোন্ সময়েই বা বিশেষ বিশেষ দ্রব্য পরিহার্য্য, তাহার তালিকা ছিল। 'বিদ্যানুবাদ-পূর্ব্বে' জ্ঞান, জ্ঞান-লাভের উপায়, বিবিধ শাস্ত্র প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত। 'কল্যাণবাদ-পূর্ব্বে' গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, কি কি গুণ থাকিলে ও কিরূপ তপশ্চর্য্যা করিলে তীর্থঙ্কর হওয়া যায় তাহার বিবরণ, ও বিবিধ তীর্থঙ্করগণের জীবনের প্রধান ঘটনাসংশ্লিষ্ট উৎসবের (ইহা কল্যাণক নামে কথিত) পরিচয় ছিল। 'প্রাণবাদ-পূর্ব্বে' আয়ুর্ব্বেদ, বিষের প্রতিষেধ, ভূতাবিষ্টকে প্রকৃতিস্থ করণ প্রভৃতি বিষয় ছিল। 'ক্রিয়াবিশাল-পূর্ব্বে' গীত, ছন্দ, অলঙ্কার কলাবিদ্যা, দেবপূজাবিধি প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান ছিল। 'ত্রিলোকবিন্দুসার পূর্ব্বে' পৃথিবীর পরিচয়, ও অন্যান্য বহুবিধ বিষয় ছিল। কথিত আছে বীজগণিতও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অঙ্গ নামক জৈনশ্রুতিগুলির বর্ণন এইখানে শেষ হইল। অঙ্গবাহ্য নামক জৈনশ্রুতি ১৪ প্রকীর্ণকে বিভক্ত। (১) সামায়িক-প্রকীর্ণক। ইহা ছয় প্রকার সামায়িকের (নাম, স্থাপনা, দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ও ভাব) পরিচয় প্রদান করিয়াছে। (২) সংস্তবপ্রকীর্ণক তীর্থঙ্করগণের জীবনের পাঁচটি অবস্থা বর্ণন করিয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কোন্ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই-সকল অবস্থার পরিচয় এবং তাঁহাদের শক্তির বিষয় এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। (৩) বন্দনাপ্রকীর্ণক। ইহাতে মন্দির ও অন্যান্য উপাসনার স্থলের কথা আছে। (৪) প্রতিকর্ম্ম-প্রকীর্ণক। অহোরাত্র, পক্ষ, মাস বা বৎসরে জনিত বিবিধ দোষ ও তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় এই গ্রন্থে আছে। (৫) বিনয়প্রকীর্ণক। ইহাতে জ্ঞান, চরিত্র প্রভৃতিতে যে বিনয় প্রকাশিত হইবে সেই বিনয়ের পাঁচ প্রকার বিভাগ ও প্রতি বিভাগের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (৬) কৃতিকর্ম্ম-প্রকীর্ণক। ইহাতে জৈন তীর্থঙ্কর, অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায়, প্রভৃতির প্রণাম ও উপাসনা-বিধি, জৈন মন্দির প্রদক্ষিণ করার বিধি প্রভৃতি আছে। (৭) দশবৈকালিক-প্রকীর্ণক। ইহাতে সাধুদিগের চরিত্র, পবিত্র আহার প্রভৃতি, অর্হৎদিগের আচারসমূহের নিয়মাবলী আছে। (৮) উত্তরাধ্যায়ন প্রকীর্ণক*। ইহাতে অর্হৎদিগকে যে-সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে ও যে-সকল ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে জন্ম হইতে কেহ জাতি প্রাপ্ত হয় না। গলদেশে যজ্ঞোপবীত থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। বল্কল পরিধান করিলেই তপস্বী হয় না। নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদির পরিচয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকিলে তবে ব্রাহ্মণ হইবে। (৯) কল্পব্যবহার-প্রকীর্ণক। ইহাতে অর্হৎগণের কর্ত্তব্য কার্য্য ও অন্যায় কার্য্য করিলে সেই পাপ মোচনের উপায় নির্দ্দিষ্ট

* Jacobi কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

হইয়াছে। (১০) কল্পকল্প-প্রকীর্ণক। ইহাতে অর্হৎগণ কি কি দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন, কোন্ কোন্ স্থল ব্যবহার করিতে পারেন প্রভৃতি বিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (১১) মহাকল্পসংজ্ঞক-প্রকীর্ণক। ইহাতে জিনকল্পী ও স্থবিরকল্পী অর্হৎগণের যোগের পন্থা, দীক্ষার নিয়মাবলী, আত্মশুদ্ধি প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১২) পুণ্ডরীক-প্রকীর্ণক। ইহাতে দেবতাগণের জন্মস্থান ও চারপ্রকারের দেবতার বিবরণ; দান, উপাসনা প্রভৃতি কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে জীব ঐ দেবতার অবতার হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। (১৩) মহাপুণ্ডরীকাক্ষ-প্রকীর্ণক। ইহাতে কিরূপ তপস্যা ও অনুষ্ঠানাদি করিলে ইন্দ্র, প্রতীন্দ্র প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহার বর্ণনা আছে। (১৪) নিষিধিক-প্রকীর্ণক। অমনোযোগিতা বশতঃ যে-সকল দোষ কৃত হয় তাহাদের মোচনের উপায় এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জৈনশ্রুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। সমস্ত শ্রুতি গ্রন্থগুলি এখনও পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও অনুবাদিত হয় নাই। গ্রন্থগুলির নাম ও সংখ্যারও বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। এরূপ আবশ্যকীয় ও প্রধান বিষয়ে সন্দেহ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। উপরোক্ত যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহাদের সারাংশ নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত-চক্রবর্ত্তী নামক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকারের গোম্মটসার নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে বহু গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ জৈন সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছে। জৈন সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ গবেষণা হয় নাই। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনে জৈন সাহিত্য আলোচনা করিলে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইবে।* যাঁহারা নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে রত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন জৈন সাহিত্যের অনুশীলনে নিযুক্ত হন। তাহা হইলে অনেক অমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত অনেক লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার সাধিত হইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যের সহায়তাস্বরূপ এই প্রবন্ধে শ্রুতিগ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল।

† "The sacred books of the Jain sect, which are still very imperfectly known, also contain numerous historical statements and allusions of considerable value." Vincent A. Smith, *The Early History of India*; p.8.

প্রিয়া

(উত্তর-রামচরিত হইতে সংগৃহীত)

কুন্দ-কোরক-দন্ত-শোভন সুন্দর মুখখানি,
যেনবা মূর্ত্ত মহা-উৎসব কমনীয় তব পাণি,
কণ্ঠ জড়ালে যেনবা চন্দ্রকান্ত মণির হার
ইন্দুকিরণে শিশিরবিন্দু নিচিত অঙ্গে যার।

বাণী তব ম্লান জীবকুসুমের বিকাশ-সাধিকা, প্রিয়া,
তৃপ্ত করিছে কর্ণ-কুহরে সুধাধারা বরষিয়া,
সব-ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ, করি অর্পণ প্রাণ
অবসাদাহত চিত্তে নিত্য রসায়ন করে দান।

তোমার দৃষ্টি-দুগ্ধ-সরিতে নিত্য করাও স্নান,
করি' পদ্মের কুট্মলনিভ প্রণামাঞ্জলি দান।
নেত্রযুগলে অমৃতবর্ত্তি, লক্ষ্মী-স্বরূপা গেহে,
জীবন আমার, দ্বিতীয় হৃদয়, কৌমুদীসুধা দেহে,
বর্ষোপলের মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তব
যেনবা ললিত অতি সুকুমার লবলীকন্দ নব।

সাত্ত্বিক প্রেম-রসের পরশে সুন্দর সুশোভিতা,
মৃদু চঞ্চল স্বেদ রোমাঞ্চ কম্পনে পুলকিতা,
নববারিসেকে বিকচকোরক তনু তব মনোরম
প্রাবৃট-সমীরে ঈষৎ চালিত নীপের যষ্টি সম।

হরিচন্দন-পল্লবরস তব প্রেম-পরশন,
ইন্দুকিরণ-কন্দের সুধা রোমে রোমে বরিষণ।
সন্তাপজাত মূর্চ্ছা ঘুচায়ে আকুলানন্দধারা
আঁখি ভরে' আনে পুলকবিভোর জড়তা আপনহারা।

শ্রীকালিদাস রায়

জব চার্ণক এবং কলিকাতা

কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। তিনি নাকি নিরাশ প্রণয়ের তাড়নায় আপনাকে ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত করেন। চার্ণকের প্রকৃতি রুক্ষ ছিল। কিন্তু এই রুক্ষস্বভাব কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। অবশেষে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনার কুঠির প্রধান অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। তদীয় যত্ন ও কৌশলে কোম্পানীর অর্থাগম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতে জব চার্ণক স্বদেশীয়গণের সাহচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ এতদ্দেশীয় বেশ ভূষা এবং আচার ব্যবহারের অনুরাগী হইয়া উঠেন। অবশেষে তিনি একজন হিন্দু বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, চার্ণক ঐ রমণীকে স্বামীর সহমরণ হইতে উদ্ধার করেন এবং অতঃপর তদীয় রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। চার্ণকের জীবদ্দশায় এই রমণীর মৃত্যু হয়; তাঁহার আগ্রহে মৃতদেহ সমাধিস্থ হয়। বিয়োগবিধুর চার্ণক বৎসরান্তে এই সমাধিস্থানে একটি কুক্কুট বলিদান করিয়া তাহার স্মৃতির তপর্ণ করিতেন।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে জবচার্ণক পাটনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুখসুদাবাদে গমন করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে ইংরেজের বাণিজ্য পরিচালন সাতিশয় কঠিন এবং বিপজ্জনক ছিল। মোগল রাজপুরুষগণ ইংরেজ বণিকদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেন। জবচার্ণক ক্রমাগত ছয় বৎসর কাল নবাবের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই সময় মধ্যে একবার একজন সামান্য রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে ধৃত করিয়া বেত্রাঘাত করিয়াছিল; আর একবার একদল মোসলমান সৈন্য তাঁহাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি পলায়ন করিয়া হুগলীতে আসিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃবর্গের উৎপীড়ন অসহ্য হওয়াতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদিগকে শান্ত হইতে বাধ্য করিবার জন্য উদ্যোগী হন, এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রতিরোধকারী মাত্রেরই সঙ্গে প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় জেমসের অনুমতি লাভ করেন। এই অনুমতির বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ চার্ণকের সাহায্যার্থ চারিশত সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ও মোগলতরী ধৃত করিয়া মোগল বাদশাহের প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দেন।

জবচার্ণক এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হুগলীতে অবস্থান পূর্ব্বক ভারতীয় রাজশক্তির প্রতিকূল আচরণের সম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হঠাৎ একদিন হুগলীর মোসলমান সৈন্যের সঙ্গে তদীয় তিনজন সৈন্যের কলহ উপস্থিত হয়। তাদৃশ কলহের সুযোগে হুগলীর মোগল রাজপ্রতিনিধি হুগলীর ব্রিটিশ বাণিজ্যালয় আক্রমণ করেন। মোগল রাজপ্রতিনিধি সুদৃঢ় দুর্গের অধিকারী এবং তিনশতাধিক তিনসহস্র বলদৃপ্ত সৈন্যের অধীনেতা ছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসী চার্ণক তাদৃশ অসম যুদ্ধেও অবিচলিত থাকিয়া বিপুল বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন। জবচার্ণক বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়াও আপনাকে বিপদাপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য স্বীয় বাণিজ্য-তরীতে সমস্ত পণ্য-সম্ভার উত্তোলন পূর্ব্বক ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে হুগলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎস্থান হইতে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী সূতানতি হাট নামক স্থানে উপনীত হন। ১৬৮৬ খৃঃ।

রিয়াজ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই ঘটনার অন্যরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঃ—

নবাব মূর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে ইংরাজ কোম্পানীর কুঠি হুগলীর অন্তর্গত লক্ষ্মীঘাট ও মোগলপুর নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। তৎকালে ইংরেজ সর্দ্দারগণ একদিন সূর্য্যাস্তের পর আহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের কুঠি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তাঁহারা দৌড়িয়া বাহির হইয়া জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত মালপত্র নষ্ট হইয়া যায়। কয়েকজন লোক এবং গৃহপালিত পশুও নিহত হয়। ইংরেজ সর্দ্দার চার্ণক তাঁহা-

দের গোমস্তা বারাণসীর লক্ষ্মীপুরের বাগান ক্রয় করিয়া সমস্ত বৃক্ষ কর্ত্তন পূর্ব্বক একটা কুঠির ভিত্তি পত্তন করেন এবং দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন। চারিদিকের প্রাচীর শেষ হইবার পর ছাদের কাজ আরম্ভ হইলে সৈয়দ ও মোগলবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্থানীয় শাসনকর্ত্তা মীর নাশিরের নিকট উপনীত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, বিদেশীগণ তথায় উচ্চ গৃহের ছাদে আরোহণ করিলে তাঁহাদের মহিলাকুলের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত ও সম্মানের লাঘব হইবে। হুগলীর শাসনকর্ত্তা সমস্ত বৃত্তান্ত নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন; তারপর তিনি মোগল বংশীয় অগ্রণীদিগকেও নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সেখানে উপনীত হইয়া আপনাদের দুঃখকাহিনী নবাব-দরবারে বর্ণনা করিলেন। নবাব সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইংরেজ-কুঠিতে আর একখানি ইটও গাঁথিতে নিষেধ করিয়া দিয়া হুগলীর শাসনকর্ত্তার নিকট আদেশপত্র প্রেরণ করিলেন। একারণ অট্টালিকা-সকল অসম্পূর্ণ রহিল। চার্ণক ক্ষুণ্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্য-সংখ্যা নগণ্য ছিল; বিশেষতঃ একখানি ব্যতীত যুদ্ধ-জাহাজ তৎকালে উপস্থিত ছিল না; পক্ষান্তরে মোগলের সৈন্য-সংখ্যা অধিক; ক্ষমতাশালী ফৌজদার তাহাদের পক্ষাবলম্বী; এবং নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর নামও ভীতিকর ছিল। এই-সব কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চার্ণক জাহাজ খুলিয়া দিলেন। চার্ণক যাত্রাকালে আফতাবি দর্পণের সাহায্যে হুগলী হইতে চন্দননগর পর্য্যন্ত নদীতীরবর্ত্তী জনাকীর্ণ স্থান অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিলেন। হুগলীর শাসনকর্ত্তা গৃহদাহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মাখাওয়া থানার কর্ম্মচারীকে ইংরাজের জাহাজ আবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি গুরুভারযুক্ত লৌহ-শিকল (ইহার এক-একটী আংটী দশসের ওজনের ছিল) নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া দিলেন। মগ ও আরাকানিদের নৌকার গতিরোধ করিবার জন্য এই শিকলটী দুর্গের পার্শ্বে রক্ষিত থাকিত। ইংরাজের জাহাজ লৌহ-শিকলের সন্নিধানে উপনীত হইলে জাহাজের গতিরোধ হইল। কিন্তু চার্ণক শিকল দ্বিখণ্ড করিয়া গন্তব্য পথ মুক্ত করিলেন। অতঃপর চার্ণক বর্ত্তমান চার্ণক (ব্যারাকপুর) নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। এবং বহুবিধ উপঢৌকন সহ নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া কুঠি স্থাপনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

রিয়াজের বর্ণনা সত্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রধান আপত্তি এই যে, মুর্শিদকুলিখাঁর বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজ সর্দ্দার হুগলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুতানতিতে আগমন করিয়াছিলেন। ইংরেজ বণিকদলের হুগলী পরিত্যাগের কারণ যাহাই হউক, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, চার্ণকের নেতৃত্বেই তাঁহারা সুতানতিতে উপনীত হন।

জবচার্ণক বহু বিবেচনার পর কুঠি সংস্থাপনের পক্ষে সুতানতি অতি অনুকূল স্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। আত্মরক্ষার উপযোগী দুর্গাদি নির্ম্মাণের পক্ষেও সুতানতি অনুকূল। সুতানতির নিম্নবাহিনী গঙ্গা নদী সুপ্রশান্ত ও সুগভীর; অপর পার্শ্বে রোগের আকরস্থান, কুম্ভীর ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বিচরণস্থল সুবিস্তৃত জলাভূমি। গঙ্গা ও জলাভূমির মধ্যবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে ইংরেজ বণিকদলের আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে, কর্ত্তব্য নির্ণয়ের পূর্ব্বে জব চার্ণক একাকী তরী হইতে অবতরণ করেন এবং তীর হইতে অনতিদূরে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তৎকালে ভবিষ্যৎ-গর্ভ-নিহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাস্বর চিত্র তাঁহার মানসনয়ন-সমক্ষে প্রকটিত হইয়াছিল।

কিন্তু সুতানতিতে ব্রিটিশ বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দুর্গ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই রাজসৈন্য বর্ষার জলধারার ন্যায় ইংরাজ বণিকদলের উপর পতিত হইল। চার্ণক বিপুল বিক্রমে রাজসৈন্যের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। বহু যুদ্ধের পর তিনি পরাজিত হইয়া দলবল সহ অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। অতঃপর তিনি ক্ষিপ্রগতিতে সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী হিজলী নামক স্থানে পৌঁছিলেন এবং অচিরে তত্রত্য রাজ-

দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্গ-অধিকারের অব্যবহিত পরেই রাজসৈন্য সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দুর্গ-মধ্যে অবরোধ করিল। দ্বাদশ সহস্র রাজসৈন্য তিন মাস অবধি দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। শত্রুর অস্ত্রাঘাতের সহিত দারুণ জ্বররোগ উপস্থিত হইয়া ইংরেজ সৈন্যের বিনাশ সাধন আরম্ভ করিল; অবশেষে কেবল তিনশত কঙ্কালাবশিষ্ট সৈন্য অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু হঠাৎ বাঙ্গালার নবাবের আদেশে যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল; মোগল সেনাপতি জবচার্ণককে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নবাবের তাদৃশ প্রসন্নতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রুম, অর্মে এবং ক্রুস প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিক-বৃন্দ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজ রণতরী ভারত মহাসাগরস্থিত মোগল যানসমূহ ধৃত করাতে সম্রাট আওরঙ্গজীব শান্তি স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া নবাব শায়েস্তা খাঁকে বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। কিন্তু মোসলমান ইতিহাস-লেখকগণ অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে বঙ্গদেশে মোসলমান ইংরেজে সংঘর্ষ কালে "লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্রীয়গণ চতুর্দ্দিক হইতে মোগল-শিবিরে খাদ্যসামগ্রী প্রেরণের পথ রুদ্ধ করাতে সৈন্যমধ্যে অত্যন্ত খাদ্যাভাব উপস্থিত হয়। কর্ণাটের ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ জাহাজে করিয়া খাদ্যসামগ্রী মোগল-শিবিরে প্রেরণ করিয়া সাহায্য করেন। পাদশাহ ইংরেজের সদ্ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইংরেজ অধ্যক্ষ মোগল সাম্রাজ্যাধীন বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে কুঠি নির্ম্মাণ করিবার জন্য সনদ ও পাট্টা প্রার্থনা করিলেন। আওরঙ্গজীব তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া ইংলণ্ডীয় জাহাজের উপর শুল্কের পরিবর্ত্তে তিন সহস্র মুদ্রা গ্রহণ এবং কুঠি নির্ম্মাণের আদেশ প্রচার করিলেন।"

জবচার্ণক সুতানতিতে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি লাভ করিয়া উলুবেড়িয়া নামক স্থানে পৌঁছিলেন এবং সেখানে কোম্পানীর জাহাজ প্রভৃতি মেরামত করিবার জন্য কর্ম্মালয় স্থাপন করিলেন। উলুবেড়িয়াতে তিন মাস কাল অবস্থান করিয়া জবচার্ণক সুতানতিতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে নূতন কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া স্থানীয় উন্নতি বিধান এবং বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নশীল হইলেন।

কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ চার্ণকের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কাপ্তেন হিত তাঁহাদের তিরস্কার-লিপি সহ জলপথে সুতানতিতে উপস্থিত হইলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে নব-সংস্থাপিত কুঠির মালপত্রে অর্ণব-পোত পূর্ণ করিয়া চার্ণককে সঙ্গে লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাপ্তেন হিতের পথভ্রান্তি উপস্থিত হইল; তিনি বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া তিন মাস অন্তে চট্টগ্রামের উপকূলবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু দশ সহস্র আরাকান সৈন্য তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে আগমন করিল। তাদৃশ বিপুলসংখ্যক শত্রু-সৈন্য দর্শনে নিরুপায় হইয়া কাপ্তেন হিত মান্দ্রাজের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দলবল সহ জব চার্ণক সেখানে অবতীর্ণ হইলেন।

জবচার্ণক মান্দ্রাজে ১৫ মাস কাল অবস্থিতি করিলেন, কিন্তু দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের শলাকার ন্যায় তাঁহার সংকল্প সর্ব্বক্ষণ সুতানতির অভিমুখেই থাকিত। অনেক চেষ্টায় তিনি বঙ্গে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সুতানতিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জব চার্ণকের উৎকট সাধনাবলে ন্যূনাধিক তিন বৎসর মধ্যে সুতানতি সৌষ্ঠবশালী নগরে পরিণত হয় এবং হুগলীর প্রতিদ্বন্দ্বী নগর হইয়া উঠে। কতিপয় বৎসর মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, ভবিষ্যতে ইংরেজের নবপ্রতিষ্ঠিত নগরী ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলের বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হইবে।

১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জবচার্ণক পরলোক গমন করেন। তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ জবচার্ণক সম্বন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখিয়াছেন, "তিনি সর্ব্বক্ষণ কোম্পানীর উন্নতি-চিন্তায় আবিষ্ট থাকিতেন।" ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের মতে এই বাক্যই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মারক-লিপি।

সুতানতি গ্রামের (হাটখোলা প্রভৃতি স্থান) দক্ষিণ

দিকে কলিকাতা নামক একটি স্থান (বর্ত্তমান কাষ্টম হাউস এবং মিণ্টের মধ্যবর্ত্তী ভূমি) ছিল। জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত নগরী ক্রমে কলিকাতায় বিস্তৃত হয় এবং তজ্জন্য অচিরে কলিকাতা নাম গ্রহণ করে; সুতানতি নাম বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইংরেজ-নগরীর আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং গোবিন্দপুর নামক গ্রাম (বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দক্ষিণবর্ত্তী স্থান) উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ অধ্যক্ষ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আওরঙ্গজীবের পুত্র সাহজাদা আজমের নিকট হইতে উপরোক্ত তিনখানি গ্রামের স্বত্ব ক্রয় করিয়া একাধিকারী হন। কলিকাতা নগরীর শোভা ও বৈভব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৭৪২ সালে ইংরেজ সর্দ্দার ক্ষুদ্র ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পরিবর্ত্তে একটি বৃহদায়তন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে কলিকাতা হতশ্রী হইয়া পড়ে এবং আলীনগর নাম প্রাপ্ত হয়; ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতা হইতে দূরীভূত হন। ১৭৫৬ খৃঃ। কিন্তু ইংরেজ সর্দ্দার ওয়াটসন্ এবং ক্লাইভ অচিরে কলিকাতা পুনরায় অধিকার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর ক্লাইভ কলিকাতা রক্ষার্থ অধিক সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের দুর্গ ভগ্ন করিয়া বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ইংরেজ সর্দ্দার তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কলিকাতার শোভা বর্দ্ধন করেন; এই পরিষ্কৃত ভূমি বর্ত্তমান সময়ে গড়ের মাঠ নামে পরিচিত রহিয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপিত হয়। এক দিকে বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার আয়তন শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল, অন্যদিকে ইংরেজ কোম্পানীর দেশাধিকারের ফলে কলিকাতার মর্য্যাদালাভ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ কলিকাতা মান্দ্রাজের অধ্যক্ষের অধীন ছিল। তারপর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৩ অবধি কলিকাতার অধ্যক্ষ অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময় কোম্পানীর নূতন বিধান অনুসারে কলিকাতার অধ্যক্ষ ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারতবর্ষের ইংরেজ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত সমগ্র স্থানের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার আদি অবস্থার বর্ণনা করিয়া একজন মুসলমান কবি লিখিয়াছেন, "নরকের একাংশের উপর কলিকাতা নির্ম্মিত হইয়াছে; কলিকাতা অকাতরে দদ্রু, চর্ম্ম এবং রক্তামাশয় বিতরণ করে। কসাই এবং খানসামারাই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।"

কলিকাতার নামোৎপত্তি লইয়া পণ্ডিত-সমাজে অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

(১) কলিচুন হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি এই মত প্রচার এবং সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন যে, পূর্ব্বে নূতন নগরী অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বহুল পরিমাণে কলিচুন প্রস্তুত হইত এবং তৎহেতুই জবচার্ণক স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম কলিকাতা রাখিয়াছিলেন।

(২) একজন শ্রমজীবী বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিতেছিল, এরূপ সময়ে একজন ইংরেজ পর্য্যাটক তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে ইংরেজী ভাষায় ঐ স্থানের নাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞ শ্রমজীবী মনে করে যে, তাহাকে বৃক্ষ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য উত্তর দেয় যে, গাছ কাল কাটা হইয়াছে। ইহাতে সাহেব স্থানের নাম কালকাটা বুঝিয়া উহা প্রচার করেন।

(৩) প্রখ্যাতনামা লং সাহেবের মতে মহারাষ্ট্র খাত অর্থাৎ খালকাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৪) একজন ওলন্দাজ পর্য্যাটকের মতে গলগোথা শব্দ হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। গলগোথা শব্দের অর্থ নর-কপাল-সমাকীর্ণ স্থান। নূতন নগরীতে ইংরেজের কুঠি সংস্থাপনের অব্যবহিত পরে মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহার এক-চতুর্থ পরিমাণ অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হয় এবং তজ্জন্য নদীর তীর নরকপালে সমাকীর্ণ হইয়া পড়ে। এজন্যই ইউরোপীয়-

গণ ঐ স্থানকে গলগোথা বা কলিকাতা নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন।

(৫) জবচার্ণক নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নামকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অদূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কালীঘাটের নামানুসারে কলিকাতা নামের সৃষ্টি করেন।

এই-সমস্ত বিবরণ অনুসারেই বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিক-দলের আগমনের পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা নামোৎপত্তির কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের আগমনের বহুপূর্ব্বেই গ্রাম কলিকাতার অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং উপরোক্ত মতসমূহের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে।

আইন-ই-আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কলিকাতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মোগল-অধীন মহাল-সমূহের তালিকায় কলিকাতা সরকার সাতগাঁওর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতা অথবা ক্যালকাটা নাম নাই; কলকত্তা নাম আছে। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের অধিবাসীরা কলিকাতার নাম "কলকত্তা" রূপেই উচ্চারণ করে। অধিকাংশ বাঙ্গালীও কথোপকথন কালে কলিকাতার পরিবর্ত্তে "কলকাতা" বলিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে কলিকাতার অস্তিত্ব ছিল, তাহার অন্যবিধ প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তদীয় নায়কের সিংহল যাত্রার বর্ণনা কালে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী কতিপয় জনপদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই তালিকায় কলিকাতার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে।

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে সরকার সকলের অন্তর্ভুক্ত পরগণা ও প্রসিদ্ধ মহালসমূহের নামই কেবল প্রদান করিয়াছেন। কবিকঙ্কণও স্বকাব্যে গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান সমূহেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তজ্জন্য এই দুই গ্রন্থে কলিকাতার নাম দেখিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি যে, জব চার্ণকের সময় কলিকাতা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসভূমি অরণ্যে পরিণত থাকিলেও উহা এককালে জনাকীর্ণ প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। আধুনিক জনবিরল সুন্দরবনের অনেক স্থানে প্রাচীন সমৃদ্ধি এবং জনবহুলতার চিহ্ন হর্ম্ম্যাদির ভগ্নাবশেষ এবং তড়াগাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এককালে হয়ত কলিকাতা সহ বিস্তৃত জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আকবর পাদশাহের রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে একদা সন্ধ্যার একঘণ্টা পূর্ব্বে সমুদ্রের জল আশ্চর্য্য ভাবে স্ফীত হইয়া সরকার বোগলার প্রধান নগর প্লাবিত করিয়াছিল। সরকার বোগলা অথবা বাকলা বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন এবং ঢাকার দক্ষিণ সীমার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল। বোগলার রাজা নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন। ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্র এবং জলতরঙ্গ ক্রমাগত পাঁচঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। দুইলক্ষ মনুষ্য ও পালিত পশু এই প্লাবনে প্রাণত্যাগ করে। এই ভাবে প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া খুব সম্ভব বর্ত্তমান কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চল ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়া থাকিবে।

রিয়াজ-উস-সালাতিন নামক বাঙ্গালার ইতিহাসে কলিকাতার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে কলিকাতা একটি সামান্য পল্লী মাত্র ছিল। তথায় কালীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তাহার সেবার জন্যই সমস্ত আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় কর্ত্তাশব্দের অর্থ প্রভু; এজন্য লোকে ঐ স্থানকে কালীকর্ত্তা নামে অভিহিত করিত। কিন্তু ক্রমে উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া কালীকর্ত্তা এক্ষণে কলিকাতা হইয়াছে।" মতান্তরে কলিকাতা "কালীকুট্ট" শব্দের অপভ্রংশ; কুট্টশব্দের অর্থ দুর্গা। অন্য এক জন ঐতিহাসিক "কালীক্ষেত্র" হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালীক্ষেত্র শব্দের ইংরেজি বিকৃতি ক্যালক্যাট্টা শব্দটিকেই প্রকৃত শব্দ মনে করিয়া পরে আমরা তাহা সংশোধন করিয়া বাংলা করিয়া লইয়াছি কলিকাতা।

মূলশব্দ যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কালীঘাটের কালীর সংশ্রবে কলিকাতার নামকরণ হইয়াছে। কালীঘাটের কালী সুপ্রাচীন। অতি প্রাচীন কালে কালীঘাট হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে এইস্থান কালীক্ষেত্র নামে খ্যাত ছিল। কালীক্ষেত্র বেহালা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালীক্ষেত্রে সতীদেহের কিয়দংশ পতিত হইয়াছিল

বলিয়া কোন কোন তন্ত্রে দেখা যায়। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদও আছে। তাদৃশ মতভেদসত্ত্বেও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কালাবধি কালীঘাটে কালী প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে কালীঘাটের অস্তিত্ব ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়েও কালীঘাটের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কালীঘাটের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কালীর সংশ্রবে কলিকাতার নামকরণ হইয়াছে এবং মোসলমান ও ইংরেজের আগমনের পূর্ব্বে কলিকাতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

মৈথিল ব্রাহ্মণের বিবাহ

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এক রবিবারে আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে এখান হইতে প্রায় দুই তিন ক্রোশ দূরে একটি পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলাম। বৈকালের দিকে বৃষ্টি আসিল, দৌড়িয়া অনতিদূরে এক গৃহস্থের বাটীতে একটি বাহিরের ঘরে আশ্রয় লইলাম। এখন ভাবিতে লাগিলাম বাটী ফিরিয়া যাইব কি প্রকারে! মেঠেন পথ, তাহাতে যদি এইরূপ বৃষ্টি হইতে থাকে তবে যাওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু রাত্রিতে আবার থাকিবইবা কোথায়। আমরা আর কোন উপায় না দেখিয়া, সেইখানে রাত্রি যাপন করাই স্থির করিলাম, এবং গৃহস্বামীকে আমাদের কষ্টের কিঞ্চিৎ অংশ দিব মনে করিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একটি লোক ভিজিতে ভিজিতে আমাদের নিকটে আসিল। আসিবামাত্র আমরা উপস্থিত বিপদের কথা তাঁহাকে বলিলাম এবং আরও বলিলাম যদি আমাদের রাত্রে থাকিবার একটু সুবন্দোবস্ত করিয়া দাও তবে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হই। সেই লোকটি অতি ভদ্রলোক, আমাদের কথা শুনিয়া একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, বাবু আপনারা এই ভুস্কারে (ভুষা রাখিবার ঘরে) কষ্ট পাইতেছেন কেন। দালানে চলুন, সেখানে আপনাদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত হইবে। বিছানাও যথেষ্ট আছে, রাত্রি সুখে কাটাইতে পারিবেন।

আমরা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তৎক্ষণাৎ দালান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দালানটি বাটী হইতে সামান্য দূরে। দালানে পৌঁছিবামাত্র তিনি একটি লোককে আমাদের পা ধুইবার জল আনিতে বলিলেন। পা ধুইবার পর আমরা তাঁহার দালানের একটি ঘরে, লম্বা ফরাসের উপর গিয়া বসিলাম। গৃহস্বামীও কিছুক্ষণ পরে আমাদের নিকট আসিয়া বসিলেন। একথা সেকথা বলিবার পর বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয় আমার ভাইঝির আজ বিবাহ, আমরা বড় ব্যস্ত। আপনাদিগের যাহা প্রয়োজন আমাদিগকে বলিবেন, নচেৎ ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা।' বিশেষ আজ দিনের বেলায় বিবাহ হইবার কথা ছিল কিন্তু বরপক্ষীয়েরা এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই, সেজন্য সকলে আরও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। (এ দেশে দিবা-বিবাহ প্রশস্ত)। এ জলে লোক জন পাঠাইয়া যে খোঁজ লইব তাহারও কোন উপায় নাই। এইরূপ কথা বার্ত্তার পর তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমরা বলাবলি করিতেছি, যে, আজ যেমন রাত্রে বাড়ী যাওয়া হইল না তেমনি একটি নূতন ধরণের বিবাহ দেখা যাইবে। এমন সময় একটি লোক মাথায় করিয়া কয়েকটি লুচি ও এদেশীয় অর্দ্ধমনি দুখানি খাজা ও কিছু দধি আমাদিগকে জল খাবারের জন্য আনিয়া দিল। আমরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, গৃহস্বামীর উদারতার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়াই নিমেষ মধ্যে থালাটি ছাড়া সমস্তই উদরসাৎ করিয়া ফেলিলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখি কয়েকটি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ একটি পাগড়ীধারী অশ্বারোহীর সহিত ভিজিতে ভিজিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। তখনই বুঝিলাম যে এই সেই বর, ও তাহার অনুচরেরা, যাহার জন্য গৃহস্বামী এত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাহারা দালানে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহস্বামীর অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্রামস্থ বহু লোক এবং কন্যাপক্ষীয় সকলে আসিয়া

সেখানে উপস্থিত হইল। আমরা হরিদ্রা-রঞ্জিত মিরজাই-চাপকান-ও-পাগড়ীধারী বরকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সাবধান হইয়া বসিলাম। বরযাত্রীরা হাত পা ধুইয়া বসিবার পর বিবাহ-আসরে অনেক ঠাট্টা তামাসা চলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিবার পর গৃহস্বামী বরকে লইয়া যাইবার জন্য বরযাত্রীদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

বর উঠিলে পর আমরাও গৃহস্বামীর নিকট বিবাহ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি আমাদের কথা শুনিবামাত্র যেন একটু স্তম্ভিত হইলেন। পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন 'মহাশয়, ভিন্ন দেশীয় লোককে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ, অতএব এ বিষয় আপনারা যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন সেই মত করুন।' আমরা আর কোন কথা বলিলাম না. মনে করিয়াছিলাম রাত্রিটা বিবাহ দেখিয়া একরকম কাটিবে. এখন দেখিতেছি তাহাও ঘটিল না। আমার বন্ধুরা সকলে নীরব হইয়া বসিলেন. কিন্তু আমি বিবাহ কি করিয়া দেখি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। গৃহস্বামী পুনরায় বাহিরে আসিবামাত্রই আমি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম যে কেবল আমাকে বিবাহ দেখিবার অনুমতি দিতে হইবে। তিনি আমার কথা শুনিয়া দুই একটি লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, যদিও আমাদের এরূপ করা উচিত নহে তথাপি যখন আপনি এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং যখন আপনি আমার গৃহে অতিথি তখন আপনি সদর দরজার পাশেই একটি বারাণ্ডা আছে সেই স্থান হইতে বিবাহ দেখিতে পারেন।' গৃহস্বামীর অনুগ্রহে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া সঙ্গে আর একটি বন্ধুকে লইয়া সেই বারাণ্ডায় উপস্থিত হইলাম।

ভিতরে গিয়া দেখি ঘরগুলি চূনকাম করা এবং সকল দেয়ালে নানা রংএর পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প চিত্রিত ; গৃহের উঠানটিতেও চূনকাম ছিল কিন্তু বৃষ্টিতে সমস্ত ধুইয়া গিয়াছে। বর তখনও পা ধোয়া সারিতে পারেন নাই, তাঁহার হাঁটু পর্যান্ত কাদা। পা ধোয়া হইলে, বর শ্বশুর-দত্ত অন্য একটি হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া উঠানের মধ্যে একটি উদুখলের নিকট আসিলেন। সেইখানে আট জন ব্রাহ্মণ বরকে সঙ্গে করিয়া উদুখলে কিছু নূতন ধান রাখিয়া আট বার আঘাত করিলেন। পরে সেই ধান আম-পাতে মুড়িয়া পুরোহিত বরের হাতে বাঁধিয়া দিলেন। তৎপরে বরকে সকলে মড়ওয়াতে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। মড়ওয়া একটি মাটির বেদিকে বলে। উপনয়ন ও বিবাহের সময় উঠানের মধ্যে মাটি দিয়া আধ ফুট আন্দাজ উঁচু করিয়া একটি চতুষ্কোণ বেদি তৈয়ারি করা হয়, এবং চারি কোণে চারিটি খুঁটা পুঁতিয়া উলু খড়ের দ্বারা ছাওয়া হয় ; পরে তাহাতে চুনকাম করিয়া চারিকোণে চারিটি সাদা হাঁড়ি রাখা হয়। হাঁড়িগুলি নানা রংএ চিত্রিত করিয়া আট খাই নালি সূতার দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। ইহাকেই মড়ওয়া বলে। মড়ওয়া বোধ হয় মণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশ। বর এখানে বসিয়া কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর কুল-মহিলাগণ সমস্বরে গান গাহিতে গাহিতে একটি ঘরে বরকে লইয়া গেলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম যে সেইটি গৃহদেবতার ঘর। সে-খানে ত আর যাইবার যো নাই, কাজেই বাহির হইতে খবর লইলাম। সেই ঘরে বরকে লইয়া মহিলারা দধি বিক্রয় করে। দুই তিন জন স্ত্রীলোক দধিপূর্ণ মাটির হাঁড়ি মাথায় লইয়া "দহি লেব হে" বলিয়া চীৎকার করিয়া বরকে উচিত মূল্যে ঐ দধি বিক্রয় করে। এধারে গৃহদেবতার পার্শ্বে তিশির ক্বাথ দ্বারা কেশবিন্যাস করিয়া, খোঁপাগুলি মাথার ঠিক মধ্যস্থলে উঁচু করিয়া বাঁধিয়া. রঙ্গিন ও বিচিত্র শাড়ি কোঁচা করিয়া পরিয়া দুই তিনটি কন্যা পাত্রীকে সঙ্গে লইয়া বসে। দধি বিক্রয়ের পর বরকে কন্যা কয়টির মধ্য হইতে নিজ পত্নী বাছিয়া তাহার মাথায় টোকা দিতে বলা হয়। বর ত কখন কন্যা দেখে নাই অথবা তাহার বিষয় কখন শুনেও নাই। কাজেই চিনিয়া লওয়া তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। যদি বর অপর কন্যার মাথায় টোকা দিয়া ফেলে তবে তাহার শালীদের নিকট লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। যদি ঠিক টোকা দেয় তবুও শালীদের ঠাট্টা

করিবার পথ একেবারে বন্ধ হয় না। কিন্তু প্রথমেই ঠিক করিয়া নিজের পত্নীকে চিনিয়া লওয়া প্রায় অল্পই ঘটে। কন্যার মাথায় টোকা মারিবার পর বরকে কন্যার হাত ধরিয়া উঠাইয়া সঙ্গে লইতে হয়। তখন স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতে গাহিতে বরকে পুনরায় মড়ওয়াতে লইয়া আসে। এবং যথাবিহিত কার্য্য সমাধা হইবার পর বর শাঁখে করিয়া কন্যাকে সিন্দুর পরাইয়া দেয়। বরকে এদেশে লোটা কম্বল, মাথায় বাঁধিবার পাগ, এবং কাপড়, বিবাহের সময় যৌতুক দেওয়া নিয়ম। তাহা ছাড়া যাহার যেমন সঙ্গতি সে সেইরূপ অন্যান্য দ্রব্যাদি দেয়। বড় লোকেরা গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দেয়। বিবাহ সমাধা হইলে পর বরকে কোহবরে অর্থাৎ বাসর-ঘরে পূর্ব্ববৎ গান গাহিতে গাহিতে মহিলারা লইয়া যায়। সেখানে বরকে বসাইয়া প্রথমে তস্মৈ অর্থাৎ এক রকম ক্ষীর খাইতে দেওয়া হয়। এবং পরে নানারূপ ঠাট্টা তামাসা গান ইত্যাদি হয়।

এধারে বিবাহ সমাধা হইবার পর বরযাত্রীদিগকে দধি, চিড়া, খাজা, মুরুব্বা, আচার প্রভৃতি নানা প্রকারের খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়। বরযাত্রীদিগের খাইবার সময় এক মহা গোলযোগ। তাঁহাদিগকে খাইতে বলিবা-মাত্র তাঁহারা এক শত টাকা কুল-মর্য্যাদা হাঁকিয়া বসিলেন। না পাইলে তাঁহারা জলগ্রহণ করিবেন না। অনেক তর্ক বিতর্কের পর দশ টাকায় রফা হইল। দশ টাকা গণিয়া লইয়া তাঁহারা আহার করিতে বসিলেন। আমরাও তাঁহাদিগের সঙ্গে আহার করিতে বসিলাম।

প্রাতে বরযাত্রীদিগকে একটি করিয়া টাকা ও একখানি করিয়া কাপড় দিয়া বিদায় করা হইল। বিবাহের পর জামাই শ্বশুরগৃহে দুই তিন মাস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। বিবাহের পর চারি দিন পর্য্যন্ত জামাইকে স্নান করিতে দেওয়া হয় না। এবং ভাতও খাইতে দেওয়া হয় না, কেবল প্রাতে কিঞ্চিৎ জলখাবার, ২টার সময় তস্মৈ ও রাত্রে কিছু জলখাবার দেওয়া হয়। চতুর্থ দিবসের পর ভাত খাইতে দেওয়া হয়। সেই দিন যাহার যতদূর ক্ষমতা সে ততগুলি তরকারি রাঁধিয়া বরকে খাইতে দেয়। ১১ হইতে ৪৯টা পর্য্যন্ত দিবার নিয়ম। আবার প্রথম দিন যে কয়টি তরকারি দেওয়া হইবে, জামাই যতদিন থাকিবে ততদিন সেই কয়টিই তরকারি দিতে হইবে। কনেরও সেই অবস্থা; তবে কন্যাকে তরকারি দিবার বাঁধা নিয়ম কিছু নাই।

এ দেশে ঠাট্টা করিবার এক বিভিন্ন নিয়ম। শ্বশুর-বাড়ীর যে-কেহ জামাইকে এবং তাহার মা বাপ এবং তাহার গ্রামস্থ যে-কেহকে ঠাট্টা করিতে পারে। কন্যা গওনা (দ্বিরাগমন) হইলে পতিগৃহে যায়। এদেশে বহু-বিবাহ প্রচলিত, কাজেই অনেক সময় কন্যা পিতৃগৃহেই চিরকাল থাকে। বিবাহে কন্যাকে বরপক্ষ হইতে মাত্র এক জোড়া স্থতি কাপড় ও একটি ভার দেওয়া হয়। দুইটি মাটির কলসীতে চাল ও দুইটি ঝুড়িতে কলা, ঠেকুয়া, গালার চুড়ি, ও বড় বড় কয়েকটি খাজা এবং দুই হাঁড়ি দধি, তিনটি লোকে বাঁকে করিয়া লইয়া যাওয়াকে ভার বলে। জামা মৈথিলীদের ব্যবহার করা নিয়মবিরুদ্ধ, কাজেই জামা ইত্যাদি দেওয়া হয় না। এইরূপ আরো ছোট খাটো নিয়ম আছে।

আমরা এইরূপে উক্ত গৃহস্বামীর নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রাতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

লহেরিয়াসরাই, দ্বারভাঙ্গা। শ্রীইন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

একস্থানে কতকগুলি কুটীরের সমষ্টি, এলোমেলো বিশৃঙ্খলায় নির্ম্মিত—ইহাই হইল ওরাওঁ পল্লী। কয়েকটি আঁকাবাঁকা গলিই পল্লীর মধ্যে চলাফেরার পথ। দুর্গন্ধ সার-রাখিবার গর্ত্ত, নোঙ্‌রা নর্দ্দামা ও শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর অত্যাচারে আবিল বদ্ধ ময়লা জলের ডোবা—এই-সমস্ত পল্লীর অন্তরকে যেমন অপরিচ্ছন্ন ও অপ্রীতিকর করিয়া রাখে, সুন্দর ঝোপঝাড়, মুক্ত মাঠ, ও এখানে সেখানে একটি দুটি পাহাড়, পার্ব্বত্য ছোট নদী বা আম্রকুঞ্জ বাহিরটিকে তেমনি রমণীয় করিয়া তোলে। ওরাওঁ পল্লীতে সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানের (Public

places) মধ্যে আখড়া বা নৃত্যভূমি ও ধুমকুড়িয়া বা পল্লীর অবিবাহিত পুরুষদের শয়নস্থান প্রধান।

সাধারণ ওরাওঁদের গৃহে দুইখানি করিয়া কুটীর দেখা যায়। প্রত্যেক কুটীরে চারিটি করিয়া মাটির দেওয়াল ও একটি দ্বার থাকে। ছাদ টালি বা খড় দিয়া আচ্ছাদিত। রাঁচি থানার এবং আশপাশের আর কয়েকটি থানার অধীনস্থ ওরাওঁ পল্লীগুলিতে টালির ছাদ বেশীর ভাগ খড়ের চালের স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু রাঁচি জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমের অপেক্ষাকৃত বন্য অংশে খড়ের চালই এখনো প্রচলিত; দেওয়ালগুলি কখনো কখনো গাছের ডালপালা দিয়া তৈয়ারি, এবং তাহার গায়ে কর্দ্দম ও গোময় লিপ্ত হয়। বড় কুটীরটি সাধারণত দুইটি

ওরাওঁদের ধান-মাড়া; বাঁ দিকের কুঁড়ে ঘরকে কুম্হা বলে, সেখানে আগলদার রাত্রে থাকিয়া ফসল আগলায়।
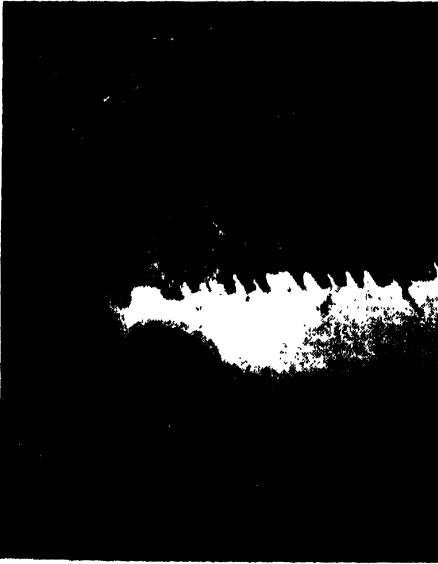
ওরাওঁদের ঘরের দেয়ালের নক্সা।

প্রধান কামরায় বিভক্ত হয়; বড় কামরাটি শয়ন, আহার ও রন্ধনের জন্য, ও ছোটটি ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ধান ও অন্যান্য শস্য এবং নানাপ্রকার বাসনকোসন রক্ষিত থাকে। কুটীরের সম্মুখে একটি ছোট বারান্দা সংলগ্ন থাকে; এটি বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়, এবং বৃদ্ধেরা সাধারণত এখানেই শয়ন করে। বড় কামরার এক কোণে একটু-খানি জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা থাকে, সেখানে মুরগী রাখা হয়। ছোট কুটীরটিতে সাধারণত গৃহপালিত পশু রক্ষিত হয় এবং কুটীরসংলগ্ন ছোট বারান্দাটি শূকরের খোঁয়াড়ের কাজ করে। অপেক্ষাকৃত বড় পরিবারে ছোট কুটীরের মধ্যভাগও শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়, বাঁশের বেড়া-ঘেরা দুই ধারের অংশে যথাক্রমে গৃহপালিত পশু ও পক্ষী রক্ষিত হয়। অতি দরিদ্র ওরাওঁ, যাহার কেবল একটিমাত্র কুটীর সম্বল, সে বড় কামরাটি শয়ন, আহার ও রন্ধনের জন্য, ও পাশের কামরাটি ভাণ্ডার ও শস্যরক্ষণের জন্য ব্যবহার করে। শয়নঘরের একাংশ বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরিয়া গোহাল তৈয়ারি হয় এবং আর এক কোণে মুরগী প্রভৃতি রক্ষিত হয়। বৃহৎপরিবারবিশিষ্ট খুব সচ্ছল অবস্থাপন্ন ওরাওঁএর দুইটিরও অধিক কুটীর থাকে; কুটীর কেন, রীতিমত বাড়ীই থাকে; ভিতরে একটি চতুষ্কোণ উঠান থাকে, পশ্চাতেও একটুকরা জমি থাকে, সেখানে শাকশব্জি ভুট্টা প্রভৃতি জন্মান হয়। বর্দ্ধিষ্ণু

ওঁরাওদের সগড় বা গরু-মহিষের গাড়ী।

দেয়। শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন এই তিন মাস ওরাওঁদের পক্ষে দুঃসময়। এজন্য অনেক ওরাওঁ হৈমন্তিক ধান কাটা হইয়া গেলেই, প্রতিবৎসর কলিকাতা বা কলিকাতার উপকণ্ঠে, যেখানে কাজকর্ম্ম জোটার সুবিধা এমন স্থানে, কয়েক মাসের জন্য কাজ করিতে যায়। কলিকাতার রাস্তায় যে ধাঙ্গড়েরা নালী নর্দ্দামা পরিষ্কার করিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে রাঁচি জেলার ওরাওঁ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পৌষ মাঘ মাসে রাঁচি জেলার জঙ্গলময় অংশ হইতে কতকগুলি বন্য কন্দমূল সংগ্রহ করিয়া তাহারা দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে। ফাল্গুন চৈত্র

ওরাওঁএর বাড়ী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও দেখিতে সুন্দর। বাড়ীর থাম, বরগা, কড়ি প্রভৃতি গ্রামের জঙ্গল হইতে সংগৃহীত শাল-কাঠে তৈয়ারি হয়; গ্রামে জঙ্গল না থাকিলে নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তর হইতে কাঠ আনা হয়। সাধারণত কুটীরে কোনো জানালা বা একটির বেশী দ্বার থাকে না। হিন্দু প্রতিবেশীর নিকটে বাস করিয়া কোনা কোনো ওরাওঁ তাহাদের অনুকরণে বাড়ীর দেওয়াল জীবজন্তু মানুষ ও ফুলের ছবি দিয়া সাজায়।

ভাতই ওরাওঁএর প্রধান খাদ্য। সাধারণ ওরাওঁ, পরিবারের সকলের জন্য সারা বৎসর ভাতের আহার যোগাইতে সক্ষম হয় না। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে দরিদ্র ওরাওঁ গোন্দলি সংগ্রহ করে, তাহা খাইয়া তাহারা সকলে দু'তিন সপ্তাহ কাটাইয়া দেয়। সাধারণ অবস্থাপন্ন ওরাওঁ এই সময়ে চাউল ও গোন্দলি একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া আহার করে। ইহার পর গোড়া বা উচ্চভূমির ধান কাটা হয় এবং অনতিকাল পরেই মাড়ুয়া সংগৃহীত হয়। কার্ত্তিক মাসে নিম্নভূমির ধান কাটা না হওয়া পর্য্যন্ত মাড়ুয়াই ওরাওঁদের প্রধান খাদ্য। কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ওরাওঁদের প্রচুর পানাহার সঞ্চিত থাকে। সেই হেতু এই সময়েই সে তাহার ধর্ম্ম ও সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান করে ও পুত্রকন্যার বিবাহ

ওরাওঁ স্ত্রীলোকেরা পথ চলিতেছে।

মাসে সংগৃহীত মহুয়াফুলের কোষগুলি দরিদ্র ওরাওঁ কর্ত্তৃক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন

ওরাওঁ ভেঁর বা রামশিঙা বাজাইতেছে।

ওরাওঁ কয়েক প্রকার ডাল খায়। অল্প হলুদ ও নুন দিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ডাল রাঁধে। সাধারণ অবস্থার ওরাওঁয়ের কাছে ডাল একটি সুখাদ্য, বিশেষ উপলক্ষে খাইবার জিনিস। অতি দরিদ্র ওরাওঁ প্রতিদিন কোনো-না-কোনো শাক ভক্ষণ করে তাহারা ভাতের ফ্যানে শাক সিদ্ধ করিয়া একটু নুন দিয়া ভাতের সঙ্গে তরকারির মত খায়। সাধারণ ওরাওঁ রন্ধন করিতে তৈল ব্যবহার করে না; তবে যাহারা বিশেষ অবস্থাপন্ন, হিন্দুর প্রতিবেশী, তাহারা রন্ধন করিতে অল্পস্বল্প তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। তৈল সরিষা বা সুরগুজা হইতে তৈয়ারি করে। শাকশবজির মধ্যে ওরাওঁ কুমড়া, লাল আলু, বেগুন, ঝিঙে, ঢেঁড়স, মটর, মূলা, পেঁয়াজ, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে ভক্ষণ করে। কয়েকখানি গ্রামে কেবল বর্দ্ধিষ্ণু ওরাওঁএরা কিছু কিছু আলুর চাষ করে; কিন্তু ইহা বিক্রয়ের জন্য, নিজের জন্য নহে। মৃত বা শীকার-করা প্রায় সকল প্রকার পশুপক্ষীর মাংস আহারে ওরাওঁ আপত্তি করে না। কিন্তু উৎসবের সময় ও মধ্যে মধ্যে শীকারে যাওয়ার সময় ছাড়া, কেবল সাধারণ আহারের জন্য পশুপক্ষীর মাংস আহার করা ওরাওঁএর সাধ্যাতীত।

ওরাওঁদের বাদ্যযন্ত্র ; চিত্রের ডাহিন দিকে গলায় ঝুলানো মাদল, এবং বাঁ দিকে কোলের উপর নাগেরা বাজিতেছে, এবং তাহার তালে তালে ওরাওঁ রমণীরা নৃত্য করিতেছে।

ছোটনাগপুরের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মত ওরাওঁদেরও হাঁড়িয়া বা চাউল-হইতে-প্রস্তুত-মদ্য প্রিয় পানীয়। দেশী মদ্য বা 'পচাই'এরও খুব প্রচলন। অত্যধিক পানাশক্তি ও চরিত্রগত সঞ্চয়বুদ্ধির অভাব বশতই অনেক ওরাওঁ-পরিবার ধ্বংস হইয়া গেছে।

ওরাওঁদের ঘানি-কল; ইহাতে তৈল ও ইক্ষুরস দুইই মাড়া হয়।

অধিকাংশ ওরাওঁ ঘর-বুনা সুতি কাপড় ব্যবহার করে। পুরুষেরা সাধারণত কারেয়া নামক কাপড় পরে। ইহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ হইতে ছয় গজ ও প্রস্থে এক ফুট। দরিদ্র ওরাওঁ যখন স্বগ্রামে থাকে তখন, ও অথর্ব্ব বৃদ্ধেরা, ভাগোয়া নামক একপ্রকার সরু কাপড় নেংটি করিয়া পরে; দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় এক গজ; উরুতের মধ্য দিয়া গিয়া ইহা কোমরে পরিহিত চামড়ার দড়িতে বা কারধানি নামক রঙীন সুতায় আটকান থাকে। কারেয়ার প্রান্তভাগ সাধারণতঃ লাল সুতায় তৈয়ারি চিত্রবিচিত্র নক্সায় সজ্জিত থাকে, কখনো বা দোদুল্যমান লাল সুতার ঘুন্টি দিয়া সজ্জিত হয়। শরীরের উপরাংশ আবৃত করিবার জন্য ইহারা দেশী কাপড়ের দুই প্রকার চাদর ব্যবহার করে। ইহাদের নাম যথাক্রমে বরখি ও পেছৌরি। প্রথমটি প্রায় তিন গজ লম্বা ও দেড় গজ চওড়া, দুই ভাঁজ করিয়া ধার সেলাই করা, সেই জন্য শীতকালে ব্যবহারের উপযোগী। দ্বিতীয়টি কেবল এক ভাঁজ, সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যেও ছোট। অবস্থাপন্ন ওরাওঁ শীতের সময় কম্বল গায়ে দেয়। ভ্রমণে বাহির হইলে অবস্থাপন্ন ওরাওঁ এক টুকরা কারেয়া মাথায় জড়ায়। ইহা পাগড়ির কাজ করে।

ওরাওঁগণ ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া গুড় করিতেছে।

সাধারণ ওরাওঁ-রমণী বাহিরে যাইবার সময় হাড়ি বা জানামা-কিচরি নামক পাঁচ গজ লম্বা ও প্রায় দুই ফুট চওড়া একপ্রকার কাপড় পরে, ইহার একাংশ দিয়া শরীর আবৃত করে। বাড়ীর মধ্যে কাজ করিবার সময় উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট 'হাড়ি' পরে—প্রায় আড়াই গজ লম্বা ও দুই ফুট চওড়া—তাহাতে শরীরের উপরাংশ অনাবৃত থাকিয়া যায়। ভ্রমণ বা কাহারো সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় ইহারা খাঁড়িয়া-

কিচরি নামক স্বতন্ত্র বস্ত্রে দেহের উপরিভাগ আচ্ছাদিত করে। উহা প্রায় ছয় গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া। দু'তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ওরাওঁ-শিশু উলঙ্গ হইয়া বেড়ায়। তিন বৎসর বয়স হইলে (অবস্থাপন্ন পরিবারে তৎপূর্ব্বে এবং অতি দরিদ্র পরিবার বা জঙ্গলময় অংশে ইহার পরে) বালক একখণ্ড কারেয়া ও বালিকা একখণ্ড গাজ্জি বা পুটলি কোমরে জড়ায়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন পরিবারে বা বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে বালিকারা দেহের উপরাংশের জন্যও একখণ্ড স্বতন্ত্র বস্ত্র ব্যবহার করে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে জেলার অভ্যন্তর প্রদেশে কেবল পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকেরাও কোমরের উপর বা হাঁটুর নীচে কোনো আবরণই রাখে না। এবং দরিদ্র স্ত্রীলোকের এই সামান্য কোমরে-জড়াইবার বস্ত্রখণ্ডও ছেঁড়া ন্যাকড়া জোড়া দিয়া তৈয়ারি।

মুণ্ডা-রমণীর ন্যায় ওরাওঁ-রমণীও তাহার দেহ নানা প্রকার (সাধারণতঃ পিতল-নির্ম্মিত) অলঙ্কারে ভূষিত করিতে ভালবাসে। তাহার মধ্যে তাগা, বালা, কণ্ঠহার, আংটি ও চুটকি প্রধান। পিতলের কণ্ঠহার ছাড়া নানা রঙের পুঁতির মালা গলায় পরে। কানের ফুটায় লাল-রঙ-করা একতাড়া পাকানো তালপাতা গুঁজিয়া দেয়; ইহা দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি ও ইহার ব্যাস প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি হইবে। নাক বা পায়ের কোনো অলঙ্কার নাই। ওরাওঁ যুবক, ওরাওঁ যুবতীর মতই, দেহের প্রসাধন করিতে ভালবাসে। গলায় কতকগুলি পুঁতির মালা; আংটা, পিতলের গুঁজি প্রভৃতি অদ্ভুত আকারের কর্ণ-অলঙ্কার; কপাল বেড়িয়া পিতলের অর্দ্ধবৃত্ত, দীর্ঘকেশ ঝুঁটিবাঁধা, তাহাতে দু'একখানা কাঠের চিরুনি গোঁজা, কখনো বা ঝুঁটির উপর একখানি ছোট গোলাকার আরশি স্থাপিত; —ইহাই ওরাওঁ যুবকের প্রধান ভূষণ। আজকাল ওরাওঁ যুবকেরা—বিশেষতঃ যাহারা নগরের সন্নিকটে বাস করে —দীর্ঘ কেশ রাখা ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু দীর্ঘকেশ কাটিয়া ফেলিলেও লম্বা চুলের নিদর্শন স্বরূপ এক গোছা চুন্দি বা টিকি রাখা চাই।

প্রায় সাত বৎসর বয়সে ওরাওঁ বালিকার কপালে তিনটি সমান্তর রেখা ও দুইটি রগে ঐরূপ তিনটি করিয়া রেখা উল্কি দিয়া অঙ্কিত করা হয়। পুনর্ব্বার বারো বৎসর বয়সে তাহার কবজি, পিঠ, পা ও বুকে ফুল প্রভৃতির অদ্ভুত ছবির উল্কি দেওয়া হয়। মালার জাতীয় স্ত্রীলোকেরা তিন-দাঁতবিশিষ্ট একটি লোহার যন্ত্র দিয়া এই উল্কি পরায়। উল্কির রংএর জন্য কয়লা ও তৈলের মিশ্রন ব্যবহৃত হয়।

ওরাওঁদিগের গৃহস্থালীর আসবাবপত্র ও বাসন-কোসন মুণ্ডাদের মতই।

ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হইতেছে নাগেরা বা গরুর চামড়ায় ছাওয়া লোহার ঢোল, বানরের-চামড়ায় ছাওয়া মান্দল বা খেল নামক মাটির ঢোল, ও ভেঁর নামক দীর্ঘ লোহার শিঙ্গা। শেষোক্তটি জোড়ায় জোড়ায় বিবাহের সময় বাজান হয়; মান্দল বাজান হয় করম জাদুরা ও সাহোরাই উৎসবে এবং নৃত্যের সময়। নাগেরা শীকার-যাত্রায়, বিবাহে ও উপরোক্ত নৃত্য ও উৎসবাদিতে বাজান হয়।

ওরাওঁএর সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বপ্রধান কেন একমাত্র, উপজীবিকাই হইল কৃষিকার্য্য। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে ধান, মটর-কলাই, তিল, সর্ষপাদিই প্রধান। কৃষিযন্ত্র ও কৃষিপ্রণালী মুণ্ডাদিগের ন্যায়। যে-সব বিশেষ শস্য ওরাওঁ উৎপাদন করে তন্মধ্যে তুলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো ওরাওঁ অল্প পরিমাণ জমিতে স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য তামাকের চাষ করে। আকের চাষ রাঁচি (পাঁচ পরগণা) ও পালামৌ জেলার অংশবিশেষে আবদ্ধ। আক কাটা হইলে, হয় কলহু নামক যন্ত্রে, নয় চোক ঘানিতে (লম্বভাবে দণ্ডায়মান দুইটি কাঠের রোলার স্ক্রু দিয়া আঁটা, পরস্পরের গায়ে ঘষণ করে) আক মাড়া হয়।

উপরোক্ত যে-কোনো যন্ত্রসাহায্যে নিংড়ানো রস বড় বড় চ্যাপটা মাটির পাত্রে চার বা ততোধিক গর্ত্ত-বিশিষ্ট চুল্লির উপর জাল দেওয়া হয়। উপরে যে গাদ ওঠে তাহা লোহার ঝাঁঝরি দিয়া তুলিয়া ফেলা হয়।

রাঁচি শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

পুস্তা রাজপ্রাসাদ

পুস্তা রাজপ্রাসাদ ঢাকায় মোগল শাসনের শেষ চিহ্ন। সে অতীত যুগে চারিতল এই বিশাল হর্ম্ম্য বুড়ীগঙ্গার তীরে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া সম্রাট ঔরংজেবের পৌত্র আজিম-উস্-শানের ধনৈশ্বর্য্যের পরিচয় দিত। আজ সে প্রাসাদের চিহ্নও নাই, উহার সমুদয় অংশ বুড়ীগঙ্গার গর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই রাজপ্রাসাদের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের একটী গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনা জড়িত এবং সেই ঘটনা হইতেই ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানী ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তরিত হয়। সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনীটি এই ঃ—

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁর সময়ে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। উড়িষ্যার পাঠানদের সাহায্যে ইনি বর্দ্ধমানের রাজপুরী আক্রমণ করিয়া মহারাজা কৃষ্ণরাম ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করেন। নবাব এই বিদ্রোহ দমনে বড়ই উদাসীনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানী সুযোগ পাইয়া আত্মরক্ষার্থ কলিকাতার ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্রোহ ও বাংলার চতুর্দ্দিকে অশান্তির সংবাদ ঔরংজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার পৌত্র আজিম-উস্-শানকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে আজিম্-উস্-শান বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। তিন বৎসর বঙ্গ শাসনের পর তিনি ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজার নির্ম্মিত বিপুল রণতরী সংগ্রহ করিয়া অতি জাঁকজমকের সহিত রাজধানী ঢাকায় আগমন করেন। সেইদিন লক্ষ লক্ষ লোক নদীতীরে দাঁড়াইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ঢাকা মসনদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুবরাজ আজিম কর্ত্তৃক ১৭০২ খৃষ্টাব্দে পুস্তা রাজপ্রাসাদ * নির্ম্মিত হয়। বিশপ হিবর পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণকালে ঢাকায় আগমন করিয়া এই বিখ্যাত রাজপ্রাসাদের গঠন-প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ চিত্তে বলিয়াছিলেন,—

"এই ইষ্টক-নির্ম্মিত দুর্গ রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহার গাত্রে তখনও এক প্রকার পলস্তারা (Plaster) দৃষ্ট হইত। ইহার স্থাপত্য অনেক বিষয়ে মস্কোর বিখ্যাত 'ক্রেমলিন' দুর্গের অনুরূপ ছিল।"

সুবাদার আজিম-উস্-শানের সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় মোগল শাসনের শেষ দশা উপস্থিত হয়। আজিম অর্থ-সংগ্রহ ও আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই চাহিতেন না। বাংলায় বিদেশ হইতে আনীত বস্তুর একমাত্র সদাগর হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কোম্পানী গঠন করিয়া বলপ্রয়োগে মহাজনী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে বাংলার চারিদিকে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বাণিজ্য-ব্যাপারটাকে তিনি 'সোনাদই খাস' ও 'সোনাদই আম' নামে অভিহিত করিতেন।

সম্রাট ঔরংজেব এই বাণিজ্য-কলঙ্কের সংবাদ প্রথম অবগত হইয়া ঘৃণার সহিত বলিয়াছিলেন 'ইহা সোনাদই খাস্ নহে, ইহা সোদ্দা খাস্ অর্থাৎ একপ্রকার বাতুলতা।' তিনি এই বাণিজ্য-ব্যাপার হইতে যুবরাজকে দূরে থাকিতে আদেশ দিয়া শাস্তি স্বরূপ তাঁহার সৈনিক প্রহরী কমাইয়া দেন। এইভাবে পিতামহের আদেশে ব্যবসায়ের লাভ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করেন। সেই সময়ে তিনি ঢাকার হিন্দু অধিবাসীদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের হোলি উৎসবে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি তিনি স্বয়ং পীত রংএর উষ্ণীষ ও গোলাপী রংএর বসন পরিধান করিয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। এহেন ইস্‌লাম-ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণের সংবাদ সম্রাট জানিতে পারিয়া পৌত্রকে ভর্ৎসনা

---

* ডাঃ টেলরের সময়ে এই রাজপ্রাসাদের সামান্য অংশমাত্র বিদ্যমান ছিল। তাঁহার সুলিখিত 'Topography' গ্রন্থে লিখিত আছে :—'Of the Pooshta residence the greater part has been carried away by the river, within the last twenty years, and there is only a small portion of it standing. It appears to have been built by Prince Azim-ooshaun, who was residing here, it may be remarked, at the time that Moorsheed Kooli Khan, while on his way to pay him a visit, was assailed by Abdul Wahid. Ferokshere, the last Viceroy, and the last Moghul Prince that ever visited Dacca, occupied this residence also.'

করিয়া স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, 'পীত রংএর পাগড়ী ও গোলাপী বসন ছয়চল্লিশ বৎসরের দাড়ি-গোঁপ-বিশিষ্ট লোককে কখনই মানায় না।' *

পৌত্রের এই-সমস্ত অদ্ভুত ও ইস্‌লাম-ধর্ম্মবিরুদ্ধ খেয়াল লক্ষ্য করিয়া সম্রাট ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁকে (করতলাবখাঁ) বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠান। ইতিপূর্ব্বে দেওয়ান রাজাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে নাজিমের অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধির আদেশ পালন করিয়া চলিতেন, কিন্তু মুর্শিদ যুবরাজের আর্থিক অবস্থার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া দেওয়ানী পদটাকে রাজপ্রতিনিধির হাত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভা ও রাজনৈতিক কৌশলের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে শান্তি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানা দিকের ব্যয় সংকোচ করিয়া দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতে আরম্ভ করেন। সম্রাট ও প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে তিনি 'পার্ব্বত্য ঘোড়া, হরিণ, বাজপাখী, গণ্ডার-চর্ম্ম-নির্ম্মিত ঢাল, তরবারী, শ্রীহট্টের মাদুর, ঢাকাই মস্‌লিন এবং কাশিমবাজারের উৎকৃষ্ট রেশমের বস্ত্র ও সুবর্ণ-ও-হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত মূল্যবান্ উপহার প্রেরণ করেন।' রাজস্ব ও নানাবিধ উপহার-সম্ভার প্রাপ্ত হইয়া সম্রাট দেওয়ান-মুর্শিদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু যুবরাজ আজিম-উস্‌-শানের পক্ষে মুর্শিদকুলিখাঁর ব্যয়-সংকোচের ক্রিয়াকলাপ ভাল বোধ হইল না, কারণ তাহার ফলে নানাদিক দিয়া তাঁহার আয় কমিয়া আসিতেছিল। অধিকন্তু নদী দ্বারা সুরক্ষিত ঢাকার ন্যায় নগরীতে সৈন্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া নূতন

পুস্তা রাজপ্রাসাদ।

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাস' হইতে তাঁহার অনুমতিক্রমে গৃহীত।)

* 'A yellow turban and rose-coloured ga ments suit ill with a beard of forty-six years' growth'.
Bradly-Birt.

দেওয়ান যুবরাজের 'নগদী' নামক তিন হাজার (কাহারও মতে পাঁচ হাজার) অশ্বারোহী প্রহরী উঠাইয়া দেন।

এইরূপ নানা কারণে যুবরাজের সহিত দেওয়ানের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই মনোমালিন্যের ফলে যুবরাজ দেওয়ানকে হত্যা করিবার জন্য একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক আবদুল ওয়াহিদকে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। আজিম-উস্-শান পুস্তা প্রাসাদের একাংশে দরবার করিতেন। দরবারের দিন দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁ রাজকীয় পাল্কীতে চড়িয়া পুস্তা প্রাসাদে গমন করিতেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদিন মুর্শিদকুলিখাঁ সহরের সদর রাস্তা দিয়া বহু লোকজন সহ লালবাগের দিকে রাজপ্রাসাদে যাইতেছিলেন। সেদিন দরবার বসিবার কথা ছিল। এদিকে পুস্তা প্রাসাদের সন্নিকটে একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে আবদুল ওয়াহিদ সংগোপনে দেওয়ান সাহেবকে আক্রমণ করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে দেওয়ান সাহেব যুবরাজের এই-সমস্ত ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া বহু লোকজন সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আজিম-উস-শানকে প্রকাশ্যভাবে ঘৃণার সহিত বলিলেন,—'যুবরাজ, যদি আপনি আমার প্রাণনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আসুন আমরা পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে শক্তিপরীক্ষা করি।' এই বলিয়া তিনি কোষস্থিত তরবারিতে হস্তার্পণ করিলেন। যুবরাজ যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি শক্তিপরীক্ষায় অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর দেওয়ান সাহেব দরবার-গৃহে উপস্থিত হইয়া আবদুল ওয়াহিদকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তাঁহার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া সৈন্য সামন্ত সহিত তাঁহাকে রাজ-সরকার হইতে পদচ্যুত করিলেন। এই ব্যাপার নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আজিম-উস্-শান অত্যন্ত ভীত হন। দেওয়ান নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দরবারের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন* এবং অবশেষে ঢাকা নগরী তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে মনে করিয়া তিনি সেইদিনই দেওয়ানী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ও লোকজন সঙ্গে করিয়া জলপথে ঢাকা পরিত্যাগ করেন। আজিম-উস্-শান পুস্তা প্রাসাদের কক্ষ হইতে মুর্শিদকুলিখাঁকে বহু লোকজন সহ বজরায় চড়িয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন। শত্রুকে বাধা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাধা দিতে গেলে পরিণাম ভয়াবহ হইবে মনে করিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

এইদিন হইতেই ঢাকার প্রাধান্য ও গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, অদৃষ্ট-পুরুষ ঢাকার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইলেন। ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইল। ইহারই অব্যবহিত পরে ঔরংজেবের আদেশমত যুবরাজ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় যাইতে বাধ্য হন। তাঁহার ঢাকা পরিত্যাগের দিন বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক স্মরণীয় ঘটনা। পিতামহ কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও তিনি অতি আড়ম্বরের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করেন। পুস্তা প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী রাজঘাট হইতে তিনি বহু লোকজন ও আট কোটী টাকা সঙ্গে লইয়া বজরায় আরোহণ করিয়াছিলেন। চারিদিকে ঢাক ঢোল ও রাজপ্রাসাদ হইতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল এবং কেল্লা হইতে বিদায়-সূচক ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহার সহিত পুস্তা রাজপ্রাসাদ ও ঢাকার গৌরব লোপ পাইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* The Viqayah Nigar (Daily News Writer) also reported the affair to His Majesty.

নিয়তি

(গল্প)

বিদ্যাকাঠীর জীবনমোহন চৌধুরী যশোহরের একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার, লোকে বলিত তাঁহার প্রবল প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। জীবনমোহন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, বঙ্গদেশের অধ্যাপক-সমাজ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী ছিল, তাহা ছাড়া ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহার বড়ই ব্যয়বাহুল্য দেখা যাইত। জীবনমোহনের একমাত্র পুত্র প্রাণমোহন, পিতার ঐকান্তিক যত্নে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে

পুত্রের বিবাহ দিয়া বৃদ্ধ জীবনমোহন পৌত্রমুখ দর্শনের ভরসায় বসিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। হইবে না হইবে না করিয়া প্রাণমোহনের পত্নী প্রমদাসুন্দরী যখন একটি কন্যা প্রসব করিলেন, তখন বৃদ্ধ যেন চাঁদ হাতে পাইলেন, আদর করিয়া পৌত্রীর নাম রাখিলেন মাধুরী। বৃদ্ধ বয়সে জীবনমোহন বিষয়কর্ম্ম বড় দেখিতেন না, সুশিক্ষিত পুত্রের হস্তে বিস্তৃত জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ নিশ্চিন্তমনে পৌত্রীকে লইয়া দিন যাপন করিতেন। মাধুরী তাঁহার নয়নের তারা হইয়া উঠিয়াছিল, মাধুরীর জন্য তাঁহার কাশীবাস করা হয় নাই। কেহ যদি বলিত যে বড় বাবুর একটি পুত্র সন্তান হইলে ভগবান কর্ত্তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহার কথা চাপা দিয়া বলিত "ও কথা বলিও না, একা মাধু আমার শত পুত্রের কাজ করিবে।" মাধুরী সত্য সত্যই মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিল ; যে তাহাকে একবার দেখিত, সে নয়ন ফিরাইয়া লইতে পারিত না। প্রতিদিন প্রভাতে মাধুরী যখন বৃদ্ধ পিতামহের হস্ত ধারণ করিয়া বিশাল পুষ্পোদ্যানে খেলিয়া বেড়াইত, তখন তাহাকে দেখিলে অপ্সরী বা দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম হইত।

জীবনমোহন দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণের দ্বারা পৌত্রীর জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে তিনি সর্ব্বদাই অস্থিরচিত্ত ও অসন্তুষ্ট থাকিতেন। বিদ্যাকাঠী গ্রামে বিদায়ের লোভে কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বা গ্রহাচার্য্য আসিলে তাঁহার আর সমাদরের অবধি থাকিত না। এইরূপে মাধুরীর শত শত জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। একবার মাত্র বিক্রমপুরনিবাসী কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায় এক ব্রাহ্মণ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। সেদিন মাধুরী পিতামহের পার্শ্বে বসিয়া ছিল, ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাতলে বসিল, কাগজ কলম লইয়া জন্মপত্রিকা লিখিতে লাগিল, কিন্তু কি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, আর লিখিল না, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন ত্রস্ত হইয়া জীবনমোহন তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ যখন কাতর হইয়া ধরিয়া পড়িলেন তখন ব্রাহ্মণ বলিল "বাবু, নিয়তি কেহ খণ্ডাইতে পারে না, অর্থব্যয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নে যদি লোকে নিয়তির হাত এড়াইতে পারিত তাহা হইলে জগতে দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যু থাকিত না।" মর্ম্মাহত হইয়া বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তখনও বলিতেছিল, "শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আমাদের উদর পূরণের উপায়। গণনার যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অর্থের জন্য আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ; বিদায়, পাথেয় প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিল। তাহার পর সে কৃষ্ণকায় জ্যোতিষীকে বিদ্যাকাঠী গ্রামে কেহ দেখে নাই। জীবনমোহন তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষোদেশে সে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহা কেহ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। মাধুরীর বয়স যত বাড়িতেছিল জীবনমোহনের বিষণ্ণতাও তত বাড়িতেছিল। পুত্রের নিকটে মাধুরীর ভবিষ্যতের কোন কথা বলিয়া বৃদ্ধের মনের তৃপ্তি হইত না, কারণ পুত্র নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি কুসংস্কারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

মাধুরীর বিবাহের বয়স হইল। প্রমদাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল যে অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ছলে একটি দরিদ্রের পুত্র ক্রয় করিয়া লালন পালন করেন, কিন্তু জীবনমোহন তাহাতে অমত করিলেন। প্রমদাসুন্দরী গৌরীদানে শ্বশুরের অমত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে জীবনমোহন নিষ্ঠাবান হিন্দু। দেখিতে দেখিতে মাধুরী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জীবনমোহন পৌত্রীর বিবাহের জন্য যত্নবান হইলেন। প্রাণমোহন কোনদিনই মাধুরীর বিবাহের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহার বিশ্বাস ত্রয়োদশবর্ষ উত্তীর্ণ না হইলে কুমারীর বিবাহ হওয়া উচিত নহে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসমাজে কর্ত্তৃত্ব করিয়া, কুলাচার্য্য ও গ্রহাচার্য্যগণের উদর পূরণ করাইয়া, অবশেষে জীবনমোহন মাধুরীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্র কলিকাতা নিবাসী, ধনীর সন্তান, কলিকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের ছাত্র, প্রিয়দর্শন

এবং মিষ্টভাষী। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বৃদ্ধের মুখে হাসি দেখা দিল। যথাসময়ে মহাসমারোহে জীবনমোহন সৎপাত্রে পৌত্রীকে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মাধুরীর দুইটি অলঙ্কার বাড়িল,—সীমন্তে সিন্দূর ও মস্তকে অবগুণ্ঠন।

তখন কলিকাতা মহানগরীতে মহামারী দেখা দিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতের শেষে গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠে, গঙ্গাতীরে শবদাহের স্থানাভাব হয়। একদিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় টেলিগ্রাম পাইয়া পিতাপুত্র কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে, শমন একটি সুকুমার জীবনের সহিত মাধুরীর জীবনের সকল সুখ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পিতাপুত্রে মস্তকে হাত দিয়া বৈবাহিকের প্রাঙ্গনে বসিয়া পড়িলেন। তখন অন্তঃপুর হইতে পুত্রশোকাতুরা মাতা উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাদিগকে গালি দিতেছিল। শুষ্কমুখে মাধুরীর শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া জীবনমোহন ও প্রাণমোহন বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধ পুত্রকে জানাইলেন যে তিনি এখন আর দেশে ফিরিতে পারিবেন না, তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইবেন। ভগ্নহৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে গৃহে ফিরিয়া প্রাণমোহন একমাত্র কন্যার সর্ব্বনাশের কথা প্রকাশ করিলেন। মাধুরী কিছুই বুঝিল না, কারণ সে বিবাহের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে স্বামীকে দেখে নাই, স্বামী কে তাহা বুঝিতে শিখে নাই, স্বামীর অভাব কি তাহা অনুভব করে নাই। প্রমদাসুন্দরী ভূতলে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কন্যাও কাঁদিতে বসিল ; আর, তাহার অশ্রুজল দেখিয়া বিদ্যাকাঠী গ্রামের কেহই অশ্রুজল রোধ করিতে পারিল না।

জামাতার শোক প্রাণমোহনের বুকে বড় বাজিল। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁহার আনন্দ বা শোক লোকে জানিতে পারিত না, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও কেহ ছিল না। চৌধুরীদিগের গৃহে প্রমদাসুন্দরীই গৃহিণী, প্রাণমোহনের মাতা বহুপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

যেমন করিয়া সকলের দিন কাটিয়া থাকে মাধুরীর দিনও তেমনি করিয়া কাটিতে লাগিল। ক্রমে মাধুরী বিবাহের কথা ও স্বামীর কথা ভুলিয়া গেল। মাধুরীর মাতা প্রাণ ধরিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইতে পারেন নাই, কিশোরী কন্যাকে হিন্দু বিধবার কঠোর জীবনব্রত অবলম্বন করাইতে পারেন নাই। ইহার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইতেছিল।

এক বৎসরের অধিককাল তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়া জীবনমোহন যখন দেশে ফিরিলেন তখন পূর্ব্বের ন্যায় হাসিমুখে সালঙ্কারা নববধূর মত মাধুরী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেল। তাহার দাদাবাবু যে এতদিন তাহাকে কি করিয়া ভুলিয়া ছিলেন তাহা সে ভাল বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহাকে দেখিয়া জীবনমোহনের বিষণ্ণমুখ আরও বিষণ্ণ হইয়া গেল তখন মাধুরীর মুখও শুকাইয়া গেল, চিরাভ্যস্ত অভ্যর্থনা ভুলিয়া গিয়া মাধুরী ধীরে ধীরে পিছাইয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া জীবনমোহন মাধুরীর বেশ পরিবর্ত্তন ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মাধুরীর অঙ্গে সধবার চিহ্ন রাখার জন্য পুত্রবধূকে বড় তিরস্কার করিলেন। মাধুরীর মাতা ভূমিশয্যায় লুটাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। পিতামহের উপদেশ অনুসারে মাধুরী অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল, সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া ফেলিল, একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিল ; সাত দিনের মধ্যে ফুলের মত সুকুমার মাধুরী যেন শুকাইয়া উঠিল। সে প্রথম প্রথম তর্ক করিয়া বৃদ্ধ পিতামহকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিধবা হইলে মাছ খাইতে নাই কেন, থান পরিতে হয় কেন, স্বামী কে, ইত্যাদি যে-সমস্ত প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই সেইগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধকে সেই বালিকা নির্ব্বাক করিয়া দিত।

কন্যার পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রমদাসুন্দরী শয্যা আশ্রয় করিলেন, মাধুরীকে দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাণমোহন অন্তঃপুরে আসা ত্যাগ করিলেন।

মাধুরী একে একে সব শিখিল, সব বুঝিল, তখন সে বালসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিল।

জীবনমোহন মাধুরীর শিক্ষা শেষ করিয়া পুনরায় তীর্থভ্রমণে চলিয়া গেলেন। তখন মাধুরী বড় বিপদে

পড়িল। একাকী তাহার দিন আর কাটে না। পিতামহের উপদেশ-মত যতক্ষণ সময় পাইত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িত, সংসারের কাজ তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইত না, প্রমদাসুন্দরী নিজেও কিছু দেখিতেন না, আত্মীয়াগণ সমস্তই সম্পন্ন করিতেন। মাধুরী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পিতামহের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় রহিল।

চৌধুরীদিগের অন্নে অনেক লোক প্রতিপালিত হইত। প্রাণমোহনের পিতা গ্রামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার শিক্ষকবর্গ প্রাণমোহনের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে জীবনমোহন এক অনাথ ব্রাহ্মণসন্তানকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কান্তিচন্দ্র গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া সেইখানেই শিক্ষক হইয়াছিল। জীবনমোহন অনেকবার তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। কান্তি আত্মীয়-স্বজন ও অর্থের অভাব জানাইয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। প্রাণমোহনের ইচ্ছা ছিল যে মাধুরীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু জীবনমোহনের মত না হওয়ায় তাঁহার আশা সফল হয় নাই। মাধুরী বিধবা হইবার পরে প্রাণমোহন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কান্তির সহিত মাধুরীর পুনরায় বিবাহ দিবেন। জীবনমোহন দ্বিতীয়বার তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলে প্রাণমোহন একদিন স্ত্রী ও কন্যার নিকটে নিজের মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রমদাসুন্দরী পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন, মাধুরী কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সে বলিল পিতামহের নিকট শুনিয়াছে হিন্দুর কন্যার একবারের অধিক বিবাহ হয় না, সে কিরূপে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে। প্রাণমোহন প্রথম দিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু বারম্বার বলিয়াও যখন কন্যার মত করাইতে পারিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে মাধুরীকে বিবাহ করিতেই হইবে।

সেইদিন হইতে মাধুরী অন্ধকার দেখিল। কথা গোপন রহিল না, ক্রমে গ্রামের লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল, দেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল প্রাণমোহন চৌধুরী বিধবা কন্যার বিবাহ দিবে। আত্মীয় স্বজন অনেকেই ধর্ম্মভয় ও সমাজের ভয় দেখাইয়া প্রাণমোহনকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বড় বেশী কথা কহিতেন না। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। কান্তি বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল, প্রাণমোহন যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন তখন সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, নীরবে মুখ নত করিয়া রহিল। প্রাণমোহন ভাবিলেন বিবাহে তাহার সম্মতি আছে। তখন তিনি বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন।

মাধুরী যখন বুঝিল যে পিতা তাহার বিবাহ দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তখন আকুল হইয়া পিতামহকে সংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইল। জীবনমোহন কোথায় গিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না, তিনি অর্থের আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পত্র লিখিতেন মাত্র, তারপর আর কোন ঠিকানা পাওয়া যাইত না। মাধুরী অনেক সন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাইল না।

প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রাণমোহন বঙ্গদেশের পণ্ডিত-সমাজের নিকট হইতে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা আনাইয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল ; গৃহে উৎসব আরম্ভ হইল। বিবাহের দিন প্রভাতে যখন নহবৎ বাজিয়া উঠিল তখন মাধুরী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সমস্ত দিনে কেহ আর তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। সন্ধ্যাসমাগমে প্রাণমোহন যখন কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হইলেন, কান্তি যখন বর-বেশে সভায় উপস্থিত হইল, তখন মাধুরীকে আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না। ব্যাকুল হইয়া প্রাণমোহন স্বয়ং গ্রামের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আকস্মিক বিপদ আশঙ্কা করিয়া প্রমদাসুন্দরী শোকশয্যা ত্যাগ করিলেন ও কন্যার সন্ধান করিতে ব্যস্ত হইলেন, কান্তি বরবেশ ত্যাগ করিয়া মাধুরীর সন্ধানে নির্গত হইল।

ক্রমে বিপদ বুঝিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সরিয়া পড়িল, আলোকমালা নিবিয়া গেল, গ্রামের লোকে বাদ্যধ্বনির

পরিবর্ত্তে শোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল। রজনী শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাণমোহন হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু কান্তি আর চৌধুরীদিগের গৃহে ফিরিল না।

শেষ রাত্রিতে জেলিয়ারা খালে মাছ ধরিতে গিয়া একটা গুরুভার পদার্থ টানিয়া তুলিল। জাল উঠাইয়া সভয়ে দেখিল যে উহা একটি রমণীর মৃতদেহ। তাহারা যখন ঘাটে নৌকা লাগাইল তখন দেখিল কে যেন তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ক্রমে ঘাটে লোক জমিয়া গেল, কোথা হইতে কান্তি আসিয়া যখন মৃতাকে মাধুরী বলিয়া ডাকিল তখন লোকে জানিল প্রাণমোহন চৌধুরীর কন্যা মরিয়াছে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। তখন সেই ঘাটে নিরুদ্বেগে বসিয়াছিল একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সে যেন মাধুরীর মৃতদেহেরই অপেক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে প্রাণমোহন সংবাদ পাইলেন। তাঁহার মুখে শোকের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, মুখ যেন আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। প্রমদাসুন্দরীর রোদনধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে কোথা হইতে তীরবেগে একখানা পান্সি আসিয়া ঘাটে লাগিল। একজন বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন, জনতা দেখিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের লোকে সসম্ভ্রমে বৃদ্ধ জীবনমোহন চৌধুরীকে পথ ছাড়িয়া দিল। মৃতদেহ দেখিয়া বেদনাক্লিষ্টকণ্ঠে বৃদ্ধ একবার শুধু ডাকিলেন "মাধু!" তাহার পর নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেহ ভরসা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইল না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল,—"বাবু, আমি সেই গণনার বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

শ্রীকাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্রবাদ—প্রাচীন ও নবীন

জগতে নানা শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই একখানি গ্রন্থ বা কতিপয় গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই গ্রন্থ-সকলের উক্তিকে তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রবাদ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কারের বিরোধী। শাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি যদি কেবল ধর্ম্মের দুই একটী মূল তত্ত্বের কথা বলিয়াই নিরস্ত হইতেন, তবুও বা ইহার একটা অর্থ বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু তাঁহারা যখন এমন কোন তত্ত্ব নাই যাহার সম্বন্ধে কথা বলেন নাই, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই দাবী বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। পুরাকালে কোন এক দিন ব্যক্তি-বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে সকল তত্ত্ব আবিভূর্ত হইয়াছিল, ইহা ক্রমবিকাশবাদ (Evolution Theory) স্বীকার করিবে না। মানবের ধর্ম্মও যখন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, তখন গ্রন্থনিবদ্ধ শাস্ত্রবাদ আর গৃহীত হইতে পারে না। তাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক নূতন শাস্ত্রবাদ প্রচারিত করিয়াছেন। এই শাস্ত্রবাদ একটী মাত্র সূত্রে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে— "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্"। গ্রন্থনিবদ্ধ শাস্ত্রবাদের সঙ্গে ইহার বিভিন্নতা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এখন প্রশ্ন এই, ইহা কি সম্পূর্ণ একটী নূতন মত, না ইহার পশ্চাতে ইতিহাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুর দেশে ইহার জন্ম এবং সংস্কৃত ভাষাতে ইহার আবির্ভাব; সুতরাং হিন্দুর শাস্ত্রবাদের অভিব্যক্তি পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রকে গ্রন্থের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, বেদই হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র, তাঁহারা বেদেরই মধ্যে ইহার প্রতিবাদ শুনিয়া কি মনে করিবেন, জানি না। অতি প্রাচীন উপনিষদ মুণ্ডক বলিতেছেন, 'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতে॥" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প,

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এ সকলই অপরা (বিদ্যা)। কিন্তু যাহা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষ ব্রহ্মকে জানা যায়, কেবল মাত্র তাহাই পরাবিদ্যা। গ্রন্থনিবদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে যদি বলা যায় যে ইহার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে যে তাহার শাস্ত্রত্বই বিনষ্ট হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। এখানে তাহাই হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ লোকে গ্রন্থই বুঝে, কিন্তু ঋষি আমাদের মনে তদতিরিক্ত কিছু পাইবার আশা জাগাইয়া তুলিতেছেন।

যেদিন "তত্রাপরা" এই উপনিষদরূপ বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল সে দিন হিন্দুর শাস্ত্রবাদ যে জগতের ভবিষ্যৎ অন্যান্য সকল শাস্ত্রবাদ হইতে বিভিন্ন হইবে তাহারই সূচনা হইয়াছিল। যে দেশে বেদ বেদান্ত গীতা পুরাণ তন্ত্র—এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হাজার হস্তের রচিত সকল গ্রন্থই শাস্ত্র বলিয়া পূজিত, সে দেশের শাস্ত্রবাদ পুস্তকের মধ্যে নিহিত হইতে পারে না। কেবল তন্ত্র পুরাণ কেন, আমি এই মুহূর্ত্তে যাহা বলিতেছি তাহার মধ্যে সেই অক্ষরকে জানাইয়া দিবার মত যদি কিছু থাকে তবে তাহাও সকলে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য; কেন না উহা বেদের বাণী। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে তুলনা করতঃ শেষোক্তকে প্রাধান্য দিয়া হিন্দুর শাস্ত্রবাদের যে গতি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্র নামক বিশাল জঙ্গলে কোন্‌টি গাছ, কোন্‌টা আগাছা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ একটা বর্ত্তিকার অন্বেষণে বাহির হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু; (তাহাতে আবার) কাল অত্যল্প এবং বিঘ্নও অনেক। (তবে কি করা যায়?) হংস যেমন জলমিশ্র দুধের দুধটুকুই টানিয়া লয়, তেমনই যাহা সার তাহারই উপাসনা করিবে। অর্থাৎ সারং শাস্ত্রং। যাহা সার তাহাই শাস্ত্র। কিন্তু কি সার আর কি অসার তাহাই বুঝাইয়া দেয় কে? তাহা না বুঝিতে পারিলে ও বাক্যেরও কোন সারবত্তা থাকে না। তাই মীমাংসা হইল—

"মোক্ষ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্।"

কেহ চাহেন ধন, কেহ চাহেন জন, কেহ চাহেন স্বর্গ, ঋষি বলিলেন, ঐ-সব পথ যাহাতে বর্ণিত আছে তাহা শাস্ত্রনামবাচ্য নহে। যাহা দ্বারা মোক্ষ প্রতিপাদিত হয় তাহাই কেবল শাস্ত্র। মোক্ষ হয় কিসে?

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। অন্ধকারের পরপারের সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিলেই কেবল মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, মোক্ষ লাভের অন্য পথ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক যাহা, তাহাই শাস্ত্র। ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, সুতরাং সত্যকে জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়, তাই "সত্যং শাস্ত্রং অনশ্বরম্"। আমরা উপনিষদে যে গতি লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই আমাদিগকে ব্রাহ্ম সমাজে আনিয়া উপনীত করিয়াছে। "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্" আর কিছুই নহে, "মোক্ষ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্" হিন্দুর এই শাস্ত্রবাদের যুগোপযোগী সংস্করণ মাত্র। ব্রাহ্ম সমাজের শাস্ত্রবাদই বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্রবাদ। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুর শাস্ত্রবাদের মূল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে আবার উহা বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা ও সাধনার বিরোধী নহে। সাধারণ শাস্ত্রবাদীকে বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের আঘাত সামলাইতে যাইয়া কত কূট ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে, কত ইতিহাসবিরুদ্ধ তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইতেছে। এই যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রবাদ কোনও বিশেষ গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া ইহা এই-সমস্ত বিচার বিতর্কের অতীত। ইহা একখানা গ্রন্থ নহে, কিন্তু একটী আদর্শ, একটী ভাব। হিন্দু শাস্ত্রকারও শাস্ত্র নামে একখানা গ্রন্থ বা কতিপয় গ্রন্থ আমাদিগকে প্রদান করেন নাই, দিয়াছেন একটী আদর্শ। গ্রন্থ নাই তাহা নহে, অনেক আছে। কিন্তু এই সকলের মধ্য হইতে এই আদর্শের আলোকে শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্ম সমাজও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। যাঁহার হিন্দুর শাস্ত্রবাদকে অজ্ঞানতা বশতঃ তথাকথিত কোনও

অভ্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন তাঁহারা আপনাদের অজ্ঞাতসারেই হয়তো ইহাকে ইহার গৌরবান্বিত স্বাতন্ত্র্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া খ্রীষ্টীয় বা মহম্মদীয় শাস্ত্রবাদের নিম্ন ভূমিতে নামাইয়া দিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজই হিন্দুর এই প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত শাস্ত্রবাদকে নিম্নতর শাস্ত্রবাদ সকলের অনুকরণকারীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যে হিন্দু বলেন, ব্রাহ্মগণ শাস্ত্র মানেন না, তিনি হয় নিজের শাস্ত্র কি তাহা জানেন না, না হয়, ব্রাহ্মের শাস্ত্রবাদ কি তাহা বুঝেন না; অথবা উভয় সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। হিন্দুর যে উচ্চ শাস্ত্রবাদ জগৎ ভুলিয়া যাইতেছিল ব্রাহ্ম সমাজ তাহারই পুনঃসংস্থাপন ও সম্প্রসারণ করতঃ নবযুগের শাস্ত্ররূপে সকলের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। ইহাকে এমন আকার দেওয়া হইয়াছে যে ইহার অভ্যর্থনায় ও অভিনন্দনে কাহারও আপত্তি হইবে না। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেই ইহার বিশাল ছায়াতলে আশ্রয় লইবার জন্য আহূত। এখানে সকলেরই স্থান রহিয়াছে। যে শাস্ত্রবাদ এইরূপ উদার ও সার্ব্বভৌমিক নহে, তাহা বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্রপদবাচ্য হইবার যোগ্য নয়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

দুনিয়াদারি

মাথায় আমার উঠ্‌ল খেয়াল
দুনিয়া যদি আমার হ'ত,
মনের সুখে সবায় আমি
চলতে দিতেম ইচ্ছামত।
খেচর এসে ভূচর হ'ত,
বাঁধ্‌ত ভূচর জলে বাসা,
শূন্যে উড়ে হাঙ্গর কুমীর
কর্‌ত সফল রাহুর আশা।
দুনিয়াখানি কাচের মত
কর্‌ত সদাই ঝিকিমিকি,
আমরা সেথা সুখের আগুন
জ্বলছি কেমন ধিকিধিকি।
হাজার রকম রঙ ফলিয়ে
দিচ্ছি কেমন কাচের গায়ে,
ঝলক দেখে চমক লাগে
ফিরছি যেমন ডাইনে বাঁয়ে,
দেখছি খেয়াল স্বচ্ছ দেয়াল
নাই বাধা তার কোনখানে
চলতি হাওয়ায় মনকে নে যায়
যেদিক খুসী সেদিক পানে।
মনটি আমার হাল্‌কা হ'য়ে
গাইছে আজি হাওয়ার গীতে—
দুনিয়াদারি সহজ ভারি
আমার সুখের পন্থাটিতে
খেয়াল দেখি দুনিয়া সুখী
হয় গো যদি আমার মত,
মনের সুখে হাওয়ার মুখে
বেড়ায় ভেসে অবিরত।
দুনিয়া হ'তে দুখের কথা
উড়িয়ে দিয়ে ফুঁয়ের জোরে
হাল্‌কা তানে হাওয়ার গানে
দিতেম সুখে দুনিয়া ভ'রে।
দুনিয়া খানা কি সেয়ানা
আমার কথায় ভুল্‌ছে না সে
আপন কোটায় খোঁটা পুঁতে
বলছে আমায় মৃদু ভাষে—
সুখের মাঝে এইটি কেবল
দুখের কথা লও শুনিয়া
তোমার শুধু খেয়াল টুকুই
অন্য জনের এই দুনিয়া
যার দুনিয়া সেই বুনিয়া
চলেন তাঁহার ইচ্ছা কাজে,
তোমার প্রলাপ হয় অপলাপ
দুনিয়াদারি তাঁরেই সাজে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

জলছবি*

বাজপাখী

কি আশ্চর্য্য! একটা সামান্য ব্যাপার, তাহা হইতেই মানুষের আগাগোড়া কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

মনটা সেদিন ভার—দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত—আমি পথ চলিতেছিলাম।

বুকের উপর একটা জগদ্দল পাথর যেন ক্রমেই চাপিয়া বসিতেছিল—কিছুই ভালো লাগিতেছিল না—যেদিকে চাই সেইদিক হইতেই যেন একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস আমাকে ঘেরিয়া ধরিতেছিল।

হঠাৎ নজর পড়িল রাস্তার ধারে মাঠের উপরে। দুইধারে ঝাউয়ের শ্রেণী, মধ্যে সরু পথ—গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাত-সূর্য্যের রৌদ্র রাস্তার উপরে পড়িয়া নানা বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছে। শরতের বর্ষণ-চিহ্ন গাছের পাতায় পাতায় মুক্তা হইয়া দুলিতেছে—বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপর দিয়া একটা হাসির ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে; ....নীচে কতকগুলা পাখী সোনার রৌদ্রে ডানা মেলিয়া নাচিতেছে, গাহিতেছে। কী তাহাদের আনন্দ! একেবারে নির্ভাবনা, নির্ভয়! কোনো দিকে দৃকপাত নাই—আনন্দে বিভোর! নাচিতেছে তাও বুক ফুলাইয়া—কাহাকেও, কিছুতেই গ্রাহ্য নাই;—এমনি তাহাদের ভঙ্গী যেন দুনিয়াখানার মালিক তাহারাই! যদি কেহ কাছে আসে এখনি মারিয়া হটাইয়া দিবে।

আকাশের পানে মুখ তুলিয়া চাহিলাম—সাদা মেঘের সারি পাল তুলিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলিয়াছে যেন কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায়! সমস্ত আকাশখানা খালি! ... হঠাৎ দেখি একটা কালো বিন্দু তীরবেগে নামিয়া আসিতেছে;—কাছে আসিলে বুঝিলাম—বাজপাখী!

আমি নীচের দিকে চাহিলাম;—তখনও পাখীগুলা নির্ভয়ে নৃত্য করিতেছে—আকাশের দিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপও নাই!

* * * *

তবে আমারও মাথার উপরে অমনি করিয়া বাজপাখী উড়িয়া বেড়াক;—আমিও ওদের মতো বুক ফুলাইয়া চলি আর বলি—"কাকে ভয়! আসুক দেখি বিপদ!"

দানের তুলনা

ধনকুবের রথ্সচাইল্ডের কথা যখনই ভাবি তখনই আমার মন তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে—কত দিকে কত বিরাট তাঁহার দান—শিক্ষা, ধর্ম্ম, আর্ত্ত-সেবা, আরো কত কি!

কিন্তু রথ্সচাইল্ডের উপর যতই শ্রদ্ধা আমার থাকুক, তাঁহার কথা মনে হইলেই আর-একজনকার কথা আমার মনে পড়ে।

আমাদের গ্রামের এক গরীব চাষা পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালিকাকে বুকে লইয়া যেদিন তাহার ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিল তখন গ্রামের সকলেই তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল—"হতভাগা আপনি পায় না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে!"

চাষা এই ধমকে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার গৃহিণী তাহাকে অভয় দিয়া প্রসন্ন মুখে যখন বলিল—"ভয় কি!" তখন তাহার আনন্দ দেখে কে?

আমার মনে হয়, ধনকুবের রথ্সচাইল্ড এই গরীব কৃষক-পরিবারের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

রিপোর্টার

দুই বন্ধুতে বসিয়া চা পান করিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন কাগজের রিপোর্টার।

হঠাৎ রাস্তায় একটা ভয়ঙ্কর গোল উঠিল—গালাগালি, মারামারি.........গোমরানোর শব্দ!

এক বন্ধু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল—"একটা লোককে বেদম মারচে হে!"

অপর বন্ধু ব্যস্তভাবে চীৎকার করিয়া বলিল—"কাকে?—চোর? ডাকাত? খুনে? যেই হোক, চল আমরা লোকটাকে উদ্ধার করিগে.........এরকম অন্যায় অত্যাচার চোখের সামনে দেখা যায় না.........আদালত

* টুর্গেনিভের ইংরাজি অবলম্বনে।

আছে সেখানে বিচার হবে—রাস্তার লোক ধরে মারবার কে ?”

—“না হে না লোকটা খুনে নয়।”

—“তাহ’লে চোর ? তা যাই হোক! চল, লোকটাকে বাঁচাতে হবে তো—সকলে মিলে মেরে ফেল্লে যে!”

—“না চোরও নয়!”

—“চোরও নয়! তবে কি ? লোকটা কি তবে তহবিল তসরুপাৎ করেচে ? ধার নিয়ে শোধ দেয় নি ? মনিবের কাজ কামাই করেচে ? রাস্তায় মাতলামি করেচে ? চাকরের মাইনে দেয় নি ? কাউকে ঠকিয়েছে ? চুক্তিভঙ্গ করেছে ?—না কি!”

—“না হে না লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টার।”

—“ওঃ! তাহ’লে বোসো, এই চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে নেওয়া যাক।”

ক্রাইষ্ট!

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন ছেলেমানুষ হইয়া গেছি; নীচু ছাদওয়ালা অন্ধকার-অন্ধকার একটি ছোট গির্জ্জা, তাহার মধ্যে আমি; আমার চারিপাশে অসংখ্য লোক—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! কেবল এক-একবার তাহাদের মাথাগুলি একসঙ্গে উঠিতেছে, নামিতেছে; —যেন ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ একটা লোক পিছন হইতে আসিয়া ঠিক আমার পাশে দাঁড়াইল।

আমি তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম না—কিন্তু আমার মনের ভিতর হইতে কে যেন একবার বলিয়া উঠিল—“ইনি ক্রাইষ্ট!”

ক্রাইষ্ট!—ঔৎসুক্য উত্তেজনা আতঙ্ক আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

চেহারায় কোনো বিশেষত্ব নাই;—সাধারণ লোকের মতোই মুখ—সাধারণ লোকের মতোই পরিচ্ছদ!

“এই ক্রাইষ্ট!”—আমি ভাবিতেছিলাম—“এই একটা সাধারণ লোক—এ ক্রাইষ্ট! হইতেই পারেনা!”

আমি অন্য দিকে চোখ ফিরাইলাম। কিন্তু ফিরাইতে না ফিরাইতেই আমার মন হইতে আবার কে যেন সজোরে বলিয়া উঠিল—“হাঁ, ইনিই ক্রাইষ্ট!”

কথাটাকে মানিয়া লইবার জন্য আমি একবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু … এ যে অতি সাধারণ লোক! সামান্য লোকের মতো মুখ—সামান্য লোকের মতো পরিচ্ছদ!

হঠাৎ আমার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—যেন আমার জ্ঞান হইল। সেই মুহূর্ত্তেই আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম—এই যে অতি সাধারণ লোকের মতো মুখ, এ মুখ ক্রাইষ্টেরই বটে!

ফাঁশির দড়ি

মজুর। তুমি ভদ্দর লোক—আমরা মুটে মজুর—আমাদের কাছে কেন বাপু তুমি ?—তুমি আমাদের কে! যাও গোল কোরোনা।

ভদ্র। আমি ভাই, তোদেরই একজন!

মজুর। বটে! মুখে বল্লেই তো আর হয় না! দেখদেখি আমাদের হাত—খেটে খেটে কড়া পড়ে গেছে! আর তুমি তো দিব্যি মোলাম হাত নিয়ে বেড়াচ্চ!

ভদ্র। এই দেখ ভাই, আমার হাত।

মজুর। তাইত! তোমার হাতেও কড়া দেখচি! এ কিসের কড়া ?

ভদ্র। এই হাত দু’বচ্ছর শিকল-বাঁধা ছিল।

মজুর। শিকল-বাঁধা! কেন ?

ভদ্র। তোমাদেরই জন্যে ভাই! তোমাদেরই ভালোর জন্যে। যারা পীড়িত তাদের মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলুম,—তোমাদের উপর যারা অত্যাচার করে তাদের বিপক্ষে তোমাদের উত্তেজিত করেছিলুম—রাজপুরুষদের যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দিয়েছিলুম—তাই আমার জেল হয়েছিল!

মজুর। ও বাবা! রাজার গায়ে হাত! জেল হবেনা! বেশ হয়েছে!

[দুই বৎসর পরে]

১ম মজুর। দু’বচ্ছর আগে আমাদের কাছে একজন ভদ্দর লোক এসেছিল, মনে পড়ে ?

২য় মজুর। মনে পড়ে বই কি! হঠাৎ যে আজ তার কথা!

১ম মজুর। আজ তার ফাঁশি।

২য় মজুর। ফাঁশি! সে কি এদ্দিন ধরে-- এখনো সেই রকম আমাদের ভালোর জন্যে চেষ্টা করছিল?

১ম মজুর। হ্যাঁরে, সেই জন্যেই তো তার ফাঁশির হুকুম হয়েছে।

২য় মজুর। ভাই তবে এক কাজ করতে পারিস! যে দড়িতে তার ফাঁশি হবে সেই দড়ির একটু টুক্‌রো জোগাড় করতে পারিস! শুনেছি এই রকম লোকের যে দড়িতে ফাঁশি হয় সে দড়ি ভারি পয়মন্ত,-- ঘরে থাক্‌লে আর কোনো ভাবনা থাকেনা!

১ম মজুর। সত্যি নাকি! তবে চল চল সেই দড়ির সন্ধানেই যাওয়া যাক।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বরষায়

আজি বরষার প্রথম প্রভাত
হৃদয়ে বাজিছে ব্যথা,
কাঁদিয়া গাহিছে অন্তর আজি
তুমি কোথা—তুমি কোথা!

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরিছে বাদল,
কাঁপে তরুশির আর্দ্র আদল,
বাতাসের গায় বিরহীর দল
বিছাইছে বাহুলতা।
বরষার এই প্রথম প্রভাত
তুমি কোথা—তুমি কোথা!

যে বেদনা ছিল গোপন নীরব,
আজি সে পেয়েছে ভাষা,
গভীর ছন্দে পুলকি' উঠিছে
কত কাঁদা কত হাসা।
বাতাস কাঁদিয়া করে হায় হায়,
তড়িৎ হাসিয়া চমকিয়া চায়,
উদ্দাম নদী উছলিয়া ধায়
গাহি কত কল কথা।
আজি বরষার প্রথম প্রভাত,
তুমি কোথা—তুমি কোথা?

আমার এ দেহ উল্লসি' উঠিছে
উচ্ছল ব্যথা ভরে;
নীরবে ঝরিছে অশ্রু শিশির
শূন্য শয়ন পরে।
কত কথা আজ কহিবারে চাই,
শুনিবার লোক খুঁজে নাহি পাই;
কেহ নাই পাশে—কিছু নাই নাই
কাহারে বুঝাব ব্যথা?
বরষার এই প্রথম প্রভাত,
তুমি কোথা—তুমি কোথা!

যে ব্যথা জাগিছে আমার এ বুকে
আজি তা' ফুটেছে মেঘে,
ঘন-ঘোর কার বারিভরা আঁখি
তারি সাথে উঠে জেগে।
আঘাতি কপাট মোর জানালার
করের শব্দ আসে যেন কার;
চমকিয়া উঠে খুলে দেখি দ্বার
অকারণ আকুলতা!
আজি বরষার প্রথম প্রভাত,
তুমি কোথা—তুমি কোথা?

প্রভাতের আলো ম্লান হাসিহীন
প্রভাত-প্রদীপ সম,
কেশ-ঘন-ঘোর আজি এ আকাশ,
নিবিড় চিত্ত মম,
ভেসে এসে আজি পরশিছে প্রাণ
কত হাসি, কত মান অভিমান,
কত বিরহের অকথিত গান,
কত ব্যথা, চপলতা;--
হেন বরষার প্রথম প্রভাতে
তুমি কোথা—তুমি কোথা!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

আগুনের ফুলকি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবে ভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ জমিয়া আসিতেছে।]

(৫)

পরদিন প্রাতঃকালে শিকারীরা ফিরিয়া আসিবার একটু পূর্ব্বে লিডিয়া তাহার ঝিকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রের কিনার হইতে বেড়াইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে একটি যুবতী একটা গাঁট্টাগোঁট্টা ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া শহরের রাস্তা দিয়া আসিতেছে। তাহার সঙ্গে অমনি আর একটা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিল একটা চাষা ধরণের লোক, তাহার জামার কনুই দুটো ছেঁড়া, কোমরে একটা লাউয়ের বস আর একটা পিস্তল বাঁধা, হাতে একটা বন্দুক; হুবহু নাটকের ডাকাতের বেশ! কর্সিকার চাষাদের ভ্রমণের সজ্জাই এই রকম। যুবতীটির অসাধারণ রূপ লিডিয়ার দৃষ্টি তাহার দিকে আকর্ষণ করিল। তাহার বয়স বছর কুড়ি; লম্বা, ফর্সা, ঘননীল চোক দুটি সমুদ্রের টুকরার মতো চঞ্চল, গোলাপী ঠোঁট দুখানি গোলাপের পাপড়ির মতো পাতলা, দাঁতগুলি মুক্তার মতো সুন্দর; তাহার মুখের ভাবে একটা মর্য্যাদার অহঙ্কার, অশান্তি ও বিষাদ যেন মিশিত হইয়া আছে; তাহার বাদামি রঙের লম্বা চুলের খোঁপাটি তাহার সুন্দর মাথাটিকে ফুলের পাপড়ির মতন বেড়িয়া আছে, তাহার উপর কালো রেশমী কাপড়ের ঘোমটা টানা; পোষাকটি পরিপাটি অথচ সাধাসিধে, কালো রঙের, শোকসূচক।

লিডিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়াই দেখিতেছিল, কারণ কালো-ঘোমটা-পরা যুবতীটি পথে দাঁড়াইয়া খুব ব্যগ্রভাবে একজনকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল; লোকটার কাছে উত্তর পাইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া সেই হোটেলের দরজাতেই সে থামিল। হোটেল-ওয়ালার সঙ্গে দুইচারিটা কি কথা বলিয়াই সে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল; তাহার সহিস ঘোড়া দুটাকে আস্তাবলে লইয়া গেল, এবং সে দরজার পাশের পাথরের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। লিডিয়া তাহার পারীসিয়ান ফ্যাশানের পোষাক ঝলকাইয়া সেই অপরিচিতা আগন্তুকের সম্মুখ দিয়া বারকতক আনাগোনা করিল, কিন্তু সে একবার চোক তুলিয়াও তাহার দিকে তাকাইল না। মিনিট পনর পরে লিডিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া আপনার ঘরের জানলা খুলিয়া দেখিল আগন্তুক যুবতীটি ঠিক সেই জায়গাতে ঠিক একই ভাবে বসিয়া আছে।

অল্পক্ষণ পরেই কর্ণেল ও অর্সো শিকার হইতে ফিরিলেন। হোটেল-ওয়ালা যুবতীটিকে কিছু বলিয়া দে-লা-রেবিয়াকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল। যুবতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে চট করিয়া উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য্য হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অর্সো একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল।

যুবতী কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আপনি অর্সো আন্তোনিয়ো দে-লা-রেবিয়া? আমি কলোঁবা।

অর্সো বলিয়া উঠিল—কলোঁবা! তুই!

তারপর তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন করিল। কর্ণেল ও তাহার কন্যা ব্যাপার দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন, কারণ ইংলণ্ডে রাস্তার মাঝখানে স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করাটা রীতি নয়।

কলোঁবা বলিল—দাদা, তোমার আদেশের অপেক্ষা না করেই আমি এসে পড়েছি, লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না; আমি আমাদের সেই কুটুম্ব কাপ্তেনের কাছে শুনলাম যে তুমি এসেছ, তাই তোমায় দেখতে ভারি ইচ্ছে হল..

অর্সো পুনরায় তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কর্ণেলের দিকে ফিরিয়া বলিল—ইনি আমার বোন, পরিচয় না দিলে আমি ওকে চিনতেই পারতাম না, কতটুকু দেখে গেছি, এখন কত বড়টি হয়েছে।—কলোঁবা, ইনি কর্ণেল সার টমাস নেভিল।—কর্ণেল ক্ষমা করবেন, আজকে

আমি আপনার এখানে খেতে পারব না ... আমার বোনটি......

— বটে! আর কোথায় খেতে যাবে শুনি? এই পচা হোটেলে শুধু আমাদের বৈ ত আর খাবারই তৈরি হয় না। শ্রীমতী আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলে আমার মেয়ে খুব খুসি হবে।

কলেঁাবা তাহার দাদার দিকে তাকাইল, দেখিল দাদাকে বেশি অনুরোধ উপরোধ করিবার আবশ্যক হইল না। তখন সকলে একসঙ্গে হোটেলের বড় ঘরটিতে প্রবেশ করিলেন। লিডিয়ার সহিত কলেঁাবার পরিচয় করাইয়া দিলে কলেঁাবা খুব নম্রভাবে নমস্কার করিল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না। সে জীবনে এই প্রথম সভ্য ভব্য অপরিচিত লেকের সম্মুখে বাহির হইয়াছে, তাহাকে দেখিলেই বোঝা যাইতেছিল যে সে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার চালচলন হাবভাবে পাড়াগেঁয়ে গন্ধ একটুও ছিল না। তাহার একটু যে আড়ষ্ট ভাব তাহা অপরিচয়ের সঙ্কোচের উপর দিয়াই কাটিয়া যাইতেছিল। এই ভাবটি দেখিয়া লিডিয়া মনে মনে ভারি খুসি হইয়া উঠিয়াছিল; এবং সেই জন্য হোক বা কৌতূহলের জন্যই হোক, সে তাহার নিজের ঘরেই কলেঁাবার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল—সে হোটেলে বাড়তি ঘরও আর ছিল না।

কলেঁাবা গুটিকতক ধন্যবাদ কোনো রকমে অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিল। ঘোড়ায় চড়িয়া আসাতে ধূলা আর বাতাসে তাহার শরীরে যে অস্বস্তি বোধ হইতেছিল তাহা দূর করিবার জন্য সে একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঝিয়ের সঙ্গে গিয়া প্রসাধন সারিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে কর্ণেলের বন্দুকগুলির সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—কি চমৎকার বন্দুক! দাদা, এগুলো তোমার?

—না, ওগুলো ইংরেজি অস্ত্র, এই কর্ণেল সাহেবের। ওগুলি যেমন দেখতে তেমনি কাজে!

—দাদা, তোমার যদি এমনি একটা থাকত!

কর্ণেল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—ঐ তিনটের মধ্যে একটা ত রেবিয়ারই। ও বেশ বন্দুক চালাতে পারে। আজকে চার আওয়াজে চার শিকার!

হৃদ্যতার এই যুদ্ধে অর্সো পরাস্ত হইয়া শীঘ্রই চুপ করিল দেখিয়া তাহার ভগ্নীর মুখে শিশুর মতো আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই তাহা আবার বিষণ্ণ গম্ভীর হইয়া গেল।

কর্ণেল বলিলেন—এস বন্ধু, কোন্‌টা নেবে বেছে নেও।

অর্সো কিছুতেই রাজি নয়।

—আচ্ছা, তোমার বোন তোমার হয়ে বেছে নেবেন এখনি।

কলেঁাবা দুবার বলিবার অপেক্ষা করিল না; সে একটা সাদামাঠা ধরণের বন্দুক বাছিয়া লইল, কিন্তু সেটা ম্যান্টন কোম্পানীর তৈয়ারি প্রকাণ্ড বড় জবরদস্ত অস্ত্র।

সে বলিল—এই বন্দুকটায় গুলি খুব ছুটবে।

তাহার দাদা কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়িয়া কেবলই ধন্যবাদ জানাইতেছিল, আহারের ডাক পড়াতে সে বেচারা এই সঙ্কোচের ব্যাপার হইতে উদ্ধার পাইয়া বাঁচিল।

সকলের সঙ্গে একত্র টেবিলে খাইতে বসিতে কলেঁাবা প্রথমটা একটু ইতস্তত করিতেছিল। কিন্তু তাহার দাদার একটি দৃষ্টি তাহার সকল দ্বিধা দূর করিয়া দিল। সে খাইতে আরম্ভ করিবার আগে ভোজ্য ভগবানকে নিবেদন করিয়া লইল। এই সমস্ত দেখিয়া লিডিয়ার মন মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে এই সরলার মধ্যে কর্সিকার আদিম প্রথার অনেক পরিচয় পাইবে মনে করিয়া তাহার প্রত্যেক কার্য্য বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছিল। বেচারা অর্সোর অস্বস্তির অন্ত ছিল না; তাহার কেবলি ভয় হইতেছিল যে কখন তাহার বোন পাঁড়াগেঁয়ে অসভ্যতা প্রকাশ করিয়া বা ফেলে। কিন্তু কলেঁাবা ক্রমাগত তাহার দাদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছিল, এবং দাদার দেখাদেখি নিজেরও চালচলন সামলাইয়া মানানসই করিয়া লইতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে সে এক রকম দারুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দাদার দিকে

তাকাইতেছিল; দুজনের চোখোচোখি হইলে অর্সোই প্রথমে তাহার দৃষ্টি নামাইয়া লইতেছিল—যেন তাহার বোন মনে মনে তাহাকে এমন কোনো প্রশ্ন করিতেছিল, যাহা সে বেশ বুঝিতেছিল অথচ সে প্রশ্নের কাছে সে নিজেকে ধরা দিতে চাহিতেছিল না। তাহারা সকলে ফরাশী ভাষাতেই কথা বলিতেছিল, কর্ণেল নেভিল ইটালিয়ান ভাষা তেমন ভালো বলিতে পারেন না। কলোঁবা ফরাশী বুঝিতে পারিতেছিল; এবং সে নিতান্ত বাধ্য হইয়া যে দু'একটা কথা বলিতেছিল তাহা বেশ স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবেই উচ্চারণ করিতেছিল।

কর্ণেল লক্ষ্য করিতেছিলেন যে তাহাদের ভাই-বোনের মধ্যে কেমন-একটা কি-যেন অন্তরাল রহিয়াছে। আহারের পর তিনি অর্সোকে বলিলেন যে তাহার বোনের সঙ্গে যদি একান্তে কিছু বলিবার শুনিবার থাকে তাহা হইলে তিনি কন্যাকে লইয়া পাশের ঘরে উঠিয়া যাইতে পারেন। এই কথা শুনিয়াই অর্সো বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, না না সেজন্য তাঁহাদের কিছুমাত্র ভাবিতে হইবে না, পিয়েত্রোনরায় গিয়া একান্তে আলাপ করিবার অবসর তাহাদের যথেষ্টই মিলিবে।

তখন কর্ণেল সোফার উপর আপনার মামুলি স্থানটি দখল করিয়া বসিলেন; লিডিয়া কলোঁবাকে কথা বলাইবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া অর্সোকে একটু দান্তের কবিতা পড়িতে ফরমাস করিল—দান্তেই তাহার প্রিয় কবি। অর্সো নরকের স্বপ্ন হইতে ফ্রাঁসেস্কার কাহিনী পাঠ করিতে লাগিল—ফ্রাঁসেস্কার পিতা তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন লাঁসিয়োত্তোর সঙ্গে: লাঁসিয়োত্তো কুৎসিত কদর্য্য, কিন্তু বীর: লাঁসিয়োত্তোর ভাই কিন্তু অতি সুপুরুষ; দেবরের রূপমুগ্ধ স্ত্রীকে লাঁসিয়োত্তো হত্যা করে;—নরকে গিয়া ফ্রাঁসেস্কা নিজেই এই কাহিনী বলিতেছে। অর্সো যথাসাধ্য মূর্চ্ছনা দিয়া কবিতা পাঠ করিতে লাগিল, এবং অপরের সম্মুখে এই প্রণয়কাহিনী পাঠ করার যে বিপদ তাহা সে পদে পদে অনুভব করিতেছিল। এতক্ষণ কালোঁবা মাথা নত করিয়া বসিয়া ছিল; কিন্তু ইটালিয়ান কবিতার শব্দঝঙ্কারেই তাহার চিত্ত উদ্বোধিত হইয়া উঠিল: সে সোজা হইয়া বসিল, তাহার বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল; সে বসিয়া বসিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষণে আরক্ত ক্ষণে পাংশুল হইতে লাগিল। সুকবিতার এমনি প্রভাব, তাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য পণ্ডিতের টীকাভাষ্যের অপেক্ষা রাখে না!

পাঠ সাঙ্গ হইলে কলোঁবা বলিয়া উঠিল—কি চমৎকার! এ কে লিখেছে দাদা?

অর্সো একটু কুণ্ঠিত লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। লিডিয়া হাসিয়া বলিল—এ একজন ফ্লোরেন্সের পুরাণো কবি, অনেক দিন হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

অর্সো বলিল—পিয়েত্রান্‌রায় গিয়ে আমি তোকে দান্তে পড়াব।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—বাঃ! কি মজাই হবে!

তারপর সে তিন চারটি শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল; প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে উচ্চস্বরে উত্তেজিত হইয়া, তাহার দাদা যেখানে যেমন মূর্চ্ছনা দিয়াছিল সেখানে তেমনি মূর্চ্ছনা দিয়া।

লিডিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি কবিতা এমন ভালবাসেন! আপনি দান্তে নতুন পড়বেন, আপনার ওপর আমার হিংসে হচ্ছে!

অর্সো বলিল—মিস নেভিল, দান্তের কবিতার কি শক্তি দেখুন। যে নিজের দেশের ভাষা বৈ কিছু জানে না এমন বুনো মেয়েকেও তাতে মাতিয়ে তোলে।...... না, আমি একটু ভুল করছি, কলোঁবার একটু কবিত্ব ছিল মনে পড়ছে। ছেলে বেলায়ও কবিতা লিখত; বাবা আমাকে লিখেছিলেন যে পিয়েত্রান্‌রা এলাকায় ওর মতন শোক-সঙ্গীত রচনা করতে কেউ পারে না।

কলোঁবা একটু মিনতির দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিল। লিডিয়া কর্সিকার উপস্থিত-কবির কথা শুনিয়া অবধি তাহাদের রচনা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। সে কলোঁবাকে ধরিয়া বসিল তাহার একটি গান তাহাকে শুনাইতেই হইবে। এখনি যে সে ভগিনীর কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিয়াছে তাহা ভুলিয়া গিয়া অর্সো আপত্তি তুলিল যে কর্সিকার শোকসঙ্গীতের চেয়ে একঘেয়ে বিশ্রী গান আর হইতে পারে না, এবং দান্তের কবিতা

পাঠের পর কর্সিকার বুনো গান গাওয়া মানে তাহার দেশের অপমান হওয়া। কিন্তু এই-সব আপত্তি লিডিয়ার ঝোঁক আরো উস্কাইয়াই তুলিতে লাগিল। তখন অর্সো বাধ্য হইয়া ভগিনীকে বলিল—আচ্ছা, যা-হোক একটা কিছু ছোটখাটো তৈরি করে গা।

কলোঁবা নিশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল, অল্পক্ষণ ছাদের দিকে মুখ তুলিয়া বসিয়া রহিল; তারপর ভীরু পাখী যেমন নিজে চোখ বুজিয়া মনে করে কেহ তাহাকে দেখিতেছে না, তেমনি ভাবে হাত দিয়া চোখ দুটি ঢাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

পাহাড়তলীর বিজন পথে আলোক না পশে,
পাহাড়তলীর পাথর-কোঠা অন্ধ দিবসে,
জানলা তার বন্ধ থাকে,
ধূম ওঠে না ছাদের ফাঁকে,
বনের লতা দ্বারের বাজু বন্ধনে কশে!
পাহাড়-ঘেরা বিজন গেহ গহন দিবসে!

দুপুর বেলা ক্ষণেক শুধু একটি অনাথা
ঝর্কা খুলে চর্কা কাটে, গায় সে কি গাথা!
করুণ গাথা সুর স্বরে
শূন্যে শুধু মরে ঘুরে,
পায় নাক' সায়, না পায় সাড়া; নোয়ায় রে মাথা
দুপুর বেলায় আলোর মেলায় একটি অনাথা।

একদা সেই বাতায়নের সমুখ-শাখাতে
বনের পাখী বস্‌ল এসে ক্লান্ত পাখাতে।
বল্‌লে পাখী গান শুনে তার
"শোচন তোমার নয় গো একার,
সঙ্গীহারা আমিও,—ব্যাধের বাণের আঘাতে!"
বনের পাখী বল্‌লে বসে সবুজ শাখাতে!

"পাখী! পাখী!" ব্যগ্র-আঁখি বালিকা বলে—
"আমায় পিঠে নে দেখি, ব্যাধ পালায় কি ছলে!
শত্রু যদি লুকিয়ে থাকে
আকাশে ওই মেঘের ফাঁকে,
আনতে টেনে পারব তারে পাড়ব ভূতলে!
আমায় তুলে নে তুই, দেখি লুকায় কি ছলে!"

"কিন্তু, পাখী, বিদেশ গেছে আমার বড় ভাই,
সেথায় মোরে যায় কে নিয়ে? ভাব্‌ছি আমি তাই।"
বল্‌ল তখন বনের পাখী
"ভায়ের তোমার ঠিকানা কি?
দাও ঠিকানা ডানার ভরে আমিই সেথা যাই।
বিদেশ-বাসী দাদা তোমার,—তোমার বড় ভাই।"

—এই যে একটি বনের পাখী!—বলিয়া অর্সো স্নেহভরে ভগিনীকে আলিঙ্গন করিল।

লিডিয়া বলিল—আপনার গান চমৎকার! আপনি যদি ঐ গানটা আমার খাতায় লিখে দ্যান। আমি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করে ওটার স্বরলিপি করে নেব।

কর্ণেল ভদ্রলোক গানের এক বর্ণ না বুঝিলেও কন্যার প্রশংসার সঙ্গে যোগ দিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনি এই যে পাখীর গান করলেন সে কোন পাখী, যে রকম পাখী আজ আমরা খেলাম?

লিডিয়া তাহার খাতা আনিয়া হাজির করিল। কলোঁবা কবিতার আকারে পৃথক পৃথক লাইনে না লিখিয়া একেবারে টানা লিখিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া লিডিয়া অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার কৌতুকস্মিত মুখ দেখিয়া অর্সোর ভ্রাতৃস্নেহ একটু বেদনা একটু লজ্জা অনুভব করিতেছিল।

রাত্রি গভীর হইলে যুবতী দুজন তাহাদের ঘরে গেল। লিডিয়া কলার, কোমরবন্দ, বগলস, বাঁধন, প্রভৃতি খুলিতে খুলিতে দেখিল যে তাহার সঙ্গিনী তাহার জামার ভিতর হইতে ছোট লম্বা বাতির মতো একটা কিছু বাহির করিয়া খুব সন্তপণে টেবিলের উপর রাখিয়া তাড়াতাড়ি ওড়নাখানা ঢাকা দিল; তারপর সে মাটিতে জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে লাগিল। দু মিনিট পরে সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। লিডিয়া ইংরেজ-রমণী-সুলভ দীর্ঘসূত্রিতা এবং স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে তখনো পোষাক খুলিয়া উঠিতে পারে নাই, এবং একটা কিছু খুঁজিবার ছল করিয়া টেবিলের উপর হইতে

কলোঁবার ওড়নাখানি তুলিয়া দেখিল চমৎকার একখানি ছোরা, রূপা আর ঝিনুকের সুন্দর কাজ-করা।

লিডিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এদেশের মেয়েরা কি সবাই জামার বুকে ছোরা নিয়ে বেড়ায়, এই কি এখানকার রেওয়াজ?

কলোঁবা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নিয়ে বেড়ানো ভালো। পাজি লোকের ত অভাব নেই।

—এই রকম করে কারো বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে আপনার সত্যি সাহস হয়?—বলিয়া লিডিয়া ছোরাখানি উঁচু করিয়া ধরিয়া মারিবার অভিনয় করিল।

কলোঁবা তাহার সুমধুর স্বরে বলিল—হাঁ পারি বৈকি, যদি নিজেকে বা নিজের আত্মীয় বন্ধুকে রক্ষা করার দরকার হয়।... কিন্তু ও রকম করে উঁচিয়ে ছোরা মারে না; যাকে মারবে সে যদি সরে যায় তবে সে ঘা যে নিজেকেই এসে লাগ্‌বে।

তারপর বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ছোরা ধরিয়া কলোঁবা বলিল—এমনি করে ধর্‌তে হয়; এই যে ঘা, এ একেবারে সাংঘাতিক। যাদের এই দুরন্ত জিনিসের সম্পর্কে থাকতে না হয় তারাই সুখী।

কলোঁবা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথাটিকে বালিশের উপর পাতিয়া চক্ষু মুদিল। লিডিয়ার মনে হইল এমন সুন্দর, এমন পবিত্র, এমন সরল আর-একখানি মুখ আছে কি না সন্দেহ। ফিডিয়াস মিনার্ভার মূর্ত্তি গঠন করিবার সময় এই আদর্শ দেখিতে পাইলে খুসি হইতেন।

(৬)

ইহাঁরা সকলে ততক্ষণ ঘুমান, আমি এই অবসরে অতীত ইতিহাস কিছু বলিয়া লই।

আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে অর্সোর পিতা, কর্ণেল দে-লা-রেবিয়াকে কেহ খুন করিয়াছিল। এ খুন কিন্তু চোর ডাকাতের হাতে সাধারণ খুন নয়; শত্রুর হাতে খুন; কিন্তু কাহারো সহিত কাহারো শত্রুতা যে কেন কিসে হয় তাহা স্থির করা প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন। প্রায়ই শত্রুতার আক্রোশটাই বংশানুক্রমিক চলিয়া আসে, কারণটা কাহারই প্রায় মনে থাকে না।

কর্ণেল দে-লা-রেবিয়ার পরিবারের সহিত অনেকগুলি পরিবারেরই মন-কষাকষি ছিল; কিন্তু বিশেষ শত্রুতা ছিল বারিসিনি পরিবারের সঙ্গে। সে শত্রুতার সূত্রপাত তিন শত বৎসর পূর্ব্বে। প্রথম অপরাধ যে কাহার সে সম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য শুনা যাইত; কেহ বলিত রেবিয়া-পরিবারেরই কেহ প্রথমে বারিসিনি-পরিবারের কোনো রমণীর অপমান করে, এবং বারিসিনিরা খুন করিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লয়; আবার কেহ বলে তাহার ঠিক উল্টা কথা। মোট কথা, এই দুই পরিবারের মধ্যে রক্তরেখার গণ্ডি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর মিটাইবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সেই প্রথম রক্তপাতের পর আর দ্বিতীয়বার রক্তপাতের সুযোগ ঘটে নাই, কারণ বিজেতা জেনোয়া গবর্মেণ্ট রেবিয়া ও বারিসিনি উভয় পরিবারকেই শাসনে দাবাইয়া রাখিয়াছিল; আর উভয় পরিবারের গরম রক্তের জোয়ান লোকদের বিদেশেই প্রায় থাকিতে হইত বলিয়া কয়েক পুরুষ ধরিয়া উদ্যোগের অভাবেই খুনের শোধে খুন হইতে পারে নাই।

শত খানেক বৎসর পূর্ব্বে রেবিয়া পরিবারের একজন নেপল্‌সের এক জুয়ার আড্ডায় গিয়া কয়েকজন সৈনিকের সহিত বিবাদ বাধাইয়া বসে; সৈনিকেরা তাহাকে নানাবিধ অপমান করিয়া শেষে কর্সিকার মেড়া বলিয়া গালি দেয়; রেবিয়া তরবারি খুলিয়া একাই তাহাদের তিন জনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছিল, এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে আর একজন কে বলিয়া উঠিল 'এখানে আরো একজন কর্সিকার মেড়া আছে!' এবং স্বদেশীর পক্ষ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এই ব্যক্তি বারিসিনি পরিবারের লোক। দুজনের কেহ কাহাকেও চিনিত না। যখন উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইল তখন তাহারা দেখিল যে 'মহিষের শিং বাঁকা, কিন্তু যুঝবার বেলা একা!' বিদেশে স্বদেশের অপমান এই দুই শত্রুকে বন্ধুত্বের গ্রন্থি দিয়া সহজেই বাঁধিয়া দিল। ইটালিতে যত দিন ছিল এই বন্ধুত্ব তাহাদের টুটে নাই, কিন্তু দেশে ফিরিয়াই একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাহাদের সন্তানেরাও তেমনি, বাপপিতামহের ধারা বজায় রাখিয়াই চলিল। রেবিয়া-বংশধর সৈনিক বিভাগে গেল, আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বারিসিনি হইল উকিল।

বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ে পৃথক হইয়া পড়াতে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ত হইয়াই উঠিত না, এমন কি কেহ কাহারও খবরও রাখিত না। এই রেবিয়া আমাদের অর্সোর পিতা।

ভিক্তোরিয়ার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করাতে কর্ণেল রেবিয়ার পদোন্নতি হওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। বারিসিনি তাহা পাঠ করিয়া বলিল, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, অমুক জেনেরাল যখন রেবিয়া-গৃহিণীর মুরুব্বি আছেন তখন তাঁহার স্বামীর পদোন্নতি ত হইবেই! এই কথা রেবিয়ার কানে গেল। রেবিয়া কথায় কথায় একজনকে বলিল, বারিসিনির অত টাকা কেন জান? আপনার মক্কেলের নিকট হইতে যাহা পায় তাহার ঢের বেশি পায় সে মক্কেলের প্রতিবাদীর নিকট হইতে। বারিসিনিও এই কথা শুনিল এবং এ কথা সে ভুলিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে গ্রামের দারোগার পদ শূন্য হওয়ায়, বারিসিনি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করিল। ইতিমধ্যে রেবিয়ার মুরুব্বি জেনেরাল রেবিয়া-গৃহিণীর এক আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটকে এক চিঠি লিখিলেন। জেনেরালের সুপারিশই বাহাল হইয়া গেল, এবং বারিসিনি মনে করিল এ কেবল তাহাকেই অপদস্থ করিবার ষড়যন্ত্র।

নেপোলিয়নের রাজত্বের অবসানে জেনারেলের সুপারিশের লোকটির নেপোলিয়নের দলের লোক বলিয়া চাকরি গেল; এবং সেই চাকরি পাইল বারিসিনি। নেপোলিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠার 'শওরোজ' পুনরায় বারিসিনিকে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিলেও নেপোলিয়নের নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার চাকরিতে খাতাপত্তর দপ্তরদস্তাবেজ শিলমোহর বাগাইয়া বেশ কায়েমি হইয়া বসিল।

এই সময় হইতে বারিসিনির অদৃষ্টে শুভগ্রহের পূর্ণদৃষ্টি পড়িল। কর্ণেল রেবিয়া হাফ-পেন্সনে বরখাস্ত হইয়া দেশে আসিয়া বসিয়াছিলেন। বারিসিনির আড্ডায় তাঁহাকে মিথ্যা মোকদ্দমায় জেরবার করিয়া ফেলিবার গোপনে চেষ্টা চলিতে লাগিল। রেবিয়ার ঘোড়া দারোগা সাহেবের ফসল তছরুপ করিয়াছে, দাও জরিমানা। দারোগা সাহেবের ছাগলে রেবিয়ার ফসল খাইয়াছে, অবলা পশু বৈ ত নয়, উহাদের কি ছাই আত্মপর বোধ আছে! রেবিয়ার দুজন প্রজা ডাকহরকরা আর চৌকিদারের কাজ করিত, তাহাদের চাকরি গেল; সে চাকরি পাইল দারোগা সাহেবের লোকে। দারোগা সাহেবের সকল দিকেই সমান দৃষ্টি, কর্ত্তব্যের ত্রুটি একটুকু হইবার জো নাই; গির্জ্জাঘর অনেক কাল বেমেরামত হইয়া পড়িয়া আছে, মেরামত করিতে হইবে। মেরামত করিতে মিস্ত্রী লাগিয়া রেবিয়াদেরই কাহারো কবরের রেবিয়াদের নাম-খোদা একখানা পাথর মাত্র উঠাইয়া ফেলিয়া নূতন পাথর বদলাইয়া দিয়া মেরামত শেষ করিয়া গেল।

কর্ণেল রেবিয়ার স্ত্রী মারা গেলেন; মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া গেলেন, যে-বাগানে তিনি নিত্য বেড়াইতেন সেই বাগানেই যেন তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। দারোগা-সাহেব হুকুম দিলেন সাধারণ কবরের জায়গাতেই কবর দিতে হইবে, আলাদা জায়গায় কবর দিবার হুকুম নাই। কর্ণেল ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হুকুম দিলেন বাগানেই কবর খোঁড়া হোক। দারোগা-সাহেব সাধারণ কবরখানায় কবর খনন করাইয়া পুলিশ মোতায়েন করিলেন। কর্ণেল-গৃহিণীর মৃতদেহ দখল করিবার জন্য দুই পক্ষেই লোক জড়ো হইতে লাগিল, এবং দাঙ্গাফসাদের সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল।

পাদ্‌রী সাহেব গির্জ্জা হইতে বাহির হইতেই রেবিয়ার আত্মীয়েরা জন চল্লিশেক বরকন্দাজ লইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং বাগানের দিকে লইয়া চলিল। দারোগা সাহেব তাঁহার দুই পুত্র, মক্কেল, পুলিশ প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া বাধা দিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রেবিয়ার দল তাঁহাকে একেবারে হুট করিয়া দিল; কয়েকটা বন্দুকও মাথা চাড়া দিয়া উঠিল; একজন লোক বন্দুকের তাগও করিতেছিল; কিন্তু কর্ণেল রেবিয়া তাহার বন্দুক ধরিয়া হুকুম দিলেন, তাঁহার হুকুম ভিন্ন কেহ বন্দুক চালাইতে পারিবে না। দারোগা সাহেব বিপক্ষ দলের লোকসংখ্যা আর তাহাদের মরিয়া ভাব দেখিয়া আস্তে আস্তে পিঠটান দিলেন।

এইবার থানার সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া রেবিয়ার দল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। এই দলে যাহার খুসি সেই আসিয়া ভিড়িয়াছিল—কেহবা আসিয়াছিল মজা দেখিতে, কেহবা আসিয়াছিল ভিড় বাড়াইতে। উহাদের মধ্যে মাথা-পাগলা একজন অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল 'জয় সম্রাটের জয়!' রাষ্ট্রের অধিনায়ক যখন রাজা তখন রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলা যেমন অপরাধ, তেমনি রাষ্ট্র যখন রাজা তাড়াইয়া গণতন্ত্রের অধীন তখন রাজার জয় ঘোষণা করাও তেমনি অপরাধ। অকস্মাৎ সম্রাটের জয়ঘোষণা হওয়াতে এতদিনের অভ্যাসবশতঃ দুইচারজন সেই সঙ্গে সাড়া দিয়া ফেলিল; এবং সকলে ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দারোগা সাহেবের একটা ষাঁড় রাস্তা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সকলে প্রস্তাব করিল সেটাকেই জবাই করিয়া পথ করিয়া চলা যাক। কিন্তু কর্ণেল রেবিয়া সকলকে থামাইয়া দিলেন। দারোগা সাহেব মাজিষ্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করিলেন যে কর্ণেল রেবিয়া দারোগার হুকুম ও মহামান্য সরকারের আইন অগ্রাহ্য করিয়া নেপোলিয়ান-পক্ষীয় কতকগুলি লোককে লইয়া বিদ্রোহ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছে, এবং ইহার দ্বারা দেশের শান্তিভঙ্গ ও খুনজখম হইবার আশঙ্কা থাকা বিধায় পিনাল কোডের ধারা অনুসারে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া হুজুরের সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

এই রিপোর্টের অতিশয়োক্তিই তাহার কাল হইল। কর্ণেল রেবিয়াও মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ কমিশনারকে সমস্ত বিবৃত করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই দ্বীপের অপর একজন শাসনকর্তা রেবিয়ার বৈবাহিক সম্পর্কে আত্মীয় এবং তিনি স্বয়ং দেশনায়কের সম্পর্কে ভাই। এইসব কারণে কর্ণেল রেবিয়ার বিরুদ্ধে দারোগার ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া গেল; রেবিয়া-গৃহিনী উদ্যানেই সমাহিত হইলেন। কেবল সেই মাথা-পাগলা লোকটা, যে সিংহাসন-চ্যুত সম্রাটের জয়ঘোষণা করিয়াছিল, তাহার পনর দিন কারাদণ্ড হইল।

বারিসিনি সাহেব এত জোগাড়েও রেবিয়ার কিছু করিয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহার কলকাঠি অন্যদিকে ঘুরাইয়া টিপিতে লাগিলেন। রেবিয়ার একটা পানিচাক্কি ছিল; বারিসিনি একখানা পুরাতন দলিল বাহির করিয়া সেই জলস্রোতে নিজের দাবি দাখিল করিলেন। বহুকাল ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। বৎসরকাল পরে যখন বোঝা গেল যে আদালত রেবিয়ার সপক্ষেই রায় প্রকাশ করিবেন, তখন বারিসিনি পুলিশ কমিশনরের হাতে একখানি চিঠি পৌঁছাইয়া দিলেন। এই চিঠিতে আগস্তিনি নামে একজন বিখ্যাত গুণ্ডার দস্তখত; দারোগা সাহেব যদি রেবিয়ার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া না লন তাহা হইলে সেই গুণ্ডা তাঁহার ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া তাঁহাকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। কর্সিকায় গুণ্ডার সাহায্য লইয়া কাজ হাসিল করা সকলেরই জানা ব্যাপার। সুতরাং এই চিঠিতে দারোগার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার উপায় সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরেই পুলিশ কমিশনর আর একখানা চিঠি খোদ আগস্তিনির নিকট হইতে পাইলেন। সে বলে যে দারোগা যে চিঠি দাখিল করিয়াছেন তাহা জাল। দারোগাকে যে বেশি ঘুস দিতে পারে দারোগা তাহারই পক্ষ হইয়া প্রতিপক্ষের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য না করিতে পারেন এমন কর্ম্ম পৃথিবীতে নাই। যদি এই জালিয়াত একবার তাহার হাতে পড়ে তাহা হইলে সে তাহাকে বেশ রীতিমত শিক্ষা দিয়া তবে ছাড়িবে ইহাও সে পুলিশ কমিশনরকে জানাইতে ত্রুটি করে নাই।

ইহা নিশ্চয় যে গুণ্ডা আগস্তিনি এইরূপ চিঠি লিখিতে কখনো সাহস করিতে পারে না। রেবিয়ার দল বলে বারিসিনি লিখিয়াছে, বারিসিনির দল বলে রেবিয়া লিখিয়াছে। উভয় পক্ষই রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া অপর পক্ষকে এমন ভাবে দূষিতে আরম্ভ করিল যে কোন পক্ষ যে প্রকৃত দোষী তাহা ঠাহর করা বিচারকের দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ একদিন কর্ণেল রেবিয়া খুন হইলেন।

পুলিশ-তদন্তে যাহা জানা গেল তাহা এই:—সেই দিন সন্ধ্যাবেলা বেওয়া মার্দালিন্ পিয়েত্রী হাট হইতে চাল

কিনিয়া গাঁয়ে ফিরিতেছিল, হঠাৎ দেড়শ কদম দূরে উপরাউপরি দুইবার বন্দুক আওয়াজ শুনিল এবং তখনি দেখিল যে একজন লোক নত হইয়া আঙুরের ক্ষেতের ভিতর দিয়া আপনাকে ছিপাইয়া গাঁয়ের দিকে পলাইতেছে। যাইতে যাইতে লোকটা একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল, কিন্তু দূরত্ব ও অন্ধকারের জন্য উক্ত বেওয়া সেই ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারিল না, অধিকন্তু সে ব্যক্তি মুখে একটা আঙুরের পাতা চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। সেই ব্যক্তি হাতের ইসারায় তাহার এক সহকারীকে ডাকিয়া আঙুরের ক্ষেতে অদৃশ্য হইয়া গেল, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী দেখিতে পাইল না। পিয়েত্রী বেওয়া তাহার মোট ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিল কর্নেল রেবিয়া পড়িয়া আছেন, রক্তে ঢেউ খেলিতেছে, কিন্তু তখনো প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে। তাঁহার কাছেই তাঁহার গুলিভরা ঘোড়া-তোলা বন্দুক পড়িয়া আছে, দেখিলেই বোধহয় যেন তিনি সম্মুখের আক্রমণকারীকে বাধা দিবার উপক্রম করিতেছিলেন কিন্তু পশ্চাতে গুলি খাইয়া পড়িয়া গেছেন। তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না, গুলি একেবারে ফুস্‌ফুস্ ভেদ করিয়া গিয়াছিল। পিয়েত্রী বেওয়া তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না। তিনি অতিকষ্টে পকেট দেখাইয়া দিলে পিয়েত্রী পকেট হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিল; তিনি কোনো রকমে কলম ধরিয়া গোটা কতক কি কথা আঁচড়াইয়া দিলেন। বেওয়া পিয়েত্রী লেখাপড়া না জানাতে কিছুই বুঝিতে পারিল না। লিখিবার চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া কর্নেল এলাইয়া পড়িলেন কিন্তু ইসারা করিয়া যেন বলিলেন উহাতেই তাঁহার খুনেদের নাম আছে।

বেওয়া পিয়েত্রী গাঁয়ে ঢুকিতেই দেখিল দারোগা বারিসিনি ও তাঁহার পুত্র ভাঁসান্তেলো যাইতেছে। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তাহা দারোগা সাহেবকে বলিল। দারোগা সাহেব সেই লেখা কাগজটা হাতে লইয়া নিজের চাপরাস এবং জমাদার ও কনেষ্টবলদের ডাকিয়া আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া থানায় গেলেন। তখন পিয়েত্রী আহত কর্ণেলকে একবার দেখিতে যাইবার জন্য ভাঁসান্তেলোকে অনুরোধ করিয়া বলিল, চেষ্টা করিলে তিনি হয়ত এখনো বাঁচিতে পারেন। কিন্তু ভাঁসান্তেলো স্বীকৃত হইল না; বদ্ধশত্রুকে এমন অবস্থায় দেখিতে গেলে লোকে মনে করিতে পারে যে সে হয়ত বাঁচিলেও বাঁচিতে পারিত, কিন্তু সেই গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই দারোগা সাহেব লোকজন লইয়া উপস্থিত হইলেন; তখন কর্ণেল রেবিয়া মরিয়া গিয়াছেন। দারোগা লাস উঠাইতে হুকুম দিয়া ডায়ারি লিখিয়া লইলেন।

দারোগা সাহেব থানায় ফিরিয়া খাতাখানি শীলমোহর করিয়া রাখিলেন। এবং যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া খুন আস্কারা করিবার জন্য খানাতল্লাসী করিতে লাগিলেন; কিন্তু খুনের কোনই কিনারা হইল না। জজের সম্মুখে যখন রেবিয়ার খাতাখানির শীলমোহর খোলা হইল, দেখা গেল একটা রক্তমাখা পাতায় দুর্ব্বল কম্পিত হস্তাক্ষরে সুস্পষ্ট লেখা আছে—আগস্তি...। এবং ইহা দেখিয়া জজের আর কোনো সন্দেহই রহিল না যে আগস্তিনিই কর্ণেলকে খুন করিয়াছে।

কলোঁবা জজের কাছে সেই খাতা দেখিবার অনুমতি চাহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া খাতাখানির পাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া দেখিয়া সে হাত বাড়াইয়া দারোগাকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল- "ঐ খুনে!" যে দারুণ শোকে সে বিমথিত হইতেছিল তাহারই উত্তেজনায় আশ্চর্য্যরকম স্পষ্টবাদিতা ও যুক্তির সহিত সে বলিতে লাগিল—খুন হইবার আগের দিন তাহার বাবা তাহার দাদার একখানি চিঠি পাইয়াছিলেন; সেই চিঠিতে দাদার বদলি হওয়ার কথা আর নূতন ঠিকানা লেখা ছিল; তাহার বাবা এই নোটবুকে তাহার দাদার নূতন ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই ঠিকানা-লেখা পাতাখানি এই নোটবুকে দেখা যাইতেছে না। নিশ্চয় সেই পাতার পৃষ্ঠে বাবা

তাঁহার খুনীর নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, দারোগা চালাকি করিয়া সেই পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নূতন পাতায় জাল নাম লিখিয়া দিয়াছে।

জজ খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই খুনীর নাম-লেখা পাতাখানির ঠিক আগের পাতাখানি ছেঁড়া হইয়াছে বটে; কিন্তু খাতার স্থানে স্থানে আরো পাতা ছেঁড়ার চিহ্ন আছে; এবং সাক্ষীরা বলিল যে কর্ণেল রেবিয়ার নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া চুরুট ধরানো অভ্যাস ছিল, অসাবধানে পুত্রের-ঠিকানা-লেখা পাতাখানি ছিঁড়িয়া ফেলা কিছু আশ্চর্য্য নহে। অধিকন্তু সাক্ষীরা ইহাও বলিল যে পিয়েত্রী বেওয়ার হাত হইতে খাতা লইয়া দারোগা সাহেব অন্ধকারে খুনীর নাম পড়িতেও পারেন নাই, এবং থানায় গিয়া যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ জমাদার তাঁহার কাছে কাছেই ছিল এবং তিনি সর্ব্বসমক্ষেই আলো জ্বালিয়া খাতাখানি কাগজে মোড়ক করিয়া মোহর দিয়া রাখিয়াছিলেন।

জমাদারের জবানবন্দি শেষ হইয়া গেলে কলোঁবা তাঁহার পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া মিনতির স্বরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জমাদার এক মুহূর্ত্তের জন্যও দারোগাকে একলা ছাড়িয়া কোথাও নড়িয়া গিয়াছিল কি না। এই সুন্দরী যুবতির এমন অশ্রুসজল মিনতি দেখিয়া পুলিশের জমাদারেরও হৃদয় একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, হাঁ সে একবার পাশের ঘরে এক তা কাগজ আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু সে এক মিনিটের বেশি নয়, এবং যতক্ষণ সে পাশের ঘরে ছিল দারোগা সাহেব বরাবর তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন; সে ফিরিয়া আসিয়াও দেখিয়াছিল যে সেই রক্তমাখা খাতা ঠিক তেমনি ভাবে যেখানে ছিল সেখানেই পড়িয়া আছে।

দারোগা বারিসিনি খুব শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার জবানবন্দি দিতে লাগিলেন। কুমারী রেবিয়ার যে আক্রোশ তাহা ত স্বাভাবিক; এখন দারোগা সাহেব নিজের সাফাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে তিনি সেদিন সমস্ত সন্ধ্যা বেলাটা গ্রামেই ছিলেন; ঘটনার সময় তাঁহার পুত্র ভাঁসাস্তেলো থানার সম্মুখে তাঁহার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল; এবং তাঁহা দ্বিতীয় পুত্র অর্ লান্দিক্সিয়োর সেদিন জ্বর হইয়াছিল, ে ত শয্যা ছাড়িয়া সেদিন উঠিতেই পারে নাই। তি তাঁহার বাড়ীর সমস্ত বন্দুক আনিয়া দেখাইলেন ে সম্প্রতি কোনো বন্দুকই আওয়াজ করা হয় নাই। খাতা খানি তিনি তখনই শিলমোহর করিয়া জমাদারের জিম্মা রাখিয়া দিয়াছিলেন, কারণ কর্ণেল রেবিয়ার সহি তাহার শত্রুতা থাকার জন্য তাঁহার প্রতি লোকের সন্দেহ হওয়া খুব স্বাভাবিক। ইতিপূর্ব্বে আগস্তিনির দস্তখতি একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে আগস্তিনি ভ দেখাইয়াছিল, যে তাহার নামে চিঠি জাল করিয় লিখিয়াছে তাহাকে সে খুন করিবে; আগস্তিনি কর্ণেল রেবিয়াকেই সন্দেহ করিয়া খুন করিয়া থাকিবে। গুণ্ডাদের ইতিহাসে এমন খুন আকছার দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ঘটনার দিন পাঁচেক পরে আগস্তিনিকেও কে খুন করিল। লাস পরীক্ষার সময় তাহার কাছে কলোঁবার একখানা চিঠি পাওয়া গেল। সেই চিঠিতে কলোঁবা তাহাকে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে সে বাস্তবিকই তাহার পিতাকে খুন করিয়াছে কি না, তাহা যেন সে স্পষ্ট করিয়া বলে।

কলোঁবা এ চিঠির কোনো জবাব পায় নাই। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, বাপকে খুন করিয়া মেয়ের কাছে তাহা স্বীকার করিবার সাহস তাহার হয় নাই। কিন্তু যাহারা আগস্তিনির স্বভাব জানিত তাহারা চুপিচুপি বলাবলি করিল যে, সে যদি খুন করিয়া থাকিত তবে সে তাহা লুকাইবার লোক ছিল না। আর-একজন পলাতক আসামী ব্রান্দলার্কাসিয়ো শপথ করিয়া তাহার সঙ্গীর নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সাক্ষী দিল; কিন্তু তাহার প্রমাণ এই মাত্র যে তাহার বন্ধু কখনো তাহাকে বলে নাই যে কর্ণেল রেবিয়ার উপর তাহার কোনো সন্দেহ বা আক্রোশ আছে।

মোটের উপর, সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে ফাঁসিয়া গেল যে দারোগা বারিসিনির চিন্তিত হইবারও কোনো কারণ ঘটিল না। জজ সাহেব মোকদ্দমার রায়ে দারোগাকে প্রশংসায় প্রশংসায় একেবারে স্বর্গে তুলিয়া

ধরিলেন; এবং দারোগা বারিসিনিও কর্ণেল রেবিয়ার সহিত সোঁতা লইয়া পুরাতন মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়া আপনার উদারতা সপ্তমে চড়াইয়া সাধারণের বাহবাটাও লুটিয়া লইলেন।

দেশের রীতি অনুসারে মৃতের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলোঁবা গান রচনা করিল। ইহাতে সে তাহার অন্তরের সমস্ত আক্রোশ ঘৃণা ক্রোধ ঢালিয়া দিয়া বারিসিনিদের খুনী বলিয়া প্রচার করিল এবং তাহার দাদার হাতে তাহাদেরও একদিন তুল্য দশা হইবে বলিয়া খুব শাসাইয়া রাখিল। এই গানটি এত প্রচার হইয়া লোকের প্রিয় হইয়া পড়িল যে জাহাজের মাঝি মাল্লা খালাসিরাও ইহা গাহিত।—সেই গানই মাঝির মুখে লিডিয়া শুনিয়াছিল।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অসো ছুটি চাহিল, কিন্তু পাইল না।

প্রথমে বোনের চিঠিতে খবর পাইয়া তাহার মনে হইয়াছিল যে বারিসিনিরাই অপরাধী; কিন্তু মোকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া তাহার বিশ্বাস হইল যে বারিসিনিরা কোনো দোষেই দোষী নয়, যত নষ্টের গোড়া ছিল সেই আগস্তিনি গুণ্ডাটা। কিন্তু প্রথম তিন মাস ধরিয়া কলোঁবা তাহাকে যে চিঠিই লেখে তাহাতেই সে বারিসিনিদের উপরই দোষারোপ করিয়া লেখে; ইহাতে তাহার ঠিক বিশ্বাস না হইলেও তাহার কর্সিক রক্ত জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিত এবং সেও তাহার ভগিনীর মত প্রায় স্বীকার করিয়া লইবার উপক্রম করিতেছিল। তথাপি সে যতবারই তাহার ভগ্নীকে চিঠি লিখিত সব চিঠিতেই লিখিত যে তাহার সন্দেহের যখন কোনো প্রমাণ নাই, তখন সে সন্দেহ পোষণযোগ্য নহে। কিন্তু বৃথাই সে তাহার ভগিনীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দুই বৎসর এইরূপেই কাটিল।

তারপর হাফ-পেন্সনে তাহাকে বরখাস্ত করা হইল। সে এখন দেশে ফিরিয়া যাইতেছে—পিতার মৃত্যুর জন্য যাহাদিগকে সে নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাদের উপর কোনোরূপ প্রতিহিংসা লইবার জন্য নহে; ভগ্নীর বিবাহ দিয়া, দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে ফ্রান্সে গিয়া বাস করিবে স্থির করিয়াছে। এসব পুরাতন ব্যাপার লইয়া ঝগড়াঝাঁটি করিয়া মন খারাপ করা সে মোটেই পছন্দ করে না। দেশের সুখ চেয়ে বিদেশের স্বস্তিও ভালো।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোলজাতির নব্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়

কোল ওরাওঁ প্রভৃতি বন্য জাতিই ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী। ইহারা ছোটনাগপুরের অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও গভীর অরণ্যসমূহে বাস করে। ইহারা অত্যন্ত অসভ্য ও সরল প্রকৃতির লোক। ইহারা অত্যন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ; কিন্তু বিনাদোষে কাহারও অনিষ্ট করেনা।

যে সময় হইতে এতদ্দেশে ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই সময় হইতেই সভ্যসম্প্রদায়ের সংস্পর্শে ক্রমশঃ ইহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা ক্রমশঃ চতুর ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে। অধুনা অনেকেই বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ দিতেছে। ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করিয়া কোলজাতির মধ্যে কেহ কেহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কেহ বা ডেপুটী কালেক্টর এবং অনেকে আরও অন্যান্য উচ্চ রাজপদারূঢ় হইয়াছে। সুতরাং আজ-কাল সকলেই ইহাদিগকে মান্য করিতেছে।

পূর্ব্বে ইহাদের কোনও ধর্ম্মই ছিল না; সুতরাং অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। আজকাল এই জাতির মধ্যে এক নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সাত আট বৎসর যাবত এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

সিংরায় হো নামক একজন কোল এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সিংহভূম জেলার মহকুমা চাইবাসার পশ্চিমে বারকেলা নামক পর্ব্বতের নিকটস্থ কোনও গ্রামে ইহার বাস। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে একসময় ইহার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হয়। এই পীড়াই এই নূতন ধর্ম্মের সূত্রপাতের প্রধান কারণ। কোন স্বজাতীয় কবিরাজের পরামর্শ অনুসারে সিংরায় ঔষধ অন্বেষণের জন্য একদিবস গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। ঐ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অকস্মাৎ একজন জটাজুটধারী জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হন। সেই সরলহৃদয় সিংরায় এরূপ অসম্ভাবিতরূপে এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও

আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার পদতলে গিয়া পতিত হয়। সে আপনার স্ত্রীর দুরারোগ্য পীড়ার বিষয় তাঁহাকে অবগত করাইলে তিনি বলিলেন, "সিংরায়! তুমি দুঃখিত হইও না। অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডন করিতে পারে। তুমি অদ্য হইতে সংসারের মায়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্জ্জনে বসিয়া সর্ব্বদা রাম নাম জপ কর; তোমার সমস্ত কষ্ট দূর হইবে। তুমি অবশেষে অনন্ত স্বর্গ লাভ করিবে। কিন্তু মনে রাখিও যে, (ভগবানের পুনরাদেশ পর্য্যন্ত) আতপতণ্ডুলের অন্ন, শাক ও লবণ ব্যতীত অপর কোন দ্রব্যই আহার করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

ইহার কয়েকদিবস পরেই সিংরায়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সিংরায় সেই মহাত্মার বাক্যানুযায়ী, সেই দিবস হইতেই সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে রামনাম জপ করিতে লাগিল।

অতঃপর দুই একজন করিয়া ক্রমশঃ অনেকে তাহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিতে লাগিল।

শোনা যায় যে, যদি সিংরায় কিম্বা তাহার কোন শিষ্য সন্ন্যাসী-নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিত তাহা হইলে তাহার কোনও-না-কোনরূপ শারীরিক অসুখ হইত। পুনরায় নিয়ম পালন করিয়া চলিলেই আহার সমস্ত কষ্ট দূর হইত।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সিংরায় একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইল। সে বৃথা অধিক বাক্যব্যয় করে না। সে বলে, "ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমার মুখ হইতে যে-সকল বাক্য বহির্গত হয় তৎসমুদয় ভগবানের বাক্য। সুতরাং এই-সকল বাক্য পালন করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।" ধ্যানমগ্ন সিংরায়ের বদন-বিনিঃসৃত প্রত্যেক কথাই তাহার শিষ্যেরা আজপর্য্যন্তও পালন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস, যদি কেহ উক্ত বাক্য অনুসারে কার্য্য না করে তাহা হইলে জগদীশ্বর তাহাকে দণ্ড দেন। সিংরায়ের বাক্য ভগবানের আদেশ বলিয়াই পরিচিত।

এক সময় আদেশ হইল যে, ঐ ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই উপবীত ধারণ, গেরুয়াবসন পরিধান, গেরুয়া রঙ্গের ছাতা ব্যবহার ও কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং সকলেই উক্ত আদেশ অনুসারে চলিতে লাগিল। এমন কি এইধর্ম্মে দীক্ষিতা স্ত্রীলোকগণকেও উপবীত ধারণ করিতে হইল।

যে-সকল লোক এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই, দীক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাদের হস্তপক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করে না। যদি ভ্রমবশতঃ কেহ তাহাদের হস্তপক্ক অন্ন আহার করে তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। নতুবা সে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকে।

ইহার পর পুনরায় একদিবস আদেশ হইল যে, রাম নাম পরিত্যাগ করিয়া সত্য নাম জপ করিতে হইবে; এবং লবণ ও শাকাদি বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র আতপ তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে হইবে। তাহারা শীতকালে ষ্টকিং ব্যবহার করিতে পারিবে। তদনুসারে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আজকাল পুনরায় আদেশ হইয়াছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে পায়জামা টুপী ও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবে। এই ঈশ্বরপরায়ণ জাতি ক্রমান্বয়ে ভগবানের সমস্ত আদেশ পালন করিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহারা ইহারও ত্রুটী করিতে পারিল না। অধুনা এই ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেককেই পায়জামা, টুপী ও জুতা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। গুরু সিংরায় বল-পূর্ব্বক কিম্বা তোষামোদ দ্বারা কাহাকেও এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেনা। সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছা অনুসারে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। মহাত্মা সিংরায়ের মুখ হইতে সময় সময় এরূপ ভাষা বহির্গত হয় যে, সে নিজেই কিছুক্ষণের জন্য তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কিন্তু অল্পক্ষণ আলোচনা করিলেই ইহা তাহার পক্ষে ক্রমশঃ সহজবোধ্য হইয়া আসে। তৎপরে সে ইহা তাহার সর্ব্বশিষ্য-সমক্ষে বর্ণন করে, এবং তাহারাও ঈশ্বর-বাক্য বোধে সেই-সব অনুশাসন পালনে তৎপর হয়।

এই নব্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা অপরের আসনে উপবেশন করে না। যে স্থানে বসিতে হইবে, গুরু সিংরায় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে জল ছিটাইয়া দেয় এবং সকলেই আপন আপন গাত্রবস্ত্র বিস্তার করিয়া তদুপরি

উপবেশন করে। সিংরায় যখন যে-সকল মন্ত্রোচ্চারণ করে তাহা ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষায় মিশ্রিত। ইহা কেহই বুঝিতে পারে না।

সিংরায় বলে যে, এই ধর্ম্মই ভবিষ্যতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে এবং তখন ইহাই ভারতের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে। এবং উক্ত মিশ্রিত ভাষাতেই কথোপকথন ও পুস্তকাদি মুদ্রিত হইবে।

চাইবাসার চতুষ্পার্শ্বস্থ কোল পল্লীসমূহে এই ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে।

চাইবাসা শ্রীবুদ্ধেশ্বর দত্ত।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত পাঁচ পরিচ্ছেদের সারাংশ :—ক্ষেত্রনাথ দত্তের বাড়ী কলিকাতায়। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণজালে জড়িত হন। ক্ষেত্রনাথ বি-এ পাশ করিয়া পিতার সাহায্যার্থ পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া ও একটী ভগিনীর শুভবিবাহ সম্পাদন করিতে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায় এবং ঋণদায়ে পৈত্রিক বাটী উত্তমর্ণের নিকট আবদ্ধ হয়। অর্থাভাবে ক্ষেত্রনাথের কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল ও সংসার চালাইবার কোনও উপায় রহিল না; তাহার উপর স্ত্রী মনোরমা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এদিকে উত্তমর্ণও ঋণের দায়ে বাটী নিলাম করাইতে উদ্যত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং বাটী বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এবং এক বন্ধুর পরামর্শক্রমে উদ্বৃত্ত অর্থের কিয়দংশ দ্বারা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম জেলায় বল্লভপুর নামে একটী মৌজা ক্রয় করিলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় করিবেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে রুগ্না স্ত্রী, তিনটী পুত্র ও একটী শিশুকন্যা সহ তিনি বল্লভপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলেন।

ষ্টেশন হইতে গোযানে পার্ব্বত্য ও অরণ্যপথে যাইতে যাইতে ঘটনাক্রমে মাধবপুরে মাধব দত্ত নামে জনৈক স্বজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত ক্ষেত্রনাথের আলাপ হইল। মাধবদত্তের অনুরোধে তিনি সপরিবারে তাঁহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। বল্লভপুর ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত জমিদারের "কাছারী বাটী" নামক দ্বিতল পাকা বাটীও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। সেই বাটীই তাঁহাদের আবাসবাটী হইল। ক্ষেত্রনাথের এক শত বিঘা খাসখামার জমী ছিল; তাহা নিজ জোতে চাষ করিবার জন্য তিনি বলদ মহিষ প্রভৃতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। সুন্দর আবাসবাটী ও চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং প্রবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতীয় মহিলাগণের ও দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সহিত আলাপ করিয়া মনোরমা অতিশয় আনন্দিত হইলেন।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ কতিপয় দিবস প্রাঙ্গণের প্রাচীরাদি প্রস্তুত করাইতে একান্ত ব্যস্ত রহিলেন। জঙ্গল হইতে শালের রোলা আনীত হইল। বালকেরা এবং মনোরমাও বিস্ময়ের সহিত এই অভিনব প্রাচীর-নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখিতে লাগিল। কাড়ার (মহিষের) গাড়ীতে রোলা-সকল পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে বাহিত হইতে লাগিল। সে গাড়ীর চাকাও চমৎকার। কাষ্ঠের মোটা তক্তাকে একত্র গাঁথিয়া তাহা গোলাকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। চাকাগুলি দেড় হাতের অধিক উচ্চ হইবে না। সেই চাকাগুলি অতিশয় দৃঢ়। উচ্চ নীচ স্থান ও খাল নদীর উপর গাড়ী লইয়া যাইতে হইলে, এইরূপ চাকাই একান্ত উপযোগী। কিন্তু যখন গাড়ী চলে, তখন চাকা ও লিগের ঘর্ষণে এরূপ ভয়ঙ্কর ও কর্কশ শব্দ উত্থিত হয় যে, তাহা অর্দ্ধ মাইল হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রজাবর্গ আপনার গাড়ী দ্বারা শালের রোলা ও বাঁশ পর্ব্বত হইতে বহিয়া আনিয়া দিল। মজুরেরা ক্ষেত্রনাথের নির্দ্দেশ-মত সেই রোলাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিল, এবং দুইদিকে বাঁশের বাকারি দিয়া তাহা রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিল। রোলার সূক্ষ্ম অগ্রভাগগুলি আকাশের দিকে রহিল। প্রাচীর এরূপ দৃঢ় ও উচ্চ হইল যে, তাহা কাহারও পক্ষে লঙ্ঘন করা অসম্ভব হইল।

প্রাচীর প্রস্তুত হইলে গৃহের প্রাঙ্গণটি প্রশস্ত হইল। দুই চারিটি "কামিন" (স্ত্রীমজুর) মাটী ও গোময় লেপিয়া তাহা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করিল। ইন্দারাটী প্রাঙ্গণের মধ্যেই পড়িল। মনোরমা সযত্নে তাহার পার্শ্বে একটী তুলসী-বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বালকেরা বাগানে সাহেবদের রোপিত দুই চারিটি পুষ্প-বৃক্ষের চারা আনিয়া স্থানে স্থানে রোপণ করিল। ইন্দারার অনতিদূরে, উত্তর দিকের প্রাচীরের সংলগ্ন স্থানে একটি কাঁচা রান্নাঘর প্রস্তুত হইল। কাছারী-বাটীর নিম্নতলের একটী প্রশস্ত গৃহ ভাণ্ডার-গৃহে পরিণত হইল।

প্রজারা নবীন ভূস্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইল যে, তাঁহার যখন যাহা অভাব হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহা মোচন করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার

নিজের বলদ ও লাঙ্গল না আসা পর্য্যন্ত, প্রজাবর্গ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিজ জোতের ভূমি কর্ষণ করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার নিজের লাঙ্গল ও বলদ আসিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। পাঁচ জোড়া বলদ, দুই জোড়া কাড়া ও দুইটী পয়স্বিনী গাভী ক্রীত হইয়া গোশালায় রক্ষিত হইল। গো-মহিষ গোশালায় আসিল বটে, কিন্তু তাহাদের আহার্য্য তৃণাদি কিরূপে ও কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। বল্লভপুরে খড় ইত্যাদি ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। প্রজাবর্গ ভূস্বামীর অভাবের কথা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে কিছু কিছু খড় আনিয়া দিল। এইরূপে যে পরিমাণে খড় সংগৃহীত হইল, তাহাতে গোমহিষাদির প্রায় ছয় মাসের আহার্য্য সম্বন্ধে ক্ষেত্রনাথ নিশ্চিন্ত হইলেন।

গোশালায় পয়স্বিনী গাভী দুইটীর স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিল বটে, কিন্তু ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে তাহাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘরও প্রস্তুত করিলেন। গাভী দুইটী সেই ঘরেই সর্ব্বদা মনোরমার চক্ষে চক্ষে থাকিত। গৃহকর্ম্মে মনোরমার সহায়তা করিবার জন্য "যমুনীর (যমুনার) মা" নামে একটী কার্য্যদক্ষা স্ত্রীলোক পরিচারিকা-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে গাভী দুইটীকে নিজহস্তে খাওয়াইত। গোসেবা করা পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া মনো-রমাও অবসরক্রমে তাহাদিগকে নিজহস্তে খাওয়াইতেন। দুইটী গাভীতে প্রায় ছয় সের দুগ্ধ প্রদান করিত। সে দুগ্ধ এরূপ সুমিষ্ট যে, ক্ষেত্রনাথ, মনোরমা বা তাহাদের সন্তানেরা কেহই কলিকাতায় কখনও এরূপ দুগ্ধ পান করে নাই। যমুনার মা প্রত্যহ নিজহস্তে গাভীদের দুগ্ধ দোহন করিত।

এদিকে কৃষিকার্য্যের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। আষাঢ় মাস পড়িয়াছে। প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। এই সময়ে ধান্য রোপণ বা বপন না করিলে, শস্য "নামী" হইবে। সুতরাং কৃষিকার্য্যের জন্য সাত জন নিপুণ ও বলিষ্ঠ "মুনিষ" (মনুষ্য?) নিযুক্ত হইল এবং গোমহিষাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন "বাগাল" (রাখাল, অর্থাৎ যে গরু বাছুরকে বাগায়, বা চরাইবার সময় একত্র করিয়া রাখে) নিযুক্ত হইল। এদেশের প্রথানুসারে, মুনিষ, বাগাল ও কামিনেরা গৃহস্থের ঘরে খাইয়া থাকে। মনোরমার যেরূপ দুর্ব্বল দেহ, তাহাতে তিনি যে একাকিনী এতগুলি লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বাগাল ও মুনিষেরা যে জাতীয় ব্যক্তি, যমুনার মাও সেই জাতীয়া স্ত্রীলোক। সুতরাং যমুনার মা, ইহাদের সকলের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার ভার লইল। যমুনা নাম্নী তাহার বিধবা কন্যাটিও জননীকে এবং মনোরমাকে গৃহকার্য্যে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল।

বাগাল মুনিষদের আহার্য্য প্রস্তুত করা সহজসাধ্য কার্য্য ছিল না। মুনিষেরা প্রত্যূষে লাঙ্গল লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিত। প্রত্যূষ হইতে বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত তাহারা ভূমিকর্ষণ করিত। এগারটার সময়ে, তাহারা লাঙ্গল ছাড়িয়া "বেসাম" (জলপান) খাইবার জন্য প্রস্তুত হইত। বাগাল এই সময়ে "জলপান" লইয়া মাঠে যাইত। সাতজন মুনিষ এবং বাগাল এই আটজনের জলপান; অর্থাৎ দুইটী বড় ধামা-পূর্ণ মুড়ি এবং কতকগুলি "সঁপ্‌রা" (লঙ্কা) ও কিঞ্চিৎ লবণ। যমুনার মা প্রত্যহই প্রাতে চারি সের চাউলের মুড়ি ভাজিত। মুড়ি ভাজা হইলে, সে তাহাদের জন্য ভাত রাঁধিত। যমুনা, যমুনার মা, এবং আটজন মুনিষ বাগালে সর্ব্বসমেত দশ জনের জন্য প্রায় আট সের চাউলের অন্ন তদুপযুক্ত কলাইয়ের ডাল এবং তরকারী প্রভৃতি রন্ধন করা হইত। মুনিষেরা লাঙ্গল বলদ ও কাড়া লইয়া বেলা প্রায় চারিটার সময় মাঠ হইতে গৃহে আসিত। আসিয়া বলদ ও কাড়া-সকলের আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিত। তৎপরে তৈল মাখিয়া স্নান করিতে যাইত; স্নানান্তে আহারে বসিত। আহার শেষ হইলে, তাহারা বলদ ও কাড়াসকলকে রাত্রির জন্য পুনর্ব্বার আহার্য্য তৃণাদি দিয়া বৈঠকখানার বারাণ্ডায় আসিয়া শয়ন করিত। সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর, শয়ন করিবামাত্র, তাহারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইত।

ক্ষেত্রনাথের ভাণ্ডারে ধান্য চাউল বা কলাই সঞ্চিত ছিল না। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে যেরূপ খরচ, তাহাতে পসারীর দোকান হইতেও চাউলাদি ক্রয় করিয়া আনা

তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইতেছিল না। এই কারণে, মাধব দত্ত মহাশয়ের পরামর্শক্রমে তিনি এক শত টাকার ধান্য ক্রয় করিয়া আনাইলেন এবং উঠানের এক পার্শ্বে গাভীদের জন্য যে গোশালা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারই সন্নিকটে একটী ঢেঁকী বসাইলেন। যমুনা ও যমুনার মা অবসরক্রমে ধান্য সিদ্ধ করিয়া তাহা শুকাইয়া রাখিত। দুইটী ঠিকা কামিন আসিয়া তাহা ঢেকিতে "ভানিয়া" (ভাঙ্গিয়া) চাউল প্রস্তুত করিত। এইরূপে ভাণ্ডারে চাউল সঞ্চিত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ নিকটবর্ত্তী হাট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কলাইও ক্রয় করিয়া আনাইলেন, এবং গৃহে একটী যাঁতা বসাইয়া, যমুনা ও যমুনার মার সাহায্যে তাহা হইতে ডাল প্রস্তুত করাইলেন। তিনি আপনাদের ব্যবহারের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট গমও ক্রয় করিয়া আনাইলেন। যাঁতাতে সেই গম পিষ্ট হইলে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আটা, ময়দা ও সুজি উৎপন্ন হইত। গমের চোকল ও কলায়ের ভূষি প্রভৃতি গাভীদের আহার্য্য হইত।

কৃষিকার্য্য, গৃহস্থালী এবং অন্যান্য বিষয়ের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ক্ষেত্রনাথের কিছুমাত্র অবসর ছিল না। এই-সমস্ত বিষয়ে তিনি মাধব দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সদুপদেশ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুই তিন দিন অন্তর তিনি স্বয়ং আসিয়া কৃষিকার্য্য প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া না দিলে, অনভিজ্ঞ ক্ষেত্রনাথ নিজ বুদ্ধিতে কিছু করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথও সকল বিষয়ে পিতার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল। নগেন্দ্র প্রত্যহ ক্ষেত্রসমূহে গমন করিয়া মুনিষদের কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিত। তাহার চক্ষে সমস্তই নূতন ব্যাপার। লাঙ্গল দ্বারা ভূমিতে চাষ দেওয়া, মই দেওয়া, ধান্য বপন, ধান্য রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার নিকট নূতন। এই কারণে, কুতূহলী নগেন্দ্রনাথ মহান্ আগ্রহের সহিত প্রত্যহ মাঠে গমন করিত এবং সমস্ত কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিত ও শিখিত। সুরেন এবং নরুও নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে সকল ব্যাপারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কৌতূহল প্রকাশ করিত। কলিকাতার ক্ষুদ্র সীমা হইতে বহির্গত হইয়া বালকেরা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর মহান্ শিক্ষামন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং অত্যল্প দিনের মধ্যে তাহাদের চিত্ত এবং মনেরও যে যথেষ্ট বিকাশ হইল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আর মনোরমা? বল্লভপুরে আসিয়া মনোরমার দেহ ও মনের যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহা বিস্ময়জনক। পার্ব্বতীয় প্রদেশের নির্ম্মল বায়ু সেবন ও বিশুদ্ধ জল পান করিয়া মনোরমার দেহের অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া গেল। তাহার উপর তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি অল্প হইল না। কোথায় কলিকাতার দুর্ব্বিষহ চিন্তা ও সাংসারিক কষ্ট, আর কোথায় বল্লভপুরের সর্ব্ববিষয়ে প্রাচুর্য্য ও স্বচ্ছলতা। বল্লভপুরের সুন্দর বাটীর চতুর্দ্দিকে আপনাদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, গোমহিষ, লোক জন, দাস দাসী,—প্রতিবাসিগণের নিকট সম্মান, স্বামীর উন্নতির সূত্রপাত, পুত্রগণের উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি—এবং সর্ব্বোপরি, তাহাদের নধর দেহ এবং আনন্দময় বদন অবলোকন করিয়া, মনোরমার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। মনোরমা কেবল স্বামী ও পুত্রকন্যাদের জন্য স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক কার্য্য অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছিল। তাঁহাকে গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। পরন্তু মনোরমা ইহাতে কোন কষ্ট অনুভব করিতেন না। যমুনা ও যমুনার মা তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিত। ইহাদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মনোরমা এক-একবার মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিতেন। মনোরমা তাহাদিগকে আত্মীয়ার ন্যায় যত্ন করিতেন; তাহারাও "গিন্নী"কে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহাদের আকার প্রকার পরিচ্ছদ এবং কথাবার্ত্তা রূঢ় হইলেও, তাহাদের হৃদয় অতিশয় চমৎকার ছিল। মনোরমা তাহাদের নিকট মুড়ি ভাজা, ধান সিদ্ধ করা, এবং চাউল প্রস্তুত করা ইত্যাদি নানা অত্যাবশ্যক বিষয়ের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন কৌতূহলপরবশ হইয়া, মনোরমা যমুনার মাকে সরাইয়া দিয়া, নিজেই মুড়ি ভাজিতেন। মনোরমার গৃহস্থালী

দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন তাহাতে লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের সময় কিঞ্চিৎ অবসর পাইলে, মনোরমা নরুকে কাছে বসাইয়া পড়াইতেন। সুরেন্দ্র পিতার কাছে প্রাতে ও সন্ধ্যায় পুস্তক পাঠ করিত। বল্লভপুরে ভাল পাঠশালা অথবা কোনও স্কুল না থাকায়, নরুর বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। সেই কারণে, মনোরমা স্বহস্তে তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে প্রতিবাসিনী রমণীরাও কোনও কোনও দিন মনোরমাদের বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিত। মনোরমা সকলকেই মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট করিতেন। কখনও কখনও মনোরমা দ্বিতলের বারান্দায় একাকিনী দণ্ডায়মান হইয়া নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে কৃষি-কার্য্যের প্রক্রিয়া কৌতূহল সহকারে অবলোকন করিতেন। স্বামী এবং নগেন্দ্রনাথ কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিয়া সাধ্বী-হৃদয় আনন্দ ও উল্লাসে পরিপূর্ণ হইত; এবং আপনাদের পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইবামাত্র কখনও কখনও তাঁহার সুন্দর ও বিশাল চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইত। মনোরমা কলিকাতায়, সেই স্মরণীয় রাত্রিতে, হৃদয়ের আবেগে ভগবান্‌কে যে কাতর ভাবে ডাকিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দয়াময় হরি তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন, তাহা মনোরমার বিশ্বাস হইয়াছিল। সেই অবধি মনোরমার হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। মনোরমা স্নানান্তে প্রত্যহ পুষ্পচন্দন লইয়া একাগ্রচিত্তে ইষ্টদেবের পূজা করিতেন এবং ভগবান্‌কে কাতরমনে ডাকিয়া বলিতেন, "হে দয়াময় ঠাকুর, তুমি আমাদের দয়া কর; আমরা যেন কখনও তোমার দয়ায় বঞ্চিত না হই। তুমি আমার স্বামী ও সন্তানগুলিকে সুখে ও সুস্থশরীরে রাখ। ঠাকুর, তোমার পদে যেন চিরকাল আমাদের সকলেরই ভক্তি অচলা থাকে।" এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সতীর দুই গণ্ডস্থল বহিয়া পূত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাসের মধ্যে কৃষিকার্য্য প্রায় এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টিপাত হয় যে, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের লোক সেরূপ বৃষ্টিপাত কখনও চক্ষে দেখেন নাই। সামান্য মেঘের সঞ্চার হইলেই, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। বল্লভপুরের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। সেই পাহাড়-সমূহের গাত্র বহিয়া ভীষণ শব্দে জলস্রোত নামিতে থাকে। সে শব্দ এরূপ প্রচণ্ড, যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়। পর্ব্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "জোড়" বা তটিনী আছে। সেই তটিনীসমূহ মুহূর্ত্ত মধ্যে বন্যার জলে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তটিনীর জল খরবেগে শীঘ্র প্রবাহিত হইয়া যায়। সুতরাং বৃষ্টিপাতের অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পরে, তাহার বিশেষ কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই আষাঢ় মাসে কৃষকগণের নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর থাকে না। ক্ষেত্রনাথ আপনার সাতজন মুনিষ ও কামিন্ লাগাইয়া ধান্যরোপণ কার্য্য শেষ করিলেন। প্রথম হইতে উদ্যোগ না থাকায়, এ বৎসর পঞ্চাশ বিঘার অধিক জমীতে আবাদ হইল না। এই পঞ্চাশ বিঘা জমীই উৎকৃষ্ট জমী। অবশিষ্ট জমী "টাঁড়" (ডাঙ্গা জমী)। পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে টাঁড় জমীগুলি আনত হইয়া আসিয়াছে। প্রচুর বর্ষা হইলে, এই টাঁড় জমীতে আশু (আউশ) ধান্য হইতে পারে; অন্যথা, ইহাতে কলাই, টুমুর (অড়হর), রমা (বরবটী) প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ধান্যের জমীতে ধান্য রোপণ শেষ হইয়া গেলে, মাধব দত্ত মহাশয়ের পরামর্শক্রমে, ক্ষেত্রনাথ এই টাঁড় জমীগুলিতে চাষ দেওয়াইলেন, এবং কতকগুলিতে কলাই, কতকগুলিতে বরবটী এবং কতক-গুলিতে টুমুর বা অড়হরের বীজ ছড়াইয়া দিলেন। এই-রূপে সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চাশ বিঘা টাঁড় জমীতে আবাদ করা হইল। এতদ্ব্যতীত, ধান্যের জমী ও টাঁড় জমী আরও প্রায় একশত বিঘা ইতস্ততঃ অকৃষ্ট পড়িয়া রহিল।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ধান্যের ক্ষেত্রে ধান্য-গাছ-

সকল হরিদ্বর্ণ ধারণ করিল। তখন ক্ষেত্রসমূহের চমৎকার শোভা হইল। টাঁড়সমূহেও কলাই, অড়হর প্রভৃতির চারা গাছ বাহির হইয়া তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা-সম্পাদন করিল। ক্ষেত্রনাথ শস্যক্ষেত্র সমূহের শোভা দেখিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; মনোরমাও দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তদ্দর্শনে আনন্দিত হইতে লাগিলেন। মুনিষদের কাজকর্ম্মের ঝঞ্চাট অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল; তাহারা কোদালিহস্তে এখন প্রত্যহ প্রাতে ধান্যক্ষেত্রে গিয়া ক্ষেত্রের ভগ্ন আলি বন্ধন করিত এবং ক্ষেত্র হইতে ঘাস ইত্যাদি নিড়াইয়া ফেলিত। মধ্যাহ্নে তাহাদের বিশেষ কোনও কার্য্য থাকিত না। সেই সময়ে তাহারা বাড়ীর উত্তরদিকে বিস্তৃত ভূখণ্ডে উৎপন্ন শাকসব্‌জী প্রভৃতির যত্ন করিতে নিযুক্ত রহিত। ইতিমধ্যেই বেগুন, লাউ, কুমড়া (ডিঙ্গ্‌ল্যা), ঝিঙ্গে প্রভৃতি অনেকগুলি অত্যাবশ্যক তরকারীর গাছ বড় হইয়াছিল এবং কোনও কোনও গাছে ফল ধরিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। বর্ষার প্রারম্ভেই যমুনার মা মুনিষদিগকে বলিয়া একদিন খানিকটা জমীতে লাঙ্গল দেওয়াইয়াছিল। যমুনা ও যমুনার মা গ্রাম হইতে শাকসব্‌জীর বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা এই জমীতে বপন করিয়াছিল। মনোরমা স্বয়ং এই বপন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। কোথাও শাকের ক্ষেত, কোথাও বেগুনের ক্ষেত, কোথাও লাউ ও কুমড়ার লতা, কোথাও পুঁইশাকের মাচা, কোথাও ঝিঙ্গে এবং করোলার লতা, কোথাও "রামঝিঙ্গা"র (ঢেঁড়শের) গাছ, কোথাও "শকরকন্দ" আলুর ক্ষেত ইত্যাদি। মনোরমা প্রত্যহ অবসরক্রমে এই তরকারীর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং শাক, ঝিঙ্গে, করোলা, কুমড়া, লাউ, প্রভৃতি স্বহস্তে তুলিয়া আনিতেন। তাঁহারা প্রথম প্রথম বল্লভপুরে আসিয়া তরকারীর বড় অভাব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনক্রোশ দূরে একটী গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন মাত্র হাট হয়। সেই হাটে যে তরকারী প্রভৃতি আমদানী হইত, তাহা সামান্য। এদেশের লোকেরা তরকারী প্রায় কিনিয়া খায় না। সুতরাং হাটেও তরকারী তত আমদানী হইত না। সেই কারণে, মনোরমা যমুনার মার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের রান্নাঘরের পশ্চাদ্ভাগে প্রায় দুই তিন বিঘা জমীতে এই-সমস্ত আনাজের গাছ উৎপন্ন করাইয়াছিলেন।

একদিন ক্ষেত্রনাথ, মনোরমার সহিত, তরকারীর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। মনোরমা, যমুনার মার সাহায্যে, যে দুই চারিটী তরকারীর বীজ পুঁতিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু গাছগুলি বড় হইয়া যে এত শীঘ্র ফলবান্ হইয়াছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। মনোরমার সঙ্গে তিনি ক্ষেত্রের মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সুরেন ও নরু ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বাবা, এই দেখ, আমাদের গাছ কেমন বড় হয়েছে। আমরা নিজেই বীজ পুঁতেছিলাম। গাছগুলি প্রথমে ছোট ছোট ছিল। তার পরে, দেখ, এখন কত বড় হয়েছে। এই দেখ, বাবা, ঝিঙ্গে গাছে কেমন ঝিঙ্গে ধরেছে! এই দেখ, ঝিঙ্গের কেমন হল্‌দে হল্‌দে ফুল!" এই বলিয়া উভয় ভ্রাতায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা পুত্রদের আনন্দ দেখিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্ষেত্রনাথ তরকারী-ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে জমীর উর্ব্বরাশক্তি দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইতেছিলেন। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনেক জমী পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিতেছিলেন, এই জমীতে গোলআলু, কপি প্রভৃতি অনায়াসেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে। স্বামীকে কিছু অন্যমনস্ক দেখিয়া, মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ভাব্‌ছ?" ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "আমি ভাব্‌ছি, তোমার গিন্নীপনা; আর ভাব্‌ছি যে যখন অল্প চেষ্টাতেই এখানে এত শাক্‌সব্‌জী জন্মিতে পারে, তখন খানিকটা জমীতে আলু চাষ কর্‌লে হয় না?" মনোরমা হাসিয়া বলিলেন, "আমিও যমুনার মাকে সেই কথা বলেছি।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "তা তো বটে; কিন্তু আলুর চাষ কর্‌তে গেলে, তাতে যে মাঝে মাঝে জল সেচন কর্‌তে হ'বে। জল কোথায়? একটা ইন্দারা কাটাতে না পার্‌লে, দেখ্‌ছি আলুর চাষ হ'বে না।" মনোরমা

বলিলেন, "হবে না কেন? ঐ যে আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ছোট নদীটি রয়েছে; ঐ নদীতে বারমাসই তো অল্প অল্প জল ব'য়ে যায় ব'লে শুনেছি। সেই জল আলুর ক্ষেতে চালাতে পার না?"

ক্ষেত্রনাথ হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। মনোরমা সহসা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নদীর জল রইল কত নীচে, আর তোমার আলুর ক্ষেত্র হ'ল কত উপরে। অত নীচে থেকে উপরে জল উঠ্‌বে কেমন করে?"

মনোরমা সলজ্জমুখে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "কেমন ক'রে উঠ্‌বে, তা আমি অত জানি না। তবে সেদিন বারাণ্ডায় ব'সে ব'সে আমি ভাবছিলাম, যদি ঐ নদীটীর মাঝখানে মাটীর একটা খুব শক্ত বাঁধ দিয়ে দাও, তা হ'লে জল আট্‌কে যাবে এবং উঁচুও হ'বে। আর ঐ নদীর পাশের জায়গাতেই যদি আলুর ক্ষেত কর, তা হ'লে সেখান থেকে সহজেই ক্ষেতে জল আস্‌তে পার্‌বে।"

ক্ষেত্রনাথ সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে মনোরমার মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমাও স্বামীর মুখমণ্ডলে সহসা ভাবান্তর দেখিয়া চমকিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মনোরমা, বাঃ, কি চমৎকার কথাই বলেছ! এ তো চমৎকার বুদ্ধির কথা! তোমার মাথায় ঐরূপ বুদ্ধি কেমন ক'রে এল? আমি তো হাজার বছর ব'সে ব'সে ভাব্‌লেও, এ কথাটি ভেবে উঠ্‌তে পারতাম না। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আশ্বিন মাসে নদীর মাঝখানে একটা বাঁধ দিলে দশদিনেই জল আট্‌কে যাবে। বাঁধের এক কোণে যদি খানিকটা করে জল বেরিয়ে যেতে পায়, তাহ'লে জলের ভারে বাঁধটি ভাঙ্গবে না। বা! চমৎকার কথা! থাম, আমি সব কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখি।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ সেখান হইতে "জোড়ে"র দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। মনোরমা সেখানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গৃহের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ মুনিষগণের সর্দ্দার লখাইয়ের (লক্ষ্মণের) সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বুঝিলেন যে সেই ছোট নদী নন্দা জোড়ের মাঝে অনায়াসে একটী বাঁধ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঁধটি তত সুদৃঢ় হইবে না; বর্ষাকালে জলের স্রোত প্রবল হইলে, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন, "বর্ষার সময়ে বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায়, তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে। এখন সাত আট মাস না ভাঙ্গলেই হল।" লখাই বলিল, "সাত আট মাস ইটো নাই ভাঙ্‌ব্যেক্‌, গলা; গোটা ধরণটাতে ইটো খাড়া থাক্‌ব্যেক্‌; পর বার্‌ষ্যাতে নাই টিক্‌ব্যেক্‌"।* তাহার পর, লখাই কৌতূহলপরবশ হইয়া "গলা"কে জিজ্ঞাসা করিল, জোড়ের মাঝখানে বাঁধ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? তখন ক্ষেত্রনাথ তাহার নিকট নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন "গোলআলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মটরসুঁটি, শাকসব্‌জি, এই-সমস্ত এই জোড়ের ধারের ক্ষেতে আবাদ করবার ইচ্ছে করেছি। ধরণের সময় জল না পেলে তো এই-সমস্ত ফসল হবে না। তাই মনে করেছি, জোড়ের মাঝখানে একটা বাঁধ দিলে জল আট্‌কে যাবে, আর সেই জল ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ফসল বাঁচাবো। কেমন, লখাই, বাঁধ দিলে আটকাবে না?"

লখাই বলিল "খুব আট্‌কাব্যেক হে, খুব আট্‌কাব্যেক্‌। ইটো আচ্ছা বুধের কথা বটে। তোরা পূব্যা বটিস্‌, আচ্ছা ঠাঁওরাইচিস্‌। আর জল পাল্যে আলু, আর উটোর কি নাম বটে?—কবি—হঁ কবিই বটে—ইগুলান্‌ তো ইঠেনে ভারি তেজ বাঁধব্যেক্‌। আমি বরষ বরষ রাঁচি যাই রহি কি ন? আলু কবির কাম আমি সেথাতে করেছিলি।" † এই বলিয়া লখাই ক্ষেত্রনাথকে বলিল, এই ভাদ্রমাসেই আলু কপির বীজ বপন করিতে হয়; দেরী

* গলা (প্রভু) সাত আট মাস ইহা ভাঙ্গিবে না। সমস্ত ধরণের সময় (অর্থাৎ বৎসরের যে সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না সেই সময়ে) ইহা খাড়া থাকিবে; পরন্তু বর্ষার সময় ইহা টিকিবেনা।

† লখাই বলিল "জল খুব আটকাবে। এটি চমৎকার বুদ্ধির কথা। আপনারা পূর্ব্বদেশীয় লোক, বেশ ঠাওর করেছেন। জল পেলে আলু—আর ওর নাম কি,—কপি, হাঁ কপিই বটে, এগুলি তো এই স্থানে সতেজে উৎপন্ন হ'বে। আমি প্রতি বৎসর রাঁচি যাই কি না, সেখানে আমি আলুকপির পাট করেছি।"

করিলে ফসল "নামী" (অর্থাৎ বিলম্বে উৎপন্ন) হইবে। অতএব শীঘ্র বীজসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। পুরুলিয়াতে আলুর বীজ পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে কপি ইত্যাদির বীজ আনাইতে হইবে। সে ও অন্যান্য মুনিষগণ কল্য হইতেই বাঁধ বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। এদিকে, আলু ও কপির ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া ও তাহা উত্তমরূপে কোপাইয়া, মাটী প্রস্তুতও করিতে হইবে।

নন্দা তটিনীর পার্শ্বে প্রায় চারি বিঘা ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। পরদিন প্রভাতে দুই জন মুনিষ তাহাতে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে অন্যান্য মুনিষদের সহিত লখাই সর্দ্দার "শগড়" (শকট) লইয়া পাহাড়ের ধারে গেল, এবং সেখানে শালের মোটা খুঁটি, বাঁশ ও গাছের শক্ত শক্ত মোটা ডাল কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিল। তটিনীর গর্ভ কেবলমাত্র বার চৌদ্দ হাত প্রশস্ত ছিল। লখাই সর্দ্দার তটিনীর গর্ভে পাঁচ হাত অন্তরে দুইটী সারিতে খুঁটি ও বৃক্ষের মোটা ডাল ঘন-সন্নিবিষ্ট করিয়া দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিল, এবং বাঁশের বাতা বা বাকারী দিয়া সেগুলি উত্তমরূপে বাঁধিল। তাহার পর সেই দুই সারির মধ্যে বাঁশের কঞ্চি, বৃক্ষের ছোট ছোট শাখা এবং বড় বড় প্রস্তর ও কঙ্করময় শক্ত মাটী ফেলিতে লাগিল।

ক্ষেত্রনাথ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "লখাই, বাঁশের কঞ্চি আর গাছের ডাল মাঝখানে দিলে ভিতরে ফাঁক থেকে যাবে, আর সেই ফাঁক্ দিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে যাবে। এ রকম করছ কেন ?"

তদুত্তরে লখাই নিজের ভাষায় বলিল, জল যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। বৃক্ষের ডাল ও খুঁটি ঘন ঘন করিয়া প্রোথিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত জল কখনই বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু খানিকটা জল সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাওয়া আবশ্যক, নতুবা বর্ষা না হইলেও, এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। পাহাড় হইতে ঝরণার জল ঝরিয়া সর্ব্বদাই জোড়ে পড়িতেছে। সুতরাং সমস্ত জল রুদ্ধ করা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত বাঁধের এক পার্শ্বে একটি কাটান রাখিতে হইবে। সেই কাটান দিয়াও জল প্রবলবেগে সর্ব্বদা বহির্গত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বাঁধ টিকিবে না।

ক্ষেত্রনাথ কলেজে বিজ্ঞান পড়িয়াছিলেন। তিনি নিরক্ষর লখাইয়ের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ও তাহার কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই বাঁধ প্রস্তুত হইয়া গেল। গ্রামের প্রজারা বাঁধ দেখিয়া চমৎকৃত হইল। বাঁধের এক পার্শ্বে কাটান রাখা হইল। জল সেই কাটান দিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দে অনবরত তটিনী-গর্ভে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিতে ও জল-প্রপাত দেখিতে ক্ষেত্রনাথের পুত্রগণের অতিশয় আনন্দ হইত। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে মনোরমাও কখনও কখনও বাঁধের নিকট উপবিষ্ট হইয়া জলপ্রপাত দেখিতেন ও তাহার গম্ভীর অথচ ভীষণ শব্দ শুনিয়া মনে এক অব্যক্ত ভাব অনুভব করিতেন।

তটিনীর জল বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে তাহার ঊর্দ্ধদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া তটিনী-গর্ভে জল দাঁড়াইয়া গেল। হঠাৎ বৃষ্টি হইয়া তটিনী বেগবতী হইলে কি জানি বাঁধ সহসা ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্য জলবেগ মন্দীভূত করিবার জন্য লখাই এক উপায় অবলম্বন করিল। সে বাঁশ ও কঞ্চির কতকগুলি শক্ত টাটি প্রস্তুত করিল এবং সেগুলি কিঞ্চিৎ দূরে দূরে তটিনীর তীর হইতে তাহার গর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত খুঁটির সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া দিল। এই টাটিগুলির নাম আড়ালি। আড়ালি বাঁধিবার উদ্দেশ্য এই যে, তটিনীর স্রোত প্রবল হইলে, তাহা তদ্দ্বারা প্রতিহত হইয়া মন্দীভূত হইবে এবং বাঁধের উপর কিছুতেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

বল্লভপুর গ্রামের নিকটে কোনও বৃহৎ জলাশয় ছিল না। গ্রামবাসীগণ পার্ব্বতীয় ঝরণা, জোড় ও দোন (দ্রোণ) হইতে জল আনয়ন করিয়া ব্যবহার করিত। এক্ষণে নন্দা জোড়ের জল আবদ্ধ হওয়ায়, সেই আবদ্ধ জলে স্নানাদি করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক

হইল। মধ্যাহ্নে দলে দলে পুরুষ, স্ত্রী, বালকবালিকা নন্দায় স্নান করিতে যাইত। বৈকালে গ্রামের মহিলারা নন্দার জলে কলস পূর্ণ করিয়া সারি বাঁধিয়া মাঠের আলির উপর দিয়া গল্প করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেন। ক্ষেত্রনাথের বাটী গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত থাকায়, সেদিকে গ্রামবাসীগণের তত গতায়াত হইত না, এবং পাহাড় পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান জনশূন্য বোধ হইত। এক্ষণে, নন্দার কল্যাণে এই জনশূন্য স্থান সজন হইল। মনোরমা দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনীদিগকে দেখিতে পাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

নন্দার জল আবদ্ধ হইলে, লখাই সর্দ্দার আলু ও কপি প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড কোদালি দ্বারা কোপাইয়া তাহার মাটী প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে কপি মটর প্রভৃতির বীজ আনিল। এদিকে ক্ষেত্রনাথ আলুর বীজ সংগ্রহের নিমিত্ত স্বয়ং পুরুলিয়া গমন করিলেন, পুরুলিয়ার অঞ্চলের লোকেরা আলুর চাষ করে না। সেই কারণে সেখানে ভাল বীজ পাওয়া গেল না। কেহ কেহ তাঁহাকে তজ্জন্য রাণীগঞ্জে কিম্বা বর্দ্ধমানে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ক্ষেত্রনাথ বীজের জন্য কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষ্টেশনে গাড়ী আসিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই কারণে তিনি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পাদচারণা করিতে করিতে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের বিশ্রামাগার হইতে সাহেবী-পরিচ্ছদ-পরিহিত একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বাহির হইতে দেখিয়া একটু চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষেত্রনাথের মনে হইল, ইঁহাকে যেন তিনি কোথাও দেখিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ স্মৃতি আলোড়ন করিয়া তিনি ইঁহাকে চিনিতে পারিলেন। ক্ষেত্রনাথের মনে হইল, ইঁহার নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সিটি কলেজের বি, এ, ক্লাসে ক্ষেত্রনাথ সতীশের সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিলেন। সতীশ কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইয়া পুরুলিয়ায় আসিয়া থাকিবেন, এইরূপ মনে করিয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন "সতীশ বাবু, আমায় চিন্‌তে পারেন?" সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কে, ক্ষেত্তর না কি? আরে, তোমায় আবার চিন্‌তে পার্‌বো না? তুমি এখানে কি মনে ক'রে? কারুর উপরে নালিশ ফ্যাসাদ কিছু করেছ না কি?" ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "না, নালিশ ফ্যাসাদ্ কিছু নয়। আমি কল্‌কাতা ছেড়ে এখন এই অঞ্চলেই বাস কর্‌ছি। একটু কাজের জন্যে এখানে এসেছিলাম। এখানে কাজটা হ'ল না, তাই রাণীগঞ্জে যাচ্ছি।"

সতীশবাবু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন. "কল্‌কাতা ছেড়ে এ অঞ্চলে এসে বাস করছ! কোথায় হে? আর কি কাজের জন্যে রাণীগঞ্জে যাচ্ছ?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে এই বল্‌ছি যে আমি এখন কল্‌কাতার বাস ছেড়েছি। এই জেলার বল্লভপুরে কিছু জমী জায়গা কিনে এখন সেইখানেই চাষবাস কর্‌ছি।"

সতীশচন্দ্র যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বটে? বটে? ভারি চমৎকার তো! কিসের চাষ আবাদ করছ?"

ক্ষেত্রনাথ সংক্ষেপে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন এবং আলুর বীজসংগ্রহের জন্য যে রাণীগঞ্জে যাইতেছেন, তাহাও খুলিয়া বলিলেন।

সতীশচন্দ্র হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ভারি চমৎকার! ভারি চমৎকার! আলুর বীজের জন্যে রাণীগঞ্জে যাচ্ছ? আরে ভাই, তার জন্যে তোমায় আর রাণীগঞ্জে যেতে হ'বে না। চল, চল, যত বীজ চাই, সব তোমাকে আমি দেবো।"

ক্ষেত্রনাথ কিছু বিস্মিত হইয়া সতীশচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথের বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়া আবার হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আমি কোথায় আলুর বীজ পাব, তাই তুমি ভাব্‌ছ বুঝি? তোমার পরিচয় আমি সব শুন্‌লাম। কিন্তু আমার পরিচয়টা তোমাকে এখনও দিই নাই। তুমি সেই বি-এ পাশ ক'র্‌লে? আমিও বি-এ পাশ্ ক'রে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজের কৃষিশ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'য়ে দুই বৎসর

কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌লাম। তার পর আরও দুই বৎসর নানাস্থানে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কাজ শিখ্‌লাম। শেষে গভর্ণমেণ্ট আমাকে কৃষকদের সর্দ্দার ক'রে ফেল্‌লেন। এখন আমি এই জেলায় কৃষকদের সর্দ্দার হ'য়ে এসেছি। আরে ভাই, এই জেলার চাষা-গুলো এমন হতভাগা যে, তারা না কিছু বোঝে, আর না কিছু কর্‌তে চায়। তারা সেই যে মান্ধাতার আমল থেকে কেবল ধানটির চাষ কর্‌তে শিখেছে, তা ছাড়া আর কিছু জানে না বা শিখ্‌তে চায় না। কত চেষ্টা কর্‌ছি, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এখন তোমার মতন একটা চাষা পেয়ে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। চল, আমার বাসায় চল। আমি তোমাকে একজন পাকা চাষী ক'রে ফেল্‌বো।"

ক্ষেত্রনাথের মনে অতিশয় আনন্দ হইল। সতীশ একটী বন্ধুর প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়াছিলেন। ট্রেন আসিল; কিন্তু বন্ধু আসিলেন না। তাহা দেখিয়া সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিয়া দুই বন্ধুতে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথের পারিবারিক দুরবস্থার ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, এরূপ অবস্থায় তুমি কল্‌কাতার বাস ছেড়ে আর এই অঞ্চলে এসে খুব বুদ্ধি-মানেরই কাজ করেছ। আমি বল্লভপুর কখনও দেখি নাই; কিন্তু তোমার মুখে যেরূপ শুন্‌ছি, তা'তে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, বল্লভপুরের মাটী খুব ভাল। সেখানে শুধু আলু, কপি, মটর, শালগম কেন, অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যও উৎপন্ন কর্‌তে পার্‌বে। তুমি হয়ত জান না যে, এই পুরুলিয়া জেলার অনেক স্থানের মাটী কার্পাস উৎপাদন কর্‌বার পক্ষে একান্ত উপযুক্ত। এই জেলাটি কটন্‌-বেল্ট (cotton belt) অর্থাৎ কার্পাস উৎপাদনযোগ্য ভূমি-মেখলার অন্ত-র্গত। এখানে যে কিছু কিছু কার্পাস না জন্মে, তা নয়। কিন্তু এদেশের লোকে যে কার্পাস উৎপন্ন করে, তা তত ভাল নয়। কার্পাসের তন্তুগুলি সূক্ষ্ম ও লম্বা হ'লে, তার মূল্য বেশী হয়। কিন্তু আমাদের দেশের কার্পাসের তন্তু মোটা ও ছোট। তা হ'তে মিহি সূতা হয় না, কেবল মোটা সূতাই হয়। মোটা সূতায় মোটা কাপড় হয়। কিন্তু তার মূল্য বেশী নয়। এই জন্য বিলাতে এই দেশের কার্পাসের কিছুমাত্র আদর নাই। এদেশ থেকে বিলাতে যে কার্পাস রপ্তানী হয়, তায় কেবল দড়ি, টোয়াইন, গদী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে এদেশে সূক্ষ্ম ও লম্বা তন্তুর কার্পাস উৎপন্ন হ'ত; কিন্তু কালক্রমে যত্নাভাবে কার্পাসের অবনতি ঘটেছে। মিশর ও মার্কিন দেশের কার্পাসই খুব উৎকৃষ্ট। তাদের তন্তুগুলি সূক্ষ্ম ও লম্বা। কাজেই বিলাতে তাদের আদর বেশী। বিলাতের ল্যাঙ্কেশায়র ও ম্যাঞ্চেষ্টারে যে-সকল কাপড় প্রস্তুত হয়, তাদের সূতা মিশর ও মার্কিনের কার্পাস থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। অথচ আমাদের দেশের অনেক স্থলে এমন সুন্দর মাটী আছে যে, চেষ্টা কর্‌লে আমরাও তাতে খুব উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন কর্‌তে পারি। এক দিন এই ভারতবর্ষেরই কার্পাস, সূতা ও কাপড় জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন্ ভারতের কার্পাসের সূতা হ'তেই প্রস্তুত হ'ত। কৃষিকাজটা আজকাল নেহাৎ চাষাদেরই হাতে পড়েছে। তাদের কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভাবে ও যে প্রণালীতে কৃষিকাজ করে গেছে, তারা কেবল তারই অনুসরণ করে। তুমি যদি একটা নূতন প্রণালী তাদের ব'লে দাও, তা তারা কিছুতেই গ্রহণ কর্‌বে না। এই কারণে আজকাল শিক্ষিত কৃষকের নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে; আর এই জন্যই আমি তোমাকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে দেখে এত সুখী হয়েছি। তোমরা অল্পেই সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে, আর কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে। আরে ভাই, কেবল ওকালতী আর কেরাণীগিরি ক'রে কি হ'বে? মাটীই লক্ষ্মী। যার একটু মাটী আছে, তার ভাবনা কি?"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন "আমার ইচ্ছা, তুমি মিশর দেশের কার্পাসের কিছু বীজ নিয়ে গিয়ে তোমার বল্লভপুরে কার্পাসের চাষ কর। এখন বেশী নয়,

কেবলমাত্র এক বিঘা কি দুই বিঘা জমীতে কার্পাস লাগিয়ে দেখ, কি রকম হয়। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌ব, আর যা যা করতে হয়, তা তোমায় বলে দেব। এদেশে যে কার্পাস হয়, তার বীজ প্রায় চৈত্র বৈশাখ মাসে, কিম্বা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বোনে। স্যাঁৎসেঁতে জমীতে ভাল কার্পাস হয় না। ডাঙ্গা জমীই কার্পাস আবাদের পক্ষে ভাল। বেলে, দোআঁশ, এঁটেল, ও নদীতীরের উচ্চ পলিপড়া জমী অর্থাৎ যাতে এখন আর বন্যার জল উঠতে পারে না, এইরূপ জমীই কার্পাস চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ভিজে জমীতে কার্পাস গাছ রুগ্ন ও খর্ব্বাকৃতি হয় ও গাছের পাতা পীতবর্ণ হয়ে কুঁক্‌ড়িয়ে যায়। এরূপ গাছে ফুল ধরে না, ধর্‌লেও তা ঝ'রে পড়ে। এই কারণে উর্ব্বর অথচ ডাঙ্গা জমীই কার্পাস চাষের পক্ষে একান্ত উপযুক্ত। যদি ডাঙ্গা জমী স্বভাবতঃ উর্ব্বর না হয়, তা হ'লে তায় সার দিতে হয়, গোবর, ছাই, পচা পাতা, পচা খড়, পচা কলা-গাছ, নদী ও খালের পলিমাটি, পুকুরের পাঁক, পুরাতন মেটে দেওয়াল ভাঙ্গা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সার। মাটী এঁটেল হ'লে চুন ও ইটের ভাটার পোড়া-মাটী সাররূপে ব্যবহার করা উচিত। এতে মাটী ফাটে না, আর জমী সরস ও উর্ব্বর হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই কার্পাসের জমীতে দুই তিন বার লাঙ্গল দিতে পার্‌লে ভাল হয়। তা'তে জমী উর্ব্বর হয়, এমন কি জমীতে আর সার না দিলেও চলে। বীজ বপন কর্‌বার আগে কার্পাসের জমী মহিষের লাঙ্গলে দুই তিন বার ভাল ক'রে চষে' তার পর সাত আট বার গরুর লাঙ্গলে চষ্‌তে হয়। যেন কোথাও একটীও ঢেলা না থাকে। মই দিয়ে ঢেলাগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌তে হয়। মাটী যখন ধূলার মত হবে, তখন তাতে বীজ বপন কর্‌তে হয়। তুলার মাটী ধূলার মত হওয়া উচিত, এই কথাটি মনে রাখ্‌বে। আমি তোমাকে যে বিদেশী বীজ দেব, তা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেও বোনা চলে। কিন্তু বীজগুলি জমীতে ছড়িয়ে দিও না; তাতে যেখানে-সেখানে গাছ হ'বে। গাছ ঘন হ'লে কার্পাস তুল্‌বার সময় গাছের ডালগুলি ভেঙ্গে যেতে পারে। এই কারণে কার্পাসের বীজ বপনের নিয়ম এইরূপঃ— জমীর পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই ফুট সমান্তরালে নালা কেটে ফেল। যেখানে যেখানে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত নালাগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত নালাসকলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, সেই সেই সংযোগ স্থলে এক একটি বীজ বপন কর। বিদেশী কার্পাসের গাছে জল সেচন কর্‌তে হয়; এই কারণে, নালা কেটে বীজবপন কর্‌তে পার্‌লে জলসেচনেরও পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় আর কার্পাসের ক্ষেতগুলিও দেখ্‌তে খুব সুন্দর হয়।

"আমি অন্যান্য শস্য আবাদ কর্‌বার কথা কিছু না ব'লে কেবল কার্পাস চাষের কথাই যে এত বল্‌ছি তার একটী কারণ আছে। দেখ, ধান, কলাই, গম, যব এদেশে সকলেই আবাদ ক'রে থাকে, আর তুমিও অবশ্য কর্‌বে। কিন্তু কেবল অন্নের যোগাড় হ'লেই তো চল্‌বে না, বস্ত্রেরও যোগাড় চাই। সেই বস্ত্রের যোগাড় কর্‌বার জন্যে আমি তোমাকে এত কথা বল্‌ছি। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক কেবল হুজুক নিয়েই থাকেন। তাঁরা রাজনীতিক আন্দোলন আর ছাই-ভস্ম কত-কি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন। রাজনীতিক আন্দোলনের যে কোনও প্রয়োজন নাই, তা আমি বল্‌ছি না। কিন্তু কেবল রাজনীতিক আন্দোলনেই দেশের উদ্ধার হ'বে না। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মঙ্গল কিসে হ'বে, সে বিষয়ে কেহ বড় একটা চিন্তা করেন না। শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেকেই চাকরী বা ওকালতীর জন্য লালায়িত। যাঁর যতদিন কিছু টাকা না জমে, তিনি ততদিন স্বদেশ-হিতৈষী! তার পর কিছু টাকা জমে গেলেই, বাবাজীর আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। অন্নবস্ত্রের অভাবমোচন না হ'লে লোকের কিছুতেই সুখ ও শান্তি হ'বে না। সেই অন্নবস্ত্রের যোগাড় সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে কত জমী অকৃষ্ট হ'য়ে প'ড়ে আছে, তা কি জান? কিন্তু জমী কর্ষণ কর্‌তে গেলে, অনেক কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়, 'চাষা' হ'তে হয়; তা'তে শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজী ন'ন। যাক্ ও-সব কথা; এখন তোমাকে আমি বল্‌ছি, তুমি কার্পাসের চাষটা ক'রে দেখ। যদি

তোমার জমীতে এ বৎসর ভাল কার্পাস জন্মে, তা হ'লে পরে তুমি বিস্তৃতভাবে কার্পাসের চাষ কর্‌তে পার্‌বে। এতে বিলক্ষণ পয়সাও পাবে। আর তোমার দেখাদেখি অপর চাষারাও কার্পাসের চাষ কর্‌বে। তা হ'লে, আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে ভাল কার্পাস উৎপন্ন হবে। বোম্বাই অঞ্চলে কত সুতার কল ও কাপড়ের কল রয়েছে। আমাদের এই অঞ্চলে যদি ভাল কার্পাস জন্মে, তা হ'লে আমাদের দেশেও কত সুতার ও কাপড়ের কল হবে। বিদেশ হ'তে বিলাতে কার্পাস আমদানী হয়। সেই কার্পাস উচ্চ মূল্যে ক্রয় ক'রে বিলাতের লোকেরা তা হ'তে সুতা প্রস্তুত করেন, আর সেই সুতায় কাপড় বোনেন। সেই কাপড় আবার এদেশে রপ্তানী হয়, আর আমরা তাই না কিনে আমাদের লজ্জা নিবারণ করি। আমরা এমনই অকর্ম্মণ্য জাতি হ'য়ে গেছি! কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এমন অকর্ম্মণ্য ছিলেন না।"

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র আবার নিস্তব্ধ হইলেন। এই দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি যেন একটু ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

পঞ্চশস্য

মৃত্যুর নূতন রূপ (Current Opinion):—

ডাক্তার আলেকসিস কারেল মৃত্যু ঘটনাটাকে একেবারে নূতন ব্যাপার বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। তিনি জীবশরীরের তন্তু বা শরীরাংশ (tissue) লইয়া কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বোতলে জিয়াইয়া রাখিতেছেন; তারপর দরকার মতো তাহা অপর জীব-শরীরে জোড়া লাগাইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিতে পারিতেছেন। যাহাকে আমরা মৃত জীব মনে করি, তাহারও শরীরে মৃত্যুর অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত তন্তুগুলি জীবিত থাকে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন তথা-কথিত মৃত্যুর পরেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও রক্তসঞ্চরণ, ফুসফুসের নিশ্বাস প্রশ্বাস, পাকযন্ত্রের খাদ্য পরিপাক এবং রক্তবিন্দুতে পরিবর্তন প্রভৃতি ক্রিয়া চলিতে থাকে। মৃত্যুর পরেও এক চেতনা ছাড়া, শরীরযন্ত্রের সমস্ত ক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাইতে পারে। এবং মৃত্যুর পরে জীব-শরীরে বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে মৃত জীবের পুনর্জীবন লাভ তিনি অসম্ভব মনে করেন না।

ডাক্তার আলেক্‌সিস কারেল।

ফরাসীদেশে এক ধনী ডিউকের রাত্রি ১০টার সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার এক নাবালক পুত্র, রাত্রি বারোটার সময় আইনের চক্ষে সাবালগ হইবে। দুই ঘণ্টা আগে মরিয়া পিতা পুত্রকে অকূলে ভাসাইয়া যাইতেছেন দেখিয়া ডিউকের উকিলেরা ডিউককে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ডাক্তারদের অনুরোধ করিল। ডাক্তারেরা কারেল-প্রণালীতে ত্বকনিম্নে ঔষধনিষেক (hypodermic injection) করিয়া মৃতের শরীরে উত্তাপ, শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎস্পন্দন ফিরাইয়া আনিয়া সওয়া বারোটা পর্য্যন্ত মৃতকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সাবালগ পুত্রকে বিষয় দেওয়াইল।

বর্ত্তমান লোকপ্রিয় ইংরেজ কবি (Current Opinion) :—

অনেক সমঝদারের মতে ইংলণ্ডে টেনিসনের পর কবি নাম পাইবার যোগ্য তরুণ কবি নোয়েস (Alfred Noyes)। তাঁহার বয়স এই সবে ৩২ বৎসর। ইহারই মধ্যে তিনি ডজনখানেক কবিতার বই প্রকাশ করিয়াছেন। ড্রেক (Drake) নামক মহাকাব্য লোকের কাছে অত্যধিক সমাদৃত; কিন্তু তাঁহার নিজের মতে পদ্যে পরীর গল্পগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। মানব-জীবনের সুখদুঃখের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠ সহৃদয় পরিচয় থাকাতে তাঁহার কাব্য আধুনিক ইংলণ্ডের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের কাছেই সবিশেষ সমাদৃত হইতেছে। তিনি সদানন্দ; তাঁহার যে দুঃখ তাহা গভীর আনন্দেরই রূপান্তর। তাঁহার দুঃখভাবপূর্ণ রচনা প্যানপেনে পানসে নয়, তাহা বলিষ্ঠ ও ভীষণ। তিনি মনে করেন, একদিকে যেমন নরসমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব, অপরদিকে তেমনি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্যও। তিনি জীবনে কখনো রফা করিয়া চলিতে পারেন না। কবিতা তাঁহার জীবনের অঙ্গ নয়, কবিতাই তাঁহার জীবন। বর্ত্তমান যুগ যেমন পরীক্ষামূলক বস্তুতন্ত্র বিজ্ঞানের যুগ; বিগত যুগ যেমন ধর্ম্মোৎ-

আলফ্রেড নোয়েস।

সাহের যুগ ছিল; আগামী যুগ তেমনি কাব্যের যুগ, ভাবের যুগ হইবে—ইহাই তাঁহার ধারণা। জীবনে আধ্যাত্মিক আনন্দ দেওয়াই কবিতার কাজ; বর্ত্তমানের বিরোধী-মত-সংঘাত ও সম্প্রদায়-সংঘাতকে এক শাশ্বত সত্যে সমন্বয় করিয়া তোলাই কবিতার কর্ত্তব্য। বস্তুর মধ্য হইতে চিরন্তন একের আবিষ্কার, এককে জানা বোঝা উপলব্ধি করা কবিতার দ্বারাই সম্ভবপর। শেলির মতো নাস্তিক্যবাদী কবিরাও সেই অস্বীকৃত সত্য একেকেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বের আশ্রয়ভিত্তি-স্বরূপ যে-সামঞ্জস্য যে-একতান নিয়তকাল ধরিয়া তালে তালে বাজিতেছে, যাহার মধ্যে বিশ্বের সকল বেসুর সকল বেতাল ডুবিয়া যাইতেছে, সকল প্রকৃত কবি ও কবিতা তাহারই সহিত আমাদের যোগ সংসাধন করে। অনাদ্যনন্ত নিয়মতন্ত্রী বিশ্ববীণায় যে সুর বাঁধা রহিয়াছে তাহার তাল যাহাতে কাটে তাহা ভগবানের বুকে গিয়াই লাগে। একটি ছোট ময়নাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে বিশ্বেশ্বরের ভ্রূকুটি বিশ্ববীণায় মহাঝঞ্ঝনা বাজাইয়া তুলে। অন্যায়ের অত্যাচারের পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিশ্বেশ্বরের উদাত্ত রোষ প্রচার করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরের মহিমা গাহিবার জন্য মানব-মনে কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। যে এই কবিতার সম্মান রাখিতে না পারে, সে কবি নয়।

এই তরুণ ইংরেজ কবি আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির মধ্যে প্রকৃত কবিতার সন্ধান পাইয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন এই কবিতা পড়িয়া এখন তাঁহার কলম ধরিতে লজ্জা হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপের স্বদেশহিতৈষী উপন্যাসিক

(Current Opinion):—

যোজে রেজাল (Joze Rezal) মালয়-চীন জাতীয় লোক, ফি ফিলিপাইন দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কতকগুলি নভেল লি জগতে যশস্বী হইয়াছিলেন; তাঁহার নভেলগুলি The So Cancer, The Reign of Greed প্রভৃতি নামে ইংরেজি তর্জ্জমা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাঁহার স্বদেশহিতৈষ জন্যই তাঁহার নাম জগতের ইতিহাসে বিশেষ করিয়া স্মর হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যখন স্পেনের অধীন ছিল, ত তাহার দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না; বিজেতা স্পানিয়ার্ডরা ফিলিপি দিগকে তাহাদের স্বদেশের রাষ্ট্রব্যাপারে কিছুমাত্র অধিকার দি চাহিত না। এই অন্যায় অত্যাচার যুবক রেজালের চিত্তে বি
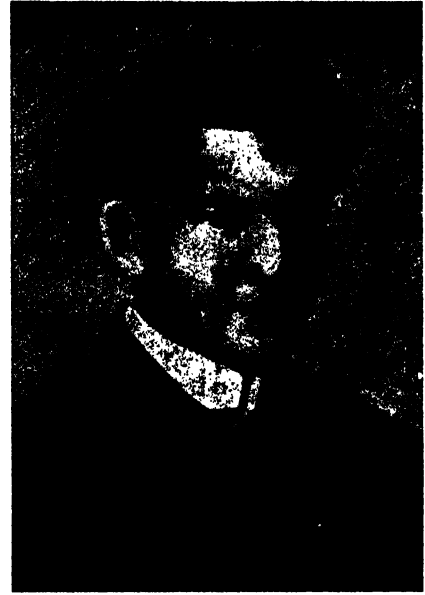
যোজে রেজাল।

ভাবে বাজিয়াছিল। তিনি স্পেন রাজ্যে বার্সিলোনা ও মাদ্রি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়েই তি প্রসিদ্ধ ডন কুইক্সো উপন্যাসের ধরণে স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা প্রকা করিয়া একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন; শেষ করে ফ্রান্সে, প্রকাশ করেন বার্লিনে। এই উপন্যাসখানি প্রকাশ করিতে প্রকাশকের যাহা ব্যয় হইয়াছিল সেই ঋণ কম্পোজিটরের কা করিয়া দিয়া তিনি শোধ করেন। তারপরে বইগুলি চুরি করি ফিলিপাইনে প্রেরণ করেন; সেখানে স্পেন গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ইহা প্রচার বন্ধ ও বই বাজেয়াপ্ত করেন। এবং তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া বিনা বিচারেই হত্যা করা হয়। তখন তাঁহার বয়স ৩ বৎসর মাত্র।

আসলে কিন্তু ইনি রাজদ্রোহী মোটেই ছিলেন না, তিনি

চাহিতেন অন্যায়ের প্রতিকার। রাজপুরুষদিগকে মারধর করা বা তাহাদের নিকট ভিক্ষা করা কোনটাই তিনি দেশের দুর্দ্দশা মোচনের উপায় বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, শিক্ষাই একমাত্র উপায় যাহা দ্বারা মানুষের দাসত্ব মোচন হইতে পারে; আইডিয়ার প্রসার ও প্রচার হইলেই মানুষকে আর কেহ দাবাইয়া রাখিতে পারে না; স্বদেশের মুক্তি দেশের অন্তর হইতেই অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে হইবে, বাহিরের অপুষ্ট অপক্ক রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টার দ্বারা নহে।

এই মতবাদের মধ্যে অন্যায় বা ভয়ের কারণ কিছু না থাকিলেও স্পেন গভর্ণমেণ্ট জ্ঞানের বিস্তারের কথাতেই ভয় পাইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে স্পেনেও ফ্রান্সিস্কো ফেরার লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া স্পেন্ গভর্ণমেণ্ট হত্যা করিয়াছিল; রেজালকেও তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, মারিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—"মৃত্যু আমার কি করিবে? আমি যে বীজ বপন করিয়া গেলাম, তাহার ফলভোগ করিতে অবশিষ্ট রহিল দেশে অনেক লোক!"

ফিলিপাইন দ্বীপ এখন স্বাধীনতাবাদী আমেরিকার অধীন। এখন দেশের লোক মন খুলিয়া নিজেদের দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের সম্মান করিতে পারিতেছে। রেজালের জন্মস্থান ফিলিপিনোদিগের তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার হত্যার দিন তাহাদের জাতীয় উৎসবদিবস হইয়াছে; তাঁহার স্মৃতি সম্মানিত ও সংরক্ষিত হইতেছে।

আমেরিকার আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি (Current Opinion) :—

আমেরিকার আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি জোয়াকিন মিলারকে (Joaquin Miller) লোকে আমেরিকার বাইরন বলিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমেরিকার আধুনিক কালের সাহিত্যক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ ত্রিমূর্ত্তির শেষ মূর্ত্তির তিরোধান হইয়াছে বলিয়া আমেরিকা বিশেষ দুঃখিত; অপর দুই মূর্ত্তি ছিলেন মার্ক টোয়েন এবং ব্রেট হার্ট। অনেকের মতে ওয়াল্ট হুইটম্যানের পর এমন বিশেষত্ব-ও-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কবি আমেরিকায় প্রাদুর্ভূত হন নাই। তাঁহার জীবন ও রচনা সমস্তই কবিত্বময় ছিল।

'জোয়াকিন মিলার' তাঁহার গৃহীত নাম; তাঁহার আসল নাম ছিল সিনসিনেটাস হাইনার। একজন মহিলা তাঁহার রচিত মেক্সিকোর ডাকাত জোয়াকিনের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে বলেন যে, রচনা সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার এই বিদঘুটে নাম লইয়া কবি-খ্যাতি লাভ করা অসম্ভব; তাঁহার নাম অপেক্ষা তাঁহার কাব্য-নায়ক ডাকাতটার নাম ঢের সুশ্রাব্য। সেই দিন হইতে তিনি জোয়াকিনের নাম নিজে গ্রহণ করিলেন।

The Songs of the Sierras তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা; তাহার নামেই তাঁহার পরিচয়। কিন্তু ইহা খ্যাতি ও নিন্দা তুল্যভাবেই লাভ করিয়াছিল। ব্রেট হার্ট উহার এক তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু একটি মহিলার মিনতিতে তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার পত্রিকায় সেই মহিলার লিখিত প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডেও তিনি আমেরিকান বাইরন এবং বুনো বাঘ, দুই প্রকার আখ্যাই পাইয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া ব্রাউনিং, কার্লাইল, রসেটি ভ্রাতৃযুগল, সুইনবার্ণ প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

তিনি বহু আত্মীয় লইয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটা খেয়াল ছিল যে প্রত্যেক লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন এক একটি স্বতন্ত্র বাড়ী থাকা দরকার, কারণ প্রত্যেক লোকেরই জীবনযাত্রায় কিছু-না-কিছু গোপনীয় ব্যাপার আছে। এজন্য তিনি একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির বাসের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতিথি তাঁহার গৃহে সমাদৃত হইত, কিন্তু একসঙ্গে একজনের বেশি তাঁহার গৃহে ঠাঁই পাইত না, কারণ প্রত্যেক অতিথির জন্যই ত স্বতন্ত্র বাড়ী দিতে হইবে। জাপানী কবি য়োনে নোগুচি একদা তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কবি-অতিথির সম্মানের জন্য তিনি একখানি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া অতিথিকে উৎসর্গ করেন। সকল দেশেরই অনেক প্রসিদ্ধ লোক তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিশিষ্ট অতিথির জন্যই নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার জমিদারীময় এইরূপ ছোট ছোট বাড়ী ছড়ানো রহিয়াছে। তাঁহার বাড়ীর পাশে গোলাপের বন করা তাঁহার বিশেষ বাতিক ছিল।

জোয়াকিন মিলার, তাঁহার স্বতন্ত্র গৃহে।

তিনি বই দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি যা সামান্য পড়িয়াছিলেন তাহার মধ্যে বাইরন, বার্ণস্, পো এবং ক্রিষ্টিনা রসেটির লেখা তাঁহার ভালো লাগিত।

তাঁহার অনেক কবিতা আমেরিকার সকলের কণ্ঠস্থ। তাহার মধ্যে Columbus নামক কবিতাটির তুল্য কবিতা আমেরিকার আর কোনো কবি লিখিতে পারেন নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

তাঁহার কবিতা তাঁহার উজ্জ্বল অথচ ক্ষ্যাপা অমার্জ্জিত ভাবের জন্যই বিশেষ সমাদৃত, কোনোরূপ বিশেষ কলাকুশলতার জন্য নহে।

তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য তিনি নিজহাতে একটি চিতা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন যে চিতাভস্ম লইয়া কেহ কিছু করিতে পারিবে না, বাতাসে তাহা বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া যাইবে। চিতার গায়ে তিনি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—অজ্ঞাতের নৈবেদ্য!

শিশুশিক্ষায় স্বাধীনতা (Current Opinion, The Literary Digest, Crisis, etc.) :—

জগতের সকল বিভাগেই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে

শিশুশিক্ষায় স্বাধীনতা।
মারিয়া মন্তসোরি (বাঁ দিকে কালো পোষাকে) তাঁহার শিশু-মন্দিরে স্বাধীন উন্মুক্ত ভাবে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পারা যায় এই চিন্তা সমস্ত সভ্যজগতে জাগিয়া উঠিয়াছে, নানা স্থানে নানা রকম পরীক্ষা চলিতেছে। শিশুকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে পূর্ণমনুষ্যত্বের দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারা সহজ হয় তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ভাবে স্থির না হইলেও ইহা নিঃসংশয় স্থির হইয়াছে যে বর্ত্তমানের নির্দ্দিষ্ট স্কুল-ক্লাশের বাঁধা নিয়মে শিক্ষাদানপ্রণালী মনুষ্যত্ববিকাশের অনুকূল নহে। মানুষের চিত্তবৃত্তি একটা জাতিভেদ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো দুই শিশুই একরূপ প্রকৃতির একরূপ ধাতের হয় না। তা যদি হয়, তবে ৫০।৬০ জন ছেলেকে একটা ঘরে ভরিয়া সকলকে এক রকমের শিক্ষা দিলে কতকগুলি ছেলের কাছে সেরূপ শিক্ষা একেবারেই নিষ্ফল হইবার কথা; সেরূপ ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে 'গাধা' নামে সম্মানিত হইতে হইতে আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া বসিয়া অমানুষ হইয়া উঠিলে তাহার জন্য তাহারা যত তাহার অপেক্ষা মাষ্টার মহাশয়ই অধিক দায়ী।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সংশোধন করিবার জন্য ইহা স্থির হইয়াছে যে শিশুর স্বপ্রকৃতির অনুকূল করিয়া এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যোগ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও প্রণালী; সেখানেও শিশুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। এখন স্বাধীনতা লাভের যুগ আসিয়াছে; জীবনের সকল বিভাগে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগের সুবিধা না থাকিলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে না। এজন্য সম্প্রতি মন্তসোরি নাম্নী একজন ইটালিয়ান মহিলা স্বাধীনতার মধ্যে শিশুর শিক্ষালাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; যদিও তাহাকে প্রণালী বলা যায় না, তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহাকে মন্তসোরি-শিক্ষাপ্রণালী বলা হয়।

মারিয়া মন্তসোরি স্বাধীনতার মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তির শক্তির চরম সীমা পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রোমে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; তাহার নাম 'কাজা দে বাঁবিনি' বা শিশু-মন্দির। এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শিশুর ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া; অথচ স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়;—শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার ভিতর দিয়া শৃঙ্খলা। সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষার বিষয় ও প্রণালীই বাঁধা থাকে; যে-কোনো শিশুকে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহাকেই সেই বাঁধা-বন্ধনে জড়াইয়া ফেলা হয়। আর মন্তসোরি-প্রণালীতে প্রথমে শিশুকে প্রমুক্ত ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার প্রকৃতির অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শিশু বাধাবন্ধহীন স্বাধীন ক্ষেত্রে ছাড়া পাইয়া সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলে, তখন তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা কঠিন ব্যাপার হয় না। হয় ত কতকগুলি শিশুকে একসঙ্গে একটা ঘর ঝাঁট দিতে বলা হয়; তাহাদের ঝাঁটা ধরার কায়দা, ঝাঁট দিবার ভঙ্গি, দ্রুত বা ধীরেসুস্থে কাজ করার প্রবণতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে চিনিয়া রাখেন এবং তাহার প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে থাকেন। প্রথমে শিশুর পরিবেষ্টনের সহিত তাহাকে অল্পে অল্পে পরিচিত করিয়া তুলিয়া তাহার অনুভব-ক্ষমতা সুতীক্ষ্ণ করিয়া তোলা হয়; তাহাতে চলায় ফেরায় সে সতর্ক হইতে শিখে, কোথাও ধাক্কা খায় না, হোঁচট লাগে না, যাহা লইয়া খেলা করে বা কাজ করে তাহা বেশ বাগাইয়া ধরিয়া নিপুণভাবে চালনা করিতে শিখে। ইহার ফলে তাহার দেহ পীড়িত ও চিত্ত বিরক্ত হইবার অবকাশ পায় না। ক্রমশঃ শিশু নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষা নিয়মে সুখ আছে স্বস্তি আছে—যাহা করিতে চাওয়া যায় নিয়মে করিলে তাহা সুন্দর হয়, শীঘ্র হয়। ইহা হইতে ক্রমে তাহার বুদ্ধি অনুশীলিত হয়; সে কাজ সত্বর ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য ফিকির উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে; সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকে।

গল্প মনে পড়িল ; সেদিন পড়িতেছিলাম যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন শিশু ছিলেন তখন হইতেই তাঁহাকে এমন করিয়া সামলাইয়া রাখা হইত যে ইংলণ্ডের ভাবী রাণীর পক্ষে অশোভন হয় এমন কোনো কাজ তিনি করিয়া না ফেলেন। একবার তিনি কোনো আত্মীয়ার বাড়ী বেড়াইতে যান ; সেদিন তাঁহার জন্মদিন ; আত্মীয়াটি বলিলেন, আজ তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, তোমার কি চাই বল। বালিকা ভিক্টোরিয়া বলিলেন, দাসীদের মতন জানালা সাফ করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হয়, তিনি আজ জানালা সাফ করিবেন। তখনি বালতিভরা জল, চুন, স্পঞ্জ আসিল ; ইংলণ্ডের ভাবী রাণীর বালিকা-প্রকৃতি আজ ছাড়া পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মন্তসোরি-শিক্ষকদের শিক্ষার ক্ষেত্র।
শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীর কার্য্যরীতি দেখিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই সমস্তই নিয়ম বটে, কিন্তু এ নিয়মে মানুষকে জড়ভরত করিয়া পুতুল বা দাস করিয়া তোলে না। এই নিয়মে মানুষ আত্ম-সংযমী, আত্মনিষ্ঠ এবং কর্ম্মকালে কার্য্যনিয়মনে সক্ষম হয়। এই বিদ্যালয়ের নিয়ম শুধু বিদ্যালয়টিতেই খাটে এমন নহে, তাহা বিশ্বসমাজের নিয়ম। শিশুর যে স্বাধীনতা অপরের ক্ষতি বা পীড়ার কারণ হইতে পারে সে স্বাধীনতায় বাধা দিয়া শিশুকে তাহার অপকারিতা বুঝাইয়া তাহার কর্ম্মচেষ্টা মঙ্গলের পথে ফিরাইয়া দেওয়া হয় ; ইহাতে তাহারা সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা করে। শিশুর প্রত্যেক কার্য্যই তাহার অন্তরপ্রকৃতির প্রকাশ বলিয়া দুষ্টামি মনে করিয়া কিছুই অবহেলা বা অকারণে নিবারণ করা হয় না।

এজন্য শিক্ষকের ধৈর্য্য, অনুসন্ধিৎসা, পর্য্যবেক্ষণপটুতা, প্রভৃতি গুণ অত্যাবশ্যক। সাধারণ শিক্ষকেরা শিশুর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেই উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠেন "এই ছোঁড়া, চুপ করে' বোস।" তিনি ভাবিয়া দেখেন না যে শিশুর সেই চাঞ্চল্য কি প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কোনো শিশু হয়ত সর্দ্দার হইয়া অনেকগুলি ছেলে মেয়ে জড়ো করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া একটা বিষম কাণ্ড করিতেছে ; তাহা মাষ্টার মহাশয়ের অসহ্য। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে হয় ত দেখা যাইবে যে শিশু নিজেই হয় ত মাষ্টার মশায় হইয়া ছাত্রদের প্রতি তর্জ্জনগর্জ্জন অভ্যাস করিতেছে বা আর কিছুরও অভিনয় করিতেছে। যথার্থ শিক্ষক শিশুর এই অনুকরণশক্তিকে কাজে লাগাইয়া দ্যান, আর সাধারণ শিক্ষকেরা তাহাকে বকিয়া ধমকাইয়া তাহাকে ভালো মানুষ গো-বেচারা করিয়া তোলেন ; তাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো কার্য্য করার বালাই তাহাকে আর পোহাইতে হয় না, অলস জড় নির্জীব রকমে জীবন-টাকে ফুঁকিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটা

মন্তসোরির শিশু-মন্দিরে রুদ্ধ ঘরে ক্লাশ নাই ; ধরাবাঁধা সময় নাই ; বেঞ্চি ডেস্কের গোলকধাঁদা নাই। ছোট ছোট চেয়ার আছে, যার যেখানে খুসি টানিয়া লইয়া বসিয়া যায়, যার খুসি সে মাটিতে বসে, শোয়, গড়াগড়ি দেয়। শিক্ষকেরাও ছাত্র-ছাত্রীর পাশে মাটিতে বসিতে দ্বিধা বোধ করেন না ; যখন যার যাহা খুসি তাহা শিখে। কিন্তু শিক্ষকেরা শিক্ষা ব্যাপারটাকে এমনই হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলেন যে শিশুরা ডাকের অপেক্ষা না করিয়া আপনিই শিক্ষকের চারিদিকে আসিয়া জুটে।

শিক্ষাদানও মন্তসোরির নিজের উদ্ভাবিত বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে হয়। কার্ড, সাটিন ও শিরিশ কাগজ দিয়া বিবিধ আকার গঠন করা হয় ; তাহার উপর হাত বুলাইয়া দাগা বুলাইয়া শিশু আকারের জ্ঞান লাভ করে। বড় শিশুরা রঙের খেলা করিয়া রং চেনে ; দড়ি ফিতায় ফাঁশ গেরো বাঁধিতে শিখে। তদপেক্ষাও বড় শিশুরা জ্যামিতিক আকার গঠন করিতে শিখে। শিক্ষাদানের সময় দৃষ্টি রাখা হয় যাহাতে শিশুর বোধশক্তি ও নিজে বুঝিয়া কাজ করিবার শক্তি অনুশীলিত হয়।

যাহা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা সহজভাবে শিশুর সম্মুখে ধরিতে পারাই শিক্ষকের নিপুণতা। শিশু-মন্দিরের শিক্ষক শিশুর খেলার সাথীর মতো তাহার পাশে বসিয়া বেশ স্পষ্ট জোর দিয়া শিশুটির নাম ধরিয়া ডাকেন ; সে ডাক এমন স্পষ্ট যে তাহা যে কেবল মাত্র শিশুর ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে তা নয়, তাহার ইন্দ্রিয়ের অধিপতি অন্তরাত্মাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করে ; তখন শিশু আর অমনোযোগী থাকিতে পারে না। তখন সে সাটিনের স্পর্শ ও শিরিশ কাগজের স্পর্শের তারতম্য হইতে মসৃণ ও কর্কশ অনুভব করিতে শিখে, সোজা বাঁকার জ্ঞান লাভ করে। তারপর রঙের পরিচয় হয় ; সে রকম রং সে আগেও কত দেখিয়াছে, এখন তাহার নাম জানিয়া সে প্রীত হয়, রঙের স্বরূপটি তাহার মনে গাঁথিয়া যায়। যতক্ষণ শিশু কোনো জিনিষ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারে ততক্ষণ সে নিবিষ্টমনে সেই জিনিষটিকেই নিরীক্ষণ করে ; শিক্ষক ততক্ষণ চুপ করিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। বুঝিতে পারিলেই বা আরো কিছু জানিতে চাহিলেই শিশু মুখ তুলিয়া

শিক্ষকের দিকে চাহে, তখন শিক্ষক পুনরায় নূতন বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শিশুরা হলদে আর লাল রং খুব ভালো বাসে দেখা যায়।

শিশু-মন্দিরের শিশুরা শিক্ষকদিগের দেখাদেখি কোনো কাজ করিতে চেষ্টা করিলে 'যাও যাও, তোমার আর গিন্নেমো পাকামো করতে হবে না' বলিয়া তাহাকে দমাইয়া দিয়া নিরস্ত করা হয় না। কাজ করিতে পারা, বড় লোকের কাজে লাগা শিশুদের প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এবং নিজে কিছু কিছু করিতে পারিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করে। শিশুমন্দিরে একবার কতকগুলি খেলনা দেখানো হইতেছিল; ছেলেমেয়েরা এমন ভিড় করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে একটি আড়াই বৎসরের কন্যা কিছুতেই দেখিতে পাইতেছিল না; কাঁধের উপর দিয়া, পায়ের ফাঁক দিয়া, কোনো রকমেই দেখার জুত করিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল; তারপর হঠাৎ তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে একখানা চেয়ার টানিতে লাগিল। তাহাতে একজন শিক্ষয়িত্রীর নজর তাহার দিকে পড়িতেই তিনি 'আহা বাছারে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না' বলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। খেলনা দেখিয়া শিশু সুখী হইল বটে কিন্তু নিজের উদ্ভাবন কাজে খাটাইতে না পারিয়া তাহার উৎসাহ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় বাধা পাইলে অনেক শিশু বিদ্রোহী হইয়া উঠে; কারণ স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব শিশুদের মধ্যে এত তীক্ষ্ণ যে তাহারা বাধা সহ্য করিতে পারে না। এই বিদ্রোহী ভাবকে আমরা নাম দিয়াছি দুষ্টামি। দুষ্ট ছেলের দুষ্টামি মানে তাহার বাধিত ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। সুতরাং দুষ্টামি বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য বা দমন করিবার বিষয় নহে।

মন্তসোরি-প্রণালীতে ৪।৫ বৎসরের ছেলেমেয়েরা এমন চমৎকার লিখিতে আঁকিতে শেখে যে সাধারণ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা তেমন পারে না। মন্তসোরি স্বয়ং ইহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পিতলের নানাবিধ আকারের পাত টেবিলের উপর রাখিয়া রঙিন পেন্সিল দিয়া ছেলেরা কিনারে কিনারে বুলাইয়া টেবিলে বা কাগজের উপর দাগ টানিতে শিখে; পিতলের পাত তুলিয়া লইলে দেখে বিচিত্র আকার অঙ্কিত হইয়া গেছে। সেই সমস্ত রেখাবদ্ধ চিত্রের মধ্যস্থল তাহারা রঙিন পেন্সিল ঘসিয়া রঙে ভরিয়া তুলে; ইহাতে সে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক, পাতিত রেখা টানিতে শিখে; রঙের সামঞ্জস্য বিধান করিতে শিখে; এবং নিজেকে রেখার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়া মনোযোগ দিতে ও হস্তচালনায় পটুতা শিক্ষা করে। ক্রমে ক্রমে সে অক্ষর রচনা করিতে আপনিই পারে। তারপর হয়ত খেলার ছলে অক্ষরপরম্পরা সাজাইয়া যায়, এবং অকস্মাৎ কোনো একটা শব্দ বা বাক্য লিখিয়া ফেলিয়া যখন সে জানিতে পারে যে ইহাকেই বলে লেখা এবং সে তাহার জানা একটা জিনিসের নাম লিখিয়াছে, তখন সে বুঝিতে পারে যে লিখিয়া কেমন করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। ইহা জানিয়া তাহার আর আনন্দের অবধি থাকে না। এইরূপে ক্রমে সে জ্যামিতি প্রভৃতিও শিখিতে আরম্ভ করে।

মন্তসোরি স্বকীয় উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দিতেছেন।

এই শিক্ষার প্রত্যেক শিশুকে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধক শিক্ষা। এই জন্য এই শিক্ষাপ্রণালী য়ুরোপ আমেরিকায় ব্যাপ্ত ও সমাদৃত হইয়াছে; ক্রমশঃ এসিয়া ও আফ্রিকাতেও পরিচিত হইতেছে।

চাহনির ভাষা (The Literary Digest):—

জার্ম্মান ডাক্তার পল কোহন বলেন যে মানুষের চোখের চাহনি দেখিয়াই তাহার মনের অবস্থা ও চরিত্র উপলব্ধি করা যাইতে পারে, চোখে শরীরের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যেরও ছায়াপাত ধরিতে পারা যায়। তাঁহার মতে চিত্রের চক্ষু দেখিয়াও চিত্রকরকে চিনিতে পারা সহজ, কারণ চিত্রকর চিত্রের চোখে নিজেরই অন্তর-ভাব প্রকটিত করিয়া তোলেন। তিনি দু ডজন চোখের নমুনা দিয়া এইরূপ নমুনা সংগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন; তাহাতে লোকচরিত্র-জ্ঞান, চিকিৎসা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনেক সুবিধা হওয়ার কথা।

১ হইতে ৭ নম্বর চোখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চোখ; তাহাতে বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত দেখা যায়। ১ নম্বরে আনন্দ; ২ নম্বরে বিষাদ; ৩ নম্বরে বিরক্তি; ৪ নম্বরে ভয়; ৫ নম্বরে অবিশ্বাস; ৬ নম্বরে ধূর্ত্ততা; ৭ নম্বরে সশঙ্ক অবিশ্বাস; ৮ ও ৯ নম্বর পাগলের চোখ; ১০ নম্বর মূত্ররোগের পরিচায়ক। ১১ নম্বর চোখ গ্যয়টের; ১২ নম্বর ভল্টেয়ারের; ১৩ নম্বর বিসমার্কের; ১৪ নম্বর জার্ম্মান সম্রাটের; ১৫ নম্বর কোনো একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের; ১৬, ১৭, ১৮ নম্বর র‍্যাফেলের চিত্রের চোখ; ১৯ নম্বর বত্তিচেলির চিত্রের;

২০ নম্বর গিদো রেনির চিত্রের; ২১ নম্বর হলবেইনের চিত্র হইতে গৃহীত; ২২ নম্বর রুবেন্সের চিত্র হইতে; ২৩ নম্বর এইষ্টারম্যানের চিত্র হইতে; ২৪ নম্বর মুরিলোর চিত্র হইতে সংগৃহীত।

পেক্‌জ্‌লী নামক একজন আমেরিকাবাসী চোখের চাহনি হইতে বিবিধ রোগ ও বিষক্রিয়া ধরিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া চক্ষুতারকা ও রোগের সম্পর্ক সূচক একটি নক্সা তৈয়ারি করিয়াছেন। পাকযন্ত্রের কোন পীড়া হইলেই চক্ষুতারকার অব্যবহিত চতুর্দ্দিকে তাহার বিকৃতি-লক্ষণ ধরা পড়ে; তাহার পরেই স্নায়ুক্ষেত্র; অন্যান্য শরীরাংশ চক্ষুর অপরাপর অংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; এবং কোনো রোগ বা ডাহিন চোখে ও কোনোটা বা বাঁ চোখে তাহার প্রভাব বিস্তার করে।

এই আবিষ্কারের সূত্রপাতটি ভারি কৌতুকাবহ। পেক্‌জ্‌লী যখন বালক তখন একদিন বাগানে একটা পেঁচা ধরিতে চেষ্টা করেন; পেঁচাটা ধরা পড়িয়া তাঁহাকে এমন খামচাইয়া ধরে যে পেঁচার পা ভাঙিয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি পান। এই সময় বালক ও পেচক চোখোচোখি করিয়া চাহিয়া ছিল; বালক দেখিল যে পেঁচার পা ভাঙিবার সময় চোখের নীচের দিক হইতে একটা কালো রেখা বিস্তৃত হইয়া চক্ষুতারকা স্পর্শ করিল। সেই পেঁচাটার ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করিয়া তাহার বেদনা সারিয়া গেল কিন্তু পাখানি ভাঙিয়াই রহিল। পেক্‌জ্‌লী দেখিলেন যে পেঁচার চোখের কালো দাগটি সারিয়া গিয়া তাহার স্থানে শাদা আঁকাবাঁকা রেখা পড়িয়াছে। ইহা হইতে বালকের মনে লাগিল যে বেদনার সহিত কালো দাগের এবং ভাঙা পায়ের সহিত বাঁকা রেখার নিশ্চয়ই কোনো সম্পর্ক আছে। তাহার পর সুদীর্ঘকালের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ হইতে তিনি চক্ষু হইতে রোগ নির্ণয়ের নক্সা তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। (৩৪০ পৃষ্ঠা)।

চাহনির ভাষা।

ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সমস্যা (Chicago Tribune) :—

গত উদার-ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের মহাসভায় এই সঙ্কল্পটি স্বীকৃত হইয়াছিল—'জাতি-সংঘাতের সকলবিধ কারণ দূর করিয়া যাহাতে জাতির সহিত জাতির সখ্য ও শান্তি-সম্পর্ক বর্দ্ধিত হয় তাহার জন্য আমরা সকলকে যথাসাধ্য ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি। সকল জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা বলিষ্ঠ জাতিকে দুর্ব্বল জাতির সহিত ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য করা; এবং কৃষ্ণকায়দিগের বিলম্বিত উন্নতিচেষ্টার পোষণ ও পালনের জন্য বিশেষ সহমর্ম্মিতা ও সদাশয়তার সহিত ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার করা;—আমাদের মতে জাতি-সংঘাত নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির হইয়াছে।'

বাস্তবিক সর্ব্বক্ষেত্রে শ্বেতকায়দিগকে বিজেতা ও প্রধান দেখিয়া কৃষ্ণকায়েরা মনে করে যে তাহারা বুঝি স্বভাবতই দুর্ব্বল, শ্বেতাঙ্গদের বলি হইবার জন্যই জগতে জন্মিয়াছে। নিজের জাতির শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে এরূপ নিরুদাম অবিশ্বাস দূর করিবার উপায় স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়—

১ম। জনসাধারণের মধ্যে কোনো বিশেষ শ্রেণীকে অনুগ্রহ না দেখাইয়া সর্ব্বসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা সম্পাদন।

২য়। জাতি বা বর্ণগত যে-সমস্ত কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহা বিরোধ ও বিদ্বেষ বাঁচাইয়া দূর করিয়া ফেলা। কোনো জাতি বা বর্ণ কোনো জাতি বা বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; যাহারা নিকৃষ্ট হইয়া আছে তাহারা নিজেদের গুণের উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিলেই শ্রেষ্ঠের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠতর হইতে পারিবে, কিন্তু বিরোধ বা বিদ্বেষ দ্বারা অপরকে আঘাত করিয়া বা নীচে নামাইয়া

KEY TO DIAGNOSIS FROM THE EYE.
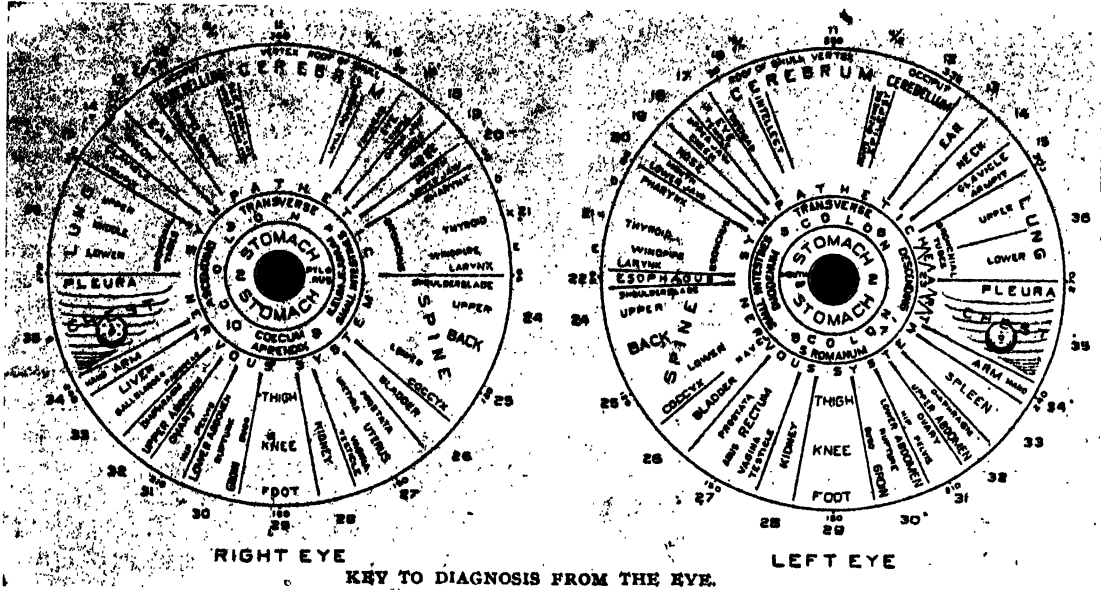
চক্ষু হইতে রোগ নির্ণয়ের নক্সা।

নিজে প্রতিষ্ঠা পাইবার বা বড় হইবার চেষ্টায় কাহারো মঙ্গল নাই।

৩য়। স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ ও বিদেশীর দ্বারা তাহা অধিকৃত হওয়া নিবারণ।

৪র্থ। জনসাধারণকে এমন ভাবে শিক্ষিত ও গঠিত করিয়া তোলা যে তাহারা নিজের কাজ নিজেরাই করিতে সমর্থ হয় এবং স্বদেশের সেবা, সংরক্ষণ ও শাসনের ভার নিজেরাই গ্রহণ ও বহন করিতে পারে।

৫ম। উপযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং তাহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা।

৬ষ্ঠ। জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রতা-বোধ জাগ্রত করিয়া তাহাদের সংহত শক্তি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করা।

এই-সমস্ত উপায় কর্ম্মে সফল করিয়া তুলিতে পারিলেই সকল ভয় দূর হইয়া যাইবে।

তুর্কীর পরাজয়ের কারণ (The Literary Digest)

কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদপত্রে আলোচনা হইতেছে যে তুর্কী যে-সমস্ত রাজ্য এককালে জয় করিয়াছিল তাহারাই বা বলে বীর্য্যে ধনে জনে এত প্রবল হইয়া উঠিল কেমন করিয়া আর বিজেতা তুর্কীরই বা এমন হীন দশা হইল কেন? কত লোকে কত কি কারণ দর্শাইতেছে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে দোষ দিতে সাহস করিতেছে না। একখানি আর্মেনিয়ান কাগজে কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে যে, 'তাতার বা তুর্ক, পারসী বা তুর্কমান, মিশরী বা আরব, যে-কেহ আমরা আমাদের পূর্ব্ব বলবীর্য্য হারাইয়া পরপদদলিত হইতেছি সে সকলের অধোগতির কারণ ইসলাম-ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মুসলমান বিজেতারা নিজেদেরকে এত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ মনে করে যে তাহারা বিজিত দেশে চিরকাল বিদেশীই থাকিয়া যায়, দেশের সঙ্গে কোথাও তাহার যোগ হয় না; কাজেই দেশের লোক স্বতঃস্ফূর্ত্ত-ভাবে যে-সমস্ত উন্নতি ফলাইয়া তোলে তাহার সুবিধা তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই জোটে না। রুষ, মাগিয়ার, ফিন প্রভৃতি অনেকেই তুর্কীর ন্যায় এশিয়ার উপনিবেশী, কিন্তু উহারা এখন পুরাদস্তুর য়ুরোপীয় হইয়াছে; আর তুর্কী যে-কে-সেই আছে। পাশ্চাত্য জাতি শাস্ত্র বা প্রাচীনতার দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া না থাকিয়া স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধিমূলক চেষ্টায় যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, মুসলমান তুর্কী আপনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতের গর্ব্বে নিশ্চিন্ত থাকিয়া তাহার ভাগ পাইতে বঞ্চিত হইয়াছে। 'কেতাবে লেখা আছে' বলিয়া তাহারা অসত্যকেও সত্য বলিয়া আঁকড়িয়া আছে, এবং 'শাস্ত্রে ত লেখে না' বলিয়া তাহারা প্রত্যক্ষ সত্যকেও আমল দিতে চাহে না। কোরান মুসলমান মাত্রেরই কাছে চিরন্তন কালের উপযোগী সত্য বাণী; আর বাইবেল অধিকাংশ খ্রীষ্টানেরই কাছে সেকেলে বাতিল পুঁথি, এবং যাহা কিছু চিরন্তন সত্য তাহাতে আছে তাহা এক বাইবেলেই আবদ্ধ হইয়া নাই, তাহা মানব-মনের স্বাধীন-চিন্তার প্রকাশ, দেশে দেশে কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শাস্ত্রের মুখ চাহিয়া একজনের এই অধঃপতন, এবং স্বাধীন যুক্তির অনুসরণ করিয়া অপরের এই অভ্যুদয়। ১৮৭৭ সালের পরাজয়ের পর মার্শাল আহম্মদ আলি পাশা যখন রাজসভায় বলিয়াছিলেন যে, "তুর্কী আর য়ুরোপে তিষ্ঠিতে পারিবে না। সে তল্পিতাল্পা গুটাইয়া এশিয়ায় গিয়া সময় থাকিতে নূতন ঘরকন্নায় মন দিলে বরং ভালো হয়।" তখন সকলে তাঁহাকে পাগল ঠাওরাইয়াছিল; লোকে মনে করিয়াছিল তিনি জার্ম্মানীর স্থায়ী অধিবাসী হইয়া তুর্কীত্ব

হারাইয়া অমন কথা বলিতেছেন, নহিলে তুর্কীর পরাজয়ের কথা কোন মুসলমান কি মুখে আনিতে পারেন! শাস্ত্রছাড়া কথা বলা শুধু কাফেরেরই সাজে!

যাহাই হউক সাধারণ তুর্কীরা শাস্ত্রমত এখন অভ্রান্ত বলিয়া মানুক আর না মানুক, সকলেই স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবরক্ষার উপায় ভাবিতেছে। 'ইক্‌দম্‌' নামক তুর্কী সংবাদপত্র দেশবাসীর মধ্যে যথার্থ কর্ম্মতৎপর স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য জাতির গর্ব্ব, কর্ম্মে প্রীতি, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং খ্রীষ্টান প্রতিবাসীর সমকক্ষতার চেষ্টা অবলম্বন করিতে বলিতেছে। "তুর্কী যে শিল্প বাণিজ্যে অপটু ও হীন তাহার কারণ তাহার জাতীয়তার অভাব। নিকোলা একজন গ্রীক মুচি, তাহার তৈরি জুতা আমির ওমরাহ হইতে আলি বলি রামা শামা সবাই আদর করিয়া পরে; কাজেই সে উপার্জ্জন করে বিস্তর; আর উপার্জ্জন হইতে কিছু স্কুলে, কিছু মন্দিরে, কিছু হাসপাতাল প্রভৃতি আতুর-সেবায় দান করিতেও পারে; উদ্বৃত্ত যাহা থাকে তাহাতে সে ছেলেমেয়েকে ভালো করিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া স্কুলে পড়ায়, নিজের আর গিন্নির ঘরকন্নাও বেশ স্বচ্ছন্দে চালায়। আর বকির একজন তুর্কী মুচি, তাহার তৈরি জুতা কেবল আলি বলি রামা শামার শ্রীচরণ বুকে করিয়াই কৃতার্থ, দেশের মাথা যাঁহারা তাঁহাদের চরণগুলো বকিরের জুতার মাথায় কস্মিন কালেও পড়ে না। সুতরাং তাহার যাহা উপার্জ্জন তাহাতে তাহার দুবেলার অন্নই জোটে না; তাহার পরণে কানি, স্ত্রীর পরণে টেনা, তাহার ছেলেমেয়েরা আকাট মূর্খ, কুঁড়ে ঘরে কেবল ইঁদুরের উঠুনি। এই যে নিকোলা আর বকির, এদের তারতম্য এদের সমগ্র জাতি পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে। বকিরের জা'ত ক্রমে ক্রমে বকির হইয়া দাঁড়ায় এবং নিকোলার জা'ত নিকোলা হইয়া উঠে। দেশের শিল্পীর দারিদ্র্য মানে সমস্ত দেশের দারিদ্র্য। গরিব বকিরেরা খাজনা দিতে পারে না, আমির ওমরাহের ভাণ্ডার শূন্য থাকে, তাহারাও ক্রমে দুর্দ্দশার পথে আসিয়া দাঁড়ায়। আমার স্বদেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্য, বাণিজ্য ও শিল্পের অনুন্নতি, সমস্তই আমার স্বদেশীয়ের জাতীয়তা-বোধ ও উচ্চাভিলাসের অভাবের ফলে। স্বদেশী ভাব যদি তীক্ষ্ণ উগ্র না হয় তবে স্বদেশীয়ের ভাগ্যে দাসত্বের লাথি ঝাঁটা লাঞ্ছনা তোলা আছে—এ ত জানা কথা! যাহারা স্বদেশকে প্রাণমন দিয়া না ভালবাসে তাহারা কখনো অপর স্বদেশপ্রাণ জাতির সমকক্ষ হইবার কল্পনাও করিতে পারে না। দেশে যৌথ কারবারের চেষ্টা বিফল হইয়াছে; এক এক জনের বাণিজ্য চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে; কিন্তু দেশের লোককে তাহার জন্য বিকল বা ব্যস্ত হইতে দেখা যায় নাই। আমরা সকল তাতেই এমনি উদাসীন। বিদেশী জিনিসের চটকদার মোহ যতদিন আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে, স্বদেশী জিনিসের যতদিন না সমাদর ও সম্মান শিখিব, যতদিন আমরা স্বদেশকে সকল দেশের সেরা বলিয়া মানিতে না পারিব, ততদিন দিনে শতেক বার করিয়া মৃত্যু আমাদের ভাগ্যে অবধারিত!"

চারু।

"নব স্বাধীনতা" ("The New Freedom"; by Woodrow Wilson. Chapman & Hall):—

মার্কিন যুক্তরাজ্যের দেশনায়ক শ্রীযুক্ত উড্রো উইলসন মহাশয় সভাপতি-নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের সময় যে সমুদয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলি "The New Freedom" বা "নব স্বাধীনতা" নাম লইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বক্তৃতাবলীর মধ্যে যে একটি মহান্‌ আদর্শ ও সুবিন্যস্ত ভাবের ঐক্য বিদ্যমান তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুধাবনের যোগ্য। তাহাতে কোনরূপ দলাদলি বা গালাগালির নাম গন্ধ নাই, প্রতিপক্ষের প্রতি নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব-সুলভ কোনরূপ বিদ্রূপ, ব্যঙ্গোক্তি বা অভদ্রোচিত ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই; আছে শুধু দেশের রাজনৈতিক কলুষ কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও সে-সমস্ত দূর করিবার উপায়-নির্দ্দেশ।

অনেকেই জানেন যে আমেরিকার বড় বড় ক্রোড়পতি ব্যবসাদারগণ নিজেদের মধ্যে "ট্রাষ্ট" বা "করপোরেশন" গঠন করিয়া দেশের অন্যান্য ছোট বড় ব্যবসাগুলির ধ্বংসসাধন করিতেছেন। ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নষ্ট করিয়া আপনাদের একনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য তাঁহারা চারগুণ পাঁচগুণ অধিক দরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি ক্রয় করিয়া নিজেরা ইচ্ছামত মূল্যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন, অতি সামান্য পারিশ্রমিকে কারখানায় শ্রমজীবী খাটাইতেছেন। যদি কোন ব্যবসায় কোম্পানী বা ব্যবসাদার অধিক মূল্যেও "ট্রাষ্টের" নিকট তাঁহাদের ব্যবসায় বিক্রয় করিতে রাজী না হন তাহা হইলে "ট্রাষ্টের" কর্ত্তারা, সেই কোম্পানী বা ব্যবসাদার যাহাতে ইচ্ছামত দেশে ও বিদেশে মাল সরবরাহ করিতে না পারেন সেই জন্য রেলওয়েগুলি পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়া লন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যবহনের বিনিময়ে অসম্ভব রকম মাশুল লইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করেন! "ট্রাষ্টগুলি" এইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নষ্ট করিয়া আমেরিকার ব্যবসাবাণিজ্যের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। "ট্রাষ্টের" কর্ত্তাদের মার্কিনদেশে "বস্‌" (Boss) বলে। এই "বসেরা" অর্থের জন্য এমন কাজ নাই যাহা করিতে সঙ্কোচবোধ করে। সর্ব্বশক্তিমান্‌ রৌপ্য-চক্রের মহিমায় কোন বাধাবিপত্তিই তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বা যুক্তরাজ্যের "সেনেট" ও "কংগ্রেসে" তাহাদেরি একাধিপত্য। কাজেই আইন করিয়া "ট্রাষ্টের" ক্ষমতা ভাঙিবার চেষ্টাও এতকাল ব্যর্থ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন হইতে আমেরিকার জনসাধারণের মনে "বস্‌"দিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা "বসের" স্বর্ণ-নিগড় ভাঙিয়া "নব স্বাধীনতা" লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীকে দরিদ্র করিয়া শুধু একদল লোককে কৃত্রিম ও অন্যায় উপায়ে অসম্ভব রকম ধনী হইতে দেওয়া যে জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে একথা মার্কিন আজ বুঝিয়াছে। "মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই জাতির প্রাণশক্তি বিদ্যমান, তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সমগ্র জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে," "অর্থের দাস হইলে জাতীয় অধঃপতন সুনিশ্চিত"—আজ মার্কিনের চতুর্দ্দিকে এই কথা শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমান দেশনায়ক উড্রো উইলসন মহাশয়ই এই নবভাবের উদ্বোক্তা। তিনি তাঁহার "নব স্বাধীনতা" পুস্তকে সংগৃহীত বক্তৃতাগুলিতে মার্কিনবাসীগণকে এই-সমস্ত কথাই শুনাইয়াছেন, বুঝাইয়াছেন। আমেরিকায় "বসের" রাজত্ব ভাঙিয়া "মাসের" বা সাধারণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি দৃঢ়-সংকল্প, অসদুপায়াবলম্বী "ট্রাষ্ট" বা করপোরেশনের ধ্বংস-সাধনে তিনি বদ্ধপরিকর! কিন্তু ট্রাষ্টের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে হইলে মার্কিন-জনসাধারণের সাহায্য চাই; সেই জন্য উড্রো উইলসন মহাশয় মার্কিনবাসীগণকে অর্থ-নিগড় ভাঙিয়া আপনাদের জন্মভূমিকে উন্নত ও পবিত্র করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। মার্কিনগণ যে আহ্বান শুনিয়া তাঁহাকেই দেশনায়কের পদে বরণ করিয়াছেন

এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে দেশের সমুদয় দুর্দ্দশা দুর্গতি মোচনের জন্য এক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বলকান্ বিপ্লবে বলকান্ রমণী (The Literary Digest) :—

আধুনিক কালের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ নাট্যকার ইস্রায়েল জ্যাঙ্গুইল (Israel Zangwill) মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্যাঙ্গুইল, বল্কান্ যুদ্ধ চলিবার সময় "বলকান্ বিপ্লবে বলকান্ রমণীর সহযোগিত্ব" সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে এই যুদ্ধে বলকান্দিগের যে জয় হইতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ—বলকান্ রমণীর সহযোগিত্ব! বলকান্ রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিই আকারে অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের জনসংখ্যাও অল্প; কাজেই প্রায় প্রত্যেক পুরুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে হইয়াছে। জন্মভূমির আহ্বানে চাষা লাঙ্গল ফেলিয়া, মুটে মাথার মোট নামাইয়া, তাঁতি তাহার তাঁত ফেলিয়া, দোকানী তাহার বিপণী ফেলিয়া, আসিয়াছে;—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলেই আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কাজ করিতেছে কে? তাহাদের পরিবারের মুখের অন্ন, পরণের বস্ত্র, যোগাইতেছে কে? শুনিলে অবাক হইতে হয়,—তাহা যোগাইতেছে বলকান্-রমণী! সে একলাই সংসারের সমস্ত কাজ সারিতেছে; লাঙ্গলও ঠেলিতেছে, মোটও বহিতেছে, তাঁতও বুনিতেছে, দোকানও চালাইতেছে! তা' ছাড়া আবার যুদ্ধক্ষেত্রে বলকান্ রমণী আহত ও পীড়িতের সেবিকারূপে বর্ত্তমান! এমন কি, সার্ভ-রমণীগণ রণভূমিতে রসদ আনয়ন, অস্ত্রশস্ত্রাদি ও সংবাদ-বহন প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতেছে। এইরূপে বলকান্-যোদ্ধাদিগের কার্য্যের এক-চতুর্থাংশ ভাগ তাহাদের রমণীগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু অপরদিকে হারেম-অবরুদ্ধ তুর্কী-রমণীগণ তুরস্ক-সৈন্যের কোন কার্য্যেই সহায়তা করিতে পারিতেছে না। মুসলমান সমাজের কঠোর অবরোধ-প্রথা তুর্কী-রমণীর সকল কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের সাহায্য বা শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক,—সংসারে পুরুষের অনুপস্থিতিতে যে-সমুদয় কার্য্য না হইলে অনাহারে মরিবার সম্ভাবনা, তাহাদের দ্বারা তাহাও হইতেছে না! শ্রীমতী জ্যাঙ্গুইল বলিতেছেন, তুর্কী যে তাহার রমণীকে সকল কার্য্য ও অধিকার হইতে দূরে রাখিয়া—শুধু বিলাস-ক্রীড়নক করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতেই তাহার এই দুর্দ্দশা। বর্ত্তমান যুগে নারীশক্তিকে দূরে ঠেলিয়া রাখিলে যে শোচনীয় পরিণাম,—তুর্কীর পরাজয় তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন!

"সয়তানের স্বর্গ" (Putumayo : The Devil's Paradise ; by W. E. Hardenberg. Fisher Unwin) :—

য়ুরোপ প্রায়ই আমাদের নিকট তাহার সভ্যতা ও দয়াধর্ম্মের বড়াই করিয়া থাকে। সে প্রায়ই বলিয়া থাকে "ওরিয়েণ্টালদিগের"—অর্থাৎ প্রাচ্যবাসীগণের "Sanctity of Life" বা প্রাণমাহাত্ম্যবোধ নাই। কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া প্রাণমাহাত্ম্যবোধ সম্বন্ধে, য়ুরোপের তরফ হইতে যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহার সভ্যতা ও দয়াধর্ম্মবোধের দাবী সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হইয়া উঠিতে হইতেছে। গত কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া নানা য়ুরোপীয় কোম্পানী পৃথিবীর নানাস্থানে যে অকথ্য ও অমানু[ষিক] অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে তাহা শুনিলে সহজে বিশ্বাস ক[রিতে] প্রবৃত্তি হয় না।

প্রবাসী-পাঠকের মধ্যে অনেকেই জানেন যে কিছুদিন প[ূর্ব্বে] আফ্রিকার কঙ্গো ফ্রী ষ্টেটে রবার সংগ্রহের জন্য ভূতপূর্ব্ব বেলজি[য়ম] রাজ লিওপোল্ড যে এক ব্যবসা ফাঁদেন তাহাতে সেই স্থা[নের] আদিম অধিবাসীগণের প্রতি কি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক আচরণ হ[ইয়া]ছিল। আমাদের দেশে বহুবৎসর পূর্ব্বেকার নীলকর অত্যাচা[রের] কথা অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু কঙ্গোতে লিওপোল্ডের অত্যাচা[রের] তুলনায় তাহা শুধু ছেলেখেলা মাত্র। গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন ক[ঙ্গোর] অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন জানা যায় য[ে] আবশ্যকীয় রবার সংগ্রহে অসমর্থ হইলে বা কার্য্যে শৈথিল্য প্রক[াশ] করিলে,—লিওপোল্ডের কর্ম্মচারীগণ, কঙ্গোবাসীগণকে কশা[ঘাত] হইতে আরম্ভ করিয়া, বিকলাঙ্গ এবং পরিশেষে রাইফেলের সাহা[য্যে] তাহাদের ভবযন্ত্রণা শেষ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন [না]। এই ভীষণ অত্যাচারের ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কঙ্গো জন[শূন্য] মরুভূমি হইয়া দাঁড়ায়, অথচ কঙ্গোর বিশেষণ ফ্রী ষ্টেট বা স্বাধীন রাজ[্য]। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক পরলোকগত "মার্ক টোয়েনে[র]" King Leopold II in Congo পুস্তকখানি কিম্বা প্রবাসী[তে] প্রকাশিত কঙ্গো-কাহিনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই ব্যাপারের অনেক বৃত্তান্তই অবগত আছেন।

সম্প্রতি আবার দক্ষিণ আমেরিকার পুটুমায়ো (Putumayo) নামক স্থানে আর-একটি এরূপ রবার-ব্যবসায়-কোম্পানীর অত্যাচ[ার] ও পাশবিকতার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। এই কোম্পানীর প[রি]চালক ও অংশীদারদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ, এবং ইংর[াজ] গবর্ণমেন্টের চেষ্টাতেই এই নিষ্ঠুর কাহিনী প্রথমে জানা যায়। ১৯[০৪] খৃষ্টাব্দে যখন কঙ্গোতে, লিওপোল্ডের বর্ব্বর অত্যাচারের কথা লই[য়া] সমগ্র ইংলণ্ড ও য়ুরোপ জুড়িয়া আন্দোলন চলিতেছিল,—আশ্চর্য্যে[র] বিষয়—ঠিক তখনই লণ্ডনে, এক কোটি পাউণ্ড মূলধন লইয়া এ[ই] "পুটুমায়ো রবার কোম্পানী"র প্রতিষ্ঠা হয়! তাহার পর এই আ[ট] বৎসরকাল ধরিয়া সেই কোম্পানী, ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য, তথাকা[র] অধিবাসীগণের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত পু[টু]মায়ো-প্রত্যাগত হার্ডেনবার্গ নামে একজন মার্কিন ইঞ্জিনিয়া[র] তাঁহার "Putumayo : The Devil's Paradise" বা শয়তানে[র] স্বর্গ পুটুমায়ো, নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে যে লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী বর্ণি[ত] হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে অতিবড় নিরীহের ধমনীর রক্ত দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। হার্ডেনবার্গ লিখিয়াছেন, পুটুমায়ো কোম্পানী প্রত্যেক গ্রামের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রবারসংগ্রহের ভা[র] দিতেন। গ্রামবাসীগণ যদি সময়মত সে পরিমাণ রবার যোগাইতে অক্ষম হইত, কিম্বা কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি চাবুক ও অন্যান্য শাস্তির বন্দোবস্ত হইত। ইহাতেও যদি তাহারা বশ্যতা স্বীকারে বিলম্ব করিত তাহা হইলে কোম্পানী[র] নিযুক্ত অস্ত্রধারী ঘোড়সওয়ার মানুষ শিকারে বাহির হইত। গ্রামবাসীগণ ভয়ে গৃহ ছাড়িয়া বনে পলাইত, বন্দুক আর কুকুর তাহাদের অনুসরণ করিত। হার্ডেনবার্গ বলেন এইরূপে গত কয় বৎসরে পুটুমায়ো কোম্পানী প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের প্রাণনাশ করিয়াছে! বাস্তবিক সভ্য ইউরোপের এই-সব উন্মত্ত বর্ব্বরতার নিকট তৈমুর, চেঙ্গিসের লোকক্ষয়কীর্ত্তি লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াছে, প্রাণমাহাত্ম্যবোধ সম্বন্ধে য়ুরোপের বড়াই ফাঁকা

আওয়াজে পরিণত হইয়াছে এবং স্বার্থে আঘাত লাগিলেই যে ইউরোপের ধর্ম্মবুদ্ধি লোপ পাইতে বসে, তাহা জগতের সমক্ষে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

চীনের ভবিষ্যৎ (Outlook, New York) :—

নব্য চীনের নেতা ও তাহার স্বাধীনতাদাতা সন্-ইয়াট্-সেন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পত্রিকা "আউটলুকে" তাঁহার দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলিতেছেন, ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের শাসনকালে চীনের যে অবস্থা ছিল বর্ত্তমানে প্রজাতন্ত্রের অধীনে তদপেক্ষা তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে; পূর্ব্বাপেক্ষা দেশে একতার ভাবও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দেশে অন্তর্বিপ্লব লাগিয়াই ছিল; এখন চীনের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে সংবাদ ও লোক-চলাচলের বন্দোবস্ত খুব ভাল হওয়ায় দেশে একতাস্থাপনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

সংবাদপত্র বৃদ্ধি।

পূর্ব্বে চীনে বড় জোর চল্লিশ কি পঞ্চাশখানি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল; বিপ্লবের পর এখন সেস্থানে সহসা প্রায় হাজারখানি দৈনিকের অভ্যুদয় হইয়াছে! চীনের অনেকখানি জুড়িয়া টেলিগ্রাফের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে সমস্ত দেশে—প্রত্যেকটি গ্রামে পর্য্যন্ত—খবর চলাচলের সুবিধা হইয়াছে।

দেশে যে একপ্রাণতার হাওয়া বহিয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ চীনে আফিম প্রবেশ করিতে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন জাগিয়াছিল তাহাতে। পূর্ব্বে অনৈক্য দ্বারা চীন এতদূর বিচ্ছিন্ন ছিল যে এরূপ একটা বৃহৎ আন্দোলন ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ তখন দেশে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত। এখন সমগ্র-চীনবাসী দেশের আশা আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য।

চীনবাসীরা শিক্ষালাভে খুবই উৎসুক। চীনা বাপ মা, পরিবারের প্রায় প্রত্যেকটি সন্তানকেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে; সুতরাং চীনে "বাধ্যতামূলক শিক্ষা" প্রচারের কোনই আবশ্যকতা নাই। প্রজাতন্ত্রের অধীনে শিক্ষার উন্নতি খুব দ্রুতবেগেই হইতেছে; চীনের মনীষীবর্গ এখন দেশে ইংলণ্ডের ন্যায় কতকগুলি পব্লিক্-স্কুল স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায় শীঘ্রই সমগ্র চীনদেশে শিক্ষাদানের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হইবে।

বর্ত্তমানে চীনবাসীদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল; দিনে দিনে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। চীনেরা কৃষিকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী; অধুনা কৃষির উন্নতিকল্পে তাহারা আধুনিক যন্ত্রতন্ত্রাদির সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিতেছে। দেশের "প্রাকৃতিক সম্পদকেও" কাজে খাটাইবার উপায় হইতেছে।

আমার মতে বেশ দ্রুতগতিতে অথচ খুব ধীরতা ও সতর্কতার সহিত চীনের রাজনৈতিক উন্নতি হইতেছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে প্রজাতন্ত্রের অধীনে আমরা শীঘ্রই এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিব। আমরা শান্তি চাই। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চীনের উন্নতির অন্তরায় না হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহের হাঙ্গামায় লিপ্ত হইবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই। য়ুরোপীয় জাতিরাই প্রথম "পীত-বিভীষিকার" ধুয়া ধরে; আর তাহারা যদি সে বিভীষিকার সৃষ্টি না করে তাহা হইলে আমাদিগের দ্বারা সে পক্ষে কোনই আশঙ্কা নাই।

অপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ।

আমি চীন ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা-সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছি। সুখের বিষয়—জাপানের অনেকেই এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে চীনের সহিত বন্ধুতাই তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বন্ধুত্বে শুধু চীন বা জাপানের মঙ্গল হইবে এমন নহে,—ইহাতে সমগ্র জগতের লাভ।

আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রকে অন্যান্য বিদেশী রাজ্য যে এখনো স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন তাহার প্রধান কারণ—সাম্রাজ্য-লোলুপতা! য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ এই অবসরে চীনে আপনাদের রাজত্ব বা প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় আছেন। রুষ মঙ্গোলিয়া অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত;—মঙ্গোলিয়া না পাইলে রুষ-গভর্ণমেণ্ট 'রিপবলিক্' স্বীকার করিবেন না। এই অসঙ্গত আবদার আমরা গ্রাহ্য না করাতে—যাহাতে অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তি 'রিপবলিক্' স্বীকার না করেন—রুষ ভিতরে ভিতরে সেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যিনিই যাহা করুন আমরা আমাদের দেশকে কখনই 'পার্টিশান' বা ভাগাভাগি করিতে দিব না। * * মার্কিন যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানী, জাপান, আমাদের রিপবলিক্ বোধ হয় শীঘ্রই স্বীকার করিবেন। আমার মনে হয় য়ুরোপীয় অন্যান্য গভর্ণমেণ্ট যখন দেখিতে পাইবেন যে আমরা চীনের স্বার্থ-স্বত্ব-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বাস্তবিকই বদ্ধ-পরিকর তখন আর তাঁহারা 'রিপবলিক্' স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না। * *

বহুদিনের পর চীন জাগিয়াছে—এবার সে উঠিবেই উঠিবে—তাহার ভবিষ্যৎ আশার আলোকে উজ্জ্বল।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

জাপানী কুসংস্কার (Japan Magazine):—

জাপান আজ সর্ব্বদিকে উন্নতিলাভ করিলেও একটা প্রাচীন কুসংস্কার এখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেটির নাম 'কান-মাইরি' অর্থাৎ 'ঠাণ্ডা জলে স্নান' নামক কুসংস্কার। জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে শীত যখন বেশ প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময় কোনমতে একখানি সূক্ষ্ম সাদা চাদরে লজ্জা নিবারণ করিয়া নগ্নদেহে বিস্তর স্নানার্থী জাপানীকে পথে দেখা যায়। ইহাদের কোমরে আবার একটি করিয়া ছোট ঘণ্টা ঝুলানো থাকে। এই বেশে এবং এই ভাবে তাহারা মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। সর্ব্বত্রই পুরোহিতের দল বরফের মত ঠাণ্ডা জল এই-সকল ধার্ম্মিক স্নানার্থীর গায়ে ঢালিয়া দিলে তবেই সকলের শান্তি হয়। দেবতাও সন্তুষ্ট হন! দুষ্ট গ্রহও তুষ্ট হয়! জল শুচিতার চিহ্ন—জল যে গায় না ঢালিল, সে শুচি হইল না, অপবিত্র রহিল, তেমন লোককে দেবতা কি বলিয়া অনুগ্রহ করেন! ঠাণ্ডা জল আবার যে গায় ঢালিল, শুচি ত সে হইলই, পুণ্যের মাত্রাও তাহার অসাধারণ! এই দুরন্ত শীতে নগ্নদেহে ঠাণ্ডা জল ঢালা কি সহজ নিষ্ঠা,—অল্প ভক্তির ফল!

পুণ্যার্থীর দল এমনই করিয়া শীতের রাত্রে মন্দিরে মন্দিরে ছুটিয়া ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালাইয়া স্নান সারিয়া লয়—সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। গা বহিয়া সেই ঠাণ্ডা জল ঝরিতেছে, তবু কেহ তাহা মুছিবে না—সেই জল গায়ে মাখিয়াই আবার অন্য মন্দিরে ছুটিতে হইবে।—অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। হাত অবধি

ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠে। এমন যাত্রীর সংখ্যা এক-একটি মন্দিরে বড় অল্প হয় না। গত শীতের সময় তোকিয়োর এক মন্দিরে ১৩০০ জন যাত্রী স্নানের জন্য জড়ো হইয়াছিল। সাধারণতঃ তাহারা গরম জলেই স্নান করিয়া থাকে—সুতরাং পাপের এ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবিতে গেলেও গা যেন শিহরিয়া উঠে। দুই চারিজন যে এ প্রায়শ্চিত্তের চাপে প্রাণ অবধি হারাইয়া বসে, তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—আত্মার মঙ্গলের জন্য যদি প্রাণ যায়, ত যাক্ সে!

এখন কথা ইহাই হইতেছে যে মানুষ যত অধিক যন্ত্রণা সহিবে, দেবতা সেই পরিমাণেই তৃপ্ত হইবেন, এ ধারণা বহু যুগ-যুগান্ত হইতে পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা দারুণ কুসংস্কার, সন্দেহ নাই। স্বর্গকামনায় মানুষের এই কষ্টভোগের কথায় পৃথিবীর প্রাচীন কাহিনীগুলি পরিপূর্ণ। মঙ্গলের জন্য সাধনা—যতই কঠোর হোক—সে সাধনায় যে গৌরব আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সে সাধনায় দেবতা ও মানুষ সকলেই তুষ্ট হন। ন্যায়ের জন্য যদি কেহ বিরাট দুঃখ ভোগ করে ত তাহার দুঃখভোগের শক্তির ও সকলে প্রশংসা করে। মানুষের জন্য, দেশের জন্য, নিজের জন্য,—মানুষ কত ত্যাগস্বীকার করে—এসকলের মধ্যে দোষ বা নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ দেখিতে পাই না। সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলেই ত্যাগের মহিমা প্রচ্ছন্ন আছে। ত্যাগেই ধর্ম্ম নীতি ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে এই 'কানমাইরি' প্রথাকে কুসংস্কার বলি কেন? কারণ আছে। এ প্রথায় শুধু অনর্থক কষ্ট ডাকিয়া আনা হয়। কর্ত্তব্য-পালনে যে দুঃখ আমরা ভোগ করি তাহার মূল্য আছে—কিন্তু যে কষ্ট সাধ করিয়া ডাকিয়া আনি, শুধু ক্রুদ্ধ দেবতাকে ভুলাইবার মোহে, সে কষ্ট দেখিয়া শ্রদ্ধা হয় না,—ঘৃণা হয়। কারণ সে কষ্ট-ভোগের মধ্যে দারুণ স্বার্থের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে—সেই জন্যই এ কষ্টভোগকে কুসংস্কার বলি।

জাপানী স্নানার্থী বলিতে পারে যে তবে ফোড়া কাটিবার সময় ডাক্তারের ছুরি দেহে যে বেদনা দেয় তাহাও তবে কুসংস্কার! কিন্তু না। এখানে এ কষ্টভোগের মূলে জীবন বা দেহরক্ষার বাসনা নিহিত আছে। তেমনই যদি 'কানমাইরি'-প্রথা স্নানার্থীর দেহ বা জীবন রক্ষায় এতটুকু সহায়তা করিত তবে তাহাকে কুসংস্কার বলিতাম না। দেবতা ভুলাইবার জন্যই না এ স্নান! যে দেবতা সুদখোরের মত, ভক্তকে নির্য্যাতন করিয়া পুণ্য আদায় করিয়া ছাড়েন, সে দেবতা দেবতাই নহে! মানুষ যদি নিজের কর্ত্তব্য ঠিকমত সাধন করিয়া যায়, সংযম দ্বারা লোভ মোহ রোধ করিয়া ইহলোকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়, তবেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করা হইল বলিয়া আমরা মনে করি। নহিলে চড়কের সময় পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া, কি দারুণ শীতে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া, কিম্বা তিথি-বিশেষে কোন পাহাড়ের অন্তরালে স্থিত কোন নদীর এক নির্দ্দিষ্ট ঘাটে দুইটা ডুব পাড়িলেই যদি দেবতার কৃপায় অতিবড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। খুন চুরি জালিয়াতি করিয়া গঙ্গায় দুইটা ডুব দিলেই সদ্য পাপ ক্ষয় হইল, দেবতার কোপ উড়িয়া গেল—এরূপ মনে করা যে ভুল,—এবং ইহা যে দারুণ কুসংস্কার তাহা বোধ হয় এই আইনকানুনের দিনে আর বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। ঈশ্বর প্রেমময়, করুণাময় তাঁহার রাজ্যে অপরকে আঘাত না দিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলেই তিনি তুষ্ট হইবেন—ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানুষের মতই ঈর্ষাপরায়ণ বা হিংস্রপ্রকৃতি নহেন। এমনই যাঁহার বিশ্বাস, তিনিই প্রকৃত সাধুভক্ত—নহিলে আপনার মনের মত দেবতা বানাইয়া যে বলে যে তাহার দেবতা একটু ত্রুটিতে রাগিয়া চটিয়া মাথা বাজ ফেলিবেন—সে ত ভণ্ড, তাহার দেবতাকে দেবতা বলিয়া আমরা মানিব না—দেবতাও ক্ষুদ্র স্বার্থের চেষ্টায় মানুষের মং ঘুরিয়া বেড়ায় কথায় বিশ্বাসী ভক্তের চেয়ে নাস্তিকের সংস্রব বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বর প্রেমময়—শুধুই প্রেম, শুধুই জ্ঞানের আকর-ইহা যে মানে, বা বোঝে, তেমন মানুষের উন্নতির আশা আছে-উন্নতি হইবেই।—আর যাহার ঈশ্বর তাহারই মত রক্তমাংসের জীব হিংসা, দ্বেষ, রোষ, লোভ প্রভৃতিতে হৃদয় পূর্ণ, সে বেচারার উন্নতি কোনই আশা নাই—যে তিমিরে সে আছে, চিরদিন সেই তিমিরেই সে রহিয়া যাইবে—এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। সৌ।

পলাতক

মনোবাতায়ন-তলে উড়ে আসে দলে দলে
ভাবরাশি পতঙ্গের প্রায়,
অশোক কিংশুক রাঙা, ইন্দ্রধনু ভাঙা ভাঙা
বরণের বিচিত্র ছটায়,
স্বচ্ছ ক্ষীণ পক্ষ মেলি কাঁপিয়া পড়িয়া হেলি,
এসে শুধু দেখা দিয়ে যায়,
ধরিতে রাখিতে নারি হায়!

ওগো বাতায়ন-তলে হেন কি আলোক জ্বলে?
যার লাগি আস বার বার?
দেখা যদি দাও এসে একাকী ফেলিয়া শেষে
ফিরে তবে কেন যাও আর!
নয়ন অধর মম কক্ষ বক্ষ, শিশু সম
এস সবে কর অধিকার,
নাহি ভয় অনল-শিখার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আশ্রমপালিত ক্ষত্রকুমার

(উত্তর-রাম-চরিত হইতে)

তূণীর দুইটি দুলিছে পৃষ্ঠে, লম্বিত শিখাগুচ্ছ
করিছে পরশ শায়কগুলির কঙ্ক-পাতার পুচ্ছ।
পূতলাঞ্ছনে চিহ্নিত হৃদি যাগের ভস্মপুঞ্জে,
রুরুর চর্ম্ম স্কন্ধে, ফিরিছে আশ্রম-বনকুঞ্জে,
মৌর্ব্বী-মেখলা দৃঢ়নিবদ্ধ, রাঙা অধোবাস-খণ্ড
করে শরাসন অক্ষমালিকা আর পিপ্পল-দণ্ড।

শ্রীকালিদাস রায়।

মৃত্যু-মোচন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের সার মর্ম্ম :—স্বামী ফিদিয়ার সহিত স্ত্রী লিজার বনিবনাও ছিল না, নিত্য ঝগড়া খিটিমিটি বাধিত। একদিন লিজা অভিমান করিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া মাতা আনার গৃহে চলিয়া আসিল। ফিদিয়া লিজাকে এক পত্র লিখিয়াছিল যে, দুইজনে যখন মনের এতই অমিল, তখন তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হোক্! লিজাও উত্তর দিল, "বেশ কথা, তাই হোক্!" কিন্তু দুইচারিদিনের মধ্যে লিজার অভিমান কাটিয়া গেল, স্বামীর প্রতি তাহার অনুরাগ বাড়িয়া উঠিল। তখন সে বহু মিনতি করিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া স্বামীকে এক পত্র লিখিল। পত্রখানি বাল্যসুহৃদ্ ভিক্তরের হাতে পাঠানো হইল। বেদিয়া-গৃহে বন্ধুবান্ধব লইয়া ফিদিয়া তখন মজলিস জমাইতেছিল। বেদিয়াদের মেয়ে মাশা বড় সুন্দর গাহিতে পারে। সেই গান শুনিয়া ফিদিয়া আপনার দুঃখ ভুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল, এমন সময় লিজার পত্র লইয়া ভিক্তর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ফিদিয়াকে সে লিজার পত্র দিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য বহু অনুরোধ করিল, লিজারও বিস্তর দোহাই পাড়িল, কিন্তু ফিদিয়ার সঙ্কল্প অটল! সে কিছুতেই গৃহে ফিরিল না। ভিক্তর তখন অগত্যা নিরাশ হইয়া বিরক্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর হঠাৎ একদিন লিজার ছেলেটির কঠিন পীড়া হইল। ছেলের জন্য লিজা আকুল, কাতর হইয়া পড়িল। ভিক্তর রাত্রি জাগিয়া সেবা করিয়া, ডাক্তার ডাকিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া ছেলেকে বাঁচাইল। ভিক্তরের প্রতি লিজার কৃতজ্ঞতাও বাড়িয়া উঠিল। ওদিকে ফিদিয়া বন্ধু আব্রমবের বাটীতে দিন কাটাইতেছিল। সহসা একদিন লিজার ভগ্নী শাশা তথায় গিয়া ফিদিয়াকে বাড়ী ফিরিবার জন্য বহু অনুনয় করিল কিন্তু তাহাকেও ফিদিয়া সেই এক উত্তর দেয়, সে গৃহে ফিরিবে না, ফিরিবার প্রবৃত্তিও তাহার নাই। বিবাহ-বন্ধন কাটাইয়া লিজাকে সে মুক্তি দিবে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফিদিয়া বলিল, লিজা তাহার স্ত্রী; কিন্তু মনে মনে সে ভিক্তরকে ভালবাসে, ভিক্তরও তাহাকে ভালবাসে! তবে লিজা মেয়ে ভাল বলিয়াই মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিত, এ ভালবাসা রোধ করিবার জন্য, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না—এইটী ফিদিয়ার লক্ষ্য এড়ায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ফিদিয়া তাহাদের দুইজনের সুখে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া থাকিতে চাহে না। বিশেষ ভিক্তর তাহার বাল্যবন্ধু এবং এই জন্যই আর গৃহে ফিরিতে তাহারা ইচ্ছা নাই। শাশা অগত্যা বিমর্ষ চিত্তে গৃহে ফিরিল; ফিদিয়া সঙ্গে আসিল না।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কারেনিনার কক্ষ।

ঘরটি নিতান্তই সাদাসিধা—আড়ম্বরহীন।

কারেনিনা বসিয়া পত্র লিখিতেছিল।

ভৃত্য প্রবেশ করিল।

ভৃত্য। প্রিন্স সার্জ্জিয়স এসেছেন।

কারেনিনা। (সানন্দে) এসেছে! আঃ, বাঁচা গেল! যা, তাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। (কাগজ-পত্র চাপা দিয়া রাখিল; উঠিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথার অসম্বদ্ধ কেশরাশি গুছাইয়া লইল)।

ভৃত্য ও তৎপশ্চাৎ প্রিন্স প্রবেশ করিল।

ভৃত্যের প্রস্থান।

প্রিন্স। (অভিবাদনান্তে) তোমার অসুবিধা হল না ত কিছু!

কারেনিনা। অসুবিধা! না, না, মোটেই না। তোমার সঙ্গে একটা ভারী দরকারী কথা আছে।...হ্যাঁ, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

প্রিন্স। সেই পেয়েই ত তাড়াতাড়ি আসছি।

কারেনিনা। আমি ত এক মহা ফ্যাসাদে পড়েছি—ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না ভাই। ছেলেটাকে সে যাদু করেছে—নিশ্চয় যাদু! না হলে ভিক্তরকে ত কখনো আমি কোন বিষয়ে এত একগুঁয়ে কি আমার কথার অবাধ্য হতে দেখিনি। আমার পানে মূলে সে চায় না এখন। বিশেষ সে ছুঁড়ীটাকে তার স্বামী ফারখৎ লিখে দেওয়া অবধি ভিক্তর আমার একেবারে বদলে গেছে—আর সে মানুষ নেই!

প্রিন্স। তার পর ব্যাপার এখন কেমন দাঁড়িয়েছে, শুনি!

কারেনিনা। ব্যাপার আর কি! ঐ ছুঁড়ীকে ও বিয়ে করবেই—তা সে যাই ঘটুক!

প্রিন্স। তার স্বামীর খপর কি?

কারেনিনা। সে ত ডাইভোর্স দিতে খুব রাজী!

প্রিন্স। এঁ্যা!—(বিস্ময়ের ভাব দেখাইল।)

কারেনিনা। ডাইভোর্স কোর্টের সমস্ত হাঙ্গাম-হুজ্জুত ভিক্তর স্বচ্ছন্দে মাথা পেতে নেবে, বলে! ভাবো একবার কাণ্ডখানা—সেই উকিলের যত জেরা, সাক্ষীসাবুদ,—কেলেঙ্কারীর একশেষ!... ভিক্তরের তাতে বয়ে গেছে! এ কিন্তু আমার বরদাস্ত হয় না। অমন শান্ত লাজুক ছেলে—

প্রিন্স। অর্থাৎ মেয়েটাকে সে ভালবাসে—এই আর কি! তা এ সবে ত আর মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

কারেনিনা। রেখে দাও তোমার ভালবাসা! সেকালে আমাদের আমলেও কি ভালবাসাবাসি ছিল না —না আমরাও কাকে ভালবাসিনি! সে ত বন্ধুর ভালবাসা। ভালবাসলেই যে একেবারে তাকে বিয়ে করতে হবে, এ কি লক্ষ্মীছাড়া বাতিক, তোমাদের এই এ কালের!

প্রিন্স। সে ভালবাসার দিনকাল গেছে! তখন এতটা মোহ ছিল না—লোকের প্রাণও ছিল শুদ্ধ নির্ম্মল,—এখন এই নাটক-নভেলের জ্বালায় অনেকের মাথা বিগড়ে গেছে—ভাবে, ঐ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নৈলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অন্য বন্ধনই আর থাকতে পারে না! প্রবৃত্তি মানুষের হীন হয়ে গেছে! তা যাক, এখন ভিক্তরের মতলবখানা কি?

কারেনিনা। ঐ যে বলুলুম,—সেটাকে বিয়ে করা! আমি বলছি ভাই, এ যাদু, না হলে আমার অমন ভিক্তর! ওদের সঙ্গেও আমি দেখা করেছিলুম—ভিক্তর জেদ করছিল। তা বাড়ীতে কেউ তখন ছিল না—আমি আমার কার্ড রেখে এসেছি। তারপর আজ তার এখানে আসবার কথা আছে। —(ঘড়ির দিকে চাহিয়া) ছ'টা বাজে—এখনই তা হলে আসবে। ভিক্তরের কথায় তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেও আমি রাজী হয়েছি—তাই ত আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি, কি বলব তাকে! তোমাকে তাই ডেকে পাঠিয়েছি—এখন একটা যুক্তি পরামর্শ দাও দেখি।

প্রিন্স। তাই ত—

কারেনিনা। অর্থাৎ বুঝেছ,—এ আসার মানে কি! পাকা কথা দেওয়া! সে কথা আমায় দিতে হবে। সেই কথার উপর ভিক্তরের সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে! 'হ্যাঁ', কিম্বা 'না', একটা বলতে হবে। ··· কি বলি···

প্রিন্স। মেয়েটিকে জান ত বেশ?

কারেনিনা। না, আমি তাকে দেখিনি কখনো। তবু সে কেমন অলুক্ষণে বলেই আমার ভয় হচ্ছে! স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—কোন্ ভাল ঘরের মেয়ে এমনভাবে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে! আর বিশেষ ফিদিয়ার মত স্বামী! সে যে আবার ভিক্তরের বন্ধু—আহা, জান না, তুমি? হামেশা সে আমাদের এখানে আসত। ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগত—বেশ মিষ্টি স্বভাব! যদিই বা বয়সের দোষে এমন কিছু অপরাধ সে করে থাকে, তাই বলে কি স্ত্রীর উচিত, রাগ করে একেবারে সম্পর্কই তুলে দেওয়া! বিশেষ স্বামী হল গুরুজন! আসল কথা কি জান,—একটা জিনিস আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ভিক্তরের মত ছেলে—ধর্ম্ম-কর্ম্মেও অমন মন—সে কেমন করে আর-একজনের ডাইভোর্স-করা বৌ বিয়ে করবে। কত লোকের সঙ্গে সে তর্ক করে বেড়িয়েছে, নিজের কানে আমি শুনেছি,—সে বলেছে, ডাইভোর্সটা ভারী ব্যাদড়া জিনিস। কোন ধর্ম্ম তার সমর্থন করে না। আর সেই ভিক্তর কি না নিজে আজ অপরের ডাইভোর্স-করা বৌ দিব্যি ঘরে আনবে! নিশ্চয় সে ভিক্তরকে যাদু করেছে।··· আমার ত ভয়ে হাত-পা আসছে না, ভাই। এখন নিজের কথা থাক। তোমার মত কি, বল। একটা পরামর্শ দাও দেখি আমায়—কি করব। ভিক্তরের সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হয়েছে কি? সে কিছু বলেছে তোমায়?

প্রিন্স। দেখা হয়েছে—কথাও কিছু হয়েছে। আমার বিশ্বাস, ভিক্তর তাকে ভালবাসে! অনেকদিন থেকেই ভালবাসে। এ ভালবাসা যে সে মুছে ফেলবে, তাও অসম্ভব। বেচারা নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করেছে, কিন্তু কোন ফল পায় নি। সে আর কোন মেয়েমানুষকে কখনো ভালবাসেনি, বাসে না, বাসতে পারবেও না। এই ত ব্যাপার! এর সঙ্গে বিয়ে না হলে ওর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে—দুঃখেরও সীমা থাকবে না।

কারেনিনা। শোন একবার, ছেলের কথা! ভেরিয়ার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক করলুম—চমৎকার মেয়ে সে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। ভিক্তরকে তারও খুব মনে ধরেছিল—ছেলে কিন্তু বিগড়ে বসলেন। সে মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নি—একবার রাজী হোক না, ভিক্তর—

প্রিন্স। ও সব কথা মিছে তোলা? তাতে ত

আর সমস্যা-ভঞ্জন হবে না। এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার উচিত এ বিয়েতে মত দেওয়া।

কারেনিনা। একটা দোজপক্ষের বৌকে ঘরে তুলতে হবে! ছিঃ—! ভাব দেখি, তার পর—একদিন, দুজনে বেড়াচ্ছে, এমন সময় ফিদিয়া হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়াল—! কি লজ্জা, কি ঘেন্নার কথা সে! ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! না বাপু, এ আমার বরদাস্ত হয় না। আর কোন্ মা-ই বা এ বরদাস্ত করতে পারে যে তার ছেলে—তা-ও একটিমাত্র ছেলে—এমন মেয়ে বিয়ে করে আনবে!

প্রিন্স। উপায় কি? অবশ্য মানি, তোমার পছন্দ-মত ভাল একটি সুশ্রী সুস্বভাবের মেয়ে ভিক্তর বিয়ে করত, তাহলে দেখতে শুনতেও ভাল হ'ত। তবু এ এক-রকম মন্দের ভাল ত! ধর, যদি ছেলে একটা বেদের মেয়েকেই বিয়ে করে বসে, কি—যাক, সে কথা,—! লিজা মেয়ে এ দিকে মন্দ নয়—আমি তাকে নেলির ওখানে দেখেছি। মেয়েটি দেখতে বেশ, স্বভাবও ধীর শান্ত, ভালই—

কারেনিনা। রেখে দাও তোমার ভাল! স্বামীর সঙ্গে যে মেয়ের এত অ-বনিবনা...

প্রিন্স। কিন্তু তার স্বামীও শুনেছি ভারী বদ লোক! স্ত্রীর সে শক্র ছিল বললেই হয়। তেমন লোকের সঙ্গে কি ঘর করতে পারে মানুষে? মাতাল, বওয়াটে,—নেশাভাঙ, বদখেয়ালি নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা আছে—বিষয় সম্পত্তি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে—স্ত্রীর এত বোঝানিতেও বুঝ মানে না! এমন অসুখে কি করে' একজন তার সারা জীবন কাটায়—তা'ও বল! অথচ প্রাণে তার ভালবাসা আছে, সাধ আশাও বিলক্ষণ—তার কোন্‌টা মিটল? বিশেষ এখন একটি ছেলে হয়েছে আবার! তা সে ছেলেটাকে অবধি দেখত না। মনের মিল নেই, এ অবস্থায় এক ঘরে কোনমতে দিন কাটালেই কি চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া যাবে! এমন অবস্থায় সে বিয়ে কাটিয়ে নূতন আর একটা বিয়ে করা কী এমন দোষের?

কারেনিনা। বেশ বাপু, তোমাদের যদি সকলেরই এই মত, তা হলে আমি মাঝে থেকে বিঘ্ন ঘটাই কেন? আমি না হয় কোথাও সরে যাই।

প্রিন্স। রাগারাগি কেন? রাগারাগির ত কথা এতে নেই। তোমার মনের একটা খেয়ালের ঝোঁকে দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ আজীবন দারুণ কষ্ট পাবে এই বা কেমন?

কারেনিনা। বেশ বাপু—আমি কোন বাধা দোব না—আবার তাও বলি, ও বৌ নিয়ে আমি কিন্তু ঘর কর্‌তে পারব না।

প্রিন্স। শাস্ত্রে কি বলে—ভুলে যাচ্ছ—ক্ষমা—

কারেনিনা। শাস্ত্রে বলছে, ক্ষমা কর—দুর্ব্বল যারা, অপরাধী যারা—তাদের সে দুর্ব্বলতা, সে অপরাধ ক্ষমা কর!.........কিন্তু এ কি ক্ষমা করবার মত?

প্রিন্স। আচ্ছা বল, লিজা কেমন করেই বা অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করে? মনেই যদি তার অ-বনিবনা, তখন আর তার কি রইল? ছেলেটি ছোট—তাকে মানুষ করতে গেলেও ত একটা আশ্রয় চাই—সে মেয়ে-মানুষ, স্বভাবতই দুর্ব্বল। স্বামী এই রকম বাউণ্ডুলে, জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই, এতটুকু দায়িত্ববোধ নেই, এমন অবস্থায় সে বিয়ে কাটিয়ে যদিই বেচারী লিজা ভিক্তরকে আশ্রয় করে—তাতে তার কি এমন অপরাধ হয়?

ভিক্তর প্রবেশ করিল। সে আসিয়া মাতার করচুম্বন ও প্রিন্সের করকম্পন করিল।

ভিক্তর। মা—

কারেনিনা। কেন ভিক্তর?

ভিক্তর। লিজার আসবার সময় হয়েছে। এখনি সে আসবে। আমার শুধু একটা অনুরোধ আছে—এ বিয়েতে যদি তোমার আপত্তি থাকে—

কারেনিনা। যদি! নিশ্চয় আপত্তি আছে—খুব আপত্তি আছে।

ভিক্তর। তবু তোমায় মত দিতে হবে, মা। দোহাই, —তোমার পায়ে পড়ি। আমাদের দুজনের জীবন চুর-মার হয়ে যাবে, না হলে।

কারেনিনা। বেশ—তা'হলে ও বিষয়ে কোন কথাই কব না আমি।

ভিক্তর। তা কয়োনা—তুমি শুধু তাকে চেনো মা—জানো, সে কি মানুষ, সেইটুকু শুধু বোঝ!

কারেনিনা। ভিক্তর—

ভিক্তর। মা—

কারেনিনা। একটা কথা শুধু আমার বলবার আছে। লিজাকে তুমি বিয়ে করবে—! যথার্থই এতে আমি অবাক হয়েছি। একজনের ডাইভোর্স-করা স্ত্রী—স্বামী তার বেঁচে—এমন লোককে? তুমি নিজেই কতবার বলেছ,—এটা অত্যন্ত কদর্য্য ব্যাপার—এই ডাইভোর্স—ধর্ম্মও তায় আমোল দেয় না।

ভিক্তর। মা—একটা কথা শুধু ভেবে দেখ। আমরা লোকের বাইরেটা দেখে তাকে ঘৃণা করি, কিন্তু তার মনটাকে দেখি না। শুধু খোলা নিয়েই শাস্ত্রের কারবার! তার চেষ্টা খোলাটা যাতে ঠিক থাকে। কিন্তু যেটা আসল—মানুষের মন,—সেটা তার শাসনের চাপে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। শাস্ত্র সে মনটাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করে না। শাস্ত্রের মাপকাটি দিয়ে মানুষের বিচার করো না মা—সে বিচার ঠিক হবে না। মন দিয়ে মানুষ বুঝতে হবে। না হলে একটা প্রাণ—অমূল্য মানুষের প্রাণ,—পা দিয়ে তাকে চেপে-পিষে অমনি গুঁড়িয়ে ফেলবে!...তুমি ত নিষ্ঠুর নও মা—তবে কেন এ-সব কথা তুলছ?

কারেনিনা। ভিক্তর—তুইই আমার সব। তুই যাতে সুখী হোস্,—তোর যাতে ভাল হয়,—এ জগতে শুধু এই আমার সাধ—আর আমার কি আছে ভিক্তর, কে আছে?—

ভিক্তর। প্রিন্স—

প্রিন্স। সে কথা সত্য—তুমি তোমার ছেলের ভালই দেখ, ভালই খোঁজ। তবে আসল কথা কি জান,—আমাদের চুলগুলোতে যখন পাক ধরে, তখন কাঁচা মাথাগুলোর সুখদুঃখ আমরা ঠিক তলিয়ে বুঝে উঠতে পারি না। অর্থাৎ ছেলের ভাল-মন্দর সম্বন্ধে মা যা স্থির করে বসে থাকে, অনেক সময় দেখা যায়, ছেলের ভালমন্দর সঙ্গে সেটা ঠিক খাপ খায় না। অথচ কোন মা-ই ছেলের কখনো মন্দ চায় না।

কারেনিনা। নিশ্চয়। মায়ে আবার কবে ছেলের ম[ন্দ] খুঁজে থাকে! ছেলে যাতে সুখী হয়, ছেলের যাতে ম[ন্দ] একতিল দুঃখ-কষ্ট না হয়, দিবারাত্রি না মায়ের শুধু এ[ই] চিন্তা! ... কিন্তু এ বিয়ে ... না, আমি মরে যাব—বাঁচ[ব] না, তা হলে—

ভিক্তর। মা, তুমি যদি এই কথা বল, তা হ[লে] আমি আজ কোথায় দাঁড়াই!

প্রিন্স। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, ভিক্তর। তোমার মা[কে] একটু ভাবতে চিন্ততে দাও। মুখে এখন বলছে বলেই কি—

কারেনিনা। আমার মুখে দু কথা নেই, প্রিন্স। রেখে ঢেকে বলতেও আমি শিখিনি কখনো—জীবনের এতগুলো দিন যখন এই ভাবেই কেটে গেল তখন এই শেষ বয়সে—

প্রিন্স। যাক্, যাক্—আমি ও একটা কথার কথা বলছিলুম মাত্র।

ভৃত্য প্রবেশ করিল।

ভৃত্য। কার্ড।

ভিক্তর। আমি তা হলে যাই।

ভৃত্য। এই কার্ড—লিজা আন্দ্রিব্না প্রোতাশেভা।

ভিক্তর। আমি তা হলে যাই। মা—দেখো যেন—

করুণ ভাবে মাতার দিকে চাহিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রিন্স চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কারেনিনা। (ভৃত্যের প্রতি) যা, এইখানে তাঁকে নিয়ে আয়। (ভৃত্য প্রস্থান করিলে প্রিন্সের প্রতি) তুমি যেয়ো না যেন।

প্রিন্স। আমার থাকাটা ভাল দেখাবে কি? কথা-বার্ত্তা হবে সব—

কারেনিনা। না, না, একলা থাকলে—আমার সে কেমন বাধ-বাধ ঠেকবে। তুমি থাক! বরং যখন বুঝব যে, তোমার থাকাটা ঠিক হবে না, তখন একটা ইসারা করব'খন। জানলে? ... কিন্তু প্রথমটা কেমন চক্ষুলজ্জা করবে। আমি তোমায় এই রকম একটা ইসারা করব, তখন তুমি চলে যেয়ো। (ইঙ্গিত বুঝাইয়া দিল)।

প্রিন্স। বেশ! তবে তাই হোক। আমার বোধ

হয়, এ-কে তোমার মনে লাগলেও লাগতে পারে। সব দিক একটু বিবেচনা করো—নেহাৎ একেবারে শক্ত ভাবে বিচার করো না।

কারেনিনা। তোমরা সকলেই এককাট্টা হয়েছ, বেশ!

লিজা প্রবেশ করিল।

(উঠিয়া) এস মা, এস। সে দিন আমি তোমাদের বাড়ী গেছলুম, তা কারো দেখা পেলুম না। তুমি যে এসেছ, এতে আমি খুব খুসী হয়েছি।

লিজা। সে আপনার অনুগ্রহ। আপনি যে আমাদের ওখানে গিছলেন—

কারেনিনা। (প্রিন্সের প্রতি) তুমি লিজাকে চেন?

প্রিন্স। হাঁ, জানি। (লিজাকে অভিবাদনান্তে) আমার ভাগ্নী নেলির ওখানে আপনাকে দেখেছি বোধ হয়!

লিজা। নেলি! ও, সে যে আমার বন্ধু। দুজনে আমরা এক সঙ্গে পড়েছিলুম। (কারেনিনার প্রতি) আপনি যে আমাদের ওখানে যাবেন, আমি তা স্বপ্নে কখনো ভাবিনি।

কারেনিনা। তোমার স্বামীকে আমি ভালই জানি—আমাদের ফিদিয়া। আমার ছেলের সে একজন খুব বন্ধু ছিল। আমাদের এখানে প্রায়ই সে আস্‌ত—অবশ্য সে যখন মস্কোয় যায় তার আগেকার কথা বলছি। সেখানেই না তোমাদের বিয়ে হয়?

লিজা। হাঁ।

কারেনিনা। তারপর যখন ফিদিয়া মস্কো থেকে ফিরে এল, তখন থেকে আর দেখা হয়নি।

লিজা। তিনি ত কোথাও বড় বেরুতেন না।

কারেনিনা। তবু তোমায় নিয়ে আমার এখানে একবার তার আসা উচিত ছিল।

(কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই স্তব্ধ রহিল, পরে প্রিন্স নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কথা কহিল)।

প্রিন্স। আপনাকে শেষ দেখি—বোধ হয়, দেনিশ্‌দের বাড়ী যে দিন ভোজ ছিল, সেই দিন। আপনি পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন—

লিজা। আমি—? কৈ, না—! ওঃ—হাঁ, হাঁ আমি ভুলে গিছলুম। (মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কারেনিনার প্রতি) আপনাকে আমি বিরক্ত করেছি—আমায় ক্ষমা করবেন। কি করব—? উপায় নেই। আমি এসেছি—ভিক্তর আমায় বলেছিল...সে বলছিল...আপনার সঙ্গে দেখা হলে ...আপনি নাকি দেখা করতে চেয়েছেন। কিন্তু...(লিজার চোখে অশ্রু দেখা দিল)...আমার মত অভাগিনী পৃথিবীতে আর নেই, মা—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।)

প্রিন্স। আমি তা হলে আসি।

কারেনিনা। আচ্ছা, তুমি তবে এস।

(কারেনিনা ও লিজাকে অভিবাদনান্তে প্রিন্স প্রস্থান করিল।)

কারেনিনা। শোন লিজা...আমি তোমার বাপেরও নাম জানি না—তা যাক, তাতে কিছু এসে যায় না।

লিজা। (কারেনিনার মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুত দৃষ্টি নত করিল।)

কারেনিনা। যাক্—সে কথা নয়, লিজা। আসলে তোমার জন্যে আমার মনে বড় দুঃখ হয়—আহা, বেচারী তুমি! কিন্তু ভিক্তর হল আমার প্রাণ। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি বেঁচে আছি—সে আমার সর্ব্বস্ব। তার মন আমি ভালই জানি—যেমন নিজের মন জানি, তেমনি জানি। তার মনে বড় গর্ব্ব—সে গর্ব্ব বংশের নয়, ধনের নয়—সে গর্ব্ব তার চরিত্রের। তার আদর্শও খুব উঁচু—তা থেকে কোন দিন সে একতিলও হঠেনি। শিশুর মতই তার মন নির্ম্মল পবিত্র। এমন নিখুঁত চরিত্রের ছেলে আজকাল দেখ্‌তে পাবে না তুমি।

লিজা। আমিও তা জানি—

কারেনিনা। শোন, এর আগে কখনও সে কোন মেয়েকে ভালবাসে নি। শুধু তোমায় বেসেছে। ভেবো না যে আমার মনে একটুও হিংসা হচ্ছে না—হিংসা একটু হয়েছে! সে কথা লুকোবি না। মায়ের প্রাণ শুধু ছেলের মঙ্গলই খুঁজে বেড়ায়। সে ছেলে যখন এতটুকু থাকে, সমস্ত অভাব-আব্দার নিয়ে তার মার বুকেই যখন সে শুধু ছুটে আসে, মার মন কি আহ্লাদে যে ভরে যায়! এত সুখ, এত সৌভাগ্য, মেয়েমানুষের আর কিছুতে নেই। তার পর যখন সেই অসীম নির্ভরতার

মায়া কাটিয়ে স্ত্রীর কাছে সে প্রাণের গোপন কথা বলতে ছোটে, তখন মায়ের প্রাণ ভেঙ্গে যায়। মা পর হয়ে গেছে, মা তখন আর কেউ নয়।—ছেলের আমার বিয়ে এখনও হয়নি, কিন্তু এই যে সে মার মুখের দিকে না চেয়ে, মার বুকে পাষাণ হেনে স্ত্রীর ভালবাসাকেই শুধু একমাত্র সুখের মনে করছে, মার কথা কানেও তুলতে চাইছে না—এতেই আমার বুক ভেঙ্গে গেছে—কেবলি মনে হচ্ছে, হা রে ছেলের দল, মাকে তোরা এত সহজে ভুলে যাস্—কিন্তু হাজার দোষেও মা ত তোদের কৈ এক দণ্ডের জন্যও ভোলে না!...কিন্তু আমিও স্বার্থপর নই মা—ছেলের বিয়ে দিতে আমার কোন অসাধ নেই। মনকে আমি বুঝিয়ে ঠিক করেছি, কিন্তু তাকে এমন বৌ আমি এনে দিতে চাই, যার মন তারই মত উঁচু, তারই মত নির্ম্মল, শুভ্র—পৃথিবীর এতটুকু ধুলোমাটি যে প্রাণে কোন দিন এতটুকু দাগ লাগাতে পারেনি!

লিজা। মা—(লিজার স্বর বাধিয়া গেল।)

কারেনিনা। তুমি কিছু মনে করো না, লিজা—যদি কিছু রূঢ় বলি, তাহলে মার প্রাণ বলেই সেটা ধরো না। তোমার এতে কোন দোষ নেই—তোমার বরাত মন্দ—তোমার এতে হাতই বা কি? মোহের ঘোরে, নেশার ঝোঁকে ভিক্তর এখন বুঝছে না, সে কি করতে যাচ্ছে—কিন্তু দু দিন পরেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তখন সে অনুতাপে সারা হয়ে যাবে। তার চরিত্র-গর্ব্ব নষ্ট হয়ে যাবে—এতে সে কখনও সুখী হবে না।

লিজা। সে কথা আমিও ভেবেছি—

কারেনিনা। লিজা, তোমার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, মনও তোমার খাটো নয়—তোমার চেহারা দেখে আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি।—তুমি যদি ভিক্তরকে ভালবাস—নিশ্চয় তা হলে নিজের মঙ্গল, নিজের সুখের আগে ভিক্তরের কিসে মঙ্গল, কিসে সুখ, তা খোঁজ। বল দেখি তবে মা, তুমি কি এমন কাজ করতে পার, যাতে ভিক্তর আজীবন একটা দুঃখ-অনুতাপের জ্বালায় জ্বলতে থাকবে। ভিতর-ভিতর জ্বলে একেবারে সে খাক্ হয়ে যাবে—মুখে অবশ্য কোন দিন সে জ্বালার কথা তুলবে না সে—

লিজা। না মা, তা সে বলবেনা—আমারও বিশ্বাস তাই। এ কথা আমিও ভেবেছি খুব—ভেবে আমা[র] কর্ত্তব্যও আমি স্থির করেছি। এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু সে শুধু একই কথা বলে শুধু বলে, আমায় না পেলে সে সুখী হবে না—তার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি তাকে তবু বুঝিয়েছি, যে, আমাদের ভালবাসা কোনদি[ন] লয় পাবে না—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নাই হল—দু'জনে আজীব[ন] দুজনের বন্ধু হয়ে ত থাকতে পারি। আমার এ জী[র্ণ] দীর্ণ জীবনটাকে কেন তুমি ভারের মত আপনার জীবনে[র] সঙ্গে বেঁধে কষ্ট পাবে! তবু সে মা, কিছুতে বুঝতে চায় না—

কারেনিনা। বয়সের দোষ—তাই বুঝতে পারছে না—

লিজা। আপনি মা তাকে বুঝিয়ে বলুন—যে[ন] সে আমায় বিয়ে না করে। আমারও এ বিয়েতে মত হচ্ছে না। আমি চাই ভিক্তরের সুখ, নিজের নয় আমার জন্যে তার নাম লোকের মুখের ঠাট্টা-টিট্‌কিরীতে ঘুরে বেড়াবে, এ ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যায়—এ চিন্তাও আমার সহ্য হয় না। তবে একটি কথা, আমায় আপনি ঘৃণা করবেন না, মা—আমি বড় দুঃখিনী, বড় অভাগিনী—

কারেনিনা। লিজা—

লিজা। (দীর্ঘনিশ্বাসান্তে মৃদুভাষে) না!—এ কিছু না—! (কারেনিনার প্রতি) আসুন মা—আমরা দুজনে ওকে নিবৃত্ত করি—ও সুখী হোক্!...তবে আমায় আপনি একটু ভালবাসবেন—

কারেনিনা। বাসব কি মা—! তোমায় দেখেই তোমার উপর আমার কি যে মায়া পড়েছে—তার পর তোমার মুখে এমন সব কথা শুনে যথার্থই তোমায় ভালবেসে ফেলেছি যে মা! (লিজাকে চুম্বন করিল। লিজা কাঁদিয়া ফেলিল।) না, মা—চুপ কর—কেঁদো না। তোমার বিয়ের আগে যদি ভিক্তরের সঙ্গে তোমার এমন ভালবাসা—! (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার অদৃষ্ট!

লিজা। সে বলে, তখনও আমায় সে ভালবাসত। তবে আর-একজনের সুখে—বিশেষ বন্ধুর সুখে—পাছে আঘাত দেয়—

কারেনিনা। আহা—! যেমন উঁচু মন তার, তেমনি কথা। দুঃখ করো না মা, আমার মেয়ে নেই, আমি তোমায় মেয়ের মতই ভালবাসব—তুমি আমার মেয়ে।

ভিক্তর। (প্রবেশান্তে) আমি বলিনি কি মা—যে, লিজাকে দেখলেই তুমি ওকে ভাল বাসবে! তা হলে, এখন আর তোমার অমত নেই?

কারেনিনা। অমত—! না বাবা, এখনও সে সব কিছু ঠিক করিনি। তবে এইটুকু বলে রাখি, ভিক্তর, মা শুধু ছেলের সুখ, ছেলের মঙ্গলই চায়। মাঝে যদি এই-সব ব্যাপারগুলো না থাকত,—

ভিক্তর। না মা, তুমি মত বদলো না,—তোমার পায়ে পড়ি—এই শুধু, আর আমার কোন কথা নেই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

একখানি জীর্ণ গৃহের দীন কক্ষ।

কক্ষের এক পার্শ্বে একটা মলিন শয্যা, অপর পার্শ্বে পুরাতন টেবিল ও সোফা। কক্ষের অবস্থাও জীর্ণ-মলিন।

ফিদিয়া একাকী বসিয়াছিল। সহসা দ্বারে করাঘাত হইল, ও নারীকণ্ঠে কে ডাকিল।

নেপথ্যে নারীকণ্ঠে। দোরটা খোল না, ফিদিয়া—অ ফিদিয়া—শুনছ?

ফিদিয়া। (উঠিয়া দ্বার খুলিয়া) কে? আরে—তুই! আয়, আয়—আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে, মাশা তুই এসেছিস,—বেশ হয়েছে!

মাশার প্রবেশ।

মাশা। তুমি বেশ লোক—যাও। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না—তোমার সঙ্গে আমার আড়ি!

ফিদিয়া। (মৃদু হাসিয়া) আড়ি! ও! তাই বুঝি এত পথ হেঁটে, বাড়ী বয়ে, আর কথা কবি না, এইটুকু বলতে এসেছিস—? তা আমার অপরাধটা কি, বল্। না, তাও বলবিনে?

মাশা। নিজে যেন জানেন না কিছু—বা রে!

ফিদিয়া। জানব যদি ত জিজ্ঞাসা করব কেন, মাশা?

মাশা। তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন, মোটে যাও না—

ফিদিয়া। তাই তোর রাগ হয়েছে?

মাশা। (ভেঙচাইয়া) তাই তোর রাগ হয়েছে! কেন হবে না রাগ? কেন তবে আমাকে তুমি ভাল-বাসতে? আমি তোমায় আর ভালবাসব না—তা বলে রাখছি।

ফিদিয়া। মাশা—

মাশা। হাঁ, মাশা নই ত কে আবার? তুমি আমায় একটুও ভালবাস না, একটুও না।

ফিদিয়া। (হাসিয়া) এত বড় অপবাদ তুই দিচ্ছিস মাশা? আমি তোকে ভালবাসি না,—এ কথা কে তোকে বল্লে?

মাশা। হাঁ, যা ভালবাস, তা আমি খুব জেনেছি। তোমার কোন কথা আমি আর বিশ্বাস করি না। লোকের কথাই ঠিক—তোমার কোন কথার ঠিক নেই।

ফিদিয়া। কোন্ কথাটা বেঠিক পেলি?

মাশা। কোন্টা নয়! এই ত সবাই বলছিল, ফিদিয়া তার বৌকে ডাইভোর্স করবে—তা করেছ?

ফিদিয়া। চুপ, চুপ,—চুপ কর্, মাশা—ওতে আমার কষ্ট হয়।

মাশা। হাঁ কষ্ট হয়! কিচ্ছু কষ্ট হয় না।

ফিদিয়া। মাশা, তুই এ কথা বলিসনে—দুনিয়া বলুক, সে আমায় বিশ্বাস করে না।—কিন্তু তুই বলিসনে।

মাশা। না, বলবে না? খুব বলব, একশ বার বলব, পাঁচশ বার বলব। কেন বলব না—?

ফিদিয়া। তুই কি জানিস না, মাশা, জগতে যদি এখন আমার কিছু সম্বল থাকে ত সে শুধু তোর ভালবাসা।

মাশা। আমার ভালবাসা! আমায় ত তুমি ভারী ভালবাস গো। বাসতে তোমার বড় বয়ে গেছে!

ফিদিয়া। বাসি কি না বাসি, তুই তা বেশই জানিস, মাশা—তবু তর্ক করবি!

মাশা। ভালবাসলে জান আর এত কড়া হত না—।

ফিদিয়া। কড়া? কার জান?—আমার? তুই আমায় কড়া বলছিস, মাশা?

মাশা। (কাঁদিয়া ফেলিল; পরে অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে) তুমি আমায় একটুও দেখ্তে পার না।

ফিদিয়া। (মাশার মস্তক আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে) কাঁদিসনে, কাঁদিসনে, মাশা, লক্ষ্মীটি, কাঁদিসনে। জীবনটার দাম আছে, মাশা, সেটা কেঁদে'কাটাবার জন্যে নয়। কেন—তোর কিসের দুঃখ? কিসের কান্না? তোর এই এমন টানা কালো চোখ—জলে ভরে যাবে, এ যে মানায় না, মাশা।

মাশা। আমায় ভালবাসবে? বল—

ফিদিয়া। বাসব,—বাসি ত! তুই ছাড়া আর আমার কে আছে, মাশা?

মাশা। না, আমাকে, শুধু আমাকেই ভালবাসতে হবে, আর কাউকে নয়। বাসবে, বল?...আচ্ছা, বাস, বল্‌লে ত?

ফিদিয়া। (সহাস্যে) বাসি। প্রমাণ চাস্?

মাশা। প্রমাণ? আচ্ছা, চাই। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) ওটা কি লিখ্‌ছিলে, তবে পড়—পড়ে আমাকে শোনাও —ঐ যে টেবিলের উপর কি-লেখা কাগজ রয়েছে—

ফিদিয়া। ওটা শুনলে তোর মনে কষ্ট হবে—

মাশা। না হবে না কষ্ট। তুমি পড়।

ফিদিয়া। শোন্ তবে। (পাঠ) "শরতের শেষ। সন্ধ্যার সময় স্থির করিলাম সুরিজিন দুর্গে দুই জনে দেখা করিব—বন্ধু ও আমি। যখন দুর্গে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সুন্দর প্রাসাদ—মাথায় কতকগুলি ছোট চূড়া। তাহারই গা বেড়িয়া কুয়াশার সূক্ষ্ম আবরণ——"

মাশার বৃদ্ধ পিতা আইভান ও মাতা নাস্তাসিয়া প্রবেশ করিল।

নাস্তাসিয়া। (মাশার নিকট আসিয়া) এই যে—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, এখানে এসে আড্ডা দিচ্ছ! আর জায়গা পাওনি? আমরা কোথায় চারধার খুঁজে হায়রান হয়ে যাচ্ছি—কাণ্ড কি, বল্‌ দেখি! (ফিদিয়ার প্রতি) তোমায় কিছু বলিনি, সাহেব—আমার মেয়েকে বলছি।

আইভান। (ফিদিয়ার প্রতি) আপনি কি রকম ভদ্দর লোক, মশাই? এমনি করে একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করছ—এটা কি তোমার—আপনার উচিত হয়েছে?

নাস্তাসিয়া। (মাশার প্রতি) নে, গায়ে এই শাল-খানা চাপা দে! চ' এখান থেকে, পোড়ারমুখী। মেয়ে পাখা উঠেছে, এখান অবধি উড়তে শিখেছ! এখন আমি লোকের মুখ চাপা দি কি করে, বল্‌ দেখি! চারধারে যে ঢাক বেজে গেছে! একটা ভিখিরির সঙ্গে এসে মস্করা হচ্ছে! কাণা কড়ি দেবার যার মুরদ নেই—গলায় দড়ি গলায় দড়ি!

মাশা। করেছি কি—আমি—? যাও, আমি যাব না ফিদিয়াকে আমি ভালবাসি—তাই এখানে এসেছি। বেশ করেছি এসেছি। তাতে কার কি? আমার যখন খুসি হবে তখন আমি বাড়ী যাব। যাব না যে মোটে এমন ত নয়।

নাস্তাসিয়া। পাঁচটা ভদ্দর লোক গান শুনতে এসে ফিরে যাচ্ছে—

মাশা। আর গাইব না, এমন কথা ত বলিনি—

আইভান্। থাম্, থাম্—আর ন্যাকামি করতে হবে না। বুড়ো বাপ-মা—তাদের যে মাথা কাটা যাচ্ছে। (ফিদিয়ার প্রতি) আর আপনারই কি এ উচিত হয়েছে? আপনাকে ভদ্দর লোক বলেই জান্‌তুম—একটু ভালও যে না বাসতুম, এমন নয়! এই যে কদ্দিন গান শুনে গেছ, একটিও পয়সা দাওনি, তা কোন দিন কি আসতে মানা করেছি, না, এলে তাড়িয়ে দিয়েছি! এই বুঝি তার শোধ হচ্ছে!

নাস্তাসিয়া। মেয়েটাকে কি এমনি করেই গুণ করতে হয়! গুণ নয় ত কি! আমার ঐ একটি মেয়ে—সাত নয়, পাঁচ নয়, মোটে একটি—আমাদের সে চোখের তারা, আঁধার ঘরের মাণিকটুকু—এমনি করেই কি তাকে মজাতে হয়? লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় ত বটেই, তার উপর কত বড় বড় লোক সব মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে গান শুনতে এসে ফিরে গেল—! বলি, একটা ধর্ম্মভয়ও কি নেই, বাছা?

ফিদিয়া। নাস্তাসিয়া, আইভান,—তোমরা ভুল করছ, মিথ্যে রাগ করছ। আমায় এতটা বদমায়েস ঠাওরো না—মদ খাই, আর যাই করি, আমি একেবারে পশু হয়ে যাইনি! তোমাদের মেয়ে—এই মাশা—ফুলের মতই এ শুভ্র, নিষ্পাপ, নির্ম্মল—আমার কাছে তার মর্য্যা-

দার এতটুকু হানি হয়নি। বিশ্বাস কর—মাশা আমার বোন—আমার মার পেটের বোন্।...তবে মাশাকে আমি ভালবাসি —কি করব, তাকে না ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আইভান। যখন টাকা ছিল তখন ভালবাসতে পারনি? হাজার, খানেক টাকা নিয়ে এলে কি আর মাশাকে আমরা ছেড়ে দিতুম না? তখনত আর এমন মাথাও হেঁট হত না। এ হলেত ভদ্দর লোকদের মতই কাজ হত। তা না, এখন সর্ব্বস্ব খুইয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েকে চুরি করে আনা!।তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

মাশা। ফিদিয়া আমায় আনবে কেন? কেউ আমায় আনেনি,—আমি নিজে এসেছি। আমায় ধরে বেঁধে নিয়ে যাবে? চল,—কিন্তু তালা এঁটেও রাখতে পারবে না, তা কিন্তু বলে রাখছি। আমি আবার আসব। ফিদিয়াকে আমি ভালবাসি—ওকে ছেড়ে কখনই আমি ঘরে থাকব না।

নাস্তাসিয়া। ছি মা—এ সব কথা কি বলতে আছে? লোকে যে নিন্দে করবে! তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে—ছিঃ! চল, বাড়ী চল।···এস।

আইভান। মাশা, তোর ভারী আস্পর্দ্ধা হয়েছে দেখছি—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে কোথাকার! চুপ কর্ বলছি। (মাশার হাত ধরিল) আয়—(মাশাকে সবলে টানিয়া আইভান ও নাস্তাসিয়ার প্রস্থান।)

প্রিন্স সার্জ্জিয়সের প্রবেশ।

প্রিন্স। আমায় মাপ করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ আমি আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে ফেলে যে অপরাধ করেছি—

ফিদিয়া। কে আপনি? (চিনিতে পারিয়া) ওঃ—আপনি—প্রিন্স সার্জ্জিয়স! (অভিবাদন।)

প্রিন্স। আপনার কাছেই একটা দরকারে আসছিলুম—হঠাৎ আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে ফেলে—

ফিদিয়া। যাক্—তার জন্যে কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই! বসুন।...আমার কাছে আপনার কি দরকার, বলুন দেখি—আমিত কিছু বুঝতে পারছি না। হাঁ, তবে একটা কথা বলে রাখি। আমার সম্বন্ধে আপনার যেমনই ধারণা থাক না,—এই মেয়েটি—ও বেদেদের মেয়ে, মুজরো করে বেড়ায়—মেয়েটি খুবই ভালো। ওর মনে এতটুকু মলা নেই। নিষ্পাপ দেহ, নির্ম্মল চরিত্র। ওর উপর আমারও মনের ভাব এতটুকু দূষণীয় নয়। এর মধ্যে হয়ত একটু কাব্য থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তার পবিত্রতায় কখনো এতটুকু আঁচড় লাগতে দিই নি। আপনি হয়ত মনে কর্‌তে পারেন, এসব কথার তাৎপর্য্য কি? আছে একটু—পাছে এর উপর আপনার একটুও সন্দেহ জন্মায়, তাই বলছি। তা ছাড়া এ ব্যাপারে নিজের মনটারও একবার সাড়া নিলুম। নিয়ে বড় তৃপ্ত হলুম। যাক্, নিজের কথাই কতকগুলো বকছি শুধু—। হ্যাঁ, আপনার কি দরকার, যদি অনুগ্রহ করে বলেন—

প্রিন্স। হাঁ, সেই কথা বলি। এই—

ফিদিয়া। তার আগে আমার একটা বক্তব্য আছে। সমাজে আজ আমার জায়গা আছে কি না সন্দেহ, তাই একটু অবাক হচ্ছি—আপনার মত মহৎ লোক হঠাৎ আমার কুঁড়েয় এলেন—

প্রিন্স। সেই কথাই বলছি। সমাজ আপানার সম্বন্ধে যে ধারণাই করুক আজ, আমার ধারণা একটুও তাতে খাটো হবে না।

ফিদিয়া। সে আপনার অশেষ অনুগ্রহ!

প্রিন্স। কথাটা কি—ভিক্তর কারেনিন হল আমার আত্মীয়—খুবই নিকট-আত্মীয়। তার মার অনুরোধেই আমি এসেছি—অর্থাৎ তিনি জানতে চান্ যে, আপনার স্ত্রী লিজার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় এখন—?

ফিদিয়া। আমার স্ত্রী—! লিজা? কেন—তার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে ত।

প্রিন্স। এ কথাটাও বুঝেছি। অর্থাৎ কি জানেন, আসলে, আমার জানবার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে—বুঝলেন কি না—

ফিদিয়া। শুনুন, আমি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। লিজা—তার এতে কোন দোষ নেই—দোষ আমারই। আমার দোষের অন্ত নেই, সংখ্যাও নেই। সে—এমন স্ত্রী অনেক ভাগ্যে মেলে—

প্রিন্স। ভিক্তর কারেনিন—বিশেষ তার মা—

আপনার অভিপ্রায়টা জানতে চান। তাই আর-কি আমি এসেছি।

ফিদিয়া। (বিনীতভাবে) অভিপ্রায়—এমন-কিছু নেই। সে এখন স্বাধীন, মুক্ত! অর্থাৎ আমি আর তার কোন সুখে বিঘ্ন হব না—এই আমার সাফ জবাব! আমি জানি, লিজা ভিক্তরকে ভালবাসে, ভিক্তরও লিজাকে ভালবাসে—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। ভিক্তর লোক ভাল—সচ্চরিত্র, ধীর, শান্ত—আর তার হাতে লিজা সুখেই থাকবে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন।

প্রিন্স। হুঁ, কিন্তু আমরা—

ফিদিয়া। (বাধা দিয়া) না, না, আপনি মনে করবেন না, যে, আমি রিষের জ্বালায় এ-সব বলছি। মোটেই তা নয়। ভিক্তর আজ সবে নতুন লিজাকে ভালবাসতে সুরু করেনি, লিজাও না। দুজনেই দুজনকে বহুদিন থেকে ভালবেসে আসছে। আসল খাঁটি ভালবাসা, যাকে বলে। কিন্তু এ ভালবাসা কখনো তারা প্রকাশ হতে দেয়নি—অতি গোপনে সন্তর্পণে তাকে চাপা দিয়ে এসেছে। তা বলে লিজা কি আমায় অযত্ন করত? না—! সে প্রাণপণে ভিক্তরের ভালবাসা মুছে ফেলবার চেষ্টা করত তার বুক ভেঙে যেত, প্রাণ ছিঁড়ে যেত, তবু এই ভালবাসাটা ছায়ার মত তার চারিধারে ঘুরে বেড়াত। তার সমস্ত সেবা, সমস্ত যত্নের মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী কালির আঁচড় টেনে দিত!... কিন্তু না, এ সব-কথা আপনাকে বলা উচিত হচ্ছে না, বোধ হয়।

প্রিন্স। আমায় আপনি বন্ধু বলে মেনে নিতে পারেন। শুনুন, আমার আসবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু লিজার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি, তাই জানা। সব আমি বুঝেছি—ছায়ার মত, রাহুর মত আপনাদের দাম্পত্য জীবনের আশে-পাশে এই ভালবাসাটা ঘুরে বেড়াত!

ফিদিয়া। বেড়াত। বোধ হয় তাই স্ত্রীর সঙ্গে আমার কেমন খাপ খেত না। আমিও তাই বাধ্য হয়ে সুখের জন্য অন্যত্র বেরুতে লাগলুম—তখন প্রথম যৌবন—মনের বেগও উদ্দাম, মদের মত তীব্র ফেনিল—কিন্তু যাক্, অত বিস্তারিত বর্ণনায় লাভ নেই। ভাবে না, নিজের দোষটুকু সমর্থন করবার জন্যে এ কথা বলা কেন সমর্থন? কিসের আশায়? কার ভয়ে? আম আমার কোন কৈফিয়ৎই নেই। আমার মত লক্ষ্মীছা লোক, তার স্বামী হবার যোগ্য নয়! আমি তা একেবারে মুক্তি দিচ্ছি—সে স্বাধীন—সম্পূর্ণ স্বাধী একথা স্বচ্ছন্দে তাদের আপনি বলতে পারেন।

প্রিন্স। এ-সব ত বুঝলুম। আসল গোল জানেন—এ বিয়েতে ভিক্তরের মার ত মোটেই মত নে আর-একজনের ডাইভোর্স-করা স্ত্রী—অর্থাৎ আমার মত এত সঙ্কীর্ণ নয় অবশ্য। একবার বিয়ে হয়েছিল, তা কি! সে বিয়ে যদি সুখের না হয়ে থাকে ত, তা কাটি আবার যদি একটা বিয়ে হয়, তাতে ক্ষতিই কোন্‌খানে! তুচ্ছ একটা শাস্ত্রের অনুশাসনে এক মানুষ আজীবন কষ্ট পাবে—তার জীবন ব্যর্থ নিষ্ফল হ যাবে—

ফিদিয়া। তা ডাইভোর্সে ত আমার অমত নেই আমি ত বলেওছি। তবে আসল কথা কি জানেন, এ জন্যে আদালতে গিয়ে কতকগুলো মিথ্যে হলপ্‌ কর আমি একেবারে নারাজ! মিথ্যে কথাই বা কি ক বলি!

প্রিন্স। সে কথা ঠিক। তা আচ্ছা, সে বিষ আমরা পরামর্শ করে একটা উপায় দেখে নিচ্ছি আপনি—হাঁ—আপনি ঠিকই বলেছেন—

ফিদিয়া। তা হলে—দেখুন, আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখবেন। আমি ত একটা পাষ বদমায়েস, কিন্তু তবু দু-একটা পাপ এখনও করতে পা না—পারবও না কখনো। সেটা ঐ মিথ্যা কথা বলা-মিথ্যে কথাটা গলায় কেমন আটকে যায়—বলতে পারি না।

প্রিন্স। দেখুন, কিছু মনে করবেন না—কিন্তু যত আপনার সঙ্গে কথা কইছি ততই আপনাকে হেঁয়া বলে মনে হচ্ছে। এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি,—এমন উঁচু ম আপনার—আপনি কি করে যে নিজের এ দশা করলে তা কিছুতেই ঠাওরাতে পারছি না। কেন নিজে

এ সর্ব্বনাশ করলেন বলুন দেখি? —যথার্থই আমার দুঃখ হচ্ছে।

ফিদিয়া। (কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া) আজ দশ বৎসর ধরে আমি এই অধঃপতনের পথে ক্রমশই নেমে চলেছি।—কিন্তু আপনার মত এমন সহৃদয় বন্ধু কখনো পাইনি। এমন করে কেউ আমার মনটাকে কোন দিন তলিয়ে বুঝতে চায়নি। এত দয়া, এমন মিষ্ট কথা কোথাও কোনদিন আমার বরাতে জোটে নি! যদি জুটত—! আমার সঙ্গীরা?—তারা দুঃখ করে, বকে, উপদেশ দেয়, কিন্তু এমন প্রাণের সঙ্গে কেউ কোনদিন কিছু বলেনি।......আপনার দয়া কখনো ভুলব না।... কিসে এমন হলুম, জিজ্ঞাসা করছেন? কিসে আবার? মদে। মদই আমাকে আজ জানোয়ার করে তুলেছে। তবে ভাববেন না যে শুধু ফূর্ত্তির জন্যে মদ খাই, ভাল লাগে বলে খাই! তা না—মদে সব ভুলিয়ে দেয়—বিস্মৃতির জালে প্রাণটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলে! কোন ভাবনা থাকে না, চিন্তা থাকে না, জাগরণ থাকে না—সব বালাই চুকে যায়। যখন জ্ঞান হয়, যখন জেগে থাকি, তখন সব কথা মনের মধ্যে হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দেয়—সে যেন আগুনের খেলা—প্রাণ পুড়ে যায়, মন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, তাই তাতে মদের ধারা ঢেলে দিই—আগুন নিভে যায়, ভাবনা উড়ে যায়—প্রাণটা জুড়োয়,—তাই মদ খাই। তখন একেবারে নিস্পরোওা— ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, ভয় নেই, ডর নেই, লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভারী আরাম—বিস্মৃতির আরাম, অজ্ঞানের আরাম! তার পর গান—এই বেদেদের গান! রূপের পরী যেন! বেদের মেয়ের আঙুরের মত তুলতুলে কচি ঠোঁট বেয়ে গানের সুধা ঝরে পড়ে, অমনি চোখ বুজে আসে, স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলি!...তবে যখন আবার জ্ঞান হয়, উঃ, তখন সে কি লজ্জা, কি ঘৃণাই যে কাঁটার মত গায়ে বিঁধতে থাকে—কি ছিলুম, কি হয়েছি ভেবে পাগল হয়ে যাই যেন। তখন আবার মদ, আবার গান। দিবারাত্রি শুধু এই মদ আর গানের স্রোত ছুটতে থাকে।

প্রিন্স। কাজ-কর্ম্ম?

ফিদিয়া। দেখেছি, ঢের চেষ্টা করেছি। কাজে কেমন গা লাগে না, মন বসে না।...কিন্তু যাক্, এ-সব কথা আর কেন? বিশেষ আমার কথা—ও ছেড়ে দিন।—তবে আপনাকে ধন্যবাদ—এত দয়া, এত স্নেহ!—আবার ধন্যবাদ দি।

প্রিন্স। বেশ, তবে আসি। তা হলে গিয়ে তাদের কি বলব?

ফিদিয়া। বলবেন যে, যা তারা করতে বলবে, তাই হবে, তাই করব। তারা বিয়ে করে করুক, তাদের পথ নিষ্কণ্টক।

প্রিন্স। হাঁ, এ ছাড়া আর কি!

ফিদিয়া। তাই হবে। আমার উপর তারা এটুকু নির্ভর রাখতে পারে। এর ব্যবস্থাও আমি করব।

প্রিন্স। কবে?

ফিদিয়া। কবে—? ও—তা আচ্ছা, পনেরো দিন শুধু সময় চাই। তাতে কি অসুবিধা হবে কিছু?

প্রিন্স। না, অসুবিধা আবার কি! তা হলে এই কথা—কেমন?

ফিদিয়া। হাঁ, এই কথা পাকা কথা।

প্রিন্স। তা হলে আমি আসি। নমস্কার—

ফিদিয়া। নমস্কার, নমস্কার (প্রিন্স চলিয়া গেল।)

(বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল পরে মৃদু হাসিল)

নাঃ—বেশ—এ বেশ হয়েছে! এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? ঠিক হয়েছে—ঠিক! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গৃহহারা

ঝটিকা হুঙ্কারি চলে, মত্ত বৃষ্টিধারা
আমারে আঘাত করে পাগলের পারা
চারি দিকে; ছিন্ন দীর্ণ অম্বর অপার—
তিমির-স্তম্ভিত রাত্রি, স্তব্ধ চারিধার;
সিক্ত কম্পমান তনু, ব্যাকুল হৃদয়,
তোমারি তোরণ-তলে যাচিয়া অভয়
দাঁড়ায়ে রয়েছি একা; এস একবার
ওগো খুলে দাও তব নিরুদ্ধ দুয়ার,
আমারে ডাকিয়া লও মন্দিরের তলে,
যেথায় শান্তির মাঝে নিত্যদীপ জ্বলে।

৫।৫।১৩　　শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দিদি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক :—অমরনাথ বন্ধু দেবেন্দ্রকে না জানাইয়া সুরমাকে বিবাহ করিয়াছিল। দেবেন্দ্র না জানিয়া চারুর সহিত অমরনাথের জীবন-ঘটনা এমন জড়াইয়া ফেলে যে অমর চারুকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সে পিতা কর্ত্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হইয়া চারুকে লইয়া স্বতন্ত্র থাকে, এবং সুরমা শ্বশুরের সংসারের কর্ত্রী হইয়া উঠে। অমরের পিতার মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে ক্ষমা করিয়া চারুকে সুরমার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞা চারু দিদিকে আশ্রয় পাইয়া আনন্দিত হইল দেখিয়া সুরমাও সপত্নীর দিদির পদ গ্রহণ করিল।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামী বাড়ী আসাতে সুরমা সংসারের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিল। কিন্তু অমর চিরকাল বিদেশে কাটাইয়া সংসার-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সে বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য সুরমার শরণাপন্ন হইল।

এইরূপে ক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিচয় হইল। অমর দেখিল সুরমার মধ্যে কি মনস্বিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মপটুতা ও একপ্রাণ ব্যথিত স্নেহ আছে। অমর মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ক্রমে প্রণয়ের আকারে তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

সুরমা বুঝিল যে চারুর স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া চারুর প্রতি অন্যায় করিতে যাইতেছে, এবং সেও নিজের অলক্ষ্যে চারুর স্বামীকে ভালবাসিতেছে। তখন সুরমা স্থির করিল যে ইহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। চারুর অশ্রুজল, চারুর পুত্র অতুলের স্নেহ, অমরের অনুরোধ তাহাকে টলাইতে পারিল না। বিদায় লইবার সময় অমর সুরমাকে বলিল, যাইবার পূর্ব্বে একবার বলিয়া যাও যে ভালবাস। সুরমা জোর করিয়া "না" বলিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে কাঁদিয়া লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল "ওগো শুনে যাও আমি তোমায় ভালবাসি।"

সুরমা পিত্রালয়ে গিয়া তাহার বিমাতার ভগ্নী বালবিধবা উমাকে অবলম্বনস্বরূপ পাইয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। সুরমার সমবয়সী সম্পর্কে কাকা প্রকাশ উমাকে ভালবাসে, উমাও প্রকাশকে ভালবাসে, বুঝিয়া উভয়কে দূরে দূরে সতর্কভাবে পাহারা দিয়া রাখা সুরমার কর্ত্তব্য হইল।

এদিকে চারুর একটি কন্যা হইয়াছে; এবং চারুর সম্পর্কে ভাইঝি মন্দাকিনী তাহার দোসর জুটিয়াছে। কিন্তু দিদির বিচ্ছেদ-বেদনা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অমরও সান্ত্বনা পাইতেছিল না। শেষে স্থির হইল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতে হইবে। কাশীতে গিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে একদিন হঠাৎ অমরের সহিত সুরমার দেখা হইয়া গেল। ক্রমে চারুও দিদির সন্ধান করিয়া সুরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এই সময় সুরমা চারুর ভাইঝি মন্দাকিনীকে দেখিয়া স্থির করিল যে তাহার সহিত প্রকাশের বিবাহ দিয়া উমাকে বুঝাইতে হইবে যে প্রকাশ তাহার কেহ নহে, এবং প্রকাশকেও উমাকে ভুলাইতে হইবে।

প্রকাশ ব্যথিত হৃদয়ে সুরমার এই দণ্ডাদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। সুরমা প্রকাশের বিবাহের দিন উমাকে লইয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিল।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশ ও মন্দাকিনীর বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ অমরকে বলিল "আর কেন, এখন দেশপানে চল, কতদিন ছাতুর দেশের বায়ু হজম করবে?" অমর বলিল "হজমের কিছু কি গোলমা দেখ্‌ছ?" "তা ত দেখ্‌ছি না, সেই ত ভয় পাচ্ছি। পাছে জমীদারি ভুঁড়ীটি কায়েমী রকমে বাঁধি ফেল।" "সে ত ভাল কথা! আর দেখেছ চারু বেশ সেরেছে?" "তা ত দেখছি। তাই বলে কি আ দেশে ফির্‌তে হবে না।" "একবার যাব। তারপ সব বন্দোবস্ত করে রেখে একবার কাজের লো হবার চেষ্টা কর্‌তে হবে।" "রক্ষা কর দাদা! কাজে লোক হওয়া সবার ধাতে সয়না, অন্ততঃ যার সর্দি হ'লে মাথায় কম্ফর্টর বাঁধবার তিনটে লোক চা তার দাদা অকেজো হয়ে থাকাই ভাল।" "আহ কম্ফর্টর বাঁধবার লোকও সঙ্গে নিতে হবে, কাজেও লাগতে হবে।" "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়।" চারু আসিয়া শুনিয়া বলিল "না, আগে দিদি এসে পৌঁছুন, তিনি দেখা করে যাবেন বলেছেন।" অমর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "তবে কি এখন তাঁর 'আসার আশায়'ই চাতকের মত বসে থাক্‌তে হবে?" চারু রাগিয়া বলিল "বড়ই অপমানের কথা, না?" "না খুব মানের কথা?" "কিসে অপমান শুনি!" "আমি তোমার সঙ্গে বক্‌তে পারিনে; যত দিন ইচ্ছে থাক কিন্তু আমায় আর বকিও না।"

তেওয়ারী আসিয়া হাঁকিল "চিট্‌ঠি"। অমর পরিহাস করিয়া বলিল "তোমার বার্ত্তা এল বুঝিগো।" "যাও যাও ঠাট্টায় কাজ নেই" বলিয়া পত্রখানা শেষ করিয়া গম্ভীর মুখে উঠিয়া চলিল। অমর ডাকিল "ব্যাপার কি শুনিই না! এখন বুঝি আর আমি কেউ নই? বল না কার পত্র?" "দরকার কি।" "শোন শোন।" "শুন্‌তে চাই না, তেওয়ারী একখানা গাড়ী ডেকে আন্‌ত।" "গাড়ী কি হবে? কোথায় যাবে?" "বেয়ানের সঙ্গে দেখা কর্‌তে।" "বেয়ান? ওঃ নূতন সম্বন্ধে টান যে বেশী দেখছি।" "কেন হবেনা? পুরোণো সম্বন্ধ যে জ্বলে গিয়েছে, এটা নূতন।" অমর নীরব হইয়া পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল। সুরমা লিখিয়াছিল যে চারু যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিতে পারে ত' বড় ভাল

হয়। বাড়ীতে সে, উমা ও চাকর চাকরাণী ভিন্ন অন্য কেহ নাই। দুএকদিনের মধ্যেই তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে।

চারুর যাওয়ায় অমরনাথ কোন আপত্তি করিল না। প্রথম দর্শনে উভয়েরই কিছুক্ষণ বিবাহের কথাবার্ত্তায় কাটিল। চারু একটু ক্ষুণ্নভাবে বলিল "প্রকাশ কাকা বোধ হয় এ বিয়েয় তত খুসী হয়নি, মুখে একটুও হাসি দেখলাম না, হয়ত মেয়ে পছন্দ হয়নি।" সুরমা বলিল "পাগল!" "কিন্তু দিদি মন্দা মেয়েটি বড় নির্ম্মায়িক, যাবার সময় একটুও কাঁদ্‌লে না, কেবল অতুলকে কোলে নিয়ে চুমু খেলে। আমায় নমস্কার করে কেবল মাথা হেঁট করে রইল, কিচ্ছু বল্‌লে না"—সুরমার তাহার কথা শুনিতে আর ভাল লাগিল না। কথার মাঝখানে বলিল "আমি ভেবেছিলাম হয়ত তোমরাও দেশে চলে গেছ।" "তুমি যে থাকতে বলে গিয়েছিলে। কখন এলে?" "সকালের গাড়ীতে।" "বাড়ীর সব ধুমধাম ফুরিয়ে গেলে তবে বাড়ী যাবে নাকি? তিন চার দিনের কথায় এত দেরী হ'ল যে?" "কি করি বল! তীর্থে বেরুলে কি শীগ্‌গির ফেরা যায়। বৌভাত ত তিন চার দিন হয়ে গেছে, বাবা খুব রেগেছেন হয়ত।" "দিদি, মন্দাকে এখন একবার পাঠালে ভাল হ'ত না? এরপর আবার নিয়ে যেতে?" সুরমা ভাবিয়া বলিল "প্রকাশ তাহেরপুরে নিতান্ত একা থাকে কি না—মাস ছয় বাদে সে বাড়ীতে আস্‌বে তখন মন্দাকে এনো, সে এখন ছেলেমানুষটীও নয়, বেশ থাক্‌বে।" "তা থাক্‌বে" বলিয়া চারু নিশ্বাস ফেলিল। উমা নীরবে বসিয়া ছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া অন্য ঘরে গেল। চারু সুরমাকে বলিল "উমা এমন হয়ে গেল কেন দিদি?" সুরমা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, স্খলিত কণ্ঠে বলিল "কি রকম?" "এত গম্ভীর, হাসিখুসী একেবারে নেই, মন-মরা ভাব।" সুরমা গম্ভীর মুখে বলিল "ভগবান ছোটবেলায় যে আঘাতগুলো করে রেখেছেন বুদ্ধি আর বয়সের সঙ্গে সেগুলো হৃদয়ে প্রবেশ করে, তা কি বোঝ না?" চারু নীরবে রহিল। দেখিতে দেখিতে চারুর চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। "তুমি আর এখানে ক'দিন আছ?" সুরমা বলিল "কি জানি! কদিন থাক্‌ব বলে' দে না।" "আমার কথায় থাক্‌বে? আমার আবার এত ভাগ্যি!" "বাবা যা রাগবার তা ত' রেগেছেনই! এখন দিন দুই পরেই যাব।" "তবে ভালই হবে, আমার রামনগর দেখা হয়নি, চল কাল দেখ্‌তে যাবে?" সুরমা হাসিয়া বলিল "আচ্ছা তা যেতে পারি কিন্তু"—"কিন্তু কি?"—"আচ্ছা তুই বাড়ী গিয়ে ঠিক্ করগে ত' তারপরে বলে পাঠাস্।" "দিদি, নতুন বাড়ী কেনা হয়েছে জান?" "না এই শুন্‌ছি, কোথায়?" "অসীর ধারে, একদিন দেখ্‌তে যাবে না?" "আগে রামনগর ত চল, তারপরে বোঝা যাবে।"

পরদিন রামনগর যাওয়া হইল বটে কিন্তু অমরনাথ গেল না, দেবেনই তাহাদের লইয়া গেল। চারু সেজন্য সুরমার কাছে অনেক রাগ প্রকাশ করিল। সুরমা হাসিয়া বলিল "তাইত কিন্তু বলেছিলাম।" "কেন ভাসুর ভাদ্রবৌ ত নয়?" "তার চেয়েও বেশী।" চারু রাগ করিয়া বলিল "আমি অত জানি না।" সুরমা মনে মনে বলিল "কি করে জান্‌বি।"

দুই দিন বড় সুখেই কাটিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে চারু ছেলে মেয়ে লইয়া সুরমার কাছে উপস্থিত হইত, সে সময়টা সুরমার মরুভূমে বারিবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এর পূর্ব্বে ত কই চারুর সঙ্গ এমন মিষ্ট লাগে নাই—এ যেন মরণের পূর্ব্বে প্রাণপণে জীবনের আনন্দবিন্দু উপভোগ; যেন মরুভূমি-যাত্রীর প্রাণপণে পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লওয়া!—নিভিবার পূর্ব্বে যেন প্রদীপের জ্বলিবার উদ্দীপ্ত আগ্রহ! অতুল মন্দার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া এখন উমাকেই দিদি বলিয়া মানিয়া লইল, কিন্তু এ দিদির নাকে নোলক, হাতে বালা না থাকাতে তাহার বড় অপছন্দ হইতে লাগিল। চারু হাসিয়া বলিল "এই দিদিই যে তোর আগের দিদি, তা বুঝি মনে পড়ে না?" সুরমা বলিল "ওর সে দিদি এই দিদিতে মিশে গেছে।" উমা নীরবে একটু হাসিল মাত্র। চারু বলিল "উমা, নতুন বাড়ী দেখ্‌তে যাবি না?" উমা সুরমার পানে চাহিল। "মার দিকে চাচ্চিস্—

আমি আর বুঝি কেউ নই ?" উমা আবার একটু হাসিয়া বলিল "যাবনা ত' বলিনি।" "কি বল দিদি ! যাবে না ?" "কবে ?" "কাল ভাল দিন আছে গৃহ-প্রবেশ হবে, আমরা সবাই যাব. সেখানে চড়িভাতি হবে। তোমার সেখানে নেমন্তন্ন রইল, নতুন বেয়াই-বাড়ী যাবে, বুঝেছ ?" সুরমা চারুর গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল "এত কট্‌কটে কথা বল্‌তে শিখেছ ?" "না বলে আর থাক্‌তে পারি না যে।" "যেতে পারি, কিন্তু কাল রাত্রে যে বাড়ী যাব, কখন যাই বল ?" "কেন সকালে, রাত্রে না হয় যাবে। আর দুদিন থাক্‌বে না দিদি ! হয়ত এই শেষ ! আবার কখনো কি দেখা হবে ?" "হয়ত এই শেষ" সুরমার কানে কেবল এই কথাই বাজিতে লাগিল। হয়ত এই শেষ ! তবে দুএকটা আনন্দের—সুখের স্মৃতি সঙ্গে লইয়া গেলে দোষ কি ? তাহার সঙ্কল্প ত' অপরিবর্ত্তনীয় তবে সামান্য ইচ্ছাগুলাকেও কেন বুকের মধ্যে এমন করিয়া চাপিয়া লইয়া চলিয়া যায় ? হয়ত এই ক্ষুদ্র বাসনাগুলি কখন' কণ্টকের মত বিঁধিতে পারে। মুখের আলাপ চোখের দেখা ইহা কতক্ষণের জন্য এবং ইহাতে কিই বা যায় আসে ! কাহারো ইহাতে কোন' ক্ষতি নাই, অন্য কাহারো ইহাতে লাভও নাই ! তাহারই বা লাভ কি ! লাভ লোক্‌সান কিছুই নাই কেবল শোণিত-সাগরে একটু ফেনোচ্ছ্বাস,—চক্ষের একটা দুস্পৃহার তৃপ্তি, তুচ্ছ বাসনার একটু তুচ্ছ সফলতা ! সুরমাকে নীরব দেখিয়া চারু বলিল "যাবে না ?" "যাব। তবে তোমাদের কোন' গোলমাল বাধ্‌বে না ত ?" "তুমিই গোলমাল বাধাতে অদ্বিতীয়, আবার লোকের দোষ দাও ! আমরা কাল গিয়ে তোমায় নিতে গাড়ী পাঠিয়ে দেব, সকাল করে যেও, বুঝেছ ? উমাকেও নিয়ে যেও।" "আচ্ছা।" "নিতে পাঠাতে হবে নাকি ?" "তবে যাবনা যা।" "একটা ঠাট্টাও সইতে পারনা ! আজ তবে চল্লাম—কালকের সব ঠিক করতে হবে, বলে রাখিগে।"

চারু বাড়ী গিয়া অমরকে সমস্ত কথা বলিল। কাল যে চড়িভাতি পরম শোভনীয় হইবে তাহার অনেক আভাস দিয়া বলিল "এখনো চুপ করে রয়েছ ? জোগাড় কর্‌বেনা ?" "কি কর্‌তে বল ? রোশনচৌকিতে হবে, না গোরার বাজনা চাই ?" "ওতেই ত' তোমার উপর রাগ ধরে। দিদি কত দিনের পর বাড়ীতে আস্‌বে, একটু জোগাড়যন্ত্র না কর্‌লে হয় ?" "হঠাৎ এ মতিভ্রম কেন ?" "তুমি জিজ্ঞাসা করগে আমি জানি না।" "তুমি যেমন পাগল—ও একটা স্তোভ কথা বুঝ্‌ছ না ?" "নিজমুখে বলেছে আস্‌বে, স্তোভ কথা হল ? তুমি বাড়ী ছেড়ে পালাবে কখন ?" "সে কথা কেন ?" "তুমি পালাবে আর লোকে বল্‌বে না ? সে যার সেই ভয়ে আস্‌তেই রাজি হচ্ছিল না।" অমর অতর্কিত ভাবে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, সাম্‌লাইয়া লইল। চারু বলিল "কই ওখানের কিছু বন্দোবস্ত করাবে না ?" "কি করাতে হবে বলে দাও, দেবেন সব ঠিক করে রাখ্‌বে।" "তবু নিজে নড়্‌বে না ?" "কুড়ে লোক যে, জানই ত।"

রাত্রে আহারাদির পর যখন অমর জানালার ধারে একখানা কৌচের উপর একখানা বই লইয়া শুইয়া পড়িল তখন অম্লান চন্দ্রকিরণে পৃথিবী হাসিতেছিল। গবাক্ষ দিয়া শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু প্রবেশ করিয়া যদিও তাহাকে একটু কাঁপাইয়া তুলিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নাটুকু উপভোগের লোভ ছাড়িতে পারিল না। বইখানা সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া স্থির নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কঙ্করময় দেশের বহুযত্ন-রোপিত পুষ্পবৃক্ষগুলাও অতি জীর্ণ শীর্ণ ! সমস্ত দিন প্রচণ্ড ধূলা খাইয়া এখন তাহারা শুভ্র চন্দ্রকিরণে যেন একটু আরাম উপভোগ করিতেছিল। অনতিদূরস্থ মহানগরীর কোলাহল ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। যেন একটা প্রকাণ্ড মায়াজাল অলক্ষ্য হস্তে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে। দেবেন আসিয়া নিকটে বসিয়া বলিল "কি হচ্চে ?" অমর সচকিতে চাহিয়া বলিল "যা হয়ে থাকে। তোমার কত দুর ?" "আর দাদা ! সে দুঃখের কথা বলো না ! এতক্ষণ পর্য্যন্ত সব ঠিক্ ঠাক করে রেখে এলাম তবু চারু হিসেব নিয়ে খুঁত বার কর্‌লে ! বেচারার কাল দিদি আস্‌বে সেই আহ্লাদে আর কারো ওপর দুঃখ দরদ নেই।" অমর শুনিয়া হাসিল। "তোমার কি দাদা, তুমি ত' হাস্‌বেই, বিশেষ

কাল তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী যোগে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি! সালোক্য সাযুজ্য মোক্ষ, তুমি ত হাস্‌বেই!" অমর তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল "আঃ!" দেবেন বাধা না মানিয়া বলিয়াই চলিল "ব্যাপারটা কি বলত হে? যেখানে তিনি এমন অভ্যর্থিতা সেখান হতে তিনি অন্তর্হিতা কেন থাকেন? লোকটা বোধ হয় একটু— কি বল?" "সেটা তোমার ভগ্নীকেই জিজ্ঞাসা ক'রো। তাকে এ কথা বললে সে তোমায় মারবে।" "তবে কাণ্ডটা কি খুলে বল ত?" "আর এক দিন বলা যাবে।" "তোমার মহাকাব্য, থুড়ি ফার্সের, উপসংহার বুঝি কাল? তার পরে বল্‌বে? কিহে যা বলেছিলাম, কাব্য—না—তোমার এ ফার্সখানা ট্রাজেডী না কমেডী?" "যাও যাও শুতে যাও, তোমার কি ঘুম পায় না, আমি আর ঘুমে চাইতে পাচ্চি না।" "তবে চল্লাম।"

প্রভাতে সকলে নবক্রীতু বাটীতে গেল। সুরমাকে আনিতে গাড়ী লইয়া তেওয়ারী গিয়াছিল। চারু আসিয়া কড়াইশুঁট ছাড়াইতে ছাড়াইতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। অমর একটা ঘরে জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার শার্সি খড়খড়িগুলা প্রণিধান করিয়া দেখিতেছিল, রাস্তার জনতা এক বিচিত্র চিত্রের মতই তাহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছিল। গড় গড় শব্দে গাড়ীখানা আসিয়া জানালার কিছু দূরে দরজার নিকটে দাঁড়াইল। অমর অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তথাপি মানসচক্ষুর সম্মুখে একটি পট্টবাসা বিমুক্তকেশা পূজারতা যোগিনীর মূর্ত্তি নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর দ্বার খোলা, মধ্যে প্রকাণ্ড পাগড়ীশোভী তেওয়ারীরই মস্তক! দেবেন অতি বিস্ময়ে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। "বাড়ীতে মাইজী লোক নেহিস্‌—দেশ'পর চলা গিয়া; হোকর কো এহি চিট্‌ঠি দে গিয়া।" দেবেনই পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে লেখা "চারু! আজই বাড়ী যেতে হ'ল! তুমি ক্ষমা ক'রো। তোমাদের চড়িভাতির কোন অঙ্গহানি না হয়! আমায় সংবাদ দিও, আর আমার হয়ে তোমরা সে আনন্দটুকু উপভোগ ক'রো। ইতি—তোমার দিদি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা কালীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। সুদীর্ঘ পথ সে কেবল আপনার বিচার করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যেন একটু অপরের কথা শুনিতে বা ভার লইতে ইচ্ছা হইতেছিল। অপরাধ কোন্ স্থানটায় তাহা স্থির করিতে না পারিলেও গুপ্ত অপরাধীর অনুশোচনার মত কি একটা জিনিষ তাহাকে নিরর্থক কেবলই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল! অগ্নি কোথায় তাহা বুঝা যাইতেছে না অথচ তাহার জ্বালা অনুভব! সে বড় মর্ম্মভেদী দহন। বাটী আসিয়া দেখিল সেখানেও সে অপরাধী হইয়াছে। সময়ে না আসায় পিতা অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন, প্রকাশকে জমিদারীর কার্য্যের জন্য তাহেরপুর যাইতে হইয়াছে এবং বধূকেও পাঠানো হইয়াছে, কেন না পূর্ব্বেই এইরূপ স্থির হইয়াছিল। পিতার এ সামান্য অসন্তোষে সুরমার মনে নিমেষের জন্যও ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু উমার পানে চাহিয়া তাহা আবার শমতা প্রাপ্ত হইল। দূরে রাখিয়া উমাকে যে সে সন্তাপের হাত হইতে অনেকটা রক্ষা করিয়াছে, তাহা সুরমা বেশ বুঝিতে পারিল। বাড়ীর পুরাণো ঝি শশীর মা আসিয়া বলিল "মাগো, বাড়ীতে এমন যজ্ঞি গেল আর যার সব সেই বাড়ী নেই। সবাই বলে ওমা সেকি! পুণ্যির কি আর সময় ছিল না গা! বউটো সুদ্ধ এসে মনমরা হয়ে একলাটি চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাক্‌ত, আমায় কেবলি জিজ্ঞাসা করত তাঁরা কবে আস্‌বেন? আমি বলি, কি জানি বাছা, এই এল বলে। তা তোমার আর পুণ্যির সাধ মেটেই না। বউটো—" সুরমা তাহার কথায় বাধা দিয়া অবান্তর কথা আনিয়া ফেলিল। মন্দাকিনীর কথা শুনিতে সুরমার যেন আর ভাল লাগিতেছিল না। চিত্ত সহসা তাহার উপরে যেন নিতান্ত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে। সুরমা একবার ভাবিয়া দেখিল মন্দার দোষ কি! সুরমার দান সে সানন্দে সকৃতজ্ঞ চিত্তে মাথায় করিয়া লইয়াছে এই কি তাহার অপরাধ! মন্দার অপরাধ কোন খানে তাহা সুরমা বুঝিতে না পারিলেও মনে তাহার

প্রতি সন্তুষ্ট নয়। একি সমস্যা তাহা বুঝিয়া উঠা দায়! সুরমা অনেক সমস্যা লইয়াই কিছু গোলে পড়িয়া রহিল। চারুকে আশা দিয়া শেষে অত্যন্ত অন্যায়রূপে সে চলিয়া আসিয়াছে, একবার দেখা পর্য্যন্ত করিবার অপেক্ষা রাখে নাই। তবু ইহাতে সে অনুতাপ করিবার কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কেননা সে অনেক বিবেচনা করিয়াই এ কার্য্য করিয়াছে। মনে ক্ষণিকের জন্য একটা বাসনা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার মোহে সুরমাকে ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারি মোহে সে চারুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অমরের সহিত দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিল। পরে বুঝিল—ইহাতে কাজ নাই।—সে লোভ যে সুরমা প্রত্যাহার করিতে পারিয়াছে ইহাতে সে সুখী। যাহার সংস্রব সে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে তাহার সহিত আবার এ সাক্ষাৎ কেন; ক্ষণেকের দর্শনে আলাপে আবার সে সম্বন্ধ মনে নিমিষের জন্যও জাগাইয়া তোলার কি প্রয়োজন? নিজের চাঞ্চল্যে সে একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এ ইচ্ছাটুকু হৃদয়ের মধ্যে কেন এমন ভাবে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে! এ ক্ষুদ্র আশার ক্ষুদ্র তৃপ্তিতে সুখ কি—ফল কি! হয়ত একটা গ্লানি। যাহা সে ত্যাগ করিয়াছে প্রাণ কি তাহার জন্য এখন অনুতপ্ত হইতে চায়? সমস্ত জীবনব্যাপী ত্যাগের কি এই পরিণাম! সমস্ত জীবনটাকে বিফল করিয়া দিয়া সামান্য একটা কথার জন্য আজ সে লালায়িত। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! এই দুর্ব্বলতা তাহার কোথা হইতে আসিল! তাই সভয়েই সুরমা পলাইয়া আসিয়াছে। যাক্ তাহাও এক রকমে ত মিটিয়া গিয়াছে। চারুর স্নেহের কাছে ত সে চিরকালই অপরাধী! অদ্যকার এ অপরাধে বেশী করিয়া আর কি হইবে? চারু পরে যে তাহাকে ক্ষমাও করিবে তাহাও সুরমা স্থির জানিত, কিন্তু এ কোন্ অস্বস্তি তাহাকে দিবারাত্রি শাস্তি দিতেছে। কি এক গুরুভারে হৃদয় যেন সর্ব্বদা অবসাদ-গ্রস্ত। যেন কি একটা মস্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে; কে যেন অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছে! রাধাকিশোর বাবুর রাগ দুদিনেই পড়িয়া গিয়াছিল। আবার সংসার যেমন ছিল তেমনি চলিতেছে, উমাও শান্ত মৌন ভাবে আপনার পূজার্চ্চনা, ঠাকুর-সেবা, বাকী সময়ে সমস্ত সংসারের কাজ লইয়া ব্যাপৃত থাকে। রাধাকিশোর বাবুরও যথানিয়মে সব চলিতেছে। সুরমাও তাহার বাহ্যিক নিয়ম সমস্ত বজায় রাখিয়াছে, কেবল অন্তরে সব বিশৃঙ্খল; প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিতেই একটা কিসের আশা তাহার মনে জাগিয়া উঠে। কিসের একটা প্রতীক্ষায় তাহার মন সর্ব্বদা যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমে দিন চলিয়া যায়। দিনের সমস্ত কার্য্যশেষে যখন সে শয্যা গ্রহণ করে, তখন যেন অন্তর বাহির অত্যন্ত শ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত! কেন এমন হয়! আশা করিবার তাহার ত' কিছুই নাই। প্রকাশের বিবাহের পর ছয়মাস হইতে চলিল কিন্তু চারু এ পর্য্যন্ত আর তাহাকে কোন পত্রাদি লেখে নাই। মন্দা এখানে থাকিলে হয় ত কোন-না-কোন সংবাদ পাওয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে একবার মনে হয় মন্দাকে কয়েক দিনের জন্য নিকটে আনা উচিত, কিন্তু পাছে উমা তাহাতে কোন সূত্রে সামান্য আঘাতও পায় সেই ভয়ে সাহসও হয় না।

এ দিকে রাধাকিশোর বাবু এক দিন বলিলেন "আর কত দিন সংসারে থাক্‌ব, শরীরও ক্রমশঃ ভগ্ন হয়ে আস্‌ছে, আমার ইচ্ছা এখন গিয়ে কাশীবাস করি। প্রকাশকে বাড়ী এসে বস্‌তে লিখে দি; জমীদারির এখন বেশ ব্যবস্থা হয়েছে, সে বাড়ী বসে সব দেখ্‌বে, আর তুমি বাড়ী থাকলে।" সুরমা বলিল "সেকি হয়, আমিও আপনার সঙ্গে থাক্‌ব।" পিতা বলিলেন "সে কি মা! তুমি কি এখনি সংসারত্যাগী হবে?" সুরমার হাসি আসিল, তাহার আবার সংসার! যার অস্তিত্বই নাই তার গ্রহণই বা কি ত্যাগই বা কি! কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "আপনি ছাড়া আমার আবার সংসার কিসের!" "তবে প্রতিজ্ঞা কর আমি অবর্ত্তমানে আবার গৃহস্থালীতে ফিরে আসবে?" সুরমাকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন "আমি কেবল তোমার আর প্রকাশের মুখ চেয়ে আছি যে তোমরা আমার নামটা রাখ্‌বে। সন্তান হয়ে যদি তুমি বাপের নাম না রাখ্‌তে চাও

তো অন্যের কাছে কি আশা কর্‌তে পারি?" সুরমা স্বীকৃত হইলে তখন কাশীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রকাশকে সংবাদ পাঠান হইলে প্রকাশ সস্ত্রীক বাটী আসিল। মন্দাকে সাদরে সুরমা গৃহে বরণ করিয়া লইল, কিন্তু প্রকাশকে কিছু বলিতে পারিল না। প্রকাশও অন্তঃপুর হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিত, সুরমা তাহাতে দুঃখিতও হইল সুখীও হইল। মন্দাকে চারুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় সে কিছু বলিতে পারিল না। প্রথম প্রথম চারু কাশী হইতেই মন্দাকে দুএকখানা পত্র দিয়াছিল, তাহার পরে আর কোন' সংবাদ নাই। শুনিয়া সুরমা একটু হাসিয়া বলিল "চারু এরি মধ্যে তোমায় ভুলে গেল নাকি?" মন্দা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "হয়ত সময় পান্‌ না, নয়ত কিজানি কেমন আছেন; তাঁরা অনেক দূরে দূরে বেড়াবেন কথা ছিল।" সুরমা তখন সেকথা ত্যাগ করিয়া মন্দার মাথায় হাত দিয়া বলিল "আমার নাম তোমার মনে ছিল? না স্নেহের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বনবাসে দিয়েছি বলে—আমার নাম মনে হ'লেও কষ্ট হ'ত তোমার মন্দা?" বলিতে বলিতে সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। মন্দা তাহার পদধূলি লইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল "আপনি একথা বলে কেন আমায় অপরাধী কর্‌ছেন? আপনার স্নেহ এ জীবনে ভুলব না।" "আমি তোমায় কি স্নেহ দিতে পেরেছি মা? ওকথা বলো না।" "আপনি আমায় যা দিয়েছেন এ আমি জীবনে কোথাও পাইনি। আপনিই আমায় এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিয়েছেন, এমন সুখ দিয়েছেন।" সুরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "মা, সত্য করে বল, তুমি কি সুখী হয়েছ? প্রকাশ কি তোমার মত রত্নের আদর জানে—যত্ন জানে?—তোমায় কি চিনেছে সে?" "ওকথা বলবেন না, আমায় আপনারা পায়ে স্থান দিয়েছেন, আমার কোন্‌ সুখের অভাব?" "ওতে আমার মন নিশ্চিন্ত হচ্চে না—সন্তুষ্ট হচ্চে না মা! বল সে ত তোমায় যত্ন করে?" মন্দা নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল "আপনি যার কথা বল্‌ছেন তিনি নিজের যত্নই করতে জানেন না যে মা। আপনি তাঁকে এই বিষয়েই একটু অনুরোধ কর্‌বেন। আপনাকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করেন, আপনার কথা ঠেল্‌তে পার্‌বেন না। তাহলেই আমার আর কিছুর দরকার থাক্‌বে না!"—মন্দার কণ্ঠস্বরে এমন একটা পূর্ণতার আভাষ প্রকাশ পাইল যে তাহাতে সুরমা যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সত্যই যেন তাহার আর কিছুরি প্রয়োজন নাই,—কোন অভাব নাই। সুরমা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে এইটুকু ক্ষুদ্র বালিকা কিরূপে এমন আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছে এবং এই অল্পদিনেই কি করিয়া বুঝিয়াছে যে স্বামীর সুখেই তাহার সুখ, তাহার সুখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই! এ অবস্থা কিসে পাওয়া যায়? এ শিখিতে কি শিক্ষার প্রয়োজন? কি সাধনার আবশ্যক? কেহ তাহাকে বলিয়া দিলনা যে ভালবাসা—একমাত্র ভালবাসাই এ আত্মবিস্মৃতির মূল। সুরমা তাহাকে আরও একটু বুঝিয়া দেখিবার জন্য বলিল "তোমার পিসিমার জন্যে মন কেমন কর্‌ত না?" "খবর পাইনা বলে কর্‌ত।" "খবর পেলে আর কর্‌ত না।" "বোধ হয় নয়।" "তাঁদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না?" "প্রথম প্রথম করত।" "এখন আর করে না?—কেন মন্দা?"—মন্দা একটু নীরবে থাকিল। তার পরে মৃদুকণ্ঠে বলিল "তাহলে উনি যে একা থাক্‌বেন, হয়ত যত্ন হবে না।" "যদি আর কেউ সে যত্ন করে?" "কে করবে?" বলিয়া মন্দা তাহার পানে চাহিল—সে দৃষ্টিতে সুরমা বুঝিল এমন যে আর কেহ পৃথিবীতে আছে, থাকিতে পারে তাহাই তাহার বিশ্বাস হয় না। জগতের উপর এ অবিশ্বাস, এ সন্দিগ্ধ ভাব কোথা হইতে উঠে একটু যেন বুঝিতে পারিয়া সুরমা মাথা হেঁট করিল।

কাশী যাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকট হইতে লাগিল। বাড়ী সুদ্ধ সকলেই দুঃখিত, সকলেই কাঁদিতেছে, কিন্তু মন্দাই যে সকলের চেয়ে কষ্ট পাইতেছে তাহা বুঝিয়া সুরমা সস্নেহে তাহাকে বলিল "কেন মা, তুমিত একেরই উপর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ঢেলেছ, কর্ত্তব্য দান করেছ, তবে কাঁদ কেন মা?" মন্দা চোখ মুছিয়া বলিল "আমি কখন মা দেখিনি। আপনাকে আমার তেমনি মনে হয়?"

মন্দার কথায় সুরমার চক্ষেও জল আসিয়াছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি সে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

মন্দা দেখিল উমা তাহার আসা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়ায় আবার তখনি সরিয়া যায়। মন্দাও প্রথমে কথা কহিতে সাহস করিত না। শেষে একদিন গিয়া উমার হাত ধরিয়া ফেলিল, ক্ষুণ্নস্বরে বলিল "আমায় কি ভাই ভুলে গেলে?" উমা তাহাকে ভোলে নাই, কিন্তু সে কেমন ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল, কাহারো সহিত নিজ হইতে সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিত না, এক্ষণে মন্দার স্নেহসম্ভাষণে তাহার সে ভয় দুরে গেল, সেও তার কোমল হস্তে মন্দার আর একখানি হাত ধরিয়া বলিল "না ভাই। তুমি আমায় ভোলনি?" মন্দা স্নেহস্বরে বলিল "তোমাকে আর মাকে আমার সর্ব্বদাই মনে পড়্‌ত। তুমিও কি কাশী যাবে ভাই?" "হ্যাঁ।" "তুমি কেন থাক না?" উমা মৃদুস্বরে বলিল "মার কাছে নইলে আমি যে থাক্‌তে পার্‌ব না ভাই।" মন্দা দুঃখিত হইয়া বলিল "এখানে আসছি শুনে ভেবে-ছিলাম তোমাদের কাছে থাক্‌তে পাব। যাই হোক্ আমায় একটু মনে রাখ্‌বে না কি ভাই!" উমা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল তাহাকে মনে রাখিবে।

বিদায়ের দিন বিরলে প্রকাশকে ডাকিয়া সুরমা বলিল "প্রকাশ, কেমন আছ?" "ভাল আছি।" কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ মৃদুকণ্ঠে বলিল "আর তোমরা?" "আমরা ভাল, উমা বেশ আনন্দে আছে, কাশী গেলে সে আরও আনন্দে থাকে।" প্রকাশ মস্তক অবনত করিল; বহুক্ষণ পরে বলিল "ভগবান তাকে আনন্দেই রাখুন এই প্রার্থনা তাঁর কাছে।" "আমি তোমার জন্যও ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করি প্রকাশ।" প্রকাশ মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি ত ভালই আছি সুরমা।" সুরমা দেখিল প্রকাশের চক্ষে অশ্রুর আভাষ ভাসিয়া উঠিয়াছে। বেদনাবিদ্ধকণ্ঠে সুরমা বলিল "মন্দাকে যত্ন করতে শিখো! জেন' সে একটি অমূল্য রত্ন। তোমার সুখের আশায়ই কেবল সে তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে। তোমায় ভগবান অতুল্য জিনিষ দিয়েছেন, তাকে চিনো, তাকে স্নেহ করতে শিখো।" প্রকাশ আবার মস্তক অবনত করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল "জানি তা, সে স্বর্ণ-শৃঙ্খল,—কিন্তু অস্থানে দিয়েছ।"—"তা দিইনি! শৃঙ্খল নয় সে তোমার, তাকে চিন্‌বে একদিন অবশ্যই।"

প্রকাশ বলিল "আশীর্ব্বাদ কর।"

(ক্রমশ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অক্ষয় সাহিত্য-কীর্ত্তির সহিত পাঠকেরা সুপরিচিত; কাজেই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেই কীর্ত্তির অনুশীলন কিংবা সুদীর্ঘ সমালোচনা উপযোগী বলিয়া মনে হইতেছে না। বিশেষতঃ এই প্রবাসীতে ১৩১৫ সালে তাঁহার বহু পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া চুকিয়াছি। সাহিত্যে তাঁহার যথার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই; এ সময়ে অনুরাগ-বিরাগের উত্তেজনা পরিহার করিয়া নিঃস্বার্থ সমালোচনা করা বড় কঠিন। যাঁহার স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনাময় সঙ্গীত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে গীত হইতেছে, সুখে-দুঃখে সকলে যাঁহার হাসির জ্যোৎস্না সম্ভোগ করিয়া অফুরন্ত প্রফুল্লতা লাভ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় দর্শনে অসংখ্য লোক প্রতিনিয়ত চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, আশা করি তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই আজ তাঁহার কথা সস্নেহে স্মরণ করিতেছেন।

সর্ব্ব প্রথমেই কবির মৃত্যুর দিনের কথা মনে পড়িতেছে। যাঁহাকে অপরাহ্ণ ৪টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে এবং প্রফুল্ল মনে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম, তিনি সেই অপরাহ্ণেই সহসা ৫টার সময় সংজ্ঞা হারাইয়া, রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। এ সংবাদে গভীর শোকের মধ্যেও যে একটুখানি তৃপ্তির কারণ ছিল, তাহা চারি পাঁচ দিন পরে অনুভব করিয়াছিলাম। অপরিহার্য্য মৃত্যু "দুদিন আগে, দুদিন পিছে" ত আসিবেই; তবে সে যদি ভীতির

ছায়া বিস্তার না করিয়া, অবসানের যন্ত্রণা না বহিয়া আসে, তবে তাহার নির্ম্মমতার মধ্যেও একটুখানি করুণার রেখা প্রতিভাত হয়। কবির মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে আমি যখন চিকিৎসকের দ্বারা আমার চক্ষু পরীক্ষা করাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যদি নিজে বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার অসুখ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, তবে পরীক্ষা করাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এই দেখ, আমি নিজে বুঝিতে পারিতেছি, বেশ ভাল আছি; কাজেই শরীর পরীক্ষার জন্য অনেক দিন ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না।" মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যিনি প্রসন্ন মনে এবং সুস্থ শরীরে ছিলেন, এই শোকের দিনে তাঁহার সৌভাগ্য স্মরণ করিতেছি।

তাহার পর মনে পড়িতেছে ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যিনি এ যুগে হাস্যরসে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহার যে বিন্দুমাত্র পরিহাস করিবার প্রবৃত্তি ছিল, কিম্বা দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া হাসিয়া সামাজিকতার সুখ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক ছিল, তাহা হয়ত তাঁহার বাল্যকালে কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। যে ছাত্রেরা ক্লাসে বসিয়া হাসিত বা গল্প করিত, তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন না; সকলেই তাঁহাকে সুশীল, মিতভাষী এবং বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগী বলিয়া জানিতেন। যে সচ্চরিত্রতা এবং সাধুতার জন্য বাল্যকালে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাহা যে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল, একথা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই জানেন। তিনি যে কত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনের অনেক ছোট বড় কথার আলোচনায় দেশের লোকে জানিয়া সুখী হইতে পারিবে।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

পত্নীর চির বিদায়ের পর, ৮ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি করুণ স্বরে অশ্রুসিক্ত নয়নে গাহিয়াছিলেন—"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে, দুদিন পিছে"। তাহার পর আবার পত্নীবৎসল দ্বিজেন্দ্রলাল সৈনিকের স্বদেশপ্রত্যাগমনের কথার ছল করিয়া কাঁদিয়া গাহিয়াছিলেন—

"বহুদিন পরে হইব আবার
আপন কুটীর বাসী,
দেখিব বিরহ-বিধুর অধরে
মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে
মিলন-মুখর বাণী,—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো,
আমার হৃদয়-রাণী।"

"বহুদিন পরে" না হইয়া কবির এই পরপারে যাত্রা যে তাঁহার প্রথম গানের অনুরূপ "দুদিন পিছে"ই হইল, ইহাই আমাদের গভীর দুঃখ। তাঁহার পত্নীর বক্ষ হইতে মাতৃস্নেহটুকু কুড়াইয়া লইয়া তিনি মাতৃহারা দুইটি শিশুকে যেভাবে মানুষ করিতেছিলেন, কবির চরিত্র অনুধাবনের জন্য সে কথার ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে।

সকলেই বলিতেন এবং এখনও বলিতেছেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসে অদ্বিতীয়, বহুশ্রেণীর চরিত্র অঙ্কনে সুপটু, এবং সঙ্গীতের সুরে ছোট বড় সকলকেই স্বদেশ-প্রেমে উদ্দীপ্ত করিতে সুদক্ষ ছিলেন। এ কথাগুলি যে সত্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু যাহা কবির

জীবনের নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, যে ভিত্তির উপরে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রতি সঙ্গীতে এবং প্রতি চিত্রে তাঁহার যে ভাব ফুটিয়া উঠিত, অনেকে হয়ত সেই মৌলিক ভাবটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই, অথবা লক্ষ্য করিয়াও অনেক সময়ে হাসির ঘটায় অথবা চিত্রের ছটায় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহাতে সমাজ উন্নত এবং পবিত্র হয় তাহাই তাঁহার লক্ষ্য এবং ব্রত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার কাব্য-সমালোচনা ভবিষ্যতে হইবে। আমি এখন কবি-চরিত্রের এই মূল দিকটির প্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ঠিক্ ২৭ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি যথার্থতঃ সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করেন। তাহার পূর্ব্বে অনেক গান এবং কবিতা লিখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে-সকল রচনা সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দ্বিজেন্দ্রলাল "একঘরে" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে যে তীব্র ভাষায় সামাজিক অনেক ভণ্ডামির পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম-যৌবনসুলভ চপলতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবির অনেক রক্ষণশীল আত্মীয়-বন্ধু প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ঐ কথায় স্থিতিশীল সমাজের লোকদিগের নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের আদর ও প্রতিপত্তি থাকিবে। দ্বিজেন্দ্রলাল সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, এবং স্বাভাবিক সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ করিতেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই বুঝি কালের প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহা বুঝিতে পারিয়া ২৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "একঘরে" পুস্তিকাখানি এই প্রকার ভূমিকা লিখিয়া পুনর্মুদ্রিত করিলেন যে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনও যে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই পুনর্মুদ্রণ হইতেই পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"একঘরে" গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার পর প্রায় ঐ সময়েই কবি "ভারতী" পত্রিকায় "নূতন-পুরাতন" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সমাজকে উন্নতির পথে চালাইবার জন্য তাঁহার কত আগ্রহ ছিল, তাহা ঐ প্রবন্ধে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। যেখানে গম্ভীর বিচার নিষ্ফল হয়, সেখানে তামাসায় বেশী কাজ দেখে বলিয়া তিনি হাসির গানে অনেক সামাজিক ভণ্ডামি এবং উপহাসাস্পদ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার হাসির গানের এই বিশেষত্বের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

কবি তাঁহার "প্রতাপসিংহ" নাটকে মুখ্যতঃ এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যদি আদর্শ উচ্চ না হয়, তবে প্রতাপসিংহের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং বীরত্বও ফলদায়ক হইতে পারে না। প্রতাপসিংহ যত বড় দেবতা হউন না কেন, তিনি "বংশগৌরব" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। বংশগৌরব অপেক্ষা যে স্বদেশ অনেক গুণে বড়, এবং স্বদেশ বলিতে যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বুঝায় না, এ কথাও নাটকের দুইতিন স্থলে কবি বুঝাইয়া গিয়াছেন। যাঁহার আদর্শ কেবল বংশ-গৌরব রক্ষা, তিনি যবনী-বিবাহের অপরাধে শক্তসিংহের মত ভাইকে পরিত্যাগ করিয়া হঠিয়া গেলেন। প্রতাপ বলিলেন—"শক্ত! তুমি আমার ভাই নও; কেননা তুমি যবনী-বিবাহ করিয়াছিলে।" কবি দেখাইলেন যে প্রতাপের মত মহাত্মাও মনের সঙ্কীর্ণতার ফলে ক্ষুদ্র হইয়া গেলেন, এবং প্রতাপ-প্রত্যাখ্যাত শক্তসিংহ সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী এড়াইয়া বিশ্বজনের ভাই হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্বদেশ-ভক্তিতে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ ছিল, এবং তিনি স্বদেশকে সকল প্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত করিয়া খাঁটি গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" যখন সর্ব্বত্র গীত হইতেছিল, তখন তিনি লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই যে, অনেকে স্বদেশপ্রেমের নামে যাহা পরিত্যাজ্য এবং হেয়, তাহাও প্রাচীনতার নামে গ্রহণ করিতেছিল। যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল এই-প্রকার অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার

শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-সঙ্গীতের পার্শ্বে "আবার তোরা মানুষ হ" গীতটিকে স্থান দিয়াছিলেন। নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ না করিলে, কেবল স্বদেশ স্বদেশ করিয়া চেঁচাইলে যে ফল হইবে না, একথা হয়ত অনেকের কাছে রুচিকর নহে বলিয়াই ঐ "আবার তোরা মানুষ হ" গীতটি মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও বড় বেশী লোকপ্রিয় হইতে পারে নাই। স্বদেশের যে কল্যাণসাধনের জন্য তিনি দেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমে উত্তেজিত করিতেছিলেন, দেশের সেই কল্যাণ সাধিত হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। আমার প্রার্থনা এই যে, কবি-রচিত উদ্দীপনাপূর্ণ "ভারতবর্ষ-বন্দনা" গীতটি গাহিবার সময় সকলেই যেন একবার মনে করেন —"গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই ; আবার তোরা মানুষ হ।" আমাদের সামাজিক পবিত্রতা এবং সুশিক্ষাই যে আমাদের যথার্থ উন্নতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া যদি স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হই, তাহা হইলেই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পবিত্র স্মৃতি অক্ষয় করিতে পারিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে ;
জনমি খ্রীষ্টান-কুলে খ্রীষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই ; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত !

অর্থ দানে মুক্তপানি, বিদ্যা দানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে ; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
বিনিমূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত !

কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি ! —ও অস্থি নেবে না গোরস্থান !

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা !
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু !
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে পূত—হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মধ্য যুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliere ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কালসহকারে দেশের আব্-হাওয়া আক্রমণকারী-দিগের উপর জয়লাভ করিল। যে উত্তাপের উপর উহারা প্রথমে অভিশাপ বর্ষণ করিত, সেই উত্তাপই এক্ষণে উহাদের রক্তহীন দেহের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। সাগর ও গিরিমালার দ্বারা পৃথক্‌কৃত এই ভারতবর্ষ,—মহাদেশের ন্যায় বৃহদায়তন—এক এসিয়িক রাজ্যের অধীনে, সামান্য একটি উপরাজ্য হইয়া বহুদিন কখনই থাকিতে পারে না। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে, দাসবংশ-জাত,—একজন ভাগ্যান্বেষী তুর্ক—কুতব, "দাসরাজা-দিগের" রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ভারতের প্রথম মুসলমান সাম্রাজ্যের সংস্থাপক। দিল্লি-নগরকে তিনি রাজধানীরূপে নির্ব্বাচন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই শত্রু-সমাজসমূহ স্থাপিত হইতে আরব্ধ হয়। মুসলমান আক্রমণকারীর অধিকাংশই আর্য্য-রক্ত-মিশ্রিত পারসীক কিংবা আফগান ; রাজপুতেরা যে-বংশ হইতে উৎপন্ন, তুর্ক ও মোগোলেরা সেই একই বংশ হইতে উৎপন্ন ; উচ্চবর্ণদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইতরসাধারণ হিন্দুদিগের দেশাভিমান আদৌ নাই। উহাদের শ্রমোৎ-পন্ন কিঞ্চিৎ লভ্যাংশ পাইলেই, উহারা যে-কোন বিদেশীয় প্রভুর অধীনতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাকে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুইটি ধর্ম্ম, দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা পূর্ব্বেই প্রবেশলাভ করিয়াছিল ; হিন্দী ও ফার্সি মিশিয়া সৈন্যশিবিরে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষার সাহায্যে জেতৃ-বিজিতের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়া ও বাক্যালাপের একটা উপায় হয়। সম্রাট যখন হিন্দুরাজাদিগকে এবং মুসলমান সেনাপতিগণকে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন এই কেন্দ্রীভূত সুদৃঢ় শাসনপ্রণালী হইতে অশেষ শুভ ফল উৎপন্ন হইল ; শান্তি স্থাপিত হইল ; কৃষকেরা আবার নির্ব্বিঘ্নে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল ; মারীভয় সংখ্যায় কমিয়া গেল ; দুঃখ কষ্ট প্রশমিত হইল ; মুসলমান-রাজকর বিধর্ম্মীদিগের পক্ষে অতিরিক্ত হইলেও রাজপুতদিগের

যথেচ্ছা-প্রবর্ত্তিত রাজকরের তুলনায় লঘু বলিয়াই অনুভূত হইল। ভারতীয় প্রাচীন ব্যবসায়গুলির সহিত আরব ও পারসীকদিগের নিকটে শিক্ষিত কতকগুলি নূতন ব্যবসায় সংযোজিত হইল।

"দাসরাজাদের" যুগ শিল্প ও সাহিত্যের জন্য গৌরবান্বিত। বর্ত্তমান দিল্লি হইতে দশ মাইল দূরে প্রাচীন দিল্লির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়; সম্মুখভাগে আরবীয় ধরণের ১১টা খিলান; পার্শ্বদেশে একটা দ্বারপ্রকোষ্ঠ; পশ্চাৎ-প্রান্তে ধর্ম্ম-মন্দির; তাহারও তিন সারি স্তম্ভ, অধিকন্তু আর এক সারি আধ্‌লা থাম। হিন্দু স্তম্ভ উপর্য্যুপরি বসাইয়া এই পিল্লাগুলি গঠিত হইয়াছে; উহাতে বিভিন্ন প্রকার ঢোলের গঠন দৃষ্ট হয়- এবং উহাদের মাথালগুলা প্রাচীন পারস্য রাজধানীর স্তম্ভ-মাথালের অনুরূপ। মস্‌জিদের সম্মুখে প্রসিদ্ধ কুতবমিনার—সাদা ও লাল, পাঁচতলা, এবং উচ্চতায় ২৪০ ফুট। ইরান ও বোগদাদ হইতে আগত কুতূহলী ব্যক্তিগণ এই নূতন রাজধানীর আশ্চর্য্য শোভা সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। এমন কি সাদি-কবি এই উপলক্ষে কতকগুলি উর্দ্দু কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

সাদির প্রভাবাধীনে ভারতের মুসলমানেরা ফার্সি ও উর্দ্দু এই উভয় ভাষাতেই লিখিতে আরম্ভ করে। এই যুগের সাহিত্য-গুরু—খোস্‌রৌ। কতকগুলি প্রেমের গজল্ ও যোগতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি কবিতার জন্য মুসলমান সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। (জীবনের শেষ ভাগে তিনি সুফী-মত অবলম্বন করেন)।

সাদির একটী গজল নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—এই গজলগুলির এক চরণ উর্দ্দু ও আর-এক চরণ ফার্সি—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে রচিত।

"তোমার সখা কষ্ট পাইতেছেন; তাঁহার উপর তোমার কি দয়া হইবে না! হা! তোমার সেই নেত্রযুগল যদি দেখিতে পাই! তোমার মুখের কথা যদি শুনিতে পাই!—প্রিয়তমে তোমার বিচ্ছেদ আর আমার সহ্য হয় না। মোমবাতী যেমন জ্বলিয়া পুড়িয়া গলিয়া পড়ে, ঝরিয়া পড়ে, আমিও তেমনি অবিরত অশ্রুপাত করিতেছি। আমি যে তোমাকে ভালবাসি...বিরহ-রজনীগুলি তাহার অলক-দামের ন্যায় দীর্ঘ; যে কয়েক দিন তাহাকে দেখিতে পাই উহা জীবনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।"

খোস্‌রৌ-রচিত একটি গজল:—

"গোরস্থানে। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছি। আমার কত বন্ধু অন্তর্হিত হইয়াছে...উহারা শূন্য-দেশের কয়েদী। আমি তবে কোথায় যাইব? আমি এই কথা বলিতে না বলিতে, ঐ দেখ দূর হইতে প্রতিধ্বনি বলিতেছে:—আমি তবে কোথায় যাইব?"

খোস্‌রৌর এক তরুণবয়স্ক বন্ধু, দিল্লির অধিবাসী হসন্ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কবিতাটি রচিত হয়—

"সাকি! ঢালো সুরা। পশ্চিম দিকে সাদা মেঘ উঠিয়াছে। ঐ মেঘগুলা জলবিন্দু চারিদিকে ছড়াইতেছে; য়ুসফের প্রেমে আসক্ত জুলেখা এইরূপ অশ্রুপাত করিয়াছিল।—অন্তিম বিচারের দিন বলিয়া কি মনে হয় না? (সৎলোকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও অসৎ লোকের মুখে বিষাদের নীলিমা)। এই দেখ নীলিম হস্তে বেগ্‌নী রং, সাদা মুখে জুঁইফুলের বিকাশ। এবং ঈশ্বরের বাম-পার্শ্বস্থ শোক-তরু (willow) নরকদণ্ডার্হদিগের ন্যায় বায়ুভরে কম্পিত হইতেছে। আনো সুরা, স্ফটিক পাত্রে ঢালো সুরা। সুরার রক্তিমা আর পাত্রের শুভ্রতা—এই দুইয়ের মধ্যে বিবাহ দিতে আমি ভালবাসি।" (১)

খোস্‌রৌ "চার দর্বেশের গল্প" পারস্য ভাষায় রচনা করেন। "বেতাল পঁচিশ" যেরূপ হিন্দুদিগের প্রিয়, এই গ্রন্থটি তেমনি মুসলমানদিগের প্রিয়। তবে বেতাল পঁচিশের গল্পে ভয়ানক-রসের দিকে হিন্দু-রুচির প্রবণতা প্রকাশ পায়। সেই-সব অন্ধকূপ যাহার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, স্বীয় আত্মীয়দের শবের সহিত একসঙ্গে বদ্ধ রহিয়াছে; তাহারা তিন দিনের রসদ মাত্র পাইয়া থাকে; পরে অনশন স্বকার্য্য সাধন করে। কিন্তু, জীবন ধারণের জন্য একজন যুবাপুরুষ প্রতিদিন প্রাতে নূতন নূতন কয়েদীর প্রাণ বধ করে—কেবল একটি নব যুবতীকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। সেই তরুণী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে ও গর্ভবতী হয়। এই-সকল হতভাগ্য ব্যক্তি তিন বৎসর কাল এই ভীষণ বধ্য ভূমিতে

(১) আমির-খস্‌রৌ (১২৫৩—১৩২৫), ভারতের সব-চেয়ে বড় ফার্সি-কবি; তাঁহার "পঞ্চ রত্নকোষ" নামক গ্রন্থ, নিজামীর আদর্শে রচিত। ফার্সি-কবিতার প্রাচীন বিষয় লইয়া রচিত এই পাঁচটি কাব্য:—"খোস্‌রৌ ও শিরীন্," "লৈলা ও মজনু," "অষ্ট স্বর্গ" (পারসীক Don Juan "বেহরাম-গোর"-এর অষ্ট অদ্ভুত সাহসের কার্য্য), "নক্ষত্রগণের উদয়" (যোগ-তত্ত্ব-গঠিত কবিতা) এবং "সেকন্দর-দর্পণ।" ভারতীয় লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য খোস্‌রৌ সমসাময়িক ঘটনাদি লইয়াও কবিতা রচনা করিয়াছেন। যথা;—খিজির খাঁ ও গুজরাট-রাজদুহিতার শোচনীয় প্রেমকাহিনী। হসন্ (১৩২৬ অব্দে মৃত)। Garein de Tassy, "Histoire de la literature hindone et hindonstanie."—Dr. Pizzi, "Storia della poesia persiana," এবং Dr. Horn, "Geschichte der persichen Litteratur"—দ্রষ্টব্য।

ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, এবং কোন একটা পাপাচরণ না করিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষার উপায় নাই।

এইরূপ একটি দৃশ্য এবং তা ছাড়া নায়কের পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি যেরূপ সোমদেবকে স্মরণ লইয়া দেয়,—পক্ষান্তরে সুললিত পারস্য ভাষায় রচিত "চার-দর্বেশের" আখ্যানে প্রেমিক ও নারীভক্তগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। "সহস্র-এক রজনীর" সাজ সজ্জা উহাতে আছে। রাজকুমারেরা, বণিকেরা,—অপরিজ্ঞাতা রূপসীর অনুসন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এক ব্যক্তি, একবার মাত্র একটি রমণীকে দর্শন করিয়া, সেই রমণীর প্রতিমাকে চিরজীবন পূজা করিতেছে; নবযুবতীরা মাঠ ময়দানের মধ্যে মাথাফাটা-বিপদান্বেষী সুপুরুষদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রেমে আসক্ত হইতেছে। হাপসী রমণীরা, খোজারা, কোন এক রহস্যময় সঙ্কেত-স্থানে লইয়া যাইতেছে; পরে দৈত্যরা যে-সকল প্রেমিকদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল, দেব ও পরীরা আসিয়া অবশেষে তাহাদের পুনর্মিলন ঘটাইয়া দিল। (২)

প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি অনুরাগ বশতই এই-সকল গল্প ও কবিতা বিশেষরূপে একটা মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। প্রাচ্যবাসীদিগের মধ্যে এই অনুরাগ এত প্রবল যে, রূঢ়প্রকৃতি মোগলেরাও একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য আপন শিবির হইতে পলায়ন করিত; সূর্য্যাস্তের শোভায় মুগ্ধ হইত; তাহার পর, একটা নৌকায় শুইয়া, চন্দ্রালোকিত নদীর গতি অনুসরণ করিত। মহম্মদের নিষেধ সত্ত্বেও, উহারা সুরাপান করিত; হাসিস্ চর্ব্বণ করিত; বুলবুলের উদ্দেশে, গোলাপের উদ্দেশে, চন্দ্রের উদ্দেশে কবিতা রচনা করিত; পরে, নেশাটা যখন মাথায় চড়িয়া যাইত, তখন এই-সকল বন্য-প্রকৃতি কঠোর-হৃদয় সৈনিকেরা, কারাবদ্ধ রমণীদিগের এই-সকল নিষ্ঠুর প্রভুরা, মজনুর প্রেমলীলা ও সহস্র-এক রজনীর অদ্ভুত কাণ্ড সমূহের খেয়াল দেখিত। (৩)

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নবাগত তুর্কদলসমূহ বিদ্রোহী হইয়া উঠে; খিল্‌জি-বংশ দাসরাজদিগের স্থান অধিকার করে; মুসলমান সৈন্য দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া আদম-সেতু পর্য্যন্ত উপনীত হয়; তুর্করা ও আফগানেরা ভারত আক্রমণ করে; বেতনভুক্ মোগলেরা প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উত্তর-পশ্চিমের লোকসংখ্যাকে রূপান্তরিত করে; তথায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে। তুগলক্ নামক এক তুর্ক-ভারতীয় রাজবংশের আমলে তৈমুরলং (১৩৯৮) লুটপাট করিয়া দিল্লি উচ্ছিন্ন করে; নরমুণ্ডের দুইটা প্রকাণ্ড স্তূপ সাক্ষীস্বরূপ রাখিয়া তৈমুরলং আবার গিরি-পথ অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। তখন অরাজকতার প্রাদুর্ভাব। ছিন্নাঙ্গ দিল্লি-সাম্রাজ্যের মধ্যে তিন রাজবংশ—তুর্ক বা আফগান—পর-পর প্রতিষ্ঠিত হয়; কুল্‌বর্গে, গোলকণ্ডায়, বিজাপুরে, পঞ্জাবে, গুজ্‌রাটে, বেনারসের নিকটবর্ত্তী জোনপুরে, স্বাধীন মুসলমান-রাজ্যসমূহ সংস্থাপিত হয়; এই-সকল রাজ্য পরস্পর আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ করিত, হিন্দুদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিত। প্রাসাদের ষড়যন্ত্র অথবা সৈনিক-বিদ্রোহের ফলে, রাজসিংহাসন অবিরত নবাগত ভাগ্যান্বেষীর হস্তগত হইত। অবশেষে, তৈমুরলংএর প্রপৌত্র বাবর উত্তর-ভারত জয় করিল, রাজপুতদিগকে পরাভূত করিল, এবং মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। (৪)

এই যুগের ঐতিহাসিক চিত্রের মুখ্য রেখাগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

(২) "বাগ্-ও-বাহার" এই নামে, দিল্লির মীর অম্মন্ কর্ত্তৃক উর্দ্দুতে অনূদিত এবং উর্দ্দু হইতে, D. Forbes কর্ত্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত।

(৩) বাবরের স্মৃতিলিপি দ্রষ্টব্য (তাতার-ভাষায় লিখিত), "ওয়াকাই" বা "তুজকি বাবরী" Erskine ও Loydenএর ইংরাজি অনুবাদ, পারস্য ভাষা হইতে De Pavet de Courteille-এর ফরাসী অনুবাদ। অনেক সময়, এই রূঢ়প্রকৃতি মোগল, কোন ভূখণ্ডের দৃশ্য, নদী, বৃক্ষ, বাড়ন্ত ফসল দেখিবার জন্য একটু থামিতেন। তিনি কবিতাও রচনা করিয়াছেন:—

"বৃক্ষচ্ছায়া, সংকলিত কবিতাবলী, রুটি, সুরা, মরুভূমিতে তোমার গান,—এই সমস্ত মরুভূমিকেও স্বর্গ করিয়া তুলে।"

একটা চৌবাচ্চার গায়ে এই লিপিটি খোদিত দেখা যায়:—"মধুর নববর্ষের আগমন, মধুর বসন্তের হাসা, মধুর দ্রাক্ষার রস, কিন্তু প্রেমের কণ্ঠস্বর আরও কত মধুর! বাবর! জীবনের সমস্ত সুখকে করতল-গত কর,জীবন পলায়ন করিতেছে,আর ফিরিবে না।" (M. Stanley Lane Pooleএর "বাবরের জীবনচরিত" দ্রষ্টব্য।)

(৪) দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান মুসলমান রাজবংশ।

বামনী রাজবংশ, আফগান-সেনাপতি জফর খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৩৪৭—১৫২৫)। রাজধানী;—কুলবর্গ, ওয়রঙ্গল, বিদার।

অষ্টম শতাব্দীর অভিমুখে, হিন্দু-সভ্যতার অবনতিতে রীতিনীতি কলুষিত হইল, গৃহ-যুদ্ধ বাধিল, অরাজকতা উপস্থিত হইল। মধ্য এসিয়ার জনসঙ্ঘ ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মবিরহিত, সভ্যতাবিরহিত শকেরা, শুক্ল-হূনেরা,—বিজিত জাতির প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। বর্ণভেদের সোপানশ্রেণীর মধ্যে উহাদের জন্যও একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উহারা রাজপুত নামে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সামন্ততন্ত্র স্থাপন করিল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যও এই সামন্তশাসনের অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা জলন্ত আবেগ ও আগ্রহ সহকারে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু রক্ষা করিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মকে আরও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিল।

একাদশ শতাব্দী হইতে অভিযানের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইল। মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, আরব ও পারস্য দেশীয় সভ্যতা হইতে লাভবান হইয়া, এই নবাগত বৈদেশিকেরা হিন্দুসমাজতন্ত্রের মধ্যে আর প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইল না। উহারা প্রথমে হিন্দুদের প্রতি দুর্বৃত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, উহাদের দ্রব্যাদি লুটপাট, উহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল; পরে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য স্থাপন করিল, সামন্ততন্ত্রের পুষ্টিসাধন করিল। পরিশেষে, বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশ মোগল সম্রাটকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিল। অশোকের পরে, এই প্রথম সম্রাট যাঁহার রাজত্ব সমস্ত ভারতে প্রসারিত হয়।

এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ববিধান করিতে হইলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন হওয়া আবশ্যক, উভয়ের সভ্যতা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। একদিকে, অসংযত কল্পনা, শ্রেণী বন্ধনের প্রবৃত্তি, মূলতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ, মূর্ত্তিপূজা, বর্ণভেদ; অন্যদিকে, যথাযথরূপে সত্যনির্দ্ধারণ করিবার বুদ্ধি, বাস্তব তথ্যের প্রতি অনুরাগ, একেশ্বরবাদ, সাম্যবাদ। এই দুই বিপরীত প্রবণতার মধ্যে, মিল হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি একজায়গায় মিল হইয়াছিল। সেই যে একটা বিশেষ ভাব যাহা ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত সভ্য দেশকে রূপান্তরিত করিয়া তুলিয়াছিল; কাজ করিবার জন্য, উৎপাদন করিবার জন্য, সমস্ত দেখিবার জন্য, সমস্ত শিখিবার জন্য, সমস্ত বুঝিবার জন্য, সেই যে একটা আকাঙ্ক্ষা যাহাকে কবিত্বের ভাষায় "নবজীবনের ভাব" (Renaissance) বলা হইয়া থাকে, সেই ভাবের জায়গাতেই মিল হইয়াছিল। যদিও ইহা অসম্পূর্ণ মিলন, ক্ষণস্থায়ী মিলন; তথাপি বলিতে হইবে, এই মিলনের ফলস্বরূপ, ভারত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা, কতকগুলি সুন্দর গ্রন্থ, সুন্দর কবিতা লাভ করিল, এবং যে-সকল রাজার রাজত্ব ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত, সেইরূপ একটি গৌরবান্বিত রাজত্বের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইল। (ক্রমশ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজাপুরের সাম্রাজ্য (১৪৮৯—১৬৮৪)।
গোলকণ্ডার সাম্রাজ্য (১৫১২—১৬৮৪)।
আহমদনগর(১৪৯০—১৬৩৬)।
বেরার (এলিচপুর রাজধানী) (১৪৮৪—১৫৭২)।
বিদার (১৪৯২—১৬৫৭)।

রাত্রি বর্ণনা

(মিত্র-অমিত্রাক্ষর ছন্দ; স্বভাবাতিশয়োক্তি অলঙ্কার)

ঘড়িতে বারোটা; পথে 'বরোফ! বরোফ!'... লোপ!
উড়ি' উড়ি' আরসুলা দেয় তুড়িলাফ ... সাফ!
পাল্‌কি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে ... তুড়ে!
আঁধারে হাড়ু-ডু খেলে কান করি উঁচা ... ছুঁচা।
পাহারা'লা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ খোদ!
বেতালা মাতাল তাই খায় হালফিল ... কিল!

* * * *

তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত ... চিৎ!
জুৎ পেয়ে চুরি করে টিকির বিদ্যুৎ ... ভূত!
নির্গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌগোঁফা ... তোফা!
গণেশ কচালে আঁখি করে সুড় সুড় .. শুঁড়!
স্বপ্নে দেখে,—ভয়ে তার খুলেছে সাহেব ... জেব!
পূজা হন গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে ... বেড়ে!

* * * *

ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে বাদুর ... বাদুড়!
ছেঁচা-বোঁচা কালপেঁচা চেঁচায় খিঁচায় ... কি চায়!
সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মামদোর গোর ... চোর!
আবরি সকল গাত্র মশা ধরে অস্তে ... দন্তে!
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁক ডাক ... নাক!
স্বপনের ভারি ভিড়...দাঁত কিড়মিড় ...বিড় বিড় বিড়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মেরী ম্যাগডেলীন

কার্লো ডল্‌চি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্র

COLOUR BLOCKS AND PRINTING BY U. RAY & SONS, CALCUTTA.

গীতাপাঠ

গীতা-শাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনো একটি স্থানেও কৈবল্য-মুক্তির উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে, গীতা-পুস্তকের যে পাতারই গায়ে আঙুল ঠ্যাকানো যায়, সেই পাতার মধ্য হইতেই জীবন্মুক্তির সুর ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। বিশেষত, কৈবল্য-মুক্তি গীতাশাস্ত্রে স্থান পাইবার কথাই নহে; কেননা, গীতাতে মহাভারতের যে জায়গার কথা বলা হইতেছে, সে জায়গায়— অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যাহা কাজে লাগিতে পারে সেই রকমেরই উপদেশ শোভা পায়, তা বই কৈবল্য-মুক্তির উপদেশ কোনো-ক্রমেই শোভা পায় না। যুধিষ্ঠির হইলে—তাঁহাকে শৌর্য্যবীর্য্যাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শোভা পাইত মন্দ না। কিন্তু অর্জ্জুনকে শূরবীর হইতে বলাও যা,—আর, মধ্যাহ্ন-দিবাকরকে তেজঃশালী হইতে বলাও তা, দুইই সমান। শ্রীকৃষ্ণ তবে অর্জ্জুনকে কী হইতে বলিতেছেন? অর্জ্জুনকে তিনি না-হইতে বলিতেছেনই বা কি?—জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন—কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন—যোগী হইতে বলিতেছেন—ভক্ত হইতে বলিতেছেন। কিন্তু এতগুলা কথার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।—এক কথাতেই মামলা চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; সে কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবন্মুক্ত হইতে বলিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্মুক্তি বলে কাহাকে? জীবন্মুক্তি যে, বলে কাহাকে, তাহার গোটাতিনেক নমুনা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর:—

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই:—

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়; আর, কর্ম্ম যাহা করিবে তাহা—অনাসক্ত হইয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধির মধ্যস্থলে সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া—করিবে। সমত্বেরই নাম যোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥"

ইহার অর্থ এই:—

স্থিরবুদ্ধি এবং মোহমুক্ত ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া প্রিয় ঘটনাতেও হর্ষোন্মত্ত হইবেক না, অপ্রিয় ঘটনাতেও উদ্বিগ্ন হইবেক না।

তৃতীয় অধ্যায়ের সার্দ্ধ উনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।
কর্ম্মৈনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥"

ইহার অর্থ এই:—

যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা অনাসক্ত হইয়া করিবে। আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ত্তাপুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন। জনকাদি রাজর্ষিরা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গীতার এইসকল উপদেশের মাতৃদুগ্ধে সাধকের জীবন পরিগঠিত হইলে, তাঁহার অন্তরাকাশে সংশয় এবং কুসংস্কারের মেঘ কাটিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাঁহার মনোরাজ্য হইতে বিষয়কামনার দলবল দূরীভূত করিয়া সুবিমল সদানন্দ আবির্ভূত হয়; এবং তাঁহার জীবনযাত্রা-পথে স্বার্থপরতার কণ্টকাবৃত বনজঙ্গল উচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানপরতা আবির্ভূত হয়; আর তাহা যখন হয়, তখন সাধক জীবন্মুক্ত হ'ন।

গীতাপুস্তকে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দ নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দ যেখানে-সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে। গীতার যে যে স্থানে ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানের শ্লোকের মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিলে এটা বেস্ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকার মহর্ষি বলিতে চাহিতেছেন আর কিছু না—যুবরাজের পিতৃ-বিয়োগ হইলে তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত যৌবরাজ্য যেমন আপনা হইতেই উত্তরাধিকৃত সাক্ষাৎ রাজ্যে পরিণত হয়, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে অথবা দেহত্যাগের পূর্ব্বে প্রাক্তন কর্ম্মের বাসনা-সংস্কারাদি নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার যত্নার্জ্জিত জীবন্মুক্তিই অগত্যা-

সুলভ ব্রহ্মনির্ব্বাণে পরিণত হয়। শাস্ত্রকার মহর্ষিদেবের মতে—জীবন্মুক্তি কেমন সহজে—কেমন নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে—ব্রহ্মনির্ব্বাণে পরিণত হয়, তাহার একটি শেরা নমুনা গীতাশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর ঃ—

গীতাশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বশেষের দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্মিন্নন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন]

যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্পৃহাশূন্য হইয়া, স্বার্থশূন্য হইয়া, অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন। ইহারই নাম পার্থ ব্রাহ্মীস্থিতি। এ স্থিতি যিনি প্রাপ্ত হ'ন—সংসারের মায়ামোহ আর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক অন্তকালেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।" বলা হইয়াছে "যে সাধক ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হ'ন (অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া—স্পৃহাশূন্য, স্বার্থশূন্য, এবং অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন) তিনি শান্তি লাভ করেন; সংসারের মায়ামোহ আর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।" ইহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সে সাধক জীবন্মুক্ত। ইহার অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে "এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক অন্তকালেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, বৃদ্ধ পিতার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজ যেমন যৌবরাজ্যের আধিপত্যে ভর দিয়া থাকিয়া উত্তরাধিকৃত রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন, তেমনি, জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণের কূলে উপনীত হ'ন।

প্রশ্ন॥ আমি সোজাসুজি এইরূপ বুঝি যে, নির্ব্বাণই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব। এ কথা যদিই বা সত্য হয় যে, গীতা-শাস্ত্রের কোনো স্থানেই কৈবল্য-মুক্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ কৈবল্য-ছাড়া আর কিছু। ফল কথা এই যে, সাংখ্যদর্শনের মতানুমোদিত কৈবল্য-মুক্তিও যেমন, আর, গীতাশাস্ত্রের মতানুমোদিত ব্রহ্মনির্ব্বাণও তেমনি, দুইই মহানির্ব্বাণেরই আর এক নাম। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে কোন্‌খানটায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর॥ ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দের অর্থ তুমি যদি এইরূপ বুঝিয়া থাকো যে, নির্ব্বাণই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব, তবে তাহার জন্য গীতাশাস্ত্র কোনো অংশেই দায়ী নহে। তাহা দূরে থাকুক—এইমাত্র তোমাকে আমি গীতার যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, ব্রাহ্মীস্থিতিই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব। এ বিষয় লইয়া তোমার সহিত বাদানুবাদের কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমার বিবেচনায়—ব্রহ্মনির্ব্বাণ কিসের নির্ব্বাণ এবং কিসের নির্ব্বাণ নহে, তাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানোই তোমার ভুল ভাঙিয়া দিবার খুব সহজ উপায়; অতএব তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

৫ম অধ্যায় ২৪শ, ২৫শ, ২৬শ, শ্লোক।

"যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং॥"

ইহার অর্থে এই ঃ—

(১)

অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার রতি, অন্তরাত্মাই যাঁহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।

(২)

ব্রহ্মনির্ব্বাণ লভেন সেইসকল ঋষিশ্রেণীর লোক যাঁহারা ক্ষীণপাপ, সংশয়শূন্য, সংযতাত্মা এবং সর্ব্বভূতহিতে রত।

(৩)

কামক্রোধবিমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান।

উদ্ধৃত শ্লোকতিনটির প্রথমটিতে এই যে বলা হইয়াছে "অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার রতি, অন্তরাত্মাই যাঁহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন" ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, অন্তরাত্মাতে যে প্রকার সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় সেই সুবিমল ব্রহ্মানন্দ, আর, অন্তরাত্মা যে প্রকার জ্ঞানের জ্যোতিষ্কেন্দ্র সেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, এ দুয়ের কোনোটি একমুহূর্ত্তও ব্রহ্মনির্ব্বাণের সঙ্গ ছাড়ে না। তবেই হইতেছে যে, ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মনির্ব্বাণের ডা'ন হাত বাঁ হাত।

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ লভেন সেইসকল ঋষিশ্রেণীস্থ লোক—যাঁহারা ক্ষীণপাপ, সংশয়শূন্য, এবং সর্ব্বভূত-হিতে রত" ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের অন্তরে—নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইতে, কেবল, পাপ সংশয় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য এবং হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি-সকল নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, তা বই, সর্ব্বভূতের হিতকারিতা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না।

তৃতীয় শ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে "কামক্রোধ-বিমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান," ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শুধুই যে কেবল নির্ব্বাণ তাহা নহে, একদিকে যেমন তাহা কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি আলেয়ার দলবলের নির্ব্বাণ, আর-একদিকে তেমনি তাহা আত্ম-জ্ঞানের সূর্য্যোদয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গীতা-পুস্তকের যে স্থানেই যখন ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানেই—জ্ঞান, আনন্দ, জগতের হিতানুষ্ঠান প্রভৃতি আত্মার গোড়াঘ্যাঁসা মুখ্য ধর্ম্মগুলির চতুর্দিকে মন্ত্রপূত গণ্ডির ঘের দিয়া সেগুলিকে নির্ব্বাণের আক্রমণ হইতে সাবধানে আগ্‌লিয়া রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ সম্বন্ধে গীতাকার মহর্ষিদেবের মর্ম্মগত অভিপ্রায় যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তিনটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

আত্মার এই যে তিনটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—জ্ঞান আনন্দ এবং বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা বা কুশলেচ্ছা, এ তিনটির অপরিপক্ক অবস্থায় তিনটিই স্ব স্ব বিপরীত ধর্ম্মের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়ানো থাকে; জ্ঞান—সংশয়-এবং-কুসংস্কারের সহিত জড়ানো থাকে, আনন্দ—বিষয়-তৃষ্ণার সহিত জড়ানো থাকে, কুশলেচ্ছা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তির সহিত জড়ানো থাকে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

সাধকের আত্মপ্রভাবে জ্ঞানের সংস্রব হইতে সংশয় এবং কুসংস্কার অপসারিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়; আত্মপ্রভাবে আনন্দের সংস্রব হইতে বিষয়তৃষ্ণা অপসারিত হইলে ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় সুবিমল সদানন্দ (সংক্ষেপে—ব্রহ্মানন্দ) আবির্ভূত হয়; আত্মপ্রভাবে কুশলেচ্ছা হইতে হিংসা-দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি-সকল অপসারিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় মঙ্গলকামনা এবং মঙ্গলচেষ্টা আবির্ভূত হয়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

এইরূপ ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দ এবং মঙ্গলপরায়ণতার ত্রিবেণীসঙ্গম জীবন্মুক্তিরও যেমন, আর, ব্রহ্মনির্ব্বাণেরও তেমনি, উভয়েরই সার-সর্ব্বস্ব।

উপরি-উদ্ধৃত গীতার শ্লোকগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিয়া আমি যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলিলাম। মন্দ নহে রহস্য! তুমি যেখানে দেখিতেছ নির্ব্বাণের নৈশ অন্ধকার, আমি সেখানে দেখিতেছি আত্মজ্ঞানের সূর্য্যালোক।

প্রশ্ন॥ একটা কিন্তু তুমি দেখিতেছ না—এটা দেখিতেছ না যে, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি; আর, সেইজন্য, ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত তিন গুণের কোনোটিরই কোনো ধর্ম্ম মুক্তির ত্রিসীমার মধ্যে প্রবেশ পাইতে পারে

না ;—রজোগুণের এই যে-দুইটি ধর্ম্ম—দুঃখ এবং অশান্তি, আর, তমোগুণের এই যে-দুইটি ধর্ম্ম—জড়তা এবং মোহ, এ তো প্রবেশ পাইতে পারেই না ; তা ছাড়া, সত্ত্বগুণেরও কোনো ধর্ম্ম মুক্তিরাজ্যে প্রবেশ পাইতে পারে না ; সুখও প্রবেশ পাইতে পারে না—জ্ঞানও প্রবেশ পাইতে পারে না। শাস্ত্রকার মহর্ষিদেব স্বয়ং কী বলিতেছেন ? বলিতেছেন তিনি

"সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি দুঃখসঙ্গেন চানঘ ॥"

ইহার অর্থ এই :—

প্রকৃতিসম্ভূত এই যে তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজ তম, তিনটিই অব্যয় আত্মাকে দেহে বাঁধিয়া রাখে। তাহার মধ্যে যে-টি স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবের গুণে প্রকাশক এবং সুখাত্মক, সেই প্রথম গুণটি, কিনা সত্ত্বগুণ, আত্মাকে সুখের আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে।

এই যে বলা হইয়াছে "সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখের আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে," ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সুখই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি, দুইই আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ; আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ও-দুইটির কোনোটিই মুক্তির ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না।

উত্তর ॥ চর্ম্মচক্ষু মেলিয়া গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এটা যেমন তুমি দেখিয়াছ যে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখের আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে ; জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া এটাও তেম্নি তোমার দেখা উচিত যে, সে-যে সত্ত্বগুণ তাহা ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব বই ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের শুদ্ধসত্ত্ব নহে। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বড় যে কম তাহা নহে ;—ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ একেবারেই রজস্তমোগুণের সঙ্গবর্জ্জিত ; পক্ষান্তরে, ত্রিগুণের কোটার ভিতর-অঞ্চলের মিশ্র সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের সহিত মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট। এখানে পাঁচটি বিষয় দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি—সুখ এবং জ্ঞান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

রজস্তমোগুণের সঙ্গবর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্বের বা অ[illegible] সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্মও দুইটি—(১) অমিশ্র জ্ঞান কি[illegible] অজ্ঞান-এবং-জড়তা'র সঙ্গবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান, অ[illegible] যাহা একই কথা—অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞা[illegible] এবং (২) অমিশ্র সুখ কিনা দুঃখ-এবং-অশান্তি[illegible] সঙ্গবর্জ্জিত সুবিমল আনন্দ, সংক্ষেপে—ব্রহ্মানন্দ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট মিশ্র সত্ত্বগুণের মুখ্য ধ[illegible] দুইটি—(১) মিশ্রজ্ঞান কিনা অজ্ঞান-এবং-জড়তা[illegible] সঙ্গাশ্লিষ্ট বিষয়-জ্ঞান বা বিষয়-বুদ্ধি, (২) মিশ্র সুখ কি[illegible] দুঃখ-এবং-অশান্তি'র সঙ্গাশ্লিষ্ট বিষয়-সুখ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মিশ্রসত্ত্বগুণের এই যে দু[illegible] ধর্ম্ম—(১) বিষয়জ্ঞান বা স্বার্থপরায়ণ কর্ত্তৃত্বাভিমা[illegible] বিষয়বুদ্ধি, এবং (২) অনিত্য বিষয়সুখ, এ দুইটি [illegible] সাত্ত্বিক ধর্ম্ম আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল তাহাতে আর [illegible] নাই ; তবে কিনা উহা রাজসিক পাপপ্রবৃত্তি [illegible] তামসিক জড়তা'র ন্যায় মারাত্মক গোচের বন্ধন-শৃ[illegible] নহে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দ্বেষহিংসাম[illegible] রাজসিক পাপপ্রবৃত্তি নাগপাশের বন্ধন ; অজ্ঞানম[illegible] তামসিক জড়তা লৌহশৃঙ্খল ; আর, মিশ্রসত্ত্বের ঐ দুইটি ধর্ম্ম—বিষয়বুদ্ধি এবং বিষয়সুখ, উহা স্বর্ণশৃঙ্খ[illegible] পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—([illegible] অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান এবং (২) সুবিমল সদানন্দ, দুইটি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্ম্ম আত্মার বন্ধনশৃঙ্খল হওয়া দ[illegible] থাকুক—উহা মুক্তির নিদান।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

দৃশ্যমান জগতে বিশুদ্ধ জল কুত্রাপি নাই বলি[illegible] অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গার জল ন্যূনাধিক পরিমাণে গৈরি[illegible] মৃত্তিকামিশ্রিত, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সরোবরের [illegible] হংসাদি জলচর জন্তুর মলমূত্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে ক[illegible] মিত ; এমন কি জলীয় বাষ্পও বিভিন্নজাতীয় নানা প্রক[illegible]

বাষ্পের সহিত মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট। দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৃশ্যমান জগতের চতুঃসীমার মধ্যে জল-মাত্রই যেমন মিশ্রধর্ম্মী—ত্রিগুণের কোটার চতুঃসীমার মধ্যে সত্ত্বগুণ মাত্রই তেমনি মিশ্রসত্ত্ব। কিন্তু তা বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, বিশুদ্ধ জল বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই, অথবা, শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁহার জানা উচিত যে দৃশ্যমান জগতে যেখানে যতপ্রকার জল আছে—বিশুদ্ধ জল তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান ;—ত্রিগুণের কোটার ভিতরে যেখানে যত সত্ত্বগুণ আছে—সমস্তেরই মূল উপাদান শুদ্ধসত্ত্ব। অতএব একথা যেমন সত্য যে, ত্রিগুণের কোটার ভিতর-অঞ্চলে মিশ্রসত্ত্ব বই শুদ্ধসত্ত্ব স্থান পাইতে পারে না; এ কথাও তেমনি সত্য যে, ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশে শুদ্ধসত্ত্ব চিরবর্ত্তমান! এখন দেখিতে হইবে এই যে, সকলেই জানে গঙ্গাজল-মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে ঘোলা জল, কেননা, ঝর্ঝরে পরিষ্কার গঙ্গাজলেও একটু আধটু গৈরিক মৃত্তিকা মিশ্রিত আছেই আছে; অথচ বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিচারপতি তাঁহাকে শুধু-কেবল বলেন "গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো," তা বই, এরূপ বলেন না যে, "ঘোলা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো"। তেমনি, আমাদের দেশের পণ্ডিত-মহলে এ কথা না জানে এমন লোকই নাই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ মাত্রই মিশ্রসত্ত্ব; অথচ, গীতাকার মহর্ষি শুধু কেবল বলিলেন যে, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখ আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে"। অনায়াসে তিনি বলিতে পারিতেন যে, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব আত্মাকে বিষয়সুখ আর বিষয়বুদ্ধির সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে" কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। কেন তিনি তাহা বলেন নাই? কেন যে, তিনি তাহা বলেন নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। শ্রাবণ মাসে গঙ্গায় ঢল নাবিয়া সারা গঙ্গা যখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন "গঙ্গাজলে স্নান করিলাম" বলিলেই যেমন "ঘোলা গঙ্গাজলে স্নান করিলাম" ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, তেমনি, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ" বলিলেই মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে মিশ্রসত্ত্ব বলা নিতান্তই বাড়া'র ভাগ বিবেচনায়—গীতাকার মহর্ষি উহাকে শুধু-কেবল সত্ত্বগুণ মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সত্ত্বগুণ যেখানে মিশ্রসত্ত্ব বই শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না, সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং সাত্ত্বিক সুখ যে সেখানে মিশ্রজ্ঞান এবং মিশ্রসুখ হইবে, অথবা, যাহা একই কথা—বিষয়বুদ্ধি এবং বিষয়সুখ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহা তো হইবারই কথা। এখন বক্তব্য এই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব যেমন আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল, তেমনি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্মদুটাও আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ;—বিষয়বুদ্ধিও যেমন, বিষয়সুখও তেমনি, দুইই আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব তো আর ত্রিগুণের কোটার-অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব নহে। শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণের কোটার সীমা ছাড়াইয়া তাহার ভিত্তিমূল-প্রদেশে অবস্থান করে—ইহা আমরা একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব এটা স্থির যে, পদ্মপত্র যেমন জলবিন্দুর আধার হইয়াও জলবিন্দু কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয় না ; শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি ত্রিগুণের মূলাধার হইয়াও ত্রিগুণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রে শুধু বলে এই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বরজস্তমোগুণ আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ; তা বই, একথা বলে না যে, ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল। পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত-পুস্তকের গ্রন্থকার কি বলিতেছেন শ্রবণ কর ঃ—

> "চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্বসমন্বিতা
> তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ ; দ্বিবিধা চ সা।
> সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে ॥
> মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
> অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ [অর্থাৎ জীবাত্মা] * * * *॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—

চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দুইপ্রকার—(১) শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতি—যাহার আরেক নাম **মায়া**, আর, (২) মলিনসত্ত্বময়ী প্রকৃতি—যাহার আর-এক নাম **অবিদ্যা**। সেই যে শুদ্ধসত্ত্বময়ী

প্রকৃতি—মায়া, তিনি আপনার অধিষ্ঠাতা-পুরুষের বশবর্ত্তিনী। তাঁহার অধিষ্ঠাতা-পুরুষ কে ? না সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। আর, এই যে মলিনসত্ত্বময়ী প্রকৃতি—অবিদ্যা, ইনি আপনার অধিষ্ঠাতা-পুরুষকে অধীনতাশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখেন। ইঁহার অধিষ্ঠাতা কে? না জীবাত্মা।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে মলিন-সত্ত্বই (অর্থাৎ ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব) স্বীয় অধিষ্ঠাতার (কিনা জীবাত্মার) বন্ধন-শৃঙ্খল; তা বই, শুদ্ধসত্ত্ব (অর্থাৎ ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের খাঁটি সত্ত্বগুণ) স্বীয় অধিষ্ঠাতার (কিনা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ পরমাত্মার) বন্ধন-শৃঙ্খল হওয়া দূরে থাকুক্, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মার বশবর্ত্তী।

অতএব এটা স্থির যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল নহে; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, শুদ্ধসত্ত্বের এই যে দুইটি মুখ্য ধর্ম্ম—অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান এবং সুবিমল সদানন্দ—এ দুইটির কোনোটিই আত্মার বন্ধনশৃঙ্খল নহে।

প্রশ্ন ॥ শুদ্ধসত্ত্বেরই বা পরিচয়-লক্ষণ কি, আর, মিশ্রসত্ত্বেরই বা পরিচয়-লক্ষণ কি ?

উত্তর ॥ আমি অনতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে,

(১) সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি—(ক) জ্ঞান এবং (খ) সুখ। (২) মিশ্রসত্ত্বের মুখ্য ধর্ম্মও দুইটি—(ক) বিষয়বুদ্ধি এবং (খ) বিষয়সুখ। (৩) শুদ্ধসত্ত্বের মুখ্য ধর্ম্মও দুইটি—(ক) অপরোক্ষ আত্মানুভূতি এবং (খ) সুবিমল সদানন্দ।

প্রশ্ন ॥ তোমার যাহা মন্তব্য-কথা তাহাই তুমি পূর্ব্বেও বলিয়াছ—এখনও বলিতেছ। কিন্তু শাস্ত্রে কি বলে ?

উত্তর ॥ শাস্ত্রেও তাহাই বলে। সত্য কি মিথ্যা—তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন তাহা তোমাকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তোমার মনের সমস্ত ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

শুদ্ধসত্ত্বের তিনি লক্ষণ-নির্দ্দেশ করিতেছেন এইরূপ ঃ—

"বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি ॥"

[বিবেক-চূড়ামণি ১২১ শ্লোক]

ইহার অর্থ এই ঃ—

বিশুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম এইগুলি ;—প্রসাদ (কিনা প্রসন্নতা) আত্মানুভূতি, পরমা প্রশান্তি, তৃপ্তি, পুলক, আ[র] পরমাত্মাতে তেম্নিতর নিষ্ঠা যাহাতে-করিয়া সদানন্দে[র] উৎস খুলিয়া যায়।

এই শ্লোকটির মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করি[য়া] পাইতেছি এই যে শুদ্ধসত্ত্বের ধর্ম্ম প্রধানতঃ দুইটি—(১) অপরোক্ষ আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞান এবং (২) পরমাত্মা[তে] স্থিতিজনিত সদানন্দ।

মিশ্রসত্ত্বের তিনি পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে[ন] এইরূপ ;—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি
তাভ্যাং * মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিত সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ং ॥
মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তি রসন্নিবৃত্তিঃ ॥"

[বিবেক-চূড়ামণি ১১৯।১২০ শ্লোক]

ইহার অর্থ এই ঃ—

সত্ত্বগুণ যদিচ জলের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব তথাপি অপ[র] দুটার সহিত (অর্থাৎ রজস্তমোগুণের সহিত) মিলিয়া বন্ধনে[র] হেতুভূত হয়। এই রকমের সত্ত্বগুণে (অর্থাৎ রজস্তমোগুণে[র] সঙ্গাশ্লিষ্ট মিশ্র সত্ত্বগুণে) আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্য্যে[র] ন্যায় নিখিল জড় বস্তু প্রকাশ করে। ☞ [ইহা[তে] বুঝাইতেছে এই যে, জড়প্রকাশক বহির্মুখী বিষয়-জ্ঞা[ন] ভিন্ন অপরোক্ষ আত্মানুভূতি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম নহে। অপ-রোক্ষ আত্মানুভূতি যে, শুদ্ধসত্ত্বেরই ধর্ম্ম, তাহা অনতিপূ[র্ব্বে]

* এই শ্লোকটির অব্যবহিত পূর্ব্বের গোটা ছয়েক শ্লোকে রজস্তমো-গুণের পরিচয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অতএব এখানে "তাভ্যাং" রজস্তমোভ্যাং, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বিবেক-চূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে।] মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণ এইগুলি ঃ—স্বমানিতা (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানিতা), যমনিয়মাদি ব্রতপরায়ণতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, মুমুক্ষুতা (অর্থাৎ মুক্তির অভিলাষিতা), দৈবী সম্পত্তি (অর্থাৎ শমদমাদি সাধনসম্পত্তি), অসন্নিবৃত্তি [অর্থাৎ অসৎ পদার্থ হইতে, কিনা অনিত্য বস্তু হইতে, সরিয়া দাঁড়ানো।]

ইহার টীকা।

উদ্ধৃত শ্লোকদুইটির প্রথমটির প্রথমার্দ্ধ হইতে পাইতেছি যে, রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট মিশ্রসত্ত্বগুণ আত্মার কপ্রকার বন্ধন-শৃঙ্খল। আবার ঐ প্রথম শ্লোকটির শেষার্দ্ধ হইতে পাইতেছি যে, আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্বরূপী বিষয়জ্ঞান ভিন্ন সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম নহে। (অপরোক্ষ আত্মানুভূতি যে শুদ্ধসত্ত্বের ধর্ম্ম তাহা একটু পূর্ব্বে বিবেক-চূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে)। উদ্ধৃত শ্লোকদুইটির দ্বিতীয়টির মধ্য হইতে পাইতেছি যে, মিশ্র সত্ত্বগুণের লক্ষণগুলির সব-ক'টাই মুমুক্ষু সাধকের সাধনাবস্থার লক্ষণ, তা বই, তাহার একটিও মুক্ত পুরুষের সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ নহে। মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণগুলির গোড়ার বৃত্তান্ত এইরূপ ঃ—

মিশ্রসত্ত্বের অবয়বীভূত বহির্মুখী জ্ঞানে একদিকে যেমন ভোগ্য বিষয়সকল প্রকাশ পায়, আর-একদিকে তেমনি কোনো-না-কোনো ঘটনা-গতিকে ভোগ্য বিষয়সকলের অনিত্যতা-দোষ সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া পড়ে; আর, তাহা যখন হয়, তখন দ্রষ্টাপুরুষ অসতের প্রতি (অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর প্রতি) বীতরাগ হ'ন। মিশ্রসত্ত্বের একটি লক্ষণ তাই অসন্নিবৃত্তি। অসতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিলেই মুক্তির অভিলাষ জাগিয়া ওঠে; মিশ্রসত্ত্বের আর-একটি লক্ষণ তাই মুমুক্ষুতা। মুক্তিকামনা জাগিয়া উঠিলে মুক্তির পথপ্রদর্শক সদ্‌গুণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে; মিশ্রসত্ত্বের তৃতীয় আর-একটি লক্ষণ তাই শ্রদ্ধা-ভক্তি। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিলে গুরূপদিষ্ট সাধনের পথে মতিগতি হয়; মিশ্রসত্ত্বের চতুর্থ আর-একটি লক্ষণ তাই শমদমাদি এবং যমনিয়মাদির সাধন। সাধক যতদিন পর্য্যন্ত সাধনের ঢেউ কাটিয়া সিদ্ধির কূলে উপনীত না হ'ন, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির গলা জড়াইয়া ধরিয়া থাকে—কিছুতেই তাহাকে ছাড়ানো যায় না; মিশ্রসত্ত্বের পঞ্চম আর-একটি লক্ষণ তাই কর্ত্তৃত্বাভিমান। পরিশেষে সাধক যখন মিশ্রসত্ত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের মুক্ত আকাশে সমুত্থান করেন, তখন তিনি ত্রিগুণের কোটার সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া গুণাতীত হ'ন এবং অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান, সদানন্দ এবং পরমা শান্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বৃদ্ধ রাজার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজের যৌবরাজ্য যেমন আপনা হইতেই রাজার রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগ হইলে জীবন্মুক্তি আপনা হইতেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ-পদে অধিরূঢ় হয়। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে পারত্রিক মুক্তি যে কিরূপ এবং কতরূপ, আগামী অধিবেশনে তাহার গবেষণায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষা সন্ধ্যা

মেঘের দোলায় চলে মঘবান
গোধূলি-লগনে বিয়ে !
ইন্দ্রধনুর চাঁদোয়া খাটান
অস্তকিরণ দিয়ে ;
বরুণের সাথে চলেছে পবন
বরের মিছিল নিয়ে,
হয়েছে মিতালি জন্ম-কলহ
সুখেতে ভুলিয়া গিয়ে ?
আজি সুলগনে বসুধার সনে
দেব বাসবের বিয়ে !

রঙীন মেঘের নিশান উড়ায়ে
ছোটে দিকপাল সবে,
বাজায়ে মাদল চলেছে জলদ
ঘন গুরু গুরু রবে,
আতস্ বাজীর তুবড়ি খেলায়
বিজুলি কাজল নভে,

দধিচার দান দীপক জ্বাল'য়ে
যাত্রা করেছে সবে,
বসুধার সনে বাসবের আজ
মিলন অমোঘ হ'বে !

ঝর ঝর জলে বাজিছে ঝাঁঝর,
পবনে সানাই বাজে,
বন-মর্ম্মর উর্ম্মি-সাগরে
তাল রাখে মাঝে মাঝে ;
হাতে লয়ে 'ছিরি' অস্ত-ভানুর
সন্ধ্যা সে এয়ো-সাজে
দাঁড়াল মাথায় তারকা-প্রদীপ
দিক্-তোরণের মাঝে,
বসুধা রাণীর প্রাসাদ-দুয়ারে
শঙ্খ শতেক বাজে !

মেঘ দোলা হতে নেমে আসে বর,
থামিল পতাকী দল,
উজল অযুত আঁখি-তারকায়
শোভে মণ্ডপতল,
মাতৃকা সবে শ্রীআচার করে
গ্রহদীপে সমুজ্জল,
পবন-বরুণ দিল সরাইয়া
লাজবাস, ধারা জল,
মর্ত্ত্যে-অমরে শুভদৃষ্টি করে
সাক্ষী ত্রিদশদল !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কষ্টিপাথর

ভারতী (জ্যৈষ্ঠ)।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—শ্রীচুনীলাল বসু—

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করিলেও কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময়ে আমরা অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই না। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যে-সকল কারণে ঘটিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদিগের এই অসহায়তা ও দুরবস্থার প্রধান কারণ।

কতকগুলি চক্ষুর অগোচর বিশেষ বিশেষ নিম্নশ্রেণীর জ[illegible] বা উদ্ভিদ্ জাতীয় পদার্থ আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি[illegible] বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অণুবীক্ষ[illegible] সাহায্যে ইহাদের আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কত[illegible] গুলি স্পর্শ দ্বারা, অপরগুলি স্পর্শ ব্যতীত অন্য উপায়ে, রোগীর শরী[illegible] হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চুলকন[illegible] খোসপাঁচড়া, দাদ, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগসমূহ রোগী বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদির স্পর্শ দ্বারা, অথবা বায়ু দ্বার[illegible] পরিবাহিত হইয়া, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামি[illegible] হয়। যক্ষ্মা রোগের বীজ রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে ; উহা শুষ্ক হইলে পর উহার সূক্ষ্মাংশ ধূলির সহি[illegible] মিশ্রিত হইয়া বায়ু দ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হ[illegible] এবং নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করতঃ যক্ষ্মারো[illegible] উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ ফিবার্ প্রভৃতি সংক্রাম[illegible] রোগের বীজ মনুষ্যের শরীর হইতে বমন বা মলের সহিত পরিত্যা[illegible] হইয়া যদি পনীয় জল বা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনরূপে মিশ্রি[illegible] হয় এবং উক্ত জল বা খাদ্য কোন প্রকারে আমাদের উদরস্থ হয়, তা[illegible] হইলে আমরা ঐ-সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বীজ বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া রোগী[illegible] গলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এব[illegible] এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে সাংঘাতি[illegible] রোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগে[illegible] বীজ (এক প্রকার কীটাণু) স্পর্শ দ্বারা অথবা বায়ু, পানীয় জ[illegible] বা দূষিত খাদ্য দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামি[illegible] হয় না। ইহাদিগের বীজ কোনরূপে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহি[illegible] মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহাদিগের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রোগীর রক্তের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক জাতীয় মশকী দংশন-কালে রোগীর শরীর হইতে শোণিত রক্তের সহিত উহা উঠাইয়া লয়। পরে উক্ত কীটাণু ঐ মশকীর দেহাভ্যন্তরে পুষ্টিলাভ করে এবং ঐ মশকী যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever), ফাইলেরিয়েসিস্ (Filariasis), কাল-নিদ্রা (Sleeping sickness) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ বিভিন্ন জাতীয় মশক, মক্ষিকা বা পোকার দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লেগ রোগ ইন্দুরের দেহে অবস্থিত। এক প্রকার পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা মনুষ্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। আসামের সাংঘাতিক কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) বীজ ক্ষিপ্ত কুকুরের লালার (Saliva) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন ঐ কুকুর মনুষ্য বা অপর প্রাণীকে দংশন করে তখন উক্ত রোগের বীজ লালার সহিত তাহার ক্ষতস্থানের রক্তের সহিত একবারে মিশ্রিত হইয়া যায়। হাম, বসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক রোগে যখন "ছাল" উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই ছালের মধ্যে ঐ-সকল রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং বায়ু, বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করে।

রোগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যে রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যে-কোন রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি স্বাভাবিক শক্তি আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ; নানা কারণে এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া

থাকে। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিলে এই শক্তি যথোচিত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; এরূপ অবস্থায় কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে উহা অবাধে বিষ-ক্রিয়া প্রদর্শন করে। যে-কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কলেরা, টাইফয়েড ফিভার্, প্লেগ প্রভৃতি রোগে এই রক্ষণশীল অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

উপরোক্ত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজ আমাদের পরীক্ষাগারে অথবা অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিবার পর বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া "টিকা"(Vaccine) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দারা ঐ-সকল রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে স্বল্প বা দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বসন্ত রোগের "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিকাংশ স্থলেই আজীবন বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়; এইজন্য যাহাদের একবার বসন্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। প্লেগ, টাইফয়েড ফিভার্, কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য এইরূপ "টিকার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ টিকা মহামারীর সময় বা মধ্যে মধ্যে লইতে হয়; ইহার রোগ-প্রতিরোধ শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

জানকীনাথ ঘোষাল—শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী

নদীয়ার জয়রামপুরের ঘোষাল বংশে প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে জানকীনাথের জন্ম হয়। এই ঘোষালবংশ অসাধারণ বলবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই বংশে জন্মিয়া জানকীনাথের বাল্য-শিক্ষাও বংশানুকূল হইয়াছিল। তাঁহাদের লাঠিখেলা বর্ষাখেলা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মধ্যে মধ্যে দুই দল হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ চলিত। তাঁহার বল ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে।

তাঁহার নিজ ইচ্ছামতই তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এইখানেই তিনি ৺রামতনু লাহিড়ী, ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ ঘোষ, ৺রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর রাজার দৌহিত্র) প্রভৃতি বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসেন। রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ মনীষীগণের উপদেশ ও উত্তেজনায় জানকীনাথ ও আরও কতিপয় ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন, এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। উপবীত-ত্যাগবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ইহাতে মোটেই রাগ করেন নাই; বলিয়াছিলেন ছেলের যাহা সত্য মনে হয় তাহাই করিয়াছে, তা করুক। তিনি স্বার্থের জন্য নিজের মত ও বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই; পিতার ক্রোধবজ্র মাথায় লইয়া এই সময় তিনি নানা সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পুলিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় লোকের পুলিসের সব কার্য্য অনুমোদন করিয়া সদ্ভাবে চলা অধিক দিন সম্ভব হয় নাই।

এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে যান ও এই সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবককে দেখিয়া প্রীত ও আকৃষ্ট হন এবং কয়েক বৎসর পরে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং এই সময় হইতে আবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে পুনগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা বধূর মুখ-দর্শন করেন এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন ও সকলকে লইয়া আহারাদি করিতেন।

বিবাহকালে জানকীনাথ তাঁহার শ্বশুর-পরিবারের দুইটী রীতি গ্রহণ করেন নাই:—১। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা। এই সময় তিনি ডেপুটি কলেক্টার ছিলেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র; মহর্ষিদেব কন্যার যে শিক্ষা পত্তন করেন, স্বামীর যত্নে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তিনি তাঁহার কন্যাদ্বয়কেও পুত্র-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, ইহা সকলেই জানেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার কন্যাদ্বয় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলাদেবী বহু সৎ-কার্য্যের বা দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাত্রী। তাহার প্রধান সহায় ও উদ্যোগী ছিলেন স্বর্গীয় জানকীনাথ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ-সংস্কার-প্রযত্নে তিনিই সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন।

তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য অত্যন্ত গভীর ছিল। তাঁহার একজন সহপাঠী বন্ধুকে তিনি একবার কয়েক সহস্র টাকা ধার দেন। বন্ধু তাহার কিয়দংশ শোধ করিয়া এক দিন বলিলেন "বাকী হাজার কতক আর আমি দিতে পারছিনে, আমায় মাপ করে দেও।" জানকীনাথ হাস্যমুখে বন্ধুর এ আবদার মানিয়া লইলেন।

বিবাহের পরেই বিলাত যাইবার প্রস্তাব হওয়ায় জানকীনাথ ডেপুটী কালেক্টরীর পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা কারণে সেই সময় বিলাত যাওয়ায় বাধা পড়ায় তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে বেরিণী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক দোকান তিনি ক্রয় করেন। তাহা খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করিবার অল্পদিন পরে—তাহার পূর্ব্ব মালিক তাহা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পিতা গভীর স্বার্থত্যাগ করিয়া দোকান ফিরাইয়া দিলেন।

লাটের নিলামে অল্প মূল্যে তিনি অনেকগুলি বিষয় খরিদ করেন; তাহা রাখিলে তিনি লক্ষাধিপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন পূর্ব্ব মালিকগণ গললগ্নবাসে আসিয়া জমি ফিরাইয়া দিবার অনুরোধ করেন, তখন তাহার অধিকাংশই তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ স্বীকার ও দয়া এমনি প্রবল ছিল।

রোগীর সেবা তাঁহার একটি প্রধান ব্রত ছিল। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যতদূর সেবা করিয়াছেন, আর কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার উদার মনপ্রাণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া তিনি বন্ধুবান্ধব ও মাতৃভূমির সেবায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। দাসদাসীর রোগেও তিনি সেবা করিতেন। পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোর নবাবী প্রথায় চাকর দাসীদের অসুখের সময় তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ ও বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু জানকীনাথ তাহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না; অসুখের সময় নিজে পুনঃ পুনঃ তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন; আবশ্যক হইলে নিজেও সেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে এজন্য উপহাসাস্পদ হইতে হইত। গরীব দুঃখীর সেবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় ডাক্তারী করিতেন। কাহারও বিপদ বা কষ্ট দেখিলে তিনি প্রাণপণ সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি পরের কষ্টে এতদূর

ব্যস্ত থাকিতেন যে নিজের বৈষয়িক কার্য্য অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত।

তাঁহার মধুর নম্রতা ও বিনয় যথেষ্ট ছিল। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখনও তিনি সমাগত বন্ধুবান্ধবগণকে যথারীতি অভিবাদন করিয়াছেন, নিজে যাইয়া গাড়ীতে পৌঁছাইতে না পারায় দুঃখ জানাইয়াছেন।

কলিকাতার প্রায় সব সাধারণ হতকর কার্য্যেই তাঁহার যোগ ছিল। অনেক বৎসর তিনি মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। মোকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে যে ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বৎসরাবধি তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল; মধ্যে মধ্যে এক এক বার শয্যাগত থাকিতেন, কিন্তু একটু সুস্থ বোধ করিলেই কোর্টে ও অন্যান্য কার্য্যে যাইতেন। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিরল।

স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল।

ইঁহার সঙ্কলিত "Celebrated Trials in India" নামক পুস্তক সাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে।

পবলিক কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় কার্য্য ছিল—ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস। হিউমের উদ্বোধনে এটি জানকীনাথের স্বহস্তে রোপা, স্বহস্তে জল সেচন করা ও স্বহস্তে বাড়ান জাতীয় মহীরুহ। কংগ্রেসের জীবন আজ ২৮ বৎসর; আজ অনেকেই ইহার বন্ধু, সহায় ও মুরুব্বি, কিন্তু যতদিন ও নাবালক ছিল, ততদিন জানকীনাথই ইহার প্রধান অভিভাবক ছিলেন।

যে সময়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না মাদাম ব্লাভাট্স্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফি প্রচার করেন সে সময় জানকীনাথ থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিঃ হিউমও থিয়সফিষ্ট ছিলেন। সেকালে বৎসরান্তে মান্দ্রাজে একটি থিয়সফিক্যাল কন্‌ফারেন্স হইত; ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে থিয়সফিষ্টগণ সেখানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এইরূপ সম্মিলনী হইতেই হিউম সাহেবের মনে একটি ভাবের স্ফুরণ হইল যে, সমগ্র ভারতবাসীর এইরূপ একটি পলিটিক্যাল সম্মিলনী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল হইবে। এই ভাব হইতেই কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং সেই ভাবটিকে কাজে পরিণত করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি তখন কিছুকালের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া "Indian Union" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে তিনি কায়মনোপ্রাণে ইহার জন্য কার্য্য করিয়াছেন।

পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দুঃখীর দুঃখ নিবারণ, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, স্বদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি যে-দিকে যে-কোনও কার্য্যে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত, সর্ব্বদাই তিনি তাহাতে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতেন। কোনও ভাল কাজের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিলে কাহাকেও কখনও নিরাশ হইতে হয় নাই। সেই-সকল প্রসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, তাঁহার যেন আহার নিদ্রা মনে থাকিত না. কতই যুক্তি আঁটিতেছেন, কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, কতই সাহায্যের পথ আবিষ্কার করিতেছেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকাও একটি আনন্দ।"

যমুনা (বৈশাখ) ।

নারীর মূল্য—শ্রীমতী অনিলা দেবী—

জল জিনিসটি নিত্য প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। নারীর মূল্যও বেশী নয়, সংসারে ইনি সুলভ! যে পরিমাণে তিনি সেবা-পরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা, অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে, এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী, তাহারই উপর নারীর মূল্য নির্ভর করে। সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই, কিন্তু এ ব্যবস্থা একা নারীরই জন্য। পুরুষের এ সম্বন্ধে যে বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল তাহা কোথাও খুঁজিয়া মেলে না। এবং ভারতবর্ষের ন্যায় এত বড় একটা প্রাচীন দেশে পুরুষের সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্য্যন্তও বোধ করি নাই। এই সতীত্বের চরম হইয়াছিল সহমরণে। যে দেশে তখনও টোল করিয়া মহামহোপাধ্যায়েরা সাংখ্য বেদান্ত পড়াইতেন, জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন, কর্ম্মফলে স্থাবর-জঙ্গম-পশুজন্ম স্বীকার করিতেন, তাঁহারা যে সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবীতে কর্ম্মফল যাহার যাহা হোক দুইটা প্রাণীকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইলেই পরলোকে একসঙ্গে বাস করে—এ কথা স্বীকার করা কঠিন। বিধবা রমণী সংসারের কোন্ কাজে লাগিবে? অতএব তাহাকে পতিসেবার দোহাই দিয়া পুড়াইয়া মার এবং মনু-পরাশর মাথায় করিয়া পরস্পরের পিঠ ঠুকিয়া লোকের কাছে বড়াই কর আমাদের নারী দেবী। সহমরণ প্রথা ইংরেজেরা যখন তুলিয়া দেন, তখন টোলের পণ্ডিতসমাজ চেঁচামেচি করিয়া চাঁদা তুলিয়া বিলাতে আপিল করিয়াছিল, এ প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে হিন্দুধর্ম্ম বনিয়াদ-সমেত বসিয়া যাইবে! কি ধর্ম্মজ্ঞান! কি সহৃদয়তা! দেবীপূজার কি মনোরম পবিত্র অর্ঘ্য! তারপর যখন সনাতন ধর্ম্মের চেয়ে ম্লেচ্ছ রাজার পুলিশের গুঁতা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন যত রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে তাহা বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া দেবী করার ব্যবস্থা করা হইল। চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে! অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছাদনা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে! মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে! বিধবা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়ার হতাদর হইতে দর হয় যখন নিজের গিন্নীটি আসন্নপ্রসবা, যখন কাগবগ ডাকিয়া ছেলেটাকে দুটা খাওয়াইবার দরকার হয়। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ ঘরের মধ্যে আরও একশত স্ত্রী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলেও তাহাকে দেবী হইতেই হইবে!—সে তখন পরের গলগ্রহ,—কখন সে মুখ হেঁট করাইবে সেই ভয়েই কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না, বিশ্বাস করে না। সেই জন্যই আগে লোকে পুড়াইয়া মারিয়া নিশ্চিন্ত হইত। এই ব্যবস্থা এ দেশের সমস্ত নারীজাতিকে যে কত হীন, কত অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পুরুষেরা যাহা ইচ্ছা করে, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে নারী তাহাই স্বীকার করে, এবং পুরুষের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করে এবং ভুল করিয়া সুখী হয়। হইতে পারে ইহাতে নারীর গৌরব বাড়ে, কিন্তু সে গৌরবে পুরুষের অগৌরব চাপা পড়ে না। সেদিন ঐ কেরোসিনে আত্ম-হত্যা করায় দেশের অনেকেই বাহবা দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ সতী বটে! অর্থাৎ, আরো দুই চারিটা এমন ঘটিলে তাহারা খুসি হয়। আশ্চর্য্য, এত অত্যাচার, অবিচার, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করা সত্ত্বেও নারী চিরদিন পুরুষকে স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে! যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, স্বামী বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, এ কথা সে বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি এইখানেই নারীর মূল্য! পুরুষের 'আমি'টার মধ্যে নারীর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা ডুবিয়া গিয়াছে। ভগবান মনু বলিয়া গিয়াছেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'; ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন 'নরকস্য দ্বারো নারী'; বাইবেল বলিয়াছেন, 'Root of all evil': য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ লাটিন ধর্ম্মযাজক টারটুলিয়ান লিখিয়াছেন "Thou art the devil's gate"; সেণ্ট পদবী প্রাপ্ত ধর্ম্মযাজক আগষ্টিন শিষ্যমণ্ডলীকে শিখাইতেছেন "What does it matter, whether it be in the person of mother or sister; we have to be beware of Eve in every woman"; সেণ্ট (!) আমব্রোস তর্ক করিয়া গিয়াছেন "Remember that God took a rib out of Adam's body, not a part of his soul, to make her!" পুরুষের নিকট নারীর কি খাতির!

আর্য্যাবর্ত্ত (মাঘ) ।

চীনের ভারত আক্রমণ—শ্রীতারানাথ রায়—

বিদেশী অনেক জাতি ভারত জয় করিয়াছে আমরা জানি। একদা চীনারাও যে ভারত জয় করিয়াছিল সে সংবাদ অনেকের কাছেই নূতন।

চীনের তাং বংশের দুইখানি প্রাচীন ইতিহাসে চীন সেনাপতির দ্বারা ভারত আক্রমণের উল্লেখ আছে (ডাক্তার বুশেল)। বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনেও এই কথা সমর্থিত দেখা যায় (অধ্যাপক রেভিন্‌স)। লাসার প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায় যে তিব্বতী ও নেপালী সৈন্যের সাহায্যে চীন ভারত জয় করে (ডাঃ ওয়াডেল)।

সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এক ব্রাহ্মণকে দূতরূপে চীনে প্রেরণ করেন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাটের দূত ওয়াং-হিয়েন-শি ৩০ জন অশ্বারোহী সহ ভারতে আসেন। তিনি মগধে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয় (৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)। অর্জ্জুন নামে হর্ষবর্দ্ধনের একজন মন্ত্রী রাজা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন; তিনি চীনদূতকে শত্রুভাবে গ্রহণ করেন। ওয়াং-হুয়েন-শি কয়েকজন সহচর সহ নেপালে পলায়ন করেন, বাকী নিহত, ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়।

এই সংবাদ তিব্বতরাজ স্রোং-সান-গ্যাম্পো শুনিলেন। তিনি ছিলেন চীন সম্রাটের জামাতা। তিনি শ্বশুরের অপমান প্রতি-শোধের জন্য সহস্র অশ্বারোহী, ও নেপাল-রাজ সপ্তসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, প্রদান করিলেন। চীন-দূত তাহার সাহায্যে ত্রিহুত অবরোধ করিয়া জয় করিলেন। অর্জ্জুন পুনঃপুন পরাজিত ও শেষে বন্দী হইয়া চীনে নীত হইলেন। চীন ইতিহাসে প্রকাশ এই যুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়াছিল।

অর্জ্জুন আপনাকে চীনের অধীন সামন্ত রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে চীন-সম্রাট দয়া করিয়া তাঁহাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। চীনভাষায় অর্জ্জুনের নাম লিখিত হই-য়াছে 'অ-লো-না-সোয়েন'। চীনের রাজধানী পিকিন নগরে রাজ-পরিবারের সমাধি-মন্দিরের তোরণে অর্জ্জুনের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি এখনো রহিয়াছে।

চীনসেনার হস্তেই প্রকৃত প্রস্তাবে মগধসাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন হয়। মগধ-সাম্রাজ্য হতশ্রী না হইলে বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা ভারতবর্ষের পক্ষে কঠিন হইত না।

এই চীন অভিযানের পূর্ব্বেও আর একবার চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়। চীন-সম্রাট উইচি ৯০-১০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধু হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন; বিজিত রাজ্য সামরিক রাজপ্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইত এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা কাবুল হইতে বারাণসী এবং গঙ্গাতীর-বর্ত্তী গাজিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনো প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। উইচি সম্রাটের শাসন-সময়েই ভারতের সহিত রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত হয় (ভিনসেণ্ট স্মিথ)।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ)।

অখণ্ড জীবন—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী—

বিশ্বকে ও মানবজীবনকে পৃথিবীর অনেক কবি ও ভক্ত পরিপূর্ণ সঙ্গীতের মতো করিয়া অনুভব করিয়াছেন। 'বহির্জগতের এবং মানবজগতের দুই প্রকারের দুই বিভিন্ন সঙ্গীত। বহির্জগতের সঙ্গীত আবার ত্রিবিভক্ত—১ম অণুপরমাণুর, ২য় গ্রহউপগ্রহের, ৩য় মহাকালের। সংখ্যা, পরিমাণ, গতি, হ্রাসবৃদ্ধি, এ সমস্তের নিয়মিত তালে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত উদ্গীত হইতেছে। 'মনুষ্যের সঙ্গীত শরীর ও আত্মার বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।' 'আনন্দের পরিপূর্ণতাকে সঙ্গীতের ভাষায় ভিন্ন ব্যক্ত করা অসম্ভব, সেইজন্য আনন্দস্বরূপের যে প্রকাশ এই বিশ্ব এবং মানবজীবন তাহাও সঙ্গীত।' 'ছাপা তিলক লাগাইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া জগৎ হইতে কেন দূরে রহিয়াছ? প্রেমের রাগিণী দিবারাত্রি বাজিতেছে, সবাই শুনিতেছে সেই সঙ্গীত, নৃত্য কর আমার মন, মত্ত হইয়া নৃত্য কর।' এ সমস্তই প্রাচীন কবি ভক্তের উক্তি।

কিন্তু এ যুগের পক্ষে মনুষ্যলোককে সঙ্গীতরূপে উপলব্ধি করা কঠিন—তাহার মধ্যে কত কত বৈচিত্র্য, কত বিরোধ ও হানাহানির পালা। দুইচারিজন আধুনিক কবি মানবজীবনের সকল জটিলতার মধ্যে নামিয়া তাহার সকল বিরোধ ও বৈচিত্র্যকে প্রেমের এক পরিপূর্ণ রাগিণীর অন্তর্গত খণ্ড খণ্ড সুরের মতো অনুভব করিয়াছেন—তাঁহাদের কাছে মানুষের সর্ব্বপ্রকারের অভিজ্ঞতার সার্থকতা আছে। যেমন একটা বৃত্তের টুকরামাত্র দেখিয়া তাহার পূর্ণ গোলত্বের ধারণা হয়, সেইরূপ এই অসমাপ্তি, অবসাদ, দৈন্য, বেদনা, সেই স্বর্গমর্ত্তপাতালকে একত্রকরা আনন্দসঙ্গীতের গভীরতা ও পূর্ণতাকেই বারম্বার সপ্রমাণ করিতেছে।

অতএব আজ অতীতের নিষ্ফলতা ক্ষতি নৈরাশ্য ও অপরাধের কথা ভাবিয়া ম্লান হইব না। যেমন মাল্যে গ্রথিত একটি পুষ্পের পাশাপাশি আর একটি পুষ্প সাজিয়া আসে সেইরূপ পুরাতন নূতনের সঙ্গে গাঁথিয়া চলিয়াছে; এক রাগিণীর মধ্যে একটি সুর যেমন আর একটি সুরের সঙ্গে সঙ্গত হয় তেমনি করিয়া সঙ্গত হইতেছে। যদি কোথাও কিছু বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা থাকে তবে তাহা সঙ্গীতের তালের মতো—সে যে সঙ্গীতকেই পরিপূর্ণতর করিয়া দিবে।

কালের চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এই জীবনরূপ মৃত্তিকার পিণ্ডে যত আঘাত আসিয়া পৌঁছিতেছে সেই সকল আঘাতেই কুম্ভকার ক্রমাগত এই পিণ্ডটাকে নব নব আকার দান করিতেছেন। আঘাতের দিকে না তাকাইয়া কুম্ভকারের উদ্দেশ্যের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি তিনি একটি পরিপূর্ণজীবনের পাত্র গড়িতে চান, আমার জীবনপাত্রেই তি অমৃত পান করিবেন। জীবনের ভাঙাগড়ার মধ্যে সকল অবস্থা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া একটি পরিণামের সূত্র অবিচ্ছিন্ন দে যাইতেছে!

এইজন্য ভারতবর্ষ মৃত্যুতেই জীবনের অবসান না দেখি জীবনকে লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত অনন্ত করিয়া দেখিয়াছেন, মৃত্যুে তাই তাঁহারা অমৃত বলিয়া জানিয়াছেন। অতএব আজ আমরা বলি—আমার কাছে বিশ্ব মধুময় হোক, সমস্ত মধুময় হোক, আমা জীবন মধুময় হোক, পৃথিবীর ধূলি পর্য্যন্ত মধুময় হোক।

ভারতী (বৈশাখ)।

হিন্দোলা—শ্রীসরলা দেবী—

লাহোরের দেশীপাড়া ও সাহেবপাড়ায় স্বর্গনরক প্রভেদ; দেশী পাড়া সংখ্যাহীন অলিগলির গোলকধাঁধায় দুর্ভেদ্য, সেখানে কষ্টগ গৃহ, সহনাতীত দুর্গন্ধ, আর দুর্দৃশ্য মক্ষিকা; আর সাহেবপাড়া অখণ্ড অনন্তবিস্তৃত আকাশের সুনির্ম্মল ক্রোড়ে পরিচ্ছন্ন সৌধাবলী এই দুই পাড়ায় আকারগত পার্থক্য যেমন, জীবনগত পার্থক্য তেমনি। সেখানকার জীবনের স্পন্দন এস্থানকে স্পর্শ করে না সহরের প্রায় সমস্ত পুরুষাংশ সন্ধ্যাবেলায় বায়ু সেবনার্থ এথাে নির্গত হইয়া আসে, স্বল্পাংশ স্ত্রীও চাদর জড়াইয়া গাড়ীতে বা পাদ চারে দেখা দিয়া থাকে।—কিন্তু এখানকার কোন স্থায়ী ছাপ—ন তাহারা সহরে লইয়া যায়—না সহরের কিছু এখানে রাখিয়া যায় সহর ও বাহিরের ভেদ চিরবর্ত্তমান থাকে।

আমরা বাহিরের লোক, বাহিরের খোলা হাওয়া, আরাম ও আয়েসের পাশে জড়িত—তবু সহরে এমন একটা কিছু আছে—যা আকর্ষণ অনিবার্য্য। সে মানবলীলা, সৃষ্টিলহরী, জন্মমৃত্যু সুখদুঃ হাসিকান্নার ফের। মানবসমাজ মাত্রের অন্তর্নিহিত সাম্যের মধে দেশভেদে কালভেদে যে রহস্য যে বৈচিত্র্য যে নূতনত্ব আছে তাহারই মোহ বাহিরের লোককে সহরের দুর্গন্ধী ও কলুষিত হওয়ার মধ্যেও টানিয়া লইয়া যায়। এমন একটা মোহের টানে এই লোকালয়ে অগণিত নরনারী কোন ঢেউয়ে কখন কি ভাবে তরঙ্গায়িত হ তাহা উপলব্ধ করিবার লোভে একদিন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের তালে তালে উঠিবার পড়িবার সখে তাহাদের সঙ্গ লইলাম।

দুইটি পরিচিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিধবা ব্রাহ্মণী মা ও মেয়ে পূর্ব্বদিন আমার কাছে গাড়ী চাহিয়াছিলেন—ঠাকুরদ্বারায় যাইবেন সেখানে কিছু আছে। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম।

পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। কন্যা বাড়ীর বাহিরে রোয়াকে বসিয়া আছেন—মাতা অন্দরে পাককার্য্য সারিতেছেন। যে সময় বাবুরা বাহিরে যান সেই সময় পঞ্জাবের অলিগলিতে বহির্বাটীর রোয়াক পুররমণীদের সেব্য হয়। গায়ে গায়ে ঘেঁসা প্রত্যেক বাড়ীর রোয়াকে পুরস্ত্রীগণ সমাসীন, কেহ বসিয়া চরকা কাটিতেছেন, কেহ সূতার নুটি করিতেছেন, কেহ কুর্ত্তা সেলাই করিতেছেন, কেহ শুধুই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রি-সমাগমে ইঁহারা ছাদের আশ্রয় লইবেন, শীতকালে ঘরের ভিতরে যাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাদে চড়ার বা ভিতরে যাইবার সময় না হইবে রোয়াকে কাটাইবেন। আশপাশের বাড়ীর পুরুষদের আনাগোনায় কোন স্ত্রী বিব্রতা হন না—গলির মধ্যে গরু বাছুর মহিষের আনাগোনার মত পুরুষের আনাগেনোও ভ্রূক্ষেপেরই যোগ্য নহে।

কন্যা আমার জন্য রঙিন সূতার রঙ্গিন পায়ার নীচু চৌকী একখানি বাহির করিয়া আনিলেন। বলিলেন দীপদ্বালার সময় না হইলে মন্দিরে যাইয়া লাভ নাই। সুতরাং আমাকেও রোয়াকে বসাইয়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করাইতে লাগিলেন। এই রোয়াকই তাঁহাদের ড্রইংরুম—অতিকষ্টে দুখানি ছোট চৌকির স্থান সেখানে হয়। কিন্তু আমার আগমন-সংবাদে রাজ্যের ছোট ছোট মেয়ের সমাগম হইল, আর অন্ততঃ চার পাঁচজন সেই রোয়াকের উপর গুটি মারিয়া বসিবার চেষ্টায় আমাদের চৌকি দুখানিকে আসন্ন-পতনশঙ্কান্বিত করিয়া তুলিল। গৃহস্বামিনী তাহাদের বকিয়া ঝকিয়া রোয়াকের নীচে বা সিঁড়ির ধাপে নামাইয়া দিলেন।

সূর্য্যাস্তের পর আমরা মূলচাঁদের ঠাকুরদ্বারার অভিমুখে নির্গত হইলাম। আজ সেখানে জন্মাষ্টমীর হিন্দোলা। সমস্ত শ্রাবণ মাস ঝুলনের উৎসবে দেশ আনন্দিত থাকে। শ্রাবণমাসের প্রতি শনি ও রবিবারে কুমারী ও সধবারা সুন্দর সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নদীর ধারে বা কোন বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে যায়। আমোদ আর কিছু না, দোলনায় দোলা ও ঝুলনের গান গাওয়া। এই সময় ঘরে ঘরেও দোলনা টাঙ্গায়, যে-কেহ আগন্তুক আসে একবার দোলনায় বসিয়া দোল খায়। জন্মাষ্টমীর দিন সব চেয়ে বেশী ধুম। যে বার জন্মাষ্টমী ভাদ্রমাসে পড়ে সেবার ঝুলনের আমোদ ভাদ্র পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। জন্মাষ্টমীতে মন্দিরে মন্দিরে সমারোহের প্রতিদ্বন্দিতা চলে। এখানকার দুটী মন্দিরে সব চেয়ে বেশী ভিড় হয়, আনারকলির বংশীধারীলালের মন্দিরে, আর রেলের ধারে মূলচাঁদের ঠাকুরদ্বারায়।

পথে সুন্দর বীথীর দুই পার্শ্বে গোধূলির সময় রমণীর সারি পদব্রজে ঠাকুরদ্বারার অভিমুখে চলিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এরকম দৃশ্য একেবারেই দুর্লভ। ভদ্রলোকের সুসজ্জিতা কন্যা ও বধূগণকে রাজপথে সঞ্চরণ করিতে দেখা আমাদের পক্ষে একেবারে আকাশ-কুসুম সন্দর্শনের তুল্য। হিন্দু ভারতবর্ষে যেখানে মুসলমানী প্রভাব বা অত্যাচার মাত্রাতীত হইয়াছে সেইখানেই রমণীদের পরদার মাত্রাও বাড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অত্যধিক মুসলমান-নিপীড়িত দেশ হইয়াও পঞ্জাবের প্রাচীন আর্য্যগণের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ স্ত্রী-জাতির অনবরোধ বিষয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মজা এই, ঠিক যেমনটি চলিয়া আসিয়াছে তেমনিই চলিতে পারে রঙ বদলাইলেই বিপদ। খোলামুখে পদব্রজে যাইতে এখানে লজ্জা নাই, কিম্বা ঠিকা এক্কা বা টমটমে চড়িয়া (যাহাকে এখানে ব্যাম্বুকার্ট বলে) অপরিচিত অন্য ভাড়াটের সঙ্গে 'শেয়ারের' গাড়ীতে একত্র যাইতেও হানি নাই—কিন্তু ঘরের খোলা ল্যাণ্ডো ফিটনে চড়িয়া গেলেই যত গোল। আমার সঙ্গিনীরা আমার সঙ্গে খোলা ল্যাণ্ডোয় বসিয়া স্বগলির পথিক নারীগণের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইতে লাগিলেন।

মন্দিরে ঢুকিতেই সামনে প্রশস্ত অঙ্গন, তার বাম পাশে ঢাকা বারান্দা। মেয়েরা সেই পাশ দিয়া ঠাকুরদালানে যাইতেছে, পুরুষেরা অঙ্গনের উপর দিয়াই যাইতেছে। বারান্দায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে খানিকটা অঙ্গন মাড়াইতেই হয়। অঙ্গন গ্যাসের আলোকে ঝকমক করিতেছে, সেখানে পুরুষের প্রাচুর্য্যও যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না, অনায়াসে পুরুষের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতেছে।

প্রাঙ্গণে ফরাসের উপর আগন্তুক পুরুষদের অভ্যর্থনা করিয়া বসান হইতেছে। একজন রাগী রাগ আলাপ করিতেছে—কিন্তু কার সাধ্য যে কিছু শুনে। একে ত মেয়েদের ও শিশুদের কলরব, পরস্পরকে ডাক হাঁক—"নী সরস্বতীয়ে—" "নী লীলো—" "বে সুন্দরা" "ভাই মুন্তেদু পানি পিলা"—"কুড়িয়ু ফাড়্" ইত্যাদি ;—তার উপর ব্যাণ্ডের বাদ্যি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ে নির্গত হইয়া আর কোথাও এত সস্তায় কিস্তিমাৎ করে নাই—যেমন এই ব্যাণ্ডের বাদ্যিতে। ইংরেজের ব্যাণ্ডের সঙ্গীতকলাও বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে—প্রতিভা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে কত পুরুষের সাধনার ফল। আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা প্রতিভার উদ্বোধনে, বিনা বিজ্ঞানের অনুশীলনে টপ করিয়া এই পাকা ফলটি যেখানে-সেখানে মুখে পুরিয়া দিই। ফলে কলা চর্চ্চা হয়না, কলা ভক্ষণ হয় বটে। যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ব্যাণ্ডের বাজনা বাজানর মত বাঁদরামি আর কিছু নাই। কোথায় ঠাকুরদ্বারায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, কোথায় গোপীমনমোহনের বাঁশীর স্বর, আর কোথায় ব্যাণ্ডের বাদ্যি। একে ব্যাণ্ড, তায় বেসুরা, তায় একেবারে দুহাত মাত্র তফাতে! একটা খুব গোলমাল হৈ চৈয়ের সমারোহ তাণ্ডব ভাবে চলিতে লাগিল—কিন্তু এই শত লক্ষ ভক্তের পূজায় মন্দিরে না পাইলাম ভক্তির গাম্ভীর্য্য না শোভনতা।

আমাদের বাড়ীর ১১ই মাঘের উৎসব মনে পড়িল। কতকটা মিল ও অনেকটা তফাৎ। সেই রকম দরাজ উঠানের সামনে দালান—কিন্তু আমাদের উঠান প্রায় এর তিন গুণ, আর তাহার সাজসজ্জাতেও বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু আসল তফাৎ সেখানে সমাগতগণের নিঃশব্দতায় এবং উপাসক ও গায়কগণের বেদমন্ত্রঘোষ ও সঙ্গীতে একটা অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রস সঞ্চারে।

বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। এখানে নবাগতা রমণীরা একেবারে সিধা অঙ্গন দিয়াই ঠাকুরঘরে চলিয়া আসিতেছেন। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, ন্যাকামি নাই, হাব ভাব নাই। নিতান্ত সরল সহজভাবে রূপসীর তরঙ্গ ধাইয়া আসিতেছে। কোন নববধূ ঝিকিমিকে ওড়নায় ঝল্‌সান গ্যাসল্যাম্পের সহস্র রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া চলিয়া আসিতেছে—কোন বিধবা রমণী মলিন অঙ্গাবরণের একটা মস্ত ছিদ্র পর্য্যন্ত ঢাকিতে চেষ্টা করে নাই, সহজ ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে—কেহ তরুণী, কেহ বৃদ্ধা, কেহ সুভূষিতা, কেহ অত্যল্পভূষণা—কিন্তু সকলেই সুন্দর। কুৎসিত মুখ দৈবাৎ একটা আধটা—বাকী সবই সৌন্দর্য্যে, সুষমায়, লাবণ্যে ভরা। কিন্তু সুন্দরী বঙ্গললনার মত আনতা লতার শ্রী নহে—তেজোদীপ্তা খড়্গ-ধারিণী সিংহবাহিনীর প্রতিমূর্ত্তি যেন।

এ মন্দিরে ঝুলন দেখিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঠাকুরের হিন্দোলের স্থলে দেখিলাম ঠাকুরাণীদের মধুময় রূপের হিল্লোল। হিন্দু-সমাজে পুরুষদের মধ্যে মেয়েদের এমন অবাধ গতিবিধি কল্পনার অতীত ছিল, নিজের চোখে না দেখিয়া, শুধু শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু আজ যখন সুন্দরী রমণীর প্রবাহ সম্মুখ দিয়া বায়োস্কোপের চলৎচিত্রের ন্যায় চলিয়া যাইতে লাগিল—তখন মুগ্ধচিত্ত হইয়া গেলাম।

বেশ ভূষাই বা কি! ঠিক থিয়েটারের সাজের মত! ঘাগরা কুর্ত্তা ওড়নায় জরি জড়াও, গোটা কিনারি, সল্‌মা চুমকি—একেবারে ঝক্‌মক করিতেছে। কত নভেলের, কত নাটকের, কত নবন্যাসের সরঞ্জাম এখানে পুঞ্জীভূত। এত খোলাখুলির মধ্যে, এত ছাড়াছাড়ির মধ্যে নানা অঘটন যে ঘটিয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে-সব ঘটনাকে কুৎসার পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া মানবিকতার পবিত্র রঙে রাঙাইয়া তুলিবার জন্য পঞ্চনদ কোন বঙ্কিমের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু যে হতভাগ্য দেশে মাতৃভাষার চর্চ্চা নাই, সে দেশে বঙ্কিমের সম্ভাবনা কোথায়?

নানাভাবের লহরীতে তরঙ্গায়িত হইয়া উৎসবভঙ্গের অনেক

পূর্ব্বেই সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

ইন্দ্রজাল

শূন্য ভুবনে ছাউনি এ কার?
ছায়া পড়ে কার গগন-ভালে?
রিক্ত দ্যুলোক ভরিয়া উঠিল
কোন দেবতার ইন্দ্রজালে!

নিকষ-পাষাণ কান্ত-লোহায়
নিঙাড়িয়া গড় গড়িল কে রে?
হাওয়ার উপরে পুরী পত্তন,
নয়ন বচন অবাক হেরে!

বারুদ-বরণ মেঘের বুরুজ,
সীসার বরণ কোমর-কোঠা,
মোরচা-বন্দী মেঘ-গম্ভীনে
ঝলসিছে মৃদু জলুসী টোটা!

ত্রাস-দস্যুর ত্রি-অরুণ আঁখি
ফিরে কি আবার ত্রিলোক শোষে?
কাহারে দলন করিতে দেবতা
বাহিনী সাজান জ্বলিয়া রোষে?

আড়-বাড় আর ঘাঁটি মুহড়ায়
'হাঁকার' বাজায় দামামা কাড়া,
হের দেখ কার বিপুল বাহিনী
হামার হয়েছে পাইতে ছাড়া!

জোড়া-আয়নাতে কি খবর চলে?
বিজুলি কী আনে? ... নিকাশী চিঠি!
তীর-বেগে যত বীর বাহিরিল,
ছররা ছুটিল ঝলসি দিঠি!

বখেড়িয়া ঊনপঞ্চাশ হাওয়া
ক্ষেত রোকে আর বখেড়া করে,
তোড়ে তোড়াদার বন্দুকে আর
লব্‌লবি টেনে ধোঁয়ায় ভরে!

কালো বারুদের নস্য টানিয়া
কাল-হাঁচি হাঁচে কামান নভে,
যোজন-পাল্লা গোলা উগারিয়া
ভরে দশ দিক ভীষণ রবে!

কেল্লা বুরুজ সীনা গম্বুজ
বজ্র-বিষম গজের ঘায়ে
টলমল যেন করে অবিরল
হেলে যেন হায় ডাহিনে বাঁয়ে!

মেঘের সঙ্গে মেশে দূর বন
ঝাপটে দাপটে পালট খেয়ে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ত্রাস দস্যুটা,
শোষণ-অসুর পালায় ধেয়ে!

দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে
সোমরসে-ভিজা শ্মশ্রুতটে,
দাঁড়ান ইন্দ্র ইন্দ্রধনুটি
লম্বিত করি' আকাশপটে!

ঐরাবতেরে অঙ্কুশ হানি
ঐন্দ্রজালিক লুকান হেসে,
মুগ্ধ মানব স্নিগ্ধ ধরণী
নিবেদিছে প্রীতি দেবোদ্দেশে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

প্রকৃতি-প্রবেশ—পদার্থ-পরিচয়—

শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত, বালকবালিকার অধ্যাপক অভিভাবকের সাহায্যার্থ। প্রকাশক সান্যাল কোম্পানি। মূল্য ২৲ টাকা। বহু চিত্রসম্বলিত, কাপড়ে বাঁধা, ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

পদার্থ-পরিচয় দ্বারা শিক্ষাদান আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর এক প্রধান অঙ্গ। পদার্থ-পরিচয় দিতে হইলে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যার একটা মোটামুটি বোধ থাকা চাই; পদার্থপরিচয় প্রকৃতি-পরিচয়ের অন্তর্গত।

পুস্তকে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের অবস্থার, এবং কপিকল, তাপমান, তুলাদণ্ড প্রভৃতি কৃত্রিম প্রাকৃতিকনির্ণয়নির্ভর যন্ত্র প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই পরিচয়-প্রদান-প্রণালীতে ৪ বৎসরের শিশু হইতে ক্রমশঃ ১৩ বৎসরের বালকবালিকার বুদ্ধির উপযোগী করিয়া বিষয়বিন্যাস করা হইয়াছে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বিষয়, উপকরণ, প্রণালী প্রভৃতিরও আলোচনা ও নির্দ্দেশ যথাস্থানে এবং সাধারণ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। পরিচয়-দান-প্রণালী বিচিত্র হইলে শিক্ষার্থীর প্রীতিকর হইবে বলিয়া বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—(১) আদান বা প্রশ্ন (Eliciting or Questioning Method) ; (২) কথোপকথন ; (৩) চিত্রে পাঠনা (Picture Lesson) ; প্রদান পাঠনা (Information Lesson) ; ইত্যাদি। অনেক স্থলে পদার্থের নাম ও গুণের ছড়া থাকাতে তাহা স্মরণ রাখিবার সুবিধা ও শিশুদের মনোরঞ্জক হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে অনেক বিষয়ের তথ্য নিপুণভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারী হইয়াছে নিঃসন্দেহ।

সুনীতি-শিক্ষা—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত, ১৫৮ পৃষ্ঠা ; কার্ডবোর্ডের মলাট ; মূল্য ছয় আনা। প্রকাশক সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গদ্যপদ্যসমন্বিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক। তৃতীয় ও চতুর্থ মানের উপযোগী। গদ্যের ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাচীনতন্ত্রের (Classic) ; পদ্যগুলিও সাধারণ নীতিমূলক কবিতা যেমন হইয়া থাকে তদপেক্ষা হীন নহে।

শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সচিত্র। মূল্য এক আনা। অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণশিক্ষা দিবার উপযোগী শব্দ ও পাঠ সুশৃঙ্খলায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পদ্যশিক্ষা—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। সচিত্র। মূল্য দুই আনা। কতকগুলি পদ্য অপরের লিখিত; অধিকাংশ গ্রন্থকারের নিজের। উপদেশ ও বর্ণনা-মূলক পদ্য সহজ শুদ্ধ ভাষায় লিখিত।

পত্রদলিল লিখন-শিক্ষা—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। মূল্য দুই আনা। পত্র ও দলিল লিখিবার প্রণালী ও আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার পত্র লিখিবার দুই প্রকার প্রণালী দিয়াছেন—হিন্দু রীতি ও মোসলমান রীতি। মোসলমান রীতি মানে বাংলার সহিত প্রচুর উর্দ্দু শব্দের মিশ্রণ, মসুরের দালের খিচুড়িতে পেঁয়াজ ফোড়নের মতো তাহা নিতান্ত দেশী হইলেও একশ্রেণীর নিষ্ঠাবানেরা তাহা অভক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। বাঙালী হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক, তাহার মাতৃভাষা বাংলা ; বাংলার মধ্যে যে-সমস্ত সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে তাহা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই এজমালি সম্পত্তি ; এবং যে-সমস্ত ফার্শী উর্দ্দু আর্বী ইংরেজি ফরাশী পর্ত্তুগীজ ডচ্ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়া আচরণীয় হইয়াছে সেগুলি বিদেশী বলিয়া সংস্কৃত শব্দের সহিত অপাংক্তেয় নহে। কিন্তু যাহারা বাঙালীর পরিচিত নহে তাহারা একেবারে অপাংক্তেয়, অনাচরণীয়। আমরা হামেশা টেবিল চেয়ারে বসিয়া কাগজ কলম দোয়াত লইয়া দলিল দস্তাবেজ মুসাবিদা করিতে পারি, কিংবা ফরাশে বসিয়া পোলাও কাবাব কোর্ম্মা চপ কাটলেট খাইতে পারি, তাহাতে বাংলা ভাষার জাত যায় না ; কিন্তু লেখকের নমুনায় চিঠি লিখিলে বাংলা ভাষাকে অপমান করা হয়, তাহার জা'ত মারা হয়। একটি নমুনা উদ্ধৃত করিলাম ; বাঙালী ছেলে তাহার পাড়াগেঁয়ে মাকে চিঠি লিখিতেছে—

> জনাব হজরত মওজ্জেমা
>
> শ্রীযুক্ত ওয়ালেদা সাহেবা
>
> খেদমতেষু।
>
> হকনাম সহায়।
>
> বখেদমতেষু—
>
> হাজার হাজার আদব বাদ আরোজ এই যে আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। মধ্যে বাপজীর এক পত্র পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে আমার হাজার হাজার আদব কহিবেন। খোদার ফজলে এবং আপনার দোয়াতে আমি ভাল আছি। খোকা মিয়া কেমন আছেন? সত্তর পত্র লিখিয়া সরফরাজ করিতে মর্জ্জি হয়। আরোজ ইতি। খাকছার ফিদবী গোলাম রহমন।

এ চিঠি ছেলের মা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ত ? না তাঁহাকে মৌলবীর কাছে দৌড়িতে হইয়াছিল ? সে সংবাদ গ্রন্থকার দেন নাই।

বিবিধ প্রবন্ধ—

শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ছয় আনা।

গদ্যপদ্যসমন্বিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক। বিষয় নির্ব্বাচন, ভাষা ও রচনা উত্তম। অমিত্রাক্ষর পদ্যগুলি একটু কর্কশ হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্য—

শ্রীরেবতীমোহন গুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত। প্রকাশক মনোমোহন ঘোষ, যোলঘর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। মূল্য পাঁচ আনা।

গদ্যপদ্যসমন্বিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক। ইহার পদ্যপাঠগুলি প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন ; যার কর্ম্ম তারে সাজে ; কবিতা গড়িয়া পিটিয়া হয় না, কবিতা ঈশ্বরদত্ত শক্তির স্ফুরণ মাত্র। যাহার ভাগ্যে সেই দেবাশীর্ব্বাদ পড়ে নাই তাহার ধার করিয়া কাজ চালানোই ভালো ; উপাদানের অভাব সত্ত্বেও সৃষ্টির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এ কথা অনেক লেখকই বুঝেন না। এই পুস্তকের পদ্যগুলি সুনির্ব্বাচিত। গদ্যাংশের রচনা ও বিষয় উত্তম।

ছেলেদের গল্প—

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটী। দ্বিতীয় সংস্করণ। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা।

এই পুস্তিকায় দুটি গল্প আছে। একটি গদ্যে (দ্বীপের কাহিনী), অপরটি পদ্যে (যতীন্দ্র ও যামিনী)। দ্বীপের কাহিনীটি বিলাতী adventureএর কাহিনী ; যতীন্দ্র ও যামিনী বাঙালী সংসারের সুখদুঃখের কথা। একটির কৌতুকবিস্ময়কর ঘটনাপরম্পরায় শিশুচিত্ত যেমন কল্পনায় নূতন জানিবার ইচ্ছায় উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, অপর গল্পটি তেমনি শিশুর স্বভাবের উপর স্নিগ্ধ করুণ প্রভাব বিস্তার করিবে ; একটি সংসারের বৈচিত্র্য দেখাইয়া শিশুকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বলিবে, অপরটি সেই কর্ম্মক্ষেত্রে দুঃখ-

দারিদ্র্যের মধ্যে স্নেহ প্রেম করুণার অমৃতধারার রসাস্বাদের সংবাদ দিবে। গল্প দুটিই সুলিখিত। গল্পখোর ছেলেমেয়েরা ইহা পাইলে সুখী ও উপকৃত হইবে।

খুকুরাণীর ডায়ারি—

শ্রীবিনোদিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক কুন্তলীন প্রেস। সচিত্র ও কাপড়ে বাঁধা। ১২২ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা।

লেখিকা তাঁহার শিশুকন্যার জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া করিয়া তাহার জীবনকথা আশ্রয় করিয়া শিশুজীবনের একটি ধারাবাহিক কৌতুককর ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতিদিন শিশুর জাগরণ হইতে শয়ন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শিশুর ক্রীড়া কৌতুক ও কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া তাহার জ্ঞানবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি কিরূপে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে; শিশুর চিন্তা, বুদ্ধি, পর্য্যবেক্ষণ, স্মৃতি, অনুকরণ, খেলা, শিল্পকর্ম্ম, সঙ্গীত, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, কৌতুক, সেবা, আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতির পাশে রাগ, বিরক্তি, আব্দার, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির চিত্র লেখিকার নিপুণ পর্য্যবেক্ষণে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে খুকুরাণীর বিভিন্ন অবস্থার ছবি (ফটোগ্রাফ) দেওয়াতে বিষয়গুলি আরো বিশদ হইয়াছে। ছবিগুলির মধ্যে খুকুরাণী, খুকুর লেখাপড়া, খুকুর নাওয়া, খুকুর খেলা, খুকুর সেলাই বেশ স্বাভাবিক রকমের সুন্দর হইয়াছে; খুকুর বাজনা বাজানো ছবিখানিও চলনসই। বাকি তিনখানি ছবি ভারি আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়াছে; যেন ক্যামেরার সামনে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসা হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানিতে শিশুর কথা শিশুর নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হওয়াতে বিশেষ কৌতুককর হইয়াছে; শিশুর সেই স্বকীয় ভাষা বুঝিবার সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে এবং স্থানে স্থানে ফুটনোটে তাহার মানবীয় চলিত ভাষার প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য অংশও সরল শোভন ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মাতারা শিশুর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা শিশুর চরিত্র সুন্দর শোভন কল্যাণকর করিয়া গঠন করিতে শিখিতে পারিবেন; পিতামাতা, ভাইভগিনী, আত্মীয় অভ্যাগত, দাসদাসী প্রভৃতির সহিত স্নেহ প্রীতি শান্তি সেবা আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী করিয়া শিশুকে গড়িয়া তোলা সহজ হইবে। আর শিশুরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ ও কৌতুকের সহিত একটা আদর্শ শিশুজীবন চোখের সামনে দেখিতে পাইবে। এই শিশুটি আবার কাল্পনিক নয়; তাহাদেরই মতন একজন; এই শিশুটি পশ্চিমে হিন্দুস্থানী বেষ্টনের মধ্যে পালিত; সুতরাং তাহার ধরণ ধারণ, কথাবার্ত্তা বাঙালী শিশুপাঠকের বিশেষভাবে কৌতুককর বোধ হইবে।

আজকালকার কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তসোরি প্রণালীতে শিক্ষা দিবার পক্ষে এইরূপ পুস্তক বিশেষ উপযোগী। মন্তসোরি স্ত্রীলোক; তিনি য়ুরোপ আমেরিকায় শিশুশিক্ষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। শিক্ষাকার্য্যে নারীর সহায়তাই শ্রেষ্ঠ সহায়তা। আমাদের দেশের মাতারা এই পুস্তকনির্দ্দিষ্ট প্রথায় শিশুশিক্ষায় মন দিলে শিশুরা মায়ের স্নেহাশ্রয়ে খেলার সঙ্গে শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারিবে। মানুষকে সকল রকম অত্যাচার ও উপর-চাপ হইতে মুক্ত করিয়া কেবল নিজ প্রকৃতির অধীন করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে। শিশুর মাথার উপর ভাড়া-করা গুরুমহাশয় যদি বেত উঁচাইয়া বসিয়া শিশুচিত্ত দুর্ব্বল ভীরু সঙ্কুচিত করিয়া তোলেন তবে বড় হইয় সে মাথা তুলিতে পারিবে না, আপনার ন্যায্য প্রাপ্য জে করিয়া চাহিতে তাহার সাহসে কুলাইবে না; শাস্ত্রবিধি, সমা শাসন, হাকিমের আদেশ অন্যায় জানিলেও মাথা পাতিয়া সহি চলিতেই সে শিখিবে। মাতারা শিশুদিগকে স্বাধীন আবহাওয় মধ্যে মানুষ করিয়া তুলিয়া মনুষ্যত্বের পথ মুক্ত করিয়া তুলুন।

রবীন্দ্রনাথ—

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কবির কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমি স্বরূপে লিখিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ১০৫ পৃষ্ঠ মূল্য আট আনা।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ও কাব্যের ইহা নিপুণ ও বি বিশ্লেষণ। লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তি একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার পূর্ব্বকে উত্ত রের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধি দেয়। অপূর্ণতা অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্প পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়—সেই জন্য কবির বা সাহিত্যি কের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভাল মা পরিণতির ভাল। * * * কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা মধ্যে তাঁহার এই ভিতরকার পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকে আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

লেখক বিশেষ নিপুণতার সহিত রবীন্দ্রনাথের বহু কাব্য কবিতা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার কাব্যজীবন ও কাব্যের এক ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করি কবির অনেক কাব্যের অন্তর্গত গূঢ় মর্ম্মকথাটির সহিত পরি সহজ হইবে; কবিকে বোঝা সহজ হইবে; এবং কবির কাব ভাবৈশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত বিশ্লেষিত দেখিয়া আনন্দ ও বি দুইই হইবে।

এ পুস্তকখানি প্রবন্ধাকারে প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল সুতরাং ইহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। কেবল এই কথা বলি লেই যথেষ্ট হইবে মনে করি যে, এমনতর কবি-ও-কাব্য-সম লোচনা বঙ্গভাষায় কম আছে এবং কদাচিৎ হইতে দেখা যায়।

উজানী—

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটু কোম্পানি। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এখানিতে বিবিধ বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "অনেকগুলিই সত্য ঘটনা অবলম্ব লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস। সামা জীবনের সামান্য চিত্র।" এই চিত্রগত জীবনগুলি সামান্য এই অ যে, তাহারা বৃহত্তর মানবসমাজের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু আসলে সেগুলি সামান্য নয় অজ্ঞাত full many a gem of purest ray serene যাহা is bor to blush unseen তাহারই কতকগুলি বাছিয়া বাছিয়া কবি বৃহত্ত ক্ষেত্রে পরিচিত করিয়া দিতেছেন; ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাসেও কত শিখিবার ভাবিবার উপাদান লুক্কায়িত থাকে তাহার পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যায়;—ইহাই এই গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব।

গ্রামের অজয় ও কুনুর নদী, হংস খেয়ারি ও অখিল মাঝি, আরী

ও ছিরু, রাম মশায় ও নোটন আপন আপন চরিত্রের বিশেষত্ব লইয়া আমাদের নিতান্ত পরিচিত লোকের মতন দেখা দিয়াছে।

চণ্ডালীর দেবতার চাঁদমুখ দেখিবার একান্ত আগ্রহের পশ্চাৎটানে যখন 'চলে না দেবের রথ' তখন প্রধান পাণ্ডা ভক্ত অন্বেষণে বাহির হইয়া দেখিল চলিবার শক্তি নাই তবু চাঁদমুখ দেখিতে 'হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ি'। পাণ্ডা চোখের জলে ভাসিয়া বুড়ীকে বুকে তুলিয়া লইল। তখন—

ফ‍ঁাপোর বৃদ্ধা বলে দাও ছাড়ি,
বাবা গো চাঁড়াল মুই।
ব্রাহ্মণ বলে দে মা পদধূলি
গুরুর গুরু যে তুই।

এমন কথা যে-গ্রামের কবি গাহিতে পারেন তিনি নিজে ধন্য হইয়া সেই গ্রামকে ধন্য করিবেন, এবং সেই হওয়ায় সমস্ত দেশ সংস্কার-বিমুক্ত শুদ্ধচিত্ত হইবার পথে দাঁড়াইবে। কবির উদার প্রাণ শূদ্র ও গরিব চাঁদ সরকারের প্রতিমাপূজা হয় নাই বলিয়া তাহার দুঃখে ...তর ব্রাহ্মণ জমিদার কান্ত গাঙ্গুলিকে দিয়া যেমন বলাইয়াছে—

চল খুড়া তাড়াতাড়ি,
না যাউক কেহ আমি যাই,
আমি খাব তব বাড়ী।

তেমনি আবার মঙ্গলকোটের পথে গাজি সাহেবের ভাঙ্গা মসজিদ—

'আজ তার আধখানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে,
আধখানা কুন্নুরের গায়,

দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছে—

ভবনের মাঝ দিয়ে নদী হয়ে বহে গেছে
শত নয়নের আঁখিজল।

এই মসজিদের দুর্দ্দশা কবি একটি ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন—

ইদের দিনেও আজ জনহীন পড়ে থাকে।

আবার হরিশ পোদ্দারের ভাঙা বাড়ীতে—

সব গেছে, একমাত্র কন্যা আছে তার,
ত্যক্ত গৃহ-আঙিনায় সেফালির ঝাড়।

দেখিয়া যেমন, আলি নওয়াজের তমসুক পোড়ানো ও গোলামের 'আধেক-গড়া গোহালখানি' দেখিয়াও তেমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে।

গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ছেলে নোটনের আপন ভুলিয়া পরের সেবা; রাম মহাশয়ের বিদ্যাসাধ্যি; আমগাছ ও ঘোষালপুকুর; ছিরু ও শ্রীমন; প্রভৃতির গেঁয়ো চিত্র বিচিত্র রসে উপভোগ্য হইয়াছে। শ্রীমন—

খেলত শুধু ঝুলঝুপ পুর ডাণ্ডাগুলি খেলা
পলের মত চলে যেত দীর্ঘ দিনের বেলা।

* * *

নীলকণ্ঠের যাত্রা যদি দুক্রোশ দূরে হয়
সবার আগে তাহার সেথা না গেলেই ত নয়।

ইত্যাদি কাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মনের মধ্যে নিজ গ্রামের একটি তুল্য চরিত্র আকার ধরিয়া উঠে; ইহারা সব বাংলার পল্লীগ্রামের বিভিন্ন চরিত্রের এক একটি সদৃশ দৃষ্টান্ত (prototype) মাত্র।

এই সুন্দর গ্রাম্যছবির বইখানি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থের আদর্শে গড়িবার চেষ্টা করাতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও ভাবের ছায়া অনেক স্থলে পড়িয়াছে এবং তাহা সুস্পষ্ট ধরা যায়। কোনো কোনো কবিতায় ইংরেজি কবিতার বা কথার ভাব একেবারে তর্জ্জমা করিয়া বসানো হইয়াছে। অখিল মাঝির 'বন-টগরের মত' সাদা হৃদয় দেখিয়া গ্রামের জমিদারের হিংসা Char es Mackay লিখিত The Miller of the Dee নামক কবিতার অনুরূপ। তুলনার জন্য নিয়ে উভয়েরই শেষ ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

একদা গ্রামের জমিদার
ক'ন তরী হতে নামি',
জগতের মাঝে শুধু তোর
হিংসা করি রে আমি,
জমিদারী দিয়ে ডিঙ্গিখান
নিতে সদা আছি রাজি,
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ
পাই যদি ওরে মাঝি!

"Good friend" said Hal, and sighed the while,
"Farewell! and happy be;
But say no more, if thou'dst be true
That no one envies thee.
Thy mealy cap is worth my crown--
Thy mill, my kingdom's fee!
Such men as thou are England's boast
O miller of the Dee!

রাম মশায়ের চিত্র গোল্ডস্মিথের Village School-masterএর নকল। তুলনার জন্য দুইটী কবিতা হইতেই অনুরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল—

রামায়ণ মহাভারতে ছিলেন সবিশেষ পারদর্শী,
পাঠের অধিক ক্রন্দনে তিনি ভুলাতেন পাড়াপড়শী।
মারীচের বাপ-শ্বশুরের নাম লয়ে করিতেন তর্ক
পণ্ডিত জন মেনে যেত হার কি বুঝিবে বল মূর্খ।
মণ্ডলগণ বলিত সকলে, একি বিধাতার কাণ্ড,
এত বিদ্যেটা ধরেছে কেমনে মাথার ক্ষুদ্র ভাণ্ড।

The village all declared how much he knew;
'Twas certain he could write, and cipher too.
In arguing, too, the parson owned his skill,
For even, though vanquished, he could argue still;
While words of learned length and thundering sound,
Amazed the gazing rustics ranged around;
And still they gazed, and still the wonder grew,
That one small head could carry a l he knew.

কাপালিকের প্রতি দেবীর আদেশ রবীন্দ্রনাথের 'যার নাম ভালবাসা তার নাম পূজা' ভাবটির তর্জ্জমা বা paraphrase। তথাপি এই কবিতাটি ভাবমাধুর্য্যে সুন্দর ও পরম উপভোগ্য হইয়াছে। কাপালিক শবসাধনায় বসিয়া বিবিধ প্রলোভন, বিবিধ বিভীষিকা দেখিতেছে, কিন্তু সে অটল। তখন দেবী মায়া তাহার মায়ের কণ্ঠে তাহাকে ডাক দিল; কাপালিকের ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল। ব্যথিত কাপালিক তখন আপনার পরাভবে দেবীকে বলিতেছে—

যৌবনের প্রলোভন, রূপ, বিত্ত, নিখিল সংসার
পারে নাই ভাঙিবারে ক্ষণতরে যে ধ্যান আমার,
শ্মশানে জননীকণ্ঠে ডাকি মায়া করিল চঞ্চল
কঠিন শাক্তের চিত্ত, করিল মা সকল বিফল।
আমি অসংযমী মাতা, দেখিলাম শক্তি নাই মোর
কাটিবারে সংসারের অতিমাত্র ক্ষীণ স্নেহ-ডোর।

এবং নির্ব্বেদদগ্ধ হৃদয়ে যখন সে 'ভ্রমরার ঘন কৃষ্ণজলে' প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত, তখন দেবী আবির্ভূতা হইয়া

বলিলেন, উঠ বৎস, মহাব্রত পূর্ণ তব আজ,
আশিস-নির্ম্মাল্য লহ, আজি তব সিদ্ধ সবকাজ।
ব্যর্থ নহে তোর পূজা, দেবগ্রাহ্য সার্থক সুন্দর,
প্রীত আমি, উঠ বৎস, লভ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর।
স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-হীন কর্কশ কঠিন কারাগার
হয় না হয় না কভু দেবতার বিলাস-আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্বজননীর স্নেহ সে কখন পারে না লভিতে!

এই সঙ্গে বৈরাগী উদয় মহান্তের নূতন স্নেহবন্ধনে বাঁধাপড়ার বেদনায় দেবতার সান্ত্বনা উল্লেখযোগ্য—

শোন গো সাধু, শোন গো ত্যাগী, শোন গো অনুরক্ত,
জীবে যাহার যত গো দয়া সে মোর তত ভক্ত।
ভেব না তুমি হে মহাজ্ঞানী, হৃদয়ে এঁকে নিয়ো,
জীবেরে দয়া নামেতে রুচি আমার চিরপ্রিয়।

কিন্তু ইহার মধ্যেও Leigh Huntএর আবু বিন আধম কবিতার ছায়াপাত হইয়াছে। 'শেষ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনে ক কুড়াতে' স্মরণ করাইয়া দেয়।

কতকগুলি কবিতার কেন্দ্রগত ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে না পারাতে কবিতাগুলির পরিণতি সুস্পষ্ট হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ 'বিমলা', 'হংস খেয়ারি', 'নীহার', 'আশুতোষ' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে; অথচ ইহাদের মধ্যে ভাব ও কবিত্ব দুইই অঙ্কুর অবস্থায় অস্পষ্ট হইয়া আছে।

কবিতাগুলির অনেক স্থানে ছন্দপতন আছে; অনেক স্থলে নিকৃষ্ট মিল ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনো কোনো কবিতা অস্পষ্ট হইয়াছে, কেন্দ্রগত ভাবটিকে আরো একটু ফলাইয়া তোলা উচিত ছিল; কোনো কোনো কবিতায় বেশি বলা হইয়াছে একটু প্রচ্ছন্ন করিয়া ইঙ্গিতের উপর রাখিলে ভালো হইত। শেষোক্ত দোষে দুষ্ট হইয়াছে বিশেষ করিয়া একটি ভালো কবিতা 'সতী'; উহার শেষ শ্লোকটি না দিলেই বোধ হয় ভালো হইত।

পুস্তকখানিতে ছাপার ভুলও আছে।

এই পুস্তকখানিতে কাব্যরসিক সমাজে সমাদর পাইবার বিশেষ যোগ্যতা আছে।

রাজতপস্বিনী—

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক মজুমদার লাইব্রেরী। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ২৪০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। পাইকা অক্ষরে ছাপা। মূল্য এক টাকা।

এখানি রাজশাহী জেলার পুঁটিয়ার পুণ্যশ্লোক মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনীপ্রসঙ্গ; সুগঠিত জীবনচরিত নহে। লেখকের পিতা মহারাণীর দেওয়ান ছিলেন; সেই সূত্রে লেখকের সহিত মহারাণীর পরিচয়; তিনি আপন পুত্রের ন্যায় লেখককে স্নেহ করিতেন, এবং লেখকও তাঁহাকে মাতার তুল্য ভক্তি করিতেন। এজন্য লেখক নিজের অভিজ্ঞতা. হইতে এবং বিজ্ঞাতত্থ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে জানিয়া মহারাণীর জীবনের অনেক কথা সংগ্রহ করিতেছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, মসলা সংগ্রহ করিয়া সুগঠিত জীবনচরিত লিখিবেন। এজন্য এই সংগ্রহের মধ্যে একটা ক্রম বা ধারাবাহিকতা বা পৌর্ব্বাপর্য্য কিছু নাই; যাহা যখন যে প্রসঙ্গে মনে পড়িয়াছে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাওয়া যায় না; যে-সমস্ত সদ্গুণের জন্য এই মহিলা বঙ্গে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা, এবং বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভুদেব প্রভৃতি দেবচরিত্র ব্যক্তিদিগের স্নেহ লা করিয়াছিলেন তাহা যে কেমন করিয়া তিনি অর্জ্জন করিতে সম হইয়াছিলেন তাহারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পুস্তকে শেষের দিকে একটু আভাস মাত্র আছে যে মহারাণী তাঁহ পিতামহী, পিতা ও বিশেষ করিয়া মাতার নিকট হইতে সদ্গু রাজি লাভ করিয়াছিলেন। পতিকুলে কোনো মহিলা অভিভাব ছিল না; ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া তের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এই অল্পদিনের স্বামীসঙ্গও নিরবচ্ছিন্ন ছিল —স্বামী যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং যখন তি কলিকাতায় গিয়া থাকিতেন তখন বালিকা বধূকে পিত্রালয়ে গি থাকিতে হইত। সুতরাং তাঁহার চরিত্র গঠনের সহায়তা এব উপাদান পিতৃকুল হইতেই পাইয়াছিলেন বুঝা যাইতেছে, কিন্তু কেম করিয়া কিরূপ আদর্শ সম্মুখে পাইয়া পলে পলে চরিত্র গঠিত হই উঠিয়াছিল তাহার বিশেষ কোনো পরিচয় এ গ্রন্থে নাই।

স্থানে স্থানে ব্যক্তি ও ঘটনার পরিচয় এত অসম্পূর্ণ যে তাহ অস্পষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। স্থানে স্থানে ভাষা সেকেলে ধরণের এবং ভাষার গঠনে ও শব্দের ব্যবহারে ভুলও আছে।

এই-সমস্ত ত্রুটী অনিবার্য্য; কারণ ইহা জীবনচরিত গঠনে উপাদান সংগ্রহ মাত্র।

কিন্তু ইহার মধ্য হইতেই এই অসাধারণ রমণীর যে চিত্রা আমরা পাই তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এবং প্রসঙ্গত সেকেলে জমিদার-সংসারের একটি কৌতুককর চিত্র আমর দেখিতে পাই।

ছয় বৎসর মাত্র সধবা থাকিয়া তের বৎসরের বালিকা বিধব হইয়া যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন তাহার নিষ্ঠা শুচিতা ও কৃচ্ছ্রত অসাধারণ। বারো হাতের মোটা থান বারো মাসের পরিচ্ছদ শীতে কাতর হইলে আগুনে হাত সেঁকিয়া লইতেন। এক বেল হবিষ্যান্ন গ্রহণ; মাথার কেশ কর্তন; ব্রত উপলক্ষে একাধিক উপবাস প্রভৃতি তাঁহার কাছে নিতান্ত সহজ অবশ্য-অনুষ্ঠেয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল। তের বৎসর মাত্র বয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর চিত্র তিনি দেখিতে পারিতেন না; 'কদাচিৎ সেদিকে দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার মুখ রক্তিম ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।' সেকালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিন্দার বিষয় ছিল; তৎসত্ত্বেও তিনি নিয়মিত প্রত্যহ পুস্তক পত্রিকা সংবাদ পাঠ করিতেন—বাংলা ভাষার সমস্ত সংগ্রন্থ তিনি পড়িয়াছিলেন, সংস্কৃতও অল্প জানিতেন। নিজে সমস্ত বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন; কিন্তু তাঁহার চক্ষু-লজ্জার সুবিধা পাইয়া কর্ম্মচারীরা মঞ্জুরী খরচের অধিক লিখিয়া বাকিটা আত্মসাৎ করিত; তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন 'সবারও নয়, কবারও নয়।' 'খাদ্যসামগ্রী চুরি যাওয়ার কথা শুনিলে হাসিয়া তিনি বলিতেন "খাবার জিনিস কখন লোকসান হয়? কেহ না কেহ ত খাবেই!"' অথচ 'পাপের প্রতি যে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা অনুদিন তিনি পোষণ করিতেন তাহাও কার্য্যে প্রকাশ পাইত। একদিন অন্দরে খবর আসিল একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে। উহার অসচ্চরিত্রতার কথা মহারাণীমাতার গোচর হইয়াছিল। দেখা করিলেন না, কিন্তু যাহাতে সে সুবিচার পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।' আত্মীয় বা আশ্রিতদের মধ্যে 'কেহ কোন অন্যায় কি অযশের কাজ করিয়াছে শুনিবামাত্র তিনি কেবল অজস্র অশ্রুপাত করিতেন। অপরাধী ইহাতেই শাসিত হইত, অন্য কোনরূপ দণ্ড দান করিতে তিনি জানিতেন না।' এই দয়ার ভাগ শুধু তাঁহার প্রজারা নয়, অপর শরিকের প্রজারাও পাইত;

নরনারী, পশুপক্ষী সকলের দুঃখেই তাঁহার হৃদয় সহজেই ব্যথিত হইত। 'অন্ন ও বিশুদাসী মহারাণীমাতার আদেশ অনুসারে সমস্ত পুঁটিয়া ঘুরিয়া কার ঘরে অন্ন নাই, কার ঘরে বস্ত্র নাই, কার ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না, সন্ধান করিয়া তাঁহাকে বলিত। তিনি তদনুসারে ব্যবস্থা করিতেন।' কাহারো পীড়ার সংবাদ পাইলে নিজের কঠিন পীড়া ও যন্ত্রণার সময়েও নিজের চিকিৎসককে সেই পীড়িতের চিকিৎসার জন্য জেদ করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। কত ছাত্র তাঁহার খরচে লেখা পড়া করিয়া উত্তরজীবনে বড়লোক হইয়াছেন। অথচ তাঁহার অজস্র দানের কথা সংবাদ-পত্রে প্রচার হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন। 'তাঁহার কাছে ছোট বড় পাপী পুণ্যাত্মা সকলেই সন্তানতুল্য' ছিল। 'নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস কঠোর হিন্দুয়ানিসম্মত হইলেও তাঁহার মত সাধারণত বড় উদার ছিল।' তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণে সাহায্য করিতেন; ব্রাহ্ম প্রচারকেরা তাঁহার গৃহে গিয়া সমাদৃত হইতেন, ধর্ম্মালাপ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন। তাতে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ শ্রীশবাবু ক অনুযোগ করিয়া বলিয়া-ছিলেন 'ছি বাবা, শূদ্রে গীতার ব্যাখ্যা করে, তাই কি শোনা লাগে?' মহারাণী 'সদনুষ্ঠানপ্রিয়তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় ভক্তি করিতেন এবং বলিতেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ চলিলে সমাজে পাপস্রোত অনেক কমিবে।' লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব যখন গভর্ণমেণ্টগেজেটে প্রকাশিত হয় তখন সর্ব্বপ্রথম মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর ঐকান্তিক পোষকতায় পুঁটিয়ায় সমর্থনসভা ও আনন্দোৎসব হয়; স্বয়ং মহারাণী পর্দ্দার অন্তরালে সভায় উপস্থিত ছিলেন; এবং 'আত্মশাসন' (স্বায়ত্তশাসনকে তিনি আত্মশাসন বলিতেন) 'সম্বন্ধে কি হইতেছে তাহার খুঁটিনাটি সংবাদ তিনি সর্ব্বদা রাখিতেন।' ব্রহ্মচর্য্যের কৃচ্ছ্রসাধন, অতিরিক্ত উপবাস, দত্তকপুত্রের বিয়োগে মানসিক ক্লেশ প্রভৃতিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে অশেষ যশ পশ্চাতে রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

এই পুণ্যশীলা রাজতপস্বিনীর পুণ্যকাহিনী পড়িয়া শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। ইহা বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের পাঠ করা উচিত। ইহার আভ্যন্তরীণ অবান্তর কাহিনীগুলি সেকেলে জমিদার-সংসারের ও তাহার আশেপাশের একটী বিশেষ কৌতুক-চিত্রের আভাস দেয়, ইহাতে পুস্তকখানি পড়িতে আরো ভালো লাগে।

সুভদ্রা—

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১০৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র। এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপা। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১৲, অবাঁধা ৸৴০।

সংস্কৃত ও বাংলা মহাভারত অবলম্বনে সুভদ্রার চরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। রচনা অনেকটা উপন্যাসের ধরণের। স্ত্রীপাঠ্য হইবার উপযুক্ত। সুভদ্রার স্নিগ্ধ চরিত্র ও পুণ্য কাহিনী কথা আকারে রচিত হওয়াতে পাঠে আগ্রহ জন্মে। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন 'অভিমন্যু-কুমার তখন উত্তরার গর্ভাসীন।' 'স্থিত' অর্থে 'আসীন' শব্দের প্রয়োগ বাংলা ভাষায় দেখা যায় না, 'আসীন' মানে আমরা 'উপবিষ্ট' 'বসিয়া থাকা' বুঝি।

তান্‌কা-সপ্তক

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুতে)

অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে।
অশ্রু-সায়র-কূলে।

সে ছিল মূর্ত্ত
হাস্যের অবতার,
প্রতি মুহূর্ত্ত
ধ্বনিত হাসিতে তার।
হরষের পারাবার!

ত্র্যম্বক প্রভু
তারে দিয়েছিল হাসি,
হাসি তার কভু
জমাট তুষার-রাশি।
সে পুন "মন্দ্র"-ভাষী!

ফেনিল হাস্য
সাগরের মতো তার;
বিলাস, লাস্য,
হুঙ্কার, হাহাকার,—
মিলে মিশে একাকার!

জ্যোৎস্না রাত্রি
চুপে তারে নেছে ডেকে!
পারের যাত্রী
গিয়েছে এ পার থেকে
হাসির অঙ্ক রেখে!

আলো অবসান
শেষ মলিনতা জিনে,
পরিনির্ব্বাণ-
তিথির পূর্ব্ব দিনে,
লঘু মনে বিনা ঋণে!
দেশ-জোড়া শোকে
অ-শোকের মূল দহে;
এ অশ্রু-লোকে
অশ্রু দ্বিগুণ বহে।
তবু সে শীতল নহে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বর্ষা

(১)

বরষা নিশ্বাস ফেলে করেছে মেদুর
নিদাঘের গগনের রজত-দর্পণ।
ললিত গতিতে মেঘ করি প্রসর্পণ
হেলায় আচ্ছন্ন করে জ্বলন্ত রোদ্দুর॥

প্রসারি কপিশ পাখা বরষা বাদুড়
অপরাহ্ণে সান্ধ্যছায়া করেছে অর্পণ।
তিরস্কৃত দিবাকর হয়ে সন্তর্পণ
আকাশের অবকাশে ছড়ায় সিঁদুর॥

তাপখিন্ন কুসুমেরা এবে মাথা তুলি
নয়ন মেলিয়া দেখে অকাল গোধূলি!

শুভ্র পীত রক্তবর্ণ পরি চারু সাজ,
ক্লান্ত তনু রেখে কান্ত আকাশের কোলে
ভর দিয়া ক্ষীণবৃন্তে মন্দ মন্দ দোলে
চাঁপা আর কৃষ্ণচূড়া আর গন্ধরাজ॥

(২)

বরষা এসেছে আজ সেজে বাজিকর,
মেঘের ধরিয়া শিরে ঘন জটাজাল।
অদ্ভুত মায়াবী ঋতু রচি ইন্দ্রজাল
চোখের আড়াল করে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর॥

সঘনে বাজায় হয়ে বদ্ধ পরিকর
অম্বরে ডমরু লক্ষ অলক্ষ্য বেতাল।
বিদ্যুৎ-নাগিনী যত ত্যজিয়ে পাতাল
অন্তরীক্ষে নাচে সবে করে ধরি কর॥
থেকে থেকে হেসে উঠে বিচিত্র বিশাল
গগনের কোণে কোণে রঙের মশাল॥

বরষা-পরশে দিবা রাত্রিরূপ ধরে।
আগুনে জলেতে ভুলি জাতিবৈর আজ
খেলা করে আকাশের অন্ধকার ঘরে।
এ বাজির সব ভাল, বাদ দিয়ে বাজ!

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

চিত্র-পরিচয়

মেরি ম্যাগডেলিন

মেরি ম্যাগডেলিন জুডিয়ার একজন বারনারী ছিলেন; ভগবান যিশুখ্রীষ্টের পুণ্যপ্রভাবে তিনি পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া সাধ্বী হইয়াছিলেন এবং যিশুর শিষ্যা-রূপে তাঁহার মরণান্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এই চিত্রে তাঁহার নবজীবন-লাভ জনিত পুণ্যজ্যোতি ও ধ্যানতন্ময় স্বর্গীয় ভাবটি চিত্রিত হইয়াছে। যাঁহারা এই বরণীয়া নারীর জীবনের সংগ্রাম ও পরিবর্ত্তনের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কবিত্বময় পরিচয় পাইতে চান, তাঁহারা মেটারলিঙ্কের 'মেরি ম্যাগডেলিন' নামক উপাদেয় ভাবপ্রধান নাটকখানি পাঠ করিলে তৃপ্ত হইবেন।

প্রবন্ধাদি প্রকাশ সম্বন্ধে নিবেদন

যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসীতে প্রকাশার্থ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের রচনা প্রকাশের সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতেছি। বিশেষ কোনও সংখ্যায় কোন লেখা ছাপিতে কেহ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ না করিলে কৃতজ্ঞ হইব। যদি এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে ক্ষমালাভে যেন বঞ্চিত না হই।

প্রবন্ধ বা গল্প সচরাচর প্রবাসীর ৪।৫ পৃষ্ঠার অধিক দীর্ঘ না হইলে ভাল হয়। দীর্ঘ প্রবন্ধ অপেক্ষা ছোট প্রবন্ধ শীঘ্র প্রকাশিত হয়। রচনা স্বসম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপাততঃ কয়েক মাস আমি কোনও নূতন ক্রমশঃ-প্রকাশ্য রচনা মুদ্রিত করিতে পারিব না।

কোন মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে যে রচনা আমার হস্তগত হইবে না, তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা কম। ৭ই তারিখের মধ্যে আসিলেই যে পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসী-সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রবাসীর লেখক, গ্রাহক ও পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া প্রবাসীর বিজ্ঞাপনের ৯ পৃষ্ঠায় '**প্রবাসীর বিশেষত্ব কি?**' এবং বিজ্ঞাপনের ৩০ পৃষ্ঠায় '**প্রবাসীর নিয়মাবলী**' পাঠ করিয়া দেখিবেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তুলসীর জন্ম।

যুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি আই-ই, কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে
শিল্পীর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২০

৪র্থ সংখ্যা

সভ্যতার স্তর ও যুগ

পশুদিগের সহিত মনুষ্যের শারীরিক সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। পশুর ও মনুষ্যের দেহযন্ত্র সর্ব্বতোভাবে একই উপাদানে গঠিত। উচ্চশ্রেণীস্থ বানরদেহে প্রত্যেক পেশী প্রত্যেক শিরা ও প্রত্যেক অস্থি যে-প্রথায় সন্নিবিষ্ট, মনুষ্যদেহেও ইহারা অবিকল সেই প্রথায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অস্থিসংস্থান-বিদ্যার দিক্ দিয়া (anatomically) দেখিতে গেলে, নিম্নশ্রেণীস্থ বানরের সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের যে সম্বন্ধ, উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অনেক নিকট। চিত্তবৃত্তি বিষয়েও কতিপয় শ্রেষ্ঠ পশুর সহিত মানুষের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়। স্নেহ, হিংসা, ঈর্ষা, ভয় বা সাহস, কতকগুলি পশুতে যেমন আছে, মনুষ্যহৃদয়েও সেই রূপেই বিদ্যমান।

কিন্তু কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে মনুষ্যে ও পশুতে তারতম্য লক্ষিত হয়ঃ—

প্রথম—প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান একই শক্তির সাহায্যে মানুষ ও পশু চিন্তা করিয়া থাকে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতদূর প্রাচীনকালের কোনও নিশ্চিত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সেই সময় হইতেই পশুদের অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধি এত পরিপুষ্ট যে উহাদের মধ্যে তুলনাই হয় না। ধীশক্তি সম্বন্ধে মনুষ্যে ও পশুতে বিস্তর প্রভেদ, এবং এই প্রভেদের সামঞ্জস্য করিতে পারে, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কোনও জীব এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি মস্তিষ্কাধার (Cranial Capacity) বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আদিম প্রস্তরযুগের মানব (Palaeolithic man) কেবল যে সর্ব্বোচ্চ পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা নহে, তাহার আধুনিক কি সভ্য, কি অসভ্য সকল বংশধরগণের তুলনায় কোনও অংশে ন্যূন ছিল না।*

দ্বিতীয়—আ, দ্য কাৎরফাজ প্রমুখ কতকগুলি মনুষ্যতত্ত্বজ্ঞের মতে দুইটী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দ্দেশিত হয়—(১) আধ্যাত্মিক বৃত্তি—যাহা দ্বারা মানুষ অলৌকিক জীবের ও ভবিষ্যৎজীবনের উপর বিশ্বাস করে; এবং (২) নৈতিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা মনুষ্য লাভের ও শারীরিক সুখদুঃখের অতীত নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে। পশুদের মধ্যে এই দুই শক্তি অঙ্কুরাবস্থাতেও দেখা যায় না। আদিম মানবের এবং তাহার সমতুল্য আধুনিক অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও কিন্তু এই দুই শক্তি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাসীদেশে যে কতিপয় আদিম প্রস্তরযুগের নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে মৃতব্যক্তিকে তাহার অস্ত্রাদির সহিত সমাহিত করা হইয়াছিল, এবং অন্ততঃ একটী মৃতব্যক্তির সহিত তাহার অস্ত্রাদির অতিরিক্ত একটা বাইসনের জঙ্ঘাও বোধ হয় মৃতাত্মার ভোজনের উদ্দেশ্যে দেওয়া

* লা শাপেল ও স্যাস্তের নরকপাল সমূহের মস্তিষ্কাধারের পরিমাণ ১৬০০ ঘন সেণ্টিমিটার, নেয়াণ্ডারথালের ১৭০০, ক্রোমায়ঞো কপাল সমূহের ১৫৯০ হইতে ১৭১৫ পর্য্যন্ত। প্যারিবাসিগণের মস্তিষ্কাধারের নিম্নতম পরিমাণ ১৫৫৮ ঘন সেণ্টিমিটার, চীনগণের ১৫১৮, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোগণের ১৪৩০; এবং ট্যাস্মানিয়াবাসিগণের ১৪৫২; টনিপার্ড এই পরিমাণগুলি দিয়াছেন। ১৯১০ সালের জিওলজিকাল সোসাইটীর সাম্বৎসরিক উৎসব-সভার বক্তৃতায় অধ্যাপক সোল্লাস বলিয়াছেন—"ঐ কপালগুলি এই তথ্যের নির্দ্দেশ করিতেছে যে ফ্রান্সের আদিম নিবাসীরা মস্তিষ্কাধার বিষয়ে সভ্যতম মানব অপেক্ষা উপরে বৈ নিম্নে ছিল না।"

হইয়াছিল। নব-প্রস্তরযুগের মনুষ্যগণ মৃতের সমাধির উপর আকাটা আস্ত পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত এবং মৃতাত্মাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে সমাধির ভিতর অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্রাদি এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ করিত।

পৃথিবীর কোনও স্থানেই এখনও এমন কোনও অসভ্য জাতি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার একেবারে কোনও ধর্ম্ম নাই। কতকগুলি অসভ্য জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস তদপেক্ষা সভ্যতার অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত জাতির ধর্ম্মমতের সহিত স্বচ্ছন্দে উপমিত হইতে পারে। নিম্নপদস্থ বহু দেবতার উপরে স্থিত বিশুদ্ধ-আত্মা পরমেশ্বরের বিষয়ে টাহিটীয়গণের স্পষ্ট ধারণা আছে। তাহাদের একটী গানের আরম্ভ এইরূপ—"তিনি ছিলেন, তাঁহার নাম ট্যায়ারোআ, তিনি অনন্তে ছিলেন, পৃথিবী ছিল না, স্বর্গ ছিল না, মানুষ ছিল না।" আর একটী গান বলিতেছে—"মহানিয়ামক ট্যায়ারোআ পৃথিবীর স্রষ্টা,—তাঁহার পিতা নাই, বংশ নাই।" অ্যালগন্কুইনদিগের ও মিংগোয়ে রেডস্কিনদিগের ধর্ম্মমতও উচ্চাঙ্গের। * আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ প্রোটোএরিয়নগণ বর্ত্তমান অসভ্যজাতিগণের মত অবস্থাতেই দৌঃ-পিতৃ অর্থাৎ আকাশপিতাকে (জুস্, জুপিটার) প্রধান দেবতা বলিয়া উপাসনা করিত। আর্য্যজাতির প্রাচীনতম কীর্ত্তি ঋগ্‌বেদে দৌঃকে সকল দেবের আদি বলা হইয়াছে।

বিশেষজ্ঞ মনুষ্যতত্ত্ববেত্তারা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন যে অসভ্যজাতিরা নৈতিকজ্ঞান-বিরহিত নহে। অতি হীন অসভ্যজাতিদের ভিতরেও সম্পত্তি-জ্ঞান, মনুষ্যজীবনের প্রতি সমাদর, এবং আত্মমর্য্যাদা-বোধ আছে, ইহা এখন স্বীকৃত। এমন কোনও অসভ্য জাতির বিষয় জানা যায় নাই যাহারা চৌর্য্য ও হত্যাকে অন্যায় ভাবে না ও যাহাদের অল্পবিস্তর ধর্ম্মভাব নাই। কতিপয় উন্নত জাতির ভাষা হইতে জানা যায় যে অসভ্য অবস্থাতেই তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সম্পত্তির জ্ঞান, ন্যায়-পরায়ণতা ও সরলতার ধারণা ছিল। চীন ভাষায় ইহার উদাহরণ মিলিবে—যথা, সাধুতা বোধক শব্দটী 'আমার' ও 'মেষ' এই দুইটী কথার সংযোগে সৃষ্ট, স্বত্ব বোধক চো শব্দ 'নিজের' ও 'মেষ' এই দুই ভাগে বিভক্ত, এবং পরীক্ষা দ্বারা সুবিচার বোধক Tseang (ৎসীয়াং) শব্দ ইয়েন (Yen) ও ইয়াং (Yang) = মেষের কথা বলা এই দুই শব্দ যোজনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এই-সকল কথা হইতে জানা যাইতেছে যে চীনগণ যখন নিতান্ত হীন গ্রাম্য অবস্থায় ছিল তখনও তাহাদের সম্পত্তির, ন্যায়পরায়ণতার ও সরলতার জ্ঞান ছিল।

এইরূপে মনুষ্যের তিনটী অবস্থা হয়ঃ—

প্রথম—পাশবিক অবস্থা—এই অবস্থায় শরীর ও চিত্ত-বৃত্তি বিষয়ে পশু হইতে মানুষের পার্থক্য বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়—মধ্যাবস্থা—এই অবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির আত্যন্তিক পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া তাহাকে পশুজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়।

তৃতীয়—বিশিষ্ট মানবাবস্থা—এই অবস্থায় মানবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি তাহাকে পশুজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় এবং এই বিচ্ছেদ এত সম্পূর্ণ যে কোনও কোনও প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমতি যে তদ্দ্বারা মানবজাতি মনুষ্যসৃষ্টি বলিয়া এক বিশেষ সৃষ্টির দাবী করিতে পারে।

এখন পর্য্যন্ত পশুর ও মনুষ্যের মাঝামাঝি কোনও জীবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মস্তিষ্কাধারও মনুষ্যের ও পশুর মাঝামাঝি এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে :—অন্ততঃ ডারউইন তাঁহার "মনুষ্যের আবির্ভাব" (Descent of Man) * নামক গ্রন্থে কতকগুলি পশুতে ঐ দুই শক্তির অঙ্কুরাবস্থায় থাকা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তদপেক্ষা এ কথা অনেক পরিমাণে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

মানবভ্রূণের পরিণতির ক্রমের মধ্যে যেমন হীন হইতে শ্রেষ্ঠ মেরুদণ্ডী জীবদেহ পরম্পরায় মনুষ্যের ক্রমাভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই তাহার জীবনের বিকাশ-পদ্ধতিও বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে তাহার উন্নতির ক্রমের উদাহরণস্বরূপ। বাল্য ও পৌগণ্ডে তাহার পাশবপ্রবৃত্তি-সকল প্রবল থাকে ; এই সময়ে চিন্তার পাণ্ডুর ছায়াপাতে তাহার মন অসুস্থ হয় না। প্রৌঢ়ত্বে বুদ্ধিশক্তির ও বার্দ্ধক্যে তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়।

সকল অসভ্যজাতিকেই সম্পূর্ণ পরিপুষ্টিলাভ করিতে হইলে ঐ-সকল অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেই হইবে। একজন তেজস্বী ও সুখান্বেষী যুবকের কাছে বৃদ্ধোচিত বিজ্ঞতা ও পারত্রিকতা আশা করা যেমন অসঙ্গত, কোনও নবোত্থিত ও তেজোদৃপ্ত সভ্যজাতির নিকট প্রাচীন ও পরিপক্ক সভ্যতাসুলভ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের আশা করাও সেইরূপ অসঙ্গত।

সভ্যতার প্রথম স্তরে মনুষ্যসমাজ তাহার পাশবিক

* আ, দ্য কাৎরফাজ প্রণীত "মনুষ্যজাতি" (Human Species) ১৮৮১ সাল, লণ্ডন—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

* চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জীবন লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এইজন্য লুণ্ঠনবৃত্তি তখন স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আত্মা জড়ের অধীন, এবং তখনকার সভ্যতাও জড়ানুগত। যে-সকল শিল্পের দ্বারা জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও বিলাস বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিল্পই এই সময়ে আবিষ্কৃত ও পুষ্ট হয়। এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি এবং জীবনের পাশব প্রয়োজনের চরিতার্থতা কিম্বা চিত্তবৃত্তির আলোচনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় কবিতা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কণ ও স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পের বিকাশ হয়, এবং এই কারণে সভ্যতার প্রথম স্তরকে কলাশিল্পের স্তর বলা যাইতে পারে। এ স্তরের সর্ব্বকালেই শিল্পকলাগুলি বস্তুতন্ত্র (Realistic) হইয়া থাকে; তাহার অতিরিক্ত কিছু আশা করাও যায় না। এ সময়ে দর্শনশাস্ত্র একেবারে নাই, জ্যোতির্বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics) ভিন্ন অন্য কোনও বিজ্ঞান উন্নত হয় নাই। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মনুষ্যজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই বিশ্বাস হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র, এবং কলা ও শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্ক থাকার জন্য যন্ত্রশাস্ত্র (Mechanics) অনুশীলিত হইত। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে বস্তুগত, এবং প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের ও রণনৈপুণ্যের-জন্য-প্রখ্যাত শূরবৃন্দের উপাসনায় পর্য্যবসিত ছিল। ধর্ম্মভাবের প্রসার ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মিক উন্নতি বড় বেশী হয় নাই। ইন্দ্রজাল, মোহিনীবিদ্যা ও ডাকিনীবিদ্যার বিশ্বাস প্রবলভাবে বিস্তৃত ছিল। যে-সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, এবং পাশব-বল যেখানে উচ্চতম সমাদর লাভ করিত, ও জনসাধারণ ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন অন্য সুখের সন্ধান জানিত না, সে সমাজে নৈতিক বুদ্ধির বিশেষ পুষ্টির আশা করা যায় না।

সভ্যতার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্ত্তী স্তরকে বুদ্ধিবৃত্তির বা মানসিক উন্নতির স্তর বলা যাইতে পারে। তখন আর আত্মার উপর জড়ের প্রভুত্ব থাকে না, যুক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নিয়মের সাম্রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হয়। তখন মানবজাতি কেবল তাহার পাশবজীবনের জন্যই ব্যস্ত থাকে না, তাহার জীবনানুভূতি প্রশস্ত হয়; সে প্রাকৃতিক ও আত্মিক ঘটনাবলীর কারণ ও নিয়ম অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতে প্রযত্ন করে। এইরূপে বিজ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়। প্রথম স্তরে শিল্পকলার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা থাকিয়া তো যায়ই, বরং অনেক সময় তাহার পুষ্টিও হইতে পারে। কিন্তু ধীশক্তি শিল্পবিষয়েই নিমগ্ন না থাকিয়া এমন সকল বিষয়ের চর্চ্চায় নিযুক্ত হয় যাহাদের সহিত বর্ত্তমানে লাভের বা মনুষ্যের পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। কলাবিদ্যা অনুকরণ ও বাস্তবপ্রিয়তা ছাড়াইয়া, সেই বিশুদ্ধ (Classic) অবস্থায় উঠে, যে-অবস্থায় জড় ও আত্মার মিলনের মধ্যেই সৌন্দর্য্য অন্বেষিত হয়। কবিত্ব এখন অর্দ্ধসভ্য শূর ও দেবগণের রণকুতিত্ব ও প্রণয়-সাহসিকতার বর্ণনা ছাড়িয়া তখনকার মার্জ্জিতবুদ্ধির ও নৈতিকজ্ঞানের উপযোগী নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য প্রণয়নে ব্রতী হয়। সমরপ্রিয়তা ও লুণ্ঠনাসক্তি প্রশমিত হইতে আরম্ভ করে। এ স্তর যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই জনসাধারণ পশুবলের অপেক্ষা বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমাদর করিতে শেখে; পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের অপেক্ষা মনুষ্যত্ব ও আত্মসংযম বাড়িয়া যায়। প্রথম স্তরে ভগবৎ সম্বন্ধে যে মনুষ্যকেন্দ্রীভূত ধারণা ছিল, তাহার সহিত এ স্তরের যুক্তিমূল প্রকৃতির সঙ্গতি হয় না। শিক্ষিত শ্রেণী হয় নাস্তিকতার নয় অজ্ঞানবাদের (Agnosticism) কিম্বা কোনও-না-কোনও আকারের একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর প্রভাব অজ্ঞ ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া অহাদেরও মতের পরিবর্ত্তন সম্পাদন করে, এবং তাহাদের জীবনে ইন্দ্রজাল মোহিনীবিদ্যা বা ডাকিনীবিদ্যার প্রভাব একেবারে তিরোহিত না হইলেও, এত কমিয়া যায় যে না থাকারই মধ্যে দাঁড়ায়।

তৃতীয় স্তরে পাশবজীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি, বাহ্যজীবন অপেক্ষা আভ্যন্তরিক জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে লোকসকল বহির্জগতের পরিবর্ত্তে অন্তর্জ্জগতে, এবং আত্মতৃপ্তি ছাড়িয়া আত্মসংযমে সুখের সন্ধান করে। যে-সব শিল্পকলা শরীরের সুখ ও বিলাস বিধান করে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে-সকলের প্রতি বড় একটা মনঃসংযোগ করেন না। উন্নত শ্রেণীর কাছে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, এবং অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও কতকটা এইরূপই হয়। উন্নত শ্রেণীর লোকেরা স্বার্থদমন ও পরার্থপরতাকে জীবনের নিয়মস্বরূপ করিয়া লন। স্বার্থত্যাগ ও দয়া অভূতপূর্ব্ব প্রসার লাভ করে। যে সমরপ্রিয়তা দ্বিতীয় স্তর হইতেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা এখন অধ্যাত্ম-পথে উন্নত ব্যক্তিদের মধ্যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। পার্থিব, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধায়িনী শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা লক্ষিত হয়, এবং সমাজে চাঞ্চল্য অপেক্ষা ঐক্যের লক্ষণ অধিক মাত্রায় ফুটিয়া উঠে।

আমরা যে তিনটী স্তরের কথা বলিলাম ইহাদের সমষ্টিকে মানবের উন্নতির এক একটী যুগ বলা যায়। এই উন্নতির ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা সুবিধাজনক। প্রথম যুগের অস্তিত্ব খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ সহস্র শতাব্দী

হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই মিশর, ব্যাবিলন ও চীনের প্রাথমিক সভ্যতার ইতিবৃত্তও পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় যুগের অস্তিত্ব আনুমানিক খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর হইতে সাত শত খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে মিশর ও চীনের পরবর্ত্তী সভ্যতা এবং ভারতবর্ষ, * গ্রীস, রোম, এসীরিয়া, ফিনিসিয় ও পারস্য দেশের সভ্যতার উত্থান হয়। আমরা এখন তৃতীয় যুগে। এই যুগ ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় (যাহাকে পাশ্চাত্য বলা যায়) সভ্যতার উত্থান ও উন্নতি এই যুগের মুখ্যতম ঘটনা। প্রত্যেক যুগই কোনও-না-কোন জাতীয় বা রাজনৈতিক ঘটনা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অনধিকার-প্রবেশী বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক মিশর, কাল্‌ডীয়া ও চীনের আদিম নিবাসিগণের পরাজয় হইতে প্রথম যুগের সূত্রপাত। এই যুগ প্রধানতঃ সিমীয় আধিপত্যের কাল। সিমীয় অথবা মিশ্রিত সিমীয় জাতি, চীন ভিন্ন তখনকার সমগ্র সভ্য জাতির উপর আপন প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের প্রথম ক'এক শতাব্দীতে এক চীন ভিন্ন অপর সকল সভ্য জাতির মধ্যে ভাব-বিনিময়ার্থ ব্যাবিলোনীয় ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই সময়ে আর্য্যজাতির আবির্ভাব; এই জাতি দ্বারা সভ্যতার যে-পরিমাণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল তেমন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

আর্য্যজাতির আদিম নিবাস সম্বন্ধে এখনও ভাষা-তত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। প্রায় দুই সহস্র তিন শত খ্রীঃ পূঃ অব্দে, ব্যাবিলোনীয়ার খামুরাবির সময়ে, আর্য্যজাতির এক অংশ ব্যাক্‌ট্রিয়া ও পূর্ব্ব ইরাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কতকগুলি হেতু আছে। ইহারই আর এক অংশ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরে ভারতে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অসভ্য আদিম নিবাসিগণকে জয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। † মিটানি নামক আর্য্যজাতির আর এক শাখা প্রায় খ্রী পূঃ ১৫০০ অব্দে এসিয়া মাইনরে প্রাধান্যলাভ করে। * আর্য্যজাতির হেলেনীস্ নামক তৃতীয় শাখা গ্রীসে অভিযান পূর্ব্বক পেলাস্‌গীয়গণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে, এবং ইহাদের চতুর্থ অথবা রোমক শাখা অপেক্ষাকৃত সভ্য ইট্রস্‌কানদিগকে পরাজিত করে। অনুমান ২০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে হীক্‌সো নামক এক অসভ্য জাতি মিশর আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজবংশ ধ্বংস করিয়া সেখানে আপনাদের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে। খামুরাবি ও তাঁহার বংশধরগণের সময় যাহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ অব্দে ইলাম পর্ব্বত হইতে সমাগত ক্যাসাইটিস্ নামক এক অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হয়। ক্রমশঃ এই সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতে এসীরিয় নামক এক নূতন সাম্রাজ্য উত্থিত হয়। একমাত্র চীনদেশে অতি সামান্য উপদ্রবের সহিত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল; এখানে ন্যূনাধিক ১৭৬৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সেই দেশেরই শানবংশ ইয়ায়ু কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশকে উচ্ছিন্ন করিয়া তৎস্থলাভিষিক্ত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে শর্ম্মণ্য (German) জাতিপুঞ্জ দ্বারা রোম সাম্রাজ্য জয়, সপ্তম ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে আরব্য জাতির আফ্রিকা সীরিয়া পারস্য ও ভারতবর্ষে প্রবেশ, আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে টল্‌টেকগণ (Toltec) কর্ত্তৃক মেক্‌সিকো বিজয় এবং নবম ও দশম শতাব্দীতে পেরুতে ইন্‌কাগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা † প্রভৃতি ঘটনাবলী হইতে মানব-সভ্যতার তৃতীয় যুগের সূচনা।

সমাজতত্ত্বের জটিল রহস্যাবলীর উদ্ভেদ করা সর্ব্বদাই অতি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যা আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কঠিনতর, কারণ ঐ দুই যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী এক কিম্বা একাধিক যুগের ফলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরম্ভ হয়। তৃতীয় যুগে ইহা গূঢ়তম। যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সভ্যতা হয় নষ্ট নয় স্থিতিশীল হয়, তথাপি তত্তৎ যুগের ফলগুলি অনেকাংশে রক্ষিত থাকে।

* এই স্থানে মিঃ বসুর সহিত আমাদের মতদ্বৈধ আছে, ভারতীয় সভ্যতাকে এত পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবার কোনও হেতু মিঃ বসু নির্দ্দেশ করেন নাই।—জি. লা. ব।

† ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ভারত-প্রবেশকাল সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ মত। অধ্যাপক জ্যাকবি ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই ঘটনাকে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ অথবা তদপেক্ষা আরও প্রাচীনকালে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি যে অন্যস্থান হইতে আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইহা একটা প্রকাণ্ড অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ মত এখনও নিঃসন্দেহে সর্ব্ববাদিসম্মত বলা যায় না। —জি. লা. ব।

* এসিয়া মাইনরের বোঘাজকিয়ৈ (Boghazkioi) নামক স্থানে খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দের এক উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় যে বৈদিক দেবতা মিত্রাবরুণ ইন্দ্র ও নাসত্য উদ্বোধিত হইয়াছেন। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা অক্টোবর ১৯০৯, ৮৪৬ পৃঃ ও জুলাই ১৯১০, ১০৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† আমেরিকার টল্‌টেক-পূর্ব্ব এবং ইন্‌কা-পূর্ব্ব সভ্যতার ইতিবৃত্ত এখন পর্য্যন্ত যা পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই দুই সভ্যতা বোধ হয় দ্বিতীয় যুগের। ইন্‌কা ও টল্‌টেকগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ, টেক্‌স্‌কিউকাসগণ ও আজটেকগণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম স্তরের সমসাময়িক তাহাদের সভ্যতার প্রথম স্তরে বেশ উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

যদিও বৃক্ষগুলি মৃত কিম্বা ফলপ্রসবে অসমর্থ হইয়াছিল, তাহা হইলেও তাহাদের অনেকগুলি সবীজ ফল রহিয়া গিয়াছিল, এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে আবার অঙ্কুরোৎপাদনক্ষমও ছিল। এই-সকল কারণে, অর্থাৎ বাহিরের ও ভিতরের, নিম্নস্তরের ও শ্রেষ্ঠস্তরের সভ্যতার মেশামেশি হওয়ায়, এই-সকল বিষয়ের সুমীমাংসা করা বা ভেদ নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরব্যগণ যখন রণোন্মুখ ও জড়ভক্ত ছিল, সেই সময়ে তাহাদিগকে জোর করিয়া জনৈক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এবং অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এমন এক ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল, যে-ধর্ম্ম অন্য এক বিদেশী ধর্ম্মের প্রভাবে উৎপন্ন, যাহা আবার হয়তো মানবোন্নতির দ্বিতীয় যুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ফলস্বরূপ বহু দূর দেশের অপর এক ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। এই-রূপে আমরা দেখিতে পাই—মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুন্নত একটী সমাজের সহিত এক মহোন্নত ধর্ম্মের অযোগ্য সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার ফলনিচয়ের সংসর্গে পড়িয়া আরবগণ অচিরে সেই-সকল সভ্যতার প্রকৃতি কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় আসক্ত হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নিগ্রোদিগেরও এইরূপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলা যায় না, যে, সমগ্র আরব-সমাজ বা নিগ্রো-সমাজ মানসিক উন্নতি সাধিত করিয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যেই অনেকগুলি ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ এবং ধর্ম্মোন্মত্ত সারাসেন সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ভক্ত হইল। তাহারা দর্শন গণিত ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেকগুলি সংস্কৃত ও গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ফেলিল। নবম ও দশম শতাব্দীতে বোগদাদের আব্বাসাইড বংশ, মিশর ও স্পেনের ওম্মেদি বংশ বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিল; এবং বোগদাদ, কায়রো ও আন্দালিউসিয়া তখনকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র মুসলমান-সমাজ তখনও সভ্যতার প্রথম স্তরে অবস্থান করিতেছিল, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তাহারা দ্বিতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মানসিক উন্নতি কলাবিদ্যায় পর্য্যবসিত ছিল, এবং কবিত্ব ও ভাস্কর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও বিষয়ে তাহারা অতি সামান্যই মৌলিক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে তাহারা মুখ্যভাবে বাহক মাত্রের কার্য্য করিয়াছে, অর্থাৎ ভারতীয় ও যাবনিক (গ্রীসদেশের) সভ্যতার কতকগুলি মূল্যবান্ ফল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছে মাত্র।

সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থান কালেই মঙ্গোলীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহারা ঐ ধর্ম্ম সভ্যতার যে-স্তরের একটী মহত্তম ফল সেই স্তরে উঠিয়াছিল তাহা নহে। ইউরোপের অসভ্যগণ দ্বিতীয় যুগের প্রাচ্য সভ্যতার শেষ অবস্থার একটি উৎকৃষ্টতম ফল খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বলা বাহুল্য যে ইহাকে তাহারা পরিপাক করিতে পারে নাই। এ ধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে নাই, এবং যদিও তাহারা নামে মাত্র ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি বহুদিন যাবৎ তাহারা সভ্যতার প্রথম স্তরেই থাকিয়া গিয়াছিল। এই ধর্ম্ম অবলম্বন-কালে তাহারা যতটুকু উন্নতি করিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার পরার্থপরতার কোনও সামঞ্জস্য ঘটে নাই। নির্ম্মম ও অন্তহীন অগ্নিদণ্ডরূপ সিদ্ধান্ত, অনন্ত নরক-যন্ত্রণার বীভৎস দৃশ্যের কল্পনায় টারটিউলিয়ন প্রভৃতি ধর্ম্মমীমাংসক-গণের পৈশাচিক উল্লাস, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মমণ্ডলী (Church) কর্ত্তৃক ইহুদীগণের উপর রীতিমত ও সংকল্পিত নিষ্ঠুরতার সহিত অত্যাচার, সেই-সকল জাতিরই উপযুক্ত যাহাদের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর লোকেরাও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে বৃষ ও ভল্লুক বধ করিয়া অশেষ আমোদ অনুভব করিত।

সভ্যতার যুগ-নিচয়ের সহিত ভূতত্ত্বের (Geology) যুগগুলির সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারাও অত্যাবশ্যক ভৌগোলিক ও জৈবিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা সূচিত হয়। মানবোন্নতির পর্য্যায়ের সহিত পৃথিবীস্থ নানা দেশের উদ্ভিজ্জ ও পশুসঙ্ঘের উন্নতির পর্য্যায় তুলনা করিয়া দেখিলে এই সাম্য ঘনিষ্ঠতর মনে হয়। এক প্রকৃতির পশুসঙ্কুল ভূপঞ্জর পৃথিবীর এক অংশে যে-ভাবে গঠিত, অপর অংশেও সেই ভাবেই গঠিত দেখা যায়। তেমনই যে-সকল ভূস্তরের (Deposits) নিম্নে আদিম প্রস্তর-যুগের মানবাবশেষ প্রোথিত দেখা যায়, তাহারা—কিম্বা পরবর্ত্তী কালের শৈল্প, মানসিক বা নৈতিক উন্নতির পরিচায়ক স্মৃতিস্তম্ভ ও লেখাদি, যেখানে যেখানে একই স্তরে পাওয়া যায় তাহারা যে একই কালের তাহা সিদ্ধান্ত করিলে ভুল করা হয় না—অবশ্য যদি তাহারা অন্যত্র হইতে আনীত না হইয়া থাকে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যে সাবধানতার প্রয়োজন—যাহার বিষয় পরে বলা যাইবে—তাহা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং মেগালিথিক (প্রকাণ্ড অখণ্ড প্রস্তরের) স্মৃতিস্তম্ভ (ডলমেন, ক্রমলেক প্রভৃতি) যাহাদের গঠনপ্রণালী অক্ষত অথবা অল্পক্ষত বৃহৎ প্রস্তরসমূহকে সমতল ছাদবিশিষ্ট কুটীরের আকারে সজ্জিত করা ভিন্ন আর কিছু নহে—গ্রেট ব্রিটন, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, সীরিয়া, উত্তর অফ্রিকা, অথবা ভারতবর্ষ যেখানেই পাওয়া যাক, তাহারা যে নব-প্রস্তর-যুগে নির্ম্মিত তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রথম যুগের ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সহিত, মিশরের ও চীনের সভ্যতার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে মিল দেখা যায়। ব্যাবিলন মিশরের নিকটবর্ত্তী, এই জন্য এক দেশের চিন্তাফল ও রীতিনীতি অন্য দেশে আনীত হইয়াছে, ঐ দুই দেশ সম্বন্ধে ঐ সাদৃশ্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু চীন ও ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে ব্যবধান এত বিস্তর, ও বাহ্য অন্তরায়সমূহ এত দুর্লঙ্ঘ্য, যে, সেই সুদুর যুগে তাহাদিগকে অতিক্রম করা একরূপ অসম্ভব ছিল, এবং ইহাদের সভ্যতার সাদৃশ্য * সম্বন্ধে উপরিকথিত হেতু নির্দ্দেশ করা আদৌ সমীচীন নহে।

দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয় স্তরের গ্রীকচিন্তাপ্রণালী অনেক বিষয়ে সেই সময়কার ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সদৃশ এবং এই দুই দেশের মধ্যে সংসর্গ এত বেশী ছিলনা যাহা দ্বারা এই সাম্য বুঝা যায়। দ্বিতীয় যুগের তৃতীয় স্তরের চীনের ও ভারতবর্ষের সভ্যতার অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়, এমন কি চীনের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক লাউৎসে যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বেদান্তের সহিত এত মিলে যে অনেকে মনে করেন যে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। †

তিনি ভারতবর্ষের নৈতিক উন্নতির আদর্শে উঠিয়া "উপকার করিয়া অপকারের প্রতিদান কর" এই মহোচ্চ শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "আমার তিনটী অমূল্য রত্ন আছে ; তাহাদের আমি সর্ব্বদাই কাছে রাখি ও আদর করি—তাহারা দয়া, মিতাচার ও বিনয়। আপনাকে জানিয়াই তৃপ্ত হও, তোমার সমকক্ষ মানবকে বিচার করিতে বসিও না। যে যথার্থ ভাল লোক সে সকলকেই ভালবাসে, কাহাকেও ত্যাগ করে না!"

সভ্যতার ও ভূতত্ত্বের যুগনিচয়ের তুলনায় আলোচনা, এবং বিভিন্ন অবস্থার সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক-নির্দ্দেশ একটু সাবধান হইয়া করিতে হয়। এক সময়ের সভ্যতা পরবর্ত্তী সময়ে গৃহীত হইতে পারে, যেমন দ্বিতীয় যুগের যাবনিক ও হিন্দু সভ্যতা তৃতীয় যুগের সারাসেনগণ লইয়াছিল। আবার এমনও হইতে পারে যে একদেশের কোনও যুগের সভ্যতা পরবর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত থাকিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর নানা অংশে, বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত, আদিম প্রস্তরযুগের সভ্যতা থাকিয়া গিয়াছে। ঐ-সকল স্থলে যে ভূস্তরের নীচে আদিম প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহারা যে ঐ যুগের নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তুতঃ কোনও দেশে এক উচ্চাবস্থার সভ্যতা যে অপর এক নিম্নস্তরের সভ্যতার স্থলাধিকার করিয়াছে অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

যেমন পৃথিবীর এক অংশের ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোনও যুগের উদ্ভিজ্জ ও পশুসত্ত্ব পৃথিবীর অন্য অংশের সেই যুগের উদ্ভিজ্জ ও পশুসত্ত্বের ঠিক সমসাময়িক হয় না, সেইরূপ কোনও যুগের কোনও স্তরে এক দেশে সভ্যতার যে-সকল ফলাফল প্রসূত হইয়াছে তাহারা অপর দেশে সেই যুগের সেই স্তরে প্রসূত ফলাফলের ঠিক সমসাময়িক না হইতেও পারে। যথা—দ্বিতীয় যুগের দ্বিতীয়

* ইতিহাসের প্রারম্ভেই চীন ও কাল্‌ডীয়ার জ্যোতিষিক জ্ঞানের সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি কোন পরিমাণ বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণাগুলিতেও এই সারূপ্য দেখা যায়। অধ্যাপক আর. কে. ডগলাস বলিয়াছেন :—"সুকিং অর্থাৎ চীনের ইতিহাস-পুস্তকের একটী আদ্য পরিচ্ছেদে এমন কতকগুলি জ্যোতিষিক লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে দিক্‌চতুষ্টয়কে পশ্চিমাভিমুখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ দিক্‌দর্শনযন্ত্রের সংস্থানের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উত্তর দিক্‌কে বায়ুকোণ এবং দক্ষিণদিক্‌কে অগ্নিকোণ স্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দিক্‌পরিবর্ত্তনের কারণ-নির্দ্দেশ কেবল খ্রীঃ পূঃ ২০৫৬ অব্দে অবস্থিত বুদ্ধিমান্ ও সুশিক্ষিত সম্রাট ইয়াউর জ্যোতিষিক জ্ঞানের নিন্দাবাদে পর্য্যবসিত ছিল। কিন্তু ডাক্তার দ্য লাকুপেরি দেখাইয়াছেন যে কলালিপিময় ফলকগুলি (Cuneiform Tablet) হইতে জানা গিয়াছে যে আকাডিয়ানগণের মধ্যেও এই দিক্‌পরিবর্ত্তন-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই আবিষ্কারের সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ উক্ত পণ্ডিত আরও দেখাইয়াছেন যে কালডীয়ার বেলমেরোডাকের মন্দির ভিন্ন অন্য সকল মন্দিরই ঐ প্রকার পশ্চিমাভিমুখ করিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে।"—কনফিউসিয়ানিজ্‌ম্, ৯-১০ পৃঃ।

† ডাক্তার ডগ্‌লাস বলিয়াছেন "আমরা লাউৎসের ইতিহাস এত কম জানি যে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা বলা অসম্ভব। হয় তো তাহা হইয়াছিল ; কিন্তু উহা হউক বা না হউক তৎপ্রচারিত তাও ধর্ম্ম ও হিন্দু যোগশাস্ত্র—এই দুইটীর মধ্যে সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক। যখন আমরা শুনিতে পাই যে হিন্দু যোগশাস্ত্র স্বার্থপর ধর্ম্মের উপর নিঃস্বার্থ প্রেমের আসন দেয়, এবং বৈদিক ক্রিয়ার এবং নিয়ম-প্রতিপাদক সাহিত্যের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, এবং তাহার অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনোপলক্ষে কর্ত্তা ও কর্ম্মের, ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের একীকরণ সাধন করে ; এবং ইহার চরম লক্ষ্য পরমাত্মায় লীন হওয়া, ও ঐ অবস্থার উপায় স্বরূপ ঐ শাস্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্ব আত্মচিন্তা ও সর্ব্বশক্তির বিলোপ উপদেশ করে ; এবং এই শাস্ত্রমতে সময়ে অসীমের উপলব্ধি হইতে পারে, এবং অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায় ; তখন লাউৎসের মনে প্রথম উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়া তাও ধর্ম্ম যে যে অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী কুসংস্কারময় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, সব যেন দর্পণে প্রতিফলিতের ন্যায় দেখিতে পাই।"—কনফিউসিয়ানিজ্‌ম্ ও টাওইজ্‌ম্, ২১৮-১৯।

লাউৎসের জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে। অতএব তিনি বুদ্ধ অপেক্ষাও প্রাচীন। এবং যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে ভারতে ও চীনে সেই সময় সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে একের দ্বারা অপরের অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব ছিল, তথাপি এক্ষেত্রে বুদ্ধ কর্ত্তৃক লাউৎসের অনুপ্রাণিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

অর্থাৎ মানসোন্নতির পর্য্যায় গ্রীসে খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে যাবনিক (Ionic) মতের প্রতিষ্ঠাতা মিলেটস্-বাসী থেলিস্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে এই পর্য্যায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা বলিবার কতকগুলি হেতু আছে। ঐ যুগের তৃতীয় বা নৈতিক পর্য্যায় ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের, চীনে লাউৎসের ও কন্‌ফিউসিয়সের, পারস্যে দেরায়ুসের রাজত্বকালে জোরোয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মপ্রচারের, এবং প্যালাষ্টাইনে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত ইহুদী ধর্ম্ম প্রচারের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীসে ইহার আরম্ভ সক্রেটিসের সময়ে, অর্থাৎ একশত বৎসর পরে। এই নৈতিক বিপ্লবের প্রাবল্য ও স্থায়িত্ব নানা দেশে নানাবিধ। ভারতবর্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিশিষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

অন্যান্য জৈবিক সংস্থানের মত সভ্য মানবেরও স্থিতি-বিধানের নিয়ম এই যে, জীব যত উন্নত তাহার বাসস্থান সেই পরিমাণে সংকীর্ণ। আদিম প্রস্তর-যুগের মানব পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া ছিল। কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালনের জ্ঞানসম্পন্ন এবং উন্নততর যন্ত্রাদিসমন্বিত নব-প্রস্তর-যুগের মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ব্যাধ ও ধীবরবৃত্তি আদিম প্রস্তর-যুগের মনুষ্য অপেক্ষা অনেক উন্নত। নব-প্রস্তর-যুগের মানবের বাসভূমি ইহাদের আদিম প্রস্তরযুগবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের বাসভূমি অপেক্ষা অনেক সঙ্কীর্ণ। মানব যখন সভ্য হইল তখন আবার তাহার বাসস্থান আরও অল্প পরিসরে নিবদ্ধ হইল। পুরাকালের সভ্যতা উত্তর ভূগোলার্দ্ধের অক্ষরেখার কতিপয় অক্ষাংশের মধ্যে, আর্য্য, সিমীয় ও মঙ্গোলীয় মাত্র এই তিন জাতির ভিতরে আবদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যেও আবার কোনও কোনও জাতি সভ্যতার প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই। উদাহরণ—আসীরিয়গণ;—ইহারা দ্বিতীয় যুগে বিলক্ষণ পার্থিব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহারা যেমন হস্তপ্রসূত শিল্পে, তেমনই কৃষিকার্য্যে দক্ষ হইয়াছিল। তাহারা নিম্নকথিত শিল্পসমূহের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল—বর্ণ-বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট বস্ত্র, সুসম্পন্ন আস্তরণ (Carpet), বিস্তর সূচিশিল্পসমন্বিত পরিচ্ছদ, মূল্যবান্ ও সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত গৃহসজ্জা, হস্তিদন্তে স্বর্ণ-খচিত ও খোদিত কারুকার্য্য, কাচের ও বহুবিধ এনামেলের দ্রব্য, ধাতুময় দ্রব্য, অশ্বসজ্জা এবং রথ। প্রয়োজনীয় শিল্পের অধিকাংশই বেশ অনুশীলিত হইয়াছিল, এবং পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা ও অলঙ্কারাদির সম্বন্ধে তাহারা এখনকার লোকের অপেক্ষা বেশী পশ্চাৎবর্ত্তী ছিল না। কিন্তু এতটা পার্থিব উন্নতি সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে মানসিক বা নৈতিক উন্নতির লক্ষণ বড় একটা দেখা যায় না। আসীরিয়ার রাজারা তাঁহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে বারবার নিজেদের নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়াছেন, যেন ইহা একটা গৌরবের বিষয়। একজন বলিয়াছেন—"আমি ২৬০ জন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া সেই মুণ্ডগুলির স্তূপ (Pyramid) নির্ম্মাণ করিলাম।" আর একজন বলিয়াছেন—"আমি প্রতি দুই জনের মধ্যে একজনের প্রাণবধ করিলাম; নগরের বৃহৎ তোরণের সম্মুখে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া আমি বিদ্রোহীদলের অধিনায়কগণের ছাল ছাড়াইয়া তদ্দ্বারা এই প্রাচীর আচ্ছাদিত করিলাম। কতকগুলাকে জীবদ্দশায় এই প্রাচীরের সহিত গাঁথিয়া দিলাম, কতকগুলাকে এই প্রাচীরে ক্রসবিদ্ধ অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম।" আসীরিয়ার ইতিহাস তত্রত্য নৃপতিবৃন্দের অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত সম্পাদিত পরস্বাপহরণ ব্যাপারের বৈচিত্র্যহীন বিবরণে পূর্ণ।

সমাজতত্ত্বের উপকরণ এত জটিল, এবং ঐ উপকরণ যে-সকল লেখাদিতে পাওয়া যায় তাহাও এত অসম্পূর্ণ, এবং ঐ লেখাদির অভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা এত দুরূহ, যে, কোন সামাজিক সমষ্টি কোন সময়ে সভ্যতার এক স্তর হইতে অন্য উচ্চতর স্তরে উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কঠিন। যে সমাজ অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে অথবা সভ্যতার প্রথম স্তরে সবে উঠিয়াছে, তাহাতেও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কিম্বা মানসিক ও নৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু এমন ব্যক্তি নিজ সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় সমাজে কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আদিম প্রস্তরযুগেও এমন ধীশক্তিশালী শিল্পী জন্মিয়াছিল যাহাদের শিল্পকার্য্য এখনকার সেই শ্রেণীর শিল্পকার্য্যের সহিত তুলনাতেও কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু এইরূপ ঘটনা এত বিরল যে, তাহারা যে-সমাজে বাস করিত সেই সমাজ যে কলাশিল্পসূচিত সভ্যতার প্রথম স্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ঋগ্বেদের সময়ের ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যখন সভ্যতার প্রথম স্তরে ছিলেন তখনি তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি মহাত্মার উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহারা পরবর্ত্তী স্তরগুলির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন। তাই বলিয়া বলা চলেনা যে সেই সময়কার সমগ্র আর্য্যসমাজ তত্তৎ স্তরে উন্নত হইয়াছিল।

এ তো গেল অপেক্ষাকৃত সহজ উদাহরণ। সমাজতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর সমক্ষে ইহা অপেক্ষা অনেক জটিলতর সমস্যা উপস্থিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতে

গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক এবং গ্রীসে সক্রেটিস্ কর্ত্তৃক সভ্যতার তৃতীয় অথবা নৈতিক স্তর সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু দুইটী বিরুদ্ধ কারণে ঐ কথায় আপত্তি হইতে পারে। একদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পূর্ব্বেই পাইথাগোরাস এবং উপনিষৎ-রচয়িতৃগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং অপরদিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ এবং সক্রেটিস্ যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের মৃত্যুর অনেক পরে ফল প্রসব করিয়াছিল। প্রথমোক্ত তর্কপ্রণালীর দ্বারা আমরা তৃতীয় স্তরের সূত্রপাতের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা পিছাইয়া যায় এবং দ্বিতীয় তর্কপ্রণালী দ্বারা উহা আগাইয়া আসে। পাশ্চাত্য জগতে অনেক লোক আছেন যাঁহারা নৈতিক স্তরে পঁহুছিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সমাজ নৈতিক স্তরে পঁহুছিয়াছে কি না তাহা প্রশ্নের বিষয়। এমন একটী সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা যায় যে যাঁহারা নৈতিক স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাঁহারা যাবৎ সমগ্র সমাজের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন যদ্দ্বারা সমাজসমষ্টির জীবনে ও কার্য্যে তাঁহাদের শিক্ষা অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ কোনও সমাজকে নৈতিক বা তৃতীয় স্তরে উন্নত বলা চলে না। কোনও সমাজ সভ্যতার এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে কিনা এই তথ্যের বিচার আমরা উক্ত সূত্রাবলম্বনেই করিয়াছি। কিন্তু যে-সমাজ সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে, সেই সমাজেই প্রথম স্তরের জনসংখ্যাই বেশী; ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা অসভ্যদশার একটু উপরে উঠিয়াছে মাত্র, এবং তত্রত্য উন্নত ব্যক্তিরা সমাজকে যে পথে চালাইতে চাহেন, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত পথে উহাকে লইয়া যাইতে চায়। সভ্যসমাজে সর্ব্বদাই এইরূপ বিরোধী শক্তিপুঞ্জের ক্রিয়া চলিতেছে এবং তৎপ্রসূত সামাজিক ঘটনাবলীর বিবিধত্ব ও জটিলত্ব এত মতিভ্রমজনক, যে, এই সংঘর্ষণোদ্‌বৃত্ত শক্তির গতি নির্দ্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার।

সভ্যতার কোন স্তর কখন আরম্ভ হইয়াছে তাহার মীমাংসা করা যেমন কঠিন, উহা কখন শেষ হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করাও তেমনি কঠিন। যে শক্তি-সমবায় পার্থিব মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত করে তাহারা অস্তিত্বহীন হইলেও উহাদের বেগাবশেষ সমাজকে সম্মুখের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে। এইরূপে অনেক সময়ে প্রথম স্তরের সভ্যতা দ্বিতীয় স্তরে প্রসৃত হয়,—এবং দ্বিতীয় স্তরের সভ্যতা অনেক সময়েই তৃতীয় স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

স্তরের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যুগের সম্বন্ধেও খাটিবে। বাস্তবিক স্তর কিম্বা যুগ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, এবং কখন কোন যুগের আরম্ভ বা শেষ হইয়াছে কখন কোন স্তরই বা আরম্ভ বা শেষ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কাজেই তাহা অনেকটা অনুমান-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ যে-সকল লেখাদি হইতে ঐ সময় নিরূপণের উপকরণ সংগৃহীত হয় তাহার এত অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও অবিশ্বাস্য যে, ঐ সময়গুলি নির্দ্দিষ্ট সময়গুলির কাছাকাছি হইবে ইহা ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই অনুমিত হইবে যে মনুষ্যের উন্নতি অবাধ গতিতে চলে নাই। তৃতীয় স্তরে গতি অপেক্ষা সামঞ্জস্যের দিকেই অধিক দৃষ্টি পড়ে। অতএব যে সভ্যতা ঐ স্তরে উঠিয়াছে পরবর্ত্তী যুগনিচয়েও উহা অনেকটা স্থিতিশীল হইয়া থাকে এবং নবোত্থিত সভ্যজাতিরা তত্তৎযুগের প্রথম প্রথম স্তরে স্বভাবতঃ নিম্নতর সোপানে অবস্থান করে। কিন্তু এক যুগের কোন স্তরের সভ্যতা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সেই স্তরের সভ্যতা অপেক্ষা উন্নত এবং অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রসৃত হইবেই, কারণ পরবর্ত্তী কালের সভ্যতা অনেক পরিমাণে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন দ্বিতীয় যুগের সকল অবস্থাতেই প্রথম যুগের সেই-সকল অবস্থা অপেক্ষা সভ্যতার প্রসার বাড়িয়াছিল, এবং গুণেরও উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল; যে বিস্তৃত ভূমি ব্যাপিয়া ঐ সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ভারতবর্ষ পারস্য, এসিয়া মাইনর, গ্রীস ও রোম তাহার অন্তর্গত ছিল, এবং ঐ সময়েই গ্রীসের ও ভারতের শৈল্পিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়াছে এবং শিল্প ও বুদ্ধি বিষয়ক কৃতিত্ব সমধিক উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইতেছে। দ্বিতীয় যুগের শেষ স্তরে আমরা যে নৈতিক আদর্শ পাইয়াছিলাম তাহা এখনও রহিয়া গিয়াছে। ফলতঃ এখনকার নবোদ্ভূত সতেজ সভ্যজাতিদের মধ্যে সেই আদর্শে উঠিবার কোনও আন্তরিক চেষ্টা এখনও লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু যখন তাহারা সত্যই তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হইবে তখন সে চেষ্টা তো হইবেই, বরং ইহাও সম্ভব যে ঐ আদর্শের স্থান এমন সব মহত্তর আদর্শ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে যে যাহার ধারণা এখনও আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।
শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

বিশ্বাসঘাতকের অনুতাপ

[যিশুখ্রীষ্ট নবধর্ম প্রচার আরম্ভ করিলে প্রথমে মাত্র বারো জন তাঁহার ভক্ত শিষ্যরূপে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু য়িহুদী জাতির গুরুপুরোহিত সম্প্রদায় এই নূতন প্রচারককে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেছিল না। তাহারা যিশুকে তাঁহার প্রচারে বাধা দিতেও পারিতেছিল না, পাছে সাধারণ লোক যিশুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া গুরুপুরোহিতের কথাই অমান্য করিয়া বসে। গুরুপুরোহিতেরা যিশুকে জব্দ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, এবং যিশু নিজেকে য়িহুদীদের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিবে স্থির করিল। যিশুর দ্বাদশটি শিষ্যই সেণ্ট বা সাধু নামে পরিচিত; তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সাধু জুডাস। সে গুরু-পুরোহিতের ষড়যন্ত্রের আভাস একটু পাইয়া মনে করিল যে দাঁও মারিবার একটা মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; সে তাহাদের নিকট গিয়া প্রস্তাব করিল যে সে কিছু টাকা পাইলে যিশুকে তাহাদের হাতে ধরাইয়া দিতে পারে। গুরুপুরোহিতেরা মহা খুসি। মাত্র ত্রিশ টাকায় রফা হইয়া গেল, জুডাস যিশুকে ধরাইয়া দিবে। জুডাস সঙ্কেত স্থির করিয়া গেল যে সে যাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরণ-চুম্বন করিবে সেই যিশু, তাঁহাকেই ধরিতে হইবে। ইহার পর এক ভোজে যিশু শিষ্যদের সহিত আহার করিতে করিতে বলিলেন যে 'আমার জীবনকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে; তোমাদের মধ্যেই একজন আমায় শত্রুর কবলে বিক্রয় করিয়া দিবে।' সকল শিষ্যই আশ্চর্য্য হইল; সাধু জুডাসও কম আশ্চর্য্য হইল না। ভোজের পর জুডাস যিশুকে প্রণাম করিয়া চরণচুম্বন করিল; এবং সেই সঙ্কেত অনুসারে গুরুপুরোহিতের লোকেরা যিশুকে ধরিয়া লইয়া রাজার দরবারে নালিশ করিল যে এ রাজদ্রোহী, এ নিজেকে য়িহুদীদের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছে। বিচারে যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণনাশের দণ্ড হইয়া গেল। তখন জুডাসের মনে নিজের বিশ্বাসঘাতকতায় ভয়ানক নির্ব্বেদ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। সে ছুটিয়া গিয়া পুরোহিতদের সম্মুখে যিশুর মহাপ্রাণের মূল্য ত্রিশ টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য মেলিয়া ধরিল। পুরোহিতেরাও সেই ঘৃণ্য অর্থ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জুডাস সেই টাকা পুরোহিতদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল এবং অন্তরাত্মার তাড়নায় অস্থির হইয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিল।

এই পুরাণকথার সূত্র অবলম্বন করিয়া রুশ লেখক W. Doroschewitsch এই গল্পটি রচনা করিয়াছেন। লেখক বিশেষ নাম-জাদা নহেন; কিন্তু তাঁহার গল্পের মধ্যে যে একটা ভীষণ সয়তানির বিকট লীলা ও প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আছে তাহা তাঁহার ক্ষমতার পরিচায়ক। যে শঠতা ও ধূর্ত্ততার চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কোনো দেশে বা কালে আবদ্ধ নহে, তাহা শাশ্বত মানবচরিত্রের একটা বিকট দিক। জগতের যত বিশ্বাসঘাতক গোয়েন্দা তুচ্ছ টাকার লোভে মহৎ বা সরলপ্রাণ লোককে বিপন্ন করিয়া সাধুতার ছদ্ম আবরণে আত্মগোপন করিয়া ফিরে, তাহারা সব জুডাসের দলের; জুডাস তাহাদের সাধারণ নাম। এই চিত্রটি তাহাদেরই চিত্র।]

জুডাস আত্মহত্যা করে নাই।

জুডাসের মত লোকেরা আত্মহত্যা করে না।

জুডাসের আত্মহত্যার জনরব জেরুজেলামে ছড়াইয়া পড়িল; সাধুস্বভাব খ্রীষ্ট-শিষ্যেরা তাহাই বিশ্বাস করিলেন। জুডাসের সেই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা! তাহার পর এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া বেচারার আর কি উপায়ই বা ছিল?

কিন্তু জুডাস আত্মহত্যা করিবার পাত্র নয়। সে শুধু সঙ্কল্প করিয়াছিল।

সে ভগবান্ যিশুকে জল্লাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া মনের দুঃখে বনে গেল, একটা মজবুত দেখিয়া গাছ বাছিয়া ঠিক করিল, তাহার ডালে একটা ফাঁশি বাঁধিল, এবং হঠাৎ সুযুক্তি মাথায় আসিল।

"আমি যে কাজ করেছি তা পাপ। আত্মহত্যা মহাপাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি মহাপাপে হওয়া সম্ভব? আত্মহত্যা করা ত কঠিন নয়, সে ত ইচ্ছা কর্‌লেই কর্‌তে পারি। প্রায়শ্চিত্ত ত এত সহজে হয় না। প্রভু স্বয়ং বলেছেন 'সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে. জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।...আর যে-কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে-কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাইবে না।... একশত মেষের মালিক একটি হারাণো মেষ ফিরিয়া পাইলে যেমন আনন্দ করেন, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তদ্রূপ একজন পাপী অনুতাপী হইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে, নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের জন্য তত আনন্দ হইবে না।' প্রভুর আদেশ অমান্য করা চলে না, আত্ম-হত্যা করা হবে না, অনুতাপ কর্‌তে হবে। অতএব আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্যের খাতিরে আমার বাঁচাটা নিতান্তই দরকার, ধর্ম্মের খাতিরেও দরকার, প্রভুর খাতিরেও দরকার, স্বর্গের খাতিরেও দরকার। বাঁচা ছাড়া আমার আর গতি নেই! আহা, প্রভু হে তোমারই ইচ্ছা!"

জুডাস গাছ হইতে দড়িগাছটি খুলিয়া লইল, পাছে আর কোনো দুর্ব্বলচিত্ত লোক অপকর্ম্ম করিয়া বসে—সকলের ত আর তাহার সমান শাস্ত্রজ্ঞান আর গুরুভক্তি নাই।

দড়িগাছটি সে সঙ্গে করিয়াই বন হইতে বাহির হইল। বলা ত যায় না কোন্ জিনিস কখন কি দরকারে লাগে।

জুডাস শহরে চলিল।

দীর্ঘ পথ।

দীর্ঘ-পথ চলিতে চলিতে ভাবনা চিন্তাও সুদীর্ঘ হয়।

জুডাস ভাবিতেছিল—"আমাকে খুব কঠিন রকমের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কঠিনতম কৃচ্ছ্রসাধন হবে আমার

জীবনব্রত ! দুর্ব্বহ জীবন বহন করা—এক নম্বর। দু নম্বরে, আমি সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হতে পারি; কিন্তু অত সহজে নিজেকে ছেড়ে দিলে ত চলবে না। প্রভু ত বলেই রেখেছেন—'ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং স্থচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ।' অতএব ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ দখল করা ত আমার উচিত হবে না। স্বর্গের পথে কাঁটা দিতেই হবে; আমাকে ধনবান হতে হবে। আমার জন্যে কি বল না, এ যে স্বয়ং প্রভুর আদেশ, আর আমার প্রায়শ্চিত্ত !"

জুডাস পুরোহিতদের দরবারে গিয়া বলিল—"কাল রাগের মাথায় আপনাদের অনুগ্রহের দেওয়া ত্রিশ টাকা আমি ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমার অপরাধ হয়েছে, ঘাট হয়েছে। টাকা ক'টা ফিরে দিলে আমি মাথা পেতে নেব এখন।"

মহাযাজকের চেলা একজন বৃদ্ধ পুরোহিত গিয়া মহাযাজককে এত্তেলা করিল যে জুডাস আসিয়া তাহার পুরস্কারের টাকা ক'টা চাহিতেছে।

মহাযাজক একবার যিশুর উপর রাগ করিয়া জামা ছিঁড়িয়াছিলেন, এখন জুডাসের পুনরাবির্ভাবে রাগ করিয়া কাপড় ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়া বলিলেন—"আঃ সেই পাজি জুডাসটা আবার জ্বালাতে এসেছে! তবে না লোকে বলেছিল যে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে? এই ভুতুড়ে দলটার কাণ্ডখানাই আলাদা! মরা যিশু গোর থেকে উঠে পালাল! আর মরা জুডাস দানোয় পেয়ে এসে হাজির! এসব কি ব্যাপার!"

শহরে হুলস্থুল লাগিয়া গিয়াছিল। হাজার মুখে হাজার রকম জনরব।

মহাযাজক হতাশ ক্রোধে গুমরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"এসবের শেষ করে ফেলতে হবে। রাজার দেওয়ান এখনো রেগে আছেন। যিশুর কাণ্ডটায় দেশময় একটা সাড়া পড়ে গেছে—কেবল ঐ কথারই আলোচনা! এই পাজিটাকে তার ত্রিশ টাকা ফেলে দাওগে—আর বলে' দাওগে সে যেন এই শহরে আর মাথা না গলায়, তা হলে ওর মাথা থাকবে না।"

মহাযাজকের বৃদ্ধ চেলা দীর্ঘ দাড়ি চুমরাইতে চুমরাইতে জুডাসকে গিয়া বলিল—"উঃ। মহাযাজক মহাশয় কি কিছুতে টাকা দ্যান! রাগ কী! অনেক করে বল্লাম, আহা বেচারা ত্রিশটে টাকার জন্যে তার প্রভুকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিলে—রক্ত-বেচা টাকা! সে টাকা না পেলে বেচারা মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে। তখন তিনি দয়া করে' বিশটে টাকা ফেলে দিলেন। এই ন্যাও ভাই, নিয়ে থুয়ে চোঁচা চম্পট দাও। আমায় জলখেতে কিছু দিয়ে যাবে না, এত করে তোমার টাকা ক'টা আদায় করে এনে দিলাম!"

জুডাস কাঁপিতে কাঁপিতে বটুয়ার মুখ আঁটিয়া জেরুজেলাম ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

সে মিশরে গেল।

"আমায় যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। ভগবান যদি বাঁচিয়ে রাখেন ত এইখানে আমার প্রায়শ্চিত্ত করে মরবার ইচ্ছে আছে।"

একটি ছোটখাটো শহর। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। সে শহরে গরিব লোকই বেশি। দেখিয়া শুনিয়া জুডাস সেখানেই বাস করিল।

জুডাস ভাবিল—"প্রভুর আদেশ, দরিদ্রকে দয়া করতে হবে; তিনি বলেছেন, 'ধন্য দয়াশীলেরা, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।' আমার ত পুঁজি সবে কুড়িটি টাকা; আমি এই সামান্য অর্থে কার বা কি উপকার করতে পারব? আমায় ধনসঞ্চয় করতে হবে, দানের জন্যে—নইলে আমার আর কি প্রয়োজন?"

এই সঙ্কল্পে সন্তুষ্ট হইয়া সে পুনরায় ভাবিল—"অর্থ ত সঞ্চয় করব—কিন্তু উপায়?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল—"এই টাকা ক'টা সুদে খাটানোই ভালো—তাতে গরিবের উপকার আর আমার অর্থবৃদ্ধি দুইই হতে থাকবে। আমার হাতে টাকা বাড়লে গরিবেরই কাজে লাগবে—নইলে আমার কি বলনা। আমার টাকা বাড়া মানে ত গরিবদেরই ভালো হওয়া!"

জুডাস অন্যান্য মহাজন অপেক্ষা অল্প সুদে কিস্তিবন্দিতে ঋণ শোধের সর্ত্তে টাকা ধার দিতে লাগিল। শীঘ্রই অন্যান্য সুদখোর মহাজনেরা ব্যবসায়ে ফেল হইয়া আস্তে আস্তে চাটিবাটী গুটাইয়া সহর ছাড়িয়া পলাইল।

তখন জুডাস সুদের হার বাড়াইয়া দিল। তাহার শীঘ্র শীঘ্র কিছু টাকা করিয়া লওয়া ত চাই।

সে বলিল—"অপর মহাজনেরা সুদখোর চশমখোর; আর আমি লোকের উপকারের জন্যেই যা-কিছু করি। আমার যে সুদ নেওয়া সে দশজনের উপকার করতে পারবার জন্যেই ত। আমি গরিবের ভাণ্ডারী বই নই; যার দরকার এস, যত খুসি নিয়ে যাও—যখন পার ফেরত দিয়ো, সে টাকায় তোমার মতনই অভাবগ্রস্ত আর-একজনের অভাব মোচন হতে পারবে। আমি যে কড়াক্রান্তি হিসাব করে সুদটি আদায় করে তবে ছাড়ি সে কি আমার জন্যে? ক্ষেপেছ! বেশি করে গরিব দুঃখীর অভাব মোচন করতে পারব বলেই আমার এই আকিঞ্চন। গরিবের ধনের আমি আগলদার মাত্র, তাই আমার এত কষাকষি! গরিবের অর্থ উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার আমি কে?"

গরিব বেচারীরা তাহাদের মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা কড়ি জোগাইয়া জুডাসকে ধনশালী করিয়া তুলিতে লাগিল এবং অধিকন্তু কৃতজ্ঞতায় কেনা গোলাম হইয়া রহিল।

সেই শহরের বারনারীগুলি বেশ সুন্দরী। জুডাস তাহাদের নিকট গতায়াত করিত।

কেহ কিছু বলিলে বলিত—"আহা হা আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কি বল না; আমি ওদের মঙ্গলের জন্যেই না ওদের কাছে যাই; এ যে প্রভুর শিক্ষা—তিনি পতিতাদের উদ্ধারের জন্যেই না অবতার হয়েছিলেন।"

তাহাদের দেখিয়া দেখিয়া জুডাস যুক্তি করিল—"মানুষ যে ভগবানের কাছে বলি দেয় তা নিখুঁত নিটোল তাজা দেখেই দেয়। বুড়ো বোকা পাঁঠা ত কেউ বলি দেয় না, দিতে হলে নধর কচি দেখেই বলি দেয়। আমি একে বুড়ো হাবড়া, তাতে আবার পাপে ভরা। আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করবার জন্যে নিষ্পাপ তাজা প্রাণের দরকার। আমাদের লোক-পিতামহ আব্রাহাম নিজকে ত বলিদান করেন নি, তিনি পুত্র ইশাককে বলি দিয়েছিলেন। আমিও তাঁর পুণ্য-পদাঙ্ক অনুসরণ করব। কিন্তু পিতামহ আব্রাহামের দেবতা ছিলেন মৃত্যু-রূপী; আর আমাদের দেবতা জীবন-রূপী। আমার প্রথম সন্তানকে আমি ন্যায়-ধর্ম্ম-মতে পালন করে ভগবানের কাজেই নিবেদন করে দেবো। আমি ত সন্ন্যাসী মানুষ, আমার বিয়েরই বা দরকার কি, আর টাকা কড়িরই বা দরকার কি, আর ছেলেপুলেরই বা দরকার কি?—যা-কিছু করি সে ভগবানের আদেশ পালন আর অকিঞ্চনের সেবার জন্যে একেবারে নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে বৈ ত না। প্রভু হে তোমারি ইচ্ছা!"

জুডাস বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের মধ্য হইতে শহরের সেরা সুন্দরীকে বিবাহ করিল।

যখন তাহাদের প্রথম পুত্র হইল তখন জুডাস বিচার করিয়া স্থির করিল—"পুত্রের কল্যাণেই পিতার পরিত্রাণ! পুত্রকে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর্শেই পালন করতে হবে। আর আজ থেকে আমার ব্যক্তিত্ব পুত্রের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিতে হবে; তেজারতি মহাজনি কারবারে আমার আর লিপ্ত থাকা উচিত নয়—আমি সন্ন্যাসী মানুষ, পরের উপকারের জন্যে নির্লিপ্ত হয়ে উদাসীনভাবে আমার ছেলের প্রতিনিধি হয়েই আমাকে কাজ করতে হবে।"

জুডাস মিস্ত্রী ডাকিয়া সদর দরজা হইতে আপনার নামের সাইনবোর্ড উঠাইয়া ফেলিয়া সোনালি অক্ষরের নূতন সাইনবোর্ড বসাইল—ছোট জুডাসের গদি।

জুডাস ভাবিল—"আমি একটা পাপ করেছি বটে। তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে। কিন্তু আমার ছেলে ত নিষ্পাপ; তার ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই। তবে আমার সমস্ত সঞ্চয় জলে ফেলে দিয়ে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার ত আমার নেই। এ রকম অন্যায় কি প্রভু পরমেশ্বর ক্ষমা করতে পারেন? আমার ত পুঁজি ছিল মাত্র কুড়ি টাকা; সে টাকা ক'টা ত প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমার জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই কবে খরচ হয়ে গেছে। যা-কিছু টাকা এখন আমার হাতে জমেছে সে-সবই ত গরিবদের কাছ থেকে নেওয়া। এ টাকায় আমার ত অধিকার নেই। এ টাকাগুলো আমার ছেলেকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে, তার পর তার ধর্ম্মে যা থাকে তাই করবে—আমি ত দিয়ে থুয়ে খালাস। কিন্তু ছেলেকে উপদেশ আর দৃষ্টান্ত দিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে আগে।"

বৃদ্ধ জুডাস ছোট জুডাসকে উপদেশ আর দৃষ্টান্ত দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল।

বেশ দস্তুরমতই তালিম করিয়া তুলিল।

যখন সর্ব্বস্বান্ত দরিদ্র ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া জুডাসের গদিতে আসিয়া আস্ফালন করিয়া গালাগালি দিত, তখন গদিয়ান মহাজনের প্রতিনিধি বুড়া জুডাস পরম গম্ভীরভাবে বলিত—"ছি ভাই, ক্রোধ করতে আছে? প্রভুর উপদেশ 'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা দুর্জনের প্রতি রোষ করিয়ো না; বরং যে-কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দিয়ো। আর যে-কেহ তোমার আঙরাখা লইতে চাহে, তাহাকে চোগাও লইতে দিয়ো।' প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবে থাকাই উচিত।"

তাহারা প্রত্যুত্তরে যদি বলে—"যেজন আমাদের সর্ব্বনাশ করে, সে ত প্রতিবেশী হলেও শত্রু। শত্রুকে কি প্রেম করা যায়?"

জুডাস মৃদুহাস্য করিয়া বলে—"প্রভু বলেছেন, 'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও।' শত্রুকে ত ভাই কেবল প্রেমের দ্বারাই জয় করা যায়।"

জুডাস এসমস্ত কথা ছেলের সাক্ষাতেই বলিত, যেন সে ছেলেবেলাতেই এই-সব নীতিতে পোক্ত হইয়া উঠে।

যদি কেহ হতাশ হইয়া আসিয়া বলিত—"দাও দাও, তোমার সর্ব্বনেশে সুদেই আমি টাকা নেব। এখন ত বাঁচি, তারপর দেখা যাবে যা হয়।" তখন জুডাস পরম সদয় ভাবে বলিত—"আহা বন্ধু, নেবে বৈ কি, নেও নেও, আমার ছেলে তোমাকে ধার দিতে বাধ্য। কারণ প্রভুর আদেশ 'যে-ব্যক্তি তোমার কাছে যাচ্ঞা করে তাহাকে দেও; এবং যে-কেহ তোমার নিকটে ধার লইতে

চাহে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়ো না।' ধার নেও, নিয়ে এখন প্রাণটা ত বাঁচাও। জান থাকৃলে মাল হবে, জান আগে না মাল আগে!"

এই রকম উঁচু দরের উপদেশও প্রায়ই কাহাকেও সান্ত্বনা দিত না।

একদিন একজন বলিয়া বসিল—"হাঁ হাঁ ঠাকুর, তুমি মহা সাধু কিনা, তুমি ত অমন কথা বলবেই। নিজের সর্ব্বস্ব ছেলেকে স'পে দিয়ে গাঁট হয়ে বসে আছ! আমরা ত আর তোমার মতো সাধু নই, যার ধারি তার ধার আমাদের যে শুধতেই হয়।"

জুডাস স্মিত মুখ কাচুমাচু করিয়া বসিয়া থাকিল, যেন আত্মপ্রশংসায় সে বিষম কুণ্ঠিত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপে কে একদিন তাহাকে সাধু বলিয়া গেল, আর দেখিতে দেখিতে সেই নাম দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল।

লোকের টাকার দরকার হইলেই বলিত—"এইবার সাধু জুডাসের শরণাপন্ন হতে হবে দেখছি; তিনি ছেলের তহবিল থেকে আমাদের কিছু দিয়ে কৃতার্থ করে দেবেন।"

ইতিমধ্যে যিশুর পুণ্যপ্রভাব জগতের পাপ-সংক্ষোভের উপর শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

জুডাসের বাসস্থান যে শহরে সেখানে একজন খ্রীষ্টভক্ত ছিলেন।

তাঁহার নাম নাথানিয়েল।

নাথানিয়েল খ্রীষ্টের শিষ্যের শিষ্য।

তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন।

কিন্তু যখনই তিনি প্রভু যিশুর কোনো বাণী প্রচার করেন তখনি সকলে তাঁহাকে বলে "এ ত আমরা জানি। এ ত সাধু জুডাসের কাছে আমরা ঢের দিন আগে শুনেছি!"

নাথানিয়েল ব্যস্ত হইয়া সাধু জুডাসের সহিত পরিচয় করিতে ছুটিলেন।

পরম সম্ভ্রম শ্রদ্ধা বিস্ময় কৌতুহল কণ্ঠে ভরিয়া নাথানিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাধু, আপনি এই-সব মহাবাণী কোথায় পেলেন?"

জুডাস পরম ভক্তিভরে বলিল—"আহা! আমি স্বয়ং প্রভু যিশুর মুখে এইসব মহাবাণী বহুবার শুনেছি। আমি তখন জুডিয়ায় ছিলাম।"

নাথানিয়েল উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি তা হলে প্রভুকে দর্শন করেছেন!" তাঁহার মন পুণ্যময় হিংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন—"আমি শুধু প্রভুর শিষ্যদের দেখেছি। আহা কী লোকই তাঁরা! প্রভু না জানি কি ছিলেন!"

নাথানিয়েল সাধুদিগের কথা বলিতে লাগি[লেন]; অমুক অমুক-জায়গায় প্রচার করিতে গিয়াছেন। অমু[ককে] অবিশ্বাসীরা হত্যা করিয়াছে। ইত্যাদি।

জুডাস প্রত্যেকেরই খবর খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা ক[রিতে] লাগিল, এবং নিজেও তাহাদের সম্বন্ধে অনেক ক[থা] বলিল।

কথায় কথায় জুডাসের কথা আসিয়া পড়িল।

জুডাস জিজ্ঞাসা করিল—"জুডাস লোকটা কে?"

নাথানিয়েল উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আ[পনি] যখন সব জানেন তখন সে পাজিটাকেও অবশ্য জা[নেন]। পাজিটা শেষে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।"

জুডাস 'সাধু' নাম শুনিতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি[ল]; 'পাজি' শব্দটা শুনিয়া সে একটু থতমত খাইয়া গেল, বুকে হঠাৎ একটা বিষম ধাক্কা বাজিয়াছে।

তাহার মুখ কালো হইয়া উঠিল।

সে বিচলিত হইয়া দাড়ি আঁচড়াইতে লাগিল।

অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—"তাকে আপনি অমন কথাটা বললেন?"

বিস্মিত নাথানিয়েল বলিয়া উঠিলেন—"বলব ন[া]? সেই বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম বদমায়েসটাকে পাজি ব[লব] না ত কি বলব? সে প্রভুকে শত্রুর হাতে বেচে এল[!"]

নাথানিয়েল উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মা[থায়] রক্ত চড়িয়া গেল। তিনি উঠিয়া পায়চারি ক[রিতে] লাগিলেন।

জুডাস বিষণ্ণভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"আপনি এই জুডাসকে তা হ'লে ঘৃণা করেন?"

"নিশ্চয়!"

"আপনি তাকে শত্রু ভাবেন?"

"আমার পরম শত্রু সে!"

"আপনার তাকে প্রেম করা উচিত।"

নাথানিয়েল বিবর্ণ হইয়া ভয়পাংশুল মুখে জুডা[সের] দিকে চাহিয়া রহিল।

জুডাস বিচারকের ন্যায় কঠিনভাবে বলিতে লাগিল "তার অপরাধ? আপনাদের সে প্রভুর সঙ্গ থে[কে] বঞ্চিত করেছিল, এই না?

"হাঁ!"

"আপনার তাকে ভালো বাসা উচিত।"

নাথানিয়েল নিস্তব্ধ।

"আপনার উচিত তাকে ক্ষমা করা।"

নাথানিয়েল অবাক।

জুডাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"প্রভুর আদে[শ] 'তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও।'"

বিশ্বাসঘাতকের অনুতাপ

জুডাস দোকানঘরে ঢুকিয়া গেল।

তাহার ছেলের দোকানঘর।

পরদিন সেই সময়ে জুডাস তেমনিভাবে দোকানঘরের বাহিরে আসিয়া বসিয়া ছিল।

নাথানিয়েল বড় কাতরভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দূর হইতেই উচ্ছ্বসিত আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"সাধুপুরুষ! ধন্য আপনি! আপনি প্রভুর যথার্থ দর্শন পেয়েছিলেন! এজন্যে আপনি প্রভুর আদেশ উপদেশ আমাদের চেয়ে ঢের বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। কাল যে আমি ক্রোধ রিপুর বশীভূত হয়ে আপনার ন্যায় সাধুর সম্মুখে অকথা কুকথা উচ্চারণ করেছি, তার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন। আমার ঘাট হয়েছে।"

তিনি একেবারে কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িলেন।

নাথানিয়েল বলিলেন—"আমি কাল সমস্ত রাত্রি কি করে' কাটিয়েছি তা যদি জানতেন!"

"আপনার কার্য্য প্রভু পরমেশ্বরের অনুমোদিত হোক।"

"আমি জুডাসের কল্যাণের জন্যে সারা রাত্রি প্রার্থনা করেছি!"

জুডাস ধীরে ধীরে উঠিয়া যুবকের কুঞ্চিত কেশের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"বাবা, ঠিক করেছ, বেশ করেছ। রোজ এমনি কোরো।"

এইদিন হইতে নবগঠিত খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের নেতা নাথানিয়েল সাধু জুডাসের পরামর্শ ভিন্ন কোনো কাজই করিতেন না।

সম্প্রদায় বাড়িয়া চলিয়াছে।

জুডাসেরও প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছে।

তাহার উপদেশে খ্রীষ্টপন্থীরা দরিদ্রসেবার জন্য একটি দাতব্য ভাণ্ডার স্থাপন করিল।

যাহার যেমন শক্তি সে তেমনি মাসে মাসে ভাণ্ডারে সাহায্য করে।

জুডাস পরামর্শ দিল—"ভাণ্ডারের অর্থ আমার জিম্মায় গচ্ছিত রাখতে পার। গরিবের অভাব হলেই সে আমার ছেলের গদিতে আসে। যথার্থ অভাব কার তা ত আমি জানি; আমি বুঝে সুঝে ব্যবস্থা করতে পারব।"

জুডাস টাকাগুলি লইল। টাকার হিসাব দিল—কাহাকেও না।

অবশেষে ইহা হইতে কথা জন্মাইল।

একদিন নাথানিয়েল অপ্রতিভ ভাবে মুখ লাল করিয়া আসিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে মাপ করবেন, আমি কিছু বলছিনে, আমায় সবাই বলতে পাঠিয়েছে তাই বলছি—কিছু মনে করবেন না—কেউ কেউ—অবিশ্যি তারা যে খুব ভালো লোক তা নয়, তবু—তারা জানতে চায় যে দরিদ্রভাণ্ডারের টাকাগুলো কোন্ গরিবকে দেওয়া হয়েছে।—তা তা......"

জুডাস তাহার স্বাভাবিক স্মিত হাস্যে বলিল—"আপনি তাদের বলবেন দান তখনি যথার্থ দান যখন ডাহিন হাতের খবর বাম হাত না জানে। জানেন কি এ কার মহাবাণী?"

নাথানিয়েল লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গিয়া সকলকে বলিলেন—"দানের খবর জেনে কাজ নেই ভাই। অনর্থক ঔৎসুক্যের বশে আত্মার কল্যাণ ও দানের সার্থকতা পণ্ড করে লাভ কি?"

তাহারা সকলে মাথা নাড়িয়া অসন্তোষ-ক্ষুব্ধ স্বরে বলাবলি করিল—"হায়রে! আমরা খ্রীষ্টান হয়ে কি অসহায়ই হয়েছি!"

জুডাস যদিও ছেলের নামে তেজারতি করে, তবু তাহার মতো সাধু লোকের সুদখোর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাটা নাথানিয়েলের মনে ভালো লাগে না!

সময়ে সময়ে জুডাস খাতকদের একেবারে উৎখাত করিয়া তুলে দেখা যায়।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত ভাবে নাথানিয়েল কথায় কথায় এই কথাটা পাড়িলেন।

জুডাস বেপরোওা।

ঠোঁটের উপর স্মিত হাসি টানিয়া দিয়া কোনো জবাব না দিয়া জুডাস গল্প ফাঁদিয়া বলিল প্রভু যিশু সদাই পাপীদের সংসর্গে থাকিতে কেমন ভালো বাসিতেন।

"হ্যাঁ বাবা, প্রভু পাপীদের সঙ্গেই থাকতেন।"

নাথানিয়েল লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

নাথানিয়েল অপরের দোষ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাস করিলেন।

তিনি আর জুডাসকে কখনো কোনো প্রশ্ন করিবেন না ঠিক করিলেন।

"সাধু পুরুষ! তিনি যা করেন বেশ ভেবে চিন্তেই করেন নিশ্চয়! এমন মহাপুরুষের কি কখনো অন্যায় বা ভুল হতে পারে!"

ক্রমে সকলেরই নাথানিয়েলের মতো জুডাসের সাধুতায় দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া গেল।

জুডাসও স্বয়ং ইহা বিশ্বাস করিতে লাগিল।

যদি হঠাৎ কখনো সেই পুরাতন আচরণটা মনে পড়িত, তবে তাহা জুডাসের বিশ্বাস হইত না, স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত, মনে হইত সে আর-কোনো পাষণ্ড গোটাকতক টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সে জুডাস যেন মরিয়াছে।

সে ত জীবনের ভ্রান্তি! সয়তানের ফন্দি!

"পাপের ফল অনুতাপ কি মধুর! পচা সারে যেমন ফসল! ফল পেতে হলে বীজকে ত মরতেই হবে! মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম কেমন করে হ'ত যদি প্রথমে না মৃত্যু হ'ত! যিশু মরে ধন্য হয়েছেন। এক জুডাস মরে গেছে, এখন তার জায়গায় আর এক জুডাস এসেছে—সে সকলের মতে সাধু জুডাস! জুডাসও আজ ধন্য হয়েছেন!"

নাথানিয়েল পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল—"আপনাকে ধর্ম্মসংঘের প্রধান হতে হবে।"

জুডাস দীন ভাবে বলিল—"আমি বাবা সকলের পায়ের তলার আসনটি নেবো।"

নাথানিয়েলের মনে হইল—কী ধূর্ত্ত!

নাথানিয়েল তাড়াতাড়ি এই দুষ্ট চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উপবাস করিয়া ভাবিলেন—আহা কী সাধুপুরুষ!

কাজের বেলা দেখা গেল জুডাস সকলের মাথার আসনটিই দখল করিয়া বসিয়াছে।

সংঘ নাথানিয়েলের আদেশ মানিয়া চলে, আর নাথানিয়েল মানে জুডাসের।

জুডাস উপদেশ দেয়, বিচার করে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে, শাস্তি দেয়, ক্ষমা করে। যা খুসি!

জীবনের সন্ধ্যা পরম আরামে কাটিতে লাগিল।

যখন দেখিল যে ক্রমেই দেহ শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, তখন একদিন পুত্রকে গোপনে ডাকিয়া জুডাস বলিল—"আমার ত তিন কাল গিয়ে এক কালে এসে ঠেকেছে। আমি কোন্ দিন আছি কোন্ দিন নেই তার ত ঠিক ঠিকানা নেই। বুঝে শুনে চোলো। শাস্ত্রে বলে পিতামাতাকে ভক্তি করবে, মান্য করবে। শাস্ত্র মেনে ধর্ম্মপথে থেকো, আখেরে ভালো হবে।"

জুডাস-বাচ্চা বলিল—"আজ্ঞে সে আর আপনাকে বলতে হবে না। আপনার সুনাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তা করব বৈ কি। সুদের হার কমিয়ে দেওয়া চলবে না; কমিয়ে দিলে লোকে বলবে দেখেছ বুড়ো জুডাসটা কী কঞ্জুস যক্ষই ছিল! সুদের হার বাড়িয়ে দেবো; লোকে শতমুখে আপনার দয়ার গুণগান করবে, গরিবের মা-বাপ গেছে বলে হায় হায় করবে!"

জুডাস পুত্রের মাথায় শীর্ণ কম্পিত হাত রাখিয়া বলিল—"আঃ বাপের বেটা বটে! পাষাণময় উষর ক্ষেত্রে আমি বীজ বপন করিনি!"

জুডাসের মৃত্যু আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

জুডাসের—ছোট জুডাসের—সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষে রাজার হালে সাধু সন্ন্যাসী বৃদ্ধ জুডাস ইহধাম ত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় সংঘ গৃহের চারিদিকে ভিড় করিয়া জমিয়াছে। নাথানিয়েল জুডাসের শয্যার শিয়রে বিবর্ণ বিষণ্ণ।

শীতের সন্ধ্যার মতো জুডাসের জীবনের আলো ধী[রে] নিভিয়া যাইতেছিল।

নাথানিয়েল কাঁদিয়া আকুল।

জুডাস বলিল—"বন্ধু, আমি এই মায়াময় দুঃ[খের] জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছি।"

সোনা রূপা জহরাতে খচিত কার্পেট-মোড়া ঘ[রে] দাঁড়াইয়া খ্রীষ্টশিষ্যেরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আ[হা] মায়াময় দুঃখের জগৎ!"

"আমি তোমাদের চোখের সামনে আমার জী[বন] কাটিয়ে গেলাম।"

নাথানিয়েল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আপ[নি] আমাদের ধ্রুবতারা ছিলেন!"

খ্রীষ্টপন্থীরা বলিয়া উঠিল—"আহা, ধ্রুবতারা!"

নাথানিয়েল স্বর্গগামী মহাপুরুষের পদতলে পড়ি[য়া] বলিলেন—"সাধু! আপনি আমাদের জীবনের আ[দর্শ] হয়ে থাকবেন। আমাদের একটি অন্তিম চুম্বনে আশীর্ব্বা[দ] করে যান।"

জুডাস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল—"[না] তা হবে না। এই অধরোষ্ঠ একদিন প্রভুর চরণ চু[ম্বন] করেছিল! এ অধরোষ্ঠ আর কাহাকেও চুম্বন করবে ন[া]। আমার ছেলেকেও কখনো আমি চুম্বন করতে সা[হস] করিনি। আমার চুম্বন প্রভুরই থাক!"

জুডাসের অন্তিম নিশ্বাসে কথা শেষ হইয়া গেল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যা[য়]

বিলাতী বেগুন

বিলাতী বেগুন আমাদের দেশী সবজী নহে। [ই]দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে। আমা[দের] দেশে ইহার অপর একটী নাম গুড়-বেগুন। সাহে[বেরা] এই বেগুন খুবই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমা[দের] দেশেও ইহার চলন আজকাল অত্যন্ত বেশী হ[ইয়া] উঠিয়াছে;—এখন অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যা[নে] ইহার আবাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, [এবং] বাজারেও এই সবজীর আমদানি মন্দ নহে।

অনেক প্রকারের বিলাতী বেগুন আছে—বড় ছোট; গোল, ডিম্বাকার, চেপ্‌টা ইত্যাদি; লাল হলুদে। লাল বড় ফলের গাছেরই চাষ সক[লে] করিয়া থাকেন। ছোট ফলের গাছে কখনও কখ[নও] বেগুনগুলি গোছা গোছা বাহির হয়। কোন্ প্রকা[রের]

গাছ লাগাইতে হইবে তাহা স্থান বিশেষের মৃত্তিকা, জল বায়ুর অবস্থা এবং লোকের রুচি অনুসারে নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

মৃত্তিকা ঃ—দো-আঁশ জমিই এই সবজীর পক্ষে উপযুক্ত ; প্রস্তরময় মৃত্তিকাতেও ইহার চাষ হইতে পারে। উত্তম ফসলের জন্য জমির উত্তাপ, বায়ুর চলাচল এবং সূর্য্যের আলোক কিছু অধিক হওয়া আবশ্যক।

জমি প্রস্তুত ঃ—৩।৪ বার সোজাসুজি ও আড়াআড়ি ভাবে চাষ দিয়া "মই"য়ের সাহায্যে জমিকে সমতল করিয়া পরে তাহাকে আগাছাশূন্য করিয়া ফেলিতে হইবে। জল সেচনের জন্য প্রণালী রাখা দরকার। ক্ষার সার (Potash) এই সবজীর পক্ষে উপযুক্ত। সাধারণতঃ ছাই ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। জমিতে অত্যধিক গোবর ব্যবহারে অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন, কারণ এই সারে আশু ফলের পরিবর্ত্তে পাতার সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। যাঁহারা অধিক সার প্রয়োগ করিতে সমর্থ তাঁহারা ২৪ পাউণ্ড সুপার্ ফস্‌ফেট্, ১২ পাউণ্ড নাইট্রেট্ অব্ পটাশ্ ও ৮ পাউণ্ড এমনিয়ম্ সাল্‌ফেট্ একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক একর্ জমিতে প্রয়োগ করিয়া অধিক ফসল আশা করিতে পারেন (সটন্)।

বীজ বপন, চারা উৎপাদন, ও তাহার রোপণ-প্রণালী ও পরবর্ত্তী কার্য্য ঃ—এই সবজীর চাষের জন্য বীজ-ক্ষেত্র (Seed Bed) প্রস্তুত করিতে হয়। বীজ-ক্ষেত্রের মাটী খুব নরম ও গুঁড়া হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে অঙ্কুর শীঘ্র বাহির হইতে পারে না। পত্র-সার বীজ-ক্ষেত্রের পক্ষে উপযুক্ত ; ক্ষেত্রের উপর বীজ ছিটাইয়া দিলে পরে "হো" বা বিধে ব্যবহার চলিতে পারে না এবং গাছ বাহির হইলে জল সেচন ও নিড়ানের বিশেষ অসুবিধা হয়। সেই হেতু 'লাইন' ধরিয়া বীজ বপন করা উচিত। সরল রেখায় বীজ উপ্ত হইলে হাতে বা বলদ দ্বারা চালাইবার উপযুক্ত মাটী উষকাইবার কয়েক প্রকার দেশী ও বিলাতী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। বীজ বপন করিয়া ক্ষেত্রে মই দিয়া বীজগুলিকে একেবারে মাটী দিয়া আবৃত করিয়া দিতে হইবে। জমি সিক্ত না থাকিলে জল ছিটান আবশ্যক হইয়া থাকে। চারা গাছ বাহির হইলে উহাদিগকে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ হইতে রক্ষা না করিলে উহারা শুষ্ক হইয়া যায়। সেই জন্য দিবাভাগে উহাদিগকে কোন পত্র দ্বারা (কলাপাতা, তালপাতা ইত্যাদি) আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হয়। গাছ একটু বড় হইলে এইরূপ আচ্ছাদনের আর প্রয়োজন হয় না। এইরূপ চারা অবস্থায় অনেক পোকা আসিয়া গাছের অনিষ্ট করে। এই জন্য এই সময় ছাই প্রয়োগ করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য। বীজ-ক্ষেত্র খোলা জায়গায় করাই প্রশস্ত। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চারা গাছগুলিকে তুলিয়া জমিতে রোপণ করাই যুক্তিসঙ্গত। বীজ-ক্ষেত্র হইতে গাছ উঠাইয়া রোপণ করিবার সময় দেখিতে হইবে যেন বীজ-ক্ষেত্র কতকটা সিক্ত থাকে, নচেৎ তুলিবার সময় চারা গাছের কচি শিকড়গুলি ছিঁড়িয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা আছে। মেঘলা দিন দেখিয়া গাছ উঠাইয়া একটু গভীর ভাবে রোপণ করা উচিত। ইহার পরে জমিতে জল ছিটান আবশ্যক। মাটী ভিজা কিম্বা বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে জল ছিটানর দরকার হয় না। বিলাতী বেগুনের গাছ অধিক তুষারাবৃত স্থানে ভাল জন্মিতে পারে না। এইরূপ স্থানে এই সবজীর চাষ করিতে হইলে ইহাদিগকে তুষার ও কুয়াশা হইতে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। শীতপ্রধান দেশে যেখানে কুয়াশা ও শীতের অধিক আতিশয্য সেখানেই ইহার চাষের জন্য জমি খণ্ড খণ্ড ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হয়। এবং এইরূপ প্রত্যেক খণ্ডে তিন ফুট্ অন্তর সারি করিয়া তাহার উপর তিন ফুট্ ব্যবধান রাখিয়া গাছ পোঁতা আবশ্যক। প্রত্যেক সারির মধ্যে জলপ্রণালী রাখিলে জল সেচনেরও খুব সুবিধা হইবে এবং সকল অংশ সমান জল পাইবে। অধিক কুয়াশা কিম্বা শীতের দিনে গাছগুলিকে হাল্‌কা মাদুর কিংবা ঘাসের টাট্ দিয়া আবৃত করিয়া উহাদিগকে কুয়াশা ও শীত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। গাছ নাড়িয়া পুঁতিবার পরও উহাদিগকে আবৃত রাখা উচিত। ইহার পরে মধ্যে মধ্যে আগাছা উঠান, নিড়ান দেওয়া ও ১০।১২ দিন অন্তর জল সেচন করিলেই ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। গাছগুলি বেশী পল্লবযুক্ত ও ঘন মনে হইলে মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে জমি অত্যন্ত স্যাঁত-সেঁতে থাকে। ইহা কোন সবজীর পক্ষেই শুভ নহে। যাহাতে গাছের গোড়ায় জল জমিয়া গাছের অনিষ্ট না করিতে পারে, সেই জন্য আল্ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গাছ রোপণ করিয়া গাছের গোড়ায় মাটী দিয়া উচ্চ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছের ডাঁটার (Stem) আশ্রয়ের জন্য জমিতে কিছু অবলম্বন থাকা আবশ্যক। অড়হরের ডাল, বাঁশের কঞ্চি প্রভৃতি অল্পব্যয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গাছ অবলম্বন পাইলে অধিক ফসল দিয়া থাকে। আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে বিলাতী বেগুনের গাছে এইরূপ অবলম্বন দেওয়া হইয়া থাকে, এবং আমাদের দেশেও এই প্রণালী অনুসারে চাষ করিয়া দেখা উচিত। শীতকালেই ইহার ফসল হয়। কিন্তু খুব যত্ন লইলে এবং বার বার গাছ রোপণ করিলে

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বিলাতী বেগুন পাওয়া যাইতে পারে।

আয় ব্যয় :—আমাদের দেশে বিলাতী বেগুন লাভজনক ব্যবসা হিসাবে বোধ হয় চাষ করা হয় না। দেখিতে ভাল বলিয়া অনেকে বাগানে বাহারের জন্য লাগাইয়া থাকেন। সেই জন্য ইহার চাষ করিতে হইলে কত ব্যয় হয় তাহার সঠিক বিবরণ কোন স্থানে পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে এক একার জমি চাষ করিতে জমির কর সুদ্ধ ৭৫৲ টাকা খরচ পড়ে। এক একার্ জমি হইতে ২০০ মণ বেগুন সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ৫ পয়সা হিসাবে /১ সের ধরিলেও ২০০ মণ বেগুন হইতে ১২৫৲ টাকা পাওয়া যাইবে। অতএব খচর বাদে এক একারে ৫০৲ টাকা লাভ থাকে। বলা বাহুল্য আমাদের বাজারে বিলাতী বেগুন এক আনা হইতে দুই আনা সের বিক্রয় হয়। লাভও সেই পরিমাণে হইবে। অতএব আমরা বিলাতী বেগুনের চাষকে লাভজনক বলিতে পারি।

বিলাতী বেগুনের পোকা :—এখানে যে পোকার চিত্র দেওয়া হইল উহা বিলাতী বেগুনের অনেক ক্ষতি
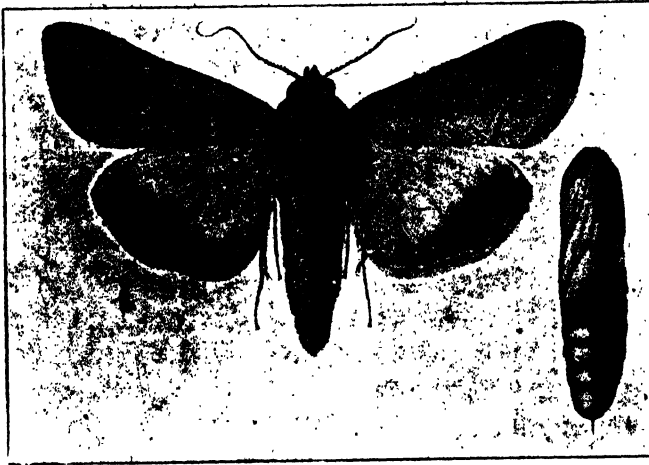
বিলাতী বেগুনের প্রজাপতি ও পুত্তলি—দ্বিগুণ বর্দ্ধিতাকারে।

করে। ইংরাজীতে এই পোকাকে (Gram caterpillar) বলে। নিম্ন বঙ্গে ইহার নাম কাত্‌রি বা চোরা পোকা—বিহারের স্থানে স্থানে ইহাকে কাজরা পোকা বলে। এই পোকার প্রজাপতি মোটামুটি লাল্‌চে রংএর। সম্মুখের পাখার ধারের রং কাল। ইহার স্ত্রী-প্রজাপতি পাতা, ফুল, কিংবা ফলের উপর ছোট ছোট সাদা ডিম পাড়িয়া যায়। ৩।৪ দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া

বিলাতী বেগুনের কীড়া—দ্বিগুণ বর্দ্ধিতাকারে।

কীড়া বাহির হয় ও কিছু দিনের জন্য পাতা খায় পরে ফলে ছিদ্র করিয়া ভিতর খাইয়া উহাকে একেব নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে ১৫ দিন ফল খা মাটীতে নামিয়া পুত্তলি করে। কীড়াগুলি ১½ ই পরিমাণ লম্বা হয় ও উহাদের রং সবুজ ও মধ্যে ম লাল ডোরাযুক্ত। কীড়াগুলি হাত দিয়া বাি কেরোসিন্ তৈলে ফেলিয়া মারা ব্যতীত অন্য উ নাই।*

কৃষি কলেজ, সাবোর, ভাগলপুর } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

পূর্ব্ব-বঙ্গ

(সমালোচনা)

প্রস্তর-বিহীন, প্রতিবৎসর বন্যা-প্লাবিত, ভ বালুকার 'ব'-দ্বীপ বঙ্গদেশে প্রাচীন ইতিহাে প্রায় সব চিহ্নগুলিই কালে লোপ পাইয়াে মধ্যদেশ বা দক্ষিণাপথের তুলনায় এ প্রদেশে প্র শ্রেণীর ঐতিহাসিক দলিল বড়ই কম। তাই ি যুগের বাঙ্গলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পা অনেক সময় দুঃখ হয় "আহা! কত বড় এক ঔপন্যাসিক এখানে মাঠে মারা যাইতেছেন!" অ অনেক গবেষণা সম্বন্ধে সাহিত্যিক জুরীকে স্কট্‌ল্যা দেশের আদালতের নিয়ম অনুসারে "Not prove এই রায় দিতে হয়; অর্থাৎ প্রতিপাদ্য মতটা সম্ভব এবং বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়, কিন্তু তাহ যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

মুসলমান যুগেও, মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুব তুলনায় বাঙ্গলার ঐতিহাসিক উপকরণ ক প্রথমতঃ এই "রুটী-পূর্ণ নরক" (দুজখ্ পুর্ আজ্ নান্)-এ ভা ভাল কর্ম্মচারীরা আসিতে চাহিতেন না। দ্বিতীয়তঃ খুব ব বঙ্গবাসী ফার্সি ভাষায় লেখক হইয়াছিল। তখন পশ্চিমে অসং হিন্দু—কায়েথ, খত্রী, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত—উচ্চ শ্রেণীর ফার্সি শিখি সরকারী কাজ করিত। বিশেষতঃ রাজস্ব সংগ্রহ ও হিসাব এ

* বিলাতী বেগুনের পোকার চিত্র দুইটী ভারতীয় কৃ বিভাগের কীটতত্ত্ববিদের অনুগ্রহে পাওয়া গিয়াছে।—লেখক।

বিভাগ ছুটি হিন্দুদের একচেটে ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য হিন্দু ফার্সিতে পদ্য ও গদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছে। এখনও বিহারে অনেক লালা কায়েথ ফার্সি অক্ষরে চিঠিপত্র লেখে, নাগরী পুস্তক পড়িতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা হয় নাই। মুঘলযুগে আমাদের প্রদেশের উচ্চ দেওয়ানী (revenue) কর্ম্মচারীগণ পশ্চিম হইতে আসিতেন; নীচের আমলারা বাঙ্গালী ছিল বটে, কিন্তু তাহারা বোধ হয় কাজ চালাইবার মত ফার্সি শিখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত,—অন্ততঃ এটা সত্য যে তাহারা ফার্সি গ্রন্থ লেখে নাই। সে যুগের বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও ফার্সির জ্ঞান পশ্চিমের মত গভীর ও বিশুদ্ধ না থাকিবারই সম্ভাবনা। চিঠিপত্র ও হিসাব ফার্সিতে লেখা হইত বটে, কিন্তু "সুবা বাঙ্গলা"তে কোন হিন্দ-ফার্সি সাহিত্য জন্মে নাই। এই জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে গিয়া প্রায় ইংরাজ-যুগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রন্থকারকে প্রবাদের সাহায্য লইতে হয়। "কিম্বদন্তী ও প্রবচন......একেবারে উপেক্ষা করাও চলেনা।......প্রবাদের ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে, অতি সন্তর্পণে, আমাদিগকে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের বিলুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।" (ঢাকার ইতিহাস, ৵৹ পৃষ্ঠা)। কিন্তু প্রবাদের এজাহার অন্য বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী দ্বারা "করোবর" না হইলে তাহা কাহিনীই থাকিয়া যায়, ইতিহাস হয় না।

সুখের বিষয়, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে এখন প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে সকলেই উৎকীর্ণ লিপি বা প্রাচীন কলা-দ্রব্য উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এখন বাঙ্গলায় এরূপ কোন প্রাচীন দলিল চোখের সম্মুখে আসিলে তাহার লোপ বা অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা নাই। ছোট ছোট সহরে পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বুঝিবার ও পাঠোদ্ধার করিবার লোক আছে। অবিলম্বে তাহার ফটো সহ অনুবাদ প্রকাশিত হইবে; এবং মাসিক সাহিত্যের স্তম্ভে কয়েক মাস ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন আখড়ার প্রাচ্য-বিদ্যামহামল্লগণের—মহাভারতীয় যুদ্ধের মত গালাগালি মিশ্রিত—দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর, লিপিখানির বিশুদ্ধ পাঠ সাধারণের হস্তগত হইবে। এইরূপে পাল ও সেন রাজাদের ইতিহাস দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত হইয়া উঠিল। যে-কিছু ফাঁক আছে তাহাও সময়ে পূরণ হইবে এরূপ দৃঢ় আশা করা যায়।

যদি কখন পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার হয়, তবে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অমূল্য হইবে। কিরূপে এই সুস্থ-দেহ, নির্ভীক, স্বাধীনমনা, প্রবাসপ্রিয়, অক্লান্ত-পরিশ্রমী, "কাজের লোক," কিন্তু অনুকরণ-দক্ষ, কল্পনাশূন্য, ভাব-প্রবণতাহীন, "বাংগাল্" জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, কোন্ কোন্ ঘটনার প্রভাবে ইহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখের ও শিখিবার বিষয় হইবে। বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি এখন পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকদের মধ্যেই বিদ্যমান; অন্যত্র নাড়ী প্রায় থামিয়াছে। অনেক বৎসর পরে পূজার জিনিষ কিনিতে গিয়া দেখি যে কলিকাতার বাজারে—এবং সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে—পর্য্যন্ত "পূর্ব্ব-বঙ্গের আক্রমণ" ও জয় হইয়াছে! কোয়েটা হইতে ভামো পর্য্যন্ত সরকারী আফিসের ও "বারের" কথা ত সকলেই জানেন।

আমাদের মধ্যে নূতন জাগ্রত স্বদেশ-ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টার প্রথম ফল স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন জেলার ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের "ঢাকার ইতিহাস"কে অনেক বিষয়ে আদর্শ স্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ গ্রন্থকার বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত শ্রমে প্রায় সকল বিদ্যমান "মূল" দলিলগুলি পড়িয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি এই "মূল"গুলিকে ভাল করিয়া জেরা করিয়া তবে তাহাদের সাক্ষ্যকে গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। ইউরোপে "বৈজ্ঞানিক"-ইতিহাস-লেখকদের নিকট এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার; কিন্তু আমাদের দেশে এই দ্বিতীয় গুণটি এখনও বিরল। এখনও আমাদের অনেক ঐতিহাসিক, প্রবাদ এবং ইতিহাস, সমসাময়িক দলিল এবং পরবর্ত্তী যুগের সঙ্কলন, খোদিত লিপি এবং নকল পুঁথী,—এই দুই শ্রেণীর সাক্ষীর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে তাহা জানেন না, অন্ততঃ কার্য্যে স্বীকার করেন না। ইতিহাসক্ষেত্রে "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহারের" প্রধান কারণ এই যে আমাদের লেখকেরা "আদি ও অকৃত্রিম ঐতিহাসিক ভৈষজ্যালয়ে" যান না। তাঁহারা আসল না দেখিয়া অনুবাদের অনুবাদ বা উদ্ধৃতের উদ্ধৃত লইয়া কাজ সারেন, সমসাময়িক সাক্ষীর বিবরণ না খুঁজিয়া তৃতীয় বা চতুর্থ কানে শুনা কথা গ্রহণ করেন, এবং বিশুদ্ধ সংস্করণ সংগ্রহ না করিয়া হাতের কাছে যে শস্তা সংস্করণ পাওয়া যায় তাহাই ব্যবহার করেন। ইহার ফলে পরিশ্রম পণ্ড হয় এবং এরূপ লিখিত গ্রন্থ ক্ষণস্থায়ী হয়। ইহার ফলে আমাদের প্রত্নতত্ত্বের "গবেষণা"গুলি এত বেশী অসার ও ব্যক্তি-গত বিবাদে পূর্ণ। কিন্তু যতীন্দ্র বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া আসল বই হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রতি উক্তির জন্য সর্ব্বপ্রথম সাক্ষীর জবানী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৬০০ পৃষ্ঠার বেশী দীর্ঘ হইলেও ইতিহাস নহে, ইহা ঢাকা জেলার বর্ণনা মাত্র, অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গেজেটিয়ার। কিন্তু সে জন্য ইহার মূল্য কম নহে। প্রথমতঃ জেলার প্রাকৃতিক অবস্থা ও স্থানগুলি না জানিলে ইতিহাস-জ্ঞান জীবন্ত ও ফলপ্রদ হয় না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ঢাকা জেলার ইংরাজী গেজেটিয়ার অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী তথ্য আছে এবং অনেক স্থলে ইংরাজ লেখকদের ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। যতীন্দ্র বাবু অন্ধভাবে হাণ্টার টেলার প্রভৃতি "পূর্ব্ব-সূরী"দিগের কথা উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি নিজের যুক্তি বা স্থান-পরিদর্শন অথবা সর্ব্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে এই-সব লেখকদের ভুল দেখাইয়া, বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা করিয়াছেন। এজন্য সরকারী "ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার"এর ভবিষ্যৎ সংস্করণ সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ করিতে হইলে এই বই ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে। ইহা গ্রন্থকারের এবং বাঙ্গলা ভাষার কম গৌরবের বিষয় নয়। তাঁহার ভাষাও "আহা আহা!" "মরি মরি!"র সংক্রামক ব্যাধি হইতে মুক্ত; অলঙ্কারের ছটা ও বৃথা বাগাড়ম্বর তাঁহার ঐতিহাসিক বাগ্দেবীকে প্রগল্ভা করিয়া তোলে নাই! আমাদের সাহিত্য-মহারথী পণ্ডিতগণ হয়ত এটা দোষ বলিয়া গণ্য করিবেন!

এই খণ্ডের কয়েকটি পরিচ্ছেদ যেমন মনোরম তেমনি শিক্ষাপ্রদ। ৩য় অধ্যায়ে নদনদীর গতি-পরিবর্ত্তনের কারণ ও 'ব'-দ্বীপের উৎপত্তি, ১২শ অধ্যায়ে ঢাকার বিখ্যাত শিল্পগুলি, এবং ২২—২৪ অধ্যায়ে জেলার প্রাচীন কীর্ত্তি, পুণ্যস্থান ও ঐতিহাসিক দৃশ্য ও ভগ্নাবশেষগুলি অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দেশে যেরূপ দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে শেষোক্ত অধ্যায় তিনটির মূল্য অত্যন্ত বেশী, কারণ ইহারা ভবিষ্যৎ যুগের জন্য অনেক পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিবে। গ্রন্থে সম্বলিত ৪০ খানি হাফটোন ছবি এবং ৫ খানি মানচিত্র এই রক্ষণ-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবে, এবং ভিন্ন

জেলার লোকদের কাছে ঢাকার প্রাচীন কীর্ত্তি উজ্জ্বল আকারে তুলিয়া ধরিবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটি ভ্রম ও অভাব নির্দ্দেশ করিতেছি। ফার্সি শব্দগুলি লিখিতে ও ছাপিতে বড়ই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ঢাকার ইতিহাসে এই জাতীয় শব্দ প্রচুর, সুতরাং একজন বাঙ্গালী মৌলবীকে দিয়া এগুলি আদ্যোপান্ত দেখাইয়া লওয়া ভাল। ২/০ পৃষ্ঠায় যে মূলের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কিছু যোগ দেওয়া আবশ্যক ;—(১) Walter Hamilton's *East India Gazetteer*, কোয়ার্টো সংস্করণ এক বালুমে, অক্টেভো সংস্করণ ২ বালুমে (বোধ হয় ১৮২৬—২৮ সালে ছাপা) ; (২) *Calcutta and Agra Gazetteer*, 4 Vols., 1841 ; এবং (৩) সম্ভবতঃ M. Martin's *Eastern India*, 3 Vols.এ রঙ্গপুর আসাম প্রভৃতির সংস্রবে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ঢাকা সম্বন্ধে কিছু থাকিতে পারে। আসাম সম্বন্ধে একখান প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থ আমার আছে, তাহাতে এরূপ লেখা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৭২৭ কি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কারণ বইখানা সঙ্গে নাই)—প্রবল বন্যায় আসামের জল ও স্থলের মূর্ত্তি একেবারে বদলাইয়া যায়। তাহার জের ঢাকা জেলা পর্য্যন্ত আসা খুব সম্ভব। সুতরাং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মত (৬২ পৃঃ) আর-একটি প্রাকৃতিক বিপ্লব পূর্ব্ববঙ্গে ঘটিয়াছিল। শাহজাহানের সময়ে মগদের পূর্ব্ববঙ্গ আগমনের একটি ছোট বিবরণ আবদুল হামিদ লাহোরী- লিখিত ফার্সি "পাদিশাহ নামা"তে আছে।

।৶০ পৃঃ, বাঙ্গলার সুবাদারী দিল্লীর ওমরাহগণের বাঞ্ছনীয় ছিল, একথা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সত্য নহে। ৩৩১ পৃঃ, অনুবাদে কয়েকটি ভুল আছে। ৩৩৩ পৃঃ, বিবি পরীকে মুহম্মদ আজিমের পত্নী বলা যে ভুল তাহার ঐতিহাসিক যুক্তি *Modern Review*এ সৈয়দ্ আওলাদ্ হোসেনের *Echoes of Old Dacca*র সমালোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

৩৪০ পৃঃ, হিজরী ১০৫৫=১৬৪১ খৃঃ হইতে পারেনা। ৩৮৮ পৃঃ, হিজরী ১০৭৯ সালে বাদশাহ যে ভারত ব্যাপিয়া দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গার আদেশ দেন সেই সময়ের সরকারী ফার্সি ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। ৪০৩ ও ৪০৭ পৃঃ, সাধু-জীবনী দুটি আরব্যোপন্যাসের অন্তর্গত করা উচিত ছিল ; গ্রন্থকার সন্দেহ প্রকাশ বা সমালোচনা করেন নাই। ৪৫৭ পৃঃ জিজ্বিরা অর্থে দ্বীপ, অর্থাৎ চারিদিকে সাগর নদী বা খাল দ্বারা ঘেরা স্থান। ৪৮২ পৃঃ, "ইস্পিঞ্জিয়ার" অদ্ভুত শব্দ ; বোধ হয় "ইস্‌ফান্দিয়ার" হইবে। ৫০২ পৃঃ, "লঘুভারতের" ঐতিহাসিক মূল্য কি ? *

শ্রীযদুনাথ সরকার।

* "ঢাকার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ৬১২ পৃঃ, ৫ খানি ম্যাপ ও ৪০ খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য ৩।০। কলিকাতা, ১৩১৯।

আধুনিক যুগের শিল্পসাধনা

(১)

এক শিল্পী তন্ময় হইয়া আপনার ঘরে বসিয়া সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি গড়িতেছিল। সুন্দর দেহের প্রতি অঙ্গে যে এত ছন্দ, মূর্ত্তি গড়িবার পূর্ব্বে সে কি তাহার কিছুই জানি[...] থরে থরে বিকশিত গোলাপ-নিকুঞ্জের উপরে বসন্তের বাতাস হিল্লোল তুলিয়া যায়, তখন যেমন এ[...] পর একটি করিয়া গোলাপ মাথা দোলাইয়া দোল[...] তাহাকে আনন্দ-সম্ভাষণ জানায়—তেমনি তাহার স্পর্শে রেখার পর রেখা, আকারের পর আকার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শিল্পী অবাক্ হইয়া ভ[...] জগতের মুখের উপরকার স্থূল আবরণ আজ [...] করিয়া না জানি খসিয়া গেল! জগতে যেন কো[...] আর বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, রস নাই, আছে কেবল রেখা আর আকার! অথচ তাহার হইল, সেই রেখা-আকারের ছন্দবিন্যাসে যেন স[...] বাজিতেছে, তাহাদের নিটোল সুডোল গড়নে যেন উছলিয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রত্যেক রন্ধ্র হইতে সুবাস বাহির হইয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের হীনতা যেন বিচিত্র বর্ণে হিল্লোলিত হইবার জন্য ভি[...] ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে!

গড়া শেষ হইলে শিল্পী তাহার প্রতিমূর্ত্তির মাথ[...] পানে চাহিল আর আকাশের দিকে চাহিল। আ[...] সুগোল হইয়া দিগন্তের কাছে নামিয়া গিয়াছে—ঐ সুন্দরীর মাথার গড়নখানি! নীল অবগুণ্ঠনের [...] কেশভার যেন দিগন্তের বন-রেখা পর্য্যন্ত লুটাইয়া আর চোখ দুটি! সেও যে ঐখানেই লক্ষ্য করা যায়, ভোরের আলোর সাড়া পাইয়া নীলোৎপল-আকাশ খু[...] আসে আর শুকতারা তাহার মাঝখানে অনিমেষ দৃ[...] চাহিয়া থাকে! শুধু কি নীলোৎপল-আকাশ খো[...] বনে বনে কত ফুল যে আঁখি মেলে! আর সমস্ত [...] বীর স্নিগ্ধ করুণ শ্যামল চোখদুটি কি খোলেনা? তা[...] শিল্পী চোখের পল্লব, কপোল আর ওষ্ঠাধর দেখি[...] নদীর ও সমুদ্রের বুকের ঢেউ আর বনের পাতার [...] হাওয়ার ঢেউ—সেই ঢেউগুলি কি আসিয়া ঐ ক[...] তরঙ্গিত অক্ষি-পল্লব আর কপোল আর ওষ্ঠাধর গ[...] করিয়াছে?

এমনি করিয়া প্রতি অঙ্গ সম্বন্ধে ভাবিতে ভা[...] শিল্পী একেবারে মূর্ত্তির মধ্যে তন্ময় হইয়া গেল। তা[...] মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার মূর্ত্তির ম[...] প্রবিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাল নাই, [...] নাই, পৃথিবীতে আর কোনও বস্তু নাই—যাহা কিছু দেখে তাহাই তাহার মূর্ত্তির মধ্যে কোথাও না কো[...] স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া আছে। শুভ্রমূর্ত্তি—কিন্তু দেখিল যে তাহাতে কত বর্ণ খেলা করিতেছে! যত সমস্ত পায়ে, গালে, আঙুলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর [...] লেপে প্রতিভাত—ভোরের আকাশভরা অরুণিমা ফু[...]

বনের তরুণ লালিমা, যেন আর কোথাও নাই, কোথাও নাই। যত কালো সব চুলে চোখে ভ্রূতে চোখের পাতায়—রাতের কালো, মেঘের কালো, বনের কালো, সাগরের কালো। আকাশে পাখী উড়ে, সে যেন তারি চঞ্চল ভাবমাখানো দুইটি আঁখি-তারার উপরে আঁকা ভ্রূযুগের মতো—বাতাস শাখা দোলায়, সে যেন তারি বুকের আন্দোলনে আঁচলখানি ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিবার মতো! বনের জন্তুগুলিও যেন তাহাদের বিশাল কায়া ও আরণ্য হিংস্র-স্বভাব বিসর্জ্জন দিয়া কেবল তাহাদের মন্থর গতি-ভঙ্গিমা তাহারি চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে! তাহাদের সেই চরণগতির ছন্দেই তো শার্দ্দূলবিক্রীড়িত শিখরিণী প্রভৃতি কত মধুর ছন্দ কবিরা সৃষ্টি করিয়াছে!

এমনি করিয়া যখন ত্রিভুবন বিলুপ্ত হইয়া সেই শিল্পীর কাছে একমাত্র সেই ত্রিলোকলাঞ্ছিতা প্রতিমাখানি জীবন্ত হইয়া রহিল, তখন একদিন নিদ্রাশেষে সে ভোরে উঠিয়া দেখে তাহার প্রতিমা নাই। রাত্রে কোন্ চোর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—সে ঘুমের ঘোরে কিছুই জানিতে পারে নাই। বাহির হইয়া সে যখন অন্বেষণে যাইবে, তখন দেখিল একি! সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া সেই প্রতিমা! আজ আর তাহার মূর্ত্তি নাই! কিন্তু অনন্ত নীলাম্বরে তাহার কি প্রসন্ন কি সুন্দর হাসি! জ্যোতির অঞ্চলখানি কেমন করিয়া সে আকাশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে! কোথাও তাহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না—কিন্তু সে সর্ব্বত্রই যেন আছে। শিল্পী আর শিল্পশালায় পুনরায় মূর্ত্তি গড়িতে গেল না। সে বিশ্বভুবনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। কহিল—যদি ইহাকে পাই তবে যাহা গড়িব তাহা ইহারই অরূপ রূপকে প্রকাশ করিবে—আর যদি ইহাকেই না পাই তবে যে রূপ গড়িব তাহাতে বিশ্ব যতই সায় দিউক্ না—জানিব সে মায়ার কারাগার। কারাগারে আর নয়!

(২)

এ কাহিনীর অর্থ কি? এই কাহিনীতে আধুনিক যুগের শিল্পসাধনার ইতিহাসটুকু দিবার চেষ্টা করিলাম।

ওয়াল্টার পেটার, রসেটি, বদেলেয়ার প্রভৃতি শিল্পী, গুণী ও কবিগণ বলেন—শিল্প শিল্পের জন্য—art for art's sake—l'art pour l'art.

চমৎকার কথা।

পৃথিবীতে এমন কোন্ বস্তু আছে যাহার স্বকীয় কোন তাৎপর্য্য নাই?

একটা ধূলিকণাও যে আছে সেও কেবল তাহারি জন্য! অনন্ত দেশ কাল তাহাকেই দেখিতেছে ও দেখাইতেছে! আমি শুধু তাহাকে দেখিতেছি এক-কণা-পরিমাণ স্থানে ও কালে, ও ভাবিতেছি ধূলিকণা বুঝি বাস্তবিকই তুচ্ছ ধূলিকণা! হায়রে, এ কথা জানিনা যে তাহারি মধ্যে সৃজনকর্ত্তার অসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত। সেই জন্য মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—পৃথিবীর ঐ রজঃটুকুও মধুমৎ!

শিল্প বলিয়া একটা বিশেষ জিনিস যখন মানুষের রসবোধের ভিতর দিয়া বহুযুগ ধরিয়া সৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাকে ধর্ম্ম বা নীতি বা তত্ত্ববিদ্যা বা সমাজ বা আর কিছুর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিবার দরকার কি? এ-সকল জিনিস স্ব স্ব স্থানে বেশ আছে—শিল্পের সঙ্গে ইহাদের যদি কোন যোগ থাকে তো সে যেমন পৃথিবীতে সকল বস্তুর সঙ্গেই সকল বস্তুর যোগ আছে তেমনিই। তাহাতে তো আর শিল্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যায় না এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলে শিল্পের উদ্দেশ্যের স্বাতন্ত্র্যও নিশ্চয়ই থাকিবে। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কি পৃথিবীর স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়াছে? সূর্য্যের জন্য পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের ধাত্রী তো পৃথিবীই—সূর্য্য নহে। ধর্ম্ম বা নীতি বা তত্ত্ব শিল্পের উপরে বাহির হইতে যেরূপ প্রভাবই বিস্তার করুক্ না—শিল্প আপনার মহিমায় আপনি একাকী বিরাজিত।

L'art pour l'art—শিল্প শিল্পেরই জন্য!

শুধু এইটুকু বলিয়াই আধুনিক শিল্পরসিকগণ ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা বলেন, সেই জন্য শিল্পের বিষয়টা কি তাহা দেখিয়ো না, শিল্পের চেহারাটা কি, প্রকাশটা কি তাহাই একমাত্র দেখিবার জিনিস।

কুসুমিত তরুর কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব কিছুই দেখিও না—দেখিয়ো শুধু ফুল, শুধুই ফুল!

পুষ্পিতযৌবনা দেহধারিণীর বুদ্ধি দেখিয়ো না, মন দেখিয়ো না, হৃদয় দেখিয়ো না—দেখিয়ো শুধু লাবণ্য, শুধুই লাবণ্য!

শারদস্বচ্ছ পূর্ণিমা রজনীর আকাশ দেখিয়ো না, অগণ্য হীরকলাঞ্ছিত তারকা দেখিয়ো না, নিম্নে পৃথিবীর শেফালিগন্ধসমুচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নাচন্দনচর্চ্চিত শ্যামমূর্ত্তিখানি দেখিয়ো না, দেখিয়ো শুধু পূর্ণচন্দ্র—শুধুই পূর্ণচন্দ্র।

শিল্পীর মতে শিল্পসৃষ্টি তো ইহাই। সে তো কোন জিনিসকেই আর আর সকল জিনিসের সঙ্গে যোগে যুক্ত করিয়া দেখায় না—যোগসূত্র আছে কি নাই তাহার খোঁজ লইবারই বা তাহার কি প্রয়োজন! কেননা সে-কাজে বিজ্ঞান আছে, তত্ত্বজ্ঞান আছে! শিল্পসৃষ্টির কাছে তাহার সৃষ্টবস্তুর কোথাও কোন যোগ নাই—সে স্বতন্ত্র, অখণ্ড, স্বয়ম্ভু!

"নাহি তার পূর্ব্বাপর
যেন সে গো অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল !"

যদি সৃষ্টবস্তুকে সৃষ্টি এমনি করিয়া আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ করিয়াই না দেখিবে, তবে সৃজনের আনন্দ থাকিল কোথায়? স্রোতে যে ফুল ভাসিয়া চলে, সে যে ভাসিয়াই গেল—কিন্তু সেই স্রোত হইতে যদি তাহাকে উদ্ধার করিয়া অর্ঘ্যরচনা করিতে পারি, তবেই তো কালস্রোতের উপর সৃজনের আনন্দ জয়ী হইল। দেশকালের নিত্য বহমান স্রোত হইতে এমন করিয়া কোন্ স্বপ্নকে আমরা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি! কিন্তু সেই উদ্ধার করিবার কাজেই তো আমাদের কলারাজ্যের বড় বড় দূতী নিযুক্ত আছে,—কবির সঙ্গীত আছে, চিত্রকরের বর্ণ আছে, রেখা আছে,—তাহারা ক্রমাগতই যে চেতনার সমুদ্রে জাল ফেলিয়া মগ্নলোক হইতে স্বপ্ন-রত্ন উদ্ধারের চেষ্টায় লাগিয়া আছে! যদি একটি স্বপ্নও ভাসিয়া উঠে, তবে আর কি তাহার যোগসূত্র কোথায় তাহা অন্বেষণের জন্য কাহারও ব্যস্ততা হয়—তখন সে কি ভয়ঙ্কর একলা! সমস্ত কল্পনা, ভাবনা, বেদনা তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কত মায়ার জালই তখন বয়ন করে! তখন স্রষ্টা একলা, সৃষ্ট পদার্থ একলা—বিশ্বভুবন বাহিরে সরিয়া যায়।

তাইতো বলা হইয়াছে L'art pour l'art – শিল্প শিল্পেরই জন্য!

উঃ একি ভয়ঙ্কর প্রতিমাপূজা!

এইবার আমার গল্পটি স্মরণ কর। সেও যে তাহার সৃষ্ট প্রতিমাকে এমনি তন্ময় হইয়াই দেখিয়াছিল! তাহার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ প্রতিমার মধ্যে অবসিত ছিল। সে যেন জগতের জড়চেতন সকল স্রোতের ভিতর হইতে দেশকালাতীত সেই মৃণ্ময় অথচ চিন্ময় স্বপ্ন-প্রতিমাকে আকর্ষণ করিয়া তুলিয়াছিল!

মানুষের জীবনের অন্য অন্য দিকের সঙ্গে সাধনার সঙ্গে কি তাহার এই তন্ময়ীভূত রূপ-সাধনার কোনো যোগ ছিল?

সমস্ত জগৎ কি লজ্জায় দূরে অপসৃত হয় নাই? কিন্তু একদিন যখন এই প্রতিমা হৃত হইল, তখন কি 'বেদনা এক তীক্ষ্ণতম' তাহার মর্ম্মে গিয়া প্রবেশ করিল না?

ইউরোপের মনীষী অধ্যাপক অয়কেন লিখিয়াছেন:— "Art of this type may be able to enrich and perfect our sensibilities in undreamt of fashion: * * but it can bring but little benefit to the human soul and it will not be able perceptibly to elevate spiritual life." অর্থাৎ —এরূপ শিল্প আমাদের ইন্দ্রিয়বোধগুলিকে অভাবনীয়রূপে উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য্য দান করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা মানুষের আত্মার সামান্য উপকারেই [illegible] এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করিতে স্পষ্টতই [illegible] হয়।

অয়কেন আধ্যাত্মিক জীবন বলিতে বুঝিয়াছেন, জীবনে আর কোথাও অংশ বা খণ্ড স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন [illegible] নাই, একেবারে একের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবসিত [illegible] গিয়াছে। শিল্পপ্রাণ জীবন কি এই সমগ্র ও অখণ্ড [illegible] চায়? কোথায় চায়? তাহা হইলে সে কি বলে L[illegible] pour l'art? সে যে আদিঅন্তহারা ক্ষণমাত্রে-উ[illegible] বিশ্বপ্রবাহ হইতে উৎক্ষিপ্ত স্বপ্নের বিলাসী—সেই [illegible] তাহার শিল্প-প্রতিমা গড়ে যে! সুতরাং অভাবনীয় ইন্দ্রিয়বোধগুলিকে এরূপ শিল্প উৎকর্ষ দান ক[illegible] অয়কেনের এই কথাটি কি সত্য নয়?

কিন্তু শিল্পে বিষয় বড় না প্রকাশ বড়, ভাব বড় রূপ বড়, ইহা লইয়া তর্ক করিতে যাওয়া মিথ্যা। [illegible] শিল্পীরা বলিবে, ভাব তো ফাঁকা জিনিস, সে তো [illegible] একটা বস্তু নহে। অমন বস্তুবিচ্ছিন্ন শূন্য পদার্থ [illegible] কি শিল্পের চলে? তত্ত্বজ্ঞানের চলিতে পারে বটে।

তুমি শিল্পী, তুমি এই মানবদেহ যে কত সুন্দর [illegible] তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে ছবিতে প্রকাশ করিয়া দে[illegible] তেছ। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দেহের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে সে কি স্থূল মাংস[illegible] অস্থি ও স্নায়ুপেশীর যোগাযোগে উৎপন্ন হইয়াছে [illegible] তোমার বিশ্বাস? তা যদি না হয়, তবে ইহার পশ্চ[illegible] আর কিছু আছে মানিবে না কি? দেহটা কি [illegible] মাত্র নয়? আছে নিশ্চয় আর একটা কিছু! দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু সে কার মুখের? তাহ[illegible] আত্মা বল আর নাই বল, সেই আত্মা বা আপ[illegible] তোমার সকলের চেয়ে আপন জানিয়ো। হে শিল্পী সু[illegible] সকল দেহসৌন্দর্য্যে তুমিই যে প্রকাশিত। এ সৌ[illegible] দেখিতেছে কে? দেহ নিজে, না তুমি? তো[illegible] আপনাকেই তুমি বাহিরে দেখিতেছ। অতএব [illegible] করিয়োনা—যদি শুধু আকারের দিকে তুমি ঝুঁকিয়া তবে তোমার এই প্রকাশ-নদীর স্রোতে নব নব [illegible] আর জাগিবে না, দেখিতে দেখিতে স্রোত রুদ্ধ হ[illegible] তোমার প্রকাশ-নদী বদ্ধ ডোবার আকৃতি প্রাপ্ত হই[illegible] তখন প্রাণের চেয়ে দেহ তোমার কাছে সত্য[illegible] বিশ্বের চেয়ে প্রতিমাই তোমার কাছে প্রত্যক্ষ হইবে। তখনই তোমার দেবতা হইবেন পুত্তলিকা।

সেইজন্য, আমি ইউরোপের প্রধান মনীষী হেগে[illegible] একটি কথা সার জানিয়া সযত্নে স্মৃতিতে রক্ষা ক[illegible] থাকি; কথাটি এই:—"Beauty is merely t[illegible] spiritual making itself known sensuously"

সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বস্তু, কিন্তু সে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে আপনাকে প্রতিভাত করে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে, শিল্প সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বড় কথা নাই।

দেবলোকের অপ্সরী গন্ধর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দাও, মর্ত্ত্যলোকে বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মনুষ্যলোকে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও সে কিসের সৌন্দর্য্য? শুধুই শরীরের? প্রেমহীন কল্যাণহীন মনআত্মাসকলবর্জ্জিত শুধুই কায়ার সৌন্দর্য্য? দেখিতে পাও না প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে কল্যাণ মাখা—আর সেই জন্যই যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এত মিষ্ট বোধ হয়! আর মানবীর সৌন্দর্য্যে প্রেম মাখা, সেই জন্য তাহা যেন প্রেমেরই বাহ্যপ্রকাশ বলিয়া অনুভূত হয়।

আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে বলে সৌন্দর্য্য বাঁশী। সে চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া অভিসারে বাহির করে এবং প্রেমের নিকটে অবশেষে তাহাকে উপনীত করে। সে যে আহ্বান, এই তো তাহার সার্থকতা। কিসের আহ্বান? প্রেমের।

যদি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে অন্য সকল দিক্ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধমাত্র কায়িক করিয়া দেখাও—শুদ্ধ কায়াকেই চিত্রিত কর—মনকে নয়, প্রাণকে নয়, আত্মাকে নয়—তবে তাহার কোন সার্থকতা থাকে কি? আধুনিক যুগে ইউরোপের নানাস্থানে—বিশেষতঃ ফরাসী দেশে—এই যে কায়াসৌন্দর্য্যের শিল্পসৃষ্টি হইতেছে তাহা কি অত্যন্ত নিরর্থক ও মিথ্যা নয়? "Beauty is merely the spiritual making itself known sensuously"—সৌন্দর্য্যের সেই spiritual বা আধ্যাত্মিক অঙ্গ যদি বাদ পড়িল তবে খোসাটুকু লইয়া কী লাভ আছে! লাভ তো নাইই, বরং পরম ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষতি পাপের ক্ষতি—কারণ বিচ্ছিন্নতার আর এক নামই পাপ। সমগ্রের চেয়ে যেখানেই অংশ বড় হইয়াছে, সেখানেই পাপ দেখা দিয়াছে। আর সমগ্রের মধ্যে যেখানেই অংশ স্থান করিয়া লইয়াছে সেখানেই পাপ লুপ্ত হইয়াছে।

আধুনিক যুগের শিল্পসাধনাকে আমি বলি শিল্পের রূপ-সাধনা, আর যে সাধনা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিবার দিকে শিল্প তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছে তাহাকে আমি বলি শিল্পের অরূপ-সাধনা। আধুনিক যুগে এই দুই সাধনাই পাশাপাশি কাজ করিতেছে এবং জয়লাভের জন্য পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত পরিচ্ছেদের সারাংশ:—ক্ষেত্রনাথ দত্তের বাড়ী কলিকাতায়। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু উপর্যুপরি কয়েক বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণজালে জড়িত হন। ক্ষেত্রনাথ বি-এ পাশ করিয়া পিতার সাহায্যার্থ পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া ও একটী ভগিনীর শুভবিবাহ সম্পাদন করিতে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায় এবং ঋণদায়ে পৈত্রিক বাটী উত্তমর্ণের নিকট আবদ্ধ হয়। অর্থাভাবে ক্ষেত্রনাথের কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল ও সংসার চালাইবার কোনও উপায় রহিল না; তাহার উপর স্ত্রী মনোরমা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এদিকে উত্তমর্ণও ঋণের দায়ে বাটী নিলাম করাইতে উদ্যত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং বাটী বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এবং এক বন্ধুর পরামর্শক্রমে উদ্বৃত্ত অর্থের কিয়দংশ দ্বারা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম জেলায় বল্লভপুর নামে একটী মৌজা ক্রয় করিলেন। উদ্দেশ্য, সেখানে সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় করিবেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে রুগ্না স্ত্রী, তিনটী পুত্র ও একটী শিশুকন্যা সহ তিনি বল্লভপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলেন।

ষ্টেশন হইতে গোযানে পার্ব্বত্য ও অরণ্যপথে যাইতে যাইতে ঘটনাক্রমে মাধবপুরে মাধব দত্ত নামে জনৈক স্বজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত ক্ষেত্রনাথের আলাপ হইল। মাধবদত্তের অনুরোধে তিনি সপরিবারে তাঁহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। বল্লভপুর ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বহির্ভাগে অবস্থিত জমিদারের "কাছারী বাটী" নামক দ্বিতল পাকা বাটীও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। সেই বাটীই তাঁহাদের আবাসবাটী হইল। ক্ষেত্রনাথের এক শত বিঘা খাসখামার জমী ছিল; তাহা নিজ জোতে চাষ করিবার জন্য তিনি বলদ মহিষ প্রভৃতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। সুন্দর আবাসবাটী ও চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং প্রবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতীয় মহিলাগণের ও দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সহিত আলাপ করিয়া মনোরমা অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রনাথ "মুনিষ কামিনের" সাহায্যে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমীতে ধান্যের আবাদ করিলেন, এবং পঞ্চাশ বিঘা টাঁড় বা ডাঙ্গাজমীতে অড়হর, কলাই, মুগ, বরবটী প্রভৃতি আবাদ করিলেন। নন্দা নাম্নী একটী ক্ষুদ্র তটিনীতে বাঁধ দেওয়াতে জলের অভাব হইল না। ক্ষেত্রনাথ সেই জলের সাহায্যে আলুর চাষ করিবার উদ্দেশ্যে আলুর বীজ সংগ্রহের নিমিত্ত পুরুলিয়া গমন করিলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একটী বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ক্ষেত্রনাথকে বল্লভপুরে বিদেশীয় উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ বপন করিতে উপদেশ দিলেন।]

দশম পরিচ্ছেদ।

সতীশচন্দ্র কার্পাস-কৃষি-বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন। বঙ্গদেশের কৃষকেরা যাহাতে উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি নানাস্থানে প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা

করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি নানাস্থানের কৃষকদের সহিত মিশিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, একটু লেখাপড়া না জানিলে, ও একটু স্বদেশহিতৈষী না হইলে, কৃষকেরা উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে বা সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য তিনি শিক্ষিত বা শিক্ষার্থী যুবকগণকে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। কিন্তু কেহ তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করিতেন না। পরপদলেহন-প্রিয় অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও শিক্ষিত যুবকেরা এবং হাইকোর্টের জজিয়তী পদের আকাঙ্ক্ষী নব্য উকীল মহাশয়েরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে হাসিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে, এত ব্যয়ে ও পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শেষে যদি "চাষা" হইতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাশিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? কোথাও সহানুভূতি বা উৎসাহ না পাইয়া সতীশচন্দ্র সর্ব্বদা অতিশয় ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কাল কাটাইতেন। আজ জনৈক শিক্ষিত বন্ধুকে ভাগ্যদোষে বা ভাগ্যগুণে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি কার্পাস-কৃষি সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ক্ষেত্রনাথকে তাহার প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ বন্ধুবরের প্রত্যেক কথা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিলেন ও তাহার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কেবল আত্মরক্ষার জন্যই প্রথমে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নানাস্থানে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পরিশেষে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতার বহুদিনের পৈত্রিক বাটী ও আত্মীয় স্বজনগণের মমতা ত্যাগ করিয়া, এখন সকলের ঘৃণা ও বিদ্রূপব্যঞ্জক দৃষ্টির অন্তরালে সপরিবারে বনবাস স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বের মত দারিদ্র্যের কঠোর পীড়ন না থাকিলেও ক্ষেত্রনাথ এখনও মনে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এখনও তাঁহাকে বহু বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এখনও তিনি সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, কখনও হইবেন কি না, তাহাও তিনি জানেন না। তবে যত্ন ও চেষ্টা করিলে শেষ পর্য্যন্ত যে জয়লাভ হইতে পারে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে। আত্মরক্ষা ও পরিবার প্রতিপালন, এই দুইটী বিষয়ের চিন্তাই এখন ক্ষেত্রনাথের মনোরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গল-চিন্তার কিছুমাত্র স্থান নাই। কিন্তু আজ সতীশচন্দ্রের কথা শুনিতে শুনিতে সহসা তাঁহার মনের মধ্যে একটী আ[...] আলোকের ছটা আসিয়া পড়িল! সেই আলো[...] ছটায় ক্ষেত্রনাথের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত [...] পড়িল। ক্ষেত্রনাথ অল্পে অল্পে যেন বুঝিতে পারি[...] কৃষিকার্য্যে কিছুমাত্র হীনতা নাই; কৃষিকার্য্যে [...] হইয়া আপনাকে সভ্য লোকসমাজের দৃষ্টির অন্ত[...] রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই, এবং এই কার্য্যে [...] সঙ্কোচ ও আত্মগোপনেরও কোনও কারণ নাই। অ[...] তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কৃষিকার্য্যই প্রকৃত গৌর[...] কার্য্য এবং স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলসাধক। ধরি[...] আমাদের জননী; জননীকে আশ্রয়রূপে দৃঢ়ভাবে ধ[...] থাকিলে, অন্নবস্ত্রাভাবে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হ[...] না। ধরিত্রীর অপর নাম বসুন্ধরা। তাঁহার নিকট [...] রত্ন চাহিলে, ধনরত্নের অভাব হইবে না। কৃষি হ[...] অন্ন উৎপন্ন হয়; অন্ন জীবমাত্রেরই প্রাণ; এই কা[...] অন্ন ব্রহ্ম। ভূমি হইতে যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় প্রধা[...] তাহাই বাণিজ্যের মূল। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"; সু[...] ভূমি স্বয়ং লক্ষ্মী! কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলে, সক[...] অন্নাভাব ঘুচিবে; বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্পের উ[...] হইবে; দেশের লোক ধনবান্ হইবে, এবং স্বদেশ[...] স্বজাতির মঙ্গল সাধিত হইবে। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ক্ষেত্র[...] যে ভূমিলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হই[...] ছেন, তজ্জন্য তিনি আপনাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান্ [...] করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের দুঃখ মুহূর্ত্তম[...] তিরোহিত হইল, এবং দুঃখের পরিবর্ত্তে মনোমধ্যে আন[...] আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। ভূমির অধিষ্ঠা[...] দেবতার ঐশ্বর্য্যশালিনী, স্নেহময়ী, বিশ্বপালিকা জন[...] মূর্ত্তি সহসা তাঁহার হৃদয়মন্দিরে দিব্য শোভায় উদ্ভা[...] হইয়া উঠিল। অমনই তাঁহার নয়নযুগলও বাষ্পজ[...] সমাচ্ছন্ন হইল এবং তিনি স্বতঃই অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উ[...] লেন "জয় মা করুণাময়ি, জগদ্ধাত্রি, কৃপা কর, [...] কৃপা কর।"

আজ ক্ষেত্রনাথের হৃদয়ে শান্তি আসিয়া বিরাজি[...] হইল। আজ তাঁহার মনের ক্ষোভ, হৃদয়ের দৈন্য, আ[...] সঙ্কোচ ও আত্মগ্লানি সমস্তই তিরোহিত হইল। অ[...] তিনি কৃষিকার্য্যকে পবিত্র, গৌরবময় ও মহৎ কার্য্য বলি[...] হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। আজ তিনি বুঝিলে[...] তিনি কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত নহেন, পরন্তু [...] স্বার্থের সহিত স্বদেশের ও স্বজাতির মহান্ স্বার্থও বিজড়ি[...] রহিয়াছে। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলে[...] তিনি আদর্শস্থানীয় কৃষক হইতে পারিলে, সামান্য প[...] মাণেও স্বদেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে এবং তাঁহ[...] জীবনধারণও সার্থক হইবে।

সেইদিন সন্ধ্যার পর সতীশচন্দ্রের সহিত ক্ষেত্রনাথ কৃষিসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। সেই আলোচনার ফলে তাঁহার প্রচুর জ্ঞানলাভ হইল। কৃষিকার্য্যে সফলতালাভ করিতে হইলে কত বিষয় যে জানিতে হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। জাপান, আমেরিকা ও ইতালীর কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করিয়া কত যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে ও কিরূপ লাভবান্ হয়, তাহাও তিনি অবগত হইলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে কৃষি সম্বন্ধীয় দুই তিনটি পুস্তক পাঠ করিতে দিলেন এবং আরও কতিপয় উৎকৃষ্ট পুস্তকের নাম লিখিয়া দিলেন; পরদিন প্রভাতে, ক্ষেত্রনাথ আলু ও কার্পাসের বীজ লইয়া মহোৎসাহে বল্লভপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বল্লভপুরে উপনীত হইয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার শস্যক্ষেত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তন্মধ্যে যেন এক অভিনব শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন। জননী ভূমিলক্ষ্মীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি যেন তাঁহার নয়নগোচর হইল; তাঁহার আশ্বাসসূচক অভয়বাণীও যেন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে করজোড়ে জননী ভূমিলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলেন।

যথাসময়ে আলুর মাটী প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের উপদেশানুসারে প্রায় তিন বিঘা জমীতে আলুর বীজ বপন করিলেন। অবশিষ্ট এক বিঘা জমীতে তিনি ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মটর, টমেটো (বিলাতী বেগুন), সীম ও নানাজাতীয় শাকসব্জী লাগাইলেন। এদিকে নন্দাজোড়ের অপর পারে একটী উচ্চ অথচ উর্ব্বর ডাঙ্গাজমী কার্পাস-ক্ষেত্রের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। নন্দা অদূরবর্ত্তিনী থাকায়, তাহার জল কার্পাসক্ষেত্রে লইয়া যাইতে কোনও অসুবিধার সম্ভাবনা রহিল না। ক্ষেত্রনাথ স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া সতীশবাবুর উপদেশানুসারে কার্পাসক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়াইতে লাগিলেন। মাটী প্রস্তুত হইলে, তিনি ক্ষেত্রের পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকে আড়াই ফুট্ সমান্তরালে কতকগুলি নালা কাটাইয়া, নালাসমূহের সংযোগস্থলে এক একটী কার্পাসের বীজ বপন করাইলেন। কাপাসের চারাগাছগুলিকে গোমহিষাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ক্ষেত্রের চারিদিকে একটী শক্ত বেড়া দেওয়াইলেন। দুই বিঘা পরিমিত ভূমিতে কার্পাসের বীজ উপ্ত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসে বল্লভপুরের শস্যক্ষেত্রসমূহের মনোহারিণী শোভা হইল। সেই শোভাদর্শনে কৃষকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ক্ষেত্রনাথ জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও কৃষিকার্য্য করেন নাই বা দেখেন নাই; সুতরাং, তাঁহার হৃদয় বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে পূর্ণ হইল। দুই তিন মাস পূর্ব্বে যে-সকল ক্ষেত্র মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছিল, আজ তৎসমুদায় হরিৎশস্যে অদ্ভুত শোভাময় হইল। বল্লভপুর গ্রামটি যেন এক ক্ষুদ্র হরিৎসাগরে পরিণত হইল; মারুতহিল্লোলে তরঙ্গায়িত শস্যশীর্ষসমুদায় সেই সাগরের তরঙ্গরাজিরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; বল্লভপুরের মধ্যে যে-স্থানে লোকের বসতি আছে, সেই স্থানটি এই হরিৎসাগরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথের গৃহের চতুর্দ্দিকেই হরিৎশস্যপূর্ণ ক্ষেত্ররাজি। তন্মধ্যে ধান্যের ক্ষেত্রই অধিক। কোথাও অড়হর, কোথাও কলাই, কোথাও মুগ প্রভৃতি শস্যেরও ক্ষেত্র রহিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ একদিন মনোরমার সহিত দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শস্যক্ষেত্রসমূহের এই শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছিলেন; তিনি জননী বসুন্ধরা দেবীর এই শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি ও আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধনধান্যপূর্ণ নিজ গৃহের চিত্রও কল্পনায় অঙ্কিত করিতেছিলেন। মানসপটে সেই চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে, তিনি উৎফুল্লনয়নে মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মনোরমা, এই-সকল শস্য মাড়াই ঝাড়াই ক'রে যখন ঘরে তুলবো, তখন আমাদের ঘরের কেমন শ্রী হবে, বল দেখি? ঘরে কোনও জিনিষের অভাব থাকবে না। ধান, চা'ল, কলাই, অড়হর, মুগ প্রভৃতিতে তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ হ'য়ে যাবে। আলু, তরকারী, শাক সব্জীর কোনও অভাব থাকবে না। আবার দুই দশ দিন পরে ছোলা, গম, যবও বুনবো। এদিকে দুই বিঘা জমীতে ভাল কাপাসের বীজ লাগিয়েছি। কাপাস-গাছে যদি ভাল তুলা হয়, তা হ'লে বেশী মূল্যে তা বিক্রীত হবে; আর সেই টাকাতেই আমাদের সম্বৎসরের কাপড় কেনা চলবে। মা ভগবতী এতদিনে আমাদের মুখপানে চেয়েছেন। কল্‌কাতা থেকে আমরা যখন চ'লে আসি, তখন আমি তোমাকে খুলে বলি নাই যে, আমি নিজে বল্লভপুরে চাষ করবো। যে চাষ করে, লোকে তাকে 'চাষা' বলে। 'চাষা' শব্দটা আমাদের দেশের মধ্যে একটা গালি। লেখাপড়া শিখে,—অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে,—পৈত্রিক ব্যবসাবাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে—শেষে যে আমি 'চাষা' হবার সঙ্কল্প করেছি, তা কেবল বন্ধু বান্ধব কেন, তোমাকেও বলতে আমি সাহস করি নাই। আমার ভয় হয়েছিল, পাছে তারা বা তুমি আমাকে ঘৃণা বিদ্রূপ কর। অথচ, তখন আমার অবস্থা যেরূপ, তা'তে চাষ করা ভিন্ন সংসার প্রতিপালনের জন্য আমি অন্য কোনও

উপায় দেখ্‌তে পাই নাই। আমি প্রথমে মনে করে-ছিলাম, কিছু দিন চাষ ক'রে আগে তো সকলের প্রাণ বাঁচাই, তারপর সংসার চল্‌বার একটা কিছু উপায় হ'লে, চাষ ছেড়ে দিয়ে আবার ব্যবসা আরম্ভ কর্‌বো। চাষ যে আমার জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন হবে, তা আমি কখনও ভাবি নাই। অভাবে পড়্‌লে সব কাজই কর্‌তে হয়, এইরূপ ভেবে আমি চাষ কর্‌বার সঙ্কল্প করি। কিন্তু আমি যে চাষী হব, তা একদিনের জন্যও দৃঢ়-নিশ্চয় করি নাই। আমি যে চাষী হয়েছি, তার পরিচয় কা'কেও বড় একটা দিই নাই, আর কখন দিবও না, এইরূপ স্থির করেছিলাম। কিন্তু সেদিন পুরুলিয়ায় গিয়ে, কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক আমার যে বন্ধুটি আমাকে আলু ও কাপাসের বীজ দিয়েছিলেন, তাঁর মুখে চাষের যেরূপ উপকারিতার কথা শুন্‌লাম, তাতে আমার মনের ভাব একেবারেই বদ্‌লে গেছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কৃষিই লক্ষ্মী, আর ভূমিই সকল ধনের মূল। দেখ, চাষের দ্বারা কতপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। আমাদের বেণের দোকানের যত রকম মশলা, তাও চাষ ক'রেই লোকে উৎপন্ন করে। এই-সকল দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ই ব্যবসা। তা ছাড়া মাটীর মধ্যে কত রত্ন ও খনি রয়েছে। সোনা, রূপা, হীরে, মাণিক, তামা, লোহা, অভ্র, পাথুরেকয়লা, এলা মাটী, কেওলীন্ মাটী, চা খড়ি, এই সমস্তই এই মাটীতে পাওয়া যায়। তাই তোমাকে বল্‌ছিলাম, কৃষিই লক্ষ্মী, আর ভূমিই ধনরত্নের মূল। কৃষিকাজটাকে আমি বাণিজ্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এইজন্য বল্‌ছি যে, কৃষি দ্বারা শস্য উৎপাদন না কর্‌লে আমরা জীবনধারণ কর্‌তে পারি না। সোনা, রূপা, হীরে, মাণিক আর পাথুরে কয়লা খেয়ে কি কেউ বাঁচ্‌তে পারে? জীবনধারণের জন্য শস্য চাই, অন্ন চাই। তা না হ'লে, একদিনের জন্যও সংসার চলে না। যাতে আমাদের জীবন রক্ষা হয়, আর-দশজনেরও জীবনরক্ষার উপায় হয়, সেই কাজ কি শ্রেষ্ঠ নয়? আমার মনে হয়, সেই কাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মহৎ ও গৌরবময় কাজ আর কিছুই নাই। এখন আমি আপ-নাকে আর 'চাষা' বল্‌তে কোনও লজ্জা অনুভব করি না, বরং তা'তে আমার গৌরবই বোধ হচ্ছে। কলেজে পড়্‌বার সময়-বর্দ্ধমান জেলার একটী সহপাঠীকে আমরা 'চাষা' ও 'চাষার দেশের 'লোক' ব'লে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম! আহা, বেচারী আমাদের ঠাট্টা বিদ্রূপে অনেক সময় বড় অপ্রতিভ হ'য়ে পড়্‌তো। কিন্তু সেও সময়ে সময়ে প্রত্যুত্তর ক'রে বল্‌তো 'তোমরা কল্‌কাতার লোক—কুয়োর ব্যাঙ; চাষের যে কি গুণ, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে? তোমাদের বাড়ীতে একটী লোক বা অতিথি এলে, তোমরা তা'রে একবেলা এক মুঠো ভাত দিতে কাতর হও; আর আমরা হ'লেও, বাড়ীতে দশ জন লোক এলে, তাদের দিতে কখনও কাতর হই না। তোমাদের কল্‌ তো এমনই সভ্য সহর!' এই ব'লে সে কখনও ক সগর্ব্বে একটী ছড়া বল্‌তো, তা এখনও আমার আছে। ছড়াটি এই:—

> ধন, ধন,—ধান ধন, আর ধন গাই,
> কিছু কিছু রূপা সোনা, আর সব ছাই।

এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার সেই সহপাঠ কথাই ঠিক্। ধানই প্রকৃতপ্রস্তাবে ধন; সোনা ধন নয়। সংস্কৃতেও একটী বচন আছে, 'ধনং ধান্যধনম্।' গাইও ধনের মধ্যে পরিগণিত। গ প্রাচীনকালে গোধন বল্‌তো। ঘরে যদি ধান অ ভাত থাকে, আর গাভীতে যদি দুগ্ধ দেয়, তা হ জীবনরক্ষার আর ভাবনা কি? লোকে কথায় ব 'দুধেভাতে সুখে থাক।' সুতরাং বর্দ্ধমানের আমার বন্ধুটির কথাই ঠিক। আর তার কথাটি অমূ এ বৎসর আমাদের কি রকম ফসল হয়, তা দেখে উৎসাহ পাই, তা হ'লে চাষের উপরেই আমি ঝোঁক্ দেব। মনোরমা, তোমার চারিদিকে ভূমিল যে শোভা দেখ্‌তে পাচ্ছ, তা'তে তোমার মনে আ হচ্ছে না?"

মনোরমা স্বামীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলি "তা আবার বল্‌তে হয়? তোমরা সব মাঠে ম জলে কাদায় ঘুরে বেড়াও; আমি কিন্তু এইখানে দাঁড়ি দাঁড়িয়ে রোজই মাঠের যে শোভা দেখি, আর তা আমার যে আনন্দ হয়, তা তোমায় বল্‌তে পারি ন আমি নীচে বেশীক্ষণ থাকৃতে পারি না; সংসা কাজকর্ম্ম করি আর এক-একবার এই বারাণ্ডায় এ দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাই। তোমার বর্দ্ধমানের বন্ধুটি ঠি কথাই বলেছিলেন। ধানই ধন, আর সব ছাই! ধ যে লক্ষ্মী, তা কি আমরা জানি না? ভাত অপ (অপচয়) হ'লে, আমরা বলি 'লক্ষ্মীর অপ্‌চো' হ'চ্ছে আর ধান না হ'লে কি কখনও লক্ষ্মীপূজো হয়? ক কাতায় যিনি যতই বড় লোক হ'ন, কারুর ঘরে এ মুঠো ধান নাই! দোকান থেকে চা'ট্টি ধান কিনে আন্‌লে, কারুর বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা হয় না! সেই জন্যে কলকাতার লোক এত লক্ষ্মী-ছাড়া! আজ যদি কারু কিছু টাকা হয়, সে অমনই ঘর-বাড়ী ফাঁদায়, আ গাড়ীজুড়ী চড়ে। তারপর, কাল আবার সেই বাড়ী বন্ধ দিতে বা বেচ্‌তে পথ পায় না। ওগো, আমি বে বুঝ্‌তে পেরেছি, ধানই লক্ষ্মী। এখন মা লক্ষ্মী আম দের উপর দয়া করুন, আমরা যেন ছেলেপিলে নি

কোনও রকমে সংসার চালাতে পারি। আমরা যেদিন এখানে আসি, সেই দিন দত্ত মশাইয়ের বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে যাই। সেই দিনই আমার মনে হয়েছিল, 'আহা, আমাদেরও যদি কখনও এই-রূপ হয়।' তুমি চাষের কাজ করতে পারবে কি না, সেই বিষয়ে আমার ভয় আর সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুমিও যে চাষের মহিমা বুঝেছ, তা'তেই আমার মনে আর আনন্দ ধর্‌ছে না। যার যা খুসী হয় সে আমাদের তাই বলুক। যারা সোনাদানা চায়, তারা তাই নিয়ে থাকুক। আমরা সোনাদানা তত চাই না, যত চাই মরাই মরাই ধান। আমাদের ঘরে ধান থাক্‌লে মা লক্ষ্মীর কখনও অকৃপা হবে না, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।"

মনোরমার কথা শুনিয়া ক্ষেত্রনাথের হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইল। উভয়েরই মনে যে একই ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্রনাথের কিছু বিস্ময় হইল। ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিমীলিত নেত্রে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন "মা ব্রহ্মময়ি জগদম্বে, আমাদের উপর কৃপা-কটাক্ষ কর, মা।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে-সকল টাঁড়্ বা ডাঙ্গাজমীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে কোনও শস্য উৎপন্ন হইত না, নন্দার জল বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে, তৎসমুদায়েও এক্ষণে শস্যোৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। নন্দার উভয়তটবর্ত্তিনী অনেক ভূমি এইরূপে শস্যশালিনী হইল। তটিনীর এক দিকে আলু, কপি ও মটরের ক্ষেত্র, অপরদিকে কার্পাসের ক্ষেত্র; আবার অন্যত্র তাহার উভয় পার্শ্বেই গম, যব, ছোলা, সরিষা প্রভৃতি শস্যসমূহের জন্যও নূতন নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। লখাই সর্দ্দার বলিতে লাগিল, আগামী চৈত্রমাসে নন্দার তটে দুই তিন বিঘা ভূমিতে সে ইক্ষুও রোপণ করিবে। গম যব প্রভৃতি শস্য বপনের জন্য ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রনাথ পাঁচ বিঘা জমীতে গম, দুই বিঘাতে যব, চারি বিঘাতে ছোলা, ও চারি বিঘাতে সরিষা বপন করাইলেন। এতদ্ব্যতীত, প্রায় আট বিঘা টাঁড়-জমীতে গুঞ্জা নামক তৈলোৎপাদক একজাতীয় শস্যও উপ্ত হইল। ক্ষেত্রনাথের ভূমিতে অল্প অল্প পরিমাণে এইরূপে প্রায় সকল প্রকার শস্যেরই চাষ হইল। কিন্তু এখনও বহু জমী অকৃষ্ট পড়িয়া রহিল।

আবাদের কার্য্য এইরূপে সমাপ্ত হইলে, মুনিষেরা এখন "ক্ষেতারা"য় মনোনিবেশ করিল, অর্থাৎ, তাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে গিয়া তাহা হইতে ঘাস নিড়াইতে লাগিল এবং কোদালি দ্বারা মাটী উল্টাইয়া ফেলিতে লাগিল। ক্ষেতারার পর শস্যের চারাগুলি সতেজে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

প্রচুর ফসলের আশায় ক্ষেত্রনাথ ও তাঁহার পরিবার-বর্গের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। আর কিছু দিন পরেই তাঁহাদের গৃহ ধান্য, কলাই, অড়হর, মুগ প্রভৃতিতে, এবং আরও এই চারি মাস পরে যব, গম, মটর, সরিষা, গুঞ্জা, কার্পাস প্রভৃতিতে পূর্ণ হইবে। যে-গৃহে নিত্য অভাব বিদ্যমান ছিল, সেই গৃহে এখন আর অভাবের লেশমাত্র থাকিবে না, অধিকন্তু সকল বিষয়েই প্রাচুর্য্য থাকিবে, এই চিন্তায় কোন্ গৃহীর মন আনন্দ ও উৎসাহে উৎফুল্ল না হয়?

কিন্তু এই জগতে কেহ কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। আনন্দকোলাহলের মধ্যেও বিষাদের করুণ সুর বাজিয়া উঠে; উজ্জ্বল দিবা-লোকের পশ্চাতে অমানিশার অন্ধকার ছুটিয়া আসে; মিলনসুখের মধ্যেও বিরহের ব্যথা জাগিয়া উঠে; আশার পর নৈরাশ্য আসে, এবং সুখের পর দুঃখ আসে। সংসারের বিচিত্রতাই এইরূপ, এবং এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংসারচক্র নিয়ত ভ্রাম্যমান।

আশুধান্যগুলি পাকিয়া উঠিয়াছিল। লখাই সর্দ্দার দুইচারি দিনের মধ্যেই তাহা কাটিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে একদিন প্রাতে সে বিষণ্ণমুখে ক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের মুখের ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লখাই, মাঠ থেকে হঠাৎ চ'লে এলে যে?"

লখাই দুঃখিত কণ্ঠে বলিল "আর নাই আস্‌্যে কি ক'র্‌ছি বল্, গলা? লে, তোর কাম লে; আমি আর লার্‌ব। আমি এত যে গতর খাটালি, সব মিছাই হ'ল।"*

ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের বাক্য শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কি হ'ল, লখাই? খুলে বল না?"

লখাই বলিল "আর কি হ'বেক্ হে। তুই এথাতে চাষ নাই কর্‌তে পার্‌বি; তুই এথাতে এক শীষও ধান নাই পাবি। হঁ, আমি মিছা নাই ব'ল্‌ছি।" †

ক্ষেত্রনাথের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লখাই সর্দ্দারের মন এতই খারাপ্ হইয়াছিল যে প্রকৃত

---

* লখাই বলিল "প্রভু, আমি না এসে আর কি কর্‌ছি, বলুন। আপনি আপনার কাজ বুঝে নিন্; আমি আর কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। আমি যে এত গতর খাটালাম, অর্থাৎ পরিশ্রম কর্‌লাম, সবই মিথ্যা হ'ল।"

† লখাই বলিল "আর্ কি হ'বে? আপনি এখানে চাষ কর্‌তে পার্‌বেন না, বা একটীও ধানের শীষ পাবেন না। সত্য বল্‌ছি; আমি মিছে কথা বল্‌ছি না।"

ব্যাপার কি, তাহা বহু প্রশ্ন করিয়াও ক্ষেত্রনাথ অবগত হইতে পারিলেন না। লখাই তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কেবল এই মাত্র বলিতে লাগিল "চ আমার সাথে, দেখ্‌বি চ।" *

অগত্যা ক্ষেত্রনাথ ও নগেন্দ্র লখাইয়ের সঙ্গে চলিলেন। কি একটা গোলমাল হইয়াছে, তাহা মনোরমাও শুনিলেন। শুনিয়া, তাঁহারও মন চঞ্চল হইল।

ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের সঙ্গে আউশ ধান্যের ক্ষেত্রের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, দুই তিন বিঘা জমীতে ধান্য নাই। কেহ যেন তাহা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, পাকা ধান দেখিয়া হয়ত রাত্রিতে চোরে তাহা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি নিজ মনের আশঙ্কা লখাইকে ব্যক্ত করিয়া বলিলে, লখাই বলিল "ইটো চোরের কাম নাই বটে; এথাতে পায়ের চিন্ ভাল্যে দেখ্।" †

ক্ষেত্রনাথ দেখিলেন, ভিজা মাটীতে ছাগলের ক্ষুর-চিহ্নের মত অসংখ্য ক্ষুরচিহ্ন রহিয়াছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "লখাই, ছাগলে কি ধান খেয়ে গেছে?"

লখাই বলিল "ছাগল নাই বটে হে, ছাগল নাই বটে। ইগুলান্ হরিণ বটে; রাত্যে পাহাড় লে হরিণের পাল ধানের ক্ষেতে হাব্‌ড়াইছিল; হরিণগুলান্ তোর ক্ষেতের একটীও ধান নাই রাখ্‌ব্যেক্। তুই চাষ্ ক'র্‌তে লার্‌বি। আমি মিছাই গতর খাটালি।" ‡

এই বলিয়া লখাই-সর্দ্দার একটী আলের উপর মাথায় হাত দিয়া এবং দুঃখ ও চিন্তায় মুখ অবনত করিয়া বসিয়া রহিল।

এতক্ষণে ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের দুঃখ ও নৈরাশ্যের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি বিপদের গুরুত্বও মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিয়া লইলেন। হরিণের পাল এক রাত্রির মধ্যেই যখন তিন বিঘা জমীর ধান খাইয়া ফেলিল, তখন দশ পনর দিনের মধ্যেই তাহারা পঞ্চাশ বিঘার ধান খাইয়া ফেলিবে! কলাই, অড়হর, গম, যব, বুট প্রভৃতি শস্যের ফসলও এইরূপে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, ক্ষেত্রনাথ চক্ষে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে আশাপ্রদীপ উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত হইতেছিল, সহসা তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিনিও ম হাত দিয়া সহসা আলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কেহ একটীও কথা কহিল না। শেষে ক্ষেত্রনাথ লখাইকে নানাপ্রশ্ন করিয়া অ হইলেন যে, হরিণ, বন্যবরাহ, বন্যহস্তী, শুকপক্ষী ও রের উপদ্রবে এই অঞ্চলে চাষ আবাদ করা সুকঠিন। হ শূকর, হস্তী ও ময়ূর তাড়াইতে না পারিলে কেহ মুঠা শস্যও গৃহে লইয়া যাইতে পারে না। রাত্রি ইহাদের উপদ্রব অধিক হয়। কিন্তু রাত্রিতে শস্যে পাহারা দেওয়া বড় বিপজ্জনক। যেখানে হরিণ, খানেই বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রিতে ক্ষেত্রে ভ্রমণ ক গেলে প্রাণটি হাতে লইয়া যাইতে হয়। খুব উচ্চ বা মাচা না বাঁধিলে রাত্রিতে মাঠে পাহারা দে অসম্ভব। কিন্তু বন্যহস্তী আসিলে, টঙ্গে চাপিয়া থাকি প্রাণরক্ষা করা যায় না। হস্তিগণ ক্রুদ্ধ হইলে টঙ্ ভা ফেলে।

ভীতি ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে ক্ষেত্রনাথ বলি "লখাই, যখন চাষ আরম্ভ কর্‌লে, তখন এইসব উপদ্র কথা আমাকে বল নাই কেন? এত উপদ্রব অ জান্‌তে পার্‌লে হয়ত আমি চাষই কর্‌তাম না; ন ফসল বাঁচাবার কোনও উপায় ক'র্‌তাম।"

লখাই ক্ষেত্রনাথের অনুযোগের যাথার্থ্য বুঝিতে পা কিছু দুঃখিত হইল। পরে বলিল "গলা, তোকে কহ্‌তে আমি পাশুরে গেল্‌ছিলি।" * এই বলিয়া ল যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, প্রতিবৎসর হরি এরূপ উপদ্রব হয় না। হরিণেরা এক পাহাড়ে বার থাকে না, নানা পাহাড়ে চরিয়া বেড়ায়। এই ব বল্লভপুরের পাহাড়ে আসিয়াছে। যে বৎসর হরি পাল আসে, সে বৎসর ফসল রক্ষা করা কঠিন তবে প্রজারা আপন-আপন ধানের ক্ষেতের পার্শ্বে বা মাচা বাঁধে এবং সেই মাচায় উঠিয়া পর্য্যায় রাত্রিতে ফসলের পাহারা দেয়। বন্দুক আওয় করিয়া ভয় দেখাইলে, হরিণের পাল পলাইয়া যায়; নাগ্‌রা বা ধাম্‌সা বাজাইলেও ভয় পায়। বন্য হ পালও প্রতিবৎসর আসে না; কোনও কোনও বৎ আসে। এই বৎসর, ছয় সাত ক্রোশ দূরে সোন পাহাড়ে একপাল বন্যহস্তী আসিয়াছে, এবং সেই অঞ্চ প্রজাদের শস্য নষ্ট করিতেছে। বল্লভপুর গ্রামে বে বেচন মণ্ডলের একটী বন্দুক আছে, আর কার্ত্তিক ভূ প্রসিদ্ধ শিকারী বলিয়া তাহারও একটী বন্দুক আ কিন্তু এই দুইটীমাত্র বন্দুকে হরিণের পালকে বিতা

* "চলুন, আমার সঙ্গে, দেখ্‌বেন চলুন।"

† লখাই বলিল "এ চোরের কাজ নয়। এখানে পায়ের চিহ্ন চেয়ে দেখুন।"

‡ লখাই বলিল "ছাগল নয়, ছাগল নয়। এগুলি হরিণের পদচিহ্ন। রাত্রিতে পাহাড় থেকে হরিণের পাল ধানের ক্ষেতে পড়েছিল। হরিণগুলা আপনার ক্ষেতের একটীও ধান রাখ্‌বে না। আপনি চাষ কর্‌তে পার্‌বেন না। আমি মিছামিছি গতর খাটালাম।"

* "প্রভু, আপনাকে একথা বল্‌তে আমি ভুলে গিছ্‌লাম

করা অসম্ভব। বন্যবরাহের উপদ্রব এবৎসর হয় নাই; কিন্তু বন্যহস্তীর উপদ্রব হইতে পারে। যদি বন্যহস্তী আসে তাহা হইলে ফসল রক্ষা করা কঠিন কার্য্য হইবে। কাহারও হস্তী মারিবার যো নাই। সে বৎসর ঝালদ্যার নিকটে বান্দ্‌শার পাহাড়ে একটা হাতী মারিয়া একটী লোক তিনমাস ফাটকে গিয়াছিল। জ্যোৎস্নাময় নিশীথে ময়ূরের পাল পাকাধানের ক্ষেতে নামিয়া শস্য নষ্ট করে। দিনের বেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী ধানের ক্ষেতে নামে। এখন ধান পাকিবার সময় হইয়াছে, আর ধানের শত্রুরাও দেখা দিয়াছে। লখাই এত "গতর" খাটাইয়া ধানের আবাদ করিল; কিন্তু হরিণের পাল এক রাত্রিতেই তিন বিঘা জমীর ধান সাবাড় করিয়াছে! ইহা দেখিয়া লখাইয়ের মনে বড় নৈরাশ্য জন্মিয়াছে। এখন গ্রামের প্রজাদের সহিত যুক্তি করা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া যদি কোনও সদুপায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে, এই বৎসর ফসল বাঁচিবে; নতুবা ফসল রক্ষার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

লখাই সর্দ্দারের কথা শুনিয়া, ক্ষেত্রনাথের মুখ বিশুষ্ক হইল। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষেত্রনাথে কত কষ্টে ও কত যত্নে এত শস্য উৎপন্ন করিলেন; তিনি ও মনোরমা তাঁহাদের শস্যপূর্ণ ভাণ্ডারের কল্পনা করিয়া মনে কত আশা ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন; সহসা এই অচিন্তিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ উপস্থিত! ক্ষেত্রনাথ বুঝিলেন, এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ না করিলে, তাঁহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইবে, এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার ভয়ানক দারিদ্র্যকষ্টে পড়িবেন। মাঠের মাঝে বসিয়া বসিয়া ভাবিলে আর কি হইবে? গ্রামের মণ্ডল ও প্রজাদিগকে ডাকাইয়া উপদ্রব-নিবারণের একটি উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়া ক্ষেত্রনাথ লখাইকে বলিলেন "লখাই, তুমি গ্রামের মণ্ডল ও মাতব্বর প্রজাদের ডেকে 'কাছারী-বাড়ী' নিয়ে এস। আমরা সেখানে যাচ্ছি।" নগেন্দ্র গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে পিতাকে বলিল "বাবা, আমাদের গোটাদুই বন্দুক কিনে আন্‌লে হয় না? আর মাচা বেঁধে রাত্রিতে পাহারার বন্দোবস্তও কর্‌লে হয় না?" কিন্তু নগেন্দ্রনাথের কোন কথাই ক্ষেত্রনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ধীরপাদক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন, দ্বিতলের বারাণ্ডায় মনোরমা উৎসুকনয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। ক্ষেত্রনাথের চক্ষুর সহিত মনোরমার চক্ষু মিলিত হইবামাত্র ক্ষেত্রনাথ মস্তক অবনত করিলেন এবং চিন্তাপূর্ণ ম্লানমুখে বৈঠকখানায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে লখাই সর্দ্দারের সহিত বেচন মণ্ডল, ফেলারাম মণ্ডল, গোবিন্দ সর্দ্দার, হরাই মাহাতো প্রভৃতি প্রায় পঁচিশ জন প্রজা কাছারী বাটীতে উপস্থিত হইল। লখাই সর্দ্দার পথেই তাহাদিগকে সমস্ত ব্যাপার বলিয়াছিল। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে কেন আহ্বান করিয়াছেন, তাহা আর খুলিয়া বলিতে হইল না। হরিণের উপদ্রবের কথা শুনিয়া তাহাদেরও মনে ভয় ও ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনার পর স্থির হইল যে, হরিণ তাড়াইবার জন্য পাহাড়ের কোলে কোলে চারিদিকে দশটি টঙ্গ্‌ বা মাচা বাঁধিতে হইবে; তন্মধ্যে ক্ষেত্রনাথ তিনটি মাচা বাঁধিবেন, আর অবশিষ্টগুলি প্রজারা বাঁধিবে। প্রজাগণ প্রতিরাত্রিতে পর্য্যায়ক্রমে এবং ক্ষেত্রনাথের মুনিষেরাও রাত্রিকালে মাচায় থাকিয়া শস্যক্ষেত্রের পাহারা দিবে। রাত্রিতে প্রতিপ্রহরে দুইটী মঞ্চ হইতে যুগপৎ নাগরা বা ধামসা বাদিত হইবে। যদি হস্তী আইসে, তাহা হইলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া সকল মঞ্চ হইতে যুগপৎ নাগ্‌রা বাজাইতে হইবে। সকল মঞ্চ হইতে একেবারে নাগরা বাজিয়া উঠিলে, গ্রামের লোকেরাও বুঝিতে পারিবে যে, হস্তী আসিয়াছে, এবং তাহারাও হস্তী তাড়াইবার উপায় অবলম্বন করিবে। গ্রামের মধ্যে কেবল দুইটি বন্দুক আছে; ক্ষেত্রনাথ আরও দুইতিনটি বন্দুকের পাস লইয়া বন্দুক ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উপস্থিত, ক্ষেত্রনাথ ও প্রজাদের যে আউশ ধান্য পাকিয়াছে, তাহা দুইএক দিনের মধ্যেই কাটিয়া গৃহে আনা কর্ত্তব্য।

এইরূপ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের পর সভা ভঙ্গ হইলে, ক্ষেত্রনাথ সেইদিনই বন্দুকের পাসের জন্য পুরুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি লখাই সর্দ্দারকে মাচা বাঁধিতে ও ধান কাটিতে উপদেশ দিলেন। লখাইও তৎক্ষণাৎ সমস্ত কার্য্যের উদ্যোগ করিবার জন্য তৎপর হইল।

সমস্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া, ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মনোরমা নগেন্দ্রের মুখে উপস্থিত বিপদ ও আশঙ্কার কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। অবগত হইয়া অবধি তিনিও চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রোদনও করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল। ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া মনোরমা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না; তাঁহার চক্ষু দুটী অশ্রুভারে ছলছল্ করিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে সহসা টস্‌টস্ করিয়া দুই চারি ফোঁটা

জল পড়িবামাত্র তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চল দ্বারা চক্ষু দুটী আবৃত করিলেন।

ক্ষেত্রনাথ মনোরমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহস ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন "ও কি গো! তুমি যে একেবারে ব'সে পড়েছ? অত ভাব্‌লে কি হবে? বিপদ এলেই তার প্রতীকার কর্‌তে হবে। অল্পেই হাল ছেড়ে এলিয়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন? দুঃখ ব্যতীত কখনও সুখ হয় না। ভগবানের রাজ্যের নিয়মই এইরূপ। গোলাপ ফুলটি তুল্‌তে গেলেই হাতে কাঁটা লাগে; পদ্মফুলের মৃণালেও কাঁটা আছে। তুমি কিছু ভেবো না। হরিণগুলোর উপদ্রব যা'তে নিবারণ কর্‌তে পারি, তারই উপায় করা যাচ্ছে। এখন অন্ততঃ তিনটি বন্দুক কিনে আন্‌তে হবে। তার জন্য আজ আমি পুরুলিয়া যাব। পুরুলিয়া হ'তে সম্ভবতঃ কল্‌কাতাও যাব। কল্‌কাতা না গেলে বন্দুক কোথায় পাব? তোমরা দুই তিন দিন সাবধানে থাক্‌বে।"

মনোরমা স্বামীর বাক্য শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন এবং গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

বল্লভপুর হইতে গো-যানে ষ্টেসনাভিমুখে যাইতে ক্ষেত্রনাথ সুখের পথে কণ্টক এবং সিদ্ধির পথে বাধা বিঘ্ন ও অন্তরায়ের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের এরূপ বিধান কেন, তাহাও তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া বুঝিলেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্যই পরমেশ্বরের এই সুব্যবস্থা। বাধা বিঘ্ন না পাইলে, মনুষ্যের শক্তি জাগরিত ও স্ফূরিত হয় না। বাধা বিঘ্ন দেখিয়া ভয় পাওয়া বা নিরাশ হওয়া কাপুরুষতা মাত্র। নৈরাশ্যের মধ্যেও আশা দেখিতে হইবে, বিপদের সময়েও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে, এবং বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য বীরদর্পে তাহাদের সম্মুখীন হইবে। রণে ভঙ্গ দিলেই মনুষ্যত্ব গেল। বাধা বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যদি প্রাণও যায়, তাহাও ভাল। কেননা, তাহাতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয় না; বরং সেইরূপ মরণেই প্রকৃত জীবনলাভ করা যায়।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষেত্রনাথের মন হইতে অন্ধকার সরিয়া গেল; তাঁহার হৃদয়ের উপর দুশ্চিন্তার যে গুরু ভার চাপিয়াছিল, তাহাও অপসৃত হইল। সন্ধ্যা সমাগমে পথপার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যসমূহ নানাজাতীয় বিহঙ্গমের সুমধুর কলরবে সহসা ঝঙ্কৃত ও মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রনাথ যেন তাঁহার অন্তর্জ্জগতের সহিত এই বহির্জ্জগতেরও সহানুভূতি অনুভব করিলেন।

যথাসময়ে ট্রেনে পুরুলিয়াতে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রনাথ তাঁহার বন্ধু সতীশবাবুর বাসায় গেলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার পরিবারবর্গের, বিশেষতঃ কৃষিকার্য্যের জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষেত্রনাথ সকল বিষয়ের একও কুশল জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কার্পাসক্ষেত্রের ি বলিতে লাগিলেন। কার্পাসের চারা গাছগুলি হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া সতীশবাবু যারপরনাই ন্দিত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এ বৎসর ফসলই ভাল হবে, এইরূপ আশা করা যায়। কা যে ভাল হবে, তা মনে হচ্ছে। কিন্তু হরিণ ও হ বড় উপদ্রব হয়েছে। গতকল্য একপাল হরিণ ধ ক্ষেতে প'ড়ে প্রায় তিন বিঘা জমীর ধান খেয়ে ফে এখন এই উপদ্রব নিবারণ কর্‌তে না পার্‌লে, ফসলই বাঁচাতে পার্‌বো না। তার উপায় কি করা বল দেখি?"

সতীশচন্দ্র এই প্রদেশের অবস্থা সবিশেষ জানি না। সেই কারণে, তিনি কোনও প্রকৃষ্ট উপায়ের বলিতে পারিলেন না। তখন ক্ষেত্রনাথ তাঁহার প্রজ সহিত যুক্তি করিয়া যে যে উপায় স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে বলিলেন। সতীশচন্দ্র সেই উপায়সমূহের অনুমোদন করিলেন। তখন ক্ষেত্রনাথ বলিলেন " ডেপুটী কমিশনারের কাছে যাতে তিনটি বন্দুকের পাই, তা ক'রে দিতে হবে।" সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ করিয়া বলিলেন "কমিশনার সাহেব কা'কেও বন্দু নূতন পাশ দিতে একেবারে নারাজ। কিন্তু কাল স তুমি আমার সঙ্গে তাঁর সহিত দেখা কর্‌তে চল। কার্পাসের চাষের ক্ষতি হবে ব'লে, তোমাকে দেওয়াতে পার্‌ব, এইরূপ আশা করি!"

পরদিন প্রভাতে উভয়েই ডেপুটী কমিশনার সা সঙ্গে দেখা করিলেন। ক্ষেত্রনাথের পরিচয় পা বিশেষতঃ তিনি বিদেশীয় কার্পাসের বীজ বপন ক কার্পাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অ হইয়া, সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন নাথ তাঁহাকে হরিণ ও বন্য জন্তুর উপদ্রবের কথা লেন এবং ফসল রক্ষার জন্য তিনটি বন্দুকের পা প্রার্থনাও জানাইলেন। ডেপুটী কমিশনার বলি "পুলিশে সবিশেষ অনুরোধ না করিলে, আমি কাহা পাশ দিই না। কিন্তু আপনি যখন বিদেশীয় কার্পা চাষ করিতেছেন, এবং সতীশ বাবুও আপনাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, তখন আপনাকে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনার কা কৃষি কিরূপ হইতেছে, তাহা আমি মফঃস্বল পরিদর্শ সময় স্বয়ং দেখিয়া আসিব। যে বন্দুকে হাতী মারা সে বন্দুকের পাশ আমি আপনাকে দিব না। হ আসিলে, কোনও রূপে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিবে

আপনাদের ঐ অঞ্চলে বাঘও আছে। যদি বাঘ-শীকার করিবার সুবিধা থাকে, আমাকে সংবাদ দিবেন। আজ প্রথম কাছারীতে আপনি আমার এজলাসে গিয়া পাশের জন্য দরখাস্ত করিবেন। আমি পাশ দিবার জন্য হুকুম দিব।"

ক্ষেত্রনাথ সেই দিনই বন্দুক ক্রয়ের নিমিত্ত পাশ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইলেন। এবং সেখানে দেঁড়শত টাকা মূল্যের তিনটি টোটাদার বন্দুক ও প্রচুর সংখ্যক ফাঁকা ও গুলিভরা টোটা লইয়া চতুর্থদিনের প্রাতঃকালে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

হেমকণা

ব্রাহ্মণ আমাকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ করিয়াছিল যে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবে অনুভবে বুঝিতে পারিতেছিলাম যে সে দ্রুতপদে নগর পরিত্যাগ করিতেছিল। নগরের কোলাহল পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ব্রাহ্মণ নীরবে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করিল "কে যায়?" বৃদ্ধ বলিতে যাইতেছিল "ব্রাহ্মণ" কিন্তু কি ভাবিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বলিল "পথিক"। দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "পথে আমার একটা কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দেখিয়াছ?" বৃদ্ধ চলিতে চলিতে উত্তর করিল "না।" তাহার পর বোধ হইল ব্রাহ্মণ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, নাবিককে ডাকিয়া তাহার নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইল, কিন্তু পরপারে যাইয়া তাহার পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করিল। নাবিক কোন মতে ছাড়িল না, সে বলিল "পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিয়াছি বটে কিন্তু এখন আর ছাড়িব না, তুমিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, তবে আমি বিনামূল্যে কেন তোমার জন্য পরিশ্রম করিব?" বৃদ্ধ বাধ্য হইয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে তাম্রখণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে প্রদান করিল এবং অনুচ্চ স্বরে নাবিককে গালি দিতে দিতে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূরে গ্রামের প্রান্তে কতকগুলি বালক বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা দূর হইতে বৃদ্ধকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদিগের মধ্যে যাহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সে বলিল "ব্রাহ্মণ আসিতেছে তাহাতে ভয় কি, ব্রাহ্মণেরা এখন আর ক্রুদ্ধ হইলে মনুষ্য দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে না, কারণ রাজা উঁহাদিগের দেবত্ব অপহরণ করিয়াছেন।" বৃদ্ধ নিকটে আসিয়া বলিল আমাকে পথ ছাড়িয়া দেও। পূর্ব্ব-পরিচিত বালক উত্তর করিল, "অনেক পথ পড়িয়া রহিয়াছে চলিয়া যাও।" বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বঁলিয়া উঠিল "আমি কে তা জানিস্?" বালক দূরে সরিয়া যাইয়া বলিল "জানি। তবে রাজার আদেশে রাজকর্ম্মচারীরা গ্রামের প্রান্তে কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া তবে ক্রুদ্ধ হইও।" বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন স্থানে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে?" বালক উত্তর করিল "গ্রামের উত্তর সীমার প্রস্তরখণ্ডের উপরে।" বৃদ্ধ ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে চলিল, দেখিল গ্রামসীমার নূতন প্রস্তরখণ্ডের উপরে কে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে "যাহারা জম্বুদ্বীপে দেবতা বলিয়া পূজিত হইত তাহারা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।" বৃদ্ধের মস্তক বোধ হয় ঘূর্ণিত হইতেছিল, কারণ সে হঠাৎ ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া রাজপথে ফিরিয়া আসিল এবং গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। পথে ব্রাহ্মণের দুই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তৃতীয় দিনে প্রথম প্রহরে ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইল। সে দেখিল তাহার গৃহের সম্মুখে অধিকাংশ গ্রামবাসী সমবেত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল এবং জানাইল যে তাহার পুত্র গ্রামান্তর হইতে দুইটি ছাগশিশু ক্রয় করিয়া আনিয়াছে সেই জন্য ধর্ম্মমহামাত্রের আদেশে রাজপুরুষগণ তাহা উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার পুত্র রাজকর্ম্মচারীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?" একজন প্রতীহার উত্তর দিল "যজ্ঞের জন্য পশু আনিয়াছে সেইজন্য ইহাকে বন্ধন করিতে আসিয়াছি।" বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমি, আমার পিতা, আমার পিতামহ এবং তাহার পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যজ্ঞকালে যথার্থ পশু আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অপরাধ হয় নাই, অদ্য ইহা কি বলিয়া অপরাধশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইল?" কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "রাজার আদেশে।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "আদেশ কোথায়?" কর্ম্মচারী বিরক্ত হইয়া কহিল, "গ্রামসীমায় যাইয়া দেখিয়া আইস।" কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধ বস্ত্রাঞ্চল হইতে আমাকে বাহির করিল এবং রাজকার্ম্মচারীকে তাহা প্রদান করিয়া পুত্রের বন্ধনভয় দূর করিল। রাজপুরুষ সুবর্ণলাভ করিয়া হৃষ্ট মনে ছাগদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার নূতন কলেবর গ্রহণ করিয়াছি। আমার আকার সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে

চতুষ্কোণ ছিলাম, এখন গোলাকার হইয়াছি। যে সুবর্ণবণিক সুবর্ণ-রেণু হইতে আমাকে মুদ্রার আকার প্রদান করিয়াছিল সে এখন দেখিলে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। পূর্ব্বে যত গ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছি সকল স্থানেই সুবর্ণকারগণ আমার অঙ্গে ইচ্ছামত চিহ্ন লাগাইয়া দিত। এখন আর তাহা করিবার উপায় নাই। আমার একপৃষ্ঠে যবন রাজার মুখ ও অপর পৃষ্ঠে যাবনিক ভাষায় ও অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি আছে। আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিলে সুবর্ণবণিকগণ এখন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। মুদ্রা চিহ্নিত করিলে পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মূল্য বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ হ্রাস হইয়া থাকে।

মৌর্য্যাধিকার হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উৎকোচ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমাকে তাহার উত্তমর্ণের হস্তে প্রদান করিয়াছিল; উত্তমর্ণ তাহার দেয় রাজকরের অংশস্বরূপ আমাকে শৌল্কিকের হস্তে প্রদান করিয়াছিল। নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় পাটলিপুত্রে রাজকোষে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। তখন গিরিমণ্ডিত জনশূন্য রাজগৃহ নগরে অশোকের মৃত্যু হইয়াছে। সিংহাসন লইয়া সম্রাটের পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে ঘোরতর গৃহবিবাদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অবসর পাইয়া দূরস্থিত প্রদেশ সমূহের শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। সীমান্তবাসী অবিজিত জাতিসমূহ গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করিয়া লইতেছিল, প্রদেশে প্রদেশে যথারীতি রাজস্ব আদায় হইত না, সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজকোষ শীঘ্রই শূন্য হইয়া গেল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যবনগণ পুনরায় উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। হীনবল শাসনকর্ত্তাগণ পরাস্ত হইয়া সাহায্যের জন্য পাটলিপুত্রে রাজসকাশে আবেদন প্রেরণ করিল। মন্ত্রণা-সভায় স্থির হইল যে যবনগণ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে, তাহারা অর্থলাভ করিলেই সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, অতএব ভাণ্ডার হইতে পুরুষপুরে সুবর্ণ প্রেরণ করা হউক। শূন্যপ্রায় রাজকোষ হইতে অবশিষ্ট সুবর্ণগুলি সংগৃহীত হইয়া রাজসভায় আনীত হইল। সম্রাটের সম্মুখে শকটে আরোহণ করিয়া রক্ষীপরিবৃত হইয়া পাটলিপুত্র হইতে পুরুষপুরে চলিলাম। একবার যবনের নিকট হইতে লুণ্ঠিত হইয়া মগধে আসিয়াছিলাম, আবার মগধ হইতে উৎকোচ স্বরূপ যবনের হস্তে চলিলাম। যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথেই ফিরিয়া চলিলাম। দেখিলাম দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; গ্রামে গ্রামে প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; জলাভাবে অন্নাভাবে মারীভয়ে লোকে গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় করিতেছে। কর্ষণাভাবে উর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহ বনে প হইতেছে, কৃষকবর্গ হলচালন পরিত্যাগ করিয়া লুণ্ঠ অবলম্বন করিতেছে, দেশ ক্রমশঃ শ্মশানে পরিণত হইং

বারাণসী ও কান্যকুব্জ পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমাি চলিয়াছি। শকটগুলি ধীরে ধীরে ভাগীরথী-তী পথে চলিয়াছে। রক্ষকগণ কতক অগ্রসর হইয়া গি কতক বা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, চকিতের ন্যায় দল অস্ত্রধারী পুরুষ শকটগুলি ঘিরিয়া ফেলিল, চাল পলায়ন করিল অথবা নিহত হইল, রক্ষীগণ শকট আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা শকটচালকগণের স্থান অি করিয়া রাজপথ হইতে অপসৃত হইল। রক্ষীগণ ফি আসিলে তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য একদল অে করিতে লাগিল অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ আমাদিগকে রাজপথ পরিত্যাগ করিল; প্রস্তর ও বন অতিক্রম ক আমাদিগের সহিত অহিচ্ছত্র নগরে প্রবেশ করিল।

নগরের প্রান্তে দেবমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া এব দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বৃদ্ধ তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করি ছিল। দস্যুগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। জিজ্ঞাসা করিল "অবশিষ্ট লোক কি নিহত হইয়াছে একজন উত্তর করিল "না—তাহারা রক্ষীদিগকে দিবার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছে।" শকট হই সুবর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ বস্ত্রাধারগুলি বৃদ্ধের সম্মুখে রা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দস্যুদলের অবশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগের নেতা আি বৃদ্ধকে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "ক সিদ্ধ হইয়াছে?" উত্তর হইল "হাঁ।"

"কেহ নিহত হইয়াছে?"

"না।"

"রক্ষীগণ কি করিল?"

"শকট চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া যুদ্ধের ভাণ করি পলাইল।"

"কোন পথে গেল?"

"কান্যকুব্জের দিকে।"

"পুষ্যমিত্র, তুমি সেনাপতি হইবার উপযুক্ত পা অদ্য হইতে তুমি সেনাপতি হইলে। আবশ্যক বিবেচ করিলে আমার আদেশের অপেক্ষা করিও না।"

যুবক প্রণত হইল, উত্তর করিল "ব্রাহ্মণ হই কিরূপে যুদ্ধ ব্যবসায় গ্রহণ করিব?"

"ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাপ নাি বেণের কথা স্মরণ কর।" পুষ্যমিত্র পুনরায় প্রণত হই তখন বৃদ্ধের আদেশে দস্যুগণ আমাদিগকে ধনাগা লইয়া গেল।

লক্ষ সুবর্ণের অধীশ্বর হইয়া ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র যে সেনাদল গঠন করিল, মৌর্য্য সম্রাটের অগণিত সেনা আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। মৌর্য্যসেনা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। মৌর্য্য সম্রাট উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির জন্য ব্যস্ত হইলেন। পুষ্যমিত্র অন্তর্বেদীতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া মৌর্য্য সাম্রাজ্যের মহাসেনাপতি আখ্যা লাভ করিল। পুষ্যমিত্রের হস্তে শেষ মৌর্য্য সম্রাট বৃহদ্রথ কিরূপে নিহত হইয়াছিল তাহা ভট্ট ও চারণগণ এখনও গান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের ধনভাণ্ডার হইতে এক সৈনিকের হস্তে এক তণ্ডুল-বিক্রেতার বিপণীতে আসিলাম, তাহার নিকট হইতে নগরহারবাসী এক বণিকের হস্তে পতিত হইলাম। তাহার দুর্গন্ধময় দেহের মলিন আচ্ছাদনের অভ্যন্তরে চর্ম্মপেটিকায় আবদ্ধ হইয়া মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিলাম। বহুদিন চর্ম্মপেটিকায় আবদ্ধ থাকিয়া যেদিন মুক্ত হইলাম সেই দিন দেখিলাম তুষারমণ্ডিত শৈলশ্রেণীবেষ্টিত উপত্যকায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চীনাংশুকের পটমণ্ডপের নিম্নে রাজসভা বসিয়াছে। কতকগুলি সুবর্ণময় দণ্ডের উপরে পটমণ্ডপ স্থাপিত, তাহার নিম্নে কুরুবর্ষের বহুমূল্য আস্তরণের উপরে ক্ষুদ্র সিংহাসনে রজতাভ চর্ম্মমণ্ডিত সশস্ত্র যবনরাজ বসিয়া আছেন। পটমণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য বর্ম্মাবৃত সেনা দাঁড়াইয়া আছে এবং সিংহাসনের চারিপার্শ্বে যবন সেনানায়কগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছেন। রাজার সম্মুখে আমার অধিকারী বণিক নতমুখে দণ্ডায়মান আছে। যবনরাজ তাহাকে আর্য্যাবর্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—সে দেশ কতদূর বিস্তৃত, পথে কত নদী ও পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে হয়, দেশে সুবর্ণের আকর আছে কিনা, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের সৈন্যসংখ্যা কত, তাহাদিগের শিক্ষা কিরূপ? বণিক ধীরে ধীরে যবনরাজের প্রশ্নের উত্তর দিল। তাহার পর রাজাদেশে একজন যবনসেনা তাহাকে শিবির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আমরা পটমণ্ডপের নিম্নে আস্তরণের উপরে পতিত রহিলাম। একজন সেনানায়ক আমাদিগকে হস্তে লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের মুদ্রাগুলিকে বাছিয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ করিতেছিল। অধিকাংশ সুবর্ণ মুদ্রাই আকারে প্রায় চতুষ্কোণ এবং প্রত্যেকের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত আছে, প্রত্যেক মুদ্রা যে যে গ্রাম ও নগরে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদিগের শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহকুলিক নিগমের চিহ্ন তাহার উপরে অঙ্কিত হইয়াছে এবং ইহা তাহার অকৃমতার নিদর্শন। মুদ্রা সমূহের উপরে পাটলিপুত্রের সূর্য্য, বারাণসীর শিবলিঙ্গ, কৌশাম্বীর স্বস্তিক চিহ্ন, মথুরার নাগপাশ, জালন্ধরের বোধিবৃক্ষ, তক্ষশিলার হস্তী, পুষ্কলবতীর নগরদেবতা প্রভৃতি সর্ব্বজনচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। তাহার পর একজন পরিচারক আসিয়া আমাদিগকে পুনরায় চর্ম্মপেটিকায় আবদ্ধ করিল এবং দ্বিতীয় পট্টাবাসস্থিত কোষাগারে লইয়া গেল। কিছুদিন অশ্বপৃষ্ঠে যবন সেনার সহিত শিবিরে শিবিরে ভ্রমণ করিলাম। ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আসিয়াছি। সে দেশের নাম বাহ্লিক, তাহার পশ্চিম সীমায় ঐরাণ দেশ অবস্থিত। সুদূর যোনদ্বীপে যবন সম্রাটের রাজধানী অবস্থিত, সেস্থান হইতে রাজধানী ছয়মাসের পথ। চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত যবন সম্রাটের প্রপৌত্র তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দৃঢ় শাসনের অভাবে ঐরাণের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী পারদ জাতি এবং বাহ্লিকপ্রবাসী যবনগণ তখন বিদ্রোহী হইয়াছে। অতি অল্প কাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান যবন সম্রাটের পিতা সম্রাট তৃতীয় আন্তিয়ক ঐরাণের ও বাহ্লিকের পার্ব্বত্য প্রদেশে পরাজিত হইয়াছেন। তাহার পর বাহ্লিকে ও শকদ্বীপে সম্রাটের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি দিয়দত বা দেবদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। রাজ্যের অধিকার লইয়া যবনরাজ দিয়দত ও সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি এবুক্রতিদ তখনও যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন। এই যুদ্ধ শেষ হইলেই দিয়দত স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিবেন, কারণ যাবনিক প্রথা অনুসারে ইহাই স্বাধীনতার একমাত্র চিহ্ন। যখন এই বিদ্রোহী সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে দুইদল যবন সেনা বাহ্লিকের অধিকারের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল তখন বাহ্লিকবাসী আর্য্যগণের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না। মহানদীর দক্ষিণতীর হইতে বাহ্লিকের পর্ব্বতমালার পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি সর্ব্বদাই শস্যশ্যামলা; দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। বাহ্লিকের জনপদনিবাসীগণ উভয় পক্ষের সেনার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া সমতলভূমির পরিবর্ত্তে পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতশিখর সমূহ বহুকাল যাবত শ্বেতকায় আর্য্যগণের বাসভূমি হইয়াছিল। সহস্র বৎসর পরেও তুষারের লীলাক্ষেত্রের নিম্নে শ্বেতকায় আর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইত। তখন বাহ্লিকের সমতলভূমি নাসিকাবিহীন কাম্বোজ জাতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ শেষ হইতে হইতে বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। হেমন্তে তুষারপাতে শৈলশ্রেণী হইতে তাড়িত হইয়া উভয় পক্ষের যবন সেনা সমতলভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জনশূন্য গ্রাম ও নগর পরিভ্রমণ করিয়া যবনরাজ দিয়দত ধ্বংসোন্মুখ বাহ্লিক নগরে দুরন্ত শীতঋতু যাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিলে বিপক্ষ সেনা আসিয়া

নগর-পরিখার বহির্দ্দেশে শিবির স্থাপন করিল। কিছু দিনের জন্য বাহ্লিক নগরী পুনরায় মানবের আবাসস্থান হইল। দিয়দত রাজধানীতে আসিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কনে মনঃসংযোগ করিলেন। গ্রীষ্ম ও বর্ষার কয়মাস লুণ্ঠনে যে মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে সুবর্ণের বিশুদ্ধতার জন্য আমরাই সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাচিত হইলাম। যবনগণের মুদ্রাঙ্কনের প্রথা বিভিন্ন। প্রথমতঃ তাহারা চতুষ্কোণ সুবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করে না। তাহাদিগের সমস্ত মুদ্রাই গোলাকার। সেইজন্য তাহারা গলিত সুবর্ণ গোলাকার মৃণ্ময় পাত্রে নিক্ষেপ করে এবং পরে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া লয়। তাহার পর লৌহনির্ম্মিত মুদ্রার ছাঁচ সুবর্ণ গোলকের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে স্থাপন করিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা আঘাত করে। দ্বিতীয়তঃ যবনদিগের মুদ্রা বণিকগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় না। রাজাদেশে রাজ-কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া থাকে। বণিকগণ মূল্য দিয়া রাজকোষ হইতে সুবর্ণ মুদ্রা ক্রয় করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ যবনরাজ্যে বণিকগণ বা বণিকসম্প্রদায়ের নিগম সমূহ মুদ্রায় অপর কোন চিহ্ন অঙ্কিত করিলেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে।

আমি যখন মুদ্রাঙ্কিত হইয়া নূতন কলেবর গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ভাবিয়াছিলাম যে আমার ন্যায় সুন্দর জগতে আর কিছুই নাই, আমার সেই দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের উজ্জ্বল গৌরকান্তি দেখিলে তোমরাও মোহিত হইয়া যাইতে। তখন আমার এক পৃষ্ঠে রাজার শিরস্ত্রাণ-পরিহিত মস্তক ও অপর পৃষ্ঠে শ্যেন-হস্তে যবন দেবতা ও রাজার নাম অঙ্কিত ছিল নূতন সুবর্ণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ্য সভায় রাজসকাশে আনীত হইলে সভাসদ্‌বর্গ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল বটে কিন্তু দুই একজন প্রাচীন শুক্লকেশ সেনাপতি তেমন আস্থা প্রদান করিল না। তাহারা কহিল তাহাদিগের বাল্যে যোনদ্বীপে তাহারা সুবর্ণ মুদ্রার যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিয়াছে, নবাঙ্কিত মুদ্রার সৌন্দর্য্য তদপেক্ষা হীন। তাহাদিগের মধ্যে একজনের গলদেশে সুবর্ণ-শৃঙ্খল-বদ্ধ দিগ্বিজয়ী যবন-রাজ অলসন্দের একটি মুদ্রা লম্বিত ছিল, সে তাহার সহিত আমার তুলনা করিয়া দেখাইল যে নূতনত্বের মাধুর্য্য বর্জ্জন করিলে অলসন্দের মুদ্রা আমা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন যাবনিক মুদ্রার সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে ভাষা অক্ষম। তাহা দর্শন করিয়া অনুভব করিতে হয়, বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। যবনরাজ প্রকাশ্যে প্রাচীন সেনাপতিগণের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না, কারণ তখনও শক্রসেনা নগর-তোরণের বহির্দ্দেশে উপবিষ্ট ছিল; কিন্তু অন্তরে তাহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। নূতন সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ সৈনিক-গণের মধ্যে বিতরিত হইল। তাহারা কর্কশ যা[বনিক] ভাষায় জয়ধ্বনি করিয়া জনশূন্য নগর প্রতিধ্বনিত ক[রিয়া] তুলিল। পরিখার বাহিরে শক্রসেনা সে জয়ধ্বনি [শুনিয়া] কম্পিত হইল। গুপ্তচর যখন আসিয়া সংবাদ দি[ল যে] রাজা দিয়দত অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং নিজনামে মু[দ্রা] করিয়া তাহা সৈন্যদলমধ্যে বিতরণ করিয়াছেন [তখন] তাহারা আশ্বস্ত হইল।

দিয়দত রাজ-উপাধি গ্রহণ করিলেও বাহ্লিক[বাসী]গণের দুর্দ্দশার অন্ত হইল না। যুদ্ধক্ষেত্রে দিয়[দতের] জীবনের অবসান হইল। প্রথম দিয়দতের পুত্র [দ্বিতীয়] দিয়দত বাহ্লিকের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছি[লেন] বটে, কিন্তু তাঁহাকেও অধিকদিন রাজ্যভোগ করিতে[ে হয়] নাই। অবসর পাইয়া এবুক্রতিদ স্বয়ং রাজো[পাধি] গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় দিয়দত নিহত হইলে তাঁ[হার] সেনাপতি এবুথদিম প্রথমে প্রভুর নামে, পরে [স্বয়ং] রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া নিজনামে রাজ্যশাসন ক[রিয়া]ছিলেন। এবুক্রতিদ ইতিমধ্যে বাহ্লিকের দক্ষিণস্থ [প্রদেশ]সমূহ জয় করিয়া স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছি[লেন]। অবশেষে এবুথদিমের অত্যাচার সহ্য করিতে না পা[রিয়া] বনবাসী বাহ্লিক জনপদগণ এবুক্রতিদের শরণাপন্ন হ[ইল]। এবুক্রতিদ তাহাদিগের সাহায্যে এবুথদিমকে পরা[জিত] ও নিহত করিলেন। বিংশতিবর্ষব্যাপী যুদ্ধের [পর] যবনরাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। বনবাসী বাহ্[লিক] জানপদগণ সমতলভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাহ্[লিকে] এবুক্রতিদের রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইলে তাঁ[হার] পুত্রদ্বয় দিগ্বিজয়ের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্[যায়]

পাণিগ্রহণ

(পুরাতন জাপানী কবিতা হইতে)

প্রসারিত হস্তখানি আজি ওগো লয়ে টানি,
উপাধান করি সুখে পারিগো ঘুমাতে,
একটি রাত্রির শুধু সুখের স্বপন লাগি,
এ পবিত্র শির মম পারি না বিকাতে,
বাহুখানি মূল্য যদি নাহি পাই হাতে।

শ্রীকালিদাস রায়।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(De La Mazeliereর ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার দ্বিতীয় রূপান্তরসাধন।

ষোড়শ শতাব্দী। সকল দেশেই এই যুগের সাধারণ লক্ষণ।—সামন্ততন্ত্রের অবসান, একাধিপত্য-শাসনমূলক বড় বড় রাজ্য।—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা।—সমুদ্রযাত্রা ও দেশ-আবিষ্কার।—বাণিজ্য। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে যোগস্থাপন।—ধর্ম্মসংস্কার।—ষোড়শ শতাব্দীর লোকদিগের অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষত্ব। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ। ভাগ্য-অন্বেষীর দল। সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত।—নূতন রীতিনীতি, নূতন মত ও বিশ্বাস।—সাহিত্য।—ধর্ম্ম।—পোর্ত্তুগীজ উপনিবেশ।—আগ্নেয় অস্ত্র।—ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা।—বড় বড় হিন্দু-রাজ্য ও মুসলমান রাজ্য।—মোগল সাম্রাজ্য।—প্রথম যুগ। আকবর। তাঁহার জীবন, তাঁহার চরিত্র। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে মিলন। ভারতীয় নবজীবন।—দ্বিতীয় যুগ। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও দলাদলি। আরংজেবের ধর্ম্মান্ধতা। অধঃপতন।

অনেকগুলি কারণে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়, আমরা তাহাকে নবজীবনের ভাব বলিব।

সমস্ত প্রাচীন মহাদেশে, রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্রমবিকাশ একই পথ অনুসরণ করে। বিশেষতঃ চীন ও রোমে, প্রথমে সামুদ্রিক জাতিরা বর্ব্বর জাতিদিগকে হটাইয়া দেয়, পরে আবার ঐ সামুদ্রিক জাতিরা বর্ব্বর জাতিগণকর্ত্তৃক বিজিত হয়। ঐ বর্ব্বরেরা সমস্ত রাজ্য বিধ্বস্ত করে। কিন্তু শেষে ঐ বর্ব্বর বিজেতৃগণ বিজিত-দিগের সভ্যতা গ্রহণ করে, এবং তাহারাও আবার মধ্য-এসিয়ার যাযাবর জাতিদিগকে তাড়াইয়া দেয়। প্রাচীন কালের লোকদিগের সহিত প্রথম-আক্রমণকারীদিগের সম্মিলনে যে-সকল নূতন জাতি গঠিত হয়,—নূতন আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত বলসঞ্চয় করিবার জন্য, বিসদৃশ উপাদানসমূহকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবার জন্য, আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সভ্যভব্য ও মার্জ্জিত করিয়া তুলিবার জন্য, ঐ-সকল নূতন জাতির দুই শতাব্দী-কাল লাগিয়াছিল। তাই দেখা যায়, মিংদের রাজবংশ, খৃষ্টান রাজ্যগুলি, অটোমান ও পারসীকদের রাজ্যসমূহ, ভারতের মোগলসাম্রাজ্য এবং তোকুগভদিগের সোগুন-আধিপত্য দুই শত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীভূত রাজ্যগুলির মধ্যে, সামন্ততন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও পুরোহিতের প্রাধান্য চিরকালের মত রহিত হইল। আভ্যন্তরিক শান্তির সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বজনের প্রতি প্রযুজ্য আইন সংস্থাপিত হইল; স্থায়ী সৈন্য প্রতিষ্ঠিত হইল; ইহাদের আগ্নেয় অস্ত্রে শত্রুদিগের অশ্বসৈন্য পরাস্ত হইল। সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে, সমৃদ্ধির পরিপুষ্টি হইল, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইল, কর্ম্মের একটা বড় রকম বিভাগ-ব্যবস্থা হইল, সর্ব্বপ্রকার শিল্পকলার ও সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ের উন্নতি হইল।

এতদিন যাহারা গৃহ-যুদ্ধে যশ সৌভাগ্যের অন্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা বহির্দ্দেশের দুঃসাহসিক ব্যাপারের দিকে চোখ ফিরাইল। এই-সকল ব্যাপার যথা:—ভাস্‌কো-ডা-গামার, ক্রিষ্টোফার কলম্বসের, কর্টিজের, সিজারের, পরে ফরাসিদিগের, ইংরাজদিগের, ওলন্দাজদিগের দেশাবিষ্কার ও দিগ্বিজয়; জাপানীদিগের, চিনীয়দিগের, তুর্কদিগের বিজয়াভিযান। এইরূপে সকল জাতির মধ্যে একটা যোগ নিবদ্ধ হইল, নূতন নূতন বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত হইল, বহুমূল্য ধাতুগুলির মূল্য হ্রাস হইল, আর্থিক উন্নতি নূতন পথে প্রধাবিত হইল, অভিজাতবর্গ দরিদ্র হইয়া পড়িল, সমৃদ্ধ বণিকগণের প্রভাব প্রতিপত্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নগরের লোকেরা এমন কি কৃষকেরাও পূর্ব্বাপেক্ষা সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে লাগিল।

দ্রব্যবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে, মতামতের বিনিময় হইল, জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইল, সমস্ত দেখিবার ও সমস্ত জানিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। বহিঃ-শান্তি, সমৃদ্ধি, কর্ম্ম-বিভাগ—এই সমস্তের দরুণ লোকেরা অতীতের সভ্যতা, শিল্পবিজ্ঞান, ও দর্শনের অনুশীলনে অবসর প্রাপ্ত হইল। ইহা হইতে যে লুপ্ত জ্ঞানচর্চ্চা নবজীবন লাভ করিল ষোড়শ শতাব্দীই সেই নবজীবনের যুগ।

সর্ব্বপ্রকার মানসিক শক্তি উত্তেজিত হওয়ায়, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ব্যবসায়ে, প্রতিভাবান্ লোকের আবির্ভাব হইতে লাগিল;—সেই সব লোক যাহাদের চরিত্র মধ্যযুগের রূঢ়ধরণের বিদ্যালয়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যাহাদের মন, এমন একটা কার্য্যক্ষেত্র চাহিতেছিল যাহা সামন্ত-তান্ত্রিক ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত। উহাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্য হইতে, এমন কি ইতরসাধারণ লোকদিগের মধ্য হইতে সমুত্থিত হয়। উহারা সেই-সব জনকজননীর সন্তান যাহারা যুদ্ধবিগ্রহে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই, যাহারা লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া ও ভোগসুখে নিমগ্ন হইয়া নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে নাই; এই প্রথম তাহারা চিন্তা করিবার, জ্ঞানঅর্জ্জন করিবার, কার্য্য করিবার একটা অবসর প্রাপ্ত হইল; এই অবসরটিকে উহারা আগ্রহের সহিত সাপটিয়া ধরিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর লোকদিগের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের হেতুনির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদের বলিতে

হয় যে উহা দুইটি হৃদয়-ভাবের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছিল :—সামন্ততান্ত্রিক আত্মমর্য্যাদা ও বিশ্বমানবতা।

মধ্যযুগে, নিম্নতম পদবীর অভিজাত ব্যক্তিও নিজ ভূমির অধিপতি; তিনিই আইনের প্রণেতা, এবং তিনিই আইনের প্রয়োগকর্ত্তা। তাঁহার বিরুদ্ধে অতি ক্ষুদ্র অপরাধও এই আইন-অনুসারে রাজদ্রোহের ন্যায় দণ্ডনীয়। যেমন রাজাদিগের মধ্যে, তেমনি সমান-পদবী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও সংগ্রামের দ্বারা অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারা মানমর্য্যাদাঘটিত বিরোধের মীমাংসা হইত। প্রথমে বিশেষরূপে অভিজাতবর্গের মধ্যে, তাহার পরে সৈন্য-দিগের মধ্যে, এবং তাহার আরও পরে সকলশ্রেণীর মধ্যে, এই আত্মসম্ভ্রমের ভাব আবির্ভূত হয়। শপেন-হৌয়ার বলেন, এই আত্মসম্ভ্রমের লক্ষণটির দ্বারা প্রাচীন আধুনিকের মধ্যে ভেদনির্ণয় করা যাইতে পারে। এই কথাটার মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রীক ও রোমকেরা, নিজ ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থকে, সমগ্র রাজ্যের স্বার্থের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছিল। গ্যয়টের কথা ধরিয়া বলা যাইতে পারে,—উহারা আপনাদিগকে সমস্তের একটা অংশ বলিয়া মনে করিত, আর সেই সমস্তটা কি?—না, তাহাদের নগর। সামন্ততান্ত্রিক একাধিপত্যের ভাব রক্ষা করিয়া, আধুনিকেরা সেই "সমস্তকে" আপনার মধ্যেই গড়িয়া তুলিতে চাহিল। যে-সকল ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনই মানুষের প্রথমকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেয়, সেই আত্মমুক্তির উপদেশের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মসম্ভ্রমের ভাবটিও আধুনিককালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির একটি প্রধান কারণ।

ষোড়শ শতাব্দীতে, আত্মসম্ভ্রমের সংস্কারটি মধ্যযুগেরই মত রূঢ়ধরণের,—এমন কি ভীষণ হিংস্রধরণের ছিল; কিন্তু যে-সকল বাধা ষোড়শ শতাব্দীর উন্নতির পথে অন্ত-রায়স্বরূপ ছিল, সে-সমস্ত এক-আঘাতেই ভূমিসাৎ হইয়া গেল। সৈনিক নিয়ম-শাসন ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত সামন্ততন্ত্রের পদমর্য্যাদামূলক শ্রেণীবিভাগও বিনষ্ট হইল। সকল দেশেই তখন বিশ্বাসের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যাইত :—বিশ্বমানবের প্রতি অবজ্ঞা, সেই সঙ্গে আপনার প্রতিও অবজ্ঞা, অধঃপতনের ধারণা, অতি ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য অনন্তকাল শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয়, কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্মান, ঈশ্বর অলৌ-কিক কাণ্ডের দ্বারা কখন কখন জগৎশৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করেন এই বিশ্বাস। কিন্তু বিদেশভ্রমণের প্রসাদে, অন্য জাতির সহিত জ্ঞানবিনিময়ের প্রসাদে,—লোকেরা যে-সকল বিদেশীয় জাতিকে উন্মত্ত বা বিষম অপরাধী জ্ঞান করিত, তাহাদের সভ্যতা তাহারা এক্ষণে জানিতে পারিল; বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে. অলৌকিককাণ্ডে সন্দেহ জন্মিল। ধনগর্ব্ব, শিল্পবিজ্ঞানের গর্ব্ব,—প্রথমে মানবসমষ্টিকে, ব্যষ্টি মানবকে দেবতারূপে দাঁড় করাইল। শি সৌন্দর্য্যের এই মত্ততা (humanism) "বিশ্বমান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই আত্মসম্ভ্রম ও "বিশ্বমানব সম্মিলনে এমন এক মানববংশ উৎপন্ন হইল যাহারা অথচ সুকুমার, দয়ালু অথচ নিষ্ঠুর, শিক্ষিত ও (যাহারা বর্ব্বরদিগের অপেক্ষাও বেশী রূঢ়, এবং সভ্যা অপেক্ষাও বেশী মার্জ্জিত।

***

যেমন য়ুরোপে তেমনি ভারতেও. ষোড়শ শত সেই একই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়

য়ুরোপের ন্যায় ভারতও বিশৃঙ্খলার আবর্ত্ত বাহির হইতে চাহিল। সামন্ততন্ত্রের টুকরা-ভাগের প্রাচীন রাজ্যসমূহকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, নূতন র সংগঠন থামাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই ভাগবাটো পদ্ধতি সকলের নিকটেই অপ্রিয় হইয়া উঠিল। সেই সময়ে আগ্নেয় অস্ত্র আবির্ভূত হয়। সহস্র সহস্র সে-মোটা বন্দুক ও শত শত সে-কেলে কামানের সুরক্ষিত গড়বন্দি স্থানের অন্তরালে অবস্থিত বাবরের যুদ্ধে রাজপুতের অশ্বসৈন্য বিমর্দ্দিত হইল। পঞ্চদশ ব্দীতে, সামন্ততন্ত্রাধীন ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি,—বাঙ্গালা, গু বাহ্‌মনী সাম্রাজ্য, গোলকণ্ডা, বিজাপুর—এই-সক রাজ্যের মধ্যে বিলীন হইতে আরম্ভ করিল। উত্তরা সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলি দিল্লীর একাধিপত্য করিল, এবং দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুরাজ্যগুলি, নগরের একাধিপত্য স্বীকার করিল। অ সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হইবার সম্ভাবনা হইল, কিন্তু ভারত, সমস্ত দেশের একছত্র রাজা বলিয়া কো রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিল না। তৈমুর- পৌত্র বাবরই ভারতের ঐক্যসাধন কার্য্য আরম্ভ (১৫২৬-১৫৩০)। তাঁহার মহাশক্তিশালী উত্ত কারিগণকর্ত্তৃক এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয় :—হুমায়ুন (৫৬),—পরে সের সা কর্ত্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), জাহাঙ্গির (১৬০৫-২৭ জাহান, (১৬২৭-৫৮), আরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)। পীয় রাজ্যগুলির ন্যায়, মোগলসাম্রাজ্যও বড় বড় '(রাজাদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধন করা আবশ্যক মনে এবং ছোট ছোট রাজাদিগেরও অনেক অধিকার রাখিত। এবং ভারতের নূতন জাতিগুলি এতটা হইয়া উঠিয়াছিল যে, সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য যে মিত্র-রাজ্যের (Federal) ভাব ধারণ করিল।

যে বৃহৎ বাণিজ্যব্যাপার পৃথিবীর সমস্ত জ সম্মিলিত করে, ভারতও সেই বৃহৎ ব্যাপারে যোগ

ছিল। অবশ্য, ভারতের নাবিকগণ, উপকূল ছাড়িয়া বেশীদুর যায় নাই (১)। ভারতের বণিকগণও ভারতের সীমান্ত ছাড়াইয়া বেশী দুর যায় নাই। বর্ণভেদপ্রথা তাহাদের কার্য্যোদ্যমকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মোগল, আফগান ও তুর্কদিগের স্বার্থবাহ বণিকের দল ছিল; উহারা পঞ্জাব, পারস্য ও মধ্য-এসিয়াকে যোগসূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের বাস্তব সমৃদ্ধি, উপকথার কাল্পনিক সমৃদ্ধি, সকল দেশের বণিককেই আকর্ষণ করিয়াছিল। আরবদিগের পরে পোর্টুগীজ, তাহার আরও পরে ওলন্দাজ, ইংরাজ, ও ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে গুজরাটে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমশিল্পের উন্নতি হইল, দেশের ধন সম্পদ বাড়িল, নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণীর পদবীতে আরোহণ করিল, জনসখ্যার বৃদ্ধি হইল। (২)

এই সময়েই, ভারতের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম, সম্মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, সকলেই মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবধর্ম্মসংস্কারকেরা একেশ্বরবাদের উপদেশ দিতে লাগিল, এবং বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। হিন্দুদিগের রমণীরা, মুসলমানদিগের রমণীদের ন্যায় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইল। আরবদের সংস্পর্শে, হিন্দুরা যাথাযথ্যের ভাবটি অর্জ্জন করিল, তথ্যের প্রতি উহাদের বেশী দৃষ্টি হইল। পারস্যের প্রভাবে উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মরুচি ও বীরভাবাপন্ন হইল। তুর্ক ও মোগলের নিকট শিক্ষা পাইয়া উহারা সৈনিক হইয়া উঠিল।

পক্ষান্তরে, মুসলমানদিগের মধ্যেও রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ঈষৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। জাতিভেদ স্থাপনের দিকে উহাদের একটু প্রবণতা পরিলক্ষিত হইল। অনেকে মন্দিরে ভজনা করিতে লাগিল। তাহারা যেরূপ তাহাদের পীরপয়গম্বরের পূজা দিতে লাগিল, তাহাদের নিকটে যেরূপ 'মানৎ' করিতে লাগিল, তাহা হিন্দুদের পৌত্তলিকতা হইতে অল্পই তফাৎ। ফকীরেরা যোগীদের মতই জীবন যাপন করিতে লাগিল। সুফীদিগের বিশ্বব্রহ্মবাদ ও যোগবাদ হিন্দুমতেরই প্রতিচ্ছায়া। এই দুই জাতির শিল্প ও সাহিত্য এরূপভাবে মিশিয়া গেল যে, দুই সভ্যতার মধ্যে কোন্ অংশটি প্রকৃতপক্ষে কাহার তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন হইল। পরে আরও নূতন নূতন ধর্ম্ম, ও নূতন নূতন সভ্যতা লোকের গোচরে আসিল; পার্সিরা জোরোয়াস্তারের মত সমর্থন করিতে লাগিল; পোর্টুগীজ পাদ্রিরা দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, পর্য্যটক ও ভাগ্য-অন্বেষীরা দলে দলে আসিতে লাগিল; তা ছাড়া, সকল কালের ও সকল দেশের গ্রন্থসকল অনূদিত হইতে লাগিল।

ষোড়শ শতাব্দাতে ভারতে, য়ুরোপের মত' অনেকগুলি বুদ্ধিমান ও সাহসী লোক আবির্ভূত হইয়াছিল, জাতিবৈচিত্র্য চারিত্রবৈচিত্র্যকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। প্রায়ই দেখা যায়, ভারতীয় সভ্যতা মৌলিকতাকে চাপিয়া রাখে; তাই এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের একটু বেশী ঔৎসুক্য হয়।

তৎকালে বাবর ও আকবরের ন্যায় মহামহিম অধিপতি এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতে শা-জাহান ও আরংজেব; ইঁহারা সকলেই নীতিকুশল রাষ্ট্রপরিচালক। বৈরাম নামক এক রূঢ়প্রকৃতি মোগল, আকবরের নাবালকত্বের কালে, প্রতিনিধির ক্ষমতা পরিচালন করিত:—বৈরাম ইতিপূর্ব্বে সমস্ত রাজবিদ্রোহকে শোণিতসাগরে ডুবাইয়া দেয়; পরে, যখন তাহার ছাত্র নিজ প্রভুত্বের দাবী করিল, তখন সে নিজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আবুল-ফজল ভারতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জাতিতে আরব। সূক্ষ্মরুচি সাহিত্যসেবক, বুদ্ধি ও চারিত্র্যে নমনীয়, যারপরনাই মুক্তহৃদয়, উদারপ্রকৃতি, বহুপ্রসূ গ্রন্থকার—মুসলমান-ভারত হইতে ওরূপ লোক ক্বচিৎ প্রসূত হইয়াছে। উক্ত দুই জনই গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হয়। ভারতীয় নবজীবন-যুগের রীতিনীতি য়ুরোপীয় নবজীবনযুগের রীতিনীতির মতই ভীষণ হিংস্র-ধরণের ছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে, তোদর-মল সেনা-নায়ক ও কোষ-সচিব বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন (তিনি পারস্য ভাষাকে সরকারী ভাষা করিয়াছিলেন); রাজপুত মান-সিং আকবরের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী সেনাপতি। ধর্ম্মসংস্কারকগণ,—যথা:—হিন্দুদিগের মধ্যে চৈতন্য, বল্লভ, নানক-শা; মুসলমানদিগের মধ্যে, স্বপ্নদর্শী শিয়া-সম্প্রদায়, সুফীগণ, অপ্রশাম্য সুন্নি-সম্প্রদায়; শেষ-বিচার-দিনের পর সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, ইংলণ্ডের 'প্যুরিট্যান'দিগের ন্যায় সেই মুসলমান ধর্ম্মরাজ্যবাদীগণ। প্রবক্তা মহম্মদের মৃত্যুর পর, প্রায় সহস্রবৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, এইবার একজন "মাধী"র আবির্ভাব হইবে। সেই মাধী ধরাতলে ঈশ্বরের রাজ্য

---

(১) আবুল-ফজল সমস্ত বিষয়ের এত যে খুটিনাটি বিবরণ দিয়াছেন, তিনি কিন্তু জাহাজের অধ্যক্ষতা-বিভাগ সম্বন্ধে তিন পৃষ্ঠা মাত্র লিখিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া কেবল নদীপথের নৌচালন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, লাহোর ও কাশ্মীর নৌকার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু আরও এই কথা বলেন, ভারতের উপকূলে, এমন সকল নৌকাও গঠিত হয় যাহা সমুদ্রে যাইতে সমর্থ; বন্দরগুলিরও অবস্থা ভাল এবং ম্যালাবার হইতে হাজার হাজার নাবিক আসিয়া থাকে। (আইন-আকবরী)।

(২) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, আরংজেবের বৃহৎ যুদ্ধের সময়, এই-সকল শুভফল অন্তর্হিত হয়।

ন্যায়, বৈদ্যুতিক চুল্লী, বুন্‌সেনের শিখা, তাপমান বা বায়ুমান যন্ত্র কিছুই ব্যবহার করিতেন না,—নানা প্রকার গাছের শিকড়ের রস, তন্ত্র মন্ত্র, জপ হোম প্রভৃতি উপকরণ লইয়া লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিবার জন্য সাধনা করিতেন। শুনা যায়, এই সাধনায় নাকি তাঁহারা সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিকদের অস্তিত্ব আর নাই, তাঁহাদের পুঁথিপত্রও লোপ পাইয়াছে, সুতরাং কোন্ সূত্র ধরিয়া তাঁহারা পরশ-পাথরের আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। আছে কেবল তাঁহাদের নাম—আল্‌কেমিষ্ট। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই আল্‌কেমিষ্টদের অদ্ভুত খেয়াল বা পাগলামির কথা স্মরণ করিয়া যে কত বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তাই হয় না। কিন্তু গত দশ বৎসরে রসায়ন-শাস্ত্রে যে-সকল অদ্ভুত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে সেই বিদ্রূপকারিগণই বুঝিতেছেন, আল্‌কেমিষ্টরা পাগল ছিলেন না, তাঁহাদেরও সাধনা ছিল এবং তাহার ফলে তাঁহাদের সত্যদর্শন ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান রসায়নবিদ্ র‍্যাম্‌জে (Sir William Ramsay) সাহেব আজকাল মুক্তকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, লৌহকে সুবর্ণে এবং রাঙ্‌কে রৌপ্যে পরিণত করা অসাধ্যসাধন নয়। সুতরাং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সেই আল্‌কেমিষ্টের দল যে পরশ-পাথরের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহারি অনুসন্ধানে ছুটিতে হইতেছে।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের আবিষ্কারের কথা বুঝিতে হইলে একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে। সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উঠিলেই অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ পঞ্চভূতের অবতারণা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দিয়াই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এই পাঁচটি পদার্থের প্রত্যেকটিই মূল পদার্থ অর্থাৎ তাহাদের আর রূপান্তর নাই; এই যে বৃক্ষলতা পশুপক্ষী ঘরদুয়ার সকলি সেই পঞ্চভূতের বিচিত্র মিলনে উৎপন্ন; এগুলি যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন আবার সেই পঞ্চভূতের আকার গ্রহণ করে। প্রাচীনদের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়িয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। গত উনবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্‌টন্ সাহেব প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতির কোনটিই মূল পদার্থ নয়। ইহাদের প্রত্যেকটিকেই বিশ্লেষ করা যায় এবং ইহাতে তাহাদের মধ্যে একাধিক অপর বস্তুর মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ডাল্‌টন্ সাহেব প্রচার করিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে সৃষ্ট নয়; হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ প্রভৃতি বায়ব পদার্থ, গন্ধক অঙ্গার প্রভৃতি কঠিন পদার্থ এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থ দিয়া এই জগতের সৃষ্টি। তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে লাগিলেন বায়ু জল প্রভৃতি ভূত-পদার্থ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন্ ও হাইড্রোজেন্ দিয়াই গঠিত। কাজেই প্রাচীন যুগের পঞ্চভূতের স্থানে বহু ভূতকে বসাইতে হইল; বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়া লইলেন হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি প্রায় নব্বুইটি বস্তু দিয়াই এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং এগুলিই প্রকৃত মূল পদার্থ। ইহাদের ধ্বংস বা রূপান্তর নাই।

ডাল্‌টন্ সাহেবের এই সিদ্ধান্তটি দীর্ঘকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে আদৃত হইয়া আসিতেছিল। কোন কালে যে ইহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হইবে এ কথা কেহ কখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই! কিন্তু এই সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের মূলেও কুঠারাঘাত হইল। ফ্রান্সের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ক্যুরি সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রেডিয়ম্ নামক এক ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহা আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাণু অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। রেডিয়ম্ ধাতুটি মূল পদার্থ বলিয়াই জানা ছিল, কাজেই একটা মূল বস্তুকে ঐপ্রকারে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখিয়া সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া গেলেন। ক্যুরি সাহেব এক রেডিয়মেরই বিশ্লেষ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না, থোরিয়ম্, ইউরেনিয়ম্ প্রভৃতি বহু ধাতব মূলপদার্থের ঐ প্রকার বিশ্লেষ দেখাইতে লাগিলেন এবং এগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যে একই অতি সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণত হয় তাহাও সকলে দেখিলেন। পরমাণুর এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ-গুলির নাম দেওয়া হইল ইলেক্ট্রন্ বা অতি-পরমাণু।

ক্যুরি সাহেবের পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কার অতি অল্প দিনই হইল প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সংবাদ কর্ণগোচর হইবা মাত্র রদারফোর্ড, সডি, টম্‌সন্ প্রমুখ বর্ত্তমান যুগের প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন; আজও এই-সকল গবেষণার বিরাম নাই; ইহার ফলে আজকাল বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব নিত্যই আবিষ্কৃত হইতেছে। ইঁহারা দেখিতে পাইলেন, রেডিয়ম্ ধাতু বিশ্লিষ্ট হইলে কেবলি ইলেক্ট্রন্ অর্থাৎ অতি-পরমাণুতে পরিণত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে উহা নাইটন্ (Niton) নামক আর এক নূতন ধাতুতেও রূপান্তরিত হয় এবং এই নাইটন্ জিনিসটা জন্মগ্রহণ করিয়াই আবার হেলিয়ম্ এবং রেডিয়ম্ জাতীয় আর একটা বস্তুতে (Radium-A) রূপান্তর গ্রহণ করে। কাজেই যে-সকল ধাতু এ পর্য্যন্ত মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদিগকেই বিশ্লিষ্ট ও রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া ইঁহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এই-সকল আবিষ্কারে ডাল্‌টন্ সাহেবের পার-

মাণবিক সিদ্ধান্ত (Atomic Theory) আর অটল থাকিতে পারিল না। বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে লাগিলেন, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ প্রভৃতি নব্বইটি ধাতু ও অধাতু মূলপদার্থ জগতে নাই ; মূলপদার্থ জগতে একটি মাত্রই আছে এবং তাহাই ঐ ইলেক্ট্রন্ বা অতি-পরমাণু। এ-গুলিই অল্প বা অধিক সংখ্যায় জোট্ বাঁধিয়া আমাদের সুপরিচিত অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতির উৎপত্তি করে। ইঁহারা আরও অনুমান করিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল যে, রেডিয়ম্ বা সেই জাতীয় বস্তুই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অতি-পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নহে, জগতের সকল বস্তুই ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া অতিপরমাণুতে পরিণত হইতেছে এবং অতিপরমাণু জোট বাঁধিয়া আবার নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিতেছে। ইঁহারা কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এই প্রকার এক বিশ্বব্যাপী ভাঙাগড়া লইয়াই এই জগৎ। এই ভাঙাগড়ার আদিও নাই অন্তও নাই।

যখন সমগ্র জগৎ পূর্ব্বোক্ত নবাবিষ্কার এবং নবভাবে আবিষ্ট, তখন ইংলণ্ডের প্রধান রসায়নবিদ্ সার উইলিয়ম্ র‍্যামজে ঐ রেডিয়ম্ লইয়াই নীরবে গবেষণা করিতে-ছিলেন। ইনি দেখিলেন, এই যে রেডিয়ম্ রূপান্তরিত হইয়া নাইটনে পরিণত হইল এবং নাইটন্ বহু তাপ ত্যাগ করিয়া হেলিয়ম্ হইয়া দাঁড়াইল, এই সমস্ত ভোজ-বাজি শক্তিরই লীলা। হিসাব করিয়া দেখিলেন, এক ঘন সেন্টিমিটার (one cubic centimeter) স্থানে আবদ্ধ নাইটন্ বিশ্লিষ্ট হইয়া হেলিয়ম্ ইত্যাদিতে পরিণত হইলে, সেই আয়তনের চল্লিশ লক্ষ গুণ হাই-ড্রোজেন্‌কে পোড়াইলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার তাপ আপনা হইতেই জন্মে। তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এই বিপুল শক্তিরাশি খুব নিবিড়ভাবে রেডিয়-মেই লুক্কায়িত থাকে এবং সেই রেডিয়ম্ নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয় তখন ঐ শক্তিই তাপের প্রকাশ করে। র‍্যামজে সাহেবের বিশ্বাস হইল, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এই প্রকার বিশাল শক্তিস্তূপ সঞ্চিত আছে, এবং সেই সযত্নরক্ষিত শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া প্রকৃতি দেবী জগতে ভাঙাগড়ার ভেল্কি দেখান্। রেডিয়মের ন্যায় গুরু ধাতু যখন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ত্যাগ করিয়া নাইটন্ ও হেলিয়ম্ প্রভৃতি লঘুতর বস্তুতে পরিণত হইতেছে, তখন লঘু পদার্থের উপরে প্রচুর শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কেন তাহাকে গুরুতর পদার্থে পরিণত করা যাইবে না,—এই প্রশ্নটি র‍্যামজে সাহেবের মনে উদিত হইল। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করিতে পারিলে লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা কঠিন হইবে না, ইহা সকলেই বুঝিতে লাগিলেন।

প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রণালী আবিষ্কার করা কঠিন নয়, কিন্তু যে-সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপরিমিত শক্তিপ্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি জগতের কার্য্য চালাইয়া থাকেন, তাহার অনুকরণ করা মানব-বিশ্ব-কর্ম্মার সাধ্যাতীত। র‍্যামজে সাহেব ইহা জানিয়াও কোন কৃত্রিম উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করিয়া লঘু পদার্থকে স্বতন্ত্র গুরু পদার্থে পরিণত করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উপায় ধরা দিল না এবং রেডিয়ম্ বিযুক্ত হইবার সময়ে যে বিপুল শক্তি দেহ হইতে নির্গত করে সে প্রকার শক্তিরও তিনি সন্ধান করিতে পারিলেন না। এই সময়ে একটি কথা র‍্যামজে সাহেবের মনে হইল ; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, নাইটন্ বিযুক্ত হইবার সময়ে স্বভাবতঃ যে বিপুল শক্তিরাশি দেহচ্যুত করে, তাহা যদি কোন উপায়ে অপর লঘু পদার্থের উপরে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে হয় তো সেই লঘু বস্তু কোন গুরু পদার্থে পরিণত হইতে পারিবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আরম্ভ হইল। প্রথমে কয়েক বিন্দু বিশুদ্ধ জলে নাইটন্ নিক্ষেপ করিয়া তিনি জলের হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেনের কোন পরিবর্ত্তন হয় কিনা দেখিতে লাগিলেন। জল যথারীতি বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ উৎপন্ন করিতে লাগিল, এবং নাইটন্ হইতে হেলিয়ম্ জন্মিতে লাগিল। পাত্র হইতে এই-সকল বাষ্প স্থানান্তরিত করিয়া তাহাতে আর কোনও নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে কিনা, র‍্যামজে সাহেব তাহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে দেখা গেল, ঐসকল বাষ্প ব্যতীত নিয়ন্ (Neon) নামক একটি মূলপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। র‍্যামজে সাহেবের বিস্ময়ের এবং আনন্দের আর সীমা রহিল না। জলের হাইড্রোজেন্ বা নাইট্রোজেন্‌কে যখন গুরুভারবিশিষ্ট নিয়নে পরিণত করা গেল, তখন অদূর ভবিষ্যতে এক দিন ঐ প্রকার উপায়ে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করাও সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

র‍্যামজে সাহেবের এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার-সমাচার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে যে আন্দোলন ও বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে, বোধ হয় আধুনিক যুগের কোন আবিষ্কার দ্বারা তদ্রূপ বিস্ময় ও আন্দোলন সৃষ্ট হয় নাই। আজকাল বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র ও সভাসমিতিতে এই বিষয় লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিতেছে ; জগতের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানরথিগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। সকলেই যে র‍্যামজে সাহেবের আবিষ্কারের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেছেন তাহা বলা যায় না। বেকেরেল্ সাহেব, যিনি

সর্ব্বপ্রথমে রেডিয়ম্ জাতীয় পদার্থের গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তিনি, এখন আর ইহজগতে নাই। ক্যুরি সাহেবেরও মৃত্যু হইয়াছে। মাদাম্ ক্যুরি, রদারফোর্ড, টম্‌সন্ ও সডি সাহেবই এখন এই আবিষ্কারে মতামত প্রকাশের অধিকারী। রদারফোর্ড সাহেব র‍্যামজের আবিষ্কার-কাহিনী শুনিয়া বলিয়াছিলেন সম্ভবতঃ পরীক্ষাকালে কোনক্রমে জলের পাত্রে বাতাস প্রবেশ করিয়াছিল; বাতাসের নিয়ন্‌কে র‍্যামজে সাহেব সদ্যোৎপন্ন নিয়ন্ মনে করিয়া ভুল করিতেছেন। মাদাম্ ক্যুরিও এই আবিষ্কারে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষার পর র‍্যামজে সাহেব নানা পদার্থের যে-সকল রূপান্তর প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই-সকল বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি এক পরীক্ষায় র‍্যামজে সাহেব তাম্র, নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ মিশ্রিত এক যৌগিক পদার্থে (Copper Nitrate) সেই নাইটন্ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উক্ত যৌগিক পদার্থটি পরিবর্ত্তিত হইয়া আর্গন্ (Argon) নামক এক মূল-পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সিলিকন্, টিটানিয়ম, থোরিয়ম্ প্রভৃতি ঘটিত অনেক যৌগিক পদার্থের উপরেও এই পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং এই শেষোক্ত প্রত্যেক পদার্থের রূপান্তরে অঙ্গারের (Carbon) জন্ম হইয়াছে। বিসমথ-ঘটিত এক পদার্থের (Bismuth Perchloride) রূপান্তরে সেদিন অঙ্গারক বাষ্পের উৎপত্তিও দেখা গিয়াছে।

র‍্যাম্‌জে সাহেবের এই-সকল পরীক্ষার কোনটিই গোপনে করা হয় নাই। তিনি বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এই-সকল পরীক্ষা দেখাইয়াছেন, এবং কোন কোনটি ইংলণ্ডের কেমিক্যাল সোসাইটির প্রকাশ্য সভার সম্মুখে করা হইয়াছে। সুতরাং এগুলির সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কারণ নাই। জগতের লোকে এখন বুঝিবেন, প্রকৃতির এই যে বিচিত্র লীলা তাহা নব্বইটি মূল পদার্থ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে না,—সকল পরিবর্ত্তনের গোড়ায় একই বর্ত্তমান। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, তাম্র সকলই একেরই বিচিত্র রূপ। আল্‌কেমিষ্টরা লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করিবার জন্য যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া করেন নাই। লৌহকে সুবর্ণ করিবার জন্য পরশ-পাথর এই ভূমণ্ডলে এবং এই প্রকৃতির মধ্যেই আছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রকৃতি-পরশ

আজি প্রভাতে এ কার গন্ধ পশিল অন্তরে,
ফুল-সৌরভে দিক্‌দিগন্ত মাতায়ে!
তৃণে শিহরি উঠিল অন্তবিহীন প্রান্তরে,
অবশ অঙ্গে কার অন্তর-ব্যথা এ!
আজি বনমর্ম্মরে শিশির-সিক্ত পল্লবে,
অবশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল ভূতলে!
আজি পূর্ব্ব-আকাশ অলক্ত-রাগ-গৌরবে,
লুটায় বিলাসে কাহার চরণ-যুগলে!
আজি আলোকে আলোকে লুটিয়া গলিয়া পড়িছে রে,
সুষমা কাহার আকুল করিয়া অবনী!
আজি আকাশে বাতাসে ঝলকে ঝলকে ঝরিছে রে,
কাহার সরস-পরশ-সিক্ত লাবণি!
আজি প্রভাতে জাগিয়া কাহার মহিমা লাগিল রে,
দ্যুলোকে ভূলোকে পুলকে চিত্ত দুলায়ে!
কার মর্ম্ম-গন্ধে প্রকৃতি আজিকে জাগিল রে,
পাগল করিয়া কোথা নিয়ে যায় ভুলায়ে!

২

সে কি এসেছিল রাতে মৃদুল-চরণ-সম্পাতে
শবদ-বিহীন দিগন্ত-দ্বার খুলিয়া,
সে কি মোর অঙ্গনে গোলাপে. করবী, চম্পাতে
রেখে গেছে তার অঙ্গের আভা ভুলিয়া!
সে কি সারা রাত ধরি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া প্রান্তরে,
ফিরেছিল লঘু চরণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
শেষে জ্যোৎস্না-পুলক-লীলায়িত-তনু শ্রান্ত রে,
গেল স্বপনের দিগন্ত পানে উড়িয়া!
বুঝি ধরণীর গায় লুটেছিল তার অঞ্চল,
তরু-পল্লবে ছুঁয়েছিল তার পাখা;
তাই অন্তরে ধরা শিহরিছে; আজি চঞ্চল
পুলকিত রসে তরু-পল্লব-শাখা।
সে কি ছুঁয়েছিল মোর অন্তর মাঝে ছন্দ রে,-
বিশ্ব-রসের-অন্তর-মধু-পরশে!
তাই শিহরিছে মোর মর্ম্মে মর্ম্মে গন্ধ রে,
কাঁপিতেছে হিয়া বিপুল পুলক হরষে।
তাই প্রভাতে আজিকে কোন দিগন্ত প্রান্তরে,
উড়ে গেছে মন কাহার দরশ লাগিয়া!
আজি স্তব্ধ আলোকে চাহিয়া নিশি উপান্তে রে,
দাঁড়ায়ে মুগ্ধ কাহার পরশে জাগিয়া।

শ্রীজীবনময় রায়।

মানবের পূর্ব্বপুরুষ

"মানুষ প্রথমে জড়ের মধ্যে ছিল; তাহার পর সে গাছ হইয়া জন্মিল; বহু বর্ষ ধরিয়া সে গাছ হইয়াই রহিল—তখন তাহার জড়-জীবনের অতীত কাহিনী তাহার মনেও ছিল না; তারপরে যখন সে উদ্ভিদ্-জীবন হইতে প্রাণী-জীবন লাভ করিল, তখন আবার উদ্ভিদ-জীবনের স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল, কেবল রহিল তাহার আভাস;—তাই বসন্তের সময় পুষ্প-পল্লবের নবীনতা ও প্রাচুর্য্য তাহার প্রাণকে উদাস করিয়া বনের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, এ যেন স্তনদুগ্ধ-লোলুপ শিশুর মাতার কোলে উঠিবার অবুঝ আকুলতা। তারপর প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে পশু-পংক্তি হইতে মানবত্বে উন্নীত করিলেন। মানুষ প্রকৃতির দুলাল, প্রকৃতির কোলের মধ্যে তাহার বেশ-পরিবর্ত্তন যুগে যুগে রকম রকম। এখন মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ক ও বলে শক্তিতে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে। এখন যেমন তাহার অতীত রূপের স্মৃতি তাহার লুপ্ত, তেমনি তাহার বর্ত্তমান রূপও ভবিষ্যতে রূপান্তর লাভ করিবে।"—জলালউদ্দীন রুমি, মসনবী ৪র্থ সর্গ (১৩শ শতাব্দীতে রচিত)।

বানরের ছবি দেখিলেই তাহাকে মানবের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিবার বিদ্রূপ-অভ্যাসটা আমাদের মধ্যে কত দিন প্রচলিত হইয়াছে তাহা স্থির করা মোটেই দুরূহ নহে। যে দিন হইতে পাশ্চাত্য-মনীষী ডারুউইন ও ওয়ালেসের "ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদ" সভ্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই দিন হইতেই এই ব্যঙ্গের সৃষ্টি। যে যাহাই হউক, বানর হইতে মানবের পরিণতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে বড় একটা ভুল ধারণা আছে। যাঁহারা "ক্রমবিকাশবাদ" তথ্যটির সহিত তেমন পরিচিত নহেন তাঁহারা, বানর মানবের পূর্ব্বপুরুষ একথা শুনিলে মনে করেন যে, হয়তো অতি পুরাকালে কোন এক সময়ে বানরীমাতার গর্ভে মানবের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক মানুষ ও বানরের শরীরের গঠনের "ধাঁচ" প্রায় একইপ্রকার হইলেও উভয়ের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর তুলনা করিলে এত অধিক ও সুস্পষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা হইতে এ কথা কখনই মনে করা যায় না যে আমরা আজ-কাল যে বানর দেখিতে পাই সেইরূপ কোন বানরীমাতার গর্ভ হইতে বর্ত্তমান মানবের ন্যায় কোন মনুষ্যসন্তান কখনো কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। "খাঁটি" বানর হইতে "খাঁটি" নরের সাক্ষাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। ডারউইনের মত বা "বিবর্ত্তনবাদ" অনুসারে বানরদেহ বংশপরম্পরায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত বা অভিব্যক্ত হইয়া মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মানবদেহের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ যাহা বলেন সে সম্বন্ধে গোটাকতক কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক!

বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মানবদেহ কোন এক কালে সৃষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভে প্রেরিত হয় নাই, পরন্তু বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে আপনাকে সৃজন করিয়াছে। বিবর্ত্তনবাদীরা "প্রোটোপ্লাজ্‌ম্" (Protoplasm) বা জীবপঙ্ক নামক এক পদার্থকে "ফিজিক্যাল্ বেসিস্ অফ্ লাইফ্" (Physical Basis of Life) বা "জীবনের ভৌতিক ভিত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবদেহ মাত্রই প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ সজীব কোষে (Cells) গঠিত। এই কোষগুলি আবার একটি নির্দ্দিষ্ট
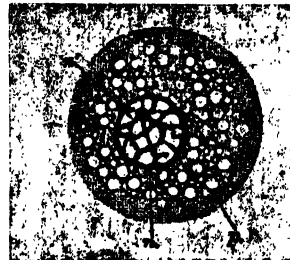
"সেল" (Cell) বা কোষের চিত্র।
[মধ্যস্থলের ক্ষুদ্র বৃত্তটির চতুর্দ্দিক প্রোটোপ্লাজমে (Protoplasm) পূর্ণ। *p*, প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ *n*, জীববীজ (nucleus ও nucleolus)]
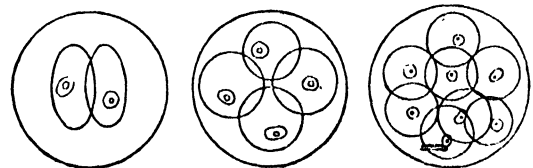
কোষ-বিভাগের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র।
[কোষগুলি প্রথমে একটি হইতে দুইটি, তৎপরে দুইটি হইতে চারিটি এবং পরে চারিটি হইতে আটটি—এইরূপে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানুযায়ী আপনাকে বিভক্ত করে]
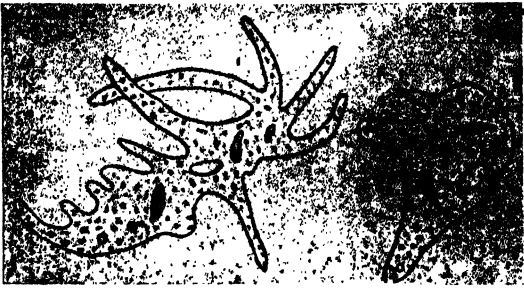
"এমিবা" (Amœba)।
[অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বৃহদাকৃতি করিয়া প্রদর্শিত]

সংখ্যানুযায়ী আপনাকে বিভক্ত করিতে পারে। সর্ব্ব নিম্নস্তরের প্রাণী "এমিবা (Amœba) এই "প্রোটো-প্ল্যাজ্‌মে"-পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গশূন্য ও অস্থি-মাংসবিহীন একটিমাত্র-কোষ-বিশিষ্ট (Unicellular) সূক্ষ্ম জীব। এমিবা ক্রমাগত আপন দেহের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণের দ্বারা আকার পরিবর্ত্তন করে। ক্রমবিকাশের ধারায় পরে দ্বিতীয় স্তরে এক-কোষবিশিষ্ট এমিবা হইতে বহুকোষবিশিষ্ট "সিন্‌এমিবা" (Synamœba) বিবর্ত্তিত হইল ; বহু সূক্ষ্ম কোষের সমাবেশে "সিন্‌এমিবার" দেহে অনুভূতির শক্তি জন্মিল। কাদা-চিংড়ি বা পচা পুকুরের উপরে ভাসমান জীবপঙ্ক এই পর্য্যায়ের। "সিন্‌-এমিবা" হইতে তৃতীয় স্তরে "গ্যাষ্ট্রুলার" (Gastrula) সৃষ্টি হইল। ইহাদের জননেন্দ্রিয় ভিন্ন আহার করিবার জন্য স্বতন্ত্র মুখের ছিদ্র হইল।
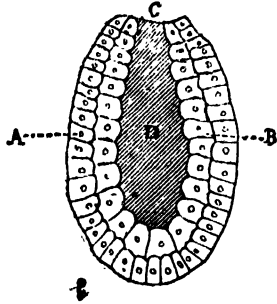
"গ্যাস্ট্রুলা" (Gastrula)।
[*A*, দেহের উপরের কোষস্তর ; *B*, নিম্ন কোষস্তর ; *C*, মুখগহ্বর ; *D*, দেহগহ্বর।]

"গ্যাষ্ট্রুলার" পর চতুর্থ স্তরের প্রাণী "হাইড্রা" (Hydra) বা "পুরুভুজ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "গ্যাষ্ট্রুলা" অপেক্ষা "হাইড্রার" (Hydra) অতিরিক্ত দু-একটি ইন্দ্রিয় জন্মিল। স্পঞ্জ এই পুরুভুজ জাতীয়। পঞ্চম স্তরে এই "হাইড্রা" হইতে "মেডুসা" (Medusa) সৃষ্টি হইল। "মেডুসার" দেহেই সর্ব্বপ্রথম সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডল ও মাংশপেশী দেখা দিল। পুরীর সমুদ্রতীরে যে জেলিফিশ দেখা যায় তাহা এই মেডুসা পর্য্যায়ভুক্ত। এই "মেডুসা" হইতে প্রাণীজীবনের ষষ্ঠ স্তরে কীটের (Worms) উদ্ভব হইল। তাহার পর সপ্তম স্তরে "হিমাটেজা" (Himatega) ; এই "হিমাটেজার" দেহেই সর্ব্বপ্রথম মেরুদণ্ডের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে মেরুদণ্ড অত্যন্ত ক্ষীণ—মোটেই সুগঠিত নহে ; সুতরাং "হিমাটেজাকে" বাদ দিয়া তাহার পর হইতে "ভার্টিব্রেটা" (Vertebreta) বা মেরুদণ্ডী জীবের সৃষ্টি ধরিয়া লইতে হয়। মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী—"ডিম্বপ্রসবী" ও "স্তন্যপায়ী"। ডিম্বপ্রসবী নিম্নস্তরের প্রাণী, যথা—মাছ, পাখী, সরীসৃপ, ইত্যাদি। ইহাদের উপরে স্তন্যপায়ী জীব। কিন্তু ডিম্বপ্রসবী মেরুদণ্ডী জীব হইতে একেবারে স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী জীবের সৃষ্টি সম্ভব নয়। মনোট্রিমেটা (Monotremeta) নামে অর্দ্ধসরীসৃপ অর্দ্ধস্তন্যপায়ী জীব ডিম্বপ্রসবী ও স্তন্যপায়ীর মধ্যে অবস্থিত।

সুগঠিত মেরুদণ্ডযুক্ত স্তন্যপায়ী জীবের নিম্নস্তর হইতে বিকশিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে গরিলা, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী, গিবন প্রভৃতি "নরাকৃতি বানরের' (Anthropoid Apes) সৃষ্টি হইল। ইহাদের পর মেরুদণ্ডযুক্ত স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব—মানব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বানর হইতে মানবের সাক্ষাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। বিবর্ত্তনবাদীদের মতে "মানবাকৃতি বানরের" দেহই বংশপরম্পরায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইয়া মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে "মানবাকৃতি বানর" ও মানবের মধ্যবর্ত্তী দৈহিকঅবস্থাপ্রাপ্ত জীবের উদ্ভব নিশ্চয়ই হইয়াছিল এবং বহুপূর্ব্বকালের মানব, অর্থাৎ বর্ত্তমান মানববংশের পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি অধিকতর বানরাকৃতি ছিল। কিন্তু সে যাহাই হউক বহুদিন পর্য্যন্ত বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকগণের "মানবদেহের ক্রমবিকাশতথ্যের" কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। ক্রমে তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞান (Comparative Physiology), অস্থি-সংস্থানতত্ত্ব (Comparative Anatomy) ও অস্ত্রবিদ্যার (Surgery) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব ও অন্যান্য জীবের দেহ, অস্থি, ভ্রূণ প্রভৃতির বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবচ্ছেদ (Dissection) সাধিত হইয়া "মানবদেহের ক্রমবিকাশ-বাদ" সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) উন্নতিতে এ বিষয়ে বহু নূতন তথ্যেরও আবিষ্কার হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিত অধ্যাপক হেকেল (Hœcel) ও হাক্‌সলী (Huxley) নানা পরীক্ষা ও প্রমাণ সহযোগে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন যে মানব-ভ্রূণ মাতৃজঠরে অবস্থানকালে যে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া গঠিত হয় তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তরের সকল প্রাণীর ভ্রূণের অবিকল অনুরূপ। মানব-

"মানবাকৃতি বানর" ও মানবের কঙ্কাল।

গিবন ওরাং-ওটাং শিম্পাঞ্জী গরিলা মানুষ

[এই কঙ্কালগুলি কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত দেখিলেই ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী ইহাদের দৈহিক গঠনের পরিবর্ত্তন এবং ইহাদের পরস্পরের সৌসাদৃশ্য ও পার্থক্য উপলব্ধি হইবে]

ভ্রূণ প্রথমে একটি "এমিবার" ন্যায় থাকে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে "গ্যাষ্ট্রুলা" "মেডুসা" এবং অন্যান্য বহু নিম্নশ্রেণীর জীবের ভ্রূণের আকার ধারণ করে। কিন্তু পরে স্তরে স্তরে উন্নত হইতে উন্নততর আকারের মধ্য

সদ্যজাত ভ্রূণের আকৃতি।

[a, b, মস্তিষ্ক ; c, f, ত্বক ; d, e, মেরুদণ্ডাভাস।]

দিয়া মানবভ্রূণ "মানবাকৃতি বানর"-ভ্রূণের আকার প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মানবভ্রূণের ক্ষুদ্র পুচ্ছ থাকে এবং তাহার দৈহিক-গঠন, আকারপ্রকার, পদাঙ্গুলি ও কর্ণস্পন্দনের শক্তিও থাকে ঠিক বানরভ্রূণের মত। কিন্তু কিছুদিন পরে আরো পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবভ্রূণের পুচ্ছ খসিয়া যায়, মেরুদণ্ড সুদৃঢ় ও উন্নত হয়, কর্ণস্পন্দনের শক্তি লুপ্ত হয় এবং মানবভ্রূণ পূর্ণভাবে মানুষের মত হয়।

মৎস্য-ভ্রূণ কুকুর-ভ্রূণ মানবভ্রূণ
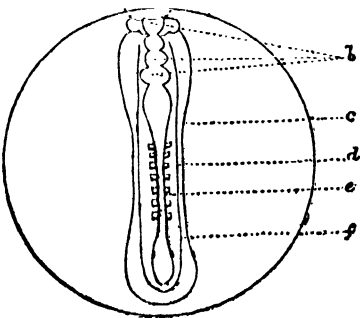
বিভিন্ন জীবের ভ্রূণের আকৃতি।

[মানব-ভ্রূণ মাতৃজঠরে অবস্থান কালে যে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া গঠিত হয় তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তরের সকল নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর অবিকল অনুরূপ। মাছ, কুকুর ও মানবভ্রূণের গঠনাবস্থা কালের একই সময়ের আকৃতির মধ্যে যে কতদূর সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান তাহা উপরের চিত্রটী দেখিলেই বোধগম্য হইবে। a, মস্তিষ্ক ; b, চক্ষু ; c, কর্ণ ; d, চিবুকনিম্নের খাঁজ ; e, লাঙ্গুল।]

মানবাকৃতিবানরদেহ যে বংশপরম্পরায় ক্রম-বিকশিত হইয়া মানবদেহে পরিণত হইয়াছে— মাতৃজঠরে মানবভ্রূণের ক্রমবিকাশ তাহার এক সুদৃঢ় প্রমাণ বটে ; কিন্তু "মানবাকৃতি বানর" ও মানবের
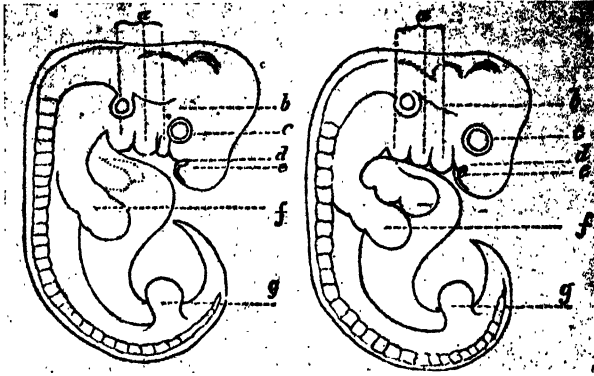
বিভিন্ন জীবের ভ্রূণের আকৃতি।

কুক্কুর-ভ্রূণ (বয়স একমাস) মানব-ভ্রূণ (বয়স একমাস)

a, চিবুকনিম্নের খাঁজ ; *b*, মস্তিষ্ক ; *c*, চক্ষু ; *d*,*e*, নাসিকা ; *f*, সম্মুখের পা ; *g*, পিছনের পা।

মধ্যবর্ত্তী জীবের—অর্থাৎ বর্ত্তমান মানবের পূর্ব্বপুরুষের—অস্তিত্বের কোনরূপ চিহ্ন না পাওয়ায় বহুদিন পর্য্যন্ত সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে বানর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীবগণের আকৃতি বানর ও মানবের মাঝামাঝি এবং তাহাদের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তি বানর অপেক্ষা উন্নত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা এরূপ মধ্যবর্ত্তী কোন জীবের অস্তিত্বের চিহ্ন না পাওয়াতে তাহার নাম দিলেন "The Missing Link" বা "লুপ্ত আংটা"।

বহুদিন পর্য্যন্ত এই "লুপ্ত আংটার" পর্য্যায়ভুক্ত কোন প্রাণীর সন্ধান মিলে নাই। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর অন্তর্গত রাইন নদীর উপকূলে "নিয়াণ্ডার উপত্যকায়" ভূস্তরে প্রোথিত এক করোটি (skull) পাওয়া যায়। উন্নত ভ্রূ, চাপা কপাল, খর্ব্ব নাসিকা, প্রশস্ত চোয়াল ও চিবুকের একান্ত অভাব এই করোটির বিশেষত্ব ছিল। "মানব-আকৃতি বানরের" মধ্যে গরিলা শিম্পাঞ্জীর আকারেও এই বিশেষত্বগুলি আরো অধিকতররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই করোটির সহিত গরিলা, শিম্পাঞ্জীর করোটির সৌসাদৃশ্য থাকিলেও মস্তিষ্ক-আধারের (Brain cavity) পরিমাণে প্রকাশ পায় যে "নিয়াণ্ডার-করোটির" (Neanderthal skull) মস্তিষ্কের পরিমাণ তাহাদের মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক অধিক ছিল;—এমন কি, পরিমাণে সেটি বর্ত্তমান মানবমস্তিষ্কের প্রায় সমানই ছিল।

কিন্তু পরিমাণে অধিক হইলেই মস্তিষ্কের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না। যে প্রাণীর মস্তিষ্কের উপরিভাগের "খাঁজগুলি" (Convolutions) যত সূক্ষ্ম ও সংখ্যায় যত অধিক হইবে ততই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু ভূগর্ভপ্রোথিত বহু পুরাতন করোটির মধ্যে মস্তিষ্ক অনেক দিন পূর্ব্বেই যে বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি মস্তিষ্ক বিলুপ্ত হইয়া গেলেও তাহার চিহ্ন একেবারে লোপ পায় না। করোটির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের বহুকাল অবস্থানবশতঃ অস্থির উপরে তাহার যে রেখা (fossœ) অঙ্কিত হইয়া যায়—সেই রেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌গণ মস্তিষ্কের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় করেন।

বিভিন্ন জীবের ভ্রূণের আকৃতি ও পরিণতি।

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

(ক) শূকর (খ) বাছুর (গ) খরগোস (ঘ) মানুষ
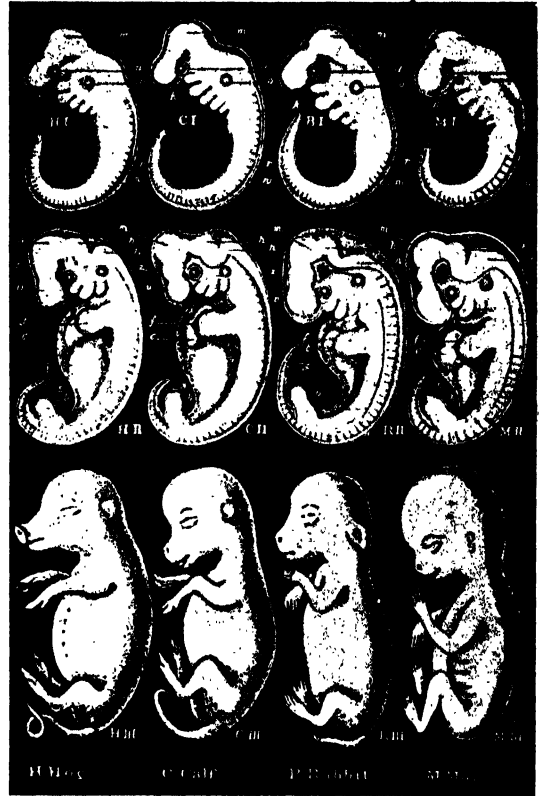
[উপরের চিত্রখানিতে শূকর, বাছুর, খরগোস ও মানব-ভ্রূণের পরিণতির বিভিন্ন অবস্থার আকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম পংক্তিতে অবস্থিত ভ্রূণের চিত্রগুলি একেবারে প্রথম অবস্থার—কাজেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌসাদৃশ্যও অত্যন্ত অধিক। দ্বিতীয় পংক্তিতে এই সৌসাদৃশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কমিয়া আসিলেও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। তৃতীয় পংক্তিতে বিভিন্ন ভ্রূণগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিত ও সুস্পষ্ট আকার পাওয়া সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে মোটামুটি যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান]

সে যাহাই হউক "নিয়াণ্ডার উপত্যকায়" প্রাপ্ত করোটির এইরূপে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন যে সেটি "মানবাকৃতি বানর" হইতে উন্নত অতি নিম্নস্তরের মানবের করোটি।
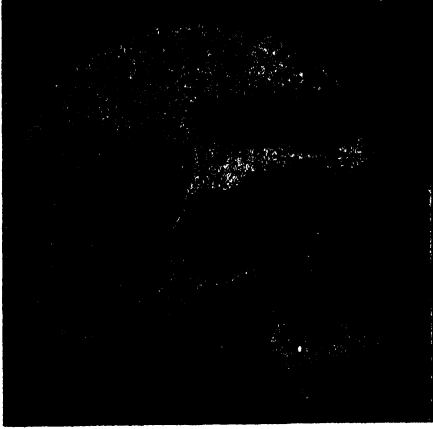
বানরাকৃতি নর-করোটী।

উপরের নর-করোটী প্রশান্ত মহাসাগরের কোন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের অসভ্য আদিম মানবের। ইহার উন্নত ভ্রূ, খর্ব্ব নাসিকা ও মুখের উপর-চোয়ালের সহিত মানবাকৃতি বানরের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে।

ভূগর্ভোত্থিত এই সমস্ত করোটিই বানর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। বহু বৎসর পর্য্যন্ত পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মানব। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের অন্তর্গত সাসেক্স্ শায়ারে (Sussex Shire) এক কঙ্করময় গহ্বর হইতে একটি করোটি আবিষ্কৃত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বিবর্ত্তনবাদী ও নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক মহলে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। এই করোটি কতদিন পূর্ব্বের এবং কাহার তাহা লইয়া বহু বাদ-বিতণ্ডা ও পরীক্ষার পর তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে এই করোটি চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের আদিম মানবের। এই
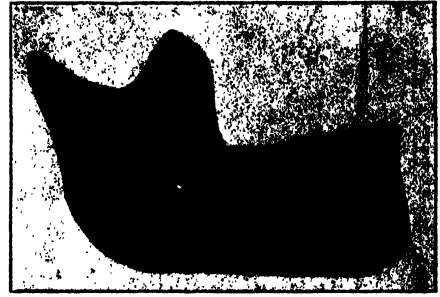
আফ্রিকার অসভ্য কাফ্রি মানবের চোয়াল।

শিম্পাঞ্জীর চোয়াল।

আমেরিকার অসভ্য মানবের চোয়াল।
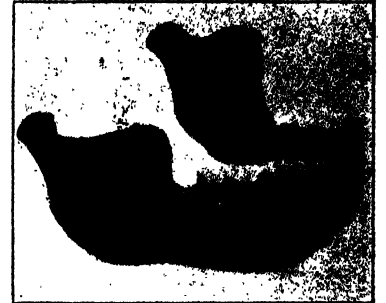
হিডেলবার্গে প্রাপ্ত আদিম মানবের চোয়াল

"নিয়াণ্ডার করোটির" আবিষ্কারের পর মধ্যে মধ্যে আরও এই রকম প্রাচীন মানবের দু-একটি করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে যবদ্বীপে একটি করোটি পাওয়া যায়। "মানবাকৃতি বানরের" সহিত এই করোটির সৌসাদৃশ্য "নিয়াণ্ডার করোটি" অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়াতে পণ্ডিতেরা সেটি বানর কিম্বা মানব কোন্ প্রাণীর করোটি, তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহারা সেটিকে নিম্নস্তরের মানব-করোটি বলিয়া বুঝিতে পারেন।

আদিম মানবও "নরাকৃতি বানর" ও মানবের মধ্যবর্ত্তী লুপ্ত আংটার—"Missing Link"এর পর্য্যায়ভুক্ত জীবের অন্যতম। *

* প্রবন্ধের শিরোভাগে "সাসেক্স্ মানবের" যে চিত্রখানি প্রদত্ত হইয়াছে সেটি ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ অস্থিসংস্থান-তত্ত্ববিদ ডাক্তার উইলিয়াম অ্যালেন ষ্টার্জ ও ডাক্তার স্মিথ উডওার্ড মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত হইয়াছে। তুলনামূলক অস্থি-সংস্থান-তত্ত্বের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলিয়াই সামান্য করোটি হইতে পণ্ডিতেরা এই চিত্র প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন।
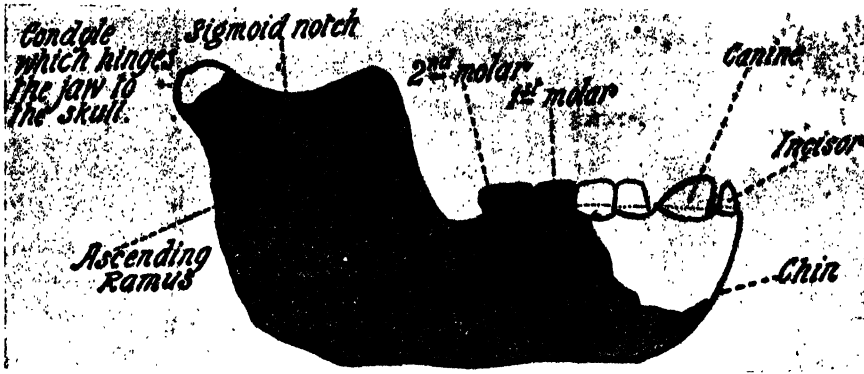
সাসেক্স-মানবের চোয়াল।

[শিম্পাঞ্জীর ন্যায় চিবুকের একান্ত অভাব এই চোয়ালের প্রধান বিশেষত্ব।]

করিয়া আছে। সেই-সকল গহ্বর জলপূর্ণ হইয়া সমুদ্র ও হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ভূদেহে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। ভূদেহ সম্বন্ধে কোন কথা যদি ঠিক করিয়া বলা যায়, তবে তাহা এই যে এখন যেমন দেখিতেছি, ভূদেহ চিরকাল তেমন ছিল না। এক কালে যেখানে উর্ম্মি-মুখর সমুদ্র ছিল সেখানে আজ বিস্তৃত মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর গাত্র বৃষ্টি, তুষার, সূর্য্যের তাপ প্রভৃতির অবিরাম ক্রিয়ায় বিপর্য্যস্ত হইতেছে। সেই-সব ধরণীগাত্রচ্যুত মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ড নদীস্রোতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কণায় পরিণত হইয়া সমুদ্র ও হ্রদের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইতেছে। চলিত ভাষায় ইহাকেই "পলি পড়া" বলে।

পুস্তকের পত্রগুলি যেরূপ পরপর সাজানো থাকে সেইরূপ নানাজাতীয় মৃত্তিকার স্তর উপর্য্যুপরি সজ্জিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ গঠিত হইয়াছে। এই সমুদয় স্তরের কোনটি বেলে পাথরের, কোনটি শ্লেট পাথরের, কোনটি খড়ির, আবার কোনটি বা কয়লার। বৎসরে বা শত বৎসরে কতখানি কাদা বা বালি নদীমুখে ও সমুদ্রগর্ভে স্তূপীকৃত হয় তাহা জানা থাকিলে, কোন একটা স্তরের গভীরতার মাপ পাইলে সে স্তরটা যে কত বৎসরে গঠিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায়। সুতরাং সেই স্তরে যদি কোন প্রাণীর দেহাবশেষ প্রস্তরীভূত অবস্থায় প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায় তবে তাহা হইতে সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় যে সেই প্রাণীর কঙ্কাল ভূপৃষ্ঠেই ছিল, ক্রমে তাহার উপর পলি পড়িয়া সেটা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার উপর কত পুরু পলি পড়িয়াছে এবং সেই পলি পড়িতে কতকাল লাগিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে সে কঙ্কালটার বয়স কত তাহা বলিতে পারা যায়। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে গড়ে এক ফুট পুরু স্তর জমিতে একশত বৎসর লাগে। কিন্তু পৃথিবীর স্তরগুলি পর পর সজ্জিত হইয়া গঠিত হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ঠিক পর পর থাকে না। ভূকম্পে এবং অন্য নানাপ্রকারে স্তরগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। নীচের কোনটি স্তর উপরে চলিয়া আসে, উপরের কোনটি বা আবার নীচে বসিয়া

এখন বৈজ্ঞানিকেরা কেমন করিয়া এই করোটি কোন প্রাণীর ও সে প্রাণী কত পূর্ব্বের তাহা স্থির করিয়াছেন সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

প্রথমে "সাসেক্স্-করোটির" আকৃতির কথা বলা যাক। নরাকৃতি বানরের চোয়াল যেমন প্রশস্ত এবং তাহাদের চিবুকের যেমন অভাব "সাসেক্স্-করোটিরও" ঠিক তেমনি। কিন্তু মুখ ও মস্তকের অন্যান্য অংশ মানুষেরই অনুরূপ। সাসেক্স-করোটির মস্তিষ্ক-আধারের (Brain cavity) ছাঁচ লইয়া রেখাগুলি (fossæ) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার মস্তিষ্কের "খাঁজগুলি" বর্ত্তমান মানব-মস্তিষ্কের "খাঁজগুলির" মত অত সূক্ষ্ম না হইলেও এ পর্য্যন্ত আদিম মানবের যত করোটি পাওয়া গিয়াছে তদপেক্ষা অনেক অধিক সূক্ষ্ম। ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে "সাসেক্স-মানবের" বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান মানব অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও "মানবাকৃতি বানর" অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে বানর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী জীবের আকৃতি, মানব ও বানরের মাঝামাঝি এবং তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বানর অপেক্ষা উন্নত হইবে। "সাসেক্স করোটির" মস্তিষ্ক তাঁহাদের এই অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

তারপর "সাসেক্স্-মানবের" বয়সের কথা। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে "সাসেক্স্-মানব" পৃথিবীতে বাস করিত। এখন তাঁহারা কেমন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন সেই কথা বলিব।

পৃথিবীর গাত্র বন্ধুর। একদিকে যেমন সুবৃহৎ শুভ্র তুষারকিরীটী পর্ব্বতমালা অভ্র ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, অপর দিকে সেইরূপ বিস্তীর্ণ গহ্বর-সকল মুখব্যাদান

(১) "মানবাকৃতি বানরের" অন্যতম শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ক।
(২) মানুষের মস্তিষ্ক।
[কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই 'মানবাকৃতি বানর' (শিম্পাঞ্জী) ও মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা দেখা যাইবে। মানবাকৃতি বানরের মস্তিষ্কের উপরিভাগের খাঁজগুলি ((Convolutions) অপেক্ষা মানুষের মস্তিষ্কের খাঁজগুলি অধিক সূক্ষ্ম এবং সংখ্যায় অনেক অধিক। মানুষের মস্তিষ্কের খাঁজগুলি এইরূপ বলিয়াই বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষ মানবাকৃতি বানর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।]

যায়। স্তরে প্রোথিত কঙ্কালগুলিও সেই সঙ্গে ওলট-পালট হইয়া পড়ে। সুতরাং সব সময়ে স্তরের গভীরতা মাপিয়া কঙ্কালের বয়স ঠিক করা যায় না। এরূপ স্থলে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কঙ্কালের অবস্থা এবং তাহার গাত্রসংলগ্ন ধাতু বা প্রস্তর ও অন্যান্য চিহ্নাদি পরীক্ষা করিয়া বয়স ঠিক করেন।

"সাসেক্স মানবের" করোটি যে-স্তরে প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে সেটি কঙ্করস্তর। ভূতত্ত্ববিদ্গণ সেই স্তরের মৃত্তিকা ও অন্যান্য বস্তু পরীক্ষা করিয়া বলিতে-ছেন যে "সাসেক্স-মানব" "প্লাইয়োসিন্" (Pliocene) ভাগের। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভূস্তরের গঠন অনুসারে পৃথিবীর বয়সকে মোটামুটি চারিটি যুগে বিভক্ত করিয়া-ছেন,—যথা, প্যালিজোইক (Palœzoic) বা আদিযুগ, মেসোজোইক (Mesozoic) বা মধ্যযুগ, কাইনোজোয়িক (Kainozo ic) বা অন্ত্যযুগ, ও প্লেইষ্টোসিন্ (Pleistocene) বা বর্ত্তমান যুগ। এই চারিটি যুগের মধ্যে আবার বিভাগ আছে। উপরে যে "প্লাইয়োসিন্" ভাগের কথা বলিয়াছি তাহা কাইনোজোইক্ যুগের শেষ অংশ। চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে এই প্লাইয়োসিন যুগ ছিল। সুতরাং "সাসেক্স-মানবেরও" যে চারি লক্ষ বৎসর বয়স হইবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। (৪৩৬ পৃষ্ঠায় ভূস্তরের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আপাততঃ যত আদিম-মানবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এই "সাসেক্স-মানবই" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও হয়তো অধিক পুরাতন মানবের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যদি সন্ধান পাওয়া যায় তবে বিবর্ত্তনবাদীদিগের "ক্রমবিকাশ-বাদ তথ্যটি" অধিকতর সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার আলোকে আরো অনেক নব নব তথ্যের আবিষ্কার হইয়া বিজ্ঞানরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

পুনর্ম্মিলন

(পুরাতন জাপানী কবিতা হইতে)

আজিকে পাষাণ-পুঞ্জ নদীরে করেছে ভাগ,
দুই দিকে বহে দুই আধা,
তার ত ক্ষমতা জানি ; অচল, নারিবে দিতে
পুনরায় মিলিবারে বাধা।

শ্রীকালিদাস রায়।

(১) যুগবিভাগ। (২) মধ্যবিভাগ। (৩) ভূস্তরের গঠন। (৪) বিভিন্ন ভূস্তরে প্রোথিত প্রাণী ও অন্যান্য পদার্থের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ।
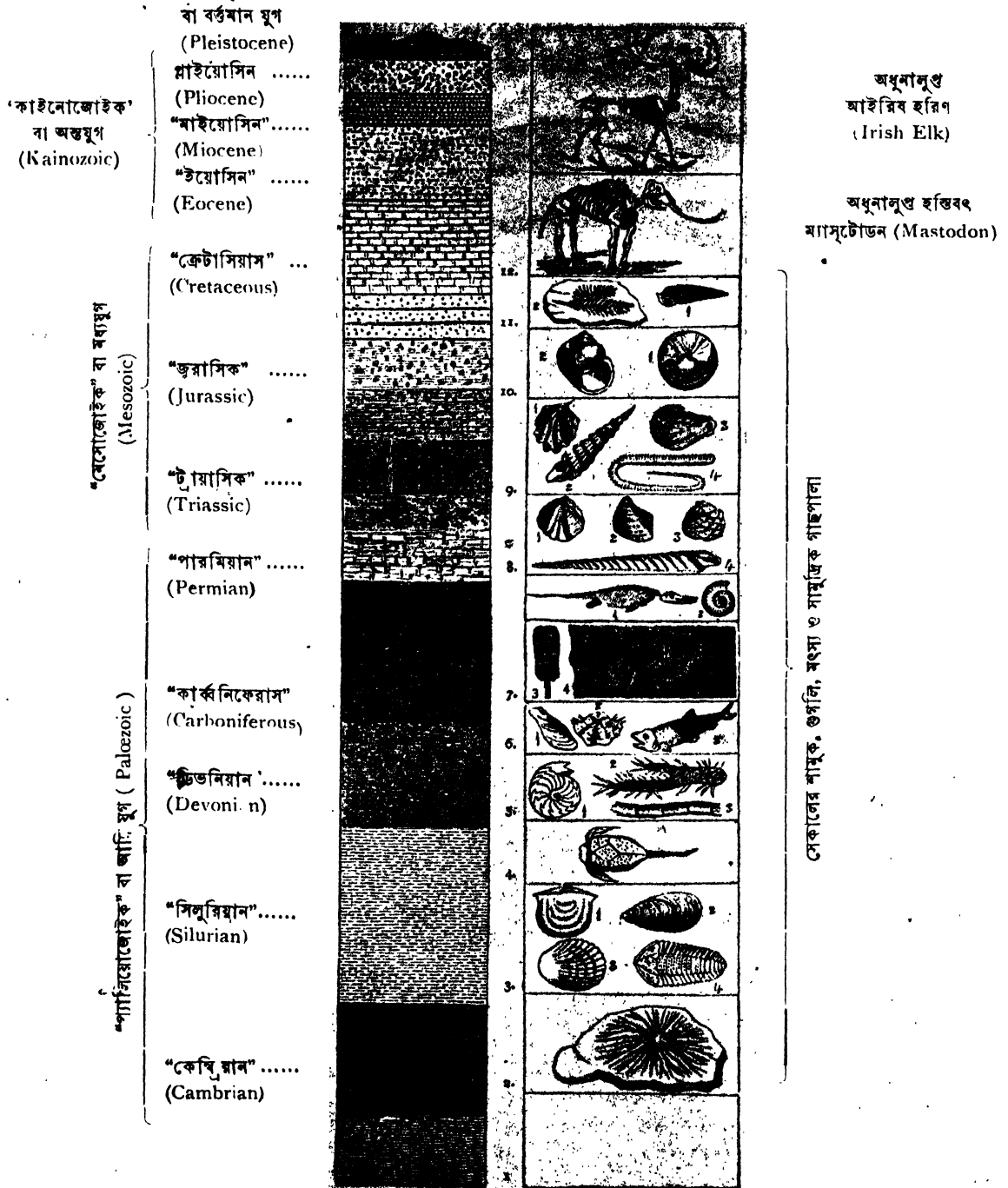
ভূস্তর ও স্তরবিভাগে প্রস্তরীভূত পদার্থের শ্রেণী।

কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য *

(সমালোচনা)

গত শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এগারখানি কাব্যগ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ করিয়া বাংলার পাঠক-সমাজকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে পাঠককে এবং সমালোচককে বিস্মিত, আনন্দিত এবং কতকটা বিপর্য্যস্ত করিবার মত এত অজস্র উপাদান এক সময়ে প্রকাশ হইতে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। এই কবিতারণ্যে অযত্ন-বিন্যস্ত বঙ্গপ্রকৃতির নব নব শোভা ও আনন্দ এবং দুর্ভোগের ভিতর দিয়া পথ ঠেলিয়া আমরা বহু পূর্ব্বপরিচিতকে দেখিতে পাইয়াছি, কিন্তু অধিকাংশের সঙ্গেই আমাদের নূতন করিয়া পরিচয় পাতাইতে হইয়াছে। কবির কাব্যজীবনের প্রথম অরুণালোকিত বসন্ত-প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া এই শরৎ-সায়াহ্নের সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত যে-সব কবিতা নানা মাসিকের পত্রপৃষ্ঠায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আজ সহসা যেন যাদুকরের মায়া-দণ্ডস্পর্শে সেই বিচ্ছিন্ন শাখা-পুষ্প-পল্লবকে একসঙ্গে মিলাইয়া দিয়া এই বৃহৎ প্রাণস্পন্দনময় কানন রচনা করিয়া তুলা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক অংশের সহিত পরিচয় সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। আমরা শুধু চোখ বুলাইয়া লইবার অবসর পাইয়াছি মাত্র। তবে একথাও ঠিক, প্রকৃত আত্মীয়ের সঙ্গে পরিচয় সুদীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা রাখে না; আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কিন্তু কি করিয়া তাহাকে প্রকাশ করিব, কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে সুরু করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছি। এই রাজ্যে শিশুর ধূলিখেলা, রমণীর অলক্তক এবং শ্রীহরির চরণরেণু একসঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে; এখানে আভীরী রমণীর আঙিয়া-কাঁচলি এবং ঘাগ্‌রী-চুনরীর জাল পাতা হইয়াছে, আবার বেনারসীর ঝিলিমিলির সঙ্গে সঙ্গে আটপৌরের পূত জীর্ণতাকেও উপেক্ষা করা হয় নাই; যুবতীর ওষ্ঠরাগের সঙ্গে এই কাননে অরুণবর্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ অশোক ফুটিয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই রক্ত-রাগিণীর ফাঁকে ফাঁকে বিধবার সিত-বাসের মত শুভ্র-ম্লান কুন্দটিও আপন করুণ সুরটি ধরিয়া দিতে বিরত থাকে নাই। এই কাননে কোথাও কদম্ব ফুটিতেছে, কোথাও গিরগিটী সুরসুর করিয়া চলিয়াছে, কোথাও বা কচুপাতা শিশির-অশ্রু মোচন করিতেছে; এখানে তমালতলে গোপিনীরা বৃন্দাবনের উৎসব জমাইয়া বসিয়াছে, আর উৎসব-দেহের প্রাণের মত শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী থাকিয়া থাকিয়া গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে। এই কাননের উচ্ছৃঙ্খল শোভার মধ্যে মনুষ্যশিল্পীর হাত পড়ে নাই; তাই এই অনায়াস-সৌন্দর্য্যের ভাল এবং মন্দ দুই'ই আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। এই ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া পথ করিয়া প্রত্যেক সৌন্দর্য্য-সুষমার অশোক-গুচ্ছ-গুলির দেখা যদি আমরা না পাইয়া থাকি তবে সে দোষ একা আমাদের নহে।

প্রৌঢ় বয়সের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াও কবির এই যে প্রকাশ-প্রাচুর্য্য ইহাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যৌবন-বসন্তের রসোদ্বেলিত হৃদয়কে কাব্যাকারে অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিতে পারা স্বাভাবিক, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই রসোচ্ছ্বাসের ভাটার দিনে পুরাতন কথার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি ছাড়া অনেকের ভাগ্যে আর কোনো উপায় থাকে না, কারো ভাগ্যে বা রস একেবারে শুকাইয়া গিয়া কাব্যবাণী একেবারে নীরব হইয়াও যায়। প্রেমই জীবকে ভাষা শিখাইয়াছে; মানুষকে কবি করিবার ক্ষমতা শুধু এই প্রেমের হাতেই আছে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রেমকে মানুষ ধীরে ধীরে বিদায় করিয়া আসে, চিরকাল সেই সুরেই কাব্য বাঁধিতে গেলে কৃত্রিমতার আশ্রয় লইতে হয় এবং এই কারণেই ক্রমে তাহা অসম্ভবও হইয়া উঠিতে পারে। এক প্রেমকে বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রেমকে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে, অতীতকে পশ্চাতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎকে জীবনের মধ্যে আবাহন করিয়া আনিতে হইবে,— চিরনবীনতার রহস্যই সেই জায়গায়। অনেকের জীবনের বসন্ত বিদায় লয় কিন্তু শরৎ আসে না; বসন্তের মত কাব্যজীবনের একটা শরৎ ঋতুও আছে। আমাদের কবির জীবন এই শরতের স্নিগ্ধতায় ভরিয়া গিয়াছে; যৌবন-প্রভাতের বাসন্তী দীপ্তি হয়ত তাঁহার চিত্তে আর মোহ বিস্তার করে না, কিন্তু তিনি শরৎ-সায়াহ্নের অস্ত-আকাশের মত শ্রীকৃষ্ণের পদরজ-আবির-কুঙ্কুমে 'লালে-লাল' হইয়া উঠিয়াছেন। আর প্রকৃত কবির চিত্ত চির-বসন্তেরই লীলাভূমি, সেখান হইতে বসন্ত কি কখনো বিদায় লইতে পারে। বসন্তই শরতে রূপান্তর গ্রহণ করে, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। উষার শুকতারাই সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা হইয়া দেখা দেয়। তবে একের সম্মুখে মনুষ্যভূমির বিচিত্র কর্ম্মকোলাহল এবং অন্যের সম্মুখে পরপারের রহস্যময় একের কোলে বিশ্ব-ব্যাপারের বিপুল বিরতি। কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে এই দুটা দিক অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ-রেখা টানিয়া দেওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না;—তাঁহার "অশোকের" কল্পনা-নেত্রে "শেফালী"র শুভ্রতা লাগিয়া রহিয়াছে, তাঁহার "শেফালী"ও "অশোকে"র রক্তিমা একেবারে হারায় নাই। কবির এই যে চির-বসন্তের প্রাচুর্য্য, সেই সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

> আমার এ কবিচিত্তে সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন;
> কবিতা-কালিন্দী তারে ছাঁদিয়াছে নীল চক্রাকারে।
> বসন্ত-উৎসব হেথা নিশিদিন; অলির ঝঙ্কারে
> মুখরিত পুলকিত নিশিদিন কুসুম-কানন।

কবিচিত্তের এই নিত্য রাসোল্লাসের নায়ক হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই কবির অনন্ত প্রেম এবং কবিত্ব-প্রাচুর্য্যের উৎসস্বরূপ। এই চিরযুবতী কবি-বধূর চির-যৌবনের রহস্য-হেতুটিও সেইখানেই পাওয়া যাইবে।

এই কৃষ্ণভক্ত কবির কাব্যালোচনায় শ্রীকৃষ্ণের কথাকেই ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া অল্পবিস্তর এই কৃষ্ণভক্তিরই তমাল-ছায়ায় কবিচিত্তের সংসার-জীবনের যে ছায়া-রৌদ্র-খেলা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

শেষ জীবনে কবি যখন বধূ তখন তাঁহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রথম; জীবনে কবি যখন পুরুষ তখন তাঁহার নায়িকা রমণী।—সুতরাং এই নারী-প্রেম-ব্যাপার লইয়াই কবির সমস্ত কাব্যজীবনের আরম্ভ। কবি দেবেন্দ্রনাথ নিছক প্রেম-কবি,—তাঁর স্বরূপটি এই এক কথাতেই পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করা যায়। নারীকে তিনি উজ্জ্বল

* অশোক-গুচ্ছ (দ্বিতীয় সংস্করণ), গোলাপ-গুচ্ছ, পারিজাত-গুচ্ছ, শেফালি-গুচ্ছ, অপূর্ব্ব নৈবেদ্য, অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল, অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা, অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা, হরিমঙ্গল (দ্বিতীয় সংস্করণ), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জানদামঙ্গল। কলিকাতা, ১১নং গোয়াবাগান স্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রঙে আঁকিয়াছেন। "অশোক-গুচ্ছের" "নারীমঙ্গল" শীর্ষক কবিতায় আমরা তাঁহার নারী-প্রীতির পরিচয় পাই—

জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য; সুকোমল কান্ত পদাবলী;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার!
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী!
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা!)
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ এ চেতনা—
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা!
কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থের মধুরতর চিকণ রঙ্গিমা—
ভাবের সে সমাবেশ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুতার গুপ্ত সে গরিমা!)—
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর, সরেনা গো বাণী!
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি?

তারপর বিলাসিনী বধূ যখন শুদ্ধ অর্দ্ধরাতে অভিসারিকার বেশে রক্ত চেলীর ঝলকে প্রমোদ-কক্ষে আনন্দ-লহরী জাগাইয়া, গৌরাঙ্গের পুলক-পরশে সারা গৃহকে হর্ষে মাতোয়ারা করিয়া পতিপাশে গিয়া মিলিত হন, তখনকার সেই দৃশ্য অনুভব করিয়া কবি বিহ্বলচিত্তে রং ফলাইয়া সেই ছবি যেমন আঁকিয়াছেন, অন্য দিকে আবার

নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের থালা, চন্দনের বাটী—
অর্চ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী!
বধূর শ্রীমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আমরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!

নারীর এই ভোগাতিরিক্ত কল্যাণী মূর্ত্তিটিও কবি-চিত্রকরের তুলিকায় তেমনি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

নারীর সৌন্দর্য্য-সম্পদে কবির হর্ষ-বিভোরতা পাঠককেও মুগ্ধ করিয়া তোলে—

তুমি মোর স্পর্শমণি! তোমার দু'হাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণ-দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে!
গৃহের আরসী ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে!
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে!
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোনার সরসে!
আমারো ছিল গো সখি, মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোনার কিরণ।

যে বাঙ্গালীর "পুত্র হলে শাঁখ বাজে, কন্যা হলে আঁধার ভবন" কবি সেই বাঙ্গালীর কানে গম্ভীর মন্দ্রে "দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ" বাজাইয়াছেন,—

পুত্র হলে শাঁখ বাজে! কন্যা হলে আঁধার ভবন।
নারীরে অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চুন কালি!
প্রকৃতি-রাধারে এত অবহেলা? তাই বনমালী
চির তরে চির তরে ত্যজেছেন বঙ্গ-বৃন্দাবন।

* * * *

মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়ঙ্করা দেবতারূপিণী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য-আধার।
নারীর মাহাত্ম্য, মূঢ়! বুঝিলে না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে। বিধাতার মানস-মোহিনী
যে কবিতা, হে পুরুষ! তুমি তার শব্দ মাত্র সার;
অক্ষরের শ্রেণী তুমি, নারী তার তাল ও রাগিণী;
যে নিশার অঙ্গে অঙ্গে উছলয়ে অসীম সুষমা,
হে পুরুষ! তুমি তার কুন্তলের ঘোর অন্ধকার।
নারী তার তারা-রত্ন, ছায়াপথ-শোভা নিরুপমা!
রজনীগন্ধার হাস, শেফালির আনন্দ-সম্ভার!
নারী তার—শান্তি, নিদ্রা, ঝিল্লীময়ী নূপুর-শিঞ্জিনী!
নারী তার পৌর্ণমাসী, জ্যোৎস্না-বন্যা, বিশ্ব-বিপ্লাবিনী

এই নারীকে কবি প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাম্পত্যলীলার ভিতর পাঠক-সমাজের কাছে মোহিনীর বেশে উপস্থিত করিয়া আমরা "লাজ-ভাঙান"র অভিনব অভিনয় দেখিয়াছি, জ্যো যামিনীর বক্ষে সুপ্ত কালো কোকিলটির মত প্রিয়ার মুখের তিলটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, 'চাবির রিং' এবং 'ডায়মন মলের' মধুর আলাপ আমাদের কানে এখনো সুধা ঢালিতে যখন "বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে" তখন প্রেমক কবি প্রিয়ার পাশে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত দুটি ধরিয়াছেন,

দিবসের পাপচিন্তা, কলুষ, সরমে,
হেরি ও সাঁজের দীপ, গিয়াছি বিস্মরি!
হাসিয়া, ছাড়ায়ে হাত, গেল বধূ ছুটি!—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি!

কবি "যুবতীর হাসি"কে বিশিষ্টতা দিয়া লিখিয়াছেন,—

গান নাহি বোঝা যায়, ভাসে শুধু সুর;
ফুল নাহি দেখা যায় সৌরভ কেবলি;
প্রাণের গবাক্ষ দিয়ে জ্যোৎস্না মধুর,
উছলিয়া অধরেতে পড়ে আসি ঢলি!
বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে কনক-মৃণালে,
তোমার হৃদয় মাঝে প্রেমের পিয়ালা!
উর্ব্বশী রঙ্গিণী সম নাচে তালে তালে,
মোহিনী মদিরা কিবা, পিয়ালায় ঢালা!
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি!
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চ হাসি?

কবি-প্রিয়ার অলক্তক-মাখা চরণযুগলে জল ঢালিয়া দিতে কা গোপনে খোকাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, "খোঁপা-খোলা শিক্ষাটিও যে তাঁহার নিকট হইতেই আসে নাই তা' কে জানে কবি কিন্তু তাড়াতাড়ি খোকার পক্ষ হইয়া বলিতেছেন—

খোঁপাটি দিয়েছে খুলে;—এই দোষ ওর?
খোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর!
দেখ সখি, চুলগুলি
শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,—
দোলায়ে অলকাবলি খেলে বায়ু-চোর।

"নিরলঙ্কারা"'র শোভা দেখিবার জন্য কবি অলঙ্কারের বাক্সের চাবিটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন,—

বিনোদিনী, চাবি তব গিয়াছে হারায়ে ?
এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি কুড়ায়ে।
কষিত কাঞ্চন জিনি,
তোর ও তনুয়া খানি।
তাহে কেন অলঙ্কার দিবিরে চাপায়ে ?
দিব না দিব না চাবি, দিব না ফিরায়ে।
* * * *
নাহি শবদের ছটা,
নাহি উপমার ঘটা,
তবু চিত্ত গীতিকাব্যে ফেলেছি হারায়ে।

বিশ্বের কোনো সুন্দর জিনিষেই কবি প্রিয়ার মুখের তুলনা পাইতেছেন না, শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন,—

এই দুটি কথা আমি বুঝিয়াছি সার
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার।

চম্পক অঙ্গুলিগুলি নাড়িয়া কবি-প্রিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বকুল-হার গাঁথিতেছেন, কবি সেই শোভা দেখিতেছেন আর মালা গাঁথা শেষ হইলে প্রিয়ার কণ্ঠে ফুলগুলির সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া বলিতেছেন.

আমিও কুসুম সাথ ; সারাটি যামিনী,
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ।
লভিতে ও পুষ্প-জন্ম বিভব গৌরব
হ্মাদে দেখ, কি উতলা হয়েছি স্বজনি।
চিকণিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা,—
আমরেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।

এই নারী-প্রেম হইতে আত্মীয়-প্রেমের পরিণতি কবির কাব্য-জীবনে অতি সহজেই হইয়া আসিয়াছে। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

বিস্ময়-বিস্ফার-নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে ;
"বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ—
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?
তার এত মাতৃভক্তি ? বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি। দেখেছ কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত ?"—ও রূপ-অনলে
(হোমানলে।) পুড়ায়েছি "আমিত্বে"র দেহ।
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে।
স্বজনি লো। তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী।—
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য-কুম্ভমেলা দিনে, সরমে ভরমে
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মা-বধূ।

এই আত্মীয়-প্রেমকে একটু বাড়াইয়া লইয়া কবির বিশ্ব-প্রেম-রহস্যের চাবিটিও আমরা এই জায়গাতেই পাই। কবি শুধু প্রেয়সী নারীকে আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি কন্যা নারী এবং মাতা নারীকেও তেমনি উজ্জ্বল করিয়াই দেখাইয়াছেন। তিনি পতি-প্রেমোৎফুল্লা যুবতীর "উচ্চহাসি"র পাশেই বিধবার "মলিন হাসি" অঙ্কিত করিয়াছেন,—

বিশ্বের ঝঞ্ঝাট ক্লেশ যন্ত্রণার একশেষ,
উপমায় হারে তোর কাছে।
হায় রে মলিন হাসি তোর চক্ষে অশ্রু-রাশি
যত আছে, জগতে কি আছে।

তিনি কুলীন-কলঙ্কিনীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, গণিকার হরি-ভক্তির কথা বলিয়াছেন।

কবি-প্রিয়ার ভিতর দিয়াই কবি রমণীসমাজের সহিত যেমন, সমগ্র বিশ্বসমাজের সহিত তেমনি একাত্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন। ব্যাপ্তির দিকে যে প্রেম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, সংহতির দিকে আবার তাহাই একের রসে ডুবিয়া যায়,—এই ভাবে. কবি বিশ্বপ্রেমের ভিতর দিয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্নীত হইয়াছেন এবং কবির নারীপ্রেম এবং কৃষ্ণপ্রেমের যোগ-সূত্রটিও এই বিশ্ব-প্রেমের মধ্যেই। কিন্তু কবির এই নারীপ্রেম এবং কৃষ্ণপ্রেমের যোগ এবং সামঞ্জস্যটি অনুভব করিয়া লইতে বাহিরের এই আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যপন্থাটির তো কোনো আবশ্যকতাই দেখি না, বরং এই যোগটিকে কবিচিত্তের সুনিবিড় একানুভূতিতেই সোজাসুজি ভাবে পাওয়া যায়। যে নারীকে কবি লৌকিক মাতারূপে দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই অতিলৌকিক জগজ্জননী বিশ্বপ্রকৃতিরূপে পূজা করিয়াছেন। কবির শ্রীরাধাই এই বিশ্বধাত্রী প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি যেমন জীবের সেবাপরায়ণা মাতা, তেমনি জীবভোগ্যাও বটেন; শ্রীরাধা একদিকে যেমন জগতের শাশ্বত মাতা, অন্যদিকে তেমনি জগতের শাশ্বত প্রেয়সী।

"——বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার"

এই কথা উর্ব্বশী সম্বন্ধে যেমন শ্রীরাধা সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। রাধিকার এই দুইরূপ সর্ব্বজনবিদিত। বৈষ্ণব কবিরা সাধারণতঃ এই বিশ্বপ্রেয়সী রাধাকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের কবির কাব্যেও 'মাতা রাধা'র উল্লেখ খুব বেশী নাই। "পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান" নিজ নিজ দাম্পত্যজীবন হইতেই চুরি করিয়া আনিয়া বৈষ্ণব কবিরা এই বিশ্বপ্রেয়সীর ভিতর দিয়া আপন আপন দাম্পত্য-রসকেই যে অনেকটা নূতন ভাবে ভোগ করেন নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথা ঠিক যে শ্রীরাধার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কবিচিত্তকেও বধূবেশে কঙ্কণ-নূপুর ও কাঁচলি চুনরীতে সাজাইয়া শুক্ল নিশীথের দুর্গম পথে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাভিসারে পাঠাইয়াছেন। কবি দেবেন্দ্রনাথও যে শ্রীরাধাকে চিরঈপ্সিতা দয়িতারূপে কামনা করিয়াছেন তাঁহারাই অস্তিত্বে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া আবার চিরঈপ্সিতের অভিসারে বাহির হইয়াছেন। অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষের এই নারী হওয়ার রহস্যের কথা এমার্সন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—এখানে সে-সব উল্লেখের স্থান নাই। আমাদের বৈষ্ণব সাধনাতেও জগতের শাশ্বত পুরুষের নিকট জগদ্বাসী মাত্রই যে নারী সে কথা সকলেই জানেন। সে যাহা হউক, কবির নারীপ্রেম এবং কৃষ্ণপ্রেমের সোজাসুজি যোগটি আমরা এই খানেই পাই।

নারীর পরেই শিশুকে কবি তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন বলা যায়। কেহ যদি বলেন কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে প্রধান স্থান শিশুরই, তাহা হইলে সে কথায় আশ্চর্য্য হইবারও কিছু নাই। যাহা হউক নারীকে লইয়াই তাঁহার কাব্যসূচনা হইয়াছে, এবং অল্পে অল্পে শিশু যখন তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল তখনও প্রথমটা নারীর শোভাবর্দ্ধক ভাবেই শিশুকে তিনি দেখিয়াছেন, স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই।

ফুল-শিশু আঁখি খুলে
তরু-শাখে দুলে দুলে,
দেখে যবে মুগ্ধ মুখে উষার বয়ান,
ভুবন ফিরাতে নারে আপন নয়ান।

তরুকোল শূন্য করি ;
সে তরু-দুলালে হরি'
আমি কি আনিতে পারি থাকিতে এ প্রাণ ?

এখানে শিশু ফুল, নারী-তরুর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনই তাহার উদ্দেশ্য। কবি আবার বনের শোভা পাখীর সহিত খোকার তুলনা করিতেছেন ; কবি খোকাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে তাহার মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কবি বর্ণনা করিলেন,—

পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ।

কিন্তু শেষে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিয়া শিশু কবির হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। এখন আর তাহার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কবি "মেন্তু"কে আদর করিয়া যখন বলিতেছেন,—

তোমার চরণস্পর্শে মুঞ্জরি উঠেগো হর্ষে
হৃদি-তরু অরুণ অশোক।

তখন এই নূতন সতিনী সম্বন্ধে কবি-গৃহিণীর রাগ করিবার কিছু নাই, তখন তাঁহাকেও সতিনীকে আদর করিয়া বলিতে হয়,—

ছয় বছরের কন্যা রূপে গুণে তুই ধন্যা
স্নেহময়ী মোদের নাতিনী,
বহু পুণ্যপুঞ্জ-ফলে বহু তপস্যার বলে
পাইয়াছি এহেন সতিনী।

সতিনীর প্রতি এরূপ উদারতা আশ্চর্য্য বটে। তাঁহারা উভয়েই কবিচিত্তে আপন আপন রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছেন, এখানে কেহ কাহাকেও বাধে না, কাজেই কেহ অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দেখা দেন নাই। কবি এই স্বপ্রধান শিশুকে কত নমু, রাণী, ফুলরেণু এবং "সাধনবাবু" রূপে আঁকিয়াছেন, কত বন্ধু এবং কবি-ভ্রাতার শিশুকে তিনি কাব্য-কোল দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। এই শিশু কখনো কবির খুকুমণির আকারে—

আরসি-ভাঙ্‌নী, চেয়ার-নাশিনী,
পুস্তক-ছিঁড়্‌নী, কাগজ-গ্রাসিনী,
সর্ব্বত্র-গামিনী, সুন্দর ডাকিনী

রূপে দেখা দিয়াছে ; কখনো বা "মাতাল" সাজিয়া টলিয়া টলিয়া চলিয়াছে,—

টল্, টল্, চল চল, জুতা পায়ে দিয়া,
চলেছেন খোকাবাবু হেলিয়া দুলিয়া।
কবে কোন্ কালে, সেই বাসবের পাশে,
সুধা-ভ্রান্তি খেয়েছিলি মন্দারের গ্রাসে,—
এখনো গেল না নেশা, হায় রে কপাল,
না জানি কেমন সুরা। কেমন মাতাল।

কখনো বা সেই শিশু "ডাকাতে"র মত "মহা আস্ফালন করি" গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে এবং গৃহকর্ত্তা হাত যোড় করিয়া হৃদয়-ভাণ্ডার তাহার পায়ে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শিশু-রাণী যখন বহুদিন পরে মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে তখন একটি বয়োপ্রাপ্ত শিশুরই মত তাহার পিসীমা সরোজিনীর ছবিটি আমাদের বেশ লাগিয়াছে,—

"দেখ মা খুকির ডাগোর ডোগর
হইয়াছে চক্ষু দুটি।"—
কোলে লয়ে তারে, সুখী সরোজিনী,
গৃহে করে ছুটোছুটি।
মায়েরে দেখায়, দাদারে দেখায়,
চটকায় জোরে তারে।
মার তিরস্কার, নাহি শোনে কানে ;
জোরে টেপে বারে বারে।
হাসিয়া হাসিয়া, বলে সরোজিনী—
"উহারে টিপিতে বেশ ;
ফুলের মতন, দেহের গঠন,
রেশমের মত কেশ।
এত ওরে টিপি মুখ টিপে টিপে
খুকি তবু হাসে কেনে ?
মোর কোলে আছে, তাই তোমাদের,
হিংসা বুঝি জাগে মনে ?"

শিশুদের ত জাত্ নাই, কবি চাঁড়াল-শিশুকেও অসঙ্কোচে কোল দিয়াছেন। পাঠককে এই "অদ্ভুত বাউলের গান"টি শুনিতে হইবে,—

(আমায়) কে রে করে এক-ঘরে ?
(ও তোর) আর্য্যামি-ভণ্ডামি রাশ, জলে-ভরা দুধের কেঁড়ে।
আমায় কে রে করে এক-ঘরে ?
(সে দিন) গিয়ে তোদের পাড়া-গাঁয়,
বসে আছি চণ্ডিতলায়—
(এক) চাঁড়ালেদের সোনার যাদু নাচ্‌তে লাগল আমায় হেরে।
ঝাঁপিয়ে এল আমার কোলে,—
(আমি) যত্নে তারে নিলাম তুলে।
তোরা বল্লি "ছি ছি। কি কর ? কি।" তোদের কথা শুন্‌লাম কি রে
(আমায়) কে করে রে এক-ঘরে ?
ওরা সবাই ঢালা এক ছাঁচে,
(ওরে ছেলেদের কি জাত্ আছে ?)
তোদের মুখে আছে মোহের মুখস্, এসব কথা বুঝবি কি রে ?
(আমায়) কে করে রে এক-ঘরে ?
(সেই) চাঁড়াল-শিশুর চুমো খেয়ে,
বসেছিনু অবাক্ হয়ে ;
আর কাঙাল-বন্ধু গুহক-সখা দেখা দিলা অন্তরে।
(আমার) আঁখির বাঁধন গেল খুলে,—
যুবা ছিলাম, হলাম ছেলে।
(এখন) যুবমি বুড়মি ছেড়ে, ছেলেমি করি পেট ভরে।
(আমায়) কে রে করে এক-ঘরে ?

এই ভক্ত কবি ঐকান্তিক বাৎসল্যভাব হেতু প্রত্যেক শিশুর মধ্যে বালক যীশু এবং ব্রজের গোপালের মূর্ত্তি দেখিতে পান,—

তোরে হেরি, ওরে শিশু, পড়ে মনে ম্যাডোনার কোলে,
বালক যীশুর মূর্ত্তি। রাঙা পায়ে মধুর নূপুর,
তুই যেন ব্রজের গোপাল।

অন্যত্র—

তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ভরি গেল বুক।
অপূর্ব্ব বাৎসল্য-ভাব চিত্তে জাগে।—বুঝি এতকালে.
পাব আমি নীলকান্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে।

কবি শিশুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

অমৃতের মহাসিন্ধু অপূর্ব্ব হিল্লোলে,
আমার এ কবি-চিত্তে বহিছে কল্লোলে।
তারি বেলা-ভূমে আমি রচেছি সুন্দর,
সৌন্দর্য্যের জগন্নাথ-পুরী মনোহর।

সুন্দর দেউল রচি করেছি স্থাপন
রে সুন্দর! তোর ওই মুরতি মোহন।
প্রসারি অন্তর-দৃষ্টি হের এ অমর সৃষ্টি;—
এ নহে কল্পনা-কথা, এ নহে স্বপন;
শিশুই মানব-বেশে দেব নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণের বালকমূর্ত্তি দেখিবেন, ভক্ত-কবির ইহাই সাধ,—তাই রাখাল রূপে মা যশোদাকে তিনি বলিতেছেন—

ওগো মা জননী, ওগো নন্দরাণি
(একবার) বল্ বল্ বল্ ওরে নাচ্‌তে।
(একবার) তেমনি করে, নূপুর পরে নাচ্‌তে।
ছোট বাহুদুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
রুণু রুণু রুণু নূপুর বাজায়ে,
হাসায়ে কাঁদায়ে, কাঁদায়ে হাসায়ে,
তেমনি করে বল্ ওরে নাচ্‌তে।

আমরা দেখিয়াছি কবির নারীপ্রেম কেমন তাঁহাকে মধুর ভাবে শ্রীভগবানের পূজা করিতে শিখাইয়াছে; এখানে আমরা দেখিতেছি কবির বাৎসল্য-ভাব শ্রীভগবানকে অন্য মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। নারীপ্রেম কিম্বা শিশুপ্রেমের রেখাটিকে শেষ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিলে তাহা ভগবৎপ্রেমেই গিয়া ঠেকে, যে-কোনো দিক দিয়াই চরমতা অনন্তের সঙ্গেই মিলিয়া যায়। কবি নারীপ্রেম এবং শিশুপ্রেমের মধ্য জায়গাতেই ঠেকিয়া যান নাই। এগুলির সঙ্গে ভগবৎপ্রেমের প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নাই, তবু প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে প্রভেদ থাকিয়া যায় তাহা শুধু আপেক্ষিক নিবিড়তায়। কবি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে এই নারীপ্রেম এবং শিশুপ্রেম এমনি রস-নিবিড়তা লাভ করিয়াছে যে দেশের অতীত যুগের বৈষ্ণব সাধনার সূত্রটিকে ঘিরিয়া শ্রীভগবানের মূর্ত্তি সেখানে আপনা আপনি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

কেবল মাত্র এই নারী- এবং শিশু-সমাজকে কবি তাঁহার কাব্যে স্থান দেন নাই,—তাঁহার সারা কাব্যজীবন জুড়িয়া সকলকে কোল দেওয়ার ভাবটি অতি উজ্জ্বলভাবে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার স্নেহ অসাধারণ, তাঁহার বন্ধু-প্রীতি অতুলনীয়, বাংলার আধুনিক কবি-সমাজকে তিনি স্নেহাশিসে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার কাব্যে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। পথের পথিকও সে প্রীতি লাভ করিতে বঞ্চিত থাকে নাই। কবি মানবেতর প্রাণীকেও পরম পুলকে আলিঙ্গন দান করিয়াছেন। ধরণীর নরনারী-সমাজের প্রতি এই কবির ভাবটি আশ্চর্য্য রকম উদার। যাহারা মানবকে কুৎসিত এবং কুকর্ম্মরত বলিয়া দেখে কবি তাহাদিগকে বলিতেছেন,—

নিজেই উড়ায়ে ধূলা, হেরিতেছ সব অন্ধকার।
নেত্র-রোগে হারায়েছ বর্ণজ্ঞান;———
——————————মানস-দর্পণে
নিরখিছ নিজমূর্ত্তি সারা বিশ্বে দিবস রজনী।

কবির চক্ষে নরনারী অপূর্ব্ব সুন্দর। তরুরাজ্যে জীবরাজ্যে সবই তাঁহার আপন।—

হে প্রকৃতি, একি লীলা বুঝিবারে নারি—
যে দিকে তাকায়ে দেখি সে দিকে কি সখাসখী,
তরু-রাজ্যে জীব-রাজ্যে যত নরনারী?
প্রজাপতি উড়ে ঘুরে, বসে আসি মোর শিরে;
মুচকিয়া হাসে সব কুসুম-কুমারী।
প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের শিখীটি পেয়েছে টের,
আমি গো স্বজন তার;—রঙ্গ দেখ তার
সম্মুখে আসিয়া দেয় নৃত্য-উপহার।

কবি তাঁহার জীবন-কাব্যে জগন্মাতার এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি,—

"তৃণ হ'তে নীচ হয়ে, ক্লেশ আধিব্যাধি
তরুসম সয়ে, ধর বৈষ্ণবের রীতি!
শত্রু মিত্রে সবাকারে প্রাণপণে প্রীতি
কর বৎস।"

জীবরাজ্যের মত মূক প্রকৃতির প্রতিও কবির আন্তরিক আকর্ষণ অত্যন্ত সহজ-সরল এবং জন্মার্জ্জিত। কবি প্রকৃতিকে বন্ধুর ন্যায় ভালবাসেন, আত্মভোলা শিশুর ন্যায় খেলার সাথী করিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন। ফুল তাঁহার কেমন প্রিয় তাহা তাঁহার পুস্তকের নামগুলি হইতেই সূচিত হয়। পরমাত্মীয়ের মত প্রসন্ন ফুল্লমুখে ফুল তাঁহাকে নিত্য অভিনন্দিত করে। গাঁদাফুলের কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

যে ভবনে নাহি হয় শঙ্খধ্বনি দেবের উদ্দেশে
সে গৃহ শ্মশান।
রচি উপচার নানা, যথা হয় দেবার্চ্চনা,
সেই গৃহ ইন্দিরার স্থান।
থাক্ শত দাস-দাসী, অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি,
সু-ঝালর ঝুলুক বিতানে;
গৃহ করি ভরপূর উঠুক হাসির সুর,—
কিবা তায়,—ফুল যদি না ফুটে উঠানে?

কবির চিত্ত প্রকৃতিকে মানবীয় বৃত্তি দান করিয়াছে। কবি কুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

কেন এ উদাস ভাব ধরিয়াছ ধনি?
হয়েছ কি বাল্যকালে নব তপস্বিনী?

মানবের সহিত তাহার সাদৃশ্য-সম্বন্ধ না পাতাইয়া কবিচিত্ত স্থির থাকিতে পারে না,—

তোরি মত, কত শত নব তপস্বিনী
আছে বঙ্গ-ঘরে।
আশৈশব শ্বেতবাস, অশ্রুজল বারমাস,
দেশাচার-শৃঙ্খলেতে তাহারা বন্দিনী;
তোরি মত, কুন্দ, তারা নবীন যোগিনী।

কুন্দ যেমন প্রকৃতি-রাজ্যের বালবিধবা, অশোক তেমনি অলক্ত-সিন্দূর-আঁকা অরুণবর্ণা যুবতী, গোলাপ সেখানকার ব্রীড়া-রাগময়ী নববধূ। কবির মানিনী রক্তজবা আঁখি লাল করিয়া "বিরহ-ব্রত" পালন করিতেছে, শুভ্র-পূতা দেবারাধনা-রতা সেফালী-সুন্দরী নিত্য উষার পায়ে আপন জীবন দান করিয়া পূজা যোগাই-তেছে, আর কামিনীগুলি মানবরাজ্যের কামিনীদের রূপ-যৌবনের অনিত্যতার রূপকের মত "ভাল করি না ফুটিতে, সুসৌরভ না ছুটিতে" নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িতেছে।

নারী, শিশু, মানবসাধারণ কিম্বা প্রকৃতির দিক হইতে কবিকে বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যায়, কিন্তু কবির প্রতি ঠিক সমন্বয়-দৃষ্টিটি শ্রীভগবানের দিক হইতেই সম্ভবে। "কদম্ব-সুন্দরী" শীর্ষক কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

এ জগতে সৌরভ ও প্রীতি,
রমণীকণ্ঠের গীতি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না,
সবি এক; মরি মরি একই মৃণালে
শত শতদল গাঁথা।

বাস্তব জগতের সঙ্গে তাহার প্রতিরূপ একটা সূক্ষ্ম জগৎও গায় গায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। রমণীর ওষ্ঠরাগ, শিশুর হাসি, বন্ধুর প্রীতি এবং ফুলের শোভা প্রভৃতি টুকুরা টুকুরা সৌন্দর্য্যের বিচ্ছিন্ন দলগুলি যে হরিদেহের মৃণাল-শীর্ষে মিলিত হইয়া কবি-হৃদয়ের বাস্তব স্তরে সংসার-শতদল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে তাহারই রক্তপদের মত শিকড় কবি-হৃদয়ের অন্তরতম সূক্ষ্ম প্রদেশ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; বাহিরের আলো-অনিলের রাজ্যে যাহা শতদলে ফাটিয়া পড়িয়াছে, ভিতরের সুনিভৃত রহস্যময় গহনে তাহা একটি চিকণ দেহ-ভঙ্গিমার মত শুধু এক সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল রেখা রূপে বিরাজিত। বাহিরের দলবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া যেমন এই ভিতরের এককে দেখিতে হইবে, তেমনি ভিতরের এই হরিভক্তির মৃণালের দিক হইতে না দেখিলে বহির্বৈচিত্র্যের শুষ্ক বিচ্ছিন্নতাকে রসোজ্জ্বল্যে লগ্ন এবং আলোকিত করিয়া দেখা সম্ভব হইবে না।

যে বিভিন্ন হৃদয়বৃত্তিকে মানব বাহিরের বৈচিত্র্যসঙ্গতে সার্থক করিতে চেষ্টা করে অথচ সম্পূর্ণভাবে পারে না, সেই হৃদয়বৃত্তিগুলি তাহাদের বিভিন্নতা অনেকটা রক্ষা করিয়াও ভিতরের এই একের মধ্যে চরমভাবে সার্থক হইয়া উঠে। এই জন্যই ভগবান ভক্তের প্রভু, বৎস, সখা এবং স্বামী, প্রেয়সী একাধারে সকলই; তিনিই সর্ব্ব-রসাধার, সর্ব্বাঙ্গীন মানবাকাঙ্ক্ষার একমাত্র তৃপ্তি। বিভিন্ন ভাবের মধ্যে মধুর ভাবের আরাধনাই শ্রেষ্ঠতম। কবি-বৈষ্ণব বলিতেছেন,—

হে গোবিন্দ, হে মাধব, নারায়ণ, মুকুন্দ, মুরারি।
আমি চাহি হইবারে শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বনফুল;—
নেত্রে হাসি, ঋষিপত্নী পরি' বাকল-দুকূল,
স্বহস্তে তুলিবে মোরে। "জয় হরি" বদনে উচ্চারি,'
বিনায়ে বিনায়ে গাহি' কৃষ্ণ-স্তোত্র, প্রাণ-মনোহারী,
বাজাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা, উন্মাদন জ্বালিয়া গুগ্‌গুল,
তপোবন আশ্রমের ঋষি-বৃন্দে করি হর্ষাকুল,
অর্পিবে তোমার পদে। ধন্য ভাগ্য যাই বলিহারি!
দাস-ভাবে চুম্বি পদ দিনে দিনে হব ভাগ্যবান;
সখাভাবে হয়ে মরি সুচিকণ বরগুঞ্জমালা,
আলিঙ্গিব কণ্ঠ তব। কৌস্তুভ-কিরণ করি' পান,
জ্যোতির্ম্ময়। হব আমি হিরণ্ময়, অপূর্ব্ব উজ্জ্বলা!
তার পর? তার পর মধুর ভাবেতে হয়ে ভোর,
মাথার ভূষণ হ'য়ে পাব মুক্তি; ওগো চিত্তচোর।

বিশ্বজোড়া ঔদারতাই প্রকৃত ভক্তচিত্তের লক্ষণ। মহাত্মা যিশুকে লক্ষ্য করিয়া এই কৃষ্ণভক্ত কবি বলিতেছেন—

জীবন কাটিয়া গেল; দেখা যায় মরণের তীর;
ওই হায় উপকূলে শোনা যায় জলধি-গর্জ্জন।
আমার সম্বলমাত্র ভাঙা-বুক, নয়নের নীর।
এই পারানির কড়ি, দয়া করি, নাবিক সুজন,
লও, লও। লোকে বলে, বিশ্বমাঝে তুমি অতুলন,
দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময় কাণ্ডারী সুন্দর।
হে যিশু। কাঁদিছে প্রাণ, দলে দলে গভীর তিমির
ঘনাইল। এল বুঝি কালরাত্রি! ফুরায় জীবন!
হে নির্লোভ! হে নিষ্পাপ! তুমি চাও খাঁটি অশ্রুবারি
পরিতপ্ত হৃদয়ের, নাহি চাও ধনীর কাঞ্চন;
তাই হোক্; শুভক্ষণে, বেলাভূমে, দোহাই তোমারি,
চরণ-রাজীবে আজি অশ্রুজল করিনু অর্পণ।
বাহ তরী, বাহ তরী; উজলিয়া নদীর মোহানা,
ফুটিছে চাঁদের আলো। পারে চল, গাহিয়ে সাহানা।

ভগবান এই ভক্তকবির কেমন আপন, এবং তাঁহার প্রতি কবির কী অপরিসীম নির্ভর, তাহা নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে সুন্দর ফুটিয়াছে,—

জনম জনম আমি তোমায় হেরিনু স্বামী,
আঁখি না জুড়াল।
লাখ লাখ যুগে যুগে বঁধুহে ধরিনু বুকে,
আকুলি ব্যাকুলি মোর তবু না ফুরাল।
জনম জনম আমি জান হে অন্তরযামী,
করিলাম মান।
তোমার দর্শন পাই মান রোষ ভুলে যাই।
হে শ্যাম, তোমার প্রেমে নাহি অকল্যাণ।
জনম জনম আমি, তোমারেই পাই স্বামী,
এই দাও বর।
হে বঁধু যে কাজ কর, তাই হয় মনোহর,
হে বঁধু যে সাজ ধর তাহাই সুন্দর।
জনম জনম আমি পেয়েছি হৃদয়-স্বামী
কতই যাতনা।
সুখ দাও, সেও ভাল, দুখ দাও, সেও ভাল,
আমার স্বভাব শুধু ও পদকামনা।
জনম জনম আমি, চাইনা হৃদয়-স্বামী,
কোনো পুরস্কার।
চাই না রূপের কান্তি, সে শুধু আঁখির ক্লান্তি,
তুমিই প্রাণের শান্তি ব্রজ-গোপিকার।
জনম জনম আমি করি গো হৃদয়-স্বামী,
এই সে বাসনা,—
আমি থাকি ক্রোড়ে ধরি, তুমি যাও নিদ্রা হরি।—
আমি হেরি ওই মুখ হইয়ে মগনা।

কবির হৃদয়-নিকুঞ্জে শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠিয়াছে; কবির চিত্ত-রাধা আনন্দে আত্মহারা হইয়া সখিগণকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

সখিরে,
সাজাইয়া দেলো আজি বাসন্তিয়া বসনে।
কানে কদম্বের দুল,
শিরে নাগেশ্বর ফুল,
অশোক চম্পকে দেরে উজলিয়া বরণে।
মুখর কুসুমে দেরে নূপুরিয়া চরণে।
সখিরে,
ঝলকিয়া অলকেরে চামেলি ও বকুলে,
উজলিয়া দেলো মোরে মোহনিয়া দুকূলে।
গলে দে মালতীমালা,
সাজাইয়া দেলো বালা,
মনোহরা পারুলে ও মোতিয়ার মুকুলে।
শ্যাম যেন বলে হেন বধূ নাহি গোকুলে।

আমরা এই "বিরহিণী" চিত্তবধূকে বলি, প্রিয়মিলনের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সাজ তাঁহার হইয়া গিয়াছে, তিনি এখন নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার হৃদয়-স্বামীর অভিসারে যাত্রা করিতে পারেন।

আমরা এতক্ষণ কবির রচনা হইতেই যথাসম্ভব তাঁহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি; তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি মোটামুটি কথা বলিতে বাকী রহিয়াছে, সেগুলি না বলিয়া লইলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়িবে, কবি তাঁহার অধিকাংশ কবিতাকেই বিশেষ কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলায় সাজাইয়া দেন নাই। অভি-

সারিকা "ব্রজাঙ্গনার" ছবি, "শিশুমঙ্গল" গীতি কিম্বা প্রীতি "নৈবেদ্য" পরিবেষণের ভাবও তো কোনো গ্রন্থবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এগুলি বরং তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থাবলীরই বিশেষত্ব-লক্ষণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা কাব্যের পর অনুরূপ বস্তুবিষয় অবলম্বন করিয়া "অপূর্ব্ব" আখ্যায় নবীন কাব্যদ্বয় রচিত হইয়া উঠিয়াছে শুধু এই জন্যই "অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা' এবং "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা" সমগ্র কাব্যাবলী হইতে পৃথক অস্তিত্বের নামরূপের দাবী করিতে পারে; নহিলে মোটের উপর তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ বিশেষত্ব-জ্ঞাপক কিম্বা সার্থকনামা নহে, বিশেষতঃ কবির "গুচ্ছ"গুলি। কবিতার সন্নিবেশে কবি বিষয়-স্বাতন্ত্র্য কিম্বা সময়ক্রম কোনো রীতিকেই তেমন ভাবে ধরিয়া থাকেন নাই। এই জন্য প্রথমতঃ আমাদের মনে হইয়াছিল কবিতাগুলি যে-কোনো রীতিতে হয়ত আরো ভালো করিয়া সাজানো যাইতে পারে। কিন্তু ক্রমে আমাদের ধারণা হইয়াছে যে এই অযত্ন-বিন্যস্ত বন্যতাই এদের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক; কারণ, প্রথম রীতি অবলম্বনের পক্ষে প্রতিবন্ধক এই যে এদের মধ্যে প্রকৃত বৈচিত্র্য খুব কম এবং আপাতদৃষ্টির বৈচিত্র্যগুলির মধ্যেও সীমারেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট; আবার যে-কবির কাব্যজীবনে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে একটা ক্রমাভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে শুধু তাঁহারই কাব্যসম্বন্ধে শেষোক্ত রীতি প্রকৃত কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে সেই ক্রমাভিব্যক্তির যথেষ্ট অভাব আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

ইহা একটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। এত দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া রচিত এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীর মধ্যেও কবির চিত্ত-বিকাশের ইতিহাস-ধারার অভাসটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এই কবির চিত্তের ইতিহাসকে বিকাশ-ক্রমের যুগে যুগে বিভক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে বিফল হইবে বলিয়াই মনে করি। কবির লৌকিক প্রেম হইতে অতিলৌকিক প্রেমে উন্নতির কথা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক কবি-হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন (?) তাঁহার কাব্যজীবনের কোনো বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে বলিয়া তো মনে করিতে পারি না। আসল কথা, পরিবর্ত্তন জিনিষটাই এই কবির প্রকৃতিবিরোধী। তিনি যে কখনও কৃষ্ণ-প্রেমিক ছিলেন না এই কথা মনে করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই কবি মঞ্জরী এবং "কলিকা-জীবন যাপন" না করিয়াই ফোটাফুল হইয়া জন্মিয়াছেন। বিভিন্ন মানস-অবস্থার বৈচিত্র্য এবং বিরোধের ভিতর দিয়া স্তরে স্তরে একটি মানবাত্মার বিকাশ-রহস্যকে আবিষ্কার করিবার পরম রমণীয় উপভোগ হইতে আমরা এখানে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত। এই হৃদয়সর্ব্বস্ব কবিকে কোনদিন বিন্দুমাত্র সন্দেহ আসিয়া আলোড়িত করিয়া যায় নাই; মনঃশক্তিসম্পন্ন বীরকবির মত মানবের জটিল জীবন এবং সমাজসমস্যার সম্মুখীন হইবার কিম্বা বিশ্লেষণ-সূক্ষ্ম কবি-কল্পনাকে মানবমনের গূঢ় অলকাপুরীতে পাঠাইবার কবিত্ব-তীক্ষ্ণতা এই কবির আদৌ নাই; বৈচিত্র্য-পন্থায় ইন্দ্রজাল ফলাইবার মত কবি-প্রতিভার এখানে সম্পূর্ণ অভাব আছে; এবং যে বিরোধ-বিপত্তি পরবর্ত্তী আত্মসমর্পণের মিলন-রসকে প্রগাঢ় করিয়া তুলে এখানে তাহার সন্ধান করিতে যাওয়াও বৃথা। এই এক কবি যিনি ভ্রমরের বাহিরের-শুষ্কতায়-জন্মিবার এবং উড়িবার ক্লেশকে কিছুমাত্র স্বীকার না করিয়া একেবারে ফুল-দেহের মধুকোষেই জন্মলাভ করিয়াছেন। এই পদ্মকোষগত কবি-ভ্রমরের পক্ষে মধুভোগ অত্যন্ত সহজ বলিয়াই প্রাকৃত। অথচ প্রকৃত কবি-ভ্রমরের মত বস্তু-পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া আসিতে হয় নাই কিম্বা দেহসৌন্দর্য্যবিধান, বিহারভঙ্গী এবং কল-গুঞ্জনের কলা-চেষ্টাও তাঁহাকে আদৌ করিতে হয় নাই। এই স্বভাব-মধুজীবিতাই কবির স্বভাব-বিকাশ এবং কলা-কৌশলের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

এই স্বভাব-মধুজীবিতা যাহার ভাবাত্মক কারণ, কবির মানসতার (Intellectuality) অভাবই তাহার অভাবাত্মক কারণ, অর্থাৎ এই মানসতার অভাবই কবিকে স্বভাব-মধুজীবী, কাজেই স্বভাব-বিকাশহীন এবং অ-কলাকুশল করিয়াছে। এই অমানসতার ভাল-মন্দ দুইই আছে।

কবির "অশোকগুচ্ছ" প্রভৃতির অনেক প্রেমকবিতায় অথবা লক্ষ্মণের প্রতি ঊর্ম্মিলার লিপি-কাব্যে একটা উপভোগ্য বস্তু-রস আছে। কবি দেবেন্দ্রনাথের নিকট এই দেহাগার আদৌ বন্ধনের মত হইয়া দেখা দেয় নাই; তিনি এই দেহকেই পবিত্র মনে করিয়া সেখানেই তাঁহার চিরজীবনের সুখ-নীড় বাঁধিতে পারেন। শিশুচিত্র এবং ভক্তিপ্রাণতায়ও এই মানসতার অভাবেই বস্তুরস ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে।

এই অমানসতাজনিত কাব্যকলাগত যত সব দোষ থাকিতে পারে কবি দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীতে সেগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মনঃশক্তিসম্পন্ন বিশ্লেষক প্রতিভাই শুধু একটা জিনিষকে তাহার বিভিন্ন দিক হইতে দেখাইয়া নব নব বৈচিত্র্যের আনন্দে পাঠককে নিত্য সজাগ এবং মুগ্ধ রাখিতে পারে। কবি দেবেন্দ্রনাথ যখন একই সুরে "ভালবাসি, ওগো আমি ভালবাসি" শুধু এই কথাই গাহিয়া চলিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাল লাগার দিক হইতে না হউক, কাব্যকলার দিক হইতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে সাহিত্যের ভাষা এবং চিন্তাগত মুদ্রাদোষে তিনি প্রতিনিয়তই অধিকতর দুষ্ট হইয়া চলিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের এই এক ভাল লাগার ভাবটি দুই চারিটি উপমা-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া যখন বিভিন্ন নামরূপের অতি-স্বচ্ছ আবরণের নীচে দিয়া গ্রন্থাবলীর এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া আসে তখন সেই একঘেয়ে ভাবে পীড়িত হইতে হয়।

এই কবির ভাল-লাগার একটা ক্ষমতা আছে, কিন্তু উল্টা দিকে পরবিচার এবং স্ববিচার-ক্ষমতার অভাবে একটা বড় রকমের দোষও আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অবস্থাটাকে অহঙ্কার-হীনতার উচ্চপদবী দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাকে ব্যক্তিত্ব-হীনতার নামে অভিহিত করিলেও অন্যায় হইবে না।

সমতলভূমির জলধর্ম্মিতাই এই কবির বিশেষত্ব। তিনি আপনাকে শুধু চারিদিকে 'পাতল' করিয়া বহাইয়া দিতে জানেন, তীক্ষ্ণমুখ শরের মত পাতালে প্রবেশ করিতে কিম্বা লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত আকাশে উড়িতে জানেন না। যে সমুচ্চ মানস-তট বারি-বেগকে ধারণ করিয়াও তাহাকে সমুদ্রের দিকেই অগ্রসর করিয়া দেয় এই কবির হৃদয়-রাজ্যের 'সমতটে' তাহা কিছুমাত্র মাথা উচু করিয়া দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রের মত বিশ্বলোককে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তুলিবার অন্ধ অনুকরণে আপনাকে ছড়াইয়া দেওয়ার চেয়ে তট-বন্ধনকে মানিয়া লওয়ার আপাতক্ষতি এবং পরবর্ত্তী পরম লাভ অধিকতর আকাঙ্ক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করি।

এই ছড়াইয়া-গলিয়া-যাওয়ার সরলতার সঙ্গে মানসপন্থানুবর্ত্তী রহস্যপন্থীদের (mystics) সূচিমুখ রস-নিবিড় সরল একাগ্রতারও গোলমাল করিলে চলিবে না।

এই তট-রেখার কলাসংযমে যিনি আপনার কাব্যকে বাঁধিয়া তুলিতে না পারেন তাঁহার কাব্যের গতিবেগ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। এই কলাগত অসংযমে দেবেন্দ্রনাথের কাব্য এলাইয়া পড়িয়াছে,

কোথাও যেন তেমনভাবে রস-সংযমতায় জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ যিনি সমগ্রভাবে দেখিতে পারিবেন তিনি একটি খাঁটি কবি-হৃদয়ের পরিচয়ে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এই সমগ্রের আলোকে কবির জীবনটিই একটি কাব্যের মত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু শিল্পী-কবির প্রত্যেক কাব্যাংশের মধ্যেই সমগ্রের সর্ব্বাঙ্গীনতা ধরা দেয়; অংশ লইয়া বিচার করিতে গেলে দেবেন্দ্রনাথকে একজন উঁচুদরের কবি বলিয়া মনে না হওয়া অসম্ভব নহে। কুঁদিয়া কুঁদিয়া প্রত্যেক কবিত্ব-পংক্তি এবং কবিতাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার মত কলা-কৌশল এই কবির আয়ত্তে নাই। অথচ নিতান্ত সাধারণ বহু পংক্তির মধ্যে হঠাৎ এক একটি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর কবিত্বরসপূর্ণ উপযুক্ত ভাব-প্রকাশ উপমা ইত্যাদি নদী-বালুকায় স্বর্ণরেণুর মতই আমাদিগকে লুব্ধ মুগ্ধ করে, বাহুল্য ও বিশেষত্বহীন পংক্তিপরম্পরা পাঠের ক্লেশও সহ্য করিতে বাধ্য করে। এই জন্যই, যদিও আমরা প্রথম ভাবিয়াছিলাম এই গ্রন্থাবলী অনেক ছাঁটিয়া কাটিয়া বাহির করিলে কবির পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় হইত, আমরা এখন মনে করিতে বাধ্য হইতেছি যে এই ছাঁটাকাটা ভাবের সীমারেখা টানা এই কবির কাব্যে একরূপ অসম্ভব, এমনকি তাহাতে কবির 'কম্বলই মিছা' হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই কলাগত কোনো উপকার না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সমগ্রের উপর কবির জীবনকাব্যের যে ছায়াটি আসিয়া পড়িয়াছে তাহার রসবোধের মহৎ উপকার হইতেও আমরা বঞ্চিত হইতাম। এই কলাগতিহীন কাব্য দূর ভবিষ্যতের হৃদয়দ্বারে যদি গিয়া আঘাত নাও করে, ভবিষ্যতের কলাদোষ-অসহিষ্ণু পাঠক যদি পাঠগতিতে পদে পদে ব্যাহত হইয়া সমগ্রের খাঁটি কবিটিকে আবিষ্কার করিয়া লইবার ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তবু সমগ্রের রসমুগ্ধ আমরা এই পরিপূর্ণ কবিপ্রাণতাকে সসম্মান আনন্দের সহিত হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

মৃত্যু মোচন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের সার মর্ম্ম:—স্বামী ফিদিয়ার সহিত স্ত্রী লিজার বনিবনাও ছিল না, নিত্য ঝগড়া খিটিমিটি বাধিত। একদিন লিজা অভিমান করিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া মাতা আনার গৃহে চলিয়া আসিল। ফিদিয়া লিজাকে এক পত্র লিখিয়াছিল যে, দুইজনে যখন মনের এতই অমিল, তখন তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হোক্। লিজাও উত্তর দিল, "বেশ কথা। তাই হোক্!" কিন্তু দুইচারিদিনের মধ্যে লিজার অভিমান কাটিয়া গেল, স্বামীর প্রতি তাহার অনুরাগ বাড়িয়া উঠিল। তখন সে বহু মিনতি করিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া, ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া স্বামীকে এক পত্র লিখিল। পত্রখানি বাল্যসুহৃদ্ ভিক্তরের হাতে পাঠানো হইল। বেদিয়া-গৃহে বন্ধুবান্ধব লইয়া ফিদিয়া তখন মজলিস জমাইতেছিল। বেদিয়াদের মেয়ে মাশা বড় সুন্দর গাহিতে পারে। সেই গান শুনিয়া ফিদিয়া আপনার দুঃখ ভুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল, এমন সময় লিজার পত্র লইয়া ভিক্তর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ফিদিয়াকে সে লিজার পত্র দিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য বহু অনুরোধ করিল, লিজারও বিস্তর দোহাই পাড়িল, কিন্তু ফিদিয়ার সঙ্কল্প অটল। সে কিছুতেই গৃহে ফিরিল না। ভিক্তর তখন অগত্যা নিরাশ হইয়া বিরক্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর হঠাৎ একদিন লিজার ছেলেটির কঠিন পীড়া হইল। ছেলের জন্য লিজা আকুল, কাতর হইয়া পড়িল। ভিক্তর রা[ত] জাগিয়া সেবা করিয়া, ডাক্তার ডাকিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া ছেলে[কে] বাঁচাইল। ভিক্তরের প্রতি লিজার কৃতজ্ঞতাও বাড়িয়া উঠি[ল]। ওদিকে ফিদিয়া বন্ধু আরিমবের বাটীতে দিন কাটাইতেছি[ল]। সহসা একদিন লিজার ভগ্নী শাষা তথায় গিয়া ফিদিয়াকে বা[ড়ী] ফিরিবার জন্য বহু অনুনয় করিল কিন্তু তাহাকেও ফিদিয়া [সেই] এক উত্তর দেয়, সে গৃহে ফিরিবে না, ফিরিবার প্রবৃত্তিও তাহ[ার] নাই। বিবাহ-বন্ধন কাটাইয়া লিজাকে সে মুক্তি দিবে। কা[রণ] জিজ্ঞাসা করিলে ফিদিয়া বলিল, লিজা তাহার স্ত্রী; কিন্তু মনে ম[নে] সে ভিক্তরকে ভালবাসে, ভিক্তরও তাহাকে ভালবাসে[;] তবে লিজা মেয়ে ভাল বলিয়াই মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিত, এ ভালবা[সা] রোধ করিবার জন্য, কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না—এইটী ফিদিয়[ার] লক্ষ্য এড়ায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ফদিয়া তাহাদের দুইজনে[র] সুখে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া থাকিতে চাহে না। বিশেষ ভিক্ত[র] তাহার বাল্যবন্ধু এবং এই জন্যই আর গৃহে ফিরিতে তাহার ইচ[্ছা] নাই। শাষা অগত্যা বিমর্ষচিত্তে গৃহে ফিরিল; ফিদিয়া স[ঙ্গে] আসিল না।

ভিক্তরের মাতা কারেনিনার প্রাণে দারুণ ঝড় দেখা দিল। বংশে[র] দুলাল, একমাত্র পুত্র ভিক্তর,—সে কি না অপরের একটা পরিত্যক্ত[া] স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। ইহাতে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এ[যে] অশাস্ত্রীয় বিবাহ। আত্মীয় প্রিন্স সার্জ্জিয়স্ আসিয়া বুঝাইল, তাহা[তে] দোষ কি। ফিদিয়ার সহিত বিবাহে লিজা যদি কেবল দুঃখই পাই[য়া] থাকে; এখন বিবাহ করিয়া সে যদি সুখী হইতে চায় এবং দুইজনে[র] মধ্যে ভালবাসা গভীর থাকে, তবে এ বিবাহে কিসের আপত্তি[?] শাস্ত্রের দুইটা অনুশাসন? মানুষের অন্তর্বেদনা ত শাস্ত্রের অনুশাস[নে] উড়াইয়া দিবার নহে। ভিক্তরও যখন মাকে বুঝাইল, এ বিবাহ [না] হইলে, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তখন মাতার প্রাণ চঞ্চ[ল] হইয়া উঠিল; তিনি প্রমাদ গণিলেন। শেষে লিজাও তাঁহার সহি[ত] দেখা করিতে আসিল। লিজার সহিত কথাবার্ত্তার পর তাহার প্রা[ণে] কারেনিনার একটা মায়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, লিজার মন উন্নত[;] তবে সে বড় অভাগিনী। তিনি লিজাকে বুঝাইলেন, এ বিবাহ প্রায়[ই] সুখের হয় না। বয়সের দোষে, মোহের ঘোরে—ভিক্তর ভবিষ্য[ৎ] বুঝিতেছে না, পরে কিন্তু এ বিবাহের জন্য তাহার মনে অনুতা[প] জন্মিবেই। লিজা বুঝিল, বুঝিয়া ভিক্তরকে নিবৃত্ত করিবে বলিল[;] কিন্তু ভিক্তর তাহাতে এতটুকু টলিবার লোক নহে। তাহার সে[ই] এক কথা,—লিজাকে না পাইলে, সে বাঁচিবে না।

ওদিকে ফিদিয়াও আপনার মনের মধ্যে দারুণ দাহ লই[য়া] নিঃসঙ্গভাবে দিন কাটাইতেছিল। মাশা আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহা[কে] মধুর সঙ্গ দান করিয়া প্রীতিসম্ভাষণে তাহার দুঃখ দূর করিবার চে[ষ্টা] পাইত। একদিন সে আসিয়া ফিদিয়াকে বলিল, সে ফিদিয়াকে ভালবাসে। ফিদিয়া কথাটা শুনিয়াও যেন শুনিল না। ইতিমধ্যে মাশার পিতামাতা তাহার সন্ধানে আসিয়া কন্যাকে তিরস্কার করিল[,] ফিদিয়াকেও দুইটা কঠিন কথা শুনাইতে ছাড়িল না। ফিদি[য়া] বলিল, সে যতই কেন বদমায়েস বা সয়তান হৌক, সে পশু নহে[;] মাশাকে সে সহোদরার মতই ভালবাসে। মাশাকে তাহা[র] পিতামাতা জোর করিয়া গৃহে লইয়া গেল। ঠিক সেই সম[য়] প্রিন্স সার্জ্জিয়স্ আসিয়াছিল, লিজা সম্বন্ধে ফিদিয়ার সঙ্কল্প জানিতে

অন্তরাল হইতে সে বাশা-সম্বন্ধে ফিদিয়ার যে পরিচয় পাইল তাহাতে ফিদিয়ার উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল। ফিদিয়া তাহাকে জানাইল, লিজাকে সে মুক্তি দিবে, নিশ্চয়—তবে শুধু পনেরো দিন-মাত্র সময় চাহে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

একটি হোটেলের নিভৃত কক্ষ।

হোটেলের ভৃত্য ও তৎপশ্চাৎ ফিদিয়ার প্রবেশ।

ভৃত্য। এই ঘরে সাহেব আপনি বসুন। কেউ এধারে আসবে না—কোন গোলমাল নেই। আর,—আপনার কাগজ আমি এখনি নিয়ে আস্‌ছি।

ফিদিয়া চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

[নেপথ্যে-পেত্রোবিচ্। ফিদিয়া সাহেব,—একবার আস্‌ব কি এ ঘরে—?]

ফিদিয়া। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কে ? এস—আমার একটু কাজ আছে—তা যাক্, এস তুমি।

পেত্রোবিচের প্রবেশ

[ইনি একজন অক্ষম লেখক; নিজের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বাস, প্রতিভা ইহার অসাধারণ; সাধারণে হিংসায় শুধু আমোল দেয় না।]

পেত্রোবিচ্। তা হলে এবার বুঝি ওদের জবাব দেবেন ? বেশ! আমার একটা কথা আছে—শুনুন—একেবারে চুটিয়ে জবাব দেবেন, কোন কথা আর ফাঁক রাখ্‌বেন না। রেখে ঢেকে কিছু বলা অন্ততঃ আমার ত স্বভাব নয়—কোষ্ঠীতে সে ব্যবস্থাই নেই। এই জন্যই না আমার আজ এই দশা—

ফিদিয়া। (সে কথা কানে তুলিল না; ভৃত্যকে কহিল) ওরে, এক বোতল মদ দিয়ে যাস্ দিখিন্!

(ভৃত্যের প্রস্থান)

ভৃত্য প্রস্থান করিলে ফিদিয়া পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

পেত্রোবিচ্। আরে ব্যস্, পিস্তল যে! ব্যাপার কি! আপনি কি আত্মহত্যা করবেন না কি ? এই পিস্তলের গুলিতে ? এ্যাঁ!...তা মন্দ নয়! ব্যাপারটা বেশ একটু রোমাণ্টিক হয় বটে! নাটুকে মৃত্যু! আপনার মাথাটা বেশ দেখছি, মজার ভাবটাবও আসে। অর্থাৎ আমি সব বুঝেছি, তারা আপনার মাথাটা হেঁট করতে চায়, আপনিও সেই মাথায় গুলি চালিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে চান, বাঃ, বাঃ—খাসা মাথা খাটিয়েছেন! বাঃ! আরও কি জানেন, আমি একজন লেখক কি না, তাই এই কার্য্য-কারণটার মধ্যে কেমন চমৎকার শৃঙ্খলা আবিষ্কার করে ফেলেছি। আর কেউ হলে পারৃত—? কখনো না!

ফিদিয়া। কিন্তু ওহে, তুমি শুনছ—

ভৃত্য আসিয়া কাগজ-কলম ও মদের-বোতল গ্লাস টেবিলের উপর রাখিল।

ফিদিয়া। (পিস্তলের উপর রুমাল চাপা দিয়া) বোতলটা খোল্। (ভৃত্য বোতলের ছিপি খুলিয়া প্রস্থান করিল) আচ্ছা, একটু খেয়ে নেওয়া যাক্। কি বল, পেত্রোবিচ্! (উভয়ের মদ্যপান; পানান্তে ফিদিয়া পত্র লিখিতে বসিল) একটু থাম তুমি এখন। আমি চিঠিখানা লিখে ফেলি!

পেত্রোবিচ্। বেশ, আপনি লিখুন। আমিও ততক্ষণ পানে মন দিই। কিছু ভাববেন না—আপনি যদি মরণ পণই করে থাকেন, তা হ'লে স্বপ্নেও ভাববেন না যে, আমি আপনাকে সে পণ থেকে নিবৃত্ত করব। জীবন বলুন, আর মৃত্যুই বলুন,—আমার কাছে দুইই সমান। আমার কাছে বেঁচে থাকাটা হল মৃত্যু, আবার মৃত্যুটা হ'লগে জীবন। কথাটা হেঁয়ালির মত লাগছে ? তা লাগতে পারে। কারণ আমরা লেখক—সাদাসিধে কথা বলা আমাদের দস্তর নয়। আপনি মরছেন নিজের জ্বালা জুড়োবার জন্য, আরাম পাবার জন্য! কেমন, না ? আমিও মরতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু সে কেন জানেন ? মরে আমি এই লক্ষ্মীছাড়া দেশটাকে জানাতে চাই, কি রত্নই সে হেলায় হারালে! প্রতিভার পূজা বেঁচে থাকতে ত কেউ করে না, মারা যাবার পর ভক্তি সবার একেবারে উথলে ওঠে! আমার এই পূজো পাবার ধৈর্য্য আর থাকছে না—তাই চট্ করে মরে এই পূজো আদায় করতে চাই। বুঝলেন ? আমায় একটা গুলি ধার দিতে পারেন ? বাঃ, এই যে পিস্তল ভরাই আছে। (পিস্তল হাতে উঠাইয়া লইল)—আচ্ছা, তবে আমি আগেই চললুম, আপনি পরে আসুন! ওঃ, খপরের কাগজে কাল হুলুস্থুল বেধে যাবে! হোটেলে জোড়া খুন। এই এক-দুই-ত-থাক্—তিন বললেই গুড়ুম করে গুলি ছুটত! তিন আর এখন বলে কাজ নেই, নাঃ—এখনও সময় হয় নি! (পিস্তল রাখিয়া দিল) আর এ রকম করে নিজেকে প্রাণে মেরে ভক্তগুলোকে পূজো শিখিয়ে লাভ কি! কিছু না! তারা দিব্যি থাকবে, মাঝখান থেকে বোকার মত আমাকেই সরে পড়তে হবে। নাঃ,...কিন্তু আমি ঝড় বকছি, আপনি চুপ করতে বললেন না ? বিরক্ত হচ্ছেন, খুবই—?

ফিদিয়া। (লিখিতে লিখিতে) এবার একটু চুপ কর দেখি।

পেত্রোবিচ্। চুপ করব। বলেন কি আপনি ? এই লক্ষ্মীছাড়া দেশটার কথা মনে হলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে! এত লিখছি, তা কোন কাগজ সে লেখা ছাপতে চায় না! বস্তা বস্তা লেখা ফিরিয়ে দেয়! লক্ষ্মীছাড়া

হতভাগার দল—প্রতিভার আদর জানে না, গুণীর কদর বোঝে না! সর্ব্বনাশ হোক—না, না, আপনি ওঁ রকম করে চাইবেন না—আপনাকে বলছি না আমি, দেশকে বলছি, তার সর্ব্বনাশ হোক্—আমার দ্বারা যদি তার ভাল না হয় ত কাজ নেই তার ভাল হয়ে। এই যে গড্ডালিকা-প্রবাহে সব ভেসে চলেছে—এ কেন? কেন? কেন? আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন? এই যে আমি একবেলা পেট ভরে খেতে পাই না। আর ক্রুহাম-বেরুশের সার চালিয়ে সব ফুর্ত্তি করে বেড়ায়, অনর্থক ব্যয়—এ কেন? এদের মাথায় বজ্রাঘাত হয় না! এই সব আয়েসী লক্ষ্মী-ছাড়া লোকগুলো নিজেদের আয়েস নিয়েই শুধু আছে—নাঃ, আপনার লেখার ব্যাঘাত হচ্ছে। কি করব, আমারো প্রাণে ভাব এসে পড়েছে। এদিকে বোতলও প্রায় খালি করে ফেলেছি। বেশ, আমি এখন তবে আসি—

ফিদিয়া। (লেখা শেষ করিয়া পত্রখানা পাঠ করিল) হাঁ তুমি এখন যাও।

পেত্রোবিচ্। হাঁ, যাই, তবে যাবার আগে আমার নিবেদনটুকু আর একবার মনে করিয়ে দিলে—

ফিদিয়া। নিবেদন পরে শুন্‌ব'খন! এখন এক কাজ কর দেখি—(পেত্রোবিচের হস্তে অর্থ দিয়া) এই টাকা-গুলো হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে যেয়ো। আর বলো, আমার নামে কোন চিঠি-পত্র এলে এখানে যেন সেগুলো পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। কি? পারবে?

পেত্রোবিচ্। তা আর পার্‌ব না কেন! তবে চিনির বলদ—চিনি বয়েই বেড়াব শুধু—এ চিনি মুখে পড়বে না একটু, দুঃখ এই! তা, এ সব টাকা কি ম্যানেজারকে দিতে হবে—?

ফিদিয়া। আচ্ছা, আপাততঃ যা তার পাওনা হয়েছে, তাই চুকিয়ে দিয়ে, বাকীটা তুমি নিয়ো!

পেত্রোবিচ্। বাঃ, বাঃ—এই ত মানুষের মত কথা! ধন্য ধন্য ওহে বদান্য! এর প্রত্যুপকার আর কি করব। আমার প্রথম যে বই প্রকাশকেরা ছাপতে নেবে, সেখানা আপনার নামে উৎসর্গ কর্‌ব! আপনার নাম অমর হয়ে যাবে! (প্রস্থান)।

ফিদিয়া। বদ্ধ পাগল! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল; পরে পত্রখানি ভাঁজ করিয়া খামে মুড়িয়া শিরোনামা লিখিয়া টেবিলে রাখিল। উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পিস্তল উঠাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ললাটে নিবদ্ধ করিয়া ধরিল। হাত কাঁপিয়া উঠিতে, পিস্তল নামাইয়া রাখিল) না, না, মরা সহজ নয়! সহজ নয়। এই প্রাণটা এক নিমেষে—কেন? কেন? (ভাবিতে লাগিল) না—(নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত-শব্দ) কে? (উঠিল)

মাশা (নেপথ্যে)। আমি

ফিদিয়া। 'আমি' কে? (দ্বার খুলিল) মাশা—

মাশার প্রবেশ।

মাশা। (প্রবেশান্তে ব্যগ্রভাবে) আমি তো[illegible] বাড়ী অবধি গেছলুম তোমায় খুঁজতে, সেখানে পেলুম [illegible] শেষে পপোভদের ওখানে, অরিমবের বাড়ী, কো[illegible] আর যেতে বাকী রাখিনি। শেষে কোথাও না [illegible] ভাবলুম, এখানে একবার খোঁজ করে যাই! তাই [illegible] খোঁজ নিলুম—শুনলুম, তুমি এইখানেই আছ। (স[illegible] পিস্তল দেখিয়া) এ কি—? এঁ্যা! ফিদিয়া এই [illegible] শেষে মতলব করেছ—

ফিদিয়া। (মৃদু হাসিয়া) না রে মাশা, ও কিছু ন[illegible]

মাশা। কিছু নয়! আমি বুঝি না কিছু—[illegible] (পিস্তল হস্তে লইল) তুমি কি নিষ্ঠুর, ফিদিয়া? আ[illegible] জন্যে তোমার এতটুকু মায়া হয় না! আমি যে [illegible] করি—এতে তোমার পাপ হচ্ছে, ফিদিয়া, তা কিন্তু [illegible] জেনো!

ফিদিয়া। আমি তাদের সব দায় থেকে খা[illegible] করে দিতে চাই—কথাও দিয়েছি তাই—তা মিথ্যা হ[illegible] মাশা?

মাশা। আর আমি? আমি কি করেছি যে, [illegible] এমন করে—

ফিদিয়া। তুই! তুইও মুক্তির নিশ্বেস ফেলে বাঁচ[illegible] মাশা! ভেবে দেখ্, আমি তোর কি করেছি—কিছু ন[illegible] আমার জন্যে পথে পথে রোদে জলে ঘুরে ঘুরে তে[illegible] কি কষ্ট হচ্ছে! তোর অমন রঙ কালি হয়ে গেছে, অ[illegible] চেহারা—

মাশা। সে ত তোমার দোষ নয়, ফিদিয়া। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না—ফিদিয়া, পারি না যে[illegible]

ফিদিয়া। পারিস না? আমার কাছে তুই কি পা[illegible] কি তুই পেয়েছিস্ মাশা যে এমন করে নিজের জীব[illegible] কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিস! অ[illegible] বুঝতে পারছিস্ না—কিন্তু কাল যখন দেখ্‌বি, আমার [illegible] শেষ হয়ে গেছে, দু দণ্ড না হয় কাঁদবি, তার পর চো[illegible] সেই জলটুকু ঝরে যাবার পর দেখবি, চারিধার ফ[illegible] হয়ে গেছে। তোর ঐ হাল্কা সহজ মনটুকু আবার সুখে[illegible] রৌদ্রে নেচে গেয়ে উঠবে! তখন,—তখন—মাশা?

মাশা। কাঁদব? কেন কাঁদব? বয়ে গেছে আম[illegible] কাঁদতে। আমার জন্যে ওঁর ভারী দরদ কি না—[illegible] আমি (কাঁদিয়া ফেলিল)।

ফিদিয়া। মাশা, কাঁদছিস্? এখনই কাঁদছিস্ দেখ্, তুই ভেবে দেখ্—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই তোরও এতে ভাল হবে!

মাশা। আমার ছাই ভাল হবে! তোমার ভাল হবে, তাই বল।

ফিদিয়া। (হাসিয়া) আমার ভাল! আমার ভাল কি করে হবে, মাশা? আমি ত মরছি!

মাশা। মরে বেশ সব এড়াচ্ছ—আর এখানে ভাবতে কষ্ট পেতে ত রইব আমি! তোমার কি!

ফিদিয়া। তুই ভারী দুষ্টু হয়েছিস, মাশা—

মাশা। বল্‌বে বই কি দুষ্টু—বল্‌বে বই কি! নিজের সুখটুকু খালি দেখে বেড়াচ্ছেন!

ফিদিয়া। আমার কি সুখ তুই দেখলি?

মাশা। তা না ত কি! আচ্ছা, আমায় কোনদিন স্পষ্ট করে বলেছ তুমি যে, তোমার কিসের অভাব,—তুমি কি চাও?

ফিদিয়া। আমি কি চাই! চাই আমি ঢের জিনিস! আগে পিস্তলটা তুই রাখ্ দেখি!

মাশা। কি জিনিষ, বল! পিস্তল আমি এখন রাখছি না—

ফিদিয়া। প্রথমে দ্যাখ্, আমি চাই,—আমি যে কথা দিয়েছি, তার না নড়চড় হয়। হলে মিথ্যা কথা হবে! তার পর দ্যাখ্, এই আদালতে গিয়ে মিথ্যে হলপ কি করে আমি পড়ি! যা নয়, তা কি করে বলি,—সে আমি প্রাণ থাকতে পারবো না—আদালতের মধ্যে সেই সব কতকগুলো ইতর ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি—

মাশা। তা ঠিক! আদালতের সেটা—তা আচ্ছা, আর কি চাও?

ফিদিয়া। অথচ দ্যাখ্, এই বিয়ে কাটাতেই হবে! না হলে ওরা সুখী হতে পারে না। আমার জন্য ওরা কষ্ট পাবে—কোন দোষ করেনি বেচারী দুজনে—

মাশা। বেচারী! থাক্, থাক্! ঢের হয়েছে! কে বেচারী? তোমার স্ত্রী? এমন করে তোমায় যে ত্যাগ করবার জন্যে ঝুঁকেছে—

ফিদিয়া! সে তার দোষ নয়, মাশা, সে দোষ আমার!

মাশা। হ্যাঁ, তোমার বই কি! সব তোমার দোষ! আর যত গুণ তাঁরই একচেটে! না? সে একেবারে গুণের নিধি! আচ্ছা, আর কি—?

ফিদিয়া। আর? আর এই তুই! দ্যাখ্ দেখি, আমার জন্যে তুই কি কষ্টই না পাচ্ছিস্—বাড়ীতে মা-বাপের কাছে নিত্যি গালাগাল, নিত্যি বকুনি—আর এই রকম করে আমার জন্যে পথে পথে ছোটা—

মাশা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না। বাড়ীর বকুনি যদি আমার ভাল লাগে, আমার যদি পথে ছুটে আরাম হয়?

ফিদিয়া। পথে ছুটে আরাম হয়! কি বলিস্ তুই, মাশা?

মাশা। যাই বলি না কেন, তোমার কি! আমার যদি এই রকমই ভাল লাগে! এই ত—

ফিদিয়া। আরো আছে—

মাশা। আরো? কি সে?

ফিদিয়া। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আরো যা, তা আমার নিজের সম্বন্ধে—! এ জীবনে আমার ঘৃণা হয়ে গেছে। এ কি জীবন! একটা বোঝার মত পৃথিবীতে খানিকটা জায়গা জুড়ে শুধু পড়ে আছি। নিষ্কর্ম্মা, অকেজো লোক—আমার দ্বারা কখনো কারো ভাল হ'ল না—তোর বাপই ত সেদিন বল্‌ছিল, আমি একটা আপদ—

মাশা। বলুক গে! ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। আমি তোমায় ছাড়ছি না! তুমি যতই কেন আমায় দূর-ছাই কর না, তবু আমি আঠার মত লেগে থাক্‌ব। নিষ্কর্ম্মা, অকেজো বলে দুঃখ করছ? কেন সে ত তোমারি হাত। তুমি মদ ছেড়ে দাও, কুসঙ্গ ছেড়ে দাও—কাজকর্ম্ম কর, মানুষ হও। সে আর কি এমন শক্ত?

ফিদিয়া। মুখের কথায় বল্‌তে শক্ত নয়! ঘটাই শক্ত বটে।

মাশা। আচ্ছা, আমার কথামত চল দেখি।

ফিদিয়া। তোর মুখের পানে যতক্ষণ চেয়ে থাকি মাশা, ততক্ষণ যা করাবি, তাই আমি কর্‌তে পারি, কিন্তু সে কতক্ষণ?

মাশা। আমি তোমার কাছ থেকে কোথাও যদি আর না নড়ি—তা হলে? বল, তা হলে পারবে ত? কেন পারবে না, ফিদিয়া? যারা এ সব না করে, তারাও ত মানুষ, তারা কি তোমার চেয়ে এতই বড়, এতই তাদের ক্ষমতা যে, তারা যা পারে, তুমি তা পারবে না! তবে? (টেবিলের উপর খামে-মোড়া পত্র দেখিয়া) ও কি? তুমি বুঝি ওদের চিঠি লিখেছ! কি লিখেছ, পড়, আমি শুনব।

ফিদিয়া। যা কর্‌তে যাচ্ছি, তাই লিখেছি আর কি! (পত্রের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল) আর এ চিঠিতে এখন কাজ নেই।

মাশা। (পত্র কাড়িয়া লইয়া) লিখেছ বুঝি যে, এই পিস্তলের গুলিতে তুমি সব শেষ করে দেবে! কি লিখেছ —পিস্তলের কথা লিখেছ?

ফিদিয়া। না, পিস্তল বলে নাম করিনি—তবে লিখেছি, আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি!

মাশা। আচ্ছা, তবে এ চিঠি আমার কাছে থাক্— ছেঁড়ে না। ভাল কথা, তুমি সে গল্পটা জানো? সেই যে রামালোভের গল্পটা—সেই যে মোটা বইখানা— আরিমব পড়ে গল্প শোনাচ্ছিল—?

ফিদিয়া। জানি। তা সে-গল্পে কি হবে?

মাশা। বেশ বই সেটা, না? আমার মনে আছে'। সেই যে রামালোভ—সকলে মনে করেছিল, সে জলে ডুবে মারা' গেছে—কিন্তু সত্যি মরেনি—?...তুমি সাঁতার জানো?

ফিদিয়া। না।

মাশা। তবে ত বেশই হয়েছে! বাঃ, চমৎকার—! তোমার জামাটামাগুলো আমায় দাও দেখি! তার পকেটে যে কাগজপত্র আছে, থাকুক—এতে তোমার পরিচয় পাবে লোকে। (পিস্তল রাখিয়া ফিদিয়ার জামা হাতে তুলিয়া লইল।)

ফিদিয়া। কি করবি তুই—? তোর মতলবখানা কি, শুনি!

মাশা। মতলব আর কি। তুমি আমাদের ওখানে চল—সেখান থেকে আমাদেরি একটা কাপড়-চোপড় পরে আসবে—তার পর—

ফিদিয়া। তুই একটা কি জাল-জালিয়াতি করবি দেখচি!

মাশা। হোক্ গে জাল! তুমি যেন নদীতে চান্ করতে গেছ—ডাঙ্গায় তোমার এই কাপড়-চোপড় রেখে, —তার পর পকেট থেকে এই চিঠি আর কাগজপত্রগুলো সবাই পাবে'খন—ব্যস—

ফিদিয়া। ব্যস—কি রে?

মাশা। আবার কি? বুঝলে না—আমরা দুজনেই তার পর এ দেশ থেকে পালাব। চল, অন্য কোন দেশে গিয়ে আমরা দুজনে থাকব—পাহাড়ের কোলে, বনের ধারে, যেখানে হোক্, কুঁড়ে বেঁধে দুজনে থাকব—কেউ জানবে না, কারো কোন ক্ষতি হবে না। দেখ দেখি তুমি নতুন মানুষ হতে পার কি না!

ফিদিয়া। মাশা—

সহসা পেত্রোবিচ্ প্রবেশ করিল।

পেত্রোবিচ্। পিস্তলটা আমি একবার নিতে পারি!

মাশা। স্বচ্ছন্দে। (ফিদিয়ার প্রতি) চলে এস, ফিদিয়া, আর দাঁড়িয়ে ভাবে না! চলে এস—

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আনার বাটী। লিজার বসিবার ঘর।

ভিক্তর ও লিজা।

ভিক্তর। যখন পাকা কথা দিয়েছে, তখন কথার খেলাপ সে কখনই করবে না। কি ভাবছ তুমি, লিজা?

লিজা। আমি—হ্যাঁ—সেই বেদে মেয়েটার কথা শুনে অবধি আমার মনে আর কোন দ্বিধা নে আমিও তবে খালাস! ভেবো না, আমি রিষের জ বলছি। কিসের রিষ—? তবে একটা কথা শুধু কাঁট মত বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করছিল, যে, সে ত অ কোন মেয়ে-মানুষকে—যাক্—আমার মনটা খোলসা হ গেছে! ভিক্তর, তোমার এ ভালবাসার ঋণ কখনো আ শোধ দিতে পারব না।

ভিক্তর। কে ঋণী, লিজা? তুমি ঋণী নও, ' আমি।

লিজা। শোন ভিক্তর, আজ আমায় বাধা দি না—মনে যা আসে, তা বলতে দাও—আমার কে কি মনে হচ্ছিল, জান—? কেবলি মনে হচ্ছিল, আ দুজনকে ভালবাসছি—একই সঙ্গে, দুজনকে—তাই কে প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠছিল—কিন্তু যখন জানল সেই বেদের মেয়েটার উপরই তার প্রাণ পড়ে আ তখন মনকে সহজেই বোঝাতে পারলুম, কেন অ তার পানে ছুটিস্—যে তোর নয়, কেন তার কথা! যে শুধু তোকেই জানে, তাকেই তুই বেশ করে আঁক ধর্। কথাগুলো নাটকের মত শোনাচ্ছে, না—ভিক্তর কিন্তু কি করে তোমায় বুঝিয়ে বলি। এ মনের অ যুক্তি-তর্কের কথা—তাই কি এমন নাটকের শোনাচ্ছে! কিন্তু আমি মিথ্যা বলিনি, ছল করিনি ভিক্তর।

ভিক্তর। ছল! তুমি ছল করবে!

লিজা। মন আমার পরিষ্কার হয়ে গেছে, তার কে কোণে আর এতটুকু ঝাপ্সা নেই! কিন্তু একটা ক এখনো মনে হলে কেঁপে উঠছি—

ভিক্তর। কি কথা?

লিজা। ডাইভোর্সের কথা! সেই আদাল ব্যাপার!

ভিক্তর। কিছু ভাবনা নেই, লিজা। দেখ্ দেখ্তে সে মেঘও কেটে যাবে! ফিদিয়া বলেছে, সব ঠিক করে ফেলবে, তা ছাড়া তার হয়ে এক উকিলও আমি পাঠিয়েছি—উকিল দরখাস্ত নিয়ে গে তার সই করাতে। সই হলে সে দরখাস্ত আদাল পেশ করলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। আবার কি তুমি কি ভাব, সে কথার খেলাপ করবে?

লিজা। না, না, তা সে করবে না। অন্য বি যতই সে দুর্ব্বল হোক—মিথ্যা সে জানে না! মিথ্যা সে ঘৃণা করে! কিন্তু তুমি তাকে টাকা পাঠাতে গে কেন? সেটা কি ভাল দেখাবে?

ভিক্তর। কি করি, বল। আদালতের সংস্রব রয়ে যখন, তখন টাকার খরচও এতে কিছু আছে—যে-কা

যা দস্তুর। তার হাতে টাকা আছে কি না-আছে—এর জন্যে যদি আবার দেরী হয়ে যায়—বাগড়া পড়ে! তাই টাকা পাঠিয়েছি।

লিজা। তবু এই টাকা পাঠানোটা একটু কেমন-কেমন দেখায় না।

ভিক্তর। না!—এতে আর কি মনে করবে সে!

লিজা। আমরা যেন একটু স্বার্থপর—এইটেই এতে বোঝায় না? চটপট করে কোন গতিকে সব সেরে ফেলতে চাই—

ভিক্তর। তা একটু দেখাতে পারে বটে, কিন্তু উপায় কি, বল! এর জন্য দায়ী তুমি—নও কি! ভাব দেখি, কত দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস ধরে আমি তোমার আশা-পথ চেয়ে বসে আছি। কবে তোমায় আমার নিজের বলে' বুকে নেব,—কবে তোমায় পরিপূর্ণ ভাবে পেয়ে আমি সুখী হব, ধন্য হব—শুধু এই ভেবে দিন কাটিয়েছি। সুখের সন্ধানে ছুটলে মানুষ একটু স্বার্থপর হয়ই লিজা,—তার এ দুর্ব্বলতাটুকু ভগবান নিশ্চয় ক্ষমা করেন। বল লিজা, তোমারও কি এ ভেবে সুখ হচ্ছে না, যে, দুজনে আমরা চিরমিলনের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছি!

লিজা। আমার সুখ! ভিক্তর—তুমি কি জান না,—আমি বেঁচে আছি, সে কার প্রেমে! আমার ছেলে সেরে উঠেছে, তোমার মা আমায় ভালবাসেন, তুমি আমায় ভালবাস, জগতে আমার আর চাইবার কি আছে, ভিক্তর! তুমি আমার সব অভাব পূর্ণ করে দিয়েছ। তুমি আমার কে—তা তুমি জান—!

ভিক্তর। আমি কে—লিজা,—লিজা কি মিষ্টি হাওয়া হু-হু করে ঘরে ছুটে আসছে—ঐ শোন,—বাগান পাখীর গানে ভরে গেছে—এত সুখ, এত গান,—এ যেন আমাদেরই সুখে সারা বিশ্ব আজ সাড়া দিয়ে উঠেছে! কি গভীর সুখ এ লিজা!

লিজা। ভিক্তর—

ভিক্তর। লিজা, আকাশে বাতাসে কি সুখ আজ এ উথলে উঠেছে—প্রাণে আর কোন কথা গোপন থাকছে না—সমস্ত বাঁধ ভেঙে দিয়ে সে ছুটে বেরুতে চাচ্ছে! বল লিজা, আমি কে, তা বল—দেখ, আমার সমস্ত দেহ কি এক আবেশে উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে! আমি কে—বল—আমি তোমার মনের কোন্ খানটিতে আছি, বল! লিজা, তুমি আমার দেহ-মন তোমায় দিয়ে ছেয়ে ফেল। বল লিজা, বল, যা মনে আসছে, সব বলে ফেল। এমন শুভ সুন্দর মুহূর্ত্ত—মনকে এখন আর বেঁধে রেখো না—

লিজা। ভিক্তর—প্রিয়তম—

ভিক্তর। লিজা—লিজা—প্রিয়তমে—ঐ শোন, আবার পাখী গেয়ে উঠেছে—আমার মনের ভিতরও একটা পাখী অনেক দিন থেকে মূর্চ্ছিত তন্দ্রাতুর হয়ে পড়ে ছিল, আজ সেও জেগে যেন সাড়া দিয়ে দিয়ে উঠছে। গাও লিজা, তুমি একটা গান গাও—এমন গান গাও, যার সুরে তোমার মনের সঙ্গে আমার মনটি একেবারে মিশে যায়। ঐ পিয়ানো রয়েছে—অনেক দিন তোমার গান শুনিনি—গাও,—গাও—লিজা!

লিজা। (পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিল)

> বোঝ না শোন না দাসীর কথা,
> বোঝ না নীরব প্রাণেরি ব্যথা।
> তোমার স্বপন-ধেয়ানে থাকি,
> নিমেষ না দেখি, বরষে আঁখি,—
> ছিঁড়ো না টানিয়ে চরণ-লতা।
> ছায়ার মতন, তোমার আছি,
> তোমার বিহনে কেমনে বাঁচি,—
> তপন-বিহনে ছায়া যথা।

ভিক্তর। চমৎকার গান! সুন্দর!...কে?

ধাত্রীর সহিত লিজার পুত্র মিশ্‌না প্রবেশ করিল।
লিজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিল।

ভিক্তর। মানুষের স্মৃতি—কি সে নিষ্ঠুর একটা সৃষ্টি!

লিজা। কেন, ওকথা বল্‌লে যে! (পুত্রের মুখচুম্বন করিল।)

ভিক্তর। মানুষ যদি অতীত একেবারে ভুল্‌তে পারত! আমার মনে পড়ছে, তোমার সেই বিয়ের কথা। আমি তখন বিদেশে গিয়েছিলুম্। ফিরে এসে যখন শুন্‌লুম্, তোমায় জন্মের মত হারিয়েছি, তখন মনটা কি এক আগুনে পুড়ে নিমেষে ছাই হয়ে গেল! কি অসহ্য সে জ্বালা, লিজা!—তার পর তোমায় প্রথম দেখি—তোমার সে মনে পড়ে? ফিদিয়া এসে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। তার সে কি হাসিমুখ—বন্ধুর সুখ মনে করে আমার মনটাকে আমি জোর করে পা দিয়ে পিষে চেপে ফেল্‌লুম্। তার পর তোমায় দেখ্‌লুম্—আমার বুকে তখন যেন বাজ ডাকছিল! কেবলি মনে হচ্ছিল, মনের মধ্যকার এ প্রলয়-সংঘর্ষ যেন কেউ না ধরে ফেলে! তুমি এসে কথা কইলে,—আমি তোমার মুখের পানে চাইতে পারলুম্ না। কেবলি মনে হচ্ছিল, আমার, আমার জিনিস, ফিদিয়া লুট করে নিয়েছে! তার পর কি কষ্টে মনকে বশ কর্‌লুম্—না, লিজা পরের স্ত্রী, বন্ধুর স্ত্রী! সে আমার বোন, আর কেউ নয়, কিছু নয় সে!...

লিজা। ভিক্তর—

ভিক্তর। না, না, শোন—সব আমার মনে পড়ছে! এখন আর শুন্‌তে দোষ কি! ভয় কি, লিজা? হাঁ, মনও একরকম বশ হল। তার পর যখন ফিদিয়ার

এই সব খেয়াল দেখা দিলে, তোমার চোখে জল ঝরতে লাগল, তখন তোমার পানে চেয়ে আবার সেই অত দিনকার রুদ্ধ স্রোত আমার মনের বাঁধ কেটে বেরিয়ে পড়ল। তুমি তখন সান্ত্বনার জন্য আমার হাত ধরলে—আমার হাত কেঁপে উঠল!—মনের বাসনা হল কি, জান,—আশ্রয় তোমায় দিতে পারি যদি! শেষে ফিদিয়ার ব্যবহারে তুমি যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, সেও ফারখত দিতে চাইলে, তখন মনে হল, আশা বুঝি দুরাশা হবে না। তার পর শুনলুম, আমায় তুমি এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলনি—আমায় ভালবাস—চিরদিনই ভাল বেসেছ—তখন লিজা, আবার সব অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠল! এখন কি মনে হচ্ছে জান—লিজা—আমরা দুজনে দুজনকে কত যুগযুগান্ত ধরে ভালবেসে এসেছি—মাঝেকার এই যে দুঃখ, এই যে বিচ্ছেদ এ যেন কার একটা অভিশাপ—যেন একটা দুঃস্বপ্ন—সে দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে—তবু মাঝে মাঝে কি এক আতঙ্কে প্রাণ যেন শিউরে শিউরে ওঠে। গান গেয়ে তুমি আমার আশ্রয় চাইছিলে, তাই সে দুঃস্বপ্নের কথাটা আবার মনে পড়ে গিয়েছিল! যাক্—সে দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে—আজ আর কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই। লিজা, লিজা, এখন থেকে চিরদিন আমি তোমারই, তুমিও আমারই! বল, আর কোনদিন আমাদের এ সুখে দুঃস্বপ্নের ছায়া পড়বে না ত? বল, বল—

লিজা। আঃ! ভিক্তর, তুমি ও সব কি বকছ?

ভিক্তর। কিছু মনে করো না, লিজা—! এ শান্ত মনটার একবার সাড়া নিচ্ছি। অতীত আর বর্ত্তমানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, সেটাকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে, অখণ্ড করে নিচ্ছি, তবু একটা কথা মনে হচ্ছে—আহা, ফিদিয়ার জন্যে আজ সত্যই দুঃখ হচ্ছে! বেচারা—বেচারা ফিদিয়া—তার প্রাণ বড় উঁচু—আমাদের জন্য সে আপনার স্বার্থ একেবারে ছেড়ে দিলে; কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ সত্যই আজ ভরে উঠেছে!

লিজা। সে বড় ভাল—তাতে ভুল নেই! কিন্তু আমার উপায় ছিল না—আমি নিজেকে আগে বুঝতে পারিনি, আমার প্রাণ চিরদিন তোমাকেই চেয়ে ফিরছিল—!

ভিক্তর। আমাকে—?

লিজা। শুধুই তোমাকে—না হলে আজ—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মিঃ ভসেন্সকি এসেছেন!

ভিক্তর। সেই উকিল। ফিদিয়ার খবর পাব।

লিজা। এখানেই ডাকিয়ে পাঠাও। আমিও শুনি—কি বলে।

ভিক্তর। তুমি শুনবে? আচ্ছা—যা, এখা[নে] পাঠিয়ে দে! (ভৃত্যের প্রস্থান)

লিজা। (ধাত্রীর প্রতি) মিশনাকে তুমি নিয়ে যা[ও] এখন। (পুত্রকে লইয়া ধাত্রীর প্রস্থান) কি খপর পা[চ্ছ] ভাবছ ভিক্তর?

ভসেন্সকির প্রবেশ।

ভিক্তর। খবর কি?

ভসেন্সকি। তার দেখা পেলুম না।

ভিক্তর। দেখা পেলেন না? সে কি! দরখা[স্তে] সইও হয়নি তা হলে?

ভসেন্সকি। না। দেখা না পেলে আর কি করে [সই] হবে? কিন্তু একখানা চিঠি আছে—(লিজার প্রতি) আপনার নামে। (ভিক্তরের হস্তে পত্র প্রদান) ত[ার] বাড়ী গিয়ে শুনলুম, সে হোটেলে আছে। হোটেলে[র] ঠিকানা জেনে সেখানে গেলুম। দেখাও হল।

ভিক্তর। দেখা হয়েছে, তা হলে?

ভসেন্সকি। আহা আগে শুনুন সব। দেখা হল। দরখাস্তখানা রেখে আমায় বললে, এক ঘ[ণ্টা] পরে আসবেন। তার পর ত একঘণ্টা পরে আমি গে[লুম] গেলুম। গিয়ে দেখি—

ভিক্তর। ছি, ছি! এ তার ভারী অন্যায়। [এ] রকম মিথ্যা ছলনায় সব পণ্ড করা! এতদূর অধঃপা[তে] গেছে সে—

লিজা। চিঠিখানা আগে পড়ে দেখ না, কি লিখেছে

(ভিক্তর পত্র পাঠ করিতে লাগিল।)

ভসেন্সকি। আমি তা হলে এখন আসি। আম[ার] খালি পণ্ডশ্রমই সার!

ভিক্তর। আপনি আসবেন? তা আসুন—অ[থবা] না হয় কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব'খন। আপ[নি] যে এতটা কষ্ট করলেন তার জন্য—(সহসা প[ত্রের] উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চমকিয়া উঠিল ইতিমধ্যে ভসেন্সকির প্রস্থান) এ কি?

লিজা। ও কি—তুমি অমন করলে কেন? [কি] আছে চিঠিতে—?

ভিক্তর। না, না,—

লিজা। পড়—পড়—সবটা পড়, আমি শুনি!

ভিক্তর। (পত্রপাঠ) "লিজা, ভিক্তর,—এ [চিঠি] তোমাদের দুজনকেই আমি লিখছি। কোন সম্বো[ধন] দিলুম না—কারণ, তার কোন অর্থ নেই, কারণও নে[ই]। মনে করো না, তোমাদের উপর আমার মনের [ভা]ব বেশ প্রসন্ন! তা নয়—বেশই তিক্ত সে ভাব! ত[বে] আজ আর কোন তিরস্কার তোমাদের করতে চাই [না]। আমি অভাগা—সে কথা আমি নিজেও জানি। অ[...]

লিজার স্বামী, তবু বলছি, আমিই তার প্রাণে অনধিকার প্রবেশ করেছিলুম। সে হৃদয় ভিক্তরের—আমি চোরের মত তাকে গ্রহণ করেছিলুম। তবু লিজাকে আমি ভাল বাসতুম! কথাটা বিশ্বাস করতে না চাও, করো না—কিন্তু কথাটা সত্য।”

লিজা। হঠাৎ এ সব কথা যে! তার পর—?

ভিক্তর। “কিন্তু এ সব বাজে কথা থাক্! ভূমিকার কোন প্রয়োজন নেই। আসলে যা বলতে চাই, তা এই,—যেভাবে তোমাদের কাজ উদ্ধার করব বলেছিলুম, সে ভাবটা এখন বদলাতে হচ্ছে। এটা শুধু মনের খেয়াল, আর কিছু নয়। তবে ভাবনা নেই,—তোমাদের কাজ উদ্ধার হবে। আদালতে কতকগুলো মিথ্যা হলপ করে, কিম্বা মিথ্যা দরখাস্তে সই দিয়ে, মিথ্যাকথাকে সত্যের ছাঁচে ঢেলে খাড়া করা, আমার দ্বারা সে হয়ে উঠবে না। আমি যতই মন্দ হই না কেন, এ কাজটা এখনও পারি না—এই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। এসব কুৎসিত আইনের ব্যাপারে আমার কেমন ঘৃণা আছে। তোমরা চাও, এ বিয়ে কাটানো—যাতে তোমাদের বিয়েতে কোন বাধা না থাকে? তার জন্য আর একটা উপায়ও ঠাওরেছি—তারই আশ্রয় নিলুম। অর্থাৎ আমি বিদায় নিচ্ছি।

লিজা। ভিক্তর—

ভিক্তর। “আমি বিদায় নিচ্ছি—চিরবিদায়। যখন এ চিঠি তোমাদের হাতে পৌঁছুবে, তখন কোথায় আমি। পুঃ—আদালতের খরচের জন্য টাকা পাঠিয়েছিলে—ভাল করনি। ছিঃ! সে টাকা ফেরত পাবে, ম্যানেজারকে বলা আছে। সে পাঠিয়ে দেবে। আমার নিজের বলবার কথা বড় বেশী নেই। তবে বন্ধু বলে' একটা উপকার যদি কর—একটা মিনতি যদি রাখ—আমার বাড়ীর কাছে ইউজিন বলে এক গরিব খোঁড়া আছে। তার পরিবার অনেকগুলি। বেচারা রেলে কাজ করত—পা দুখানি রেলে কাটা পড়ায় আর কাজ করতে পারে না—কোম্পানির কাছ থেকে যে মাসহারা পায়, তাতে তার সংসার চলে না—আমি তাকে প্রতি মাসেই কিছু কিছু সাহায্য করতুম—অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ, আমার সাধ্যমত। তোমাদের অনেক টাকা আছে, যদি দয়া হয় ত এই লোকটিকে কিছু সাহায্য করো, তা হলেই কৃতার্থ হব। আমি গেলে পৃথিবীতে আর কারো কোন ক্ষতি হবে না, শুধু এই লোকটারই কিছু হবে। তাই সেটা কিছুও যদি পূরণ করতে পার, তবেই আমি শান্তিতে বিদায় নি। লোকটির স্বভাব-চরিত্র ভাল—প্রকৃতই দয়ার পাত্র সে। এই কথা। তবে এখন বিদায়—ফিদিয়া।”

লিজা। এঁ্যা—সে আত্মহত্যা করেছে!

ভিক্তর। (ঘণ্টায় ঘা দিল। ভৃত্যের প্রবেশ) শীগগির দ্যাখ্—মিঃ ভসেন্সকি কত দূর গেলেন—তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়, বল্—ভারী দরকার। ছুটে যা।

(ভৃত্য বেগে ছুটিল।)

লিজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমার মনে এই এক ভয় ছিল যে, সে এই রকম করেই বুঝি জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলবে! (অশ্রুপাত) সত্যই তাই হল! ফিদিয়া—ফিদিয়া—প্রিয়তম—(টেবিলে মুখ রাখিল।)

ভিক্তর। লিজা—

লিজা। না, না, ভিক্তর, কে বললে, আমি তাকে ভালবাসি না? ভুল, ভুল—বাসি—বাসি—এখনো ভালবাসি। আমিই তাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলুম! উঃ—না, না, সরে যাও, সরে যাও—আমায় খানিক একলা থাক্‌তে দাও।

ভসেন্সকির প্রবেশ।

ভিক্তর। ফিদিয়া কোথায় গেছে—হোটেলে তার কোন সন্ধান নিয়েছিলেন?

ভসেন্সকি। তারা বল্লে, সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে—শুধু এই চিঠিখানা রেখে বলে গেছে, কেউ এলে তার হাতে দেবার জন্যে—তার পর আর ফিরে আসেনি।

ভিক্তর। আচ্ছা, আপনি যান্—(ভসেন্সকির প্রস্থান) যেখান থেকে পারি, তাকে ফিরিয়ে আনব, লিজা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি এখনই চল্লুম।

লিজা। তুমি রাগ করো না, ভিক্তর - আমার উপর রাগ করো না। খুঁজে তার সন্ধান কর—পার যদি, এখানে তাকে নিয়ে এস। একবার—একবার শুধু—

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন

বেলাব গ্রামে যাদববংশীয় ভোজ-বর্ম্মা দেবের তাম্রশাসন আবিষ্কার হইবার পরে শ্যামল-বর্ম্মা বা সামল-বর্ম্মা, হরি-বর্ম্মা প্রভৃতি রাজগণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা মাসিকপত্রসমূহে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার জন্য যাঁহারা বিখ্যাত তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বেলাব তাম্রশাসন সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—(১) যাঁহারা “বৈজ্ঞানিক” উপায়ে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন:—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই; এম, এ; (২) যাঁহারা কুলশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে

চেষ্টা করিতেছেন এবং তদনুসারে এই তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিতেছেন:—প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।

বেলাব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্যামলবর্ম্মা নামক চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" দ্বিতীয় ভাগের পূর্ব্বার্দ্ধে বসুজ মহাশয় শ্যামলবর্ম্মার নিম্নলিখিত পরিচয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন:—

(ক) "চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। * * * * ইনি বিজয়সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * * * অনন্তর রাজা বিজয়সেন তাঁহার মালতী নাম্নী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। * * * * শ্রীমান শ্যামলবর্ম্মা অগ্রজ মল্লবর্ম্মাকে পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া স্বয়ং দিগ্বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। * * * * দেশ-বিদেশবাসী বহুসংখ্যক প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি তাঁহার তীব্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়ান্তর্গত বিক্রমপুরের উপান্তভাগে স্বীয় বাসার্থে একটি পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।"

—রামদেব বিদ্যাভূষণের "বৈদিক কুলমঞ্জরী।"

(খ) "মহারাজ পরম ধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। * * * * মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * বিজয়সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। * * এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয়সেন দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মল্লবর্ম্মা এবং অপর জনের না। শ্যামলবর্ম্মা। * * * * শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া অতি ধর্ম্মজ্ঞ শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।"

"ত্রিবিক্রম মহারাজ সেনবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুর-সমীপতঃ॥"

—৮ কৃত বৈদিক কুলপঞ্জী।

(গ) "গঙ্গার পূর্ব্বে, মেঘনার পশ্চিমে, লবণসমুদ্রের উত্তরে এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম্মশীল শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন।"

—সামন্তসারের বৈদিক কুলার্ণব।

এতদ্ব্যতীত বসুজ মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাত-নাম কুলগ্রন্থে শ্যামল-বর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত আছে দেখিতে পাইয়াছেন। দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত অপর বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেনবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রশাসনের পাঠ দেখিলেই সহজে জানিতে পারিবেন যে, উভয়েই এক ছাঁচে ঢালা।

তত্র তাম্রশাসনং যথা:—

"ইহ খলু বিক্রমপুর-নিবাসী কটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়ব বারাৎ স্বস্তি সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যুপেত সততবিরাজমানাশ্বপতি গজ নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি বর্ম্মবংশকুলকমল-প্রকাশ ভাস্কর সোমব প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয়শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্ট পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অধিরাজ-বৃষভ শঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্যামল দেবপাদবিজয়িনঃ।"

কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি সংগ্রহ এবং আবিষ্কার ক ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু করিয়াছিলেন যে শ্যামলবর্ম্মা বল্লালসেনের কনিষ্ঠভ্রা বিজয়সেনের দ্বিতীয় পুত্র। হেমন্তসেনের অপর ত্রিবিক্রম এবং শ্যামলবর্ম্মা সেন-রাজগণের করদ ভূ ছিলেন।

বেলাব গ্রামে যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয় তাহা হইতে তাম্রশাসন-প্রদাতার নিম্নলিখিত বংশ-পত্রি সংগৃহীত হইতে পারে:—

বজ্রবর্ম্মা
|
জাতবর্ম্মা = বীরশ্রী
| (চেদীরাজ কর্ণদেবের কন্যা
সামলবর্ম্মা = মালব্যদেবী
|
ভোজবর্ম্মা

বর্ত্তমান অবস্থায় দুইটিমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে:—(কুলশাস্ত্রের শ্যামলবর্ম্মা ও যাদববংশের জাতবর্ম্মার সামলবর্ম্মা এক ব্যক্তি নহেন। (২) শ্যামলবর্ম্মা সামলবর্ম্মা একই ব্যক্তি। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্তবিনোদবিহারী রায় যুক্তি না করিয়া দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ণিত হইয়াছে:—(১) শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশ-সমুদ্ভূত ন (২) তাঁহার পিতার নাম বিজয়সেন এবং তাঁ মাতার নাম মালতী বা বিলোলা নহে। (৩) ব মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত অধিকাংশ কুলশাস্ত্রগ্রন্থে দে পাওয়া যায় যে শ্যামলবর্ম্মা বারাণসী-বা কান্য রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বেলাব শাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে শ্যামলবর্ম্মার মহিষীর নাম মালব্যদেবী। এরূপ অবস্থায় শ্যামল সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে ত ঐতিহাসিক মূল্য পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন।

বজ্রবর্ম্মার পুত্রের নাম সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উ হইয়াছিল। ঢাকা-রিভিউ পত্রিকায় দেখা যায় বিধু গোস্বামী প্রমুখ মহাশয়গণ "জৈত্রবর্ম্মা" পাঠ ক ছিলেন। সাহিত্যপত্রিকার অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ ব মহাশয় "জাতবর্ম্মা" এবং ঢাকা-রিভিউ পত্রিকায়

মহাশয় "জাত্র" বা "জাতবর্ম্মা" পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র তাম্রশাসনে খড়ির গুঁড়া লাগাইয়া ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। তাম্রশাসনখানির সম্মুখের দিক ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় অনেকগুলি গর্ত্ত হইয়াছে, গর্ত্তের মধ্যে খড়ির গুঁড়া প্রবেশ করায় বিকৃত ফটো দেখিয়া এইরূপ নানাবিধ উদ্ভট পাঠোদ্ধার সহজেই মনে আসে।

অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে আস্কলি সাহেব তাম্রশাসনখানি আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তাহার পর বৈশাখ মাসের শেষে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পুনার তাম্রশাসনখানি অল্পদিনের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছেন। মূল তাম্রশাসনে অষ্টম শ্লোকটী নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত আছে ঃ—

> গৃহ্নন্ বৈণা-পৃথু শ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
> যোঙ্গেযু গ্রথয়ষ্ক্রিয়ং পরিভবং স্বাং কামরূপশ্রিয়ম্।
> নিন্দন্দিব্য-ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
> কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ যাং সার্ব্বভৌমশ্রিয়ং ॥

অষ্টম শ্লোক সম্বন্ধে বসুজ মহাশয় কতকগুলি আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন ঃ—

> "বেণ-নন্দন পৃথু যেরূপ সায়ম্ভুব মনুকে গোবৎসস্বরূপে রক্ষা করিয়া পৃথিবী দোহন করিয়া প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন, বজ্রবর্ম্মার পুত্রও সেইরূপ হয়ত চেদিপতি কর্ণকে সায়ম্ভুব মনুর স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যশাসন ও প্রজারক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা এরূপও আভাস পাইতেছি দোহন বা গ্রহণ দ্বারা জাতবর্ম্মা সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিলেও কর্ণদেবই প্রকৃত প্রস্তাবে উপভোক্তা ছিলেন। বজ্রবর্ম্মার পুত্রই তাঁহার এই সার্ব্বভৌমত্ব লাভের প্রধান সহায় ছিলেন বলিয়া এখানে যেন ইঙ্গিত রহিয়াছে।"

জাতবর্ম্মা স্বয়ং সার্ব্বভৌমশ্রী লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন; কর্ণের সহিত তাঁহার সার্ব্বভৌমত্বের বিশেষ সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বসুজ মহাশয় এই স্থানে ইঙ্গিতে জানাইয়া গিয়াছেন যে তাঁহার মতে শ্যামলবর্ম্মা বা সামলবর্ম্মাই বঙ্গের যাদববংশের প্রথম রাজা। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় ঢাকা-রিভিউ পত্রিকায় "বঙ্গের বর্ম্মরাজবংশ" নামক প্রবন্ধে এই অংশ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, পরে যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

কলচুরি-চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেবের পুত্র, জাতবর্ম্মা ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শ্বশুর, কর্ণদেবের যে পরিচয় বসুজ মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধে দিয়াছেন তাহা মৃত ডাক্তার জর্জ বুলারের বারাণসীতে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের তাম্রশাসন নামক প্রবন্ধ হইতে অনুবাদিত। এই সম্পর্কে কর্ণদেবের রাজ্যারম্ভের কাল নির্ণয় অত্যন্ত আবশ্যক। সম্প্রতি Epigraphia Indica পত্রিকার একাদশ ভাগে ডাক্তার হুলজ্ (Hultzsch) কর্ণদেবের একখানি নূতন তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা এলাহাবাদ জেলার গোহাড়োয়া নামক গ্রামে আবিষ্কৃত। ডাক্তার ফ্লিট্ এই তাম্রশাসনের তারিখ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইহা কর্ণদেবের রাজ্যের সপ্তম বৎসরে অর্থাৎ ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে কর্ণদেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব সম্বন্ধে বসুজ মহাশয় একটি ভুল তারিখ প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

> কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব ১০২৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

মূল পুঁথিখানি সংস্কৃত রামায়ণের পুঁথি, ইহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মৃত অধ্যাপক বেণ্ডল (Bendall) কর্ত্তৃক নেপাল দরবার পুস্তকালয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে ঃ—

> "সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়াধিরাজ শ্রীমান্-গাঙ্গেয়-দেব-ভুজ্যমান তীরভুক্তৌ কল্যাণ-বিজয়-রাজ্যে।"

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে ১০৭৬ বিক্রম সংবৎসরে অর্থাৎ ১০২১ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিরাজ উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব তীরভুক্তিতে রাজত্ব করিতেন।

"বেলাব" তাম্রশাসনের ১০ম ও ১১শ শ্লোকে ভোজবর্ম্মার মাতৃকুলের পরিচয় আছে। এইস্থানে বসুজ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া বলিতে চাহেন যে ১০ম শ্লোকে যে উদয়ীর নাম আছে তিনি ধারের পরমার রাজবংশের উদয়াদিত্য এবং ১১শ শ্লোকে যে জগদ্বিজয় মল্লের উল্লেখ আছে তিনি উদয়াদিত্য দেবের তৃতীয় পুত্র জগৎদেব। এই জগদ্দেবের নাম কোন খোদিত লিপিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু চারণগণের নিকট ইনি অতি সুপরিচিত। জগদ্দেব গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সেনাপতি ছিলেন। পূজ্যপাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে তিনি মালব্যদেবী নাম দেখিয়া ভোজবর্ম্মার মাতুলবংশ যে মালবের পরমার রাজবংশ ইহা স্থির করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। বেলাব তাম্রশাসনের ১০ম শ্লোকটি দেখিলে বোধ হয় ৯ম এবং ১০ম শ্লোকের মধ্যে এক বা তদধিক শ্লোক লেখকের অনবধানতার জন্য বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই, বেলাব তাম্রশাসনে জগদ্বিজয় মল্ল শব্দটী নাম না হইয়া মনভূ বা কামের বিশেষণ হইলেও হইতে পারে। "জগদ্বিজয় মল্ল" যদি কাহারও নামই হয় তাহা হইলেও "জগদ্দেব" নামের সহিত ইহার এমন কি বিশেষ সাদৃশ্য আছে। জগদ্দেব অপেক্ষা

কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে সিংহপুরে থাকিয়া বিবাহ করা যায় বটে, কিন্তু অঙ্গদেশে শ্রী-বিস্তার করিতে হইলে, কামরূপশ্রীকে পরাজয় করিতে হইলে, বা দিব্যনামক কৈবর্ত্ত নায়কের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিতে হইলে সুদূর পঞ্চনদ হইতে বহুদূর আসিতে হয়। সেই জন্যই উপায়ান্তর না পাইয়া বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক বিস্তৃত সার্ব্বভৌমশ্রী কর্ণের উপভোগ্যা ইহার "ইঙ্গিত আছে"। বেলাব তাম্রশাসনের ৮ম শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জাতবর্ম্মা বর্ম্মবংশের প্রথম রাজা। কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় কথা শ্যামলবর্ম্মা নিজভুজবলে রাজা হইয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিতেছেন "শ্যামলবর্ম্মা গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার তাম্রশাসনোক্ত 'বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে অথচ তিনি গৌড়পতি ছিলেন না, (২) তিনি নিজ ভুজবলে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, পিতৃরাজ্য পান নাই, এই জন্যই তাম্রশাসনে পিতার নাম দেন নাই বলিয়া বোধ হয়।" একখানি কুলগ্রন্থে গৌড়েশ্বর উপাধি দেখিয়া রায়-মহাশয় দ্বিতীয় কুলগ্রন্থের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। এক জন যে, প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যে সেনবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসন দৃষ্টে বর্ম্মবংশীয় শ্যামলবর্ম্মার কৃত্রিম তাম্রশাসন রচনা করিয়াছেন, তাহা কি রায় মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই? রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় যুক্তি আরও অদ্ভুত। তাম্রশাসনরচয়িতা যে, শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া রচনাকালে তাঁহার নাম দেন নাই এবং ধরা পড়িবার ভয়ে নূতন নামের সৃষ্টি করেন নাই সে কথা রায় মহাশয়ের মনে আদৌ স্থান পায় নাই। বসুজ মহাশয় এবং রায় মহাশয় উভয়েই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে শ্যামলবর্ম্মাদেব ৯৯৪ শকাব্দে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; ইহার কারণ জাতীয় ইতিহাসোদ্ধৃত পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকার বচন:—

"গৌড় দেশে শ্যামল নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ ছিলেন। সেই মহীপাল বহু প্রচণ্ড নৃপতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাবশালী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া ৯৯৪ শকাব্দে শুভ তিথিতে রাজা হইয়াছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিষয় বৈভবাদি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রা নাম্নী কন্যা তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।"

প্রথম কথা, বিজয় সেনের পুত্র শ্যামল ৯৪৪ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জাতবর্ম্মার পুত্র সামল কি করিয়া ৯৪৪ শকাব্দে অভিষিক্ত হইতে পারেন? দ্বিতীয় কথা, বিজয়সেনের পুত্র শ্যামল ও জাতবর্ম্মার পুত্র সামল একই ব্যক্তি ধরিয়া লইলে স্বীকার করিতে হইবে যে কুলশাস্ত্রের কোন ঐতিহাসিক মূ নাই; অতএব কুলশাস্ত্রের তারিখ গ্রাহ্য হইতে পা না। তৃতীয় কথা শ্যামলবর্ম্মার তারিখ সম্বন্ধে কু গ্রন্থকারগণ একমত নহেন। বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধ ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জিতে লিখিত আছে 'শ্যামলব সমাদরপূর্ব্বক ১১৬৪ শকে কনৌজস্থিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম দিগকে এদেশে আনিয়া ধনরত্ন, বসন, ভূষণ ও গ্র প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে বাস করাইয়াছিলেন।' অত পর কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচ নিষ্প্রয়োজন।

রায় মহাশয়ের আরও কতকগুলি অভিনব আবিষ্ক যথাস্থানে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ভর করি তিনি ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। এগুলিও বি শতাব্দীর নূতন আবিষ্কার:—(১) শ্যামলবর্ম্মা যখ বিক্রমপুর অধিকার করেন, বিজয়সেন সেই সময় দক্ষি বরেন্দ্রে অধিকার বিস্তার করিয়া গৌড়েশ্বর পাল রাজ সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে শ্যামলব বঙ্গদেশ জয় করিয়া নিজে স্বাধীন হইয়াছিলেন।

(২) ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন রাজ্যে অভিষিক্ত হই পাল রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইলে সুযো বুঝিয়া ভোজবর্ম্মা নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলে

(৩) "বল্লালসেন তাঁহার রাজ্যের ১০ম বৎসরে (১১ খৃষ্টাব্দে) ভোজবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিক্রমপ অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় সমস্ত রাঢ় দে ভোজবর্ম্মার শাসনাধীন ছিল এবং বল্লালসেন তাহ অধিকারী হইয়াছিলেন।"

(৪) "বল্লালসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যে অভিষি হইয়াছিলেন। এই বৎসরেই ভোজবর্ম্মার পঞ্চম বৎসরে তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।"

(৫) "শ্যামলবর্ম্মা ১০৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১১৪ খৃষ্টা পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

(৬) "ভবদেবের কথামত হরিবর্ম্মার বংশ সেনবংশে পদানত হয় নাই, তাঁহাদের শ্যামলবর্ম্মা নামক জনৈ জ্ঞাতি ভবদেবের প্রভু হরিবর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ যখন লিখিয়াছিলেন যে "সে বংশের অভ্যুদয়ের পর ভবদেব স্বীয় প্রভুকে সেনবংশী গৌড়াধিপের অধীনতা স্বীকারে উপদেশ দিয়া, স্ব অগস্ত্যবৎ বৌদ্ধাম্ভনিধি গণ্ডূষকরণে পাষণ্ড-তার্কিকদলনে এবং স্মৃতি জ্যোতিষ এবং মীমাংসা শাস্ত্রের চর্চ্চায় মনে নিবেশ করিয়াছিলেন," তখন তাঁহার অনুমান-শক্তি প্রাবল্য হইয়াছিল। তাহার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখি এবং এখন বোধ হয় তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন

কিন্তু তাই বলিয়া একমাত্র বেলাব তাম্রশাসন দেখিয়া কেহই বোধহয় স্বীকার করিবেন না যে শ্যামলবর্ম্মা হরিবর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

হরিবর্ম্মা কে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে তিনি বাঙ্গালা দেশের একজন রাজা। তাঁহার অস্তিত্বের তিনটি প্রমাণ আছে:—(১) ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে তাঁহার মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব শর্ম্মার একখানি শিলালিপি আছে, তাহাতে তাঁহার নাম ও বিবরণ আছে। মৃত অধ্যাপক কীলহর্ণ এই খোদিত লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন প্রতিলিপি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। কীলহর্ণের মতানুসারে ইহাতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) একখানি তাম্রশাসন, ইহার অধিকাংশ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার জাতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ইহার কিয়দংশের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি নিজে তাম্রশাসনখানি দেখিয়াছি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মৃত হরিনাথ দে মহাশয় পাঠোদ্ধার করিবার জন্য এখানি আমাকে দিয়াছিলেন। তখন বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছিলাম, তিনি যতটা পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত অংশ তাম্রশাসনে নাই। (৩) হরিবর্ম্মদেবের ১৯শ রাজ্যাঙ্কে বঙ্গাক্ষরে লিখিত অষ্ট সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিকায় একখানি পুঁথি। ইহা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে কিনিয়া দিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনে হরিবর্ম্মার পিতার নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মনীষীগণ বর্ম্মন উপাধি দেখিয়াই হরিবর্ম্মাকে শ্যামলবর্ম্মার জ্ঞাতি মানিয়া লইয়াছেন। বেলাব তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে হরিবর্ম্মার সহিত ভোজবর্ম্মার সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে, তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বসুজ মহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন "হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার সচিব ভবদেব উভয়েই শ্যামলবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী।" গত বৈশাখ মাসের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে হরিবর্ম্মা চন্দ্রবর্ম্মার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় বসুজ মহাশয়ের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে যাইয়া কতকগুলি স্বপ্নদৃষ্ট তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেলাব তাম্রশাসনে যে হরিবর্ম্মার ইঙ্গিত আছে তাহাতে এমন বুঝায় না যে তিনি নিশ্চিত চন্দ্রবর্ম্মার পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে যে তিনি শ্যামলবর্ম্মার সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এই কথা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতানুসারে হরিবর্ম্মদেব ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী। মৈত্রেয় মহাশয় কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা জানান নাই, তবে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে ভোজবর্ম্মার পূর্ব্বে হরিবর্ম্মাকে স্থাপন করা যায় না।

বর্ম্মরাজবংশের সহিত তাৎকালীন অন্যান্য রাজবংশের সম্পর্ক।
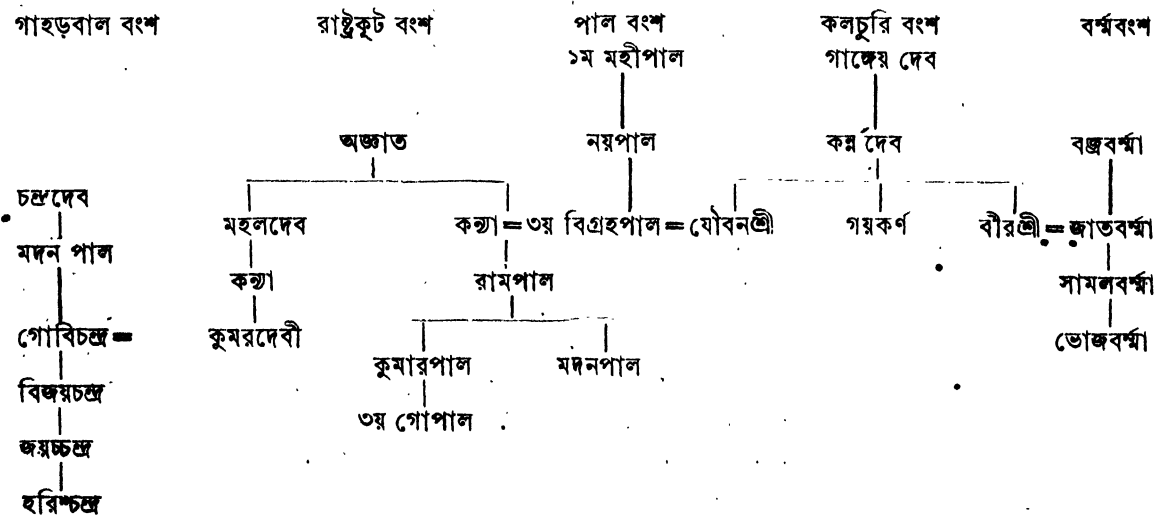
জগদেকমল্লের সহিত জগদ্বিজয়মল্লের অধিকতর সাদৃশ্য আছে। কল্যাণের চালুক্যবংশের দ্বিতীয় জগদেকমল্ল গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সমসাময়িক। একমাত্র বেলাব তাম্রশাসনের বলে ভোজবর্ম্মার মাতুলবংশ ঠিক নির্ণয় করা যাইতে পারে না, নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক বেলাব তাম্রশাসনের ১০ম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের ১ম তিনটি অক্ষর পড়িতে পারেন নাই, বসুজ মহাশয় নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ঃ—

"তথোদয়ী সুন্দরভুৎ প্রভুত প্রতাপ বীরেষপি সঙ্গরেষু
যশ্চন্দ্রহা(স) প্রতিবিম্বিতং স্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতেস্ম॥"

মূল তাম্রশাসন এবং গত বৎসরের "সাহিত্যে" প্রকাশিত বেলাব তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফে দেখিতে পাইতেছি যে "প্রতাপ" স্থানে "দুর্ব্বার" খোদিত আছে ঃ—

"তথোদয়ী-সুন্দরভুৎ প্রভুত দুর্ব্বার বীরেষপি সঙ্গরেষু
যশ্চন্দ্রহা(স) প্রতিবিম্বিত স্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতেস্ম।"

গত পৌষমাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় বসুজ মহাশয় "বঙ্গরাজ-শ্বশুর জগদ্বিজয়" নামক আর একটি প্রবন্ধে বেলাব তাম্রশাসনের ১০ম শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত পাঠ উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় মূল তাম্রশাসনে সেরূপ পাঠ নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ-চিন্তামণি এবং ফরবিসের (Forbes) রাসমালা নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে জগদ্দেব সম্বন্ধে দুইটি সুন্দর গল্প তুলিয়া দিয়াছেন। এইগুলি সুখপাঠ্য হইলেও আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। বসুজ মহাশয় বলিতেছেন—

"ঈশ্বর বৈদিকের বৈদিক কুলপঞ্জি হইতে আমরা সামলবর্ম্মার বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।"

পাদটীকায় বলিতেছেন—

"স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সেই-সকল প্রমাণ উদ্ধৃত ও আলোচিত হইল।"

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছি, তাহার বোধ হয় আর নূতন আলোচনা আবশ্যক হইবে না। বসুজ মহাশয়ের স্বতন্ত্র প্রবন্ধ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। স্থানান্তরে বসুজ মহাশয় বলিতেছেন,—

"সামলবর্ম্মাই যাদব-বংশের প্রথম নৃপতিরূপে বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

পাদটীকায় বলিতেছেন—স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। স্বতন্ত্র প্রবন্ধটি বোধ হয় অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় ঢাকা-রিভিউ পত্রের পৌষ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

এতদিন বাঙ্গলার বর্ম্মা রাজবংশের খাঁটি বিবরণ জানিবার উপায় ছিল না। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি, শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের কিয়দংশ এবং কুলজী গ্রন্থ হইতে এই বংশের যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে শ্যামলবর্ম্মা স[...] কিছু স্থির হয় নাই। অনুমানে সকলেই তাঁহাকে বিজয়সে[...] পুত্র স্থির করিয়াছিলেন। একের বর্ম্মা ও অপরের সেন উ[...] থাকায় এ সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত কেহ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে লইতে পা[...] নাই।"

পাঠকগণ ইহার সহিত বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক লি[...] "শ্যামলবর্ম্মা ও ভোজের তাম্রশাসন" নামক প্রব[...] দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ্ মিলাইয়া দেখিবেন।

রায় মহাশয় অনেকস্থানে শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাস[...] উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা যে কি বস্তু তাহা পাঠকবর্গ[...] জ্ঞাত করা উচিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগে[...] নাথ বসু মহাশয় দুইশত বর্ষের হস্ত-লিখিত একখ[...] বৈদিক কুলপঞ্জিকায় ইহার কিয়দংশের অনুলিপি পাই[...] ছেন। অনুলিপিটি দেখিবামাত্র বোধ হয় যে [...] বর্ম্মবংশীয় কোন রাজার খোদিত লিপির অনুলিপি হই[...] পারে না। লেখক বিশ্বরূপ সেন বা লক্ষ্মণ সেনের তা[...] শাসন হইতে এই অংশ নকল করিয়া লইয়াছেন, কে[...] "সেনবংশকুলকমল" স্থানে "বর্ম্মবংশকুলকমল" লি[...] দিয়াছেন। নকল প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে [...] কেশব সেনের বা বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন আবি[...] হইবার পরে এই অংশ বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক আবি[...] কুলগ্রন্থে "প্রক্ষিপ্ত" হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণ সেন [...] তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সেনবংশীয় রাজা "অশ্বপতি, গ[...] পতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি" উপাধি গ্রহণ কে[...] নাই। ইহা যে কলচুরি-রাজগণের উপাধি তাহা ক[...] দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখিলেই বুঝিতে পা[...] যায়। তাম্রশাসনে লেখক কর্ণদেবের নিম্নলিখিত ক[...] উপাধি দিয়াছেন—

"পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর কলিঙ্গাধিপতি শ্রীমৎ কর্ণদেবো নিজভুজোপার্জ্জিতাশ্বপতিগজপ[...] নরপতি রাজত্রয়াধিপতিঃ শ্রীমৎ কর্ণদেবঃ"।

চন্দ্রদেব, মদনপাল, গোবিন্দচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, জয়চ[...] হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি গহেড্বালবংশীয় কান্যকুব্জ রাজ[...] সর্ব্বদাই এই উপাধি ব্যবহার করিতেন। তা[...] শাসনে শ্যামলবর্ম্মদেবকে সেনরাজগণের ন্য[...] "অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" উপাধি ব্যবহ[...] করিতে দেখা যায়; বাঙ্গালার সেনবংশ ব্যতী[...] অপর কোন রাজবংশকে এই জাতীয় বিরুদাবলী ব্য[...] হার করিতে দেখা যায় না। "বঙ্গের জাতীয় ইতি[...] হাসে" প্রকাশিত শ্যামলবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের অনুলি[...] দেখিলে বোধ হয় যে কুলশাস্ত্র অনুসারে শ্যামলব[...] দেবকে সেনবংশোদ্ভব মনে করিয়া কোন ব্যক্তি তা[...] শাসনের এই অংশটি রচনা করিয়া বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃ[...] আবিষ্কৃত কুলপঞ্জিকায় যোগ করিয়া দিয়াছেন। এ[...]

তাম্রশাসনে রচয়িতা শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম দেন নাই কি জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে, তখনও শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই এবং রচয়িতা ভরসা করিয়া শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত রায়মহাশয় নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন :—

(১) "রাজেন্দ্র চোলের তাম্রশাসন অনুসারে জানা যায় যে তিনি ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ় দেশ জয় করিয়াছিলেন।"

এই দুই ছত্রে দুইটি নূতন আবিষ্কারের কথা আছে :— (ক) রাজেন্দ্র চোলের কোন একখানি তাম্রশাসনে তাঁহার রাঢ়বিজয়ের কথা আছে, এবং (খ) তিনি ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়দেশ জয় করিয়াছিলেন। এতদিন পৃথিবীর লোকে জানিত যে এক তিরুমলয় পাহাড়ে খোদিত লিপি ব্যতীত অপর কোন খোদিত লিপিতে ১ম রাজেন্দ্র চোল দেবের উত্তরাপথ বিজয়ের কথা নাই। আমরা জানিতাম যে রাজেন্দ্র চোলের ১৩শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে তাঁহার উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্লিট্, সিউয়েল ও ডাক্তার হুলজের গণনানুসারে অনুমান ১০১১।১২ খ্রীষ্টাব্দে ১ম রাজেন্দ্র চোলদেব সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ১ম রাজেন্দ্র চোলদেবের উত্তরাপথাভিযান শেষ হইয়াছিল। তিনি যে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ় জয় করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না। ভরসা করি রায় মহাশয় স্বয়ং এই নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহা প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী জনসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

(২) "তাঁহার সহিত জ্যোতিবর্ম্মা নামক বর্ম্মবংশীয় একজন বীর ছিলেন।"

(৩) "রাজেন্দ্র চোল দেশে চলিয়া গেলে এই জ্যোতিবর্ম্মা বিক্রমপুর জয় করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।"

(৪) "বর্ম্মবংশীয় বজ্রবর্ম্মার পৌত্র, জাতবর্ম্মার পুত্র শ্যামলবর্ম্মা হরিবর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।"

শেষের তিনটি আবিষ্কার অসাধারণ মৌলিক গবেষণার ফল। এগুলিকে বিংশতি শতাব্দীর নূতন আবিষ্কার সমূহের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে, দোষের মধ্যে প্রমাণাভাব। রায় মহাশয় তাঁহার নূতন আবিষ্কারগুলির প্রমাণ শীঘ্র প্রকাশ করুন। প্রমাণগুলি প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

রায় মহাশয় বলিতেছেন :—

"বিক্রমপুরের বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, "দেবগ্রহ গ্রহমিতে স বভুব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রুন্" অর্থাৎ শ্যামলবর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) নিজবলে শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।"

রায়মহাশয় অতি সুন্দর ভাষায় ও স্পষ্টভাবে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এই কথাটি তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। কথাটি তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) শ্যামলবর্ম্মাই বর্ম্মবংশের ১ম রাজা, (২) তিনি নিজ ভুজবলে গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন, (৩) তিনি ৯৯৪ শকে (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দে) অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই কথাগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য বসুজমহাশয় বেলাব তাম্রশাসনের অষ্টম শ্লোকের বিপরীত অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই জন্যই তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে জাতবর্ম্মা যে রাজশ্রী বিস্তার করিয়াছিলেন চেদীরাজ কর্ণদেবই তাহার উপভোক্তা। শ্যামলবর্ম্মাকে বর্ম্মবংশের প্রথম রাজা করিতে পারিলে কুলশাস্ত্রের কথঞ্চিৎ মর্য্যাদা রক্ষা হয়। কুলশাস্ত্রোক্ত ঐতিহাসিক কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা হয় না, এই জন্যই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই-সকল অত্যাশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত কথার অবতারণা করিয়াছেন। বসুজ মহাশয় বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিন্তু রায়মহাশয় বোধ হয় এই পথের নূতন পথিক; কারণ বসুজ মহাশয় যে স্থানে "আভাস" ও "ইঙ্গিত" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সে স্থানে রায়মহাশয় যেন প্রত্যক্ষ কথা বলিতেছেন। দৃষ্টান্ত :—বসুজ মহাশয় বলিতেছেন—

"এতদ্দারা এরূপ আভাস পাইতেছি, দোহন বা গ্রহণ দ্বারা জাতবর্ম্মা সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিলেও কর্ণদেবই প্রকৃত প্রস্তাবে উপভোক্তা ছিলেন। জাতবর্ম্মার পুত্রই তাঁহার এই সার্ব্বভৌমিকত্ব লাভের প্রধান সহায় ছিলেন বলিয়া এখানে যেন ইঙ্গিত রহিয়াছে।"

রায়মহাশয় বলিতেছেন :—

"এই শ্লোকটি নিতান্তই অতিরঞ্জিত। তাম্রশাসনের পঞ্চম-শ্লোকে লিখিত আছে,—হরির জ্ঞাতিবর্গ বর্ম্মা-উপাধিধারিগণ সিংহতুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা যে এই সিংহপুর গ্রামের বাহিরে কখন গিয়াছেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ উক্ত তাম্রশাসনেই নবম শ্লোকে লিখিত আছে শ্যামলবর্ম্মাই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে জাতবর্ম্মা রাজা ছিলেন না।"

কথা হইতেছে বেলাব তাম্রশাসনের ৮ম শ্লোকের! শ্লোকটিকে অতিরঞ্জিত না বলিলে বসুজ মহাশয়ের নিম্নলিখিত উক্তির অর্থ হয় না, "সামল বর্ম্মাই যাদববংশের প্রথম নৃপতিরূপে বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।" ৯ম শ্লোকে এমন কোন কথাই নাই যাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে শ্যামলবর্ম্মাই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা যে সিংহপুর গ্রামের বাহিরে গিয়াছিলেন, বেলাব তাম্রশাসনের ৮ম শ্লোকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

"If Hari Varma cannot be proved to have belonged to a dynasty different from that of Bhoja Varma, he can have no place in history before Bhoja Varma." (Modern Review, 1912. p. 249)

এই উক্তির পক্ষে যে কি প্রমাণ আছে তাহা বলিতে পারি না। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যদি কোন নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। বেলাব তাম্রশাসনের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকানুসারে হরিবর্ম্মা যাদব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ ভোজবর্ম্মার কিছু দিন পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতাপাঠ

[গতমাসের গীতাপাঠপ্রবন্ধে ভুলক্রমে একটি অশুদ্ধ শ্লোক প্রবেশ করিয়াছে এইরূপ ঃ—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখবন্ধেন বধ্নাতি দুঃখবন্ধেন চানঘ॥

ইহার পরিবর্ত্তে হইবে এইরূপ ঃ—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখবন্ধেন বধ্নাতি জ্ঞানবন্ধেন চানঘ॥]

প্রশ্ন॥ তুমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আমাকে বুঝাইলে —কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বটে; তা ছাড়া, তোমার নিজের কথাগুলিকে তুমি মনোহর শাস্ত্রীয় বেশে সাজাইয়া দাঁড় করাইতেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি কর নাই। কিন্তু এত যে তোমার যুক্তিপ্রদর্শনের এবং শাস্ত্রপ্রদর্শনের কৌশল পারিপাট্য—সবই উল্টাইয়া যাইতেছে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একটি কথার এক-ঝাপটে! তাঁহার প্রণীত আত্মবোধ-নামক পুস্তিকায় স্পষ্ট লেখা আছে—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ বিনির্ম্মলং।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—

নির্ম্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহার তুমি কি উত্তর দেও?

উত্তর॥ শঙ্করাচার্য্যের মতো অতবড় একজন পাকা মাঝি জ্ঞানতরী'কে অজ্ঞান-সমুদ্রের সারাপথ নির্ব্বিঘ্নে পার করাইয়া আনিয়া মোক্ষডাঙায় পৌঁছিবার সম-সম কালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন, তবে তাহাতে কী প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার তলায় কোনো-না-কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র যে কি, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সে ছিদ্র হ'চ্চে কঠোর অদ্বৈতবাদ। গীতাশাস্ত্রের কোথাও কিন্তু সেরূপ ছিদ্রও নাই—তাহার কথাও নাই। এইজন্য বলি যে, শঙ্করাচার্য্যের মতামতের দায় গীতাশাস্ত্রের স্কন্ধে চাপাইতে যাইবার পূর্ব্বে তোমার উচিত ছিল মুক্তি-বিষয়ে বেদান্তদর্শনের সহিত গীতাশাস্ত্রের কোন্ জায়গায় মিল এবং কোন্ জায়গায় অমিল তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখা। তাহা যখন তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তখন আমার কর্ত্তব্য—তোমার সেই উপেক্ষিত বিষয়টিকে যবনিকার আড়াল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তোমার চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করা। কেননা আমি দেখিতেছি যে, তাহা যদি আমি না করি তবে কিছুতেই তোমার ভুল ভাঙিবে না। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে—মুক্তি-বিষয়ে বেদান্তদর্শনের প্রকৃত মতামত কিরূপ তাহার মোট বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে জ্ঞাপন করা নিতান্তই আবশ্যক বিবেচনায় আপাতত তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চদশ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে প্রশ্ন একটী উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,

"কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনান্ অবিশেষেণৈব অমানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকং উত কাংশ্চিদেব"।

ইহার অর্থ ঃ—

যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপাতিরিক্ত বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনোপ্রকার প্রাকৃত আবির্ভাব) অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন—সবাই কি তাঁহারা নির্ব্বিশেষে দিব্য পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন, অথবা—কেহবা নীত হ'ন—কেহ বা হ'ন না?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,

"প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বান্ অন্যান্ বিকারালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মলোকং।"

ইহার অর্থ ঃ—

বিকারালম্বীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) প্রতীকোপাসক অর্থাৎ প্রতিমাদি-পূজক এবং (২) সগুণব্রহ্মোপাসক। বিকারালম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিমাদি-পূজক তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন না; পরন্তু যাঁহারা সগুণব্রহ্মোপাসক—সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন।

ঐ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের সপ্তদশ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,

"যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিং তেষাং নিরবগ্রহং ঐশ্বর্য্যং ভবতি আহোস্বিৎ সাবগ্রহং।"

ইহার অর্থ এই ঃ—

সগুণব্রহ্মোপাসনার প্রসাদে যাঁহারা মনকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য কি সর্ব্বাঙ্গীন অথবা আংশিক ?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,

"জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যৎ অণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগদ্‌ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈব ঈশ্বরস্য।"

ইহার অর্থ ঃ—

সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি জগদ্‌ব্যাপার ব্যতিরেকে অণিমাদি প্রভৃতি আর আর যতপ্রকার ঐশ্বর্য্য আছে—সমস্তই মুক্তপুরুষে বর্ত্তিতে পারে ;—জগদ্‌ব্যাপার কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই অধিকারায়ত্ত, তদ্ভিন্ন তাহা আর কাহারও অধিকারায়ত্ত নহে।

ঐ অধ্যায়ের ঐ পাদের উনবিংশ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে লেখে

"বিকারাবর্ত্ত্যপি চ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং, ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরং সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং। তথাহ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহ আম্নায়ঃ। 'তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।' 'পাদোঽস্য সর্ব্বাণি ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' ন চ তং নির্ব্বিকারং রূপং ইতরালম্বনা প্রাপ্নুবন্তীতি শক্যং বক্তুং। * * * যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপং অনবাপ্য সগুণে এব অবতিষ্ঠন্তে এবং সগুণেঽপি নিরবগ্রহং ঐশ্বর্য্যং অনবাপ্য সাবগ্রহে এব অবতিষ্ঠন্তে।"

ইহার অর্থ ঃ—

নিত্যমুক্ত পারমেশ্বর (অর্থাৎ পরমেশ্বরীয়) রূপ শুধু যে সূর্য্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠান প্রভৃতি বিকারের (অর্থাৎ জগদ্‌ব্যাপারের) সহবর্ত্তী তা তো আর না ;—একদিকে যেমন তাহা বিকারের সহবর্ত্তী, আর এক দিকে তেমনি তাহা নির্ব্বিকার। বেদে তাই ইঁহার দুইরূপ স্থিতির উল্লেখ আছে ; যেমন—'ইঁহার মহিমা এতদূর পর্য্যন্ত ; মহিমান্বিত পুরুষ তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়' ; এই বেদবচনটিতে মহিমাতে স্থিতি এবং স্বরূপে স্থিতি দুইই এক সঙ্গে সূচিত হইতেছে ; তথৈব 'ইঁহার এক পাদ সমস্ত ভূত—ত্রিপাদামৃত দ্যুলোকে' এই আর-একটি শ্রুতি-বচনে জগদ্‌ব্যাপারের সহবর্ত্তিতা এবং অতিবর্ত্তিতা দুইই এক সঙ্গে সূচিত হইতেছে। একথা বলিতে পার না যে, বিকারালম্বীরা (অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রাকৃত আবির্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা) পরমেশ্বরের নির্ব্বিকাররূপে স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন। সগুণব্রহ্মোপাসকেরা একদিকে যেমন পরমেশ্বরের নিগুর্ণরূপে স্থান না পাইয়া সগুণরূপে স্থিতি করেন, আর এক দিকে তেমনি তাঁহারা পরমেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইয়া আংশিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হ'ন।

["সর্ব্বাঙ্গীন ঐশ্বর্য্য" কিনা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃত্ব—"আংশিক ঐশ্বর্য্য" কিনা অণিমালঘিমাদি অলৌকিক শক্তিসামর্থ্য]।

ঐ অধ্যায়ের ঐ পাদের একবিংশসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে তৃতীয় আর-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,

"ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানাং ঐশ্বর্য্যং যস্মাৎ ভোগমাত্রং এষাং অনাদিসিদ্ধেন ঈশ্বরেন সমানং ইতি শ্রূয়তে * * * * 'যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি এবং হৈবম্বিদং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি' * * *। নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাৎ অন্তবত্বং ঐশ্বর্য্যস্য স্যাৎ ততশ্চৈষাং আবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত।"

ইহার অর্থ ঃ—

আর-একটি কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের ঐশ্বর্য্যকে নিরঙ্কুশ বলিতে পারা যায় না অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ বলিতে পারা যায় না। সে কারণ এই যে, বেদে কেবল বলে—উঁহাদের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত ভোগবিষয়েই সমান, তা বই, এরূপ বলে না যে, উঁহাদের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত কর্ত্তৃত্বাদি বিষয়েও সমান ; তার সাক্ষী ঃ—বেদে আছে 'সমুদায় ভূত দেবতাকে যেমন রক্ষা করে—উপাসককেও তেমনি রক্ষা করে' ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ ঐশ্বর্য্য যেহেতু ভোগবিষয়ক মাত্র, এই হেতু তাহা সীমাবচ্ছিন্ন। সীমাবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যের ভোগ কিছু আর অনন্তকাল চলিতে পারে না—তাহার অন্ত অনিবার্য্য। তবে কি ভোগাবসানে মুক্তপুরুষকে পুনর্ব্বার ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে ?

পরবর্ত্তী সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,

"নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেন অর্চ্চিরাদি পর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি—যস্মিন্ অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং ইতোদিবি যস্মিন্ ঐরম্মদীয়ং সরো যস্মিন্ অশ্বত্থঃ সোমসবনো যস্মিন্ অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম যশ্চানেকধা মন্ত্রার্থবাদাদি প্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিযুক্তভোগো আবর্ত্তন্তে। কুতঃ। 'তয়োর্দ্ধং আয়ন্ অমৃতত্বং এতি।' 'তেষাং ন

পুনরাবৃত্তিঃ।' 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে।' 'ব্রহ্মলোকং অভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।' ইত্যাদি শব্দেভ্যঃ। অন্তবত্ত্বেঽপি তু ঐশ্বর্য্যস্য যথা অনাবৃত্তি স্তথা বর্ণিতং 'কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরং' ইত্যত্র। সম্যক্ দর্শনবিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধা এব অনাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপি অনাবৃত্তিসিদ্ধিঃ।"

ইহার অর্থ ঃ—

যাঁহারা নাড়ীরশ্মিসমন্বিত অর্চ্চি প্রভৃতি পংক্তিবিভাগের মধ্যদিয়া দেবযান পথ অতিবাহন করিয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন;—পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে যেখানে বিরাজ করিতেছে অরণ্য নামক যুগল সমুদ্র, অন্নমদময় সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, ব্রহ্মার অপরাজিতা পুরী এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত হিরণ্ময় প্রাসাদ—সেই ব্রহ্মলোকে যাঁহারা গমন করেন, সেখান হইতে তাঁহারা চন্দ্রলোকবাসীদিগের ন্যায় বিযুক্তভোগ হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ তাহার—'উপাসকেরা উর্দ্ধে গমন করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হ'ন' 'তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না' 'তাঁহারা মনুষ্যলোকে আবর্ত্তন করেন না' 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন না' এইসকল বেদবাক্য। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্রহ্মোপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য অন্তবান্ হইলেও যে-প্রকারে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নিবারিত হয় সে কথা পূর্ব্বের একটি সূত্রে বলা হইয়াছে; বর্ত্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দশমসূত্রে অর্থাৎ 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরং' এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই স্থানে অবস্থিতি-কালেই তত্রত্য অধিবাসীদিগের সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া গতিকে তাঁহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রহ্মা তাঁহার সঙ্গে তাঁহারা একত্রে পরম পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ পরমস্থান প্রাপ্ত হ'ন। সম্যক্‌জ্ঞানের-উৎপত্তি-প্রসাদাৎ যাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছে সেই নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণ মুক্ত পুরুষদিগের অনাবৃত্তি তো সিদ্ধই আছে; অতএব তৎপ্রসাদাৎ (অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের উৎপত্তিপ্রসাদাৎ) সগুণব্রহ্মোপাসকদিগেরও যে অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে—তাহা তো হইবারই কথা।

মুক্তিবিষয়ে বেদান্তদর্শনের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি সবিস্তরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—

প্রথম সিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বরের স্থিতি দুই প্রকার—(১) স্বরূপে স্থিতি, এবং (২) মহিমাতে স্থিতি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

(১) যে-ভাবে তিনি স্বরূপে স্থিতি করেন সে-ভাবে তিনি নির্গুণ; আর (২) যে-ভাবে তিনি আপনার মহিমাতে স্থিতি করেন সে-ভাবে তিনি সগুণ।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ প্রতিমাদি-পূজা ব্রহ্মোপাসনার কোটায় স্থান পাইবার অযোগ্য। *

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিপ্রাপ্ত সম্যক্‌জ্ঞানীদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তো হয়ই না, তা ছাড়া—সগুণব্রহ্মের উপাসকদিগকেও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

ইহলোকেই হউক্ আর পরলোকেই হউক—যখনই যাঁহাতে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই তিনি মুক্ত হ'ন।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

সগুণব্রহ্মোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন; আর সেখানে অবস্থিতি-কালে—একদিকে যেমন জগদ্ব্যাপার ব্যতীত আর আর সমস্ত ঐশ্বর্য্য (যেমন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) তাঁহাদের করায়ত্ত হয়; আর এক দিকে তেমনি তাঁহাদের অন্তরে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞানের কপাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, আর, সেইগতিকে তাঁহারা মুক্ত হ'ন।

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রহ্মা তাঁহার সহিত একত্রে পরম পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ কিনা পরমধাম প্রাপ্ত হ'ন।

বেদান্তদর্শনের শেষের এই সিদ্ধান্তটির সম্বন্ধে আমার মনে দুইটি গুরুতর প্রশ্ন সহসা উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ যদি প্রকৃত পক্ষেই নির্ব্বাণ হয়, আর সেই কারণে যদি ব্রহ্মা প্রলয়কালে তাঁহার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরদিগের সহিত একত্রে বিষ্ণুর পরমপদে উপনীত হইয়া একবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন, তবে ব্রহ্মার অবর্ত্তমানে প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টির কার্য্য চলিবে কাঁহার অধ্যক্ষতায়?

* আমাদের দেশের অধম-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিষয়ী লোকদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য সময়ে সময়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এইরূপ একটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা লোকমধ্যে রটনা করিয়া থাকেন যে, প্রতিমাপূজাও একপ্রকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। ইঁহাদের জানা উচিত যে, প্রতিমাপূজা ব্রহ্মোপাসনার কোটায় স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রতীকোপাসনার কোটায় তাহার জন্য স্বতন্ত্র একটা স্থান পরিচিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রশান্ত অবস্থাতেও মুক্তপুরুষের জ্ঞান প্রেমাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম অবিচ্যুত থাকে, আর, সেই কারণে যদি—প্রলয়কালে ব্রহ্মা এবং তাঁহার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরেরা বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হ'ন, তবে প্রলয়ান্তে আবার যখন ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের (অবশ্য নূতন সৃষ্ট ব্রহ্মলোকের) আধিপত্যকার্য্যে ব্রতী হ'ন, তখন তাঁহার পুরাতন ব্রহ্মলোকবাসী সহচরেরা তাঁহার সঙ্গে একত্রে নূতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত না হইবেন যে কেন, তাহার কোনো অর্থ থাকে না। রজনী অবসানে রাজা যেমন রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন—মন্ত্রীও তেমনি মন্ত্রণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন—রাজদূতও তেমনি দৌতকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—চাষাও তেমনি চাষকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; নচেৎ রাজ্যের প্রজারা যদি স্ব স্ব অধিকারোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তবে রাজা রাজকার্য্য করিবেন কাহাদিগকে লইয়া? জনশূন্য রাজ্যের রাজাই বা কিরূপ রাজা? ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরদিগের অবর্ত্তমানে ব্রহ্মলোক যদি জনশূন্য হয়, তবে সেরূপ ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মাতেই বা কি কাজ, আর, বর্ত্তিয়া থাকিয়াই বা কি কাজ? *

প্রশ্ন। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তোমার প্রশ্ন-দুটার একটা সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ক্ষান্ত থাকিবে? তা চেয়ে—স্পষ্ট বল না কেন যে, কোনো জন্মেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তোমাকর্ত্তৃক ঘটিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের দেশীয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরা তোমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন?—হরি হরি! তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? হইবে যাহা—তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি;—তুমি শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া দেশসুদ্ধ সমস্ত শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তোমার প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন। তবে যদি তুমি রামানুজাচার্য্য বা ঐরূপ কোনো লোকপূজ্য আচার্য্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে তাহা হইলে তুমি অনেকানেক পণ্ডিতের নিকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিতে—সেটা সত্য।

উত্তর॥ শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমার স্বপক্ষসমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত বিবেকচূড়ামণি এবং সর্ব্ববেদান্তসার হইতে গণ্ডাগণ্ডা বহুমূল্য বচন যাহা আমি

---

* বর্ত্তমানকালের একজন মার্কিণদেশীয় যোগিঋষি-শ্রেণীর মহাত্মা (Andrew Jackson Davis) Clairvoyance-সংজ্ঞক ধ্যানযোগের প্রভাবে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-ব্যাপারের যেরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা মোটের উপর আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের সহিত মেলে একরকম মন্দ না, পরন্তু তাহার অবান্তর শ্রেণীর বিষয়গুলা কতক বা ভাবে মেলে ভাষায় মেলে না—কতক বা কোনো অংশেই মেলে না। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে তাহার কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

After the individual souls leave this planet অর্থাৎ পৃথিবী (and all planets in universal space which yield such organizations of matter) they ascend to the Second Sphere of existence. Here all individuals undergo an angelic discipline, by which every physical and spiritual deformity is removed, and symmetry reigns throughout the immeasurable empire of holy beings. When all spirits shall have progressed to the second sphere, the various earths and planets in the Universe * * * will be depopulated and not a living thing will move upon their surfaces. And so there will be no destruction of life in that period of disorganization, but the earths and suns and planets will die—their life will be absorbed by the Divine Spirit. * * * But the inhabitants of the second sphere will ultimately advance to the third, then to the fourth, then to the fifth, and lastly into the sixth; this sixth sphere is as near the Great Positive Mind as spirits can ever locally or physically approach. * * * It is in the neighbourhood of the divine aroma of the Deity; it is warmed and beautified infinitely by His infinite Love, and it is illuminated and rendered unspeakably magnificent by His all-embracing Wisdom. In this ineffable sphere in different stages of individual progression, will all spirits dwell.

* * * * *

When all spirits arrive at the Sixth Sphere of existence, and the protecting Love and Wisdom of the great Positive Mind are thrown tenderly around them; and when not a single atom of life is wandering from home in the fields and forests of immensity; then the Deity contracts his inmost capacity, and forthwith the boundless vortex is convulsed with a new manifestation of Motion—Motion transcending all our conceptions, and passing to and fro from centre to circumference, like mighty tides of Infinite Power. Now the law of Association or *gravitation* exhibits its influence and tendency in the formation of new suns, new planets, and new earths. The law of progression or *refinement* follows next in order and manifests its unvarying tendency in the production of new forms of life on those planets; and the law of development follows next in the train, and exhibits its power in the creation of *new* plants, animals, and human spirits upon every earth prepared to receive and nourish them. Thus God will create a new Universe, and will display different and greater elements and energies therein. And thus new spheres of spiritual existences will be opened. These spheres will be as much superior to the present unspeakable glories of the sixth sphere, as the sixth sphere is now above the second sphere; because the *highest* sphere in the *present* order of the Universe will constitute the *second* sphere in the *new* order which is to be developed.

There have already been developed more new Universes, in the manner described, than there are atoms in the earth.

ইতিপূর্ব্বে উর্দ্ধৃত করিয়াছি তাহার একটিও আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না। শঙ্করাচার্য্যের মতো অতবড় একজন তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য কি কেহ কোথাও দেখিয়াছে না দেখিবে? কী অকৃত্রিম সত্যানুরাগী! পাণ্ডবসেনার মধ্যে যেমন অর্জ্জুন অদ্বিতীয়, সত্যের সেনার মধ্যে তেমনি শঙ্করাচার্য্য অদ্বিতীয়। আমি আবার শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিব? আমি তাঁহার বিন্দু-মাত্র পদধূলি পাইলে বর্ত্তিয়া যাই! আমার বিশ্বাস এই যে, যাহাকে আমি বলিতেছি "কঠোর অদ্বৈতবাদ" তাহা কেবল শঙ্করাচার্য্যের মতের একটা বাহিরের পরিচ্ছদ, তা বই, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মতের ভিতরের কথা নহে। শঙ্করাচার্য্যের ভিতরে মহা এক অদ্বিতীয় সত্য জাগিতেছে; এম্নি তাহা অপ্রতিম—এম্নি অপরিমেয়—এম্নি অতলস্পর্শ গভীর, যে, তাহা মুখেও ব্যক্ত করা যায় না—লেখনীতেও ব্যক্ত করা যায় না, বলিয়াও বুঝানো যায় না, গড়িয়াও দেখানো যায় না। যাহা মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব সেই কথাটি পাকে প্রকারে, ইঙ্গিত ইসারায়, ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কঠোর অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্য্য এই যে একটি কথা বলিয়াছেন —যে,

"অজ্ঞান-কলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ সুনির্ম্মলং
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতক-রেণুবৎ ॥"

"নির্ম্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়" এ কথাটির নিগূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝি তাহা এই:—

শঙ্করাচার্য্যের ভিতরে যে কথাটি জাগিতেছে তাহা যদি তিনি মুখে প্রকাশ করিয়া না বলেন, তবে তাহা তাঁহার ভিতরেই থাকিয়া যায়। যদি তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন তবে তাহা কঠোর অদ্বৈতবাদের আকারে পরিণত হয়। সেই ভিতরের ভাবটির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে অদ্বৈতবাদের নিশান খাড়া করা ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর নাই। লোকে কথায় বলে "নেই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল।" শঙ্করাচার্য্যের ভিতরের কথাটি একেবারেই তাঁহার ভিতরে থাকিয়া যাওয়া অপেক্ষা অদ্বৈতবাদের আকারে তাহা লোক-মধ্যে প্রচারিত হওয়া ভাল। এখন কথা হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদ দিব্য একটি চাঁছা-ছোলা মত, এইজন্য তাহা লোকের জ্ঞানের উপলব্ধিগম্য; পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভিতরের কথাটি যেহেতু অনির্ব্বচনীয়, এই হেতু তাহা জনসাধারণের উপলব্ধিগম্য নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে তোমার অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইলে সেই সঙ্গে তোমার অদ্বৈতজ্ঞানও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিনাশ পাইবে যেন অদ্বৈতজ্ঞান—উৎপন্ন হইবে কিরূপ জ্ঞান? যদি বলো—কিছুই উৎপন্ন হইবে না—যাহা অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে তাহাই অবিদ্যামুক্ত হইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি—যাহা অবিদ্যামুক্ত হইবে তাহা জ্ঞান কি অজ্ঞান? তাহা যদি জ্ঞান হয়, তবে, এই যে তুমি বলিলে "জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হইবে" তোমার এ কথাটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যায়। আমি তাই বলি এই যে, চরমে যেরূপ জ্ঞান অবিদ্যামুক্ত হইয়া বিরাজমান হইবে, তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা কাহাকেও বুঝানো যাইতে পারে না; আর, তাহা বুঝানো যাইতে পারে না বলিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহা কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। তা ছাড়া—কাহাকেও তাহা বুঝাইতে চেষ্টা না-করিবার এটাও একটা কারণ—যে, সে জ্ঞান যাঁহার যখন উৎপন্ন হইবে, তখন, তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা তিনি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন; তাহার পূর্ব্বে তাহা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। এ যাহা আমি বলিলাম তাহার একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা যদি আমি না করি, তবে, আমার মন বলিতেছে যে, শ্রোতারা আমার ঐ কথাটির তাৎপর্য্য এক বুঝিতে আর বুঝিবেন।

জ্যামিতি-পুস্তকের গোড়াতেই সরল রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইয়াছে। একটি সংজ্ঞা এই যে, যে-রেখা দুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যে সরলভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেই বলা যায় সরল রেখা। এ সংজ্ঞা সংজ্ঞাই নহে। আর একটি সংজ্ঞা এই যে, দুই বিন্দুর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম পথ তাহাই সরল রেখা। এটা তো সংজ্ঞা নহে—এটা সিদ্ধান্তবিশেষ; কেননা দুই বিন্দুর মধ্যস্থিত হ্রস্বতম রেখা সরল কি বক্র তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। প্রকৃত কথা এই যে, সরল রেখার সংজ্ঞা হয় না—অথচ জোর করিয়া তাহার সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে। আর একদিকে দেখা যায় যে, সরল রেখা যে কাহাকে বলে, তাহা অধম মূর্খ লোকেরাও জানে। তার সাক্ষী—কোনো একজন গাড়োয়ান্ যখন গাড়ী সজোরে ঠেলিয়া স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করে—তখন সে সরল-রেখাপথে বলপ্রয়োগ করে। প্রকৃত কথা এই যে, সরল রেখা একপ্রকার মানসিক রেখা—তাহা বল-স্ফূর্ত্তিরই আর এক নাম; সুতরাং তাহার দৈশিক সংজ্ঞা অসম্ভব। এখানেও নেই-মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল—সরল রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ না-করা অপেক্ষা ছাত্রদিগের

উপকারার্থে মোটামুটি তাহার একটা সংজ্ঞানিরূপণ করা ভাল। চরম ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ জ্ঞান তাহার সংজ্ঞা নির্ব্বাচন যদিচ অসম্ভব, কিন্তু তাহা যে কিরূপ জ্ঞান নহে, তাহা বলিতে পারা কিছুই কঠিন নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিতে পারিতেন যে, চরম ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞানও নহে —অদ্বৈতজ্ঞানও নহে; তাহা তিনি বলেন নাই কেবল এই জন্য—যেহেতু "অদ্বৈতজ্ঞান নহে" বলা তাঁহার মুখে শোভা পায় না; তা ছাড়া—"দ্বৈতও নহে অদ্বৈতও নহে" এরূপ একটা হেঁয়ালি ধরণের কথা দর্শন-শাস্ত্রে স্থান পাইবার অযোগ্য। হেঁয়ালিধরণের কথা দর্শন-শাস্ত্রে যদিচ শোভা পায় না, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে তাহা খুবই শোভা পায়; কেননা তন্ত্রশাস্ত্রের আগাগোড়া সবই হেঁয়ালি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব যেখানে ঢুলুঢুলু চক্ষে বলিতেছেন

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিতং॥"

"কেহ বা অদ্বৈত ইচ্ছা করেন, কেহবা দ্বৈত ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমার এই যে তত্ত্ব—দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত, এ তত্ত্ব কেহই জানে না" সেখানে শিবের ঐ নির্ঘাত বচনটি শিবের মুখে শোভা পাইয়াছে দিব্য মনোহর। এসম্বন্ধে প্রকৃত কথা যাহা দ্রষ্টব্য তাহা আমি পূর্ব্বে একস্থানে প্রকারান্তরে বলিয়াছি; তাহা এই যে—

অদ্বৈতজ্ঞান দ্বৈতগর্ভ এবং দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতের অন্তর্ভুক্ত।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের শাঙ্কর-ভাষ্যে এই যে দুইটি উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে—(১) "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" অর্থাৎ "ইঁহার মহিমা এতদূর পর্য্যন্ত—মহিমান্বিত পুরুষ তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়", (২) "পাদোঽস্য সর্ব্বাণি ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ "ইঁহার একপাদ সমস্ত ভূত—ত্রিপাদামৃত দ্যুলোকে", এই দুইটি বচনের মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে—পরমেশ্বর যে সগুণ এবং নির্গুণ দুইই একাধারে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, আর, সেই সঙ্গে মুক্তিবিষয়ক তথ্যনিরূপণের বাকি পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। কিন্তু আজ আরনা—মুক্তিবিষয়ে আর কয়েকটি কথা যাহা আমার বলিবার আছে—আগামী অধিবেশনে তাহার পর্য্যালোচনায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

(১০)

দেবাসুরে মিলে যখন সমুদ্র মন্থনে লেগেছিলেন তখন মহাসমুদ্রের পেটে যা কিছু ছিল সমস্ত তাঁকে নিঃশেষে উদ্গার করতে হয়েছিল। সে সময়ে তাঁর যে কি রকমের পীড়া উপস্থিত হয়েছিল সেটা তিনি মহাভারতের বেদব্যাসকে কোনদিন বোঝাবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু এই বর্ত্তমান কবিটিকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার জঠর তাঁর জঠরের মত এমন বিরাট নয় এবং তার মধ্যে বহুমূল্য জিনিষ কিছুই ছিল না, কিন্তু বেদনার পরিমাণ আয়তনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, সেইজন্যে অতলান্তিক পার হবার সময় তার অপার দুঃখ অল্প কালের মধ্যেই উপলব্ধি করে নিয়েছিলুম। আমরা যে নিতান্তই মাটির মানুষ সেটা বুঝতে বাকি ছিল না। এখন কেবলি মনে হচ্চে, কালো জল আর হেরবো না গো, দুতী সমুদ্র আর পার হব না—ষ্টীমারের বংশীধ্বনি যত জোরেই বাজুক আর কূল ছাড়তে মন যাচ্চে না। ডাঙায় নেমে এখনো শরীরটা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিন রাত্রি নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যেন শরীরের থেকে আল্‌গা হয়ে নড়-নড় করুচে। সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুমঝুমি পেয়েছিল—দু'হাতে করে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুষ্পদী যা কিছু আছে সমস্তয় মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে—কিন্তু উল্‌টে পাল্‌টে খানাতল্লাসী করে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্ধের কোন সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

(২)

আমেরিকার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রণালী আমি যতটা আলোচনা করে দেখলুম তাতে একটা কথা আমার মনে হয়েচে এই, যে, আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা বই পড়াবার দিকে একটু ঢিল দিয়েছি। আমরা একদিকে যেমন ইংরেজি সোপান, সংস্কৃত প্রবেশ প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে থাকে থাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিত অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ একেবারে হুহু করে ছেলেদের পড়ে যাওয়া। সেগুলো খুব বেশী তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই—তাড়াতাড়ি কোনো মতে কেবলমাত্র মানে করে এবং আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ রকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা' নয় কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠ্‌তে থাকে। যতদিন একজন ছেলে

আমাদের ইস্কুলে আছে ততদিনে সে যদি অন্তত কুড়ি পঁচিশখানা বই যেমন করে হোক্ পড়ে যাবার সুযোগ পায় তাহলে ভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা না ঘটে' থাকতে পারে না। যেটুকু পড়বে সেটুকু সম্পূর্ণ পাকা করে পড়ে' তার পরে এগতে দেওয়ার যে প্রণালী আছে সেটা স্বভাবের প্রণালী নয়। স্বভাবের প্রণালীতে আমাদের মনের উপর দিয়ে পরিচয়ের ধারা দ্রুতবেগে বহে চলে যাচ্ছে, কিছুই দাঁড়িয়ে থাক্‌চে না, কিন্তু সেই নিরন্তর প্রবাহ ভিতরে ভিতরে আমাদের অন্তরের মধ্যে পলি রেখে যাচ্চে। ছেলেরা মাতৃভাষা একটু একটু করে বাঁধ বেঁধে বেঁধে পাকা করে শেখে না—তারা যা জেনেছে এবং যা জানে না সমস্তই তাদের মনের উপরে অবিশ্রাম বর্ষণ হতে থাকে—হতে হতে কখন যে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে ওঠে তা টেরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির প্রণালীর গুণ হচ্চে এই যে প্রকৃতি তার শিক্ষাকে কিছুতেই বিরক্তিকর করে তোলে না। জীবন জিনিষটা চলতি জিনিষ—তাকে জোর করে এক জায়গায় দাঁড় করাতে গেলেই তাকে পীড়ন করা হয়। আমি এটা বেশ বুঝতে পেরেছি ছেলেদের মনকে কোন একটা জায়গায় ধরে রাখবার চেষ্টা করাই জড়প্রণালী—শিক্ষা-ব্যাপারটাকে বেগবান্ করতে পারলে তবেই জীবনের গতির সঙ্গে তার তাল রক্ষা হয় এবং তখনই জীবন তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যে অসম্পূর্ণ পড়াকে ভয় করলে চলবে না, আসলে বিলম্বিত পড়াটাই পরিহার্য্য। মুস্কিল এই যে, আমরা প্রতিদিন পদে পদে পরীক্ষার দ্বারা ফল দেখে দেখে তবেই আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর সফলতার বিচার করি—কিন্তু জীবন-ব্যাপারের বিকাশ নিত্য দেখা যায় না—তার যে-ফলটা অগোচর সেইটেই তার বড় সম্পদ—সেটা ভিতরে ভিতরে জমতে জমতে কাজ করতে করতে একদিন বাইরে অপর্য্যাপ্ত ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শীতের সময় যখন গাছপালার পাতা ফুল ফল সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন যদি কোন ইন্‌স্পেক্টর তাদের কাছ থেকে পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ করতে আসে তা হলে অরণ্যকে-অরণ্য একেবারে 0 মার্কা পেয়ে মাথা হেঁট করে থাকে—কিন্তু বসন্ত জানে পরীক্ষা-পত্রের দ্বারা জীবনের বিচার চলে না—প্রশ্ন করলে জীবন ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারে না, অনেক সময়ে চুপ করে বোকার মত বসে থাকে কিন্তু একদিনে দক্ষিণে হাওয়ায় যখন তার বুলি ফোটে তখন একেবারে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা জড়োপাসক, জীবনের গতিকে আমরা দেখ্‌তে পাইনে বলে তাকে কোন মতে বিশ্বাস করতেই পারিনে—এতেই আমরা অন্তরের ক্রিয়াকে পরিহার করে বাহ্য প্রক্রিয়াকেই সার করে বসে আছি। এই অন্ধতায় যে আমরা কত পীড়া ও কত ব্যর্থতার সৃষ্টি করেছি সে কথা বলে শেষ করা যায় না—ফলের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় লোভ করেই আমরা বিফল হচ্চি। যাই হোক্ তোমাদের সংস্কৃত ও ইংরেজি অধ্যাপনার মধ্যে এখন থেকে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠকে খুব বড় স্থান দিতে হবে—বছরের মধ্যে অন্তত দুখানা করে বই পড়ে শেষ করা চাই—সে পড়া যে খুব পাকা গোছের পড়া হবে না এ কথাও মনের মধ্যে জেনে রাখ্‌তে হবে—তাতে দুঃখ পেলে কিম্বা হতাশ হলে চলবে না—এই রকম অনুশীলনের ফলটা তিন চার বৎসরের চেষ্টার পরে তোমরা জানতে পারবে।

(৩)

চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটি ভালো বিদ্যালয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার জিনিষ ঢের আছে। কিন্তু তাদের সমস্তই বহু ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ নেই। কেবল, অঙ্ক শেখবার একটা যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে লিখচি। এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে—সেটা হচ্চে Banking। তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেক বই, ভাউচার, হিসাবপত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যবসা, কারো বা চামড়ার—সেই উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনাদেনা এবং তার লাভ লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক দস্তুর মত রাখ্‌তে হচ্চে। এতে অঙ্ক জিনিষটাকে এরা গোড়া থেকেই সত্যভাবে দেখ্‌তে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেলচে। তোমার মনে আছে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু আমি বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের ক্লাসে এই দোকান রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। গণিত শাস্ত্রে আমার বিদ্যার পরিমাণ গণনায় অতি যৎসামান্য বলেই আমি এ জিনিষটাকে খাড়া করে তুলতে পারলুম না—কোন জিনিষ নূতন প্রণালীতে গড়ে তোলবার শক্তি ছিল না—এই জন্যে এটা ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু অঙ্ক জিনিষটা কি এবং তার ভুল জিনিষটা যে কেবল নম্বর কাটার জিনিষ নয়, সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ, এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ছোট ছোট কাপড়ের বস্তায় বালিপুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে—অবশ্য খাতাপত্র ঠিক দস্তুর-মত রাখ্‌তে শেখাতে হয়। এই জিনিষটাতে ওদের হাত দুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরেই আমরা বিদ্যালয়ের ডিপজিটের কাজ স্বতন্ত্র করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে তুলতে একটু ভাব্‌তে এবং খাটতে হয় কিন্তু তার পরে কলের মত চলে যাবে।
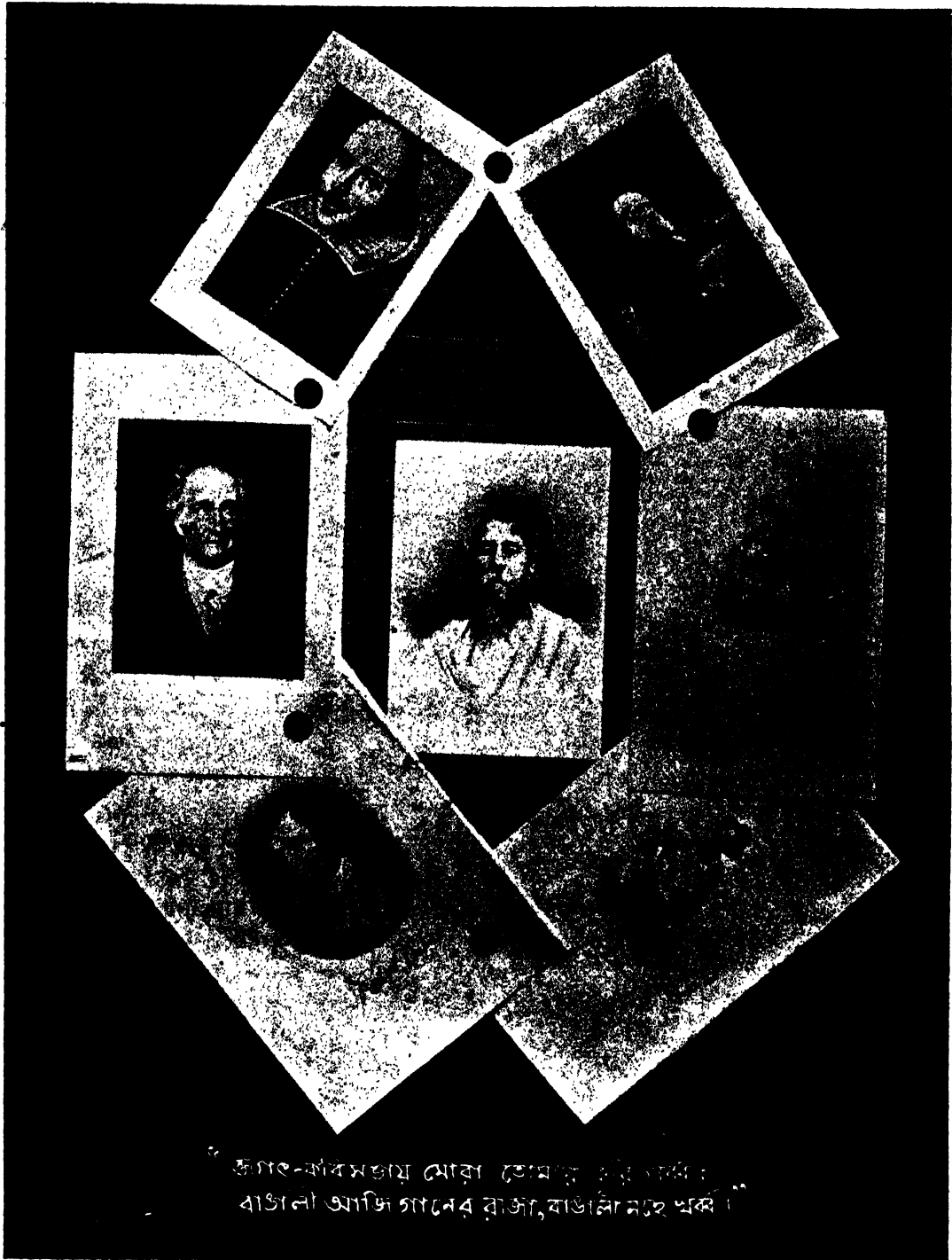
জগৎ-কবি-সভা।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে হপসিং কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রস্তুত ফটোগ্রাফ্ হইতে।

আতার বীচি তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাকা পয়সার কাজ চালাতে পার—কাগজ কেটে কতকগুলি নোটও তৈরি করে নিতে পার—এতে ওদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে। এই জিনিষটা একটু ভেবে দেখো। এদেরই স্কুলে এই জিনিষটার নূতন প্রবর্ত্তন হয়েছে—আমরা এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমরা বাঁধা রাস্তার বাইরে কিছুই করতে পারলুম না—আর এরা অনায়াসে এগিয়ে যাচ্চে—এইটে দেখে আমার মনে দুঃখ বোধ হল।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি

(তৃতীয় প্রস্তাব)

অন্যান্য আদিম মানবের ন্যায় ওরাওঁদিগের সামাজিক প্রণালীও তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এবং তাহাদের অধিকাংশ সামাজিক রীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে তাহাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য ভূতপ্রেতের কু-নজর ও অশুভ প্রভাবকে দূরে রাখিবার অবিরাম চেষ্টা। মৃত ও জীবিত মানুষের আত্মা, ভূতপ্রেত যাহাদের কোনো বিশেষ স্থান ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ আছে, বা ভবঘুরে ভূত যাহাদের কোনো বিশেষ আবাসস্থান নাই—এ সবাইকে যখন দমন করা যাইবে না তখন তুষ্টিসাধন ত করিতেই হইবে।

ওরাওঁ খ্রীষ্টান বালিকা।

ওরাও মেলা।

ওরাওঁএরা ভুঁইহার ও রাইয়ৎ এই দুইটি সামাজিক বিভাগে বিভক্ত। যাহারা জঙ্গল কাটিয়া গ্রামস্থাপনা করিয়াছিল তাহাদের বংশধরেরা ভুঁইহার নামে পরিচিত। জঙ্গল কাটিবার সময় জঙ্গলের ভূতপ্রেতগণের শান্তিসুখে বাধা পড়িয়াছিল, তাই মধ্যে মধ্যে প্রেতাত্মাদিগকে বলি প্রদান করিবার ভারটা ভুঁইহারদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই ভূতগুলিকে খুঁট-ভূত বলা হয়। তিন, পাঁচ, সাত বা বারো বৎসর অন্তর ইহাদের উদ্দেশে কুক্কুট, ছাগল বা মহিষ বলি দেওয়া হয়। জমিতে এক স্থানে একটি কাঠের খোঁটা পুঁতিয়া প্রেতাত্মার আবাসস্থলটি চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেক বলির পর খোঁটাটি বদলাইয়া নূতন খোঁটা স্থাপন করা হয়, এবং উহার উপরে বলি-মাংসের কয়েক টুকরা একটি কাঁপা

ওরাওঁ ও মুণ্ডা ছাত্রগণ স্কুলে বাইবেল-বর্ণিত উপাখ্যানের অভিনয় করিতেছে।

দুই-মুখ-বন্ধ-করা লোহার পেরেক দিয়া বিঁধিয়া রাখা হয়। এই পেরেকটিকে 'সিঙ্গি' বলে। পেরেকটি পোঁতা হয় ভূতকে পাতালপ্রদেশে পাঠাইবার জন্য, সে যাহাতে পুনর্ব্বার বলির নির্দ্দিষ্ট সময় আসিবার পূর্ব্বে উঠিতে না পারে! ঘটনাক্রমে যদি ইতিমধ্যে প্রেতাত্মার ক্ষুধা জাগিয়া ওঠে বা ভ্রমক্রমে নিরূপিত সময়ে বলি না দেওয়া হয় তো তাহার ক্রোধ গ্রামস্থ পশু ও লোকের মধ্যে ব্যাধি ও মৃত্যুরূপে প্রকাশিত হয়। তখন গ্রামবাসীরা মাতি বা ভূততত্ত্বজ্ঞ ওঝার সাহায্যে অবিলম্বে বাহির করিয়া ফেলে, কাহার শৈথিল্যে গ্রামে এ-সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। সেই পরিবারের কর্ত্তাকে খুঁট ভূতের সহিত যে চুক্তি, তাহা পালন করিতে বাধ্য করা হয়। ওরাওঁ গ্রামের আদিম অধিবাসীরা এইরূপ বন্দোবস্তই করিয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাদের বংশধরেরা গ্রামস্থ কর্ষিত ভূমির এলাকাস্থিত ভূতগুলিকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সে-সব নিয়ম বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য ভূতপ্রেত প্রভৃতি যাহারা জঙ্গল ও পোড়ো জমিতে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধেও উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল,—আদিম অরণ্যের একাংশ ইহাদিগকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, উহার নাম জাহের বা সর্ণা। গ্রামপুরোহিত (পাহান) নিরূপিত সময়ে এখানে আসিয়া গ্রামের সকল ওরাওঁএর পক্ষ হইতে প্রেতাত্মার দলকে কুক্কুট বলি প্রদান করেন।

এই-সকল দেবতার মধ্যে চালো পাচ্চো ও দারহা সর্ব্বপ্রধান। খুঁট ভূতেরা পারিবারিক দেবতা; ইহারা গ্রামদেবতা। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল ইহাদের হস্তে নিহিত। প্রত্যেক পরিবারের পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মাই প্রকৃত গৃহ-দেবতা। ইহারা সাধারণত সদয়প্রকৃতি; সেইজন্য ইহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য বিশেষ কোনো পূজার প্রয়োজন হয় না। গ্রামকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পারিবারিক দেবতা ও গ্রামদেবতার তুষ্টিসাধন করা প্রয়োজন। এবং এই-সকল দেবতা ও ভূতের তুষ্টিসাধন কেবলমাত্র গ্রামের ভুঁইহারের দ্বারাই হইতে পারে। কাজে-কাজেই সমাজে ভুঁইহারেরই প্রাধান্য। এবং এইরূপে ওরাওঁদের মধ্যে ভূমির ভোগাধিকারও ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত!

উপরিলিখিত দুই প্রকার দেবতা ব্যতীত ছোটখাট ভূত, প্রেতাত্মা প্রভৃতি অসংখ আছে। ইহাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। বন্ধুভাব অপেক্ষা বৈরভাবটাই ইহাদের মধ্যে প্রবল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য সময়ে ওরাওঁ যে-সব সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহার অধিকাংশই এই-সব সংখ্যাতীত ছোট ভূতের শত্রুতা এড়াইবার জন্য।

এইরূপ কয়েকটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছি।

জন্ম—শিশুর জন্মের অল্পকাল পরেই ভূতেদের শত্রুতা ও কু-নজর এড়াইবার জন্য একটি 'কিরো' বা 'ভেলোআ' (ভল্লাতক বা ভেলা) ফল তাহার গাত্রে

ওরাওঁ ও মুণ্ডা খ্রীষ্টপন্থী ছাত্রদের স্কুল ব্যাণ্ড।

মুখ করিয়া, কিরূপে পুরাকালে এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইল, মানুষ ও ভূতের সৃষ্টি হইল কিরূপে, তাহার একটা পরম্পরাগত সুদীর্ঘ বিবরণ আবৃত্তি করিয়া যায় এবং ভূত ও মন্দলোকের ক্ষতি করিবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য 'ধর্ম্মে' বা ঈশ্বরের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করে—"হে ধর্ম্মে, আপনার শিক্ষামত আমি মানুষ ও ভূতের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি আমি এখন আপনাকে একটি 'জীবন' বলি প্রদান করিতেছি (একটি পদার্থ যাহার জীবন আছে কিন্তু) যাহার মাথা বা পা নাই (অর্থাৎ আমি এই ডিমটি আপনাকে বলিস্বরূপ দিতেছি)। হে ধর্ম্মে! যদি কেহ তাহার 'কু-নজর' বা 'কু-মুখ' এইদিকে ফেরায় তো তাহার চোখ যেন এই

স্পর্শ করানো হয়। এই ফলের এক ফোঁটা রস যদি কোনো মানুষ, পশু বা পাখীর চোখে পড়ে ত চোখ ফাটিয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এবং ওরাওঁদের ভুতপ্রেত দেবতারও মানুষেরই মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে বলিয়া এই ফলের রসকে তাহারাও সমান ভয় করে। 'কু-নজর'-বিশিষ্ট লোকেরও এই ফলটি বিশেষ ভয়ের কারণ, যেহেতু এই ফলের এক বিন্দু রস তাহার চোখে পড়িলে সে চিরদিনের জন্য অন্ধ হইয়া যাইবে।

জন্মের পর চতুর্থ দিনে যে শোধনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাও ভুত এবং মন্দলোকের কু-নজর হইতে মাতা ও শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য। এই অনুষ্ঠানটি যতদিন না সম্পন্ন হয় ততদিন মাতা ও শিশুকে বাড়ীর বাহির হইতে দেওয়া হয় না। কারণ, এই কয়দিনই প্রসূতির ও শিশুর উপর ভুত, ডাইন প্রভৃতির কু-নজর পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা।

জন্মের পর অষ্টম বা নবম দিবসে ভুতের ওঝা আসিয়া ভুত ও মন্দলোকের দাঁত ভাঙিবার জন্য একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। ইহার নাম 'ডাণ্ডা-রেঙনা' বা 'ভেলোয়া-ফারি'। চালের গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া ও অল্প উনানের মাটি ওঝার সামনে রাখা হয়। এই উপকরণগুলি দ্বারা মেঝের উপর সে একটি মায়া-ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একমুঠা চাউলের উপর একটি কুক্কুট-ডিম্ব রাখে। ভেলোআ গাছের একটি ডালের এক প্রান্ত চিম্‌টার আকারে চিরিয়া উহা ডিমের উপর আটকাইয়া দেওয়া হয়। ওঝা অঙ্কিত গণ্ডির সামনে বসিয়া পূর্ব্বদিকে

ওরাওঁ খ্রীষ্টপন্থী বালক।

কুক্কুট-ডিম্বের মত ফাটিয়া যায় (ডিমটিকে এখনি ছুরি দিয়া ভাঙিয়া ফেলা হইবে) এবং তাহার মুখ

যেন এই ভেলোআ ডালের মত দুই ভাগে চিরিয়া যায়।"

আবৃত্তি শেষ করিয়া ওঝা ডিমটি ছুরি দিয়া ভাঙিয়া ফেলে ও বলিস্বরূপ উহা দেবতাকে অর্পণ করে। সে তারপর ভূমি হইতে যত্নসহকারে যাবতীয় পূজার উপকরণ উঠাইয়া লইয়া (কয়লার গুঁড়া, চালের গুঁড়া প্রভৃতি) পথের উপর ফেলিয়া দ্যায়। এইরূপে শিশু ও তাহার পরিবারস্থ সকলের ভূতপ্রেতের কু-নজর প্রভৃতি হইতে বিপদের সম্ভাবনা দুরীভূত হয়।

বিবাহ—বিবাহের পরেই বধূকে যখন বরের বাড়ী লইয়া যাওয়া হয় তখন পুনর্ব্বার ভেলোআ-ফারি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তারপর বধূকে শীতল জলে স্নান করাইয়া দেওয়া হয় এবং গ্রামের গোড়াইত তাহার কপালে সিন্দুর-রেখা অঙ্কিত করিয়া দ্যায়। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইতেছে মেয়েটিকে তাহার পিতার গ্রামের ভূতপ্রেতের নজর হইতে মুক্ত করিয়া লওয়া।

গর্ভ—স্ত্রীলোকের যখন প্রথম গর্ভসঞ্চার হয় তখন একটি পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজার উদ্দেশ্য—তাহার পিতার পরিবারের প্রেতাত্মা বা গ্রামের দেবতা যাহাতে গর্ভিণী বা ভ্রূণের কোনো অনিষ্ট করিতে না পারে। মাহতো, পাহান এবং স্বামীর গ্রামের অন্যান্য মোড়লদের সমক্ষে স্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে ও তাহার পিতার গ্রাম্যদেবতাদের উদ্দেশে একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়।

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বিশেষ করিয়া ওরাওঁকে শোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, কারণ উহার সহিত মৃতের আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বীজ বপন ও শস্যকর্ত্তন এই দুই সময়ের মধ্যে যে-সব ওরাওঁ মরে তাহাদের অস্থি সমাহিত (হাড়-বোরা) করার অনুষ্ঠান হেমন্তের শস্যকর্ত্তনের পর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর গ্রামবাসী সকলে একত্রে মাহতো বা গ্রামের মোড়লের বাড়ী গিয়া হাজির হয়। মাহতো প্রত্যেককে অল্প তেল ও হলুদবাটা দ্যায়। লোকেরা তেল ও হলুদ গায়ে মাখিলে মাহতো ফুটচিরা নামক দীর্ঘ শরের গুচ্ছ দিয়া পবিত্র জল তাহাদের গায়ে ছিটাইয়া দ্যায়। এই উপলক্ষ্যে এইটিই কেবল একমাত্র শোধনক্রিয়া নয়। গ্রামবাসীদিগকেই কেবল শোধন করিতে হইবে তাহা নহে, গ্রামের সমস্ত অলি-গলি মন্ত্রপূত করিতে হইবে। সে কার্য্যটা করিতে হয় নাইগা বা পাহানকে—সে গ্রামের প্রধান পুরোহিত। পাহান গ্রামের আখড়ায় গেলে একটি লাউয়ের বসের মধ্যে জল পুরিয়া তাহার নিকট আনা হয়। জল শুদ্ধ করিয়া লইয়া বহুসংখ্যক ওরাওঁ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সে বস্তির এক ধার দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য ধার দিয়া বাহির হইয়া যায়—অলি-গলি অন্ধকার কোণ প্রভৃতিতে সেই জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলে। তারপর সমবেত গ্রামবাসীদের সামনে পাহান বিরি-বেল্লাই বা সূর্য্যদেবতার উদ্দেশে একটি শ্বেত কুক্কুট বলি দ্যায় এবং প্রার্থনা করে—"হে ঈশ্বর! আমরা এক্ষণে এই গ্রাম শোধন করিতেছি। এখন হইতে যেন আমাদের কৃষিকার্য্যাদি ভালো রকম চলে। আমরা যখন ভ্রমণে বাহির হইব তখন যেন আমাদের পায়ে একটি কাঁটাও না ফোটে।" এই অনুষ্ঠানের নাম 'পদ্দা-কামনা' বা 'গাঁও-বানানা'।

ওরাওঁ অ-খ্রীষ্টান বালক।

ওরাওঁ ভূতকে যেমন ভয় করে, ভূতের ওঝা, কু-নজর, অচেনা মানুষ, ও অজানা দেশের মন্দপ্রভাবকেও তেমনি ভয় করে। ভ্রমণে বাহির হইবার সময় ওরাওঁ ডান হাতের তালুর উপর অল্প ধূলা তুলিয়া লয়, তাহার উপর মন্ত্র (বন্ধনী) পড়ে ও ফুঁ দিয়া চতুর্দ্দিকে হস্তস্থিত ধূলা উড়াইয়া দেয়। এরূপ করিলে সে নাকি ভূত ও কু-নজর হইতে রক্ষা পাইবে।

ভূতের ওঝা বা প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি যদি আজ্ঞাবহ ভূতের সাহায্যে কাহারো অনিষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হয় তো সেব্যক্তি তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার

জন্ত মন্ত্র (বন্ধনী) আওড়াইয়া সরিষা, তুলার বীচি ও কয়েক মুঠা চাউল বাড়ীর চারিদিকে ছড়াইয়া দ্যায়।

কয়েদী জেল খাটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এক বিশেষ শোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তবে তাহাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ জেলে বাস করিবার সময় সে অচেনা লোকের সঙ্গে দিন যাপন করিয়াছে এবং তাহাদের 'নজর গুজর' তাহার উপর পড়িয়াছে। যতদিন না শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় ততদিন তাহাকে হয় অবিবাহিতের আবাসস্থান ধুমকুড়িয়া বা জোঁখ-এড়পায়, নয় স্বগৃহের বারান্দায় বাস করিতে হয়। গ্রামের মোড়লদিগের সামনে একটি শ্বেত কুক্কুট বা ছাগল বলি দিয়া প্রত্যাগত কয়েদী উহার রক্ত অল্প পান করে। জলের মধ্যে এক টুকরা সোনা ডুবাইয়া সেই জল সমবেত সকলের উপর ছিটাইয়া দেওয়া হয় এবং কয়েদী সেই জল অল্প পান করে। তার পর ভোজ। প্রত্যেক অভ্যাগতের পাতে কয়েদী এক-এক মুঠা ভাত দিয়া পরিশেষে নিজে তাহাদের সহিত আহারে বসিয়া যায়।

ওরাওঁ রমণীর নৃত্যোৎসব।

স্পর্শদোষ প্রেতাত্মা ও কু-নজরের ভয় প্রভৃতি আদিম বিশ্বাসের সহিত 'ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুসমাজে প্রচলিত ঐরূপ বিশ্বাসের তুলনা করিলে মনে হয়, আমরা যে-সব শুদ্ধাচারের বড়াই করি, সম্ভবতঃ তাহার মূল আদিম অসভ্য অবস্থার ভূতপ্রেতে-বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত।

রাঁচি। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

কাণাকড়ি

বন্ধুবরেষু—

ভারতীর পূজায় কিছু দক্ষিণা এবং প্রবাসী বন্ধুর নামে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ এই দুই সৎকার্য্যের কতকটা সার্থকতা থাকিলেও থাকিতে পারে—ইহকালে না হয় পরকালে বা। কিন্তু বাৎসরিক ছয় তন্‌খা খাজনা দিয়া দশশালা বন্দোবস্তে আসমুদ্র ভারতবর্ষটা দখল করিয়া লওয়ার অর্থ ত আছেই, তাছাড়া Speculation হিসাবে সে কার্য্যটার বেশ একটু রস আছে যেটা প্রথমোক্ত দুটা সৎকার্য্যের একটাতেও নাই।—এ যেন 'একটা হর্ষ,' 'একটা মহামহিমা,' একটা আরব্য উপন্যাসের নূতন প্রদীপের বদলে পুরাতন প্রদীপ ক্রয় করিয়া লওয়ার মত,—যদিনা 'ভারতবর্ষটা' যার সেই ভারত-গভরমেণ্ট বাধা দেন। এই যদি-না-তেই আমি ঠেকিয়া গেলাম। এবং আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষের ধন যখন ছয় টাকায় ছয়গুণ হিসাবে আর সকলেই বুঝিয়া পাইল, আমি তখন আমার আধুলিটির পরিবর্ত্তে ষোলআনার বদলে আটআনা মাত্র রস উপভোগের অধিকারী হইয়া বড়ই যে ঠকিয়াছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। কিন্তু এটা আমার বিশ্বাস যে এই আট আনাকে নিংড়াইয়া আমি ষোল আনা রস বাহির করিয়া লইতে পারিব। ভারতবর্ষের মাটি তো বটে! সুতরাং প্রথমেই আমি মলাট বা ঝুলিটা লইয়া পড়িলাম। সর্ব্বাগ্রে হাতে ঠেকিল—দাঁতে নয়, কেননা আমি অদন্ত; কাযেই হাতে পরীক্ষা না করিয়া মুখে কিছু দিই না—কুতুব মিনার এবং বুদ্ধগয়ার দুই টুক্‌রা প্রস্তর। সে দুটাই আমি রেল-কোম্পানীর টাইম-টেবল আফিসে উপহার পাঠাইয়াছি; কেননা তাঁহারা ও দুইটা পদার্থের সদ্ব্যবহার চিরকাল করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন। সাহিত্য পরিষদের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কাহাকেও দিলে চলিত, কিন্তু সেটা পূর্ব্বে মনে আসে নাই। পাথর ছাড়িয়া মনোভৃঙ্গ এবার একেবারে ওই আকাশ-গঙ্গায় প্রস্ফুটিত কমলদলে গিয়া বসিল; কিন্তু হায় কাগজের ফুলে রস কোথায়! সেটা কলিকাতায় আসিয়া পাড়াগেঁয়ে বরকর্ত্তারাই কেবল আবিষ্কার করিতে পারেন। ভৃঙ্গবর হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় পদ্মবনের জলবুদ্‌বুদটার দিকে আমার পড়ায় দৃষ্টি

আমি একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া গেলাম ; এবং আট আনার চার আনা রসে বেশ একটি বড়-গোছের রসগোল্লা পাকাইয়া লইতে বিলম্ব করিলাম না। এ রসের নাম বিরাগ। এটি ভারতবর্ষের চিরন্তন সামগ্রী। ধন্য সেই চিত্রশিল্পী, যে কাগজের মলাটে এতটা রস দিতে পারে! জলবুদ্বুদের উপরে বিধাতার আখরের মত যেন একটা কি দেখিলাম, কিন্তু প্রিণ্টারের দোষে আমার ভাগ্যে সেটা অস্পষ্টই রহিয়া গেল। ছয় টাকার কোন অংশীদার সেটা সুস্পষ্ট আকারে পাইয়াছেন বোধ হয়। আট আনায় আর ছয় টাকায় এইটুকুই প্রভেদ।

এইবার বাহির ছাড়িয়া আমি একেবারে থলির ভিতরে হাত পুরিলাম। একটা যেন গ্রামোফোন হাতে ঠেকিল। কিন্তু সেটাকে বাহির করিয়া মহলা দিতে মোটেই আমার উৎসাহ হইল না ; সেটা ডাক্তার কুমারস্বামীকে দিব স্থির করিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। আমাদের পাড়ায় আর সব আছে কেবল গ্রামোফোনটাই নাই, এক-একবার মনে করিতেছি যে বাদ্যযন্ত্রটা আমাদের সঙ্গীত-সমাজে উপহার দিই ; কিন্তু এখন না, যেদিন অন্য পাড়ায় উঠিয়া যাইব সেদিন এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে ; তৎপূর্ব্বে কিছুতেই না।

থলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে এবার একখানি ছবি হাতে উঠিল ;—হাঁ এতক্ষণে জিনিষের মত একটা জিনিষ পাইয়াছি। ছবিখানির উপরে লেখা 'ভারতবর্ষ' ; ছবির নীচে লেখা 'বিশ্বাস', 'আশা' ও বদান্যতা' ; চিত্রকর জ্যাট্কা! এ নিশ্চয় আমাদের ও-পাড়ার প্যাট্কা ছেলেটার কায, নাম ভাঁড়িয়েছে ; যাহোক ছেলেটা এঁকেছে ভাল, ঠিক ইতালিয়ান পেন্‌টিং, কিন্তু ছেলেটা ভাব ফোটাতে পারেনি। ক্রশ নিয়ে 'বিশ্বাস' এটা বোঝা গেল—ঠিক আমাদের মেয়ে-ইস্কুলের বড় মেম ; কিন্তু 'আশা' আর 'বদান্যতা' এ দুটোর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া গেলনা ত! একটা জেলেনী একটা নঙ্গরের রশি ধরে খাড়া আছে, এতে আশার কথা কোন্ খানে? আর একটি মহিলা সন্তান-ক্রোড়ে উপবিষ্টা, এতে বদান্যতাই বা কোথায়! ছবিটার গুণপণা সম্বন্ধে একটা ভুল-ধারণা আমার থাকিয়াই যাইত, যদিনা আমার M. A. বন্ধু আসিয়া আমায় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেন যে এটি একটি সত্যই বিলাতী ছবি। নারদের বাহন যেমন ঢেঁকি তেমনি ক্রিশ্চানদের মতে বিশ্বাসের বাহন ক্রশ-কাষ্ঠ, আশার বাহন লঙ্গর এবং বদান্যতার বাহন মদের পেয়ালা।

এবার যে ছবিখানি হাতে পাইলাম সেটির ভাবার্থ বুঝিতে আমার আর তিলার্দ্ধ মাত্র বিলম্ব ঘটিল না। ঐ যে ভারতের মানচিত্রের উপরে সালঙ্কারা রমণী, উনি হচ্ছেন ভারতী! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যেমন অসি হইয়াছিল, তেমনি ভারতীর বীণা এখানে বন্দুকের আকার ধরিয়াছে। দেবী হাঁস শিকার করিতেছেন। একটি হাঁস গুলি খাইয়া পদতলে লুণ্ঠিত, আর এক গুলি ভারতবর্ষের জীবনভার লাঘব করিতে ছুটিয়াছে। সুনিপুণ চিত্রকর 'র'য়ের পুঁটুলিটি গুলির মত আঁকিয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এবং ভাবের ঘরে গুলি চালানো যে তাঁহার নেশা সে—টা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন—'স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা।'

এইবার আমার M. A. বন্ধু আমাকে পরীক্ষা করিবার আশায় নিজেই ঝুলির ভিতর হইতে একখানি ছবি উঠাইয়া আমায় দেখাইলেন। বলা বাহুল্য যে বন্ধুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ছবির যতটা পঠনীয় সেটা চাপিয়া রহিল। আমি ব্যাখ্যা দিতে সুরু করিলাম ঃ—ছবিখানির নাম 'সিন্ধু-সৈকতে'। সম্মুখে ওই মেটে অংশটি বালুচর, তাহার উপর অনেক শামুক গুগ্‌লী গড়াগড়ি দিতেছে—আসল সমুদ্রে শামুক কিন্তু ওভাবে বালিতে গড়াগড়ি দেয় না, তাহারা প্রায়ই ভিজে বালিতে লুকাইয়া যায়। কিন্তু বালির উপরে নাম লিখিতে আমি অনেককেই দেখিয়াছি! ওই যে সাপের খোলসের মত নীল অংশ ওটা হচ্ছে সমুদ্র। চিত্রের সমুদ্র এইরূপই হওয়া উচিত। আমি থিয়েটারের অনেক বড় বড় সিন্‌পেণ্টারকে এমনি ভাবেই সমুদ্র আঁকিতে দেখিয়াছি। আসল সমুদ্র সে অতি ভীষণ ব্যাপার! যেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ক্ষ্যাপা ঘোড়ার ছুটোছুটি! যে বেগে ঢেউ আসে তাতে মাটিতে পা রেখে ওই বড় ঘরের ঝিটি কেন, জোয়ান পালোয়ান পর্য্যন্ত খাড়া থাক্‌তে পারে না। সুতরাং ও রমণীটি যে-সে নহেন! শ্বেত ও নীলে মণ্ডিত মুক্তহারবিলম্বিত মণিময়-মুকুটান্বিত স্বয়ং 'ফেণাদেবী'। সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। জলদেবীও বলিতে পার ;—তিনি সিন্ধুতীর ঝাঁটাইতে আসিয়াছেন। বালির উপর দিয়া সমুদ্রের জল যখন গড়াইয়া যায় তখন মনে হয় বাস্তবিক কে যেন ঝাঁট দিয়া গেল। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য দিয়া শিল্পী এই বুঝাইয়াছেন যে দিবারাত্রি এই ঝাঁটকার্য্য চলিতেছে ;—অনন্তের কূলে কেহ যে সুখে বাস করিবেন তাহার অবসর নাই। বন্ধু বলিলেন—"দেখদেখি এটা 'শীতলা' কিনা,—হাতে ঝাঁটা রয়েছে যে!" আমি হঠাৎ বন্ধুবরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে টান দিলাম, লেখা বাহির হইল 'ভারতবর্ষ'। আমি অবাক্! ওই চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কিছু তো খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং আমার ধারণা যে বিজ্ঞাপনের জন্য 'ভারতবর্ষটা' ওখানে ছাপা গেছে, আসল ছবিটা হচ্ছে 'সিন্ধু-সৈকতে'। ভারতীতে এবং প্রবাসীতে

ও সাহিত্য ইত্যাদিতে, এমন কি বিলাতেও মাঝে মাঝে এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথা আজকাল প্রচলিত হই-য়াছে! একা ভারতবর্ষের দোষ কি! বেচারা মহাজন-দিগেরই পথ অনুসরণ করিতেছে—এবং তাঁহাদের মত 'গত' হইবার চেষ্টায় আছে।

এবার যে ছবিখানি হাতে উঠিল তাহার নীচে মেঘদূতের দুই চরণ বিজ্ঞাপন। সুতরাং সেটা ছাড়িয়া আমি ছবির অর্থ বাহির করিতে বসিলাম। ছবির নাম 'কলের বাঁশী'! সকালে কলের চিমনি ধূমোদ্গিরণ করিয়াছে এবং দুই কুলী-রমণী বলিতেছে—'সখি ওই বুঝি বাঁশী বাজে'! ছবির এক কোণে লাল অক্ষরে ভারতবর্ষ, সুতরাং তাহারা যে ভারতের মাটিতে দণ্ডায়-মানা সেটা নিশ্চয়; নচেৎ মনে হইত চিতাবাঘের ছালে দুই রমণী কি যেন কি একটা লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে। ছবিখানিতে যথেষ্ট perspective দেখান হইয়াছে। চিত্রটি বেনামী, কিন্তু চিত্রকর পল্লীচিত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন। আমি ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছি এমন সময় বন্ধুবর মেঘদূতের দুই চরণের বাংলা দিলেন। এবার আর বিজ্ঞাপনের দোহাই চলিল না; আমি হার মানিলাম।

এবার একটা দিক্‌গজ শিল্পীর ছবি হাতে উঠিল। ছবির নীচে কিছু লেখা না থাকিলেও আমরা স্পষ্ট বুঝিতাম—আনন্দে করতালি দিতে দিতে কাহারও অগ্নি-প্রবেশ! অগ্নিশিখাগুলি ভয়ে কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্পাকারে সতীর অঞ্চলে দ্রুত লুক্কায়িত হইতেছে, আর ধূমরাজি সতীর করতালির সঙ্গে মনোহর নৃত্য করিতেছে। ভবানীচরণের ছবির গুণই এই যে বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না—যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার অঙ্গভঙ্গীর অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ভবানীবাবুর ছবিও বুঝিতে কোন কষ্ট নাই; —দুইই সমান! এ বিষয়ে আমার M. A. বন্ধুও একমত। নন্দলালের সতীর ছবি দেখিলে গায়ে যেন জ্বর আসে। আগুনের আঁচে অঙ্গ যেন দগ্ধ হয়। ভবানীবাবুর ছবি সেই জ্বরের ডিঃগুপ্ত। আমরা আপামর সাহিত্যসেবীকে ভবানীবাবুর এই জ্বরান্তক বটিকা বা কুইনাইন প্রভাতে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অলমতি।

শ্রীনগদ-ক্রেতা।

আগুনের ফুলকি

(৭)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটী কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাব-ভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।]

ভগিনীর সহিত সাক্ষাতে তাহার পিতৃগৃহের প্রতি মমতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই হোক, বা তাহার সভ্য বন্ধুদের সম্মুখে ভগিনীর বুনো পাড়াগেঁয়ে ধরণধারণ প্রকাশ পাওয়াতে তাহার লজ্জা হইতেছিল বলিয়াই হোক, কলোঁবার আগমনের পরদিন প্রভাতে অর্সো আজাকসিয়ো ছাড়িয়া স্বগ্রাম পিয়েত্রানরায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু সে কর্ণেল নেভিলকে স্বীকার করাইয়া লইল যে তিনি নেপোলিয়নের গ্রাম দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের বুনো গাঁয়ে একবার পায়ের ধূলা দিবেন, এবং প্রতিদানে অর্সো তাঁহার জন্য হরিণ, ছাগল, পাখী প্রভৃতি শিকার প্রচুর জুটাইয়া দিবে।

বিদায়ের পূর্ব্বদিন শিকার করিতে না গিয়া অর্সো সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইবার প্রস্তাব করিল। কলোঁবা বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে শহর হইতে কিছু সওদা করিয়া লইবার জন্য হোটেলেই ছিল; কর্ণেল নেভিল থাকিয়া থাকিয়া যা-তা মারিবার জন্য দলভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন; সুতরাং অর্সো লিডিয়াকে একা পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মনের কথা বলিয়া লইবার খুব সুযোগই পাইয়াছিল। সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য বা পথবীথির সৌন্দর্য্য কিছুতেই তাহাদের মন দিবার অবসর ছিল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বেড়াইতে বেড়াইতে অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মিস লিডিয়া, সত্যি করে বলুন ত, আমার বোনটিকে দেখে আপনার কি রকম লেগেছে?

—আমার বড্ড ভাল লেগেছে।— লিডিয়া হাসিয়া বলিল—আপনার চেয়েও আমার আপনার বোনকে বেশি ভালো লেগেছে,—উনি একেবারে খাঁটি কর্সিক, আর আপনি বর্ব্বর বুনো এখন অতিরিক্ত সভ্য হয়ে পড়েছেন!

—অতিরিক্ত সভ্য!......বটে! কিন্তু যে অবধি আমি এই দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েছি, আমি বুঝতে পারছি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি বেশ একটু বুনো প্রকৃতির হয়ে উঠছি। হাজার রকম বিকট চিন্তা আমার মধ্যে তোলপাড় করে' আমায় একেবারে ক্ষেপিয়ে তোলবার জোগাড় করেছে......আমার বিজন গাঁয়ের জঙ্গলে ডুব মারবার আগে আপনাকে গোটা দুই কথা আমি বলে নিতে চাই।

—আপনার সাহসে বুক বাঁধতে হবে; আপনার বোনের মন কেমন সান্ত্বনা পেয়েছে দেখুন দেখি, তার দৃষ্টান্তে আপনি মন স্থির করুন।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। ঐ কি তার সান্ত্বনা পাওয়া? তা মনেও ভাববেন না। সে এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত একটা কথাও বলে নি। কিন্তু প্রত্যেক দৃষ্টিতে আমি বুঝতে পারছি, সে আমার কাছ থেকে কি চায়!

—উনি আপনার কাছ থেকে কি চান?

—না, সে বেশি কিছু না......কেবল তার ইচ্ছে যে আমি একবার পরখ ক'রে দেখি যে, আপনার বাবার ঐ বন্দুকটা শিকারের পক্ষে যেমন সাংঘাতিক মানুষের পক্ষেও তেমনি কিনা!

—অ্যাঁ বলেন কি! আপনার এই রকম মনে হচ্ছে! কিন্তু এ যে আপনার পক্ষে বিষম হবে!

—যদি তার অন্তর প্রতিহিংসা নেবার চিন্তাতেই ভরে না থাকত, তা হলে সে এসেই প্রথমে বাবার কথা পাড়ত; সে সে-প্রসঙ্গ একেবারে যে তোলেই নি! যাদেরকে সে ভুল করে' খুনে বলে মনে করে, তাদের কথাও তুলতে পারত—কিন্তু সে সম্বন্ধেও কথাটি না! আমরা কর্সিক জা'তটা ভারি ছুঁদে, ভারি ফন্দিবাজ ফিচেল। আমার ভগ্নীটি ভেবেছেন, তিনি ত এখনো আমাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে উঠতে পারেন নি, এখন আমাকে ভয় দেখাতে চান না, চাই কি আমি ভেগে যেতেও পারি। একবার আমাকে ঠেলতে ঠেলতে আলৃসের ধারে নিয়ে যেতে পারলে হয়, আমার মাথা যেই ঘুরে উঠবে, সেও অমনি ঠেলা দিয়ে আমাকে একেবারে গভীর অতলে ফেলে দেবে!

অর্সো তাহার পিতার মৃত্যু-বৃত্তান্ত এবং আগস্তিনিই যে হন্তা তাহার প্রমাণ লিডিয়াকে বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—কিন্তু কলোঁবাকে কিছুতেই প্রত্যয় করাবার জো নেই। তার শেষ চিঠি থেকে আমি বেশ বুঝেছি যে সে বারিসিনিদের মৃত্যু পণ করে বসেছে! সে তার বন্য মূঢ়তার বশে যে রকম ভাবে প্রতিহিংসার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছে, আমি পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, পুরুষ মানুষ, আমার মাথায় যদি ঐ রকম খেয়াল ঢুকত, আর আমি বুঝতাম যে প্রতিহিংসা নেওয়া না নেওয়ার ওপর আমার সম্মান নির্ভর করছে, তা হলে তারা এতদিন আর এ পৃথিবীতে থাকত না!

লিডিয়া বলিল—আপনি আপনার ভগ্নীর নিন্দে করছেন!

—না। এই ত এখনি আপনিই বললেন যে সে পূরোদস্তর কর্সিক' এ দেশের দশের যেমন ধারা তারও তেমনি।......কাল আমি অত বিষণ্ণ হয়ে ছিলাম কেন জানেন কি?

—না, কিন্তু কদিন থেকেই আপনি এমনি বিরস হয়েই ত আছেন দেখছি। ......আমাদের আলাপের সূত্রপাতে আপনাকে বেশ আমুদে দেখেছিলাম, আজকাল আপনি যেন কেমন বিমর্ষ।

—বরং তার উল্টো! কাল আমার যা আনন্দ হয়েছিল তেমন আনন্দ আমার ভাগ্যে সচরাচর জোটে না। আপনি আমার বোনটির প্রতি কত অনুগ্রহ কত সদয় ব্যবহার করেছেন! ......আমরা, কর্ণেল আর আমি, নৌকো করে শিকার করতে গিছলাম। মাঝি হতভাগা আমায় বল্লে কিনা—"অর্সো আন্তো, আপনি শিকার ত ঢের করছেন, কিন্তু অর্লান্দিকৃসিয়ো বারিসিনি আপনার চেয়ে জবর শিকারী!"

—এ কথায় এমন দোষের কি আছে? আপনি কি মনে করেন যে শিকারে আপনি অদ্বিতীয়! এতটা অহঙ্কার ভালো নয়!

—না, না, সে কথা নয়। সে বাঁদরটার কথার ইঙ্গিত আপনি বুঝলেন না? সে বলতে চায় যে আমি এত বড় ভীরু যে অর্লান্দিকসিয়োকে মারতে আমার সাহসে কুলোবে না।

—অ্যাঁ বলেন কি আপনি? এসব কথা শুনলেও যে ভয় হয়! আপনাদের দেশের আবহাওয়ায় শুধু জ্বরজ্বালাই হয় না, মানুষকে একেবারে পাগল করে' ছেড়ে দ্যায়! বাঁচোয়া যে আমরা শীগ্‌গির পালাচ্ছি!

—পিয়েত্রানেরায় পায়ের ধুলো না দিয়ে নয়। আপনি আমার বোনের কাছে স্বীকার করেছেন।

—আচ্ছা আমরা যদি এই অঙ্গীকার পালন না করি তা হলে আমাদেরকে প্রতিহিংসার ল্যাঠায় পড়্‌তে হবে ত?

—আপনার মনে আছে, সেদিন আপনার বাবা মশায় ভারতবর্ষের লোকদের গল্প করছিলেন—তারা কোম্পানির গভর্ণরদের ভয় দেখায় যে ন্যায়বিচার যদি না কর তবে দরজায় ধন্না দিয়ে পড়ে' পড়ে' না খেয়ে মরে যাব?

—ইস, আপনারা না খেয়ে মরবেন? বিশেষ সন্দেহ!

আপনি একদিন উপোস করুবেন আর কলোঁবা ঠাকরুণ সরপুরিয়া এনে সামনে ধরলেই সব সঙ্কল্প উবে যাবে।

—আপনার ঠাট্টাগুলো একটু তীক্ষ্ণ হয় মিস নেভিল; আমার প্রতি আপনার আর একটু সদয় ব্যবহার করা বোধ হয় উচিত। আমি একেবারে একলা, আমার মুখের পানে তাকাবার কেউ নেই। আপনি ত এখনি বললেন, দেশের আবহাওয়ায় পাগল হয়ে উঠতে হয়—আপনি যদি আমায় রক্ষা না করেন ত আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি আমার একমাত্র ভরসা, আপনিই আমার মঙ্গলময়ী! এখন......

লিডিয়া গম্ভীর হইয়া তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—এখন এই ক্ষ্যাপা হাওয়ার মাঝখানে মতি স্থির রাখবার উপায় হচ্ছে আপনার মনুষ্যত্বের সম্মান, সৈনিকের অকপট বীরত্ব, আর......(একটি ফুল তুলিবার জন্য নীচু হইয়া লিডিয়া বলিতে লাগিল) আর তার যদি আপনার কাছে এক কড়াও দাম থাকে, তবে আপনার মঙ্গলময়ীর স্মৃতি!

—হায় মিস নেভিল, যদি আমি নিশ্চয় জানতাম যে আপনি সত্যসত্যই আমার জন্যে একটুও ভাবেন......

এই কথায় লিডিয়া একটু স্নেহার্দ্র হইয়া বলিল—দেখুন দে-লা-রেবিয়া, আপনি একেবারে নেহাৎ ছেলেমানুষ! আপনাকে আমি একটু উপদেশ দেবো। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, আমি একছড়া হার নেবার জন্যে ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম; মা আমাকে সেই হারছড়া দিয়ে বল্লেন, "যখনই তুমি এই হার পরুবে তখনই মনে কোরো যে তোমার ফরাসী ভাষা এখনো শেখা হয়নি।" সেই দিন থেকে আমার চোখে হারছড়ার সৌন্দর্য্য আর মূল্য অনেক কমে গেল। সেটা যেন আমার গলায় অজ্ঞতার লজ্জার মতো জড়িয়ে ধরৃত। আমি হারছড়া না ছেড়ে ফরাসী ভাষাটাকে শিখে তবে ছেড়েছি! এই আংটীটা দেখ্‌ছেন? এটা ঈজিপ্টের পিরামিডের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল; এর ওপরে এই যে একটা বোতলের মতো চিহ্ন খোদা আছে, ওটা অক্ষর, ওর মানে 'মানব-জীবন'। তার পরে বর্শা-হাতে যে যোদ্ধার মূর্ত্তিটি আছে তার মানে 'যুদ্ধ'। এই দুটি অক্ষর একত্র করে পড়লে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন যে তার মানে হয় 'মানব-জীবন সংগ্রামময়'। এই নিন, আমার এই আংটীটি আপনাকে দিচ্ছি। যখন আপনার মনের মধ্যে কর্সিক আবহাওয়ায় কোনো কুচিন্তা গজিয়ে উঠ্‌বে, আমার এই কবচটির দিকে নজর পড়লেই আপনার মনে হবে যে 'জীবন সংগ্রামময়,' সংগ্রামে জয়ী আমাকে হতেই হবে! কুপ্রবৃত্তির কাছে পরাজয়স্বীকার!—সে কখনই নয়!...... দেখুন, আমি মন্দ বক্তৃতা দিই নে!

—আমি আপনার কথা ভাবব, আর নিজেকে বোঝাব......

- নিজেকে বোঝাবেন যে আপনার একজন বন্ধু আছে, আর মনে করবেন যে সে বড়ই দুঃখিত হবে...... যদি......সে আপনাকে পরাজিত দেখে। আরো ভাববেন যে আপনার স্বর্গগত পিতৃপুরুষের আত্মাও তা'তে পরিতৃপ্ত হবে না, বরং বেদনা পাবে।

এই কথা বলিয়াই লিডিয়া হাসিমুখে অর্সোর হাত ছাড়াইয়া তাহার পিতার দিকে দৌড়িয়া যাইতে যাইতে বলিল—বাবা, বাবা, পাখী বেচারাদের ছেড়ে, চল নেপোলিয়নের গুহায় গিয়ে একটু সরস্বতীর সেবা করা যাক!

(৮)

অল্প দিনের জন্য হইলেও বিদায়ের মধ্যে একটা বিষাদ-গম্ভীর বিরহ-বেদনা সঞ্চিত থাকে; বিদায় যেন মৃত্যুর ছায়া। অতি প্রত্যুষে ভগিনীকে লইয়া অর্সো বিদায় হইবে; পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলাই সে লিডিয়ার কাছে বিদায় লইয়া রাখিল—অত ভোরে তাহার জন্য লিডিয়ার ঘুম নাও ভাঙিতে পারে, তাহার বেলায় ওঠাই অভ্যাস, তাহার জন্য সে অভ্যস্ত বিশ্রামের ব্যাঘাত কেনই বা করিবে। তাহাদের বিদায়গ্রহণটা বড়ই গম্ভীর ভাবে স্বল্প কথায় শেষ হইয়া গেল। সমুদ্রতীরে ভ্রমণের পর হইতে লিডিয়া ভাবিতেছিল যে অর্সোর প্রতি সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় টান প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে; আর অর্সো ভাবিতেছিল লিডিয়ার বিদ্রূপ আর হাল্কা সুরের কথাবার্ত্তা কেমন নির্ম্মম ভাবে তাহাকে প্রতি পদে ঘনিষ্ঠতায় বাধা দিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতেছিল যে তরুণী ইংরেজ-নারীর ব্যবহারে সে একটু স্নেহসূত্রের খেই ধরিতে পারিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই রূপসীর শ্লেষ বাক্যে ও হাল্কা হাসির ফুৎকারে সমস্ত জট পাকাইয়া যাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল তাহার চোখে সে সামান্য পরিচিত মাত্র, দুদিন বাদেই তাহার কথা সে ভুলিয়া যাইবে। পরদিন প্রত্যুষে অর্সো যখন কর্ণেলের সহিত বসিয়া কফি পান করিতেছিল, তখন সেই তত ভোরে লিডিয়াকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অর্সোর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ইংরেজ-রমণীর পক্ষে, বিশেষ করিয়া লিডিয়ার পক্ষে, পাঁচটার সময় ওঠা একেবারে অসাধ্যসাধন! ইহাতে অর্সো মনে মনে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আপনি এত সকালে কষ্ট করে' উঠেছেন, আমি ভারি দুঃখিত হচ্ছি। নিশ্চয় কলোঁবা আপনাকে তুলে এনেছে—আমি তাকে এত করে' বারণ করে দিয়েছিলাম তবু আপনাকে না জাগিয়ে ছাড়েনি দেখছি। আপনি নিশ্চয় মনে মনে

খুব গাল দিচ্ছেন আর ভাবছেন যে আপদ বিদায় হলে বাঁচি। কেমন ?

লিডিয়া, তাহার পিতা বুঝিতে বা শুনিতে না পারেন এমন ভাবে, চুপি চুপি ইটালিয়ান ভাষায় বলিল—না। বরং কাল আপনাকে একটু ঠাট্টা করেছি বলে আপনিই হয়ত আমার ওপর চটে আছেন। আপনি আমার ওপর কোনো রকম অপ্রসন্ন ভাব নিয়ে যাবেন না। আপনারা ত সোজা জা'তের লোক নন, ভীষণ কর্সিক, আপনাদের অপ্রসন্নতা একেবারে মারাত্মক! বিদায় তবে বিদায়, আবার দেখা হবে আশা করি!

লিডিয়া তাহার হাতখানি অর্সোর সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল। অর্সো একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া আর কোনো উত্তরই খুঁজিয়া পাইল না।

কলোঁবা অর্সোর নিকটে আসিয়া তাহাকে জানলার ধারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ওড়নার আঁচল খুলিয়া কি যেন দেখাইল এবং চুপিচুপি কি বলিল। অর্সো ফিরিয়া আসিয়া লিডিয়াকে বলিল—আমার বোন আপনাকে একটা অদ্ভুত উপহার দেবে ইচ্ছে করেছে। আমরা গরিব বুনো কর্সিক, আমাদের ভালোবাসা ছাড়া এমন কিছু দেবার মতো জিনিস নেই যা সময়ে পুরোণো হয়ে নষ্ট হয়ে যায় না। আমার বোন আমাকে বলছিল যে আপনি বিশেষ কৌতুহলের সঙ্গে এই ছোরা-খানা দেখ্‌ছিলেন। এটা আমাদের পরিবারের পুরোণো সম্পত্তি। খুব সম্ভব যেসব হাবিলদারের পরিচয় আপনি পেয়েছেন তাদেরই কারো কোমরে এটা ঝুলত। কলোঁবা এটাকে এমনি মহামূল্য জিনিস ঠাওরে রেখেছে যে, সে এটা আপনাকে দিতে অনুরোধ করছে। এখন আমি উভয়সঙ্কটে পড়েছি—একদিকে ভগ্নীর অনুরোধ রক্ষা, অপর দিকে আপনাকে এটা দিলে আপনি আমাদের ঠাট্টা করবেন।

লিডিয়া বলিয়া উঠিল—ছোরাখানি চমৎকার! কিন্তু পারিবারিক সম্পত্তি আমার নেওয়া উচিত হবে না।

কলোঁবা তাড়াতাড়ি জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—এ আমার বাবার ছোরা নয়। রাজা থিয়োডোর আমার মাতামহবংশের কাউকে এখানা দিয়েছিলেন। আপনি এখানি নিলে আমরা ভারি খুসি হব।

অর্সো বলিল—দেখুন মিস লিডিয়া, রাজার ছোরাকে অবজ্ঞা করবেন না, খবরদার!

ব্যারন থিয়োডোর, ফরাসী সুইডেন ও স্পেনের সৈন্য বিভাগে চাকরী করিতেন; তিনি কর্সিকাদিগকে বিজেতা জেনোয়িসদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়া তুর্কীদের সাহায্যে কর্সিকাকে স্বাধীন করেন, এবং কর্সিকার রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু বারংবার পরাজিত হইয়া তিনি অবশেষে লণ্ডনে পলায়ন করিয়া সেইখানেই মারা যান। বিশেষ প্রতিপত্তিশালী অন্য রাজাদের চিহ্নসামগ্রী অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী রাজা থিয়োডোরের চিহ্নসামগ্রীর মূল্য সৌখীন চিহ্ন-সঞ্চয়ীদের কাছে ঢের বেশী। লিডিয়ার পক্ষেও এ প্রলোভনটা বিশেষ রকমই প্রবল হইয়াছিল, এবং লিডিয়া তাহার দেশের বাড়ীতে একটি গালাকরা টেবিলের উপর এই ছোরাখানির দৃশ্য ও দর্শকের উপর উহার প্রভাব কল্পনা করিয়া ছোরাখানি লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াই উঠিয়াছিল। সে লোভে-ব্যগ্র লোকের মতো অল্প একটু ইতস্তত করিয়াই ছোরাখানি লইয়া, তাহার স্বাভাবিক মধুর হাসিতে মধু ঢালিয়া কলোঁবাকে বলিল—ভাই কলোঁবা...তোমাকে এমন করে নিরস্ত্র করা কি ঠিক হবে ?......

কলোঁবা গর্ব্বভরা কণ্ঠে উত্তর করিল—আমার দাদা আমার সঙ্গে আছে, আর সঙ্গে আছে আপনার বাবা মশায়ের দেওয়া সেই দোনলা বন্দুক!...দাদা, বন্দুকে গুলি ভ'রে নিয়েছ ?

লিডিয়া ছোরাখানি কোমরে বাঁধিল।

ধারালো বা চোখালো অস্ত্র শত্রুকেই দিতে হয়, বন্ধুকে দিলে বন্ধুর অমঙ্গল হয়; এই অমঙ্গল নিবারণের জন্য কলোঁবা লিডিয়ার কাছ হইতে একটি পয়সা দাম আদায় করিয়া ছাড়িল। লিডিয়া বুনো দেশের বুনো মেয়ের কুসংস্কার দেখিয়া মনে মনে খুব মজা অনুভব করিল।

এখন বিদায় লইতেই হইবে। অর্সো পুনরায় লিডিয়ার করকম্পন করিল; কলোঁবা লিডিয়াকে আলিঙ্গন করিল, এবং তারপর কর্সিক ভদ্রতায় মুগ্ধ কর্ণেলের চুম্বনের জন্য তাহার গোলাপী ঠোঁটখানি পাতিয়া ধরিল।

জানলা হইতে লিডিয়া দেখিল তাহারা ভাই বোন ঘোড়ায় চড়িল। তখন কলোঁবার চোখ দুটি ক্রূর আনন্দের উজ্জ্বল আলোকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহার এমন দৃষ্টি লিডিয়া আগে দেখে নাই! এই দীর্ঘাকার ও প্রচুর শক্তিশালিনী রমণীর মনের মধ্যে সম্মানের বর্ব্বর উন্মত্ত ধারণা, ললাটে গর্ব্বের গরিমা, ক্রূর হাসিতে অধরের কুঞ্চন, দেখিয়া দেখিয়া লিডিয়ার মনে হইল যেন এই রণরঙ্গিণী তাহার সঙ্গী সশস্ত্র যুবকটিকে কোনো এক ভীষণ কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছে। তখন অর্সোর ভয়ের কথা তাহার মনে পড়িল; মনে হইল অর্সোর দুর্গ্রহ যেন তাহাকে বিনাশের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

অর্সো ঘোড়ায় চড়িয়া ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল লিডিয়া জানলায় দাঁড়াইয়া আছে। অর্সো লিডিয়ার তখনকার মনের ভাব বুঝিয়াই হোক বা তাহাকে শেষ বিদায়-

ইঙ্গিত জানাইবার জন্যই হোক, লিডিয়ার-দেওয়া মিশরী আংটীটি তুলিয়া লিডিয়াকে দেখাইয়া চুম্বন করিল।

আরক্তিম হইয়া লিডিয়া জানলা হইতে সরিয়া গেল; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কর্সিক দুজন তাহাদের টাটু ঘোড়া ছুটাইয়া পাহাড়ের দিকে ক্রমশ দূরে আরো দূরে চলিয়া যাইতেছে। আধ ঘণ্টা পরে লিডিয়া দূরবীণ কষিয়া দেখিল তাহারা সমুদ্রতীর ধরিয়া যাইতেছে, আর অর্সো থাকিয়া থাকিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া শহরের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে অন্তরালে পড়িয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল।

লিডিয়া আর্সিতে মুখ দেখিতে গিয়া দেখিল সে কী ভয়ানক মলিন পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে! সে তখন নিজের মনেই বলিতে লাগিল—"এই তরুণ যুবকটির আমার কথা ভাবা কি উচিত? আর আমি, আমারই কি তার কথা ভাবা উচিত? কেন ভাবা, কিসের জন্যই বা? ...পথের সঙ্গী বৈ ত নয়! ...আমি এই কর্সিকায় কেন এসেছিলাম ছাই? ...নাঃ! আমি তাকে একটুও ভালোবাসি না।... না, না, তাকে ভালো বাসা—অসম্ভব!...আর কলোঁবা? ...খুনের চাপান গাইয়ে, প্রতিহিংসায় পাগল বুনো সেই মেয়েটা, যে এতবড় একখানা ছোরা ছাড়া চলে না, সে হবে আমার ননদ!" হঠাৎ লিডিয়ার হাত তাহার কোমরবন্ধের সেই ছোরাখানার উপর পড়িল, সে রাজা থিয়োডোরের ছোরাখানা তাহার প্রসাধন-টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সে আবার নিজের মনে বলিতে লাগিল—'কলোঁবা যাবে লণ্ডনে! সে লেডিদের সভায় নাচ্‌বে! আ আমার পোড়াকপাল! লোকের কাছে গৌরব করবার মতনই সম্বন্ধ বটে!...সে সারা শহরটাকে ক্ষেপিয়ে নাচিয়ে তুলতেও পারে চাই কি।...অর্সো, সে আমাকে ভালো বাসে, নিশ্চয়ই ভালো বাসে...সে যেন একটি উপন্যাসের নায়ক, তার সব বিচিত্র অদ্ভুত কর্ম্মের মোহড়ায় আমি বাধা দিয়ে বসেছি।...কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসা নেওয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবিকই কি তার গোড়াগুড়ি ছিল?...সে বীর আর বাবুর মাঝামাঝি এক জীব!...আমি তাকে একেবারে পূরো দস্তর বাবু বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি!...

লিডিয়া বিছানার উপর আছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে চাহিল, কিন্তু ঘুম তাহার তল্লাটে আসিল না। সে শুইয়া শুইয়া কেবল অর্সোর কথাই ভাবিতে ভাবিতে শতেক বার করিয়া বলিতে লাগিল—না, না, অর্সোর সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক ছিল না, নাই নাই সম্পর্ক নাই, তাহার সহিত আর সম্পর্ক থাকিবে না।

(৯)

অর্সো ভগিনীর সহিত পথ চলিতেছে। যতক্ষণ তাহাদের ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছিল ততক্ষণ তাহারা কোনো কথাই বলিতে পারে নাই; যখন চড়াই উঠিতে লাগিল তখন পা পা করিয়া চলিতে হইতেছিল, তখন যে-বন্ধুদের ছাড়িয়া যাইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা মধ্যে মধ্যে চলিতে লাগিল। কলোঁবা খুব উৎসাহিত হইয়া লিডিয়ার রূপ, কালো চুলের বাহার, আর তাহার ভব্য শোভন ব্যবহারের প্রশংসা করিতেছিল। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করিল যে, দেখিয়া যতটা মনে হয় কর্ণেল নেভিল কি বাস্তবিকই ততই ধনী, লিডিয়া কি তাঁহার একমাত্র সন্তান? উপসংহারে সে বলিল—আমার ত মনে হয় কুটুম্ব খুব ভালোই হবে। লিডিয়ার বাবার তোমার ওপর খুব টান পড়েছে বলে মনে হয়...

অর্সো কোনো উত্তর দিল না দেখিয়া সে বলিয়াই চলিল—আমরাও ত এককালে বড়মানুষ ছিলাম, এখনো ত আমাদের খাতির সম্ভ্রম কম নয়। আমাদের হাবিলদার-গোষ্ঠীর চেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার দেশে আর কেই বা আছে! দাদা, তুমি সেই বংশের লোক। আমি যদি তুমি হতাম, তবে লিডিয়াকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করতে একটুও ইতস্তত করতাম না...বিয়েতে তুমি যে বরপণ পাবে, তাই দিয়ে আমি একটা বন আর আমাদের বাড়ীর পাশের আঙুর-ক্ষেতটা কিনব; একটা ভালো রকম বাড়ী বানাব; আর যে-বাড়ীতে দেশের শত্রু মুরের মুরদ চূর্ণ হয়ে মুণ্ডু গড়াগড়ি গিয়েছিল সেই বাড়ীটা মেরামত করিয়ে দেবো।

অর্সো ঘোড়াকে ছুট করাইয়া দিয়া বলিল—কলোঁবা, তুই আস্ত পাগল!

—দাদা, তুমি পুরুষ মানুষ, কি করা উচিত অনুচিত মেয়েমানুষের চেয়ে তুমি ঢের বেশি জানো, মানি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সেই ইংরেজটা তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে কিসের জন্যে কেন আপত্তি করবে? ইংলণ্ডে হাবিলদার-বংশ আছে?......

এইরূপ কথাবার্ত্তায় একদমে অনেক পথ হাঁটিয়া ভাইবোনে একটি ছোট গাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা তাহাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে সে রাত্রির জন্য বাসা লইল। সেখানে তাহাদের অভ্যর্থনা ও আতিথ্য-সৎকার দস্তুর-মতই হইল; কর্সিকার আতিথেয়তার পরিচয় যাহার জানা আছে সেই বুঝিতে পারিবে যে সে কী সমাদর! পরদিন প্রভাতে যখন অতিথিরা বিদায় হইল, তখন গৃহস্বামী অতিথিদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া দিয়া আসিল।

বিদায় লইয়া ফিরিবার সময় সে অর্সোকে বলিল—এই যে বনজঙ্গল দেখছেন, এই বনে একজন পলাতক আসামী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দশ বচ্ছর বাস করে গেছে,

পুলিশ তাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়েও টিকি দেখতে পারনি। এই বনের ওপারেও গাঁ আছে; সেখানে বা কাছাকাছি কোথাও যদি কেউ বন্ধু থাকে তবে বনবাসী হলেও কিছুরই ত অভাব ঘটে না।...এই যে আপনার একটা তোফা বন্দুক আছে দেখছি, এতে খুব দূর থেকেই নিকেশ করে দেওয়া যায় বোধ হয়! বাঃ! কিবে গড়ন আর কত বড়! এতে হরিণ-টরিণের চেয়ে বড় শিকারও বেশ হর্ত্তে পারে!

অর্সো নিতান্ত অগ্রাহ্যের ভাবে উত্তর করিল যে, এই বন্দুকটা বিলাতী ইংরেজ-তৈরী, আর এর পাল্লাও নিতান্ত কম নয়। তারপর তাহারা বিদায় লইয়া যে যার পথে যাত্রা করিল।

যখন পিয়েত্রানরা হইতে অল্প দূরে পথিকেরা একটা গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিল তখন দেখিল দূরে সাত আট জন লোক বন্দুক লইয়া অপেক্ষা করিতেছে—কেহ বা পাথরের উপর বসিয়া আছে, কেহ বা ঘাসের উপর শুইয়া আছে, আর কেহ বা বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া যেন পাহারা দিতেছে; তাহাদের ঘোড়াগুলা দূরে ছাড়া চরিতেছে। কলোঁবা তাহার স্কন্ধ-বিলম্বিত দূরবীণটি তুলিয়া চোখে লাগাইয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিল—ওরা আমাদেরই লোক। পিয়েরিকৃসিয়ো তার কাজ হাসিল করেছে দেখ্‌ছি।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—কে ওরা?

কলোঁবা বলিল—আমাদের প্রজারা। পরশু সন্ধ্যে-বেলা পিয়েরিকৃসিয়োকে বলে এসেছিলাম; এরা সব তোমার আরদালি হয়ে বাড়ী পৌঁছে দেবে বলে এগিয়ে এসে আছে। গাঁয়ে তোমার একলা যাওয়া ত নিরাপদ নয়, তোমায় বলে রাখছি, বারিসিনিরা না পারে হেন কর্ম্মই নেই!

অর্সো একটু কড়া স্বরে বলিল—কলোঁবা, তোকে আমি বার বার করে বারণ না করেছি যে আমার কাছে হক-না-হক বারিসিনিদের নাম আর তোর প্রমাণশূন্য সন্দেহের কথা তুলিসনে! আমি এই সব পাজি লোকের সঙ্গে গাঁয়ে সঙের মতো ঢুকৃব এ তুই মনেও করিসনে। আমাকে না জানিয়ে এই সব ধাষ্টম করতে তোকে কে বলেছিল। আমি ভারি বিরক্ত হয়েছি তোর কাণ্ড দেখে!

—দাদা, তুমি দেশের হালচাল ভুলে গেছ। তোমার গোঁয়ার্ত্তুমি যখন তোমাকে বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাবে তখন তোমাকে রক্ষা করা যে আমার কর্ত্তব্য। যা করেছি তা করবার আমার অধিকার আছে বলেই করেছি।

এমন সময় প্রজারা মুনিবদের দেখিতে পাইয়া তাড়া-তাড়ি ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াগুলোকে ধরিয়া এক এক লাফে পিঠে চড়িয়া ছুটিয়া আগাইয়া আসিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন ছাগলের চেয়েও লোমশ, সাদা-দাড়ি-ওয়ালা, গরম সত্বেও গায়ে মাথায় কাপড় জড়ানো জোয়ান বুড়ো উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—জয় অর্সো আন্তোর জয়! বাঃ! বাপ-কি ব্যাটা! বাপ চেয়েও লম্বা, বাপ চেয়েও জোয়ান! ক্যা তোফা বন্দুক! দেশে এই বন্দুকের জয়জয়কার পড়ে যাবে অর্সো সাহেব!

অপর প্রজারাও সমস্বরে বলিয়া উঠিল—জয় অর্সো আন্তোর জয়! আমরা জানি যে হুজুর একদিন দেশে ফিরে আসবেনই।

একজন পাটকিলে রঙের লম্বা জোয়ান বলিল—আহা! বড় কর্ত্তা যদি আজ বেঁচে থাকৃতেন! দেশে ফিরে এল ছেলে, আজ বাপ বেঁচে থাকলে কি আনন্দই হ'ত তাঁর! তখন আমি বলেছিলাম যে বারিসিনির ভার আমার থাক...আহা তখন আমার কথা শুনলেন না, গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে, শেষে পস্তাতে হ'ল।

বুড়ো জোয়ান বলিয়া উঠিল—আচ্ছা আচ্ছা! দেরি হয়ে গিয়েছে বলেই কি আর বারিসিনি বেঁচে গিয়েছে? সে দেখা যাবে এখন।

—জয় অর্সো আন্তোর জয়!—এবং সঙ্গে সঙ্গে ডজন খানেক বন্দুক জয়ধ্বনি করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

এই সব ঘোড়সওয়ারেরা সকলে অর্সোকে ঘিরিয়া এক সঙ্গে কথা কহিয়া তাহার সহিত করকম্পনের জন্য হুটাপুটি করিয়া অর্সোকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; অর্সো কি যে করিবে কি বলিবে কিছুক্ষণ ঠিক করিতেই পারিতেছিল না; তাহার কথাই বা তখন কে শোনে? অবশেষে উহাদের উৎসাহ একটু প্রশমিত হইলে অর্সো খুব মুরুব্বিয়ানা স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল—ভাইসব, তোমরা আমার ওপর যে টান দেখালে, আমার বাবার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা দেখালে, তার জন্যে আমি তোমাদের ধন্যবাদ করি। কিন্তু আমি কারো উপদেশ শুনতে রাজি নই—আমি চাই না যে কেউ আমাকে উপদেশ দেয়, সলা পরামর্শ দেয়। আমি জানি আমার কি করতে হবে না-হবে!

প্রজারা বলিয়া উঠিল—খুব ঠিক, খুব খাঁটি! হুজুর ত জানেনই যে আমরা হুজুরের হুকুমের বান্দা, হুকুম করলেই হাজির! যে কাজ বলৃবেন বুক দিয়ে হাসিল্ করব।

—হাঁ, জানি তোমরা আমার হুকুম-বরদার। কিন্তু এখন আমার কোনো লোকেরই দরকার নেই, আমার কোনো বিপদেরও আশঙ্কা নেই। যাও, যে যার ঘরে ফিরে নিজের নিজের ক্ষেত খামার গরু বাছুর দেখগে।

আমি পিয়েত্রানরা যাবার পথ চিনি, আমার সঙ্গে পাণ্ডা পাহারার কিচ্ছু দরকার নেই।

বুড়া বলিল—কুছ পরোয়া নেই অর্সো আন্তো, সে বেটারা আজ ঘরের বা'র হতেই সাহস করবে না। বেরাল যখন আসে ছুঁচো তখন গর্ত্তে পশে।

অর্সো রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—বুড়ো বাহাত্তুরে দেড়ে ছুঁচো কোথাকার! তোর নাম কি?

—ওমা! আমায় চিন্তে পারছ না অর্সো আন্তো? আমার যে-ঘোড়াটা কামড়-কাটা তার পিঠে তোমায় কতদিন উঠিয়েছি। পোলো গ্রিফোকে মনে পড়ে না? আমার তন মন রেবিয়াদের হুকুমের তাবেদার। তোমার এই নয়া বন্দুক যেদিন হুকুম জারি করবে সেদিন আমার এই বুড়ো বন্দুক আর তার বুড়ো মনিবও চুপ করে থাকবে না, এ তুমি নিয্যস জেনে রেখো অর্সো আন্তো।

—বেশ, বেশ! কিন্তু তোমাদের সয়তানির দোহাই, এখন ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও, আমাদের পথ চলতে দাও।

প্রজারা অবশেষে বিদায় হইয়া জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গাঁয়ের দিকে চলিয়া গেল; কিন্তু যেখানে যেখানে পথ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে সেইখানে সেইখানে থামিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া যাইতেছিল কোথাও কোনো শত্রু লুকাইয়া ছিপাইয়া আছে কি না। এবং বরাবর অর্সো ও তাহার ভগিনীর নিকট হইতে এমন দূরে দূরে থাকিয়া চলিতেছিল যে দরকার হইলে ছুটিয়া গিয়া সাহায্য করিতেও পারে। পথ চলিতে চলিতে পোলো গ্রিফো তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল—আমি সমঝেছি! সব বুঝেছি! ও বল্‌বে না যে কি করবে, একেবারে করে' দেখাবে। বাপকা ব্যাটা! বহুত আচ্ছা! কাউকে তোমার চাইনে, একাই কাজ হাসিল করবে, দেবতার কাছে মানত করেছ! সাবাস! দারোগা সাহেবের পিঠের চামড়া মাসেক কালের মধ্যেই এমন ঝাঁঝরা হয়ে যাবে যে একটা কুপি করবার মতনও আস্ত চামড়া মিলবে না।

এইরূপ উৎসাহিত অনুচরে সমাবৃত হইয়া অর্সো ও কলোঁবা তাহাদের গ্রামে পূর্ব্বপুরুষের বাস্তভিটায় প্রবেশ করিল। রেবিয়া বংশের অনুগত লোকেরা এতকাল নায়কহীন হইয়া মুষড়িয়া ছিল; আজ তাহারা অর্সোকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য কাতারে কাতারে আসিয়া জড়ো হইতেছিল; এবং যাহারা কোনো দলেরই নয় তাহারা নিজের নিজের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রেবিয়া-বংশধর ও তাহার অনুগত অনুচরদের আগমন দেখিতেছিল। আর বারিসিনিরা ঘরের মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া দরজা জানলার ফুটা ও ফাঁক দিয়া অর্সোর আগমনে গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও ভিড় লক্ষ্য করিতেছিল।

পিয়েত্রানরা গ্রামখানির বসতিতে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা নাই। কর্সিকার সকল গ্রামেরই এমনি ধারা। একটা পাহাড়ের মাথায় যেমন-তেমন করিয়া যেখানে-সেখানে বাড়ীগুলি তৈরি হইয়াছে, তাহাতে না-হইয়াছে রাস্তা, আর না-আছে কোনো শৃঙ্খলা, একটা যেন গোলক-ধাঁদা। গ্রামের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড পল্লবপ্রচুর ওক গাছ; তাহার সম্মুখে একটা পাথরে বাঁধা পুষ্করিণী, নলের ভিতর দিয়া একটা ঝরণার জল তাহার মধ্যে আসিয়া জমিতেছে। এই পুষ্করিণীটি একদিন রেবিয়া ও বারিসিনি দুজনে মিলিয়া তৈরি করাইয়াছিল; কিন্তু ইহাকে এই দুই পরিবারের অতীত বন্ধুত্বের সাক্ষী বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে; বরং ইহা তাহাদের রেষারিষিরই চিহ্ন। এক সময় কর্ণেল রেবিয়া গ্রামের মিউনিসিপ্যালিটির হাতে কিছু টাকা দিয়া গ্রামে পানীয় জলের জন্য একটা ফোয়ারা করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন; কৌসলী বারিসিনি অমনি তাড়াতাড়ি সেই পরিমাণ টাকা দিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে তেমনি কিছু একটা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই রেষারিষিতে সেই সুন্দর পুষ্করিণীটি গড়িয়া উঠিল। পল্লবশালী ওক গাছটির চারিধারে এই পুষ্করিণীর পাড়ে খানিকটা খোলা জায়গা পড়িয়া আছে, সন্ধ্যাবেলায় নিষ্কর্ম্মারা এইখানে জুটিয়া জটল্লা ও গল্পগুজব করে। কেহ তাস খেলে, কেহ গান গায়, আর উৎসব আনন্দ উপলক্ষ্যে দলে দলে ঘুরপাক খাইয়া নাচে। বছরে একবার এখানে মেলা বসে। এই খোলা জায়গার দুধারে সামনাসামনি দুটো উঁচু পাথরের দেয়াল হুবহু এক রকমের; সে দুটি রেবিয়া ও বারিসিনির বাড়ীর হাতা। এখানেও তাহাদের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রেবিয়াদের বাড়ী গাঁয়ের উত্তর পাড়ায়, আর বারিসিনিদের বাড়ী দক্ষিণ পাড়ায়। অর্সোর মাতার কবর দেওয়ার হাঙ্গামার পর হইতে রেবিয়ার দলের কাহাকেও দক্ষিণ পাড়ায় বা বারিসিনির দলের কাহাকেও উত্তর পাড়ায় দেখা যায় নাই।

অর্সো ঘুর বাঁচাইবার জন্য দক্ষিণপাড়ার মধ্য দিয়া দারোগার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া কলোঁবা তাহাকে নিষেধ করিল। সে বারিসিনিদের পথে যাইতে বাধা দিয়া একটা গলি দিয়া যাইবার জন্য ভাইকে অনুরোধ করিল।

অর্সো বলিয়া উঠিল—এত হাঙ্গামার দরকার কি? গাঁয়ের রাস্তা ত আর কারো কেনা সম্পত্তি নয়?

অর্সো ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কলোঁবা আপন মনে মৃদু স্বরে বলিয়া উঠিল—হাঁ, বীর বটে! বাবা, বাবা, তোমার খুনের শোধ এ নেবেই নেবে!

পুষ্করিণীর পাড়ের খোলা জায়গাটায় আসিয়া কলোঁবা তাইকে আড়াল করিয়া বারিসিনিদের বাড়ী আর অর্সোর মাঝখান দিয়া চলিতে লাগিল। এবং চলিতে চলিতে তাহার বাজপাখীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শত্রুর বাড়ার আনাচে কানাচে জানলায় দরজায় গলি ঘুঁজিতে বুলাইয়া বুলাইয়া যাইতে লাগিল। কলোঁবা দেখিল যে বারিসিনিদের বাড়ীটার আটঘাট বাঁধা হইয়াছে, আর গোঁলন্দাজি কস্ত করার চিহ্নও অল্প স্বল্প দেখা যাইতেছে; জানলাগুলোর মুখে বড় বড় কাঠের গরান দিয়া বাহির হইতে প্রবেশের পথ রোধ করা এবং ভিতর হইতে গা-ঢাকা হইয়া গুলি চালাইবার সুবিধা করা হইয়াছে। এ একেবারে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা, শত্রুর আক্রমণের জন্য পুরাদস্তুর প্রস্তুত!

ইহা দেখিয়া কলোঁবা বলিয়া উঠিল—ভীরু কাপুরুষ সব! দাদা দাদা, দেখ, এরা এর মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার কি উদ্যোগটাই করেছে! আটঘাট বেঁধে ঘুপটি মেরে বসে আছে। থাক! একদিন না একদিন ওদের বেরুতে ত হবেই!

দক্ষিণপাড়ায় অর্সোর পদার্পণ সারা গ্রামখানিকে তোল..., করিয়া তুলিয়াছে; সকলেই এই ব্যাপারটাকে বিষম গোঁয়ার্তুমি ও অতিসাহস বলিয়া মনে করিতেছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওক-তলার জটল্লায় সকলে বলাবলি করিতেছিল—ভাগ্যিস বারিসিনির বেটারা রুকে আসে নি! ওদের ত আর বুড়ো দারোগার মতন রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তারা দেখতে পেলে অর্সো মিঞাকে মজাটি টের পাইয়ে দিত! একেবারে শত্রুর কোটের মধ্যে পা দেওয়া! এ কী গোঁয়ার্তুমি!

গাঁয়ের মাতব্বর বুড়ো একজন বলিল—ভায়ারা সব, শোন শোন, আমার কথা শোন! আজ আমি কলোঁবা ছুঁড়িকে দেখলাম—মুখ দেখেই মনে হ'ল ছুঁড়ির মাথায় একখানা কি মতলব খেলছে। বাতাসে আমি বারুদের গন্ধ পাচ্ছি! শিগ্‌গিরই পিয়েত্রানরায় মাংস খুব সস্তা হয়ে উঠ্‌বে! (ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

ইতর জন্তুর বোধশক্তি (The Literary Digest):—

অনেকে হয়ত বিশ্বাস করিবেন না যে টরেস প্রণালীর ধারে দ্বীপের অধিবাসীগণ ২এর বেশী গণনা করিতে পারে না। অথচ অনেক ইতর জন্তু তদপেক্ষা অধিক গণনা-শক্তির বেশ পরিচয় দেয়। পারী নগরের লা রিভ্যু পত্রিকায় কুর্পাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, যে, অনেক পক্ষীই তাহাদের বাসা হইতে ডিম চুরি হইলে বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্যজনক গণনা-শক্তির পরিচয় পশুদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। হেনল্টের খনি সমূহে একজোড়া ঘোড়া ৩০ বার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ যাতায়াতের পর সে দিনের মত খালাস পায়; ক্রমে তাহাদের সংখ্যার ধারণা এমনই বদ্ধমূল হইয়া যায় যে ৩০ বার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বেশ কাজ করে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পথ ৩০ বার শেষ হইলেই আর চলিতে রাজী হয় না। বিখ্যাত ফরাসী লেখক মনটেনও লিখিয়াছেন যে পুরাতন পারস্যের রাজধানী সুসাতে উদ্যান সমূহে যে বলদগণ জল সেচন করিত তাহারা ১০০ বার কূপ হইতে জল তুলিলে আর কাজ করিতে রাজী হইত না।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু ইদানিং এ বিষয়ে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইতর জন্তু একেবারে গণনা-শক্তি-রহিত নয়। দেখা গিয়াছে যে চড়ুই ও কাক চার পর্য্যন্ত গণিতে পারে। চারজন শিকারীকে যদি তাহারা তাহাদের বাসার নিকট লুকাইয়া থাকিতে দেখে তবে যে পর্য্যন্ত না তাহারা ৪ জনকেই সেখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখে ততক্ষণ তাহারা বাসায় ফেরে না। কিন্তু যদি ৪ জনার বেশী লোক শিকার করিতে বাহির হয় তবে এই পক্ষীগণ আর গণিয়া ঠিক করিতে পারে না এবং দেখা গিয়াছে যে লুকাইবার স্থান হইতে সকলে চলিয়া না গেলেও চারজন চলিয়া গেলেই তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসে। বানরতত্ত্বজ্ঞ জাকো সাহেব বলেন যে বানরেরাও ৪এর বেশী গণিতে পারে না, এবং বোয়ারগণ যখন বানর ধরিতে যায় তখন ৪এর বেশী লোক একত্র হইয়া বাহির হয়। ৪ জন একে একে বানরদের সামনে দিয়া চলিয়া গেলে তাহারা আর ঠিক করিতে পারে না যে আরও কেহ লুকাইয়া আছে কি না। কিন্তু যতক্ষণ চারজন চলিয়া না যায় ততক্ষণ তাহারা কখনও নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া আসে না।

রোমানিস সাহেব লণ্ডন-জীবাগারে একটি বানরকে ৫ পর্য্যন্ত গণিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বানরটিকে খড় দিয়া গণিতে শিখান হয়। এবং আজ্ঞা করিলে সে ৫এর মধ্যে যে-কোন সংখ্যক খড় হাতে লইয়া দেখাইতে পারিত। বোলতা প্রভৃতির চাকের ঘরগুলি ছকোণা করিয়া তৈরি, কখনো কম-বেশী হয় না; ইহাতে তাহাদের গণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। জার্ম্মানিতে "ডন" নামক একটি কুকুরের কথা-বলিবার আশ্চর্য্য শক্তির সম্বন্ধে কাগজে অনেক আন্দোলন হইয়াছে। 'ডন' নাকি নিম্নলিখিত ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ—"তোমার নাম কি?" "তোমার কি হইয়াছে?" "তুমি কি চাও?" "উহা কি?" উত্তরে নিম্নলিখিত কথা 'ডন' উচ্চারণ করিতে পারে। যথা 'ডন', 'হাঙ্গার' (ক্ষুধা), 'হাবেন' (খাইব), 'কুকেন' (কেক্), 'রুহে' (বিশ্রাম)। ইহা ব্যতীত 'ডন' প্রশ্নের উত্তরে 'যা' (হাঁ) এবং 'নিন' (না) বলিতে পারে। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে সে "হেবারল্যাণ্ড" কথা উচ্চারণ করে। অস্কার কাংষ্ট জার্ম্মানির একজন বড় মনস্তত্ত্ববিৎ। তিনি এই কুকুরটির ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার এই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।—

ভাষা তিন রকমে ব্যবহৃত হইতে পারে। ১। বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য। ২। কোন কথা শুনিয়া মানে না বুঝিয়া তাহা নকল করিবার উদ্দেশ্যে। ৩। কেবল কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্যে। এখন দেখা যাক ডনের কথা এই তিন শ্রেণীর কোনটির অন্তর্গত।

ডনের কথা প্রথম শ্রেণীভুক্ত নহে; কারণ সে মানে বুঝিয়া, কোন ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার করে না। প্রশ্নগুলি ঠিক

একটির পর একটি জিজ্ঞাসা না করিয়া যদি প্রথমে তাহাকে "তুমি কি চাও" জিজ্ঞাসা করা যায় তবে সে উত্তর দেয় 'ডন' অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নের যাহা উত্তর তাহাই দেয়।

'ডনের' কথা কাহাকেও অনুকরণ করার চেষ্টা নহে। কারণ অনুকরণ হইলে যাহার অনুকরণ করা যায় তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর সহিত উচ্চারিত কথার ভাবভঙ্গির সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু 'ডন'এর সেরূপ কোন চেষ্টা দেখা যায় না। তাছাড়া ডন 'হাবেন' (খাইব) কথাটা যে রকমে বলিতে শিখিয়াছে তাহাতে অনুকরণের কিছুই থাকিতে পারে না। "তুমি কিছু খাইবে" "Willst du etwas haben?" এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করায় ডন বলে "haben, haben, haben" (খাইব, খাইব, খাইব), তাহার পর ডন এই কথাটি আবার বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু বলিতে সমর্থ হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় 'ডন' অনুকরণ করিয়া কথা বলে না।

এই প্রবন্ধের লেখক (Oscar Pfungst) দুই বৎসর ধরিয়া কুকুরদের ধরণধারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কুকুরের বোধশক্তি অত্যন্ত কম এবং তাহাদের মনোযোগ দিবার শক্তি না থাকায় অনুকরণ করিয়া কিছু শেখা তাহাদের পক্ষে খুব কঠিন। সুতরাং ফাংষ্ট সাহেবের মতে 'ডনের' কথা কেবল কতকগুলি শব্দ মাত্র যাহা শ্রোতার কানে ভাষা বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি বলেন যে 'ডনের' কোন কথার মাত্রার ঠিক নাই। একবার সে কথাটি ছোট করিয়া বলে, একবার হয়ত বড় করিয়া বলে। সে কেবল মাত্র একটি স্বরবর্ণ উচ্চারণ করে। এই বর্ণ 'ও' এবং 'উ'এর মাঝামাঝি। সে কণ্ঠ্য বর্ণের মধ্যে কেবল 'ক' উচ্চারণ করে। অনুনাসিক 'ং' বলিতে পারে। যাহারা তাহার কথা পূর্ব্বে কখনও শোনে নাই তাহারা তাহার hunger এবং haben, ruhe এবং kuchen, উভয় জোড়া শব্দের উচ্চারণের মধ্যে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারে না। ডনের কথা কওয়া আমাদের দেশের পক্ষীবিশেষের "বউ কথা কও" বা "চোখ গেল" বা "গৃহস্থের খোকা হোক" প্রভৃতি বলার ন্যায়। সাধারণ লোকে অনেক সময় যাহা মনে ভাবে তাহাই শুনিতেছে বলিয়া ভ্রম করে।

অনেকেই হয়ত জানেন যে শিক্ষিত ঘোড়া আশ্চর্য্য খেলা দেখাইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে সঙ্কেতের সাহায্য ব্যতীত ঘোড়া আশ্চর্য্য কিছুই করিতে পারে না। তাহারা বুদ্ধির পরিচালনা করিতে পারে একথা কেহই স্বীকার করিত না। সম্প্রতি জার্ম্মানিতে কার্ল ক্রাল (Karl Krall) নামক এক ব্যক্তি ইতর "জন্তুর চিন্তাশক্তি" সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ক্রাল পেশায় স্বর্ণবণিক হইলেও অনেক দিন হইতে মনস্তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি নূতন প্রণালীতে দুইটি অশ্বকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষার যে আশাতীত ফল হইয়াছে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার সিদ্ধান্ত সমূহ বিশ্বাস করেন নাই এবং সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে অনেক কটু কথা বলিয়াছে। এই সব আলোচনার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া অনেক বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ এবং মনস্তত্ত্ববিৎ ক্রালের মতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য এলবারফিল্ড (ক্রালের বাসস্থান) গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক জিগ্‌লার (Zieglar) নামক জনৈক বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে বংশধ প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রালের শিক্ষাপ্রণালী একেবারে ছিল। তিনি অশ্বগুলিকে বিচারশক্তিবিহীন বলিয়া মোটেই দরজা জা না। বরং মনুষ্য-শিশুর ন্যায় তিনি কিণ্ডারগার্টেন গ্রামবাসী লিকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ইহাতে এরূপ আশ্চর্য্য ফল হইয়াছে যে এক বৎসরে কোন কোন অশ্ব যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ঘোড়ার লিখিবার যন্ত্র।

জন্তুগুলি পায়ের সাহায্যে লেখে। যথা, একক সংখ্যা দক্ষিণ পদ দ্বারা, দশক সংখ্যা বাম পদ দ্বারা এবং শতক সংখ্যা পুনরায় দক্ষিণ পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করে। সংখ্যা লিখিবার এক প্রকার বোর্ড আছে তাহাকে Stamping Board অথবা লাথিমারিবার বোর্ড বলা যায়।

অধ্যাপক জিগ্লার একবার হ্যানসেন নামক কোন অশ্বকে ৩৩ + ১১ + ১২ এই অঙ্কটি কসিতে দেন। অশ্ব তৎক্ষণাৎ ঠিক উত্তর পায়ের দ্বারা বোর্ডের উপর লিখিয়া দিল। তাছাড়া আরও অনেক অঙ্কের ঠিক উত্তর দিয়াছিল।

ঘোড়ার লাথাইয়া অঙ্ক কসিবার বোর্ড।

আর একটি অশ্বকে অধ্যাপক জিগ্লার অঙ্ক কসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বোর্ডের উপর অঙ্ক লিখিয়া দিলেন। কিন্তু অশ্ব ঘাড় নাড়িল। অপরিচিত লোকের আবদার সে শোনে না। অধ্যাপক গাজর প্রভৃতি খাইতে দিলেন, কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়।

'মহম্মদ' এবং 'জরিফ' নামক দুইটি অশ্ব যে-কোনো সংখ্যার বর্গ-মূল বাহির করিতে পারে। ইহাতে মনে হয় যে পশুগুলি কেবল মাত্র সঙ্কেতে কাজ করে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ঘোড়া প্রথমে ভুল উত্তর দিয়া পুনরায় তাহা শুধরাইয়া লয়। ইহা চিন্তার দ্বারাই সম্ভব।

অশ্বগুলি নাকি বানানও করিতে পারে। কোন কথা বলিলে তাহা লাথি মারিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেয়। অনেক সময় তাহারা স্বরবর্ণ ছাড়িয়া দেয়। যেমন Hafer gaben (give out) লিখিতে বলায় লিখিল Hfr gbn.

এই সমস্ত শিক্ষিত ঘোড়া লইয়া ফ্রান্সে খুব আন্দোলন হইতেছে। পারী নগরে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী-দার্শনিক-সমিতিতে এই সম্বন্ধে সম্প্রতি খুব আলোচনা হইয়াছে। ঘোড়া মানুষ অপেক্ষা শীঘ্র অঙ্ক কসিয়া দেয় ইহা কিরূপে সম্ভব? অনেকের মতে কোনরূপ সোজা সাঙ্কেতিক উপায়ের সাহায্যে অঙ্ক কসা হয় এবং সঙ্কেতের সাহায্যে উত্তর ঘোড়াকে জানাইয়া দেওয়া হয়। কুইণ্টন সাহেব ক্রাল সাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দোষ দেখেন। প্রথমতঃ ঘোড়াগুলি অঙ্ক কসিতে অনেক ভুল করে (কোন কোন সময় শতকরা ৪০টি অঙ্কও ভুল হয়) এবং এই ভুল অঙ্ক-নির্ব্বিশেষে হইয়া থাকে। যথা, সামান্য যোগ করিতেও যত ভুল হয়, আবার ঘনমূল, চতুর্মূল, পঞ্চমূল নির্ণয় করিতেও প্রায় ততই ভুল হয়। আবার ঘোড়াগুলি নাকি যোগ করে, গুণ করে, বর্গমূল নির্ণয় করে, কিন্তু বিয়োগ অথবা ভাগ করিতে পারে না। ইহারই বা অর্থ কি? তা ছাড়া অশ্বগুলি ১৪৪এর বেশী সংখ্যার ধারণা করিতে অক্ষম। এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া কুইণ্টন সাহেব সহজ উপায়ে বর্গমূল প্রভৃতি অঙ্ক কসিবার এক নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন। এবং দার্শনিক সমিতির সমক্ষে তিনি শিক্ষিত ঘোড়াগুলির ন্যায় দ্রুতগতিতে বহু কঠিন অঙ্কের উত্তর বলিয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত দ্রুত অঙ্ক কসিবার উপায় পারী নগরের ল্য মাতাঁ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই :—

প্রথমতঃ তিনি বর্গমূল নির্ণয়ের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা কেবল ইংরাজিতে যে-সব রাশিকে perfect squares বলে অর্থাৎ যে-রাশির বর্গমূল বাহির করিলে ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়, কোনো ভাগশেষ বাকি থাকে না, যেমন ৪,৯,১৬,২৫ প্রভৃতি, তাহাতেই প্রয়োগ করা যায়। কোনও রাশির ৫ম মূল নির্ণয় করিতে হইলে তাহার একক সংখ্যাই তাহার মূল হইবে। কিন্তু সেই রাশি পূর্ণমূলীয় (perfect power) হওয়া চাই। যথা ৩২এর ৫ম মূল ২; ২১৩র ৩; ৫৯০৪৯এর ৫ম মূল ৯। এই প্রকারে বড় বড় রাশিরও মূল নির্ণয় করা যায়।

ঘনমূল নির্ণয়ের উপায় একটু পৃথক। যে সব সংখ্যার একক স্থানে ১,৪,৫,৬,৯ থাকে তাহাদের ঘনমূল ঐ সব সংখ্যা। যথা ২১৬র ঘনমূল ৬; এই প্রকারে কুইণ্টন সাহেব ৭ম, ৯ম, ১১শ, ১৩শ, ১৫শ মূল পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। বি।

বালক বীর (The Comrade) :—

হুসেন নুরী ১২ বৎসরের তুর্কী বালক। তাহার পিতা লুলবুর্গার যুদ্ধে মারা গেলে তাহার মাতা দুইটি শিশুসন্তান লইয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া শাতালজার দিকে পলায়ন করেন। এইরূপ দুঃখের আঘাতে হুসেন নুরীর অন্তরে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, সে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের শত্রু বুলগারদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। শাতালজা যুদ্ধক্ষেত্রে সে একজন সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটা বন্দুক ও টোটা এবং দেশশত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তুর্কী সেনাপতিরা যে-কেহ তাহার করুণ কাহিনী ও অসাধারণ সঙ্কল্পের কথা শুনিল সে-ই বালকের প্রতি মমতা দেখাইতে লাগিল, কিন্তু নিতান্ত শিশু বলিয়া তাহার আব্দার কেহই রক্ষা করিতে পারিল না। বালককে সৈন্য-শিবিরে যত্ন করিয়া রাখা হইল, এবং সকলেই মনে করিল যে দু-চার দিনেই বালকের সঙ্কল্প প্রশমিত হইয়া যাইবে। কিন্তু হুসেন নুরী

হুসেন নুরী চাউশ।

যখন দেখিল যে কাহারো নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা নাই, তখন সে একদিন শিবির হইতে পলায়ন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত-হত সৈন্যদিগের পরিত্যক্ত বন্দুক ও টোটা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গেল। একটা বন্দুক ও কতকগুলি টোটা মিলিয়াও গেল। যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে সৈন্য-শ্রেণী হইতে তফাতে একটি বালক একক দাঁড়াইয়া তাহার

চয়ে বড় একটা বন্দুক উঁচাইয়া তুর্ক-শত্রুদের দিকে অবিশ্রাম গুলি ালাইতেছে—যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বাতাস বিদীর্ণ করিয়া গোলাগুলি ত্যু হানিয়া ফিরিতেছে, বালকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। একজন াফিসার আনন্দে অধীর হইয়া বালককে একেবারে কোলে তুলিয়া াইয়া প্রধান সেনাপতি ইজ্জত পাশার নিকট হাজির করিল; ইজ্জত াশা বালকের কাহিনী শুনিয়া প্রীত হইলেন। হুসেন নুরীর লক্ষ্য-ভদ করিবার ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া তাহার নিপুণতায় আশ্চর্য্য হইয়া সনাপতি তাহাকে সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। সেই অবধি হুবার হুসেন নুরী আশ্চর্য্য সঙ্কল্প-দৃঢ়তা, উৎসাহ ও সাহস দেখা-য়া সৈন্য ও সেনাপতি সকলেরই প্রশংসা- ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছে। একজন বুলগার গুপ্তচর ছদ্মবেশে তুর্কীশিবিরে ছিল; হুসেন নুরী াহাকে ধরিয়া তাহার মুণ্ড কাটিয়া ছিন্ন মুণ্ড লইয়া গিয়া প্রধান সনাপতিকে উপহার দেয়। যুদ্ধ-বিবরণীতে তাহার বীরত্বখ্যাতি ানিতে পারিয়া সুলতান বালক বীরকে চাউশ বা চল্লিশ সৈন্যের ধিনায়ক পদবী দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। একদা হুসেন নুরী বামা-ফাটা লোহার টুকরায় উরুতে আহত হয়; তাহার অনিচ্ছা ত্ত্বেও তাহাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়; সুল-তান স্বয়ং হাসপাতালে গিয়া তাহার স্বাস্থ্যের তদ্বির করিয়াছিলেন; এবং আরোগ্য হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে গিয়া সে সুলতানের অতিথি ইয়া থাকে, এবং সুলতান কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে। হুসেন নুরী প্রত্যেক বালকের আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত; প্রত্যেক পিতামাতার এইরূপ সন্তান কামনার ধন। এই আদর্শ যে-জাতির মধ্যে বাস্তবরূপে আবির্ভূত হইয়া দেশপ্রীতিতে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে, সে জাতির নিরাশ হইবার কোনো কারণ নাই, সে জাতির আর মার নাই।

তুর্কীর পরাজয়ের কারণ (Literary Digest):—

কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদপত্র ইক্‌দম্‌ দেশের দুর্দ্দিনে দেশবাসী-দের প্রাণপণে সাহস দিতেছে এবং তাহাদিগকে নিজেদের পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ের জন্য চোখে আঙুল দিয়া তাহাদের ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিতেছে। তাহার মতে তুর্কীর প্রধান বিপদ তাহার নিরাশাস ও নিরুদ্যম। পরাজিত হইয়াছে বলিয়া হাত পা ছাড়িয়া হতাশ হইলে চলিবে না; পরাভব হইতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া মৃত্যুর সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেই জাতি উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারে। য়ুরোপীয় সকল জাতির সৈন্যেরাই লেখাপড়া জানে; ইতিহাস পড়িয়া দেশের রাষ্ট্রের গৌরব রক্ষা করিতে শিখে—অপর জাতির বিফলতার বিবরণ হইতে নিজেদের সফলতার উপায় আবিষ্কার করিয়া লয়; তাহারা একএকটি সজীব চিন্তাপটু সঙ্গীন, বুদ্ধিমান সেনাপতির আজ্ঞা-চালিত হইলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। যে জাতির মুটে মজুর চাষাভুষা সকলেই লেখাপড়া জানে, নিজেদের ভালো মন্দ নিজেরাই চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারে, দেশের আশা, আকাঙ্ক্ষা, গৌরব, উন্নতির সঙ্গে যেখানকার সকলেই যোগ রাখিয়া সাহায্য করিয়া চলিতে পারে, তাহাদের ত সমগ্র দেশের প্রত্যেক লোকই সৈন্য—সে দেশের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত উন্নতির আর মার নাই। বুলগারদের এই শিক্ষা আছে, তুর্কীদের নাই—বুলগার আজ সর্ব্বত্র জয়ী, আর তুর্কী পরাজিত অপমানিত। নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক পরাজয়ের পর জার্ম্মানীতে জনসাধারণের লেখাপড়া শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়; অল্প দিনেই জার্ম্মানী আপন পরাজয়ের প্রতিশোধ দিয়া ফ্রান্সের অঙ্গ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিতে পারিল—শিক্ষিত জার্ম্মান সেনার প্রতিরোধ করিবার শক্তি ফ্রান্সের ছিল না। এই শিক্ষায় সমগ্র য়ুরোপের চৈতন্য হইল, হইল না শুধু আমাদের; তাহার ফলে আমরা আজ পরের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতেছি। এখনো যদি আমরা সচেতন হইয়া চোখ মেলিয়া সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়া বুঝিতে পারি এবং অকপটে নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করি তবে এখনো বাঁচিবার পথ পাওয়া যাইতে পারে। অজ্ঞতায় যত না বিপদ তদপেক্ষা বেশি বিপদ অজ্ঞতা অস্বীকারে। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত অভাবের সন্ধান পাই তবে তাহার পূরণের চেষ্টাতেই প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত হইয়া যাইবে। আলস্য ও বিলাস, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে হইবে; অবিশ্রাম ও দীর্ঘ কালের কায়িক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজেদের আর-সকলের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা ত জগতের বাতিল জাতি নহি। যাহার অতীত গৌরবময় ছিল তাহারই উত্তরাধিকার ভবিষ্যৎ গৌরবময় হইবে। অতীতের তেজোদীপ্ত প্রাণধারা ভবিষ্যৎকে প্রাণবান্‌ করিয়া তুলিবে। দেশে হাতিয়ারের অভাব নাই, অভাব শুধু কারিকরের। অজ্ঞতা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকুশলতা লাভ করিলেই দেশের মধ্য হইতেই দেশের ভবিষ্যৎ সুন্দর শোভন করিয়া গড়িয়া তোলা সহজ হইয়া যাইবে। আমাদের শত্রুর দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের যুবকযুবতীদের চাঙ্গা করিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে স্বাধীনভাবে নিরুদ্বেগ ভবিষ্যৎকে আমরা বরণ করিয়া আনিয়া দেশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। চারু।

মুক অভিনয় (The Literary Digest):—

আইরিশ অভিনয় সম্বন্ধে একটা অপবাদ প্রচলিত আছে যে তাহারা বকে বেশী, করে অল্প; অর্থাৎ তাহাদের নাটকে গতি (action) অপেক্ষা কথার আড়ম্বর অত্যধিক। সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক জর্ম্মন নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়ে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে—তাহারা একখানি নাটকের অভিনয় করিয়াছিল, শুধু গতি দ্বারা—কাজ ও অঙ্গভঙ্গীতেই আগাগোড়া নাটকখানি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, কথা একটিও ছিল না। সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দল চোখের দৃষ্টি, সংযত ভঙ্গী ও অচপল অঙ্গ-সঞ্চালন প্রভৃতির দ্বারা অভিনয়-কলার চরম বিকাশ দেখাইয়া নাটকখানিকে দিব্য ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। মুক অভিনয়ে দর্শক যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার প্রবর্ত্তক ম্যাক্স রীনহার্ট।

নাটকখানি আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর মতই একটি রোমাণ্টিক প্রাচ্য উপাখ্যান-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিনয় দেখিয়া নিউ-ইয়র্কের ঈভনিঙ্‌ পোষ্ট (Evening Post) বলিয়াছেন, "অঙ্গভঙ্গী ও চাহনি প্রভৃতির দ্বারায় মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিচিত্র ভাব এমনই সুদক্ষভাবে ফুটানো হইয়াছিল যে, মুখের কথাও এতখানি ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। মুক অভিনেতাগণের অঙ্গ-সঞ্চালনাদির পার্শ্বে বর্ত্তমান যুগের বহু সুপ্রতিষ্ঠ বাগ্মী অভিনেতার ভাবভঙ্গী নিতান্তই দীন ও ম্লান প্রতিভাত হয়।"

নাটকখানির নাম "সমরুণ"। ইহার অভিনয়-আয়োজনে সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপটাদিতে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে—পোষাক পরিচ্ছদে প্রাচ্য ঐশ্বর্য্যের বিপুল আড়ম্বরের এতটুকু অভাব ঘটে নাই, দৃশ্যপটও নিখুঁতভাবে স্বভাবের অনুসারী হইয়াছিল। নাটকের উপাখ্যানটি এইরূপ—

এই বাক্‌হীন নাটকের নায়ক নুরুদ্দিন ভাবুক প্রকৃতির লোক। তাহার রেশমের দোকান আছে। প্রথম দৃশ্যে সে আপনার সেই রেশমের দোকানে বসিয়া আছে—পথে অসংখ্য নরনারী চলিয়াছে, সে একদৃষ্টে তাহাদের পানেই চাহিয়া থাকে। নিত্যই সে ভাবে, মনের মধ্যে একটি যে আদর্শ, কোমল মুখের আভাস ঘুরিয়া ফিরিতেছে, তেমনই একখানি মুখ কি কোন দিন চোখে পড়িবে না? একদিন ভাগ্য ফিরিল। নায়িকা সমরুণ পথে যাইবার সময় তাহার পানে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া গেল। চারি চক্ষুর মিলন হইয়া গেল। নুরুদ্দিন আশ্বস্ত হইল, আঃ এতদিনে তাহার মানসীর দেখা তবে মিলিয়াছে। সমরুণ কিন্তু বড় সেখের গৃহে বাঁদী—সেখের সঙ্গেই সে বাজারে আসিয়াছিল। নয়ন-কোণে এই যে গোপন চাওয়াটুকু—এটুকু বৃদ্ধ সেখের চোখে পড়ে নাই।

মূক-অভিনয়।

কুব্জ তরুণী নর্ত্তকীকে ভালো বাসে; সেখের পুত্র নর্ত্তকীর প্রণয়-ভিখারী হইয়া তাহাদের দুজনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; কুব্জ সেতার বাজাইয়া আনন্দের আবরণে আপনার ঈর্ষা বেদনা ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সকলের মনেই সন্দেহ ভয়ের ছায়াপাত হইয়াছে। কালো হাবসী বান্দা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে, অবস্থা কেমন সাংঘাতিক কালো হইয়া উঠিতেছে।

আর একদল প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল। সে এক কুব্জ—বাজারের ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ের ম্যানেজার—ও রঙ্গালয়ের এক তরুণী নর্ত্তকী। কিন্তু বেচারা কুব্জের ভাগ্যদেবতা নিতান্তই অকরুণ, তাই একদিন কুব্জ ক্ষুব্ধ নিরাশচিত্তে দেখিল, নৃত্যশীলা নর্ত্তকীর সহিত বৃদ্ধ সেখের তরুণ পুত্রের চোখে চোখে দিব্য কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। তাহার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। অচিরেই বৃদ্ধ সেখের হারেমে নর্ত্তকীকে বিক্রয় করিয়া সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অসংখ্য বাঁদীতে হারেমটিকে পরিপূর্ণ করাই ছিল বৃদ্ধ সেখের একমাত্র সখ। রাগের মাথায় কুব্জ এই কাণ্ড করিয়া বসিল—রাগ পড়িলে যখন সে দেখিল, যে নিজেরই সে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে তখন দারুণ বেদনায় সে বিষপান করিল।

বিষে মৃত্যু কিন্তু ঘটিল না। উত্তেজনার বেগে এমনই হইয়াছিল যে বিষটা কণ্ঠেই আটকাইয়া রহিল—উদর-গহ্বরে পৌঁছিতে পারিল না। কিন্তু নর্ত্তকীর ধারণা সে, মরিয়া গিয়াছে। কুব্জ তখন নুরুদ্দিনের দুই ভৃত্যের সাহায্যে একটা থলির মধ্যে প্রবেশ করিল; ভৃত্যদ্বয় থলির মুখ আঁটিয়া তাহাকে নুরুদ্দিনের দোকানে রেশমের বস্তার পার্শ্বে রাখিয়া দিল।

এমন সময় সমরুণ রেশম কিনিতে নুরুদ্দিনের দোকানে আসিল। নুরুদ্দিন ভাঁজ খুলিয়া রেশম দেখাইতেছিল—সমরুণ তাহা না দেখিয়া কম্পিত ত্রস্ত হস্তে নুরুদ্দিনের করস্পর্শ করিল। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। সমরুণ নুরুদ্দিনের গায় একটি রক্ত গোলাপ ছুঁড়িয়া দিল, আনন্দবিহ্বল নুরুদ্দিন সমরুণের চরণ-প্রান্তে

মূক-অভিনয়।

তরুণী নর্ত্তকী-কুব্জের প্রণয়-নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সেখের পুত্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে, এই ভাবটি চিত্র দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলে সমরুণের সখীর পরামর্শে নুরুদ্দিন একটা থলির মধ্যে প্রবেশ করিল, সখী ও সমরুণ থলির মুখ আঁটিয়া দিল। সেখের বাড়ীতে রেশমের বস্তা পাঠান হইল—কুব্জ ও নুরুদ্দিনও সেই বস্তার মধ্যে করিয়া একেবারে সেখের হারেমে চালান হইল।

কুব্জ যেন মৃত্যুর দূত—তাহাকে ঘিরিয়া কেমন একটা করাল ছায়া যেন ঘুরিয়া বেড়ায়—তাহার মুখে চোখে বিভীষিকার স্ফুলিঙ্গও যেন দুই চারিটা দেখা যায়। হারেমে নুরুদ্দিনকে নৃত্যশীলা তরুণী রূপসীর দলে আমোদরত রাখিয়া ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে প্রমোদশালা হইতে সে সরিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া সে দেখিল,

সখের পুত্র ও তাহার নবক্রীতা বাঁদী সেই রঙ্গভূমির রূপসী র্ত্তকী—যাহাকে মুহূর্ত্তের রোষে সে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে।

নর্ত্তকী তখন নায়ক সেখ-পুত্রকে তাহার পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল—সে তাহার পিতার বাঁদী,—পিতা বাঁচিয়া থাকিতে কি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে উভয়ের মিলন হয়। কুব্জ আসিয়া তাড়াতাড়ি নিদ্রিত সেখকে জাগাইয়া তুলিল—সতর্ক করিয়া দিল। সেখ তখনই পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইল—এবং আরব্য রজনীর কাহিনীর অনুরূপ দারুণ ক্ষিপ্রভাবে পুত্রের প্রাণ লইল,—কুব্জও অলস রহিল না—স্বহস্তে নর্ত্তকীকে হত্যা করিয়া মনের ক্ষোভ ত সে দূর করিলই, তাহার উপর বৃদ্ধ সেখকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইল না। কি জানি একটি কথা শুনা যায় নাই। রঙ্গাভিনয়ের ইতিহাসে এ এক নূতন পৃষ্ঠা উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বোষ্টনের Transcript পত্র প্রথমাভিনয়ের রাত্রে একজন বিচক্ষণ কলা-বিদ্ সমালোচক পাঠাইয়াছিলেন। এই মূক অভিনয় দেখিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "অঙ্গভঙ্গী, চাহনি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে যে-জীবন, যে-তেজ, যে স্বচ্ছ প্রকাশ অভিনয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা চোখে না দেখিলে, কথায় বুঝান যায় না। নীরবে নাটকের গতি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—সে কি ক্ষিপ্র, ত্বরিত-গতি, যেন নদী-স্রোতের মতই,—কোন বাধা বা বন্ধন নাই। কাহারও মুখে কথা নাই—দেহের তরঙ্গে, দৃষ্টির তরঙ্গে, ক্ষিপ্র ছিপের মতই নাটকের

মূক-অভিনয়।

সমরুণ, সেখের এতদিনকার পেয়ারের বাঁদি, বাজার হইতে নূতন-কেনা বাঁদির জন্য সেখ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দৃপ্ত ভাবে দাঁড়াইয়াছে। পশ্চাতে সেখ-পুত্র ও কুব্জ অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছে—উহারা সেখ ও তাঁহার নূতন বাঁদির মৃত্যু ঘটাইবে। ছবিখানি যেন কথা কহিতেছে।

যদি বৃদ্ধ সেখ বাঁচিয়া রহিলে নুরুদ্দিন সমরুণও তাহারই মত প্রেমের নিরাশ-যাতনা ভোগ করে! তাহার জীবনটা ত গিয়াছেই, ইহারা দুইজনে তবু সুখী হোক! দুইজনের এই আনন্দ-মিলনেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

মোটামুটি ইহাই নাটকের উপাখ্যান। নয়টি মাত্র দৃশ্যে এই ঈর্ষাভীষণ, করুণ-কোমল প্রেমোৎসবের চিত্রখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—আরব-জীবনের সে একটি গূঢ় চক্রান্তের মর্ম্মভেদী কাহিনী! বাজার, কুব্জের রঙ্গভূমি, সেখের কনক-প্রাসাদ, সেখের শয়নকক্ষ, নুরুদ্দিনের রেশমের দোকান প্রভৃতি দৃশ্যপট সৌন্দর্য্যে আড়ম্বরে অতুলনীয়। নাটকের এই উপাখ্যানটি আগাগোড়া ইঙ্গিতের মধ্য দিয়াই ছুটিয়া গিয়াছে—কোথাও কাহারও মুখ হইতে উপাখ্যান ভাসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—বাস্তবের মাধুর্য্য কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ বা উপাখ্যানের গ্রন্থিও শিথিল হয় নাই। বিচিত্র বিভিন্ন সুরের সাহায্যে যেমন একটি অখণ্ড রাগিণীর সৃষ্টি হয়, তেমনই এই-সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর বিচিত্র অঙ্গ-সঞ্চালনের লীলাভঙ্গীতে একই রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রেম, আনন্দ, কৌতুক, ঈর্ষা, হতাশা প্রভৃতি যেন রঙ্গপীঠে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। যবনিকা পড়িলে, মনে হইল যেন স্বপ্নে এক বিচিত্র ছবি ফুটিয়াছিল—অপূর্ব্ব মাধুরিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।......এ মূক নীরবতা খাপছাড়া নহে—খেই হারাইয়া সেই খেইয়েরই পুনরুদ্ধারের জন্য রঙ্গমঞ্চে যে ক্ষণিক বিরক্তিকর নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠে, সেরূপ ত নহে,—এ যেন দীপ্ত উজ্জ্বলতা—যেন বিরাট কোলাহল তন্দ্রাতুর

মুক-অভিনয়।
নুরুদ্দিন রেশমের বস্তার সঙ্গে অন্তঃপুরে নীত হইয়া তাহার প্রণয়িণী সমরুণের হৃদয় জয় করিতেছে। বিস্তারিত বস্ত্রখানি প্রণয়ীযুগলের গোপন মিলন সঙ্কেতে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে।

রহিয়াছে মাত্র—তন্দ্রা ভাঙ্গিলে এখনই আকাশ ছাপাইয়া ফেলিতে পারে। তাহার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে নরচিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিগুলা থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে—এ অভিনয়ের নীরবতা ঠিক এমনই। যে ক্রন্দন, যে দীর্ঘনিশ্বাস মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে, তাহাতে নাটকের তাল কাটিয়া যায় না—নাটকটিকে তাহা জমাট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াই তুলে।

মূক অভিনয় খুবই কঠিন ব্যাপার। ইহাতে অভিনেতৃবর্গের শক্তির চরম পরিচয় পাওয়া যায়। মুখের কথা মনের সকল ভাবই প্রকাশ করিয়া দিতে পারে, সে ভাব বুঝিতেও বিশেষ বিলম্ব হয় না। কিন্তু হস্ত-পদের সঞ্চালন, কিম্বা নয়নের একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট সব খুলিয়া বলে না—মনোভাবের আভাস দেয় মাত্র। মানবচিত্তবৃত্তির জ্ঞান যাহার নখদর্পণে সেই শুধু ভঙ্গী দ্বারা বিভিন্ন বৃত্তির পরিচয় দিতে পারে। শক্তিশালী কবি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক এই চিত্ত-জ্ঞানের অধিকারী—সেই চিত্তজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি এই-সকল জর্ম্মন অভিনেতৃবর্গের মধ্যেও অসাধারণ। কথার সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া অভিনব প্রথায় যে সরল নির্দ্দোষ ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, পাশ্চাত্য জগৎ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যক্ত ভাষায় সব কথা খুলিয়া বলা অপেক্ষা ভঙ্গী বা ইঙ্গিতে অনেকখানির আভাস দেওয়াই কবির লক্ষণ। যে-সকল কাব্য নাটকাদি শেষোক্ত প্রণালীতে রচিত, তাহাই ঐ শ্রেণীর। কলা-অভিনয়েও যে ঠিক এই ধারা খাটে, তাহাও সমরুণে প্রমাণিত হইয়াছে।

সৌ।

ভারত-চিত্রশিল্পের পুনর্বিকাশ (L' Art Decoration):—

যদিও মরিস্ ম্ঁ্যাত্র্ তাঁহার Art Indien নামক পুস্তকের শেষ ভাগে বলিয়াছেন যে ভারত-চিত্রকলার পুনর্বিকাশ এখন অসম্ভব।—ইংরাজ-রাজত্বের আরম্ভ অবধি এদেশের চিত্রকলা এতই দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু আজ সেই দুর্দ্দিনের কবল হইতে এই ভারত-চিত্রকলার মুক্তিলাভের আশু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় প্রাচ্য-শিল্প-সভার ষষ্ঠ-বার্ষিক প্রদর্শনী ম্ঁ্যাত্র্ মহোদয়ের ভারত-শিল্প সম্বন্ধে উল্লিখিত ভয়াবহ আশঙ্কা-বাণী ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। ভারতে পুনরায় এই যে নবজীবনের পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হইতেছে ইহা অতীব আনন্দের বিষয়।

ভারত-শিল্পে এই নবীন উদ্যমের নেতাগণ যে কেবল মাত্র শিল্পের জন্য শিল্প-চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাহা নয়; হিন্দু জাতির প্রকৃতিগত যে আধ্যাত্মিকতা তাহারও বিকাশে ইঁহারা সকলেই সচেষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তা প্রবাহ, মহতী আশা ও দেশ-হিতৈষণার সহিত ভারত-শিল্পের এই নব বিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সুসঙ্গত।

এ যাবত সাধারণ চিত্রবিদ্যালয় বা School of Artএর বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে, ছাত্রগণকে বাধ্য হইয়া ইতরশ্রেণীর ইউরোপীয় আর্টের বাঁধিগৎ অনুসারে চলিতে হইত। এই নব্য চিত্রকরগণ সেই বিজাতীয় বিকৃত শিল্পের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা সহানুভূতির চক্ষে দেখা স্বাভাবিক।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "ওমর খৈয়ম"এর চিত্রাবলীর যিনি চিত্রকর, সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিল্পসভার সভাপতি। এই শ্রদ্ধাস্পদ গুরুর চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যগণ সমাসীন। এ বৎসর তিনি দুইটি লোকপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলীর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি ব্যঙ্গচিত্র দেখাইয়াছেন; তাহাতে তাঁহার এক সম্পূর্ণ নূতন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিতে তিনি বিদ্রূপের তুলিকা দ্বারা আধুনিক রঙ্গালয়ের অবনতির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে সৌন্দর্য্য-লোলুপ দর্শকের সম্মুখে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা প্রাচীন মহাপুরুষদের বাজারে ঝুঁটা জরির পোষাকে সজ্জিত করিয়া ও বিলাতী গীতিনাট্যের সাজসরঞ্জামে বেষ্টিত করিয়া, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন।

ঠাকুর মহাশয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র—"পুরীতে ঝড়।" এই ক্ষুদ্র ছবিখানিতে আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাস, এবং ঘন ঘোর আকাশ। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ফলতঃ, যিনি এই প্রদর্শনীতে সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন, তিনি নিরাশমনে ফিরিবেন। বিদেশী ভ্রমণকারীগণ ভারতবর্ষের যে বহিরঙ্গ দেখিতে পান, প্রাচ্যসৌন্দর্য্যলিপ্সু ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে জাজ্বল্যমান ভারতবর্ষ আঁকিতে চেষ্টা করেন,—এস্থলে সে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা অন্তরঙ্গ এবং বিষাদাচ্ছন্ন একটি অতিপ্রাকৃত ভারতবর্ষ,—রূপকাত্মক, আধ্যাত্মিক, ধর্ম্মপ্রাণ এবং চিন্ময়। এই চিত্রগুলি রেখার ছন্দ এবং বিচিত্র ভঙ্গি দ্বারা চরম ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করে, এবং বর্ণের সামঞ্জস্য দ্বারা হৃদয়বৃত্তির চরম উত্তেজনার প্রতি লক্ষ্য রাখে।

সভাপতি মহাশয়ের ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইউরোপে তাদৃশ পরিচিত না হইলেও, চিত্রকর হিসাবে কোন অংশে অবনীন্দ্রনাথের

ন্যূন নহেন। তাঁহার নিপুণ আলেখ্যে হিন্দু ভাবের উপর জাপানী শিল্পকলার ঈষৎ প্রভাব লক্ষিত হয়, এবং কোন-কোনটিতে Carriere অঙ্কিত চিত্রের ঘোর বিষাদের ছায়া দৃষ্ট হয়। এই সভার সম্পাদক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহার অঙ্কিত "কালী" একটি নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এ বৎসর কতকগুলি রামায়ণ-চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন পুঁথির চিত্রিত পাটার আদর্শে অঙ্কিত। Italian Renaissanceএর শিল্পশিক্ষার্থীর ন্যায় অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যগণ তাহাদের গুরুকে ঘিরিয়া থাকে, ও সর্ব্বদাই তাঁহার উপদেশ পাইয়া তাঁহারই ভাব ও কল্পনায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। শিষ্যের উপরে গুরুর এইরূপ প্রভাব বিস্তারের ফলে হয় ত ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ব চাপা পড়িবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু গুরুর হাতে এই আত্ম-সমর্পণের ফলে তরুণ শিক্ষার্থী যে একটা সুনিশ্চিত আশ্রয় অবলম্বন করিয়া নিজের মনের উপরে গুরুদত্ত বিশেষত্বের ও মহত্ত্বের একটি অম্লান তিলকাঙ্ক বহন করিয়া নিজের ক্ষুদ্র নিজত্বকে একটা বৃহত্তর নিজত্বের সহিত যোগ করিয়া দিবার সুবিধা পায় এটা স্থির। আমাদের দেশে এই গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ লোপ পাওয়ায় আমরা সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত।

এই নবীন শিল্পীগণের চিত্রে এখনো সময়ে সময়ে ইংরাজী ভাবের ছাপ দেখা যায়,—Rossettiর ন্যায় ভাবপ্রবণতায় তাহার প্রকাশ। কিন্তু পুরাতন চিত্রের নকল করাইয়া গুরুমহাশয় সেকালের রচনা-কৌশলের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং তখনকার নির্ভুল রেখাঙ্কন-পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

এই তরুণবয়স্ক শিষ্যগণের দ্বারা ভবিষ্যতে ভারত-চিত্রকলা, এবং যে শিল্পসভা দ্বারা তাহাদের চিত্র সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, উভয়েরই প্রভূত উন্নতিসাধন হইবে, এমন আশা করা যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত চিত্রগুলি সুষমা-ও-কবিত্বপূর্ণ, সামি-উজ্-জামার চিত্রগুলি মোগল-লিখন-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শে রচিত, এবং সুরেন্দ্রনাথ কর, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, শৈলেন্দ্রনাথ দে, বেঙ্কটাপ্পা, সতেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, অসিতকুমার হালদার, রামেশ্বরপ্রসাদ, নারায়ণপ্রসাদ এবং হাকিম মহম্মদ খাঁ,—সকলেই উল্লেখযোগ্য।

আশা করি "প্রাচ্য শিল্পসভা" সম্প্রতি জাভায় যেরূপ একটি প্রদর্শনী খুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, পারী নগরীতেও অনতিবিলম্বে তদ্রূপ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন। তাহাতে কেবলমাত্র যে চিত্রশিল্পের উদ্দীপনা হইবে তাহা নহে, পরন্তু যে-সকল ভারতবর্ষীয় শিল্পী ফরাসী-চিত্রকলার অনুরক্ত, তাঁহাদের পরিচয় ফরাসীগণ লাভ করিবেন। তাঁহারা Puvis, Rodin, Besnard ও Gauguin সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত আলাপ করেন, এমন কি Stenilen ও Manufraর নামও তাঁহাদের অবিদিত নহে। সরকারী চিত্রবিদ্যালয়ের বিদেশী চালচলন ও মামুলী ভাবের বন্ধন হইতে এই নব্য চিত্রশিল্পীগণ নিজেদের ছাড়াইয়া লইবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে পড়ে আমাদের নব্য "Impressionist"গণ, ইতালীয় শিল্পের প্রভাব এবং সরকারী শাসনের বিরুদ্ধে এইরূপই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সাদৃশ্য প্রথমে হঠাৎ ধরিতে না পারিলেও, ইহাদের এখনকার অবস্থার সহিত আমাদের তখনকার অবস্থার সমতা অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। ভারতবর্ষের অবস্থাগুণে তাঁহাদের এই মুক্তির প্রয়াস আমাদের অপেক্ষা অধিকতর তীব্র বটে, কিন্তু ফ্রান্সদেশের চিত্রকলার নবযুগের সহিত ইঁহাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য এবং সরল পদ্ধতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ই।

কষ্টিপাথর

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা (আষাঢ়)।

বিলাতের পত্র—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল সকালে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি। এবারেও আটলান্টিক অশান্ত ছিল—কিন্তু আমাদের প্রকাণ্ড জাহাজটাকে তেমন করে বিচলিত করতে পারে নি। তাই এবার আমাকে সমুদ্রপীড়ায় ভুগতে হয় নি।

এবার আমার নববর্ষের প্রথম দিন এই সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে এসে দেখা দিল। প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি—কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ। এবারকার নববর্ষ যেন আমার কূল থেকে বিদায় নেবার হুকুম নিয়ে এল—আমাকে যাত্রার আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেল। এবার ডাঙার মায়া একেবারে ছেড়ে দিয়ে কর্ণধারের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে পড়তে হবে। সেখানে পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না—কিন্তু যিনি হাল ধরে আছেন, তিনি পথ জানেন এই কথা মনে নিশ্চয় জেনে বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাঙায় স্থির হয়ে বসতে গেলে ভিত খুঁড়তে হয়, শিকড় গাড়তে হয়, সঞ্চয় বিস্তার করতে হয়, আর চলতে গেলে শিকল খুলতে হয়, নোঙর তুলতে হয়, স্থাবর সম্পত্তির বোঝা ফেলে আসতে হয়, —এখন থেকে সেই সমস্ত চিরাভ্যাসের আয়োজন থেকে নিষ্কৃতি নেবার আয়োজন করতে হবে। অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির পথে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা। এ পথের কি কোনদিন অন্ত আছে? কিন্তু যেমন অন্ত নেই তেমনি গম্যস্থান যে প্রতিপদেই—আমরা যেমন চলছি তেমনি পৌঁচচ্ছি—আমাদের এই চিরজীবনের যাত্রায় চলা এবং পৌঁছন একেবারে একই কথা। তা যদি না হত তাহলে অনন্ত চলা যে অনন্ত শাস্তি হয়ে উঠত।—কিন্তু সমস্ত জীবনব্যাপারের মজাই হচ্চে ঐ, তার অপূর্ণতা এবং পূর্ণতা একেবারে এপিঠ ওপিঠ হয়ে দেখা দেয়—যখন খেতে থাকি তখন আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রাসই খাওয়া—খাওয়ার আনন্দের জন্য খাওয়ার অবসানের অপেক্ষা করতে হয় না। তাই এবারকার নববর্ষের দিন মনকে বারবার বলিয়ে নিলুম, মন, চলতে হবে, এখন থেকে পিছন দিকে তাকাবার অভ্যাস ছাড়তে হবে। যদি সামনের মুখে চলবার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দেওয়া যায় তাহলেই মিথ্যার মায়া কাটানো সহজ হবে—তাহলেই, কে কি বলচে, কে কি ভাবচে, কিসে কি হবে এ-সব কথা ভাবনায় একেবারে দরকারই হবে না। কেননা, যখন আমরা মনে করি বসে থাকাটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখনই আশেপাশে যে-কেউ আছে সকলেরই মুখের দিকে তাকাতে হয়, এবং পোঁটলা-পুঁটলি, ঘটিবাটি, কাঁথা কম্বল সমস্তই একেবারে ভূতের মত পেয়ে বসে;—যে হতভাগা দশের দাসত্ব করে তাকে প্রতিদিন যে আপনাকে ও পরকে কত বঞ্চনা করতে হয়, কত মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তার ঠিকানা নেই—কিন্তু অনন্তের পথে চলতে হবে এই কথাটা ঠিক ভাবে বলতে পারলে জীবন আপনিই সত্য হয়ে ওঠে—কেননা আমাদের জীবনের সত্য স্বরূপটাই হচ্চে তাই, অনন্তের পথে চলা, রাস্তার মাটি কামড়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নয়। এই জন্যে বসে থাকতে গেলেই জীবন মিথ্যা হয় এবং চলতে

আরম্ভ করবামাত্রই সত্য হতে থাকে। তাই ত আমাদের প্রার্থনা, অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য থেকে সত্যের দিকে আমাদের নিয়ে যাও—ঐ নিয়ে যাওয়ার দিকেই সমস্ত সার্থকতা—বসিয়ে রাখাতেই যত গেরো। ধনরাম যখন আমাদের ধরে বেঁধে রাখ্‌তে চায় তখনই আমাদের গুরু এসে বলেন ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে বরঞ্চ উট গলতে পারে কিন্তু ধনী কখনো স্বর্গরাজ্যে যেতে পারে না। সে কথার মানে হচ্চে ধনসঞ্চয় যে আমাদের ধরে রাখতে চায়, এবং ধরে রাখ্‌লেই আমরা স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট হই—কারণ, বসে থাকার দ্বারাই আমরা অন্তের মধ্যে আট্‌কা পড়ি, চলার দ্বারাই আমরা অনন্তকে উপলব্ধি করতে পারি—সেই উপলব্ধিতেই আমাদের একমাত্র সত্য। সেই জন্যেই আমাদের প্রার্থনার ভিতরকার কথা হচ্চে—গময়, গময়, গময়,—আমাদের বসিয়ে রেখো না। কারণ, যখনই আমরা চলতে থাকৃব তখনই প্রকাশ আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হবেন। বীণাযন্ত্রে তারের উপর তার চড়াতে থাকলেই যে সঙ্গীতের প্রকাশ হয় তা নয়—তারের উপর ঝঙ্কার দিয়ে তাকে সচল করলে তবেই সঙ্গীতের আবির্ভাব বীণাকে সফল করে তোলে। আমরা খোঁটা আকড়ে ধরে বসে আছি বলেই আমাদের আবিঃ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারচেন না। তাই এবারে যাত্রার পথে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা গেল—এবার আমাদের "শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ" হোক্।

"আমাদের যাত্রা হল সুরু,
এবার ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার—
এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক
ভয় করিনে আর—তোমারে করি নমস্কার।"

কেননা, যে যাত্রা করেছে—"অথ সো হভয়ংগতো ভবতি।"

মানসী (আষাঢ়)।

চাষার বেগার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—

রাজার পাইক বেগার ধ'রেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ;
পরের কাজে কাট্‌বে সারাদিন,
রৈল প'ড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাট্‌চে সবে দিনে ও রেতে,
শেষ জোয়ে'তে 'রুইব' বলে
বেরিয়েছিলাম আজ,—
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ।
লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ—যেন টিয়ে পাখীর পাখা;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে'
মাঝের-গাঁয়ের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে
আস্‌ল ধেয়ে গ্রামের পানে,
পল্লীপথ গরুর খুরে
হ'ল যে কাদামাখা;
শস্যভারে পড়্‌ল চড়া ঢাকা।
উপর-স্বরণ দারুণ এ বাদলে
জীর্ণ আমার কুটীর ভাসে জলে;
মোড়লের ঝি ভাব্‌ছে অধোমুখে,
ছেঁড়া কাঁথায় কাঁদ্‌ছে দুটি ছেলে।
'শ্যামলা' আমার দুঃখ বুঝে
উঠানকোণে দাঁড়িয়ে ভেজে,
দেনার দায়ে দাদাঠাকুর—
গোয়াল ভেঙে নিলে।
সাম্‌লে নিতাম আজকে রু'তে পেলে।
জীর্ণ চালে হ'ল নাকো দেওয়া
কোথাও দুটি পচাখড়ের গুঁজি;—
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিল্‌ল না কি পল্লীখানি খুঁজি।
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতে হবে রাজার বাড়ী,
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথা
মলিন হ'ল বুঝি।
মিল্‌ল না এই গরীব ছাড়া পুঁজি।

ভারতবর্ষ (আষাঢ়)।

ভারতবর্ষ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

১

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি। ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি। জগত্তারিণি। জগদ্ধাত্রি।"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

২

সদ্যস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমলকমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

৩

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট; সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে,
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

৪

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুঠায়ে পড়িয়ে পিককলরবে, চুম্বে তোমার চরণপ্রান্ত;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়সলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

৫

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;

জননি তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
—জগৎপালিনি ! জগত্তারিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

বিজ্ঞান (ফেব্রুয়ারী)।

জর্ম্মান-অধিকারভুক্ত চীনরাজ্যে ডিম্বের ব্যবসা—

১৯১০ সালে সিংটাউ হইতে ১৮,২১,১৮৩ ডজন্ ডিম্ব রপ্তানি হইয়াছিল। অধিকাংশই সাইবিরিয়ার ভ্ল্যাডিভোষ্টক বন্দর ক্রয় করিয়াছিল। অন্য একটি কারখানা ডিম্বের উপাদান শুষ্ক করিয়া রপ্তানি করিয়া থাকে। এই কারখানায় প্রতিদিন ৩,৩০০ডজন ডিম্বের প্রয়োজন হয়। এই শুষ্ক ডিম্বের অধিকাংশই জারমানিতে রপ্তানি হইত। এক্ষণে আমেরিকায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। একমাত্র চীনদেশেই এই সমস্ত ডিম্ব সংগৃহীত হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ যন্ত্রপাতি বা কি উপায়ে ডিম্বের শুষ্কসার সংগৃহীত হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। পরিচালকগণ গোপনে কারবার চালাইতেছেন। পুরাতন কেরোসিন তৈলের বাক্সে ডিম্ব কারখানায় নীত হয়। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে ধরিয়া এক একটি ডিম্ব পরীক্ষিত হয়। ইহাতে ডিম্ব খারাপ হইয়াছে কি না অতি সহজে বুঝা যায়। ডিম্ব ভাল কি মন্দ তাহা আলোকে ধরিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভালগুলি বাছাই করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। অতঃপর ডিম্বগুলিকে ভাঙ্গিয়া তাহাদের শ্বেত এবং হরিদ্রা অংশ পৃথক করা হয়।

হরিদ্রা অংশ একটা সাকৃশন্ পাম্প দ্বারা একটা লম্বা পাইপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া একটা বায়ুশূন্য স্থানে নীত হয় এবং তথায় ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। অতঃপর যন্ত্র সাহায্যেই ইহা অন্য একটা পাত্রে পরিচালিত হয়। সেই পাত্রে ইহা হরিদ্রা-পিষ্টকবৎ পতিত হয়, তথা হইতে পুনরায় আর একটী যন্ত্রে চালিত হয় এবং তথায় একেবারে ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া যায়। ইহাই বাক্সবন্দি করিয়া রপ্তানি করা হইয়া থাকে। ইহা যদি শীতল এবং শুষ্কস্থানে রক্ষা করা হয় তাহা হইলে বহুকাল যাবত অক্ষুন্ন থাকে এবং ইহার খাদ্যত্ব কোনরূপে নষ্ট হয় না।

ডিম্বের শ্বেত অংশ কাচের চ্যাপ্টা পাত্রে রক্ষা করিয়া একটা ঘরের ভিতর তাকে বা সেল্‌ফে সাজাইয়া রাখা হয়। এই ঘরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি হইতে ৫৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইলে ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া পাত্রস্থ করিয়া রপ্তানি করা হয়। কখনও কখনও দোবরা চিনির দানার ন্যায় ইহাকে চূর্ণ করিয়াও রপ্তানি করা হয়।

ডিম্বের খোলাগুলি জারমানিতে চালান যায়, সেখানে ইহা হইতে গৃহপালিত পক্ষী ইত্যাদির খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১১সের শুষ্ক ডিম্ব-হরিদ্রা প্রস্তুত করিতে ১,০০০ ডিম্বের প্রয়োজন হয়। সমগ্র ডিম্বাংশের ১১ সের শুষ্ক সার প্রস্তুত করিতে ১,০০০ ডিম্ব লাগে। সার্দ্ধ দুই সের আলবুমেন প্রস্তুত করিতে ১,০০০ ডিম্ব আবশ্যক। সম্পূর্ণ শুষ্ক ডিম্বের সেরকরা মূল্য প্রায় ৪৷৷০ টাকা। এলবুমেন সেরকরা মূল্য প্রায় ৩৲ টাকা, শুষ্ক ডিম্ব-হরিদ্রা প্রায় ৩৷৷০ টাকা। এক-একটা বাক্সে প্রায় অর্দ্ধমণ হইতে ১ মণ পর্য্যন্ত চালান যায়।

অতি নিকট ভবিষ্যতে সিংটাউ পৃথিবীতে শুষ্ক ডিম্বের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইবে।

ছানা—

গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় ৮,১০০ মণ ছানা উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই ছানা উৎপাদনে ২,৫৩,৮০০ মণ মাখন-তোলা দুগ্ধ অথবা ২,৬৩,০০০ মণ খাঁটি দুগ্ধ প্রয়োজন হইয়াছিল। ভারতে যে ছানার কারখানা খোলা হইয়াছে, তাহার অবস্থা এখন নিতান্ত শৈশব। উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুশৃঙ্খলায় কারবার পরিচালিত হইলে এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। কারখানার রীতিমত উন্নতি করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। (১) দুগ্ধ হইতে ছানা সম্পূর্ণ অধঃস্থকরণ। (২) ছানা পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক করণ। (৩) রপ্তানি করিবার উপযোগী প্যাকিং করিবার ব্যবস্থা।

এক প্রকার সেণ্ট্রিফিউগাল যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ হইতে মাখন পৃথক করা হয়। এই মাটা-তোলা দুগ্ধ হইতে ছানা পৃথক করা হয়। ইহাতে শতকরা ৩২ ভাগ ছানা কণিকা অবস্থায় মিশ্রিত হইয়া থাকে। একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ছিদ্রবিশিষ্ট কুঁজার ন্যায় মাটীর পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া জল ছাঁকিয়া ফেলিলে পাত্রের মধ্যে ছানা ও মাখন পড়িয়া থাকে। যে জল বাহির হইয়া আইসে তাহার উপাদান প্রধানতঃ জল, দুগ্ধশর্করা ও কয়েক প্রকার ধাতব লবণ। দুগ্ধের এই ছানার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কেজিয়েট।

দুগ্ধে যে দুগ্ধ-অম্ল (lactic acid) থাকে তৎসংযোগেও দুগ্ধ হইতে ছানা উৎপাদিত হইতে পারে। অথবা দুগ্ধ আপনা-আপনি অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে, তৎসহযোগেও ছানা উৎপাদিত হয়। এইরূপ ছানা বিশুদ্ধ। দুগ্ধ গাঁজাইয়া যে ছানা হয় তাহা তত বিশুদ্ধ নয়।

দুগ্ধে সালফিউরিক্ এসিড দিয়া ছানা অধঃস্থ করিলে ছানা সামান্য হরিদ্রা-বর্ণাভ হয়। কিন্তু প্রথমে সালফিউরিক এসিড দিয়া দুগ্ধকে দধিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া পরে সোডিয়াম বাইকারবনেট ক্ষারের দ্রাবণ প্রয়োগ করিয়া সেই দধিকে পুনরায় দ্রবীভূত করিয়া পুনরায় এসিটিক এসিড বা ইথিল সালফিউরিক এসিড দ্বারা ছানা উৎপাদিত করিলে ছানা বিশুদ্ধ শুভ্র বর্ণ হইয়া থাকে। যদি তাপমাত্রা ১০০ডিগ্রি হইতে ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে তাহা হইলে দধি অতি ঘন ও দৃঢ় হয়। এইরূপে উত্তপ্ত করিতে হইলে বাষ্প সহযোগে উত্তপ্ত করাই বিধেয়। এইরূপ করিলে দুগ্ধকে প্রয়োজনীয় উত্তাপে অনেক কাল পর্য্যন্ত রাখা সম্ভব। একটা জ্বাল দিবার কটাহের চতুর্দ্দিকে ঘন করিয়া নলের বেড়া দিয়া সেই নলের মধ্য দিয়া বাষ্প পরিচালিত করিলেই দুগ্ধ অল্প পরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। এবং বাষ্পের পরিবাহন ইচ্ছামত অল্পাধিক করিলেই দুগ্ধ একই তাপমাত্রায় বহুকাল থাকিতে পারিবে।

দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইলে দধিকে পরিশোধিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ দধি হইতে মাখন এবং দুগ্ধ-অম্ল বিতাড়িত করা আবশ্যক। একটা কাষ্ঠের গামলায় সোডিয়াম কারবনেটের ক্ষীণ দ্রাবণ ঢালিয়া তাহার সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়। অতঃপর ছানাকে পুনরায় অম্ল সহযোগে অধঃস্থ করাইয়া লইলেই চলে। অতঃপর ক্রমাগত জল দ্বারা ছানাকে ধৌত করা উচিত। অবশেষে যখন ধৌত জলে কোনরূপে অম্লের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে না তখন আর ধৌত করিবার প্রয়োজন হয় না।

অতঃপর ছানাকে শুষ্ক করা নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ যে ছানা পাওয়া যায় তাহা শুষ্ক নহে। সাধারণ ব্যবসায়ীগণ শুষ্ক

ছানা প্রায়ই উৎপাদন করে না বা উৎপাদন করিতে জানে না। কিন্তু কারখানা করিতে হইলে এই শুষ্ক ছানারই বিশেষ প্রয়োজন।

পরিশুষ্ক ছানা শুভ্র বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। ইহা বড়ই ভঙ্গপ্রবণ এবং প্রায় স্বচ্ছ। শুষ্ক ছানা অতি অল্পকাল মধ্যে বায়ু-মণ্ডলের জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া ফেলে। ছানার কারবারে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ছানার এই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

যদি ছানায় সামান্য জলও থাকে তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছানায় পোকা ধরে, পচিয়া যায়, অথবা একেবারে অখাদ্য হইয়া উঠে।

শুষ্ক করিতে হইলে, পর পর অনেকগুলি প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ ছানাকে কাপড়ের দ্বারা জল বাহির করিতে দিতে হয়। অতঃপর চাপ সহযোগে জল একবারে নিঃশেষিত করিয়া লইতে হয়। অতঃপর এইরূপে প্রায় জলশূন্য ছানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। এই খণ্ড খণ্ড ছানাকে ক্রমে শুষ্ক করিবার গৃহে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তাহাদিগকে লম্বা পাত্রে রক্ষা করিয়া ঘরের তাপ-মাত্রা ১২০ হইতে ১৬০ ফারেনহাইট উত্তাপ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হয়।

এই সমস্ত গৃহে প্রচুর বায়ু চলাচলের যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা থাকে। এই প্রবাহিত বায়ুর সংস্পর্শে জল ক্রমশঃ বাষ্পীভূত হইয়া যায়। সময়ে সময়ে অন্য উপায়েও জল শুষ্ক করা হয়। তজ্জন্য রীতিমত যন্ত্রপাতি আবশ্যক। ডিরেক্টর জেনারল অফ কমার্শিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স মহাশয়ের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে।

প্যাক করিবার প্রণালী অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা যদি ইহাতে কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে ছানার মধ্যে তৎক্ষণাৎ বীজাণু প্রবেশ করিয়া ইহাকে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলে। শুষ্ক ছানা একখণ্ড পরিষ্কার বস্ত্রের উপর রাখিয়া তাহার উপর যন্ত্র দ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া সুরাসার ছড়াইয়া একেবারে দৃঢ় ভাবে প্যাক করা প্রয়োজন। এরূপ করিলে সুরাসার বাষ্পীভূত হইয়া বাক্সের বা কার্ডবোর্ডের ঠোঙ্গার অভ্যন্তর ভাগ সুরাসার-বাষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে জীবাণু উৎপাদিত হইতে পারে না।

প্রতিভা (চৈত্র)।

দ্বিজ রামপ্রসাদ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—

স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং বঙ্গবাসী রামপ্রসাদের সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামপ্রসাদের পদাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে ইহাতে একাধিক ব্যক্তির রচনা আছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদের গান মিশ্রিত হইয়া আছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নিবাস ছিল হালিসহরের সন্নিকট কুমারহট্ট গ্রামে। আর দ্বিজ রামপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার ভণিতাযুক্ত গানের ভাষা হইতে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিজ-ভণিতাযুক্ত সঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত লঘুভাবাত্মক। কবিরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল না; কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদের গানে দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ গৃহস্থ ছিলেন; দ্বিজ রামপ্রসাদ উদাসীন গৃহত্যাগী ছিলেন। দ্বিজ রামপ্রসাদ ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণার চিনিষপুর গ্রামে বাস করিতেন; তিনি সাধারণের নিকট ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ নামে পরিচিত ছিলেন। চিনিষপুরের কালী-বাড়ী ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে এই দুই রামপ্রসাদের সঙ্গীত ভাষা ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেখিয়া পৃথক করা উচিত; যে-কেহ অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিলেই এই সৎকার্য্যে সফল হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ধন্যবাদভাজন হইতে পারিবেন।

দিদি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক :—অমরনাথ বন্ধু দেবেন্দ্রকে না জানাইয়া সুরমাকে বিবাহ করিয়াছিল। দেবেন্দ্র না জানিয়া চারুর সহিত অমরনাথের জীবন-ঘটনা এমন জড়াইয়া ফেলে যে অমর চারুকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সে পিতাকর্ত্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হইয়া চারুকে লইয়া স্বতন্ত্র থাকে, এবং সুরমা শ্বশুরের সংসারের কর্ত্রী হইয়া উঠে। অমরের পিতার মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে ক্ষমা করিয়া চারুকে সুরমার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞা চারু দিদিকে আশ্রয় পাইয়া আনন্দিত হইল দেখিয়া সুরমাও সপত্নীর দিদির পদ গ্রহণ করিল।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামী বাড়ী আসাতে সুরমা সংসারের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিল। কিন্তু অমর চিরকাল বিদেশে কাটাইয়া সংসার-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সে বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য সুরমার শরণাপন্ন হইল।

এইরূপে ক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিচয় হইল। অমর দেখিল সুরমার মধ্যে কি মনস্বিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মপটুতা ও একপ্রাণ ব্যথিত স্নেহ আছে। অমর মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ক্রমে প্রণয়ের আকারে তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

সুরমা বুঝিল যে চারুর স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া চারুর প্রতি অন্যায় করিতে যাইতেছে, এবং সেও নিজের অলক্ষ্যে চারুর স্বামীকে ভালবাসিতেছে। তখন সুরমা স্থির করিল যে ইহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। চারুর অশ্রুজল, চারুর পুত্র অতুলের স্নেহ, অমরের অনুরোধ তাহাকে টলাইতে পারিল না। বিদায় লইবার সময় অমর সুরমাকে বলিল, যাইবার পূর্ব্বে একবার বলিয়া যাও যে ভালবাস। সুরমা জোর করিয়া "না" বলিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে কাঁদিয়া লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল "ওগো শুনে যাও আমি তোমায় ভালবাসি।"

সুরমা পিত্রালয়ে গিয়া তাহার বিমাতার ভগ্নী বালবিধবা উমাকে অবলম্বনস্বরূপ পাইয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। সুরমার সমবয়সী সম্পর্কে কাকা প্রকাশ উমাকে ভালবাসে, উমাও প্রকাশকে ভালবাসে, বুঝিয়া উভয়কে দূরে দূরে সতর্কভাবে পাহারা দিয়া রাখা সুরমার কর্ত্তব্য হইল।

এদিকে চারুর একটি কন্যা হইয়াছে; এবং চারুর সম্পর্কে ভাইঝি মন্দাকিনী তাহার দোসর জুটিয়াছে। কিন্তু দিদির-বিচ্ছেদ-বেদনা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অমরও সান্ত্বনা পাইতেছিল না। শেষে স্থির হইল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতে হইবে। কাশীতে গিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে একদিন হঠাৎ অমরের সহিত সুরমার দেখা হইয়া গেল। ক্রমে চারুও দিদির সন্ধান করিয়া সুরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এই সময় সুরমা চারুর ভাইঝি মন্দাকিনীকে দেখিয়া স্থির করিল যে তাহার সহিত প্রকাশের বিবাহ দিয়া উমাকে বুঝাইতে হইবে যে প্রকাশ তাহার কেহ নহে, এবং প্রকাশকেও উমাকে ভুলাইতে হইবে।

প্রকাশ ব্যথিত হৃদয়ে সুরমার এই দণ্ডাদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। সুরমা প্রকাশের বিবাহের দিন উমাকে লইয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিল। প্রকাশ-মন্দাকিনীর বিবাহ হইয়া গেলে সুরমা কাশীতে ফিরিয়া আসিল। চারু সংবাদ পাইয়া দিদিকে তাহাদের নূতন-কেনা বাড়ীতে চড়িভাতির নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। চড়িভাতির দিন খালিগাড়ী ফিরিয়া আসিল, সুরমা হঠাৎ পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। সুরমার পিতা কাশীবাস করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন; সুরমাও পিতার সহিত কাশীবাস করিবে স্থির করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা অত্যন্ত আশা করিয়া আসিয়াছিল যে এই তিক্ত নূতনত্ববিহীন বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে গিয়া কোন নবীন আনন্দ উৎসাহ ও উত্তেজনার আধিক্যের মধ্যে পড়িতে পারিলে তাহার জীবনের এই বিরক্তিকর ক্লান্ত ভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। যেখানে প্রত্যহ নূতন উৎসাহ, নূতন উত্তেজনা, নূতন করিয়া দেবতার জন্য অর্ঘ্যরচনা, পূজার আয়োজন,—যেখানে পতিপুত্রহীনা সংসারের সর্ব্ব সার্থকতায় বঞ্চিতা হতভাগিনীরাও শান্তি পায়, নূতন করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, সেখানে অবশ্যই তাহার এ সামান্য অশান্তি নিবৃত্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগিবে না। ছয় মাস পূর্ব্বের কথা মনে আসিয়াছিল, সেবারে কাশী কত মিষ্ট লাগিয়াছিল, চিরজীবনে হয়ত সে সুখের তৃপ্তির স্মৃতি মন হইতে দূর হইবে না। সুরমা আশা করিল কাশীতেই সে তাহার সর্ব্বসার্থকতা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সেস্থানে গেলেই বিশ্বনাথ অযাচিতভাবে আবার তাহা তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু কই! এখানেও ত ছয় মাস হইতে চলিল, সে মাদকতা সে সুখ এবারে কোথায়! সব যেন উল্টিয়া গিয়াছে; এস্থান যেন আর সে কাশী নয়, সে কাশী যেন পৃথিবী হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কেবল তাহার অন্তরের মধ্যেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে। যেস্থানে আসিয়া একদিন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথের চরণেই উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল অদ্য সেস্থানে কেবল প্রস্তর-স্তূপের উপরে বৃথা এ ফুল বিল্বপত্র চাপানো হইতেছে, বলিয়া মনে হইল। মিথ্যা এ আয়োজন-ভার, মিথ্যা এ অর্ঘ্যরচনা, শুধু শিলার নিকটে জীবন উৎসর্গ, ব্যর্থ এ পূজা; একদিন সে বিশ্বেশ্বরের চরণ হইতে পূর্ণ অন্তর লইয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ সে সর্ব্ব অন্তর শূন্য করিয়াই পূজার ডালা সাজাইয়া আনিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু হায় বিশ্বেশ্বর কই!

সুরমা বুঝিল কেবল তাহারই কাশী আসা ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু আর সকলের সার্থক। পিতা প্রত্যহ প্রভাতে প্রকাণ্ড একটা সাজি লইয়া চাকরের হস্তে ছাতা দিয়া প্রায় সমস্ত কাশী প্রদর্শন করিয়া আসেন। মনের তৃপ্তিতে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমশঃ যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সুরমার পার্শ্বে বসিয়া উমা পূজা করে, সুরমা বুঝিতে পারে তাহার পূজা সফল! বিশ্বনাথ তাহার সম্মুখে। তাই সে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে—তাপদগ্ধ লতিকা বর্ষাবারি সিঞ্চনে আবার যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে; পূজার পরে তাহার মুখে এক একদিন যে তৃপ্তি ফুটিয়া উঠে, মাঝে মাঝে অন্যমনে সে যে হাসিটুকু হাসিয়া ফেলে তাহাতে সুরমা বুঝিতে পারে উমার কাশী আসা সার্থক হইয়াছে। চারুর সহিত সাক্ষাতের পর এই একবৎসর হইয়া গেল ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদ বা পত্র সুরমা কিছুই পায় নাই। মন্দাকে পত্র লিখিয়া জানিতে ইচ্ছা করিলেও কার্য্যতঃ তাহা সে করিয়া উঠিতে পারে নাই। চারুদের নিকট হইতে চলিয়া আসার পর সে ত ইচ্ছা করিয়া কখনো কোন সংবাদ লইতে যায় নাই। আজ ভিক্ষুকের মত তাহার প্রত্যাশায় ফিরিবে? ছিঃ এ কাঙ্গালত্বের প্রয়োজন? তারা ভালই থাকুক,—কিন্তু যাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই তাহাদের সংবাদ চাহিবে কোন লজ্জায়? সুরমা এখনো আপনার এ অহঙ্কারটুকু কোন মতেই নষ্ট করিতে পারিবে না। কেবল মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হইত সে ত' চিরজীবন এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যে আপনার স্থির নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, এ দেবাসুরের দ্বন্দ্বও তাহার অন্তরে চিরদিন,—তবে এখন সে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে কেন! অন্তর আর যেন পারিয়া উঠে না, দেহও প্রায় সেই রকম বলিতেছে। সংসারের বেশীর ভাগ কার্য্য এখন উমাই করে, মধ্যে মধ্যে বলে "মা তোমার কি হ'ল, এত ভুলে যাও কেন, একটা কাজ শেষ করে উঠ্‌তে পার না?" সুরমা হাসিয়া বলে "এখন বুড় হচ্চি কিনা তাই ভীমরথি ধরছে।" "পশ্চিমে এসে লোকে মোটা হয়—তুমি যেন কি হয়ে যাচ্চ।" সুরমা উমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয় কিন্তু আপনার ক্লান্তিরাশিকেই কেবল হাসিয়া উড়াইতে পারে না।

সুরমা পিতার নিকটেও ক্রমে ধরা পড়িয়া যাইতেছিল। তিনি একদিন সুরমাকে বলিলেন, "তুমি এমন রোগা হ'য়ে শক্তিহীন হয়ে পড়্‌ছ কেন? তোমার কি কিছু অসুখ হয়েছে?" সুরমা হাসিতে চেষ্টা করিল। "অসুখ? অসুখ ত' কিছুই নয় বাবা!" "তবে কি পশ্চিমের বায়ু তোমার সহ্য হচ্চে না?" "বেশ সহ্য হচ্চে ত'।" "সহ্য কি এরে বলে! শরীর খারাপ হওয়ার জন্য তোমার মন পর্য্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে, পূর্ব্বের মত আর কিছুরি শৃঙ্খলা নেই! আমি বেশ বুঝতে পারি। অন্য কোন' স্থানে গেলে কি ভাল থাক্‌বে? তাহলে না হয় সেইখানেই যাই।" সুরমা লজ্জিত হইয়া বলিল "এতে এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন, শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, দুদিনে আবার

সেরে যাবে, এতে এত ভাবনার বিষয় কি ?" রাধাকিশোরবাবু আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু একদিন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরমা, তুমি শেষ বারে শ্বশুরবাড়ী হ'তে কালীগঞ্জে আস্‌তে স্বীকৃত হয়ে নিজেই আমায় একখানা পত্র লিখেছিলে, না ?" সুরমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল "একথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন।" রাধাকিশোর বাবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন "এমনি, ভাল মনে পড়্‌ছিল না বলে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম মা ! ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল যে আমিই তোমাকে জোর করে তাদের কাছ হ'তে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছিলাম, আন্‌তেও গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হ'ল যেন তুমিও শেষে আমায় একখানা পত্র লিখেছিলে।" সুরমা মৃদু স্বরে বলিল "আপনি বুঝি এখনো মনে কর্‌ছেন যে আমি অনিচ্ছায় আপনার কাছে এসেছি ?" "হ্যাঁ মা মধ্যে মধ্যে তাই মনে হয় ; তাতে একটু কষ্টও পাই, কেননা তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেইও ত'।" সুরমা ব্যথা পাইল, ভাবিল কি হইতে কি হয় ! সামান্য কারণে তাহার সামান্য শ্রান্তিতেও পিতা এতখানি ভাবিয়া বসিয়াছেন ! পিতা ও সন্তান সম্বন্ধ কি সময়ানুসারে এমন পরের মত হইয়া পড়ে ? সংসারে কি কোথাও একটা এমন সম্বন্ধ বা স্থান নাই যেখানে ক্ষণেকের জন্যও নিজ অধিকারের ভাবনা ভাবিতে হয় না ! বিধিদত্ত সত্বও যখন দূরে চলিয়া যায় তখন কোন্ সত্ব তবে চিরস্থায়ী ? সুরমা ক্ষুণ্ণভাব চাপিয়া বলিল "আপনি যদি এমন ভাবেন তবে আমাকেও বল্‌তে হয়, আমার কি মা ভাই বা আর কেউ আছেন ? আপনি ভিন্ন আমারই বা আর কোথায় স্থান !" পিতা আর কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সুরমা ভাবিল, না জানি তিনি কি ভাবিতেছেন ! ক্ষোভে অধর দংশন করিল। কিন্তু সে এটা বুঝিল না যে পিতামাতার চক্ষে সত্য লুকান বড় কঠিন কথা। তাঁহার পিতৃ-অভিজ্ঞতাই যে তাঁহাকে অনেক বেশী বুঝাইয়া দ্যায়। সুরমা কেবল ভাবিল, লোকে কেন এমন মনে করে ? যে সম্বন্ধ সুরমা হেলায় ছেদন করিয়া আসিয়াছে লোকে কি ভাবে তাহা ত্যাগ করা অতি কঠিন ? তাই তাহারা অবিশ্বাস করিয়া সুরমাকে অধিক পীড়িত করে। সে এটা বুঝিলনা যে এ কথায় তাহার চঞ্চল হওয়াতেই যে সে নিজের অহঙ্কারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লোকে ভাবিলই বা,— এ কথা ত তাহার মনে উদয় হইল না—সে কেবল ভাবিতেছে কিসে ইহার বিরুদ্ধ প্রমাণ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। একে মনের অত্যন্ত উন্মনা ভাব, তাহাতে যদি তাহার এ অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হইয়া যায় তবে তাহার পৃথিবীতে আর কিছুই যেন থাকিবে না। শৈশব হইতে এমনি আত্মাভিমানের মধ্যে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, আত্মশক্তিতে তাহার এমনি অগাধ বিশ্বাস, তাই আজ প্রাণের একান্ত চেষ্টায় আপনার প্রতিজ্ঞা, ত্যাগ, অটল রাখিতে চেষ্টা করিয়া এখনো সে যুঝিতেছে।

রাধাকিশোর বাবু আবার একদিন আহার করিতে করিতে বলিলেন "মা একবার বাড়ী বেড়িয়ে এলে হয় না ? চল একবার নাহয় বেড়িয়ে আসা যাক্।" সুরমা বলিল "মিথ্যা মিথ্যা এখন বাড়ী যাওয়ার কি দরকার ?" "দরকার নাই থাকুক, গেলে দোষ কি ?" "আমরা থাকি, আপনি না হয় বেড়িয়ে আসুন।" তখন পিতা ত্রস্তে কথা ফিরাইলেন "এমন কিছু ত দরকার নেই, কেবল খরচ আর রাস্তার কষ্ট। মনে হচ্ছিল তুমি হয়ত বাড়ী গেলে একটু ভাল থাক্‌তে।— তবে থাক্, গিয়ে আর কি হবে—কি বল মা ?" "হ্যাঁ ! কাল চলুন না হয় একবার আদি-কেশবে বেড়িয়ে দর্শন করে আসা যাক্, বড় ভাল জায়গাটি।" বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিলেন "সেই ভাল। তবে আজ নৌকা ঠিক করে আস্‌তে বলি, ভোরেই যেতে হবে।" সুরমা মনে মনে একটু সকরুণ হাসি হাসিল। ভাবিল, লোকের সন্তান না হওয়াই মঙ্গলের।

উমা ভাবিয়াছিল সত্যই বুঝি বাটী যাইতে হইবে। যখন সুরমাকে একলা পাইল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "দাদাবাবু বাড়ী যাবার কথা কেন বলছিলেন মা ?" "কি জানি তাঁর বুঝি মন হয়েছিল।" "তুমি কি বল্‌লে ?" "বল্লাম যাবার দরকার নেই।" "দাদাবাবু যাবেন না ত ?" "না ? কেন ? যেতে কি ইচ্ছে হয় তোর ?" "না না মা, এখানে ত' আমরা বেশ আছি, বাড়ী গিয়ে এখন কি হবে ?" সুরমা ভাবিয়া বলিল "আচ্ছা এখন না যাই, পরে ত' যেতে হবে।" "কেন এখানে চিরদিন থাকা হয় না মা ?" "বাবা অবর্ত্তমানে ?" উমা নীরবে রহিল। "কেন তোর কি যেতে ইচ্ছে হয় না ?" "তোমার হয় ?" "না।" "তবে আমার হবে কেন !" "আর যদি আমার হয় ?" উমা ভাবিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল "তা হলে যাই, কিন্তু কষ্ট হয়।" "তোর কি এখানে এত ভাল লাগে ?" "তোমার কি লাগে না ? এখানে যে পূজো পুরোণো হয় না, দেবতা খুঁজতে হয় না, আমায় আর কোথাও কখন' পাঠিওনা মা"—উচ্ছ্বাস ভরে কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়াই উমা লজ্জিত ভাবে হেঁট মুখে রহিল। সুরমা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল "তাই হোক্ ! বিশ্বনাথ চিরদিন তাঁর পায়ের তলায়ই তোমায় রাখুন। কিন্তু হয়ত কখনো ফির্‌তে হবে, সে দিনের জন্য মনে সাহস সঞ্চয় করে

রাখ। সংসার ছেড়ে দুরে পালিয়ে গিয়ে সবাই ত্যাগী হতে পারে। ত্যাগের শক্তি যে কতটা সঞ্চিত হয়েছে তার পরীক্ষা সংসারেরই মধ্যে দিতে হয়।" উমা ম্লানমুখে বলিল "আমার কিন্তু বাড়ী যাবার নাম শুনলে বড় ভয় হয় মা। হয়ত তুমি রাগ করবে, কিন্তু তবুও বলছি আমায় সেদিন এইখেনে বিশ্বনাথের পায়ের গোড়ায় ফেলে রেখে যেও! কি জানি কেন সেখানে বড় মন খারাপ হয়ে যায়, যেন কিছুতে স্বস্তি পাই না, কেন এমন হয় মা?" "ভগবান জানেন! ভয় নেই মা, বিশ্বনাথই চিরদিন তোমায় তাঁর চরণে রাখবেন! নিজের ভার তাঁর ওপরে একান্ত ভাবে দিও, তিনি তাহলে নিজের ভার নিজেই বইবেন। তখন যেখানে থাক তাঁর পায়ের গোড়ায়ই থাকবে। বিশ্বনাথ ত শুধু কাশীনাথ নন, তিনি বিশ্বেরই নাথ।" উমা ক্ষণেক নীরবে রহিল। তারপরে মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "একটা কথা বলব?" "বল।" বলি বলি করিয়াই উমা সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিতেছে না দেখিয়া সুরমা বলিল "মনে যা হয় তা প্রকাশ করে ফেলা ভাল, বল কি বলতে চাও?" "তুমি বললে তাঁর ভার তিনি বইবেন, আর কারু কোন ভাবনা তার নিজে ভাববার জন্য থাকে না?" "না।" "তবে তুমি কেন এত ভাব মা? তুমি যা বলছ তাকি তুমিই করতে অক্ষম? তবে কার দৃষ্টান্ত নেব বল?" সুরমা চমকিত হইয়া বলিল "কই উমা! আমি কি বেশী ভাবি?" "ভাব না?" "আমি ত' তা বুঝতে পারিনা—সত্যি কি আমায় বড় চিন্তিত দেখায়?" "হ্যাঁ।" "না উমা তা নয়, তবে তবে"—"তবে কি?" "আমি ভাবিনা, তবে বড় যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এটা বুঝতে পারি।" "কেন ক্লান্ত হও মা? যাঁর কথা বললে তাঁকেই সব ভার দাওনা কেন! ক্লান্তি আসবে না! রোজ মনে হবে আজকের পূজোয় বেশী আয়োজনের দরকার।—সব নতুন চাই।" "পূজো?—কই তা করতে পারলাম?—একদিনের জন্যও যদি তা পারতাম তাহলে ভার দেবারও ভরসা করতে পারতাম। ভার দেওয়া হবে না উমা, তাঁর সঙ্গে কি অত জুয়াচুরী চলে?"—"তা যদি বল আমরা ত' প্রতিপদেই তাঁর কাছে অপরাধী, না হয় আরও একটু বাড়বে।" "ইচ্ছের আর অনিচ্ছের অপরাধে প্রভেদ আছে উমা।" উমা আর কিছু বলিল না।

মধ্যে মধ্যে সুরমার আর-একজনের কথা মনে পড়িত। সে মন্দা। সে না-জানি কেমন আছে। একেবারে স্বত্ব-ত্যাগের একটা সুখ আছে, একটা তৃপ্তি আছে। কিন্তু যাহার সেরূপ ত্যাগেরও সাধ্য নাই, যাহাকে সর্ব্ব শোকে দুঃখে কায়মনোবাক্যে কেবল অন্যের মুখ চাহিয়াই বসিয়া থাকিতে হয়, যাহার আত্মসুখ সম্পূর্ণ পরের হস্তেই ন্যস্ত, তাহার দিন কিরূপে কাটে? কেবল অপরের মুখপানে চাহিয়া কেবল অপরকে সুখী করিবার জন্য শান্তি দিবার জন্য সারা জীবনটা উৎসর্গ করিয়া একটা মানুষ কিরূপে আপনার সব দাবী ত্যাগ করে!—সুরমা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে এতটা সুখ-দুঃখ-আশা-তৃষা-ভরা মানবজীবন কেমন করিয়া মনের মধ্যে এমন ভাবে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইতে পারে!—পারে, কিন্তু সে কতটুকু? স্নেহ-মায়া-কর্ত্তব্য সব দিতে পারে—কিন্তু এক একটা বাকী থাকে। জীবন দিতে পারে কিন্তু নিজের অস্তিত্ব এমন ভাবে কোথায় দেওয়া যায়? সেস্থান বুঝি সুরমার অজ্ঞাত। সে মনে বুঝিত প্রকাশ এখনো হয়ত সব ভুলে নাই, কখনো ভুলিবে কি না তাহাও সন্দেহ!—তবে মন্দার চিরদিন কি তেমনি যাইবে? যাহার নিকট হইতে কিছুরি প্রত্যাশা নাই তাহার পায়ের গোড়ায় সারা জীবন উৎসর্গ করিয়া কেবল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে? তাতে এ তপস্যা কি কখনো সার্থকতা লাভ করে না? সহসা সুরমার আপনার কথা মনে পড়িল, মনে আসিল সেও একরূপ তপস্যা করিয়াছিল,—কিন্তু তাহার সার্থকতাকে সে কিরূপে পদদলিত করিয়াছে? সার্থকতার কথা মনে পড়াতে তাহার গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। সেরূপ সার্থকতা ত' সে চাহে নাই। আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তিই তাহার সাধনার ইষ্ট ছিল। আপনার মনুষ্যাভিমানের নিকট আপনার মনের উচ্চ আদর্শকে জীবন্ত ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই কেবল তার কামনা ছিল। কিন্তু মন্দার অবস্থা তাহার অপেক্ষা জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। সুরমা ত জানিত, স্বামী হৃদয়হীন,—স্বামী অবিবেচক! স্বামীই তাহার নয়; অপরের স্বামী! সে কতটুকুর প্রত্যাশী হইতে পারে! কিছু না! আর মন্দা যে জানে তাহার স্বামী একান্ত তাহারি! তাহার সে রত্নের অংশ লইবার দাবী জগতে কাহারো নাই।—সাধ্বীর অমল শতদল প্রেম-পদ্মের উপরে তাহার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সে উপাসনা করে! কিন্তু সে পূজা যে স্বামী লইতে শিখে নাই, তাহার মর্য্যাদা বুঝে নাই, সেরূপ নিষ্ফল পূজায় কি করিয়া মন্দার দিন যায়।—দেবতার যেখানে শুধু শিলামূর্ত্তি,—সেখানে ভক্তের কেবল মাত্র পূজা করিয়া, শুধু আপনার সরক্ত প্রেম-কোমলহৃদয়-নাল হইতে ছিন্ন—সেই ফুল নিত্য সেই শিলার চরণে উপহার দিয়া প্রসাদ-বিহীন জীবন কিরূপে কাটে! সেরূপ পূজা কতদিন চলে? সুরমা তখনো বুঝে নাই যে ভক্তের পূজার

আনন্দই দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। ভক্ত যেখানে অনন্তশরণ দেবতা সেখানে শিলারূপী কতদিন !

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বর্ষার সন্ধ্যা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভাগীরথীর এপারে ওপারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কাশীর ঘাটে ঘাটে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মন্দিরে মন্দিরে আরতির বাদ্যধ্বনি। সম্মুখে বিশালহৃদয়া গঙ্গা স্থির গম্ভীর অথচ অদম্য বেগশালিনী। বারিরাশি ধূমলবর্ণ। অতিপ্রসর জল-মধ্যে এক একটা নিমগ্ন মন্দির মাথা তুলিয়া আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। মাথার উপরে তেমনি ধূমল গভীর অতি প্রসর আকাশ। তীরস্থ প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গোলযোগ, কিন্তু গঙ্গাতীরে প্রশান্ত শান্তি বিরাজিত।

অনতিদূরস্থ শ্মশানঘাটে একটা চিতা জ্বলিয়া জ্বলিয়া এখন ক্রমশঃ নিভিয়া আসিতেছে। উমা ও রাধাকিশোর বাবু সন্ধ্যা করিতেছিলেন, আর সুরমা বসিয়া অনন্যমনে মানবজীবন-চিত্রের সেই শেষ স্ফুলিঙ্গগুলি একমনে নিরীক্ষণ করিতেছিল ;- জীবনও যেন একটা চিতা মাত্র, প্রথমে মৃদু মৃদু ঈষৎ আলো, ঈষৎ জ্যোতি। ক্রমে আলো, ক্রমে তেজ ! তার পরে হুহু ধুধু ! তার পরে কয়েক মুষ্টি ভস্ম মাত্র। অবশেষে সব নির্ব্বাণ।

সুরমা নির্লিপ্ত উদাসীনের মত চাহিয়া দেখিতেছিল ; ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক রাধাকিশোর বাবুরও জীবন-বহ্নির এইরূপে নির্ব্বাণ হইবে। উমার কোমল ক্ষুদ্র আশা-তৃষা-সুখ-দুঃখ-ভরা প্রথম যৌবনেরও নির্ব্বাণ এই রূপেই !— স্বপ্নোপম তরুণ যুবক প্রকাশ। প্রকাশের সঙ্গে মন্দা— অভাগিনী মন্দারও সেই পথ। সুরমারও এই সপ্তবিংশ বৎসরের চিররহস্যময় সুখ-দুঃখ-ভার-পূর্ণ জীবন-বহ্নিও এই রূপেই নির্ব্বাপিত হইবে। এক দিন এ নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী, এ জীবন-বহ্নি এক দিন নিভিবে। সকলেরই সর্ব্ব শেষ কয়েক মুষ্টি ভস্ম মাত্র।

মন্দিরের আরতির বাদ্য থামিল। রাধাকিশোর বাবু বলিলেন "চল আর নয়, রাত হ'ল।"—বাটী অধিক দূরে নয়। বাটীতে পৌঁছিয়া সুরমা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার সন্ধ্যাহ্নিক নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন হইত না। আসনে বসিতেই উমা আসিয়া ডাকিল "মা।" "কেন ?" "তোমার একখানা পত্র আছে।" "আমার পত্র ? বোধ হয় তোমার ভুল হয়েছে।" "না, ভুল হয়নি। এই যে তোমার নাম লেখা।" "কাছে রেখে দাও—আহ্নিক সেরে উঠে দেখবো।" সুরমা দ্বার বন্ধ করিলে বিস্মিত হইয়া উমা ফিরিয়া গেল। প্রদীপের আলোয় চিঠিখানা লইয়া কাহার হস্তাক্ষর চিনিতে চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ পরে সহসা চিনিতে পারিল। উমা তখন পত্রখানা ধীরে ধীরে কুলুঙ্গির উপরে রাখিয়া দিয়া রাধাকিশোর বাবুর খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য ময়দা মাখিতে লাগিল। অন্য দিন হইতে অদ্য সুরমার দ্বার খুলিতে অধিক বিলম্ব হইল। উমা বলিল "এস উনুন যে নিভে যায় ; কখন খাবার হবে ." সুরমা তাড়াতাড়ি পিতার আহার প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। পত্রখানার কথা যে মনে ছিলনা তাহা নয়, কিন্তু সে সামান্য আগ্রহকেও প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক নহে। পিতাকে খাওয়াইয়া উমাকে জল খাওয়াইয়া চাকর চাকরাণী ও অন্যান্য লোকদের আহারের তত্ত্ব লইয়া তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। উমা বলিল "তুমি কিছু খাবে না ?" "খাব এর পরে।" পত্র হাতে লইয়াই চমকিয়া উঠিল—এ যে প্রকাশের হাতের লেখা। প্রকাশ সহসা কেন পত্র লিখিল। এক বৎসর হইল তাহারা বাটী ছাড়িয়া কাশী-বাস করিতেছে, ইহার মধ্যে সে ত তাহাকে কোন পত্র লেখে নাই। যে পত্র লিখিত সে ত এক বৎসরেরও অধিক কাল পত্রের সম্ভাষণও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া চলে না, কেননা সুরমা ত কখন তাহা চাহে নাই।

পত্র খুলিয়া মনে মনে পাঠ করিল। "কল্যাণীয়া সুরমা ! তোমাকে অনেক দিন পরে পত্র লিখিতেছি। আশা করি আমার পত্র না পাইলেও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও নাই। দাদার পত্রে জানিতে পারি তোমরা ভাল আছ, ইহার অধিক আমার আর জানিবার কিছু নাই। এখন যে পত্র লিখিতেছি তাহার কারণ, অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি। এ সময়ে তুমি ছাড়া আর যে আমার আত্ম-জন কেহ আছে তাহা মনে পড়িল না। মন্দাকিনীর অত্যন্ত ব্যারাম হইয়াছে, কি করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি একবার আসিতে পার ? দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা ভাল বোঝ করিও। ইতি প্রকাশ।"

পত্র পড়িয়া সুরমা নীরবে রহিল, উমাও নীরব। কিন্তু তাহার যে জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে অথচ সাহস করিতেছে না তাহা সুরমা বুঝিল। বলিল "প্রকাশ লিখেছে—মন্দার ভারী ব্যারাম, বাঁচে না-বাঁচে। উমা পাংশুবর্ণ মুখে বলিল "সে কি ব্যারাম ?" "তা কিছু লেখেনি। আমায় যেতে হবে, বাবাকে বলিগে।" সুরমা উঠিয়া গেল। উমা নীরবে ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল মন্দা তাহাকে মনে রাখিবার জন্য কিরূপ স্নেহকণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছিল। মন্দা হয়ত এখনো তাহাকে মনে ভাবে, উমা কিন্তু তাহার কাছে অপরাধী। তাহার কাছে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াও কার্য্যে সে তাহা পালন করিতে পারে নাই। এই দুই বৎসর ধরিয়া সে একান্তমনে কেবল সব ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। অনেক

ভুলিতেও পারিয়াছে। কিন্তু উমার মনে হইল মন্দাকে এমন করিয়া ভোলা তাহার উচিত হয় নাই। মনে হইল পূর্ব্বে তাহাকে মনে করিতে গেলে অন্তরের মধ্যে কি একটা অস্বস্তি অনুভব হইত, কি যেন বিঁধিত, বালিকা তাই ত্রস্তে সে চিন্তাকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিত। কেন এমন হইত! আজ মনে হইল, আহা তাহাকে এক দিনও মনে করা হয় নাই, ভালবাসা হয় নাই, যদি সে আর না বাঁচে! আর দেখা না হয়! সুরমা ফিরিয়া আসিতেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কি হল? দাদাবাবু কি বল্লেন!" "কাল যাব। তিনিও যেতে চাচ্চিলেন, তাঁর শরীর ত ভাল নয় তাঁকে যেতে বারণ কর্‌লাম, ভবদা সঙ্গে যাবেন।" উমা একটু কুণ্ঠিত মুখে বলিল "তার কি খুব বেশী ব্যারাম—না বাঁচার মত?" সুরমা উমার পানে চাহিয়া বলিল "কেন, তুমি কি যেতে চাও?" উমা অমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সুরমা দেখিল এই দীর্ঘ দুবৎসরে উমা সবই ভুলিয়াছে, তাহার হৃদয় এখন সেই শৈশবেরই মত নির্ম্মল, পবিত্র! কিন্তু বিষম আঘাতে স্বভাবের যেন কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অথবা বয়সের সঙ্গে বুদ্ধিরই একটু বিকাশ হইয়াছে তাই সে এখনো প্রকাশ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এটুকু সঙ্কোচ ভাব না দূর হইলে সুরমা আবার তাহাকে প্রকাশের সম্মুখে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিল না। সুরমা বলিল "বাবার কষ্ট হবে, তুমি থাক; যদি তার অসুখ খুব বেশী বুঝি তোমায় লিখবো।" "আচ্ছা। আর তাকে বল্‌বেন—" "কি বলবো?" "বল্‌বেন আমি মন্দাকে এর পরে আর ভুল্‌বনা! সে কি আমায় মনে রেখেছে!" সুরমা সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিল "জিজ্ঞাসা কর্‌বো। সে তোমায় নিশ্চয় ভোলেনি।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আপনারই পিত্রালয়। বলিতে গেলে এই গৃহই সম্পূর্ণ তাহার নিজের গৃহ। পিতা অবর্ত্তমানে সেই ত এ গৃহের সর্ব্বেশ্বরী। জীবনের প্রথম দিন, সুখময় শৈশব ত এই স্থানেই কাটিয়াছে, তবু কেন মনে হয় প্রবাস হইতে প্রবাসেই ফিরিতেছি। এত দিনেও কি সে এ গৃহকে আপনার বলিয়া লইতে পারে নাই; এ গৃহকেও যদি তাহার আপনার গৃহ বলিয়া মনে না হয় তাহা হইলে এ জগতে আর তাহার স্থান কোথায়?

প্রকাশ আসিয়া নীরবে নিকটে দাঁড়াইল। সুরমা তাহাকে মন্দার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নীরবে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকাশ বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরমা দেখিল জীর্ণ শীর্ণ দেহে মন্দা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, যেন সে সমস্ত জীবনব্যাপী একটা ঘোর সংগ্রামের পর শ্রান্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া পড়িয়াছে, দেখিয়া সুরমার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। মন্দা তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ মুখ হাস্যে উজ্জ্বল করিয়া বলিল "আসুন মা।" তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেলে—সুরমা দুই হাতে তাহার দুই স্কন্ধ ধরিয়া নিবারণ করিয়া আবার শয্যায় শোয়াইয়া দিল। নিকটে বসিয়া নীরবে রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলগুলা গুছাইয়া দিতে লাগিল। মন্দা ক্ষণেক চোখ বুঁজিয়া নীরবে সে স্নেহটুকু উপভোগ করিয়া লইল, পরে হাসিমুখে চাহিয়া বলিল "উমা আসেনি?" "বাবা একলা থাকবেন তাই আন্‌তে পারিনি; এখন কেমন আছ মন্দা?" "ভালই আছি। আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না—কেবল মধ্যে মধ্যে খুব বেশী জ্বর আসে। ক্রমেই সেরে যাবে।" "কত দিন অসুখ হয়েছে?" "বেশী দিন নয়! উনি বড় অল্পতেই ভয় পান, আপনাকে সেখান থেকে ব্যস্ত করে আনালেন। আমি দু দিন পরেই ভাল হয়ে উঠ্‌তাম।" "কেন, আমি আসায় কি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ মন্দা?" "এমন কথা বল্‌বেন না। আমি কত দিন আপনার আর উমার কথা ভাবি, মনে হয়নি যে আর এ জন্মে আপনার দেখা পাব।" "কেন মন্দা, আমি কি তোমায় নির্ব্বাসনে ত্যাগ করেছিলাম? তোমায় ত প্রকাশের কাছে রেখেছি।" "আমার ত সেজন্য কিছু মনে হত না, আমি বেশ ছিলাম! তবে মধ্যে মধ্যে আপনাকেও মনে পড়্‌ত।" "যদি বেশ ছিলে তবে এমন অসুখ হ'ল কেন?" "অসুখ কি হয় না! সকলেরি হয়। ওঁরও দু তিনবার খুব জ্বর হয়েছিল। আমার জ্বর হয় না কি না, তাই বোধ হয় এত বেশী করে হচ্চে।" তারপরে একটু থামিয়া বলিল "আপনি এসেছেন, এবার বোধ হয় আমি শীগ্‌গিরই ভাল হব।" "কেন মন্দা? প্রকাশ কি তোমার যত্ন কর্‌ত না?" মন্দা একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল "বারে বারে ওকথা কেন বলেন বা মনে করেন? আমি ভাল হব এইজন্য বল্‌ছি যে মনটা একটু নিশ্চিন্ত হল।" "কিসের নিশ্চিন্ত?" "উনি হয়ত মনে ভয় পাচ্চেন, ওঁর কষ্টও হচ্চে হয়ত, মুখ বড় শুকিয়ে গেছে, যত্ন হয় না কিনা! আপনি এসেছেন, আর ত তা হবে না।" সুরমা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। মানুষ কিরূপে এমন হয় তাহা যেন সে এখনো মনের সঙ্গে ভাল গাঁথিয়া লইতে পারিতেছিল না। মন্দা জিজ্ঞাসা করিল "আপনি এখনো হাত মুখ ধোন্‌নি?" "না।" "তবে আর বস্‌বেন না, যান্।" "যাচ্চি। প্রকাশ আমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে এলনা কেন মন্দা?" "উনি বড় ভয় পেয়েছেন, আপনি ওঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বেন যে ভয়ের কোন' কারণ ত' নেই; আমি নিজেই বুঝ্‌ছি ভাল হব।" "তোমার এত অসুখ দেখে ভয় ত

পাবারই কথা, আমার মনে হচ্ছে শুধু ভয় নয়।" মন্দা সাগ্রহে বলিল "আর কি? ভয় নয় তবে কি?" "বোধ হয় কিছু অনুতাপও হচ্ছে।" "অনুতাপ? সেকি? কেন?" সুরমা ক্ষণেক নীরবে মন্দার বিস্মিত পাণ্ডুরাভাযুক্ত মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বলিল "অনুতাপের কি কারণ নেই?" মন্দা বিস্মিত মুখ ম্লান করিয়া একটু ভাবিয়া সনিশ্বাসে বলিল "হয়ত আছে, আমায় কখন কিছু ত' বলেন না।" "তা নয় মন্দা। তোমার বিষয়েই কি তার কোন' অনুতাপ হতে পারে না? তোমার এত স্নেহের প্রতিদান সে কি কখন' দিয়েছে?" মন্দার পাণ্ডু মুখ ঈষৎ মাত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, কেননা উত্তেজনার উপযোগী রক্ত শরীরে কোথায়! বলিল "আমার স্নেহের প্রতিদান! আপনি বলেন কি! আমি কি তাঁর যোগ্য? আপনাদের স্নেহের ঋণ আমিই কখন'—যদি না ভাল হই—এজন্মে শোধ দিতে পার্‌লাম না।" "কিসে সে তোমাকে এত ঋণে বদ্ধ করেছে মন্দা? শুধু কি তোমায় বিয়ে করে? তোমার এমন জীবনটি বিফল করে দিয়ে? একবারও তোমার কথা তোমার কষ্ট মনে না ভেবে?" "আমার কষ্ট? আমার মত সুখী কে! আমায় তিনি পায়ে স্থান দিয়েছেন সে ঋণ কি শোধ দেবার? আমার জীবন বিফল নয়—সফল সফল!—আমি বড় সুখী।"—সুরমা একদৃষ্টে মন্দার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে মুখে তখন কি অসীম সুখ অসীম তৃপ্তির জীবন্ত আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে, চক্ষু দুটী একটু নিমীলিত, গণ্ড দুটী ঈষৎ লোহিতাভ, যেন শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি। সুরমা বুঝিতেছিল মন্দাকে এখন এসব প্রশ্ন করিয়া উত্তেজিত করা উচিত নয়, তথাপি এ লোভ সুরমা সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। এমন কথা এমন ভাব সে যেন পৃথিবীতে আর কখন' দেখে নাই! ভক্ত যেমন একান্ত আগ্রহে দেবতাকে নিরীক্ষণ করে সুরমা সেই ভাবে মন্দার পানে চাহিয়া রহিল। আবার মন্দা চক্ষু খুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আমাকে শীগ্‌গির করে ভাল করে দেন, এ রকম পড়ে থাক্‌তে বড় কষ্ট হয়। আমি ভাল হব ত?" "ভাল হবে বই কি—এ অসুখ ত খুব সামান্য।" মন্দা সন্তোষের হাসি হাসিল "আমার তাই মনে হয়—আমার মরতে ইচ্ছা করে না।" "বালাই! তুমি ভাল হবে।" "আমি খুব সুখী, কিন্তু তাঁকে বোধ হয় একদিনও সুখী কর্‌তে পারিনি! একদিনও ভাল রকম হাসিমুখ দেখিনি! যেদিন তা দেখ্‌তে পাব সেই দিনই আমার মরার দিন! এখন মর্‌তে পার্‌ব না।" সুরমা শিহরিয়া উঠিল, বুঝিল মন্দার পীড়া যতদূর সংশয়ে দাঁড়াইতে পারে দাঁড়াইয়াছে! অন্তরে অন্তরে ঈষৎ বিকারেরও সঞ্চার হইয়াছে। হয় ত এ সুন্দর ফুল অকালেই বা ঝরিয়া যায়! সভয়ে সুরমা ঈশ্বরকে স্মরণ করিল,—আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল পীড়ার এ করাল আক্রমণ ব্যর্থ হউক! যদি তাঁহার রাজত্বে সত্যই এমন নিঃস্বার্থ উদার আত্মবিসর্জ্জনকামী প্রেম নামে কিছু থাকে তবে তাহার জয় হউক; সে অকালে যেন পরাজিত না হয়!

বাহিরে আসিতেই সুরমা দেখিল দ্বারের নিকটে প্রকাশ নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিল প্রকাশ সব শুনিয়াছে, বড় সুখ অনুভব করিল, তৃপ্ত মুখে বলিল "প্রকাশ! ভাল ক'রে চিকিৎসা হচ্ছে ত?" প্রকাশ নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল "হরিশ বাবু আর নিমাই বাবু দেখ্‌ছেন।" "যদি আর দু এক দিনে জ্বরটা না কমে তবে কল্‌কাতা থেকে বড় ডাক্তার আনাতে হবে।" প্রকাশ একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া, আবার নত মস্তকে বলিল "আশা কি একেবারে নেই?" "বালাই! আশা আছে বই কি! রোগীর মনেও খুব সাহস আছে, নিশ্চয় ভাল হবে।" প্রকাশ ক্ষীণ হাসিল—সে হাসি বড় করুণ, বলিল "যথার্থ বল্‌ছ না স্তোভ?" "স্তোভ নয়, যা মনে হ'ল বল্‌লাম,—এখন ভগবানের দয়া! প্রকাশ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বদা কাছে থাক ত? তুমি যত্ন করলেই এ ক্ষেত্রে বেশী ফল দেখ্‌বে।" "আমি কিছু কর্‌তে গেলে বড় জড়সড় হয়ে পড়ে, বড় অস্থির হয়! তাতে পাছে তার কষ্ট বাড়ে বলে আমি কি কর্‌ব বুঝ্‌তে পারি না।" সুরমা তাহার দিকে রুক্ষ দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল "জেনো ভগবানের কাছে তুমি দায়ী হবে! যদি মন্দা না বাঁচে— " বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল "তবে যে বল্লে ভাল হবে?" "প্রকাশ তুমি কি ছেলে মানুষ হয়েছ? ভগবানের হাত, মানুষের সাধ্য কি এ কথার উত্তর দিতে পারে? কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য—" দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রকাশ বলিল "ও সব কথা এখন আর বল না, কিসে ভাল হয় তাই বল। কর্ত্তব্যের কথায় আর কাজ নেই। কর্ত্তব্য কর্‌তে গিয়েই ত নির্দ্দোষী একটির এ দশা।" "কর্ত্তব্যের ত্রুটিতেই ত এটা ঘটেছে প্রকাশ।" "সকলে তোমার মত নয় সুরমা—তুমি সব পার! কেন পার তাও বলতে পারি। তুমি কখন সে বিষের আস্বাদ জাননি—তুমি জেনেছ কেবল স্নেহ দয়া মায়া, আর কর্ত্তব্যে ভরা অহঙ্কারপূর্ণ দৃঢ় অভিমান। তুমি কখনো এ ছাড়া আর কিছু জাননি তাই এমন হ'তে পেরেছ। যাক্‌—যা হবার তা ত হয়ে গেছে, আর ফির্‌বে না! এখন মন্দা কিসে ফেরে বল। সে আমায় সুখী দেখেনি বলে মর্‌তেও প্রস্তুত নয়—আমি যেন সত্যই তাকে সেই মৃত্যুর কোলেই না ঠেলে দি! বল কিসে সে ফির্‌বে?" সুরমা মন্দার কক্ষের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল "ঘরে যাও।" প্রকাশ কক্ষের মধ্যে চলিয়া

গেল। সুরমা ধীরে ধীরে অন্য দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রকাশ যাহা বলিল তাহা কি সত্য? সত্যই তাহার কি আর কিছু নাই, আছে কেবল অহঙ্কার আর অভিমান? নাই? সত্যই কি তাহার কিছুই নাই। তবে কিসের এ জ্বালা—যাহা অনির্ব্বাণ রাবণের চিতার মত ধীরে ধীরে আজ কয়েক বৎসর হইতে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে? প্রথম প্রথম তাহার দাহিকা-শক্তি তত অনুভব হয় নাই, কিন্তু তার পর? সেই কাশীস্থ শ্মশানের মতই যে কেবল হুহু ধূধূ রব! এ কি অগ্নি তাহা বুঝা বড় কঠিন। প্রকাশ যাহা তাহাতে নাই বলিল,—প্রেম যার নাম—সে বস্তু কি এমনই জ্বালাময় এমনই অগ্নিময়? তাহা যে শান্ত স্নিগ্ধ শীতল বারিপূর্ণ প্রভাতের জাহ্নবী-স্রোতের মত অনাবিল অনাবর্ত্ত অনুত্তাপ স্থির ধীর শান্তিময়। সে যে জীবনে কখনো এক দিনের নিমিত্তও এ ধারায় অভিষিক্ত হয় নাই? কোথা হইতে হইবে? কে দিবে! শৈশব হইতেই যে তাহার জীবন মরুভূমি। সে স্নেহ কখনো সে চিনেও নাই, তাই চির দিন তাহাকে মরীচিকা বলিয়া উপহাস করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্বনাথ এক দিন তাহার সম্মুখে স্বপ্রকাশ ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু সে চিনে নাই, প্রণাম করিতে জানে নাই! চিনিবে কিরূপে—সে যে চিরদিন অন্ধ! (ক্রমশ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

আনন্দমোহন কলেজ

মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ইণ্টারমীডিয়েট বা এফ্ এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ঐ কলেজের কমিটি এবং মৈমনসিংহবাসী সকলের এইরূপ ইচ্ছা হয় যে উহাকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিয়া উহাতে বি এ পর্য্যন্ত পড়াইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। ইহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৈমনসিংহের নেতাদের নিকট লেখাপড়া করাইয়া লন যে তাঁহারা ৫০,০০০টাকা কলেজের জন্য তুলিয়া দিবেন। তাঁহারা এইরূপে লেখাপড়া করিয়া দেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার অধিকাংশ টাকা তুলিয়া ফেলেন। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উক্ত কলেজকে বি এ মান পর্য্যন্ত অঙ্গীভূত (affiliated) করিবার দরখাস্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সম্মত হন, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন ও কলেজ চালাইবার জন্য বিস্তর টাকা মঞ্জুর করেন, এবং শেষ মঞ্জুরীর জন্য দরখাস্ত ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন! বাঙ্গালা দেশের ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে আরম্ভ করিয়া লাট সাহেব পর্য্যন্ত কেহই মৈমনসিংহে এই বৎসরই একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ পাওয়ার কোন অন্তরায় দেখিলেন না, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন যে দেশময় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইবে, কিন্তু তাঁহার উচ্চতম কর্ম্মচারীরা বিপরীত ব্যবহার করিতেছেন। এক বুড়ী যে এক জজ সাহেবকে বলিয়াছিল, "বাবা, তুমি দারোগা হও," তাহা বড় মন্দ বলে নাই। অনেক সময় কার্য্যতঃ আমাদের ভালমন্দ করিবার ক্ষমতা রাজা অপেক্ষা রাজভৃত্যদের বেশী আছে দেখিতেছি।

মৈমনসিংহ বঙ্গদেশের একটি জেলা মাত্র; কিন্তু বাস্তবিক লোকসংখ্যায় ইহা সভ্য জগতের অনেক স্বতন্ত্র দেশের সমান বা তদপেক্ষা বৃহত্তর। শিক্ষা বিষয়ে আমাদের দুর্দ্দশা কিরূপ শোচনীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য এইরূপ কয়েকটী দেশের লোকসংখ্যা ও তথাকার উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থার বৃত্তান্ত দিতেছি।

মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা ৪৫,২৬,৪২২। এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের উচ্চশিক্ষার জন্য কেবলমাত্র একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে।

স্কটল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪৪,৭২,১০৩, অর্থাৎ মৈমনসিংহ অপেক্ষা কিছু কম, এই চুয়াল্লিশ লক্ষ লোকের উচ্চশিক্ষার জন্য সেণ্টএণ্ড্রুজ, গ্লাসগো, এবার্ডীন্ এবং এডিনবরা এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তদ্ভিন্ন সাত আটটি ভাল ভাল কলেজ আছে।

সুইডেনের লোকসংখ্যা ৫৪,২৯,৬০০। এই দেশে আপসালা, লণ্ড, ষ্টকহল্‌ম্, এবং গোঠেনবর্গ, এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তদ্ভিন্ন ষ্টকহল্মের কেরোলিন্ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনও বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য মর্য্যাদা-বিশিষ্ট।

সুইট্জারল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৩৩,১৫,৪৪৩ অর্থাৎ মৈমনসিংহের তিনচতুর্থাংশ। এখানে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; যথা—বাসেল, জুরিচ্, বার্ণ্, জেনিভা, ফ্রাইবুর্গ, লজান, এবং নিউশাটেল।

নরওয়ের অধিবাসীর সংখ্যা ২২,২১,৪৭৭, অর্থাৎ মৈমনসিংহের অর্দ্ধেক। ইহাদের জন্য রাজধানী ক্রিশ্চিয়া-নিয়াতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

ডেনমার্কে ২৪,৪৯,৫৪০ জন লোকের বাস। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

গ্রীসে ২৬,৩১,৯৫২ জন লোক বাস করে। রাজধানী এথেন্সে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

হল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৫১,০৪,১৩৭। তথায় পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যথা, লীডেন, গ্রোনিঞ্জেন, উট্রেক্ট, আমষ্টার্ডেম্, এবং আমষ্টার্ডেম্ ফ্রী কাল্‌ভিনিষ্টিক্ বিশ্ববিদ্যালয়।

কিউবা দ্বীপের লোকসংখ্যা ২০,৪৮,৯৮০। তন্মধ্যে শতকরা ৫৮ জন শ্বেতকায়। এই কুড়ি লক্ষ লোকের জন্য হাভানায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপের লোকসংখ্যা ৪১,৬৮,২৪৮। তথায় সিড্‌নী, মেলবোর্ণ, এডিলেড্ এবং হোবার্ট সহরে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

নবজীল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা কেবলমাত্র ১,০৩,০০০, অর্থাৎ মৈমনসিংহের সিকিরও কম। ইহাদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সহরে পাঁচটি কলেজ তাহার অঙ্গীভূত।

এই ত গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্য স্বাধীন দেশের কথা। বাঙ্গালা দেশেই কলিকাতার বাহিরে কোন কোন জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। তাহাদের কোনটীই লোকসংখ্যায়, ধনশালিতায়, অধিবাসিগণের বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যাবত্তায় মৈমনসিংহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।

বাঁকুড়ায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, বাঁকুড়া জেলার লোকসংখ্যা ১১,৩৮,৬৭০। হুগলী জেলায় দুটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। এই জেলার লোকসংখ্যা ১০,৯০,০৯৭। নদীয়া জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। লোকসংখ্যা ১৬,১৭,৮৪৬। মুর্শিদাবাদেও প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। লোকসংখ্যা ১৩,৭২,২৭৪। রাজশাহীতে প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। লোকসংখ্যা ১৪,৮০,৫৮৭। ঢাকায় দুটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। লোকসংখ্যা ২৯,৬০,৪০২। বাখরগঞ্জে (বরিশালে) প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। লোকসংখ্যা ২৪,২৮,৯১১। চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। এই জেলার লোকসংখ্যা ১৫,০৮,৪৩৩। কুচবেহার করদ রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। অধিবাসীর সংখ্যা কেবলমাত্র ৫,৯২,৯৫২। এই সমুদয় জেলাই জনসংখ্যায় মৈমনসিংহের নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। মৈমনসিংহে অবিলম্বে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ হইতে দেওয়া উচিত।

বাঙ্গালা দেশের কোন্ কোন্ জেলায় একটিও কলেজ নাই, তাহার উল্লেখ করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখন দেশের সর্ব্বত্রই ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের সংখ্যা না বাড়ায়, কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমুদয় কলেজে আর স্থান হইতেছে না। বেতন দানে অসমর্থ ছেলেদের ত কথাই নাই, যাহারা বেতন দিতে পারে, এরূপ অনেক ছাত্রও ভর্ত্তি হইতে না পারিয়া নিরাশ মনে ঘরে বসিয়া থাকিতেছে। যে-সকল জেলায় কলেজ নাই, সেখানে টাকা তুলিয়া কলেজ স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

বর্দ্ধমান বিভাগের সকল জেলাতেই কলেজ আছে, কেবল হাবড়ায় নাই, উহা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বলিয়া বেশী অসুবিধা হয় না। কিন্তু তথাপি সেখানে একটি কলেজ হওয়া উচিত। প্রেসিডেন্সী বিভাগে যশোহর জেলায় কলেজ নাই। রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলার মধ্যে কেবল রাজশাহী ও পাবনায় কলেজ আছে, বাকী ছয়টিতে—দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, রংপুর, বগুড়া ও মালদহে কলেজ নাই। ঢাকা বিভাগের ফরিদপুরে কলেজ নাই। চট্টগ্রাম বিভাগে নোয়াখালিতে কলেজ নাই।

কলিকাতার মানুষ গণনা

১৯১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষের যে মানুষ গণনা হয়, তদনুসারে কলিকাতার লোকসংখ্যা (সহরতলী সমেত) ১০৪৩৩০৭। ইহা দিল্লীর তিন গুণেরও অধিক, এবং বোম্বাই অপেক্ষা ৬২৮৬২ বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একমাত্র লণ্ডন কলিকাতা অপেক্ষা বড় সহর। পৃথিবীর বৃহত্তম বারটি সহরের মধ্যে কলিকাতা অন্যতম।

শিশুদের মৃত্যুর হার কলিকাতায় বড় বেশী। তাহার কারণ, অসময়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া, জন্মকালীন দৌর্ব্বল্য, ধাত্রীদের প্রসব করাইতে না জানা, ময়লা অস্ত্র দ্বারা নাড়ী কাটার দরুণ ধনুষ্টঙ্কার, ইত্যাদি। কলিকাতার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাক্তার পিয়ার্‌স্ বলেন যে বাল্যবিবাহ এবং ম্যালেরিয়াই শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণ; তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া কলিকাতায় কচিৎ দেখা যায়; অতএব বাল্যবিবাহই প্রবলতর কারণ।

খালের ও টালির নালার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, এবং এই রোগে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর মৃত্যু বেশী হয়, কারণ হিন্দুরা টালির নালার জল পান করে ও উহাতে স্নান করে।

নিজ কলিকাতায় পুরুষের সংখ্যা ৬০৭৬৭৪ এবং নারীর সংখ্যা ২৮৮৩৯৩। অধিবাসীদের তিন-দশমাংশের জন্ম কলিকাতাতেই হইয়াছিল; এক-দশমাংশের জন্মস্থান ২৪পরগণা, এবং এক-পঞ্চমাংশ বঙ্গদেশের অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে। দুই-পঞ্চমাংশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত। ৪৭৯১ জনের জন্ম এশিয়ার অন্যান্য দেশে, ৭৬৩০ ইউরোপজাত, ১৪০ আফ্রিকাজাত, ২০৪ আমেরিকাজাত, ২০৮ অষ্ট্রেলেশিয়াজাত এবং ৩১ জন সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে জন্মগ্রহণ করে।

বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মধ্যে কলিকাতার বাহিরে যাহাদের জন্ম, তন্মধ্যে হুগলী জেলা হইতে আসিয়াছে ৪৮০০০ জন, মেদেনীপুর ২৯০০০, বর্দ্ধমান ২১০০০, হাবড়া ১৫০০০, চব্বিশপরগণা ৮৮০০০, ঢাকা ১৭০০০, উত্তরবঙ্গ ৪০০০এরও কম, এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে আসিয়াছে ৩৬০০০।

১৫৫০০০ আসিয়াছে বিহার হইতে, ৪১০০০ উড়িষ্যা হইতে এবং ৯০০০ ছোটনাগপুর ও সাঁওতালপরগণা হইতে। ৪১০০০ হাজার গয়া জেলা হইতে আসিয়াছে, ২৯০০০ পাটনা, ২৭০০০ কটক এবং ২০৮৬৫ শাহাবাদ। আগ্রা-অযোধ্যা অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ৯০০০০ লোক আসিয়াছে। সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মোটামুটি ২৫০০০ হাজার বাঙ্গালী আছে। সুতরাং বঙ্গের অন্য সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কলিকাতাতেই তাহার প্রায় চারিগুণ হিন্দুস্থানী আছে। বারাণসী জেলা হইতে ১২০০০ লোক আসিয়াছে, আজমগড় হইতে ৯০০০, গাজীপুর হইতে ৯০০০, জোনপুর হইতে ৭০০০। সমস্ত রাজপুতানা হইতে আসিয়াছে ২১০০০; তন্মধ্যে জয়পুর হইতে ৮০০০ এবং বিকানীর হইতে ৭০০০। পঞ্জাব হইতে আসিয়াছে ৯০০০, আসাম হইতে ৫০০০, বোম্বাই হইতে ৫০০০, মধ্যপ্রদেশ হইতে ৩০০০, মান্দ্রাজ হইতে ৩০০০ এবং মধ্যভারত হইতে ১০০০।

ভারতের বাহিরে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়াছে ৫০০০। তন্মধ্যে চীন হইতে ২৫০০, আফগানীস্থান হইতে ৫৪২, এবং নেপাল হইতে ৭৫৮। সেন্সস্ রিপোর্টে নেপালকে ভারতবহির্ভূত ধরা হইয়াছে। আমরা তাহা মনে করি না।

ইউরোপ হইতে আসিয়াছে ৭৬৩০ জন, তন্মধ্যে বিলাত হইতে ৬৫৭১, জার্ম্মেনী হইতে ২৫৬, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী হইতে ১৪২, ফ্রান্স হইতে ১১৪ এবং রুশিয়া হইতে ১১২।

কলিকাতার হিন্দুর সংখ্যা ৬০৪৮৫৩, মুসলমানের ২৪১৫৮৭ এবং খৃষ্টানের ৩৯৫৫১। খৃষ্টানদের মধ্যে ১১০৭৭ ভারতীয়, ১৪২৯৭ ইউরোপীয় এবং ১৪১৭৭ ফিরিঙ্গী।

কলিকাতায় ১০০০ পুরুষের স্থলে ৪৭৫ জন নারী আছে। সহরতলীতে এই অনুপাতে ১০০০ পুরুষ ও ৬৩২ নারী। পুরুষনারীর এই অত্যধিক সংখ্যার অসাম্য হইতে ইহা সহজেই জানা যায় যে এখানে বহু লক্ষ পুরুষ পরিবারী হইয়া বাস করে না। কলিকাতায় দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবের ইহা একটি প্রধান কারণ।

পাঁচ বৎসরের কম বয়সের ৩৩১টি শিশু বিবাহিত, এবং ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক ২৯০৩টি শিশু বিবাহিত! বিবাহিত লোকদের মধ্যে শতকরা ৬ জন বিপত্নীক, কিন্তু বিবাহিতা নারীদের মধ্যে প্রতি ২জন সধবায় ১ জন করিয়া বিধবা আছে।

হিন্দুজাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ১০৭১৪১, কায়স্থ ৮৬৬৪৪, কৈবর্ত্ত ৪৩৯৭০, চামার ৩৩৮০৮, গোয়ালা ৩১৪৮০, সুবর্ণ বণিক ২৮৭৮০, কাহার ২৪০০৬, তাঁতি ২১৭৫১, তেলি ও তিলি ২০৬৪৬।

কলিকাতায় ৫১টি ভাষায় লোকে কথা বলে। তন্মধ্যে ২৮টি ভরেতীয়। ৯টি এশিয়া ও আফ্রিকার ভাষা, তাহাতে মোট ৫০৭৬ জন কথা কয়। মোট ৯৩৬৬ জন লোক ১৪টি ইউরোপীয় ভাষায় কথা কহে।

অর্দ্ধেক লোক অর্থাৎ ৫১২৫৭৯ বাংলা বলে, এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৬৫৩৩৯ হিন্দী বলে, শতকরা ৭ জন অর্থাৎ ৭০৫৫৮ উর্দ্দু বলে, ৬১১৫৩ ওড়িয়া, ৮৯৭৮ মাড়োয়ারী, ২৮০২ গুজরাতী, ১৭৪৩ পঞ্জাবী, ১৭০১ তামিল এবং ১৪৬৯ তেলুগু। ইংরাজী বলে, ২৮৪৩০ জন, চীনা ২৬১১, ফরাসী ৭৯১, আরবী ৬৫৬।

যেখানে পাঁচজন পুরুষ লিখিতে পড়িতে জানে সেখানে কেবল একজন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে। পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ লিখনপঠনক্ষম, মেয়েদের এক-সপ্তমাংশ।

হাজার-করা লিখন-পঠনক্ষমের সংখ্যা।

	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
ব্রাহ্ম	৮৩৮	৮৬২	৮১৩
পার্সি	৮২৩	৮৭১	৭৪৩
খৃষ্টান	৮০০	৮২১	৭৭৩
ইহুদী	৬৯৩	৭৪৪	৬৪৫
জৈন	৬০৮	৭৬২	১৩৮
বৌদ্ধ	৫০৯	৫৬৪	২৯৯
শিখ	৫০১	৫৮৮	৮৮
কংফুচ-পন্থী	৩৫৮	৩৯৫	১৩৫
হিন্দু	৩২৭	৪২২	১৩৮
মুসলমান	১৫৩	২০৭	৩২

বৈদ্যদের মধ্যে শতকরা ৬৯ জন লিখিতে পড়িতে জানে, কায়স্থ ৬০, ব্রাহ্মণ ৫৭, আগরওয়ালা ৪১, গন্ধবণিক ৪৫, ওসওয়ালা ৫৪॥০, সুবর্ণবণিক ৪৫। বৈদ্যনারীদের মধ্যে শতকরা ৪৯ জন লিখনপঠনক্ষম, কায়স্থনারী ৩৩, ব্রাহ্মণনারী ২৭। বাগ্দী, চামার, ধোবা, ডোম, দোসাদ, কাওরা এবং মুচিদের মধ্যে শতকরা দশজনেরও কম লেখাপড়া জানে, আবার চামার, ডোম, কাওরা এবং মুচিদের শতকরা ৫ জনেরও কম লিখনপঠনক্ষম।

কলিকাতা ও সহরতলীর কল কারখানাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যের কল কারখানা প্রায় সমস্তই ভারতবাসীর অধিকৃত :—দাঁড়দড়া, কড়িকাঠ, ছাপাখানার

হরফ, পিত্তলের জিনিষ, তেল, সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য, ময়দা, চাল, চিনি, ছাতা, সুরকি। অধিকাংশ লোহা-ঢালাই কারখানা, লৌহ ইস্পাতের জিনিষ নির্ম্মাণের কারখানা, পাট বস্তাবন্দী করিবার কারখানা, ও ছাপাখানার মালিক ভারতবাসী। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যবসা যে পাটের কল, নানাবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা, এবং এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, তাহাতে ভারতবাসীর মোটেই দখল নাই।

কলিকাতা ও সহরতলীর যে-সকল কল-কারখানায় ২০ বা ততোধিক লোক কর্ম্ম করে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

কলিকাতা ও সহরতলীতে ৫৭২ কল-কারখানা আছে। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ২৪ টার, ইউরোপীয় কোম্পানী ৯৪ টার, ভারতীয় কোম্পানী ৭ টার, ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মিলিত কোম্পানী ৪ টার স্বত্বাধিকারী। ৪৫২ জন ধনী ৪৫২টা কলকারখানার মালিক। ৪৫২ জনের মধ্যে ৮৫ জন ইউরোপীয়, ৭ জন চীনা, ১২ জন আগরওয়ালা, ১৬ জন বৈদ্য, ৬১ জন ব্রাহ্মণ, ৬ জন ব্রাহ্ম, ২০ জন কলু, ১২ জন কাঁসারী, ৬৫ জন কায়স্থ, ১২ জন চাষী কৈবর্ত্ত, ১৯ জন মাড়োয়ারী, ২৬ জন সদ্‌গোপ, ১৮ জন মুসলমান, ১০ জন সুবর্ণবণিক, ২৪ জন তাঁতি, ১০ জন তেলি, ১৮ জন তিলি ও ৪১ জন অন্য জাতীয়।

কলকারখানার শ্রেণী ও তাহার মালিকের বিবরণ।

কারখানা।	গবর্ণমেণ্ট।	ইউরোপীয়।	দেশীয়।	চীনা।
কাপড়ের কল		২	১	
তুলার বীজ ছাড়ান-কল		১		
সেলাইর সুতা			১	
পাটের গাঁটকসা কল		১০	১৪	
পাটের কল		৬		
দড়ীর কল			১১	
রেশমের কল		১		
রংএর কল		১		
চামড়া পরিষ্কার		৫	১	
হাড়চূর্ণ		২	১	
অস্ত্র		১		
চামড়া		৪		
কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য		৩		১
কাষ্ঠ			৪	১
লোহার ঢালাই		৩	৮	
লোহা ও ইস্পাত		৩	১০	
অস্ত্র	১	৩		
গোলাগুলি	১			
মিউনিসিপাল কারখানা	১			
তালা সিন্দুক			১	
কল তৈয়ার	১	১৬	৩	
অক্ষর তৈয়ারী			১২	
পিতলের দ্রব্য			১২	
অভ্র		১		
টাঁকশাল	১			
টিনের কারখানা			১	
কাচের কারখানা			১	
চীনা মাটীর দ্রব্য			১	
ইট ও টালি		১		
দেশলাই			১	
কার্ড-বোর্ড		১		
সোড়াওয়াটার প্রভৃতি		৬	৬	
রং তৈয়ার			১	
তৈলের কল		২	৯৭	
সাবান		১	৫	
লাক্ষা		২	১	
রাসায়নিক দ্রব্য		২	৭	
সুগন্ধ দ্রব্য			১	
পেন্সিল			১	
চিঠির কাগজ		১	২	
বিস্কুট			৪	
ময়দার কল			১৮	
চাউলের কল		১	২০	
রুটী		১		
গোশালা		১		
মদ		১		
চিনির কল		১	৮	
জলের কল	৫			
মিঠাই			১০০	
চুরুট		১	৪	
পশ্বাদির খাদ্য		২	২	
মোজা, গেঞ্জি	১		১০	
জুতা	৪		৩	৩০
ছাতা			১৪	
দর্জ্জি	১	৭	১২৫	
গৃহসজ্জা		৪	৯	১
মার্ব্বেল		৪	১	
সুরকি		৩	১৬	
চুন		৫		

কারখানা।	গবর্ণমেন্ট।	ইউরোপীয়।	দেশীয়।	চীনা।
রেলওয়ের কারখানা	১	৩		
ট্রামওয়ে		২		
গাড়ী		৮	১০	
মোটর		৭	৫	
বাইসাইকেল		১	১০	
জাহাজ তৈয়ারি	১	২		
নদীর মাটীকাটা		১		
বরফ		৩	২	
টেলিগ্রাফ	১			
গ্যাস ও তাড়িত আলোক		৫	২	
ছাপাখানা	৬	২৮	১৫০	
জহরাৎ		৩	৭০	
ফটোগ্রাফ	১	৩	১০	
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও বাজনা	১	৫	২	
ঘড়ী		২	১০০	
বই বাঁধা			১০০	

পূর্ব্বে যে-সকল ব্যবসায় ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন সেই-সকল ব্যবসায় হইতে ইউরোপীয়গণ দূরীভূত হইয়াছে, এবং ভারতবাসীরা তাহা চালাইতেছে। এবং নূতন নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

১৯১১ সালে মোটর গাড়ীর কারখানা ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইত। কিন্তু ইহার পর বাঙ্গালীদের দ্বারাও এক বৃহৎ মোটরগাড়ার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চাউল ও ময়দার কল ইউরোপীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ১৮টা ময়দার কলের সমস্তই ভারতবাসী দ্বারা এবং ২১টা চাউলের কলের মধ্যে ১টা ইউরোপীয় ও ২০টা ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

পাটের কারবারই কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারবার, পাটের কলে এবং পাট বস্তাবন্দী করিবার কারখানায় ২০,০০০০ লোক কাজ করে।

১০৫টি কারবার কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত; তন্মধ্যে কেবল সাতটিতে ভারতীয় পরিচালক (ডিরেক্টর) আছে।

কলিকাতার ২৫৩২১০জন লোক অর্থাৎ সিকি লোক, কোন-না-কোন প্রকার কারখানায় কাজ করিয়া বা জিনিষ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ১৯০৮৩৬ জনের ব্যবসা দ্বারা ভরণপোষণ হয়। রেল আদি যান দ্বারা মানুষ ও জিনিষ বহন কার্য্যে ১২৬৩৩০ জনের প্রতিপালন হয়। সরকারী চাকরী এবং বিদ্যাসাপেক্ষ কার্য্য দ্বারা তদপেক্ষা ৩০০০ কম লোকের ভরণপোষণ হয়। ১১৭,৭৬৩ পাচক, দারোয়ান ও দাসদাসীর কাজ করে।

নিজ কলিকাতায় বেশ্যার সংখ্যা ১৪২৭১। তন্মধ্যে নিজ কলিকাতায় থাকে ১২৮৪৮ জন এবং সহরতলীতে ১৪২৩ জন। কলিকাতায় মোট নারীর সংখ্যার মধ্যে শতকরা সাড়ে চারিজন বেশ্যা। যাহারা নিজে উপার্জ্জন করিয়া খায়, এরূপ স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ২১ জন বেশ্যা। দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৬ জন পতিতা। ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কাদের মধ্যে শতকরা ১২ জন পতিতা। দশবৎসরের কম বয়সের ১০৯৬ জন বালিকা বেশ্যার আশ্রয়ে বাস করে। কলিকাতার এই যে বেশ্যার সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা যাহারা সম্পূর্ণ নির্লজ্জভাবে আপনাদিগকে বেশ্যা বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাদেরই সংখ্যা। নতুবা বাস্তবিক পতিতা নারীর সংখ্যা আরও বেশী; কেননা অধিকাংশ চাকরাণী এবং বহুসংখ্যক পাচিকা বাস্তবিক অসচ্চরিত্রা। বেশ্যাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন হিন্দু। কলিকাতার সমগ্র বাসিন্দার মধ্যে মোটামুটি শতকরা ষাট জন হিন্দু। সুতরাং হিন্দুবেশ্যা এত বেশী কেন, তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া রোগের প্রতিকার করা আবশ্যক। ২৯৬২, এক-পঞ্চমাংশের উপর, কৈবর্ত্ত, ১৭৭০ বৈষ্ণব, ১৪০৮ কায়স্থ, ৮৪৪ সদ্গোপ, মুসলমানশেখ ৮০৩, ২২ ইউরোপীয়, ৪৯ ইহুদী, ৫৫ জাপানী, এবং ৩০ রুশীয়। অধিকাংশ পশ্চিম-বঙ্গ হইতে, বিশেষতঃ মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে। কিম্বা কলিকাতা চব্বিশ-পরগণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কেবল ৩২২ জন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত। ৭৪৪ জন বেহার ও উড়িষ্যা হইতে এবং ৪০৯ জন উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়াছে।

৫৬২৪ জন ভিখারী আছে। তাহার দুই-পঞ্চমাংশ কলিকাতা বা ২৪ পরগণায় জাত। বাকী বেশীর ভাগ বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের লোক। ২২৪৬ জন মুসলমান।

পাটের কলে হিন্দু মুসলমান শ্রমজীবীর অনুপাত ৫ : ৪। কসাই প্রায় সব মুসলমান। পাঁওরুটীওয়ালাও প্রায় তাই। রাজমিস্ত্রী ২জন মুসলমান ১ জন হিন্দু এইরূপ। ছাপাখানায় হিন্দু-মুসলমান ৪ : ৫। তামাক বিক্রেতাদের মধ্যে মুসলমান বেশী। জাহাজের ভারতীয় খালাসী প্রায় সব মুসলমান। মাঝিদের অধিকাংশ তাই। গাড়ীর মালিক ও গাড়োয়ান, ঠিকা ঘোড়ার-গাড়ীর মালিক, কোচম্যান ও সহিস অধিকাংশ মুসলমান।

হিন্দুজাতিদের মধ্যে কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করে খুব কম লোকে। বৈদ্যদের মধ্যে চিকিৎসক এক-পঞ্চমাংশ;

ঠিকাদার কেরাণী, ইত্যাদিরও অনুপাত ঐরূপ। ৮ জনের মধ্যে ১ জন ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করে, এক-পঞ্চমাংশ পাচক বা দরোয়ান প্রভৃতির কাজ করে, এবং এক-ষষ্ঠাংশ ব্যবসা করে। কায়স্থদের দুই-পঞ্চমাংশ লিখনজীবী, এবং এক-পঞ্চমাংশের অধিক বাণিজ্য বা কলকারখানার কাজ করে। তাঁতি ও জোলাদের কৌলিক ব্যবসা কাপড় বুনা; কিন্তু কলিকাতার তন্তুবায়দের মধ্যে শতকরা সাড়ে পাঁচজন কাপড় বুনে, এবং জোলাদের শতকরা ৪ জন তাহাদের জাত-ব্যবসা করে।

শ্রাবণ-স্তুতি

বাসব-ভবন হতে এসো নামি বিলাসী শ্রাবণ,
নটবর হে প্রেমপ্রবণ।
কলকণ্ঠে কল্লোলিনী দূতী তব শ্রোণিভারানতা
দুকূল দোলায়ে চলি দিগ্‌দিগন্তে বহিছে বারতা।
সাজিল গগনরাণী এলোকেশে বিজলীর সাজে,
কপোলে চুম্বন দিলে—মেঘে ম্লান চাঁদ হয়ে রাজে।
প্রকৃতিরে সাজাইলে শ্যামশষ্প-স্মিত-শোভা দিয়া,
কদম্ব কেতকে কত কুসুমেতে কবরী ভূষিয়া।
বনান্ত-বসন চুমি মুগ্ধ অলি মাতিছে গুঞ্জরি!
কর্ণে দেছ অর্জ্জুন-মঞ্জরী।

পর ক্ষণে তোমা হেরি হে শ্রাবণ রাখালের বেশে
ইন্দ্রধনু-শিখীচূড়া কেশে।
শাওলী ধবলী ধেনু ছাড়ি দিয়া শ্বেত শিলা পরে,
গলে বলাকার মালা বসে আছ উদাস অম্বরে।
তোমার বাঁশরী-তানে শিহরিয়া কুটজ আকুল,
সিন্ধু পানে ছুটে নদী সচকিয়া ভাঙিয়া দুকূল।
কদম্ব শিহরি কাঁপে কামনায় নিকুঞ্জ বিতানে,
কেতকি কতকি কথা কামিনীর কহে কানে কানে,
কি যেন ভুলিয়াছিল কার কথা আছিল পাশরি'
বাঁশীতানে স্মরিছে শিহরি।

তারপর একি হেরি যুবরাজ হে বীর শ্রাবণ
কোথা তব বিলাস-ভবন?
একি সাজে সেজে এলে ত্যজি বংশী বনফুলহার,
বর্ম্মে আবরিয়া তনু ধনুষ্পাণি, ধরি তরবার।
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে শতশত তুরঙ্গ কুঞ্জরে,
বৃংহণে হ্রেষণে অস্ত্র-ঝনঝনে রথের ঘর্ঘরে,
তোমার সমর-সজ্জা। নিনাদিছে কোদণ্ডটঙ্কার,
জ্বালায় বাড়ব-বহ্নি ভয়ঙ্কর উঠে হুহুঙ্কার,
দিগ্‌গজ-শির টুটি তরতরে ছুটে মদধারা,
স্বেদ ঝরে নভোরাজ্য ভরা।

এ মূর্ত্তি হেরিয়া তব রণমত্ত, মহান্ শ্রাবণ,
কাঁপিয়াছে ভয়ে ত্রিভুবন।
তব পথ ছাড়ি ধরা পার্শ্বে স্থিত জুড়ি দুই পাণি
দাঁড়ায় কুজনহীন ঊর্দ্ধদৃষ্টি নিস্পন্দ বনানী।
সন্তান ছুটিয়া গিয়া মাতৃবক্ষে লভিছে আশ্রয়,
প্রিয়েরে আঁকড়ি ধরে প্রিয়া সে যে কম্পিত সভয়
পথঘাট জনশূন্য রুদ্ধ দ্বার ভবনে ভবনে,
বিবরে, কোটরে, নীড়ে, পশুপাখী, মৃগ ঘোরবনে।
ধীরে চুপি নীল বাসে নামে উষা মানব-আলয়ে,
দিবসের আঁখি মুদে ভয়ে।

তারপর একি হেরি হে শ্রাবণ, হে প্রেমপ্রবণ,
ঢল ঢল লাবণ্য-প্লাবন।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন তব হেরি আজি নব নদীয়ায়,
শোভন সোনার অঙ্গ ধুসরিত পথের ধূলায়,
প্রেমাশ্রু ঝরিছে তব দরদর আনন্দ-উন্মাদে,
ভুবন বিভোর আজি সুমধুর মৃদঙ্গ-নিনাদে।
চরণ চুম্বনে তব ধন্য ধরা উঠেছে মাতিয়া,
চঞ্চল-চরণ-তলে শ্যামাঞ্চল দিয়াছে পাতিয়া,
বিটপী লতায় নদী পারাবারে প্রেম বিতরণ।
মেঘে মেঘে আজি আলিঙ্গন।

নাচিয়া উঠেছে বিশ্ব, একি দৃশ্য তোমার কীর্ত্তনে,
হৃদি নাচে তোমার নর্ত্তনে।
কল্লোলিনী কূলে কূলে নাচে ঐ উল্লাস-হিল্লোলে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে, তরী নাচে সাগর-কল্লোলে,
পল্লী-মালঞ্চের তলে নাচে সুখে পল্লী-বালাকুল,
জলভরা ক্ষেত্রে নাচে কৃষিজীবী আনন্দ-আকুল।
বায়ু সনে নীপশাখা ছিটাইয়া প্রেমবারি-কণা
লাবণ্য যৌবনে নাচে শিহরিয়া প্রকৃতি ললনা,
নাচিছে নিখিল জন তোমা সনে মর্ত্ত্য-অমরার,
তার সনে হৃদয় আমার।

তারপরে সবশেষে একি রূপে আসিলে শ্রাবণ,
শান্ত সৌম্য নয়নপাবন।
লম্বমান জটাজুট বক্ষশোভা শুভ্রশ্মশ্রুভার,
রুদ্রাক্ষ-বলয় করে, দীপ্তচক্ষু, করেতে ভৃঙ্গার।
যজ্ঞভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক ভালে ভাতি করিছে প্রকাশ,
পদ্মগন্ধী স্বেদবিন্দু সিক্ত করে কৃষ্ণাজিন-বাস,
মূর্ত্ত তপঃফল সম যজ্ঞ শেষে আঁখি ধূম্রাকুল,
ছিটাইলে শান্তি-বারি কমণ্ডলু হতে ফলফুল।
নিমেষে মুমূর্ষু বিশ্ব হের নব জীবন লভিয়া
পদতলে পড়িল নমিয়া।
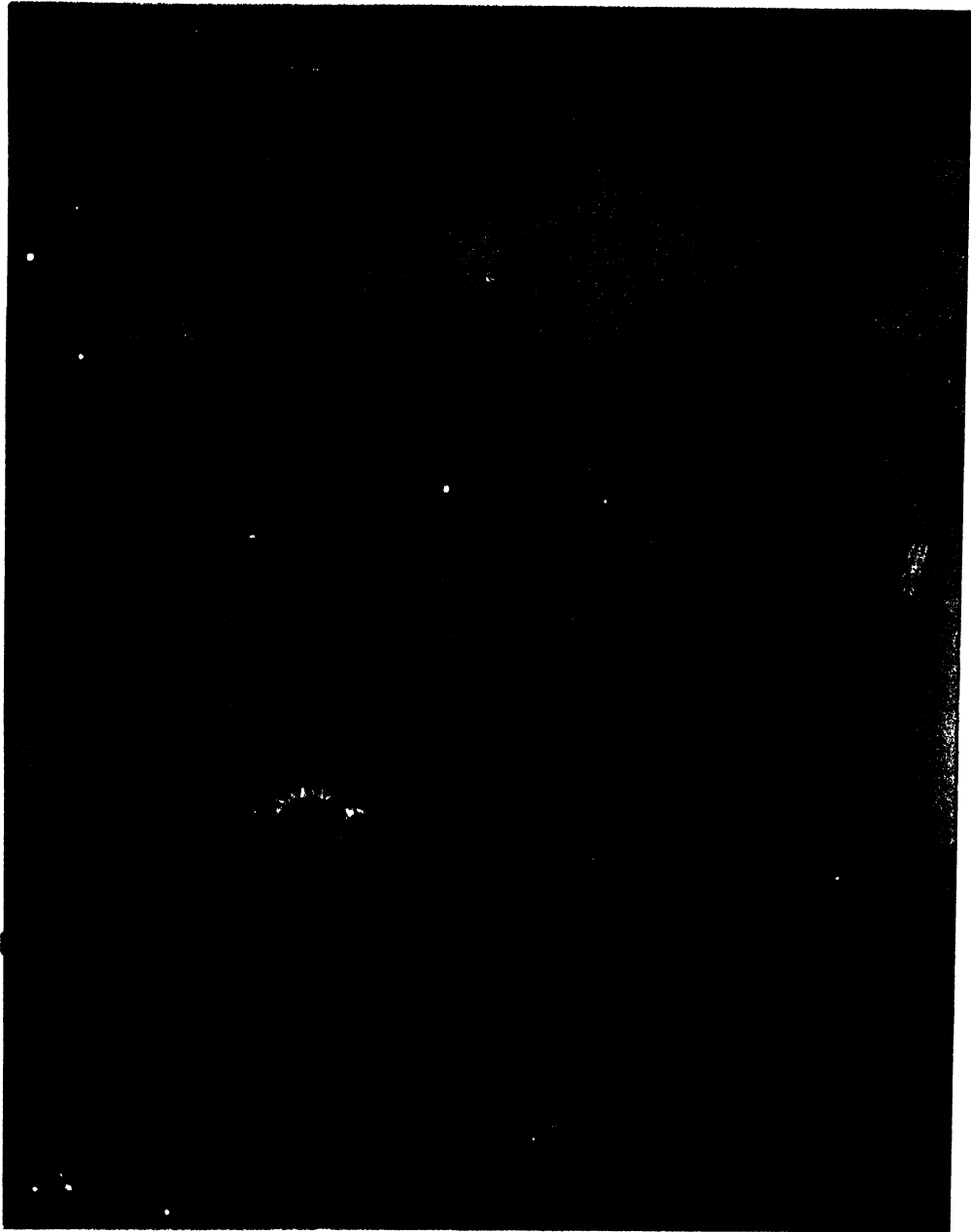
কচ ও দেবযানী।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে,

চিত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২০

৫ম সংখ্যা

পল্লী সংস্কার

সমাজ-সেবা-প্রণালী।

বাংলা দেশে এক্ষণে পল্লীগ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের দুঃখ দারিদ্র্য এবং অসংখ্য অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বহুসংখ্যক যুবক নানা স্থানে বিভিন্ন উপায়ে পল্লীবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের নীরব সাধনা আমাদের জাতীয় জীবনকে কি পরিমাণে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমাদের দেশের খুব কম লোকই ভাবিয়া দেখেন। দেশে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, সমাজের সমস্ত শক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত না হইলে এখন দেশে কোন কার্য্যই সফল হইবে না। দেশের শক্তি অল্প, এমত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেশের মঙ্গলবিধান করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে, একটি মাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা নির্ণয় করিয়া সেই পন্থাতেই সমাজের সমস্ত শক্তিকে চালনা করিতে হইবে তবেই গন্তব্য স্থানে শীঘ্রই পৌঁছান যাইবে।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" বলিয়া একটি মাত্র পথ অনুসরণের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের কথা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। কিন্তু আমাদের সমাজ এখনও এরূপ একটি ভাবে বিভোর হয় নাই, উহার গঠন-শক্তি এরূপ বৃদ্ধি পায় নাই, যাহাতে আমাদের সমগ্র চিন্তা ভাবনা কেবলমাত্র একটি সুমহান্ আদর্শ স্ফুরণের ইন্ধন যোগাইতে পারে, এবং সমস্ত কার্য্যপ্রণালী একই পবিত্র হোমানল-শিখা প্রদীপ্ত রাখিবার জন্য উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। এখন আকাঙ্ক্ষার প্রথম জাগরণ, এখন কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মশক্তি বিচার এবং বিশ্লেষণের অধিক প্রয়োজন নাই। কর্ম্মপ্রণালী যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে, কর্ম্মশক্তিও অতি ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে লজ্জা জন্মিবার কোন কারণ নাই। গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সমগ্র সমাজব্যাপী কর্ম্মশক্তির যাহাতে উদ্রেক হয়, বিচিত্র অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে সমাজের আকাঙ্ক্ষা বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। সমস্ত কর্ম্মপ্রণালী যে একমুখী বা পরস্পর-সম্বদ্ধ হয় নাই, তাহাতে আমাদের নিরাশার কোন কারণ নাই।

কিন্তু এখন হইতেই আমাদিগকে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে। বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মপ্রণালী যাহাতে এক বিপুল অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এবং এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে শক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত না হইলে আমরা শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখি না। ফলেরও বিশিষ্ট পরিচয় পাই না। কোন স্থানবিশেষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে

একটি মহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিভিন্ন শক্তিকে সেই আদর্শ অনুসারে চালনা করিতে হইবে; এইরূপে সমস্ত শক্তি এক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে, আমরা শীঘ্রই শক্তির পরিচয় পাই। আমাদের দেশে নানা স্থানে ক্ষুধিত এবং আতুরদিগের সেবা, দীন দুঃখীর প্রতিপালন, অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি যে-সকল কার্য্য নিত্য নিয়মমত নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার ফলে আমরা আমাদিগের স্বকীয় শক্তি ধীরে ধীরে অনুভব করিতেছি, আমাদের আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস এবং সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ইহাতে যে সমাজের বিশেষ পরিমাণে স্থায়ী উন্নতি সাধিত হয় নাই তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইজন্য আমাদের কর্ম্মীগণ যাহাতে সমাজ-শক্তির প্রয়োগের সুফল শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে সেই উপায়ই উদ্ভাবন করিতে হইবে।

পল্লী-জীবনের অবনতি।

আমাদের সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে হইলে পল্লীগ্রামে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, কারণ আমাদের জীবন পল্লীগ্রাম লইয়াই। দেশের শতকরা ৯০ জন এখনও পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে, দুঃখের বিষয় তবুও আমাদের শিক্ষা বা সামাজিক যাহা কিছু আন্দোলন হইয়াছে তাহা কয়েকটি সহরে আবদ্ধ রহিয়াছে। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আপনাদের ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন তাঁহারা স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় হারাইয়া ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া পড়িতেছেন, অপরদিকে পল্লীবাসীরাও তাঁহাদের সাহচর্য্য এবং সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছে। কয়েকটি সহর খুব স্ফীত হইয়া উঠিতেছে,—সহরের স্ফীতদেহ স্বাস্থ্য নহে ব্যাধিরই চিহ্ন। সহরগুলি স্বাধীন ব্যবসায়ের বা জীবিকানির্ব্বাহের কর্ম্মভূমি না হইয়া চাকরীস্থান হইয়াছে। চাকরীর সংখ্যা বা মাহিয়ানা বৃদ্ধি পাইতেছে না, অথচ দেশময় মূল্যাধিক্য, বিশেষতঃ সহরে আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য বিভিন্ন কারণে এত অধিক হইয়াছে যে, সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের আয় কমিয়া গিয়াছে অথচ মাহিয়ানা বৃদ্ধির বিশেষ আশা নাই। উপরন্তু তাঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থা ক্রমশঃ বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের উচ্চজাতি সমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে তাহার কারণ মধ্যবিত্তেরা দারিদ্র্য-হেতু আধুনিক চালচলন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁহাদিগকে গ্রামের স্বাধীন জীবিকা এবং নির্দ্দিষ্ট আয় ত্যাগ করিয়া সহরেই যাইতে হইবে। গ্রামবাসীর মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান এবং সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং পল্লীজীবনে বিদ্যাচর্চ্চা, কথকতা, যাত্রা, সঙ্কীর্ত্তন, প্রভৃতির আদর কমিয়া গিয়াছে। গ্রামে দলাদলির ভাব প্রবল হইতেছে, গ্রামের মণ্ডল মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতে পারিতেছে না। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সহকারিতার অভাব দেখা গিয়াছে। গ্রামে জল সরবরাহ বন্ধ হইতেছে কিন্তু ইহার প্রতিকার হইতেছে না। গ্রামের পথঘাট অমার্জ্জিত এবং অপরিস্কৃত, পুষ্করিণী সমূহ অসংস্কৃত। গ্রামবাসীগণ স্বাবলম্বন হারাইতেছে। গ্রাম বনজঙ্গলময় হইতেছে, বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে না। ম্যালেরিয়া বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে, গ্রাম্য শিল্পসমূহ ইউরোপের কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতায় অপারগ হইয়া বিধ্বস্ত হইতেছে। গ্রামের যাহা কিছু মূলধন তাহার দ্বারা বিদেশে শস্যরপ্তানির সুবিধা হইয়াছে। শস্য-ব্যবসায় ক্রমশঃ বিদেশী বণিকদিগের হস্তগত হওয়ায় গ্রামে অন্নাভাব থাকিলেও শস্য রপ্তানি হইতেছে।

পল্লীগ্রামের বৈষয়িক জীবন এখন কেবলমাত্র বিদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতেছে, পল্লীগ্রামের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবন আর

নাই, কোন্ দূর শতাব্দী হইতে পল্লীগ্রামের উপর দিয়া যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহা এখন অবরুদ্ধ হইয়াছে. যুগযুগান্তকালের সমস্ত চিন্তা এবং সাধনা এখন লুপ্তপ্রায়,—জাতীয় জীবন এখন কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে, অতীতকালের সাধনা হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশী সভ্যতার জন্মস্থানে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ যেখানে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা এখন পরিত্যক্ত। পল্লীগ্রামের দেউল এখন ভগ্ন, অসংস্কৃত এবং দেবতাশূন্য। পল্লীদেবতার আরাধনার সহিত আমাদের পল্লীগতপ্রাণ জাতীয় সাধনারও লোপ হইতেছে।

পল্লী-সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

সমাজের এখন পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভগ্ন দেউল সংস্কৃত করিয়া পুনরায় সেখানে দেবতা বসাইতে হইবে। জাতীয় সাধনার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সমূহের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। এ তীর্থের রক্ষক এবং পূজারী কাঁহারা হইবেন? যাঁহারা দেবতার কবচ পরিধান করিয়া মস্তকে দারিদ্র্য-কিরীট ধারণ করিয়া জাতীয় সাধনা জাগ্রত করিবার জন্য নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে পল্লীবাসী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিবেন। আপনাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তার যন্ত্রী অনুভব করিয়া যাঁহাদের শক্তি অদম্য এবং অসীম হইবে এবং যাঁহাদের প্রত্যেক সেবাকার্য্য ও অনুষ্ঠান দীনবন্ধুর চরণপূজা রূপে উপলব্ধি হইবে। অনন্ত কষ্ট-স্রোতের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিবেন অথচ কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের অনন্তের নিবিড় উপলব্ধির কোন ব্যাঘাত হইবে না। একদিকে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ এবং অপর দিকে কর্ম্মনিষ্ঠ, একদিকে জ্ঞানী অপরদিকে বিষয়াভিজ্ঞ অক্লান্ত কর্ম্মী,—তাঁহারাই আমাদের পল্লীগ্রামের জাতির অন্তরতম প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

উদ্দেশ্য।

সমাজের শ্রমজীবী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইঁহারা কোন্ কর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহাই এখন আলোচ্য। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হয়। পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীগণকে স্বাবলম্বন শিখাইতে হইবে। নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীগণ পরস্পরের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব পূরণ করিবে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষিব্যবসায়ের এবং বাণিজ্যের ধুরন্ধর এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। বণিজ্য ব্যবসায় যাহাতে পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হয় তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এবং শিক্ষা যাহাতে পল্লীবাসীগণের বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হয়, তাহারও উপায় বিধান করিবেন। গ্রাম্য শিল্পকলা, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদ এবং ক্রিয়া কর্ম্ম যাহাতে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের চিন্তাজীবন এরূপে স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারিবে। পল্লীগ্রামের সমস্ত অভাব পল্লীগ্রামবাসীদের দ্বারাই পূরণ করিতে হইবে। একদিকে ইহাতে যেমন পল্লীবাসীদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে তাহারা নিজ নিজ অভাব মোচন করিয়া আনন্দ এবং সুখলাভ করিতে পারিবে। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ উহাদের উপঢৌকন লইয়া পল্লীবাসীর নিকট উপস্থিত হইবে। দেশের যে-সমস্ত ধনসম্পদ এবং বিদ্যাগৌরব এখন কেবল মাত্র সহরেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে, তাহা না হইয়া সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহার ফলে সমগ্র সমাজের বিদ্যোন্নতি এবং আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে।

কর্ম্মকেন্দ্র—পল্লী-ভাণ্ডার।

এ কার্য্য সফল করিবার জন্য ধীর আয়োজন চাই। ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে ধীরে ধীরে বৃহৎ অনুষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। কি উপায়ে গ্রামে গ্রামে এরূপ কার্য্যের সূচনা হইবে তাহা এক্ষণে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই প্রকার কার্য্যারম্ভ কিয়ৎ পরিমাণে দেখা গিয়াছে।

প্রথমে পল্লীবাসীগণের দৈনন্দিন অভাব মোচন করিবার জন্য গ্রামে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত গ্রামবাসী অথবা গ্রামের কোন হিতৈষী ব্যক্তি কিছু টাকা তুলিয়া গ্রামে পঞ্চায়ৎগণের হস্তে উহা অর্পণ করিবে। পঞ্চায়ৎগণ ঐ অর্থ লইয়া বস্ত্র, চিনি, লবণ, ঘৃত

প্রভৃতি নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিবে। যেখানে যে দ্রব্য অতি সুবিধা দরে পাওয়া যাইবে সেই স্থান হইতে উহা ক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে। দ্রব্যসমুহ পাইকারীদরে গ্রামবাসীগণের নিকট বিক্রয় করা হইবে। জমিদারগণের নিজেরই দোকান বলিয়া তাহারা সকলেই সময়ে সময়ে উহার তত্ত্বাবধান করিবে। দোকানদারেরা সচরাচর খুচরা দরে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে লাভ করিয়া থাকে সেই লাভ দোকানের মুলধনে পরিণত হইবে, শেষে গ্রামবাসী খরিদদারগণের মধ্যে উহা বিতরিত হইবে।

ভাণ্ডার কর্তৃক প্রবর্তিত শিল্প-কৃষি-কার্য্য।

এই ভাণ্ডারে বিক্রয় খুব অধিক হইলে পঞ্চায়েৎগণ শিল্পী নিযুক্ত করিয়া দ্রব্য প্রস্তুতকরণের ভারও গ্রহণ করিবেন। তখন অন্য কোন সহর বা বাজার হইতে দ্রব্য আমদানী করিতে হইবে না, অথচ গ্রাম্য শিল্পসমূহেরও উৎসাহ দেওয়া হইবে। গ্রামের তাঁতি ও কামার গ্রামের ভাণ্ডারেই তাহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্য পাঠাইয়া দিবে এবং ভাণ্ডার হইতে উহাদিগের আহার্য্য ও বস্ত্রাদি পাইবে। গ্রামের কৃষকগণ ভাণ্ডার হইতে মূলধন কর্জ্জ লইবে। ঐ মূলধনে তাহাদের কৃষিকার্য্য চলিতে থাকিবে। কৃষকগণ সমবেত হইয়া কর্জ্জ লইবে, প্রত্যেক কৃষক অন্য কৃষকের কর্জ্জের জন্য ভাণ্ডারের নিকট দায়ী থাকিবে। ইহার ফলে সকলেই সকলের কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবে, ভাণ্ডার হইতে কৃষক যে মূলধন লইবে তাহার যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় উহা প্রত্যেককেই দেখিতে হইবে। একজন কৃষকের কর্জ্জের জন্য অপর সমস্ত কৃষক দায়ী থাকে বলিয়া মুলধন নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, ইহার ফলে কর্জ্জের সুদ খুব অল্প হইবে।

ভারতবর্ষে গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে কর্জ্জ দিবার জন্য এই প্রকার অনেকগুলি ঋণ-দান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০৪ সনে এদেশে ঋণ-দান-সমিতির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত তালিকা পড়িলে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি আমরা বুঝিতে পারিব,—

১। বৎসর	২। সমবায় সমিতির সংখ্যা	৩। সভ্য	৪। মূলধন
ক। ১৯০৬	৮৪৬	৯১,৩৪৩	২১,৩১,২৫৬৲
খ। ১৯১১	৮,১৭৭	৪০,৩০০০	২,০২,৬৮,১৩৩৲

অধিকাংশ সমবায়-সমিতিগুলিই ঋণ-দান-সমিতি। জার্ম্মানী প্রদেশে স্বদেশবাসী দরিদ্র কৃষকগণের দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে রাইফেজেন যে যৌথ-ঋণ-দান পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন উহাই এদেশে সমবায়-আন্দোলনের সূচনাকালে গভর্ণমেণ্ট অনুকরণ করিয়াছিলেন। রাইফেজেনের পদ্ধতি গভর্ণমেণ্ট এখনও অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেছেন। এই কারণে ঋণ-দান-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষকগণ ঋণ গ্রহণে সুবিধা পাইলেই যে উন্নতি লাভ করিবে তাহা নহে। তাহাদের কৃষিকার্য্যের যদি উন্নতি না হয় এবং তাহারা যদি উৎপন্ন শস্য যথোচিত মূল্যে বিক্রয় না করিতে পারে তাহা হইলে কৃষকগণের স্থায়ী উন্নতি হওয়া অসম্ভব। একারণে জার্ম্মানী প্রদেশে রাইফেজেন কৃষকদিগকে কর্জ্জগ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়াই সন্তুষ্ট না থাকিয়া উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ এবং শস্যোৎপাদনের জন্য সার এবং যন্ত্রাদি সংগ্রহ এবং শস্যবিক্রয়েরও সুবিধা দান করিয়াছিলেন। রাইফেজেনের পর ডাক্তার হাস নানা প্রকার যৌথ-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু জার্ম্মানীতে নহে, ইউরোপের অন্য প্রদেশেও যৌথ-ঋণদানের সহিত যৌথ-ক্রয়েরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইবে:—

	যৌথ-ঋণদান	যৌথ-ক্রয়	অন্য প্রকার যৌথ-দ্রব্যোৎপাদন
১। জার্ম্মানী	১৮৫০-১৮৬০খৃঃ	১৮৬০খৃঃ	
২। ডেনমার্ক	নাই	১৮৬৬	
৩। আয়ারল্যাণ্ড	১৮৯৫	১৮৯০	
৪। ইংলণ্ড	নাই	১৯০০	
৫। সুইজারল্যাণ্ড	১৮৯০	১৮৮৬	
৬। ফ্রান্স	১৮৮৫	১৮৮৪	
৭। বেলজিয়াম	১৮৯২	১৮৯০	
৮। ইতালী	১৮৬৫	১৮৮৪	

ইউরোপের সমস্ত প্রদেশেই সমবায়-সমিতি কৃষকগণকে যেরূপ ঋণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান করিয়াছে, সেইরূপ তাহাদের জন্য পাইকারী দরে বীজ সার এবং কৃষিকার্য্যোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়া কৃষিকার্য্যের বিপুল উন্নতির সহায় হইয়াছে। যে-সমস্ত যন্ত্রের মূল্য খুব অধিক সেগুলি কৃষকেরা ক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু কোন এক গ্রামের সমস্ত কৃষক সমবেত হইয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং পরে সময়মত কৃষকেরাই আবশ্যকমত ব্যবহার করিতে পারে। আমাদের দেশে ঋণ-দান-সমিতিগুলির দ্বারা যে কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু কৃষকগণ কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করিয়া কি ফল লাভ করিবে? মহাজনদিগের নির্য্যাতন এবং অত্যাচার হইতে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিবে সত্য, কিন্তু তাহারা এখনও ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। উপরন্তু শস্যোৎপাদন কার্য্যে কোন উন্নতি না হওয়াতে এবং অধিকাংশ স্থলে ব্যাপারী এবং পাইকারগণ অতি সুলভ দরে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়াতে তাহাদের দারিদ্র্যের অবসান হইবে না। আমাদের দেশে শস্যোৎপাদনের জন্য বীজ, সার প্রভৃতি কৃষকেরা প্রায়ই ক্রয় করে না; উপযুক্ত বীজ এবং সারের ব্যবহারের উপকারিতা কৃষকেরা এখনও বুঝে নাই। তাহারা এই-সমস্ত দ্রব্য অজ্ঞ অথবা প্রবঞ্চক দোকানদারগণের নিকট হইতে ক্রয় করাতে তাহাদের পরিশ্রম সফল হয় না। অধিকন্তু শস্যোৎপাদন করিয়া তাহারা যে মূল্যে শস্য বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে শস্যের বাজার-মূল্য এবং যে-মূল্যে পাইকারগণ শস্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিয়া থাকে উহা বুঝা যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই কৃষকেরা দাদন পাইয়া থাকে, এজন্য মূল্যাল্পতা আরো বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

শস্য (একমণ)	দাদন	বাজার-মূল্য
পাট	৫।৹	৯৲
বুট	৫৲	৭৲
তিসি	১॥	২॥৹

সুতরাং সমবেত প্রণালীতে কেবলমাত্র কর্জ্জ গ্রহণ করিলেই যে কৃষকদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে তাহা নহে, শস্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে কৃষকদিগের অবস্থা কখনই উন্নত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট এ কথা না বুঝিলে সমবায়-আন্দোলনের দ্বারা আমাদের কৃষকগণের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ঋণদানের সুযোগ প্রদান করিলে নির্ধনতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দেশে এখন ধনবৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কর্জ্জগ্রহণের সুবিধা সৃষ্টি করিলেই কৃষকদিগের অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইবে না, এ কথা মনে রাখা আবশ্যক।

যৌথ-ক্রয়-বিক্রয়।

আমরা যে প্রকার সমবায় প্রতিষ্ঠার এক্ষণে আলোচনা করিতেছি উহাতে সমবায়-ভাণ্ডার কেবলমাত্র কৃষকগণকে কর্জ্জ দান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না। ভাণ্ডার কৃষকগণকে বীজ যন্ত্র সারাদি দান করিবে এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করিবে।

পল্লীগ্রামের শিক্ষা ও জীবিকা।

গ্রামের সমবায়-পরিষৎ পল্লীবাসীগণের শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিবেন। নৈশবিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীগণকে আধুনিক ব্যবসায়-বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারের সহিত পরিচিত করাইবেন। বিশেষতঃ যে কৃষি- এবং ব্যবসায়-বিজ্ঞানের দ্বারা পল্লীগ্রামে অর্থাগমের উপায় হইবে, উহাদের আলোচনা হইবে। পল্লী-পরিষৎ কৃষি-উদ্যানে নানাবিধ শস্য লইয়া বিবিধ সার এবং যন্ত্রাদির প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিবে। প্রদর্শনী খুলিয়া নূতন সার অথবা নূতন যন্ত্রের প্রচলনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিবে। এরূপে নূতন নূতন শস্য-সার এবং যন্ত্র কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। সমবায়-ভাণ্ডারের দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়, কর্জ্জদান অথবা শস্য-ব্যবসায়ে যাহা লাভ হইবে, তাহা হইতেই উক্ত অনুষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। অধিকন্তু বৈষয়িক অনুষ্ঠান ব্যতীত নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিও পল্লী-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

বিজ্ঞান-প্রচার ও নূতন ব্যবসায় প্রবর্ত্তন।

এরূপে গ্রামবাসীরাই গ্রামের শিক্ষা, দীক্ষা, বৈষয়িক এবং নৈতিক উন্নতির ভার গ্রহণ করিলে এক-একটি গ্রাম স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিবে। গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কত প্রতিভাবান ব্যক্তি যে আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া জগতের সম্মুখে তাঁহাদের প্রতিভা জ্ঞাপন করিবেন। গ্রামের কৃষি-বিদ্যালয়ে বীজ ও সার লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে একজন কৃষক হয়ত কোন নূতন আবিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্য সহজ করিয়া দিবে। কোন শিল্পী আপনার সামান্য কুটিরে বসিয়া অভিনব যন্ত্র অথবা কর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কার করিবে। ভদ্রসমাজের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণে চাকরীর আশায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিবার আর কোন কারণ পাইবেন না। গ্রামেই এক্ষণে বিজ্ঞানের আলোচনা হইবে, নূতন নূতন ব্যবসায়ও প্রবর্ত্তিত হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ রাজধানীতে বসিয়াই বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতেছেন, দেশের মাটী হইতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞানচর্চ্চা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। কাজেই একদিকে যেমন তাঁহাদিগের গবেষণা দেশের বিশেষ উপকারে লাগিতেছে না, অপরদিকে দেশবাসীরাও তাঁহাদিগকে আপনাদের করিয়া লইতে পারিতেছে না, তাঁহারা ইহাদের নিকট অপরিচিতই থাকিয়া যাইতেছেন। বিজ্ঞান যখন পল্লীতে পল্লীতে কুটিরে কুটিরে আলোচিত হইবে, যখন প্রত্যেক গ্রামই তাহার বিজ্ঞানাগারের জন্য গৌরব অনুভব করিবে, যখন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কৃষক এবং শ্রমজীবীগণের নিকট অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়রূপে পরিণত হইবে, তখন উহা মস্তিষ্কের একটা নীরস ধারণামাত্র না থাকিয়া জীবন্ত সত্যরূপে গৃহীত হইবে, দৈনন্দিন জীবনের সহিত উহার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিজ্ঞানকে আপনার করিয়া লইয়া সমাজ বৈজ্ঞানিকগণকে প্রকৃত সম্মান করিতে শিখিবে।

মধ্যবিত্তদিগের অন্ন-সংস্থান।

বৈজ্ঞানিকগণ হাতে-কলমে কাজ করিয়া দেশের প্রাকৃতিক শক্তি এবং দ্রব্যাদির যথোচিত ব্যবহার করিতে শিখিবেন। এরূপে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দেশের গাছ-গাছড়া ফুল ফল বীজ অথবা জন্তুর রোম চামড়া প্রভৃতি হইতে বিবিধ দ্রব্যের উপাদান প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে বনজঙ্গলে কতপ্রকার উপাদান-সামগ্রী যে নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈজ্ঞানিকগণ পল্লীতে পল্লীতে তাঁহাদের বিজ্ঞানাগারে এই-সমস্ত দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিবেন। তাঁহাদের পরীক্ষাই নূতন ব্যবসায় প্রবর্ত্তনের সহায় হইবে। কেবলমাত্র নূতন শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা নহে, বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কৃষি এবং শিল্পসমূহেরও উন্নতি সাধিত হইবে। অভিনব যন্ত্রাদি এবং সহজ কর্ম্মপ্রণালীর প্রচলন হইবে, ইহাতে কৃষক এবং শিল্পীগণের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবে। বিজ্ঞান এরূপে গ্রামে গ্রামে কৃষক এবং শিল্পীগণের প্রয়োজনে লাগিয়া উহাদের অর্থাগমের সহায় হইবে, এবং মধ্যবিত্তদিগের জন্য নূতন নূতন শিল্প-ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ খুলিয়া দিয়া চাকরী অপেক্ষা শ্রেয়স্কর উপায়ে অন্ন-সংস্থানের সহায় হইবে। গ্রামে পল্লী-পরিষদের অধীনে এবং বৈজ্ঞানিকগণের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা সমবায়-প্রণালীতে পরিচালিত হইবে। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের উপাদান প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি না হইয়া কারখানায় দ্রব্য-প্রস্তুত করণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে একদিকে যেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, অপরদিকে গ্রামে বিদেশ হইতে নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইবে। দেশে নূতন নূতন ধনবৃদ্ধির উপায় সৃষ্ট হইবে, সকলেই কৃষিকার্য্য অথবা চাকরীর জন্য নির্ভর করিয়া থাকিবে না।

পল্লী-পরিষদের কর্ম্ম।

ধন-বৃদ্ধির সহিত অর্থোৎপাদন-প্রণালীরও উন্নতি হইবে। শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমবায়-প্রণালী অনুসৃত হইবে। ইহার ফলে সমাজের মূলধন এবং শ্রমজীবী-শক্তির শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হইবে। কৃষক শিল্পী এবং শ্রমজীবীগণ সমবায়-পরিষদের অধীনে এবং নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবে। পরস্পর সহকারিতার উপকার বুঝিবে। এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁতি,

কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সমগ্র গ্রামবাসীগণের অভাব মোচন করিবার জন্য তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসায় অধ্যবসায়ের সহিত অনুসরণ করিতেছে, এবং পল্লী-গোষ্ঠীর নিকট হইতে পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি হইতে শস্য গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অনুগৃহীত বোধ করিতেছে; এখনও পল্লীগোষ্ঠীতে কৃষকগণ শস্যোৎপাদন কার্য্যে বিভিন্ন প্রকার সমবেত-কার্য্যকরণ-প্রণালীর অনুসরণ করিতেছে; বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজা, সংকীর্ত্তনাদি গ্রামবাসীগণের সমবেত পরিশ্রম ব্যয় এবং উৎসাহের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের মণ্ডলগণের বিচারকার্য্য শান্তিরক্ষা সমবেত-কার্য্যকরণে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি পল্লীবাসীগণের আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক গোষ্ঠী-প্রভাবের আধিপত্য এবং গোষ্ঠীর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একতা ও সমবেত কার্য্যানুষ্ঠান আমাদের সমাজের একটি প্রধান বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য সমাজ আধুনিক কালে যে সমাজতন্ত্রবাদ এবং সমবায়-বিজ্ঞান প্রচার করিতেছে তাহা আমাদের সমাজের নিকট নূতন হইবে না। কিন্তু আদর্শের দিক হইতে নূতন না হইলেও পাশ্চাত্য জগতে পল্লীগ্রামগুলি সমবায়-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছে তাহা আমাদের পল্লীসমাজের নিকট বিশেষ আশা এবং উৎসাহের কথা। পল্লীবাসীগণ পল্লী-পরিষৎ স্থাপন করিয়া গ্রামের সমস্ত অভাব সমবেতভাবে মোচন করিতে অগ্রসর হইবে। মণ্ডল অথবা পঞ্চায়ৎগণের প্রভাব কেবলমাত্র বিচার এবং শান্তিরক্ষা-কার্য্যে আবদ্ধ না থাকিয়া পল্লীবাসীগণের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনে লক্ষিত হইবে। পল্লী-পরিষৎ সমস্ত পল্লীবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ কৃষি শিল্প ব্যবসায় শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবে।

(ক) গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি জীবননির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করণ;

(খ) স্বাস্থ্যরক্ষা;

(গ) শিক্ষা (কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়);

(ঘ) ধর্ম্ম; যাত্রা, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি;

(ঙ) বিচার, গ্রাম্যবিবাদ সমূহের নিষ্পত্তি;

(চ) বনজঙ্গল পরিষ্কার এবং জল সরবরাহ;

(ছ) মনুষ্য এবং গোমহিষাদির জীবন বিমা;

(জ) জলসেচন, বাঁধ রক্ষা ও নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদ নদী সংস্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ;

(ঝ) ক্রয়বিক্রয়, বাণিজ্য; শস্য-গোলা রক্ষা, মূলধন সংগ্রহ;

(ঞ) আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়া, ব্যায়াম;

প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই গ্রামের পল্লী-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

দেশব্যাপী সমবায়-সমাজ গ্রামে গ্রামে যখন এইরূপ পল্লী-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিবে, তখন প্রত্যেকেরই পক্ষে আপনার উদ্দেশ্য সাধন আরো সহজ হইবে। বিভিন্ন গ্রামের পল্লী-পরিষৎগুলি ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা, নদ নদী সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবে, এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া সকলে একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমগ্র-দেশ-ব্যাপী এক বিপুল সমবায়-সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইবে। ইহার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়া শ্রমজীবীগণ এক নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাদের কর্ম্মশক্তি বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তাহারা স্বাবলম্বন শিক্ষা করিবে। এই প্রকারে পল্লীসমাজ প্রত্যেক বিষয়েই আত্মনির্ভর হইয়া এক নবযুগের উপাদান হইবে।

নবযুগের নূতন কর্ম্মী।

দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের হাতেই এই বিপুল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাবুকতা আছে, তাঁহারা এই কার্য্যকে স্বপ্নের অগোচর না ভাবিয়া বাস্তবজীবনে নিজ নিজ কর্ম্ম-শক্তির দ্বারা সফল করিবার জন্য প্রয়াসী হইবেন; তাঁহাদের অধ্যবসায় আছে, তাঁহারা ক্ষুদ্র আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের বিপুল উন্নতির বীজ লক্ষ্য করিবেন, অন্যান্য বাধাবিঘ্ন এবং

সফলতার অসম্পূর্ণতার মধ্যেও তাঁহারা নিরাশ না হইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন; এখন চাই তাঁহাদের মধ্যে ব্যাকুলতা, পরদুঃখকাতরতা, অনশনক্লিষ্ট অসংখ্য দেশবাসীগণের ক্ষুধায় ক্ষুধার তীব্র তাড়না অনুভব করা, কর্দ্দমময় দুষিত জল যাহারা পান করিতেছে তাহাদের দারুণ পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া; আর চাই কর্ম্মনিষ্ঠা, অসংখ্য নরনারীর অসংখ্য অভাব অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ধীর আয়োজন, উন্মাদনার পরিবর্ত্তে কঠিন সংযম, স্থির এবং সংযতভাবে জীবনের সমস্ত কর্ম্মকে এক মহান্ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত করা। যে সমাজ আধুনিক কালেও বিদ্যাসাগরের ন্যায় দীনদুঃখীর জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ও নিষ্কাম অধ্যবসায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরহিত-ব্রত ও কর্ম্মনিষ্ঠা, বিবেকানন্দের অদম্য তেজ ও উৎসাহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এখনও তাঁহাদের ধন্য জীবনের সাধনাকে জীবন্ত রাখিয়াছে, সেখানে নবযুগের নূতন কর্ত্তব্যপালনক্ষম সাধক কর্ম্মীগণের কখনই অভাব হইবে না।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বাদামি গিরিগুহা

অজণ্টা, এলিফাণ্টা ও ইলোরা প্রভৃতি গিরিগুহার বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও ছবি নানা সচিত্রপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য উহাদের কথা এখন অনেকেই জানেন। কিন্তু এই ভারতমাতার কোলে ঐরূপ অনুপম কারুকার্য্যমণ্ডিত অনাবিষ্কৃত আরও কত গিরিগুহা যে আছে তাহার সন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু সকল গুহার সম্যক পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার কুমারস্বামী, হাভেল, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহোদয়গণ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যজগতের জনসমাজে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেক মন্দির হইতে শিল্পকলার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাদামি গিরিগুহার চিত্রাবলী কেহ এখনও তত লক্ষ্য করেন নাই। এই গুহার চিত্রাবলী এযাবত সংগৃহীত অন্যান্য চিত্রাবলী অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। তাহার উপর অন্যান্য গুহামন্দিরের নির্ম্মাণকাল লইয়া বহু গবেষণা হইতেছে, কিন্তু কোনটাই মনোমত হইতেছে না। কিন্তু এই বাদামি গুহামন্দিরের নির্ম্মাণকাল একেবারে নিঃসন্দেহরূপে অবগত

বাদামি গুহার ২নং হইতে ৩নং গুহায় যাইবার সিঁড়ি।

হওয়া গিয়াছে। ৩নং গুহার একটী প্রস্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "শক রাজাদের আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর পরে রাজা প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মণের রাজত্বকালের দ্বাদশ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।" ইহা হইতে আমরা অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি যে ইহা ৫৭৮খৃঃ
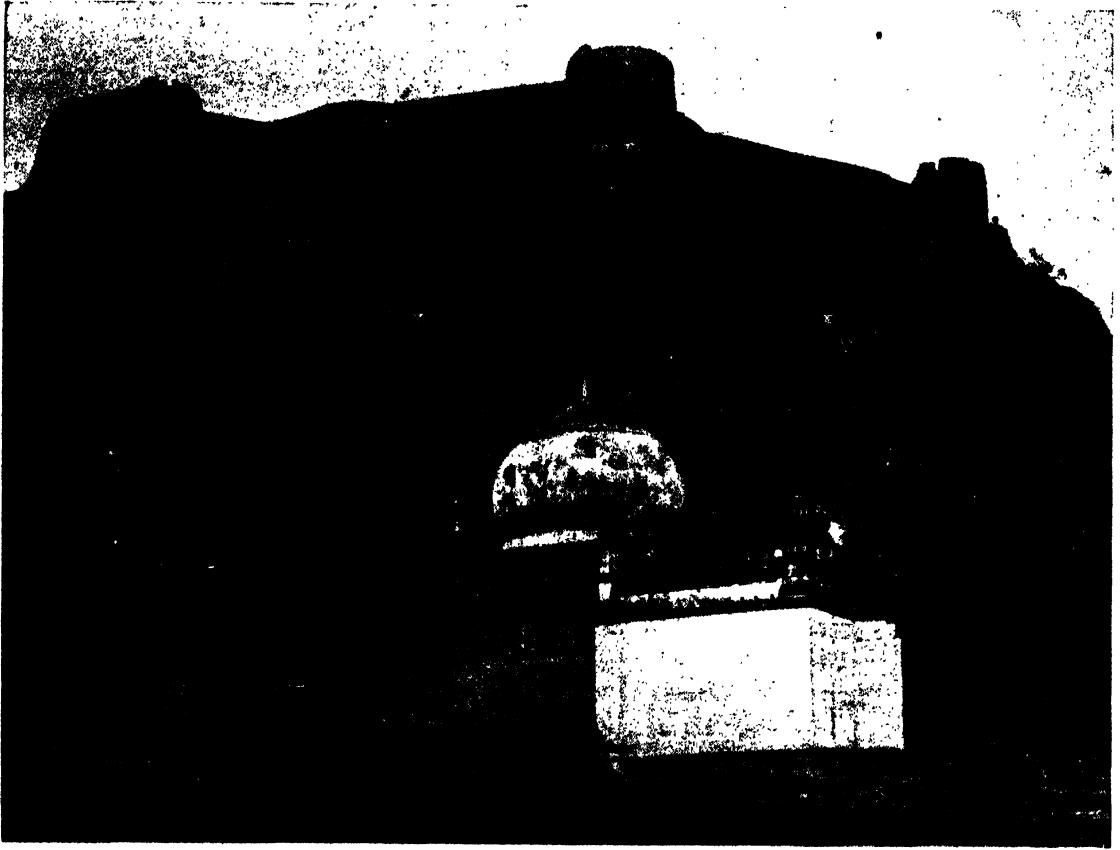
বাদামি দুর্গ।

নির্ম্মিত হইয়াছে। ফাগু'সন্‌ সাহেব বলেন, "এই মন্দিরটীর কারুকার্য্যাবলী দেখিলেই বুঝা যায় যে, তিনটীর মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রাচীন। কিন্তু এই তিনটীরই নির্ম্মাণ-কৌশলে এত সৌসাদৃশ্য আছে যে, প্রায় তাহারা একই সময়, খৃঃ ৫৭৫ হইতে ৬৮০ খৃঃ মধ্যে, নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।" যখন যে ধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটিয়াছে তখন সেই ধর্ম্মের মন্দির ইত্যাদিও অত্যধিক পরিমাণে নির্ম্মিত হইয়াছে। বাদামি গুহামন্দিরের চারিটীর মধ্যে একটীতে শৈব, দুইটীতে ব্রাহ্মণ্য ও একটীতে জৈন ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইহা হইতেই ফাগু'সন্‌ সাহেব ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইলোরার সহিত তুলনা করিলেও ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ইহাদের শিল্পচাতুর্য্য সকলের দর্শনীয়।

এখানে যাইবারও সুবিধা আছে। রেল-ষ্টেশন হইতে গুহাগুলি মাত্র দুইক্রোশ দূরে। ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়কে লিখিলেই তিনি অনুগ্রহ করিয়া গুহায় যাইবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই টোঙ্গার বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। যাইবার সময় বিজাপুর রাজ্যের ধ্বংসের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বাদামি সহর প্রাচীন হিন্দুপ্রভুত্বের ধ্বংস লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এখনও কোনও রকমে দাঁড়াইয়া আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম পুলকেশী পল্লভদের নিকট হইতে সহরটী কাড়িয়া লইয়া চালুক্যরাজধানী স্থাপন করেন। স্থানটীর অবস্থান এমন সুন্দর যে, শত্রুপক্ষ সহজে কিছু করিতে পারে না। এই দেখিয়াই পুলকেশী এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। একটী প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ১৩৩৯খৃঃ বিজয়নগরের রাজা হরিহরের রাজত্ব-কালীন দুর্গটী নির্ম্মিত হয়। অনেকে বলেন যে ইহা খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়

বাদামি দুর্গের পরিখা।
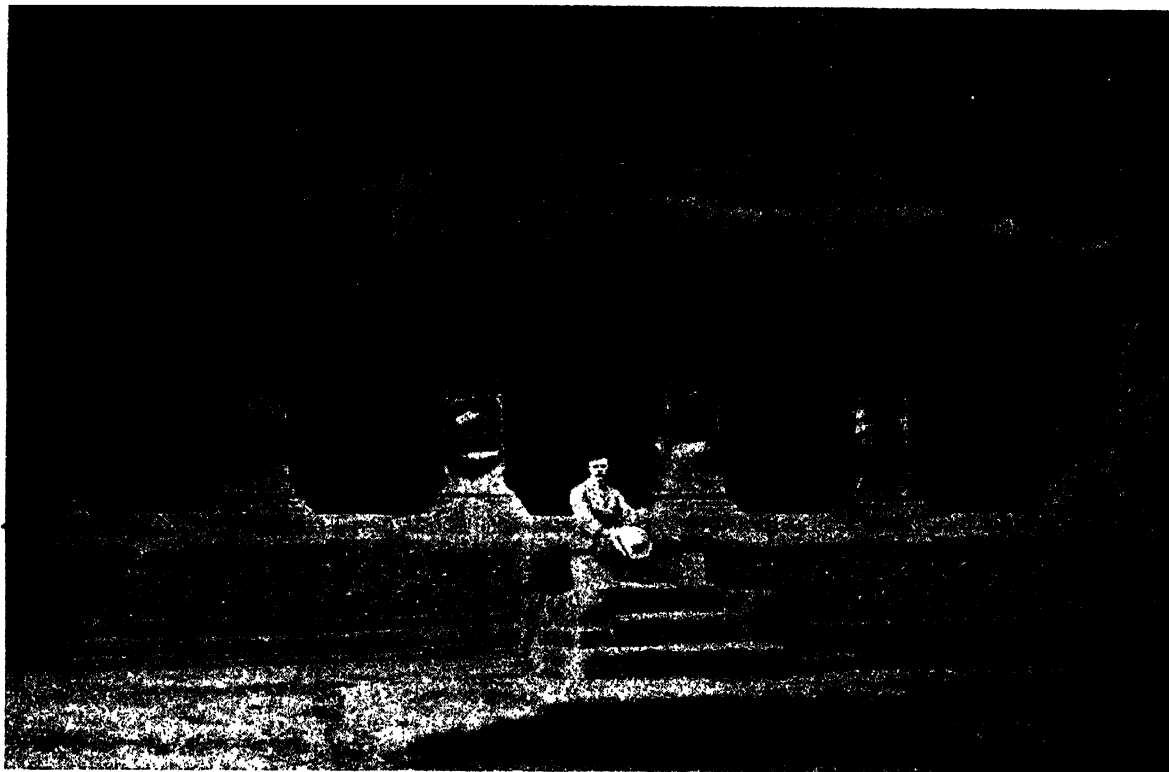
বাদামি গুহা (নং ২)।

মি-গুহাপ্রাচীরে নাগ[illegible]াসনে উপবিষ্ট বিষ্ণু-মূর্ত্তি।

সম্ভব ষোড়শ শতাব্দী অবধি দুর্গটী বিজয়নগরের অধীন ছিল। ১৭[illegible]৪৬খৃঃ ইহা পেশোয়ার অধীনে প্রথম দশ বৎসর মারহাট্টাগণ ইহা দখল করিয়া [illegible]ারে নাই, কিন্তু তৎপরে দখল পাইয়াই [illegible] ও রক্তপাত আরম্ভ করিয়া দেয়। ১৭৭৬খৃঃ আলী ইহা দখল করেন। কিন্তু ১৭৮৬খৃঃ [illegible]র ও নিজামের সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ [illegible]রিমাণ রক্ষা করিয়া অবশেষে ছাড়িয়া দিতে হয়। [illegible] হইয়া দুর্গটী আরও সুরক্ষিত করেন। সম্মিলিত [illegible] বহুকষ্টে ইহাকে পুনরায় অধিকার করিতে [illegible]ন।

[illegible]রদিকের পর্ব্বতের উপরের দুর্গটী ৫০ফুট গভীর [illegible]খাল দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়ের উপর হইতে সমগ্র সুন্দর দেখায়। দুর্গের নিকটে দর্শনীয় কয়েকটী [illegible] ও মন্দিরও আছে। দক্ষিণদিকের পর্ব্বতের [illegible] দুর্গটী আরও রমণীয়। সমভূমি হইতে দুর্গ [illegible]৪০ফুট উচ্চে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। এই-সকল পর্ব্বতগাত্রে যেখানে-সেখানে বিভিন্নাকৃতির অনেক বুরুজ আছে। এইসকল বুরুজ ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা সংযুক্ত। দুর্গের অভ্যন্তরে কয়েকটী গুদামঘর, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম রাখিবার গৃহ ব্যতীত আর কিছুই নাই। দুর্গাভ্যন্তর অত্যন্ত অসমতল, কেবল উঁচু নীচু। পাহাড়ের একটা প্রকাণ্ড ফাটলে জল ধরিয়া রাখা হইত। সেই জল দুর্গের লোকেরা ব্যবহার করিত। দক্ষিণের দুর্গটী আরও সুরক্ষিত। প্রধান পর্ব্বতগাত্র হইতে ৩০ ফুট লম্বা ৬০ ফুট গভীর একটী ফাটল দ্বারা পৃথককৃত একটী পর্ব্বতগাত্রে ইহা অবস্থিত। এই দক্ষিণদিকের পর্ব্বতটার নীচেই গুহামন্দিরগুলি।

বাদামি গুহার (১নং) বহির্ভাগে খোদিত শিবতাণ্ডব।

প্রথম গুহাটি ভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চে। খুব সম্ভব বিদ্যুৎপাতে চারিটি স্তম্ভের মধ্যে দুইটী স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কাঠের খুঁটী দিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। গুহার দক্ষিণে ৫ ফুট উচ্চ অষ্টাদশ-হস্ত-সমন্বিত একটী সুন্দর শিবমূর্ত্তি আছে (চিত্র দেখুন)। বাম দিকের বারান্দায় একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তাহার দক্ষিণে সহচরীযুক্তা একটী লক্ষ্মীমূর্ত্তি বিরাজমান। তারপর ভূতরাজ মহাদেবের অনুচর-গণের নানাভঙ্গীর বহু মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত শিব সম্বন্ধীয় আরও অনেকগুলি চিত্র আছে।

নিকটেই ২নং গুহা। এখান হইতে সহর ও জলধারের

বাদামি গুহার (৩নং) অভ্যন্তরে নরসিংহ-মূর্ত্তি।

দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। গুহার সম্মুখভাগে চারিটী স্তম্ভ ও চারিটী খিলান। বারান্দার পূর্ব্বপ্রান্তে বরাহ-অবতারের চিত্র। তাহার নিম্নে সহস্রফণাবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি শেষাদেবী ও একটী নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। একটী বামন বিষ্ণুমূর্ত্তিও আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তিটীর এক পা স্বর্গে এক পা মর্ত্তে। কার্নিসের প্রান্তগুলিতে অনেক প্রকার খোদাই চিত্র রহিয়াছে। ভিতরে প্রবেশদ্বারটী ১নং গুহার দ্বারটীর মতই। গুহাটীর ছাদ আটটী স্তম্ভ দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীর-গাত্রে সিংহ, মনুষ্য, হস্তী প্রভৃতির নানারূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। এই গুহা হইতেই একটী ছোট দরজা পার হইলেই ৩নং গুহায় যাওয়া যায়। এইটীই সব চেয়ে রমণীয় ও বর্ণনীয় গুহা। এই গুহার সম্মুখভাগেই ১০০ ফুট উচ্চ একটী পাহাড়। ইহার সম্মুখভাগ উত্তর ও দক্ষিণে ৭২ফুট লম্বা, ও ছয়টী চতুষ্কোণ স্তম্ভ দ্বারা রক্ষিত। বাবান্দায় খোদিত নানারূপ মূর্ত্তি আছে। স্তম্ভগাত্রে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি নানারূপ লতাপাতার মধ্যে আঁকিয়া রাখা হইয়াছে। বারান্দার পূর্ব্ব প্রান্তে তিন পাক দেওয়া একটী প্রকাণ্ড সর্পের (অনন্ত) উপর একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি। বারন্দার পশ্চাতের প্রাচীরের দক্ষিণে একটী বরাহ-অবতারের চিত্র। এই চিত্রের নিকট বরাহ-অবতারের কাহিনী খোদিত আছে। বারান্দার পশ্চিমদিকে বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইয়াছে (চিত্র দেখুন)।
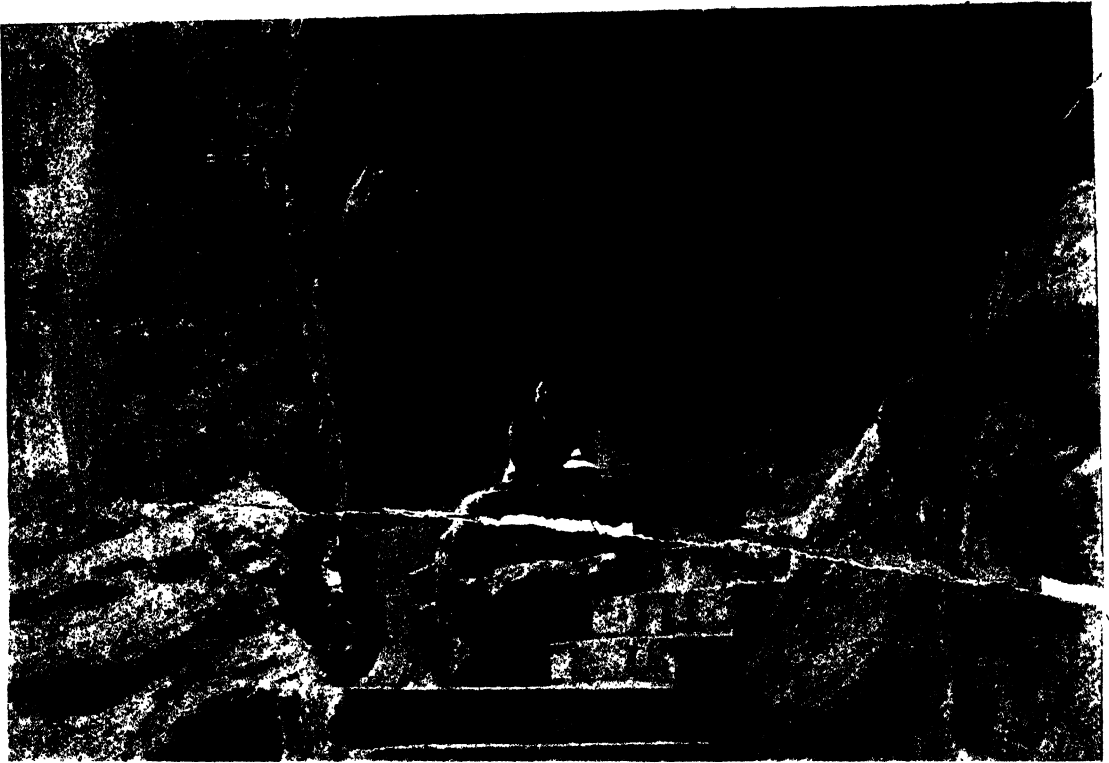
বাদামি গুহা (৪নং) জৈন মন্দির।

তাঁহার পশ্চাতে মনুষ্য-মূর্ত্তিতে পক্ষীরাজ গরুড় ও অপর দিকে একটী বামনমূর্ত্তি, মস্তকোপরি একটী প্রস্ফুটিত কমল ও চতুর্দ্দিকে নানারূপ দ্রব্যসম্ভার ও উপহার লইয়া বহুলোক সমাগত। বিষ্ণুর একটী বামনমূর্ত্তিও এখানে আছে। অভ্যন্তরে বিচিত্র কারুকার্য্যময় প্রাচীর শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

৪নং গুহাটী একটী জৈনমন্দির এবং খুব সম্ভব ৬৫০খৃঃ নির্ম্মিত হয়। গুহাটী ১৬ ফুট গভীর ও বারান্দা লম্বায় ৩০ ফুট ও চওড়ায় সাড়ে ছয় ফুট। সামনে চারিটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ। 'মন্দিরের অভ্যন্তরে ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের একটী সুন্দর চিত্র আছে। ইহা ছাড়া সিংহ কুমীর প্রভৃতিরও ছবি আছে।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

কাশ্মীরী মুসলমান

প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের মুসলমানেরা হিন্দুই ছিল। সুতরাং নামে ইহারা ইস্‌লাম হইলেও, ধর্ম্মসাধনার কোন কোন ক্ষেত্রে এবং সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহারাদিতে ইহাদের সংস্কার অদ্যাপি হিন্দুসমাজের অনুরূপই রহিয়া গিয়াছে।

সামাজিক জীবন ও সামাজিক প্রথা।

জাতকর্ম্মাদি :—হিন্দুদের ন্যায় কাশ্মীরী মুসলমানেরও সামাজিক জীবন বহুকাল-প্রচলিত কতকগুলি প্রথা ও অনুষ্ঠানের সহিত ঘন-সম্বন্ধ। বঙ্গদেশের কোন হিন্দুরমণীর সন্তান হইলে যেমন 'পাঁচউঠানি' ও 'মাসউঠানি' নামক অনুষ্ঠান বিশেষের দ্বারা প্রসূতি ও সন্তানকে শুদ্ধ করিয়া 'আঁতুড় ভাঙ্গা' হয়, কাশ্মীরী মুসলমান-সমাজেও সন্তানের জন্মের পাঁচ ও চল্লিশ দিনের দিন প্রসূতিকে

স্নানাদি করাইয়া তদনুরূপ 'উঠানি কুলাইবার' নিয়ম আছে। এইরূপ 'উঠানি' হইয়া যাইবার পর যে-কোন দিন শিশুর 'নামকরণ' হয় এবং তাহার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্র 'চূড়াকরণ' নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

মুসলমানী :—হিন্দুসমাজে উপনয়ন যেমন দ্বিজবালকগণের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার, মুসলমানবংশেও বালকগণের খৎনা হাল অর্থাৎ 'মুসলমানী'-ক্রিয়া তদনুরূপ প্রয়োজনীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট কালের ন্যায় এই অনুষ্ঠানেরও কাল-পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে। বালকের পাঁচ বৎসর বয়সের পর দ্বাদশবৎসর বয়সের মধ্যে 'মুসলমানী' হওয়া বিধেয়। এই অনুষ্ঠান কাশ্মীরী মুসলমানের বাল্যজীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। সুতরাং ইহার কার্য্য বিশেষ জাঁকজমকের সহিতই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'মুসলমানী' হওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনায় কাশ্মীরীগণ ঐ দুই দিন এড়াইয়া ইহার লগ্ন ধার্য্য করে। মূল ক্রিয়ার সাত দিন পূর্ব্ব হইতেই নানারূপ আয়োজনের সহিত ইহার 'বোধন' আরম্ভ হয়। সপ্তম দিবসে নির্দ্দিষ্ট বালকের হাতের তালু, নখ ও অঙ্গুলী এবং পায়ের নখ ও গোড়ালি মেহেদীপাতার রসে রঞ্জিত করিয়া 'নিয়াজ' অর্থাৎ পূজা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাকে একটী জিয়ারতে লইয়া যাওয়া হয়। সেস্থানের মোল্লা তাহার সম্মুখে কোরানের অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন এবং সে-ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'খুতম' উচ্চারণ করিতে থাকে; অতঃপর যথানির্দ্দিষ্টভাবে 'মুসলমানী'র মূল ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিবাহ :—'মুসলমানী' হইয়া যাওয়ার পর পুত্রের বিবাহ দেওয়ার জন্য কাশ্মীরী পিতা ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং তদুদ্দেশ্যে ঘটকের শরণাপন্ন হয়। হিন্দুসমাজের এককালীন অবস্থার ন্যায় কাশ্মীরী মুসলমানসমাজেও ঘটকচূড়ামণিরই হস্তে বিবাহের প্রজাপতিত্বভার ন্যস্ত আছে। তাহারই মধ্যস্থতায় পাত্রপক্ষের সম্বন্ধ-প্রস্তাব কন্যাপক্ষের নিকট পঁহুছে। কন্যাপক্ষ তাহাতে সায় দিলে বরের পিতা বা অভিভাবক একটী পাত্রে করিয়া কয়েকটী টাকা তাহাদিগকে দিয়া আসে। অতঃপর কন্যাপক্ষ পাত্রের বাড়ী আসিয়া তাহার আর্থিক

কাশ্মীরী বরের বিবাহবেশ।

অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সম্বন্ধ পাকা করিয়া যায়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে পাত্রের চরিত্র অপেক্ষা ধন-দৌলতেরই গৌরব অধিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। উভয়পক্ষের সম্মতি অনুসারে সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেলে 'গণ্ডুন' অর্থাৎ বাগদান্-ক্রিয়ার আয়োজন হয়। এতদুপলক্ষে পাত্রের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে নগদ পঁচিশটী টাকা, সের দশ পনর লবণ এবং কন্যার ব্যবহারোপযোগী কয়েকখানি রৌপ্যালঙ্কার প্রেরিত হয়। কন্যাপক্ষও ভাবী জামাতার জন্য একখানি শাল পাঠাইয়া দেয়।

বিবাহের মূল কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতে দুইদিন সময় লাগে। প্রথম দিন পরিবারস্থ নাপিত ও নাপিতানি

বর ও কন্যার হাত পা মেহেদীপাতার রসে রাঙ্গাইয়া দেয়। পাত্রপক্ষ এই দিন কন্যাগৃহে একটী ভেড়া পাঠাইয়া দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভেড়াটী লইয়া আসে, বরযাত্রীগণের আহার্য্য প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের তদ্বিরাদি করিবার নিমিত্ত কন্যার বাড়ীতে তাহার থাকিয়া যাওয়া নিয়ম। বরের সঙ্গে মিছিল করিয়া কতজন লোক আসিতে পারিবে, তাহা কন্যাপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। তদনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট সঙ্গী সমভিব্যাহারে বরপক্ষ মিছিল করিয়া নাচিতে নাচিতে কন্যাগৃহে আসিয়া হাজির হয়। ঐ সঙ্গে পাত্রের পিতা বা অভিভাবক একটী বাক্সে পূরিয়া সের খানেক লবণ, একজোড়া জুতা এবং বধূর জন্য হার, রূপার বালা ও একখানি শাড়ী লইয়া আসে। বরযাত্রীগণ প্রাঙ্গণে পঁহুছিবামাত্র কন্যাকর্ত্তা একখানা থালায় করিয়া খানিকটা জল লইয়া জলটা পাত্রের মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং পরে থালার উপর একটী টাকা রাখে। ইহার পর বরপক্ষ এক এক পাত্রে এক সঙ্গে চারিজন করিয়া খাইতে বসিয়া যায়। তাহাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে কন্যাকর্ত্তা ডোম, চাকর, কুমার, চৌকীদার ও স্থানীয় মসজিদের জন্য কিছু কিছু টাকা দাবী করে। এই দাবী অবিকল হিন্দুবিবাহের 'গ্রামভাটি' 'বাবিয়ানা' ও 'দেবালয়-প্রণামী'র অনুরূপ।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কাজিসাহেবের নিকট দুইজন সাক্ষী ও একজন উকীল উপস্থিত করা হয়। উকীলটী সচরাচর কন্যার মাতুলবংশ বা ভ্রাতৃবর্গের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কাজিসাহেব সাক্ষীসমেত উকীলকে বিবাহে সম্মতি জানিবার জন্য কন্যার নিকট পাঠাইয়া দেন। কন্যাটী সাধারণতঃ 'অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী'র পর্য্যায়ভুক্ত থাকায় উকীল মহাশয়কে তাহার সম্মতির প্রতীক্ষায় বড় একটা অপেক্ষা করিতে হয় না,—প্রায়ই কন্যার মাতা প্রতিনিধি হইয়া 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণং' প্রমাণানুসারে তৎক্ষণাৎ কন্যার অনাপত্তি জানাইয়া দেয়। ইহার পর 'কলমা' পড়িয়া এবং বিবাহের দায়িত্ব ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য বিষয়ক তিনটী প্রশ্ন বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজিসাহেব যজমানের পরিণয়-পর্ব্ব শেষ করেন। বলা বাহুল্য, এই উপলক্ষে পাত্রপক্ষের নিকট হইতে নগদে বা জিনিসে তাঁহার প্রাপ্যের অংশ কোনস্থলেই একেবারে বাদ পড়ে না।

বিবাহ-ব্যাপার চুকিয়া গেলে, বধূ যানারোহণে সকলের অগ্রগামিনী হইয়া স্বামীর ঘর করিতে যাত্রা করে। এবং শ্বশুর-বাড়ী পঁহুছিয়া পিত্রালয় হইতে প্রাপ্ত কিছু টাকা শাশুড়ীর পায়ে রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করে।

নববিবাহিত ভ্রাতার আগমন-সংবাদ পাওয়া মাত্রই ভগিনী গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; এবং তাহার নিকট হইতে 'ভাংমুব্রান্ত্' অর্থাৎ কিছু 'দর্শনী' আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহা বাঙালীর 'দোর-ধরা' প্রথার অনুরূপ।

কাশ্মীরী মুসলমানের বিবাহের মধুযামিনীর সময় (Honeymoon) এক সপ্তাহ।

সংসার-জীবন :—সপ্তাহান্তে মধু-যামিনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নব দম্পতির কঠোর সংসার-জীবন আরম্ভ হয়। জীবন-নাট্যের এই অংশে, আত্মরক্ষণ ও সমাজরক্ষণের নিয়মানুসারে, পুরুষবর্গের কেহ কেহ ব্যবসাদার, কেহ দোকানদার, কেহ ফেরীওয়ালা, কেহ কামার, কেহ কুমার, কেহবা চাষী—এইরূপ বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক সংসার-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

রমণী-জীবনের প্রকৃত দায়িত্ব এবং তৎসঙ্গে দাম্পত্যসুখের সূচনাও এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান-গৃহে নববধূ প্রবেশ করিবামাত্র শাশুড়ী বা অপর কোন বর্ষীয়সী মহিলা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তৈজসপত্র, তাঁতের চরকা প্রভৃতি গৃহস্থালীর প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত পরিচয় করিয়া দেয়। বধূ এই দিন হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সংসারের কার্য্যভার গ্রহণ করে। হিন্দুরমণীর ন্যায় এই-সকল মুসলমান মহিলাও দাসীর ন্যায় সসম্ভ্রমে স্বামীর সেবা করিতে ভালবাসে; স্বামীগৃহের এই দাসীপনার মধ্যে তাহারা সোহাগের ও সৌভাগ্যের আস্বাদ পায়।

উচ্চশ্রেণীস্থ ও মধ্যবিত্ত অবস্থার নারীগণ গৃহের বাহির হইবার সময় ময়লা কাপড়ের একটী ঘোমটা পরিধান করে। এইরূপ মস্তকাবরণ ব্যবহারে উঁহাদের মস্তকে

একপ্রকার চর্ম্মরোগ জন্মিতেছে এবং এই রোগ ক্রমশঃই উহাদের মধ্যে অমোঘপ্রভাব বিস্তার করিতেছে।

পল্লীগ্রামের এবং নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমান-গৃহে পর্দাপ্রথা না থাকায় এই রোগ সেস্থানে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পায় নাই। ঐ-সকল স্থানের রমণীগণ শৈশবাবধি মুক্ত স্বাধীনতা উপভোগ করায় এবং কঠোর কর্ম্মে অভ্যস্ত থাকায় শ্বশুর-গৃহের সমস্ত অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

মৃত্যু ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান :—ইহার পর শোকের পালা। নরনারীর এহেন সংসার-জীবনের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মানবের শেষ-সহচর মৃত্যু আসিয়া আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। মৃত্যুর পর শবদেহের প্রতি স্বজনের শেষ কর্ত্তব্যপালন ও পরপারস্থ আত্মার কল্যাণসাধনের নিমিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই কোন-না-কোন অনুষ্ঠানের বিধি আছে। কাশ্মীরী মুসলমান-সমাজেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। এই সমাজে

কাশ্মীরী কৃষকের ঘরকন্না।

কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বা পুত্রস্থানীয় কোন ব্যক্তি তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া কবরের উপর এক-খানি প্রস্তর স্থাপন করে। এই প্রস্তরখণ্ড সাধারণতঃ স্থানীয় কোন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে সংগৃহীত হয়,—কোন কোন স্থলে কার্য্যের সুবিধার্থ ঐরূপ দেব-মন্দিরের প্রাঙ্গণ-ভূমিকেই সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। সমাধিক্রিয়া শেষ হইলে মৃতব্যক্তির আত্মার

আমোদের সুযোগ :—কাশ্মীরী মুসলমান-দম্পতির পক্ষে শুক্রবার কিংবা কোন উৎসবের দিন বিশেষ আমোদপ্রমোদ করিবার সময়। এই-সকল দিনে ইহারা পরিজনবর্গের সহিত একত্র হইয়া রন্ধনাদির তৈজস-পত্র সঙ্গে লইয়া নৌ-ভ্রমণে বাহির হয় এবং সকল প্রকার অবরোধ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে।

কল্যাণার্থ 'ফতেহা' পাঠ করা হয়। তৎপর শ্রাদ্ধাধিকারী সমাধিস্থলে উপস্থিত জনবর্গের মধ্যে রুটী বিতরণ করে। কবরভূমিতে এইরূপ ফতেহা পাঠ ও রুটীদানের কার্য্য প্রথম বৎসর প্রতি পনের দিন অন্তর চলিতে থাকে। অতঃপর হিন্দুদের বার্ষিক শ্রাদ্ধের ন্যায় উহার অনুষ্ঠানও বাৎসরিক হইয়া দাঁড়ায়। বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় সমাধির উপর পুষ্পবর্ষণ ও জলসেচন এবং সমাধিস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে রুটী বিতরণের প্রথা আছে। কাশ্মীরী মুসলমান-সমাজের এই-সকল অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজের পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদির অনুরূপ।

কর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্র।

কৃষিকার্য্য ঃ—সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কৃষিজীবীগণ দেশের প্রাণস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরেও এই সম্প্রদায় সেই গৌরবের অধিকারচ্যুত হয় নাই। ভারতের অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় এ দেশেরও জনবর্গের মধ্যে কৃষকের সংখ্যা অধিক। কাশ্মীরী হিন্দুগণ বিশেষতঃ পণ্ডিতবর্গ কৃষিকর্ম্মকে নিতান্ত হেয় ও অসম্মানজনক কার্য্য বলিয়া মনে করে। কাজেই নিজেরা ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও উহাতে শস্যাদি জন্মাইবার ভার দেশের মুসলমান-সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করায়, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণই জমির দখলকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং এই সূত্রে দেশবাসীকে অন্নদান করিবার কর্ত্তৃত্বও তাহাদের হস্তগত হইয়াছে।

অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশে যেমন স্ত্রী-পুরুষে একত্র হইয়া কৃষিকার্য্য করে, কাশ্মীরে কখনও সেরূপ দেখা যায় না। স্ত্রীলোকগণ কৃষিকার্য্য করিলে শস্যহানি ঘটে—জনসাধারণের এই বিশ্বাসই নারীজাতিকে ক্ষেত্রের কর্ম্ম হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, বীজপবন, আগাছা নিড়ানো, জলসিঞ্চন প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের আনুষঙ্গিক সমস্ত কার্য্যই পুরুষ-সম্প্রদায় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। জমি নিড়াইবার সময়ে ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক তালে গান গাহিতে গাহিতে কাজ করে। ইহাতে মনের স্ফূর্ত্তি জন্মিয়া কার্য্যক্ষেত্রের কঠোরতার অনেক লাঘব হওয়ায় কার্য্যটীও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়ার সময়েও ইহারা
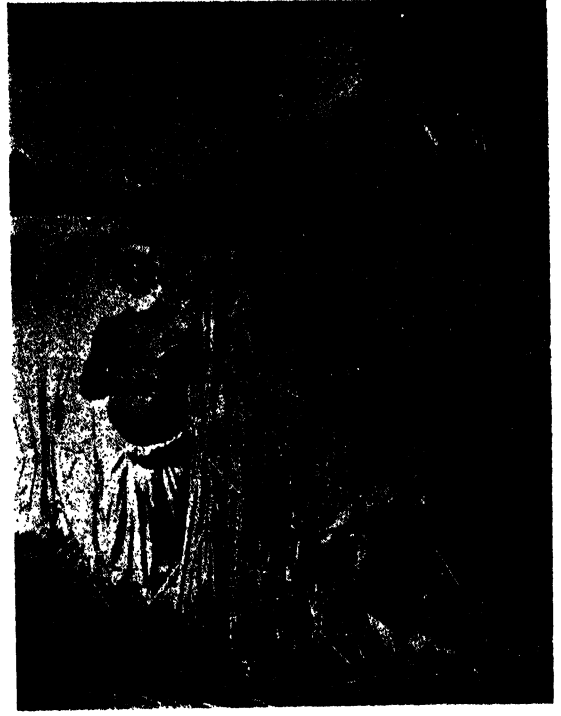
কাশ্মীরী কৃষক নল কাটিতেছে।

ঐভাবে দলবদ্ধ হইয়া কাজ করে। কার্য্যের সময়ে ইহারা সামান্য রকমের একটী নেংটী পরিয়া লয়। ঐরূপ নেংটী-পরা ২০।৩০ বৎসর বয়স্ক সারি সারি কৃষি-জীবীকে গান গাহিতে গাহিতে কাজ করিতে দেখা এক মজার ব্যাপার!

জলে কৃষি ঃ—স্থলভাগের ন্যায় কাশ্মীরের জলভাগেও কৃষিকর্ম্ম করিবার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এতদুদ্দেশ্যে ডাল হ্রদের উপর মাদুর ভাসাইয়া তদুপরি মৃত্তিকার আস্তরণ দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় এবং তাহাতে কৃষির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উপকথার পুকুর-চুরির ন্যায় এই ভাসমান ক্ষেত চুরি করা কাশ্মীরের কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে একটী রহস্যজনক বাস্তব ব্যাপার।

গুটির চাষ ঃ—কৃষিকর্ম্মের ন্যায় রেশমী গুটির চাষ করাও কাশ্মীরী কৃষিজীবীর একতম প্রধান কার্য্য। হিন্দু পণ্ডিতগণ কৃষির ন্যায় এই কার্য্যটীর প্রতিও বীতশ্রদ্ধ। তাই ইহারও ভার মুসলমানের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে।

কাশ্মীরী কৃষকের ক্ষেত্রে জল-সেচন।

পূর্ব্বে এস্থানের অধিবাসীগণ গুটি হইতে রেশম তুলিয়া নিজেরাই বস্ত্র প্রস্তুত করিত। কালক্রমে তাহাদের এই ব্যবসায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। কাশ্মীরের রাজসরকার ইহা লাভজনক বুঝিতে পারিয়া ইহার সংস্কারে মনোনিবেশ করায় সম্প্রতি ইহার কার্য্য পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গুটির চাষ করিবার জন্য কৃষকগণ প্রতিবৎসর রাজসরকার হইতে বিনামূল্যে বীজ পাইয়া থাকে। সরকার বাহাদুর ফরাসী দেশ হইতে এই বীজ আমদানী করিয়া এই করারে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিলি করেন যে, তাহারা রাজসরকার ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইহা হইতে উৎপন্ন গুটি বিক্রয় করিতে এবং পর বৎসরের জন্য নিজেরা ইহার বীজ জমা রাখিতে পারিবে না। এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া কৃষকগণ গুটির চাষ করিবার অধিকার পায়। এই কার্য্যে প্রতিবৎসর ইহারা প্রায় চারি হাজার মণ গুটি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়। বৎসরান্তে এই গুটি লইয়া ইহারা শ্রীনগরস্থ সরকারী রেশমী কারখানায় উপস্থিত হয়। সেস্থানের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের নিকট হইতে ১৫৲ মণ দরে সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া লয়। শ্রীনগরের কারখানায় কলের সাহায্যে এই গুটি হইতে সূতা প্রস্তুত হয়। রাজসরকার তাহা য়ুরোপে রপ্তানি করিয়া ২০।২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। এই আয় হইতে রাজসরকারের খরচাদি বাদে সাত লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

কাশ্মীরে কৃষি অপেক্ষা গুটির চাষ করা অনেকটা সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য। স্বভাবতও কৃষকগণকে এই কার্য্যে অধিকতর পারদর্শী বলিয়া মনে হয়। তুঁত-পাতা সংগ্রহ করিবার লোক পাইলে একজন জরাজীর্ণ ব্যক্তিও এই ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতে পারে। এই কার্য্যের নিমিত্ত যে-সকল জিনিসের প্রয়োজন হয় তন্মধ্যে উষ্ণগৃহের আবশ্যকতাই অধিক। এই গৃহের বন্দোবস্ত করা কাহারই পক্ষে তেমন কঠিন ব্যাপার নহে।

মজুরী ও বেগার :—অবসর সময়ে কুলিগিরী প্রভৃতি মজুরের নানাবিধ কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা

কাশ্মীরের মেষপালিকা।

কাশ্মীরী কৃষকের অপর এক ব্যবসায়। সময়ে সময়ে রাজকার্য্যে 'বেগার' খাটানোর জন্য ইহাদিগকে প্রয়োজন হয়। এ দেশের ন্যায় কাশ্মীরের বেগার 'বিনি মাইনে আপ-খোরাকী'র অন্তর্ভুক্ত নহে—উহার জন্য শ্রমজীবীর

কাশ্মীরী রমণীর চরকা-কাটা।

পড়িয়াছে, সুতরাং আপনাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাহাদের আর তেমন যত্ন নাই। দেশে উপযুক্ত সূতা প্রস্তত না হওয়ায় সামান্য গামছাখানি পর্য্যন্ত বয়নের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এই-সকল কারণেই এই শিল্পের বর্ত্তমান দুর্গতি ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

নারীর কার্য্য ঃ—গৃহস্থালী, ধানভানা ও কাটনাকাটা—এই তিনটী কার্য্য কাশ্মীরী কৃষক-পরিবারে নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের কুলবধূগণের

কাশ্মীরী রমণীর ধানভানা।

বেতন পাওয়ার নিয়ম আছে। তবে কার্যটী বাধ্যতামূলক বলিয়া উহাকে বেগার নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে।

কৃষিজীবীগণের অপরাপর কার্য্যের মধ্যে মেষ ও গোপালন এবং বস্ত্রবয়ন—এই দুইটী বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

মেষ ও গোপালন ঃ—যে-সকল কৃষক পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশে বা বন্ধুর ভাগে অবস্থান করে, মেষ ও গো-পালন তাহাদের প্রধান কার্য্য। ঐ-সকল স্থানে প্রধানতঃ পশমের জন্যই মেষ পালিত হইয়া থাকে। কাশ্মীরে গো-পালনের কার্য্য তেমন সুবিধাজনক ভাবে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। সেস্থানের গরুগুলিও প্রায়শই রোগা ও ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া থাকে। যাহাহউক, এই সমস্ত সত্বেও, সেস্থানে টাকায় ষোল সের দরে দুধ পাওয়া যায়।

বস্ত্রবয়ন ঃ—বস্ত্রবয়ন পূর্ব্বে অনেক কৃষকেরই উপ-জীবিকার একতম উপায় ছিল। কিন্তু অধুনা উহার কার্য্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। বিদেশী কাপড় সস্তা বলিয়া অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশের অধিবাসীগণও ম্যাঞ্চেষ্টার-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ধন দিন দিন ব্যবসায়ীদের ভাণ্ডারস্থ হওয়ায় জোলা ও তাঁতি-কুল তাহাদেরই অনুগৃহীত, বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী হইয়া

পক্ষে তালপুকুর বা ভীমপুকুরের ঘাট যেরূপ নানাবিধ রঙ্গালাপ ও আলোচনার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়, কাশ্মীরী কৃষকপত্নীর ধান ভানিবার গৃহকেও সেইরূপ বিশ্রম্ভালাপের স্থান বলিয়া গণ্য করা যায়। এইস্থানে ইহারা পাড়া-প্রতিবাসিনীর সহিত মিলিত হইয়া গল্পগুজব করিতে

কাশ্মীরের কৃষক-বালক।

করিতে ধান ভানিতে থাকে। ক্ষেতে চাষ দেওয়ার সময় বা জমি নিড়াইবার সময় পুরুষ-সম্প্রদায় যে-ভাবে কার্য্য করে, ধান ভানিবার কালে ইহারাও তদ্রূপ দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে ভালবাসে। ইহাদের অন্যতম কার্য্য কাট্‌না কাটা অনেক সময়ে ইহাদিগকে শীতের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

সময়ে সময়ে তিব্বতী স্ত্রীলোকের ন্যায় কাশ্মীরী মহিলাকে দোকানপাট করিয়াও বিকিকিনি করিতে দেখা যায়। ইহাদের দোকানে প্রধানতঃ কুলচা নামক খাবার এবং মসলা ও শাকসবজী বিক্রয় হয়।

বালকের কর্ম্মক্ষেত্র ঃ—বালকগণ পিতামাতার নানা-বিধ কার্য্যে সর্ব্বত্রই কিছু-না-কিছু সাহায্য করে। এ বিষয়ে কৃষকশিশুদের কর্ত্তব্য আরো একটু বেশী বলিয়া মনে হয়। কাশ্মীরে এই শ্রেণীর বালকগণের উপর পিতা-মাতার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে 'নাস্তা' লইয়া যাওয়ার ও গৃহ-পালিত পশু চরাইবার ভার ন্যস্ত আছে। শ্রীনগরের সন্নিহিত স্থলে যাহাদের বাস, সেই-সকল বালক তত্রত্য কারখানায় রেশম পরিষ্কার ও সূতা প্রস্তুত প্রভৃতির কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পিতামাতার আনুকূল্যও করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত কার্য্যে সময়ে সময়ে হিন্দু বালকগণকেও নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। প্রবন্ধানুষঙ্গিক চিত্রে মুসলমান কৃষক বালকের সঙ্গে ব্রাহ্মণবংশীয় চারিটী শ্রমজীবী শিশু সম্মুখভাগে বসিয়া আছে।

কাশ্মীরে বালকগণ অধিক বয়স পর্য্যন্তও উলঙ্গ থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সময় সময় একটীমাত্র লম্বা শার্ট দ্বারা নগ্নদেহ আবৃত করিয়া রাখে। কিন্তু স্নানের সময় উপস্থিত হইলেই তাহা খুলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

অগ্ন্যাধার ঃ—কাশ্মীরের কৃষক বালকদিগের চিত্রে সম্মুখ পংক্তিতে উপবিষ্ট বালকদের দুজনের হাতে দুটি সাজির ধরণের ঝুড়ি আছে। ঐ সাজি কাশ্মীরী পরি-বারের একটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। কাশ্মীরী ভাষায় উহাকে 'কাঙ্গারী' বলে। কাঙ্গারা কাশ্মীরীগণের নিত্য-ব্যবহার্য্য অগ্ন্যাধার। বালক ও স্ত্রীলোকগণ ইহাতে অগ্নি রক্ষা করিয়া পিরাণের নীচে লইয়া কাজ কর্ম্ম করে। এই শীতপ্রধান রাজ্যে বৎসরের সমস্ত ঋতুতেই, বিশেষতঃ শীতকালে, ইহা শরীরের উত্তাপ জন্মাইয়া কার্য্য করিবার পক্ষে শ্রমজীবীর যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেয়।

বালকগণের খেলা ঃ—কৃষকশিশুগণ নানাবিধ জল-ও-স্থল-ক্রীড়া করিতে অভ্যস্ত। ইহাদের একটী খেলার প্রক্রিয়া এইরূপ ঃ—একটী বৃত্তাকার স্থলে অনেকগুলি শিশু দাঁড়াইয়া যায়, এবং উহার মধ্যস্থলে একটী বালককে চোক বাঁধিয়া দাঁড় করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্দ্দিকস্থ বালকগণ একে একে এক-একখানি প্রস্তর তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে থাকে। প্রস্তরখণ্ডের পতনের ধ্বনি শুনিয়া মধ্যস্থলের বালকটী যদি প্রস্তর-নিক্ষেপকারীকে ধরিতে পারে তবে সে তাহার পৃষ্ঠে চড়িবার অধিকার পায়।

বালকগণের প্রকৃতি ঃ—এই-সকল বালক আমোদ-প্রিয় হইলেও স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক। কোন বিদেশী লোক দেখিলে ইহারা সর্ব্বকার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া পালায়। আমোদপ্রমোদ কিংবা খেলা করিবার সময়েও ইহারা বিদেশী লোকের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় পথিপার্শ্বস্থ বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া টোঙ্গাওয়ালা যদি একবার 'ঠাহ্‌রো' এই বাক্যটী-মাত্র জোরে উচ্চারণ করে, তাহা হইলেই তাহারা বিষম ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতে থাকে।

এই ভীরুতা শুধু যে বালকেরই প্রকৃতিগত তাহা নহে। অনেক সময়ে যুবক ও প্রৌঢ়গণও এই দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করে। কাশ্মীরে 'বেগার' কথাটী এতদূর ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে শুধু এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই অনেক ব্যক্তিই ছুটিয়া পালায়।

ভীরুতার কারণ ঃ—কাশ্মীরী জনসাধারণের এইরূপ কাপুরুষতার কারণও রহিয়াছে যথেষ্ট। বিগত ৯ম শতাব্দী হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ইহারা যেরূপ শাসনের অধীনে রহিয়াছে তাহাতে ইহাদের পুরুষত্ব কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ ইহারা ইহাদের স্বদেশী রাজার হস্তে প্রায় চারি শতাব্দীকাল ঘোরতর নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। তৎপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজার আমলে এই নিগ্রহ রাজধর্ম্ম প্রচারের উৎপীড়নের সহিত মিলিত হইয়া ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। অধুনা ইহার উপর আবার 'বেগার' খাটাইবার অত্যাচার সংযুক্ত হওয়ায় এই জাতি ক্রমশই পৌরুষ-বর্জ্জিত ও ভীরু হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের ভীরুতাসম্বন্ধে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে যখন ইহারা রাজসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে দর্শন করামাত্র বন্দুকাদি হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ইহারা গৃহে প্রত্যাগত হয়। এই কিম্বদন্তী বিশ্বাস করিয়াই হৌক্ আর ইহাদের প্রকৃতি বিচার করিয়াই হৌক্, বর্ত্তমানে এই জাতিকে সৈন্যের কার্য্যে গ্রহণ করা হয় না।

কৃষক-সাধারণের আতিথেয়তা ঃ—কি পুরুষ কি নারী, কাশ্মীরী কৃষক-পরিবারের সকলেরই একটী প্রধান গুণ তাহাদের আতিথেয়তা। ইহারা কোন অতিথি পাইলে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে স্থান দেয় এবং নানাবিধ উপায়ে তাহার মনস্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করে। কোন অপরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পাইলে ইহারা সর্ব্বপ্রথম 'কুৎ গৎস' ও 'ক্যাৎসা খবর'—এই দুইটী বাক্য দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করে। 'কুৎ গৎস' সংস্কৃত 'কুত্র গচ্ছসি' এবং 'ক্যাৎসা খবর' হিন্দী 'ক্যা খবরের' রূপান্তর। শেষোক্ত বাক্যটীর সহিত কাশ্মীরের এককালীন রাজনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। রাজার অত্যাচার-উৎপীড়নে দেশবাসী যখন দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া একে অপরের সংবাদ লইত। এখন ইহা অতিথির প্রতি গ্রামবাসীর আদর অভিনন্দনের ভাবব্যঞ্জক।

নারী-প্রকৃতি ঃ—পুরুষ অপেক্ষা নারীজাতির অতিথি-বাৎসল্য অধিক। ইহারা অতিথিকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করে। মাতৃহৃদয়ের যে করুণা জগৎকে জীবন-দান করে, ইহাদের সেই করুণার একাংশ স্নেহ ও মমতারূপে অভিব্যক্ত হইয়া অপরিচিত পথিককে আশ্রয় দেওয়ার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। পথের বিদেশী পথিককে তাহারা উপযাচক হইয়া ডাকিয়া ঘরে স্থান দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

সাধারণতঃ কৃষকবধূগণ নিতান্ত নিরীহ ও সাদাসিধে। বেশভূষা, আচার-আচরণ কোন দিক দিয়াই ইহাদের জীবনে আবিলতা ঢুকিতে পারে নাই। গৃহস্থালী করাই

কাশ্মীরী মুসলমানের বাসগৃহ।

তাহাদের ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম বিধি-নির্দ্দিষ্ট, এইরূপ বিশ্বাস থাকায় সংসারের কোন কার্য্যই তাহাদের বিরাগ উৎপাদন করিতে পারে না এবং এই কারণেই কর্ম্মের কঠোরতায়ও তাহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয় না। ইহারা সর্ব্বদাই হাস্যমুখ ও আমোদপ্রিয়। মেলা ও ধর্ম্মোৎসবাদিতে যোগদান করিতে ইহারা বড় ভালবাসে। এই-সকল স্থানে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া গমন করে এবং পথ চলিবার সময় একতালে গান গাহিতে গাহিতে যায়। সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে ইহারা তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের স্ত্রীজাতির ন্যায় অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে।

বাসগৃহ :—বিভিন্ন অবস্থানুসারে কাশ্মীরী কৃষকগণ বিভিন্ন প্রকার গৃহে বাস করে। কাশ্মীরের পল্লীসমূহ প্রধানতঃ তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে একপ্রকার পল্লী আকৃতিপ্রকৃতিতে অনেকাংশে সহরের তুল্য। এই পল্লী পর্ব্বতের বন্ধুর ভাগে অবস্থিত এবং দেবদারু প্রভৃতি নানারূপ বৃক্ষবেষ্টিত। এই পল্লীর গৃহগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও দ্বিতল। সচরাচর মধ্যবিত্ত অবস্থার কাশ্মীরীগণ ইহার অধিবাসী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের পল্লীগৃহ নিতান্ত সাধারণ রকমের। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পল্লীর প্রত্যেক বাড়ীতে একখানি বাসগৃহ ও একখানি ছোট গোলাঘর আছে। গোলাঘরটী কাষ্ঠনির্ম্মিত। ইহার মধ্যে মঞ্চের উপর শস্যাদি মজুত থাকে। মঞ্চের নিম্নভাগ অতিথি বা পরিবারস্থ অবিবাহিত পুরুষের শয়নার্থ ব্যবহৃত হয়। বসতগৃহের উপরের তলায় ঘাস, জ্বালানি কাষ্ঠ ও তুঁতপাতা রক্ষিত থাকে। এই প্রকার পল্লী ও তৃতীয় পর্য্যায়ের গ্রামসমূহ কাশ্মীরী মুসলমান কৃষিজীবী-সাধারণের প্রধান আবাসস্থল। তৃতীয় পর্য্যায়ের পল্লীর একটী পরিবারের চিত্র আমরা প্রবন্ধভাগে সন্নিবেশিত করিলাম।

এই-সকল পল্লী আবর্জ্জনার নরক-ক্ষেত্র। এইরূপ আবর্জ্জনার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও কাশ্মীরীগণ যে অদ্যাপি জগতে তিষ্টিয়া আছে তাহার একমাত্র কারণ —সে স্থানের উৎকৃষ্ট আবহাওয়া। কিন্তু রাজসরকার এই আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া দেশের সংস্কারে শীঘ্র মনোযোগী না হইলে শুধু আবহাওয়া যে কাশ্মীরীগণকে অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে, এমন আমাদের মনে হয় না।

ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্মালয়।

ইসলাম-ধর্ম্মের উপর কাশ্মীরী মুসলমানের বিশ্বাস অগাধ। সাধারণ একটী হাজি-মুসলমানও এই ধর্ম্মকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করে। জনসাধারণের স্বীয় ধর্ম্মের উপর এইরূপ অনুরাগ আছে বলিয়াই পাদরীগণ কাশ্মীরে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারে কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবে পূর্ব্বে এই সকল মুসলমান হিন্দু থাকায়, নামে ইহারা ইসলাম হইয়াও ধর্ম্মসাধনার

হজরত-বাল জিয়ারত।

কোন কোন ক্ষেত্রে এবং ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদিতে যথেষ্ট হিন্দুভাবাপন্ন। সাধারণতঃ ধর্ম্মসম্পর্কীয় উৎসবাদিকেই ইহারা ধর্ম্মসাধনার প্রধান উপায় বলিয়া মনে করে। তাই অন্যান্য দেশের ন্যায় কাশ্মীরেও ধর্ম্মসাধনা ও ধর্ম্মোৎসবাদির কার্য্যে নিরক্ষর অধিবাসীগণেরই অধিকতর উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়।

জিয়ারত ঃ—এদেশের মসজিদের ন্যায় জিয়ারত কাশ্মীরে মুসলমান-ধর্ম্ম-সাধনার প্রধান স্থল। কাশ্মীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ঐরূপ জিয়ারত এক একটী দৃষ্ট হয়। উপাসনার ন্যায় গ্রামবাসীগণের ধর্ম্মবিষয়ক অন্যান্য আমোদ প্রমোদ ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান এই জিয়ারতে হইয়া থাকে। এই-সকল মন্দিরে কাশ্মীরের মুসলমানী শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীনগরে ঝিলাম নদের তীরস্থ সাহে-হামদান-সাহেব নামক কাষ্ঠনির্ম্মিত জিয়ারতটীতে এ বিষয়ের অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা বর্ত্তমান। ইহার বহির্দ্দেশ ও অভ্যন্তর নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত। মুসলমান ছাত্রগণকে বিনামূল্যে শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই জিয়ারতের একাংশে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জিয়ারত হিন্দুমন্দির ভাঙিয়া তাহারই পোঁতার উপর নির্ম্মিত। এজন্য এস্থানে হিন্দু মুসলমান সকলেই পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

শ্রীনগরের তিন মাইল দূরে ডালহ্রদের তীরে হজরত-বাল নামক আর একটী জিয়ারত আছে। এই মন্দিরে একটী কাচপাত্রের মধ্যে মহম্মদের একগাছা দাড়ি রক্ষিত আছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। প্রতি বৎসর জুনমাসের কোন এক বিশেষ দিনে এই দাড়ি-প্রদর্শন উপলক্ষে এস্থানে কাশ্মীরী মুসলমানের এক মহাধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে। এই সময় দেশবিদেশস্থ বহুযাত্রী এই

কাশ্মীরী মুসলমানের মেলা।

জিয়ারতে আগমন করে। এবং উপাসনা-সময়ে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একতান মিলাইয়া নিম্নলিখিত ভাবের একটী পারসি শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকে ঃ

প্রেরিত পুরুষ ওগো, শোনো মোর প্রার্থনার বাণী,
ঈশ্বরের ভক্তশ্রেষ্ঠ, তুমি ছাড়া কারেও না জানি।
সম্মুখে বিপদ ঘোর, পড়িয়াছি ঘোর দুঃখার্ণবে,—
প্রেরিত পুরুষবর, তুমিই কাণ্ডারী মোর ভবে।

মহম্মদের দাড়ি-প্রদর্শন ঃ—উপাসনা-সময়ে সহস্র সহস্র কণ্ঠের এহেন প্রার্থনা-গীতি ও সহস্র নরদেহের দোদুল্যমান বিক্ষেপ শব্দ-মুখর সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় এক বিরাট ভাবের সূচনা করিয়া তোলে। উপাসনান্তে জনৈক মোল্লা কর্ত্তৃক মহম্মদের দাড়ি প্রদর্শিত হয়। সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া উদ্‌গ্রীব ভাবে নির্নিমেষ লোচনে ঐ দাড়ি দেখিতে থাকে। এবং উহা স্পর্শ করিলে অন্ধকে দৃষ্টিদান করিবার শক্তি জন্মে, এই বিশ্বাসে দাড়ির আধার কাচপাত্রটী স্পর্শ করিবার নিমিত্ত সকলেই উতলা হইয়া উঠে। ভক্তগণ এই স্থানে নানাবিধ দ্রব্য 'ডালি' দিয়াও এই দিনে মহম্মদের প্রতি হৃদয়ের ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যাত্রীদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ করিবার নিমিত্ত সেদিন মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়।

বেজহেহোরা মেলা ঃ—শ্রীনগরের উপকণ্ঠে ধর্ম্মসাধনার উপযোগী অনেকগুলি জিয়ারত আছে। এই-সকল মন্দির প্রধানতঃ শুক্রবারের নমাজের কার্য্যে ও সাময়িক ধর্ম্মোৎসবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। শ্রীনগরের ২৯ মাইল দূরে বেজহেহোরা-মন্দির এইরূপ ধর্ম্মসাধনার ও ধর্ম্মোৎসবের একটী প্রধান স্থল। প্রতিবৎসর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই স্থানে একটী মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই মেলাটি অত্যন্ত বৃহৎ এবং ইহার স্থায়িত্ব-কাল
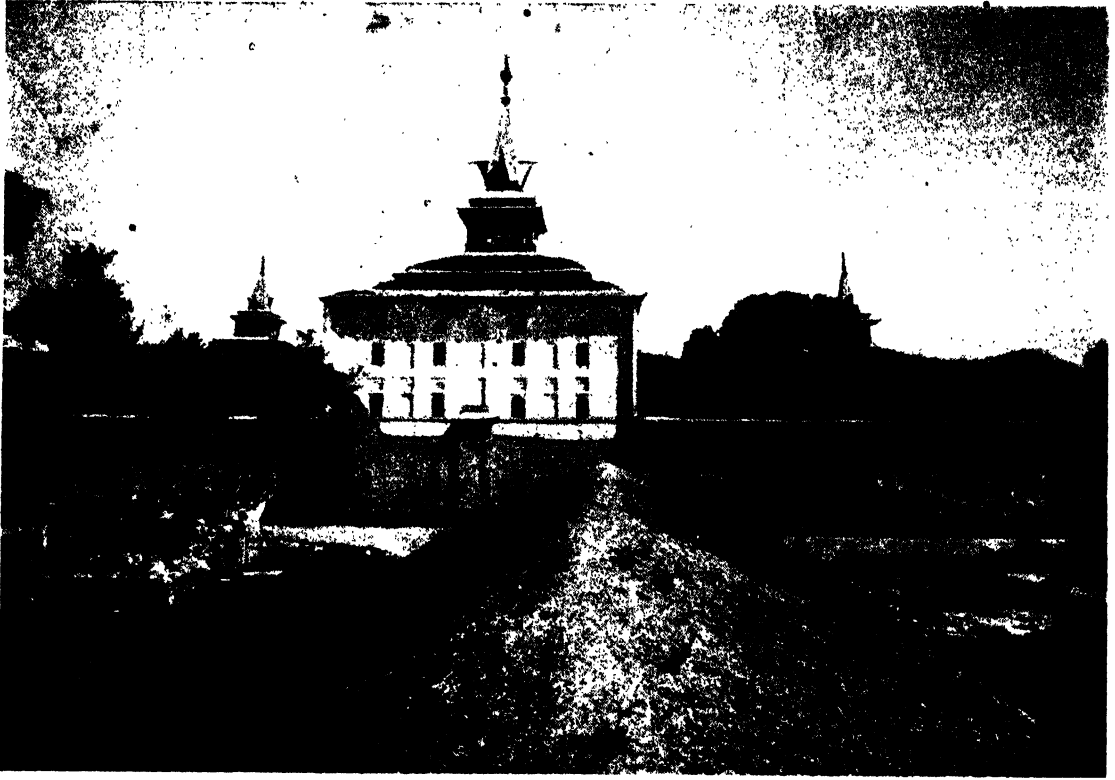
কাশ্মীর শ্রীনগরের জুম্মা মসজিদ।

এক সপ্তাহ। হিন্দুস্থানের নৌচণ্ডী, গড়মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মেলা হইতেও এই মেলায় জনসাধারণের অধিক ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ছয় সাত দিন পূর্ব্ব হইতেই দেশবিদেশস্থ বহু নরনারী এই মেলায় সমবেত হইতে থাকে।

জুম্মা-মস্‌জিদ ঃ—শ্রীনগরের জুম্মা-মসজিদটী এক সময়ে কাশ্মীরের গণমণ্ডলীর উপাসনা ও ধর্ম্মোৎসবের প্রধান স্থল ছিল। দেবদারু-কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রায় ১৮০টী বিশাল কড়ির উপর ইহার ছাদ প্রতিষ্ঠিত। অধুনা এই মন্দিরটী ভগ্ন দশায় পতিত হইয়াছে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

দিদি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক ঃ—অমরনাথ বন্ধু দেবেন্দ্রকে না জানাইয়া সুরমাকে বিবাহ করিয়াছিল। দেবেন্দ্র না জানিয়া চারুর সহিত অমরনাথের জীবন-ঘটনা এমন জড়াইয়া ফেলে যে অমর চারুকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ফলে সে পিতাকর্ত্তৃক ত্যাজ্যপুত্র হইয়া চারুকে লইয়া স্বতন্ত্র থাকে, এবং সুরমা শ্বশুরের সংসারের কর্ত্রী হইয়া উঠে। অমরের পিতার মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে ক্ষমা করিয়া চারুকে সুরমার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞা চারু দিদিকে আশ্রয় পাইয়া আনন্দিত হইল দেখিয়া সুরমাও সপত্নীর দিদির পদ গ্রহণ করিল।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামী বাড়ী আসাতে সুরমা সংসারের কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিল। কিন্তু অমর চিরকাল বিদেশে কাটাইয়া সংসার-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সে বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য সুরমার শরণাপন্ন হইল।

এইরূপে ক্রমে স্বামী স্ত্রীতে পরিচয় হইল। অমর দেখিল সুরমার মধ্যে কি মনস্বিতা, তেজস্বিতা, কর্ম্মপটুতা ও একপ্রাণ বাধিত স্নেহ আছে। অমর মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে স্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। শ্রদ্ধা ক্রমে প্রণয়ের আকারে তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

সুরমা বুঝিল যে চারুর স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া চারুর প্রতি অন্যায় করিতে যাইতেছে, এবং সেও নিজের অলক্ষ্যে চারুর স্বামীকে

ভালবাসিতেছে। তখন সুরমা স্থির করিল যে ইহাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। চারুর অশ্রুজল, চারুর পুত্র অতুলের স্নেহ, অমরের অনুরোধ তাহাকে টলাইতে পারিল না। বিদায় লইবার সময় অমর সুরমাকে বলিল, যাইবার পূর্ব্বে একবার বলিয়া যাও যে ভালবাস। সুরমা জোর করিয়া "না" বলিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে কাঁদিয়া লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল "ওগো শুনে যাও আমি তোমায় ভালবাসি।"

সুরমা পিত্রালয়ে গিয়া তাহার বিমাতার ভগ্নী বালবিধবা উমাকে অবলম্বনস্বরূপ পাইয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইল। সুরমার সমবয়সী সম্পর্কে কাকা প্রকাশ উমাকে ভালবাসে, উমাও প্রকাশকে ভালবাসে, বুঝিয়া উভয়কে দূরে দূরে সতর্কভাবে পাহারা দিয়া রাখা সুরমার কর্ত্তব্য হইল।

এদিকে চারুর একটি কন্যা হইয়াছে; এবং চারুর সম্পর্কে ভাইঝি মন্দাকিনী তাহার দোসর জুটিয়াছে। কিন্তু দিদির বিচ্ছেদ-বেদনা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অমরও সান্ত্বনা পাইতেছিল না। শেষে স্থির হইল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতে হইবে। কাশীতে গিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে একদিন হঠাৎ অমরের সহিত সুরমার দেখা হইয়া গেল। ক্রমে চারুও দিদির সন্ধান করিয়া সুরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এই সময় সুরমা চারুর ভাইঝি মন্দাকিনীকে দেখিয়া স্থির করিল যে তাহার সহিত প্রকাশের বিবাহ দিয়া উমাকে বুঝাইতে হইবে যে প্রকাশ তাহার কেহ নহে, এবং প্রকাশকেও উমাকে ভুলাইতে হইবে।

প্রকাশ ব্যথিত হৃদয়ে সুরমার এই দণ্ডাদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। সুরমা প্রকাশের বিবাহের দিন উমাকে লইয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিল। প্রকাশ-মন্দাকিনীর বিবাহ হইয়া গেলে সুরমা কাশীতে ফিরিয়া আসিল। চারু সংবাদ পাইয়া দিদিকে তাহাদের নূতন-কেনা বাড়ীতে চড়িভাতির নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। চড়িভাতির দিন খালিগাড়ী ফিরিয়া আসিল, সুরমা হঠাৎ পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। সুরমার পিতা কাশীবাস করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন; সুরমাও পিতার সহিত কাশীবাস করিবে স্থির করিল।

কাশীবাস করিবার সময় সুরমা প্রকাশের চিঠি পাইল যে মন্দা অত্যন্ত পীড়িত। সুরমা পিতা ও উমাকে কাশীতে রাখিয়া একাকী পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে মন্দা অত্যন্ত পীড়িত। তাহার উপেক্ষায় মন্দা পীড়িত হইয়াছে মনে করিয়া প্রকাশ অনুতপ্ত হইয়া মন্দার আরোগ্য কামনা ও সেবা যত্ন করিতে লাগিল।]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা আসার পরে একমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল, এত ধীরে, যে, সহজে সে উন্নতিটুকু লক্ষ্য হয় না। নিদাঘ-শুষ্ক লতিকা যেমন বর্ষাবারি সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে তেমনি ভাবে অতি ধীরে তাহার প্রাণশক্তি সবল হইয়া উঠিতেছিল। প্রকাশের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া সুরমা বুঝিল যে মন্দার সাধনা সার্থক হইয়াছে। তথাপি মনে হইতেছিল মানুষের কতটুকু ক্ষমতা! মানুষ ত অশ্রান্ত চেষ্টায় আপনার জীবন বলি দিয়াও ইষ্টদেবের প্রসন্নতালাভ করিতে পারে না, কেবল ভগবান প্রসন্ন হইলে তবেই তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া সুরমার নিজের নিষ্ফলতায় প্রাণ হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল। আশা তৃষা সুখ দুঃখ কর্ত্তব্যবুদ্ধি লুটাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা না হইলে বুঝি তাঁহার সে কৃপাদৃষ্টি পাওয়া যায় না। সুরমা তাহা তো পারে নাই। সে যে সর্ব্বদা সর্ব্ব সুখদুঃখ হইতে সর্ব্ব বিষয় হইতে "আমি"কে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের সর্ব্ব সুখ দান করিয়া আপনি অন্তরে অন্তরে দূরে থাকিতেই চাহিত। নিজ অধিকার অম্লানবদনে পরকে দিয়া তাহার সুখে সুখী হইবার অভিমান সতত হৃদয়ের মধ্যে সে জাগাইয়া রাখিয়া চলিত। অন্যের কাছে এ ছদ্মবেশটুকু খাটে কিন্তু যিনি বিধাতা তিনি যে অহঙ্কার মাত্রেরই দণ্ডদাতা। সুরমা অন্তরে অন্তরে তৃষিত থাকিয়া বাহ্যিক এমনি ভাব ধারণ করিয়াছিল যে সে আপনিও আপনার কাছে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিত। তাহার ছদ্মবেশ তাহাকেও ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। সে আন্তরিকই ভাবিত সত্যই বুঝি তাহার অমরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই বন্ধন নাই। তাহার কাছে সুরমার চাহিবার বা তাহাকে দান করিবারও কিছুই নাই। তাই বিধাতা অন্তরে অন্তরে ক্রমশঃ তাহার দর্পচূর্ণ করিতেছিলেন।

বৈকালে মন্দাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য তাহার কক্ষের দিকে যাইতে গিয়া সুরমা বুঝিল প্রকাশ সে কক্ষে আছে। একটু সরিয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইল। তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য একটা চপল আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সে দমন করিতে পারিল না। দেখিল মন্দা বিছানায় শুইয়া আছে, নিকটে একখানা চেয়ারে বসিয়া প্রকাশ নীরবে একখানা পুস্তক দেখিতেছে। মন্দার বদ্ধ দৃষ্টি প্রকাশের মুখের উপরে। নয়নে আনন্দচ্ছটা, মুখে তৃপ্তির মৃদু হাসি, দেখিয়া সুরমা একটু নিশ্বাস ফেলিল। ঘড়ীতে চারিটা বাজিবামাত্র প্রকাশ একটু চমকিত ভাবে পুস্তক ফেলিয়া বলিল "চারটে বাজল, ওষুধ দেবার সময় হ'ল।" মন্দা মৃদুস্বরে বলিল "মাকে ডাকতে পাঠান্।" "কেন আমি দিই না?" মন্দা একটু

লজ্জিত হাস্যে বলিল "ওটার অনেক খিচিবিচি, দুটো তিনটেকে এক সঙ্গে কর্‌তে হবে! মাকে ডাক্‌লেই আস্‌বেন।" "তা হোক্ না আমিই দিচ্চি!" প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়া মন্দা আর কিছু বলিল না। ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ফিরিয়াই দেখিল মন্দা খাট হইতে নীচে নামিয়া বসিয়াছে, বিস্মিত হইয়া বলিল "ও কি নাম্‌লে কেন?" "শুয়ে শুয়ে আর খেতে ভাল লাগে না, দেন।" বলিয়া ঔষধের নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল। প্রকাশ বুঝিল তাহার সেবা লইতে মন্দা এখনো কুণ্ঠা বোধ করে। ঈষৎ ক্ষুন্নস্বরে বলিল "আমায় বল্‌লে না কেন নিজে অমন করে নামা ভাল হয়নি।" "আর ত সেরে গেছি। এখনো কেন আপনারা অত করেন!" প্রকাশ উত্তর না দিয়া ঔষধের গ্লাস মন্দার হাতে দিল। ঔষধ পানান্তে প্রকাশ বেদানা ছাড়াইতেছে দেখিয়া আবার মন্দা তাহার হাত হইতে সেটা টানিয়া লইতে গেল "দেন আমি ছাড়িয়ে নিচ্চি, এ ওষুধ তত তেত নয়।" প্রকাশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল "মন্দাকিনী।" মন্দা স্বামীর দিকে চাহিল। "আমি কিছু কর্‌তে গেলে অমন কর কেন? ভাল লাগে না?" মন্দা মৃদুস্বরে বলিল "না।" "কেন?" "ওকি আপনার কাজ!" "কেন নয়?" "না।" "আমার সেবা করা তোমার কাজ?" "হ্যাঁ।" "তবে আমার নয় কেন?" "ছি ছি ওকথা বল্‌তে নেই।" "তবে তোমার কাজ কেন?" মন্দা নীরবে রহিল। প্রকাশ আবার প্রশ্ন করিল উত্তর পাইল না। তখন আরও নিকটে গিয়া মন্দার কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখিয়া অন্য হাতে তাহার কৃশ পাণ্ডুবর্ণ হাত তুলিয়া লইয়া প্রকাশ বলিল "উত্তর দেবে না?" মন্দা মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল "দেব।" "আমার সেবা তোমার কাজ কেন?" "আমরা যে মেয়েমানুষ।" "মেয়েমানুষেরই কর্ত্তব্য আছে, পুরুষের নেই?" "অনেক বেশী, কিন্তু মেয়েমানুষের সেবা করা নয়।" "তবে কি?" "আমি কি সব জানি! শুনেছি তাঁদের অনেক কাজ।" প্রকাশের যাহা মনে হইতেছিল তাহা বুঝি জিহ্বায় আসিতেছিল না. ক্ষণেক পরে কেবল বলিল "তুমি আমায় আপনি বল্‌বে আর কত দিন?" মন্দা নতমুখে বলিল "চির দিন।" "আমার ওকথাটা ভাল লাগে না, তুমি আমায় তুমি বলতে পার না?" মন্দা আবার নীরবে রহিল, আবার স্বামীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল "বল্‌বো।" প্রকাশ সাগ্রহে বলিল "কবে?" "যে দিন—" মন্দা নীরব হইল। "যে দিন কি? বলনা—বল্‌বে না?" প্রকাশের ক্ষুন্ন স্বরে ব্যথিত হইয়া মন্দা উত্তর দিল—"যে দিন আপনাকে খুব সুখী দেখ্‌ব।" "কেন আমি কি দুঃখী?" "দুঃখী নয়, তবু খুব সুখী যে দিন দেখব।" "আমি ত এখন অসুখী নই মন্দা।" "এত দিন ছিলেন।" ঈষৎ ম্লান মুখে প্রকাশ বলিল "আমি সুখী ছিলাম না কিসে বুঝ্‌তে?" মন্দা একবার তাহার স্নিগ্ধ শান্ত প্রেমপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিল,—সে দৃষ্টি যেন নীরবে প্রকাশকে বুঝাইয়া দিল, আমি তোমার মুখপানে চাহিয়াই দিন কাটাই, তুমি সুখী কি অসুখী তাহা আমাকে কি লুকাইতে পার! প্রকাশ নীরবে রহিল। মন্দা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আপনি রাগ কল্লেন কি? আমায় মাপ করুন,—আমি না বুঝে, কি বলতে কি বলেছি।" প্রকাশ ম্লান হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "একি দোষের কথা মন্দা? তুমি আমার বিষয়ে এত ভাব তার প্রমাণ পেয়ে কি আমি রাগ কর্‌তে পারি? সত্যই আমি অসুখী ছিলাম, কিন্তু তুমিই আমায় সুখী করেচ. বোধ হয় এর পরে আরও কর্‌বে।" মন্দা সহসা মস্তক নত করিয়া স্বামীকে একটা প্রণাম করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। প্রকাশ বিস্মিত ভাবে এক হাতে তাহার মুখ ধরিয়া ফিরাইয়া দেখিল চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। ব্যথিত বিস্ময়ে প্রকাশ বলিল "একি মন্দা! কাঁদ কেন?" মন্দা উত্তর দিল না। "আমি কি কিছু দোষ করেছি? বল কি দোষ—।" মন্দা ব্যগ্রভাবে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "ওরকম বল'না! ওতে আমার বড় কষ্ট হয়, তুমি—" মন্দা থামিয়া গিয়া লজ্জিত ভাবে মস্তক নত করিল, আবার তখনি মাথা তুলিয়া বলিল "মানুষ কি কেবল দুঃখে কেঁদে থাকে, আনন্দে কাঁদে না?" "কিসে এমন আনন্দ পেলে যে কাঁদ্‌লে?" "আপনি যে বল্লেন আমি আপনাকে সুখী

করতে পারব।" প্রকাশ আর কিছু না বলিয়া এক হাতে তাহার একখানা হাত ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সুরমা ধীরে ধীরে জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া তৃপ্তির একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কর্ম্মান্তরে গেল।

পিতার পত্রের উত্তর লিখিয়া সুরমা প্রকাশের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র প্রকাশ বলিল "খবর শুনেছ?" সহসা সুরমার বোধ হইল যেন কি একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ বুঝি বজ্রের মত তাহার মস্তকে পতিত হইতে উদ্যত! মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল,—স্থির নেত্রে প্রকাশের পানে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল "কিসের খবর?" "অমন হলে কেন—ভয়ের কিছু নয়।" "বল।" "মাণিকগঞ্জ থেকে পত্র এসেছে।" "কিসের পত্র? কে লিখেছে?" "পিসেমশাই লিখেছেন—অসুখের খবর শুনে নিয়ে যেতে ভারী ব্যগ্র হয়ে লিখেছেন"। সুরমা ক্রমে প্রকৃতিস্থা হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তবু যেন কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক, চরণ ঈষৎ কম্পিত। বলিল "সব ভাল ত?" "তা ত বিশেষ কিছু লেখেননি, রাজপুতানা থেকে ক'দিন মাত্র বাড়ী এসেই আমার পত্রে অসুখের খবর পেয়েছেন। আমি ত' তাঁদের ঠিকানা জানতাম না—মাণিকগঞ্জেই একখানা পত্র লিখে দিয়েছিলাম।" "তার পরে? মন্দাকে নিয়ে যাবার কথা বুঝি?" "হ্যাঁ, লোক পাঠাবেন লিখেছেন। আমি বারণ করে লিখলাম, একটু সবল না হলে রাস্তায় যাওয়া হতে পারেনা। লিখলাম আমি গিয়ে দেখা করিয়ে আনব—কি বল? ভাল হয়না কি? আমার হাতেও এখন বিশেষ কিছু কাজ নেই।" "বেশত! গেলে তারা খুব খুসীও হবে।" মন্দা এ পত্রের কথা শুনিল—শুনিয়া অবধি সে আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যহই মিনতিপূর্ণ স্বরে সুরমা ও প্রকাশকে বলিতে লাগিল "আমি ত বেশ সবল হয়েছি আমায় কবে নিয়ে যাবেন?" সুরমাও বলিল "ওর মন যখন অত উৎসুক হয়েছে তখন নিয়েই যাও—মিছে দেরী করে কি হবে।" প্রকাশ বলিল "তুমি কাশী যাচ্ছ কবে?" "আমি? কাশী? তার এখনো দেরী আছে।" "আমরা গেলে একলাই কি এখানে থাকবে নাকি?" "তাতে ক্ষতি কি!" "না না তা কি হয়! একা কষ্ট হবে। থাক্ আমরা দুদিন পরেই যাব।" "তুমি দুদিন পরে যাবে কিন্তু কাশী যেতে আমার এখনো দেরী আছে। আমায় কিছু দিন এখানে থাকতে হবে।" "তুমি কাশী ছেড়ে কিছুদিন এখানে থাকবে? নিশ্চিন্ত হতে পারবে?" "চিন্তা কিসের?" "যারা সেখানে আছে তাদের জন্যে।" "তাদের জন্যে আমার আর চিন্তা নেই প্রকাশ! বাবাকে উমার কাছে দিয়ে এসেছি, আর উমাকে বিশ্বেশ্বরের পায়ে রেখে এসেছি।" প্রকাশ নত মস্তকে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, মৃদুস্বরে বলিল "সেই স্থান তার অক্ষয় হোক্।" সুরমা প্রকাশের মুখ নিরক্ষীণ করিয়া দেখিল—মুখখানা যেন অনেকটা মেঘমুক্ত! কথা কয়টি যেন হৃদয়ের অমলিন শুভ্র আশীর্ব্বাদেরই মত! সুরমা তৃপ্ত হইয়া বলিল "তবে তোমরা কালই যাও।" "তুমি একা থাকবে?" "ক্ষতি কি!" প্রকাশ আবার অনেকক্ষণ ভাবিল,—সুরমার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "একটা কথা বলবো?" "কি কথা?" "সাহস দাও ত বলি।" "বলবার হয় বল।" "তুমিও কেন আমাদের সঙ্গে চলনা?" সুরমা শিহরিয়া উঠিল—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "কোথায়?" "মাণিকগঞ্জে।" মাণিকগঞ্জে! একি পরিহাস? যদি সেখানেই তাহার স্থান থাকিবে তবে সে আজন্ম গৃহহারা নষ্টাশ্রয় কেন? অসীম ধরণীর মধ্যে এমন ভাবে একটু স্থান খুঁজিয়া বেড়াইবে কেন! সে আবার সেখানে যাইবে? কোন্ লজ্জায় যাইবে? সেখানের স্নেহ ভালবাসাকে অপমান করিয়া উপেক্ষা করিয়াই কি সে চলিয়া আসে নাই! যাইবার পথ সে কি রাখিয়াছে? বন্ধন ছিন্ন করিলেও লোকে মুখের সৌহার্দ্দ্য রাখে, সে তাহাও রাখে নাই। তাহার আর সেখানে স্থান নাই, ক্ষণেকের পদার্পণেও সে ভূমি কলঙ্কিত করিবার অধিকার নাই। সুরমাকে নীরব দেখিয়া প্রকাশ আবার বলিল "কি বল? যাবে? গেলে কি কিছু ক্ষতি আছে?" "ক্ষতি? কার যাবার কথা বলছ—আমার?" "হ্যাঁ—আবার আমাদের সঙ্গে ফিরে আসবে? তিনিও তো দেখা করতে একবার এসেছিলেন—এতে দোষ কি?"

"দোষ নেই বল্‌ছ ?" "না।" "তবে যাওয়া যায় প্রকাশ ? কেউ কিছু বলে না ?" 'বল্‌বে ? সে কি কথা!" "কেউ বল্‌বেনা যে আবার কিসের জন্যে এসেছ ?" প্রকাশ সরল হাস্যে বলিল "না না, তাও কি সম্ভব! তাঁরা খুব খুসীই হবেন দেখ্‌বে।" "তুমি ত' জাননা প্রকাশ, আমি কাশীতে একটা মস্ত অন্যায় করেছি! তাদের সঙ্গে, চারুর সঙ্গে দেখা কর্‌ব বলে শেষে না দেখা করে পালিয়ে এসেছিলাম। সেই পর্য্যন্ত চারু আমায় পত্র দেয় না।" "সেই ত বল্‌ছি চল না, অন্যায়টার ক্ষমা চেয়ে আস্‌বে, যাদের অত স্নেহ কর, তাদের মনে এতটা মালিন্য না রাখাই উচিত।" "শুধু একটা নয়, এমন অনেক অন্যায় আছে।" "চল ক্ষমা চেয়ে আস্‌বে।" সুরমা সহসা যেন নিতান্ত বালিকার মত হইয়া পড়িল। নিজ বুদ্ধিতে সে আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে সাধ্য তাহার আর যেন নাই। পরম দুর্ব্বলতার সময় দৃঢ়ভাবে কেহ কিছু বলিলে তাহা দৈববাণীরই মত বোধ হয়। তাহা অবহেলা করিতে ইচ্ছাও হয় না সাহসও হয় না। সুরমার মস্তিষ্কে আর কিছু প্রবেশ করিতেছিল না, কেবল কর্ণে বাজিতেছিল, "এখনও সেখানে যাওয়া যায়।" মন বলিতেছিল "একবার ক্ষমা চাহিয়া এস—মেয়ে-মানুষের এত দর্প ভাল নয়! সে দর্প চুর্ণ হইতেছে,—তবু এত চাতুরী কেন! অনেক অন্যায় করিয়াছ, আর নয়—একবার ক্ষমা চাহিয়া লও।" অন্তরাত্মা বলিতে-ছিল, "ক্ষমা পাইবে,—তাহারা ক্ষমা করিতে জানে।" সুরমা মনে মনে এতগুলার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত, কাজেই প্রকাশের সহিত কথাগুলা অত্যন্ত ছেলে-মানুষের মতই হইতেছিল। সুরমাকে নীরব দেখিয়া আবার প্রকাশ বলিল "আর মন্দা এখন' তেমন সবল হয়নি, রাস্তায় একা নিয়ে যেতে একটু ভয় পাচ্চি! তুমি গেলে কোন' ভয় থাকেনা।" সুরমা যেন এতক্ষণে একটা সুদৃঢ় আশ্রয় পাইল, অন্তরেরও অন্তরের মধ্যে এখনো যেটুকু আত্মাভিমান তাহাকে রক্তিমলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিল তাহার নিকটে কৈফিয়তের যেন একটা ছল পাইল। সত্যই মন্দাকে কেবল প্রকাশের উপর নির্ভর করিয়া পাঠাইতে পারা যায় না। বুঝিল না যে এ কৈফিয়ৎ নিতান্ত বালকোচিত হইয়াছে। সাগ্রহে প্রশ্ন করিল "সাহস করতে পার না ?" "না।" "তবে উপায় ? না পাঠালেও ত' ওর মন ভাল হবে না, তাতে ব্যারাম আবার বাড়্‌তে পারে।" "এক উপায় যদি তুমি যাও।" "তবে অগত্যা তাই, নইলে উপায় কি!—কিন্তু প্রকাশ! একটা কথা!" "কি ?" "আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসো।" সুরমার স্বভাববিরুদ্ধ এই দুর্ব্বলতাতে প্রকাশ বিস্মিত হইল না,—সে যেন কতকটা বুঝিয়াছিল, —তাই সে সুরমার যাওয়ার কথা তুলিতে সাহসী হইয়াছিল। সুরমার কথায় সকরুণ স্নেহ-হাস্যে বলিল "নিজের বাড়ী যাচ্চ—তাতে এত ভয় ?" "নিজের বাড়ী? আমার বাড়ী—কোথাও নেই,—ওকথা বলোনা।" "ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ব বই কি ? তুমি যে এঘরের লক্ষ্মী—তোমায় না হলে এখানে চলে।" সুরমা আবার আহত ভাবে বলিল "কে ঘরের লক্ষ্মী প্রকাশ ? এখানের ঘরের লক্ষ্মী মন্দা! তাকে যত্ন ক'রে ধরে রেখ—সকলের মঙ্গল হবে।" প্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল —"আবার বলি, রাগ ক'রোনা, তুমি তাহলে এখনো নিজের ঘর চেননি, তাই এমন লক্ষ্মীছাড়া।" "ওসব কথা থাক্, কবে যাবে ?" "কাল। সব ঠিক করে নাও।" "কাল ? কালই প্রকাশ! আর দুদিন যাক্।" সুরমার অন্তর কি একটা ভয়ে যেন একটু একটু কাঁপিতেছিল, তাই সে মেয়াদ পিছাইয়া দিতে চায়। প্রকাশ স্বীকৃত হইল না। মন্দা সুরমার যাওয়ার কথা শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলে সুরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল "কিন্তু আমায় ফিরিয়ে এনো শীগ্‌গির।" আত্মশক্তিতে সে এমনি অবিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছিল। মন্দা ভাবিল চারু বুঝি আসিতে দিতে চাহিবে না, সুরমা তাই ও কথা বলিল। মন্দা হাসিয়া বলিল "আমি আপনাকে ছেড়ে দিলে ত'।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চারি বৎসর—সুদীর্ঘ চারি বৎসর পরে! তথাপি সবই ত সেইরূপ রহিয়াছে, সেই উন্নত বৃক্ষশ্রেণী, সেই ঝাউ-গাছগুলা মস্তক উন্নত করিয়া শোঁ শোঁ রবে নিশ্বাস

ত্যাগ করিতেছে, দূরে বিগ্রহ-মন্দিরের চক্রযুক্ত চূড়ার অগ্রভাগ তেমনি দেখা যাইতেছে! সেই শ্বেত সুউচ্চ প্রাচীর, প্রস্তরধবল গেট, দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত সবুজ-তৃণাস্তরণসমন্বিত লোহিত কঙ্করময় পথ—সম্মুখে সেই বৈঠকখানার ধবল কান্তি। গাড়ী গিয়া ধীরে ধীরে যেখানে চারি বৎসর পূর্ব্বে সুরমা একদিন শেষ বিদায় লইয়া শকটে আরোহণ করিয়াছিল সেই স্থানে লাগিল। প্রকাশ নামিয়া গেল। কিন্তু সুরমার পদ এমন কম্পিত হইতেছিল যে নামা তখন তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। ক্ষণেক পরে চাহিয়া দেখিল দ্বারের নিকটে কেহ উপস্থিত নাই। তখন ঈষৎ সাহস পাইয়া শকট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, পার্শ্বেই মন্দার শিবিকা, মন্দা আপনিই নামিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে গিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে তাহাকে পাল্কী হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের কাঁধের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাইতে করাইতে অনুভব করিল পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। তখনি হস্ত অপসৃত হইল—সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হইল "কে?" সুরমা উত্তর দিল না বা মুখ ফিরাইল না, নীরবে মন্দাকেই সাহায্য করিতে লাগিল। যে আসিয়াছিল তাহাকে মন্দা নত হইয়া প্রণাম করিতে গেল, সে হাত ধরিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "থাক্ মা, এমন হ'য়ে গেছ! এ ত স্বপ্নেও জানিনা। এত অসুখ হয়েছিল?" মন্দা নতমুখে একটু হাসিয়া চারুর পায়ের ধূলা তুলিয়া লইল। মন্দাকে ধরিয়া সুরমা অগ্রসর হইতে লাগিল, পশ্চাতে পশ্চাতে বিস্মিতা চারু। সম্মুখে পুরাতন দাসীরা একে একে সুরমাকে নমস্কার করিতেছে; কাহারো বাক্‌নিষ্পত্তি না দেখিয়া তাহারাও কথা কহিতে না পারিয়া কেবল আপনাদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন তুলিতে লাগিল।

কক্ষে গিয়া একটা শয্যায় মন্দাকে বসান' হইল। সুরমা মৃদুস্বরে বলিল "একটু শোও।" "না মা, আমার ত বেশী কষ্ট হয়নি।—পিসিমা অতুল কই? খুকী কই?" "তারা বুঝি বাইরে।"—চারু মৃদুস্বরে উত্তর দিল, সেও যেন কথা কহিতে পারিতেছিল না। একজন দাসী আসিয়া বলিল "বাবুরা আস্‌ছেন।" সুরমা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল, কি করিয়া এ দুর্নিবার লজ্জার হস্ত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে তাহা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মস্তকের ভিতরে যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। কেন এ কার্য্য সে করিয়া ফেলিল—এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কেন এ সময়টার কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখিল না। এখন যদি সমস্ত জীবনের বিনিময়েও সুরমাকে কেহ এই ঘটনাটা উল্টাইয়া দিতে পারিত সে বোধ হয় তখনি সম্মত হইত। এখনি ত অমর শুনিবে সে আবার আসিয়াছে, হয়ত শুনিয়াছেও। যে সর্ব্ববিষয়ে এত অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছে,—সম্মানের স্নেহের উচ্চ আসন যে একদিন সগর্ব্ব পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া গিয়াছে, আজ সে ভিক্ষুকের মত, অনাহুত অযাচিত আবার তাহাই কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে? ছিছি কি লজ্জা! কি ঘৃণা! তাহার এত শোচনীয় অধঃপতন কেন হইল! কি চেষ্টায় এ কলঙ্ক সে স্খালন করিবে!

আগে অতুল পরে অমর ও প্রকাশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চারু ও মন্দা মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। অমর মন্দার শয্যার এক পার্শ্বে আসিয়া বসিলে প্রকাশ দূরে সরিয়া গিয়া অতুলের সঙ্গে গল্পে প্রবৃত্ত হইল। অমর বলিল,—"এমন শরীর হয়ে গেছে! এখানে না থাকায় এত দিন কিছুই টের পাইনি। এখন কেমন আছ মন্দা?" মন্দা মৃদুস্বরে বলিল "এখন বেশ ভাল আছি—আপনি ভাল আছেন?" "বেশ আছি, ওদিকের জল হাওয়া ভাল, তুমি আর একটু সার্‌লে সেখানে আর একবার যাওয়া যাবে—তাহলে শীগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌বে।" মন্দা অমরকে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া অমর বলিল "অতুলকে দেখেছ? অতুল এদিকে আয়।" অতুল আসিয়া মন্দার নিকটে দাঁড়াইল। হৃষ্ট পুষ্ট নধর কোমল অঙ্গ, সাত বছরের বালকটি, গতিতে ভঙ্গীতে এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।—মন্দা সস্নেহে সানন্দে মৃদু কণ্ঠে বলিল "এখন ত খুব বেড়ে উঠেছে! অতুল আমায় চিন্‌তে পারছ না?" অমর অতুলের পানে সহাস্যে চাহিলে অতুল হাসিয়া উত্তর দিল "হ্যা।" "কে বল দেখি?" "ছোট দিদি।" অমর একটু বিস্মিত ভাবে বলিল "ছোট দিদি? আর

বড় দিদি কে রে?” “কাশীতে যিনি আছেন! মা. বলেন তিনি বড় দিদি, ইনি ছোট দিদি।” মন্দা অতুলের মুখ ধরিয়া নিঃশব্দে চুম্বন করিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল “রাস্তায় কোন' কষ্ট বোধ হয়নি ত?” “না।” “এস প্রকাশ আমরা বাইরে যাই—মন্দাকে শীগ্‌গীর কিছু খাওয়াও—আয় অতুল।” চারু মৃদুস্বরে বলিল “অতুল থাক্‌না।” “তবে থাক্‌—এস প্রকাশ।” প্রকাশ ও অমর বাহিরে চলিয়া গেল। সুরমা বুঝিল প্রকাশ অমরকে কিছু বলে নাই। অমর বাহির হইয়া গেলে প্রকাশ দু একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। সুরমা কক্ষের বাতায়নের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে সব সেই রকমই আছে, কেবল মানুষই কালের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে!—নহিলে আজ চিরপরিচিত চিরদিনের গৃহে সুরমা লজ্জায় শঙ্কায় মরিয়া যাইতেছিল কেন! সুরমা পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—পশ্চাতে জুতার মৃদু শব্দ হইল—সুরমা ফিরিল না। কেবল পৃথিবীকে মনে মনে বিদীর্ণ হইতে অনুরোধ করিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে কে ডাকিল “মা।” মুহূর্ত্তে সুরমা ফিরিয়া দাঁড়াইল—। এইত তাহার চিরদিনের সেই ধন! এইত সেই সম্বোধন! ইহার ত' কই কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতুল আরও নিকটে আসিয়া আঁচল ধরিল—তেমনি কণ্ঠে বলিল “এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমিত' কই আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি, লুকিয়ে আছেন বুঝি?” সুরমা দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার স্পর্শ তাহার কণ্ঠ আজিকার মত মধুর বুঝি আর জীবনে কখনো সে অনুভব করে নাই। অতুলকে চুম্বন করিতে গিয়া সুরমার রুদ্ধ জ্বালা এতক্ষণে অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অতুল দুই শুভ্র ক্ষুদ্র হস্তে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল “চলুন মা, এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন!—আমরা কেমন চমৎকার পায়রা এনেছি, একটা হরিণ এনেছি, খুকী হরিণের কাছে ভয়ে, যেতে পারেনা দূর থেকে কেবল আমাল্‌ আমাল্‌ করে। চলুন না দেখ্‌বেন।” অতুলের প্রবোধ দেওয়া শুনিয়া সুরমা বড় সুখে হাসিয়া বলিল “দেখ্‌বো আর একটু পরে।” “বিকেলে দেখবেন তবে। সেই সময়ে আমি ওদের খাওয়াই। দেখুন খুকীর রকম দেখুন, বেড়ালের বাচ্চাটাকে না মেরে ফেলে ও ছাড়বেনা।” সুরমা ফিরিয়া দেখিল শুভ্র একটী কুন্দ-কলিকার মত তিন বৎসরের খুকী একটা বিড়াল-ছানা ক্রোড়ে লইয়া ভারী বিস্মিত ভাবে তাহাদের দেখিতেছে। সুরমা অন্য কোলে তাহাকেও তুলিয়া লওয়ায় সে বিস্মিত নেত্রে সুরমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অতুল হাসিয়া বলিল “ও ভারী ভুলো, ওর কিছু মনে থাকে না—বাড়ী এসে কিছুই চিন্‌তে পারে নি! কেবল “বাড়ী যাব” বলে কাঁদ্‌ছিল। ও কেবল মার কাছে থাক্‌তে ভালবাসে, আর কাউকে চেনেনা।” খুকী দেখিল নিতান্ত অন্যায় কথা হইতেছে। তাই আধ আধ কণ্ঠে বলিল “মাকে চিনি, আল্‌ বাবাকে চিনি, আল্‌ দাদাকে চিনি, আল্‌ মোটুকে, আল্‌ আনিকে, আল্‌ আজাকে।” অতুল অত্যন্ত হাসিয়া বলিল “মা ওর সব কথা বুঝতে পাল্লেন? ওর আদ্ধেক কথা বোঝাই যায়না—মোটু কি জানেন! হরিণটার নাম মট্‌রু, ও বলে মোটু, আর পায়রার নাম রাজা রাণী আছে কিনা, ও বলে আজা আনি।” সুরমা বিভোর হইয়া শুনিতেছিল। চারু যে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এতক্ষণ সে জানিতেও পারে নাই। মাকে দেখিবামাত্র খুকী ঝুঁকিয়া পড়িল—আর তাহার কোলে থাকিবে না। অতুল বলিল “দেখ্‌ছেন ওর মজা—মাকে দেখ্‌লে আর কোথাও থাক্‌বেনা—ভারী পাজী।” চারু কোলে-উঠিতে উৎসুক ঝুঁকিয়া পড়া কন্যাকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নত হইয়া সুরমার পায়ের ধুলা লইল। চারু জিজ্ঞাসা করিল “কেমন আছ দিদি?” “ভাল আছি।” বলিয়া অভিমানে স্ফুরিতাধরা খুকীকে লইয়া সুরমা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চারু কেমন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও যেন সুরমার অবকাশ নাই। চারু কিছুক্ষণ তাহাদের ক্রীড়া দেখিয়া তার পরে সুরমার হাত ধরিয়া বলিল “চল স্নান কর্‌বে,—অনেক বেলা হয়েছে।” অতুল ও খুকী কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। চারু বলিল “যা তোদের ছোড়দির কাছে

বস্‌গে, আমরা নেয়ে আসি।" সুরমার মন্দার কথা মনে পড়িল, বলিল "তাকে কিছু খাওয়াতে হবে।" "খাইয়েছি, —চল নেয়ে আসি।" "তুমি এখনো নাওনি?" "না সকাল থেকে অপেক্ষা করে করে দেরী হয়ে গ্যাল। গাড়ী পাল্কী ষ্টেশনে ঠিক মত পেয়েছিলে ত? পত্র পেয়ে তখনি পাঠান হয়েছিল।" সুরমা নীরবে চারুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উভয়ে স্নান সারিয়া লইল। সুরমা দেখিল ঝিয়েরা আর তাহাকে কেহ কিছু প্রশ্ন বা স্বাগত সম্ভাষণ করিল না, যেন সে চিরদিনই এখানে আছে, সে এখানে চির পুরাতন। বুঝিল চারুর শাসনে তাহারা এরূপ করিতেছে। চারুর প্রতি তাহার হৃদয় অনেকটা কৃতজ্ঞ হইল। সমস্ত দিন অতুল ও খুকী সুরমাকে অবসর মাত্র দিল না। আহারাদির পর তাহাদের হরিণ, পায়রা, খরগোস, গিনি পিগ, সাদা ইঁদুর দেখিতে দেখিতে ও তাহাদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বিবরণ শুনিতে শুনিতে বিকালবেলাটা কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল। মন্দার তত্ত্বাবধানও সেদিন সুরমা ভালরূপে করিতে পারিল না। একবার মাত্র মন্দার খোঁজে গিয়াছিল, সে তখন উঠিয়া বসিয়া চারুর সঙ্গে হাসিমুখে কত গল্প করিতেছিল, বলিল "আজ আর ওষুধ খাবনা মা, কাল থেকে খাব। আজ বেশ ভাল আছি।" সুরমা আর উপরোধ করিল না। অতুল আসিয়া তখনি ধরিল "বড়মা চলুন হরিণের খাওয়া দেখ্‌বেন।" চারু বলিল "একটু বস্‌বে না?" অতুল বলিল "না এখন বস্‌তে পাবেন না! মা চলুন না।" সুরমাকে টানিয়া লইয়া অতুল চলিয়া গেল। সুরমাও যেন ইহাতে বাঁচিয়া যাইতেছিল! এদের কাছে ত তাহার লজ্জার কিছুই নাই। অম্লান কোমল হাস্যে, বচনে, দৃষ্টিতে ইহারা কেবল আনন্দই দান করিতে থাকে।

সন্ধ্যার পর শ্রান্ত খুকী, নিদ্রিতা মন্দার শয্যাপার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িল। অতুল তখন বাহিরে মাষ্টারের নিকট পড়িতে গিয়াছে। চারু সুরমার নিকটে আসিয়া বলিল "দিদি ঘুম পাচ্চে বুঝি?" সুরমা জড়িত স্বরে বলিল "হুঁ।" "রাস্তার কষ্টে সকালেই ঘুম আসে। একটু ওঠোনা—দুটো কথা আছে।" "কাল বল্‌লে হবেনা?" "না। আমার ওপর রাগ করেছিলে?" সুরমা জড়িত-কণ্ঠে বলিল "রাগ? না।" "আমি যে এতদিন তোমায় পত্র লিখিনি - সেই কাশীতে—তার পর থেকে আর তোমার কোন' সংবাদ নিইনি—দিইনি।" সুরমা নীরবেই রহিল। "এখন মনে হচ্চে খুব অন্যায় করেছি —কিন্তু এতদিন মনে বড় রাগ, বড় দুঃখ হয়েছিল! মনে হয়েছিল—যথার্থই যদি আর আমাদের না চাও তবে কেন আর তোমায় বিরক্ত করি।" সুরমা কিছু একটা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চারু আর একটু নিকটস্থ হইয়া বলিল "দিদি! কথা কচ্চ না কেন? দোষ ক'রে থাকি ত মাপ কর।" সুরমা অনেক চেষ্টায় বলিল "ওসব কথা না চারু! —অন্য কিছু বল"— "আমার মন কি মান্‌ছে দিদি! —এসে পর্য্যন্ত তুমি ভাল করে কথা কচ্চ না! একবার আগেকার মত চারু বলে ডাক্‌লেও না।" সুরমা কষ্টে একটু হাসিল "সেকি রাগ করে?" "তবে কিসে?" "তবে সত্য করে বলি, আমি যে তোমার কাছে ক্ষমা নিয়ে যাব বলে এসেছি।" "সেইজন্যে এসেছ? আমাদের দেখ্‌তে নয়?" "তাতে আমার আর অধিকার কি। ক্ষমা চাইবার অধিকার আছে—তাই চাচ্চি।" "আমার কথা ছেড়ে দাও! আমার কাছে তুমি কখনো কিছুতেই দোষী হবে না। তুমি যদি অন্য কোথাও অপরাধী হয়ে থাক সেইখানে পার ত ক্ষমা চেয়ো।" সুরমা কলের পুতলীর মত বলিল "চাইবো।" "তবে চল ক্ষমা চাবে! তুমি এসেছ তিনি হয় ত জানেনেই না।" চারু উঠিল, সুরমার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া লইয়া চলিল। বারান্দা পার হইয়া উজ্জ্বল আলোক-শোভিত গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল। চারু ভাবিল পূর্ব্বে একবার খবরটা দেওয়ার প্রয়োজন। সুরমার পদ চারুর গতিরোধের পূর্ব্বেই তাঁহারি গতি বন্ধ করিয়াছিল। চারু বলিল "দাঁড়াও, আগে খবরটা দিই! তারপরে তুমি যেয়ো।" চারু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল অমর তখন শয্যায় শুইয়া একখানা খবরের কাগজ দেখিতেছে। চারু নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কি হচ্চে?" অমর কাগজখানা অপসৃত করিয়া বলিল

"দেখতেই পাচ্চ! আজ সমস্ত দিন টিকিটির দর্শন মেলেনি, —মন্দা কি কচ্চে?" "ঘুমুচ্চে।" "জ্বর টর হয়নি ত? প্রকাশ বলছিল হয়ত আজ কষ্টে জরটা আস্‌তে পারে।" "না, বেশ ভালই আছে। একটা খবর জান?" "কি খবর?" "একজন নূতন অভ্যাগত এসেছেন।" "নূতন অভ্যাগত কে?" "একজন খুব চেনা পুরোণো লোক। কে এমন হ'তে পারে মনে কর দেখি।" অমর একটু ভাবিয়া বলিল "কে জানে। কারু কথা ত' আমার মনে আসছে না—কে লোকটা?" "একজন অতিথি।" "স্ত্রীলোক ত?" "হ্যাঁ।" "কেউ কিছু চাইতে এসেছে বুঝি?" "হবে।" "কি চাইতে এসেছ?" "সে-ই বলবে।" "ভাল বিপদে পড়েছি। কে বল ত' বল, নইলে যাও, আমার পড়া হচ্চে না।" "এই যাচ্চি, সে অতুলের মা হয়।" চমকিত স্বরে অমর বলিল "কি হয়?" "অতুলের মা হয়।" অমর সবিস্ময়ে চারুর প্রতি চাহিল। এরূপ অবিশ্বাস্য কথায় কেন তাহার প্রত্যয় জন্মিবে? চারু বলিল "বিশ্বাস হচ্চেনা?" "যাও, এখন কাগজখানা পড়্‌তে হবে, বক্‌তে পাচ্চি না।" "বিশ্বাস হচ্চে না? তবে ডাকি!" বলিয়া চারু দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। "ওকি কর, কাকে ডাক্‌বে? শোন শোন।" বলিয়া অমর উঠিয়া বসিল। চারু নিকটে আসিল। "সত্য কথাটা আমায় ঠিক করে বল দেখি।" "ঠিক্ আর কত বল্‌ব! দিদি এসেছেন!" "সেকি! মিথ্যা কথা।" "তবে সত্য প্রমাণ আনি।" "শোন শোন। কই কারু কাছে ত একথা শুনিনি, অতুলও কিছু বলেনি ত।" "তাদের বারণ করে দিয়েছিলাম—আমিই আগে বল্‌ব মনে করে রেখেছিলাম।" "বেশ! এখন ত' শোনান হয়েছে, যাও।" "কোথায় যাব?" "অতিথির যত্ন করগে।" "যত্নর প্রত্যাশী হয়েই ত তিনি এখানে এসেছেন!" "আমিও ত তাই বলছি—অতিথি এলে যত্ন করা উচিত।" "তিনি অতুলদের দেখ্‌তে এসেছেন—আর এক জনের কাছে একটু ক্ষমা চাইতে।" অমর বিস্মিত হইয়া বলিলেন "হেঁয়ালী আরম্ভ কর্‌লে যে! কিসের ক্ষমা? কার কাছে?" "যদি কোন' দোষ তাঁর কেউ মনে করে রেখে থাকে তারই কাছে।" "তবে সে তুমি। নিজের কাজ কিছু নেই কি? যাও এখন।" "ওরকম কর্‌লে এখনি চেপে বস্‌বো, সব কথা শুন্‌তে হবে।" "কি না শুন্‌ছি বল। উত্তরও দিচ্চি। শোন—অতিথির ওপর ক্ষোভ রাখ্‌তে নেই! রাগ থাকে ত মাপ করগে। এখনও সব কথা বলা হয়নি কি; না—আরও আছে?" চারু হাসিয়া বলিল "কি সাধু ব্যক্তি! আবার উল্টে চাপ! ছোট বোনের কাছে দিদির আবার দোষ করা কি—তুমি রাগ করে থাক ত—" অমর বাধা দিয়া বলিল "না, একটু তিষ্ঠুতেও আর দেবেনা দেখ্‌ছি—বাইরে যেতে হল। দেখি প্রকাশ কি কচ্চে"— "যাও দেখি কেমন যাবে।" "আঃ তুমি কি বল্‌তে চাও—আমার কি কর্‌তে বল?" "রাগ থাকে ত মাপ কর্‌তে হবে—দিদি এসেছেন।" "চারু! তুমি কি সত্যই পাগল হয়েছ—কে কার ওপর রাগ কর্‌বে? দোষই বা কিসের—ক্ষমাই বা কে কর্‌বে? বাইরে চল্লাম, প্রকাশ হয়ত একলা আছে।" অমর একটু দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। সরলা চারু লজ্জার বোঝা মস্তকে করিয়া নীরবে গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, ছিছি, কেন সুরমাকে দ্বারের নিকটে ডাকিয়া আনিয়া এ কার্য্য করিলাম! সে ত সব শুনিয়াছে সব দেখিয়াছে। নাজানি সে কি ভাবিল! অমরের এ নিঃসম্পর্কীয়ের মত বাক্যে নাজানি সে কত ব্যথা পাইয়াছে! কি করিয়া চারু সুরমাকে আর মুখ দেখাইবে! বহুক্ষণ চারু গৃহমধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পরে চোরের মত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মন্দার গৃহদ্বারে গিয়া দেখিল অতুল আসিয়া সুরমার কোল অধিকার করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। চারুকে দেখিয়া সুরমা সহাস্য মুখে বলিল "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অতুল এসে তোমায় খুঁজ্‌ছিল।" নীরস স্বরে চারু বলিল "ঐ দিকেই ছিলাম।" "বাবুরা খেতে বসেছেন, ঝি যে ডেকে গেল, কখন সেখানে যাবে?" "এই যাই—অতুল খেয়েছে?" "হ্যাঁ আমি খাইয়ে এনেছি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সাত আট দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রকাশ

বলিল "আর ত' আমার থাকা চলে না—মন্দা তুমি তবে থাক, এঁরা অনুরোধ কচ্চেন।" মন্দা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল "আর দু'চার দিন থেকে আমায় সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে যাবে না?" "দু'চার দিন পরে তোমায় এঁরা যেতে দেবেন?" "আমি বল্‌বো তা হলেই দেবেন।" এমন সময় সুরমা আসিয়া বলিল "প্রকাশ আর দেরী কত! বাড়ী চল।" প্রকাশ একবার তাহার পানে চাহিল। সুরমা বলিল "চেয়ে রইলে যে, কবে যাচ্চ?" "মন্দা বল্‌ছে আর দু'চার দিন হলে সেও যেতে পার্‌বে।" সুরমা বেশ সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল। "এ দু'চার দিনে জমিদারী কাজের বিশেষ ক্ষতি হবে না ত?" প্রকাশ বলিল "না।" "তবে তাই হোক্—মন্দা এত শীগ্‌গিরই যাবে?" প্রকাশ বলিল "হ্যাঁ।" "চারু যে দুঃখিত হবে।" মন্দা বলিল "আপনি বুঝিয়ে বল্‌বেন।" সুরমা বলিল "আচ্ছা।"

আরও দুই দিন অতিবাহিত হইল। মন্দা এত শীঘ্র যাইবে শুনিয়া চারু দুঃখিত ভাবে সুরমাকে বলিল "দিদি, বিয়ে হলেই মেয়ে পরের হয়ে যায়!—যেখানে থেকে ভাল থাকে থাক্!" সুরমা মনে মনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কেহ কোন কথা বা অনুরোধ করিল না। বুঝিল চারুর এখন অনেকটা বুদ্ধি হইয়াছে, অনুচিত অনুরোধ সে করিবে কেন! যাওয়ার কথা হইতে হইতে আরও দুই তিন দিন কাটিল। আর মধ্যে একদিন মাত্র সময় আছে, ইহার মধ্যে সুরমাও অমরের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, অমরও না। চারুও ভয়ে কিছু বলে নাই, অমর সেদিন তাহাকে যে লজ্জা দিয়াছিল তাহা তাহার মর্ম্মে এখনো গাঁথা রহিয়াছে। সুরমা মনে মনে স্থির করিল এখনো তাহার একটা কার্য্য বাকী আছে। তাহার সব গর্ব্বই সে নষ্ট করিয়াছে কেবল একটা এখনও বুঝি আছে, সেটারও শেষ করিতেই হইবে। তাহা হইলেই সব শেষ হইয়া যায়! এজন্মের দেনা পাওনা হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করিতে এইটুকু মাত্র জের আছে। আর কিছু না! মনে আছে একদিন একস্থানে একজনকে সে 'না' বলিয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে সেই ব্যক্তিকে আর একবার বলিতে হইবে "হাঁ"। বলিতে হইবে নারী জন্মের দোষ, ভাগ্যের দোষ, সর্ব্বোপরি বিধাতার দোষ! বলিতে হইবে "হে দেব, তোমারই জয় হইয়াছে!—আর কেন—সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছি, সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, এখন হোমকুণ্ড নিভাও।" প্রণাম করিয়া বলিতে হইবে "ভস্ম-তিলক ললাটে প্রসাদচিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মাল্য স্বরূপ দাও! তুমি তৃপ্ত হইয়াছ এখন আমায় মুক্তি দাও, এ জন্মের মত মুক্তি দাও—আর যেন না ফিরিতে হয়।"

অদ্য বিদায়ের দিন। সকালে সুরমা দুইখানি পত্র পাইল। একখানি তাহার পিতা লিখিয়াছেন,—লিখিয়াছেন "মা! বড় সুখী হইয়াছি; এ জীবনে যে এমন সুখী হইব তাহা আশা করি নাই। তোমরা সুখী হও, আশীর্ব্বাদ করি সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন ভোগ কর। আমি শীঘ্রই হয়ত তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব। উমাও যাইবে। ইতি তোমার পিতা।"

সুরমা প্রকাশের বুদ্ধিতে পিতার এই ভ্রান্তি দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। বুঝিল তাঁহারা বুঝিয়াছেন সুরমা চিরদিনের জন্যই এখানে আসিয়াছে। তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন শীঘ্রই করিতে হইবে! দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল—পড়িল "মা! প্রকাশ দাদার পত্রে দেখিলাম তুমি শ্বশুরবাড়ী গিয়াছ। শুনে আহ্লাদের অপেক্ষা রাগ বেশী হইল! আমায় না লইয়াই সেখানে গিয়াছ তাই। মনে ভেবনা যে আমি তা বলে রাগ করে এখানেই বসে থাক্‌ব। আমরাও বাড়ী যাব। আমার মাকে কৈলাসে বাবা ভোলানাথের পাশে দেখ্‌ব। মা! চিরদিন এক বেশই দেখে এসেছি—কবে তোমার ঠিক মার মতন বেশ দেখ্‌ব বলে প্রাণ এম্‌নি কর্‌ছে। ওখানে মন্দা প্রকাশদা সবাই আছে, আর আমিই কেবল নেই? এ কি তোমার ভাল লাগ্‌ছে। কখোনো লাগ্‌ছে না। অতুল কেমন আছে, আমায় ভোলে নি ত? এবার যদি সে আমায় "দিদি" না বলে ত তার সঙ্গে কথাই কবনা। মাসীমাকে নমস্কার দিয়ে বলো শীগ্‌গিরই তাঁর কাছে যাব। তুমি প্রণাম জেনো, বাবাকে প্রণাম দিও। প্রকাশদাকে প্রণাম দিও, মন্দাকে ভালবাসা দিও। সে

আমায় ভোলে নি ত? বেশী আর কি লিখ্‌ব। ইতি। তোমার মা-হারা মেয়ে উমা।"

সুরমা উমার পত্র পড়িয়া হাসিতে চেষ্টা করিল—হাসির পরিবর্ত্তে চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া আসিল! তাহাকে জগতের লোক এমনি অক্ষম বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে যে সে যে প্রাণান্ত পণে এখনো যুঝিতেছে তাহা কেহ কানেই আনে না। তাহার পরাজয় যেন তাহারা দিব্য চক্ষে দেখিয়াই বসিয়া আছে! এম্‌নি নারীজন্ম লইয়া সে আসিয়াছে। ধিক্!

বেলা ফুরাইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার পর যাত্রা করিতে হইবে। সুরমা অতুলকে গিয়া একবার ক্রোড়ে লইল, অতুল ম্লানমুখে রহিল। চারুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, চারু নতমুখে কি একটা গুছাইতে লাগিল। কিছুতেই যেন স্বস্তি নাই! হাত পায়ের তলা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, কণ্ঠ শুষ্ক, অল্প অল্প শীত করিতেছে; পাছে কেহ তাহার সে ভাব লক্ষ্য করে বলিয়া সুরমা লুকাইয়া লুকাইয়া অবশিষ্ট বেলাটুকু কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যা হইল, কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিল।

চারু তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল "দিদি!" সুরমা বলিল "কি"? "কি বলা উচিত ভেবে পাচ্চি না।" "না, কিছু বলো না।" "না বলেই বা কি করে থাকি! এই ত' শেষ!"— স্খলিত স্বরে সুরমা বলিল "শেষ? হাঁ্যা এইই শেষ।" "শেষ দেখা একবার করে এস।" "শেষ দেখা! কার সঙ্গে?" "তাঁর সঙ্গে।" "কোথায় যাব?" "তাঁর ঘরে, তিনি এইমাত্র কি একটা কাজে এসেছেন, এই বেলা যাও।" সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। চারু নিকটে আসিয়া বলিল "যাও দিদি আর দাঁড়িও না।" "তবে দিদি কেন বল্‌ছিস চারু! অন্য কিছু বল।" "কি বল্‌বো?" "আমি স্বামীর অংশ নিতে যাচ্চি, এখন যে আমি সতীন।" "অংশ নাও কই? আমায় তা বল কই?" "এই যে অংশ নিতে যাচ্চি।" "অতটুকুতে মানুব কেন দিদি, ন্যায্য অধিকার কখন কি নেবেনা? আমায় তোমাদের দাসী করে রেখো।" সুরমা গম্ভীর হইয়া বলিল "দাসী নয়, আজ সতীন হতে যাচ্চি—এই নতুন সম্বন্ধ আজ পাতালাম চারু।" পায়ের ধূলা লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে চারু বলিল শুধু "একদিনের জন্যে ক'রোনা; চিরদিনের"— সুরমা ত্বরিত পদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। বারান্দা পার হইয়া সম্মুখে সেই কক্ষ—যে কক্ষে প্রথম তাহার স্বামী-সম্ভাষণ হইয়াছিল। সেইদিন আর এইদিন! সেদিন শুধু গর্ব্ব, শুধু দর্প, শুধু আত্মাভিমান! আর আজ?

অমর পশ্চাৎ ফিরিয়া আলোকের নিকটে কি একটা নিবিষ্টমনে দেখিতেছিল। সহসা নিকটে রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস লইবার চেষ্টার মত অনুভব করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইবা মাত্র বারুদস্তূপে অগ্নি-শলাকা নিক্ষেপ করিলে বহ্নিরাশি যেমন সহসা এককালে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে অমরও সহসা তেমনি ভাবে পশ্চাতে হটিয়া গেল। তবু সে মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, একটু সরিল না হেলিল না। অমর একবার ভাবিল পলাইয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইল। আবার চাহিয়া দেখিল বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সেই পূজারতা যোগিনী-মূর্ত্তি। সে বদ্ধাঞ্জলি নাই, ক্ষৌমবস্ত্র নাই, তথাপি সে মূর্ত্তিতে যাহা অভাব ছিল তাহা এ মূর্ত্তি যেন বহিয়া আনিয়াছে। সুরমা নীরবে জানু পাতিয়া বসিয়া অমরের পদতলে প্রণাম করিবামাত্র অমর একটু পিছাইয়া গেল—পদে ললাট না স্পৃষ্ট হয়। সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "পিছিয়ে যাও কেন? প্রণাম নেবে না?" অমর উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেও উত্তর মুখে আসিলনা, কণ্ঠমধ্যে একটা অস্ফুট শব্দ হইল মাত্র। সুরমা অমরের পানে চাহিয়া চাহিয়া আবার বলিল "প্রণাম নিতে দোষ আছে কি?" অমর এবার কথা কহিল—গম্ভীর কণ্ঠে বলিল "আছে।" "কি দোষ শুন্‌তে পাই না?" "না।" "বাড়ীতে অতিথি এলে কি সম্ভাষণ করে না? প্রণাম করে না?" "আমায় বাইরে যেতে হবে। কিছু প্রয়োজন আছে?" "আছে।" "কি প্রয়োজন?" "তা হয়েছে, প্রণামের।" অমর এবার মুখ তুলিয়া সুরমার পানে তাহারি মত স্থিরচক্ষে চাহিল—"প্রণামের? কেন?" "কি জানি। এম্‌নি। সে না, আর একটা উদ্দেশ্য, তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ; অতিথি এলে তাকে সকলেই

সম্ভাষণ করে, তুমি করনি। তাই তোমার ত্রুটীটা সেরে নিলাম।" "সারা হয়েছে? এখন যেতে পারি?" "যাও।" অমর কিছুক্ষণ নীরবে রহিল; বোধ হয় তাহারও অনেক কি বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, বহু কষ্টে তাহা দমন করিলেও করিতে পারিতেছিল না। সুরমা আর কিছু বলিল না। অমর অগত্যা আবার তাহার পানে চাহিয়া বলিল "বিদায় নিতে এসে থাক ত বলি, কেন মিথ্যে এ ক্লেশ কর্‌লে? এর ত কোন প্রয়োজন ছিল না।" সুরমা উত্তর দিল না। অমর বলিল "চারু বল্‌ছিল তুমি নাকি ক্ষমা চেয়েছ? এ কি বাস্তব কথা নাকি?" সুরমা বলিল "হাঁ।" "কিসের ক্ষমা? কাশীতে বাড়ীতে যাওনি বলে? চারু পাগল তাই সেজন্যে তোমার ওপর অভিমান করেছিল—রাগ করেছিল। তুমি আমাদের কে, যে, তোমার ওপর রাগ বা অভিমানের দাবী কর্‌তে পারি!" সুরমার কথা কহিবার শক্তি আবার অপহৃত হইতেছিল। যে দিন এই অমরকে সে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল সে ক্ষমতা আজ কোথায়! সেদিন সে আত্মস্থ ছিল, আর আজ সে একান্ত দুর্ব্বল। অমর আবার বলিল "তুমি ভ্রমেও ভেবোনা সেজন্যে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে। মনে করে দ্যাখ,—যাবার দিন কি বলে গিয়েছিলে? সেই দিনই ত সব শেষ করে দিয়ে গেছ, আবার আজ কেন এসেছ? বিদায় নিতে? এ কষ্ট পাবার কোন'ত প্রয়োজন ছিল না! অনেক দিনই ত বিদায় দিয়েছ—বিদায় নিয়েছ।" সুরমা তখনো তেমনি নীরবে অবনত মুখে ভূপৃষ্ঠে চাহিয়াছিল, সে দেখিতে পাইতেছিল না যে অমর ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইতেছে। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া অমর সহসা বলিল "আর তোমাদের যাবার বেশী দেরী নেই।" সুরমা দ্বারের পানে চাহিল, দু'এক পদ সরিতেই অমর আসিয়া সম্মুখে অতি নিকটে দাঁড়াইল, বলিল "প্রয়োজনের কথা কই কিছু বল্লে না ত, আর কি তা বলবার দরকার নেই?" "আছে।" "তবে যাও যে?" সুরমা আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিল! সে কেন এমন হইয়া পড়িতেছে! সে কথাটা বলিবারও সাধ্য এখনো হয় নাই? এখনো সেই অভিমান?—ছিছি! সুরমা আবার দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল "একটা কথা আছে, যাবার দিন যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, যে কথার উত্তর তখন দিই নি, আজ তার উত্তর দিয়ে যাব, তাই এসেছি।" "উত্তর ত' দিয়ে গিয়েছিলে।" "সে উত্তর ঠিক নয়, আজ উত্তর দিচ্চি! নারীর দর্প-তেজ অভিমান কিছু নেই, আছে কেবল—" অমর রুদ্ধস্বরে বলিল "বল—আছে কেবল কি? প্রতিশোধ—অমোঘদণ্ড—নিক্তির মাপে প্রতিশোধ!"— "না। কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব, কেবল—" সুরমা অগ্রসর হইতেছিল, অমর গিয়া তাহার হাত ধরিল "কেবল—আর কি? সুরমা—সুরমা—যাও যদি সবটুকু বলে যাও—আর কি?" সুরমা আবার নতজানু হইয়া স্বামীর পদমূলে বসিয়া পড়িল—দুই হস্তে পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া, অজস্র বাষ্পবারি-সিক্ত-মুখ ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল "কেবল—এইটুকু, আর কিছু না। আমায় কোথায় যেতে বল, আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না।"

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সমাপ্ত।

গীতাপাঠ

আমাদের দেশের বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের কঠোর অদ্বৈতবাদের চক্রে পড়িয়া সগুণ এবং নির্গুণের মধ্যে পরস্পরের সহিত মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়াতে বেদান্তদর্শনের মুক্তিতত্ত্ব যে, কিরূপ একটা গোলমেলে কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে—গতবারের অধিবেশনে আমি তাহা সাধ্যানুসারে দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। বেদান্তদর্শনের লোকপূজ্য ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপনিই বলিয়াছেন যে, বেদে পরমেশ্বরের একসঙ্গে দুইরূপ স্থিতির উল্লেখ আছে—(১) স্বরূপে স্থিতি এবং (২) মহিমাতে স্থিতি; অথচ তিনি ঐ দুই সহোদর-সম্পর্কীয় স্থিতির মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া—মুক্তির পরম পবিত্র শান্তিধামে নির্গুণের সহিত সগুণের, তথৈব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের দেখাসাক্ষাতের পথ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; আর, তাহাতে ফল হইয়াছে এই যে, এক-মুক্তি আত্মবিস্মৃতির অগাধ জলগর্ত্তে

নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়া পরিশেষে তাহা তিন স্থানে তিন মুক্তি হইয়া সাজিয়া-বাহির-হইয়াছে,—

(১) ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি হইয়া, (২) বিষ্ণুর পরম স্থানে চরম মুক্তি হইয়া, এবং (৩) ইহলোকে জীবন্মুক্তি হইয়া সাজিয়া বাহির হইয়াছে।

প্রশ্ন॥ অ্যাকা কেবল বেদান্তদর্শনকে দোষ দিলে কি হইবে? সব শেয়ানের একই রায়!*

বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের এই যে একটি কথা—যে, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য-পথে বিচরণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিধিই বা কি, আর, নিষেধই বা কি? (অর্থাৎ তিনি বিধি-নিষেধের গণ্ডির সীমা-বহির্ভূত একপ্রকার বে-আইন্ বে-কানুন্ সৃষ্টিছাড়া লোক), এ কথা যে, বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের একটা ঘর-গড়া কথা, তাহা নহে—উহা সব শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। তার সাক্ষী:— গীতাশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ:—

মান-অপমান যাঁহার নিকটে সমান, শত্রু মিত্র যাঁহার নিকটে সমান, যিনি কোনো প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হ'ন।

উত্তর॥ "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী"

এ বচনটির অর্থ তুমি যাহা বলিতেছ, কিনা—যিনি কোনো প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করেন না তাঁহাকেই বলা যায় "সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী"—

গীতাকার মহর্ষিদেব তাহা বলেন না; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আর এক কথা বলেন। তিনি বলেন

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"

[৪র্থ অধ্যায় ১৯শ শ্লোক]

* শ্যেনপক্ষীদিগের দূরদর্শিতা জগৎময় রাষ্ট্র; তীক্ষবুদ্ধি চতুর ব্যক্তিরা তাই লোকের নিকটে শেয়ানা নামে পরিচিত। গাধা যেমন গর্দ্দভ শব্দের অপভ্রংশ—শেয়ানা তেমনি শ্যেন-শব্দের অপভ্রংশ।

ইহার অর্থ:—

যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহার সমস্ত আরম্ভ (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মোদ্যম) কামসংকল্পবর্জ্জিত (অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য); এইরূপ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্ম সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী ব্যক্তিকেই জ্ঞানিজনেরা পণ্ডিত বলেন।

তবেই হইতেছে যে, শাস্ত্রকার মহর্ষিদেবের মতে— যিনি ফলকামনা-শূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রেমের হস্তে মনো-অশ্বের রাশ সঁপিয়া দিয়া মঙ্গলের পথে অব্যাকুলিত-চিত্তে বিচরণ করেন, তা বই, ফলকামনার চাবুকের চোটে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কোনো কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, তাঁহার মতো প্রশান্তচিত্ত ধীরেরাই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী শব্দের বাচ্য। আবার, গীতাশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্ত কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

ইহার অর্থ:—

কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন, তথৈব, অকর্ম্মে যিনি কর্ম্ম দেখেন—মনুষ্যলোকে তিনিই বুদ্ধিমান্—তিনিই যোগী —তিনিই সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ।

ইহার টীকা:—

"কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন" এ কথার ভিতরের ভাব এই যে, পদ্মপত্র যেমন জলে ভাসে অথচ জলে লিপ্ত হয় না—জীবন্মুক্ত পুরুষ তেমনি সমস্ত কর্ম্ম করেন অথচ কোনো কর্ম্মে লিপ্ত হ'ন না। লিপ্ত হ'ন না কেন? না যেহেতু তাঁহার মন বিষয়ে অনাসক্ত এবং ফলকামনাশূন্য। "অকর্ম্মে যিনি কর্ম্ম দেখেন" এ কথার ভিতরের ভাব এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ফলকামনা-দূষিত কাম্যাদিকর্ম্ম হইতে হস্ত অপকর্ষণ করিয়া নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করেন, তখন কাম্যাদি-কর্ম্ম-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ম্ম হয়—কামনাদির সংযম; আর সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে, তাহার অকর্ম্মও কর্ম্ম। ফল কথা এই যে, শক্তির প্রসারণও যেমন, শক্তির সংহরণও তেমনি—দুইই কর্ম্ম। হাতের রাশ আল্‌গা দিয়া অশ্বকে দৌড় দেওয়ানোও যেমন, আর, রাশ টানিয়া ধরিয়া অশ্বের দৌড় থামানোও তেমনি, দুইই কর্ম্ম। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক ভাষায় পূর্ব্বোক্ত

প্রকার কর্ম্মের বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে Kinetic, শেষোক্ত প্রকার কর্ম্মের বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে Potential.

আবার, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

ইহার অর্থ :—

কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগকেই কবিরা বলেন "সন্ন্যাস"। আর, সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকেই কবিরা বলেন "ত্যাগ"।

কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ কিছু-আর সর্ব্বকর্ম্মের পরিত্যাগ নহে, তথৈব, কর্ম্মের ফলত্যাগ কিছু-আর কর্ম্মত্যাগ নহে। এ কথা তুমি খুবই জোরের সহিত বলিতে পার যে, গীতাশাস্ত্রোক্ত গুণাতীত ভাবের সহিত ফলকামনা-দুষিত কাম্যকর্ম্ম সংলগ্ন হয় না; কিন্তু এ কথা তুমি কোনো যুক্তিতেই বলিতে পার না যে, গীতাশাস্ত্রোক্ত গুণাতীত ভাবের সহিত কোনো প্রকার কর্ম্মই সংলগ্ন হয় না—নিষ্কাম কর্ম্মও সংলগ্ন হয় না। গীতাশাস্ত্রের কথাবার্ত্তার ভাবে এটা কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হয় না —যে, গুণাতীত ভাবের সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্মও সংলগ্ন হয়, বিমল আনন্দও সংলগ্ন হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানও সংলগ্ন হয়, ভগবদ্‌ভক্তিও সংলগ্ন হয়—সবই সংলগ্ন হয়; তার সাক্ষীঃ—গীতাশাস্ত্র হইতে এইমাত্র তুমি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া আমাকে দেখাইলে সেই শ্লোকটির (অর্থাৎ

"মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

এই শ্লোকটির) অব্যবহিত পরেই রহিয়াছে

"মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

ইহার অর্থ :—

অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে আমার সেবায় রত হয়, সে গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির যোগ্য হয়। ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা—অব্যয় অমৃতের আমি প্রতিষ্ঠা—শাশ্বত ধর্ম্মের আমি প্রতিষ্ঠা—ঐকান্তিক সুখের আমি প্রতিষ্ঠা।

ইহার টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া পরমপুরুষ পরমাত্মা বলিতেছেন "ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা"—ইহার অর্থ কি? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-মহলে এ কথা কাহারো অবিদিত নাই যে, সাংখ্যদর্শনের পারিভাষায় প্রকৃতি-শব্দের গোটা-দুইতিন সমার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দ আছে—তাহার মধ্যে ব্রহ্মশব্দ একটি। অতএব উদ্ধৃত ভগবদ্‌বাক্যটির, অর্থাৎ "ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যটির, অর্থ যে, প্রকৃতির আমি প্রতিষ্ঠা, এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

গীতাশাস্ত্রের আর এক স্থানেও ব্রহ্মশব্দ প্রকৃতি অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনির্ অহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

ইহার অর্থ :—

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গর্ভে গর্ভে যে-সকল মূর্ত্তি সম্ভূত হয়—সমস্ত গর্ভের মহাগর্ভ ব্রহ্ম, আর আমি (অর্থাৎ পরমপুরুষ পরমাত্মা) বীজপ্রদ পিতা।

অতএব গীতার যে-চারিছত্র শ্লোক আমি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম তাহার অর্থ ফলে দাঁড়াইতেছে এইরূপ :—

[পরম পুরুষ পরমাত্মা—শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলিতেছেন]।

"আদ্যা প্রকৃতির আমি প্রতিষ্ঠা, অব্যয় অমৃতের আমি প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত ধর্ম্মের আমি প্রতিষ্ঠা, ঐকান্তিক সুখের আমি প্রতিষ্ঠা। অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে আমার সেবায় রত হয়, সে গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া আদ্যা প্রকৃতির ভাব প্রাপ্ত হয়।"

এখানে কয়েকটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

যদিচ সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিন গুণের তিনটিই মূল প্রকৃতির অন্তর্ভূত, কিন্তু তথাপি মূল প্রকৃতিতে তিনটির কোনোটিরই অভিব্যক্তি নাই; আর, "যে ক্ষেত্রে গুণের অভিব্যক্তি নাই সে ক্ষেত্র কার্য্যত নির্গুণ" এই অর্থে

ঈশ্বরের সেবাপরায়ণ প্রকৃতিভাবাপন্ন ব্যক্তি গুণাতীত শব্দের বাচ্য।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

জীবাত্মা গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিভাবাপন্ন হইলে তাহাতে ফল কী হয়? না আত্মাতে পরমাত্মার আবির্ভাবের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

মূল প্রকৃতি যেমন একভাবে সগুণ, আরএক ভাবে নির্গুণ; পরমাত্মাও তেমনি একভাবে সগুণ—আরএক ভাবে নির্গুণ। মূল প্রকৃতিতে তিন গুণই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এইভাবে মূল প্রকৃতি সগুণা; আবার, মূল প্রকৃতিতে ত্রিগুণের তিনটির কোনোটিরই অভিব্যক্তি নাই এইভাবে মূল প্রকৃতি নির্গুণা। তেমনি, পরমাত্মা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, অথবা, যাহা একই কথা—আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত এইভাবে তিনি সগুণ; আবার, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত এইভাবে তিনি নির্গুণ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত" সংক্ষেপে "শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত" এ কথাটা বেদান্তের কথা, তা বই, উহা সাংখ্যের কথা নহে। সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্বগুণনামা'ই রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট। পূর্ব্বে তাই আমি বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভূত নহে।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

মহাভারতের শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের আমলে মুখ্য সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিমূলের উপরে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে বেদান্তদর্শনের গোড়াপত্তন হইতেছিল—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের কতকগুলি বাছা-বাছা আখ্যায়িকায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় দিব্য সুস্পষ্ট। তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত শান্তিপর্ব্বের ৩১৮শ অধ্যায়ের মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, প্রণিধান কর:—

"অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ।

* * *

নতু পশ্যতি পশ্যংস্তু যশ্চৈনং অনুপশ্যতি॥
পঞ্চবিংশোঽভিমন্যেতনাঽন্যোঽস্তি পরতো মম।
ন চতুর্বিংশকো গ্রাহ্যো মনুজৈর্জ্ঞানদর্শিভিঃ॥

* * *

"যদা তু মন্যতেঽন্যোঽহং অন্য এষ ইতি দ্বিজঃ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশম্ অনুপশ্যতি॥
অন্যশ্চ রাজন্যবর স্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তৎস্থানাদনুপশ্যন্তি এক এবেতি সাধবঃ॥
তেনৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতং।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্‌ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্যপ।
ষড়্‌বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয়স্তৎপরায়ণাঃ॥
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি।
তদা স সর্ব্ববিদ্ বিদ্বান্ পুনর্জন্ম ন বিন্দতি॥"

ইহার অর্থ:—

প্রকৃতি কিছুই বোঝে না; পঞ্চবিংশ (কিনা জীবাত্মা) প্রকৃতিকে বোঝে। পঞ্চবিংশ (কিনা জীবাত্মা) প্রকৃতিকে দেখে বটে; কিন্তু, তাহার আপনার দ্রষ্টাকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দেখে না। পঞ্চবিংশ (অর্থাৎ জীবাত্মা) মনে মনে এইরূপ অভিমান করে যে, আমার উপরে দ্রষ্টা আর কেহই নাই। তত্ত্বজ্ঞানীরা কিন্তু চতুর্বিংশকে (কিনা প্রকৃতিকে) গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। ব্রাহ্মণ-সন্তান যখন মনে এইরূপ বোঝেন যে, আমি স্বতন্ত্র আর এ (কিনা চতুর্বিংশ অর্থাৎ প্রকৃতি) স্বতন্ত্র, তখন তিনি কেবলীভূত হইয়া (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া) ষড়্‌বিংশকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন। সর্ব্বাধিপতি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) স্বতন্ত্র, আর পঞ্চবিংশ (অর্থাৎ জীবাত্মা) স্বতন্ত্র। এইস্থান হইতে (অর্থাৎ "পরমাত্মা স্বতন্ত্র এবং জীবাত্মা স্বতন্ত্র" এইস্থান হইতে, ইংরাজি ভাষায়—from this stand point) সাধু ব্যক্তিরা দেখেন যে, পরমাত্মাই একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা; আর, সেইজন্য, যে সকল জন্মমৃত্যুভয়োদ্‌বিগ্ন শুচি ঈশ্বরপরায়ণ যোগী এবং সাংখ্য-জ্ঞানী ষড়্‌বিংশকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন তাঁহারা পঞ্চবিংশকে (কিনা জীবাত্মাকে) অভিনন্দন করেন না (অর্থাৎ আদর দেন না)। সাধক যখন সর্ব্ববিৎ এবং কেবলীভূত হইয়া (অর্থাৎ প্রকৃতিকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া) 'ষড়্‌বিংশ'কে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন, তখন তিনি পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

ইহার টীকা।

সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক ইহা কাহারো অবিদিত নাই; কিন্তু তথাপি "অধিকন্তু ন দোষায়" এই সাধুসম্মত পুরাতন বচনটিকে ইষ্ট-কবচ করিয়া সাংখ্য-তত্ত্বাবলীর একটা তালিকা প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান কর:—

পঞ্চভূত......৫
পঞ্চতন্মাত্র...৫ } ... ২০
কর্ম্মেন্দ্রিয় .. ৫
জ্ঞানেন্দ্রিয়...৫
মন ১
অহঙ্কার......১ } ৩
মহান্ বা প্রজ্ঞা১ ২৩
মূল প্রকৃতি ২৪শ
জ্ঞ বা আত্মা ২৫শ

সাংখ্যদর্শনের মতে পঞ্চবিংশেই সমস্ত তত্ত্বের পরিসমাপ্তি; তাহার ঊর্দ্ধে আর কোনো তত্ত্ব নাই—ষড়্বিংশ নাই। সাংখ্যকার বলেন যে, ঐ যে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—জ্ঞ, ঐ জ্ঞাতাপুরুষ প্রকৃতির আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিয়া যখন দেখেন যে, "আর আমার প্রকৃতিতে কোনো প্রয়োজন নাই" তখন প্রকৃতি লজ্জিতা হইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়ন করে। এইরূপে যখন প্রকৃতির সঙ্গচ্যুত হইয়া জ্ঞাতাপুরুষ কেবলীভূত হ'ন অর্থাৎ অ্যাকলা কেবল আপনি-মাত্র হ'ন, তখন জ্ঞেয়বস্তুর অভাবে তাঁহার জ্ঞানও থাকে না, প্রেমও থাকে না, কর্ম্মও থাকে না, কিছুই থাকে না; এমন কি—তাঁহার সত্তাও থাকে না, কেননা জ্ঞানে সত্তার প্রকাশ না-থাকাও যা, আর, সত্তা না-থাকাও তা—একই। ইহারই নাম সাংখ্য-দর্শনের কৈবল্য মুক্তি। মহাভারতের শাস্ত্রকার পঞ্চবিংশের এই ব্যাপারটিকে ভিত্তিভূমি করিয়া তাহার উপরে ষড়্বিংশের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বলিয়াছেন "জ্ঞাতাপুরুষ প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু জানিবার বস্তু আছে সমস্তই ধুইয়া পুঁছিয়া নিঃশেষে জানিয়া লইয়া প্রকৃতি হইতে যখন পৃথক্‌ভূত হ'ন, আর, সেই সময়ে যখন তিনি ষড়্বিংশকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন তখন তিনি পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হ'ন। মহাভারত হইতে যে কয়েক ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে সাংখ্যদর্শনের আগাগোড়া সমস্তই মানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে একটি নূতন কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই যে, কৈবল্য অবস্থায় জ্ঞাতাপুরুষ একদিকে যেমন প্রকৃতি হইতে অন্তশ্চক্ষু প্রত্যাকর্ষণ করেন, আরএক দিকে তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মার প্রতি অন্তশ্চক্ষু নিবিষ্ট করেন। এ কথাটির ভিতরের ভাব এই যে, জ্ঞাতাপুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভূত হ'ন, তখন একদিকে যেমন তাঁহার প্রাকৃত জ্ঞান অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, আরএক দিকে তেমনি তাঁহার পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান বাধামুক্ত হইয়া যায়, আর, সেই অন্তরতম জ্ঞানে ষড়্বিংশ (অর্থাৎ পরমাত্মা) প্রকাশিত হ'ন। শেষোক্ত প্রকার মুক্তিকে কৈবল্য মুক্তি বলা শোভা পায় না এইজন্য—যেহেতু উহা কেবলমাত্র পঞ্চবিংশে পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা দূরে থাকুক—ষড়্বিংশের দর্শন-প্রাপ্তিই উহার মুখ্যতম অঙ্গ। গীতাশাস্ত্রে তাই যেখানেই যখন প্রসঙ্গক্রমে মুক্তির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সেই খানেই তখন কৈবল্য শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন ॥ প্রকৃতির সঙ্গচ্যুত কৈবল্য অবস্থায় জীবাত্মার প্রাকৃত জ্ঞান (অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান কিনা বাহ্যজ্ঞান) তিরোহিত হইয়া যাইবারই কথা; কেননা প্রাকৃত জ্ঞান বা বাহ্যজ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গসাপেক্ষ। কিন্তু মহাভারতের শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের দোহাই দিয়া তুমি বলিতেছ যে, "প্রকৃতির সঙ্গচ্যুত কৈবল্য অবস্থায় একদিকে যেমন জ্ঞাতা-পুরুষের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, আরএক দিকে তেমনি তাঁহার অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞান বাধামুক্ত হইয়া যায়।" এটা তো তোমার অবিদিত নাই যে, জ্ঞানমাত্রেরই একটা-না-একটা জ্ঞেয়বস্তু থাকা চাই, যেমন—ঘটজ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু ঘট, পটজ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু পট, সমগ্র বাহ্যজ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু প্রকৃতি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান, তাহার জ্ঞেয়বস্তু কী? পরমাত্মা স্বয়ং কি তাহার জ্ঞেয়বস্তু? তাহা তুমি বলিতে পার না এইজন্য—যেহেতু জীবাত্মাই বা কি,

আর, পরমাত্মাই বা কি—আত্মামাত্রই জ্ঞাতাপুরুষ, তা' বই, কোনো আত্মাই ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয়বস্তু নহে।

উত্তর॥ পরে তোমাকে আমি দেখাইব যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু বিশুদ্ধ সত্ব। কিন্তু আপাতত সে কথাটা ধামা-চাপা দিয়া রাখিয়া তোমাকে আমি বলিতে চাই এই যে, ঘটপটাদি বিষয়-সকলকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার প্রণালী-পদ্ধতি স্বতন্ত্র এবং পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার প্রণালী-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। শারদ পূর্ণিমায় যখন চন্দ্রমণ্ডলে বিমল জ্যোৎস্নার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় তখন অবশ্য চন্দ্রমা প্রকাশক—পৃথিবী প্রকাশ্য বস্তু। কিন্তু নিশাবসানে সেই চন্দ্রমা যখন আপনার সমস্ত জ্যোৎস্নারাশি পৃথিবী হইতে গুটাইয়া লইয়া নবোদিত সূর্য্যকে সেই প্রীতিভক্তির দীপ-নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দ্যায়—কে তখন প্রকাশক? রাত্রিকালে চন্দ্রই তো অধস্থ বস্তুসকলের প্রকাশক ছিল—কিন্তু নিশাবসান-কালে চন্দ্র যখন আপনার সমস্ত জ্যোৎস্না উদ্যন্ত সূর্য্যকে নিবেদন করিয়া দিল, কে তখন প্রকাশক? চন্দ্র না সূর্য্য? অবশ্য সূর্য্য! চন্দ্র তখন প্রকাশক হওয়া দূরে থাকুক্—চন্দ্র তখন আকাশস্থিত শরদভ্রের ন্যায় প্রকাশ্য বস্তু মাত্র। এ যেমন দেখা গেল—তেমনি, জীবাত্মা যখন ঘটপটাদি বিচিত্র বিষয়-সকলকে জ্ঞানে উপলব্ধি করে, তখন—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, জীবাত্মা জ্ঞাতাপুরুষ, ঘটপটাদি বিষয়-সকল জ্ঞেয় প্রকৃতি; কিন্তু, সেই জীবাত্মা যখন আপনার সমস্ত জ্ঞান ঘটপটাদি বিষয়-সকল হইতে অপকর্ষণ করিয়া লইয়া—বুদ্ধি মন অহঙ্কারাদি চিত্তবৃত্তির নৈবেদ্যের ডালা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে প্রীতিভক্তি-সহকারে নিবেদন করিয়া দ্যায়, কে তখন জ্ঞাতাপুরুষ, আর, কে'ই বা তখন জ্ঞেয় প্রকৃতি? তখন অবশ্য পরমাত্মা জ্ঞাতাপুরুষ—জীবাত্মা জ্ঞেয় প্রকৃতি। এ যাহা আমি বলিতেছি ইহার যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে চাও, তবে একটু পূর্ব্বে তাহা আমি তোমাকে দেখাইতে বাকি রাখি নাই। তার সাক্ষী:—অনতিপূর্ব্বে যে একটি শ্লোক তোমাকে আমি গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি (অর্থাৎ "মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" গীতার এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ শ্লোক) তাহাতে বলা হইয়াছে এই যে, যে সাধু পুরুষ ঈশ্বরের সেবায় কায়মনোবাক্যে রত হ'ন তিনি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হ'ন অর্থাৎ প্রকৃতি-ভাবাপন্ন হ'ন। তা ছাড়া, ভাগবত সম্প্রদায়ের ভক্তিশাস্ত্রের এ কথাটা দেশময় রাষ্ট্র যে, ভক্তেরা প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া ভগবানের সমীপস্থ হ'ন। ফল কথা এই যে, ত্রিগুণ-সোপানের নীচের ধাপে যেমন জীবাত্মাই জ্ঞাতাপুরুষ—ঘটপটাদি বিষয়সকল জ্ঞেয় প্রকৃতি; ত্রিগুণ-সোপানের উপরের ধাপে তেমনি পরমাত্মাই জ্ঞাতাপুরুষ—জীবাত্মা জ্ঞেয় প্রকৃতি। ভগবদ্-গীতায় স্পষ্ট লেখা আছে,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়ং; ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতির্বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

ইহার অর্থ:—

[শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া পরমাত্মা বলিতেছেন] আমার এই যে অষ্টধা-ভিন্না প্রকৃতি—ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এ প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি; কিন্তু ইহা ব্যতীত আমার আর এক প্রকৃতি আছে—তাহা জীবভূতা পরা প্রকৃতি, আর, সেই জীবভূতা পরা প্রকৃতিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এখানে পঞ্চভূত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সম্বলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকে বলা হইতেছে অপরা প্রকৃতি, আর, জীবাত্মাকে বলা হইতেছে পরা প্রকৃতি; আবার, সেই সঙ্গে এই নিগূঢ় রহস্য-বার্ত্তাটিও স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, পরমাত্মার সেই জীবভূতা পরা প্রকৃতিই সমস্ত বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

প্রশ্ন॥ ঐ অষ্টবিধ পদার্থসম্বলিত সাংখ্যের প্রকৃতিকেই বা অপরা প্রকৃতি বলা হইতেছে কেন, আর সাংখ্যের সেই যে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—জ্ঞ কিনা জীবাত্মা, যাহা কোনো জন্মেই প্রকৃতি নহে, তাহাকেই বা পরা প্রকৃতি বলা হইতেছে কেন? এক প্রকৃতিকে দুই করিয়া দাঁড় করাইবার অর্থ যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

উত্তর॥ ত্রিগুণের উপর-নীচের দুইটি ধাপের প্রতি

তুমি যদি একবার মনোযোগের সহিত ঠাহর করিয়া দেখ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত রহস্য-বার্ত্তাটির অর্থ বুঝিতে তোমার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইবে না,

অতএব প্রণিধান কর ঃ—

ত্রিগুণের নীচের ধাপে জীবাত্মা জ্ঞাতা পুরুষ, আর, (১) ভৌতিক প্রকৃতি কিনা পঞ্চভূত, (২) মানসিক প্রকৃতি কিনা সংকল্পবিকল্পাদি, (৩) বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি কিনা বুদ্ধি এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার—এই তিন প্রকার প্রকৃতি জ্ঞেয় প্রকৃতি। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণের উপরের ধাপে পরমাত্মা জ্ঞাতা পুরুষ, আর জীবাত্মা জ্ঞেয় প্রকৃতি।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টশাখান্বিতা ত্রিবিধা প্রকৃতি নীচের ধাপের প্রকৃতি বলিয়া তাহার ললাটে ছাপ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে 'অপরা"; আর, শেষোক্ত জীবভূতা প্রকৃতি উপরের ধাপের প্রকৃতি বলিয়া তাহার ললাটে ছাপ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে"পরা"।

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ এই যে বলিতেছেন—"আমার আর-এক প্রকৃতি আছে—তাহা জীবভূতা পরা প্রকৃতি, এখানে পরা প্রকৃতি যে, জীবাত্মা, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে আরেক-ধাঁচার এই যে একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি জগৎসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এ কথার অর্থ আমি মূলেই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাণপণ যত্ন করিয়াও যে-লোক আপনার ক্ষুদ্র শরীরটিকে জরামৃত্যুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারে না—জগৎসংসার ধারণ করিয়া থাকা কি তাহার সাধ্য?

উত্তর। গীতাতে পরা এবং অপরা এই দুইরূপ প্রকৃতির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে, তা বই,

অপরা প্রকৃতি ৮
পরা প্রকৃতি বা জীবাত্মা............১০০০০০০

• ১০০০০০৮

এই দশলক্ষ আট প্রকার প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। উদ্ধৃত গীতা-বাক্যটির ভাবার্থ খুবই স্পষ্ট; তাহা এই যে, অপরা প্রকৃতিও একের অধিক নহে—পরা প্রকৃতিও একের অধিক নহে। একই অপরা প্রকৃতির তিন মূর্ত্তি;—তাহার ভৌতিক মূর্ত্তি হ'চ্চে ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ; মানসিক মূর্ত্তি হ'চ্চে সংকল্পবিকল্প; বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি হ'চ্চে বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। তেমনি আবার, একই পরা প্রকৃতির তিন মূর্ত্তি;—পরা প্রকৃতির সত্ত্বগুণপ্রধান মূর্ত্তি হ'চ্চে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অনেকানেক ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি; রজোগুণপ্রধান মূর্ত্তি হ'চ্চে রাবণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকানেক অধর্ম্মপরায়ণ দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি; তমোগুণপ্রধান মূর্ত্তি হ'চ্চে—কুম্ভকর্ণ হিড়িম্বা প্রভৃতি অধমশ্রেণীর রাক্ষসপিশাচের দল। এখন দেখিতে হইবে এই যে, ত্রিগুণ-সোপানের নীচের ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি (অর্থাৎ যে ধাপে জীবাত্মা জ্ঞাতাপুরুষ সেই ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি) যেমন সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা,—ত্রিগুণ-সোপানের উপরের ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি (অর্থাৎ যে ধাপে পরমাত্মা জ্ঞাতা-পুরুষ সেই ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি) তেমনি শুদ্ধ সত্ত্ব। এ যাহা আমি বলিলাম ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে—ত্রিগুণতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে বছর-দুএক পূর্ব্বে আমি যে-কয়েকটি সার-সার কথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছি, এইখানে তাহা আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক। তখন, আমি বহুযত্নে ত্রিগুণতত্ত্বের একটা স্বচ্ছ পুষ্করিণী যাহা কাটাইয়াছিলাম, এতদিনে তাহা শ্রোতৃবর্গের বিস্মৃতিপঙ্কে ভরাট্ হইয়া যাইবারই কথা।

আজ থাক্;—আগামী অধিবেশনে সেই তত্ত্ববাপীটিকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইয়া আমি দেখাইব যে, শুদ্ধ সত্ত্বই ত্রিগুণ সোপানের উপরের ধাপের জ্ঞেয় প্রকৃতি, আর, তাহাই গীতাশাস্ত্রের সেই জীবভূতা পরা প্রকৃতি যাহা-দ্বারা সমস্ত জগৎসংসার বিধৃত রহিয়াছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

ছাত্রদের মধ্যে পলিটিক্স চর্চ্চা (Les Documents des Progres) :—

আমাদের দেশে ছাত্রদের পক্ষে পলিটিক্স-চর্চ্চা সরকারী হুকুমে নিষিদ্ধ। পলিটিক্স-সংস্রবে থাকার দরুণ কত ছাত্রের পাঠ বন্ধ হইয়াছে, বিদ্যালয় হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে; কত শিক্ষকের

চাকরী গিয়াছে; অবশেষে সে ঢেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের দেশে দেশের লোকের দেশের কথা চিন্তা বা আলোচনা করা মহা-অপরাধ; কারণ, দেশ আমাদের নিজের নয়, আমরা পরের অধীন। যাহার অধীন তাহারাই আমাদের দেশের দশা যাহা হয় করিতেছে; আমাদের আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর লওয়ার স্পর্দ্ধা নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা।

কিন্তু স্বাধীন দেশের ব্যবস্থা ঠিক উল্টা। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কোনো খোঁজ খবর লওয়া হইত না বলিয়া ফরাসী লেখক দুঃখ করিয়াছেন, এবং এখন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অধিকারী বালক ছাত্রেরা যে রাষ্ট্রব্যাপারের আলোচনা করিতেছে ইহা জগতের উন্নতি ও শান্তির শুভসূচনা মনে করিয়া তিনি হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রায় বিশ বৎসর হইল য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রাষ্ট্রব্যাপারে মন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্রদের রাষ্ট্রব্যাপার-আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতির মধ্যে সুইডেনের ওয়াডেষ্টেনা শহরের ক্রিশ্চান ছাত্রদের বিশ্বজনীন সমিতি (১৮৯৫) প্রাচীনতম। এই সমিতির সার্ব্বদেশিক সভ্য লইয়া দশটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে; সর্ব্ব শেষ বৈঠক হইয়াছিল মার্ক্সোরা সাগরোপকূলস্থ রবার্ট কলেজে; সেখানে ত্রিশটি বিভিন্ন রাজ্য হইতে ছাত্রগণ সমবেত হইয়া জাগতিক রাষ্ট্রব্যাপারের আলোচনা করিয়াছিল। সংপ্রতি নিউইয়র্ক ষ্টেটের মোহোক-হ্রদের তীরে ইহার এক বৈঠক হইতেছে।

সভ্যসংখ্যা ও কর্ম্মানুষ্ঠানতালিকা দেখিয়া বিচার করিলে ইটালীতে ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ভ্রাতৃত্ববন্ধন' (Corda Fratres) সভাকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। সমগ্র জগতের ছাত্রদের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপন ও রক্ষণ ইহার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহারা কোনো রূপ ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, বা অর্থ বিষয়ক ব্যাপারের আলোচনা করে না। তথাপি ইহারা ছাত্রসঙ্ঘ গঠন করিয়া সকল দেশের মধ্যে সৌভ্রাত্র সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দ্বারা ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও অর্থ বিষয়ক সমস্যার পরোক্ষ সমাধান করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনো-আয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙ্ঘে চার হাজার এবং রিয়ো-জেনিরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসঙ্ঘে তিন হাজারের অধিক সভ্য আছে। ইটালীর অধিকাংশ ছাত্রই ভ্রাতৃত্ববন্ধন সভার সভ্য।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যাপার-আলোচনা অধিকতর প্রবল। ১৯০৩ সাল হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত উত্তর আমেরিকায় ছাত্রদের বিশ্বব্যাপারিক সভা ৩০টি স্থাপিত হইয়াছে; তাহাদের সভ্য-সংখ্যা দুই হাজার। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভার মধ্যে এই সমস্ত সমিতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে; তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যুচ্চ; তাহাদের অর্থের অভাব নাই; এবং দেশ বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া বা কোনো বিশেষ সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহাদের সহিত একযোগে কাজ করিয়া থাকেন। ইহারা সমবেত ভাবে একটি মাসিক পত্র পরিচালনা করে, এবং মধ্যে মধ্যে মহাসভার অধিবেশন করে;—এই সমস্ত মহাসভা এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার রাষ্ট্রব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত আছে; এখনো জাগতিক ব্যাপারের আলোচনায় হাত দিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৬ সালে The Oxford Cosmopolitan Club নামে একটি বিশ্বব্যাপারিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অপরাপর ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ বহু সমিতি আছে; যথা—East and West Clubs, International Polity Clubs, War and Peace Societies, Anglo-German Society, Anglo-American Society, Anglo-Chinese Society, Anglo-Japanese Society, প্রভৃতি। ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে India Society, Indian Association নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে ভারতীয় ছাত্রদেরও সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রচেষ্টা তুর্কদেশেও দেখা দিয়াছে। কনষ্টান্টিনোপলের রবার্ট কলেজের সার্ব্বজাতিক সমিতিতে (Cosmopolitan Club) ১৫টা বিভিন্ন জাতির ৫০ জন সভ্য আছে; তাহারা সকল দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার আলোচনা করে।

জার্ম্মানীতে ১৯১০ সালে বার্লিন শহরে এই প্রচেষ্টার অঙ্কুর দেখা দেয়। শীঘ্রই তাহা মিউনিক, বন, হিডেলবার্গ, গটিঙ্গেন প্রভৃতি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়াইয়া পড়ে। অষ্ট্রীয়াতেও ১৯১২ সালে এইরূপ সার্ব্বজাতিক সভার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়াছে।

এইরূপ প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহার দ্বারা সেই বিজ্ঞানের পরিচয়লাভ ঘটে যেখানে সীমাসবহদ্দের বিবাদ নাই। সকল জাতি পরস্পরকে বুঝিয়া সকল প্রকার অসদ্ভাব সহজেই দূর করিয়া ফেলিতে পারে। কোনো জিনিসের আলোচনা না হইলে তাহার মীমাংসাও হইতে পারে না।

নাটকের স্বরূপ (Hibbert Journal):—

আধুনিক ইংরেজ নাট্যকারদের মধ্যে বার্নার্ড শ এবং জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি কৃত্রিম বন্ধন বাধা ও রীতিনীতির (convention) বিরুদ্ধে বিশেষ জোর দিয়া মত প্রকাশ করার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের নাটকের মধ্যে পাত্রপাত্রীর চরিত্র-সৃষ্টি অপেক্ষা পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক প্রধান উপাদান। গভীর যুক্তিচিন্তা-মূলক কথাবার্ত্তা এবং প্রচলিত কৃত্রিম বাধাবন্ধনের প্রতি গভীর

জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি।

শ্লেষ তাঁহাদের নাটকগুলিকে দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের মতো বিচারের সামগ্রী করিয়া তুলিলেও পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধাবস্থানে তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। বার্ণার্ড শ'র Man and Superman এবং

গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দির The Silver Box, Strife, ও Justice নামক নাটকগুলি সামাজিক সমস্তার এক-একটি বিশেষ অবস্থার দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহাতে তাঁহাদের নাটকগুলির মধ্যে তাপ নাই, কিন্তু আলোক আছে যথেষ্ট।

বার্ণার্ড শ।

গাল্‌স্‌ওয়ার্দি হিবার্ট জার্নালে The New Spirit in the Drama নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি নাটকের স্বরূপ যেরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারকথা নিম্নে সংগৃহীত হইল—

যাহা করিতে চাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ না করা, অথচ চেষ্টার পশ্চাতে যে কি উদ্দেশ্য আছে তাহারই একটা স্পষ্ট ধারণা করাইয়া দিয়া চলা, সকল রকম আর্টেরই লক্ষণ। নাটককে আর্ট-সঙ্গত করিতে হইলে তাহারও এই উপায়ই অবলম্বন করা উচিত।

নিজের বিশ্বাসে যাহা সত্য তাহাই সাহস করিয়া অকপটে প্রকাশ করিয়া আপনার অন্তরাত্মার কাছে খালাস হইতে পারিলে সে নাটক পাঠকের মনকে জয় করিবেই করিবে। সাধারণে কি চায় তাহার তোয়াক্কা না রাখিয়া, অপরের মতের সহিত রফা না করিয়া, নিজের মনের সত্য কথা জোর করিয়া শুনাইয়া দিবার সাহস ও শক্তি যদি না থাকে, তবে সকল রকমের উন্নতির ও অগ্রগতির সম্ভাবনাকে 'রাম রাম' বলিয়া বিদায় দিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিতে হয়। যদি জয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ লোকের দলে আমরা ভিড়িয়া গিয়া কাপুরুষেরই ভিড় বাড়াই, তবে ত কর্ম্মের সম্ভাবনাই লোপ করিয়া বসিতে হয়। ফলের আশা না রাখিয়া কর্ম্মসাধন করিয়া গেলে আমাদের অন্তরাত্মার যে সন্তোষ তাহাই সকলকার সেরা পুরস্কার—রঙ্গালয়ের আহাম্মক বাজে লোকের সস্তা হাততালি, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। অকপটে সত্য বলিতে সক্ষম লোকের সংখ্যা চিরকালই অল্প; তাহাদের দলপুষ্টি করিবার জন্য স্বচ্ছন্দেই সংগ্রামের অবতারণা করা যাইতে পারে। ইংরেজি নাটকের মধ্যে এই সংগ্রামের চেষ্টাকে "আজগুবি নূতন চাল" বলিয়া অনেকেই ঠাট্টা করিতেছে। "আজগুবি" নাটকের ঘাড়ে আরো একটা অপবাদ চাপানো হয় যে সেগুলি ভয়ানক 'গুরুগম্ভীর'। বাস্তবিক যে কথা পরের ফরমাসে বলা হয় তাহার মধ্যে গুরুগম্ভীর ভাবের বালাই থাকে না, কারণ সে সব ত জানা কথা; কিন্তু যে কথা আমি অন্তরে অনুভব করিয়া বলি তাহা তলাইয়া বুঝিতে তোমার মগজ যদি একটু খাটিতে বাধ্য হয় তবে সে তোমারই কল্যাণ। সাধারণের বিশ্বাস, ধারণা ও সংস্কারকে আরো ভালো করিয়া বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া বা দেখা জিনিস দেখানো আর্টিষ্টের ত কাজ নয়, আর্টিষ্টের কাজ সাধারণের সমক্ষে জীবনের নূতন সমস্যা উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরা। হয় ত এমন জিনিস খুব মজাদার ফূর্ত্তিবাজ না হইতে পারে; কিন্তু ছাবলা জিনিসের পরমায়ু ত দুদিনের। সাধারণ নামক জীবসমাজটা অজীর্ণ রোগীর মতো—যাহা একবার খায় তাহা লইয়াই অনেক কাল ধরিয়া আইঢাই করিতে থাকে, হেউঢেউ করিয়া সোরগোল করে, পরিপাক করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে বিলম্ব লাগে; যখন পরিপাক হয় তখন আরামে গা এলাইয়া দিয়া ভুঁড়িতে একটু হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু রংদার স্বপ্ন দেখিতে পাইলেই সে খুব সস্তায় খুসি হইয়া যায়। বেচারার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে চাগাইয়া টানা-হ্যাঁচড়া করিতে মমতা বোধ হয় বটে, কিন্তু মমতা করিলে ত আর চলা হয় না; তাহাকে চালাইয়া লইতে ত হইবে। প্রথমটা তাহার একটু অসুবিধা ঠেকিবে বটে, কিন্তু একবার তাহার জড়তা ভাঙিয়া অভ্যাস করিয়া তুলিতে পারিলেই সে বুঝিতে পারিবে যে ভ্রমণটা অজীর্ণ রোগের বিশেষ পথ্য, চলিতে লাগিলেই ক্ষুধাও লাগিতে থাকিবে, এবং তখন কোনো খাদ্যই 'গুরুপাক' বোধ হইবে না।

কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে নূতন নাট্যকারেরা সাধারণকে ঔষধ গিলাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য লইয়া অকপট সত্যের সেবা করা চলে না। সত্য সর্ব্বনিরপেক্ষ স্বতঃ-উৎসারিত আত্মার আনন্দ। যাহা নিজের আত্মার তৃপ্তিকর তাহারই প্রকাশ যথাযথ হইলেই অকপট সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আমার পরম আমিকে খুসি করিতে পারাতেই আমার কর্ম্মের চরম সার্থকতা।

ইহাতে যদি অভিনয় তেমন না জমে না-ই জমিল। আজ-কালকার নাটক ত শুধু অভিনেয় নয়, তাহা পাঠ্যও বটে। নাটকের মধ্যে সত্য পদার্থ থাকিলে তাহা আরো বেশি বেশিই পঠিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এখনকার নাটক শুধু পাঠের জন্যই লিখিত নয়—রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের অধিকতর যোগ্য করিয়া ইহার পূর্ব্বে আর কোনো নাটক রচিত হয় নাই। বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা ও আত্মার নিকট জবাবদিহি এখনকার নাটককে বর্দ্ধিত হওয়াতে ইহা দিবালোকের তীক্ষ্ণতাতেও সঙ্কুচিত হয় না—ইহা শাশ্বত সাহিত্যের মধ্যে আপনার আসন কায়েমি করিয়া লইতেছে। শেক্‌স্‌পীয়রের পর আপনার নিকট বিশ্বাসপরায়ণ নাটককার এই যুগেই দেখা দিয়াছে।

উচ্চ রবে বক্তৃতা করা আর্টিষ্টকে মানায় না। আর্টিষ্ট কেবল

আভাস দিয়াই খালাস। কিন্তু আভাস সে কেমন করিয়া দিবে যদি বস্তুপরিচয়ের ফল তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি তাহার না থাকে। যাহার মধ্যে সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি আছে সে সনাতন প্রথা, শাস্ত্রের আদেশ, কুলাচার, অভ্যাস, সংস্কার, প্রভৃতি বাঁধা নিয়মের দোহাই মানিতে পারে না; যে পরের কথার দোহাই মানিয়া নিজের দৃষ্টি না খাটায় সে ত অন্ধের সামিল। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আর্টিষ্ট তাহার চারিদিকে যে আবহাওয়া সৃষ্টি করে, তাহাতে সংস্কার প্রথা আচার ইত্যাদি বাঁধা নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ ভাসিতে থাকে; তাহার সংস্রবে আসিলেই মানুষ সকল জিনিস সকল প্রথা সকল নিয়ম নিজে যাচাই করিয়া পরখ করিয়া হয় বর্জ্জন করে, নয় গ্রহণ করে।

এইরূপে সাধারণ সমাজ ক্রমশঃ বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠে। এজন্য আধুনিক নাটকের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করা, বলা যাইতে পারে। সেই ব্যক্তিই সমাজের যথার্থ কল্যাণকামী যে ভালো মন্দ, পাপ পুণ্য, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদ, সমস্তই স্বচ্ছন্দে আলোচনা করিতে পারে। রুচি বা নীতির গণ্ডি টানিয়া যে নাক সিঁটকাইয়া বসিয়া থাকে, সে ত সমগ্র মানবমণ্ডলীর সহিত যোগযুক্ত নয়, কাজেই সে মানবের হিতকামীও নয়। উদ্বোধিত মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে বলিয়া যথার্থ আর্টের মর্য্যাদাও বাড়িয়া চলে—তাহা অমুক বা অমুকের রচনা বলিয়া কিছুমাত্র খাতির বাড়ে না।

পরের মতের অপেক্ষা না রাখিয়া সত্য বিশ্বাসে মনের কথা অকপটে বলিয়া যাওয়া আর্টিষ্টের কাজ; মনটাকে অনুকূল রাখিয়া পরিচয়ের দ্বারা নতনকে যাচাই করিয়া গ্রহণ করা সাধারণের কাজ। জীবনসমস্যা বড় জটিল ব্যাপার; জীবনের সত্য অঙ্কফলের মতো একেবারে কষিয়া ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি ভিন্ন, বিষয় বিচারের পদ্ধতি ভিন্ন; সুতরাং সকলের বেলা একই ফল নির্দ্ধারিত থাকিতে পারে না। এজন্য, গুরু বা শাস্ত্র বলে বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকার কাল গিয়াছে; এখন সত্যের সন্ধান সকলের নিজের নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে লইতে হইবে।

এই স্ব-তন্ত্র পথে চলিতে গিয়া আধুনিক নাটক একদলের কাছে যেমন বাহবা পায় অপর দলের কাছে তেমনি নিন্দা পায়। যাহারা মনস্বী আর্টিষ্টের রচনার গতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে তাহারা মুগ্ধ হইয়া বাহবা দেয়, আর যাহারা পিছাইয়া পড়ে তাহারা করে নিন্দা। পিছাইয়া-পড়া লোকগুলাকে ঠেলিয়া আগাইয়া দিবার জন্য পরবর্ত্তী মনস্বীদের অপেক্ষায় থাকিতে হয়।

"যদি আমি ক্রোড়পতি হইতাম!" (The Fortnightly Review) :—

রুমানিয়ার রাণী বিদুষী ও সাময়িকপত্রিকার নিয়মিত লেখিকা। তিনি কারমেন সিল্‌ভা (Carmen Sylva) স্বাক্ষরে লিখিয়া থাকেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

একদিন আমরা রাজপ্রাসাদে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিলাম। একজন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল "আমরা যদি ক্রোড়পতি হইতাম ত কি করিতাম?"

রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন "আমি সাধ পূরাইয়া ফুল আর ঘোড়া রাখিতাম।"

রাজকুমার বলিলেন "আমি আমার শেষ পাইটি পর্য্যন্ত খরচ করিয়া আমার দেশকে নীরোগ করিতে চেষ্টা করিতাম।"

একজন শরীররক্ষী বলিলেন "আমি চাষীদের জন্য আদর্শ গ্রাম পত্তন করিতাম।"

একজন কলাকুশল চিত্রকর বলিলেন "আমি শুভ্র মার্বেল পাথর দিয়া একটি রঙ্গালয় তৈয়ারি করিয়া দিতাম, সেখানে হাজার হাজার দর্শক তামাসা দেখিয়া খুসি হইয়া ঘরে ফিরিত।"

রাজা কিছুই বলিলেন না।

আমি সব-শেষে বলিলাম "আমি একটি দেবালয়ের সঙ্গে সকল শিল্প শিক্ষার উপযুক্ত একটি বিদ্যালয় প্রস্তুত করাইয়া মানবসমাজের নামে উৎসর্গ করিয়া দিতাম।"

এই ঘটনার পর বহুকাল গত হইয়াছে। আমার এই মত আর কেহ পোষণ করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু আমি এখনো সেই মতই পোষণ করিতেছি। যে দেবালয়ে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূজার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তাহাই আমার মনে হয় মানবসমাজকে শ্রেষ্ঠ দান।

ফুল বড় সুন্দর—মনপ্রাণের রসায়ন; কিন্তু ফুল ত শাশ্বত সামগ্রী নহে, তাহার ক্ষয় আছে।

রোমানেরা দেখাইয়াছে রঙ্গালয়ের পরিণাম কি। আর, লোককে তামাসা দেখাইয়া খুসি করাই তাহার পরম সাহায্য নহে।

আদর্শ গ্রামেও রোগ শোক বিবাদ কলহ লাগিয়াই থাকিবে; মানব-শরীরের ধর্ম্মই রোগপ্রবণতা।

জগতে এক মাত্র স্থান দেবালয় যেখানে রোগ শোক ক্ষুদ্রতা দ্বন্দ্ব দরজার বাহিরে পড়িয়া থাকে। দেহ মনের সমস্ত বোঝা সেখানে এমন এক জনের চরণতলে নামাইয়া দিয়া আসা যায় যিনি আমার অন্তর্য্যামী ব্যথার ব্যথী দরদী। সেখানে জমিদারের উৎপীড়ন, সন্তানের ক্রন্দন, ক্ষুধার পীড়ন, কিছু নাই। অর্থ সেখানে অকিঞ্চিৎকর, ধনী সেখানে দরিদ্রের সমান, একজন মহামহিমাময়ের চরণতলে উভয়ে পাশাপাশি প্রণত। দেবতার ভবনই ভবনহীনের আশ্রয়। সেখানে অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব নাই, ছোট বড় নাই, কাড়াকাড়ি মারামারি নাই; সেখানে কেহ কথা বলে না বলিয়া কটু কথার অবকাশ নাই। সেখানে জনসংঘের মধ্যেও তুমি একা; যে একা সে সেখানে হাজার লোকের মাঝখানে।

এই দেবালয়ের সঙ্গে সকল শিল্পের শিক্ষাগার থাকিবে; সেখানে শেখানো হইবে জ্ঞানে মানুষ দেবতার মর্ম্ম বুঝিয়া তাঁহার কত কাছে পৌঁছিতে পারে, কী মহিমায় মণ্ডিত হইতে পারে। বৃহৎ পুস্তকাগারে যুগে যুগে আহৃত জ্ঞানরাশি পুঞ্জীকৃত থাকিবে। যাহা কিছু মানুষকে উন্নত ও স্বার্থহীন করে আমার দেবালয়ের চারিদিকে তাহাই ঘিরিয়া থাকিবে। সঙ্গীত সাহিত্য চিত্র তক্ষণ প্রভৃতি ললিত কলার ভিতর দিয়া মানুষের সুকুমার মাধুর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিবে।

একটা শহরের লোকের ক্ষুধা মিটাইবার শক্তি আমার নাই, কিন্তু আত্মার আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার একটি সামান্য ব্যবস্থায় যুগযুগান্তর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী তৃপ্ত হইতে পারে।

আমি কখনো ভারতবর্ষের দেবমন্দির দেখি নাই। আমার মনে হয় মানবপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু গভীর ও শ্রেষ্ঠ তাহা সেখানে তৃপ্তি পায়।

আমার মন্দিরটির ভিতর-বাহির শুভ্র নির্ম্মল মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত হইবে। সেখানে মধুর সঙ্গীতে সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাধুভক্তের কাকুতি নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

আমি উপন্যাসের রাণী হইলে এই সব ব্যবস্থা করিতাম।

কিন্তু সত্যকার রাষ্ট্রীর অবস্থা নিতান্তই অসচ্ছল। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে করিতে রাণী বেচারী নিজেই দরিদ্র। তাহাকে অপর ধনীর কীর্ত্তি দেখিয়াই সুখী হইতে হয়।

আমি যদি কোটীশ্বরী হইতাম তবে আমি এমনিই একটি বিহার-সমন্বিত দেবায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বমানবের নামে উৎসর্গ করিয়া দিতাম।

কাবুলির ভাষা (East and West) :—

গোস্তখোর ও জবরদস্ত, বিপুলকায় ও বলবান, দুর্দে ও দাঙ্গাবাজ, নির্ভীক ও স্বাধীন কাবুলিদের আমরা শহরে গ্রামে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমরা দেখি যে, আমাদের রাজা ইংরেজ তাহাদের রাজাকে বৎসরে ১৮ লক্ষ টাকা কর দেন। সেই কাবুলিরা যে আমাদেরই জাতি তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের সাধ্বী মহিষী শতপুত্রের মাতা গান্ধারী ঐ দেশেরই মেয়ে ছিলেন; তক্ষশিলা ও গান্ধার তখন হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

এই কাবুলিরা এখন যে ভাষায় কথা বলে তাহার নাম পশ্‌তো।

কাহারো মতে য়িহুদি রাজা সলোমানের সময় হইতে এই ভাষা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। য়িহুদি রাজা সলোমানের রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল; আফগানিস্থানের উত্তর সীমায় হিমালয়ের শাখাপর্ব্বত এখনো তখৎ-ই-সুলেইমান নামে খ্যাত। এই সম্রাটের দরবারে দূর দূর দেশ-দেশান্তর হইতে লোকসমাগম হইত; এই বিভিন্ন দেশের লোকদের কথাবার্ত্তার সুবিধার জন্য সম্রাট সলোমানের মন্ত্রী আসিফ্ বরুখীয়া এক নূতন সাঙ্কেতিক ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষাই পশ্‌তো ভাষা।

অপরের মতে সলোমান যখন ভারতসীমান্তের প্রদেশ জয় করেন তখন সেই দেশ আয়ত্ত ও বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি আফগানাকে প্রেরণ করেন। সেই বিজিত দেশের দুর্দ্ধর্ষ জাতি যে ভাষা বলিত তাহা ক্রমে বিজেতাদেরও ভাষা হইয়া পড়িল। সেই মিশ্র ভাষাই পশ্‌তো। এবং আফগানার অধীনে হিব্রু বা য়িহুদি উপনিবেশের নাম হইল আফগানা। এবং ক্রমে দেশের নাম হইল আফগানিস্তান।

পশ্‌তো শব্দের অর্থ পশ্‌ শহরের ভাষা। পশ্‌ শহর সুলেইমান পাহাড়ের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত ছিল, তাহার বর্ত্তমান নাম কাশগার। এই শহরে আফগানার রাজধানী ছিল। রাজধানীর নাম হইতেই আফগানদিগের নাম হইয়াছিল পশ্‌তুন, এবং ভাষার নাম পশ্‌তো।

এই ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ প্রচুর আছে। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের শব্দ, শিল্প বাণিজ্যে সুদক্ষ প্রতিবেশী জেন্দ ও পহ্লব জাতির ভাষা হইতে, পশ্‌তো ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আফগান দেশের আদিম ভাষা ছিল বোধ হয় সংস্কৃত-ভাঙা প্রাকৃত; কৃষি সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দই সংস্কৃতমূলক। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর জেন্দ ও পহ্লবী ভাষার সংমিশ্রণ হয়; শিল্প ও বাণিজ্য-মূলক সমস্ত শব্দই জেন্দ ও পহ্লবী। বিজেতা য়িহুদির হিব্রু ভাষাও পশ্‌তোর পুষ্টি সাধন করে; দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রী ও সম্পর্কের নাম হিব্রু শব্দ হইতে নিষ্পাদিত দেখা যায়—যেমন, আওর=অগ্নি, খীল=জাতি, ইত্যাদি। স্থান, ব্যক্তি ও জাতির নামও হিব্রু-শব্দ-নিষ্পন্ন। এই জন্য আফগানদের প্রত্যেক জাতির নামের অন্তে জাই ও সম্প্রদায়ের নামের অন্তে খেল থাকে। ইহার পরে মুসলমান বিজয়ের দ্বারা ভাষার মধ্যে আরবী পারসী শব্দ প্রবেশ লাভ করে। এবং ইহার ব্যাকরণ হিব্রু, আরবী ও মিশরী ভাষার নিয়ম-সংমিশ্রণে।

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে পশ্‌তোর কোনো লিপি ছিল না। পরে পারসী অক্ষরই লিখনোপায় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পারসী অক্ষরের উচ্চারণ এখানে অনেকটা বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পশ্‌তো সাহিত্যের সুন্দর কবিতা সমস্তই মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বকার রচনা। তখনকার যুদ্ধের গানগুলি খুব উত্তেজনাপূর্ণ। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিলাভ স্বাধীনতা না থাকিলে হয় না।

সুলতান মাহমুদ ঘনী আফগানদের সাহায্যে রাজ্য লাভ করিয়া আফগানদের খুব সমাদর করিতেন। তিনি তাঁহার উজির হাসান মাইমনদিকে পশ্‌তো ভাষার জন্য লিপি রচনা করিতে নিযুক্ত করেন। হাসান এই কথ্য ভাষাকে অক্ষরনিবদ্ধ করিয়া লেখ্য ভাষা করিয়া তুলেন। উজীরের হুকুমে কাজি নসরুল্লা, নস্খ্ ছাঁদের লেখায় পশ্‌তো বর্ণমালা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসজ্জিত করেন। ট অক্ষর পশ্‌তো বর্ণমালার প্রথমে ছিল না; সিন্ধীদের সংস্রবে আসিয়া ট পশ্‌তো বর্ণমালায় প্রবেশ লাভ করে—সেও অনেক পরে। মুল্লা হাসান কান্দাহারী সর্ব্বপ্রথম পশ্‌তো ভাষায় রচনা করিয়া পশ্‌তো সাহিত্যের সূত্রপাত করেন।

আধুনিক কালে খ্রীষ্টীয় মিশনরী ও ভারতবর্ষীয় মুসলমান মৌলবীদের চেষ্টায় পশ্‌তো ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কাপ্তেন রাভের্টি (Captain H. G. Raverty) রচিত পশ্‌তো-ইংরেজি অভিধান ও লাহোরের শামস্-উল্-উলামা কাজী মির আহমদ শা রিজওয়ানির পশ্‌তো ব্যাকরণ অতি উপাদেয় পুস্তক। পশ্‌তো ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি আবদুর-রহমান। তাঁহার দিওান বা কবিতা প্রত্যেক আফগান-গৃহে সমাদরে পঠিত ও আলোচিত হয়, উহা আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় পাঠ্য। মুল্লা আবদুল আজিম, খুসল খাঁ, পীর গুলাম, আইন খাঁ প্রভৃতিও নামজাদা কবি। মুল্লা আবদুল মজিদ পেশোয়ারী পশ্‌তো ভাষায় কোরান অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক পারসী গ্রন্থ বহু ব্যক্তির দ্বারা পশ্‌তো ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং সমাদর পাইতেছে।

পেশোয়ার জেলার মুরখ্ চেরী শহরের মিঞা পরিবারের সকলেই সাহিত্য-রসিক। তাঁহারা সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য সর্ব্বদা সুচেষ্ট। মিঞা নোমানুদ্দিনের জফর-উন্-নিসা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জিনৎ-উন্-নিসা খুব লোকপ্রিয় পুস্তক।

চারু।

লর্ড লিস্টার্ (Medical Journal) :—

নব্য অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যার (সার্জ্জারীর) জন্মদাতা লর্ড লিস্টার (Lord Lister) গত বৎসর (১১ই ফেব্রুয়ারী) ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ মানুষের আত্মার উদ্ধারের পথ দেখাইয়াছেন বলিয়া, লোকে তাঁহাদিগকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া থাকে। এক হিসাবে লর্ড লিস্টারও কম ত্রাণকর্ত্তা নহেন। এন্‌টিসেপ্‌টিক্ সার্জ্জারী (antiseptic surgery)র আবিষ্কার করিয়া তিনি মানব জাতির কি-পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। লর্ড লিস্টারের পূর্ব্বে যে দক্ষ, সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক না-ছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের দক্ষতা মানুষের তেমন কাজে আসিতেছিল না। সে সময় যে-সকল রোগীর দেহে অস্ত্রচিকিৎসা করা হইত তাহাদের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। লর্ড লিস্টারের এন্‌টিসেপ্‌টিক্ সার্জ্জারী এই-সকল মৃত্যু কি করিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, লিস্টার যে সময় গ্লাসগো

লর্ড লিষ্টার।
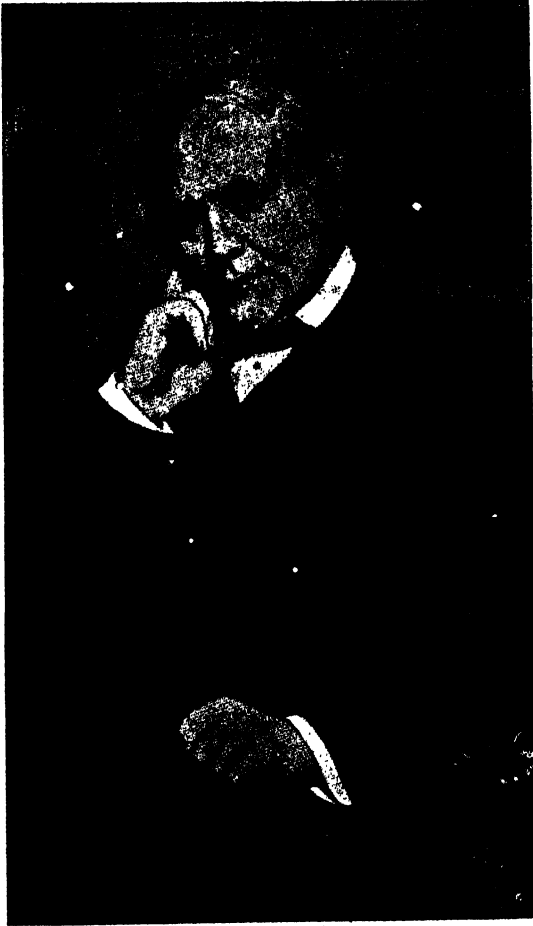
রয়াল্ ইন্‌ফার্ম্মারী (Glassgo Royal Infirmary)র অন্যতম সার্জ্জন (অস্ত্রচিকিৎসক)-এর পদে প্রতিষ্ঠিত হন, সে সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার কথাটা মনে করিয়া দেখা উচিত। সে সময় অধিকাংশ রোগীর ক্ষত ও কর্ত্তিত স্থানে দোষ জন্মাইয়া pyaemia (পাইয়ামিয়া), gangrene (গ্যাংগ্রিন্), septicaemia (সেপ্‌টিসেমিয়া) প্রভৃতি রোগ হইত। এই সকল রোগে প্রায় স্থলেই রোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটিত। তখনকার দিনে সার্জ্জনগণ মনে করিতেন কাটা স্থানে পুঁজ হওয়া প্রদাহ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। ইহার প্রতিরোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। এই বিশ্বাসবশতঃ ইহা নিবারণ করিতে তাঁহাদের কোন চেষ্টা ছিল না—বরঞ্চ ক্ষতস্থানে পুঁজ ও প্রদাহ উৎপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা পুলটিস্ (poultice) ও আরও নানা উপায় অবলম্বন করিতেন। গ্ল্যাস্‌গো ইন্‌ফার্ম্মারী (Glassgo Infirmary)র সার্জ্জন পদে বরিত হইয়া লিস্‌টার রোগীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আপনার হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলেন। ইহা নিবারণ করিতে পারা যায় কিনা তাহারই অনুসন্ধানের চেষ্টা তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার রোগীগণকে যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি রোগীর ক্ষতাদি ধৌত করিয়া, বেশ করিয়া হাত না ধুইয়া অন্যরোগী স্পর্শ করিতেন না। তখনকার দিনে এ-সকল আচার অনুষ্ঠানকে সার্জ্জনগণ একবারে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইহারা মনে করিতেন ক্ষতস্থানে যে পুঁজ হয়—স্থানটি যে পচিয়া উঠে, তাহার একমাত্র কারণ, স্থানটিতে বায়ু প্রবেশ করে বলিয়া। বায়ুতে যে অক্‌সিজেন্ (oxygen) আছে, তাঁহাদের মতে, সেই অক্‌সিজেনই এই-সকল অনর্থের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। লিস্‌টার কিন্তু এমত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এ জন্য তাঁহাকে সে সময় কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়াও লিস্‌টার তেমন ফল পাইলেন না, সে সময়কার চিকিৎসালয়গুলির বায়ু রোগবীজে এমনই দূষিত ছিল। লিস্‌টার কিন্তু হতাশ হইলেন না। হস্‌পিটাল্ গ্যাংগ্রিন (Hospital Gangrene), পাইয়ামিয়া (Pyaemia) সেপ্‌টিসেমিয়া (Septicaemia) প্রভৃতি সার্জ্জারীর কলঙ্কগুলিকে দূর করিতেই হইবে, ইহাতে যদি তাঁহার জীবনপাত করিতে হয়, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। এ সময় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একটি মাহেন্দ্রক্ষণের উদয় হইয়াছিল। পারী নগরীর পাস্তুর (Pasteur) এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বসিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন বায়ুমণ্ডলে যে-সকল ধূলিকণা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে এমন সব উদ্ভিদাণু (micro-organisms) থাকিতে দেখা যায়—যাহারাই পচন ব্যাপারটির (putrifaction এর) মূল কারণ। পচনক্রিয়া অনেকটা উৎসেচন ক্রিয়ারই (fermentationএরই) ন্যায়। বাতাসে যে ইয়েস্‌ট্‌ ফাঙ্‌গাস্ (Yest-fungus) আছে—তাহার সংস্পর্শে, যেমন তালের রস মাতিয়া তাড়ী হয়, দুগ্ধে ল্যাকটিক্ ফার্মেন্‌ট্ (lactic ferment) দিলে তাহা মাতিয়া যেমন দই হয়, ঠিক সেইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই বায়ুস্থিত বিবিধ উদ্ভিদাণু (micro-organisms) সংস্পর্শে ক্ষত ও আহত স্থানে পুঁজ হয়—তাহাদের দ্বারাই সে স্থানটি পচিয়া উঠে। এই তথ্য বাহির হইবামাত্রই লিস্‌টার তাহা কাযে লাগাইতে চেষ্টিত হইলেন। এই অদৃশ্য শত্রুকে কি করিয়া বিনাশ করিতে পারা যায়—অন্ততঃ পক্ষে তাহারা যাহাতে ক্ষতাদির উপর কায না করিতে পারে, তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে তিনি মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। এই হইতেই এণ্টিসেপ্‌টিক্ সার্জ্জারী (antiseptic sergery)র জন্ম। ইহার আবিষ্কার হওয়ার পর—অস্ত্রবিদ্যা মানুষের যে কত উপকার করিতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। ইতিপূর্ব্বে দেহের যে-সকল অংশে সার্জ্জনগণ ছুরী চালাইতে ভয় পাইতেন—ইহার পর সে-সকল স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। এখন ফুস্‌ফুস্, মস্তিষ্ক, উদরাভ্যন্তর প্রভৃতিতে ছুরী চালান সার্জ্জনদের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই এন্‌টি-সেপ্‌টিক্ সার্জ্জারী (antiseptic surgery)র কল্যাণেই ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সিংহাসনারোহণ ব্যাপারটা বিষাদে পরিণত হইতে পারে নাই। এই এন্‌টিসেপ্‌টিক্ সার্জ্জারীর জন্যই ক্ষত ও কর্ত্তিত স্থানে রোগীকে পূর্ব্বের ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয় না। অধ্যাপক হাক্‌সিলি (Huxley) এ বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—Edinburgh Royal Infirmary পরিদর্শনকালে তিনি লিস্‌টারকে বলিয়াছিলেন "দেখ লিস্‌টার, তোমার নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর আর একটি বিশেষত্ব দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া গিয়াছি। কাটার পর রোগীর যে যন্ত্রণা হয় তোমার রোগীদের সে যন্ত্রণা অনুভব করিতে দেখিলাম না।"

১৮৬৯ সালে লিস্‌টার্ (Edinburgh University) এডিনবরা ইউনিভার্সিটীর Clinical Surgeryর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানেও তাঁহার নবাবিষ্কৃত পথেরই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সার্জ্জনদিগের তত্ত্বাবধানে যে-সকল রোগী চিকিৎসার জন্য আসিত তাহারা দলে দলে প্রাণ হারাইতে বসিত কিন্তু লিস্‌টারের ওয়ার্ডের (ward) প্রায় সকল রোগীই সারিয়া উঠিত। ইহা দেখিয়াও তাঁহারা সে সময়ে লিস্‌টারের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে বিমুখ ছিলেন। ইঁহারা সে সময় লিস্‌টারকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপই করিতেন। বুড়োরা যাই করুক কিন্তু যুবারা লিস্‌টারের গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সকলেই লিস্‌টারের ছাত্র হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। ১৮৭৭ সালে লিস্‌টার King's Collegeএর সার্জ্জনের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে কয়েক বৎসর গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৯২ সালে অধ্যাপকের কায হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

লিস্‌টারের জীবনী আলোচনা করিলে, এই মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তাঁহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ অতি অল্পই জন্মিয়াছে। সফলতার গৌরব আবিষ্কারকের অদৃষ্টে কদাচিৎ ঘটিতে দেখা যায়। তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সাধারণে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এ বিষয়ে লিস্‌টারের অদৃষ্ট সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি যে সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন—তাহার জন্য প্রথম প্রথম তাঁহাকে নানারূপ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা প্রভৃতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবিতকাল মধ্যেই তাঁহার অতিবড় শত্রুকেও তাঁহারই আবিষ্কৃত পথের অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বেই antiseptic surgeryর মহিমা তিনি জগতের প্রায় সকল স্থলেই বিঘোষিত হইতে দেখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল বিদ্বৎ-সভা হইতে তিনি ভূরি ভূরি সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজসম্মানও তাঁহার অদৃষ্টে অল্প ঘটে নাই। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ও ৭ম এডওয়ার্ডের পারিবারিক চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞায় তিনি প্রথমে ব্যারোনেট্ (baronet), পরে ব্যারন্ (baron) হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ভূরি ভূরি দেশীয় বিদেশীয় রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লর্ড লিস্‌টার ১৮৯৩ সালে বিপত্নীক হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র শোকসভা আহূত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সম্রাট ও তাঁহার জননী মহারাণী এলেকজেন্দ্রা, লিস্‌টারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পরিজনগণকে পত্র লিখিয়াছিলেন। মহারাণী এলেকজেন্দ্রা (Queen Alexandra) তাঁহার পত্রের একস্থানে লিস্‌টার সম্বন্ধে এই লিখিয়াছিলেন যে "তাঁহার মৃত্যুতে মানব জাতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—রোগক্লিষ্ট মানবের তিনি যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। জগতের সকল লোকই তাঁহার মৃত্যুতে শোকানুভব করিবে।"

লিস্‌টারকে দেখিলে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে বিনয় ও নিরহঙ্কার ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পাইত না। তাঁহার মত সত্যনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মাইতে দেখা যায়। তিনি ধনী নির্ধন সকল রোগীর প্রতিই সমান সদয় ব্যবহার করিতেন।

ডাক্তার।

ল্যাফকাডিও হার্ণ (Japan Magazine) :-

পরকে আপন করিতে পারিলে তবে পরকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায়। বিদেশ ও বিদেশীকে বুঝিতে হইলে হৃদয়ে শ্রদ্ধা লইয়া সেখানে যাইতে হইবে, প্রথম হ'তেই আপনাকে উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। যাহাকে আপনার সমকক্ষ বলিয়া জানি তাহাকেই আমরা ভালো করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যাহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া ভাবি তাহার ত্রুটি ক্ষুদ্রতা ও অসম্পূর্ণতাই বেশি করিয়া আমাদের চোখে পড়ে, তাহার গুণ আমরা মোটেই দেখিতে পাই না। অনেকেই আমরা বিদেশে গিয়া যখন দেখি তাহাদের কোনো কোনো আচার ব্যবহার আমাদের হইতে বিভিন্ন অমনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলি, এরা বড় অসভ্য, বড় চরিত্রহীন। তাহাদের চোখেও যে আমাদের কোনো কোনো আচার ব্যবহার ঐরূপই ঠেকিতে পারে সে কথা তখন ভুলিয়া যাই। সঙ্কীর্ণ চিত্ত লইয়া তো কাহাকেও বিচার করা চলে না।

ল্যাফকাডিও হার্ণ (কোইজুমি য়্যাকুমো) ও তাঁহার জাপানী পত্নী।

আমাদের ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হইয়া, বিদেশে লালিত পালিত হইয়াও ভারতবর্ষকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কেবল তিনি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া ভালোবাসিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া। তিনি বিচারক সাজিয়া ভারতবর্ষের ত্রুটি অন্বেষণ করিতে আসেন নাই। ভারতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতা যেমন, জাপানে তেমনি ল্যাফকাডিও হার্ণ। তিনি বিদেশী হইয়াও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জাপানের প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তিনি সেই রম্য দ্বীপের আকাশে বাতাসে সাগরে, নিভৃতনির্জ্জন দেবমন্দিরে, এলোমেলো সরু পথে

ও কাঠের ছোট বাড়ীতেও কত রহস্য কত অফুরান সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। জনবিরল পথে রাত্রির অন্ধকারে 'আম্মা'র করুণ বাঁশীর সুর তাঁহাকে কোন্ সুদূরের অবর্ণনীয় সঙ্গীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিত; 'সামিসেনের' ঝনৎকার ও নিশীথঝিল্লীর মুখরতাও তাঁহার নিকট সেই অজানা সুদূরেরই বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত; কৃষকের নগ্নপদে তিনি সৌন্দর্য্য দেখিতেন এবং রমণীর ক্ষুদ্র কোমল হস্ত ও শ্বেত 'তাবি'-আবরিত পদযুগল তাঁহার নয়নসমক্ষে স্বর্গসুষমায় প্রকাশিত হইত। সে-সব কথা তিনি তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ইংরাজি গদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন—এক একটি লেখা যেন এক একখানি ছবি, তাহা একেবারে হৃদয় স্পর্শ করে, একবার পড়িলে চিরদিনের জন্য মানসপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। ইংরাজি গদ্যসাহিত্যে ইঁহার মত সুললিত প্রাণস্পর্শী ইংরাজি লেখা খুব অল্পই আছে। ইঁহার রচনা ভাদ্রের ভরা নদীর মত উচ্ছ্বসিত আনন্দে গান গাহিয়া ছুটিয়া চলে, সে গান যে শোনে সে-ই মুগ্ধ আনন্দিত হইয়া যায়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গ্রীসদেশীয়া মাতার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁহার আইরিশ ছিলেন।

তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভেই তাঁর নির্দ্দোষ চমৎকার লিখিবার ভঙ্গী পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক দেশ ঘুরিয়া অনেক লোক দেখিয়া অবশেষে তিনি জাপানে পদার্পণ করিলেন। প্রথমে তিনি মাৎসু ও কুমামোতো প্রদেশে ইংরাজি শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন, তারপর যখন তাঁর ইংরাজি গদ্যরচনার অদ্ভুত পারদর্শিতার কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

বাল্যে তাঁহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া যায়, অপর চক্ষুটিও বয়সের সঙ্গে ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও তিনি কত যত্নে কি অদ্ভুত সাধনায় ছত্রে ছত্রে তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

লোকে তাঁহাকে বিশেষ দেখিতে পাইত না। তিনি নির্জ্জনতা ভালোবাসিতেন। য়ুরোপীয়দিগকে সর্ব্বদা পরিহার করিয়া চলিতেন, তাহাদের সহিত মোটেই মিশিতে পারিতেন না, এজন্য জাপানের তাৎকালীন য়ুরোপীয় সমাজ তাঁহাকে বিশেষ সদয় চক্ষে দেখিতে পারে নাই।

জাপানী রমণীকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া লইয়া জাপানী প্রজা হইয়া তিনি কোইজুমি য়্যাকুমো নাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহাকে আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। যতদিন তিনি বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, ততদিন বিদেশীদের জন্য ধার্য্য বিশেষ বেতন পাইয়াছিলেন; যেই জাপানী হইলেন অমনি বেতন কমিয়া গেল। এই ব্যাপারে জাপানী গবর্ণমেণ্টের প্রতি তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

স্বীয় সাহিত্যসাধনার বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।

"কেবল ভালো-লাগার দরুণ একই বিষয়ে বৎসরের পর বৎসর কাজ করিতে যে অনিচ্ছার কথা লিখিয়াছ তা' আমি বুঝিতে পারি, কারণ আমিও বহুবার দীর্ঘকাল ধরিয়া এই হতাশার ভারে প্রপীড়িত হইয়াছি। কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি যে জগতের যা-কিছু শিল্পকার্য্য, যা-কিছু চিরস্থায়ী—সমস্তই এইরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে কেবলমাত্র শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগবশতঃ যে কাজ গড়িয়া উঠিয়াছে অপ্রত্যাশিত বিরল দুর্ঘটনায় ব্যতীত তাহার ধ্বংস নাই। তবে শিল্পীর পক্ষে সকল ত্যাগের চেয়েও কঠিন ত্যাগ হইতেছে শিল্পের জন্য এই ত্যাগ—স্বার্থকে পদদলিত করা। যাঁহারা শাশ্বতকালের পুরোহিত তাঁহাদের শ্রেণী-ভুক্ত হইবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই কঠিন নিষ্ফল ত্যাগ শিল্পীকে করিতেই হইবে। আর ত্যাগ ব্যতিরেকে ভগবানের অনুগ্রহলাভের আশা করা যায় কি? পুরস্কার কি? কেবল কি ভাবের প্রেরণা? আমার মনে হয় শিল্প আমাদিগকে নূতন বিশ্বাস প্রদান করে। মনে হয়, আমি যদি মহান্ কিছু সৃষ্টি করিতে পারি তবে ভাবিব, যে অজ্ঞেয় পুরুষ তাঁহার অনাদি উদ্দেশ্যের শুভ বিবর্ত্তনে আমায় মুখপাত্র মনোনীত করিয়াছেন, এবং যে ঋষির ভাগ্যে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছে, তাঁর যে গৌরব, আমিও তখন সেই গৌরব অনুভব করিব।"

সু।

টলষ্টয়ের সর্ব্বশেষ রচনা (Sun):—

রুশের থিয়েটারে সম্প্রতি টলষ্টয়ের একখানি নাটকের অভিনয় চলিতেছে। নাটকখানি টলষ্টয় লিখিয়াই গিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সাধারণ মানবজীবন সম্বন্ধে টলষ্টয়ের ধারণা কি ছিল, নাটকখানি পাঠ করিলে তাহা জানা যায়। এইখানিই তাঁহার শেষ রচনা।

নাটকখানির নাম "জীবন্ত শব" (The Living Corpse)। একটি সত্য ঘটনা নাটকখানির ভিত্তি। রাজার এক ফৌজদারী আদালতে এক মকর্দ্দমা হয়—সরকারী উকিল ডেবিড্ফ টলষ্টয়কে সেই মকর্দ্দমার বৃত্তান্ত বিবৃত করেন, তাহা হইতেই এই নাটকের সূত্রপাত হয়। ব্যাপারখানা মোটামুটি এই:

সামাজিক প্রতিষ্ঠাপন্ন এক লোক সুখের আশায় বিবাহ করিয়া দুই বৎসর পরে দেখিল, সে ভারী ঠকিয়াছে। তাহার অন্তর যে অজানা সুখের পিপাসায় ক্ষুব্ধ পীড়িত ছিল, পত্নী সে ক্ষোভ সে পীড়া শান্ত করিতে পারিল না। তখন সে গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র সুখের সন্ধান করিতে লাগিল। পত্নী প্রথমটা এ অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু এ ভাব অধিক দিন রহিল না। স্বামীর প্রতি অভিমান, ক্রমে বিরক্তি ও ঘৃণায় দাঁড়াইল। অনাদরে অবহেলায় তাহার উপেক্ষিত তরুণ হৃদয় সাগ্রহে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল—আশ্রয় মিলিতেও বিলম্ব হইল না। আর একজন যুবার সে প্রেমার্থিনী হইল।

স্বামী শেষে নিজের ভ্রম বুঝিল। সে কি ছিল, কি হইয়াছে। জীবনটা একেবারেই সে ব্যর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ঘৃণায়, অনুশোচনায় একদিন সে লোকালয় ত্যাগ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পথে যাহারা বন্ধু জুটিল, তাহারা আশ্বাস দিল, 'দুনিয়া মজার ঠাঁই—শুধু নাচ গান আমোদ আহ্লাদ লইয়া থাক, কোন দুঃখের আঁচ লাগিবে না'।' সে বেচারাও যেন কূল পাইয়া বাঁচিয়া গেল, আমোদে মাতিয়া অনুশোচনার হাত এড়াইল। কিছুকাল পরে সহসা একদিন আমোদের ঝোঁকে পড়িয়া একজন সঙ্গীর মৃত্যু ঘটিল—গৃহত্যাগী দুর্ভাগা তখন সেই মৃত সঙ্গীর নাম গ্রহণ করিয়া আপনার নাম ও বেশ মৃত দেহটার সহিত ভূগর্ভে সমাহিত করিল। সংবাদ রটিল তাহারই মৃত্যু হইয়াছে—মাতাল সঙ্গীগণের কিছু খেয়ালই হইল না। তখন সে জীবন্ত শব হইয়া দল ছাড়িয়া বাহির হইল।

স্ত্রী শুনিল, ইয়ারের মজলিসে মদ খাইয়া স্বামী মরিয়াছে। তখন আর বাধা রহিল না, সে আপনার নব প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে এক বিপদ ঘটিল। 'জীবন্ত শব' বেচারা এক ফৌজদারী হাঙ্গামায় পড়িয়া বিচারের জন্ম মস্কোর সার্কিট কোর্টে চালান হইল। সেখানে পুলিশের তদ্বিরে ও উকিলের জেরায় তাহার পূর্ব্বপরিচয়ও আর গোপন রহিল না। ছদ্মনামের আবরণ ঘুচিয়া গেল, জুয়াচুরি ধরা পড়িল। ফলে তাহার স্ত্রী-বেচারী, যাহাকে সে মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই মনে যথেষ্ট প্রসাদ-শান্তি অনুভব করিতেছিল—সেই স্ত্রী, স্বামী জীবিত থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণের অপরাধে অভিযুক্ত হইল।

মূল ঘটনাটিতে স্ত্রীর ভাগ্যে পরে ডাইভোর্স মিলিয়াছিল, এবং স্বামীও মকর্দ্দমার দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া আপনার উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ জীবনভার লইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।—টলষ্টয়ের নাটকে স্বামী বেচারা শেষে আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে।

এই ঘটনাটিকে নাটকের ছন্দে ফুটাইয়া তুলিবার সময় টলষ্টয় তাঁহার নায়কের জটিল হৃদয়-দ্বন্দ্বটিকে বেশ শান্ত করুণ রসে ভিজাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার অতৃপ্তি, তাহার ক্ষোভ, যাহার তাড়নায় গৃহ পত্নী সব সে ত্যাগ করিয়া গেল—সে অতৃপ্তি, সে ক্ষোভের অর্থও সুগভীর—তাহার জন্য মন অসহ্য বেদনায় ভরিয়া উঠে। তাঁহার নায়ক ফিদিয়ার মুখ দিয়া বড় দুঃখেই তিনি একটা কথা বলাইয়াছেন—কথাটি সমাজ-হৃদয়েরই একটি ব্যথিত দীর্ঘ-নিশ্বাস। ফিদিয়া বলিতেছে,—

"যে সমাজে আমার জন্ম, সেই সমাজের কথাই বলছি। সকলেরই সামনে যেমন থাকে আমার সামনেও তেমন তিনটে পথ খোলা ছিল। প্রথম চাকরি নেওয়া—তাতে পয়সা উপার্জ্জন হবে, ইতর নীচ স্বার্থটুকুর চর্চ্চা করে জগতের আবর্জ্জনার ভারও তোফা বাড়িয়ে যেতে পারা। কিন্তু আমার তা অসহ্য বোধ হত—তা ছাড়া এ সবেরও সামর্থ্য কি রুচিও আমার কোন কালে ছিল না। দ্বিতীয় পথ,—এই স্বার্থটুকু নষ্ট করে মানুষ হওয়া—তা হতে গেলে অনেক সাধনা, অনেক কষ্ট সইতে হয়, সে ধৈর্য্য বা শক্তিও আমার ছিল না। তৃতীয় পথ—বিস্মৃতি—সমস্ত দায়িত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে যায়,—দুঃখ ভোলা যায় এমন বিস্মৃতি—সে বিস্মৃতি দিতে আছে মদ, নাচ, গান, সঙ্গী, ইয়ার। তোফা আমোদ আহ্লাদ—কোন লেঠা নেই—আমি এই শেষ পথ ধরেছিলুম।"

এই ভাবটি বহুকাল হইতেই টলষ্টয়ের মনে জাগিতেছিল। কালে তাঁহার বহু পুরাতন খসড়ার মধ্যেও এই নাটকের কঙ্কাল-চিহ্ন দেখা যায়। যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসরে নাটকখানি সমাপ্ত হয়। নায়ক ফিদিয়া বৃথাই বিস্মৃতির আশায় দারুণ অস্বস্তি বুকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—এবং টলষ্টয়ের মতই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আপনার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পরিবারবর্গের পার্শ্বে ঘটনাক্রমে আসিয়া দাঁড়াইল। ফিদিয়া তাহার অতীত স্মৃতির মধ্যে আপনাকে কেমনভাবে একেবারে সম্পূর্ণ সমাহিত করিয়া দিল; শুধু নাম নয়, অতীতের সেই প্রীতি ভালবাসার সহস্র স্মৃতিও সেই নামের সঙ্গে কি করিয়া সে বিসর্জ্জন দিল,—এসব টলষ্টয়ের লেখনী কি দীপ্ত করুণ বর্ণেই না চিত্রিত অঙ্কিত করিয়াছে। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, সাদাসিধা কাহিনী,—তাহারই চারিধার ঘিরিয়া টলষ্টয় মানবজীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যার জাল রচিয়া দিয়াছেন—একটি বিরাট সত্য স্বাভাবিক শ্রীতে দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন সমালোচক হয়ত বলিবেন, নাটকখানিতে দার্শনিক তত্ত্বের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত বাড়িয়াছে—কিন্তু যাঁহারা টলষ্টয়কে চেনেন, তাঁহার রচনা, রীতি ও আজীবনের আকাঙ্ক্ষিত ব্রতের সহিত যাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁহারা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, যে, ইহাতে টলষ্টয়ের শক্তি কোথাও এতটুকু ম্লান হয় নাই।

ভিয়েনা ও বার্লিনে এই নাটকের অনুবাদ হইতেছে—তথায় ইহার অভিনয় শীঘ্রই সুরু হইবে। ইংরাজী ও ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ফরাসী অনুবাদের ভূমিকায় দেখানো হইয়াছে যে, টলষ্টয়ের নায়ক ফিদিয়া প্রকৃতির এক উদ্দাম শিশু—ইহাই নাট্যকারের কল্পনা—এবং এ কল্পনা একেবারে নূতন নহে, রুশোর ভাবেই অনুপ্রাণিত। য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ হইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষাতেও অনুবাদ হইতেছে। 'প্রবাসীতে' এবৎসর "মৃত্যু-মোচন" নামে যে নাটক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা টলষ্টয়ের The Living Corpseএরই বঙ্গানুবাদ।

সৌ।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা

(পুনরাবৃত্তি)

(De La Mazeliereর ফরাশী গ্রন্থ হইতে)

***

যে সম্রাট্‌কে আবুল-ফজল, রাজার উচ্চ আদর্শ, মনুষ্যের সেরা নমুনা বলিয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আক্‌বর বাদ্‌শা। তাঁহার দেহ-পরিমাণ বৃহতের দিকে, দীর্ঘ বাহু, বুকের ছাতি চওড়া, বলবান্‌, গায়ের রং মলিন-পীতবর্ণ, মোগোলীয় ছাঁচ, নাসিকা ঈষৎ শুকচঞ্চুবৎ, চোখ্‌ ও চুল কালো, কপাল প্রশস্ত, নাসিকার বামপ্রান্তে একটা আঁচিল। কণ্ঠস্বর জোরাল, কথাবার্ত্তায় প্রিয়ভাষী। তাঁহার চলনভঙ্গীতে ও মুখের ভাবে খুব একটা গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত। যুবা বয়স, দীর্ঘ শ্মশ্রু—যাহা মুসলমানদিগের অতিশয় প্রিয়। আরও কিছুকাল পরে, তিনি হিন্দুদিগের ন্যায় দাড়ী কামাইতেন এবং গোঁপ ছোট করিয়া রাখিতেন। মাথায়, বেশ একটু নীচু ধরণের পাগ্‌ড়ী পরিতেন, তাহাতে পর্‌-ওয়ালা শিরোভূষণ থাকিত। সচরাচর, প্রাচীনকালের সাধুদিগের মত শাদা পশোমের দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং কণ্ঠে মুক্তার মালা ধারণ করিতেন। যুদ্ধের সময় বর্ম্ম; অন্দরমহলে,—বিচিত্র ধরণের য়ুরোপীয় কেতার পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ স্পেনীয় পরিচ্ছদ—স্পেনীয়দিগের কিংখাপ ও মখ্‌মলের পোষাক।

আক্‌বর—বলবান্‌, নির্ভীক, ব্যায়াম-চর্চ্চায় অনুরক্ত, পদচারণে ও অশ্বারোহণে সুদক্ষ, শীকারে সুপটু, পোলো-খেলার অত্যন্ত অনুরাগী; রাত্রিতে, কাঠের গোলায় আগুন জ্বালিয়া, সেই প্রজ্বলিত গোলা লইয়া খেলা হইত,—কাঠ আস্তে আস্তে পুড়িয়া যাইত। উত্তম সেনাপতি; কোন বিজয়-অভিযানে তিনি নিজেই সৈন্যচালনা করিতেন। উত্তম সৈনিক; তাঁহার প্রাণের ভয় ছিল না:—একদিন, তাঁহার দুই পারিষদ ও তিনি একদল শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। একটা গর্ত্ত-খোঁড়া রাস্তায় শত্রু-সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে; ভাগ্যক্রমে মনসাগাছের ঝোপের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাই সেই দিন তাঁহার প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছিল। আর একবার, বন্দুকের অব্যর্থসন্ধানে তিনি নিজহস্তে একজন রাজপুত সর্দ্দারকে হত্যা করেন।

আক্‌বর অত্যন্ত মিতাচারী ছিলেন। তিনি একবার মাত্র আহার করিতেন, ক্বচিৎ কখন মাংস খাইতেন। তিনি খাইতেন—কারির সঙ্গে ভাত, ভারত-জাত কিছু ফল, বিশেষতঃ আম; কিন্তু এই-সকল ফলের চেয়ে পারস্যদেশের মেওয়া তাঁহার বেশী ভাল লাগিত:—খর্ম্মুজা, আঙ্গুর, পীচ ও বেদানা। তাঁহার বায়ু-প্রধান বা স্নায়ু-প্রধান ধাত ছিল; মুহূর্ত্তকালের মনের ঝোঁকে তাঁহার চরিত্রে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইত। শান্ত ও মধুর প্রকৃতি, কিন্তু যদি কোন ধর্ম্মতত্ত্ববাগীশ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিত, তিনি প্রচণ্ডক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার প্রতি কটুকাটব্য বর্ষণ করিতেন, যথা:—"যদি এখানে এক হাঁড়ি গোবর থাকিত, আমি তোমার মুখের উপর নিক্ষেপ করিতাম।" একদিন সায়াহ্নে তিনি কোন অশুভ সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেখিলেন, তাঁহার এক গোলাম নিদ্রিত; তখনই তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু তিনি মহানুভব বীরপুরুষ ছিলেন। আক্রমণ-অপ্রত্যাশী সুপ্ত শত্রুসৈন্যকে তিনি তূরীনিনাদে জাগাইয়া দিতেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। বাল্যদশায় তিনি, মোগল-প্রথানুযায়ী তাঁহার বিজিত শত্রুকে হত্যা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; বৈরাম স্বহস্তে সেই বন্দীর শিরশ্ছেদ করেন। যৌবনে, তিনি শত্রুকে ক্ষমা করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার পুত্রবাৎসল্য চিত্তদৌর্ব্বল্যের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর কতবার রাজবিদ্রোহী হইয়াছে, তবু তিনি কখন তাহাকে দণ্ডিত করেন নাই। মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ঔদার্য্য ছিল; তিনি বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়াছিলেন:—"আমার শরীর যদি এত বড় হইত যে তার মাংসে আমি সমস্ত মানবমণ্ডলীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহারা কোন জীবজন্তুকে মারিয়া আর কষ্ট দিত না।"

নিজের চাল-চলন সাদাসিধা হইলেও, তিনি জমকাল রাজদরবার, বৃহৎ প্রাসাদ, শহরের মত বিস্তৃত শিবির ভাল বাসিতেন; ভারত ও মধ্য-এসিয়ার গালিচা, রেশম, কিংখাপের তাঁবু তিনি পছন্দ করিতেন। উৎসব-আমোদেরও তিনি অনুরাগী ছিলেন। প্রাসাদে বাজার বসিত—সেই বাজারে অন্দরমহলের বেগমেরা বন্ধু-বান্ধবকে অভ্যর্থনা করিতেন; সকল দেশের বণিকেরা তাহাদের পণ্যসম্ভার ও রত্নভাণ্ডার আনিয়া উপস্থিত করিত। তারপর সৈন্যপ্রদর্শন। বর্ম্মাচ্ছাদিত পাঁচ হাজার হাতী; হাতীর উপর বস্ত্রমণ্ডিত হাওদা। হাতীগুলা প্রকাণ্ড পরিমাণের;—বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত অশ্ববৃন্দ। গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, শিকারের জন্য শিক্ষিত চিতা। শিকারী কুকুরের দল। বাজপক্ষী-পালকগণ। গলি-পথ রুদ্ধ করিবার জন্য অশ্বসৈন্য।

যুদ্ধের বহুবাঞ্ছিত অবসরকালে, ফতেপুর কিংবা লাহোরে আকবর কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, আবুল-ফজল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন:—

বৃহৎ হউক ক্ষুদ্র হউক, সকল রাজ্যেই শাসনকার্য্যের যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, প্রজাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই উদ্দেশে রাজার কর্ত্তব্য তিনি তাঁহার সময়ের সদ্‌ব্যবহার করেন। সম্রাট্‌ বাহাদুর তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে নীরব থাকেন, এবং নিজের মনের উপর প্রভু হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন। এইরূপ আত্ম-জয়ী মনীষীর মুখে অসীমের নিদর্শন, অমরত্বের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। হাজার হাজার গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয় একই সময়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে; এবং তাঁহার মনোমন্দিরে না-আছে বিশৃঙ্খলার জঞ্জাল, না-আছে ক্লান্তির ও অবসাদের ধূলা...

রাত্রি। বাগ্মী দার্শনিক-বিরহিত দরবারশালায় সম্রাট্‌বাহাদুর, ধর্ম্মপ্রাণ সুফীদিগকে অভ্যর্থনা করেন; জ্ঞানগর্ভ সাধু বাক্যালাপে তিনি তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করেন...যখন কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত হেতু জানিতে পারেন কিংবা কোন নূতন জ্ঞানলাভ

করেন, তখন তিনি বড়ই প্রীত হন...অন্য সময়ে, সাম্রাজ্য সম্বন্ধে, রাজস্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উথাপিত হইলে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবধারিত সঙ্কল্প অনুসারে তৎসম্বন্ধে আদেশ প্রদান করেন।

প্রভাতের পূর্ব্বে, রাত্রির শেষ-প্রহরে, সকল দেশের গাইয়ে-বাজিয়েদিগকে তাঁহার নিকট আনা হয়। তাহারা পরমার্থিক ও লৌকিক উভয়বিধ গান গায় এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া থাকে। তাহার পর সম্রাট্‌বাহাদুর তাঁহার নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন; তাঁহার সাদাসিধা দরবারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বেশভূষা করেন এবং তাহার পর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হয়েন। রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিসময়ে, সৈনিক, বণিক, কারিগর, কৃষক, প্রভৃতি সকল প্রকারের লোক প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া রাজদর্শনের প্রত্যাশায় অতীব ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রভাত হইলে, তাহারা সম্রাটকে যথাবিহিত অভিবাদন করে। যাহাদের উপর বেগম-মহলের ভার, সম্রাট তাহাদের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া, পরে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত খোঁজ-খবর লইয়া থাকেন। পরিশেষে, বিশ্রামার্থ নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন।"(১)

আকবর, তাঁহার অবসর সময়টুকু জ্ঞানানুশীলনে নিয়োগ করিতেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে নবজীবন-যুগেরই লোক। শিল্পকলার প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত অনুরাগ ছিল। কারুগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, তিনি ভারতের কতকগুলি সুন্দর কীর্ত্তিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রতিও তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। তিনি জ্যোতিষ এবং ভৌতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন। সাহিত্যেও তাঁহার অনুরাগ ছিল; কিন্তু জাহাঙ্গীর বলেন, তিনি অতিকষ্টে অক্ষরপাঠ করিতেন এবং আদৌ লিখিতে জানিতেন না; (২) তিনি উর্দ্দু ও ফার্শি ভাষায় কথা কহিতেন, সংস্কৃত, আরব ও গ্রীক্ গ্রন্থকার-দিগের রচিত গ্রন্থের অনুবাদ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগারে বহু গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল; এবং সেই গ্রন্থগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছিল।

বদাওনী নামক একজন গোঁড়া মুসলমান গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

সম্রাট্‌মহোদয় সরল পথ ত্যাগ করিয়া যে বিপথে গিয়াছিলেন তাহার কারণ—সকল দেশের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর বহুসংখ্যক পণ্ডিত তাঁহার "আম-দরবারে" উপস্থিত হইত। সম্রাট তাঁহার "খাস-দরবারেও" তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেন। দিবারাত্রি কেবলই প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও তত্ত্বানুসন্ধান চলিত। বিজ্ঞানের দুর্ব্বোধ অংশ, প্রত্যাদেশসম্বন্ধীয় কূটপ্রশ্ন, ঐতিহাসিক রহস্য, প্রকৃতির আশ্চর্য্য কাণ্ড প্রভৃতি...এমন কোন বিষয়ই ছিল না যাহা তলাইয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা না হইত। (৩)

আকবর প্রকৃতই নবজীবন-যুগের লোক ছিলেন। গুহ্য-তত্ত্বের অনুশীলনেও তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বদাওনী এইরূপ উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন :—

সম্রাট্ রাত্রিকালে যোগীদিগকে নিজ ভবনে আনাইতেন। ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব, তাহাদের মত ও বিশ্বাস, তাহাদের ব্যবসায় কর্ম্ম, চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা', তাহাদের অনুষ্ঠানাদি, তাহাদের অভ্যাস, শরীর হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিবার শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদিগকে তিনি প্রশ্ন করিতেন। অথবা, ধাতু-পরিবর্ত্তন-বিদ্যা, মুখ-সামুদ্রিকবিদ্যা, আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব—এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেন। সম্রাটবাহাদুর নিজে ধাতু-পরিবর্ত্তন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বহস্তে যে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শিবরাত্রি-উৎসবে প্রতিবৎসর একবার করিয়া তাঁহার রাজ্যের সমস্ত যোগীদিগকে তিনি একত্র করিয়া একটা সভা বসাইতেন। যোগীদের প্রধানেরা সম্রাটকে এইরূপ আশ্বাস দিত যে তাঁহার আয়ু অন্য মনুষ্যদিগের অপেক্ষা চারিগুণ অধিক হইবে (৪)...

আকবর অন্ততঃ হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতবর্গের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। "আইন্-ই-আকবরী" বলে, ধর্ম্মনীতি, পাটীগণিত, কৃষি, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি প্রতি বালকের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

আকবরই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত সংস্থাপক। তিনি প্রথমে খাস্ হিন্দুস্থান জয় করিয়া পরে কাশ্মীর, রাজ-পুতানা ও গুজরাট জয় করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার এই বিজয়কীর্ত্তি ক্ষণস্থায়ী হয়,—তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, মোগল পারসীক আফগান ও ভারতবাসীর মধ্যে মিল স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

ভারতবিজয়ী তাঁহার যে পিতা ও পিতামহ,—তাঁহা-দের ভারতের প্রতি, ভারতবাসীর প্রতি, যাহা কিছু ভারতের তাহারই প্রতি বিষম বিদ্বেষ ছিল।

বাবর তাঁহার জীবন-স্মৃতি লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"হিন্দুস্থান এমন একটি দেশ যেখানে প্রীতিকর জিনিস অতি অল্পই আছে। লোকদিগের মুখশ্রী সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত; উহারা সামাজিক নহে; উহাদের কোন বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ নাই; উহাদের না-আছে বুদ্ধি, না-আছে সৌজন্য, না-আছে দয়া, না-আছে আপনাদের মধ্যে একটা জমাট ভাব। উহাদের মধ্যে কোন কলাকৌশল দেখা যায় না, নিজ ব্যবসায়কার্য্যে উহাদিগকে কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে দেখা যায় না, উহাদের কোন দক্ষতা নাই, উহাদের মধ্যে ইমারতি-

(১) আইন-আকবরি।

(২) তজুক্-ই-জাহিঙ্গিরী।

(৩) Badaoni (Bibliothica Indica, II) দ্রষ্টব্য।—Blochmann।

(৪) বাদাওনী—পৃ—৩২৪ (Blochmann, পৃ—২০১)

অলঙ্কার-বিজ্ঞান বা বাস্তুবিদ্যা নাই। না-আছে এখানে ভাল ঘোড়া, না-আছে ভাল মাংস। আঙ্গুর নাই, তর্ম্মুজ নাই, ভাল মেওয়া নাই, বরফ নাই, ঠাণ্ডা জল নাই। বাজারে না-আছে রুটি, না-আছে ভাল খাদ্য। না-আছে স্নানাগার, না-আছে উচ্চ বিদ্যালয়, না-আছে মশাল, না-আছে মোম-বাতি। একটা ঝাড়লণ্ঠনও নাই।" (৫)

আর এক স্থানে এইরূপ আছে :—

সে দিন আমাকে একটা তর্ম্মুজ আনিয়া দিল; আমি কাটিয়া খাইলাম, আর অমনি এ দেশের রোগে আমি আক্রান্ত হইলাম। আমার প্রিয় স্বদেশ হইতে আমি এখন নির্ব্বাসিত। আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। (৬)

ইহার বিপরীতে, আকবরের ভারতবর্ষই ভাল লাগিত। ভারতের আবহাওয়া তাঁহার দেহ-প্রকৃতির অনুকূল ছিল, এবং দেশটিও সুন্দর বলিয়া তাঁহার মনে হইত। তিনি হিন্দুদিগকে ভালবাসিতেন, তাহাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মন্ত্রণাসভায় তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন, সৈন্যের নেতৃত্বভার বিশ্বস্তভাবে তাহাদের উপর অর্পণ করিতেন; তিনি এক রাজপুত-রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, আর এক রাজকুমারীর সহিত তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গিরের বিবাহ দেন। বিজিত রাজাদিগের রাজ্য বজায় থাকিত; তাঁহারা সম্রাটের অধীনে থাকিয়া স্বকীয় রাজত্ব ভোগ করিতেন।

বদাওনি বলেন :—

সম্রাটের হিন্দু প্রজাই অধিক, হিন্দু নহিলে তাঁহার চলিবে কি করিয়া? সৈন্যের অর্দ্ধাংশ, ও ভূমির অর্দ্ধাংশ হিন্দুদিগের। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ও মোগলদের মধ্যে এমন কোন রাজন্যবর্গ নাই যাহা হিন্দু-রাজন্যবর্গের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। (৬)

আকবর যেরূপ বড় লোকদিগের সেইরূপ সাধারণ প্রজাদিগেরও তুষ্টিসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার রাজ্যে বিজেতা বিজিতের প্রভেদ ছিল না, সবই এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভূত এক জাতি। সংখ্যায় হিন্দুরাই অনেক বেশী, হিন্দুস্থান হিন্দুদেরই দেশ। তাহাদিগকে তিনি বহুবিধ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। (৭)

আচার-ব্যবহার অপেক্ষা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাসে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অধিকতর পার্থক্য ছিল; এবং বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ও পরস্পর বিবাদ করিত। পোর্টুগীজরা দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিত, গুজরাটের পার্সিরাও প্রকাশ্যভাবে নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি করিত। আকবর সকল ধর্ম্মেরই তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন।

বদাওনি বলেন :—

"যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সম্রাট্ বিচিত্র চিত্ত-বিকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; সকল সম্প্রদায়েরই মত ও বিশ্বাসের অনুশীলন করিয়াছেন। গ্রন্থাদি যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা নির্ব্বাচনপূর্ব্বক একত্র সংকলন করিয়াছেন—এই নির্ব্বাচনশক্তি তাঁহার নিজস্ব—তিনি যে ভাবে সমস্ত বিচার করিতেন, তাহা সত্যধর্ম্মতত্ত্বের বিরোধী...বিচিত্র প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই ধ্রুববিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মেরই মধ্যে স্বকীয় পীরপয়গম্বর, ধর্ম্মাচার্য্য, ও তত্ত্বদর্শী আছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যদি সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে কোন-এক বিশেষ ধর্ম্মকে কেন সত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে করা হয়? যেমন মনে কর—ইস্‌লামধর্ম্ম; এ ধর্ম্ম ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কেননা, ইহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর মাত্র। এক সম্প্রদায় যাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, অন্য সম্প্রদায়ের

---

(৫) তুজুক্-ই-বাবরী (Memoir of Baber) Erskine ও Leydenএর ইংরাজী অনুবাদ।

(৬) ঐ।

(৬) বদাওনি—(Blochmann)।

(৭) ভারতবিজয়ের ফলে হিন্দুরা যে-সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, আকবর তৎসমস্তই তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। বিদ্রোহী হিন্দুদিগের স্ত্রী-পুত্রদিগকে বিক্রয় করিতে বা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে আকবর নিষেধ করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রী-দিগের নিকট হইতে যে শুল্ক আদায় হইত তাহা তিনি রহিত করিয়া দেন।

হিন্দুদিগের অপরাধমূলক বা দুর্নীতিমূলক আচার ব্যবহার ছাড়া তাহাদের অন্য আচার ব্যবহারের উপর আকবর হস্তক্ষেপ করিতেন না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিধবাদিগকে পতির চিতানলে দগ্ধ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন।

বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আবুল-ফজল এইরূপ বলিয়াছেন :—

"উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে বালক-বালিকার বিবাহ দিবার রীতি সম্রাট্ অতি জঘন্য বলিয়া মনে করেন। এই-সকল বিবাহ ফলদায়ী নহে। এমন কি সম্রাট্ ঐরূপ বিবাহকে অনিষ্টজনক বলিয়াই মনে করেন। তারপর বালকবালিকা যখন বড় হইয়া উঠে, তখন একত্র সহবাস করিতে তাহাদের ভয় হয় এবং তাহাদের গৃহ উজাড় হইয়া যায়। ভারতবর্ষে বর, কনেকে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিতে পায় না—ইহাও সম্রাটের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। তাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিবাহের বৈধতার পক্ষে পিতামাতার যেরূপ অনুমতি চাই সেইরূপ বর কনেরও সম্মতি চাই।"

আবুল-ফজল আরও এই কথা বলেন, সম্রাট্ নিকট আত্মীয়-দিগের মধ্যে বিবাহ দূষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, বিবাহের উচ্চ পণও তিনি অনুমোদন করেন না (এই পণের টাকা শেষে দেওয়াই হয় না)। বিবাহকর্ম্মের সরকারী অধ্যক্ষগণ দেখিতেন বর-কনে বেশ ভাল বাড়া হইয়াছে কি না। এই পরিদর্শনের জন্য, তাহাদের সম্পত্তির মূল্য অনুসারে রাজসরকারে একটা কর দিতে হইত। সম্রাট-পারিষদ আবুল-ফজল বলেন, বিবাহার্থীরা এই রাজকর কল্যাণপ্রদ বলিয়া মনে করিত (এই রাজকর কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়ের নিকট হইতেই গৃহীত হইত)।

তাহা অস্বীকার করিবার কি-অধিকার আছে? শ্রেষ্ঠতার কোন হেতু না দর্শাইয়া কোন সম্প্রদায়ের মত অন্য সম্প্রদায়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ বলিবার সেই সম্প্রদায়ের কি-অধিকার আছে?" (৮)

ফতেপুর শিক্রীতে, আরও কিছুকাল পরে লাহোরে, আকবর একটা দরবারশালা (ইবাদৎখানা) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দরবার-শালায়, উলেমাদিগকে, মুসলমান-আইনের আচার্য্যদিগকে, শিখদিগকে, পার্শিদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে, ফ্রান্সিস্‌ক্যান্‌-খৃষ্টান ও পোর্টুগীজ জেসুইট্‌দিগকে আহ্বান করিতেন। আকবর ইহাদের সকলেরই কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিতেন।

বদাওনি লিখিয়াছেন,—"এই সকল দুর্ম্মতি সন্ন্যাসীরা, প্রবক্তা মহাপুরুষের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই মহম্মদকে সয়তান বলিত, আর আকবর কি না অম্লানবদনে তাহা শ্রবণ করিতেন।—ঈশ্বর, মহম্মদ ও তাঁহার সমস্ত বংশধরের মঙ্গল করুন!—তিনি সয়তান! এইরূপ মহৎ ব্যক্তির অবমাননা-অপরাধে অপরাধী হইতে কোন দৈত্যদানবও সাহস করিবে না।"

অনেক প্রতিরোধচেষ্টার পর, ধর্ম্মবিশ্বাসসম্বন্ধে সম্রাটই উহাদের পরম নেতা এই মর্ম্মে উলেমারা একটা মন্তব্যলিপি স্বাক্ষর করিয়া দেয়। (৯) কিন্তু তাহারা ভিতরে ভিতরে এই-সকল সংস্কারের প্রতিরোধ করিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমে উহাদের প্রতিরোধচেষ্টা তীব্র হইয়া উঠিল; আকবর মুসলমানদিগের প্রতি বিশেষতঃ সুন্নিসম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আরব ভাষার শিক্ষা নিষিদ্ধ হইল। কুক্কুরেরা ঘৃণিত বলিয়া আর বিবেচিত হইল না; শূকরের মাংস নিষিদ্ধ মাংসের মধ্যে আর পরিগণিত হইল না।

বদাওনি বলেন,—"মুসলমানধর্ম্মে যাহা কিছু নিষিদ্ধ, আকবর তাহার অনুষ্ঠানে কোন বাধা দেন না...কিন্তু আরও অন্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণের কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত যাহা মানব-কর্ণের অশ্রাব্য তাহা আমি বলিতে পারি না।"

যেমন কোরানের উপদেশের প্রতি, তেমনি কোরানের প্রতিপাদিত বিশেষ ধর্ম্মমতের প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি প্রবক্তাদিগের দোষ দর্শাইয়া তাঁহাদের বাক্য অবজ্ঞা করিতেন। তিনি নরক মানিতেন না। তিনি বলিতেন;—"সয়তানকে যদি অমঙ্গলের কর্ত্তা বলা যায় তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বরের সমান করা হয়। সয়তানের কাহিনীটি অতীতের একটা কল্পনামাত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে?"

পরে আকবর ইসলাম ধর্ম্মের সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি একটি নব ধর্ম্ম স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল ধর্ম্মেরই বড় বড় বিচ্ছিন্ন সত্য এক মহা-সমষ্টির

---

(৮) বদাওনি। (Blochmann)।

(৯) "হিন্দুস্থান, শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতার কেন্দ্র এবং ন্যায়-বিচার ও সদনুষ্ঠানের দেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। তাই অনেক লোক, বিশেষত: পণ্ডিত ও ব্যবহারশাস্ত্রবেত্তারা এই দেশে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের শুধু বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নয়—সমস্ত ব্যবহারতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী,—যে-সকল প্রচলিত আইনের মূলে যুক্তিপ্রমাণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিদ্যমান সেই-সকল আইনে পারদর্শী যে আমরা—তা-ছাড়া ধর্ম্মভাব ও সাধুভাবের জন্য বিখ্যাত যে আমরা—আমরা কোরানের এই বচনটির গভীর তাৎপর্য্য সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছি:—

"ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবে, প্রবক্তা মহম্মদের আদেশ পালন করিবে, এবং তোমার মধ্যে যাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব-অধিকার আছে তাঁহাদের আদেশ পালন করিবে"; তাহার পর এই হদিশ্‌-বাক্যটিও সুপ্রতিষ্ঠিত:—"ইহা নিশ্চিত, বিচারের দিনে, যিনি ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র তিনি—ইমান্‌-ই-আদিল; যিনি এই আমীরের আদেশ পালন করেন, তিনি আমারই আদেশ পালন করেন; যিনি ইঁহার বিদ্রোহী তিনি আমারও বিদ্রোহী;" তৃতীয়তঃ যুক্তিপ্রমাণ ও সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর আরও অনেক প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আমারা ইহা স্বীকার করিয়াছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, মুজ্‌তাহিদের পদ অপেক্ষা সুলতান-ই-আদিলের পদ উচ্চতর। আমরা আরও এই কথা বলি,—যিনি ইস্‌লামের রাজা, বিশ্বাসীদিগের অগ্রগণ্য, ধরাতলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব—যাঁহার রাজ্য ঈশ্বর চিরস্থায়ী করিয়াছেন—সেই আকবর অতীব ন্যায়পরায়ণ অতীব জ্ঞানী; এবং ঈশ্বরের ভয়ে তাঁহার চিত্ত সতত পূর্ণ। অতএব ভবিষ্যতে যদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং সে সম্বন্ধে মুজ্‌তাহিদেরা যদি একমত হইতে না পারেন; যদি সম্রাট তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুযুক্তির আলোকে কোন নূতন অনুশাসন প্রচার করা আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে আমরা—সমস্ত মুসলমান লোক, ঐ অনুশাসন পালন করিতে বাধ্য হইব;—তবে এই মাত্র আমরা দেখিব যে উহা কোরানের কোন বচনের অনুযায়ী কি না এবং উহা সমস্ত মুসলমানজাতির পক্ষে হিতকর কি না; আমরা আরও এই কথা বলিতেছি, এই অনুশাসন পালনে যে-কেহ বাধা দিবে, সে পরলোকে নরকগামী ও ইহলোকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং তাহার ধন সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই দস্তাবেজটি আমরা ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনার্থ ও ইস্‌লামধর্ম্মের প্রচারার্থ সরল অন্তঃকরণে ও সাধু অভিপ্রায়ে দস্তখৎ করিলাম—রজবের মাস, হিজরায় ৯৮৭ বৎসর।"—Blochmann।

আকারে একত্র সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহা একটি মৌলিক ও প্রভাবশালী সংশ্লেষণ-চেষ্টা। মহম্মদ যেরূপ তলোয়ারের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইনি তেমনি প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। ঈশ্বর —সুন্দর; ঈশ্বর—মঙ্গল। ঈশ্বর পরম-জ্যোতি; সূর্য্যই তাঁহার উপযুক্ত বিগ্রহ। আকবর নিজে সূর্য্য হইতে উদ্ভূত, সুতরাং ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত। পার্সিধর্ম্ম হইতে এই ধর্ম্মের অল্পই পার্থক্য। পুণ্য অগ্নির আরাধনা, সবিতার আরাধনা। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে, আকবর পার্সিদিগের মধ্যে যাহা প্রচলিত সেই সৌর বৎসর প্রবর্ত্তিত করিলেন। আরও, তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ ধরিয়া তিনি একটি নূতন যুগ স্থাপন করিলেন এবং স্বর্গরাজ্যবাদীগণ যে "মাহদির" প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনিই সেই মাহদি এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

আবুল-ফজল লিখিয়াছেন :—

"যাহা কিছু উত্তম, সম্রাট সমস্তই জানেন; তাই কাহারও ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে, তাঁহার নিকট সন্তোষজনক উত্তর পায় ও তাহার প্রতীকারও অবগত হইয়া থাকে। জলপূর্ণ পাত্র হস্তে করিয়া প্রতিদিন কতলোক আসে এবং ঐ জলের উপর ফুঁ-দিতে সম্রাটকে অনুরোধ করে...সম্রাটও তাঁহার পুণ্য হস্তে ঐ পাত্রটি গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকিরণের মধ্যে স্থাপন করেন এবং তাহাদের প্রার্থনানুসারে তাহার উপর ফুৎকার দেন। এই দৈবশক্তির প্রভাবে কত দুরারোগ্য রোগ আরাম হইয়া গিয়াছে। একজন বিজনবাসী সন্ন্যাসী তাহার জিহ্বা কাটিয়া প্রাসাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল, আর বলিল :—"আমার এই অভিপ্রায় যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়া থাকে, তবে আমার জিহ্বাটা যেন আমি পুনঃপ্রাপ্ত হই;" সেই রাত্রেই মন্ত্রের দ্বারা সে আরোগ্যলাভ করিল।

শিষ্যসংখ্যাভুক্ত হইবার জন্য যত লোক আসিত, আকবর তাহাদের মধ্যে অনেককেই এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিতেন :—নিজেকেই আমি পথপ্রদর্শন করিতে পারি না, অন্যকে কি করিয়া পথপ্রদর্শন করিব? কিন্তু যে দীক্ষার্থীর ললাটে তিনি আন্তরিক ইচ্ছার চিহ্ন দেখিতেন এবং সে যদি প্রতিদিন আসিয়া জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহা হইলে তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। রবিবারে, যে সময়ে, জগৎপ্রসবিতা সূর্য্য তাঁহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করিতেন সেই সময় দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইত। নবব্রতীদিগের দীক্ষাসম্বন্ধে অশেষ বাধাসত্ত্বেও, সকল শ্রেণীর মধ্য হইতে হাজার হাজার লোক তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছে...নির্দ্দিষ্ট শুভমুহূর্ত্তে, দীক্ষার্থী তাহার পাগ্‌ড়ীটি হস্তে লইয়া, সম্রাটের পদতলে তাহার ললাট স্থাপন করে। এই সময়ে একটা সাঙ্কেতিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে :—দীক্ষার্থী বলে যে, শুভক্ষণ ও শুভনক্ষত্র যোগে,—যে-অহঙ্কার তাবৎ অমঙ্গলের নিদান, সেই অহঙ্কার হইতে সে মুক্ত হইয়াছে, আরাধনার জন্য সে এক্ষণে তাহার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতেছে। তাহার পর সে সম্রাটের নিকট মোক্ষলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করে। ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত সম্রাট্ আকবর তখন তাঁহার আশ্রয়-হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রার্থনাকারীকে উত্তোলন করেন, এবং দীক্ষার্থীর মস্তকে তাহার পাগ্‌ড়ী পুনঃস্থাপন করেন। এই সাঙ্কেতিক ক্রিয়াকলাপের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, সেই সৎ-ধর্ম্মে-দীক্ষিত লোকটি মিথ্যা-জীবন হইতে বাহির হইয়া এক্ষণে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করিল।" (১০)

তাঁহার প্রধান ভক্ত শিষ্য আবুল-ফজল, আকবরের সমস্ত শিষ্যকেই প্রকৃত ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু গোঁড়া মুসলমান বদাওনি, উহাদিগকে কুচক্রী ও ভণ্ড বলিয়া অভিহিত করেন।

বদাওনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"যোগীদের রীত্যনুসারে, সম্রাটেরও কতকগুলি শিষ্য ছিল। একদল নোঙ্‌রা কদাকার সন্ন্যাসী-ভিক্ষু যাহারা প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পাইত না, তাহারা প্রতিদিন প্রাতে,—যেখানে সম্রাট্ সূর্য্যোপাসনা করিতেন সেই জানলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা দেখাইত যেন সম্রাটের পুণ্যমুখ দর্শন না করিয়া তাহারা মুখ প্রক্ষালন করিবে না, পানাহার করিবে না, এইরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতিদিন সায়াহ্নে, ঐ একই স্থানে লোকের একটা জনতা দেখা যাইত—সে কি-জঘন্য লোকের জনতা!—হিন্দু, দুঃস্থ মুসলমান, সকল রকমের লোক, স্ত্রী,পুরুষ, রুগ্ন ও সুস্থ। সম্রাট্ যেইমাত্র সূর্য্যের সহস্র-এক নামের আবৃত্তি শেষ করিয়া জানলার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, অমনি ঐ সমস্ত লোক মাটীর উপর মুখ রাখিয়া সটান্ শুইয়া পড়িত। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যের সহস্র-এক নামের আর একটা তালিকা দিয়াছিল। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিধর্ম্মী রাজাদের সহিত তুলনা দিয়া তাহারা সম্রাট্‌কেও সূর্য্যের এক অবতার বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারা বলিত, সম্রাট্‌ই জগদীশ্বর এবং ভূলোকবাসীদিগের সহিত মেলা-মেশা করিবার জন্যই মানব-দেহ ধারণ করিয়াছেন।" (১১)

আকবরের রাজত্বের শেষভাগে, এইরূপ মনে হইতে পারিত, যেন হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম একত্র মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের কতকগুলি সচীব ও কতকগুলি সুশিক্ষিত লোক,—ইঁহাদের মধ্যেই একটা মিলন হইয়াছিল। বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও, সাধারণ লোকেরা বৈদেশিকদিগকে ঘৃণা করিত; এবং যে সকল মুসলমানসৈন্য আফগানিস্থান ও মধ্য-এসিয়া হইতে সংগৃহীত, তাহারা বিজিত জাতিকে অবজ্ঞা করিত।

আকবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর, মোগল ও মুসলমানদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। পিতা বর্ত্তমানেই তিনি লোক লাগাইয়া আবুল-ফজলকে হত্যা করেন।

(১০) আইন-আকবরী (Blochmann)।
(১১) বদাওনি (Blochmann)।

কিন্তু মদ্যপানে আসক্ত, ও অন্দরমহলে ভোগসুখে নিমগ্ন থাকায়, তিনি আকবরের কৃত কার্য্যগুলি নষ্ট করিতে পারেন নাই। রাজপুত রাজকুমারীদিগের পুত্র ও প্রপৌত্র শা-জেহান, মোগল অপেক্ষা বেশী হিন্দুই ছিলেন। শক্তি, পরাক্রম, জ্ঞানানুশীলন ও সাহসের দিক দিয়া আকবর যেরূপ নবজীবন-যুগের প্রতিনিধি, সেইরূপ শিল্প, সাহিত্য ও ভোগবিলাসের দিক দিয়া শাজেহান ঐ যুগের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি তাজমহল এবং আগ্রা ও দিল্লির প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন; তাঁহার রাজদরবার খুব জমকালো ছিল; এবং কবি ও শিল্পীদের প্রতি তিনি বিশেষরূপে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদলের প্রতিনিধি দারা-সুকো; বাহ্য আকারে ও অন্তঃকরণে তিনি হিন্দু ছিলেন। সম্ভবত তিনি মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমানদলের প্রতিনিধি আরংজেব। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। দারা পরাভূত ও নিহত হইলেন। আরংজেব তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং দিগ্বিজয় ও উৎপীড়নের রাজত্ব আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাতে করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য, সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করিল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ধ্বংসেরও পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য সাম্রাজ্যের সম্ভুক্ত হইল; কিন্তু আকবর যেরূপ বিজিতদিগকে তাঁহার প্রতি আসক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আরংজীব তদ্বিপরীতে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। শত্রুরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; এবং সেই বিদ্রোহ পূর্ব্ব-প্রশমিত প্রদেশগুলিতেও প্রসারিত হইল। যেমন জাপানে, যেমন য়ুরোপে, সেইরূপ ভারতেও নবজীবনের ভাবটি স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল; সেই ভাবটি যখন লোকে বিস্মৃত হইল, তখনই আবার গৃহ-যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল; পরধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা পুনরাবির্ভূত হইল। নবজীবন-যুগের অবসানে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইল। যে সাম্রাজ্য হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরস্পরের বিদ্বেষে উহা আবার ধরাশায়ী হইল। (১২) (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ :—কলিকাতাবাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ধান্য পাকিয়া উঠিলে, পর্ব্বত হইতে হরিণের পাল নামিয়া ধান্য নষ্ট করিতে থাকায়, হরিণ তাড়াইবার জন্য ক্ষেত্রনাথ মাচা বাঁধিয়া রাত্রিতে পাহারার ব্যবস্থা করিলেন ও কলিকাতা হইতে তিনটি বন্দুক ক্রয় করিয়া আনিলেন।]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে আসিয়া দেখিলেন, লখাই সর্দ্দার তাঁহার জমীর প্রান্তভাগে পাহাড়ের ধারে ধারে তিনটি উচ্চ মঞ্চ বাঁধিয়াছে এবং প্রত্যেক মঞ্চের উপরে দুই তিন জনের শয়ন ও উপবেশনের উপযোগী ঘরও বাঁধিয়াছে। হরিণের পাল দ্বিতীয় দিনের রাত্রিতেও আসিয়া ক্ষেত্রনাথের যৎসামান্য, কিন্তু প্রজাগণের বহু শস্য নষ্ট করিয়াছে। তৃতীয় দিনে লখাই সর্দ্দার মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক মঞ্চে দুই দুই জন মুনিষকে শস্যের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে নিজেও একটী মঞ্চে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। প্রায় সমস্ত রাত্রিই নাগ্‌রা বাদিত হইয়াছিল। নাগ্‌রার গম্ভীর রবে সমস্ত গ্রাম,

(১২) মোগল-সাম্রাজ্য-ইতিহাসের প্রথম-অংশের মুখ্য ঘটনাবলীর কালনির্দ্দেশ :—

বাবর (১৫২৬-৩০)।

হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬)—বাঙ্গালার আফগান অধিপতি শের-শা কর্তৃক বিতাড়িত হন (১৫৪০-৪৫)।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)। বয়রাম-খাঁর রাজপ্রতিনিধিত্ব (১৫৫৬-৬০)। রাজস্থান-বিজয় (১৫৬১-৬৮)। গুজরাট-বিজয় (১৫৭২-৯৩)। বঙ্গ-বিজয় (১৫৭৬)। কাশ্মীর-বিজয় (১৫৮৬-৯২)। সিন্ধু-বিজয় (১৫৯২)। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশ—আমেদনগর ও খান্দেশ-বিজয় (১৫৯৫-১৬০১)।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)।

শা-জাহান (১৬২৮-৫৮)। বিজাপুর ও গোলকন্দ করদ রাজ্য হইল—কান্দাহার মোগলের হস্তচ্যুত হইল (১৬৫৩)। শা-জাহান বন্দী (১৬৫৮)। তাঁহার মৃত্যু (১৬৬৬)।

আরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)। দারার পরাভব ও মৃত্যু। অ-মুসলমান প্রজার উপর মাথা-গুন্তি করের পুনঃস্থাপন (১৬৭৭)। দাক্ষিণাত্য আক্রমণ (১৬৮৩)। বিজয়পুর ও গোলকন্দা বিজিত হইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হইল (১৬৮৬-৮৮)।

শস্যক্ষেত্র ও পর্ব্বতগাত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সে রাত্রিতে হরিণের পাল ক্ষেত্রনাথের জমীর দিকে না আসিয়া, গ্রামের অপর প্রান্তস্থিত শস্যক্ষেত্র সমূহের শস্য নষ্ট করিয়াছিল। প্রজাগণও কিঞ্চিৎ দূরে দূরে মাচা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। চারিটি মাচা প্রস্তুত হওয়ায়, অদ্য হইতে তাহারাও শস্যের পাহারা দিতে আরম্ভ করিবে।

লখাই সর্দ্দার এই কতিপয় দিবস মাচা বাঁধিতে ব্যস্ত থাকিলেও, পক্ক ধান্যগুলি কাটিতে অবহেলা করে নাই। কর্ত্তিত ধান্যগুলি যথাসময়ে ক্ষেত্রনাথের খামারে আনীতও হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন।

ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা হইতে তিনটি বন্দুক আনিয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র গ্রামের প্রজাগণ বন্দুক দেখিবার জন্য দলে দলে কাছারী বাটীতে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কখনও টোটাদার বন্দুক দেখে নাই। সুতরাং বন্দুক দেখিয়া তাহারা তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল ও যার পর নাই আনন্দিত হইল। কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথকে একেবারে তিনটি বন্দুকের পাশ কিরূপে দিলেন, তাহাও তাহাদের বিস্ময়ের ও আলোচনার বিষয় হইল। সাহেব এই পরগণার কোনও জমীদারকে একেবারে তিনটি বন্দুকের পাশ দেন নাই। আর অনেক জমীদারের ঘরে একটীও টোটাদার বন্দুক নাই। টোটাদার বন্দুক যে কত শীঘ্র শীঘ্র ছোড়া যায়, আর তাহা ছোড়াও যে কত সহজ, তাহা দেখিয়া প্রজাগণের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের আবালবৃদ্ধ সকলেই মৃগয়াপ্রিয়। যাহাদের বন্দুক আছে, তাহারা বন্দুক লইয়া মৃগয়া করিতে যায়, আর যাহাদের বন্দুক নাই, তাহারাও তীরধনু, বল্লম, টাঙ্গি, বর্শা প্রভৃতি লইয়া মৃগয়া করিতে বহির্গত হয়। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বন্যবরাহকে ইহারা যেন কিছুমাত্র ভয় করে না। রাখাল বালকেরা বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপরে গো-মহিষাদি চরাইয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহাদের মনে যেন কিছুমাত্র ভয় নাই। প্রত্যেক রাখাল বালকের হস্তে সর্ব্বদা একটী ধনু ও একটী তীর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার পৃষ্ঠে শরপূর্ণ একটী তূণীরও লম্বমান থাকে। শিশুরাও তীরধনু লইয়া ক্রীড়া করে। কিন্তু তাহাদের তীরের ফলক লৌহময় নহে। ফলতঃ এই প্রদেশের পুরুষমাত্রেই বীরত্ব ও সাহসিকতার উপাসক। স্ত্রীলোকেরাও অতিশয় নির্ভীক। তাহারা কাষ্ঠ ছেদনের জন্য ক্ষুদ্র একটী কুঠারমাত্র লইয়া পর্ব্বতের উপরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ভীক, সে দেশের লোকেরা যে অস্ত্রশস্ত্র-প্রিয় হইবে, এবং একটী নূতন অস্ত্রের কথা শুনিলে যে তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল ও উৎসাহ প্রদর্শন করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

ক্ষেত্রনাথ বন্দুক ক্রয় করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখনও বন্দুক ছোড়েন নাই। ক্ষেত্রনাথ এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, এই প্রদেশে থাকিতে হইলে, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য তিনি তাঁহার গৃহের অনতিদূরে একটী নির্জ্জন ও নিভৃত প্রান্তরে বন্দুক ছুড়িতে শিখিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তজ্জন্য গ্রামের প্রসিদ্ধ শিকারী কার্ত্তিক ভূমিজকে নিযুক্ত করিলেন। নগেন্দ্রও বন্দুক ছুড়িতে শিখিবে, ইহা স্থির হইল।

লখাই সর্দ্দার ক্ষেত্রনাথের বন্দুক দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইল। সেও মৃগয়াপ্রিয় ছিল এবং বন্দুক ছুড়িতে জানিত। এক্ষণে কার্ত্তিক ভূমিজের নিকট টোটাদার বন্দুক ছুড়িবার কৌশল শিক্ষা করিয়া লইয়া ক্ষেত্রনাথকে বলিল "গমা, একটো বন্দুক আমি রাত্যে টঙকে লিয়ে যাব। শিকার পাল্যে গুলাব।" * ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "লখাই, তোমাকে বন্দুক দিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। বিশেষতঃ, বন্দুকের পাশে তোমার, কার্ত্তিক ভূমিজের ও নগিনের নাম লিখিয়ে এনেছি। কিন্তু আমার অনুরোধ এই, অনর্থক কোনও জীবজন্তুকে মেরো না। বনের জন্তুকে তাড়াবার জন্য দু'একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রো মাত্র। তা হ'লেই যথেষ্ট হ'বে।" লখাই ক্ষেত্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিল

* প্রভু, রাত্রিতে আমি একটা বন্দুক মাচায় নিয়ে যাব। কোনও শিকার পেলে, আমি গুলি ক'রে মারবো।"

"তোর কথা আমি নাই মানবো, গদা। হরিণ আমি পাঁয়েছি, কি গুলাইচি। মর্, আমি এত গতর খাটালি, আর হরিণগুলান্ এক রাত্যেই তিন বিঘার ধান সাবাড় কর্ল্যেক্ হে? হরিণ আমি নাই গুলাব, তো কি ক'র্‌ব?" † লখাইকে অসন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক না হইয়া ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "লখাই, তোমার যা ভাল মনে হয়, তাই কর।"

গ্রামের প্রায় চতুর্দ্দিকেই কিঞ্চিৎ দূরে দূরে দশটি মঞ্চ প্রস্তুত হইলে, রাত্রির ভোজন সমাপ্ত করিয়া ক্ষেত্রনাথের মুনিষেরা এবং পর্য্যায়ক্রমে গ্রামের প্রজারা নিজ নিজ মঞ্চে আরোহণ করিত। একই সময়ে নিকটবর্ত্তী দুইটী মঞ্চের উপর দুন্দুভি দণ্ড দ্বারা আহত হইয়া গম্ভীর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিত। দুই ঘণ্টার পর সেই দুইটী দুন্দুভি নীরব হইত। তখন উপরবর্ত্তী আর দুইটী মঞ্চের দুন্দুভি দণ্ড দ্বারা আহত হইত। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে গ্রামের চারিদিকেই প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দুন্দুভি বাদিত হইতে থাকিত।

বল্লভপুর কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে বন্যজন্তুর উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে কখনও এইরূপ সমবেত চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং প্রথম প্রথম কতিপয় দিবস গ্রামবাসিগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দুন্দুভির শব্দ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। দুন্দুভির ধ্বনি এরূপ গম্ভীর যে, তাহা দুই তিন ক্রোশ হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ বল্লভপুর হইতে প্রতি রাত্রিতে দুন্দুভির শব্দ শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। পরে যখন তাহার কারণ অবগত হইল, তখন তাহারা গ্রামবাসিগণের, বিশেষতঃ "পুভ্যা লোকগুলানের" বুদ্ধির প্রশংসা করিল। কিন্তু হরিণের পাল তাহাদেরও ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিতে থাকিলেও, তাহারা বল্লভপুরবাসিগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল না। কোনও বুদ্ধিমান্ নেতার পরিচালন ব্যতিরেকে, এই প্রদেশের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না।

যে দিন হইতে বল্লভপুর গ্রামের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী মঞ্চ হইতে দুন্দুভির ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতেই সেইগ্রামে হরিণের আর উপদ্রব রহিল না। মৃগপাল দুন্দুভির শব্দে ভীত হইয়া সেই গ্রামের সীমা ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, লখাই সর্দ্দার হরিণ "গুলাইয়া" তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মৃগপাল বল্লভপুরের সীমা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেও, ক্ষেত্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজাবর্গ পাহারা বা দুন্দুভিবাদন বন্ধ করিল না। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সমানভাবে এইরূপ পাহারা রাখিবার জন্য তাহারা স্থিরনিশ্চয় করিল। ধান্য কাটা শেষ হইলেও ফসল খামারে উঠিলে পর, পাহারা বন্ধ করা না-করা সম্বন্ধে তাহারা বিবেচনা করিবে। আউশ ধান্যের পর আমন ধান্য পাকিতে আরম্ভ করিবে। তৎপরে অড়হর, কলাই প্রভৃতি ফসলও আছে। তৎসমুদায়ও রক্ষা করিতে হইবে। দুন্দুভি নীরব হইলেই, হরিণের পাল, এমন কি হস্তীযূথও সাহস পাইয়া বল্লভপুরে আসিবে, এবং পুনর্ব্বার শস্য নষ্ট করিতে থাকিবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রজাবর্গ প্রতিরাত্রিতে দুন্দুভি বাজাইয়া শস্যের পাহারা দিতে নিযুক্ত রহিল।

যখন সর্ব্বসাধারণের উপর কোনও আপদ আসিয়া পড়ে, তখন ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, ভদ্রাভদ্র, ছোটবড় সকলেই সমবস্থ হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞানও সহসা তিরোহিত হইয়া যায়। তখন ধনীর অভিমান টুটে, নির্ব্বাকের বাক্য ফুটে, এবং গর্ব্বিত ব্যক্তিও আপনার গর্ব্ব পরিহার করে। তখন সকলেই সাধারণ বিপদের প্রতীকার সাধনের জন্য ব্যাকুল হয়। সকলেরই হৃদয়মধ্যে সহানুভূতির একটী স্রোত বহিতে থাকে, এবং সকলেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী হয়। ক্ষেত্রনাথ কলিকাতাবাসী,

---

† "প্রভু, আপনার কথা আমি মানবো (শুনবো) না। হরিণ আমি দেখতে পেলেই গুলি ক'র্‌বো। মর্, আমি এত গতর খাটালাম, আর হরিণগুলো এক রাত্রির মধ্যেই তিন বিঘার ধান সাবাড় ক'রে গেল, মশাই! গুলি ক'রে হরিণ না মার্‌লে আমি কি ক'র্‌বো?"

সভ্যসমাজের ব্যক্তি, সুশিক্ষিত এবং বল্লভপুরের অধিপতি; বল্লভপুরবাসিগণের মধ্যে অনেকেই অসভ্য প্রদেশের লোক, অশিক্ষিত ও অসভ্য-সমাজভুক্ত। সুতরাং ইহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করা ক্ষেত্রনাথের পক্ষে যদি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। প্রজাদের সহিত ভূস্বামীর যতটুকু সম্পর্ক রাখা কর্ত্তব্য, ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরবাসিগণের সহিত ততটুকুই সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন। বল্লভপুরবাসিগণও ক্ষেত্রনাথকে ধনী, "কল্‌কাত্তার লোক" "ইংরাজী-ওয়ালা" (অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিত) বিশেষতঃ ভূ-স্বামী মনে করিয়া তাঁহার সহিত মেলামেশা করিবার চিন্তাও করিত না। প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কাছারী বাটীতে আসিত না। কিন্তু গ্রামের মধ্যে হরিণের উপদ্রব-রূপ এক সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে, ক্ষেত্রনাথ সর্ব্বাগ্রে আপনার স্বতন্ত্রতা ও অভিমানের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রজাদের সহিত মিশিলেন। প্রজাবর্গও উপস্থিত বিপদে তাঁহার নেতৃত্ব ও যুক্তিপরামর্শকে মূল্যবান্ মনে করিয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং কার্য্য করিয়া হাতেহাতেই সুফল লাভ করিল। হরিণের পাল প্রায় প্রতিবৎসরই শস্যক্ষেত্রে আপতিত হইয়া শস্য নষ্ট করে এবং প্রজারাও তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু তাহারা তো কখনও একত্র মিলিয়া মিশিয়া হরিণ তাড়াইবার জন্য কোনও সদুপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই? ক্ষেত্রনাথের পূর্ব্বে যিনি বল্লভপুরে ভূ-স্বামী ছিলেন, তিনি তো এক খাজনা আদায়ের সময় ব্যতীত আর কখনও সেখানে আসিতেন না, এবং প্রজাদের সুখ-দুঃখেরও সমভাগী হইতেন না? ক্ষেত্রনাথকে গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া, অত্যাচার-অবিচারের ভয়ে প্রজাবর্গ প্রথমে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেও, এবং ক্ষেত্রনাথকে কিছু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেও, এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কারণে তাঁহার সম্বন্ধে মনে আর কোনও শঙ্কা বা অবিশ্বাস পোষণ করিল না। ক্ষেত্রনাথ নন্দা জোড়ের উপর একটী বাঁধ দেওয়াতে, গ্রামের লোকের স্নানীয় ও পানীয় জলের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে; তিনি তিনটি টোটাদার বন্দুক আনয়ন করাতে, গ্রামবাসিগণের মনে অনেকটা নিরাপদের ভাব জাগরিত হইয়াছে; আর হরিণের উপদ্রব নিবারণের জন্য একটী সহজ অথচ আশুফলপ্রদ উপায়ের উদ্ভাবন করাতে, তাহাদের শস্যরক্ষারও সম্ভাবনা হইয়াছে। এই সকল বিষয় প্রজাদের মনে বেশ স্পষ্টীভূত না হইলেও, এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে এক একটীর আলোচনা করিতে সমর্থ না হইলেও, তাহারা স্থূলভাবে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিল যে, ক্ষেত্রনাথ বাস্তবিক তাহাদের পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু ও পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার স্ত্রীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী, এবং পুত্রকন্যাগুলিও তাহাদের পরম প্রীতির পাত্র। ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ প্রজাগণের সহিত অসঙ্কোচে মিলিত এবং ইদানীং বন্দুক ছুড়িতে শিখিয়া তাহাদের সহিত কখনও কখনও মৃগয়াতেও যোগদান করিত, এই কারণে সে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিল। সে গ্রামবাসিগণের সহিত নানাপ্রকার সম্পর্ক পাতাইয়া, কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও ভাই ইত্যাদি বলিত। গ্রামবাসিগণও তাহার সহিত মিলিতে আগ্রহপ্রকাশ করিত ও তাহার নিকট কলিকাতার বিচিত্র বিবরণ শুনিত; শুনিয়া অনেক সময় বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিত। কখনও কখনও নগেন্দ্র তাহাদের কলিকাতার দোকানের কথাও বলিত। তখন কেহ কেহ তাহাকে বল্লভপুরে একটী দোকান খুলিতে অনুরোধ করিত। বল্লভপুরে দোকান খুলিলে জিনিষপত্রের ভাল কাট্‌তি হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে নগেন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তাহারা বলিত, "ভাল দোকান খুলিলে শুধু বল্লভপুরের নহে, পার্শ্ববর্ত্তী আরও দশ পনর খানা গ্রামের লোকেও তাহার দোকান হইতে প্রত্যহ জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। একটী সামান্য দ্রব্য কিনিতে হইলে, সকলেরই পুরুলিয়া যাইতে হয়। যদি পুরুলিয়ার দরে, কিম্বা তাহার অপেক্ষা কিছু চড়া দরেও জিনিষপত্র বিক্রীত হয়, তাহা হইলেও লোকে আহ্লাদের সহিত তাহা ক্রয় করিবে। প্রথমতঃ পুরুলিয়া যাইতে কত কষ্ট, তাহার উপর যাতায়াতের রেলভাড়া আছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পুরুলিয়াতে দুই একদিন অবস্থান্ করা। কোথাও মলমূত্র ত্যাগ করিলে, পুলিশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফাটকে আটক

রাজা প্রথম চার্লসের কন্যাগণ

ভ্যান ডাইক কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র

রাখে, তাহার পর হাকিমের কাছে লইয়া গিয়া জরীমানা করে। জরীমানা দিতে পারিলে, সে তখনই মুক্তিলাভ করে; আর দিতে না পারিলে, তাহাকে কয়েদ খাটিতে হয়। এই সমস্ত কারণে, লোকে সহজে পুরুলিয়া যাইতে চায় না। নগেন্দ্র যদি একটী ভাল দোকান খুলে, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে তাহার দোকান হইতে জিনিষ-পত্র তো ক্রয় করিবেই; অধিকন্তু তাহারা তাহাদের বনজ মালও সুলভ দরে বিক্রয় করিয়া যাইবে। বনজ মালের মধ্যে হরিতকী, আমলা, বহেড়া, ধুনা, লাহা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; মধু, মোম প্রভৃতিও যথেষ্ট মিলে; সোনা কিনিতে চাহিলেও সোনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতীত হরিণের শৃঙ্গ, শিকড়-বাকড়, চাউল, গম, সরিষা, গুগুজা, অড়হর, মুগ, বিরি কলাই), লঙ্কা প্রভৃতি দ্রব্যও বহু পরিমাণে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

নগেন্দ্র গ্রামবাসিগণের নিকট ব্যবসায়ের এইরূপ সুবিধার কথা শুনিত; শুনিয়া বল্লভপুরে একটী দোকান খুলিবার ইচ্ছা করিত; কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহার পিতাকে কোনও কথা বলিতে পারিত না। মাঝে মাঝে সে জননীর সহিত এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিত। কিন্তু স্বামী কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত এবং তাহারই চিন্তায় সর্ব্বদা বিব্রত থাকায়, মনোরমা ক্ষেত্রনাথের নিকট নগেন্দ্রের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে একদিনও সাহস করেন নাই। এক্ষণে প্রজাদের সহিত ক্ষেত্রনাথের মেলা মেশা আরম্ভ হওয়ায়, গ্রামের মাতব্বর প্রজারা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় কাছারী-বাটী যাইত এবং ক্ষেত্রনাথের সহিত নানাবিষয়ে গল্প ও কথাবার্ত্তা কহিত। একদিন বেচনমণ্ডল প্রভৃতি তাঁহাকে বল্লভপুরে একটী কারবার খুলিতে অনুরোধ করিল। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "বেচন, এই অঞ্চলে আমার একটী কারবার খুলবার ইচ্ছা আছে। আগে ফসল সমস্ত খামারে তুলি; তার পর তোমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'র্‌ব।" বেচন বলিল সে কথা যথার্থ বটে।

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

স্তূপ নির্ম্মাণ *

কৃষক-বালক দীন　　শুনিয়াছে কত দিন
　সিদ্ধার্থের করুণা-কাহিনী;
হাহাকার দূরীভূত　　পাপহৃদি করি পূত
　বহিত যে অমৃত-বাহিনী।
যে জন সবার লাগি　　গিয়াছে সকল ত্যাগি
　কি দিয়ে পূজিব তাঁরে আজ?
যাহা করে মনে হয়　　এ তো তাঁর যোগ্য নয়
　নিজ কাজে নিজে পায় লাজ!

একদা পথের কাছে　　ব্যস্ত সে কি ক্ষুদ্র কাজে
　আশে পাশে দৃষ্টি কিছু নাহি।
সে পথে কণিস্করাজ　　সফরে চলেছে আজ
　সহসা বালকে দেখে চাহি!
রাজা কৌতূহলে কহে—"কোন খেলা খেলিছ হে
　তুমি হেথা নিঃসঙ্গ বসিয়া?"
আপন বিনম্র আঁখি　　রাজার নয়নে রাখি
　শিশু কহে সঙ্কুচিত হিয়া!—

"পবিত্রিয়া এই স্থান　　শিষ্য সহ ভগবান
　বুদ্ধ করেছিলেন গমন,
সেই স্মৃতি পুণ্যমাখা　　হেথায় রাখিতে আঁকা
　ব্যাকুল হয়েছে মোর মন।
শত তীর্থযাত্রী-চিত　　করিবেক বিগলিত
　তাঁর নামে এই ক্ষুদ্র স্তূপ,
স্মরি তাঁর বীরবাণী　　পাবে বল শত প্রাণী
　তাই ইহা গড়ি আমি স্তূপ!"

রাজা কহে—"বটে বটে, যাঁর কীর্ত্তি গেছে রটে,
　দেশে দেশে আলোস্রোত সম,
সে নামের যোগ্য করি, সুবিশাল স্তূপ গড়ি
　এখনি তো দিতে হবে মম।"

* Samuel Beals প্রণীত "Buddhist Records" Etc. নামক পুস্তকের ভূমিকা XXXII পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মূল বিবরণ হইতে কবিতাটিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। আশা করি তাহা মার্জ্জনীয়।

রাজার আদেশ পেয়ে শিল্পী শত এল ধেয়ে
সুবিশাল স্তূপ দিল তুলি,
বালকের স্তূপ রাখি বিরাট জঠরে ঢাকি
আকাশ ছুঁইল গর্ব্বে ফুলি।
মণি মাণিক্যের শোভা কি বিচিত্র মনোলোভা
ঝিকিমিকি কি সুন্দর ছবি,
যেন খেলে সূর্য্যবিভা, গঠন সুদৃঢ় কিবা
অতুলন অনুপম সবি!

হেন দৃশ্য চমৎকার কহে সবে নাহি আর,
দেখি নাই বিশ্ব চরাচরে,
হেরি সেই স্তূপ-শির উচ্চশির নৃপতির,
হৃদয় উল্লাসে উঠে ভরে।
উচ্চারিয়া জয়নাদ স্তূপে করি প্রণিপাত
কহে শিশু অতি হৃষ্টমনা,—
"এ হয়েছে যোগ্য স্তূপ অক্ষমেরে ক্ষম ভূপ
যোগ্য কাজ সাথে যোগ্য জনা!"

হেন কালে আচম্বিতে বিস্ময় সবার চিতে
নৃপতির স্তূপশির টুটি
কৃষকের ক্ষুদ্র স্তূপ একি হেরি অপরূপ
পুষ্প সম উঠিয়াছে ফুটি!
সেথায় রাজার লোক কহে—এর শাস্তি হোক,
এ নহে শিশুর ছেলেখেলা,
ভেল্কি জ্ঞানে এই জনা ক'রে ফেরে প্রতারণা
হবে কোন জুয়ারীর চেলা!"

কণিস্ক কহিল ধীর——"রাজপুত্র ভিখারীর
হল আজ উচিত সম্মান,
স্তূপগাত্র রাজা গড়ে চাষী-পুত্র তার পরে
তুলি দিল পুণ্য শিরস্ত্রাণ;
গর্ব্বোন্নত নৃপশির নত হল হে সুধীর!
সরল ভক্তির হল জয়!"
রাজা ধীরে এত কহে বালক অবাক রহে
চিত্তে খেলে অপূর্ব্ব বিস্ময়!

শ্রীশশিকান্ত সেনগুপ্ত।

অনাদৃত

(গল্প)

আমাদের পাড়ায় গোপীমোহন সকলেরই পরিচিত ছিল। তাহার কেমন একটা আকর্ষণ ছিল যে সে কোন বাড়ীতে আসিলেই সকলে তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িত। ছেলেরা কোলে কাঁধে চড়িবার চেষ্টা করিত। "গল্প বল" "গল্প বল" করিয়া অস্থির করিত। যুবকেরা রঙ্গরহস্য করিত। বৃদ্ধেরাও সহাস্যে স্নেহপূর্ণ চক্ষে তাহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত।

গোপীমোহন বড় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার জীবনটা একভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। পিতা এক সওদাগরের আফিসে কাজ করিত। সারাজীবন কেরাণীর কলম চালাইয়া যেদিন বৃদ্ধ ইহলোক পরিত্যাগ করিল, তাহার পর হইতে সংসার গোপীমোহনই চালাইতে লাগিল। আর সংসারই বা কি? বাড়ীতে কেবল বৃদ্ধা মাতা।

সাহেবকে অনেক করিয়া ধরিয়া গোপীমোহন পিতার চাকরীটি জোগাড় করিয়াছিল। মাহিনা কুড়ি টাকা। পিতার রোগশয্যায় ডাক্তার ও ঔষধখরচ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে গোপীমোহনের কিছু ধার হইয়াছিল। কুড়িটি টাকা হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে ধার শোধ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সংসার-খরচ চালাইয়া কত টাকাই বা সে বাঁচাইবে? তাই সুদ নিয়মিতভাবে দিতে পারিলেও আসলের কিছুই এ পর্য্যন্ত সে পরিশোধ করিতে পারে নাই।

মা বলিত "দেখ্ গুপি! বুড়ো হয়ে পড়্লুম। একটা বিয়ে কর্, নাতিপুতির মুখ দেখে গঙ্গালাভ করি। একলা আর থাকৃতে পারি না।" গোপীমোহন বুঝাইত "এই যে আগে দেনাটা শোধ করি।"

গোপীমোহন ছেলেপুলে বড় ভাল বাসিত। তার কোমল স্নেহময় অন্তঃকরণ স্নেহ করিবার পদার্থের সন্ধানে সদাই ব্যাকুল থাকিত। তাই প্রতিবেশীর মধ্যে সকলের প্রতি তাহার ভালবাসা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এক একবার তাহার মনেও আশা জাগিত সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে। অৰ্দ্ধমলিন শার্টটি গায়ে দিয়া কাঁধে চাদর ফেলিয়া ছাতি মাথায় যখন সে ধীরে ধীরে আফিসের দিকে চলিত তখন তাহার মনে হইত যদি আমার ছেলেমেয়ে থাকিত তাহা হইলে কত বায়না করিত। আমাকে কি সহজে আফিসে আসিতে দিত? আফিসে টানাপাখার নীচে নিজের টেবিলটির সামনে বসিয়া অনবরত হিসাব করিতে করিতে করিতে যখন তাহার মাথা ঢুলিয়া পড়িত, হাত অসাড় হইয়া আসিত, তখন সে ভাবিত আমার ছেলেপুলে থাকিলে কি এরূপে কাজ করিলে চলিত? আফিসের ছুটির পর অবসন্নদেহে যখন চিরপরিচিত পথটি দিয়া নিজের বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিত, তখন তাহার একটা অভাব বুঝিতে পারিত। কই, আর সকলের ন্যায় তাহাকে ত কেহ আগু বাড়াইয়া লইতে আসে নাই। কোমল বাহু বিস্তার করিয়া কেহ ত বলে না "বাবা আমার পুতুল এনেছ?" আহা! সে যদি দেনাটা পরিশোধ করিতে পারে তাহা হইলে আর কোনও বাধা থাকে না। তাই যখনই তাহার মনে পুত্রকন্যাপরিবৃত সংসারের চিত্র জাগিয়া উঠিত, তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত "এই যে আগে দেনাটা শোধ করি।"

কিন্তু অন্তর তাহা বুঝিত না। স্নেহের প্রবল ক্ষুধা তাহার প্রতিবেশীগণের সকল সন্তানকে আদর করিয়াও মিটিত না। সে চায় তাহার নিজের একটি শিশু। সেই কেবল তাহাকে ভালবাসিবে। অন্য কেহ তাহার ভালবাসায় বাধা দিতে পারিবে না। প্রতিবেশীর বৈটকখানায় বসিয়া সে ছেলেদের গল্প বলিতেছে, চাকর আসিয়া ছেলেদের বলিল "চল খাবে চল, মা ডাকছেন।" ছেলেরা যাইতে চায় না, কিন্তু গোপীমোহন বুঝে ছেলেদের ধরিয়া রাখিবার কোন অধিকার তাহার নাই। ক্ষুণ্ণমনে সে গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়ে। ছেলেরা বলে "তারপর কি হ'ল দাদা?" গোপীমোহন ক্ষুব্ধচিত্তে বলে "ভাই, আবার কাল বল্‌ব।"

পাড়ায় হিংসুকেরও অভাব নাই। গোপীমোহনের স্নেহবলে শিশুহৃদয় বিজিত হইত ইহা কাহারও কাহারও চক্ষুশূল ছিল। গোপীমোহন তাহাদের বাড়ী গিয়া ছেলে কোলে করিলেই, কোন-না-কোন অছিলায় তাহারা ছেলেকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইত। কখনও কখনও গৃহিণীর অনুচ্চ মন্তব্যও গোপীমোহনের কানে পৌঁছিত "দেখেছ—মিন্‌সের চেহারা দেখেছ—কি পাকাটে গড়ন। বোধ হয় গুণ টুন করে। ছেলেপিলের অকল্যাণ ঘটাবে।" হায় গোপীমোহন! দেনা শোধের জন্য অর্দ্ধাশনে তোমার যে দেহ ক্ষীণ!

অতি কষ্টে কোনক্রমে দুই একটা পয়সা বাঁচাইয়া গোপীমোহন প্রতিবেশীর কোন ছেলের জন্য একটি বাঁশী বা একটি খেল্‌না কিনিয়া দেয়। তাহার বাপ মা বলে "ওঃ! কি ছাই একটা জিনিষ দিয়েছে।" কিন্তু শিশুর মন টাকার পরিমাণে স্নেহের ওজন করে না, তাই গোপী-দাদার সেই একপয়সার বাঁশীটি পাইয়া সে আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে ও সমস্ত দিন সময়ে অসময়ে বাঁশীটি বাজাইয়া ঘরখানি কাঁপাইয়া তুলে। গোপীমোহন সেদিন বড় আহ্লাদে আফিসে যায় ও স্ফূর্ত্তির সহিত সমস্ত কাজ শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলে।

কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল দেনা-শোধ আর হইল না। রবিবারের দুপুরবেলা তক্তাপোষখানির উপর অলস দেহ ঢালিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া সে নিজের দুর্ব্বহ ঋণভারের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। স্বপ্নে দেখিত সে যেন কারাগারের বন্দী, বুকে একখণ্ড পাষাণ চাপান আছে। সেই পাষাণখানি নামাইবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। একবার পাষাণখানি নামাইয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার মুক্তি। কারাগারের বাহিরে কচি কচি ছেলেরা হাসিমুখে ছুটাছুটি করিতেছে—গোপীমোহনকে ডাকিতেছে। চকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত তখন আবার ঋণের কথা ভাবিতে থাকিত। মা আসিয়া বলিত "ওরে বেলা পড়েছে, একটু বেড়িয়ে আয় না।"

এইরূপ রবিবারে একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছে এমন সময় বৃষ্টি নামিল। বৈশাখ মাস—অপরাহ্ণ। গোপীমোহন ছাতা লইয়া বাহির হয় নাই। হঠাৎ

ধূলার একটা ঝড় উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার জন্য একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। শীঘ্রই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

গোপীমোহন সে দিন একটি কাচানো শার্ট ও চাদর বাহির করিয়াছিল! তার পরদিন আফিসেও তাহা চালাইতে হইবে। কাজেই সেই জামা ও চাদর যাহাতে না ভিজে তাহার উপায় করিতে হইবে। গলির ভিতরে গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়ীও নাই, যে, তাহার বারান্দার নীচে গিয়া দাঁড়াইবে। পাশে একখানা খোলার চালের ঘর ছিল, তাহার দাওয়ায় উঠিয়া পড়িল।

আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল। বজ্রধ্বনির সহিত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল্। গলির মাঝে ক্রমশঃ জল জমিতে লাগিল। গোপীমোহন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেদিকে জলের ঝাপ্‌টাও আসিতে লাগিল। গোপীমোহন সরিয়া দাওয়ার কোণে গেল। সেখানে দেখিল একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর একটি ছেলে ঘুমাইতেছে। দেখিয়া বোধ হয় বয়স সাত আট বৎসর। রং খুব কালো। মাথাভরা চুল। হাত পা গুটাইয়া বালক ঘুমাইতেছে। মাথার কাছে কাগজ-জড়ান একটা কি রহিয়াছে।

এমন অসময়ে ছেলেটিকে ঘুমাইতে দেখিয়া গোপীমোহনের ইচ্ছা হইল যে তাহাকে জাগাইয়া দেয়। কিন্তু হঠাৎ বালকটীর গায়ে হাত দিতেও সাহস করিল না। কিন্তু সেই ছোট দাওয়াটির কোণেও যখন জলের ঝাপটা আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, তখন গোপীমোহন আর থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে ছেলেটির মাথায় হাত দিল। বালক করস্পর্শে নড়িয়া উঠিল। একবার কাশিয়া পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "বাবা!"

গোপীমোহনের প্রাণে একটা কিসের আঘাত লাগিল। তাহাকে ত' কেহ 'বাবা' বলিয়া ডাকে নাই। বালকের এই কথাটি তাহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে গলাইয়া দিল। বলিল "ওঠ বাবা, জল পড়্‌ছে, ভিজে যাবে।"

বালক চোখ্ মেলিয়াই দুইহাতে সেই কাগজে মোড়া পদার্থটি তুলিয়া লইল। অপরিচিত গোপীমোহনকে দেখিয়া বলিল "তুমি কে?" গোপীমোহন অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। বলিল "উঠে বাড়ীর ভিতরে যাও! সন্ধ্যার সময় কি এমন করে ঘুমুতে আছে?" বালক বলিল "আমি ত চল্‌তে পারি না। আমি যে খোঁড়া।" গোপীমোহন তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্যই ত সে খঞ্জ। বলিল "তোমার বাবা কোথায়?" বালক বলিল "আমার বাবা নেই। একবছর হ'ল মারা গেছে।"

"তোমার আর কে আছে?"

"মা আছে। দুই ভাই, এক বোন আছে।"

"তারা কোথায়?"

"বাড়ীর ভেতর। ঐ যে তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তারা খেলা কচ্ছে।"

তখন বালকটির দুই ভাই ও ভগ্নীটি একখানা কাগজের নৌকা করিয়া বৃষ্টির জলপূর্ণ নালায় ভাসাইবার চেষ্টা করিতেছিল ও উচ্চরবে কোলাহল করিতেছিল।

গোপীমোহন বলিল "তোমায় নিয়ে ওরা খেলা করে না?"

বালক বলিল "আমি যে খোঁড়া। ওরা বলে খোঁড়া হ'লে খেল্‌তে পারে না! আমি ত চোর্ চোর্ খেল্‌তে পারি না। আমি বলি বসে 'আগ্‌ডুম্ বাগডুম্' খেলি, ওরা তাতে রাজী হয় না। সন্ধের পর কোনও কোনও দিন আমার সঙ্গে খেলে।"

"তুমি সমস্ত দিন কি কর?"

"এইখানে মা সকালে বসিয়ে রেখে যায়। আমাকে দেখ্‌লে মায়ের রাগ হয় কি না। আমি খোঁড়া, কোনও কাজ করতে পারি না। তাই আমি এইখানে থাকি। বাবা আমায় এই বই দিয়েছিলেন, এইটে পড়ি; ভাল বুঝ্‌তে পারি না। এখনও ভাল পড়্‌তে শিখি-নি কি না। ছবি দেখি। বাবা আমায় গল্পগুলি সব বলেছিলেন, তাই ছবি দেখেই বেশ বুঝ্‌তে পারি।" বলিতে বলিতে বালক খুব কাশিতে লাগিল। গোপীমোহন বলিল "তোমার কি সর্দ্দি হয়েছে?"

"না। আমার যে অসুখ। মা বলে আমার হাঁপানি হয়েছে। বাবারও হাঁপানি হয়েছিল, তাইতে বাবা মারা গেছে। মা বলে আমি আর বেশীদিন বাঁচব না।"

গোপীমোহনের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

অনাদৃত বিকলাঙ্গ রুগ্ন শিশু, মাতার আদরেও বঞ্চিত। সামলাইয়া লইয়া বলিল "দেখি তোমার কেমন বই।"

বালক তাহার কাগজমোড়া বইখানি দেখাইল। মলাট-দেওয়া বহুব্যবহৃত জীর্ণ বটতলার ছাপা একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ। বটতলার ছাপা ছবি—বিকটমূর্ত্তি রাক্ষস, গজকচ্ছপের যুদ্ধ, সবই কিম্ভূতকিমাকার আজগুবি। এই ছবিগুলিই বালকের কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিত ও তাহার নিরানন্দ নিঃসঙ্গ জীবনে শান্তিদান করিত।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতেছে। গোপীমোহন বলিল "তুমি খাবে না?" বালক বলিল "এখন না। আলো জ্বালা হ'লে মা আমার ভাইবোনদের খাইয়ে আমায় নিয়ে যাবে। আমি খেয়ে তাদের রামায়ণের গল্প বল্‌ব, তারা ঘুমুবে। মা তখন খাবে, বাসন মাজ্‌বে। আমি গল্প না বল্লে আমার ভাইবোনেরা মারামারি করে। যখন আমার খুব অসুখ হয়, তখন আর বল্‌তে পারি না। ভাইবোনেরা তখন জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলে, আমাকে মারে। তাই আমি রোজই তাদের গল্প বলি।"

এই সময় বাড়ীর দরজা খুলিয়া দীর্ঘাকার এক রমণী বাহির হইল। উচ্চকণ্ঠে বলিল "ওরে ভূতো! আঃ জ্বালাতন হয়েছি বাপু। বিষ্টিতে বুঝি ভিজ্‌ছে। এ আপদ যে কতদিন—"

রমণীর কথা শেষ হইল না। গোপীমোহনকে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া বলিল "আপুনি কি চান?"

গোপীমোহন বলিল "এই বৃষ্টি পড়্‌ছে বলে এইখানে একটু দাঁড়িয়েছি। ছেলেটি বুঝি তোমারই?"

রমণী—"হ্যাঁ! দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো বাবু। যেমন আমার পোড়া কপাল তেমনি ছেলেও হয়েছে। ভূতোর বাপ মারা গিয়ে অবধি আমার দিন চলা ভার। তাও যদি ভূতো কাজ টাজ একটু আধ্‌টু কর্‌তে পার্‌তো। ওমা! ভূত নামাতে হবে যে। চল্ রে ভূতো, বাড়ীর ভেতরে চল্!" এই বলিয়া ভূতোকে দুইহাতে তুলিয়া লইল। বলিল "ওটা কি? ওঃ সেই বইখানা। তুই আমার হাড় জ্বালালি। দিন রাত তোর ওখানা বুকে রেখে কি হয় বাপু? অনাছিষ্টি যত। তোকে কে বয় তার ঠিক নেই, আবার একখানা বই!" বালকটি যেন কোন বিপৎসম্ভাবনায় তাহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল বইখানি বুকে জড়াইয়া ধরিল।

গোপীমোহন আর সহ্য করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া জুতা হাতে করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। গলিতে তখন জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

পরদিন বেলা আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সারিয়া গোপীমোহন আফিস যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু আফিসের সোজা রাস্তায় না চলিয়া গোপীমোহন কেন যে সেই গলিটির ভিতর আসিয়া পড়িল তাহা সেই জানে। বালকটি সেই দাওয়ার কোণে বসিয়া রামায়ণের পাতা উল্টাইতেছিল। গোপীমোহনকে দেখিয়াই চিনিল ও ম্লানহাস্যে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল। গোপীমোহন দাওয়ায় বসিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল।

সেইদিন হইতে গোপীমোহন দুবেলা ঐ গলিটি দিয়া বহু ঘুরিয়া আফিসে যাইত ও আসিত। বালকটিও গোপীমোহনের আগমনের প্রত্যাশায় থাকিত। উভয়ে কত কথা, কত গল্প হইত। বর্ষাকালে ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেও সহজ রাস্তা ছাড়িয়া জুতা হাতে একহাঁটু জলের মধ্য দিয়া সেই গলির ভিতর গোপীমোহন পৌঁছিত। তাহার স্নেহ-ক্ষুধার্ত্ত হৃদয় এইবার এক নিজস্ব স্নেহপাত্র পাইয়াছিল। এখানে তাহার ভালবাসার আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না!

আফিসে হঠাৎ একদিন গোপীমোহনের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইল। ছোট সাহেব ছুটি লইয়াছেন—বিলাত হইতে এক জন নূতন সাহেব তাঁহার স্থানে আসিয়াছেন। একদিন টিফিনের সময় সাহেব আফিস ঘরে আসিয়া দেখিলেন—অন্য সব বাবু টিফিন্ করিতে বাহিরে গিয়াছে। কেবল গোপীমোহন হেঁট হইয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া কি লিখিতেছে। গোপীমোহনের জলখাবার খাইবার পয়সা নাই। আর বিনা প্রয়োজনে বাহিরে গিয়া বাজে ইয়ারকি দেওয়াও তাহার ভাল লাগে না। সাহেবকে দেখিয়াই গোপীমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সাহেব কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর হইতে প্রত্যহ সাহেব গোপীমোহনের প্রতি

লক্ষ্য রাখিলেন। দেখিলেন সে প্রত্যহ ঠিক্ নিয়মিত সময়ে আসে আর নিজের টেবিলটিতে বসিয়া অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়া যায়; আর অন্যান্য বাবুদের মধ্যে কেহ হয়ত মস্ত বড় খাতা খুলিয়া তাহার আড়ালে নভেল পাঠ করিতেছেন। কেহবা পাশের কাহারও সহিত চুপি চুপি গল্প করিতেছেন। সাহেব শীঘ্রই গোপীমোহনের উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

একদিন আফিসে গিয়া গোপীমোহন শুনিল তাহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। আগামী মাস হইতে সে চল্লিশ টাকা করিয়া পাইবে। শুনিয়া গোপীমোহনের মনে আনন্দের একটা প্রবল তরঙ্গ বহিল। এত দিনের দেনা সে এইবারে পরিশোধ করিবে।

প্রথম যে মাসে চল্লিশ টাকা মাহিনা পাইল, সে মাসে গোপীমোহন দুইখানি ছবির বই, একটি বাঁশী ও একটী বড় পুতুল লইয়া সেই গলিটিতে গেল। সেদিন তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। বালকটি উৎসুক নয়নে পথের দিকে চাহিয়া ছিল। গোপীমোহন যখন উপহারগুলি বাহির করিল তখন বালকের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। বাঁশীটি বাজাইতেই বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার ভাইবোন্ ছুটিয়া আসিল। গোপীমোহন এই আনন্দদৃশ্য হইতে নিজেকে ছিনাইনা লইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সকালে আফিস যাইবার সময় যাহা শুনিল তাহাতে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। বালকটির ভাই বোনেরা খেলনাগুলি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। বালক আপত্তি করিয়াছিল বলিয়া তাহার মা তাহাকে কটুবাক্যে গালি দিয়াছে। গোপীমোহন আবার সেই দিন নূতন খেলনা কিনিয়া বালকটিকে বিকালবেলা দিয়া আসিবে এই আশ্বাস দিয়া আফিসে গেল।

সেদিন ছুটির সময় আফিসের সাহেব গোপীমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি মিঃ হার্টলির বাড়ী জান?"

গোপীমোহন সম্মতি জানাইল।

সাহেব বলিলেন "আজ মিঃ হার্টলির টাকার বিশেষ দরকার হইয়াছে! চিঠি দিয়াছেন। তুমি এখনই ৫০০৲ টাকা তাঁহাকে দিয়া এস। অন্য কাহারও উপর এ ভার দিতে আমি ইচ্ছা করি না। বিষয়টি গোপনে রাখিবে। রসীদ আনিবে।"

গোপীমোহন টাকা লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। গেটে আসিতেই দরওয়ান বলিল "বাবুজী, এক আওরৎ খাঁড়া খাড়ি হ্যায়।"

গোপীমোহন দেখিল—ভুতোর মা। বলিল "কি হয়েছে?"

ভুতোর মা বলিল "আর বাবু, আমার পোড়া কপাল। ছেলেটা মর মর। কেই বা দেখে। যদি আপুনি একবার—"

"কে? ভুতো? কি হয়েছে তার? আজ সকালে ত' তাকে দেখে এলুম।"—ব্যগ্রকণ্ঠে গোপীমোহন এই কথা কয়টি বলিল।

রমণী বলিল "ডাক্তার এয়েছিল, বলে কি না আর এক ঘণ্টাও বাঁচ্‌বে না। ছেলেটা বড় কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—আপনাকে দেখবার জন্যে—"

"চল, চল।" বলিয়া গোপীমোহন দ্রুতবেগে বাহির হইয়া পড়িল। সামনে একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী যাইতেছিল। তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে হাঁকাইতে বলিল। গাড়ী যখন গলির মোড়ে, তখন গোপীমোহন লাফাইয়া পড়িয়া গাড়োয়ানের হাতে একটা টাকা দিয়া ছুটিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

দাওয়ায় সে বালক নাই। চীৎকার করিয়া গোপীমোহন ডাকিল "ভুতো! ভুতো!" দরজা খুলিয়া বালকের বোন্‌টি আসিয়া দাঁড়াইল।

"ভুতো কোথা?"

"ঘরে শুয়ে আছে।"

ঝড়ের মত গোপীমোহন ঘরে প্রবেশ করিল। এ ঘরে পূর্ব্বে সে কখনও আসে নাই। এক পাশে একখানি তক্তপোষ। তাহার উপর মলিন শয্যা। বালকটি তাহার উপর শুইয়া আছে। শ্বাসবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। গোপীমোহন যে কয়টি খেলনা দিয়াছিল, তাহা বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। ভাই দুটি ও বোন্‌টি দূরে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে দেখিতেছে। তাহারা খেলনা

কাড়িয়া লইয়াছিল বটে কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ভূতোর পাশে সেগুলি রাখিয়া দিয়াছে। গোপীমোহন তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল "ভূতো।"

উত্তর নাই। একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। গলায় একটা অস্ফুট শব্দ ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দেহটি একবার কাঁপিয়া অসাড় হইয়া গেল।

গোপীমোহন দেখিল—বুকের উপর সেই রামায়ণখানি তখনও রহিয়াছে। পিতৃদত্ত সে উপহারটি আর কেহ কাড়িবার লোভ করে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে সাহেব, আফিসের বড় বাবু, চাপরাশী প্রভৃতির সহিত গোপীমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রুক্ষকেশ শ্মশান-জাগরণে উন্মাদপ্রায় গোপীমোহন আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "টাকা কোথায় ?"

বড় বাবু চুপি চুপি বলিলেন "লোকটা মদ খেয়েছে। এখনও যে এখানে আছে এইটিই আশ্চর্য্য। আমরা ভেবেছিলাম, টাকাকড়ি নিয়ে পশ্চিমে চম্পট দিয়েছে। পুলিসেও খবর দেওয়া গেছে। তারা ষ্টেশনে ষ্টেশনে লক্ষ্য রাখ্‌ছে।"

আর একজন বাবু বলিলেন—"নেশা করে বোধ হয় হিতাহিত জ্ঞানরহিত হয়েছে।"

গোপীমোহন বাঁ হাতে জামার পকেট হইতে ৫০০০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া সাহেবকে দিল। ডান হাতে তাহার কি একটা রহিয়াছে। সেইটাকে সে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে।

সাহেব বলিলেন "তোমার চাকরী গেল। এক মাসের অগ্রিম মাহিনা আজ পাঠাইয়া দিব।" বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবে।"

সকলে চলিয়া গেল। পথে বড় বাবু বলিলেন "ওঃ, লোকটা কি ধড়ীবাজ। আরও কোথাও থেকে কিছু সরিয়েছে বোধ হয়। ধরা পড়্‌বার ভয়ে আমাদের টাকাটা ফিরিয়ে দিলে বটে, কিন্তু দেখ্‌লে না একটা ছোট বাক্সের মত কাগজে মোড়া কি একটা বুকের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল।" অন্য বাবুরা এক বাক্যে ইহাতে সায় দিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সাহিত্যে স্বাধীন-চিন্তা

গত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী" পত্রে "ঠাকুর পূজার ইতিহাস" লিখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি যে সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ ক্ষুণ্ন বা ব্যথিত হইয়াছেন। আমি পূজার যে ইতিহাস লিখিয়াছি, তাহা যদি কেহ ভ্রমাত্মক মনে করেন, যুক্তিবিরুদ্ধ ভাবেন, অথবা বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া বিচার করেন, তবে তিনি অনায়াসেই তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের একজন কৃতবিদ্য বন্ধু ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া মৃদুভাবে তাঁহার অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদি কোন প্রতিবাদ প্রেরিত হইত, তবে সম্পাদক তাহা নিশ্চয়ই মুদ্রিত করিতেন; কারণ "প্রবাসী" পত্র কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মুখপত্র নহে, এবং এই পত্রে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন মতবাদ সুরচিত হইলেই মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে এবং মুদ্রিত হইবে। তবে সাহিত্যে যদি কেহ বিভিন্ন মতবাদের প্রচার অসঙ্গত মনে করেন, স্বাধীন-চিন্তা এবং অবাধ সমালোচনা দোষযুক্ত মনে করেন, এবং এই হিন্দুর দেশে আদম সুমারিতে সংখ্যায় যাঁহাদিগকে অধিক পাওয়া যাইবে, তাঁহাদেরই মত এবং বিশ্বাস আলোচিত ও সমর্থিত হওয়া উচিত বলিয়া ভাবেন, তবে উপায় নাই। *

স্বাধীন চিন্তাই যে হিন্দু জাতির গৌরবের প্রধান জিনিস ছিল, বিভিন্ন মতবাদ লইয়া প্রশান্তভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা যে এই দেশে খুব বেশি ছিল, সে কথা কি আবার সকলকে ভাল করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? এই ত সেদিন পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আহূত অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক

* সমগ্রভারতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা দেশে হিন্দুর সংখ্যা ২০৯৯৯৬৩৪ (দুই কোটি নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার ছয় শত চৌত্রিশ), মুসলমানের সংখ্যা ২৪২৩৭২২৮ (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার দুইশত আটাশ)। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালী হিন্দুর সমান শিক্ষিত হইয়া উঠিলে হয়ত তাঁহারা বাঙ্গলাসাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-ভাবাপন্ন দেখিতে চাহিবেন।

করিবার জন্য কত বিভিন্ন মতের অবতারণা করিতেন; এবং কেহ কেহ নাস্তিকতা পর্য্যন্ত সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমার মাতামহ ৺রামজয় তর্কালঙ্কার মহাশয় আস্তিক ছিলেন, এবং ঠাকুর-পূজাদিতেও হয়ত তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল; আমি আমার মাতাঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছি যে তিনি এক পণ্ডিত-সভায় নাস্তিক্যবাদ সমর্থন করিয়া অনেক পণ্ডিতকে তর্কে হারাইয়া প্রভূত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। যে সময়ে মিসর, বাবিলোন, গ্রীস, প্রভৃতি দেশে একাধিক ধর্ম্মমত সমর্থিত হওয়া অসম্ভব-প্রায় ছিল, সে সময়ে ভারতবর্ষে কেবলমাত্র বৈদিকপন্থা-অবলম্বনকারীদিগের মধ্যেই ঈশ্বর এবং পরকাল সম্বন্ধে অন্ততঃপক্ষে ৬৩টি মত প্রচলিত ছিল, এবং তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইত, এরূপ জানিতে পারা যায়। নিকায় গ্রন্থে অভ্রান্তরূপে দেখিতে পাই যে ভগবান্ বুদ্ধদেব ঈশ্বর এবং পরলোক বিষয়ে ৬৩টি ধর্ম্মমত লইয়া শিষ্যদিগকে উহাদের অসারতা বুঝাইতেছেন।

জ্যোতিষ্কগুলি অত্রি ঋষির নয়নসমুত্থ নহে বলিয়া প্রচার করায় আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতির ফাঁসি হয় নাই; গণদেবতা এবং মাতৃকাদিগের পূজা ভূতপ্রেতের পূজা বলিয়া অবজ্ঞা করায় ভৃগুব্যাখ্যাত মনুসংহিতা সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোন রাজা গ্রামদেবতা-পূজকদিগের গৌরববৃদ্ধি করেন নাই। এখন যদি এই অধঃপতিত জাতি প্রাচীনকালের এই স্বাধীন-চিন্তার গৌরবটুকু হারায়, এবং হিন্দুর চিরপ্রসিদ্ধ উদারতা হারাইয়া নীচ এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তবে আমাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আমাদের সমাজে অনেক স্থলেই পরসহিষ্ণুতার অভাব আছে, এবং অনেকেই সমাজতত্ত্বের বিচার করিয়া আমাদের প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির ইতিহাস জানিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এ কথা জানিতাম বলিয়াই আমার প্রবন্ধের প্রারম্ভভাগের দ্বিতীয় পেরাগ্রাফে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলাম যে, যাঁহাদের এ-সকল তত্ত্বের আলোচনা করা সহ্য হয় না, তাঁহারা যেন আমার প্রবন্ধ একেবারেই পাঠ না করেন। আমার কথা কয়েকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"ঠাকুর-দেবতার পূজার ইতিহাসের কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকিয়া উঠিবেন, এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে নৃতত্ত্ব-বিচারে অগ্রসর হইয়া মানুষের সকল প্রকার প্রথা-পদ্ধতি, সুসংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতির বিচার করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে সকল কথার বিচারের জন্য আহ্বান করিতেছি। ঠাকুর-দেবতার পূজা থাকা উচিত কিনা, এ কথা লইয়া ধর্ম্মসংস্কারকেরা বিচার করিবেন; আমার সহিত সে কথার কোন সম্পর্ক নাই।"

সাহিত্যের কল্যাণের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য এ কথা নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, যাঁহারা বিভিন্ন মতবাদের বিচার করিতে চাহেন না, স্বাধীন-চিন্তা দ্বারা সত্যোদ্ভাবনের জন্য প্রয়াসী নহেন, তাঁহারা সাহিত্যের শত্রু, সমাজের শত্রু, জাতির শত্রু। আমি যে মত প্রচার করিয়াছি, অথবা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হয়ত অতীব অসার, অতীব অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু কেহ যদি সেই মতকে সুযুক্তি দ্বারা খণ্ডিত না করেন, এবং কেবল গায়ের জোরে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতে চাহেন, তবে তিনি নর-হত্যার চেষ্টা অপেক্ষাও গুরুতর পাপে আপনাকে অপরাধী করিবেন।

আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে স্বাধীন-চিন্তা পরাভূত হইয়া আসিতেছে, এবং সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাইতেছে; পর-বাদ-সহিষ্ণুতা ক্ষীণ হইতেছে, এবং স্বদেশ-প্রেমের নামে আত্মক্ষয়সাধনী স্বার্থপরতা পুষ্টিলাভ করিতেছে। জাতির, সমাজের, এবং সাহিত্যের এই ব্যাধি দূরীভূত করিবার জন্য দেশের কৃতী সন্তানদিগকে আহ্বান করিতেছি। জর্ম্মান কবি গেটে যখন বলিয়াছিলেন যে, যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, এবং যাহা কল্যাণকর তাহা যে-কালের বা যে-দেশের সাহিত্যেই প্রস্ফুটিত হউক না কেন, তাহাকে সমাদরে আপনার করিয়া লইতে হইবে, তখন ইউরোপীয় সাহিত্য নব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছিল। সমালোচক-কুল-তিলক মেথিউ আর্নল্ড গেটের এই সুশিক্ষা প্রচার করিয়া ইংরেজি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সমালোচনার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের এই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নব্য বঙ্গসাহিত্যের জীবনদাতা বঙ্কিমচন্দ্র যখন

"বঙ্গদর্শন" পত্রে তাঁহার "সাম্য" গ্রন্থখানি অধ্যায়ে অধ্যায়ে মুদ্রিত করিতেছিলেন, তখন আমাদের সাহিত্য মুক্ত আকাশের তলায় অবাধে বর্দ্ধিত হইতেছিল। যে বারবেলা বা কালরাত্রির কুলগ্নে নূতন ব্যাধি আসিয়া সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে দিনের কথার এখন সমালোচনা করিব না। এই ব্যাধিসংক্রমণের আরম্ভকালে একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি নাস্তিকতা সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কোন মাসিক পত্রে মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। লেখকটির উপাধি মনে নাই বলিয়া নামটুকু অবলম্বনে তাঁহাকে প্রভাত বাবু বলিয়াই পরিচয় দিতেছি। নাস্তিকতার অনুকূল যুক্তি মুদ্রিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া, উল্লিখিত মাসিক পত্রের সম্পাদক প্রভাত বাবুর প্রবন্ধের একটি কিংবা দুইটি ছত্র মুদ্রিত করিয়া প্রতিমাসে তাহার ৭।৮ পৃষ্ঠা প্রতিবাদ লিখিতেন। প্রভাত বাবু তখন কোনরূপে প্রবন্ধটি সংগ্রহ করিয়া তৎসময়ে নূতন প্রচারিত "নব্যভারত" পত্রে উহা মুদ্রিত করেন। লেখকদিগের স্বাধীন মতের সহিত সম্পাদকের যে কোন সংস্রব নাই, এ কথাটাও সে সময়ে বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া "নব্যভারত"এর সূচীপত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছিল। এ দেশের পত্রিকায় এই প্রকার উল্লেখ সেই প্রথম।

জীবন-বিজ্ঞানে (Biology) যে-সকল সত্য আবিষ্কৃত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, নৃতত্ত্বের (Anthropology) সম্বন্ধ অনুসন্ধানে যে-সকল তথ্য অবগত হইতে পারা যাইতেছে, সেই-সকল সত্য এবং তথ্যের ভিত্তিতে এ কালের ইউরোপে সমাজতত্ত্ব (Sociology) আলোচিত হইতেছে, এবং সকল প্রকার সামাজিক প্রথাপদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের ইতিহাস রচিত হইতেছে। হইতে পারে যে, যে তথ্য বা যে ইতিহাস অন্যান্য সকল দেশের সমাজের উৎপত্তির কথায় সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, ভারতবর্ষের সমাজের পক্ষে তাহা খাটে না; এবং হয়ত বা ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্ম্মমত এবং অনুষ্ঠানাদি ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মে বিকশিত না হইয়া কোন সর্ব্বজ্ঞ কর্তৃক একদিনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে কেহ তাহা আমাদিগের বোধগম্য করিয়া বুঝাইয়া দিলে চলে। তাহা হইলে অনেক বিজ্ঞানের বোঝা নামিয়া যায়, এবং আমাদের সাহিত্যও বেশ হাল্কা শরীরে হাসিয়া খেলিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। বাইবেলের "পাইলেট" হইতে এ কালের ইউরোপীয় তথ্যের "পাইরেট" দল পর্য্যন্ত আমরা সকলেই সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি —"সত্য কি?" সত্য যাহাই হউক, আমরা যদি তাহার অনুসন্ধানে একাগ্রমনে এবং স্থিরপ্রাণতা (seriousness) অবলম্বনে অগ্রসর হই, এবং সকলের ভিন্ন ভিন্ন মত সমালোচনার জন্য উপস্থাপিত করি, তবে যাহা সত্য, তাহা একদিন-না-একদিন প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। যে-সকল পত্রিকায় এই স্বাধীন বিচার স্থান পাইবে, সেই-সকল পত্রিকাই সমাজের এবং জাতির যথার্থ কল্যাণ সাধন করিবে। প্রাদেশিকতা এবং সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী হইলে কেহ কেহ আপাততঃ কিঞ্চিৎ স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে সাহিত্যের উন্নতির বাধা এবং সমাজের শত্রু, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! যাঁহারা আমার এই কথায় ক্ষুণ্ণ হইবেন, তাঁহারা যেন সম্পাদককে রেহাই দিয়া আমাকেই তিরস্কার করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পুস্তক-পরিচয়

শুক্তি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকালীচরণ ত্রিবেদী, পুরুলিয়া। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১১০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

এখানি গীতিকবিতার পুস্তক। অনেকগুলি ভগবদ্‌ভক্তি বিষয়ক কবিতা আছে। নূতন ভাব বা বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও বিষয়গুণে পুস্তকখানি সুপাঠ্য। কিন্তু কবিতার কোনো ছন্দই বেশ সহজ অনায়াস-গতি লাভ করে নাই; অনেক নূতন ছন্দ রচনার প্রয়াস আছে, কিন্তু তাহাতে প্রবাহ বা ঝঙ্কার বা লালিত্য কিছুই নাই। লেখক কোনো ছন্দকেই আয়ত্ত করিয়া স্বচ্ছন্দগতি দিতে পারেন নাই। প্রকাশের ভাষা সরল বটে কিন্তু তাহাতে কবিত্বের বিকাশ অল্পই হইয়াছে। শুক্তির যতটুকু লাবণ্য তাহা রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের আভায়।

ডালি—

শ্রীমতী শরৎশশী মিত্র প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ১ অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা; কাপড়ে বাঁধা ১।০।

এখানিতে বিবিধ বিষয়ক খণ্ডকবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ভূমিকায় প্রকাশক বলিয়াছেন যে গ্রন্থকর্ত্রী এখনও সম্পূর্ণ তরুণবয়স্কা, বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বয়সে বড় বড় তত্ত্বকথা ছন্দে না গাঁথিয়া মনের সহজ সরল ভাবগুলি প্রকাশ করিলে ভবিষ্যতে কবিত্ব বিকাশের পক্ষে সাহায্য হইতে পারে। লেখিকার ছন্দের ভিতর প্রবাহ আছে; ভাষার উপরে দখল আছে; এখন মানবমনের বিচিত্র ভাবলীলাকে সুন্দর সুশোভন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই কবিতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তত্ত্ব বা ঘটনা ছন্দে গাঁথিলেই কবিতা হয় না, এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় কি এখনো আমাদের দেশে আসে নাই?

বিদ্যাসাগর—

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য দুই আনা।

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরাট চরিত্রের মূল গুণগুলি ধরিয়া দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমগ্র চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শিশুদের উপযোগী করিয়া লেখা। রচনায় চলিত ভাষা ব্যবহার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ভাষা সরল ও শুদ্ধ; মাঝে মাঝে প্রাদেশিকতার ত্রুটী থাকিয়া গিয়াছে—যেমন, বারংবার 'সাথে' ব্যবহার, 'দারোয়ান' স্থলে 'দাড়োয়ান'।

ফরাসী বীরাঙ্গনা—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুহরায়। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটুয্যে কোম্পানি। ১২১ পৃষ্ঠা। সচিত্র। এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৲ টাকা।

ফরাশী বীরাঙ্গনা জ্যা'ন্ দ'-আর্ক স্বদেশের দুর্দ্দিনে রক্ষয়িত্রী দেবতার রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ফরাশীরা যখন ইংরেজের প্রবল আক্রমণে হতোদ্যম; দেশ শত্রুর অধীন হয় হয়, পুরুষেরা হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন এই ফরাশী কৃষককন্যার কানে স্বদেশ-দেবতার করুণ আর্ত্তনাদ পৌঁছিল; তিনি ফরাশীদের সেনা-নেত্রী হইয়া ইংরেজদিগকে পরাজিত করিলেন; কিন্তু নিজে ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইলেন। অকৃতজ্ঞ ফরাশীরা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সামান্য কৃষক-কন্যার মুক্তির জন্য আর কোনোরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করিল না; সেকালের নৃশংস মূর্খ ইংরেজেরা রমণীর এই অসাধারণ বীরত্ব ও শক্তি ডাইনির মায়া মনে করিয়া তাঁহাকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল।

এই ইতিহাসের কাহিনীটি বিশুদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় ও সহমর্ম্মিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। স্বদেশ-সেবার এই পুণ্যাবদান সকলেরই পাঠ করা উচিত। এইরূপ বিদেশী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কাহিনী সংগ্রহ দ্বারা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিশালিনী ও প্রাণবতী হইবে। চিত্রগুলি সমস্তই য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত প্রসিদ্ধ চিত্রের প্রতিলিপি, সবগুলিই সুন্দর; একখানি রঙিন। এই পুস্তকের সমাদর হইবে আশা করি।

বাঙ্গলার বেগম—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ৬১+৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র। ছাপা কাগজ পরিষ্কার। মূল্য আট আনা। সিরাজ-মহিষী লুৎফ-উন্নিসা, সিরাজ-জননী আমিনা, এবং তাঁহার সহোদরা ও আলিবর্দ্দীর অপর কন্যা ঘসেটি, আলিবর্দ্দী-বেগম, মির্জাফর-মহিষী মণিবেগম, এবং নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর কন্যা জিন্নত-উন্নিসা—বাংলার এই ছয় জন বেগমের চরিতকথা বহু ইংরেজি বাংলা ফার্সীর অনুবাদ প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুকূল ভাব লইয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক চরিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে। বংশলতা এবং সাতখানি ছবি দ্বারা বেগম ও তাঁহাদের কবর প্রভৃতির পরিচয় বিশদ করা হইয়াছে। তরুণ লেখক বিশেষ যত্ন ও শ্রম করিয়া এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। 'সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেগমগণ নবাবী আমলের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ।' তাঁহাদের সুখদুঃখ, চরিত্র ব্যবহার, রীতিনীতির মধ্যে নবাবী দরবার ও অন্দরমহলের একটি কৌতুককর চিত্র পাওয়া যায়। অতএব তাঁহাদিগের কাহিনী বাদ দিয়া ইতিহাস হইতে পারে না। ইতিহাসের উপাদান রূপে ইহার যে সাধারণ সমাদর প্রাপ্য তাহা ছাড়াও ইহার বিশেষ সমাদরের দাবি আছে—ইহা আমাদের স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের সামান্য পুঁজিতে সংযুক্ত হইয়া মূলধন বৃদ্ধি করিবার সাহায্য করিবে; আমরা হয় হিন্দুপুরাণ নয় হিন্দু সংসারের বিখ্যাত রমণীদের আখ্যায়িকা লইয়াই গ্রন্থ রচিত হইতে দেখি। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু লইয়াই ত দেশ নয়; দেশকে বুঝিতে হইলে সকল সম্প্রদায়ের এক এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ নরনারীর চরিতকথার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। নিজেকে বিশ্বমানবের বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত করিতে হইলে বিশ্বের কোনো বিভাগকেই বাদ দিলে চলিবে না। সমস্ত জগৎটা যেন পুরুষেরই খাসদখল, ইতিহাসে শুধু পুরুষেরই কথা। পুরুষের হর্ষবিষাদ আকাঙ্ক্ষা প্রণয় প্রভৃতির অংশভাগিনী রমণীর কাহিনী বাদ দিলে একা পুরুষের মহত্ত্বঘোষণা মিথ্যাচার হয়, এবং ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। বাংলায় স্বল্প রমণী, কীর্ত্তিকাহিনীর পার্শ্বে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

রচনার মধ্যে আন্তরিক উচ্ছ্বাস না থাকিলেই ভালো হইত। স্থানে স্থানে শব্দের অপপ্রয়োগ, উপমার সৌসাদৃশ্য ভঙ্গ, পদরচনায় ক্রমভঙ্গ প্রভৃতি দোষও আছে। এগুলি সামান্য ত্রুটি; পরবর্ত্তী সংস্করণে লেখকের বিচারশক্তির পরিণতির সহিত সেগুলি সংশোধিত হইয়া যাইবে।

যে রঙিন চিত্রখানি ঘোসেটি বেগমের বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে সেখানি কোম্পানির আমলের ছাপা প্রাচীন চিত্রপুস্তকে ভারতের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের বেগম জিনৎ মহলের প্রতিরূপ বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ ইহা ঘোসেটি বেগমের চিত্র নহে, প্রাচীন চিত্রপুস্তককে অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ বা প্রমাণ নাই।

গ্রন্থকার এই চিত্রের ব্লক অপর স্থান হইতে পাইয়াছেন এবং সেজন্য ব্লকদাতার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা বেগমের কথা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং লুৎফ-উন্নিসা বেগম, খোসবাগ ও লুৎফ-উন্নিসার কবরের তিনখানি ব্লক প্রবাসীর নিকট হইতে লইয়াছেন, অথচ তাহার কোনো উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

দক্ষিণেশ্বর—

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লব। ডঃ ক্রাঃ ৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার আনা।

ছাপা কাগজ সুন্দর—এণ্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। অনেকগুলি ফটোগ্রাফ চিত্র আছে; গঙ্গা হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর দৃশ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর; পরমহংস দেবের দুখানি

চিত্রই সুমুদ্রিত; এবং প্রচ্ছদপটের উপর গঙ্গা হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর মানসানুভূতিসূচক ছায়াচিত্রটি অতীব সুন্দর হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে সংক্ষেপে রাণী রাসমণি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীর পরিচয়, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের পারিবারিক কথা ও সাধন সিদ্ধির ইতিহাস, পরমহংসদেবের নিজের ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নামতালিকা ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও পরমহংসদেব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে।

রচনার ভাষা বেশ সংযত, সুমিষ্ট, এবং বিশুদ্ধ। কোনো স্থানে নিজেদের বিশ্বাস পাঠকের উপর চাপানো হয় নাই; গ্রন্থশেষে লেখক সাবধানে উল্লেখ করিয়াছেন যে "ভক্তের বিশ্বাস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।"

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প -

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৮৭+৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৷০ আনা। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।

জগতের সভ্যতার ইতিহাসে যে-সকল দেশ তাহাদের ছাপ রাখিয়া কালচক্রে অধুনা লুপ্ত বা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে এসিয়ার পশ্চিমে বাবিলন, আসিরিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি রাজ্য; মধ্যস্থানে পারস্য ও ভারতবর্ষ; এবং পূর্ব্বে চীন প্রাচীনতম ও প্রধান। এসিয়ার এই-সকল সভ্য জনপদের সংস্রবে আসিয়া সভ্যতায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল আফ্রিকায় ঈজিপ্ট বা মিশর এবং য়ুরোপে গ্রীস। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মিশরের সভ্যতাই জগতের আদিম ও প্রাচীনতম সভ্যতা। এই সমস্ত আশ্চর্য্য ও বিচিত্র সভ্যতা প্রাচীন কালে জগতে কতবিধ লীলা করিয়া একেবারে এমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার বিষয়ে আমরা এখন আর কিছুই জানি না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে সেই সমস্ত লুপ্ত সভ্যতার চিহ্ন ভূগর্ভ হইতে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বৎসর বৎসর নূতন নূতন ছবি, নব নব তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছেন। কিন্তু ভারতের দেশী ভাষার গ্রন্থে বা সংবাদপত্রে তাহার ছায়াও পড়ে না; এক কালে যে-রাজ্যগুলি জগতের সভ্যতার বীজ প্রথম বপন করে, যাহাদের রাজধানী ও প্রধান তীর্থগুলি এক সময়ে জ্ঞানের কেন্দ্র, মানবজাতির চক্ষু স্বরূপ ছিল, ধনে জ্ঞানে বাণিজ্যে শক্তিতে যাহারা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, যাহাদের জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ কত কত ভিন্ন দেশে পড়িয়া সেখানে স্থানীয় সভ্যতার আলো জ্বালাইয়াছে, তাহাদের বিষয় আমরা কিছু জানি না, জানিবার আবশ্যক আছে মনেও করি না। প্রাচীন হিন্দুরা আপনার দেশের গণ্ডির মধ্যেই যতকিছু ভালো আছে মনে করিয়া বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল; তাহাদের কাছে বিদেশীরা ছিল ম্লেচ্ছ, বর্ব্বর। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছসংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই; সে জাত যাইবার ভয়ে আপনাকে ঘরে বন্ধ রাখিয়াছিল বলিয়া বাহির আসিয়া জোর করিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার জাত মারিয়াছে, স্বাধীনতা কাড়িয়া দাস বানাইয়াছে; তাহার দ্বারে আঘাতের পর আঘাত পড়িয়াছে তবু তাহার চৈতন্য হয় নাই। এখন চৈতন্য হইবার সময় আসিয়াছে; বিদেশকে ম্লেচ্ছ বর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষা করা আর চলিতেছে না। জগন্নাথের আনন্দ-বাজারে যাহারা যাহারা সভ্যতার পসরা নামাইয়াছে তাহাদের সকলের প্রসাদ আমাদিগকে চাখিতে হইবে, জগন্নাথের পুরীতে জাতিভেদ নাই, ম্লেচ্ছ-বিচার নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নাই, ইহা বুঝিবার সময় এখন আসিয়াছে। প্রভাত বাবু বাংলা ভাষায় সেই মহাপ্রসাদের এক কণিকা বহন করিয়া আনিয়াছেন, আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিব না, পুত্রকন্যার কল্যাণের জন্য তাহাদের মধ্যে তাহা মুক্ত হস্তে বণ্টন করিয়া দিব। ভারতবর্ষের সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন বা সমসাময়িক সভ্য কতকগুলি লুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস গল্পাকারে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। মিশর, বাবিলন, আসিরিয়া, ইহুদী জাতি, পারসিক জাতি ও ফিনিক জাতি সম্বন্ধে বিচিত্র কৌতুককর কাহিনী, তাহাদের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ, রীতিনীতি প্রভৃতি গল্পচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী আরব্য-উপন্যাসের কাল্পনিক উদ্ভট ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, কৌতূহলে বিস্ময়ে আনন্দে পাঠকের মন পূর্ণ হইয়া উঠে। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে জগতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসজ্ঞান এবং উপন্যাসপাঠের আনন্দ দুইই লাভ হইবে।

পাঠকের প্রীতিকর হইবে বলিয়া ইহাতে ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া হয় নাই, বিষয়গুলিও সম্পূর্ণ এবং শৃঙ্খলা করিয়া সাজানো হয় নাই; খণ্ড খণ্ড গল্পের ভিতর দিয়া মোটামুটি তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেই এত নূতন সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মন প্রাচুর্য্যের ভারে ক্লান্ত হইয়া উঠে। ইহা তরুণ-বয়স্ক পাঠক পাঠিকার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

অনেক চিত্র দ্বারা প্রত্যেক দেশের শিল্পচেষ্টার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দেশের রীতি নীতি কার্য্যকলাপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে। চিত্রগুলিও বিশেষ কৌতুকাবহ।

রচনার ভাষা খুব সহজ। কেবল রচনা-ভঙ্গিটি (style) কিছু কাঁচা বলিয়া স্থানে স্থানে শব্দ সংস্থাপনে গোলমাল ঘটিয়াছে, স্থানে স্থানে ইংরেজি ধরণে পদবিন্যাস হইয়াছে।

শিক্ষার সহিত আনন্দ পাইতে উৎসুক পাঠকসমাজে ইহার আদর হইবে।

হজরত মহাম্মদ—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক মহম্মদীয় লাইব্রেরী, শান্তিপুর। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডঃ ক্রাঃ ১৬অং ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

হজরত মহম্মদের জন্মকাহিনী, বাল্যলীলা, পয়গম্বরী প্রাপ্তি মাহাত্ম্য, ইসলাম প্রচার প্রভৃতি বিষয় পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানির রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে।

মহর্ষি মনসুর—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডঃ ফুঃ ১৬অং ১১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ আনা।

মহর্ষি মনসুর বোগ্দাদের এক ধার্ম্মিক সুফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধানার দ্বারা বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং ইসলামের নূতন প্রবর্ত্তনার গোঁড়ামির যুগে তিনি প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, আনাল হক, সোঽহং বা আমিই ঈশ্বর, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য এই উক্তি প্রচার করেন। ইসলাম-সমাজ ইহার মধ্যে মহর্ষির বিশেষ জ্ঞানবত্তা ও স্বাধীনচিন্তার পরিচয়ের বদলে তাঁহার অজ্ঞানতা ও ধর্ম্মবিদ্বেষের পরিচয় পাইল এবং সেইজন্য এই জ্ঞানী মহাত্মাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিয়া বধ করিল। বধকালেও মহর্ষি 'আনাল হক' বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া সমাজের মধ্যেও সময়ে সময়ে এইরূপ স্বাধীন-চিন্তাক্ষম জ্ঞানীর উদ্ভব হইয়া কলের পুতুলের ন্যায় স্থায়ী-নিয়মপালন-তৎপর গতানুগতিক জনসমাজকে নিজে ভাবিয়া কাজ করিতে বিশ্বাস অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহারা কোনো দেশ বা কালে আবদ্ধ নহেন; ইঁহাদের চরিতকথা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয়।

লেখক বিশুদ্ধ বাংলায় এই মহর্ষির উপদেশ, ধর্ম্মমত, শিক্ষা প্রভৃতির সহিত তাঁহার জীবনকথা বর্ণনা করিয়াছেন: তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।

শাহনামা (প্রথম খণ্ড—)

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশ চন্দ্র নাথ, ২৯ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।৵০, বাঁধা ১॥০ টাকা।

পারস্যের মহাকবি ফিরদৌসী তুসী কর্ত্তৃক ৬০ হাজার শ্লোকে রচিত জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্যের নাম শাহনামা বা রাজাদের ইতিহাস। ফিরদৌসী পারস্যের তুস নগরের অধিবাসী ছিলেন; গজনির সুলতান ভারতলুণ্ঠনকারী মহমুদের সভায় তিনি নিজের কবিত্বের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহমুদ স্বীকার করেন যে কবির রচিত এক একটি শ্লোকের জন্য এক একটি দিনার (সোনার মোহর) তাঁহাকে দিবেন। ফিরদৌসী প্রচুর অর্থ লাভের আশায় প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের আদ্যোপান্ত ইতিহাস ষাট হাজার শ্লোকে গ্রথিত করেন। প্রচুর অর্থহানি হইবে মনে করিয়া সুলতান মহমুদ দিনারের বদলে তাঁহাকে ষাট হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দান করেন। ভগ্নমনোরথ কবি রাজসভা ত্যাগ করিয়া নিজের বিরাট কাব্যের মধ্যে মহমুদের নিন্দাসূচক শ্লোক যোগ করিয়া দিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে একদিন শাহনামার কয়েকটি শ্লোক শুনিয়া কবিত্বে মুগ্ধ সুলতান জিজ্ঞাসা করেন যে এ কাহার রচনা। ফিরদৌসীর শাহনামার শ্লোক এমন সুন্দর জানিতে পারিয়া তিনি ৬০ হাজার দিনার উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া কবির গৃহে প্রেরণ করিলেন। উষ্ট্রবাহিনী যখন তুস নগরের পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিল তখন দারিদ্র্যদুঃখমুক্ত কবির শব পশ্চিম দ্বার দিয়া সমাধিক্ষেত্রে নীত হইতেছিল। কবির দুহিতা মিথ্যাবাদী সুলতানের দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সেই অর্থে সুলতানের হুকুমে তুস নগরে মহাকবি ফিরদৌসীর স্মরণার্থ একটি সরাই ও একটি নদীর বাঁধ নির্ম্মিত হইল।

সুলতানেরও মনোহরণে সক্ষম ষাট হাজার দিনার মূল্যের এই মহাকাব্য পারস্যের সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত রত্ন স্বরূপ। ইহার ভাষা সুমিষ্ট, সুমার্জ্জিত এবং প্রস্রবণের ন্যায় অবাধ ও গতিশীল। এই গ্রন্থ হইতে পারস্যের নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ, আচার ব্যবহার, সমাজ সভ্যতা, সমরকৌশল, শাসনপ্রণালী, বিদ্যা বদান্যতা, এবং তাৎকালিক লোকচরিত্র, ক্রীড়াকৌতুক, শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়; ইহাতে সেকালের সুখ দুঃখ, প্রণয় আনন্দ, বীরত্ব নৃশংসতা প্রভৃতির উজ্জ্বল চিত্রমালা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এজন্য ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকেরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ।

এই শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান গ্রন্থখানি অনুবাদক গদ্যে অনুবাদ করিয়া ভালোই করিয়াছেন; স্থানে স্থানে পদ্য উচ্ছ্বাস যাহা আছে তাহা এমন অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে যে সেরূপ না থাকিলেই ভালো হইত। এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে একখানি জগৎবিখ্যাত কাব্যের পরিচয় লাভ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে, এজন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ; তিনি যে বিরাট কর্ম্মে হাত দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তোলা সহজ হইবে পাঠক-সাধারণের সাহায্য পাইলে। আশা করি যে পাঠকসাধারণ প্রাচীন পারস্যের কৌতুককর কাহিনী জানিবার জন্য পুস্তক ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে অনুবাদকার্য্যে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবেন। আগে এক কাল ছিল যখন রাজারা লেখকদের উৎসাহদাতা ছিলেন; এখন সে ভার জনসাধারণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

পুস্তকখানি বিশুদ্ধ বাংলায় অনুবাদিত হইতেছে বটে কিন্তু যেমন করিয়া লিখিলে ভাষা বেশ সরস সুন্দর হয় তেমনটি হইতেছে না; ভাষা বড় আড়ষ্ট ও কর্কশ হইতেছে।

ফিরদৌসী-চরিত—

শ্রীমোজাম্মেল হক প্রণীত। মূল্য আট আনা।

শাহনামা কাব্য রচয়িতা ফিরদৌসী তুসীর বিচিত্র কৌতুকময় ঘটনাপূর্ণ জীবনচরিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কবির বিষয়ে অনেক কৌতুককর সংবাদ জানিতে পারা যাইবে। পুস্তিকাখানি গদ্যে পদ্যে লিখিত; ভাষা ও রচনা-প্রণালী উত্তম। যাঁহারা এই জীবন-চরিত পড়িবেন তাঁহাদের এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য শাহনামা পাঠ করা উচিত এবং যাঁহারা শাহনামা পড়িবেন তাঁহারা অবশ্য শাহনামার কবির কাহিনী পড়িবেন। গ্রন্থকার প্রথমেই লিখিয়াছেন যে 'প্রাচীন ভাষা পারসী অতি মধুর, মনোহর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষা।' কিন্তু ভাষাতত্ত্বজ্ঞ কোনো ব্যক্তি পারসী ভাষাকে 'সর্ব্বাঙ্গসুন্দর' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। লালিত্য ও মাধুর্য্য তাহার যথেষ্ট, কিন্তু তবু তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; লিখিত অক্ষরে স্বরচিহ্নের অভাব, একই বর্ণ যোজনায় বিবিধ প্রকার উচ্চারণ প্রভৃতি অনেক দোষ এ ভাষার আছে। দ্বিতীয় প্যারায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 'এই ভাষায় যত মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে অন্য কোনও ভাষায় তাদৃশ নাই।' ইহাও অত্যুক্তি। গ্রন্থকারের এইরূপ অত্যুক্তি ও উচ্ছ্বাস অন্যথা-সুলিখিত পুস্তকগুলির অনেকটা গৌরবহানি করিয়াছে।

আর একটা কথা। মুসলমানী রীতিতে চিঠি লিখিতে বাঙালী মুসলমান লেখকেরা এমন পারসী আরবী শব্দ ব্যবহার করেন যে তাহা সাধারণ বাঙালীর অবোধ্য হইয়া উঠে, যাঁহাকে চিঠি লেখা হয় তিনিও বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। আবার, পারস্য আরবের কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া লেখকেরা সযত্নপ্রযত্নে আরবী পারসী শব্দের সংস্রব এমন বাঁচাইয়া চলেন যে তাহার আর স্থানীয় চিহ্ন (local colouring) কিছুমাত্র থাকে না; সে সব ঘটনা ভাট-পাড়ার টোলে ঘটিয়াছে বলিয়াই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, বাহিরের পরিচয় থাকে শুধু নামে। পারসী আরবী ঘটনা বর্ণনার সময় বাংলা ভাষায় সমধিক প্রচলিত বহুলোকবোধ্য পারসী আরবী শব্দ ব্যবহার করিয়া সেই দেশের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া বর্ণনাটিকে সরস ও রোমান্টিক করিয়া তুলিতে পারাতেই মুন্সিয়ানা, সেইখানেই আর্ট। এ বিষয়ে হিন্দু লেখকেরাই যৎকিঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, অথচ ঐসব দেশের ভাষা, ইতিহাস, রীতিনীতি প্রভৃতি জানার সুবিধা মুসলমান লেখকেরই বেশি, কারণ সেদেশী ধর্ম্মের সহিত ইঁহাদের যোগ রহিয়াছে এবং ইসলাম ধর্ম্ম কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম নয়, তাহা বহুপরিমাণে সামাজিকও বটে। মুসলমান লেখক বাংলা লিখিতে গিয়াই তাহাকে এমন অতিমাত্রায় সংস্কৃততুল্য করিয়া

াহার বিদেশী ভাব একেবারে দম আটকাইয়া মারা রণ বোধহয় যে মুসলমান লেখকেরা সতর্ক হইয়া প্রকৃতি লক্ষ্য করেন না, এবং সেই জন্য কোন্ বিদেশী লে এবং কোন্‌টা চলে না তাহা নির্ণয় করিতে পারেন রবী শব্দ ব্যবহারের দুর্নাম অর্জন অপেক্ষা তাঁহারা সংস্কৃতনবিশ হওয়াটাই নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু এখন র মধ্যে এত সুলেখক হইয়াছেন যে তাঁহাদের নিকট হইতে বন রসমধুর আর্টিষ্টিক রচনা পাইব আশা করিতে পারি।

ত্র আরব জাতির ইতিহ:স—

থ রেওয়াজ-উদ্দিন আহম্মদ প্রণীত। ৩৮৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৸০। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকারের নিকট, দলগ্রাম, তুষভাণ্ডার পোষ্টাপিস, জেলা রংপুর।

এখানি The Right Honourable শ্রীযুক্ত সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের A Short History of the Saracens নামক প্রসিদ্ধ ও সুন্দর পুস্তকের অনুবাদ। ইহার প্রথম খণ্ডের পরিচয় আমরা প্রবাসীতে দিয়াছি। এখানি দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে বোগদাদের আব্বাস বংশীয় খলিফাদের অদ্ভুত কীর্ত্তিকথা, উপন্যাসের নায়ক-সদৃশ প্রসিদ্ধ খলিফা হারুন-অল-রশিদের কাহিনী, খলিফা রাজ্যের বিস্তার ও য়ুরোপ বিজয়, তাৎকালিক পারস্য সাহিত্যের অবস্থা, ক্রুসেড যুদ্ধের কৌতুকাবহ কাহিনী প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। চির-কৌতূহলপূর্ণ আরবের এই ইতিহাসখানি সর্ব্ব প্রকারের পাঠকেরই মনোরঞ্জক। লেখকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী উত্তম। অনেকগুলি চিত্র থাকাতে বিষয় বুঝিবার বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। এইরূপ সদ্‌গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইয়া ক্রমে বঙ্গসাহিত্য ঐশ্বর্য্যশালী ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

তমলুকের ইতিহাস—

শ্রীসেবানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস, ৩৮ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটালি, কলিকাতা। ১৫৮ + ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ইতিহাস বাংলার প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস। গ্রন্থকার তাহার পরিচয় দিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন পুরাকালে কিরূপ গৌরবান্বিত ছিল তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত না থাকিলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণরাশি সংগ্রহ করিলেও তদ্দারা * * * হতভাগ্য বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের কিছু-না-কিছু উপকার করিতে পারিবে। * * * যে বাঙ্গালীর রণপাণ্ডিত্যে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত যাঁহাদের করতলগত ছিল, সেই বাঙ্গলাদেশের দক্ষিণাংশ ভূভাগ লইয়া তাম্রলিপ্ত রাজ্য—এই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতের দক্ষিণ উপকূল, সিংহল, যাবা, সুমাত্রা, প্রভৃতি ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন, আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার ও আর্য্যজাতির বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে। * * * প্রাচীন বঙ্গের তাম্র-লিপ্ত জাতি দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল—বর্ত্তমান মান্দ্রাজের তামিল জাতি তাম্রলিপ্ত জাতি হইতে উদ্ভূত—তাম্রলিপ্ত হইতেই বাঙ্গালীরা দক্ষিণ ভারতে ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। * * * বাঙ্গালার সম্রাট মহীপালের অত্যাচার নিবারণার্থ প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান বাঙ্গলায় কেন, ভারতের, ইতিহাসে অদ্ভুত ঘটনা। এইরূপ প্রজাশক্তির অভ্যুত্থানের নেতৃগণের—বাঙ্গালার প্রাচীন নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ নর্ম্মদা- ও সরযূ-তট হইতে বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ, সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত, দাক্ষিণাত্য ও ভারতসাগরীয় দ্বীপমালা, এমন কি তাৎকালিক প্রাচ্যজগৎ, চমকিত করিয়াছিল,—পাশ্চাত্য জগৎও বিস্মিত হইয়াছিল। * * * অন্যান্য রাজ্যে যেমন বারবার রাজবংশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাম্রলিপ্ত রাজ্যে সেরূপ ঘটে নাই, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় এখানে তেমন যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটে নাই, শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

সেই প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাস বহু গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া গুছাইয়া লেখা হইয়াছে। পুস্তক-খানির অধ্যায় বিভাগ হইতে ইহার আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে—উপক্রমণিকা ; (১) ভৌগোলিক চিত্র ; (২) মহাভারতীয় যুগ ; (৩) ঐতিহাসিক কাল, বাঙ্গালীর স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব ; (৪) বংশলতা ; (৫) স্বাধীনতার কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সামাজিক দুর্নীতি, বাঙ্গালী-প্রতাপ ইত্যাদি ; (৬) ভূঁইয়া উপাধির ইতিহাস ; (৭) স্বতন্ত্রতার অবসান, তমলুক রাজ-পরিবারে গৃহবিবাদ, তমলুক-রাজ্যের পতন ; (৮) পরতন্ত্রতার কাল—মোগলশাসন ১৬৫৪-১৭৬৭ খৃঃ ; (৯) ইংরাজ-শাসনকাল, বাঙ্গালী সৈন্যের সাহস ও বীরত্ব, ইংরাজ কোম্পানীর পদাতি সৈন্য সহ যুদ্ধ, মাহিষ্য সৈন্যদল ; (১০) কীর্ত্তি-স্মৃতি ; (১১) সামাজিক চিত্র, মাহিষ্য জাতির প্রাচীন প্রভুত্ব, বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু সমাজ ইত্যাদি ; উপসংহার ; পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্টে তমলুক-রাজবংশের বংশপত্র ; রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিচয়, সামরিক কর্ম্মচারী, সামন্তরাজ ও উচ্চপদস্থ মন্ত্রীবর্গের ও কতিপয় বিশিষ্ট উপাধি ; সামন্তচক্র ; ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন ; তাম্রলিপ্ত জাতিই মান্দ্রাজে তামিল জাতি ; প্রভৃতি বিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন রাষ্ট্র ও সামরিক ব্যবস্থা এবং উপাধি প্রভৃতির অর্থ অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। উপাধিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গ্রন্থপ্রারম্ভে একটি প্রমাণ-পঞ্জী (Bibliography) দেওয়াতে উপাদান সংগ্রহের মূলের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতে গ্রন্থখানির উপাদেয়তা ও প্রামাণ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।

হৃদয় দিয়া, দেশের কীর্ত্তিকাহিনী প্রচারের আনন্দের সহিত, দেশহিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। বাঙালী মাত্রেরই বাঙালীর এই অতীত বীরত্ব-ও কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশের ইতিহাসই জাতীয় জীবন ভাঙিয়া গড়ে। অতীত ইতিহাসের গৌরবমণ্ডিত কার্য্যকলাপ ভবিষ্যৎ কর্ম্মের উদ্বোধক হইয়া জাতিকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রাখে। দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই দেশের ইতিহাস সর্ব্বদা অনুশীলন করিয়া দেশহিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। ইতিহাস দেশসেবার পন্থা নির্দ্দেশ করে।

বিশিষ্ট উপাধি।

বাহুবলীন্দ্র—বাহুবলে ইন্দ্রের সমকক্ষ। ময়নারাজবংশের উপাধি।

গজেন্দ্র মহাপাত্র—হস্তীর ন্যায় বলশালী প্রধান মন্ত্রী। তুর্কা-রাজবংশের উপাধি।

গজপতি—উড়িষ্যাধিপতির উপাধি।

রণঝাঁপ—যুদ্ধে অকুতোভয়। সুজামুঠা-রাজের উপাধি।

রণসিংহ।

সামন্ত—প্রাদেশিক রাজা।

সেনাপতি।
মহাপাত্র।
গড়নায়ক—দুর্গাধিপতি।
মহারথ—প্রধান যোদ্ধা।
নায়ক—সহকারী নেতা।
ভুপতি,ভূমিপ,ভৌমিক, ভূপাল,ভূঞা—সীমান্ত দেশের অধিপতি।
মহানায়ক—প্রধান সহকারী।
জানা—রাজপুত্র।
হাজরা—সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক।
শতরা—শত সৈন্যের অধিনায়ক।
দলই—গ্রাম্য সৈন্যের পরিচালক।
আধক—অর্দ্ধবাহিনীর চালক।
চৌধুরী—সামন্ত রাজা।
মৌল বলাধ্যক্ষ—রাজার নিজসৈন্য-চালক।
দৈশিক—গ্রাম্য সৈন্য।
দলপতি—গ্রাম্য সৈন্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ সৈন্য ও গ্রামবলসংঘসূচক উপাধি।

সিংহ, বাঘ, হাতী, মহিষ, গিরি, তুঙ্গ, কপাট, কাজলী, কোটাল, কাণ্ডী, মাণ্ডী, খাঁড়া, দণ্ডপাট, পাত্র, পট্টনায়ক, বীরা, সবরী, ধাবক, সেনী, সিংলী, পাণ্ডা, মল্ল, বাহুবল, রাহুত, হালদার, লস্কর, মৌলিক, সর্দ্দার, স্তম্ভভেদী, দৌবারিক; মঙ্গরাজ, অশ্বপতি, নরপতি, শতরা (সাঁতরা ?), হাজরা, দলই, পতাকী, সান্তরান।

নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপাধি।

ধর, কর, মাইতি, বর, দিণ্ডা, করণ, কাপ, কুইতি, প্রামাণিক, প্রধান, মণ্ডল, বৈতালিক, মল্লিক, শস্যমল্ল (শাঁসমল ?), শরণ, মজুমদার, সমাদ্দার, দেশমুখ্য, সরকার, পুরকায়স্থ, নিয়োগী, তালুকদার, জোয়ারদার, শিকদার, টীকাদার, বিশ্বাস, সাধুখাঁ, খাঁ, বক্সী, মহান্ত, মানা, বৈদ্য, বারীক, সাপুই, কয়াল।

কর্ম্মচারীগণের পদ।

বরুয়া, মুখ্য, মণ্ডল, আমিন, ভদ্র, ব্যবহর্ত্তা, দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, চৌকীদার, সর্দ্দার, সীমনদার বা দিগওয়ার, নগদী, চৌধুরী (কর-সংগ্রাহক), ভাণ্ডারী, কয়াল (শস্যসংগ্রাহক ও রক্ষক), কাজি, মহাজন, গণক, আচার্য্য, পরামাণিক, ইত্যাদি।

সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা—

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বঙ্গবাসী কলেজ-স্কুল বুকষ্টল। ২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা।

এই পুস্তিকার বিষয়টি প্রবন্ধাকারে যখন ঢাকা-রিভিউ (সম্মিলন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন আমরা প্রবাসীর কষ্টিপাথরে তাহার পরিচয় দিয়াছিলাম। এক্ষণে পুনরায় তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অধ্যাপক ললিত বাবু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার সহিত বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বানান সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা বাংলা সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখা উচিত। এই-সকল আলোচনা পাঠ করিলে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও ধাত বুঝিয়া ঠিক পথে চলিবার বিশেষ সাহায্য ও সুবিধা হইবে; আমরা এইগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি এবং আমাদের অনেক মতের পোষকতা দেখিয়া বল পাইয়াছি, অনেক মতের বিরুদ্ধ মত দেখিয়া চিন্তা করিয়া ঔচিত্য নির্দ্ধারণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি। এই পুস্তিকায় [illegible]হক সাধুভাষা ও [illegible]হক চলিতভাষা[illegible] বিপক্ষ যুক্তি ধীর ভাবে প্রয়োগ করিয়া উভয় সমালোচনা করিয়া সুবিধা অসুবিধা দেখাইয়া ব্যবহারের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিয়া [illegible] শেষ মীমাংসা করিয়াছেন এই যে 'আধা খিচুড়ী আধা [illegible] উপায় নাই।' এই নিষ্পত্তি আমরাও সর্ব্বান্ত[illegible] করি।

বঙ্গসাহিত্যাদর্শ—

শ্রীরমাপতি কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত। মজিলপুর [illegible] গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ডিঃ ৮ অং ১০০ [illegible] আট আনা।

এই পুস্তকে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও অলঙ্কার আলো[illegible] বাংলাভাষার রচনা-প্রণালী-ভেদ, বাক্য শব্দ প্রভৃ[illegible] এবং আলঙ্কারিক দোষগুণ উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শন [illegible] এই গ্রন্থ ছাত্রদিগের এবং বঙ্গভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুর [illegible] লাগিবে।

পাগলের প্রলাপ—

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ডিঃ ১২অং ৪৫০ পৃষ্ঠ[illegible] গুরুদাস লাইব্রেরী। মূল্য ছয় আনা।

এই পুস্তিকায় বাংলাভাষার বর্ণমালারহস্য [illegible] মধ্য দিয়া আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপ[illegible] —"বহুদিন পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়া যে-স[illegible] অনুভব করিয়াছি, তাহার সমালোচনা স্বরূপ এই লিখিত হইয়াছে।" গ্রন্থকারের মতে "ইকার, উ[illegible] স, ঠিক করে" না লিখিলেও চলে, "আমি [illegible] হলেই হল।" এই কথায় দুই পক্ষ দাঁড়াইয়াছে[illegible] সংস্কৃত-নির্দ্দিষ্ট (conventional) বানানের পক্ষপা[illegible] পক্ষ উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের পক্ষপাতী। সংস্ক[illegible] বলেন 'বানান ভুল হলে কখনও কখনও অর্থ বুঝ[illegible] না, সেই জন্যই শুদ্ধ করে লেখা আবশ্যক।' পাতীর পাল্টা জবাব—'আমি যখন মুখে কথা [illegible] বানান থাকে না, তখন অর্থবোধ হয় কেমন ক'[illegible] দুইটা ই, দুইটা উ, ঋ, ৯, দুইটা ব, দুইটা জ, দু[illegible] শ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে কতকগুলি একেবারে অনাবশ্যক, কতকগুলির এক[illegible] চলে, এবং কতকগুলি নূতন বর্ণের বরং নিত[illegible] আছে। একবর্ণেরই 'যখন স্বভাবতঃ উচ্চারণ[illegible] তখন আকৃতি-পরিবর্ত্তন করবার আবশ্যকতা দেখা[illegible] 'অক্ষরগুলি শব্দ উচ্চারণের একটা স্মারক চিহ্ন যে একেবারে নির্দ্দিষ্ট-ধ্বনিসম্পন্ন তাও নহে; উচ্চারণ-ব্যতিক্রমেই অক্ষর বৃদ্ধি করে নিতে [illegible] অক্ষর-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক।' [illegible] সময় লোকে অক্ষরগুলির প্রতি যতটা লক্ষ্য করে প্রতি তদপেক্ষা বেশী লক্ষ্য করে' থাকে। ছাপা[illegible] একটি প্রবন্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারি দে[illegible] বাঙ্গালীকে পাঠ করতে দেও, তবেই বুঝতে পা[illegible] এবং অক্ষর কত বিভিন্ন। এক লেখাই উচ্চারণগ[illegible] ধ্বনিতে পাঠ হবে। * * * একারণেই বলছি

করে কাজ কি, ভেঙ্গে চুরে সরল করে নও।' অনেকের মতে 'বর্ণসংখ্যা কমালে বাঙ্গলা ভাষার মূল ছিন্ন হয়ে যাবে। বর্ণমালা এরূপ হওয়া উচিত যে, যে-কোন ভাষা হ'ক না কেন ঐ বর্ণমালাতে তা অবিকল লেখা যেতে পারে।' বাংলা বর্ণমালা সংক্ষিপ্ত করার বিপক্ষে এই মতের বেশী মূল্য নাই; রোমান অক্ষরে যদি সংস্কৃত ভাষা লেখা যেতে পারে, তবে 'বাঙ্গলা অক্ষরের কয়েকটি মাত্র যোড়া যোড়া বর্ণস্থানে এক একটি থাকুল বলেই যে সংস্কৃত লেখা আটক হবে তা আমি মনে করি না। * * * লেখা পড়ে বুঝতে পারলেই হল। ভাষা শিক্ষাই যে জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তা নহে। ভাষা বিদ্যা শিখবার দ্বার মাত্র। বর্ণমালাগুলি আবার ভাষা শিক্ষার দ্বার। সেই দ্বারকে নানাপ্রকার শৃঙ্খল-যুক্ত ক'রে অগম্য করা আমার মতে যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব বর্ণমালার সরলতা সম্পাদন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।" বিশেষতঃ বাংলা লিপিযন্ত্র (টাইপরাইটার) তৈরির পক্ষে ত এই সরলতা সম্পাদন একান্ত আবশ্যক।

প্রথম পরিচ্ছেদে এইরূপ বিবিধ সুযুক্তি ও স্বাধীন-চিন্তার পরিচয় দিয়া বর্ণমালার উচ্চারণ-প্রকৃতি বিশেষ নিপুণ ভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও এইরূপ সুযুক্তি ও পর্য্যবেক্ষণ সাহায্যে বর্ণের ব্যবহার ও সংস্থান সমালোচিত হইয়াছে। 'মূল বর্ণ, বিকৃত বর্ণ ও যুক্তবর্ণ এই তিন প্রকার বর্ণের দ্বারা সমস্ত লেখাপড়া হয়ে থাকে।' কিন্তু বিকৃত বর্ণ ও যুক্তবর্ণ কোনোটা বা মাথায় চড়ে, কোনোটা পায়ে ধরে, কোনোটা বা অন্ত্যবর্ণ হয়েও আগে বসে, কোনোটা বা আগে পিছে জড়িয়ে সেঁটে ধরে; কিন্তু কেন যে তেমন হয় তাহার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বাঙ্গলা বর্ণমালা উচ্চারণ হিসাবে সুশৃঙ্খল-বিন্যস্ত বলে যেমন পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ব্যবহারের বিশৃঙ্খলতায় সেইরূপ নিকৃষ্ট ও কঠিন হয়েছে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুক্তাক্ষরের আকার, সংস্থান, উচ্চারণ-বৈষম্য প্রভৃতি সমালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যুক্তাক্ষর তুলিয়া দিয়া অসংযুক্ত বর্ণ পরম্পরায় লেখার পক্ষপাতী। "ভাষার রীতি বজায় রাখ্‌বার জন্য যখন অকারান্ত বর্ণগুলি হলন্ত উচ্চারিত হয়, তখন প্রকৃত হলন্ত বর্ণগুলিকে হলন্ত চিহ্ন দেখতে না পেলেই অমনি অকারান্ত করে পাঠ করবে, ভাষার দিকে লক্ষ্য করবে না, এ অতি অসম্ভব কথা। * * * হাতের লেখার অসুবিধা হবে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। তবে আমাদের এক প্রকার অভ্যাস দৃঢ় হয়ে গেছে বলে প্রথমপ্রথম লেখবার ও পড়বার পক্ষে অসুবিধা বোধ হতে পারে। * * * কিছুদিন অভ্যাস হলেই তা সেরে যাবে। যারা প্রথম হ'তে অভিনব প্রণালী অভ্যাস করবে তাদের কোন অসুবিধাই থাকবে না। * * * যারা ইংরাজী জানে তাদিগে এ বুঝান অতি সহজ; কারণ তাতে যুক্তাক্ষর নাই, অথচ তিন চারি বা তদধিক ব্যঞ্জনবর্ণ সর্ব্বদাই একটা স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত হয়ে থাকে।" এই সমস্ত সংস্কার হইলে বাংলা ছাপাখানা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে, বাংলা টাইপরাইটার প্রস্তুত হইলে বাঙ্গালীর ব্যবসাবাণিজ্য চালাইবার উপায় সহজ হইবে।

সমস্ত বইখানিতে নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ, ভাষার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়, সুযুক্তি, স্বাধীনচিন্তা এবং সমাজ-জীবনের বিবিধ বিভাগে সংস্কার দ্বারা উন্নতির চেষ্টা বর্ত্তমান। অথচ এই বইখানি একজন স্কুল-পণ্ডিতের লেখা। এই বইখানি সকল সাহিত্য-সেবীরই মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বিশেষভাবে গ্রন্থকারের মতগুলি আলোচনা করা উচিত। এই পুস্তকের নাম 'পাগলের প্রলাপ' গ্রন্থকারের বিনয়জন্য; আমাদের মতে ইহার নাম 'পণ্ডিতের প্রস্তাব' রাখা যাইতে পারে।

মুদ্রারাক্ষস।
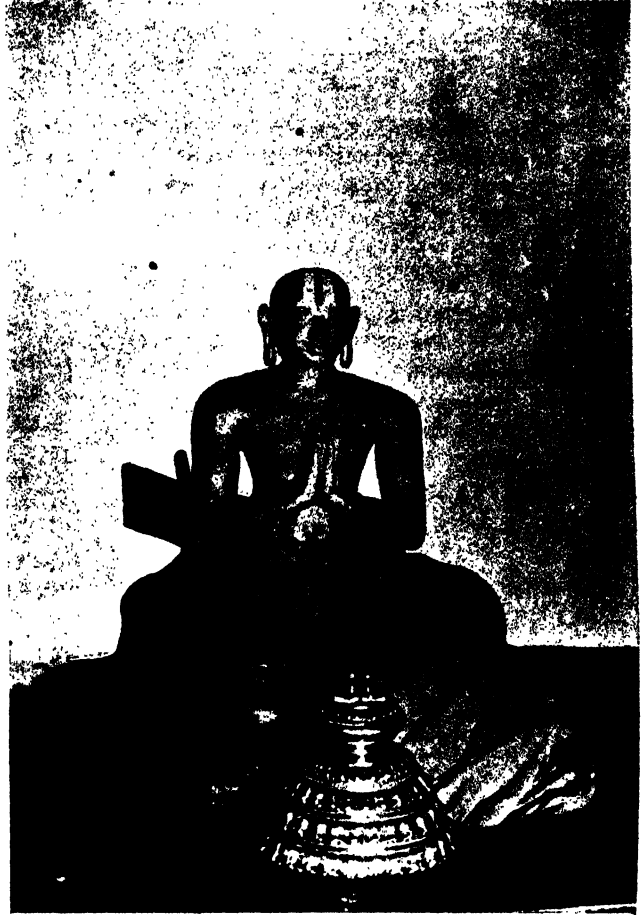
শ্রীরামানুজাচার্য্য।

(আচার্য্যের জীবদ্দশায় প্রস্তুত প্রতিমূর্ত্তি হইতে, প্রকাশকের অনুমতিক্রমে)।

শ্রীরামানুজ-চরিত —

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে ব্রহ্মচারী কপিল কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১২।১৩ নং গোপালচন্দ্র নিওগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা)। পৃঃ ২৯৫; মূল্য ২৲।

ভক্ত্যাচার্য্য মহানুভব শ্রীরামানুজ স্বামিপাদের জীবনঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের জনসাধারণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল।

গ্রন্থকর্তা শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীই প্রথম আচার্য্য রামানুজের জন্মভূমি মান্দ্রাজ অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস ও মূল গ্রন্থ-সকলের সহায়ে ঐ আচার্য্যের অপূর্ব্ব জীবন মত ও কার্য্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত উহা উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত করিতে থাকেন। ইহা প্রকাশিত হইতে ১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাস হইতে ১৩১৩ সালের কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর কাল লাগিয়াছিল। উদ্বোধনের এই সমুদয় প্রবন্ধই এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে রামানুজের জীবনচরিত। বিষয়টি এই ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) অবতরণ-হেতু, (২) রামানুজের জন্ম, (৩) যাদবপ্রকাশ, (৪) ব্যাধ দম্পতি, (৫) বন্ধুসমাগম, (৬) রাজকুমারী, (৭ শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ, (৮) যামুনাচার্য্য-বিরচিত স্তোত্ররত্ন (অনুবাদ সহ), (৯) আলওয়ান্দার, (১০) দেহদর্শন, (১১) দীক্ষা, (১২) সন্ন্যাস, (১৩) যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব স্বীকার, (১৪) রামানুজ-ভ্রাতা গোবিন্দের বৈষ্ণব মত গ্রহণ, (১৫) গোষ্ঠিপূর্ণ, (১৬) শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান এবং গুরুগণের নিকট স্বয়ং শিক্ষা গ্রহণ, (১৭) শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর প্রধানার্চ্চক, (১৮) যজ্ঞমূর্ত্তি, (১৯) যজ্ঞেশ ও কার্পাসারাম, (২০) শ্রীশৈলদর্শন ও গোবিন্দ-সমাগম, (২১) গোবিন্দের সন্ন্যাস, (২২) শ্রীভাষ্য রচনা, (২৩) দিগ্বিজয়, (২৪) কুরেশ, (২৫) ধনুর্দাস, (২৬) কৃমিকণ্ঠ, ২৭) বিষ্ণুবর্দ্ধন, (২৮) যাদবাদ্রিপতি, (২৯) কুরেশ-প্রসঙ্গ, (৩০) রামানুজ শিষ্যগণের অলৌকিক গুণরাশি, (৩১) প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠা ও তিরোভাব।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ অত্যন্ত উপাদেয় হইবে। নব্য সম্প্রদায় অলৌকিক ঘটনা সমুদায়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না সত্য কিন্তু এ সমুদায় বাদ দিলেও গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যাইবে। প্রাচীন ও নব্য উভয় সম্প্রদায়ই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থে দুই খানি প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে; একখানি গ্রন্থকার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের, অপরখানি শ্রীরামানুজাচার্য্যের; এই মূর্ত্তি রামানুজের জীবিতাবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে উদ্বোধন-সম্পাদক গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও দিয়াছেন।

গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

শ্রাদ্ধিকী—

(শ্রাদ্ধ-বাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত)। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি,এ. প্রণীত (হাজারীবাগ)। প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন বি,এ।

এই গ্রন্থে স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন ও তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেন এবং স্বর্গীয় কেদারনাথ রায় ও তাঁহার কন্যা স্বর্গীয়া সরযূবালা ঘোষের জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ ও কেদারনাথের জীবন, সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনের প্রথম অবস্থায় ইঁহাদিগকে দারিদ্র্যের কশাঘাতে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতে হইয়াছিল। "দারিদ্র্য দোষ সমুদয় গুণ নষ্ট করে"—ইহা সব সময়ে সত্য নহে—ইঁহাদিগের জীবন এই উক্তির জীবন্ত প্রতিবাদ। ইঁহারা উভয়েই স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন—চণ্ডীচরণের মত পুরুষ সংসারে বিরল। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার—সর্ব্ব দিকেই ইঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল; গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইয়াও রাজনীতি বিষয়ে কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত ও ভীত হইতেন না। যাঁহারা চণ্ডীবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন তিনি কি প্রকার নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না—এই পুরুষসিংহের বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশ করা আবশ্যক।

সরযূবালার জীবন কি প্রকার নিঃস্বার্থ ও মধুময় ছিল, পাঠকগণ এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতেই তাহার পরিচয় পাইবেন।

কেদারনাথের জীবনও অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত।

গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষায় আমরাও বলিতেছি:—"জীবনের আদর্শে জীবন গড়িয়া উঠে। উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্য চরিত্র ভবিষ্যদ্বংশের নিজস্ব সম্পত্তি হউক, তাঁহাদের মহত্ত্বের ভিত্তির উপর ইহাদের সুন্দর সুদৃঢ় জীবন-সৌধ উত্থিত হউক, কেবল ইহাদের মধ্যে নহে, কেবল দুই একটী পরিবারে নহে, বহু পরিবারে, বহুদূরে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই-সকল চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তীর্ণ হউক, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।"

উদ্ভিদ বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রণালী—

প্রথমভাগ—উদ্ভিদের উপকারিতা। শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীগিরিজামোহন মল্লিক প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৩৪; মূল্য ৵০।

এই পুস্তিকাতে ৪৫টা গাছের বিষয়ে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষকগণ ইহার সাহায্যে নয় ও দশ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

ভূগোল-শিক্ষা-প্রণালী—

প্রথম ভাগ—মালদহ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (ওহিও বিদ্যালয়, আমেরিকা) কর্ত্তৃক প্রণীত। পৃঃ ৩১; মূল্য ৵০ আনা।

এই পুস্তিকাও মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি হইতে প্রকাশিত।

মালদহ জেলার আট দশ বৎসর বয়স্ক বালকের শিক্ষণীয় বিষয় এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। 'নব প্রণালী' অনুসারে ইহা লিখিত। শিক্ষকগণ এই পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিবেন।

জৈন ধর্ম্ম—

(১) সার্ব্বধর্ম্ম। পৃঃ ৪৮। স্যাদ্বাদ-বারিধি বাদগজ-কেশরী পণ্ডিত শ্রীগোপালদাস বরৈয়া (মোরেনা) কৃত 'সার্ব্বধর্ম্ম' নামক হিন্দিপুস্তক হইতে অনুবাদিত।

(২) জৈন তত্ত্বজ্ঞান এবং চরিত্র। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক The Metaphysics and Ethics of the Jainas by H. Jacobi হইতে অনুবাদিত। পৃঃ ১২।

(৩) জিনেন্দ্র-মত-দর্পণ বা জৈন ধর্ম্মের ঐতিহাসিকতা। শ্রীযুক্ত বানারসীদাস, এম, এ, এল এল, বি প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ। পৃঃ১৬।

(৪) সাময়িক পাঠ স্তোত্র। ব্রহ্মচারী শ্রীশীতলপ্রসাদ জৈন সম্পাদিত শ্রীঅমিতগতি সূরি বিরচিত সংস্কৃত জৈন পাঠের ভাবানুবাদ। পৃঃ ১৬।

কাশীতে "বঙ্গীয় সার্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিষৎ" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য জৈন ধর্ম্মের যাবতীয় পুস্তক

বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করা। পূর্ব্বোক্ত চারিখানা পুস্তিকা উক্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত পাঠ করিয়া পাঠকগণ জৈন ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। সমিতি বঙ্গ সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সমুদয় পুস্তকই বিনামূল্যে বিতরিত। প্রাপ্তির স্থল :—

"কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী—বঙ্গীয় সার্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিষৎ, কাশী।" শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

সার্ব্বধর্ম্ম—

বঙ্গীয় সার্ব্বধর্ম্মপরিষৎ পুস্তকমালা ১, স্যাদাদবারিধি বাদগজকেশরী পণ্ডিত শ্রীগোপালদাস বরৈয়া (মোরেনা) কৃত 'সার্ব্বধর্ম্ম' নামক হিন্দী পুস্তক হইতে অনুবাদিত। প্রকাশক কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন, মন্ত্রী—সার্ব্বধর্ম্মপরিষৎ, কাশী; মূল্য অহিংসা। আকার ডবলক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠার X+৪৮+ঘ।

বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় ধর্ম্মই একই সময়ে পাশাপাশি অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে হইলে ইহাদের কোনটিকেই পরিত্যাগ করিলে চলে না, ইহা বলা বাহুল্য। বৌদ্ধসাহিত্যের আলোচনা আজকাল আমাদের দেশে একটু জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জৈনসাহিত্য এখনো অন্ধকারের মধ্যে। পাশ্চাত্য দেশেও ইহার তত আলোচনা হয় নাই, আমরা ত অনেক দূরে। এই সময়ে কাশীর "বঙ্গীয় সার্ব্বধর্ম্মপরিষদের" নাম প্রকাশিত দেখিতে পাইয়া আমরা আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছি। "এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সনাতন জৈন ধর্ম্মের যাবতীয় বিষয় বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা।" "বঙ্গভাষায়" শব্দটি পড়িয়া আমরা অধিকতর আনন্দ অনুভব করিতেছি। জৈন সাহিত্য এখনও আশানুরূপ প্রকাশিত না হইলেও যাহা হইয়াছে তাহারও সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু এই-সকল গ্রন্থ এত মহার্ঘ যে, সাধারণের ক্রয় করিয়া পড়িবার শক্তি নাই, মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনশালী ধর্ম্মোৎসাহী ধনপত সিংহের ব্যয়ে কতকগুলি জৈন ধর্ম্মপুস্তক কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল, সংস্কৃত প্রেসে এখনো সে-সব পাওয়া যায়, কিন্তু অতি দুর্মূল্য। শাস্ত্রবিশারদ জৈনাচার্য্য শ্রীবিজয়ধর্ম্মসূরি মহাশয়ের উদ্যোগে কাশীর জৈন পাঠশালা হইতে আজকাল জৈনগ্রন্থাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গীয় আসিয়াটিক সোসাইটিও কয়েকখানি পুস্তক ছাপাইতেছেন। এ সমস্তই সুলক্ষণ। আশা করা যায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি অবিলম্বেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। বঙ্গীয় সার্ব্বধর্ম্মপরিষদেরও দিকে আমরা আশায় তাকাইয়া থাকিলাম, পরিষৎ নবনব পুস্তক প্রচার করিয়া জৈনসাহিত্য অনুশীলনের সৌকর্য্য বিধান করুন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় জৈনসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জে, এল্, জৈনি, এম্, এ, মহাশয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় সংক্ষেপে জৈনদর্শনের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পর কাশীর বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় আলোচ্য পুস্তকখানির পরিচয় দিয়াছেন।

"সর্ব্বেভ্যঃ হিতঃ"—সকলেরই হিতকর, এই জন্য জৈনধর্ম্মকে 'সার্ব্ব' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানির নাম "সার্ব্বধর্ম্ম" রাখিবার ইহাই কারণ, পরিষদেরও নামের পূর্ব্বে এই কারণেই এই বিশেষণটি যোজিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মধ্যে জৈনধর্ম্মের মূলমূল সমস্ত কথাই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাকে একখানা ক্ষুদ্র প্রকরণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে ইহাকে আরও সহজ ও বিস্তার করিয়া লেখা উচিত ছিল, অন্তত অনুবাদকের ইহা করিয়া দিলে ভাল হইত। পারিভাষিক শব্দগুলির বিবরণ দেওয়া অনুবাদকের কার্য্য, কিন্তু তাহা হয় নাই। মূল গ্রন্থখানি স্থানে স্থানে কঠিন বোধ হইল, অনুবাদক তাহা সরল করিয়া দেন নাই, সাধারণ পাঠকের তাহাতে অসুবিধা হইবে। অনুবাদক একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, 'প্রবেশক'-লেখক মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেমন বলিয়াছেন, বইখানি খাঁটী "পণ্ডিতী ভাষায়" অনূদিত হইয়াছে। দুই একটি স্থান দেখাই :—

"পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক গুণের অবিষগ্‌ভাববিশিষ্ট অখণ্ড পিণ্ডকে দ্রব্য বলে" (৫পৃ); "যে শক্তির নিমিত্তে দ্রব্যে অর্থক্রিয়াকারিত্ব হয়, তাহাকে বস্তু বলে" (৬পৃ); "যদি কার্য্যের লক্ষণ প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব হয়" (১৭পৃ); ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে এই বইখানি পাওয়া যায় :—নির্ব্বাণকুঞ্জ, প্রভুঘাট, বেনারস সিটী।

জৈন তত্ত্বজ্ঞান ও চারিত্র—

পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় সার্ব্বধর্ম্মপরিষদের ইহা অন্যতম ক্ষুদ্র পুস্তিকা, ১২ পৃষ্ঠা মাত্র। ইহা H. Jacoby'র *The Metaphysics and Ethics of the Jainas* নামক প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধের শেষ কথাটি এই :—"জৈনধর্ম্ম সর্ব্বথা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। আমার বিশ্বাস এই ধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের অনুকরণ নহে। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানের ও ধর্ম্মপদ্ধতির বিষয় অবগত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদের নিকট এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং মহৎ বস্তু।"

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

A System of Indian Scientific Terminology (Chemistry). Part I—The Nonmetallic Elements. By Prof. Manindranath Banerjee, F.C.S. Price Re. 1 (including Part II).

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা। সম্প্রতি আমাদের দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। লেখকগণ উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে ইচ্ছা থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি লিখিতে পারেন না। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও নাগরী-প্রচারিণী সভা মধ্যে মধ্যে পারিভাষিক শব্দের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু এগুলি যথেচ্ছভাবে সৃষ্ট এবং অধিকাংশই কটমট। অধ্যাপক মণীন্দ্রবাবু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির (international scientific nomenclature) সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে পরিভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়। ইংরাজি শব্দের সহিত শ্রুতিগত সাদৃশ্য (phonetic resemblance) থাকিলেও সকলগুলিই সংস্কৃত ধাতুজ এইরূপ দেখান হইয়াছে। এই-সকল শব্দ-ব্যবহারে প্রবন্ধ পুস্তকাদি লিখিলে উহারা শ্রুতিকটু-দোষ-শূন্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মণীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তিকার অন্য খণ্ডগুলি শীঘ্র প্রকাশ করিলে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখকগণের অশেষ উপকার হইবে। লেখকগণের বিচারের জন্য নিম্নে পারিভাষিক শব্দগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল।

Hydrogen—আর্দ্রজন ; Fluorine—প্লোরীন ; Phosphorus—ভাস্করস ; Oxygen—অক্সজন ; Chlorine—কৃলহরিণ ; Arsenic—আর্জনিক ; Nitrogen—নেত্রজন ; Bromine—বরমীন ; Antimony—অন্তমনীকম্ ; Carbon—কারবন ; Iodine—এতিন ; Bismuth—বিসমদ ; Sulphur—শুলবারি ; Selenium—সলিলীনম ; Boron—বুরণ ; Silicon—শিলাকণ ; Tellurium—তলরম্।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তামাকের চাষ—

রঙ্গপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের সুপারিণ্টেডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস, বি,এ, প্রণীত, মূল্য ১৷৹ টাকা, চিত্র সম্বলিত, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকর্ত্তা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তামাকের আবাদ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, রঙ্গপুরের সরকারী কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাইয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহা কেবল পুস্তক-পঠিত বিদ্যার উদ্গিরণ নহে, প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষার ফলাফল ইহাতে জানা যাইতেছে।

তামাক আবাদের উপযুক্ত মৃত্তিকা আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে, সুতরাং বিদেশীয় তামাক না আনাইয়া এই দেশে উৎপন্ন তামাক দিয়াই উৎকৃষ্ট সিগারেট ও চুরুট প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; ইহাতে যে দেশের কত টাকা সঞ্চিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তামাকের উপযুক্ত জমিতে ৮।১০ ভাগ মাত্র আঁটাল মাটী, ১ ফুট গভীর বালি থাকা প্রয়োজন, ৪।৫ ফুট গভীর বালি হইলে ফল ভালই হয়। তামাকের জমিতে অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকিলে উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয় না। এই স্থলেই অন্যান্য ফসল হইতে তামাকের পার্থক্য। তামাক উৎপন্ন করিবার জন্য গোময় ও সহজ-দ্রবনীয় সারই সর্ব্বদা প্রযুজ্য। সহজ-দ্রবনীয় সার গাছের প্রথমাবস্থায় খাদ্য জোগায়, পরে গোময় সার গাছকে সতেজ ও বলিষ্ঠ রাখে। গোবর সার ৫।৬ মাসের পুরাতন হওয়া চাই, ২।৩ বৎসরের পুরাতন হইলে উহা কোন ফলদায়ক হইবে না, ইহাই লেখকের মত। সবুজ সার (Green-manure) আজকাল আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত হইতেছে, সবুজসারে তামাকের ফসল অধিক হয় জানিয়া তামাক উৎপাদনকারী কৃষকেরা সুখী হইবে সন্দেহ নাই, কারণ তাহারা ইন্ধন অভাবে গোময় ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। জমিতে সবুজসার প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল পাইলে তাহাদের সারাভাবজনিত কষ্ট দূর হইবে। লেখক যদি পুস্তকের সারসম্বন্ধীয় অধ্যায়ে তাঁহার রঙ্গপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে সবুজসার প্রয়োগের পরীক্ষিত ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে কৃষকেরা আরও উৎসাহিত হইত।

তামাকের জমিতে লেখক মহাশয় দুই বৎসরের শস্য-পর্য্যায় অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথম বৎসর সবুজসার দিয়া তামাক রোপণ করা, দ্বিতীয় বৎসরে আউস ধান্য দিয়া, রবিতে জই, বা যব বা গম বপন করা। অবশ্য জমির উর্ব্বরতা বুঝিয়া শস্যপর্য্যায় নিরূপিত করিতে হইবে। সুমাত্রা দ্বীপের জঙ্গল-আবাদী জমিতে বা আমেরিকার কোন কোন স্থানে একই ভূমিতে প্রতি বৎসর তামাকের আবাদ চলিতে পারে, কিন্তু এরূপ জমিতেও শস্যপর্য্যায় না দিলে কিছু দিনের মধ্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমাদের দেশে শস্যপর্য্যায় অবলম্বন করাই উচিত।

স্থানীয় জলবায়ু এবং মৃত্তিকার উপর তামাকের বীজ-নির্ব্বাচন নির্ভর করে। বিদেশীয় বীজ আনয়ন করিলেও পরীক্ষা করিয়া স্থানীয় জলহাওয়ার উপযুক্ত বীজই রক্ষা করা উচিত এবং গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যে-গাছটী অভীষ্টরূপে ফলপ্রসূ হইবে তাহা হইতেই বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। আমাদের মতে ২।৩ বৎসর ধরিয়া এইরূপ পরীক্ষা না করিয়া কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কারণ ভিন্ন জলবায়ুর বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইলে উহা স্থানীয় জলবায়ুর উপযুক্ত কিনা ইহা বিবেচিত হইতে ২।৩ বৎসরব্যাপী পরীক্ষার প্রয়োজন। প্রথম বৎসরে যাহা উপযুক্ত বলিয়া ধার্য্য হয়, দ্বিতীয় বৎসরে উহা অন্যরূপ ফল দিতে পারে। কোন তামাকের বীজ বিদেশ হইতে আনা অপেক্ষা এদেশজাত সেই তামাকের বীজ কোন বিশ্বস্ত বীজব্যবসায়ীর নিকট হইতে লওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহাতে স্থানীয় জলবায়ুর উপযুক্ত বীজ নিরূপণের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিতে হয় না।

নিজ ব্যবহারোপযোগী বীজ উৎপাদন সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে কাপড়ের থলির আবরণ দিয়া বীজ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কৃষি। এইরূপ বীজ হইতেই আশাপ্রদ ফল লাভ হইতে পারে।

আজকাল প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ সমুদয়ের চেষ্টায় আমাদের কৃষকদিগের ফসলের পোকা নিবারণের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। যামিনীবাবু তাঁহার পুস্তকে তামাকের পোকা ফসলের কতটা ক্ষতি করিতে পারে তাহার যথেষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। পোকার উৎপত্তি বিষয়ে অধিকাংশ কৃষকদিগের যে অদ্ভুত অদ্ভুত সংস্কার আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার কীটতত্ত্ববিষয়েও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রথমেই চোরা পোকার যতদূর সম্ভব সরল বিশদ বিবরণ দিবার সময় কীটের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (stage) ব্যাখ্যা করিয়া কীটজীবন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেদা পোকা তামাকের বহুল অনিষ্ট করে। আমাদের কৃষকেরা সাধারণতঃ এই পোকাগুলি (caterpillars) বাছিয়া ক্ষেতের ধারে ফেলিয়া রাখে। তাহাতে অনিষ্টের কোনও লাঘব হওয়া দূরে থাকুক ভবিষ্যতে লেদা পোকা হইতে তাহাদের ফসল বাঁচান দুরূহ হইয়া উঠে। এইরূপ পোকাগুলি প্রথমেই স্তূপীকৃত করিয়া মারিয়া ফেলাই উচিত।

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে এক একর (তিন বিঘা) জমিতে তামাকের আবাদের জন্য গড়ে ১১৬ টাকা খরচ করিয়া ১৯৪৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে ; সুতরাং একর প্রতি ৭৮৲ টাকা লাভ আশা করা যায়।

আমাদের সাহিত্যে কৃষিসম্বন্ধীয় পুস্তক অতি অল্প। যামিনীবাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সকলের প্রশংসার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। যামিনীবাবু পুস্তকখানির দাম কিছু কম করিতে পারেন না কি?

কৃষিবিৎ।

আদর্শ মহিলা—

প্রথম খণ্ড (বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ)—শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত। তিনটী রঙিন ও নয়টী একবর্ণের চিত্রসম্বলিত। ডবল ডিমাই ষোড়শাংশিত ২২১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা ও চিন্তা—এই পঞ্চ আদর্শ মহিলার প্রসিদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত। উচ্ছ্বসিত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্র গম্ভীর, অনাবিল ও নর্ত্তন-মুখর হইয়াছে, ঘটে; কিন্তু 'নিবেদনে' গ্রন্থকার যাহাদের "শিক্ষার ... ... অভাবের আংশিক পূর্ণতা বিধানের জন্য" ইহার সৃষ্টির বারতা জানাইয়াছেন, এদেশের সেই "কুসুম-কোমলা" স্ত্রীজাতির পক্ষে ইহা ভীতির কারণ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। স্ত্রী-শিক্ষা দূরে থাকুক, এদেশের পুংশিক্ষাই অনেকস্থলে মাতৃভাষাকে এখনও এতদূর কৃতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহাতে 'ফুল্ল নলিনীদল'-এর 'তুহিনবিন্দুরূপ অশ্রুকণা' কিংবা 'মর্ম্মর শিলাতটে স্বচ্ছ সলিলে কোকনদের ন্যায় শোভমান' 'অলক্তরাগরঞ্জিত চারু চরণ'-এর মহিমা সকলে উপলব্ধি করিতে পারে। গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্রই উক্তরূপ একটানা জোয়ারের ন্যায় পরিপুষ্ট; সুতরাং শিক্ষা-সন্তরণ-পটু সুধিবৃন্দ ভিন্ন অন্যের পক্ষে উহা অধিগম্য নহে। আখ্যানভাগের যে যে অংশে লেখক "বর্ণিত চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য... স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ" করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই হিসাবে চিন্তার পুষ্পবাগানে বসিয়া হাফেজের মত—"আহা ফুলটী কি সুন্দর! কিন্তু যাঁহার কৃপায় এই ফুল ফুটিয়াছে না জানি তিনি কত সুন্দর!"—ইত্যাকার দার্শনিক ভাবের চিন্তা এবং দময়ন্তী ও সাবিত্রীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বরান্বেষণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া রাজার নিকট রাণীর আবেদন—ইত্যাকার মামুলীধরণের নভেলী বর্ণনা নিতান্ত অনাবশ্যক ও বৃথা বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ বর্ণনা-মুখে আখ্যানোক্ত চরিত্রগুলির প্রধান দিক সর্ব্বত্রই যথাযথরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শৈব্যা-শীর্ষক নিবন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র পত্নীর পারিপার্শ্বিকরূপে চিত্রিত হওয়ায় অন্যায়রূপে দুর্ব্বল হইয়াছে। ইহাতে একজন প্রকৃত দানশীল সত্যসন্ধ নৃপতির প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইয়াছে। সীতা-নামক আখ্যানের একাংশে রাবণের পাপ-প্রস্তাবে সীতা বলিতেছেন—"আমি মহাসাগর ত্যাগ করিয়া গোষ্পদে বরণ করিব?"—এ বাক্যটী সীতার মহত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার সহায় না হইয়া বরং এই ভাবের প্রশ্রয় দিয়াছে যে, রাবণ "মহাসাগর" বা মহাসাগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে তাহাকে বরণ করিতে সীতার আপত্তি ছিল না। মূল গ্রন্থে এরূপ ভাবের বাক্য লিপিবদ্ধ থাকিলেও, আদর্শ গ্রন্থ রচনার সময়ে তাহা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করার কোনই কারণ নাই। আদর্শ দেশকালের উপযোগী হওয়া প্রয়োজনীয়, সমস্ত গ্রন্থকারেরই এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারের মন্তব্য বড় বেশী হইয়াছে এবং বহু স্থলে 'যে' শব্দটীর প্রয়োগ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। গ্রন্থখানি পাইকা হরপে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। গ্রন্থকার উৎসর্গ-পত্রে মাতাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, ইহা আমাদের কেমন কেমন লাগিল।

তপতী—

(নাট্য কাব্য)—লীলাবসান প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ; বি-এল্, এম্-আর-এ-এস্ প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা।

সূর্য্যকন্যা তপতী ও হস্তিনারাজ সম্বরণের পরিণয়-প্রসঙ্গ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। তৎসম্পর্কে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের দ্বন্দ্বকাহিনীর একাংশও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির মধ্যে কাব্যের অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু গিরিশ বাবুর নাট্যকাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের অনুকরণে ইহা রচিত হওয়ায় অসংযত মাত্রার মধ্যে ভাবের রসসম্পদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই; অথচ ঐ কারণে নটকোচিত সরলতাও ইহার মধ্যে প্রবেশলাভে বঞ্চিত হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত প্রায় সমস্ত চরিত্রই সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং প্রায় প্রত্যেকেরই কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বশিষ্ঠের চরিত্র স্থানে স্থানে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে—ইহা গ্রন্থকারের অনবধানতার পরিচায়ক। বশিষ্ঠের মুখে "মহোক্ষ খাট্বাঙ্গ ভস্ম কপালধারণ" ইত্যাকার ভাষার স্তব শুনিয়া তাঁহাকে কাপালিক বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার ন্যায় ধীর শান্ত ঋষির মুখে সরল বাক্যের স্তোত্রই অধিকতর শোভন হয়। রাজবয়স্য প্রগণ্ডকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের রাজারাণীর বিদুষককে মনে পড়ে,—বাস্তবিক বোধ হয়, ইহা যেন সেই বিদুষকেরই সংস্করণ-ফের। নাট্যান্তর্গত সঙ্গীতগুলি নিতান্ত নীরস ও কবিত্বলেশহীন।

লক্ষ্মণ—

পৌরাণিক চরিতাবলী (সংখ্যা—১৬)। ভক্তিযোগ-প্রণেতা শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

এই পুস্তকে লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, লক্ষ্মণের ভ্রাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, লক্ষ্মণের ভ্রান্তি ইত্যাদি শীর্ষক ছয়টী অধ্যায়ে রামায়ণোক্ত লক্ষ্মণ-চরিত্র বিশ্লেষিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রচনার দোষে গ্রন্থের ভাষা যেমন লালিত্যহীন ও স্থানে স্থানে অদ্ভুত হইয়াছে, তেমনি চরিত্রের আদর্শও কোথায়ও সম্যক ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। দেশকালের প্রতি না চাহিয়া "প্রামাণিকরূপে" কোন গ্রন্থকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিলেই আদর্শ সৃজনে এইরূপ বিফলতা ঘটে। সেকালেরই হউক আর একালেরই হউক, কোন চরিত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ে দেশকালের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। বাল্মীকির মূল গ্রন্থের সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা করিলেও এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। লক্ষ্মণ-প্রণেতাও যে গ্রন্থরচনার সময়ে এ বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা মনে হয় না; কারণ, এসম্বন্ধে তিনি উদাসীন হইলে ভরতমিলন অধ্যায়টীও গ্রন্থভাগে স্থান পাইত। যাহা হোক, রচনার দোষেই হোক আর রচয়িতার অনবধানতায়ই হোক, কোন অধ্যায়েই মূল চরিত্রটী বিকসিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সূর্পণখার সম্পর্কে রামলক্ষ্মণের পরিহাসোক্তি বাসর-ঘরের উপযোগী। ভবিষ্য সংস্করণে সর্ব্বাগ্রে পুস্তকের ঐ অংশ বর্জ্জিত হওয়ার আবশ্যক। "তরুণ অরুণ যখন গোদাবরী-সলিলে * * * খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছিল;" "দু'নয়নে ভাসিয়া রামচন্দ্র কত শোকই না করিলেন"—ইত্যাকার ভাষায় গ্রন্থের অঙ্গ মণ্ডিত। আমরা ইহা পড়িয়া "খিল্ খিল্ করিয়া" হাসিয়া উঠিব, না গ্রন্থকারের জন্য "দু'নয়নে ভাসিয়া শোক" করিব, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।

মানস-প্রসূন বা মায়াবতী—

'সাধনা'-রচয়িত্রী-প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়, উকীল, হাইকোর্ট। ওলিম্পিওন প্রেসে শ্রীরাধারমণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা একখানি কাব্য। কাব্যোক্তি বিষয়ের সারাংশ এই:—

চম্পাবতী রাজ্যের অধীশ্বর নেপালরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সপরিবারে রাজ্য হইতে পলায়ন করেন। কিছু দিন পরে "অপমানে অনাহারে ক্লেশে" তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজরাণী "পতিচিতানলে প্রাণ

বিসর্জ্জন" করেন। রাজপুত্র যোগেন্দ্র কনিষ্ঠা ভগিনী শান্তিকে লইয়া "পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে" বহুদিন পরিভ্রমণান্তর "পার্ব্বতীয় নগর-প্রধান" রাজপুরের নৃপতি স্বীয় ভগিনীপতি রঘুদেবের আশ্রয়ে উপনীত হন। কিন্তু রঘুদেব তাঁহাদিগকে "শত অপমান" করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন যোগেন্দ্র রামগড়ের অধিস্বামী পিতৃবন্ধু শ্যামরায়ের পুত্র ইন্দ্রনাথের ভবনে ভগিনীকে রাখিয়া স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ নামক জনৈক সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দের শিষ্যা, "মালিনী নগরের অধিস্বামিনী" ও তত্রত্য "অশোকা মন্দিরের কর্ত্রী," "যোগিনী" মায়াবতী যোগেন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। ইতিমধ্যে মায়াবতী গুরুর আদেশে "নবীন সন্ন্যাসীকে" সম্মোহিত করিবারও প্রয়াস পান। যোগেন্দ্র শত প্রলোভনেও অবিকল থাকিয়া মায়াকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি আত্মহত্যা করেন। এদিকে ইন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রীর চেষ্টায় শান্তির স্বামী-সম্মিলন ঘটে। রঘুদেব স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র বলিয়া প্রথমতঃ পরস্ত্রী-জ্ঞানেই শান্তির প্রতি আসক্ত হন; পরে তাঁহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। অতঃপর নেপালরাজও পূর্ব্ববিদ্বেষ ভুলিয়া যোগেন্দ্রের প্রতি এসন্ন হন।

মূল আখ্যায়িকার ঘটনাটী সুবিন্যস্ত হইলেও, বিশেষত্বহীন একঘেয়ে বর্ণনায় রসসম্পদশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রনাথ, রমা ও শান্তির চরিত্র মধুর বটে, কিন্তু বৈচিত্র্যহীন; অধিকন্তু উহারা কোন কোন অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি ও ইন্দিরার কপি বলিয়া মনে হয়। যোগেন্দ্রকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে মায়াবতীর চেষ্টা এবং তৎসাধনপক্ষে গুরুর উপদেশ জঘন্য রুচির পরিচায়ক। মায়াবতীর এই চেষ্টা শিবকে পতি পাইবার ইচ্ছায় উমার তপস্যার সহিত উপমিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবদারাধনা ও কন্দর্পপূজায় যে প্রভেদ, এতদুভয়ের তপস্যায়ও সেই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মায়াবতী আত্মহত্যা করিবার সময়ে যে 'মহা-মিলনে'র জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আত্মঘাতী হইবার পূর্ব্বে তাহা একটীবারও স্মরণ করিলে আমরা তাঁহার প্রেম-তপস্যাকে সার্থক মনে করিতে পারিতাম। গুরুদেব "বরের পিসি" হইয়া একবার যোগেন্দ্রকে যে মুখে উপদেশ দিয়াছেন—

"বিষম পরীক্ষাক্ষেত্র, সম্মুখে তোমার,
প্রাণপণে করো যত্ন, হইতে উদ্ধার।"

সেই মুখেই আবার "কনের পিসি"গিরী করিয়া মায়াবতীকে বলিতেছেন—

"—দেখ চেষ্টা করি,
পার যদি তারে তপশ্চর্য্যা পরিহরি,
বাঁধিতে সংসার-পাশে করিয়া যতন।"

এ চিত্রটী "হীরে মালিনী"রই জোড়া;—অথচ ইনি আবার উভয়েরই গুরু—ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানী ও সাধুশ্রেষ্ঠ। গ্রন্থের ভাষা সরল কিন্তু কাব্যের উপযোগী রসাত্মক নহে—স্থানে স্থানে বর্ণনা একেবারে নীরস গদ্যের ন্যায়ও হইয়া পড়িয়াছে। দুচারিটী প্রবাদ-দুষ্ট শব্দও গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে।

কারবালা—

শ্রীআবদুল বারি প্রণীত। নোয়াখালি, মাইজদী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মেট্‌কাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২১০ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১৷০ ও কাগজের মলাট ১৲ টাকা।

গ্রন্থখানি হরিনারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুরের নামে উৎসর্গীকৃত এবং ত্রিবর্ণে মুদ্রিত তাঁহার প্রতিকৃতিসম্বলিত। মুসলমান গ্রন্থকারের হিন্দুপ্রীতির ইহা একটি সুন্দর নিদর্শন।

কারবালা মহরমের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে রচিত একখানি কাব্য। আটটি সর্গে ইহা পরিসমাপ্ত। এই আটটী সর্গের প্রত্যেকটীই লেখকের উদার মত ও ধর্ম্মপ্রাণতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কাব্যাংশে ভাব, ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়া গ্রন্থখানি ত্রুটিহীন না হইলেও ইহার মধ্যে করুণ রসের অবতারণায় গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। শুধুমাত্র এমাম হোসেনের স্বগতঃ বাক্যের মধ্যে অতীত ঘটনাগুলির পরিচয় না দিয়া উপযুক্ত বিষয়-বিন্যাসে উহা চিত্রিত করিয়া তুলিতে পারিলে কাব্যখানির রসমাধুর্য্য আরো একটু বাড়িয়া উঠিত। গ্রন্থের অষ্টম সর্গোক্ত হোসেনের আত্মোৎসর্গ-কাহিনীটী নায়কের স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও অটুট ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর নিখুঁতভাবে চিত্রিত হইতে পারে নাই—উহার মধ্যে যেন একটু হা-হুতাশের মাত্রা অধিক ঘটিয়াছে এবং 'বিশ্বাসে'র মূলে কিঞ্চিৎ আঘাত পড়িয়াছে। এমাম-শিবিরে মন্ত্রণা-মজলিশটী নবীনবাবুর হুবহু অনুকরণ বলিয়া মনে হয়—এমন কি, রাণী ভবানীর ন্যায় এস্থানেও জয়নব "যবনিকা-আড়ে" বসিয়া সর্ব্বশেষে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। গ্রন্থমধ্যে কতকগুলি আরবী ও পারশী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎসম্পর্কে গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ এই:—"বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকাবৃন্দের কিয়দংশ আহারে বিহারে যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে ঐ পদগুলি ক্রমে আসন লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা স্বভাবতঃই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির পরে নির্ভর করিয়াই আমি, স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গমাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আকর্ষণ করিবার মানসে, 'কারবালায়' সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি। আমার মতে বঙ্গভাষাকে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই পাঠোপযোগী ও সমধিক প্রীতিপ্রদ করিয়া এরূপভাবে নব কলেবরে গঠিত করার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে মাতৃভাষার সম্পদলাভের সুযোগ ঘটিবে কিনা এবং তাহা "হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই পাঠোপযোগী ও সমধিক প্রীতিপ্রদ" হইবে কিনা, বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগস্থ কর্তৃপক্ষের অনুরূপ চেষ্টা দেখিয়া তৎসম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হইতে পারি নাই। মাতৃভাষার প্রয়োজনানুসারে ইহার মধ্যে বৈদেশিক শব্দ ক্রমশঃই স্থান পাইয়াছে ও পাইতেছে এবং হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গভাষায় যে শব্দের অভাব নাই, তজ্জন্য বৈদেশিক বাক্যের আমদানী করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইংরেজী Martyr শব্দের খাঁটি প্রতিশব্দ বাংলায় নাই, সুতরাং এজন্য বৈদেশিক "সহিদ" শব্দের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়; কিন্তু "দুঃখের কথা" লিখিবার জন্য "আপশোষ বাতের" আমদানী নিতান্ত অনাবশ্যক। আরবী পারশী শব্দ সাধারণতঃ হলন্ত-সংযুক্ত; সেজন্যও ইহা অনেক স্থলে বাংলার সহিত খাপ খাইতেও না পারে। বিশেষতঃ কাব্যগ্রন্থে উহার ব্যবহারে অযথা শ্রুতিকটুত্বও উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহা হৌক, 'মঞ্জিল', 'গুলজার', 'বেহেস্ত' প্রভৃতি যে শব্দগুলি পূর্ব্বাবধি বাংলায় প্রচলিত আছে, তাহার ব্যবহার অবাধে চলিবার পক্ষে কোনই বাধা নাই এবং

সেজন্য অনর্থক অর্থসূচী দেওয়ারও প্রয়োজন করে না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দগুলি পরিশিষ্টে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থের ছন্দ ও ভাষা স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সর্ব্বাংশে মনোরম।

খাতির-নদারত।

সম্রাট মার্কাস্ অরেলিয়াস আণ্টোনীনাসের আত্মচিন্তা—

মূল গ্রীক হইতে শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম, এ, কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ৮০+২৭৮; মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

মার্কাস্ অরেলিয়াস্ রোমক রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভূপতি পৃথিবীতে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি ষ্টোয়িক (Stoic) মতাবলম্বী সাধক ছিলেন। "জ্ঞানের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন আপনাকে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কখনও ম্লান হয় নাই। তিনি কর্ম্মে যেমন নিয়ত প্রবণশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন অন্তরে তেমনি আপনাকে সর্ব্বদা উদ্বেগবিরহিত, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ও যোগযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি জীবনে কত দুঃখ পাইয়াছেন; তাঁহার পুত্র তাঁহার হৃদয়ের ক্ষতস্বরূপ ছিলেন; তথাপি তিনি এক দিনের তরেও ক্রোধে বা মর্ম্মবেদনায় আত্মহারা হন নাই; একদিনের তরেও কাহারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন নাই; তাঁহার অনাবিল চিরপ্রসন্ন চিত্তের সুগভীর শান্তি কিছুতেই সংক্ষুব্ধ হয় নাই।"

ইঁহার জীবন যেমন মধুময়, ইঁহার লিখিত আত্মচিন্তাও তেমনি মধুময়। এমন উপাদেয় গ্রন্থ ধর্ম্মসাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। পাঠকগণকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন।

মূল গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় লিখিত; ইংরাজীতে ইহার ৪।৫ খানা অনুবাদ আছে। আমরা যে গ্রন্থখানার সমালোচনা করিতেছি ইহা ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ নহে, ইহা মূল গ্রীক হইতে অনূদিত। অনুবাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম, এ,। রজনীবাবু গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত এবং তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার সম্রাটের জীবনচরিত দিয়াছেন (পৃঃ ২ হইতে ১৩)। তাহার পর ষ্টোয়িকদর্শন বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (পৃঃ ১৪ হইতে ৫৩)।

মার্কাস অরিলিয়াসের অনুরূপ উক্তি ভারতীয় সাহিত্যেও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই প্রকার কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উক্তিসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ দিলে গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

গ্রন্থের কাগজ ছাপা বাঁধাই—সবই ভাল।

এই প্রকার গ্রন্থ যতই প্রচারিত হয়, ততই সমাজের কল্যাণ। আশাকরি এই গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইবে।

কবিতানুবাদ কঠোপনিষৎ—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-লেখক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি,এ, বিরচিত। কলিকাতা ৩৫নং গুয়াবাগান লেন হইতে শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৲+১১২; মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

অনুবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থকার এই প্রকার লিখিয়াছেন:—প্রথম কথা এই যে আমি অক্ষরানুবাদ করি নাই; কারণ তাহা হইলে ইহা দুর্ব্বোধ্য হইত। পূর্ব্বানুবৃত্তির অনুরোধে এবং গ্রন্থোক্ত বিষয় সুগম করিবার জন্য আমি স্থানে স্থানে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছি। তবে মূলরক্ষা করা যতদূর সম্ভবপর, তাহার ত্রুটি করি নাই। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তিগণও যাহাতে উপনিষদের মর্ম্মবোধে সমর্থ হন, আমি সেই লক্ষ্য রাখিয়া এই অনুবাদ করিয়াছি।"

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। উপক্রমণিকাতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বলা নিষ্প্রয়োজন শঙ্কর ভাষ্যই আমার প্রধান অবলম্বন," কিন্তু গ্রন্থকার সব স্থলে শঙ্করের অনুসরণ করেন নাই। একস্থলে (১।৩।১৪) মূলে আছে:—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। শঙ্করের মতে বরান্=প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্=শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। মোক্ষমুলার অনুবাদ করিয়াছেন "boons" (=বর সমূহ; যম নচিকেতাকে তিনটা বর দিতে চাহিয়াছিলেন—এখানে সেই বরের কথা বলা হইতেছে)। যোগীন্দ্রবাবুও ইহার অনুসরণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন:—"ইষ্টবর লভি কর তত্ত্ব অন্বেষণ।' এস্থলে টীকায় কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ছিল।

একস্থলে আছে (১।২।১৩) "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে:—১ম—যিনি প্রার্থনা করেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন। ২য়—পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করেন। এখানে এই গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে—ঋষি "প্রার্থনাবাদী" ছিলেন? না, "কৃপাবাদী" ছিলেন? শঙ্কর "বৃণুতে" শব্দের 'প্রার্থনা করা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, মোক্ষমুলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন "বৃণুতে"='বরণ করা'। যোগীন্দ্রবাবু শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু পাদটীকাতেও কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

ইহার পরের মন্ত্রে আছে "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ ইত্যাদি"—কথায় কথায় অনুবাদ করিলে এই অর্থ হয়—"যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র হইতে নিবৃত্ত হয় নাই"। গ্রন্থকার অনুবাদ করিয়াছেন—

"শ্রুতি স্মৃতি যেই কর্ম্ম করে নিবারণ
তা হ'তে বিরত নাহি হয় যেই জন"।

শ্রুতিতে স্মৃতির 'দোহাই' দেওয়া হয় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। তবে এস্থলে অনুবাদক শঙ্করের অনুসরণ করিয়াছেন।

মূলে আছে—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ২।৩।১২।

অর্থাৎ "পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা বলেন "তিনি আছেন" তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে?" বসুমহাশয় এই অনুবাদ করিয়াছেন:—

নয়নে আত্মার কেহ দেখা নাহি পায়,
বচনেও ব্যক্ত তাঁরে করা নাহি যায়;
মননেও কেহ তাঁরে
ধারণা করিতে নারে।
"আছেন" সুদৃঢ় এই কহেন যাঁহারা
বুঝাতে সক্ষম মাত্র কেবল তাঁহারা।

এখানে 'বুঝাতে' (নিজন্ত) শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই; ব্যবহার করা উচিত ছিল—"বুঝিতে"। আর 'সক্ষম' কথাটা ব্যবহার না করিলেই হইত।

কবিতানুবাদের বিপদ অনেক ; অনেক সময় অর্থের ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। যোগীন্দ্রবাবু অক্ষরানুবাদ করেন নাই। কিন্তু তিনি মূল গ্রন্থের ভাব লইয়া যেভাবে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। এই গ্রন্থ পড়িয়া পাঠকগণ মূল গ্রন্থের ভাবার্থ বেশ বুঝিতে পারিবেন।

গ্রন্থের কাগজ ছাপা ও বাঁধাই—সমুদয়ই অতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

ভারতীয় সঙ্গীত

লবকুশ দুই ভাই বাল্মীকির আশ্রমে রামায়ণ গান করিয়াছিলেন। বাল্মীকি এই গানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে সে কালের সঙ্গীত-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

লবকুশ কিরূপ গায়ক ছিলেন, এ সম্বন্ধে বাল্মীকি বলিতেছেন যে,

"তৌ তু গান্ধর্ব্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্চ্ছনকোবিদৌ।" তাঁহারা 'গান্ধর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ,' অর্থাৎ সঙ্গীতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আর তাঁহারা 'স্থান' আর 'মূর্চ্ছনার' বিষয় ভালরূপ জানিতেন।

লবকুশের গান কিরূপ ছিল, এ বিষয়ে বাল্মীকি বলিতেছেন,

"প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥"

(তাহা তিনটি 'প্রমাণ' সম্বলিত, সাতটি 'জাতি'যুক্ত আর বীণালয় সমন্বিত)।

তিনটি প্রমাণ, দ্রুত মধ্য বিলম্বিত এই তিনটি লয়। এ সকলের ব্যবহার সেকালে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। 'স্থান,' 'মূর্চ্ছনা,' 'জাতি,' এ-সকল শব্দের ব্যবহার এখন আর নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বাল্মীকি এত কথার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাগ আর তাল সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। 'রাগ' শব্দের ব্যবহার সেকালে ছিল কি না, সন্দেহ ; খুব প্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তকে (যেমন, 'ভারত নাট্য শাস্ত্রে') রাগ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। ইহাতে এরূপ বুঝিলে চলিবে না যে তখন রাগরাগিণীর ব্যবহার ছিল না। 'জাতি' শব্দ রাগরাগিণীরই জাতিবোধক ; 'মূর্চ্ছনা' রাগরাগিণীরই 'ঠাট' নিরূপক। সুতরাং রাগরাগিণীর ব্যবহার সে সময়েও ছিল।

তিনরূপ লয়ের কথা আছে, অথচ 'তাল' শব্দ ব্যবহার হয় নাই। তাল ছিল না, এ কথা হইতেই পারে না। তথাপি ইহার উল্লেখ না থাকার কারণ কি ? যাহা হউক, এ-সকল কথার বিচার করা আমার অভিপ্রায় নহে। বিশেষতঃ কবির উক্তি লইয়া এরূপভাবে আলোচনা না করাই ভাল।

সঙ্গীতরত্নাকরে 'স্থান' 'মূর্চ্ছনা' 'জাতি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। উহাতে 'রাগ' 'তাল' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং অনেক প্রচলিত রাগরাগিণীর ব্যাখ্যাও আছে। এই পুস্তকে যেরূপ সঙ্গীত-পদ্ধতির বর্ণনা আছে, তাহা বোধ হয় রামায়ণের পদ্ধতি এবং আজকালকার পদ্ধতির মাঝামাঝি। সঙ্গীতরত্নাকর দেবগিরির রাজা সিঙ্ঘনের সময়ে লিখিত হইয়াছিল। ইঁহার রাজত্বকাল ১২১০ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং সঙ্গীতরত্নাকর ৭০০ বৎসর পূর্ব্বেকার পুস্তক। এই পুস্তকে বর্ত্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদের তাল-সকলের কোন উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু 'ধ্রুবা' গানের উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় যে আমাদের 'ধ্রুপদ' গানের কায়দা এই সময়, কি তাহার পূর্ব্ব হইতেই গঠিত হইতেছিল। ইহার অন্য প্রমাণও আছে। নায়ক গোপাল, বৈজু বাওরা প্রভৃতি ওস্তাদেরা ইহারই অব্যবহিত পরের সময়ের লোক। ইঁহারা আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের রচিত ধ্রুপদ এখনও অতি আদরের সহিত আমাদের ওস্তাদেরা গাহিয়া থাকেন। নায়ক গোপালের রচিত বিস্তর মৃদঙ্গের বোলও আমাদের বাদকেরা ব্যবহার করিতেছেন।

ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ওস্তাদের রচনা এখন চলিত নাই, ইঁহাদের অপেক্ষায় প্রাচীন কোন ওস্তাদের নামও আমরা জানি না। সুতরাং বোধ হয় ইঁহারাই আধুনিক ধ্রুপদ গানের পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। এই আধুনিক পদ্ধতি যে মুসলমান প্রভাবের ফল, একথা অনেকে বলিয়া থাকেন। আমাদের ওস্তাদেরা যখন হইতে মুসলমান সংস্রবে আসিয়াছেন, সেই সময় হইতেই মুসলমান প্রভাবের আরম্ভ। সেটি হইতেছে নায়ক গোপালের সময়। তাই মনে হয় যে ইঁহাদের হাতেই আধুনিক পদ্ধতির সূত্রপাত হইয়াছিল।

ইঁহারা যে কেবল পুরাতনই ছিলেন তাহা নহে। পাণ্ডিত্য হিসাবেও ইঁহারা অতি পূজনীয় ছিলেন। গোপাল 'নায়ক' হইয়াছিলেন, কিন্তু তানসেন নায়ক হইতে পারেন নাই। গীত বাদ্য উভয়েতে পরাকাষ্ঠা লাভ না করিলে 'নায়ক' উপাধির যোগ্য হয় না। তানসেন গায়কই ছিলেন, বাদ্য চর্চ্চায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই।

গোপাল আর বৈজু, ইঁহাদের মধ্যে বন্ধুতা ছিল। বৈজুর অনেক গানে গোপালের প্রতি উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—

"কহে বৈজু বাওরা, শুন হো গোপাল লাল।
দিনন মানে সূরয, রাত মানে চন্দ্র।"

তানসেনও এইরূপ একটি গোপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক অনেক গান শেষ করিয়াছেন, যেমন,—

"কহে মিঞা তানসেন, শুন হো গোপাল লাল, অর্ব্ব খর্ব্ব কর্ দেখায়ে সুর মিলায়ে কণ্ঠ মিলায়ে, আকবর পরখ পায়ে।"

তানসেন নায়ক গোপালের অনেক পরের লোক, সুতরাং তাঁহার 'গোপাল' নায়ক গোপাল হওয়া সম্ভবপর নহে। ইনি অপর কেহ হইবেন।

তানসেন যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা 'মিঞা' শব্দেতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু তিনি হিন্দুর সন্তান। তানসেন তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল না, উহা আকবরদত্ত খেতাব। ইঁহার আসল নাম রামতনু। প্রেমকুমারী নাম্নী একটি সঙ্গীতপারদর্শিনী মুসলমান কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করেন।

প্রেমকুমারীর পিতা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের মহিষী মৃগনয়নীর সঙ্গীত বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রবাদ এই যে উঁহার গান শুনিবার জন্যই তানসেন গোয়ালিয়র আসেন, সেইখানে প্রেমকুমারীর পরিবারের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়।

আমাদের দেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই নাম অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। মৃগনয়নীর ন্যায় মীরাবাইও অতিশয় সঙ্গীতকুশলা ছিলেন। ইনি উদয়পুরের রাজার পত্নী। আকবরের সভায় ইনি গান করিয়াছেন।

আকবরের সময়ে সঙ্গীত চর্চ্চার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তানসেনই তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ। ইনি অতিশয় স্পষ্টবাদী নির্ভীক লোক ছিলেন। আকবর ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং নানারূপ মূল্যবান্ উপহার দিয়া ইঁহাকে তুষ্ট রাখিতেন। প্রবাদ এই যে, একবার অনেক লক্ষ টাকা দামের একখানি বাজুবন্দ পুরস্কার দিয়া তিনি তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "এরূপ উপহার কি অন্য কোন ব্যক্তির দেওয়া সম্ভব মনে কর?" তাহার উত্তরে তানসেন বলেন, "হাঁ, অন্যেও হয়ত দিতে পারে।"

এই কথা লইয়া আকবরের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ মনান্তর হওয়ায়, তানসেন দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকবরের মাতামহ রাজারামের নিকট চলিয়া আসেন। রাজারাম অসাধারণ পণ্ডিত, সঙ্গীত-পারদর্শী এবং গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া তানসেনের আদরের আর সীমা রহিল না। কথিত আছে যে, রাজারাম তানসেনকে একখানি বাজুবন্দ উপহার দেন, তাহার মূল্য আকবরদত্ত সেই বাজুবন্দের দ্বিগুণ ছিল—কেহ কেহ বলেন, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই বাজুবন্দ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া তানসেন নাকি আর সে হাতে রাজারাম ভিন্ন অপর কাহাকেও সেলাম করেন নাই। ইহার পরে আকবর যখন আবার তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া আনেন, তখন আকবরকেও তিনি বাম হাতেই সেলাম করিয়াছিলেন। আকবর যে কতদুর মহানুভব লোক ছিলেন, তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি তানসেনের এই ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তবে এটা বোধ হয় দাদামহাশয়ের খাতিরে।

হরিদাস স্বামী নামক একজন সাধু তানসেনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন। আকবর তাঁহার সঙ্গীত শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া ছদ্মবেশে তানসেনের সঙ্গে তাঁহার নিকটে যান। সে সঙ্গীতে তিনি এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়াছিল। তার পর

গৃহে ফিরিয়া তিনি তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "স্বামীজীর গান শুনিয়া আমার কেন এমন হইল? তোমার গান শুনিয়া ত কখনও তাহা হয় না!"

ইহার উত্তরে তানসেন বলেন যে, "আপনি এই দেশের রাজা, আমি আপনার সভায় গান করি; আর আমার গুরু এই জগৎ সংসারের যিনি রাজা তাঁহার সভায় গান করেন। আমার গানে আর তাঁহার গানে তুলনা কিরূপে সম্ভবে?"

প্রবাদ আছে যে, তানসেন আকবরের আদেশে দীপক রাগ গাহিতে গিয়া পুড়িয়া মারা যান। অনেকে বলেন যে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া, তাহা গোপন রাখিবার জন্য যথাসময়ে আকবরের সাহায্যে তাঁহা দ্বারা দীপকের আলাপ করায়।

সঙ্গীতের মত পবিত্র বিষয় লইয়াও যে নীচ লোকেরা কিরূপ কুকার্য্য করিতে পারে, ইহার আরো দৃষ্টান্ত আছে। প্রসিদ্ধ মার্দঙ্গিক লালা কেবল-কিষণ যে লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া এদেশে চলিয়া আসেন, তাহার কারণও কতকটা এইরূপ। কেবল-কিষণ এবং তাঁহার এক ভাই সেখানকার নবাবের সভার বাদক ছিলেন। নবাবের নিজেরও গান বাজনার অভ্যাস ছিল, আর এ বিষয়ে প্রশংসা লাভ করিবার ইচ্ছাও ছিল অত্যধিক। তাঁহা অপেক্ষা অন্য কাহারও অধিক প্রশংসা হয় একথা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহার ফলে এক দিন কেবল-কিষণ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যে,—নবাবের আদেশে তাঁহার ভ্রাতার হাতের আঙুল পাথর দিয়া পিষিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর একটি গায়কের গলার স্বর ঔষধ খাওয়াইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অতঃপর কেবল-কিষণেরও একটা কিছু হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

একথা শুনিবামাত্র কেবল-কিষণ লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন, ইহাতে তাঁহার নিজেরও প্রাণরক্ষা হইল, নবাবেরও যশোলাভের বিঘ্ন দূর হইল।

কেবল-কিষণের ভ্রাতাও যে কিরূপ কৃতী পুরুষ ছিলেন, তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে নবাব তাঁহার আঙুল পিষিয়া দিয়াও তাঁহার বাজনা বন্ধ করিতে পারে নাই। ইহার পর হইতে তিনি মৃদঙ্গবাদ্যের এক নূতন কায়দাই আবিষ্কার করিলেন, যাহাতে আঙুলের কোন প্রয়োজন হয় না, হাতের তেলোর দ্বারাই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই কায়দার বোলের নাম 'তুণ্ডা' বোল, এ-সকল বোলে 'তেটে' অক্ষরের ব্যবহার নাই।

কেবল-কিষণ যখন কলিকাতা আসেন, সে সময়ে পীরবক্স, গোলাম আব্বাস্ প্রভৃতি এখানকার শ্রেষ্ঠতম বাদক ছিলেন। তখনকার বিখ্যাত শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী এবং নিমাই চক্রবর্ত্তী নামক ভ্রাতাদ্বয় ইঁহাদেরই ছাত্র। কেবল-কিষণ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদেরও ওস্তাদ বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

কথিত আছে যে, কেবল-কিষণ আসার অল্পদিন পরেই গোবরডাঙ্গায় এক মজলিসে এই চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। কেবল-কিষণ সে কালের অদ্বিতীয় বাদক ছিলেন, মৃদঙ্গ-ব্যবসায়ী কাহারও নিকট তাঁহার নাম অজানা ছিল না। এমন লোকের তাঁহাদের বাজনা শুনিয়া কিরূপ লাগিল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই তাঁহাদের কৌতূহল হইল। তাহা শুনিয়া কেবল-কিষণ বলিলেন যে, "তুম্‌কো শিখ্‌লায়া, মগর্ আঁখ নেহি দিয়া।" তাহাতে দুই ভাই তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, "তবে আপনি সেই চক্ষু দান করুন।"

তদবধি কেবল-কিষণ তাঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন; যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, অন্য কোথাও যান নাই। ইঁহার শিক্ষার গুণে কালে চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা মৃদঙ্গবাদ্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। কেশবচন্দ্র মিত্র, মুরারিমোহন গুপ্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী সঙ্গীতাচার্য্যগণ ইঁহাদেরই শিষ্য।

সে সময়ে সঙ্গীত শিক্ষা যে কিরূপ ক্লেশকর ব্যাপার ছিল, তাহার কথা উল্লিখিত গুপ্ত মহাশয় প্রায়ই তাঁহার ছাত্রদিগকে বলিতেন। তৎকালের সঙ্গীত চর্চার কুফল উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের জীবনে বিশেষ ভাবেই ফলিয়াছিল। তাঁহাদিগকে বাড়ীতে পাওয়া প্রায়ই ঘটিত না। বাড়ীতে থাকিলেও অতি অল্প সময়ই প্রকৃতিস্থ থাকিতেন। গুপ্তমহাশয় নিমাই চক্রবর্ত্তীর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু গুরুর

সঙ্গ পাওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইত। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন একটি লোকের বাড়ীতেই তাঁহার সময়ের অধিকাংশ কর্ত্তন করেন, আর সেই ব্যক্তির কথা গুরুবাক্যবৎ পালন করেন। ইহার পর হইতে গুপ্ত মহাশয় কোন দিন মাছ, কোন দিন বা মিষ্টান্ন, এইরূপ ঘন ঘন উপহার প্রদান দ্বারা সেই লোকটির তুষ্টি জন্মাইতে লাগিলেন। একদিন সে ব্যক্তি গুপ্ত মহাশয়কে বলিল, "বাবা, তুমি কেন এমন করিয়া আমাকে এত জিনিস দিতেছ? আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি?" একথায় গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, "মা, আমি আর কিছুই চাহিনা; চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তুমি যদি দয়া করিয়া দিনে একটিবার আমার ওখানে পাঠাইতে পার, তবেই আমার ঢের হয়।"

সেই হইতে নিমাই চক্রবর্ত্তী প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক মুরারি বাবুর বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন। গুপ্ত মহাশয়েরও তাঁহাকে ভুলাইবার সঙ্কেত অজানা ছিল না। তিনি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় পানীয়ে আলমারি পরিপূর্ণ রাখিতেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিবা মাত্রই একটি বোতল বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরা হইত, আর অমনি তাঁহার মনও খুলিয়া যাইত। যতক্ষণ সেই বোতলে বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকিত, ততক্ষণ আর সংসারের কোন বস্তুই তাঁহার গুপ্ত মহাশয়কে অদেয় থাকিত না।

গুপ্ত মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার ছাত্রগণের অযত্ন দেখিলে উল্লিখিত কাহিনী তাহাদিগকে শুনাইয়া বলিতেন, "আমরা এইরূপ কষ্ট করিয়া বাজনা শিখিয়াছিলাম। আর তোমাদের জন্য দিন রাত খাটিয়া, কাগজ পেন্সিল যোগাইয়া, তামাক অবধি খাওয়াইয়াও তোমাদের মন পাইতেছি না।"

বাস্তবিক, বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্যাদান বিষয়ে মুরারি-মোহন গুপ্তের ন্যায় আদর্শ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। একবার তাঁহার গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনস্থ বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাড়ী পড়-পড় হইয়াছে, এমন সময় তাঁহার ছাত্রগণ সংবাদ পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুপ্ত মহাশয় তখন নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে বৃহৎ ব্যাগ হস্তে পথের অপর পার্শ্বে পাইচারি করিতেছিলেন। ছাত্রগণকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না; বোলের খাতা আমি সব লইয়া আসিয়াছি।" বোলের খাতা ভিন্ন আরও যে কিছু চিন্তার বিষয় থাকিতে পারে, একথা মুহূর্ত্তের জন্যও গুপ্ত মহাশয়ের মনে উদয় হয় নাই।

সঙ্গীত সাধনের বিদ্যা; কষ্ট করিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। বড় বড় ওস্তাদগণের শিক্ষার বিবরণ শুনিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। মুরারি বাবুর প্রধান ছাত্র সত্যকিঙ্কর গুপ্ত পঁচিশ বৎসর অবিরাম শিক্ষার পর সংসার ত্যাগ করেন। সেই উপলক্ষ্যে মুরারি বাবু বলিয়াছিলেন যে "আর বৎসর দশেক শিখিলেই উহার শিক্ষা শেষ হইতে পারিত।"

খাণ্ডারবাণীর ধ্রুপদ গায়ক প্রসিদ্ধ কান্তা-প্রসাদের সম্বন্ধে শুনা যায় যে, তিনি সকালে উঠিয়া কয়েক খানা রুটি হাতে বাড়ী হইতে বাহির হইতেন। নিকটে মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ ছিল, সেই গাছের তলায় বসিয়া সঙ্গীত সাধিতে সাধিতে তাঁহার দিন প্রায় শেষ হইয়া যাইত।

শিবনারায়ণ মিশ্র বিখ্যাত বখ্‌তেয়ারজীর শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে যে বখ্‌তেয়ারজীর নিকট সার্গম শিক্ষা করিতেই তাঁহার বারো বৎসর কাটিয়া যায়।

কি গান, কি বাদ্য, কিছুই সহজে শিখিবার উপায় নাই। বিষয় যেমন কঠিন, শিখিবার সুযোগ তেমনি অল্প। সেকালে আবার অসচ্চরিত্র ওস্তাদের আরাধনায় শিক্ষার্থীর সময়ের অধিকাংশই বৃথা ব্যয় হইত। তামাক সাজিয়া, বাজার করিয়া, নানারূপে ওস্তাদের মন যোগাইতে পারিলে, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া কালে-ভদ্রে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দান করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের দোষগুলিও শিষ্যকে অভ্যাস করাইতেন। সেকালে সঙ্গীত চর্চ্চার সাধারণ অবস্থা এইরূপই ছিল, সুতরাং তাহা ভদ্র লোকের ঘৃণার বিষয় না হইবে কেন?

নিরক্ষর চরিত্রহীন ওস্তাদগণের হাতে পড়িয়া এদেশে সঙ্গীতের এমন দুর্গতি হইয়াছিল। সঙ্গীতের শাস্ত্রের চর্চ্চা বন্ধ হইয়া যখন হইতে ব্যবহারিক সঙ্গীত মাত্র

অবশিষ্ট থাকে, সেই হইতেই এই দুর্গতির সূত্রপাত, কেননা তখন হইতেই সঙ্গীতবিদ্যা নিরক্ষরের হাতে পড়ে। প্রাচীনকালে সঙ্গীতের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। তখন অতি উচ্চ বিষয় মনে করিয়াই লোকে ইহার আদর করিত। রাজারাও যত্নের সহিত নিজ নিজ অন্তঃপুরে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুন বিরাটের পরিবারস্থ বালিকাগণের সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতে এই ঘটনাটির অতি মধুর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিদাসও অজবিলাপে "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এই কথাগুলির সন্নিবেশ করিয়া এই বিষয়েরই প্রমাণ দিয়াছেন। মীরাবাই এবং মৃগনয়নীর দৃষ্টান্তও ইহারই পোষকতা করে।

সঙ্গীতপারদর্শিনী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে অনেক হইয়াছেন, এখনও আছেন। সমাজ যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অক্ষম, এরূপ অনেক স্ত্রীলোকও সঙ্গীতের গুণে আদর লাভ করিয়া গিয়াছে। 'ধনাবাই' বলিয়া এই শ্রেণীর একটি স্ত্রীলোকের পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীতের প্রশংসা অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গুণপনা এরূপ ছিল যে, ভদ্রসন্তানেরাও তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তিনি নৌকায় চড়িয়া গঙ্গার স্তব গাহিতে গাহিতে যখন কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুর যাইতেন, তখন সেই মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া অনেক নৌকা তাঁহার অনুসরণ করিত। একবার এক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্তব গানে এতই তুষ্ট হইয়াছিলেন যে নিজের গাড়ুটি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "মা, আমি গরীব মানুষ, আমি আর কি দিব ? এই গাড়ুটি তুমি নেও।"

বড় বড় পুরুষ ওস্তাদদিগকেও অনেক সময় স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রসিদ্ধ তবলাবাদক গোলাম আব্বাস কোন এক সভায় হীরা নাম্নী গায়িকা কর্ত্তৃক এইরূপে অপদস্থ হইয়াছিলেন। সে অপমান তাঁহার প্রাণে এতই লাগিয়াছিল যে, তিনি তখনই সেই সভা হইতে উঠিয়া আসিলেন, এবং বাহিরে আসিবা মাত্রই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই যে গায়ক আর বাদকে রেষারেষী, আমাদের ওস্তাদী সঙ্গীতে ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। গায়ক আর বাদক বন্ধুভাবে চলায় একপ্রকার আনন্দ; ইঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় আর এক প্রকার আনন্দ। এ আনন্দ কতকটা কুস্তী বা লাঠি খেলার আনন্দের ন্যায়। গায়ক আর বাদকের পরস্পরের গুণপনা ইহাতে যেমন প্রকাশ পায়, আর কিছুতেই তেমন নহে। ইহার রীতিমত শাস্ত্র আছে, রাজনীতির ন্যায় কূট কৌশল আছে, যুদ্ধের উত্তেজনার ন্যায় উৎকট উত্তেজনাও আছে।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

আভিজাত্যের নির্ভরভিত্তি

[এগুলি জার্ম্মাণ দার্শনিক (Nietzsche) নিচির উক্তি। নিচি আভিজাত্যের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আভিজাত্য অর্থাৎ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। ইঁহার অনেক উক্তি প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, তত্রাচ ভাবের ও চিন্তার উদ্বোধক বলিয়া সেগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।]

প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলার মধ্যে একটু ভীরুতা আছে, একটু জড়তা আছে এবং ভাবের ঘরে বেশ একটু বড় রকমের চুরি আছে।

কল্পনাতেই মানুষের কৃতিত্ব; এমন নিজস্ব জিনিস আর নাই।

যে ভাবুক নিজের ভাবকে মূর্ত্তি দিতে পারিয়াছে, আপনার সারভাগটুকু স্থায়ী করিতে পারিয়াছে, সে দেহ বা মনের শক্তিহ্রাসে বিচলিত হয় না। কালের নিঃশব্দ সঞ্চারে সে বিদ্রূপের হাসি হাসে। নিধি যখন অন্যত্র সুরক্ষিত তখন রিক্ত ভাণ্ডারে চোর ঢুকিলে ক্ষতি কি ?

সংসারে যাহাদের 'কাজের লোক' বলিয়া খ্যাতি আছে, ভাবের জগতে তাহারা অকর্ম্মণ্য। কাজের আবরণে তাহারা মনের দৈন্য ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

বনিয়াদী বংশের সন্তান হওয়ায়, অন্ততঃ একটা সুবিধা আছে; ঘরানা-ঘরের ছেলে দারিদ্র্যের মধ্যেও মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে সক্ষম।

যে দেশে ভদ্রলোকের আধিপত্য কমিয়া গিয়াছে

সেখানে শিষ্টাচার লুপ্তপ্রায়, ভদ্রতাও সুদুর্লভ। দেশের রাজাকে ঘিরিয়া অভিজাতসম্প্রদায় গড়িয়া না উঠিলে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব; সাক্ষী ইতিহাস।

বর্ত্তমানকালের দণ্ডবিধি এক অদ্ভুত সামগ্রী; ইহাতে অপরাধী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধিও হয় না, প্রায়শ্চিত্তও হয় না; এখন মানুষকে পাপে যত না কলঙ্কিত করে, প্রায়শ্চিত্তের আড়ম্বরে—সংশোধনাগারের কুসংসর্গে—তদপেক্ষা অনেক বেশী করে। ...

যে মানুষ অপকর্ম্ম করিয়াছে তাহাকেই যখন সাজা দেওয়া হইতেছে তখন সে আর সে মানুষ নয়।

কোনো একটা কাজ করিয়া শেষে যদি মনে খট্‌কা উপস্থিত হয় তখন বুঝিতে হইবে সে কাজ করিবার মত যোগ্যতা আমার নাই এবং চরিত্রটি ঠিকমত গঠিত হইতে এখনো একটু বিলম্ব আছে। ভালো কাজ করিয়াও সময়ে সময়ে মনে খট্‌কা লাগে, তাহার কারণ অনভ্যাস, এবং পুরাতন পরিবেষের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্যের অভাব।

তাঁবেদার হইয়া থাকা যাহার পক্ষে অনিবার্য্য তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকা আবশ্যক, যাহাতে উপরওয়ালা তাহাকে খাতির করিয়া চলে। সে জিনিসটা সাধুতাই হোক, স্পষ্টবাদিতাই হোক, আর দুর্ম্মুখতাই হোক।

যে ঘনিষ্ঠতার জন্য লালায়িত, সে মনের কথা বাহির করিয়া লইতে পারে না; যে মনের কথা বাহির করিয়া লইয়াছে সে আর ঘনিষ্ঠ হইতে চায় না।

"সাধু" উদ্দেশ্যকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে হইলে "অসাধু" উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন গতি নাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সমস্ত উপায় লোকে অবলম্বন করিয়া থাকে "সাধু" উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও ঠিক সেইগুলিই অবলম্বনীয়, যথা,—হঠকার, শঠতা, অসত্য, অন্যায়, বিপক্ষের কুৎসা, গ্লানি।

খোসামোদ করিয়া, মন ভুলাইয়া, যাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিতে যায়, তাহারা ভারি দুঃসাহসের কাজ করে। যাহার খোসামোদ করা হইতেছে সে বুঝিতে পারিলেই মুস্কিল। খোসামোদ ঠিক ঘুমপাড়ানোর ঔষধের মত, ঔষধ যদি ধরিল ভালই, নহিলে ঘুম চটিয়া গিয়া মানুষকে অতিমাত্রায় সজাগ করিয়া তোলে।

ভক্তিশ্রদ্ধাই বল, আর কৃতজ্ঞতাই বল, প্রকাশের বেলায় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। বাড়াবাড়ি করিলেই নিজেকে খাটো বলিয়া মনে হইবে, হীন বলিয়া মনে হইবে, খোসামোদ করিতেছি বলিয়া মনে হইবে। যতই স্বাধীন-চেতা হও আর যতই সাধু-প্রকৃতির লোক হও, মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিবে, যে, সত্যের নিকট তুমি অপরাধী।

মানুষ যখন নিজে না বুঝিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখন পুণ্যকর্ম্ম পাপকর্ম্মের সামিল, এবং সমান ভয়ঙ্কর। মানুষ বাহিরের চাপে যে কাজ করে তাহাতে কখনো তাহার গুণের পরিচয় থাকিতে পারে না; যাহা তাহার অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্তি পায় তাহাতেই তাহার যথার্থ পরিচয়।

আমি তোমাদিগকে ভবিষ্যতের গর্ভস্থিত লোকোত্তর মানবের (Super-man) কথা শুনাইব। তোমরা মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিবার মত কোন্ কাজ করিয়াছ? অস্ফুট-বুদ্ধি পশু এবং লোকোত্তর মানব—এই দুয়ের মাঝের অবস্থা হইল বর্ত্তমান কালের মানুষ, অর্থাৎ এই আমরা।

"অমুক আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ" এমন কথা মনে হইলে চারু প্রকৃতির লোক মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করে। আর "আমি অমুকের কাছে ঋণী" এই কথাটা মনে পড়িলে হীন স্বভাবের লোক মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতে থাকে।

যাহাদের ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবল তাহারাই বলে "নারীজাতি আমাদের জীবনের বিঘ্নস্বরূপ, শত্রু।" এই কথাতেই কিন্তু তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে; তাহাদের অসংযত প্রবৃত্তিগুলা আতিশয্যের বশে যেন আত্মঘাতী হইয়া মরিতে চায়, এবং শেষে সেই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির উপায়টিকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করিতে শেখে।

প্রেমার্থী পুরুষেরা কল্পনায় নারীজাতিকে যেমনটি

দেখে, প্রেমের প্রভাবে বাস্তবিকই স্ত্রীজাতি ঠিক তেমনই হইয়া উঠে। যে সম্পর্ক আমাদিগকে উন্নত করিতে না পারে তাহা আমাদিগকে অবনত করিতে বাধ্য। সেই জন্য বিবাহের পর অধিকাংশ পুরুষের মানসিক অবনতি ঘটে এবং স্ত্রীলোকের উন্নতি হয়।

"যাহাকে বিবাহ করিতে বসিয়াছি, বুড়া বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিব কি না," বিবাহের পূর্ব্বে ইহাই একমাত্র বিবেচনার বিষয়; বাকী শুধু বাক্যাড়ম্বর।

স্ত্রীলোক যাহাকে ভালবাসে তাহাকে অন্ধের মত ভালবাসে; যাহাকে ভাল না বাসে তাহার সম্বন্ধে একেবারে অন্যায় করে। স্ত্রীলোকদের ভালবাসা ভারি বিচিত্র, উহার মধ্যে রাত্রির সঙ্গে দিন, আলোর সঙ্গে অন্ধকার একত্র বসতি করে।

যুদ্ধের প্রধান দোষ এই যে উহা বিজয়ীকে অহঙ্কারে বিমূঢ় করিয়া তোলে এবং বিজিতকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে। যুদ্ধের প্রধান গুণ এই যে উহা মানুষের কৃত্রিম আবরণ কাড়িয়া লইয়া স্বাভাবিক দোষগুণ পরিস্ফুট করিয়া দেয়। ইহা শিক্ষা ও সভ্যতার শিশির-রাত্রি। সেইজন্য যুদ্ধের অবসানে মানুষের ভাল করিবার এবং মন্দ করিবার দুইটা শক্তিই বেশ প্রবল হইয়া ওঠে।

ভাল বলে কাহাকে? যাহাতে মানুষের শক্তিসামর্থ্যের অনুভূতি মনের মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে তাহাই ভাল;—যাহাতে শক্তিসঞ্চয়ের ইচ্ছা প্রবুদ্ধ থাকে তাহাই ভাল। মন্দ কাহাকে বলে? যাহা দুর্ব্বলতা হইতে প্রসূত তাহাই মন্দ। সুখ কি? নিত্য-বর্দ্ধমান শক্তিসামর্থ্যের অনুভূতিই সুখ, বিঘ্ন-বিজয়ের নামান্তর সুখ।

ভাবের প্রাবল্য মহত্বের চিহ্ন নয়; ভাবের স্থায়িত্বই মহাপুরুষের লক্ষণ।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মনের গড়ন একই। দুজনেই এক সুরে গান গায়; তফাতের মধ্যে একজন চড়া পর্দ্দায় আর একজন নীচু পর্দ্দায়। অথচ, এই সামান্য প্রভেদেই উভয়ের মধ্যে মনান্তরের অন্ত নাই। পরস্পর পরস্পরকে ক্রমাগত ভুল বুঝিয়া জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলে।

যে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত ভাবের প্রাবল্য ঘটে পুরুষমানুষ তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া পালায়; যে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত ভাবের একান্ত অভাব পুরুষ দেখিলে সে নিজেই পলাইয়া যায়।

"পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যায় কি করিয়া?" ভাবিবার সময় নাই, চড়াই সুরু করিয়া দাও।

নৈতিক বিধান আমাদের ভাব-জীবনেরই সাঙ্কেতিক ভাষা।

বাঁচিয়া থাকা বলে কাহাকে? আমাদের শরীর ও মনের যে যে অংশ মরিতে বসিয়াছে তাহা ক্রমাগত প্রতিমুহূর্ত্তে সতর্কতার সহিত নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়ার নামই বাঁচিয়া থাকা। যাহা কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহা জরাতুর হইয়াছে তাহা নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করার নামই বাঁচিয়া থাকা।

যে ব্যক্তি আত্মসম্মান হারাইয়াছে, তাহার কথা কেউ মানে না, সে কখনো জন-নায়ক হইবার দাবী করিতে পারে না।

ইচ্ছাশক্তির পক্ষাঘাত! সে এক ভয়ঙ্কর সামগ্রী। সভ্যতা যেখানে অধিক দিন আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, মতের বৈচিত্র্য যেখানে অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে সেই খানেই এ ব্যাধির প্রবল প্রকোপ।

যাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই, সুতরাং যে শত্রুর সম্মুখীন হয় না তাহাকে লোকে ক্ষমা করিতে পারে; কিন্তু যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত নাই, সে একেবারে অমানুষ; সে ঘৃণার্হ।

পুরুষের চোখে স্ত্রীজাতি পক্ষীজাতির মত; যেন পথ হারাইয়া আকাশ-চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে ভারি কোমল, আঘাত সহিতে পারে না; আর একদিকে ভারি দুর্ব্বিনীত, পোষ মানিতে চায় না। ভারি আশ্চর্য্য, ভারি চমৎকার, ভারি মায়ার জিনিস; ঠিক পাখীর মতই। সেই জন্যই বোধ হয় খাঁচায় পুরিয়া রাখা হয়—পাছে পাখীর মত হঠাৎ উড়িয়া পালায়!

তোমরা কানে আঙুল দিতে পার, আমি একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলি; অহঙ্কার মহৎ অন্তঃকরণের একটি প্রধান উপাদান। কথাটা একটু খুলিয়া

বলি, যে বড় হইবে, তাহার কথা যে সকলকে বাধ্য হইয়া মানিয়া লইতে হইবে, এসম্বন্ধে তাহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।

(১) সাধারণের কর্ত্তব্য এবং নিজের কর্ত্তব্যের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলা, (২) কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানকে 'ভাগের মা' না করা, এবং (৩) নিজের বিশেষত্বটুকু বিকশিত করিয়া প্রাপ্য সম্মানাদি আদায় করা—এইগুলি আভিজাত্যের লক্ষণ, প্রতিভার চিহ্ন।

প্রকৃতির রাজ্যে আইন কানুন আছে বলিলে ভুল বলা হয়; আইন কানুন নাই, অবশ্যম্ভাবিতা আছে। কারণ প্রকৃতির আধিপত্যের ভিতরে কেহই হুকুম করিতে আসে না, হুকুম মানিতেও কেহ চায় না; আইনও নাই, সুতরাং আইন লঙ্ঘনও নাই; আছে কেবল অবশ্যম্ভাবিতা।

নিজের দুর্গতিতে যে দুঃখ প্রকাশ করে সে ঘৃণার্হ; উহা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। দুর্গতির মধ্যে যে মানসিক তেজ রক্ষা করিতে পারে সেই মানুষ, সে অভিজাত।

দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িলে সাধারণ মানুষ হয় নিজেকে দোষে, না হয় আর পাঁচজনকে দোষী করে; দুর্দ্দশাকে সুদশায় পরিণত করিবার চেষ্টা প্রায়ই করা হয় না।

সগর্ব্বে বাঁচিয়া থাকা যখন অসম্ভব তখন সগৌরবে মরিয়া যাওয়াই শ্রেয়; যিনি প্রকৃত অভিজাত তিনি ইহাই করিয়া থাকেন।

স্বাধীনতার অর্থ কি? নিজের নিজের আচরণের জন্য স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছার নামই স্বাধীনতা। নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই স্বাধীনতা।

মানব-জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি, শিক্ষাসংস্কারের সম্যক্ অনুশীলনের উপর নির্ভর করিতেছে। স্বাস্থ্য, শারীর-ক্রিয়া, সামাজিকতা এবং পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে শিক্ষা-সংস্কার প্রয়োগ করিতে হইবে, জ্ঞান বাড়াইতে হইবে। বাকী কাজ আপনা হইতে হইবে। আত্মার কথা, এখন কিছুদিনের জন্য, শুধু ধর্ম্ম-বক্তারাই ভাবুন।

সাম্যবাদের মত মারাত্মক বিষ দ্বিতীয় নাই। যে তোমার যোগ্য তাহার সঙ্গে যোগ্যের মত ব্যবহার করা, এবং যে অযোগ্য তাহার সঙ্গে যোগ্যের মত ব্যবহার না করা,—ইহাই তো যুক্তিসঙ্গত কথা। যাহা স্বভাবতঃ অসমান তাহাকে কখনো সমান করিতে যাইয়ো না। অনর্থ ঘটিবে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক অযৌক্তিক কথার দ্বারা কোনো বিষয়ের পোষকতা করায় উক্ত বিষয়ের যত ক্ষতি সংসাধিত হয় এমন আর কিছুতে হয় না।

যে সমস্ত ধর্ম্মমতের ইতিহাস পাওয়া যায় তন্মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মই ধ্রুব এবং চিরন্তন।

"সকলের সমান অধিকার"—ইহা অসত্য এবং অন্যায়ের একটা অদ্ভুত ছদ্ম বেশ। কারণ, এতদনুসারে সমাজ গড়িলে যে ব্যক্তি যথার্থ বড় সে কখনো ন্যায্য প্রাপ্য পাইবে না।

আমরা এতদিন কেবল ভিক্ষা করিয়াছি, এইবার ভিক্ষাদান করিবার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করিব।

বিষয়-নির্ব্বাচনেই কবির বিশেষত্ব; শিল্পই শিল্পীর শ্রদ্ধাপ্রকাশের একমাত্র ভাষা।

মৌলিকতা কি? যে সামগ্রীর বা যে ভাবের এখনো নামকরণ হয় নাই, অথচ যাহা সকলের চোখের সাম্নে রহিয়াছে, তাহাকে নামসংজ্ঞা-বিশিষ্ট করার নাম মৌলিকতা; যাহার নাম নাই তাহা সাধারণ লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। নাম কর্ণগোচর করিতে পারিলে, তখন জিনিষটাও দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে। অধিকাংশ মৌলিকতা-বিশিষ্ট ব্যক্তি নামকরণে সুদক্ষ।

যাহাদের মনের গড়ন খুব সূক্ষ্ম এবং সুন্দর, বিপদের আঘাতে তাহাদেরই বিকল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। যাহাদের মনের গড়ন মোটা ধরণের তাহারা ওরূপ বিকল হয় না। মানুষের আঙুল কাটা পড়িলে আর গজায় না, কিন্তু টিক্‌টিকির লাঙ্গুল পর্য্যন্ত কাটা পড়িলে আবার গজায়।

বিপদের মধ্যে যে বাস করে, বাঁচিয়া থাকার তুচ্ছতম উপকরণটির মধ্য হইতেও সে যথেষ্ট আনন্দ-রস দোহন করিয়া লইতে পারে। আগ্নেয়-গিরির উপত্যকায় নগর বসাও, দুর্গম সাগরে জাহাজ লইয়া যাত্রা কর, বিরোধের মধ্যে বাস করিতে শেখ, ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগকে কিছু দিয়া যাইতে পারিবে।

স্মরণশক্তি যাহার প্রখর সেই কথা দিয়া কথা রাখিতে পারে; কল্পনাশক্তি যাহার তীব্র সেই পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতে সক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের সঙ্গে নৈতিক জীবনের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক!

ধর্ম্মনীতির সূত্রে যাহার যত বেশী দখল, মানুষের প্রতি ঘৃণা তাহার তত প্রবল। নীতিশাস্ত্রকে মান্য করার অর্থ মানুষের জীবন-যাত্রাকে অপমান করা।

মানুষের "বড় কাজের গোড়া আত্মম্ভরিতা, মাঝারি কাজের মূল অভ্যাস, এবং ছোট কাজের গোড়া ভয়" যদি বলা যায় তবে নিতান্ত ভুল হয় না।

যে যে জিনিস দুর্ব্বলতা এবং অবসাদের জনক, মানুষকে আমি সে-সকলের মুখের উপর 'না' বলিতে শিখাই। আর যে যে জিনিষ তেজের উদ্দীপক এবং বলের বর্দ্ধক, সে সকলের সম্মুখে 'হাঁ' বলিতে শিখাই।

আত্মস্থ শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার অনেক প্রণালী আছে, সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশও আছে। কতকগুলি উপদেশ, কেবল, আত্মসংযমী, শক্তি-উদ্বোধনে এবং শক্তি-প্রয়োগে, অংশতঃ অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের জন্য; আর কতকগুলি সংযমে অনভ্যস্ত সাধারণ লোকের জন্য। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মধ্যে আছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে খ্রীষ্টের ধর্ম্মে।

সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের যেখানে অবসান, শিল্পের সেইখানে আরম্ভ।

শিক্ষা-সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রসব এবং চিত্ত-প্রসাধনের চরম উপাদান সঙ্গীত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মৃত্যু-মোচন

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের সারমর্ম্ম:—স্বামী ফিদিয়ার সহিত স্ত্রী লিজার মোটে বনিত না—নিত্য দুইজনে ঝগড়া-খিটিমিটি বাধিত। লিজা মাতৃগৃহে চলিয়া গেল। সেখানে বাল্য-সুহৃদ ভিক্তরের আশ্বাসে ও সান্ত্বনায় সে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইল। ভিক্তর লিজাকে বরাবরই ভালো বাসিত। তবে ফিদিয়া ছিল তাহার বন্ধু, তাই লিজার সহিত ফিদিয়ার বিবাদে আত্মপ্রেম সে কোনমতে দমন করিয়া রাখিয়াছিল। ওদিকে ফিদিয়া স্ত্রীর গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া বেদিয়া-গৃহে বন্ধু-মজলিসে মদ খাইয়া গান শুনিয়া আমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। বেদিয়া-কন্যা মাশা তাহাকে ভাল বাসিত—তাহার সুখে সুখ ও তাহার দুঃখে দুঃখ বোধ করিত। এমনই ভাবে ফিদিয়ার দিন কাটিতেছিল; কিন্তু পাঁচজনের অনুরোধে সে বুঝিল, লিজাকে বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে সে মুক্তি পাইয়া ভিক্তরকে বিবাহ করিয়া জীবনে সুখের স্বাদ পাইবে। মুক্তি দিতে গেলে কিন্তু ডাইভোর্সের আশ্রয় গ্রহণ এবং সমস্ত অপরাধ ফিদিয়াকেই ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিতে হয়—অথচ সে এমন কোন অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য লিজা আদালত হইতে ডাইভোর্সের আদেশ পাইতে পারে। সুতরাং আদালতে মিথ্যা হলপ করা ছাড়া ফিদিয়ার উপায়ান্তর নাই, তাহাতে সে একান্ত নারাজ। অগত্যা সে স্থির করিল, আত্মহত্যা করিয়া লিজাকে মুক্তি দিবে। এমন সঙ্কল্প করিয়া যখন সে আত্মপ্রাণ-বিনাশের উদ্যোগ করিয়াছে, তখন মাশা সহসা আসিয়া পড়িয়া তাহাতে বাধা দিল। সমস্ত শুনিয়া মাশা কহিল, মরিবার বা মিথ্যা হলপ লইবার কোন প্রয়োজন নাই। সে সাঁতার জানে না; নদীর তীরে আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ রাখিয়া মাশা-প্রদত্ত পোষাক পরিয়া কোথাও যদি সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায় তাহা হইলে লোকে জানিবে, জলে ডুবিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তখন লিজা-ভিক্তরের বিবাহেরও সকল অন্তরায় কাটিয়া যাইবে। ফিদিয়া এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইল। লোকে জানিল, সে মরিয়াছে এবং ভিক্তরের সহিত লিজার বিবাহও দিব্য নিরুদ্বেগে ঘটিয়া গেল।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

এক জীর্ণ হোটেলের দীন কক্ষ।

(টেবিলের চারিধারে বসিয়া বহু নর-নারী চা ও মদ্য পানে রত, গল্প-গুজব করিতেছে। সম্মুখে ছোট টেবিলের পার্শ্বে ফিদিয়া উপবিষ্ট—পরিধানে ছিন্ন মলিন বেশ, মুখে-চোখে কালিমার রেখা। ফিদিয়ার পার্শ্বে চিত্রকর পেতুস্কভ্; উভয়েই মদ্যপানে ঈষৎ নেশাতুর।)

পেতুস্কভ্। বাঃ, বাঃ, চমৎকার—একেই ত বলে, আসল ভালবাসা—অর্থাৎ প্রেম। তার পর?

ফিদিয়া। আমাদের ঘরের কি আমাদের সমাজের মেয়েদের কথা হলে এতটা আশ্চর্য্য হতুম না। তারা এমন ত্যাগ-স্বীকার করবে, সেটা ত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়! কিন্তু এ হল একটা বেদের মেয়ে—ছেলেবেলা থেকে যে শুধু টাকাই চিনে এসেছে,—অপরের কাছ থেকে দম্ দিয়ে কি করে সেই টাকা আদায় করতে হয়, এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছে, তার পক্ষে এমন ত্যাগ-স্বীকার, আশ্চর্য্য নয়? আর কি নিঃস্বার্থ এ ভালবাসা! শুধু দিতেই জানে, সর্ব্বস্ব দিয়েই সুখী—প্রতিদানে একটা কড়ি অবধি চায় না। তাই ত আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি—

পেতুস্কভ্। ঠিক ত! আর এইই হল প্রেম—কবিরা যা নিয়ে ছন্দ মেলায়, আমরা যার উপর রঙ ফলাই!

ফিদিয়া। জীবনে আমি শুধু একটি ভাল কাজ করেছি, তায় এই প্রেমের এতটুকু অমর্য্যাদা করিনি, এতটুকু অন্যায় সুযোগও গ্রহণ করিনি। কিন্তু জান কি, কেন—?

পেতুস্কভ্। এ আর জানি না! দয়া—শাদা কথায় যাকে বলে, করুণা!

ফিদিয়া। তুমি কিছু জান না। করুণা, দয়া? কেন—তার উপর দয়া কেন হবে? তা নয়—আমি তাকে শ্রদ্ধা করি—হাঁ, যথার্থই শ্রদ্ধা করি। সে যখন গান গাইত,—কি মিষ্ট গলা সে, সুন্দর গান—এখনো কি গায় না? গায়। যখন সে গাইত, তখন আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে থাকতুম। মনে কেমন শ্রদ্ধার উদয় হত। প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতুম, বাসি,—ভক্ত তার দেবতাকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভালবাসি; তাই কখনো তাকে মাটির ধূলোয় টেনে আনতে চাইনি—মাটিতে মেশাবার কথা মনেও ওঠেনি! এখন? এখনো একটা পবিত্র স্মৃতির মত সে আমার সমস্ত অন্তর ভরে আছে।

(মদ্যপান)

পেতুস্কভ। বুঝেছি, ফিদিয়া, তুমি দেখ্‌ছি একজন কবি।

ফিদিয়া। আরো শোন—এ জীবনে ভালবাসার মোহে ছ-একবার পড়েওছি। প্রথম সে—এক সুন্দরী নারী—কি অন্ধ অনুরাগে তার পিছনে ফিরতুম—কুকুর যেমন মনিবের পিছনে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি ঘুরে বেড়িয়েছি। সে-ও যেন আমায় পাক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর সে মোহ ভাঙ্‌ল—কি করে, শুনবে? তার এক স্বামী ছিল—আমি জানতুম না—সে একদিন বললে, তার স্বামীর ঘর সে ছেড়ে যাবে, যদি আমি তার সহায় হই! শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম! কি সর্ব্বনাশ! স্বামী—? সে একজনের স্ত্রী? প্রাণের মধ্য দিয়ে যেন একটা আগুনের শিখা ছুটে গেল! আমি পালালুম। নিরীহ স্বামী, তার সর্ব্বনাশ—? আমার দ্বারা হবে না! পালিয়ে এলুম—কিন্তু সে বিচ্ছেদের ব্যথা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করত। কৈ, মাশার বিচ্ছেদে তেমন ত হয় না—কোন জ্বালা, কোন যন্ত্রণা নেই! তবে প্রলোভনের বাড়া শক্র নেই! তাই মনে হয়, তার কাছ থেকে পালিয়ে এসে ভাল করেছি—আমার দেবী দেবীই আছে, তেমনি অটুট্, তেমনি অকলঙ্ক—তাকে খেলার পুতুল করে ফেলিনি! এই মনে করে যে শান্তি, যে সান্ত্বনা পাচ্ছি, তার তুলনা নেই। পেতুস্কভ্ বন্ধু, যত বড় লক্ষ্মীছাড়া হই না কেন আমি, যত নীচ, যত দীন, তবু এই শ্রদ্ধাটুকু মাণিকের মত আমার ময়লা প্রাণটাকে ঝক্‌ঝকে করে রাখ্‌বে না কি? সে আমার মনের সমস্ত ময়লা সাফ্ করে দিয়েছে—তারই আলোয় জীবনটাকে যেন আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

পেতুস্কভ্। মাশা এখন কোথায় আছে?

ফিদিয়া। জানি না, জানতে চাই-ও না। সে সব অতীতের কথা। এ বর্ত্তমানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, কোন সম্পর্ক নাই—!

(সহসা পশ্চাতে সুরাপান-বিহ্বলা এক নারী চীৎকার করিয়া উঠিল। ম্যানেজার পুলিশ লইয়া আসিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। ফিদিয়া ও পেতুস্কভ্ স্থির নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।)

পেতুস্কভ্। (চারিধার স্তব্ধ শান্ত হইলে) তোমার জীবনটায় বেশ বৈচিত্র্য আছে, দেখছি।

ফিদিয়া। বৈচিত্র্য! মোটে না—ভারী সাধারণ, ভারী একঘেয়ে আমার জীবন! আমাদের সামনে—অর্থাৎ আমরা যেমন ঘরে জন্মেছি, তেমন সব ঘরে—সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। যেটা ইচ্ছা হয়, সেইটে ধরে চলে যাও। এক,—খাও-দাও, চাকরি-বাকরি কর,—ব্যস্—টাকার কাঙ্গাল শুধু—টাকা ধ্যান্, টাকা জ্ঞান সার কর। যত টাকা আস্‌তে থাকবে, প্রাণটার উপর পাষাণের ভারও তত নাম্‌বে—সখ্ নেই, সাধ নেই—কেবলি টাকার যখ্ হও! দুনিয়ার আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। এ পথ আমার পছন্দ হয়নি—ভারী বিশ্রী লাগ্‌ত—হয়ত এ পথের পথিক হবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। দ্বিতীয় পথ, এই সমস্ত

কদর্য্যতা দূরে ঠেলে মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষ হয়ে চলে যাওয়া। কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হবে না—ভয়ে ঠিক পথ ছাড়বে না। এ পথে ক'জন চল্‌তে পারে—অটল, অচলভাবে—ক'জন? এ পথে চলতে হলে সাহস চাই,—তেমন সাহসী বীর জগতে ক'জন আছে? আর এক পথ—তৃতীয় পথ,—মদ খাও—খেয়ে সব ভোলো,—খালি গান গাও, ফুর্ত্তি চালাও, খালি আমোদ—ব্যস্—কারো তোয়াক্কা রেখো না। এই পথ আমি ধরেছিলুম। শুধু গান, শুধু ফূর্ত্তি—আজ সেই গান, সেই ফূর্ত্তি আমায় কোথায় টেনে এনেছে, দেখ,—চেয়ে দেখ। (মদ্যপান)

পেতুস্কভ্। কেন, বিয়ে—? সংসার? আমার ত মনে হয়, আমার যদি স্ত্রীটি ভালো হত ত জীবনটা আগাগোড়া গোছাতে পারতুম। কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে যে স্ত্রী এলেন, তিনি আমার সর্ব্বনাশ করে ছাড়লেন!

ফিদিয়া। সংসার? হাঁ, আমার স্ত্রী আদর্শ স্ত্রী ছিল। এখনো সে আছে, বেঁচে আছে—কিন্তু কথাই কি জান, তার যেন কোন তেজ ছিল না, যাকে বলে সেই প্রাণ ছিল না! দেখেছ ত, ভালো মদে কেমন একটা ঝাঁজ আছে—বোতলের ছিপি খুললেই টগ্‌বগ্ করে ওঠে—আমার স্ত্রীর জীবনে এই ঝাঁজটুকু ছিল না—প্রাণ আমার তাই মাতিয়ে তুলতে পারত না! কাজেই আমায় এই ঝাঁজের জন্য অন্য জায়গায় ছুটতে হত। ক্রমে মানুষের বার হলুম। সংসারের নিয়ম জান ত—আমি যা চাই, তাতে কেউ বাধা দিলে, একেবারে সে দু'চক্ষের বিষ হয়—কাজেই স্ত্রীকে হেনস্তা করতে আরম্ভ করলুম—তবুও সে বোধ হয় আমায় ভালো বাসত!

পেতুস্কভ্। বোধ হয় কেন?

ফিদিয়া। নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি না, তাই বল্‌ছি, বোধ হয়। সে আমার স্ত্রী ছিল,—কিন্তু মাশা কে? কেউ নয় ত! তবু মাশা যেমন অবাধে আমার প্রাণের মধ্যে আনা-গোনা করত, সে তেমন পারত না ত! তার পর এক ছেলে হল,—সেই ছেলে নিয়েই সে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকত, আমার খোঁজ রাখবার বড় একটা অবকাশও ছিল না—তখন আমি মনের লাগাম ছেড়ে দিয়ে, যে দিকে প্রাণ চেয়েছে, সেই দিকে ছুটে চলেছি। বাড়ী থেকে দু'তিন দিন ত অমন বাইরেই থাকতুম—আ[মা]র কোন রকম ঠিক-ঠিকানা ছিল না! আর মদ—? ম[দে] চুরচুরে হয়ে থাকতুম! মন থেকে জগৎ সংসার স্ত্রী-[পুত্র] সব মুছে গেছল—শুধু মদ—আর তারি নেশায় ম[শ]গুল হয়ে ফূর্ত্তি—ঠুমকি নাচ, রঙিলা গান! ওঃ, আ[জ] সে সবের পরিণাম দেখছি! আমোদ করতে যে রোশ্[নাই] জ্বেলেছিলুম, তারি আগুনে আমার হাড়-মাস্ অব[ধি] পুড়ে আজ ছাই হয়ে গেছে! সে মহাশ্মশানে সব পু[ড়ে] গেছে—শুধু বসে আছে, মাশা—মাশা বসে বসে আম[ার] সেই পোড়া হাড়ে-মাসে কিসের স্নিগ্ধ প্রলেপ লে[পন] করছে! কৈ, মাশা ত পুড়ল না—পুড়বে কেন? তা[কে] পোড়ায় কে? সে যে দেবী—দেবীর গায়ে কি আ[গু]নের আঁচ লাগে, বন্ধু? এই দুই নারী—এক আমা[র] স্ত্রী, আর মাশা—! স্ত্রীকে আমি দু'পায়ে থেঁৎলেছি—আর মাশাকে দেবীর মত পূজা করে আসছি—স্ত্রী[কে] ভালবাসা—? না, না, বাসিনি, কখনো বাসিনি—যেটুকু বেসেছি বলে ভেবেছি,—সেটুকু ভালবা[সা] নয়—সেটুকু হিংসা, নীচ বীভৎস হিংসা, ভালবা[সা] নয়!

(আর্ত্তেমিবের প্রবেশ; আর্ত্তেমিব একজন ভাগ্যান্বেষী যুবা।)

আর্ত্তেমিব। (অভিবাদনান্তে ফিদিয়ার প্রতি) ফি[দিয়া] মশায়, আমাদের আর্টিষ্টের সঙ্গে আলাপ করছেন? পেতুস্কভ্ আমাদের খাসা ছবি আঁকে।

ফিদিয়া। (গম্ভীরভাবে) হাঁ, এঁর সঙ্গে আলা[প] হল।

আর্ত্তেমিব্। (পেতুস্কভের প্রতি) কি হে তোমা[র] সে ছবিখানা হল?

পেতুস্কভ্। কোন্ ছবি?

আর্ত্তেমিব্। গভর্ণমেণ্ট যেখানা আঁক্‌তে দিয়েছিল—

পেতুস্কভ্। গভর্ণমেণ্টের কোন ছবি ত আঁকবার অর্ডা[র] আমি পাইনি।

আর্ত্তেমিব্। ওঃ, বটে! (বসিয়া) আমি এখানে বসলে, আপনাদের কোন আপত্তি হবে কি?

(ফিদিয়া ও পেতুস্কভ্ স্তব্ধ হইয়া রহিল)

পেতুস্কভ্। ফিদিয়া তার জীবনের কতকগুলো ঘটনা আমায় বল্‌ছিল!

আর্তেমিব্। কি—? গুপ্ত কথা? বটে! তা, বেশ, কোন ভয় নেই—আমি শুনব না, বা বিরক্ত করব না। তোমাদের গল্প চল্‌তে পারে—ক্ষতি কি! আচ্ছা, আমি না হয় ওদিকে বসিগে। (পার্শ্ববর্ত্তী টেবিলের ধারে গিয়া বসিল। উভয়ের কথাবার্ত্তার দিকে সে গোপনে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত শুনিতে লাগিল।)

ফিদিয়া। লোকটাকে আমি মোটে দেখ্‌তে পারি না।

পেতুস্কভ্। যাক সরে গেছে।

ফিদিয়া। বয়ে গেল—থাকলেই বা কি! দেখ,এক একটা লোক থাকে, যাদের দেখলেই কেমন অসহ্য বোধ হয়। ও লোকটার সামনে কোন কথা আমি কইতে পারি না—মুখ কেমন খোলেই না। অথচ, তোমার সঙ্গে ক'দিনেরই বা আলাপ, বল—তবু সব কথা তোমায় খুলে বলতে কোথাও কিছু বাধছে না। হাঁ,—কি বলছিলুম?

পেতুস্কভ্। তোমার স্ত্রীর কথা। তোমাদের ছাড়াছাড়ি হল, কেন?

ফিদিয়া। ও, হঁ্যা—! (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। আমার স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে।

পেতুস্কভ্। তার মানে, ডাইভোর্স হয়ে গেছে বুঝি?

ফিদিয়া। না। (মৃদু হাসিল) সে যে বিধবা।

পেতুস্কভ্। বিধবা? কি রকম!

ফিদিয়া। রকম আবার কি! সে বিধবা। অর্থাৎ আমি নেই!

পেতুস্কভ্। নেই!

ফিদিয়া। বুঝতে পাচ্ছ না? আমি নেই—অর্থাৎ আমি মারা গেছি। স্বামী মারা গেলে তবেই না স্ত্রী বিধবা হয়! তা আমিও মারা গেছি কি না, কাজেই আমার স্ত্রী বিধবা না হয়ে আর কি করে বল? (হাসিল।) ঠিক বুঝতে পাচ্ছ না? না—? আচ্ছা, শোন। (আর্তেমিব ঘাড় বাঁকাইয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল) তোমায় বলতে আর হানি কি? সে আজ এই ক'মাসের কথা! সর্ব্বস্ব আমি নেশা-ভাঙে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছিলুম—কিছু সংস্থান ছিল না। আমার স্ত্রীর জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল—এমন সময় আমার এক বন্ধু স্ত্রীর সাহায্যে এলেন। আমি যেমন বদ্, বন্ধুটি তেমনি ভালো! আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ভাব ছিল, ভালবাসাও ছিল! আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে, এঁর সঙ্গেই আমার স্ত্রীর বিয়ে হত—যাই হোক, দুর্দ্দশায় পড়ে আমার স্ত্রী ত এঁর আশ্রয় পেলেন,—দুজনের মধ্যে বহুদিনকার পুরানো ভালবাসা তখন জেগে উঠল। আমি তখন দু'চোখ বুজে অধঃপাতের অন্ধকারে নেমে চলেছি—স্ত্রীর কোন খোঁজ রাখি না! তখন মাশাকে দেখেছি—মাশার উপর ভালবাসায় প্রাণ আমার পূর্ণ হয়ে উঠেছে! আমিই বন্ধুর কাছে প্রস্তাব করলুম, আমার স্ত্রীকে তুমি বিয়ে কর। তারা প্রথমে রাজী হল না! আমিও আমার পথ ছাড়লুম না—শেষে তারা আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বিয়েতে রাজী হল!

পেতুস্কভ্। সংসারের নিয়মই এই!

ফিদিয়া। না, শোন। তাদের ভালবাসায় এতটুকু মলা-মাটি লাগেনি। ধর্ম্মে বন্ধুর যেমন বিশ্বাস, স্ত্রীরও তেমনি! তারা বললে, আমি ডাইভোর্স দিলে তারা বিয়ে করে। তবে আদালতে গিয়ে আমায় হলপ করতে হবে, যে আমি অপরাধী—এই সব অপরাধ করেছি। মিথ্যা কথা আদালতে বলতে মন কিন্তু চাইল না—তখন ভাবলুম, আত্মহত্যা করে মিথ্যার হাত এড়াই, এদেরও মুক্তি দি! আত্মঘাতী হতে বসেছি, এমন সময় এক বন্ধু এসে বাধা দিলে—বললে, মরবে কেন? জীবনের উদ্দেশ্য আছে। সে এক পরামর্শ দিলে। তখন আমি স্ত্রীকে চিঠি লিখে বিদায় নিলুম। পরদিন নদীর ধারে আমার পোষাক পাওয়া গেল, জামার পকেটে কাগজপত্র ছিল, তাতেই পরিচয় মিলল—আর আমিও সাঁতার জানতুম না, অনেকেই তা জানত, ব্যস্, মরে গেছি সাব্যস্ত হতে দেরী হল না, কারো মনে এতটুকু দ্বিধাও উঠল না।

পেতুস্কভ্। কি রকম করে হল? তোমার দেহ পাওয়া গেল না, অথচ তুমি মরে গেছ, সাব্যস্ত হল? বাঃ—

ফিদিয়া। আহা, পাওয়া গেছল হে। ভাব একবার কাণ্ডখানা। এক হপ্তা পরে জল থেকে পুলিশ একটা কাকে টেনে তুললে! আমার স্ত্রী এল, সে দেহ

সনাক্ত করতে। সে এক পচা-গলা-দেহ! কারো সাধ্য কি —তাকে চেনে! স্ত্রী সেটার পানে চেয়ে রইল—পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন, এই ত তোমার স্বামীর দেহ?" স্ত্রী বললে, "হ্যাঁ।" তারা বললে, "ঠিক চিনতে পেরেছেন?" "হ্যাঁ, এই, এই" বলে আমার স্ত্রী কেঁদে উঠল! তার পর, ব্যস্—আমার গোর আর তাঁদের বিয়ে, দুইই নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল! এখন তারাও নিঃঝঞ্ঝাট হয়েছে,—আর আমি? দেখছ ত—দিব্যি মদ খাচ্ছি, ফুর্ত্তি করছি! ব্যস্, সব হাঙ্গামা মিটে গেছে। ··· কাল তাদের বাড়ীর ধার দিয়ে যাচ্ছিলুম—তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। কেমন খেয়াল হল—একবার সেদিকে চেয়ে দেখলুম। ঘরে আলো জ্বলছিল, সার্শি ভেজানো ছিল, কার একটা ছায়া যেন সার্শির পাশ দিয়ে সরে গেল! ভয়ে আর আমি সে দিকে চাইলুম না—হন্ হন্ করে চলে গেলুম।·· আসল ব্যাপার কি জান পেতুস্কভ্—সময় সময় বুকটা অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করে ওঠে—আবার ভাবি, না, কিসের বেদনা! দু'পেয়ালা মদ খাই—ফুর্ত্তিতে সমস্ত প্রাণ অমনি সাড়া দেয়! এই মদই আমায় শুধু পাগল হতে দেয়নি! তাই এখন ভাবনা হয়েছে—হাতে আর একটি পয়সা নেই— (মদ্যপান)

আর্ত্তেমিব্। (উঠিয়া নিকটে আসিয়া) বাঃ, মশায়, খাসা, চমৎকার! কোথায় লাগে এর কাছে রাজ্যের উপন্যাস-নাটক—! আমি বসে বসে আপনার ইতিহাস শুনছিলুম—অবশ্য অপরাধ করেছি, তার জন্য ক্ষমা করবেন —মোদ্দাকথা শুনলুম, এ অপূর্ব্ব! এখন, এক কাজ করুন না—এখন ইতিহাসের মশলা, লাভে খাটান্ না! বলছিলেন না, আপনার হাতে একটিও পয়সা নেই—অথচ পয়সা না হলে আপনাদের মত 'মাই ডিয়ার' লোকদের কি এক মিনিট চলে? তাই বলছিলুম কি,—এমন গল্প রয়েছে, এর য়ে অনেক টাকা দাম হবে! আপনি মারা গেছেন, বলছিলেন না,—আর পুলিশে,—

ফিদিয়া। আপনাকে ত কোন পরামর্শ-উপদেশ দেবার জন্য ডাকা হয় নি—

আর্ত্তেমিব্। নাই ডাকলেন! আমি ত উকিল নই যে উপদেশের নামে আপনি ভয় পাবেন! তবে এইটুকু শুধু আপনাকে বলতে এলুম, যে, হাতে যখন লক্ষ্মী এমন করে উঠতে চাইছেন, তখন তাঁকে পা দিয়ে ঠেলে ফেল্‌বেন না—ফেলবেন না। এই দেখুন না,—আপনি ত মরে গেছেন, গোরে অবধি সেঁধিয়েছেন—এতদিনে আপনার সে দেহ সেখানে নির্ব্বিঘ্নে কয়লা কিম্বা মাটী, যা-হয়-একটা-কিছু হয়ে গেছে—তাই বলছি কি,—আপনাকে এখন চট্ করে এমন জ্যান্ত শরীরে দেখ্‌লে আপনার স্ত্রী আর আপনার ওয়ারিশ, অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর বর্ত্তমান স্বামীটি এখনই দুই বিয়ের চার্জ্জে পড়ে যাবেন 'খন—আর সে চার্জ্জের যবনিকা পড়বে, দোঁহাকার নির্ব্বাসনে! এই যখন ব্যাপার, তখন আপনাকে সশরীরে সম্মুখে দেখলে তাঁরাই যে আপনার খালি তহবিল বেজায় ভর্ত্তি করে দেবেন,—

ফিদিয়া। আপনার বক্তব্য থামবে, না—এমনি চলবে?

আর্ত্তেমিব্। আচ্ছা, বেশী কিছু করতে হবে না—আপনি শুধু স্বহস্তে একখানা চিঠি লিখে দিন—নিজে না পারেন, আমিই না হয় বকলমে সেরে নিতে রাজী আছি। শুধু তাদের ঠিকানা বলে দিন—তার পর দেখুন দেখি, আপনার টাকা এখানে এসে পৌঁছোয় কি না! আচ্ছা, আমায় না হয় দালালীর বখ্‌রা নাই দিলেন! বুঝলেন,—শ্রেফ্ পরোপকারই না হয় করলুম—

ফিদিয়া। আপনি যান এখান থেকে—আপনার সঙ্গে কোন কথা হয় নি ত আমার—

আর্ত্তেমিব্। আলবৎ হয়েছে। এই বেয়ারাটা সাক্ষী আছে। কেমন্ রে, বেটা, শুনিস্ নি—ইনি বলছিলেন যে, লোকে জানে, ইনি মারা গেছেন!

বেয়ারা। আবার আমার সঙ্গে লাগেন কেন, মশায়? মদ খেয়েছেন, মদই খেয়েছেন,—তা বলে আমার সঙ্গে মস্করা কেন?

আর্ত্তেমিব্। বুঝলেন, মশায়—

ফিদিয়া। বুঝিনি,—কিছু বুঝব না। তুমি বেরোও, বেরোও এখান থেকে। বেরুবে না—? তবে রে পাজী, শয়তান—

আর্ত্তেমিব্। কি?—পাজী—শয়তান! বটে!

পুলিশ, পুলিশ—আমি সহজে ছাড়ছি না—পুলিশ—এই পাহারালা—

(ফিদিয়া যাইবার জন্য উঠিল। আর্ত্তেমিব্ সবলে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। একজন পাহারালার প্রবেশ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভিক্তরের গৃহ। লিজার কক্ষ-সম্মুখস্থ খোলা ছাদ। কারেনিনা ও লিজা (অন্তঃসত্ত্বা) কথা কহিতেছিল ; ধাত্রী ও মিশ্‌না।

লিজা। এতক্ষণে বোধ হয় ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছেন।

কারেনিনা। গাড়ী ত অনেকক্ষণ গেছে।

মিশ্‌না। কে আস্‌বে, মা ?

কারেনিনা। তোর বাবা!

মিশ্‌না। বাবা! ধাই মা, ধাই মা, আমার বাবা আস্‌ছে—আমার বাবা!

কারেনিনা। (জনান্তিকে) ছেলেটা কিছু জানে না, বুঝতেও পারে না। লোকজনকে সাবধান, তারা যেন ঘুণাক্ষরে এ সব কথা প্রকাশ না করে।

লিজা। (জনান্তিকে) কে-ই বা বল্‌তে যাবে ?

কারেনিনা। (জনান্তিকে) আর একটু বড় হলে পুরানো লোকজন সব ছাড়িয়ে দেব। ছোটলোকদের বিশ্বাস নেই। তবে—পাড়াপড়শী—! তারপর ওর লেখাপড়ার জন্যেও ত সহরে গিয়ে এর পর থাকৃতে হবে। তখন পাড়া-পড়শী আবার বল্‌তে আস্‌বে কোথায় ?

লিজা। ধাই ওকে একটু খেলাতে নিয়ে যাক্ না—

কারেনিনা। মিথ্যে না—(ধাত্রীর প্রতি) যা বাছা, ওকে একটু বাগানের দিকে নিয়ে যা। বুড়ো মানুষের মত কাঁহাতক্ ও হাত-পা মুড়ে গট্ হয়ে এখানে বসে থাকে, বল্! এখন হল গে ওর খেলাধূলো করবার সময়—দৌড়-ঝাঁপ করুক একটু—নইলে হাত-পা শক্ত হবে কেন ? যে কাহিল শরীর! অসুখ ত লেগেই আছে।

লিজা। যাও ত মিশ্‌না, বাগান থেকে বড় বড় ফুল নিয়ে এস—আমি ঘরে সাজিয়ে রাখব!

মিশ্‌না। আন্‌ব, মা—? বড় বড় ফুল আনব—একটা, পাঁচটা, তিনটে ফুল আনব—তোমায় দোব, বাবাকে দোব—

কারেনিনা। আর আমায় বুঝি দিবি না—?

মিশ্‌না। দোব, আর ঠাকুমাকে দোব—এত বড় ফুল। এস ত ধাই মা!

(মিশ্‌নাকে লইয়া ধাত্রীর প্রস্থান)

কারেনিনা। (দীর্ঘ-নিশ্বাসান্তে) ছেলেটাকে দেখলে তাকেই শুধু মনে পড়ে। আহা, বেচারা ফিদিয়া! ইদানীং বয়ে গেল, না হলে বড় উঁচু মন ছিল তার—তোমাদের সুখের জন্যে নিজের জীবনটাই দিলে সে! এমন মানুষ কখনো দেখেছ! অল্প-ভোগী—নেহাৎ বরাত মন্দ! ... ঐ একখানা গাড়ী, না ? ভিক্তর এল, বুঝি! হ্যাঁ। লিজা, আমার পশম আজ আন্‌তে দিছ্‌লে ত ?

লিজা। হ্যাঁ, আজ্ আনবে। (নিম্নে গাড়ী আসার শব্দ হইল। লিজা উঠিয়া ছাদের রেলিঙের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।) একা নয় ত—সঙ্গে কে আছে, দেখ্‌ছি। একজন মেয়েমানুষ—এ কে ?—ও—মা! মা এসেছে।

কারেনিনা। তোমার মা! কতদিন তাকে দেখিনি!

(উভয়ে অভ্যর্থনার্থ নামিয়া গেল ; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে, আনা ও ভিক্তরের সহিত পুনঃ-প্রবেশ করিল।)

আনা। ভিক্তর গিয়ে আমায় ধরে নিয়ে এল।

কারেনিনা। বেশ করেছে,—ধরে না আনলে ত আর তুমি এ দিক মাড়াতে না!

আনা। মিশ্‌না কোথায় গেল ? মিশ্‌না ?

লিজা। সে নীচে বাগানে গেছে, ফুল আনতে। এখনি আসবে 'খন।

আনা। এখন সে কেমন আছে ? অসুখ-বিসুখগুলো গেছে ? একটু মোটা-সোটা হয়েছে ?

কারেনিনা। মোটা বড় হয় নি, তবে অসুখ-বিসুখের উৎপাতটা এখন কিছু কমেছে!

আনা। আমি আবার কাল ভোরের গাড়ীতেই যাব। শাষা একলা আছে, না হলে সে রেগে অনর্থ করবে। এইতেই সে আসতে দিচ্ছিল না, বলে, জামাই-বাড়ীতে যাওয়া আবার কি ঢঙ্! আমি বললুম, ওরে, একবার দেখে আসি—হাজার হোক্ মার প্রাণ!

কারেনিনা। সে কথা আর বলতে! তবে আমরাই মরি দিদি, ওদের জন্যে। ওরা কি আর মায়ের দরদ, মায়ের ব্যথা বোঝে! ভাবে, এই মাগীগুলোই তাদের আপদ, সুখের পথে কাঁটা! কথায় বলে, দাঁত থাকতে লোক দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না! মা এখন আছে তাই—গেলে সব বুঝবে, মা কি পদার্থ ই ছিল। কি বল, দিদি?

আনা! ঠিক কথাই ত!

ভিক্তর। বন-ভোজনের জন্য তুমি সেদিন কোথাও বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করবে, বলছিলে না, মা—? তা কাল-পরশু দুদিন আর আমায় বেরুতে হবে না। ব্যবস্থা করে এসেছি। কাল যদি বল, ত কালই কোথাও যেতে পারি।

কারেনিনা। তোর শাশুড়ীকে তা হলে আট্‌কা বাছা—ও ত এসেই যাঁব-যাব করছে। তুই শাষাকে বোঝালি না, কেন? তাকে নয় সঙ্গে করেই আন্‌তিস্‌!

আনা। ও তাকে বলেছিল বই কি, দিদি—তা সে এল না। জানই ত সে মেয়ের রকমই আলাদা! ফিদিয়া যাওয়া অবধি সে কারো সঙ্গে ভালো করে মেশে না—বলে, 'ফিদিয়া যে গেল, তা তোমাদেরই জ্বালা-যন্ত্রণায় ত্যক্ত হয়ে গেল।' তা আমরা আর তাকে কি জ্বালা দিয়েছি বল, দিদি! যত-দিন ছিল, মেয়েটাকে ত হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়েছে! তবু কি কথাটি কয়েছি, না, লিজাই কোন কথা বলতে দিয়েছে। এই যে ফিদিয়া গেছে, তা এমন দিন যায় না, দিদি, যে দিন তার জন্যে দু' কোঁটা চোখের জল না পড়ে! (চক্ষে রুমাল দিয়া অশ্রু-মোচন) সত্যিই ত আর আমি কিছু পাষাণ নই, মানুষ ত!

কারেনিনা। আহা, কি উঁচু দরেরই মন ছিল তার! তার কথা ত আমাদের মধ্যে নিত্যিই হয়!

ভিক্তর। যাক্ সে কথা। মা, তোমার পশম এনেছি আজ। রঙ্‌গুলো ঠিক মিল্‌ল কি না, একবার দেখে নাও। এর পর যে বলবে, ঐ রে, মিল্‌ল না, তখন কিন্তু ফেরত দেওয়া যাবে না। বাবা,—পশম কেনা কি সহজ ব্যাপার—রঙ্‌ মেলানোর সে যা লট্‌খটি! হিম্‌শিম্ খেয়ে গেছি একেবারে।

কারেনিনা। কৈ, পশম—দেখি। (দেখিয়া) হুঁ এবার মিলেছে। মিললে কি আর বলি, বাছা! এ যে, এগুলো আবার কি? এসেন্স! বটে! আর এগুলো চিঠি!

ভিক্তর। এত বড় খামে কার চিঠি এল? (দেখিয়া) লিজার নামে যে! একি—ম্যাজিষ্ট্রেটের মোহর-করা ব্যাপার কি?

লিজা। কৈ, দেখি! (পত্র-গ্রহণ ও মোড়ক খুলিয়া পাঠ)

কারেনিনা। চল, দিদি, তোমার ঘর ঠিক করে দি—কাপড়-চোপড় ছাড়বে, চল। তার পর, ভিক্তর, তোর ফিটনখানা জুতিয়ে দে—আমরা একটু বেড়িয়ে আসি! ঐ কোণের ঘরটা তোমার মাকে দি, লিজা, কি বল? (লিজার দিকে চাহিয়া) ও কি মা, তোমার মুখ অমন শুকিয়ে উঠল, কেন? কার চিঠি ও? কি খবর আছে?

ভিক্তর। লিজা—

লিজা। (বিবর্ণ মুখে কম্পিত দেহে ভিক্তরের হাতে পত্র দিল) সে মরে নি—বেঁচে আছে! ওঃ কবে আমার মৃত্যু হবে—সব জ্বালা জুড়োয়! ভিক্তর—(কাঁদিয়া ফেলিল।)

ভিক্তর। (পত্রপাঠান্তে ভীতি-কম্পিত স্বরে) তাই ত!

কারেনিনা। কি? হয়েছে কি? কার চিঠি এল? কে লিখেছে।

ভিক্তর। ভয়ানক খপর, মা। সে বেঁচে আছে—ফিদিয়া মরেনি। এ চিঠি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে এসেছে। সম্ভ্রান্ত ঘর বলে ম্যাজিষ্ট্রেট লিজাকে ভদ্রভাবে শুধু ডেকে পাঠিয়েছে, শমন দেয়নি! লিজার অপরাধ, স্বামীবর্ত্তমানে সে আবার বিয়ে করে ফৌজদারীর আসামী হয়েছে। আমিও আসামী।

কারেনিনা। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হল এ! এঁ্যা! এখন উপায়!

আনা। তাই ত বাবা—এখন কি করবে? কি হবে? কেন সে এমন কাজ করলে?

ভিক্তর। ভণ্ড, বদমায়েস—আগাগোড়া সে মিথ্যা প্রতারণা করে এসেছে।

আনা। তখনই ত আমি বলেছিলুম দিদি, ভালো করে সব খোঁজ নাও, তার নাড়ী-নক্ষত্র আমার ত আর কিছু অবিদিত ছিল না, তাই সাবধান হতে বলেছিলুম— তা শুনলে না ত দিদি, এখন উপায় ?

কারেনিনা। আর ভাবতে পারি না,—উপায় শুধু ভগবান!

লিজা। আমার দশা কি হবে—মা ? আমি কোথায় দাঁড়াই—(আবেগে কারেনিনাকে জড়াইয়া ধরিল।)

কারেনিনা। কেঁদো না, মা—নিশ্চয় কিছু গোল হয়েছে। ফিদিয়া এমন কাজ করবে—আমার যেন সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে ! এঁ কি সম্ভব—স্বপ্ন নয় ?

আনা। স্বপ্ন নয়, দিদি, স্বপ্ন নয়। সে যে কি শয়তান ছিল, তা তোমরা কেউ জানতে না—আমিই শুধু তাকে চিনেছিলুম। সাধে কাঁদতুম দিদি, আমার লিজা, আমার এমন সোনার পিরতিমে, তাকে আমি বাঘের মুখে দিয়েছিলুম, ভাই !

লিজা। বাঘের চেয়েও সে আজ ভয়ঙ্কর, মা—! আমার আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে—কপালে এতও ছিল—(রুমালে চোখ ঢাকিয়া প্রস্থান ; ভিক্তর পশ্চাদনুসরণ করিল।)

আনা। হ্যাঁ দিদি, এ কি সত্যি—সে মরেনি, বেঁচে আছে ? ভগবানের এ কি অবিচার, দিদি ! ওরে লিজা রে, তোর কি সর্ব্বনাশ হল রে !

কারেনিনা। চুপ কর—তোমার এ সব চীৎকার আমার সহ্য হয় না ! ... অবিচার ? মোটে নয় ! ঠিক হয়েছে—যোগ্য বিচার একেই বলে ! একটা লোককে পশুর মত তাড়িয়ে—না—ঠিক হয়েছে। আমি তখনি কেঁপে উঠেছিলুম—আমার পুণ্যের সংসার, ধর্ম্মের সংসার —সেখানে এ কি নরকের কালি টেনে আনছি ! ধর্ম্ম গেল—অধর্ম্ম এল, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা, প্রতারণা—সব এল ! আজকের এক ফোঁটা চোখের জলে কি এ অধর্ম্ম, এ মিথ্যা, এ প্রতারণা ভেসে যাবে ? কখনো না—কখনো না !

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমুদ্রাষ্টক

সিন্ধু তুমি বন্দনীয়, বিশ্ব তুঁমি মাহেশ্বরী ;
দীপ্ত তুমি, মুক্ত তুমি, তোমায় মোরা প্রণাম করি।
অপার তুমি, নিবিড় তুমি, অগাধ তুমি পরাণপ্রিয় !
গহন তুমি, গভীর তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন শ্রুতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট-রূপা-সরস্বতী'।
আর্য্য তুমি বীর্য্যে বিভু, ঝঞ্চা তব উত্তরীয় ;
মন্দ্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-ঊষা।
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্ম্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো,
লাস্যগতি, হাস্যরতি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

দিগ্‌গজেরা তোমার পরে নীলাজেরি ছত্র ধরে,
আচ্ছাদিত বিপুল বপু বলদেবের নীলাম্বরে ;
ক্ষুব্ধ ঢেউই লাঙল তব মুষলধারী হে ক্ষত্রিয় !
অপ্সরী সে অঙ্ক-শোভা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উদয়-লয়ে ছন্দে গাঁথ কর্ম্মী তুমি কর্ম্মে-হারা ;
সাগর ! ভবসাগর তুমি, তুমি অশেষ জন্মধারা ;
তোমার ধারা লঙ্ঘে যারা তাদের কাছে শুল্ক নিয়ো।
শাসন কর, পালন কর, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

মেঘের তুমি জন্মদাতা, প্রাবৃট তব প্রসাদ যাচে,
বাড়ব-শিখা তোমার টীকা, জগৎ ঋণী তোমার কাছে
রত্ন ধর গর্ভে তুমি, শস্যে ভর ধরিত্রীও ;
পন্থা—পদ-চিহ্ন-হরা ; সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

উগ্র তুমি বাহির হ'তে, ব্যগ্র তুমি অহর্নিশি,
অন্তরেতে শান্ত তুমি আত্মরতি মৌনী ঋষি।
তোমায় কবি বর্ণিবে কি ? নও হে তুমি বর্ণনীয়।
আকাশ-গলা প্রকাশ তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

শ্রীসতেন্দ্রনাথ দত্ত।

আগুনের ফুলকি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন; জাহাজে আর্সো নামক একটি কর্সিকা-বাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমন-সংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে।]

(১০)

অতি শৈশবে পিতার নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়াতে পিতার প্রতি স্নেহ মমতা প্রগাঢ় হইবার অবসর অর্সোর ভাগ্যে ঘটে নাই। পনর বৎসর বয়সে সে পিজার কলেজে পড়িতে গিয়াছিল; সেখান হইতে মিলিটারী স্কুলে ভর্ত্তি হয়। য়ুরোপে অর্সোর পিতার সহিত মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, এবং ১৮১৫ সালে অর্সো যে রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি হয় তার সেনাপতি ছিলেন তাহার পিতা। কর্ণেল সামরিক নিয়ম অনুসারে সকল লেফ্‌টেনাণ্টদের সঙ্গে যেমন রাশভারি কড়া চালে চলিতেন, ছেলের বেলা তাহার একটুও নড়চড় করিতেন না। সুতরাং তাহার পিতার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয় হইবার অবসরই ঘটে নাই। পিতার ছবি অর্সোর যাহা মনে পড়িত তাহা দুই রকমের। এক চিত্র পারিবারিক সম্পর্কে; আর এক চিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে মুনিব সম্পর্কে। অর্সোর প্রথম চিত্র মনে পড়ে, তাহাদের পিয়েত্রানেরা গ্রামে যখন তিনি শিকার হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন তাঁহার তরোয়াল আর বন্দুক অর্সোকে রাখিতে দিতেন; আর মনে পড়ে সেইদিনকার কথা, তখন সে নিতান্ত শিশু, যেদিন প্রথম তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিয়াছিলেন। আর এক চিত্র তাহার মনে পড়ে, সেই সময়কার কথা, যখন তিনি কর্ণেল দেলা-রেবিয়া, আর অর্সো তাঁহার অধীনে লেফটেনাণ্ট; তিনি ছেলেকে কখনো লেফটেনাণ্ট দেলা-রেবিয়া ছাড়া শুধু নাম ধরিয়া ডাকিতেন না; মাঝে মাঝে অর্সো যদি ভুলক্রমে কোনো একটা সামান্য দোষও করিয়া ফেলিত, পিতা তাহার উপরওয়ালা কর্ম্মচারী বলিয়া সামরিক নিয়মের শাস্তি হইতে সে অব্যাহতি পাইত না; পুত্রকে শাস্তি দিবার সময় গম্ভীরভাবে তিনি বলিতেন—লেফটেনাণ্ট দেলা-রেবিয়া, আপনি আপনার জায়গায় ছিলেন না—আপনার তিন দিন কয়েদ। আপনার দলের লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আছে—পাঁচ দিন কয়েদ। আপনার মাথায় ১২টা ৫ মিনিট পর্য্যন্ত শাদা টুপি ছিল, ১২টা পর্য্যন্ত থাকার কথা—আট দিন কয়েদ।

জীবনে একটি বার অর্সো তাহার পিতার একটি স্নেহবাণী শুনিয়া আজও তাহা সযত্নে মনে করিয়া রাখিয়াছে—সে ওয়াটার্লু যুদ্ধের দুদিন আগে ইংরেজদের সঙ্গে কাৎর্-ব্রা যুদ্ধের দিন। যুদ্ধ করিতে করিতে পিতা পুত্রকে বলিয়াছিলেন—সাবাস অর্সো! কিন্তু হুঁসিয়ার!

এ ছাড়া পিয়েত্রানরা গ্রামের সম্পর্কে কোন সুখ-স্মৃতি তাহার মনে ছিল না। কিন্তু তাহার শৈশবের পরিচিত সেই সব জায়গা, তাহার মায়ের ব্যবহারের সেই সব জিনিস, তাহার নিজের ভালোবাসার কত কি সামগ্রী, তাহার মনের মধ্যে মধুর অথচ বেদনাদায়ক হাজার রকমের ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল। তার পর একটা অন্ধকার ভবিষ্যতের আশঙ্কা যাহা ক্রমশ তাহার সম্মুখে বিকটাকার ধরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, এবং তাহার ভগিনী তাহার মনের মধ্যে যে একটা অনির্ব্বচনীয় অবুঝ অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহা তাহার মস্তিষ্ক ঘোলা-ইয়া তুলিয়া তাহাকে কেমন দমাইয়া দিতেছিল। তাহার উপর মহৎ চিন্তা উপস্থিত যে লিডিয়া তাহার গৃহে পদার্পণ করিতে আসিতেছে; এ গৃহ এখন তাহার চক্ষে অতি সামান্য, অতি কদর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে,—এখানে সেই বিলাসপালিতা সৌখীন রমণীর না জানি কত ক্লেশই হইবে, সে না জানি কি মনে করিবে!—এই ভাবিয়া অর্সো ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

অর্সো ওক-কাঠের উপর কালোবার্ণিশ-করা একখানা বড় চেয়ারে বসিয়া রাত্রিকালে খাইতে বসিল; এই চেয়ারখানিতেই বসিয়া তাহার পিতা আহার করিতেন। কলোঁবা তাহার সহিত আহার করিতে বসিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া অর্সো ঈষৎ একটু হাসিল, কিন্তু কোনো কথা বলিল না। কলোঁবাও খাবার সময় চুপচাপ আহার শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল দেখিয়া অর্সো হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; কারণ কলোঁবা তাহাকে আক্রমণ করিবার যে-সমস্ত আয়োজন ও ষড়যন্ত্র করিতেছিল তাহা রোধ করিয়া স্থির থাকিবার মতো বল অর্সো নিজের মধ্যে পাইতেছিল না; কিন্তু কলোঁবার এই উদাসীনতা তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া নয়, ইহা তাহাকে খেলানো, তাহাকে ব্যাপারটা উপলব্ধি করিবার সময় দেওয়া মাত্র।

হাতের উপর মাথা রাখিয়া অর্সো অনেকক্ষণ নিস্পন্দ নিস্তব্ধ হইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিল; তাহার মনের উপর দিয়া গত পনর দিনের জীবন-কাহিনী একে একে ছবির মতো ফুটিয়া ফুটিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। বারিসিনিদের প্রতি তাহার যে কি কর্ত্তব্য তাহা একা সে-ই ছাড়া আর সকলেই স্থির করিয়া বসিয়া আছে। কী ভয়ানক সব লোক! কিন্তু ক্রমে পিয়েত্রানরার লোক-মত তাহার কাছে সমগ্র জগতের লোকমত বলিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যদি তাহার অন্যথা করে তবে লোকে কি ভাবিবে! সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ যদি না লয় তবে সে লোকের চক্ষে ভীরু কাপুরুষ! কিন্তু কে দোষী, কাহার উপর প্রতিহিংসা লইবে? বারিসিনিরা যে এই হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সত্য বটে, তাহারা তাহার পরিবারের বদ্ধশত্রু, কিন্তু তাহাদিগকে খুনী হত্যাকারী মনে করাতে হয়ত তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইতেছে। অর্সো বারবার করিয়া লিডিয়ার-দেওয়া সেই কবচটির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সঙ্কেতলিপি পড়িতে লাগিল—'জীবন-সংগ্রাম!' 'জীবন-সংগ্রাম!' তারপর সে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—'হোক জীবন সংগ্রাম-ময়, আমি জয়ী হব, জয় আমি করবই।'

এই সঙ্কল্প মনে উদিত হইবা মাত্র তাহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল, খোলসা মনে সে উঠিয়া পড়িল। প্রদীপটি লইয়া ঘরে শুইতে যাইবে, এমন সময় বাড়ীর সদর দরজায় কে ঘা মারিল। এত রাত্রে কে আসিল? এত রাত্রে কাহারও দেখা সাক্ষাৎ করিবার বা বেড়াইতে আসিবার সময় নয়। কলোঁবা আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ঝিও আসিল। কলোঁবা দরজার দিকে যাইতে যাইতে উদ্বিগ্ন ভাইকে বলিয়া গেল—'ও কিছু নয়।'

দরজার কাছে গিয়া কলোঁবা জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

একটি মিঠে মিহি স্বরে উত্তর আসিল—'আমি দিদি-ঠাকরুণ!'

দরজার প্রকাণ্ড কাঠের হুড়কো এপাশ ওপাশ দরজার বুক চাপিয়া আঁটিয়া ছিল, এক ধাক্কায় কলোঁবা তাহা খুলিয়া ফেলিল। খোলা দরজা দিয়া একটি বছর দশেকের ফুটফুটে ছোট মেয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কলোঁবার পিছনে পিছনে খাবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেয়েটির পা খালি, পরণে কানি, মাথায় একখানা ন্যাকড়া জড়ানো।—তাহার মাথায় স্বল্পাবরণের নীচে দাঁড়কাকের ডানার মতো এক ঢাল কালো চুলের তাল দেখা যাইতেছিল; তাহার শরীরখানি কৃশ, ফ্যাকাশে, রং তার রোদপোড়া; চোখ দুটি তার পদ্মপাতায় জলের মতো স্বচ্ছ চঞ্চল, বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল। অর্সোকে দেখিয়াই সে ভয়ে থতমত খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া চাষাড়ে ধরণে নমস্কার করিল; তারপর কলোঁবাকে চুপি চুপি কি বলিয়া সদ্য-শিকার-করা একটা বুনো হাঁস তাহার দুই হাতের উপর মেলিয়া ধরিল।

কলোঁবা বলিল—শিলি আমার লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার কাকা ভালো আছে?"

—হ্যাঁ দিদিঠাকরুণ, আপনার ছি-চরণের আশীর্ব্বাদে। কাকা দেরি করে' এল বলে' আমারও আসতে দেরি হয়ে গেল। আমি তার জন্যে বনের মধ্যে ঠায় তিন ঘণ্টা হাপিত্যেশে বসে, তবে এল।

—তোমার এখনো খাওয়া হয় নি?

—না দিদিঠাকরুণ; ফুরসৎ পাই নি।

—আহা বাছারে! দাঁড়া দাঁড়া খেয়ে যা। তোর কাকার রুটি আছে ত?

—আছে এখনো। রুটির চেয়ে বারুদের অনাটন হয়েছে। এখন বনে বনে বাদাম পেকে উঠেছে, খাবার আর ভাবনা নেই। বারুদেরই যা ভাবনা।

—দাঁড়া দাঁড়া, তোর কাকার জন্যে একখানা রুটি আর চারটি বারুদও নিয়ে যা। তোর কাকাকে বলিস বারুদ বড় দরদের জিনিস, একটু হিসেব করে' রেখে ঢেকে যেন খরচ করে।

অর্সো দেখিয়া দেখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ফরাশী ভাষায় বলিয়া উঠিল—কলোঁবা কা'কে এত দান হচ্ছে?

কলোঁবাও ফরাশীতে বলিল—এই গাঁয়ের একজন ফেরারী আসামীকে—এই মেয়েটা তা'র ভাইঝি।

—তোর দান করবার কি এর চেয়ে সৎপাত্র মিলল না? একটা বদমায়েসকে বারুদ দেওয়া মানে তার পাপের প্রশ্রয় দেওয়া—এখনি ত খুন খারাপি করবে? ফেরারী আসামীদের ওপর এই রকম অনুচিত অনুগ্রহের জন্যেই ত ওরা আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে, নইলে দেশ থেকে তাদের নাম কবে লোপাট হয়ে যেত।

—যে হতভাগারা দেশের কোল থেকে নির্ব্বাসিত তারা সবাই কিছু পাজি নয়।

—খাবার দিতে হয় দে, দানা পানি দিতে আমি বারণ করিনে। কিন্তু গুলি বারুদ দেওয়াটা ভালো নয় বলছি।

কলোঁবা গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল—দাদা, তুমি এ বাড়ীর মালিক, এ বাড়ীর সব-কিছু তোমার। কিন্তু ফেরারীকে বারুদ দিতে অস্বীকার করা—সে আমায় দিয়ে হবে না। বারুদ দিতে না পারি আমার পরণের কাপড় খুলে দেবো, বেচে ওরা বারুদ কিনে নেবে। ফেরারীকে বারুদ না দেওয়া মানে তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া। পুলিশের কার্ত্তুজের বদলে তার আত্মরক্ষার আর উপায় কি?

ছোট মেয়েটি এই অবসরে রুটি ছিঁড়িয়া ব্যগ্র ক্ষুধায় গবগব করিয়া গিলিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে একবার অর্সোর দিকে একবার কলোঁবার দিকে চাহিয়া তাহাদের চোখ হইতে তাহাদের কথার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অর্সো কলোঁবাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার ফেরারীটি করেছিলেন কি? কোন্ কীর্ত্তি করে তিনি বনবাসী হয়েছেন?

কলোঁবা উত্তেজিত হইয়া একটু চড়া গলায় বলিয়া উঠিল—ব্রান্দো কোনো অন্যায় করে নি। সে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল!

অর্সো মুখ ফিরাইয়া প্রদীপ লইয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল। কলোঁবা মেয়েটিকে খাবার আর বারুদ দিয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া বলিল—তোমার কাকাকে বোলো সে যেন অর্সোর খবরদারি করে।

(১১)

সে দিন প্রভাতে একটু বিলম্বেই অর্সোর ঘুম ভাঙিল। চোখ মেলিতেই খোলা জানলা দিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল তাহার শত্রুদের বাড়ী, আর তাহাদের আটঘাট

বন্ধন। সে উঠিয়া নীচে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কলোঁবা কোথায় ?

ঝি সাভেরিয়া বলিল—দিদিঠাকরুণ রান্নাঘরে সীসে গলিয়ে বন্দুকের গুলি তৈরি করছেন।

চারি দিকেই যুদ্ধের আয়োজন! অর্সো যে দিকে এক পা বাড়ায় অমনি যুদ্ধের ছায়া তাহার মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ায়!

অর্সো রান্নাঘরে গিয়া দেখিল কলোঁবা একখানা টুলের উপর বসিয়া আছে, তাহার চারিদিকে নূতন-ঢালা চকচকে গুলি গড়াগড়ি যাইতেছে, সে বসিয়া বসিয়া গুলির গায়ে ছাঁচের ছিদ্রের সীসার খিলগুলি কাটিতেছে।

অর্সো তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—এ সব কী সয়তানি কাণ্ড হচ্ছে তোর ?

তাহার ভগিনী তাহার মিঠা স্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল—কর্ণেলের-দেওয়া বন্দুকটার গুলি ত তোমার নেই; আমি আজ একটা ছাঁচ পেয়ে গেছি, আজ তোমায় গোটা চব্বিশেক কার্তুজ দিতে পারব, দাদা!

—চুলোয় যাক তোর কার্তুজ! কার্তুজে আমার কাজ নেই!

—দাদা, সাবধানের ত বিনাশ নেই। তুমি তোমার দেশ আর দেশের লোকের হালচাল ভুলে গেছ দেখছি।

—যদি বা আমি ভুলতে চাই, তুই ভুলতে দিচ্ছিস কৈ ?...যাক্ ওসব কথা।...একটা বড় মালবাক্স এসেছে বলতে পারিস ?

—হ্যাঁ দাদা, সেটা কি তোমার ঘরে দিয়ে আসব ?

—তুই দিয়ে আসবি কি ? সেটা তুই তুলতেই পারবিনে। কোনো লোকজন এখানে নেই ?

কলোঁবা তাহার জামার আস্তিন গুটাইয়া একখানি নিটোল পুষ্ট সুশুভ্র হাত বাহির করিয়া দাদার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া বলিল—দাদা, তুমি আমাকে যতটা অবলা মনে করছ, আমি ততটা অবলা নই। আয় সাভেরিয়া একটু তুলে দিসে ত।

কলোঁবা একলাই মাল-বাক্সটা তুলিয়া ফেলিল দেখিয়া অর্সো তাড়াতাড়ি গিয়া ধরিয়া বলিল—কলোঁবা, এর ভিতরে তোরই কিছু জিনিস আছে। আমি তোকে এমন সামান্য উপহার দিচ্ছি বলে কিছু মনে করিসনে, হাফ-পেন্সনে বরখাস্ত লেফ্‌টেনান্টের পুঁজির পরিমাণ ত তুই জানিস!

বাক্স খুলিয়া সে কয়েকটা জামা, একখানা শাল, আর যুবতী রমণীর ব্যবহারের যোগ্য এটা ওটা সেটা বাহির করিতে লাগিল।

কলোঁবা বলিয়া উঠিল—বাঃ! কি চমৎকার সব জিনিস! রেখে দাও দাদা, আমার এখন নেবার জো নেই, আমার নোংরা হাত।

তারপর একটি বিষাদকরুণ হাসির রেখা অধরে টানিয়া দিয়া বলিল—আমি ত এখন ওসব পরব না, আমার কালাশৌচ। আমার বৌদির জন্যে ওগুলি রেখে দেবো।

সে দাদার হাতখানি লইয়া চুম্বন করিল।

অর্সো বলিল—দ্যাখ কলোঁবা, এতদিন ধরে অশৌচ পালন করা বড় বাড়াবাড়ি, যেন লোকদেখানো মতন।

কলোঁবা দৃঢ়স্বরে বলিল—আমি যে শপথ করেছি, যতদিন পর্য্যন্ত না......

সে খোলা জানলা দিয়া বারিসিনিদের বাড়ীর দিকে তাকাইল।

অর্সো তাহার ইঙ্গিত কথায় চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—তুই বিয়ে করছিস কবে শুনি ?

কলোঁবা বলিল—যে লোক তিনটি কাজ করতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করব......

সে শত্রুর গৃহের দিকে ক্রুর কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল।

অর্সো বলিল—কলোঁবা, তুই এমন রূপসী, তোকে এখনো যে কোনো পুরুষ গ্রেপ্তার করেনি এই আশ্চর্য্য! দ্যাখ, কে কে তোর উমেদার তাদের নাম আমায় বলবি ত ? তারা মন-ভুলানো সঙ্কেত-মঙ্গল গান গাইতে এলে আমায় খবর দিস, আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে একটু শুনব, কেমন ? তোর মতন রায়বাঘিনীকে বশ করবার মন্ত্র খুব জবর রকম না হলে ত চলবে না; তেমন মন্ত্র জানে এমন লোক তোর সন্ধানে আছে ?

—মা-বাপ-মরা একটা গরিব মেয়েকে কেই বা

পোছে ?......যে লোক আমার এই অশৌচবেশ ছাড়িয়ে উৎসব-বেশ পরাতে চাইবে তাকে আগে ঐ বাড়ীর মেয়েদের উৎসব-বেশ ছাড়িয়ে শোকের বেশ পরাতে হবে।

অর্সো মনে মনে বলিল—'এই পাগলামি আরম্ভ হ'ল।' কিন্তু এই আলোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে আর কোনো কথাই না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কলোঁবা খুব আদর-মাখা স্বরে বলিল—দাদা, আমারও তোমায় দেবার কিছু আছে। ঐ-সব সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় আমাদের এই বুনো দেশের যোগ্য নয়। বনে জঙ্গলে গেলে তোমার ঐ-সব সৌখীন সুন্দর জামা দুদিনে ছিঁড়ে ফাৎরা-ফাঁই হয়ে যাবে। তার চেয়ে ওগুলো রেখে দাও, মিস নেভিল এখানে এলে তাকে সওগাত দিয়ো।

তারপর সে একটা আলমারি খুলিয়া একটা শিকারির পোষাক টানিয়া বাহির করিয়া বলিল—আমি তোমার জন্যে এই মকমলের ফতুয়া তৈরি করেছি, আর এই টুপিটায় সলমার কাজ করতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। একবার পরে দেখবে দাদা ?

সে সবুজ রঙের মকমলের ফতুয়াটি লইয়া দাদাকে পরাইয়া দিল ; কালো মকমলের কিনারায় কালো রেশম আর জরি-বোনা কোণালো একটা টুপি মাথায় পরাইয়া দিল। তারপর প্রফুল্ল নেত্রে দাদার দিকে চাহিয়া বলিল—দাদা, এই নেও বাবার সেই তোষদান ; তাঁর ছুরি তোমার ঐ জামার জেবে আছে। দাঁড়াও আমি তাঁর পিস্তলটা খুঁজে এনে দি।

অর্সো সাভেরিয়ার হাত হইতে একখানা আয়না লইয়া নিজের সজ্জা দেখিয়া হাসিয়া ভগিনীকে বলিল—তুই যে আমাকে একেবারে থিয়েটারের ডাকাতের সর্দার সাজিয়ে দিলি দেখছি।

বুড়ী ঝি বলিল—তোমার ত দাদা অমনি সজ্জাই সাজে। পুরুষমানুষের বীরের সজ্জাই ত মানায়।

অর্সো সেই পোষাক পরিয়াই খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে সে ভগিনীকে বলিল—দ্যাখ কলোঁবা, ঐ মাল-বাক্সটার মধ্যে আমার খানকতক বই আছে। আরো বই ফ্রান্স কি ইটালি থেকে আনিয়ে দেবো। তুই পড়িস বুঝলি। তোর বয়সে লেখাপড়া না-জানাটা বড় লজ্জা কথা—য়ুরোপে দুধের ছেলেরা যা জানে তুই ত জানিসনে, সেটা কি ভালো ?

কলোঁবা বলিল—হ্যাঁ তা ঠিক, আমি জানি যে আমি কিছুই জানিনে। যদি আমায় তুমি পড়াও, ত আমি পড়া ছাড়া আর কিছু চাইনে।

(১২)

কয়েক দিন কলোঁবা আর বারিসিনিদের নাম করিল না। সে সদা সর্ব্বদা ভাইয়ের সেবাযত্নের আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত, যখন সময় পায় ঘুরিয়া ফিরিয়া দাদার কাছে লিডিয়ার গল্প পাড়ে। অর্সো তাহাকে ফরাশী ও ইটালিয়ান পুস্তক পড়ায়, এবং কখনো তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিষয়-পরিচয়ে তৎপরতা দেখিয়া, কখনো বা তাহার সামান্য বিষয়ে অজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্য অবাক হইয়া যায়।

এক দিন আহারাদির পর কলোঁবা উঠিয়া গিয়া বই খাতা না আনিয়া মাথায় ওড়না জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখশ্রীতে তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য গম্ভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। সে অর্সোর কাছে আসিয়া বলিল—দাদা, আমার সঙ্গে একটু যাবে ?

অর্সো উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল—কোথায় যেতে হবে আবার ? চ।

—আমায় হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে না তোমাকে। তুমি তোমার বন্দুকটা আর তোষদানটা নাও। পুরুষ-মানুষের নিরস্ত্র হয়ে বেরুতে নেই।

—যো হুকুম। যা করতে নেই তা না হয় নাই করলাম। কিন্তু যেতে হবে কোথায় শুনি।

কলোঁবা আর কোনো কথা না বলিয়া মাথার উপর একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া, কুকুরটাকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, অর্সো পিছে পিছে চলিল। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া গ্রামের বাহিরে গিয়া কলোঁবা আঙুর-ক্ষেতের ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা গলি ধরিয়া চলিতে লাগিল ; কুকুরটাকে একটা কি ইঙ্গিত করিয়া সামনে সামনে যাইতে বলিল। কুকুরটা সেই সঙ্কেত

বুঝিয়া মেঠো পথের দুধারে ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, এবং এক-একবার কিছুদুর আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। কুকুরটা যেন নিজের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া হুকুম তালিম করিয়া চলিয়াছে।

কলোঁবা অর্সোকে বলিল—দেখ দাদা, কুকুরটা যদি ডেকে ওঠে অমনি তুমি বন্দুক বাগিয়ে ধর্‌বে আর থমকে দাঁড়াবে! বুঝলে?

গ্রাম হইতে আধ মাইল পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া একটা মোড়ের মাথায় কলোঁবা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে প্রায় তিন ফুট উঁচু কাঁচা শুকনো গাছের ডালের স্তূপ জড়ো করা আছে। সেই স্তূপ ফুঁড়িয়া একটা কালো-রং-করা কাঠের ক্রুশের ডগা মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে। কর্সিকার ন্যায় অনেক বুনো পাহাড়ে দেশে সংস্কার আছে যে যেখানে কোনো লোকের অপঘাত মৃত্যু ঘটে সেখানে দিয়া পথ চলিবার সময় পথিককে সেই জায়গায় একটা ঢেলা কি গাছের ডাল ফেলিয়া দিয়া যাইতে হয়। এমনি করিয়া দিনে দিনে সেই স্থানটিতে ঢেলা ডাল জড়ো হইতে থাকে এবং সেই অপঘাত-ঘটনা চিরদিন লোকের মনে মুদ্রিত হইয়া থাকে, শীঘ্র লুপ্ত হইয়া মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কলোঁবা একটা গাছের ভাঙা ডাল কুড়াইয়া লইয়া সেই স্তূপে ফেলিয়া দিয়া বলিল—দাদা, এইখানে বাবাকে খুন করেছিল।

কলোঁবা সেখানে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। অর্সোও দেখাদেখি বসিল। তখন গাঁয়ের গির্জ্জার ঘড়িতে ধীরে ধীরে মরণ-আরতি বাজিতেছিল, গাঁয়ের কে একজন রাত্রে মারা গিয়াছে। অর্সোর বেদনা ক্রন্দনে গলিয়া গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে কলোঁবা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে জল নাই, মুখশ্রী দীপ্ত। সে দাদাকে টানিয়া তুলিয়া গাঁয়ের পথে ফিরিয়া চলিল।

পথে একটিও কথা হইল না। বাড়ী পৌঁছিয়া অর্সো আপনার ঘরে চলিয়া গেল। একটু পরে কলোঁবা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটা ছোট পেঁটারী। সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া খুলিয়া তাহা হইতে রক্ত-মাখা একটা জামা বাহির করিয়া অর্সোর চোখের সম্মুখে ধরিয়া কলোঁবা—'দাদা, এই জামা বাবার!' বলিয়া সেই জামাটা অর্সোর কোলে ফেলিয়া দিল।

তারপর সেই জামার উপর দুটা মর্চ্চে-ধরা সীসার গুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই গুলি দুটোতে তাঁকে খুন করা হয়েছিল!

তারপর সে অর্সোর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল—দাদা দাদা, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তোমায় নিতে হবে।

পাগলের মতো উত্তেজিত আলিঙ্গনে দাদাকে পীড়িত করিয়া, রক্ত-মাখা জামা আর গুলিদুটিকে চুম্বন করিয়া কলোঁবা ঝড়ের মতো ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল। অর্সো পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ বসিয়া রহিল।

অর্সো সেইসব ভয়ানক খুনের স্মৃতিচিহ্ন কোলে করিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল অনেকক্ষণ; সেগুলি সরাইয়া ফেলিবারও তাহার সাধ্য হইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে আপনাকে জোর করিয়া সাহস দিয়া সে সেই খুনের স্মৃতি-সামগ্রীগুলা পেঁটারীর মধ্যে তাড়াতাড়ি ভরিয়া ফেলিল, এবং ছুটিয়া ঘরের অপর প্রান্তে গিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, যেন একটা ভূত তাহার পিঠের দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর সে ভয়ে জড়সড় হইয়া আপনাকে তাহার দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া আড়াল করিতে চাহিতেছে। তাহার ভগিনীর শেষ কথা কয়টি "দাদা, দাদা, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তোমায় নিতেই হবে!" অবিশ্রাম তাহার কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল; তাহার মনে হইতেছিল যেন অনিবার্য্য সাংঘাতিক দৈবাদেশ তাহার কাছে রক্ত চাহিতেছে—রক্ত চাই, রক্ত চাই—তাহার অমোঘ আদেশ, রক্ত চাই—কিন্তু হায়! সে রক্ত হয়ত নিরপরাধ নিরীহ জনের! এই চিন্তায় সে পাগল হইবার উপক্রম হইল। অনেকক্ষণ সে নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল, মুখ ফিরাইতেও পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে সে জোর করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি পেটারীটা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং যে দিকে চোখ যায় সেই দিকেই মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেন বা কোথায় যাইতেছে তাহার কোনো ঠিকঠিকানা রহিল না।

ঝড়ো বাতাস মুখের উপর ঝাপটা মারিয়া মারিয়া অল্পে অল্পে তাহার চেতনা ফিরাইয়া আনিল। ক্রমে সে শান্ত হইয়া ঠাণ্ডা মেজাজে ভাবিতে লাগিল তাহার এই দারুণ অবস্থা, আর তাহার বিপদজাল হইতে মুক্তির উপায়। বারিসিনিরা যে খুন করে নাই ইহা এক রকম তাহার দৃঢ়বিশ্বাস, কিন্তু আগস্তিনির নামে চিঠি জাল করিয়া পাঠানো যে উহাদেরই কারসাজি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; এবং সেই চিঠিই তাহার পিতার মৃত্যুর কারণ। অতএব বারিসিনিরা তাহার পিতার মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দোষী না হইলেও পরোক্ষ ভাবে দায়ী বটে। তাহাদের নামে জালিয়াত বলিয়া নালিশ ফরিয়াদ করিবার মতো প্রমাণ পাওয়া এখন শক্ত। এমন অবস্থায়, তাহার দেশের বিশ্বাস সংস্কার আর প্রথা তাহার মনের মধ্যে মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়া কোনো একটা রাস্তার মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া প্রতিহিংসা লইবার সহজ উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিল; কিন্তু তাহার সভ্য ভব্য বন্ধুদের কথা মনে হওয়াতে, বিশেষ করিয়া লিডিয়ার কথা মনে পড়াতে, প্রতিহিংসা লওয়ার চিন্তাটাই তাহার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হইল, সে ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া মন হইতে সে-সব চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিল।

তখন তাহার মনে পড়িল তাহার ভগিনীর তীব্র তিরস্কারের কথা। আর তাহার মনের মধ্যে কর্সিকার যে উগ্রতা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল তাহাতে সেই তিরস্কার যতই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ততই তাহার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার অন্তরাত্মা ও দেশপ্রথার সংস্কারের এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ও আশা তাহার মনে হইতেছিল যে কোনো ছুতায় বারিসিনির কোনো ছেলের সঙ্গে নূতন কিছু ঝগড়া বাধানো এবং শেষে দুজনে ডুয়েল লড়া। সম্মুখযুদ্ধে গুলি করিয়া বা তরোয়ালের চোটে শত্রুনিপাত করিতে পারিলে তাহার ফরাশী সুহৃৎ ও কর্সিক-স্বভাব দুইই তৃপ্ত হইতে পারে।

এই উপায় স্থির হইয়া গেলে তাহার মন হইতে যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল, তাহার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। অর্সো লিডিয়াকে তাহার এখনকার মনের সংগ্রামের ছবি দেখাইতে পারিলে সে যে খুব খুসি হইত এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই অর্সোর রক্ত ঠাণ্ডা ও মন প্রশান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

এতক্ষণে তাহার চৈতন্য হইল যে সে গ্রাম হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে গ্রামে ফিরিয়া চলিল। বনের ধারে পথের উপর বসিয়া একটি ছোট মেয়ে একলা আপন মনে গান করিতেছিল—সেই খুনের চাপানের কাঁদুনে টানা একঘেয়ে সুরে—

"মোর রক্তেতে রাঙা এই উর্দ্দিটি নাও,
মোর বিছানার পাশে ওই দেয়ালে টানাও।
ওগো আর নাও এই ক্রুশ কষ্টে পাওয়া,—
শিরোপা এ গরবের রাজার দেওয়া।
ওগো দূরদেশে ছেলে মোর বিদেশে আছে,
ফিরলে সে দিয়ো দুই তাহারি কাছে।
ব'লো তার হিয়া মোর হয়ে ভুঞ্জিবে জয়,
ঋণশোধ—প্রতিশোধ চাহি নিশ্চয়।"

অর্সো হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এই ছুঁড়ি ও কী গান গাচ্ছিস?

বালিকা ভয়ে থতমত খাইয়া গিয়া বলিল—অ্যাঁ আপনি! এ একটা কলোঁবা দিদিঠাকরুণের তৈরি গান...

অর্সো দাঁত কড়মড় করিয়া রূঢ়স্বরে বলিল—খবরদার বলছি, এ গান গাসনে।

বালিকা ভয় পাইয়া একবার বাঁয়ে একবার ডাহিনে চাহিয়া পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল, এবং সে হয়ত এক ছুটে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াও যাইত, কিন্তু তাহার হাতে একটা বড় পোঁটলা ছিল, সেটা সে ফেলিয়াও যাইতে পারিতেছিল না।

এতটুকু মেয়ের কাছে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে

ভীত করিয়া তোলাতে অর্সো লজ্জিত হইয়া নম্র মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—খুকি, তুমি ঐ পোঁটলায় কি নিয়ে যাচ্ছ ?

শিলিনা জবাব দিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া অর্সো পোঁটলার কাপড় তুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে রুটি আর অন্যান্য খাবার আছে।

—খুকি, এই-সব খাবার কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ ?

—আমার কাকার জন্যে।

—তোমার কাকা না ফেরারী ?

—আজ্ঞে আপনাদের চরণ সেবার জন্যেই।

—যদি পুলিশ তোমায় দেখে তা হলে ত তারা জিজ্ঞাসা করবে যে কোথায় তুমি যাচ্ছ...

বালিকা একটুও চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—আমি তাদের বলব যে বন-কাটা জনেদের জলপানি নিয়ে যাচ্ছি।

—যদি পথে কোনো শিকারী ক্ষিদের চোটে এই খাবার কেড়ে নেয় ?

—আমি তাদের বলব যে এ আমার কাকার খাবার, তা হলেই তারা আর ছোঁবে না।

—তুমি তোমার কাকাকে খুব ভালো বাস ?

—হুঁ। আমার বাবা মারা গেলে কাকাই আমাদের মানুষ করেছে কিনা ; সে গাঁয়ের ভদ্দর লোকদের বাড়ী কাজ করত, তাই এখনো সবাই আমাদের দয়া ছেদ্দা করে। দারোগা সাহেব ফি বছর আমায় একটা করে' নতুন জামা দেন ; পাদ্রি সাহেব আমায় পড়ান ; কিন্তু সব চেয়ে দয়া করেন আপনার বোন কলোঁবা দিদি।

এমন সময় একটা কুকুর পথ দিয়া যাইতেছিল। বালিকা মুখের মধ্যে দুটি আঙুল দিয়া খুব জোরে শিশ দিল। কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ের উপর লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া বনের মধ্যে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ছেঁড়াখোঁড়া-কাপড়-পরা কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত দুজন লোক অর্সোর পিছনে একটা ঝোপের আড়াল হইতে মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়া দিয়া সাপের মতো নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহাদের দুজনের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিল—আ অর্সো আন্তো যে ! আপনি ভালো আছ ত ? আমায় চিন্‌তে পারছ না ?

অর্সো তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—না।

—দাড়ি চুলে মানুষের ভোল একেবারে বদলে যায় দেখছি ! আচ্ছা, ভালো করে ঠাওর করে দেখ দেখি। লেফটেনাণ্ট, আপনি তা হলে ওয়াটার্লু যুদ্ধের সঙ্গীদের ভুলে গেছ ? আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সেই দুর্দ্দিনে যে ব্রান্দো প্রাণপণে গুলি চালিয়েছিল তাকে আপনি চিনতে পারছ না ?

—অঁ্যা। ব্রান্দো তুমি !

—আজ্ঞে। ...শিলি, লক্ষ্মী মেয়ে তুই। দে দে খেতে দে, যে ক্ষিদে পেয়েছে ! লেফটেনাণ্ট সাহেব আপনি জান না, বনের হাওয়ায় বড় ক্ষিদে পায়।... কোত্থেকে জোগাড় করে আনলি ? দারোগা সাহেব, না কলোঁবা ?

—না কাকা, এ কল-বাড়ীর গিন্নি দিয়েছেন।

—তিনি কিছু হুকুম করেছেন ?

—তাঁর ক্ষেতে জন লেগেছে। তারা এখন বলছে যে আটআনা রোজ আর আধি ফসল না পেলে কাজ করবে না।

—পাজি সব ! আচ্ছা আমি তাদের দেখে নেবো। ...লেফটেনাণ্ট আমাদের এই খাবার একটু প্রসাদ করে দেবে কি ? আমাদের রাজা কয়েদ হওয়ার পরে আমরা কতদিন একসঙ্গে এমনি আলক্ষ্মীর প্রসাদ পেয়েছি, মনে আছে ত ?

—খুব মনে আছে। পাজিগুলো আমাকেও কয়েদ করেছিল।

—হাঁ সে কথা শুনেছি। আপনি তাতে দমে যাওনি নিশ্চয়।

তারপর তাহার সঙ্গীকে বলিল—এস পণ্ডিত মশায়, খেতে লেগে যাও ! লেফ্‌টেনাণ্টের সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের পরিচয় করিয়ে দি ; ইনি সত্যিকারের পণ্ডিত কি না জানি নে, তবে বিদ্যে সাধ্যি বেশ আছে। আমরা তাই ওঁকে পণ্ডিত মশায়ই বলি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—হাঁা, আমি পণ্ডিত হতে হতে রয়ে গেছি। আমি পাদ্রীগিরির জন্যে লেখাপড়া শিখে ধর্ম্মশাস্তর পড়ে-টড়ে শেষে সব ভেস্তে গেল। বরাত! এতদিনে হয়ত আমি পোপই বা হতে পারতাম, বরাতের কথা কে বলতে পারে।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—আপনার সঙ্কল্প বাধা পেলে কিসে?

—সামান্য কারণে। আমি যখন পিজা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমার বোন একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিল; তার বিয়ে দেবার জন্যে আমায় তাড়াতাড়ি দেশে আসতে হল। আমি বাড়ী এসে পৌঁছবার আগেই আমার ভগিনীর ভাবী বরটি লজ্জায় ভয়ে ভেব্‌ড়ে গিয়ে পটল তুল্‌লে; তখন পরের বোঝা কেউ আর ঘাড়ে করতে চায় না। আমি কোনো উপায় না দেখে শেষে বন্দুকের শরণ নিলাম।

অর্সো শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু খানিকটা কৌতূহল এবং খানিকটা বাড়ী ফিরিবার অনিচ্ছায় অর্সো সেই দুটি খুনী লোকের সঙ্গেই গল্প জুড়িয়া বসিল।

যতক্ষণ পণ্ডিত মশায় গল্প করিতেছিল ততক্ষণ ব্রান্দো খাবার পরিবেষণ করিতেছিল; সে নিজের সঙ্গীকে, নিজেকে, কুকুরটাকে এবং ভাইঝিকে তুল্য ভাবে খাবার বাঁটিয়া দিল।

পণ্ডিত মশায় কয়েক গ্রাস খাবার খাইয়া বলিল—আঃ! বনবাসে ক্যা মজা! রেবিয়া মশায়, আপনাকেও ত একদিন এই আশ্রয় নিতে হবে, তখন বুঝবেন মজাটা কি! নিজের খেয়াল খুসি ছাড়া আর কোনো ব্যাটারই তোয়াক্কা রাখতে হয় না—একেবারে স্ব-অধীন যাকে বলে!

এতক্ষণ এই পণ্ডিত ফেরারী ইটালীর সাধু ভাষায় কথা কহিতেছিল; এখন সে ফরাশী ভাষায় আরম্ভ করিল—কর্সিকা দেশটা ছোকরা বয়সীদের কাছে তেমন সুখের দেশ নয়। কিন্তু ফেরারীদের পক্ষে একেবারে সোনার দেশ! দেশের মেয়েগুলো ত আমাদের নাম করতে পাগল! একেবারে সর্ব্বস্ব দেবার জন্যে লালায়িত! শাস্ত্রেই বলে যে নারী বীরভোগ্যা! কিন্তু সব চেয়ে মজা এই, যে, পুলিশের দারোগা জমাদারের বউগুলো পর্য্যন্ত আমাদের জন্যে মরে বাঁচে!

অর্সো তাহার রসিকতায় কান না দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—আপনি দেখছি অনেক ভাষা জানেন।

পণ্ডিত ফেরারী বলিল—নানান ভাষায় কথা যে বলছি সেটা পণ্ডিত্য ফলাবার জন্যে মনে করবেন না—ছেলেমানুষের সামনে সব কথা ত খুলেখালে বলা যায় না, বুঝতেই ত পারছেন। আমাদের, অর্থাৎ ব্রান্দোর আর আমার, ইচ্ছেটা যে খুকি বেশ শান্ত-সুশীল সচ্চরিত্র হয়ে সৎপথেই থাকে।

শিলিনার কাকা বলিল—হাঁা, ওর বছর পনর বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দেবো মনে করে রেখেছি। পাত্তরও একটি মনে মনে এঁচে রেখেছি।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—তুমিই গিয়ে ছেলের বাপের কাছে প্রস্তাব করবে?

—নিশ্চয়। যদি আমি গিয়ে দেশের কোনো মাতব্বর লোককে বলি 'আমি ব্রান্দো, আমার একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিতে হবে,' তবে কি কোনো ব্যাটার সাহস হবে একটা টুঁ শব্দ করে' আপত্তি করতে?

তাহার সঙ্গী ফেরারী বলিল—আমি কিন্তু তোমায় ওখানে বিয়ে দিতে পরামর্শ দি না। লোকটা ভারি কঞ্জুস, বরের পণ না পেলে মেয়েকে বিষের চোখে দেখ্‌বে।

ব্রান্দো বলিল—ওহে, তার আর ভাবনা কি? তার সামনে গেঁজের গেরো খুলে উবুড় করে ধরব আর টাকা-বৃষ্টির সঙ্গতে তার মন অমনি নৃত্য করতে থাকবে।

অর্সো জিজ্ঞাসা করিল—তোমার গেঁজেয় তা হলে বৃষ্টি করবার মতো কিছু পুঁজি জমা আছে?

—এক পয়সা না। কিন্তু আমি যদি গিয়ে কোনো মহাজনকে বলি 'আমার হাজার খানেক টাকার দরকার পড়েছে, তবে সে ব্যাটা টাকা পাঠাতে পথ পাবে না। কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট, আমি অন্যায় তঞ্চক করবার লোক নই।

পণ্ডিত ফেরারী বলিল—রেবিয়া মশায় জানেন বোধ হয়, এ দেশের লোকের মনে ত মার প্যাঁচ নেই, তারা

বদ লোকের জোচ্চুরিতে খুব ঠকে। আমাদের এই রামসুন্দরী কৌৎকার জোরে (সে বন্দুক উঁচাইয়া দেখাইল) আমরা সবার কাছেই বেশ খাতির পেয়ে থাকি। জোচ্চরেরা আমাদের নাম জাল করে' লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে' আমাদের খামোখা লোকের কাছে খাপ্পাই করে।

অর্সো তীব্রকণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল—হাঁ হাঁ সে সব আমি জানি।

ফেরারী বলিতে লাগিল—ছ মাস হ'ল, আমি ভিন্ গাঁ থেকে আস্‌ছিলাম, একটা চাষা দূর থেকে আমায় দেখে খুব এক লম্বা সেলাম ঠুকে আমার কাছে এসে বল্লে—'আজ্ঞে পণ্ডিত মশায়, মাপ করবেন, আমায় আর একটু সময় দিতে হবে, আমি দুকুড়ি-পনর টাকা বৈ আর জোগাড় করে উঠতে পারিনি।' আমি তাকে বল্লাম—'পাজি কাঁহাকা! পঞ্চান্ন টাকা! সে কি রে? বলিস কি?" সে অমনি থতমত খেয়ে বলে উঠল—'আজ্ঞে ওর নাম কি তিন-কুড়ি-পনর টাকা, তিনকুড়ি তিনকুড়ি। হাঁ তিনকুড়ি-পনর টাকা। কিন্তু আপনি আজ্ঞে করে-ছিলেন এক শ টাকা—সে ত একেবারেই অসম্ভব!' আমি বল্লাম—'পাজি কাঁহাকা! আমি এক শ টাকা চেয়েছি? আমি ত তোকে চিনিই না!' তখন সে একখানা চিঠি, চিরকুট বল্লেও হয়, নোংরা ময়লা, বা'র করে দেখালে যে তাতে লেখা রয়েছে অমুক দিন অমুক জায়গায় এক শ টাকা রেখে দেবে, নইলে গিয়োকান্তো—সে আমার নাম—তোমার ঘর জ্বালিয়ে গরু বাছুর মেরে তোমায় একেবারে তছনছ করে দেবে। কোন্ ব্যাটা আমার সই পর্য্যন্ত জাল করেছিল। এতে আমার যা রাগ হয়েছিল তা আর কি বলব। আরো বেশী রাগ হয়েছিল যে, ব্যাটা লিখেছে ত এঁকে গেঁয়ো ভাষায়, তাতে আবার হাজারটা বানান ভুল! যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল প্রাইজ পেয়ে পাশ করে এসেছে, তার নামের চিঠিতে কিনা বানানে ভুল! ব্যাটা আহাম্মক কোথা-কার! আমি সেই চাষা ব্যাটাকে ধরে একবার আচ্ছা করে নেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিতেই সে দুবার ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল।—ব্যাটা চাষা! তুই কি আমাকে মুখখু চোর পেয়েছিস!—তাকে দুই লাথি কসিয়ে দিলাম—কোথায়—তা বুঝতেই পাচ্ছেন। তখন রাগটা একটু নরম পড়ে এল। আমি তাঁকে বল্লাম—টাকা রাখবার দিন আজকে না? আচ্ছা, যেখানে বলেছে সেখানে টাকা রেখে দিগে যা। তার পর আমি দেখে নেবো। একটা দেবদারু গাছের তলায় চাষাটা টাকাগুলো পুঁতে রেখে এল, আমি লুকিয়ে রইলাম। ছ'টি ঘণ্টা কেটে গেল, ছ'ঘণ্টা কি, দরকার হলে ছ দিন ওৎপেতে থাকতাম—বলেন কি, আমার নামে চিঠি জাল করে, তাতে কিনা বানান ভুল! ছ'ঘণ্টা পরে এক ব্যাটা কঞ্জুস মহাজন গুড়ি গুড়ি এসে হাজির হ'ল। সে যেই টাকা খুঁড়ে তোলবার জন্যে নীচু হ'ল দেখলাম, রাগে ত আমার পিত্তি জ্বলে উঠল, আমি চোঁচা গিয়ে মারলাম তার পশ্চাৎদেশে বিরাশি সিক্কার ওজনের এক লাথি। বাপধন একেবারে ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে কাঁটাঝাড়ের ওপর চিতপাত! একেবারে শরশয্যা! আমি তখন চাষাটাকে বল্লাম—'আহাম্মক! নিয়ে যা তোর টাকা। দেখলি ত গিয়োকান্তো কখনো চিঠি লিখতে বানান ভুল করে না!' সে বেচারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টাকা ক'টা তুলে নিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এল। আমি এক লাথিতে তাকে বিদেয় করে দিলাম।

ব্রান্দো বলিয়া উঠিল—'আঃ পণ্ডিত মশায়! তোমার ওপর আমার সত্যি হিংসে হয়। সেই মহাজন-টাকে গুলি করে কি হাসানোটাই তুমি হাসিয়েছিলে!'

পণ্ডিত ফেরারী বলিতে লাগিল—মহাজন ব্যাটাকে ফাঁদে ফেলে আমার বেটার ওপর দয়া হ'ল। এক গুলিতেই সাবাড় করে ফেললাম। আচ্ছা, অর্সো মশায়, আপনি ত অস্ত্র-শাস্ত্র পড়েছেন, বলুন ত বন্দুকের গুলিটা বারুদের আগুনেই গলে যায়, না বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে যেতে গলে ওঠে?

অর্সো অস্ত্র-শাস্ত্রের কথায় খুনীটার অন্যায় আচরণ ভুলিয়া গিয়া বন্দুক-তত্ত্ব আলোচনাতে মাতিয়া উঠিল। ব্রান্দোর এইসব বৈজ্ঞানিক-আলোচনা ভালো লাগিতেছিল না। সে বাধা দিয়া বলিল—অর্সো আন্তো, সুয্যি যে ডোবে। এখানে আমাদের সঙ্গে ত কিছু খেলে না, ঘরে কলোঁবা

ঠাকরুণকে আর অপিক্ষেয় বসিয়ে রেখো না। সুয্যি ডোবার পর পথে চলাফেরা করাটাও কিছু নয়। আচ্ছা আপনি বন্দুক ছাড়া চল কেন বল ত? কত পাজি বদমায়েস চারিদিকে। হুঁসিয়ার! আজকে অবিশ্যি কোনো ভয় নেই; বারিসিনিরা আজ বেরুচ্ছে না—আজ থানায় ম্যাজিষ্টর এসেছে। কাল ম্যাজিষ্টর চলে গেলে, ওরা ত তখন বেপরোয়া হবে। ভ্যাঁসান্তেলো ছোঁড়া ত পাজির পা-ঝাড়া; অর্লান্দিকুসিয়ো দাদার ভাই—কেউ কম যান না। ওদের একে একে নিকেশ করে ফেল,—আজ একটা, কাল একটা। আপনাকে এই এক কথা বলে দিলাম।

অর্সো রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিল—থাক, তোমার আর উপদেশ দিতে হবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ওরা আপনারা আমায় ঘাঁটাচ্ছে ততক্ষণ আমার কিছু বলবার নেই।

ফেরারীটা গালের মধ্যে জিব দিয়া শুধু একটা টকাস করিয়া শব্দ করিল, কিছুই বলিল না। অর্সো যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রান্দো বলিল—ভাল কথা, আপনি যে আমাকে বারুদ দিয়েছেন, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয় নি; মোদ্দা খুব সময়েই আমি বারুদ ক'টি পেয়েছি। এখন আর আমার কিছুর অভাব নেই। এক জোড়া জুতোর দরকার, তা শিগগির একটা ভেড়া মেরে তার চামড়ায় তোয়ের করে নেবো।

অর্সো দশটা টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—বারুদ পাঠিয়েছিল কলোঁবা; এই টাকায় তোমার জুতো কিনে নিয়ো।

ব্রান্দো টাকা দশটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল—লেফটেনাণ্ট, পাগলামি করো না। আপনি কি আমাকে ভিখিরী ঠাওরালে? আমি শুধু রুটি আর বারুদ নি, তা ছাড়া আর কিচ্ছু না।

—আমরা পুরোণো দোস্ত, আমার সাহায্য নিতে দোষ কি। আচ্ছা, আজকে তবে আসি।

অর্সো প্রস্থান করিবার আগে ব্রান্দোর অজ্ঞাতসারে তাহার বটুয়ার মধ্যে টাকা ক'টা রাখিয়া দিল।

পণ্ডিত ফেরারী বলিল—নমস্কার অর্সো আন্তো! শীঘ্রই আমাদের আবার দেখা হবে; আমাদের বনবাসের দিনগুলো আমরা কাব্য আলোচনা করে সুখেই কাটিয়ে দেবো।

অর্সো মিনিট পনর পথ চলিয়া আসিয়াছে, তখন শুনিল তাহার পিছনে কে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে ব্রান্দো।

সে বেদম হইয়া পড়িয়াছিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—এ ভারি অন্যায়! অসহ্য অন্যায় তোমার কাণ্ড, লেফটেনাণ্ট! এই নাও তোমার টাকা। আমাকে কি তুমি এমনি বোকা ঠাওরেছ? কলোঁবা ঠাকরুণকে আমার বহুত বহুত সেলাম জানাবে। আপনি আমাকে একেবারে বেদম করে জান নিকলে দিয়েছ। আচ্ছা তবে এখন আসি। (ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী বাঙ্গালী

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব।

সম্প্রতি একটী বাঙ্গালী ছাত্রের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পীএইচ-ডি (Ph. D.) উপাধিলাভের সংবাদ আসিয়াছে। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইতিপূর্ব্বে মাত্র আর একজন বাঙ্গালী এই উচ্চ উপাধি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চব্বিশপরগণার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৈদিক ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। তাঁহাদিগের সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলাতযাত্রা করেন। বাল্যকাল হইতেই ধীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ মনোযোগী। তিনি মধ্যইংরাজি পরীক্ষায় চব্বিশপরগণার মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়া কলিকাতা হিন্দুস্কুলে প্রবেশলাভ করেন। ১৯০৪ সালে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ইনি এফ্‌ এ ও বি, এসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপ্রদর্শন করিয়া সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বি, এসসি পরীক্ষায় ইনি রসায়ন এবং শরীরবিজ্ঞানে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। বি, এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নাগারে দুই বৎসর কাল

কার্য্য করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতীয় বিজ্ঞানসভা এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে বিদ্যার্থীরূপে বার্লিন গমন করেন। বিজ্ঞানসভা এবং মহারাজা বাহাদুর ইঁহাকে মাসিক ৭৫৲ করিয়া সাহায্য করেন। ধীরেন্দ্রনাথ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শার্লটেনবুর্গ টেকনিক্যাল হক্‌স্কিউলে ডাক্তার উইট (Witt) মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পি এইচ ডি।

রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমেই এইরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে ডাক্তার উইটকে বলিতে হইয়াছিল ভারতবর্ষে থাকিয়া রসায়ন শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ হয় তাঁহার এ ধারণা পূর্ব্বে ছিল না। ধীরেন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রা করিবার সময় জার্ম্মান ভাষার কিছুই জানিতেন না। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি কিরূপে উক্ত ভাষা শিক্ষা করিয়া উহাতে নিজ গবেষণা বিষয়ে প্রবন্ধ (Thesis) প্রদান করিবেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস তিনি দুই বৎসরের মধ্যে জার্ম্মান ভাষায় ঐরূপ প্রবন্ধ রচনা করিতে সমর্থ হইবেন। প্রকৃতপক্ষেও ধীরেন্দ্রনাথ তিন বৎসরের কার্য্য দুই বৎসরে সম্পন্ন করিয়া জার্ম্মান ভাষায় এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। উহা পাঠ করিয়া পরীক্ষক দুই বৎসর পূর্ব্বের সেই ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে বাস্তবিকই এই বাঙ্গালী ছাত্র ইউরোপীয় ছাত্রদিগের আদর্শস্থানীয়। দুই বৎসরে কোনও ইউরোপীয় ছাত্র একটী নূতন ভাষা শিক্ষা করিয়া এরূপ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তিন বৎসর কাল পূর্ণ না হইলে কাহাকেও Ph. D. পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় না বলিয়া কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি আচার্য্য লাইবারম্যানের (Dr. Liebermann) অধীনে রং সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি আচার্য্য উইট ও লাইবারম্যানের (Dr. Witt & Dr. Liebermann) নিকট হইতে দীর্ঘ প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছেন। আচার্য্য উইটের বিশেষ অনুরোধে বোধ হয় তিনি আরও দুই বৎসর বার্লিনে থাকিয়া গবেষণা করিবেন।

বর্ষা নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দু'জন কুলাবে ;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

(আজ) গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে ;
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর দুলাবে।
কূজন-ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজবে কেকা ;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে!
(আর) গহন ছায়া মোহন মায়া প্রহর ভুলাবে।

এস তুমি যুথীর বনে ছুকুল বুলাবে;
কোল দিয়ে ঐ কেলি-কদম্-মুকুল খুলাবে॰
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা-রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন্ গুলাবে!
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে?
কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ফুলাবে?
আয় গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বঙ্গের লোকতত্ত্ব

বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে যে ভূখণ্ডকে বাঙ্গলা প্রদেশ বলা হইত, তাহার লোকসংখ্যা ছিল ৭,৮৪,৯৩,৪১০; এখন যাহাকে বাঙ্গলা প্রদেশ বলা হইতেছে, তাহার লোকসংখ্যা ৪,৬৩,০৫,৬৪২। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার এলাকা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম করা হইয়াছে। বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বে যে-সকল স্থান বাঙ্গলার এলাকাভুক্ত ছিল, তন্মধ্যে পূর্ণিয়া, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, হাজারীবাঘ, ধলভূম, প্রভৃতি জেলা বা পরগণাকে বঙ্গের সামিল রাখাই উচিত ছিল। তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীসংখ্যা এত কম হইত না।

বঙ্গদেশে গড়ে এক বর্গ মাইলে ৫৫১ জন লোক বাস করে; ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে গড়ে এক বর্গ মাইলে ৬১৮জন লোক বাস করে। সুতরাং বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংলণ্ড-ওয়েল্‌স্ অধিকতর জনাকীর্ণ। অথচ ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশবৎসরে বঙ্গের জনসংখ্যা শতকরা ৮ জন বাড়িয়াছে, ইংলণ্ড-ওয়েল্‌সের ঐ দশ বৎসরে শতকরা ১০·৯ বাড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যে সন্তোষজনক তাহা বলা যায় না।

বঙ্গের সহরে লোকেরা ঐ দশ বৎসরে শতকরা ১৩ জন বাড়িয়াছে। ইহা গ্রাম্য লোকের বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী। সহরে হিন্দুস্থানী ও বেহারী কুলি চাকরাদির আমদানি ছাড়া, ইহার কারণ সম্ভবতঃ দুটি,—গ্রামের লোকদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়, পল্লীগ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্যও ভাল নয়। এই দুটি কথা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর মনে রাখা উচিত এবং যাহাতে পল্লীগ্রাম-সকলের উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হাজার-করা ৯৩৬ জন গ্রামে এবং কেবলমাত্র ৬৪ জন সহরে বাস করে। গঙ্গার উভয়পার্শ্বে ২৪-পরগণা, হুগলী ও হাবড়া জেলায় পাটের কল প্রভৃতি থাকায় কতকগুলি স্থানের জনসংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ভাটপাড়ার লোকসংখ্যা শতকরা ৫০০ বাড়িয়াছে। দশ বৎসরে টিটাগড়ের লোকসংখ্যা তিনগুণ হইয়াছে, এবং ভদ্রেশ্বরের শতকরা ৬১ জন বাড়িয়াছে। এখানে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাঙ্গালীর বংশবৃদ্ধি দ্বারা ঘটে নাই; প্রধানতঃ বেহার ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ হইতে কলকারখানায় খাটিবার জন্য মজুর আসায় ঐ সব স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। দশ বৎসরে (১৯০১-১৯১১) ২৪-পরগণা জেলায় কার-খানার সংখ্যা ৭৪ হইতে ১২৪ এবং মজুরদের সংখ্যা ৯৪ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার হইয়াছে। বঙ্গের পাটের কলে এখন ২০ লক্ষ মজুর খাটে। দশবৎসর পূর্ব্বে ইহার অর্দ্ধেক ছিল। এই সব কুলিদের অধিকাংশই বঙ্গ-ভাষী নহে। বাঙ্গালী শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের কি দশা হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহারা কি পাটের কল এবং অন্যান্য কারখানায় মজুরী অপেক্ষা অন্য কাজে বেশী উপার্জ্জন করে বলিয়া এই সব কার-খানায় আসে না? না, তাহারা বেহারী ও হিন্দুস্থানী কুলীদের মত শ্রমপটু নহে বলিয়া, অধিক রুগ্ন বা বাবু বা দুর্ব্বল বলিয়া, জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইতেছে? কেবল কয়েক জন শিক্ষিত লোক ত দেশের লোক নয়; অধি-কাংশই শ্রমজীবী। তাহারা সুস্থ, সবল, কষ্টসহিষ্ণু না হইলে দেশের মঙ্গল কোথায়?

কলিকাতার স্থূল স্থূল লোকতত্ত্ব আমরা গতমাসের

প্রবাসীতে লিখিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গে মানুষের আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, যে, ৫,৫৩,০০০ বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে, কিন্তু ১৮,৩৯,০০০ অবাঙ্গালী বঙ্গে আসিয়াছে। তন্মধ্যে বিহার ও উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছে সাড়ে বার লক্ষ, এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ হইতে চারি লক্ষ ছয় হাজার। বিহার ও হিন্দুস্থানের লোকেরা মনে করেন, যে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেশ লুটিয়া খাইতেছে। বাস্তবিক কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে অবাঙ্গালীরা যত টাকা নিজ নিজ প্রদেশে লইয়া যায়, বাঙ্গালী বঙ্গেতর প্রদেশ-সকল হইতে তত টাকা আনে না। এ বিষয়ে প্রাদেশিক হিংসা থাকা উচিত নয়। যেমন কথা আছে যে পৃথিবী বীরভোগ্যা, তেমনি সর্ব্বত্রই সমর্থের জয়। যে যে-কাজের জন্য যোগ্যতম, সে সেই কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিবে; ইহাতে হিংসা করিলে চলিবে কেন?

এখন যে জেলাগুলি বঙ্গের লাটের অধীন তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা সাড়ে বত্রিশ লক্ষ অধিক মুসলমান বাস করে। কিন্তু ইহা দ্বারা বঙ্গভাষী অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত কিরূপ তাহা বুঝা যায় না। কারণ পূর্ণিয়া, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, ধলভূম, হাজারীবাগ, সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ, কেঁওঝর ও বালেশ্বরে বাঙ্গালী আছে, এবং ঐ-সকল স্থানেই মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী। ঐ-সকল স্থানই এখন বাঙ্গলার এলাকার বাহিরে ফেলা হইয়াছে। যাহাকে আসাম বলা হয়, সেই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ৩৮,৩৮,৭৬৯, এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৯,০১,০৩২। আসামের কথিত ভাষা-সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকে বাঙ্গলা এবং আসামীয় ভাষা বলে। বাঙ্গলা বলে ৩২,২৪, ৬০৪ এবং আসামীয় বলে ১৫,৩২,৩৯৩। অতএব সম্ভবতঃ আসামবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু বেশী। যে তিনটি জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী তাহার মধ্যে প্রত্যেক ১০হাজার অধিবাসীর মধ্যে গোয়াল-পাড়ায় ৫৫৭৩ হিন্দু, ৩৫২২ মুসলমান; কাছাড়ে ৬৪৮৮ হিন্দু, ৩৩১১ মুসলমান; শ্রীহট্টে ৪৪৪৪ হিন্দু, ৫৫১৯ মুসলমান। কিন্তু বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে যে-সকল জেলায় বাঙ্গালী আছে, তাহাদের মধ্যে ঠিক কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান, তাহা জানিতে না পারিলে, বাঙ্গালীরা প্রধানতঃ হিন্দু বা মুসলমান তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু এই প্রকার ঠিক্ সংখ্যা জানিবার উপায় নাই। আমরা সরকারী রিপোর্ট-সকল হইতে যতটা অনুমান করিতে পারিতেছি, তাহাতে বোধহয় বাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ১৩জন, মধ্যবঙ্গে শতকরা ৪৮জন, উত্তর বঙ্গে শতকরা ৫৯জন মুসলমান। মালদহে শতকরা ৫০ এবং বগুড়ায় শতকরা ৮২জন মুসলমান। পূর্ব্ববঙ্গে তাহাদের সংখ্যা হিন্দুর দ্বিগুণ। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা কম।

বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিম বঙ্গে, সিকির কিছু বেশী পূর্ব্ববঙ্গে এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ করিয়া মধ্য ও উত্তর বঙ্গে বাস করে। বিশেষ করিয়া হিন্দুজেলা পশ্চিম বঙ্গেই দেখা যায়, তথাকার অধিবাসীদের শতকরা ৮২জন হিন্দু। মধ্যবঙ্গে শতকরা ৫১জন, উত্তরবঙ্গে ৩৭জন ও পূর্ব্ববঙ্গে ৩১জন হিন্দু। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগণা, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ী, এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, এই দশ জেলায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক। শেষোক্ত জেলায় হিন্দু অপেক্ষা ভূতপ্রেত-পূজক এবং বৌদ্ধ উভয়েরই সংখ্যা অধিক। কুচবিহার ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, এই দুই রাজ্যে এবং কলিকাতায় হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী। কলিকাতার দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক হিন্দু।

(১৯০১-১৯১১) দশ বৎসরে হিন্দুরা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, মুসলমানদের বৃদ্ধির পরিমাণ তাহার তিনগুণ। সমগ্রবঙ্গে হিন্দুরা বাড়িয়াছে শতকরা ৩·৯জন, মুসলমানেরা ১০·৪। পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুর বৃদ্ধি শতকরা ১·৭, মুসলমানের ৪·৯; উত্তর বঙ্গে হিন্দুর ২·৯, মুসলমানের ৮·২; পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর ৬·৬, মুসলমানের ১৪·৬; কেবল মধ্যবঙ্গে হিন্দুর বৃদ্ধি (৫·২) মুসলমানের বৃদ্ধি (৩·১) অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে কারণের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কলকারখানায় বেহারী ও হিন্দুস্থানী

হিন্দু কুলি মজুরের আমদানী প্রধান কারণ। গত ত্রিশ বৎসর হইতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ বেশী হইয়া আসিতেছে। ঐ ত্রিশ বৎসরে হিন্দুরা শতকরা ১৬জন বাড়িয়াছে, কিন্তু মুসলমানেরা বাড়িয়াছে শতকরা ২৯জন। মুসলমানের বৃদ্ধি পূর্ব্ববঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তথায় এখন ১৮৮১ সাল অপেক্ষা শতকরা ৫০.৫ জন মুসলমান বেশী; কিন্তু হিন্দু কেবল শতকরা ২৬জন বেশী।

সরকারী রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—(১) হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উৎপাদিকা শক্তি (Fecundity) বেশী। কিন্তু ইহা দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যা হইল না। ইহা কারণনির্দ্দেশ নয়, একই তথ্যের ভিন্ন ভাষায় পুনরুক্তি মাত্র। অর্থাৎ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, জাপানীদের চেয়ে শিখেরা লম্বা কেন, তাহার উত্তরে যদি কেহ বলে যে শিখদের দেহের বৃদ্ধি বেশী; তাহা হইলে যেরূপ কারণনির্দ্দেশ হয়, ইহাও তেমনি কারণনির্দ্দেশ। বাস্তবিক, মুসলমানদের উৎপাদিকা শক্তি কেন বেশী তাহাই ত স্থির করিতে হইবে। (২) গর্ভধারণের বয়সের (১৫ হইতে ৪৫) বিবাহিতা সধবা স্ত্রীলোক মুসলমানদের মধ্যে যত বেশী, হিন্দুদের মধ্যে তত বেশী নহে। ইহা একটা প্রকৃত কারণ হইতে পারে। এই বয়সের প্রতি চারি জন সধবা মুসলমান স্ত্রীলোকের জায়গায় কেবল তিন জন সধবা হিন্দু স্ত্রীলোক আছে। এই বয়সের শতকরা ৮৭ জন মুসলমান স্ত্রীলোক সধবা, কিন্তু কেবল শতকরা ৭৬ জন হিন্দু স্ত্রীলোক সধবা। এই পার্থক্যের কারণ, মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের চলন আছে। গর্ভধারণের বয়সের শতকরা ২২ জন হিন্দু স্ত্রীলোক বিধবা, কিন্তু ঐ বয়সের শতকরা ১১ জন মুসলমান স্ত্রীলোক মাত্র বিধবা আছে। (এই প্রসঙ্গে আমরা যাহার স্বামী জীবিত আছে এরূপ পুনর্বিবাহিতা বিধবাকেও সধবা বলিয়া ধরিতেছি।) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈধব্যের পর আবার বিবাহিত হওয়ায় অনেক মুসলমান স্ত্রীলোকের সন্তান হয়; হিন্দু সমাজে তাহা হয় না। অতএব মুসলমানের অধিক বৃদ্ধির ইহা একটি প্রকৃত কারণ। (৩) মুসলমান-সমাজ অপেক্ষা হিন্দু-সমাজে বাল্য-বিবাহ অধিক প্রচলিত। অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হইলে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা অধিক হয়, এবং মাতার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সন্তান হওয়া বন্ধ হয়। গর্ভধারণের বয়স থাকিতে থাকিতে এরূপ অনেক মাতার মৃত্যুও হয়। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কা মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন বিবাহিতা; কিন্তু ঐ বয়সের হিন্দু বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন বিবাহিতা।

এখানে বাল্য-বিবাহ ও বাল্য-মাতৃত্বের প্রভেদ স্মরণ রাখিতে হইবে। বাল্যে বিবাহ হইলেও যদি বাল্যে মাতৃত্ব না ঘটে, তাহা হইলে অন্য ক্ষতি যাহাই হউক, মাতার বা সন্তানের শারীরিক কোন ক্ষতি হয় না। পঞ্জাবে জাটদের মধ্যে ৫ হইতে ৭ বৎসরের বালিকার বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু কন্যা প্রায়ই ১৮।১৯।২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ী যায় না। এই কারণে জাটদের দৈহিক কোন অবনতি দেখা যাইতেছে না। বঙ্গ ও বিহারে বাল্য-মাতৃত্বের প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহার কুফলও যাঁহার চোখ আছে তিনিই দেখিতে পান।

বঙ্গের ১৯০১ সালের আদমসুমারির বৃত্তান্তে মুসলমানদের অধিকতর বংশবৃদ্ধির আরও কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। (১) হিন্দু-স্বামীস্ত্রীর বয়সের পার্থক্য মুসলমান স্বামীস্ত্রীর বয়সের পার্থক্য অপেক্ষা অধিক। ইহা সত্য কথা। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কোন কোন জাতির মধ্যে খুব বেশী কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করার রীতি আছে। এই জন্য এই-সকল শ্রেণীর অনেক দরিদ্র লোক পণ সংগ্রহ করিতে করিতেই প্রায় প্রৌঢ় দশা ছাড়াইয়া যায়। তাহার পর একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহার সন্তান হইবার পূর্ব্বে বা ২।১টী সন্তান হইবার পর তাহাকে বৈধব্যে ফেলিয়া অনেকে মারা পড়ে। এই সব শ্রেণীর অনেকে বিবাহই করিতে পারে না। ইহাও মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর বংশবৃদ্ধি কম হওয়ার একটি কারণ। (২) মুসলমানের খাদ্য হিন্দুর খাদ্য অপেক্ষা পুষ্টিকর বলিয়া তাহা উহাদের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা অধিকাংশ স্থলে সত্য কিনা বলা যায় না। (৩) মুসলমানদের অবস্থা, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গে,

হিন্দুদের চেয়ে সচ্ছল। হিন্দু সহজে পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া যাইতে চায় না; সে বরং বাড়ীতে থাকিয়া ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান পরিবার প্রতিপালন করিতে গিয়া কষ্ট ভোগ করিবে, তবুও অন্যত্র যাইবে না। মুসলমানের এরূপ কোন অনিচ্ছা বা সংস্কার নাই; এই জন্য তাহারাই পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় নদীর চরে বসবাস করে এবং তাহার উর্ব্বরা ভূমি হইতে প্রচুর শস্য লাভ করে। ভারতবর্ষেও লোকসংখ্যাবৃদ্ধি সাংসারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত অধিক বৃদ্ধি আংশিক ভাবে তাহাদের সাংসারিক অবস্থার সচ্ছলতা-জাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই সরকারী মন্তব্যের তাৎপর্য্য।

গবর্ণমেণ্টনির্দ্দিষ্ট এই তৃতীয় কারণটি হয়ত সত্য। কিন্তু অবস্থা খারাপ হইলে সন্তান কম হয়, এবং অবস্থা ভাল হইলে সন্তান বেশী হয়, ইহাকে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির একটি সাধারণ নিয়ম বলা যায় না*।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে গত ত্রিশ বৎসর হইতে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে বেশী বাড়িতেছে। তবে কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানদের উৎপাদিকাশক্তি হিন্দুদের চেয়ে কম ছিল? তাহার পর হঠাৎ বাড়িয়াছে কি কারণে?

হিন্দুদের যে পরিমাণে বাড়া উচিত, তাহারা সে পরিমাণে বাড়িতেছে না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে আদমসুমারির শ্রেণীবিভাগ কার্য্যে হিন্দুর সংখ্যা কম দেখাইবার একটা কারণ ঘটিয়াছে, এবং এই কম দেখাইবার ঝোঁক হ্রাস পাইতেছে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ভূতপ্রেত-পূজকদের (Animist) ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে যে রেখা টানা শক্ত তাহা সরকারী ইম্পীরিয়্যাল গেজেটিয়রের "ধর্ম্ম" প্রবন্ধলেখক† এবং অনেক লোকসংখ্যাগণনার তত্ত্বাবধারক (Census superintendent) প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, ১৮৯১এর পূর্ব্বে যাহারা হিন্দু বলিয়া গণিত হইত এরূপ অনেক লোক পরে ভূতপ্রেতপূজক বলিয়া গণিত হওয়ায় হিন্দুদের বৃদ্ধি যেরূপ কম তদপেক্ষাও কম দেখাইতেছে। আরও একটা কথা এই যে যাহারা যত অনুন্নত, বা আদিম অবস্থার নিকটবর্ত্তী, তাহাদের বংশবৃদ্ধি অনেক সময় তত বেশী দেখা যায়। ডাক্তার হাবার্ড (Dr. A. I. Hubbard) প্রণীত "The Fate of Empires" নামক একটি নবপ্রকাশিত পুস্তকে আছে যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির বংশবৃদ্ধি কমিতে থাকে। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদমসুমারির রিপোর্টে দেখিতে পাই যে বাঙ্গালাপ্রদেশে ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত দশবৎসরে মুসলমানেরা বাড়িয়াছিল শতকরা ৮·৯ জন, কিন্তু ভূতপ্রেতপূজকেরা বাড়িয়াছিল ৩৩·৯ জন। ১৮৮১ হইতে ১৯০১ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে ভূতপ্রেতপূজকেরা বাড়িয়াছিল শতকরা ৩৫·২ জন, মুসলমানেরা ১৭·৪ জন। সুতরাং এই অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের বংশবৃদ্ধির হার যে মুসলমানদের চেয়েও বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদিগকে হিন্দুশ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দেখানতে যে হিন্দুদের বৃদ্ধি আরও কম দেখাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক মুসলমানেরা যে হিন্দুদের চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণে বাড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামেও তাহাদের বৃদ্ধির হার বেশী। ভারতবর্ষে ত এরূপ ঘটিতেছেই। অন্যান্য দেশেও বোধ হয় মুসলমানেরা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা বেশী বাড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রুষিয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথায় ১৯০১ হইতে ১৯০৪

* "Nor, again, can the decline in fertility be connected with any diminution of material prosperity. On the contrary, the fertility-rate appears to be best maintained in countries by no means distinguished for their high standard of living, such as Spain, Italy, Ireland, and perhaps, Austria."—Encyclopædia Britannica, 11th Edition, article "Population."

† The writer of the article on Religion in the new edition of the Imperial Gazetteer, has remarked with reference to the method employed at the Census of 1901, and also at the present one: "Such a classification is of no practical value, simply because it ignores the fact that the fundamental religion of the majority of the people,—Hindu, Buddhist or even Mussulman—is mainly animistic. The peasant may nominally worship the greater gods; but when trouble comes in the shape of disease, drought or famine, it is from the older gods he seeks relief."

পর্য্যন্ত বৎসরে গড়ে গ্রীক্ চার্চ্চের লোকেরা হাজার-করা ১৫·৯, ইহুদীরা ১৪·৫, রোমান কাথলিকেরা ১২, প্রটেষ্টাণ্টেরা ১০, এবং মুসলমানেরা ১৯·৮জন বাড়িয়াছে। মুসলমানদের এইরূপ বৃদ্ধি সমাজতত্ত্ববিৎদিগের একটি গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত।

আমরা হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এইজন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহাজ্ঞানী বেকন বলিয়াছেন যে "লোকসংখ্যার আধিক্য এবং তাহাদের জা'তের * শ্রেষ্ঠতা, এই দুইয়েতেই রাষ্ট্রের প্রকৃত মহত্ত্ব"; লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই সমাজ বিশেষের লোকের সুদশার একটি নিশ্চিততম চিহ্ন। † সমুদয় সুসভ্য জাতি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে না বলিয়া তথায় ৩০ বৎসয়ের ঊর্দ্ধবয়স্ক অবিবাহিত পুরুষদের উপর ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। হিন্দুরা কেন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতেছে না, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই চিন্তনীয়, এবং রোগ নির্ণয় করিয়া তাহার চিকিৎসাও করা কর্ত্তব্য। মুসলমানেরা যে যে কারণে বেশী বাড়িতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া সেই কারণগুলির স্থায়িত্ব বিধান করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য।

খৃষ্টিয়ানেরা শতকরা ২২জন বাড়িয়াছে। বঙ্গের ১৯১১-১২ সালের শাসনবিবরণীতে দেখা গেল যে বাপ্টিষ্ট মিশনারীরা পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের মধ্যে কাজ করিয়া খুব ফল পাইয়াছেন। বাস্তবিক হিন্দুরা যে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতেছে না, তাহার একটি কারণ এই যে অনেক হিন্দু, প্রধানতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মের লোকেরা হিন্দু হয় না, আধুনিক কালে হইবার উপায়ও নাই; যদিও পুরাকালে কত জাতি যে হিন্দু হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই কঠিন। যাহা হউক, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দু করা যাক বা না যাক, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা যাহাতে উৎপীড়িত, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত বা অপমানিত হইয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন না করে, তাহার চেষ্টা করা হিন্দু সমাজের নেতাদের কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলাদেশে শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা বড় বেশী। প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে একজন এক বৎসর বয়সের মধ্যেই মারা যায়। কলিকাতায় ত পরিষ্কার পানীয় জল আছে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার কত বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখানে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৩১ জন, অর্থাৎ প্রায় তিনজনের মধ্যে একজন। এত অধিক মৃত্যুর কারণ সরকারী রিপোর্টে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে:—বাল্য-বিবাহ, স্বাস্থ্যরক্ষার অতি সহজ নিয়মগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ী রাস্তা নর্দ্দমাদি, এবং, শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে, এরূপ দারিদ্র্য যে মাতা প্রায় প্রসবের দিন পর্য্যন্ত খাটিতে বাধ্য হয়, এইগুলি শিশুদের অকাল-মৃত্যুর কয়েকটি কারণ। আমাদের বোধ হয় ধাত্রীদের অজ্ঞতাও অন্যতম কারণ।

১৯১২ সালের স্বাস্থ্যবিষয়ক গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ যে ঐ বৎসর বঙ্গে মৃত্যুসংখ্যা হাজারকরা ২৯.৭৭ এবং জন্মসংখ্যা হাজারকরা ৩৫.৩০ হইয়াছিল। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে এই সংখ্যাদ্বয় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মন্দ বলিয়া বোধ হয়না। কিন্তু বাস্তবিক আমাদের দেশে মৃত্যুর হার বড় বেশী। ১৯১১ সালে বিলাতে মৃত্যুর সংখ্যা হাজারকরা ১৪.৮ মাত্র ছিল, অর্থাৎ আমাদের অর্দ্ধেকেরও কম। তথায় ঐ বৎসর লোক বাড়িয়াছিল হাজারকরা ৯.৬। ১৯১২ অব্দে আমাদের লোক বাড়িয়াছিল হাজারে ৫.৫৩।

সংযত নিয়মাধীন জীবন যাপন করায় এবং অনেকে সন্তান হইবার পূর্ব্বেই বিধবা হইয়া মাতৃত্বের বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ায়, হিন্দু বিধবারা খুব দীর্ঘজীবী হন।

বঙ্গে প্রতি ১০০০পুরুষে ৯৪৫জন স্ত্রীলোক আছে। পুরুষের সংখ্যা এত বেশী হওয়ার কারণ এই যে অনেক পুরুষ একাই রোজগারের জন্য বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে

---

* এখানে "জা'ত" কথাটি ইংরেজী breed অর্থে ব্যবহৃত হইল। যেমন এই ঘোড়াটি খুব ভাল জা'তের। কোন শ্রেণীর মনুষ্যে প্রযুক্ত হইলে ইহার অর্থ এই যে ঐ শ্রেণীর লোকেরা মনুষ্যত্ব হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

† "The true greatness of a State," says Bacon, "consisteth essentially in population and breed of men;" and an increasing population is one of the most certain signs of the well-being of a community.—Encyclopaedia Britannica, 11th Edition.

আসে; স্ত্রীরা বাড়ীতে থাকে। কিন্তু এই আগন্তুকদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, যাহাদের বঙ্গেই জন্ম, কেবল তাহাদিগকে ধরিলেও দেখা যায় যে বঙ্গে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৭০ জন স্ত্রীলোক আছে। বিধবাবিবাহবিরোধীদের একটি যুক্তি আছে যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা স্বভাবতই বেশী; সুতরাং একই স্ত্রীলোককে একবার কুমারী অবস্থায় এবং পুনর্ব্বার বৈধব্যের পর বিবাহ করিতে দিলে অনেক কুমারী বিবাহ করিবার সুযোগ মোটেই পাইবে না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, তখন বিধবাবিবাহ না দিলে অনেক পুরুষের বিবাহই হইবে না। এবং বাস্তবিকও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে তাহাই দেখা যায়।

বর ও কন্যার "বাজার দর" বৃদ্ধি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও, বঙ্গে প্রায় সকলেরই বিবাহ হওয়ার রীতি অক্ষুন্ন আছে। বিবাহের বয়স বাড়িতেছে, ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে জ্ঞানিজনানুমোদিত সংস্কারের বিস্তার ইহার আংশিক কারণ; কিন্তু অনেক স্থলেই কন্যার পিতামাতা পণের যোগাড় করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া কন্যাকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখেন।

পুরুষদের মধ্যে শতকরা সাড়ে তিন জন বিপত্নীক, স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ২০জন বিধবা। ৫ হইতে ১০ বৎসরের হিন্দু বালিকাদের মধ্যে শতকরা ১২.৫ বিবাহিত; ঐ বয়সের মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৯জন বিবাহিত। ১০ হইতে ১৫ বৎসরের হিন্দু বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জনেরও উপর বিবাহিত; ঐ বয়সের মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন মাত্র বিবাহিত। হিন্দু স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৪ জনের মধ্যে একজন, এবং মুসলমান নারীদের মধ্যে ৬ জনের মধ্যে একজন বিধবা। ৫ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ৪৭১১ বালক ও ১৫,৬২২ বালিকা বিবাহিত। ঐ বয়সের ১৩১ বালক বিপত্নীক এবং ১,৮৪৭ বালিকা বিধবা।

বঙ্গে শতকরা ৯২ জন বাঙ্গলা এবং ৪জন হিন্দী-উর্দ্দু বলে। ২৯৪০০০ জন ওড়িয়া, ৮৯০০০ জন নেপালী, ৭৭১০০০ মুণ্ডারী, ১১৭০০০ ওরাওঁ ভাষা বলে।

শতকরা ৭·৭ জন বঙ্গে লিখিতে পড়িতে পারে। মান্দ্রাজে ৭·৫, এবং বোম্বাইয়ে ৬·৯ জন পারে। বাঙ্গলাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, কিন্তু তথাপি এবিষয়ে আমাদের অবনত অবস্থা অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে বুঝা যাইবে। জাপানে শতকরা ৯০ জন লিখনপঠনক্ষম; বঙ্গে ৭·৭ জন এবং বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় ৩৩ জন! ইউরোপে রুশিয়া ও স্পেন শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত। অথচ ১৯১০ সালে স্পেনে ৩৩·৪ জন লিখিতে পড়িতে পারিত। রুশিয়ার খুব অনুন্নত এশিয়াস্থ প্রদেশসমূহ এবং মরুময় স্থান সকল ধরিয়াও শতকরা ২৮ জন (বঙ্গের প্রায় ৪গুণ) লিখিতে পড়িতে পারে। বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত সহর কলিকাতায় শতকরা ৩৩ জন লিখনপঠনক্ষম, আর রুশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত প্রদেশ. এস্থোনিয়ায় ৭৯·৯ জন লিখনপঠনক্ষম। আমাদের কি ঘোর দুর্দ্দশা!

মধ্যবঙ্গে শতকরা ১১, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১০, পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৭ এবং উত্তরবঙ্গে শতকরা ৫জন লিখনপঠনক্ষম। মৈমনসিং, রাজসাহী, রংপুর এবং মালদহে শতকরা ৫জনেরও কম লোক লিখিতে পড়িতে পারে।

পুরুষদের ৭জনের মধ্যে ১জন এবং নারীদের ৯১ জনের মধ্যে একজন লিখনপঠনক্ষম। পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার দ্রুততর বেগে হইতেছে। দশ বৎসরে শতকরা ১৯.৫ বেশী পুরুষ এবং ৫৬ জন বেশী নারী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। তাহা হইলেও কেবল ৯০,৩৪২ জন নারী অর্থাৎ পুরুষদের একষষ্ঠাংশ লিখিতে পড়িতে পারে।

চারি লক্ষ আটানব্বই হাজার লোক অর্থাৎ শতকরা একজন মাত্র ইংরাজী লিখিতে পড়িতে পারে। তাহাদের এক-চতুর্থাংশ কলিকাতার বাসিন্দা।

মুসলমান লিখনপঠনসমর্থের সংখ্যা হিন্দুদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মুসলমানেরা হিন্দুর চেয়ে প্রায় ৩৩লক্ষ বেশী; কিন্তু প্রতি ৫জন লেখাপড়া-জানা হিন্দুর স্থলে কেবল ২জন মাত্র তদ্রূপ মুসলমান আছে। যাহা হউক মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার দ্রুততর বেগে হইতেছে। ১৯০১এর আদমসুমারিতে লেখাপড়া-জানা হিন্দু ও

মুসলমান যথাক্রমে শতকরা ১০.৩ এবং ৩.৫ ছিল; ১৯১১তে হইয়াছে ১১.৮ এবং ৪.১। অর্থাৎ হিন্দুরা ৭ হইতে ৮জন, মুসলমানেরা ৬ হইতে ৭ জন হইয়াছে। মুসলমান পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৯ ও ৩১; হিন্দুদের মধ্যে হইয়াছে ১৬ এবং ৬৪। অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার পুরুষ শিক্ষার চারিগুণ বেগে হইতেছে। মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা হিন্দু পুরুষদের প্রায় দ্বিগুণ বেগে বিস্তার লাভ করিতেছে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। কৈবর্ত্ত, পোদ, নমঃশূদ্র এবং রাজবংশীদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ পোদেরা খুব উন্নতি করিয়াছে।

বঙ্গে দশবৎসরে ৪ হাজার বিদ্যালয় এবং ৪ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী বাড়িয়াছে। ছাত্রী ও বালিকা বিদ্যালয় তিনগুণ বাড়িয়াছে।

পাগল, বোবা-কালা, অন্ধ এবং কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৯৭৮, ৩২১২৫, ৩২৭৪৭, ১৭৪৮৫; প্রতিলক্ষে তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩, ৬৯, ৭১, ও ৩৮। বঙ্গে পাগলের সংখ্যা বড় বেশী; দার্জিলিং ও নদীয়া ছাড়া সব জেলাতেই প্রতিলক্ষে ২৫ জনেরও উপর পাগল। ভাগীরথীর পূর্ব্বদিকে পাগলামির বেশী প্রাদুর্ভাব; উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গেই পাগল খুব বেশী। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে লক্ষে ১৫৭ জন পাগল। নারীদের মধ্যে দশবৎসরে একলক্ষে ১জন পাগল বাড়িয়াছে, পুরুষদের মধ্যে অনুপাত পূর্ব্ববৎ আছে। বোবা-কালার অনুপাত পূর্ব্ববৎ আছে। উত্তরবঙ্গের যে সব জেলায় হিমালয়োদ্ভূত নদী-সকল প্রবাহিত, তথায় বোবা-কালার সংখ্যা বেশী, এবং উহারা সকলে জড়বুদ্ধি এবং গলগণ্ডবিশিষ্ট। মধ্যবঙ্গ ব্যতীত আর সর্ব্বত্র অন্ধতা কমিয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় কুষ্ঠরোগের বড় প্রাদুর্ভাব। বাঁকুড়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; প্রতি দশ হাজারে ২৩ জন কুষ্ঠরোগী; সমগ্র ভারতে এমন কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব আর কোথাও নাই। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই সব জেলায় এবং সমগ্র বঙ্গদেশে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কমিয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরে ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ নিজেকে শেখ বলিয়াছে, তাহাকেই শেখ বলিয়া ধরা হইয়াছে; ইহাতে ঐ অঞ্চলের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান শেখ বলিয়া গণিত হইয়াছে। ১৯১১র আদমসুমারীতে ১৯০১এর মত হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতা নির্ণয়ের কোন চেষ্টা হয় নাই। ভালই হইয়াছে। কেবল যে-সকল জাতি নূতন নামে পরিচিত হইতে চাহিয়াছে তাহাদিগের প্রার্থনা প্রায় পুর্ণ করা হইয়াছে। যেমন, চণ্ডালের পরিবর্ত্তে নমঃশূদ্র এবং চাষী কৈবর্ত্তের পরিবর্ত্তে মাহিষ্য নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৭.৫, ৯, ও ১৩ জন বাড়িয়াছে।

প্রায় ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ অর্থাৎ বার আনা অধিবাসী পশুচারণ ও কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তন্মধ্যে তিন কোটির কিছু কম, অর্থাৎ সমগ্র অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক, বার লক্ষ বা শতকরা ৩জন চাষের জমীর আয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বা শতকরা সাড়ে-সাত জন খামারের চাকর বা ক্ষেতের মজুর। ৩৪৪১০০০ শ্রমজীবী; তাহার সিকি কাপড় ইত্যাদি বুনিয়া বা সূতা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পাটের কল ইত্যাদিতে ১০ বৎসরে শত-করা ১৪০ জন লোক বাড়িয়াছে। এখন উহাতে ৩২৮০০০ জন খাটে। ২৩ লক্ষের উপর বাণিজ্য অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় করে। প্রায় পাঁচ লক্ষ সরকারী কাজ করে। আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় দশহাজার।

যে-সকল কলকারখানায় ২০ জনের উপর লোক কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ১৪৬৬। তন্মধ্যে ১০০১টি বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে অবস্থিত;—কলিকাতায় ৪৯৫টি, ২৪-পরগণায় ১৭৫টি এবং হাবড়ায় ১২৪টি। সমগ্র কুলি ও কারিগরের সংখ্যা ৬০৬৩০৫। ৭৭৬৮৪ জন চৌদ্দবৎসরের কম বয়স্ক। ১৬০৮৪৮ জন নিপুণ (skilled) শ্রমজীবী, ৪২৭৯৭২ সাধারণ অনিপুণ (unskilled) মজুর। নিপুণ শ্রমজীবীদের মধ্যে ১০৭৯ ছাড়া সমস্তই ভারতবাসী। যাহারা পরিচালন, পর্য্যবেক্ষণ বা তত্ত্বা-

বধান, ও কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত তাহাদের সংখ্যা ১৭৪৮৫। তন্মধ্যে ২৯১৫ ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গী, ১৪৫৭০ ভারতবাসী। সর্ব্বপ্রকারের সমুদয় শ্রমজীবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাটের কলকারখানায় ও প্রায় তাহার সমান লোক দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির চা-বাগানে নিযুক্ত।

ভারতবাসীরা প্রায় সমুদয় পিতল ঢালাইয়ের কারখানা, তেলের কল, ধানভানা কল, কাঠের আড়ত, ইটের কারখানা, প্রভৃতির মালিক। অপর দিকে সমুদয় পাটের কল ইউরোপীয়দিগের, এবং অধিকাংশ চা-বাগান, এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ও কলনির্ম্মাণের কারখানা তাহাদের। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বড় কারখানা বিদেশীদের হাতে। বড় বড় কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমজীবীই বেশী। পাটের কলে বাঙ্গালী বড় কম। বাঙ্গালী পরিশ্রমে হারিয়া যাইতেছে।

সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৫২ জন মুসলমান ও ৪৫ জন হিন্দু। কিন্তু কৃষি ব্যতীত অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে—শতকরা ৩৭ জন হিন্দু ও ১৫ জন মুসলমান। এইসব কাজে শিক্ষা ও বুদ্ধির অধিক প্রয়োজন। ভূস্বামীদের মধ্যে সাতজন হিন্দুর স্থলে তিনজনমাত্র মুসলমান।

নিবন্ধিকা

সম্প্রীতি লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত Hultzsch-সম্পাদিত মেঘদূত কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত বল্লভ-দেবধৃত পাঠ এবং টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, এবং মেঘদূতের ভিন্ন ভিন্ন পাঠের সুযোগ্য সমালোচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেঘদূতের পাঠ বিচার করিয়া উহার একটি সংস্করণ মুদ্রিত করেন, তখন জিনুসেনের পাঠ, বিদ্যুল্লতা-ধৃত পাঠ, তিব্বতের তঞ্জুর-সংগৃহীত পাঠ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অনাবিষ্কৃত ছিল, তবুও পণ্ডিতকুলগৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন প্রতিভা এবং সুবিচারের বলে মেঘদূতে প্রচলিত অনেক শ্লোক সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন, এবং অনেক পাঠ দোষযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এখন বিবিধ দেশের পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সহজে যে পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বিচারিত হইতে পারিয়াছে, কেবলমাত্র সুবিচারের ফলে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সেই পাঠই অবলম্বনীয় বলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে স্বর্গীয় মনীষীর বিচারদক্ষতা যে-ভাবে প্রমাণিত হইল, তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছে।

প্রবাসীর ১৩১৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "বহির্ভারত" প্রবন্ধে সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, ন্যূনকল্পে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতের সভ্যতা ব্রহ্মদেশ হইতে অনাম পর্য্যন্ত এবং ইউনান হইতে কাম্বোডিয়া পর্য্যন্ত কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল, এবং কিরূপে সমগ্র পূর্ব্বোপদ্বীপ বা বহির্ভারত ভারতের গৌরবের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। যে সময়ে ভারতবর্ষ হীনবীর্য্য হইয়া বিদেশীয় মুসলমানদিগের আক্রমণ প্রতিষেধ করিতে পারে নাই, তখনও ভারতের নীতি এবং ধর্ম্মের আলোক সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উদ্ভাসিত হইতেছিল, খৃষ্টোত্তর একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম এবং কাব্যগ্রন্থ কত অধিক পরিমাণে যবদ্বীপে, শ্যামদেশে এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে নীত হইতেছিল, সম্প্রতি তাহার অনেক সুনিশ্চিত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথ হইতে যে মহাভারত গ্রন্থ যবদ্বীপে নীত হইয়াছিল, বটেভিয়া কলেজের অধ্যাপক D Van. Hlabberton তাহার একটি সুন্দর বিবরণ এ বৎসরের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন।

আমাদের পুরাণগুলিতে যে-সকল ঐতিহাসিক বংশাবলীর উল্লেখ আছে, সেগুলির বিশুদ্ধ তালিকা সংগ্রহ করিবার পক্ষে যবদ্বীপে আবিষ্কৃত মহাভারতের পাঠের বিচার অত্যন্ত উপযোগী হইবে। Hlabberton মহোদয় তাঁহার সুপাঠ্য প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যদিও চারি শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানদিগের প্রভাবে যবদ্বীপে আর্য্যসভ্যতা বিলুপ্তপ্রায়, তথাপি যবদ্বীপবাসীদিগের ভাষায়, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে এবং বহুবিধ সংস্কারে আর্য্যসভ্যতা পরিস্ফুট
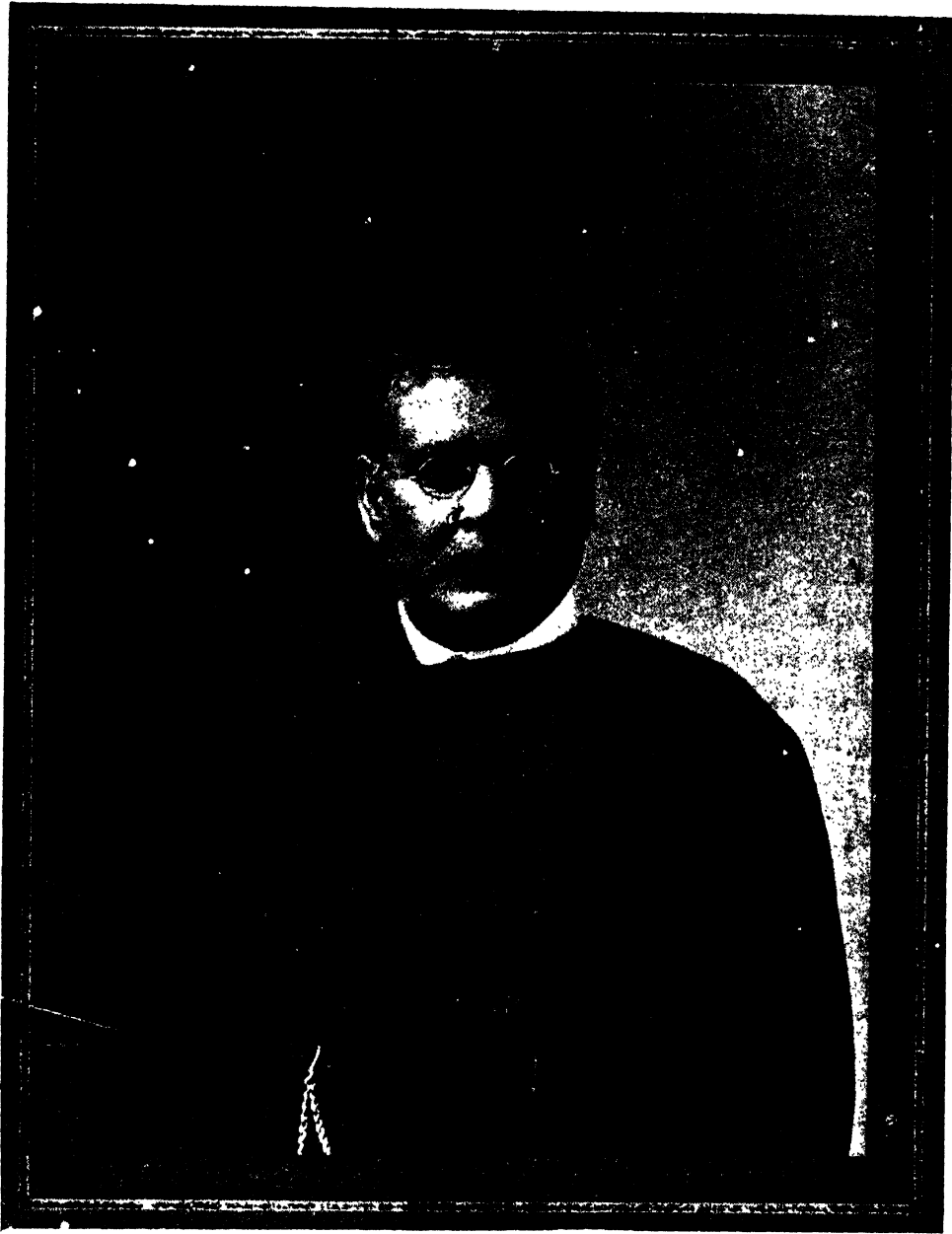
ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ

রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এ কথাও লিখিয়াছেন, যে, যাহারা ধর্ম্মে মুসলমান, তাহারা যথার্থতঃ আর্য্যসভ্যতার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। বহির্ভারতের সকল তথ্যই জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয় বলিয়া এ দেশে আমরা অনেক কথাই জানিতে পারি না।

প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে M. Coedes শ্যাম, কাম্বোডিয়া, অনাম প্রভৃতি স্থানের ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান

করিয়া সুপ্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির যে গৌরব আবিষ্কার করিয়াছেন, আশা করি, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিদেশীয় ভাষাবিৎ কোন পণ্ডিত তাহা বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। ইংরেজি প্রত্নতত্ত্বের পত্রিকায় উহার যে সারাংশ মুদ্রিত হইতেছে, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ইতিপূর্ব্বে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা হইতে সার্ তারকনাথ পালিতের বিজ্ঞানকলেজে বৃত্তি দেওয়া হইবে ও অন্যান্য প্রকারে উহার উন্নতির সাহায্য করা হইবে। "বেঙ্গলী" বলেন যে ঘোষ মহাশয় আরও দশলক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিবেন।

বিদ্যাদানের মত দান আর নাই। জীবিতকালে এতটাকা দান করিয়া ঘোষমহাশয় ধন্য হইলেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি উপকৃত হইল এবং তাঁহার মাতৃভূমি গৌরবান্বিত হইলেন। শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গদেশ এখন ভারতের শীর্ষস্থানীয়। অন্য ধনী বাঙ্গালীরা নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে পালিত ও ঘোষ মহাশয়ের মত বিদ্যাদাতা হইলে, বাঙ্গালী জ্ঞানের পথে আরও অগ্রসর হইতে পারিবে।

এবৎসর জলপ্লাবনে ভারতের নানা প্রদেশের অধিবাসীরা ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় ও গুজরাতে অনেকের প্রাণ গিয়াছে, অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গয়া ও পাটনা জেলার নানা স্থান ডুবিয়া গিয়াছে। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমান সহরের এবং বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলার অনেক গ্রাম জলমগ্ন এবং অনেক গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে। উড়িষ্যার অনেক স্থান ও মেদিনীপুর জেলাতেও এই প্রকার জলপ্লাবন হইয়াছে। কত ঘরবাড়ী যে পড়িয়াছে, ও জলের স্রোতে ধৌত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। মানুষের প্রাণহানিও হইয়াছে কিন্তু কিপরিমাণে হইয়াছে, এখনও তাহা নির্ণীত হয় নাই। জল সরিয়া বা শুখাইয়া গেলে একবার লোক গণনা করা উচিত। তাহা হইলে ১৯১১র আদমসুমারির সহিত তুলনা দ্বারা মৃতের সংখ্যার আন্দাজ পাওয়া যাইবে। শস্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। অনেক গ্রামের সমস্ত ধান্যই নষ্ট হইয়াছে। গবাদি পশু প্রায় নাই বলিলেও হয়। গৃহহারা, আত্মীয়স্বজনের আকস্মিক মৃত্যুতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, সর্ব্বস্বান্ত লোকদের সাহায্যার্থ যুবা, বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, সর্ব্বশ্রেণীর লোকে চেষ্টা করিতেছেন। ছাত্রগণ কাঁথি অঞ্চলে ২।৩ হাজার লোককে বন্যায় অপমৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ও অন্যত্র প্রবীণ লোকদের নেতৃত্বাধীনে তাঁহারা সহস্র কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মধ্যে বিপন্ন লোকদিগকে অন্ন ও কোন কোন স্থলে বস্ত্র দিতেছেন। বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রথম হইতেই বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন। মহারাজাধিরাজ হস্তী ও লোকজনের সাহায্যে শত শত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন এবং নিজ প্রাসাদে ও অন্যত্র তাহাদিগকে স্থান দিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিতেছেন। মাড়োয়ারী সমাজের লোকেরা কেবল অন্ন বস্ত্র অর্থ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তিরাও নিজে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পরিশ্রম করিতেছেন। আর্য্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণমিশন, সকলেই পরিশ্রম করিতেছেন। বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ভক্তিভাজন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে কার্য্য করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বিপন্নের সাহায্যার্থ ধনদান করেন; অধিকতর ধন্য তাঁহারা যাঁহারা দেহমনধন সবই মানবের সেবায় উৎসর্গ করেন।

যেরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ডে ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহাতে এখন অনেক দিন ধরিয়া নানা প্রকারে সাহায্য করা আবশ্যক হইবে। সদ্য সদ্য অন্নবস্ত্র দিতে হইতেছে। কিন্তু পরে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে, সমুদায় ধান্য নষ্ট হওয়ায় পুনর্ব্বার শস্য হওয়া পর্য্যন্ত মানুষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, চাষের জন্য গো-মহিষ কিনিয়া দিতে হইবে। সম্ভবতঃ নানাস্থানে জ্বর ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে। তখন চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতএব গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সুপ্রণালীক্রমে কাজ করা আবশ্যক। এখনই বহু লক্ষ টাকা তুলিবার চেষ্টা আবদ্ধ হউক।

পাষাণী

শিল্পী পাথর কাটিয়া মূর্ত্তি গড়িতেছিল। আহার নিদ্রা নাই;—কোনো দিকে তাহার খেয়াল নাই।

নির্জীব নীরস পাথর শিল্পীর নিপুণ করস্পর্শে একটু একটু করিয়া সজীব হইয়া উঠিতেছিল। বসন্তের বাতাসে ফুল যেমন করিয়া ফোটে, শ্যামলতা যেমন করিয়া জাগে, তেমনি করিয়া, মূর্ত্তির অঙ্গে যেখানে

শিল্পীর হাত লাগিতেছিল সেইখানে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছিল। অমন যে কঠিন পাথর তাহাও রসে পরিপূর হইয়া উঠিতেছিল।

শিল্পী নিজের সৃষ্টি-করা সৌন্দর্য্যে নিজেই মুগ্ধ। নিজের হাতে-গড়া প্রতিমার পানে চাহিতে তাহার সর্ব্ব-শরীর আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল—সেই আনন্দেরই প্রলেপ লাগাইয়া সে মূর্ত্তিটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক অনিন্দ্য রূপসী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুগ্ধ নয়ন রূপসীর পানে তুলিয়া শিল্পী বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গো, তুমি কে!"

সুন্দরী হাসিয়া কহিল—"তুমি যাহাকে গড়িতে চাহিতেছ আমি সেই।"

শিল্পী অবাক হইয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এবং সুন্দরীর মুখ হইতে হাসির জ্যোতিটুকু লইয়া মূর্ত্তির ওষ্ঠপুটে তাহা ফুটাইতে থাকিল।

সুন্দরী বলিল—"শিল্পী! তুমি মূর্ত্তি গঠন কর—আমি তোমায় গান শোনাই।"

এই বলিয়া সুন্দরী মৃদুগুঞ্জনে গান আরম্ভ করিল।

কেবলই কাজ করিয়া শিল্পীর মনের ভিতর যে একটা শ্রান্তি জমিয়া উঠিতেছিল সুন্দরীর গানে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। শিল্পীর মনে হইতে লাগিল, এই গানের গুঞ্জনে তাহার চিত্তকমলের যে দলগুলি মুদিয়াছিল সেগুলি আজ যেন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইয়া উঠিতেছে। সে তাহার হৃদয়ের মধ্যে নব নব ভাবের, নব নব রসের উন্মেষ অনুভব করিতে লাগিল;—তাহার প্রাণ নবীন ছন্দে, নবীন সুরে নূতনতর গান গাহিয়া উঠিল।

শিল্পী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো সুন্দরী, আমার কাছে আসিয়া বোসো।"

সুন্দরী শিল্পীর কাছে আসিয়া বসিল।

শিল্পী মুগ্ধ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল;—তাহার হাতের কাজ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল—"ওগো শিল্পী, তুমি কাজে মন দাও—আমি তোমায় গান শোনাই।"

শিল্পীর মুগ্ধ-নয়নের আগে বসিয়া সুন্দরী গান গাহিতে লাগিল।

শিল্পী জড়িতকণ্ঠে কহিল—"সুন্দরী, তোমার গান ভালো করিয়া শোনাও—আরো কাছে আসিয়া বোসো।"

সুন্দরী গাহিতে গাহিতে শিল্পীর কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

শিল্পী বলিল—"ওগো আরো কাছে এস।"

সুন্দরী আরো কাছে আসিয়া বসিল।

গানের সুরে শিল্পীর মন মাতোয়ারা হইতেছিল, ছন্দের তালে তালে তাহার মন নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল। সুন্দরীর রূপের মোহ শিল্পীর প্রাণে আবেশ আনিতেছিল—তাহার নিশ্বাসের স্পর্শে সে মাদকতা অনুভব করিতেছিল—সে যেন ঢুলিয়া পড়িতেছিল।

সুন্দরী বলিল—"ওগো শিল্পী, তুমি জাগো—জাগো। মূর্ত্তি তোমার সম্পূর্ণ কর।"

শিল্পী সে কথায় কর্ণপাত করিল না—সে কথা তাহার ভালো লাগিল না। সে বলিল—"থাক আমার কাজ! তুমি আমার ঘরে, আমি কোন্ প্রাণে তোমায় ভুলিয়া কাজ লইয়া থাকি! ওগো কাজের কথা রাখো—এখন মুখোমুখী হইয়া বোসো—তোমার ঐ বাহুর পরশ বারেকের তরে দাও।"

সুন্দরী মাথা নাড়িয়া বলিল—"না!"

শিল্পী পাগল হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো সুন্দরী, কথা রাখো—তোমার অধর-সুধা আমায় একবার পান করাও।"

সুন্দরী মাথা নাড়িয়া বলিল—"না!"

শিল্পী তখন হাত বাড়াইয়া সুন্দরীকে ধরিতে গেল।

সুন্দরী হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিল—"শিল্পী থামো। অমন কর কেন? আমি তো তোমারই!"

শিল্পী অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো তবে কেন দূরে অমন করিয়া দাঁড়াইয়া—এস এই বক্ষে!"

সুন্দরী আর কিছু বলিল না—শুধু একটু হাসিল।

শিল্পী উৎসাহিত হইয়া সুন্দরীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ফেলিল—তাহার ওষ্ঠপুটে একটি আবেগভরা চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

কিন্তু এ কি! এমন কোমল ওষ্ঠপুট এত কঠিন হইল কেমন করিয়া!

শিল্পী সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার সুন্দরী পাষাণী হইয়া গেছে!—তাহার ওষ্ঠপুটে শিল্পীর চুম্বন-রেখাটি কেবল জল জল করিতেছে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভ্রম সংশোধন

শ্রাবণমাসের প্রবাসীতে "আনন্দমোহন কলেজ" প্রবন্ধে অনবধানতা বশতঃ লেখা হইয়াছিল যে যশোহর জেলায় কোনো কলেজ নাই। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সরকার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যশোহরের নড়াল মহকুমায় জমীদার বাবুদের প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কলেজ আছে। উহা প্রথমে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র

শান্তিপুরে সন্ন্যাসান্তে।
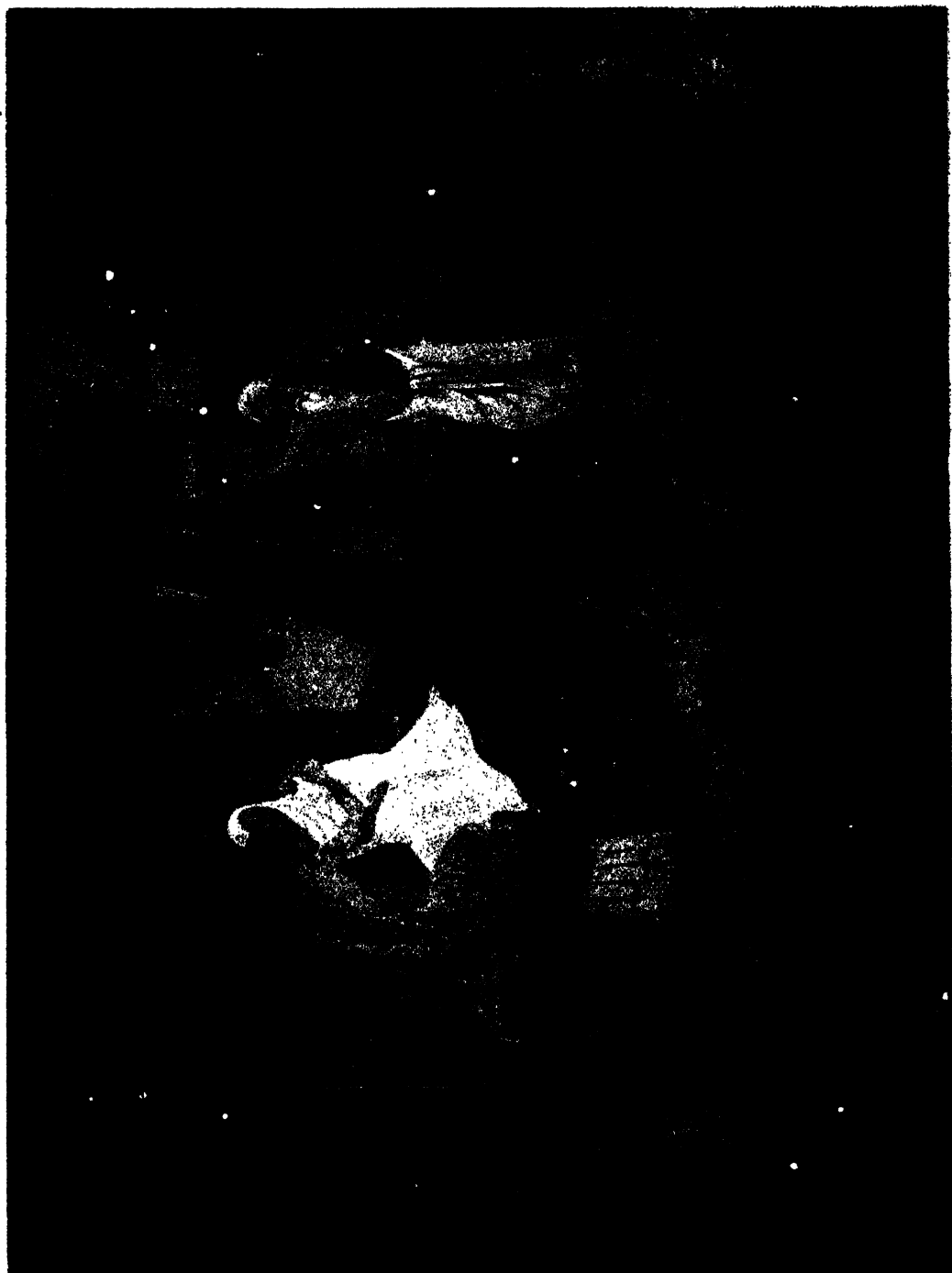
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২০

উদ্ভিদে স্নায়বীয় প্রবাহ

[প্রেসিডেন্সী কলেজের ২০শে ভাদ্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান।
আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু কৃত।
প্রবাসীর জন্য বিশেষভাবে বঙ্গভাষায় লিখিত।]

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম-দৃষ্টিও অনেক সময়ে উহাদের মধ্যে ঐক্য খুঁজিয়া পায় না। প্রাণীর দেহে সামান্য আঘাত দিলে, চীৎকার করিয়া, হাত পা নাড়িয়া বা অপর কোন অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহা সাড়া দেয়; কিন্তু সাধারণ বৃক্ষে কিল ঘুঁসি মারিলে বা চিম্‌টি কাটিলেও, সে একটুও সাড়া দেয় না। প্রাণিদেহে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃৎপিণ্ড অহরহ স্পন্দিত হইতে থাকে। নানা ঔষধের প্রয়োগে এই স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; উদ্ভিদে যে এই প্রকৃতিশীল পেশী আছে ইহা এতাবৎকাল কেহই মনে করেন নাই। প্রাণি-দেহকে উত্তেজিত করিলে তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাচল করে; আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ্-দেহেও যে, এই প্রকার বৈদ্যুতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বড় বড় উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ এতকাল অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। প্রাণিদেহ মাত্রই স্নায়ুজালে আচ্ছাদিত থাকে, এবং ইহাই তাহার নানা অঙ্গের মধ্যে যোগ রক্ষা করিয়া সমগ্র দেহটিকে সচেতন রাখে। তা'ছাড়া বাহিরের আঘাত-উত্তেজনা ও শীতাতপের প্রভাবকেও ঐ স্নায়ুজালই মস্তিষ্কে বহন করিয়া প্রাণীকে সাড়া দেওয়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু উদ্ভিদ্-দেহে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ স্নায়ুর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান্ নাই; ইঁহাদের মতে লজ্জাবতীর ন্যায় লাজুক গাছেরও স্নায়ু নাই, কাজেই ইহাদের দেহে স্নায়বিক উত্তেজনার চলাচলও নাই।

প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়ায় পূর্ব্বোক্ত অনৈক্য দেখিয়া মনে হয় প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়ই সজীব বস্তু হইলেও তাহাদের জীবনের ধারা এক নয়; যে নিয়মের অধীন থাকিয়া প্রাণী তাহার প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়, উদ্ভিদ্ সে নিয়ম মানিয়া নিজের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যদি কেহ এই দৃশ্যতঃ অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের যে লাভ হইবে তাহার সহিত অপর লাভের তুলনাই হইতে পারে না। দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত অনেক দিন ধরিয়া প্রাণীর শারীরতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ইহাতে শারীর-ক্রিয়ার অনেক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি আমাদের এই 'ক্ষুদ্র' দেহ-যন্ত্রের সকল রহস্যের সুমীমাংসা হয় নাই। প্রাণীর জটিল দেহযন্ত্র উদ্ভিদের সরল দেহের ন্যায়ই জীবনের ক্রিয়া দেখায়, ইহা নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইলে, প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্‌গণ উদ্ভিদের জীবনের কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া প্রাণীর শারীর-তত্ত্বের অমীমাংসিত ব্যাপারগুলির মীমাংসা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। তা'ছাড়া চিকিৎসা-
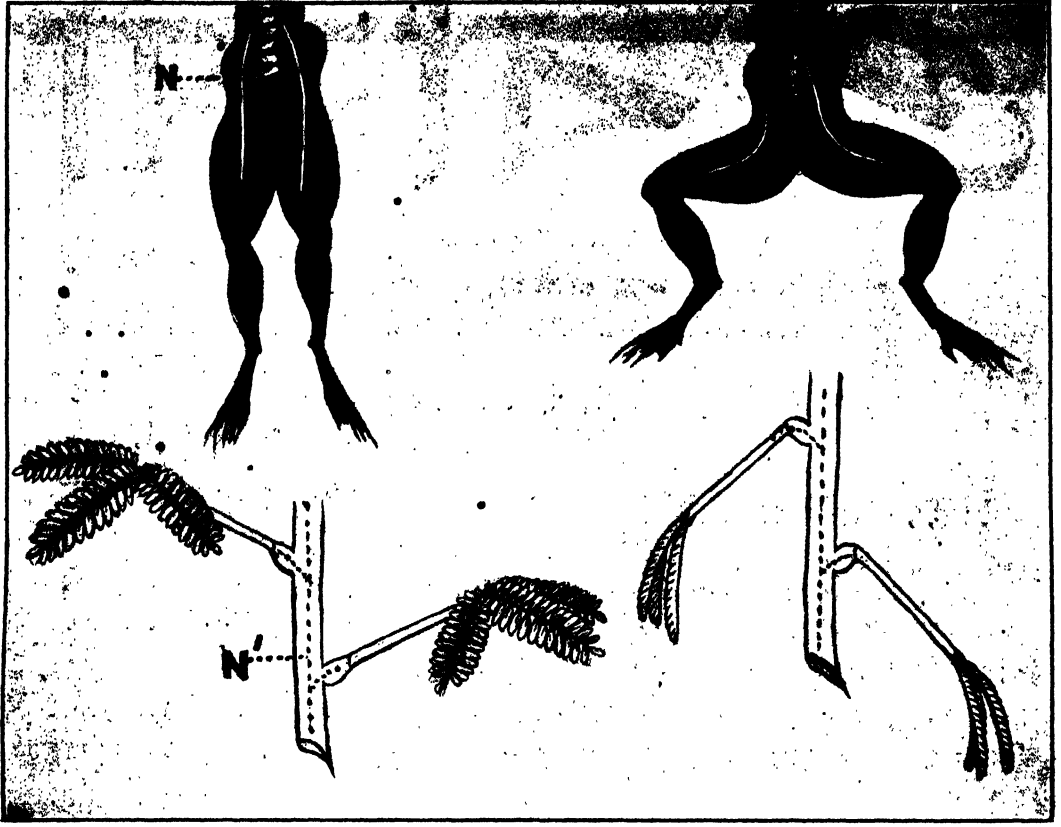
১ম চিত্র। ভেক এবং লজ্জাবতীর উত্তেজনা। বামদিকে সহজ, এবং দক্ষিণ দিকে উত্তেজিত এবং সঙ্কুচিত অবস্থা। N, ভেকের স্নায়ু; N´, বৃক্ষের উত্তেজনা-বহনকারী সূত্র। লজ্জাবতীর পত্রমূলে স্থূল পেশী উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হয়। তাহাতে পাতা নিম্নে পতিত হয়।

বিজ্ঞান এবং কৃষিশাস্ত্রও ইহাতে বিশেষ লাভবান হইবে।

আমি প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়ায় যে-সকল ঐক্য দেখাইয়াছি, সেগুলির বিশেষ বিবরণ প্রদান এখানে নিষ্প্রয়োজন। উদ্ভিদ্-মাত্রই যে বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় প্রাণীর মত সাড়া দেয় তাহা মৎপ্রণীত দুইখানি গ্রন্থে* বহু পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সম্প্রতি আমার যে আর একখানি গ্রন্থ † প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের শারীর-ক্রিয়ার আরো অনেক সূক্ষ্ম ঐক্যের কথা প্রচারিত হইয়াছে। প্রাণীর হৃৎপিণ্ড যেমন তালে তালে আপনা হইতেই স্পন্দিত হয়, আমি কোন কোন উদ্ভিদ-পেশীতে অবিকল সেই প্রকার স্বতঃস্পন্দন দেখিতে পাইয়াছি এবং নানা ঔষধ-প্রয়োগে প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের যে-সকল পরিবর্ত্তন হয়, উদ্ভিদের স্পন্দনশীল দেহে সেই-সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অবিকল সেই প্রকার পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করিয়াছি। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের একতা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব জানি না। প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ শক্তি কি প্রকারে এই দেহ-যন্ত্রটিকে তালে তালে অবিরাম স্পন্দিত

* Bose : *Plant Response*, Longmans, London and Cal.
„ *Comparative Electro-physiology* „
† „ *Researches on Irritability of Plants* „
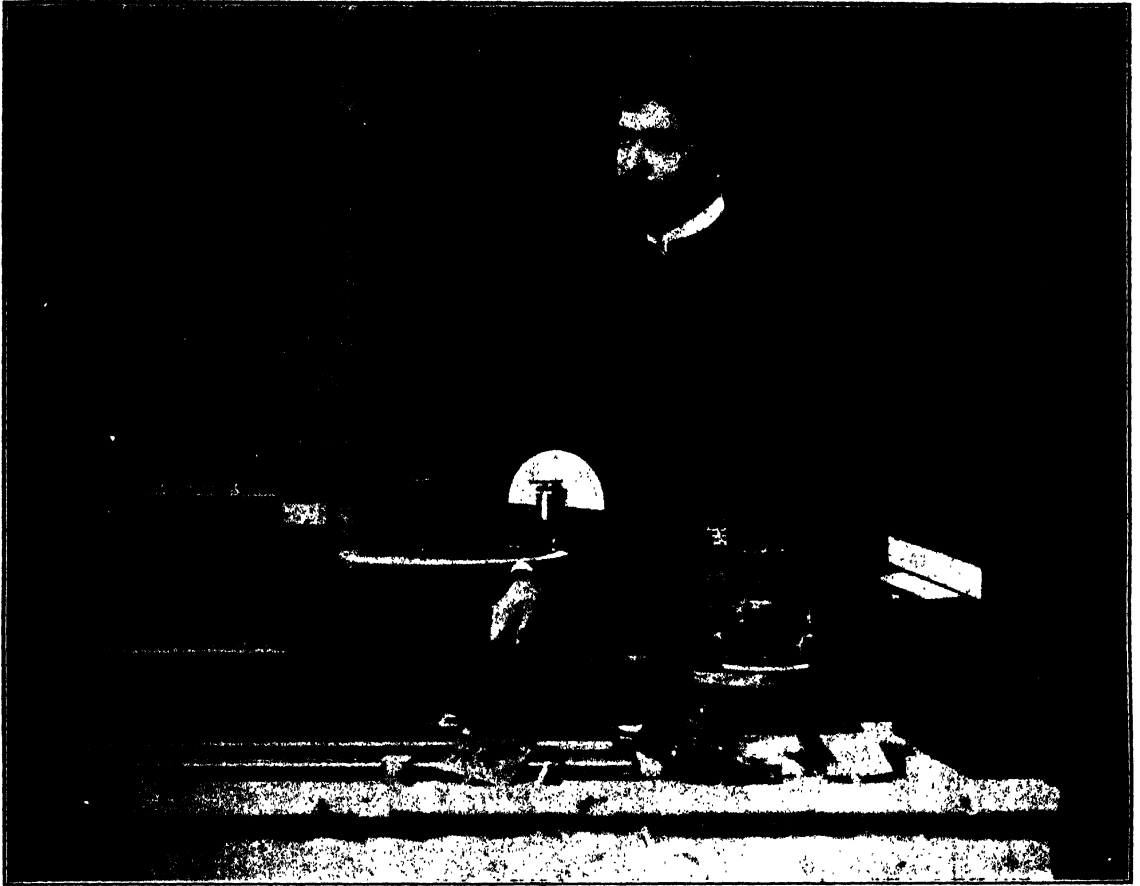
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

(লণ্ডন রয়াল ইনষ্টিটিউশনে যে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডেভি, ফ্যারাডে প্রভৃতি জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সেই টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।)

করে তাহা অদ্যাপি শারীরতত্ত্বের একটা বৃহৎ রহস্যময় ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দনের সহিত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তুলনা করিয়া এই রহস্যের মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। আহত বৃক্ষ যে বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য দ্বারা সাড়া দেয় ইহা দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার রয়াল ইনষ্টিটুসনের বক্তৃতায় প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। * প্রাণীগণ তাহাদের দেহের যে-স্নায়ুজালের সাহায্যে বাহিরের আঘাত-উত্তেজনা সর্ব্বাঙ্গে চলাচল করায়, উদ্ভিদের দেহও যে সেই প্রকার স্নায়ু-মণ্ডলীতে আবৃত আছে, ইহা আমি সম্প্রতি নানা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছি। আমি প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে উদ্ভিদে স্নায়ুর অস্তিত্বের লক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলাম এবং গত কয়েক বৎসর ইহা লইয়াই নানা গবেষণা করিতেছিলাম। সম্প্রতি ইহার সমর্থনে বহুবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কয়েক মাস পূর্ব্বে এই আবিষ্কারের আমূল বিবরণ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরিষৎ রয়াল সোসাইটি

* Bose: *Friday Evening Discourse*, Royal Institution, May 1901,

দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। † নানাদেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর জীবনের ক্রিয়ায় এরূপ অভাবনীয় একতা দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন।

উদ্ভিদের স্নায়ুর কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাণীদেহে স্নায়ু কি কার্য্য করে দেখা যাউক। টেলিগ্রাফের তার যেমন দূর দূরান্তর হইতে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত বহন করে, এক কথায় বলিতে গেলে প্রাণীর দেহস্থ স্নায়ুজালের কার্য্যও কতকটা তদ্রূপ। দেহের কোন অংশে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রযুক্ত হইবা মাত্র ঐ স্নায়ুজালই অণুপরম্পরায় সেই উত্তেজনা বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়, এবং মস্তিষ্ক আমাদিগের উত্তেজনার অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। মনে করা যাউক আমাদের চক্ষুর ভিতরে আলোক প্রবেশ করিয়া অক্ষিপর্দ্দাকে উত্তেজিত করিল; এই উত্তেজনা চক্ষু-কোটরে আবদ্ধ হইয়া থাকে না, চক্ষুরই বিশেষ স্নায়ু তাহা বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, এবং ইহারই ফলে আমরা আলোক অনুভব করিতে পারি। সকল স্নায়ুই যে কেবল মস্তিষ্কে গিয়াই শেষ হয় তাহা নহে, যেগুলি কোন সঙ্কোচনশীল মাংসপেশীতে গিয়া শেষ হয়, তাহারা উক্ত পেশীতে উত্তেজনা বহন করিয়া লইয়া গেলে পেশী আকুঞ্চিত হইয়া সাড়া দেয়।

স্নায়ু ও পেশীর পূর্ব্বোক্ত কার্য্য শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ভেকের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার পরীক্ষায় ভেকের দেহস্থ বিশেষ বিশেষ অংশের স্নায়ু এবং তৎসংলগ্ন পেশীকে কাটিয়া প্রস্তুত করা হয়, এবং পরে স্নায়ুর এক প্রান্তে কোন উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে অপর প্রান্তস্থিত পেশী স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং স্নায়ুজালই যে উত্তেজনা বহন করিয়া লইয়া যায় তাহা এই পরীক্ষায় বেশ বুঝা যায়। দেহের কোন স্থানে আঘাত দিলে, সেই আঘাতে দূরবর্ত্তী স্থানের স্পন্দন, প্রাণিদেহের বিশেষত্ব হইলেও, উদ্ভিদে ইহার উদাহরণ একেবারে দুর্ল্লভ নয় (১ম চিত্র)।

† Bose: *Transmission of Excitation in Mimosa;* Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B. Vol. 204.

লজ্জাবতী লতার কোন ডালে আঘাত দাও বা চিম্‌টি কাটিতে থাক, দেখিবে সেই আঘাত বাহিত হইয়া দূরবর্ত্তী পাতাগুলিকে গুটাইয়া দিতেছে। লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদের, এবং প্রাণীর, উত্তেজনা-বহনে এতটা ঐক্য দেখিয়াও, আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ বৃক্ষদেহে স্নায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রাণিদেহে স্নায়ু-সূত্র ধরিয়া উত্তেজনা একস্থান হইতে দূরস্থানে প্রবাহিত হয়। বৃক্ষদেহে এরূপ স্নায়বীয় প্রবাহ নাই। গাছে
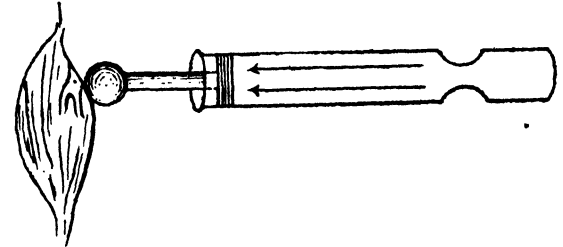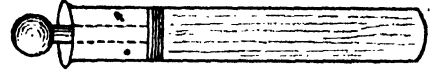
২য় চিত্র। জলের ধাক্কা। বামদিকে সঙ্কুচনশীল পেশী। রবারের নলে চিম্‌টি কাটিলে জলের ধাক্কায় কিরূপে পেশী আহত হয় তাহা নিম্নের চিত্রে দেখা যায়।

জলনালী দিয়া আঘাতের ধাক্কা একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। তাঁহাদের মতে বৃক্ষদেহ জলপূর্ণ রবারের নলের ন্যায় রসে রসাল। চিম্‌টি কাটিলে জলের ধাক্কা দূরে পৌঁছে। সেই আঘাত-বলে বৃক্ষপেশী কুঞ্চিত হয়। সেই আঘাত-বলে লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদের পত্রমূলে ধাক্কা লাগিলে পাতা বুজিয়া আইসে (২য় চিত্র)।

উত্তেজনা ও ধাক্কার বিভেদ।

স্নায়ুসূত্রে কোন স্থানে আঘাত করিলে উত্তেজনাটা স্নায়ুর অণুগুলিকে অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। উত্তেজনার বাহক স্নায়ুকে গরম করিয়া সতেজ কর,

দেখিবে এই অবস্থায় স্নায়ুর ভিতর দিয়া উত্তেজনা দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে। কোন অবসাদক দ্রব্য প্রয়োগে স্নায়ুজালকে নিস্তেজ কর, উত্তেজনা এই অবস্থায় অতি মন্থর গতিতে চলিতে থাকিবে। ক্লোরোফরম্ বা অপর কোন বিষ প্রয়োগে স্নায়ু একবারে অসাড় কর, দেখিবে স্নায়ুর ভিতর দিয়া প্রবল উত্তেজনাও চলিতেছে না। স্নায়ুর অণুগুলি কম্পিত করিতে করিতে উত্তেজনাটাই যে প্রবাহিত হয়, এই-সকল পরীক্ষা হইতে তাহা বুঝা যায় (৩য় চিত্র)।

বৃক্ষকে আঘাত করিলে যদি সেই আঘাত জলের ধাক্কার ন্যায় দূরে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার ফল অন্যরূপ হইবে।

জলপূর্ণ রবারের নল হঠাৎ টিপিয়া ধরিলে নলের জলে যে চাপের প্রবাহ হয়, তাহার কার্য্য আমরা সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। নলটিকে গরম করিয়া বা তাহাতে ঠাণ্ডা দিয়া পরীক্ষা কর, দেখিবে নলের জলের চাপ-বহন-শক্তির কোনই হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে না। নলটির চারিদিকে ক্লোরোফরমের বাষ্প প্রয়োগ কর ইহাতে নল বেহুস হইবে না এবং তাহার জলের চাপ-বহন-শক্তি লোপ পাইবে না। তার পর নানা বিষে-ভিজানো কাপড়ে নলটিকে বেষ্টিত করিয়া তাহাকে টিপিতে থাক, দেখিবে এই অবস্থাতেও নলের জল চাপ পাইয়া ধাক্কার আঘাত দূরে পৌঁছাইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, উদ্ভিদ্দেহের জলই যদি আঘাত-বাহক হয়, তাহা হইলে গাছের ডালগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শীতাতপ বা বিষ-প্রয়োগে বিকৃত করিলে তাহাদের আঘাত-বহনের কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না। যদি গরম বা ঠাণ্ডা প্রয়োগে কোন বৃক্ষ-শাখার আঘাত-বহন-শক্তি পরিবর্ত্তিত হয় বা বিষ-প্রয়োগে সেই প্রবাহ রোধ পায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে, বৃক্ষের প্রবাহ নলে আবদ্ধ জলের প্রবাহের অনুরূপ নয় কিন্তু প্রাণীর স্নায়ুপ্রবাহের অনুরূপ,—ইহা ধাক্কার প্রবাহ নহে, কিন্তু উত্তেজনারই প্রবাহ।

সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্ ফেফর্ সাহেব লজ্জাবতীর উপরে ক্লোরোফরম লাগাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, শাখার ভিতর দিয়া আঘাত-প্রবাহ অবিচলিতভাবে চলিয়াছে। মাদকদ্রব্য দ্বারাও যখন গতির পরিবর্ত্তন হইল না, তখন আঘাতফল উত্তেজনা না হইয়া জলের ধাক্কাই হইবে। এই সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার মূলেই যে একটা বড় রকমের ভুল রহিয়াছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। স্থূল বৃক্ষকাণ্ডের বাহিরে ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিলে তাহা যে অভ্যন্তরের সূক্ষ্ম স্নায়ুসূত্রে সহজে পৌঁছিতে পারে না একথা কেহ বিবেচনা করেন নাই। আমাদের পিঠে ২।৪ ফোঁটা ক্লোরোফরম দিলে অভ্যন্তরস্থিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যে স্থগিত হয় না একথা সকলেই বুঝিতে পারেন।

আমি যে-সকল উপায়ে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণ করিয়াছি তাহার সংখ্যা প্রায় দ্বাদশটি; বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র তিনটি উপায়েরই আলোচনা করিব।

১ম—উদ্ভিদের দেহের অবস্থা বিকৃত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া উত্তেজনা পরিচালনা এবং উত্তেজনার বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি পরীক্ষা।

২য়—প্রাণীর স্নায়ুসূত্রে বিষপ্রয়োগ করিলে যেমন তাহার ভিতর দিয়া উত্তেজনার চলাচল রোধপ্রাপ্ত হয়, উদ্ভিদে তাহা হয় কি-না দেখা।
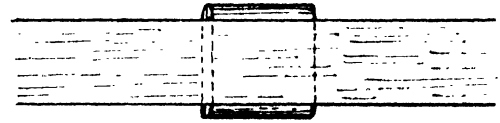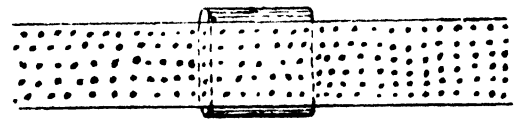
৩য় চিত্র। আণবিক উত্তেজনা (উপরের ছবি) এবং জলের ধাক্কা (নিম্নের ছবি) মাঝখানে অবসাদক দ্রব্য প্রয়োগে উত্তেজনার প্রবাহ বন্ধ হয়, জলের প্রবাহ বন্ধ হয় না।

৩য়—চিম্‌টি বা চাপ হইতেই জলের ধাক্কা। বিনা চাপ বা চিম্‌টিতে যদি বৃক্ষে উত্তেজনার প্রবাহ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে জলের ধাক্কা-মতবাদ অপ্রতিপন্ন হইবে।

এই উপায় তিনটির কথা চিন্তা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উদ্ভিদ্দেহে উত্তেজনার বেগ খুব সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করার উপরেই উহাদের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। বেগের পরিমাপ এত সূক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন যে, এক সেকেণ্ডের একশত ভাগ সময়ে উত্তেজনাটা বৃক্ষশাখা বহিয়া কতদূর চলিল তাহাও যেন নির্ভুলরূপে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি এতই স্থূল যে, ঐ অত্যল্প সময় তাহারা হিসাবের মধ্যেই আনিতে পারে না এবং সেই সময়ের মধ্যে উদ্ভিদ্ কি

প্রকারে সাড়া দিল তাহাও নির্ণয় করিতে পারে না। কাজেই যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক এবং উদ্ভিদ্‌গণ যাহাতে নিজের সাড়ার পরিমাণ ও সময় নিজেরাই যন্ত্রে লিখিয়া রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদের উত্তেজনা-বহন সম্বন্ধে এজন্য এক নূতন তরু-লিপিযন্ত্র উদ্ভাবন আবশ্যক। দেখা যাউক বৃক্ষ কি প্রকারে তাহার উত্তেজনা লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইতে পারে। নিম্নে মুদ্রিত চতুর্থ চিত্রে X-চিহ্নিত স্থানে V-চিহ্নযুক্ত দণ্ডটি আবদ্ধ থাকিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারে। ইহার এক প্রান্তে এক গাছি সূতা বাঁধা আছে এবং এই সূতারই অপর প্রান্ত লজ্জাবতী লতার পাতায় বাঁধিয়া রাখা হয়। চিত্রের W-চিহ্নিত অংশটি লেখনী; ইহা V দণ্ডের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ আছে এবং ইহারই মুক্ত প্রান্তটির বাঁকান অংশটা G-চিহ্নিত লিপি-ফলকে পাতার উঠা নামার সঙ্গে রেখা অঙ্কন করিতে থাকে।
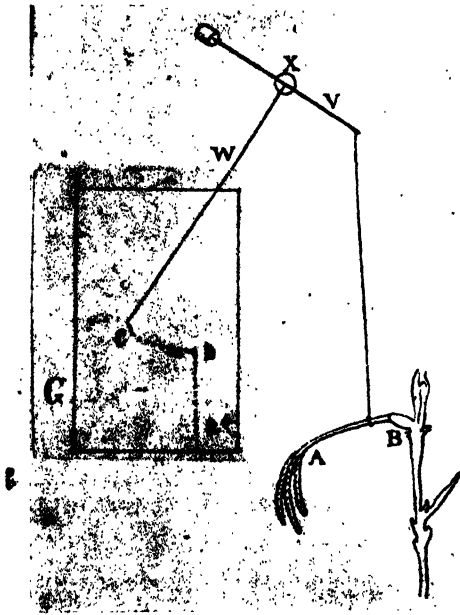
চতুর্থ চিত্র। তরুলিপি যন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র-পরিচয় হইতে পাঠক বুঝিবেন, পাতা উত্তেজনা হেতু যখন নামিয়া সূতায় টান দেয়, V-চিহ্নিত দণ্ডটি তখন নিক্তির পাল্লার মত নীচে নামিয়া পড়ে এবং লেখনীটা লিপি-ফলকে বাম দিকে একটা ঋজু রেখা অঙ্কন করে। এই প্রকারে লিপি-ফলকে যে-সকল তরঙ্গিত রেখা অঙ্কিত হয়, তাহা দেখিয়া পাতার উঠা নামার একটা মোটামুটি ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। লিপি-ফলকখানিকে স্থির রাখা হয় না; ঘড়ির কলের সাহায্যে সেইখানি অবিরাম ধীরে ধীরে লেখনীর সম্মুখ দিয়া নামিতে থাকে। এই ব্যবস্থায় কত সময়ে পাতাটি পড়িয়া রেখা-অঙ্কন আরম্ভ করিল, তাহা সাড়া-লিপি দৃষ্টে বুঝা যায়।

এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তেজনার বেগ কি প্রকারে নির্ণয় করা সম্ভব, এখন তাহা দেখা যাউক। মনে করা যাউক লজ্জাবতী পাতার A-চিহ্নিত স্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছে;—ইহাই কালক্রমে যখন পত্রের B-চিহ্নিত মূলে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখনই পাতাটি নামিয়া গিয়া সাড়া দিবে। লিপি-ফলকে তীর এবং a-চিহ্নিত সময়ে উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং b-চিহ্নিত সময়ে সাড়া-লিপি অঙ্কিত হইয়াছে। a ও bএর মধ্যের দূরত্ব যেন এক ইঞ্চির দশ ভাগের তিন ভাগ মাত্র এবং লিপি-ফলক-খানি যেন প্রতি সেকেণ্ডে এক ইঞ্চি বেগে লেখনীর সম্মুখ দিয়া নামিতেছে। এই-সকল হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, লেখনীটি যে সময়ে লিপি-ফলকে (a b)-চিহ্নিত রেখাটি অঙ্কন করিয়াছে, তাহা $\frac{৩}{১০}$ সেকেণ্ডেরই সমান। সুতরাং এই সময়ে উত্তেজনা A হইতে B স্থানে পৌঁছিয়া পাতা নামাইয়াছে। উত্তেজনা যখন Bতে পৌঁছে পত্রমূল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। আঘাত অনুভব করিয়া সাড়া দিতে খানিক সময় লাগে, ইংরাজী ভাষায় এই সময়টুকু লেটেণ্ট পিরিয়ড বলিয়া পরিচিত। ইহার প্রতিশব্দ "অননুভূতি সময়"। পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষার $\frac{৩}{১০}$ সেকেণ্ড হইতে অননুভূতি সময় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই অল্প সময়ে উত্তেজনাটা A হইতে B স্থানে গমন করিয়াছিল, ইহা বুঝিয়া লওয়া যায়। অননুভূতি'সময় পরীক্ষা দ্বারা বাহির করা যাইতে পারে। তাহা করিতে হইলে A স্থানে আঘাত না করিয়া পত্রমূল Bতে আঘাত করিতে হয়। পঞ্চম চিত্রে বৈদ্যুতিক উপায়ে কিরূপ নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আঘাত দেওয়া যায় তাহা দেখান হইয়াছে। লিপি-ফলকখানি তুলিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। পতনকালে মুহূর্ত্তের জন্য R-চিহ্নিত দণ্ড R´-এর সহিত সংযুক্ত হয়। সেই মুহূর্ত্তেই লজ্জাবতী পত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বৈদ্যুতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। কাগজ কলমে এই-সব খুব সহজ বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু যখনই ইহা দ্বারা কোন দুর্ব্বল গাছের ক্ষীণ সাড়া মাপিতে চেষ্টা করা যায় তখনই ব্যর্থ হইতে হয়। ক্ষীণ সাড়া সূতাটিকে টানিয়া তৎসংলগ্ন দণ্ডকে নড়াইতে পারে না, কারণ লিপি-ফলকের সহিত লেখনীর অবিরাম সঙ্ঘর্ষণে যে বাধা উৎপন্ন হয় তাহার বিরুদ্ধে পাতার টান কার্য্যকারী হয় না। কাজেই গাছ সাড়া দিলেও তাহা লিপি-ফলকে অঙ্কিত হয় না।

হয়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উত্তেজনাটি বৃক্ষদেহ বহিয়া কত দূরে যায় তাহা সাড়ালিপিতে অঙ্কিত বিন্দুগুলি গণিয়াই নির্ণয় করা যাইবে।

ষষ্ঠ চিত্রখানি আমার উদ্ভাবিত "সমতালিক" তরুলিপি যন্ত্রের একটি ছবি। যন্ত্রের* আমূল পরিচয় দেওয়া এই প্রকার প্রবন্ধে অসম্ভব; ইহার মূল ব্যাপারগুলিরই কথা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যন্ত্রটি বুঝিতে হইলে সঙ্গীতের একটা কথা স্মরণ করিতে হইবে। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, দুইখানি বেহালার তার যদি ঠিক একই সুরে বাঁধিয়া রাখা যায় এবং পরে তাহাদেরই মধ্যে একখানির বাঁধা তারটিকে বাজাইলে অপর তারটি আপনা আপনি সমতালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে।

তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনীটিকে কাঁপাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। চিত্রের V-চিহ্নিত লেখনীটি C-চিহ্নিত একটা কম্পমান দণ্ডের সহিত একই সুরে বাঁধা থাকে। মনে করা যাউক যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে এক শত বার কম্পিত হইতে পারে উভয়কেই যেন সেই "সুরে" বাঁধা গিয়াছে। কাজেই এখানে C-চিহ্নিত দণ্ডটিকে কোন গতিকে আন্দোলিত করিতে থাকিলে, V-চিহ্নিত লেখনী আপনা হইতেই সেকেণ্ডে এক শত বার করিয়া কম্পিত হইতে থাকিবে এবং

৫ম চিত্র। তরুলিপি যন্ত্র। লিপিফলক তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে R দণ্ড R´এর সহিত মুহূর্ত্ত কালের জন্য সংযুক্ত হয়। এই মুহূর্ত্তে বৃক্ষপত্র A-চিহ্নিত স্থানে বৈদ্যুতিক আঘাত পায়। লিপিফলকে এই মুহূর্ত্ত তীর এবং a চিহ্নিত। 'অনমুভূতি' সময় বাহির করিতে হইলে বৈদ্যুতিক তার পত্রমূল B তে প্রয়োগ করিতে হয়।

এই-সব বাধা অতিক্রম করিবার বহুবিধ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। পরে একদিন মনে হইল যে লেখনীর মুখটা সর্ব্বদাই ফলকের সংস্পর্শে না রাখিয়া যদি উহাকে মাঝে মাঝে নিমেষের জন্য ফলকে স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে ঘর্ষণের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, অথচ তাহাতে লিপি অঙ্কনের কোন অসুবিধাই হইবে না। কারণ লেখনী অল্প কালের জন্য স্পর্শ করিয়া লিপি-ফলকে যে-সকল বিন্দু রচনা করিবে, তাহাই পাতার উঠানামার পরিচয় দিবে। এই প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণের আরো একটা সুবিধার কথা মনে হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, ঠিক কত সময় অন্তরে লেখনীটি এক এক বার লিপি-ফলক স্পর্শ করিতেছে, তাহা যদি জানিয়া রাখার সুবিধা

ষষ্ঠ চিত্র। 'সমতাল' তরুলিপি যন্ত্রের উপরের দৃশ্য।

* Resonant Recorder.

সঙ্গে সঙ্গে G-চিহ্নিত লিপি-ফলকে সেকেণ্ডে একশতটি বিন্দু অঙ্কিত হইবে।

সমতাল তরুলিপি যন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত মূল কথাগুলি হইতে পাঠক বুঝিবেন, লেখনীর মুখ নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপি-ফলকে সংলগ্ন থাকায় ক্ষীণসাড়া লিখনের যে অন্তরায় ছিল, তাহা এই যন্ত্রে নাই; অথচ এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের এক ভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র সময় মাপিবার ব্যবস্থা আছে। এমনকি আবশ্যক হইলে হৃদয়ের একটি স্পন্দন হইতে যে সময় লাগে, সেই ক্ষুদ্র সময়টুকুর সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এই যন্ত্রসাহায্যে যে, কেবল বৃক্ষের উত্তেজনা-পরিবাহনবেগই আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নয়, বৃক্ষ আপনা হইতে যন্ত্রের লিপিফলকে নিজের জীবনের যে-সকল ইতিহাস লিখিয়া যায়, তাহা হইতেও বৃক্ষজীবনের অনেক নূতন কার্য্য মনুষ্যগোচর হইয়াছে।

অননুভূতি কাল নির্ণয়।

জীব যখন আঘাত পায়, সে সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায় চিম্‌টি কাটিলে সাড়া পাইতে এক সেকেণ্ডের শতভাগের একভাগ সময় লাগে। উদ্ভিদ-দেহ এই প্রকারে আঘাত অনুভব করিবার জন্য কত সময় ক্ষেপণ করে, তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। তরুলিপি যন্ত্রের সাহাযে অননুভূতি-কাল নির্ণীত হইয়াছে।
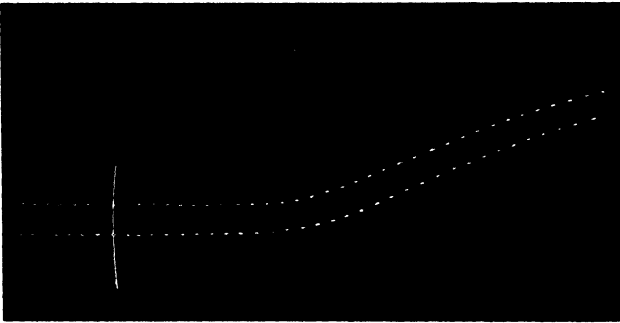
৭ম চিত্র। অননুভূতি কাল নির্ণয়। উর্দ্ধাধঃ রেখা আঘাত-সময় জ্ঞাপক। বৃক্ষপত্র দশ বিন্দুর পর সাড়া দিয়াছে। দুইটি বিন্দুর ভিতরকার ব্যবধান এক সেকেণ্ডের শতাংশ মাত্র।

সপ্তম চিত্রে একটি লজ্জাবতী লতা নিজের আঘাত-অনুভূতি ও সাড়া দিবার কাল নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছে। চিত্রে যে দুইটি সাড়ালিপি দেখা যাইতেছে, তাহা সেই একই বৃক্ষের সাড়া; উভয়ের মধ্যে একটুও পার্থক্য নাই। এইজন্য লজ্জাবতী লতাটির ঠিক্ পত্রমূলে ক্ষণিক বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করা হয়। এই উত্তেজনা প্রয়োগের সময়টা সাড়া-লিপিতেই উর্দ্ধাধঃ ঋজু রেখাটি দ্বারা প্রকাশিত হই-তেছে। এখন পাঠক চিত্রটিকে একটু ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিবেন উত্তেজনা প্রয়োগের পর যন্ত্রের সেই স্পন্দনশীল লেখনী একে একে প্রায় দশটি বিন্দু পাত করিলে গাছ সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লেখনী যাহাতে সেকেণ্ডে একশত বার কম্পিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কাজেই চিত্রের দুইটি বিন্দুর ভিতরকার ব্যবধান এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় জ্ঞাপন করিতেছে। এই-সকল হিসা-বের মধ্যে আনিয়া অনায়াসেই বুঝা যায়, লজ্জাবতী লতাটি আঘাতপ্রাপ্তির পর $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডের কিঞ্চিৎ অধিক সময় ক্ষেপণ করিয়া উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিল। কতকগুলি সুস্থ ও সতেজ গাছ আঘাত-প্রাপ্তির $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড মাত্র পরেই সাড়া দিয়াছিল। মোটা মানুষ যেমন চালচলনে ঢিলে হয়, মোটা গাছগুলিও যেন সেই প্রকার ঢিলেমি প্রকাশ করে। কিন্তু কৃশকায়টি একে-বারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। আমরা যখন খুব ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন কোন প্রকার তাড়না পাইলে শীঘ্র নড়চড় করিতে পারি না। পুনঃ পুনঃ আঘাত পাইয়া যে উদ্ভিদ্ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ করায়, সেইপ্রকার ভাব দেখা গিয়াছে। অবসন্ন অবস্থায় উদ্ভিদ্ উত্তেজনা বুঝিতে দীর্ঘ সময় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাকে বিশ্রান্ত হইবার জন্য আধঘণ্টা সময় দিলে সেই উত্তেজনাই শীঘ্র অনুভব করিয়া ফেলে।

স্নায়বীয় বেগ-নিরূপণ।

এখন দেখা যাউক সমতাল তরুলিপি যন্ত্রের সাহায্যে কি প্রকারে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা-পরিবাহনের বেগ এবং তাহার পরিবর্ত্তন নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষার প্রথমে লতাটির অননুভূতি-কালপরিমাণ স্থির করিয়া রাখা হয় এবং শেষে আঘাত প্রাপ্তির পরে উত্তেজনাটী বৃক্ষদেহের আহত স্থান হইতে নিকটস্থ পত্রের মূলে পৌঁছিতে কত সময় লইল, যন্ত্রের ফলকে লিখিত সাড়ালিপি হইতে তাহা নির্ণয় করা হয়। বলা বাহুল্য—এই সময়টার সকলই উত্তেজনা পরিবাহনের সময় নয়,—ইহার সহিত অননুভূতি কালও যুক্ত থাকে। কাজেই সমগ্র সময় হইতে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত অননুভূতি কালপরিমাণ বাদ দিয়া, অবশিষ্টকে দূরত্ব দিয়া ভাগ দিলেই উত্তেজনার প্রকৃত পরিবাহন-বেগ পাওয়া যায়।
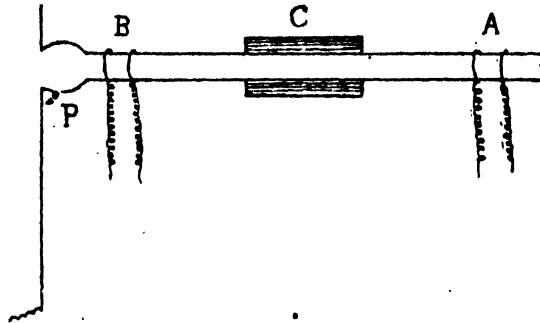
৮ম চিত্র। লজ্জাবতী পাতার ডাঁটা। বৈদ্যুতিক আঘাত প্রথমে পত্রমূলে B তে প্রদত্ত হয়। তাহার পর দূরস্থ A তে আঘাত দেওয়া হয়। C তে শীত, উত্তাপ এবং বিষ প্রয়োগ হয়।

অষ্টম চিত্রে লজ্জাবতীর ডাঁটার ছবি দৃষ্ট হইবে। প্রথমে B চিহ্নিত পত্রমূলে আঘাত দিলে সাড়ালিপিতে অনমুভূতি সময় অঙ্কিত হয়। ইহার পরের চিত্রে সর্ব্বোপরিস্থ সাড়ালিপি এই লেটেণ্ট পিরিয়ড জ্ঞাপক। দ্বিতীয় স্থলে দূরস্থিত A তে পূর্ব্বের ন্যায় বৈদ্যুতিক আঘাত দেওয়া হয়। এবারকার সময় হইতে প্রথমোক্ত সময় বাদ দিলে A হইতে B পৌঁছিবার প্রকৃত পরিবাহন সময় পাওয়া যায়। মধ্য C স্থলে বিবিধ অবসাদক দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, বেগের কোন তারতম্য হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

নবম চিত্রখানি কোন লজ্জাবতী লতার

৯ম চিত্র। এই এবং পরবর্ত্তী চিত্রে সর্ব্বোপরিস্থ সাড়ালিপি অনমুভূতি সময় জ্ঞাপক। নিম্নস্থ দুই সাড়ালিপি ৩০ মিলিমিটর দূরে আঘাত জনিত। দুই বিন্দুর ব্যবধান এক সেকেণ্ডের দশাংশ মাত্র।

উত্তেজনাপরিবাহন নির্দ্ধারণ করিবার সময় গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রে যে তিনটি সাড়ালিপি আছে, তাহার প্রথমটি অনমুভূতিকাল জ্ঞাপক। অর্থাৎ ঠিক পত্রমূলে উত্তেজনা প্রয়োগে প্রথম লিপিখানি পাওয়া গিয়াছিল। নিম্নের সাড়ালিপি দুখানি ত্রিশ মিলিমিটার * দূরে আঘাত দেওয়ার পর অঙ্কিত হইয়াছিল। লেখনীটি যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে দশবার করিয়া লিপিফলক স্পর্শ করে, তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। কাজেই চিত্রের দুইটি পাশাপাশি বিন্দুর ব্যবধান এক সেকেণ্ডের দশভাগ মাত্র সময় জ্ঞাপন করিতেছে। চিত্রের নিম্নস্থ দুইটি সাড়ালিপি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, যে উত্তেজনাকে ৩০ মিলিমিটার দূরে বহন করিতে এবং সেই উত্তেজনা অনুভব করিতে বৃক্ষটি মোট ১·৬ সেকেণ্ড অর্থাৎ দেড় সেকেণ্ডের অধিক ক্ষেপণ করিয়াছিল; কিন্তু উহার আঘাত অনমুভূতির কাল যে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড তাহা চিত্রের প্রথম সাড়ালিপিটি দেখিলেই বুঝা যায়। কাজেই
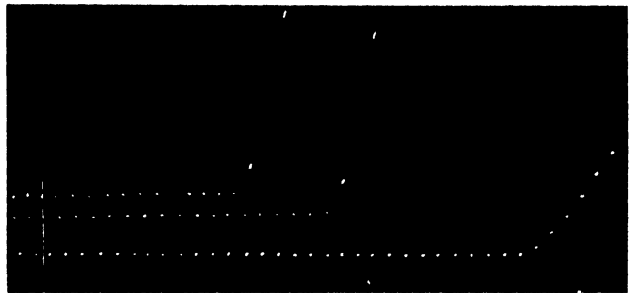
১০ম চিত্র। উষ্ণতার প্রভাবে উত্তেজনার বেগ বৃদ্ধি। সর্ব্বনিম্ন লিপি ২২ ডিগ্রিতে, তার উপরে ২৮ ডিগ্রিতেএবং সর্ব্বোপরিস্থ লিপি ৩১ ডিগ্রিতে লওয়া হয়। উষ্ণতার বৃদ্ধির সহিত পরিবাহন সময় হ্রাস এবং বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, প্রকৃত উত্তেজনা ৩০ মিলিমিটার পথ অতিক্রম করিতে ১·৫ অর্থাৎ পূর্ণ দেড় সেকেণ্ড সময় অতিবাহন করিয়াছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে এই বৃক্ষে উত্তেজনার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ি মিলিমিটার।

তাপ ও শৈত্যের প্রভাব।

পূর্ব্বে বলা বলা হইয়াছে যে বৃক্ষের উত্তেজনা-প্রবাহ যদি স্নায়বীয় ব্যাপার হয় তাহা হইলে উষ্ণতায় তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইবে, শৈত্য প্রয়োগে তাহার বেগ হ্রাস অথবা তাহা আড়ষ্ট হইবে। জলের ধাক্কা হইলে

* মিলিমিটার একপ্রকার ফরাসী মাপ। স্থুলতঃ ২৫ মিলিমিটারে এক ইঞ্চি হইয়া থাকে।

হ্রাস বৃদ্ধি কিছু হইবে না। সুতরাং প্রবাহনে তাপ ও শৈত্যের প্রভাব পরীক্ষা করিলেই এ বিষয়ের স্থির মীমাংসা হইবে।

দশম চিত্রে এই পরীক্ষার ফল দেখা যাইতেছে। চিত্রখানিতে তরু-লিপি-যন্ত্রের সাহায্যে একই লজ্জাবতী বৃক্ষের তিন অবস্থার তিনটি সাড়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তিন পরীক্ষাতে আঘাত একই স্থানে প্রদত্ত হইয়াছিল। নিম্নের সাড়াটি তাপমান যন্ত্রের ২২ ডিগ্রি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। তাহার উপরের দুখানি সাড়া সেই বৃক্ষেরই ২৮ এবং ৩১ ডিগ্রি উত্তাপে গৃহীত হইয়াছিল। পাঠক চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিবেন, কোন নির্দ্দিষ্ট দূরে উত্তেজনা বহন করিতে গিয়া বৃক্ষটি ২২ ডিগ্রি উষ্ণতায় যে সময় গ্রহণ করিয়াছিল, ৩১ ডিগ্রি উষ্ণতায় তাহার অর্দ্ধেকের কম সময় ক্ষেপণ করিয়াছিল। অর্থাৎ উষ্ণতায় বৃক্ষের উত্তেজনা দ্রুততর বেগে ধাবিত হয়।
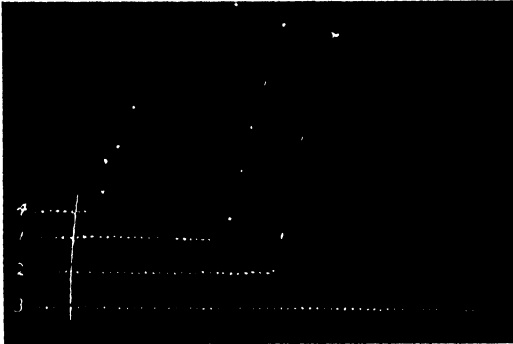
১১শ চিত্র। শৈত্য প্রভাবে পরিচালন শক্তির হ্রাস, এবং লোপ প্রাপ্তি। (১) সাধারণ অবস্থার সাড়ালিপি। (২) ডাঁটায় ঠাণ্ডাজল প্রয়োগে পরিচালন সময়ের দীর্ঘতা। (৩) বরফজল প্রয়োগে পরিচালনার আড়ষ্টতা। (৪) পাতার মূলে আঘাতজনিত অনুভূতি জ্ঞাপক সাড়ালিপি। দেখা যাইতেছে ডাঁটায় শৈত্য প্রয়োগে পত্র মূলের সংকোচন শক্তির পরিবর্ত্তন হয় নাই।

শৈত্য প্রয়োগে ইহার বিপরীত ফল পাওয়া গিয়াছিল। পাতার ডাঁটার মাঝখানে প্রথমত ঠাণ্ডা জল দেওয়াতে উত্তেজনা প্রবাহন করিবার শক্তি কমিয়া গেল। বরফ-দেওয়াতে একেবারে অসাড় হইয়া উত্তেজনা পরিবাহন শক্তি লোপ পাইল। ইহাতে পত্রমূলের সঙ্কোচন শক্তির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কারণ তাহার উপর আঘাত দেওয়াতে পূর্ব্বমত সাড়া পাওয়া গেল। (১১শ চিত্র)

বৃক্ষের পক্ষাঘাত এবং বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তি।

বরফ দ্বারা উদ্ভিদ্-স্নায়ু অসাড় করিলে, পুনর্ব্বার উত্তপ্ত করিলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জড়তা দূর হয় না। এইরূপ অসাড় ভাব প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। কিন্তু পক্ষাঘাতাক্রান্ত রোগীকে যেরূপ বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দ্বারা রোগমুক্ত করিতে পারা যায় সেই রূপে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা দ্বারা আমি অসাড় লজ্জাবতীর জড়তা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছি।

বিষ প্রয়োগে পরিবাহন শক্তির লোপ।

অধ্যাপক ফেফর লজ্জাবতীর শাখার উপরে ক্লোরোফরম দিয়াও পরিবাহন শক্তির লোপ করিতে পারেন নাই। এই পরীক্ষায় কয়েকটি দোষ বিদ্যমান। প্রথমতঃ স্থূল শাখা ভেদ করিয়া ক্লোরোফরম সহজে অভ্যন্তর স্থিত স্নায়ু আক্রমণ করিতে পারে না। শাখার পরিবর্ত্তে সরু পাতার ডাঁটায় এ সম্বন্ধে সুবিধা আছে। দ্বিতীয়তঃ ক্লোরোফরম সহজেই বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন জলীয় বিষ ব্যবহার প্রশস্ত। তৃতীয়তঃ পরিবাহন শক্তি আড়ষ্ট করিবার জন্য ক্লোরাফরম অপেক্ষা কোন কোন বিষের ক্ষমতা অনেক অধিক। পাতার ডাঁটার উপর এইরূপ বিষের প্রলেপ দিলে তাহার কিয়দংশ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষ-স্নায়ুর প্রবাহন-শক্তির লোপ করিবে এই বিবেচনা করিয়া আমি লজ্জাবতীর পাতার ডাঁটার উপর বিষাক্ত তুঁতের জলের প্রলেপ দেই। তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে ২০ মিনিটের মধ্যেই বিষ তাহার পরিবাহন শক্তির লোপ করিয়াছে। পটাসিয়াম সায়েনাইড আরো মারাত্মক বিষ। তাহার প্রলেপে ৫ মিনিটের মধ্যে বৃক্ষের স্নায়বীয় প্রবাহ আড়ষ্ট হইল। (১২শ চিত্র)
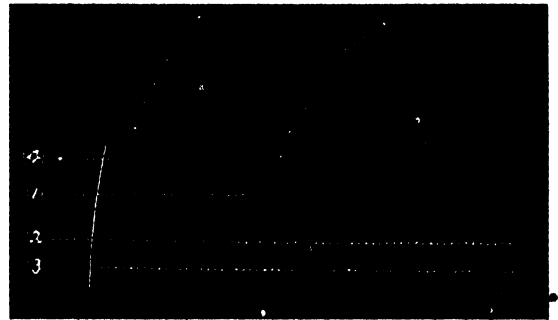
১২শ চিত্র। পটাসিয়াম সায়েনাইড বিষ প্রয়োগে উত্তেজনা প্রবাহন শক্তির লোপ। (১) সাধারণ অবস্থায় সাড়ালিপি। (২) বিষ প্রয়োগে প্রবাহন শক্তির লোপ। (৩) পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ উত্তেজনা প্রয়োগ করিলেও সাড়ার অভাব। (৪) পত্রমূলের অনুভূতি সময় জ্ঞাপক সাড়া।

এতদ্ব্যতীত বৃক্ষের স্নায়বীয়-প্রবাহ-সমর্থনকারী অনেক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছি। স্নায়ুর কোন অংশে যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া কোন সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলেই রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদ-বাহক হয়। এই প্রকারে আজ্ঞানুসারে বৃক্ষ কখনও সংবাদ-বাহক, কখনও সংবাদ-রোধক হইয়াছিল।

সোনার কাঠি, রূপার কাঠি।

রাজকন্যা মায়া পুরীতে মায়া বলে সুসুপ্তা ছিলেন। সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে মায়া নিদ্রা কাটিয়া গেল, হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন।

কই কিম্বা মাগুর মাছের মাথা কাটিয়া ফেলিলে মৎস্য-দেহ মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। কিন্তু মাংসপেশী অনেকক্ষণ সজীব থাকে। সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে মৃতবৎ দেহ লম্ফ প্রদান করে। এই ঘটনার কারণ এই যে দুই বিভিন্ন ধাতুর সংযোগে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিতে থাকে। স্নায়ুসূত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহে উত্তেজিত হয়। এ স্থলে বিনা চিম্‌টিতে উত্তেজনার সূচনা হয়। বৃক্ষে ও যদি এই প্রকারে
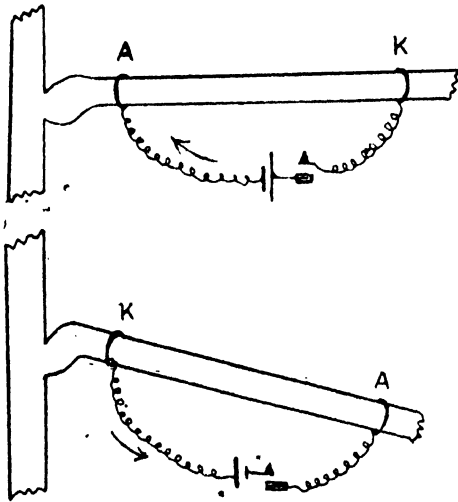
১৩শ চিত্র। বিনা চিমটিতে উত্তেজনা। এক দিকে বিদ্যুৎস্রোত বহিলে পত্র উত্তেজিত হয় না (উপরের ছবি)। কিন্তু উল্টাদিকে বহিলে উত্তেজিত হয় (নীচের ছবি)।

উত্তেজনা প্রবাহ চালনা করা সম্ভব হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই স্নায়বীয় ঘটনা। বৈদ্যুতিক উত্তেজনা শক্তির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে যে স্থান দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ প্রবেশ করে সে স্থানে উত্তেজনা প্রকাশ পায় না। পরন্তু যে স্থান দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ বহির্গত হয় সেই স্থানই উত্তেজনার কেন্দ্র। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে লজ্জাবতী পত্রে এক দিক দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ বহাইলে উত্তেজনার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যুতের গতি উল্টা দিকে চালাইলে অমনি পাতা উত্তেজিত হইয়া পতিত হয়। (১৩শ চিত্র)

যে সব পরীক্ষা দ্বারা জলের ধাক্কা এবং উত্তেজনার প্রভেদ করা যায় তাহা বর্ণিত হইল। বিনা চিমটিতেও যে উদ্ভিদে উত্তেজনা আরব্ধ এবং সেই উত্তেজনার তরঙ্গ দূরে প্রেরিত হয় তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইল। দৃষ্ট হইল যে যে সব অবস্থার প্রভাবে স্নায়বীয় উত্তেজনার বেগ, বৃদ্ধি হ্রাস কিম্বা আড়ষ্ট হয়, উদ্ভিদের আঘাত জনিত প্রবাহের গতিও সেই সব অবস্থার প্রভাবে একই রূপে বৃদ্ধি হ্রাস কিম্বা আড়ষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের আঘাত জনিত প্রবাহে এবং প্রাণীর স্নায়বীয় প্রভাবে কোন প্রভেদ নাই। আহত উদ্ভিদ্ এবং আহত প্রাণী তাহাদের আর্ত্তোদ্বেগ বার্ত্তা একই রূপে দূর স্থানে প্রেরণ করে।

কে মনে করিতে পারিত যে এই তুষ্ণীম্ভূত অসীম জীব-সঞ্চারে অনুভূতি শক্তি স্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে? তার পর কি করিয়াই বা সেই শারীরিক স্নায়বীয় উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিনী অশরীরী স্নেহমমতা ও প্রেম উদ্ভূত হইল? ইহার মধ্যে কোনটা প্রকৃত—শরীর অথবা তাহার ছায়া? ইহার মধ্যে কোনটা অজর, কোনটা অমর? যখন এই ক্রীড়নশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে, এবং ভাঙ্গা কলগুলি পঞ্চভূতে মিশিবে, তখনই সেই সব অশরীরী ছায়া আকাশে মিলিয়া যাইবে অথবা অধিকতর রূপে পরিস্ফুটিত হইবে? এই সব রহস্যের আরম্ভ কোথায় এবং অন্তই বা কোথায়?

আগমনী

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা কেমনে রয়েছে।
(আমি) শুনেছি শ্রবণে নারদ-বচনে
'মা মা' বলে উমা কেঁদেছে॥"

একটা ভাঙা বেহালার সঙ্গে ভাঙা-গলা একজন ভিখারীর মুখে একদিন এই গানটি শুনিয়াছিলাম। বাজ-নার বিশেষ কোন নৈপুণ্য ছিল না, ভিখারীর কণ্ঠস্বরেও

কোনরূপ মিষ্টতা ছিল না। কিন্তু উভয়ের মিলনে কেমন একটা চিত্তাকর্ষক মাধুর্য্য ছিল। গানের সরল বাঁধুনিতে একটি করুণ অনুরোধ অনুলিপ্ত। নারদ মেনকাকে বলিয়া গিয়াছেন. উমা 'মা মা বলিয়া কাঁদিয়াছে। তাই শুনিয়া স্নেহময়ী মাতার প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল, বুঝি বা তাঁহার চক্ষে দুই ফোঁটা জলও দেখা দিল! ব্যাকুল হৃদয়ে মেনকা গিরিরাজকে কন্যা লইয়া আসিতে মিনতি করিলেন। ভিখারীর গান এই সকরুণ মাতৃস্নেহের পবিত্র চিত্র ফুটাইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

বহুদিন পরে আজ শারদ প্রাতে সেই গানটি মনে পড়িল, আর সেই সঙ্গে মনে পড়িল সেই আকুল প্রীতির চিত্র। কিন্তু পঞ্জাবে সে আগমনী গান কোথায় শুনিতে পাইব? সে সুধা-মাখা আহ্বান-গীতি—যে গীতি নিত্য-পূজ্যা বিশ্বজননীকে কণ্যা বলিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইতে চায়—সে যে একান্তই আমাদের বাংলাদেশের!

* * * *

আদ্যাশক্তি ভগবতী দক্ষ-প্রজাপতির কনিষ্ঠ কন্যা সতীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দক্ষ যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের সহিত সতীর বিবাহ দিলেন। রাজদুহিতা সতী রাজ-প্রাসাদ ছাড়িয়া শ্মশানবাসিনী হইলেন, চন্দনানুলেপনাদি ত্যাগ করিয়া বিভূতি মাখিলেন। গন্ধমাল্য ফেলিয়া কঙ্কালমালা পরিলেন, রত্নভূষণের পরিবর্ত্তে ভুজঙ্গভূষণ ধারণ করিলেন। পতির ধর্ম্ম তাঁহার ধর্ম্ম হইল, পতির কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্ম হইল। পতি সন্ন্যাসী; সতী সন্ন্যাসিনী হইয়া সহধর্ম্মিণীর নাম সার্থক করিলেন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুঋষি এক মহাযজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞের বিরাট আয়োজন হইল। দেবগণ, ঋষিগণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই সেই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ-প্রজাপতিও আসিলেন। মহাদেব যজ্ঞ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষরাজ যখন সভায় উপস্থিত হইলেন তখন সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে সসম্মান অভ্যর্থনা করিলেন। করিলেন না কেবল ভোলানাথ শিব। তিনি তখন ভাবে বিভোর—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মদদর্পী দক্ষ ভাবিলেন জামাতা তাঁহাকে অপমান করিলেন। দক্ষ শিবের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং সেই কল্পিত অবমাননার প্রতিশোধ লই-বার নিমিত্ত নিজে অন্য এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; সে যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন, বাদ পড়িলেন কেবল শিব ও সতী। নিমন্ত্রণের পত্র বিলি করিবার ভার পড়িয়াছিল নারদের উপর। কলহপ্রিয় নারদমুনি এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। গোপনে কৈলাসে গিয়া সতীকে যজ্ঞের সংবাদ দিয়া আসিলেন। সতীর যজ্ঞ দেখিবার বড় সাধ হইল; তিনি পিত্রালয়ে যাইবার জন্য স্বামীর অনুমতি চাহিলেন। মহাদেব কহিলেন, "নিমন্ত্রণ হয় নাই যে, কিরূপে যাইবে?" সতী হাসিয়া উত্তর দিলেন "পিতৃগৃহে যাইব, নিমন্ত্রণের প্রয়োজন কি?"

তখন অগত্যা মহাদেব সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন।

সতী অনিমন্ত্রিত ভাবে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। সতীকে দেখিয়া দক্ষের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; শিবের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মদান্ধ দক্ষ স্নেহ মমতা ভুলিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলের সাক্ষাতে নিষ্ঠুর ও নীচভাবে শিবের নিন্দা করিলেন। একবারও মনে ভাবিলেন না সতীর সরল প্রাণে কত আঘাত লাগিবে।

পতিনিন্দা শ্রবণে সতী যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও অব-মানিত বোধ করিলেন। সে অবমাননা তাঁহার সহ্য হইল না। ব্যথিত হৃদয়ে তিনি দক্ষোৎপন্ন তনু ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সতী পতিব্রতা সাধ্বী রমণীর আদর্শ হইলেন।

মহাদেব সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইলেন। তখন ভোলানাথ ভৈরব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন। বজ্রকণ্ঠে কহিলেন,

"অরে রে অরে রে দক্ষ দে রে সতীরে।"

দক্ষযজ্ঞ ছারখার হইল; দক্ষের প্রাণ বিনষ্ট হইল। দক্ষপত্নী প্রসূতি রুদ্রের শরণাপন্ন হইলেন। শঙ্কর মহা-প্রাণ; তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ছিন্নমুণ্ড দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড সংলগ্ন করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। সেই অবধি দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল।

প্রাণশূন্য সতীর দেহ বহন করিয়া মহাদেব ত্রিভুবন মথিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষোভের সীমা নাই, শোকের অন্ত নাই। সৃষ্টি আর রক্ষা পায় না। তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ খণ্ডশঃ ছিন্ন করিলেন। যে যে স্থানে ঐ-সকল খণ্ড পতিত হইল তাহা এক-একটী পীঠস্থানে পরিণত হইল। এইরূপে একান্নটি পীঠস্থানের সৃষ্টি হইল।

সতীর দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া মহাদেব ধ্যানস্থ হইলেন।

*

মহাদেবের সে মহাধ্যান ভঙ্গ করিলেন পার্ব্বতী।

দেহত্যাগ করিয়া সতী গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের পতি মহাপ্রাণ শিবকে পতিরূপে পুনরায় পাইবার মানসে গৌরী যোগী-শ্বরের তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী গৌরীকে
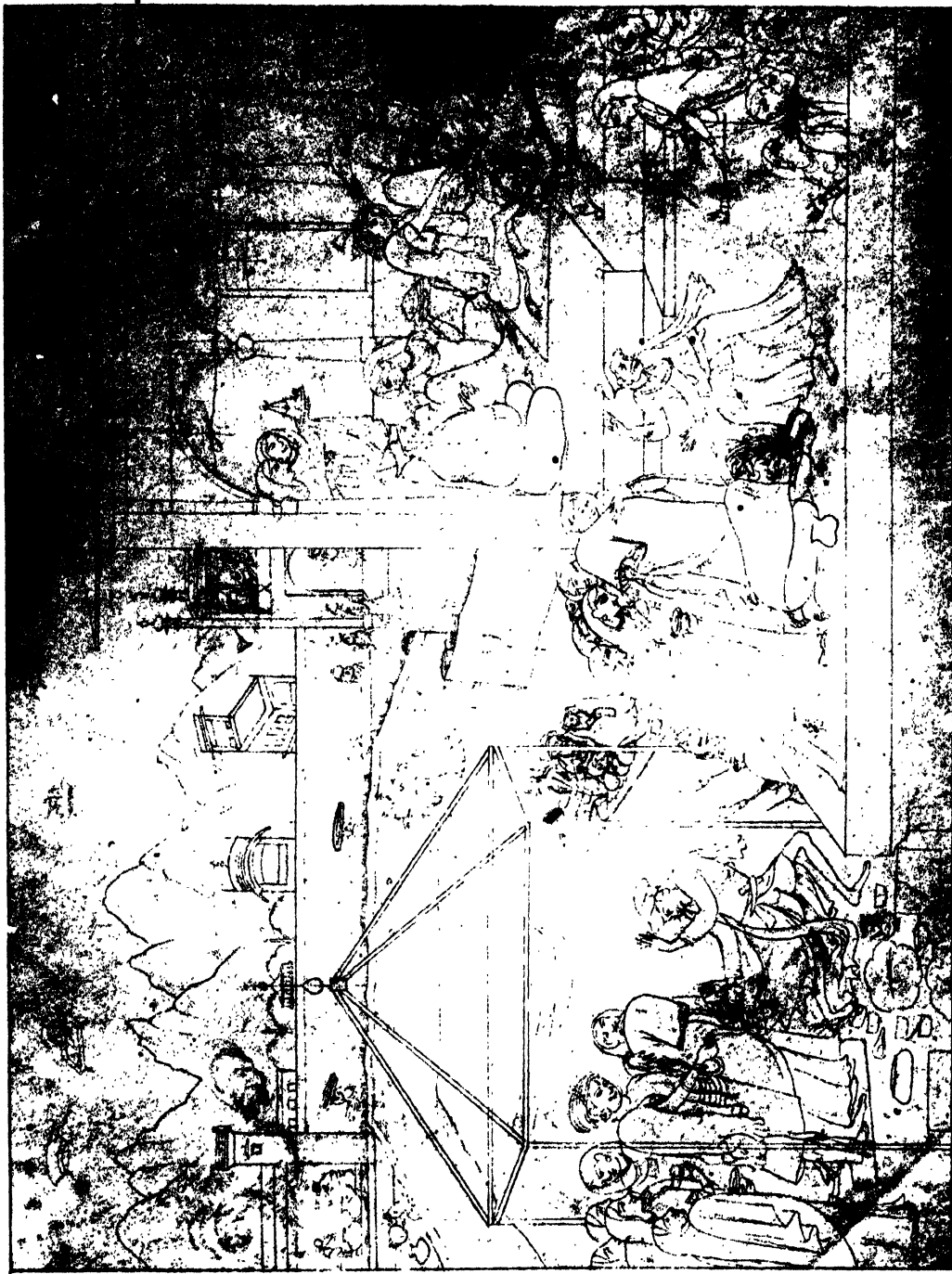
হরগৌরীর বিবাহ।
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

মহিষাসুর বধ।
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

মেনকা 'উ-মা' বলিয়া তপস্যাচরণ করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া পার্ব্বতীর নাম হইল উমা।

উমা অনন্যমনে মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ আর হয় না। তখন দেবগণের অনুরোধে কন্দর্প মহাদেবের তপোভঙ্গের চেষ্টা করিলেন। উমার একাগ্র সাধনায় যোগনিমগ্ন শিবের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কামদেব সেই সময় সম্মোহন বাণ মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ফুলশর নিজের কাজ করিল, কিন্তু হরকোপানলে মদনদেব ভস্মীভূত হইলেন। তদবধি কন্দর্প অনঙ্গ। কন্দর্পকে পরাভূত দেখিয়া উমা নিজের তপস্যা দ্বারা তপস্বী মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন।

শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। কিন্তু বরের বেশভূষা দেখিয়া মেনকা মরমে মরিয়া গেলেন। অঙ্গে বিভূতি, শিরে জটা, পরিধানে বাঘছাল, ভুজঙ্গ ভূষণ! হায়! হায়! শৈলেশনন্দিনী সোনার প্রতিমা উমার একি স্বামী!

মাতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,

"আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভুতুড়ের কপালে পড়িলে॥"

নারদ ঘটকালি করিয়াছিলেন। আক্ষেপ করিয়া মেনকা কহিলেন,

"বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদের কথায় করিল হেন কাজ॥"

কন্যা সম্প্রদান করিতে আসিয়া শৈলেন্দ্র পলাইবার পথ পান না। জামাতার অঙ্গে বিষধর ফণী—দেখিয়াই অস্থির। এদিকে

"দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি।
হেঁট মুখে মন্দ মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥"

শুভলগ্ন বহিয়া যায় দেখিয়া অবশেষে শিব মোহন বেশ ধারণ করিলেন। সে অপরূপ ভাস্বর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইল। জামাতার সুন্দর কান্তি দেখিয়া মেনকার আনন্দের সীমা রহিল না; গিরিরাজ শঙ্করের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন।

হরগৌরীর মিলন হইল। উমা কৈলাসবাসিনী হইলেন।

* * * *

কৌষিকীর আবির্ভাব।
(লাহোর মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন চিত্র হইতে)

হর-মহিষীর অন্যরূপ মহামায়া বা দুর্গা।

প্রলয়কালে ভগবান বিষ্ণু যখন শেষ-শয্যায় যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইল। বলদর্পিত অসুরগণ ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা দেবী বিশ্বেশ্বরীর স্তব আরম্ভ করিলেন। তখন দেবী বিষ্ণুর দেহ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইলেন।

অসুরদ্বয়ের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের বিরাম নাই; অবশেষে মহামায়া কর্ত্তৃক বিমুগ্ধ হইয়া মধু ও কৈটভ ভগবান বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইল। তদবধি হরির নাম হইল মধুকৈটভারি।

দেবীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্য মহিষাসুর বধ। এক সময়ে দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অসুরগণের অধিপতি মহিষ ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিল। দেবগণ অমরধাম হইতে বিতাড়িত হইলেন, তাঁহাদের লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণের অপমান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং সেই সময় তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক অনুপম দ্যুতি নির্গত হইল। অন্য দেবগণের দেহ হইতেও সেইরূপ তেজোরাশি নিঃসৃত হইল এবং সেই-সকল তেজোরাশি মিলিয়া একটি অপরূপ রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই রমণী দেবী মহামায়া। সকল দেবগণ দেবীকে আপন আপন অস্ত্র দান করিলেন। এইরূপে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া মহামায়া মহিষাসুরের সহিত ভীম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসংখ্য অসুরবৃন্দ নিহত হইল, ভীমবল মদমত্ত মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন হইল। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, পুষ্পবৃষ্টি অম্বিকার স্বেদ মোচন করিল, দেবগণ দৈত্য-দলনী দেবীর চরণকমলে নিপতিত হইয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন।

দৈত্যকুলের সংখ্যা নাই। আবার শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দৈত্যদ্বয় মহা বলশালী হইয়া উঠিল। তাহারা সবলে সুরগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য হরণ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র, ধনাধিপ কুবের, কৃতান্ত যম, চন্দ্র, সূর্য্য সকলেই নিজেদের প্রভুত্ব হারাইলেন।

তখন দেবগণ হিমাচলে গিয়া পুনরায় বিষ্ণুমায়া দেবীর বন্দনা করিতে লাগিলেন :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥"

অমরগণ যখন এইরূপে মহামায়ার স্তব করিতেছিলেন সেই সময় পার্ব্বতী পুণ্যসলীলা জাহ্নবীতীরে স্নান করিতে গমন করিতেছিলেন। দেবগণের স্তুতিবাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহার স্তব করিতেছ?" পার্ব্বতী এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাঁহার দেহকোষ হইতে একটি অসামান্যা সুন্দরী ললনা প্রাদুর্ভূতা হইয়া

অষ্টভুজা।
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

কহিলেন "শুম্ভ নিশুম্ভ দানবদ্বয় কর্ত্তৃক পরাজিত ও সুরধাম হইতে বিদূরিত দেবগণ আমারই বন্দনা করিতেছেন।" পার্ব্বতীর দেহকোষ হইতে সঞ্জাত হইলেন বলিয়া শিবার নাম হইল কৌষিক। কৌষিক প্রথমে দানব ধূম্রলোচন, পরে চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ ও তৎপরে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে সংহার করিয়া দেবগণকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

পুরাকালে সুরথ নামে এক নৃপতি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই নির্জ্জন, শান্তিময় আশ্রমে বাস করিয়াও প্রজাবৎসল নৃপতির মনে সুখ বা শান্তি ছিল না। সকল সময়েই তিনি পুত্র কলত্র, আপ্ত বন্ধু, প্রজাদিগের কথা ভাবিতেন এবং কি উপায়ে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবর্গকে সুতনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন ক্ষুন্ন মনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতেন।

মুনিসত্তম মেধস সুরথ রাজাকে এইরূপ বিমর্ষ, শোক-সন্তপ্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া, নৃপতিকে নববলে বলীয়ান করিবার জন্য শক্তিময়ী মহামায়ার মহিষাসুরবধ ইত্যাদি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন, এবং কহিলেন যে দেবী প্রসন্না হইলে সকল অভীষ্ট সাধন হয়।

অপরাজিতা-মাহাত্ম্য শুনিয়া সুরথ রাজা হৃদয়ে নূতন বল পাইলেন; তাঁহার সকল নৈরাশ্য দূর হইল, এবং নব আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। সংযতাত্মা সুরথ রাজা নদীপুলিনে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ দিয়া হোমাদি করিয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সাধকের অটুট সাধনায় চণ্ডিকা তুষ্ট হইলেন। ভক্তকে প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন। নৃপতি দেবীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দেবী কহিলেন, "তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; বর ভিক্ষা কর।"

নৃপতি ভ্রষ্ট রাজ্য ও জন্মান্তরে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভিক্ষা চাহিলেন। দেবী বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

সেই অবধি দুর্গা দেবীর পূজা প্রথা প্রচলিত হইল।

বরদৃপ্ত লঙ্কেশ্বর রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য রামচন্দ্রও দুর্গা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে দেবী নিদ্রিতা ছিলেন বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা দেবীর বোধন করিলেন। সেই অবধি সৌরাশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমা গড়িয়া দুর্গোৎসব কেবল বাংলা দেশেই হয়। অন্যান্য স্থানে এই সময় রামলীলা হয়। দেবী, অরাতির চণ্ডিকা, সন্তানের মাতা, ভক্তের বরদা। আজ সেই দেবীর আগমনী অযুত কণ্ঠে গীত হইতেছে—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

লাহোর। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে জীবতত্ত্বের প্রয়োগ

কিছু দিন হইল "সমাজতত্ত্বের এক অধ্যায়" নামক একটী প্রবন্ধে,* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের কয়েকটী সিদ্ধান্তের আলোচনা করা হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্তগুলির সাহায্যে আমাদের সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলির দোষগুণ বিচারই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুসমাজের প্রধান লক্ষণ, বর্ণাশ্রমবিভাগ। মহর্ষি মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা সুন্দররূপে ব্যাখাত এবং রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ইহা সুপ্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের আন্দোলনে এবং পরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবে এবং সর্ব্বশেষে ইউরোপীয় ভাবের সংঘাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজিও উহাকে হিন্দুসমাজের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বলিলে অন্যায় হইবে না। তবে এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা থাকিবে না, বারান্তরে সে চেষ্টা করা যাইবে।

বৈদিকযুগে দেখা যায় আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন। অনার্য্যগণ শারীরিক সৌন্দর্য্য, মানসিক বৃত্তি ও নৈতিক বল, সকল বিষয়েই আর্য্যগণ অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ছিল। এখন অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণের ব্যবহার তিন প্রকার হওয়া সম্ভব ছিল।

প্রথম, অনার্য্য জাতিকে সমূলে ধ্বংস করা। ইচ্ছা করিয়াই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার ইউরোপীয়গণ এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইয়া দুইটী জাতি মিলিয়া এক জাতি হইয়া যাওয়া। আরব প্রভৃতি মুসলমান জাতিগণ বিজিত জাতির সহিত এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সমূহ অনিষ্ট হইবার কথা, বিজিত জাতির (যদি তাহারা নিকৃষ্ট হয়) দোষ গ্রহণ দ্বারা তাহাদের বংশ নিকৃষ্ট হইয়া যাইবার কথা। ইতিহাসেও দেখা যায়, কোনও একটী মুসলমান জাতি অধিক কাল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই; আরব, তুরস্ক, পাঠান, মোগল, পারস্য প্রভৃতি নানা জাতি একের পর অন্য প্রতাপশালী হইয়াছিল।

তৃতীয় ব্যবহারটী হইতেছে, অনার্য্যগণকে স্বসমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়া রক্ষা করা; আর্য্যগণ তাহাই করিয়াছিলেন। অনার্য্যগণ আর্য্যগণের সহবাসে ক্রমশঃ উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়ায় তাহাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অপরপক্ষে উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় আর্য্যগণের বংশের অপকর্ষ জন্মিতে পারে নাই।

এই আর্য্য অনার্য্যের বর্ণসঙ্করতা নিবারণের জন্যই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের উৎপত্তি। বর্ত্তমান কালের হিন্দুও যে আর্য্যজনোচিত সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি ও চরিত্র কতকটা উত্তরাধিকার করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি এই বর্ণভেদ প্রথার নিকট ঋণী।

যাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা উচিত নয়, এইজন্য তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ ভোজনাদিও নিষেধ করা হইয়াছে।

শূদ্রগণকে হীনাবস্থ করিয়া রাখার জন্য অনেকে মনুকে দোষ দেন। কিন্তু যখন মনে পড়ে সেই-সকল শূদ্র কোল, ভীল ও নাগাদের জাতি ছিল তখন এই নিয়মের আবশ্যকতা বুঝা যায়। এই-সকল হীন ব্যক্তির হস্তে পড়িলে জ্ঞান বিজ্ঞান, শাসন-ক্ষমতা এবং ধনের যে বহুল পরিমাণে অপপ্রয়োগ হইত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? *

প্রথম প্রথম সমুদায় আর্য্যগণই এক জাতীয় ছিলেন—সকলকেই সব রকম কাজ করিতে হইত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান চলিত। ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে শ্রমবিভাগের আরম্ভ হইল। সমাজের উৎকৃষ্ট অংশ জ্ঞানচর্চ্চা ও শাসনকার্য্য লইয়া রহিলেন, অবশিষ্ট লোকে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি দ্বারা সমাজ পোষণে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে আর্য্যগণের মধ্যে তিনটী বর্ণের সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে

* প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৮।

* এই শূদ্র শব্দটার অর্থ কালক্রমে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে যিনি ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহাকেই শূদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে।—লেখক

বিবাহাদি চলিত। ক্রমে বৈশ্যগণের সহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাহ কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ তখনও চলিতে লাগিল। রামায়ণ, মহাভারতাদিতে দেখা যায় অনেক ঋষি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইত না, সন্তান ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইত। শূদ্রের সহিত দ্বিজাতিগণের মিশ্রণে যে-সকল সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইত তাহারা অত্যন্ত হেয় ছিল। দ্বিজগণের মধ্যে উচ্চজাতীয় পুরুষের সহিত নিম্নজাতীয় স্ত্রীর বিবাহ ততটা দোষাবহ ছিল না, কিন্তু নিম্নজাতীয় পুরুষের সহিত উচ্চজাতীয় স্ত্রীর বিবাহ নিন্দনীয় ছিল।

যাহা হউক এই-সকল বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইত। মনু বলেন

যত্রত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥

যে রাজ্যে বর্ণদূষক বর্ণসঙ্কর জাতি সমুৎপন্ন হয়, সে রাজ্য অচিরাৎ রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজাবর্গের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ অসদ্বংশীয়ের সহিত মিশ্রণে সদ্বংশীয়ের সন্তান অপকৃষ্ট হইবে। মনুসংহিতা বলেন "অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, এবং বধকর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই-সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে। অসদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি পিতৃপ্রকৃতিসম্পন্ন বা মাতৃপ্রকৃতিসম্পন্ন অথবা তদুভয়সম্পন্ন হয়—নিজ নীচকুলোদ্ভূতি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না। মহাকুল-প্রসূত ব্যক্তিরও জননে কোন দোষ থাকিলে, সে অবশ্যই—অল্প পরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক—তাহার (নীচকুলোদ্ভব) পিতৃমাতৃ-স্বভাবের অনুকরণ করিবে।"

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্ ॥ ৫৮
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ॥ ৫৯
কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসংকরঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু ॥ ৬০
১০ম অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের প্রধান প্রধান দোষ ও গুণ বংশানুক্রমিক (hereditary); এবং কিরূপে ধনবৈষম্য ও অন্যান্য কারণে একটী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহাও আলোচিত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তগুলির আলোকে এই বর্ণভেদ প্রথা বিচার করা যাক।

সমাজের চক্ষে একজন মানুষের শ্রেষ্ঠতা তিনটী কারণের উপর নির্ভর করে। প্রথম তাহার নিজের গুণাবলি; দ্বিতীয়, তাহার ধন; তৃতীয়, তাহার বংশ-মর্য্যাদা বা আভিজাত্য। প্রথমটীর কথা ছাড়িয়া দিয়া শেষের দুইটির মধ্যে কোন্‌টী ভাল তাহার বিচার করা যাক। ধনের সহিত মানুষের দেহমনের কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, অনেক স্থলে ইহা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। কাজেই বর্ত্তমান ইউরোপে যেরূপ ধনশালিতাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি ধনবলে বংশবৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু অনেক যোগ্যব্যক্তি ধনহীন হওয়ায় অবিবাহিত থাকিয়া নির্ব্বংশ হইতেছেন।

আমাদের সমাজে ধনের আসন আভিজাত্যের নিম্নে। বর্ত্তমানের বিজ্ঞান এই নিয়মের সমীচীনতা প্রতিপাদিত করিতেছে। একজনের শ্রেষ্ঠতা বিচার করিতে হইলে শুধু তাহার গুণাবলি দেখিলে চলিবে না, তাহার মাতৃ- ও পিতৃকুলের ইতিহাসও জানিতে হইবে। কেননা এমন অনেক বংশানুক্রমিক দোষগুণ আছে যাহা দুই এক পুরুষ পরে প্রকাশ পায়। তাহা হইলেই দেখা যাই-তেছে বংশমর্য্যাদার সহিত একজনের দেহমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় অন্যান্য সমাজের ন্যায় এখানে ধনবৈষম্যের জন্য যোগ্য-ব্যক্তির বংশ নিকৃষ্ট হইতে পাইতেছে না— রক্তের বিশুদ্ধত্ব সমধিক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তি যতই ধনবান হউক না কেন সে কিছুতেই উচ্চবংশে বিবাহ করিতে পারে না।

দেখা গেল, আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রণ নিবারণের জন্য বর্ণ-ভেদের সৃষ্টি, এবং পরে আর্য্যগণের মধ্যে ধনবৃদ্ধির সহিত অন্যান্য সমাজে যেরূপ অযোগ্য লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও যোগ্যলোকের সংখ্যা হ্রাস হয় তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে তিনবর্ণের উৎপত্তি। প্রথমতঃ,

জ্ঞানচর্চ্চা, শিক্ষাবিধান ও রাজকার্য্য স্বভাবতঃ সমাজের উৎকৃষ্টতর অংশের হস্তে আসিয়া পড়ে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করিয়া বৈশ্য বা সাধারণ লোক হইতে পৃথক করা হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বংশ, নিকৃষ্টতর লোকের সহিত মিশ্রিত না হওয়ায় অপকর্ষ লাভ করিতে পারে না, বরং অনেকস্থলে উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। তারপর দেখা গেল যিনি জ্ঞানালোচনা করিবেন তাঁহার শান্তিপ্রিয় ও জ্ঞানপিপাসু হওয়া আবশ্যক এবং যিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিবেন তাঁহার যুদ্ধপ্রিয় ও কর্ম্মকুশলী (practical) হওয়া আবশ্যক। একজন জ্ঞানবীর অপরজন কর্ম্মবীর, একজনের সাত্বিক ও অপরের রাজসিক গুণের প্রয়োজন। তখন তাহাদেরও বংশ দুইটী পৃথক করা হইল। এইরূপে এই সুবুদ্ধি-পরিচালিত কৃত্রিম নির্ব্বাচনের সহায়তায় ব্রাহ্মণের বংশে জ্ঞান ও শিক্ষকজনোচিত গুণাবলি, ক্ষত্রিয়ের বংশে যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তৃজনোচিত গুণাবলি, এবং বৈশ্যের বংশে কৃষক ও শিল্পীজনোচিত গুণসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বর্ণভেদ এখন যে কেবল বিজ্ঞানসম্মত তাহা নহে, ইতিহাসও ইহার শ্রেষ্ঠতা যথেষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছে। ব্রাহ্মণের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানী, ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বীর এবং বৈশ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্পী পৃথিবীর কোনও জাতি কোনও কালে দেখাইতে পারে নাই।

বর্ণভেদপ্রথার বিরুদ্ধে যে কয়টী প্রধান আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) কেহ কেহ বলেন সমাজের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকায় প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে প্রতিভাবান ব্যক্তির (অন্ততঃ বুদ্ধিমান talented ব্যক্তির) জননের পক্ষে বংশপ্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। কাজেই বলিতে হইবে বর্ণভেদ প্রথার গুণে অধিকসংখ্যক প্রতিভাবান বা বুদ্ধিমান লোক জন্মগ্রহণ করিবে। আর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সেই প্রতিভার স্ফুরণ নির্ভর করে তাহাও হিন্দুসমাজে অপকৃষ্ট হইবার কোনও কারণ নাই। প্রতিযোগিতা সমস্ত জাতির মধ্যে অবাধ না হইলেও প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়সমাজে এবং বৈশ্য বৈশ্যসমাজে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর যশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেন। উপরন্তু, পণ্ডিতের পুত্রের পক্ষে পণ্ডিত হওয়া এবং শিল্পীর পুত্রের পক্ষে শিল্পী হওয়া সহজ, কেননা বংশানুক্রমিক গুণাবলির কথা ছাড়িয়া দিলেও বাল্যকাল হইতে পৈত্রিক ব্যবসায়ে রুচি জন্মিবার ও শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা রহিয়াছে ; নিজবংশের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে বালকের মনে যেরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় এমন আর কিছুতে হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে বর্ণভেদ প্রথার এই-সকল বিপক্ষ সমালোচকগণ পাশ্চাত্য সমাজের মাপকাটি লইয়া আমাদের সমাজের পরিমাপ করিতে আসিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। আহার্য্যসংগ্রহ ও ধনলিপ্সাই সে সমাজের লোককে পরিশ্রম করিতে বাধ্য করে, কাজেই তাঁহারা মনে করেন ঐ দুইটীর অভাব হইলেই লোকে অলস হইবে। আমাদের সমাজ কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসী—এখানে অন্নাভাবে কষ্ট ছিল না বটে এবং অর্থকে কেহ পরমার্থ মনে করিতেন না বটে কিন্তু সমাজের—শুধু সমাজ কেন সমগ্র বিশ্বের—হিতের জন্য সদাসর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকিবার জন্য শাস্ত্রের অমোঘ আদেশ—এবং সে আদেশ এখানে যেরূপ সুপ্রতিপালিত হইয়াছিল এমন আর কোথায়ও হয় নাই ; কেননা হিন্দুজীবনের যে একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ তাহার জন্য শাস্ত্রাদেশ পালন অত্যাবশ্যক। স্পেন্সারের ন্যায় নাস্তিক এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের বল কেমন করিয়া বুঝিবেন ? যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণ জীবনব্যাপী দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতেন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে মৃত্যুকামনা করিতেন, বৈশ্য ইলোরার গুহা এবং মাদুরার মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন।

(২) বর্ণভেদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ইহা কতকগুলি কার্য্য কতকগুলি লোকের একচেটিয়া করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সমাজের আবশ্যকতা অনুযায়ী ক্রমবিভাগ থাকিতে পারে না। মনে করুন, কোনও এক ব্যবসায়ে লোকাধিক্য হওয়ায় বা আর কোনও কারণে, জীবিকা অর্জ্জনে কষ্ট হইতেছে, তখন সে

জাত্যভিমান-নিবন্ধন নিম্নজাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায় না। আমাদের শাস্ত্রকার কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কথাই বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি নিজের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে না পারেন তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি এবং তাহাতেও সুবিধা না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহাতে তাঁহার কোনও লাঘব হইবে না—ক্ষত্রিয়ও ঐরূপ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। বাস্তবিক, চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই বর্ণভেদের উদ্দেশ্য। শ্রমবিভাগ আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া মাত্র। জাতিব্যবসায় ত্যাগ করিবার জন্য কাহারও জাতি গিয়াছে শুনিয়াছেন কি?

এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া একটী কথা আছে। জাতীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন সকল বর্ণকে নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সমাজ রক্ষায় নিযুক্ত হইতে হয়। এক সময় দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ পরশুরাম ও তাঁহার গোষ্ঠী যুদ্ধে মন দিয়াছিলেন। আর সেদিন যখন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব রক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন ছত্রপতি শিবাজীর নায়কতায় মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণগণ কোশাকুশীর পরিবর্ত্তে তরবারি ধারণ করেন—কৃষকগণ হলের পরিবর্ত্তে ভল্ল গ্রহণ করে। মনুও সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

> শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুদ্ধতে।
> দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥ ৩৪৮॥
> মনু ৮ম অধ্যায়।

অর্থাৎ যখন বলদ্বারা ধর্ম্ম উপরুদ্ধ হয়, যখন কালকৃত বর্ণ-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এমন সময়ে দ্বিজাতিগণ ধর্ম্মরক্ষার্থে শস্ত্রধারণ করিতে পারেন।

(৩) বর্ণভেদের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি এই যে ইহা একরূপ স্বার্থপর আভিজাত্য (Aristocracy) সৃষ্টি করে এবং ইহা সাম্যের (equality) বিরুদ্ধে যায়। বর্ত্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধ নামক পুস্তকে এ বিষয়টী যেরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন তাহার পর আর কোনও কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি দেখাইয়াছেন সাম্য দুইপ্রকার আছে; প্রথম, সমস্ত মানুষই সমাজে সমান অবস্থায় থাকা উচিত; দ্বিতীয়, সমুদায় প্রাণীই একের বিভূতি, অতএব সকলেই সমান। প্রথমটী ইউরোপীয় ভাব, কিন্তু উহা একটা কথার কথা হইয়া রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কোনও সমাজে সকল লোক সমান অবস্থায় থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়টী হিন্দু ভাব, উহা সামাজিক হিসাবে লোকের মধ্যে বিভিন্নতা স্বীকার করে কিন্তু কাহাকেও অবজ্ঞা করে না; ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এমন কি গো ও কুক্কুর পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই সমদর্শী হয়; জীব কর্ম্মফলে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের মধ্যে মৌলিক কোনও ভেদ নাই।

তবে এস্থলে ইহাও স্বীকার্য্য যে পরবর্ত্তীকালের অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। আমি বলিতে চাহি ইহা কখনই ব্রহ্মদর্শী আর্য্যের যোগ্য ব্যবহার নহে। তাঁহাদের এই নিন্দার্হ ব্যবহারে তাঁহারা যে শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই তাহাই প্রতিপন্ন হয় মাত্র।

ইউরোপীয় সাম্যবাদের (socialism) মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ধনবৈষম্য ও তজ্জনিত দারিদ্র্যদুঃখ হইতেই উহার উৎপত্তি। সেখানকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ বিলাস-সরোবরে ক্রীড়া করিতেছেন এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকগণ দারিদ্র্যমরুভূমে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে—কাজেই সমাজের নিয়ম ওলটপালট করিয়া দিয়া সকলকে এক অবস্থায় আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুর স্বাভাবিক উদারতা ও বিচক্ষণতা এখানে সেরূপ বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা হইতে দেয় নাই। এখানে যিনি যে পরিমাণে ক্ষমতাশালী তিনি সেই পরিমাণে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

> বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
> তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

তাই বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের আয়ত্ত হইল, ক্ষত্রিয়ের রাজসেবা বিহিত হইল এবং সমাজকর্ত্তা ব্রাহ্মণ আপনি ভিখারী হইলেন। ব্রাহ্মণকে ঈর্ষা করিতে চাও ধনলোভ ত্যাগ কর, বিলাস বর্জ্জন কর, সদাচারী হও, তপস্যাপরায়ণ হও। দুঃখের বিষয় সে পথে যাত্রীর সংখ্যা বড় অধিক নয়! যাহা হউক ব্রাহ্মণ আদর্শ থাকায়, আমাদের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যেরূপ সদাচার

দেখা যায় পাশ্চাত্যদেশে সেরূপ দেখা যায় না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আভিজাত্য বটে, কিন্তু তাহা ধনের উপর নির্ভর করে না—মানবের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থার উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। আজ-কালকার অনেক বৈজ্ঞানিক ঐরূপ আভিজাত্যের প্রশংসা করিতেছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আভিজাত্য বটে—কিন্তু উহা শারীরিক সৌন্দর্য্যের আভিজাত্য, প্রখর বুদ্ধির আভিজাত্য, নৈতিক বলের আভিজাত্য।

এই সম্পর্কে আর একটা কথার বিচার আবশ্যক হই-তেছে।—অনেকে বলেন বর্ণভেদপ্রথার দোষে এক একটী নিম্নজাতি চিরকালই অধম থাকিয়া যায়। তাহারা আর সমাজে উন্নতিলাভ করিতে পারে না এবং একটী উপ-জাতি অযোগ্য হইয়া পড়িলেও উন্নত থাকিয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস উভয়েই এ কথার অযথার্থতা প্রতি-পাদিত করিতেছে। মনুসংহিতার মতে "জাতিগণ যুগে যুগে তপস্যাপ্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্যমধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীত্যে তাহা-দের জাত্যপকর্ষও ঘটিয়া থাকে। বক্ষ্যমান ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি-সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন।...স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশক নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপে ব্রাহ্মণসংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাতপুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশকাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"

তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষাঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ ৪২॥
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩॥

* * * *

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্‌যুগাৎ॥ ৬৪
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥ ৬৫
১০ম অধ্যায়।

ইতিহাসও বলে—আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রণজাত অনেক সঙ্করবর্ণ 'তপস্যাপ্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে' ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়তা লাভ করিয়াছেন। এবং যে বর্ণ যে পরি-মাণে ব্রাহ্মণের অনুকরণ করিয়াছেন তাহাদের সেই পরি-মাণে উন্নতি হইয়াছে।

এইবার চতুরাশ্রমের বিষয় আলোচনা করা যাক। প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য বা শিক্ষার কাল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এখানে কেবল এইটুকু বলিতে চাই যে প্রাচীন আর্য্য শিক্ষাপ্রণালী কেবল মানসিক বৃত্তিগুলিকে পরিস্ফুট করে না, শারীরিক ও সর্ব্বাপেক্ষা নৈতিক বৃত্তিগুলিকেও ফুটাইয়া তুলে। পরবর্ত্তী কালে যাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ, সমাজ-সেবী, বিলাসশূন্য এবং বিচক্ষণ গৃহস্থ হইতে হইবে তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অত্যন্ত উপযোগী ও আবশ্যক। এবং এই ব্রহ্মচর্য্যের ফলস্বরূপ সেকালের ব্রাহ্মণগণ যেরূপ অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানকালের পণ্ডিতবর্গের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য—উহার সর্ব্বপ্রধান ঘটনা বিবাহ। বিবাহ না করিলে কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারে না—সকল ধর্ম্মকার্য্য সস্ত্রীক করিবার বিধি। বিবাহের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। ইহাই যে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ত্ত-মানের বিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও তিনটী ঋণের কথা ভাবিলে বুঝা যায় আর্য্য গৃহস্থজীবন কি উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল। দেবঋণ পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ এই তিনটী ঋণ; দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয় যজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ স্বার্থত্যাগমূলক লোকহিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা; পিতৃঋণ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পরিশোধ করিতে হয় এবং ঋষিঋণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা পরি-শোধ হইয়া থাকে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনাপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ৩৫
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্টা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ ৩৬
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭
(৬ষ্ঠ অধ্যায়)

ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ—এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত; কিন্তু এই ঋণসকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্মের সেবা করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া, শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়না করিয়া, সন্তানোৎপাদন না করিয়া এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন তবে অধোগতি প্রাপ্ত হন।

সকলেই যে কিছুকাল সংসারাশ্রমে থাকিয়া তবে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন তাহাতে একটী সুফল ফলিয়াছিল। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেরও বংশ থাকিত, বর্ত্তমান ইউরোপে যেরূপ এই-সকল লোকের মধ্যে অনেকে অবিবাহিত থাকায় নির্ব্বংশ হয়েন সেরূপ হইতে পাইত না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিথিল হইয়া গেল, তখন বুদ্ধিমান্ ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাজেই এই-সকল শ্রেষ্ঠ লোকের বংশ থাকিল না, যাহারা গৃহস্থ থাকিতেন এবং যাহাদের বংশ থাকিত তাহারা ত্যাগশীলতায় এবং বুদ্ধিতে নিকৃষ্টতর ব্যক্তি। এইরূপে সমাজে যে যোগ্যব্যক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করিলেও বৌদ্ধদেরই ন্যায় সন্ন্যাসপ্রবণতা প্রচার করিয়া যান।

আর এক বিষয়ে আর্য্য গার্হস্থ্যপ্রথা বর্ত্তমান ইউরোপীয় গৃহস্থজীবনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে স্পেন্সার প্রমাণ করিয়াছেন যে সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের জননশক্তি নিম্নশ্রেণীর অপেক্ষা অল্প। সম্প্রতি কয়েকটী বৈজ্ঞানিক এসম্বন্ধে আরও গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমাজের যে-শ্রেণীর মধ্যে বিলাস যত অধিক তাহাদের বংশবৃদ্ধি তত কম। কাজেই বিলাসবর্জ্জন করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তানসংখ্যা বিশেষ অল্প হইবার কথা নহে। হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ বিলাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি যথোচিত রূপই হইত।*

বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—এই মহা হিতকর বৈজ্ঞানিক সত্যটী হৃদয়ঙ্গম থাকায় হিন্দুসমাজ অনেক কদাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আজকালকার ইউরোপে বিবাহের উদ্দেশ্য হইয়াছে সম্ভোগ; এখন, সন্তান জন্মিলে তাহার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আরামের ব্যাঘাত হয়, এইজন্য উচ্চশিক্ষিত সৌখিন নরনারী সন্তান হওয়া পছন্দ করেন না। যদি সন্তান হয়, তাহার পালনে তাঁহাদের যত্ন থাকে না, বেতনভোগী নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের উপর তাহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। এই ব্যাপার দেখিয়া সেখানকার কোনও কোনও চিন্তাশীল লোক সমাজের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—"বুদ্ধিমান্ এবং চরিত্রবান লোকগণের যথোপযুক্ত সন্তান হওয়া প্রার্থনীয় এবং মহিলাগণের জানা উচিত যে তাঁহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্তান-পালন। তাঁহারা বিদ্যাবত্তায় এবং শিল্পকলায় পুরুষদিগের সহিত টক্কর দিতে পারেন; না পারিলেও কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে স্নেহময়ী এবং সুদক্ষা জননী হওয়া *। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র কিন্তু সন্তানোৎপাদনের অত্যাবশ্যকতা প্রচারিত করায় হিন্দু সমাজে এরূপ বিপত্তি ঘটিতে পায় নাই। যতদুর জানিতে পারিয়াছি একমাত্র চীনদেশ ভিন্ন অন্য কোনও দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে পুত্রোৎপাদনের দায়িত্ব সম্বন্ধে এরূপ বিশদ ভাবে আলোচনা নাই।

স্মৃতিশাস্ত্রের মতে যদি কেহ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইত তবে তাহাকে পতিত করিয়া দেওয়া হইত অর্থাৎ তাহার সহিত উচ্চ জাতীয় লোকের বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইত। ইহাতে একটী

---

* Dr. Ireland points to the significant fact that some of the high castes of India (Brahmins and Rajputs), who are most exclusive in their marriages do not show the usual dwindling tendency, which may be correlated with the circumstances that they are mostly poor and abstemious. [Thomson's Heredity, p. 535].

* The first requisite, then, for mothers of the future, the elements of physical health being assumed, is that they should be motherly. They may or may not, in addition, be worthy of such exquisite titles as "the female Shakespeare of America" but they must have motherliness to begin with. [Saleeby's Parenthood and Race-culture, p. 153].

এই সুফল ফলিত যে কোনও দুশ্চরিত্র লোকের বংশবৃদ্ধি কম হইত এবং সে যোগ্য সুচরিত্র লোকের বংশে আপনার চরিত্রহীনতা প্রবেশ করাইয়া দিয়া সে বংশের অধঃপতন সংসাধিত করিতে পারিত না। আর যাহাতে কেহ গুণহীন ব্যক্তিকে কন্যাদান না করেন তজ্জন্য মনু বলিয়াছেন—বরং কন্যা যাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকে সেও ভাল তথাপি গুণহীন লোকের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে না।

অপরদিকে সদ্বংশজাত চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান্ লোকের বংশ যাহাতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য কৌলীন্য প্রথার প্রচলন হয়। কুলীন নির্ধন হইলেও তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সকলেই ব্যগ্র হইতেন। এখন এক ব্যক্তির স্বীয় দোষগুণ ব্যতীত আর দুইটী কারণে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়—প্রথম, ধনশালিতা; দ্বিতীয়, বংশমর্য্যাদা। পাশ্চাত্য দেশে ধনশালিতার গৌরব অধিক, ভারতবর্ষে বংশমর্য্যাদার গৌরব অধিক। আজকাল যখন বংশানুক্রমের প্রভাব প্রমাণিত হইয়াছে, তখন বংশমর্য্যাদা যে ধনশালিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ কি?

বংশানুক্রমের প্রভাবটি সুবিদিত থাকাতেই যে কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতাকারের বিশ্বাস ছিল যোগীর বংশেই যোগী জন্মগ্রহণ করেন।* মহর্ষি বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—"কুলোপদেশেন হয়োঽপি পূজ্যস্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি।"—বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সদ্বংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই কথাটী এমন সুন্দর যে বর্ত্তমানকালের কোনও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিত থাকিলেও বেশ শোভা পাইত।

কৌলিন্য প্রথার ভিত্তি যদিও আর্য্য ঋষিগণের ভূয়োদর্শনের উপর স্থাপিত তথাপি মুসলমান আমলে যখন দেশে জ্ঞানালোচনার স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং লোকে প্রাচীন বিধিব্যবস্থাগুলির কারণপরম্পরা বুঝিতে না পারিয়া অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল তখন বঙ্গের কৌলিন্য প্রথা একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপারে পরিণত হইল। ঘোড়ার বংশ উন্নত করিতে হইলে যে-সকল নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে মনুষ্যসমাজের বেলা তাহা চলে না। বংশানুক্রমের প্রভাব যতই হউক না কেন, তথাপি এক একটী বুদ্ধিমান্ লোক বহুসংখ্যক বিবাহ করিবে এবং একজন নিকৃষ্টতর ব্যক্তির বিবাহ জুটিবে না এরূপ পক্ষপাতিতা চলিতে পারে না।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে (polygamy) একটা কথা বলা যায় যে গুণবান্ ব্যক্তির বংশ থাকা যদি প্রার্থনীয় হয় তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দারান্তর পরিগ্রহ অন্যায় বলিতে পারা যায় না। খৃষ্টান শাস্ত্র যে বলিয়াছেন সকল অবস্থাতেই এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুরুষের অন্য স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ তাহা জীবতত্ত্বের চক্ষে কুপ্রথা বলিতে হইবে।* কিন্তু হৃদয়ধর্ম্মের দিক দিয়া বিচার করিলে বহুবিবাহ অন্যায় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

বিধবাবিবাহ বিষয়টী বর্ত্তমান সমাজতত্ত্বের সাহায্যে বিচার করিবার চেষ্টা করা যাক। অনেক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ বংশের কন্যা বিধবা হওয়ায় নিঃসন্তান থাকেন। তাহাতে সমাজে যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধির একটী উপায় নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অনেকে বলিবেন "কেবলমাত্র জীববিজ্ঞানের মতে ত সমাজ চলিতে পারে না। মানুষ পশু নহে—তাহার নানারূপ কোমল মনোবৃত্তি আছে। আর একটা বড় কথা আছে। জীবন ও মৃত্যুর অদ্ভুত প্রহেলিকার যতদিন পর্য্যন্ত না কতকটা মীমাংসা হইতেছে—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু বিশ্বাস করেন আর্য্য মহর্ষিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক আংশিক কৃতকার্য্যতালাভ করিয়াছিলেন—ততদিন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একটা মতামত দেওয়া বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত।"

কিরূপ কন্যা বিবাহযোগ্যা তদ্বিষয়ে মনু বলেন "যে স্ত্রীলোক মাতার অসপিণ্ডা (অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নহে) এবং পিতার সগোত্রা বা

---

* অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥৪২
৬ষ্ঠ অধ্যায়।

* From the point of view of certain eugenists, polygamy would be desirable in many cases, as extending the parental opportunities of the man of fine physique or intellectual distinction. [Saleeby's Parenthood and Race-culture, p. 169].

সপিণ্ডা না হয় এমন স্ত্রীলোকই বিবাহে প্রশস্তা।" গো, ছাগ, মেষ ও ধনধান্য দ্বারা অতিসমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশকুল পরিত্যাগ করিতে হইবে। হীনক্রিয় (অর্থাৎ সংস্কারবিরহিত), নিষ্পুরুষং (অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে), নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন-রহিত, রোমশ অর্থাৎ সকলেই বহুরোমযুক্ত, এবং অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত—এই দশকুলে বিবাহসম্বন্ধ রাখিবে না।

উপরোক্ত নিয়মগুলি স্থূলতঃ বিজ্ঞানসম্মত। বর ও কন্যার রক্তসম্বন্ধ অতি নিকট হইলে তাঁহাদের বংশ ভাল হয় না। বৈজ্ঞানিকগণের এইরূপ ধারণা * যে বংশ হীনক্রিয় অর্থাৎ নীতিবর্জ্জিত বা মূর্খ (সম্ভবতঃ নির্বুদ্ধি,) বা যাহাতে বংশানুক্রমিক কোনও ব্যাধি আছে তাহা বর্জ্জন করা নিশ্চয়ই বিবেচনার কার্য্য। যে কুলে পুরুষ জন্মায় না, কেবল কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে (অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় কন্যা অত্যন্ত অধিক সংখ্যক জন্মিয়া থাকে) তাহা বর্জ্জনীয়, ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে একজনের কয়টী পুত্র ও কয়টী কন্যা হইবে সেটা অনেকটা বংশানুক্রমিক। এখন আমি যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে এসম্বন্ধে কোনও রীতিমত গবেষণা দেখি নাই; * সেইজন্য কিছুদিন হইতে আমি কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে এই প্রীতিপ্রদ গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা বহুসংখ্যক পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেখিব পুত্র ও কন্যার অনুপাত বংশানুক্রমিক কি না। এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে এই গুণটী বংশানুক্রমিক এইরূপ অনুমান (working hypothesis) গঠন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহার পরীক্ষা করা খুব আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এই নূতন গবেষণার ফল কিছুকাল পরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। †

* The consequences of close interbreeding carried on for too long a time are, as is generally believed, loss of size, constitutional vigour and fertility, sometimes accompanied by a tendency to malformation. —Darwin. [See Thomson's Heredity, p. 392].

* If the sex of the offspring is not determined by environmental conditions, on what does it depend? It may depend on a number of minute and variable factors, such as the relative ages of the parents and the relative ages of the sex-cells when they unite in fertilisation or it may be "hereditary." [Thomson's Heredity, p. 505].

† পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা এই গবেষণায় সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, এই ঠিকানায় লেখকের নিকট নিম্নলিখিত তালিকাটী পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।

	মৃত্যুর বয়স বা বিধবা হওয়ার বয়স	তাঁহাকে লইয়া কয় ভ্রাতা	তাঁহাকে লইয়া কয় ভগিনী
পিতামহ			
পিতামহী			
মাতামহ			
মাতামহী			
পিতা			
মাতা			
নিজে			

উপরিউক্ত বিবরণ সত্য বলিয়া জানি।

স্বাক্ষর—

ঠিকানা—

বিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ মন্দ ছিল না ধরিয়া লইলেও, পরে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হওয়ায় এবং শ্রমবিভাগের ফলে যখন এক এক বর্ণের মধ্যে আবার ছত্রিশ জাতির সৃষ্টি হইল, তখন ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল। শেষটা এমন পর্য্যন্ত হইল যে একই বংশের লোক দুই বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ নানা দেশে বাস করিয়া নানা জাতি ত হইলেনই, বেশীর ভাগ এক বঙ্গদেশেই দুই বিভাগে বাস করা নিবন্ধন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেলেন। এই-সকল অন্যায্য বিভাগের বিভাগ (subclasses) উৎপন্ন হইবার কারণ বোধ হয় সেকালে এক প্রদেশের লোকের সম্বন্ধে অন্য প্রদেশের লোকের অজ্ঞতা; আজকালকার রেল টেলিগ্রাফের দিনে সে সমুদায় বজায় থাকিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। এই নিয়মের একটী কুফল এই হইয়াছে যে অনেক জাতি সংখ্যায় এত কম হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

শাস্ত্রের ব্যবস্থা পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ। এটীও একটী সুন্দর ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। চিরকাল সংসারের কোলাহলে না থাকিয়া, বৃদ্ধবয়স নির্জ্জনে, শান্তিতে ও আত্মচিন্তায় অতিবাহিত করা বেশ সুসঙ্গত। বর্ত্তমান ইউরোপে কিন্তু দেখা যায় অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত লোকে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন—এইজন্য সেখানে সত্তর বৎসর বয়স্ক সেনাপতিকে যুদ্ধ করিতে এবং পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক আচার্য্যকে অধ্যাপনা করিতে দেখা যায়। পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইহকালের কথা লইয়া বিচার করিলেও বুলিতে হইবে উভয় প্রথাতেই সমাজের কিছু উপকার ও কিছু অপকার হইয়া থাকে। ইউরোপীয় প্রথার গুণ এই যে সমাজের বিভাগগুলি কতকগুলি বহুদর্শী লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে। অপর পক্ষে ইউরোপীয় প্রথার দোষ এই যে কতকগুলি প্রাচীন ও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে থাকে বলিয়া রাজকীয় বিভাগগুলিতে অভিনব নিয়মের প্রবর্ত্তন ও যথোচিত সত্বরতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত খুব কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন, আরও বয়স হইলে তাঁহার প্রতিভা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদের অবসর গ্রহণ করাই উচিত *; তবে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান করিয়া তাহাদের সহায়তা করা বাঞ্ছনীয়।

শুনা যায় ফ্রান্সে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ কাল বৈষয়িক কার্য্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ কয়টা বৎসর বৃক্ষপালন-বিদ্যা (Horticultural researches) বা ঐরূপ একটী বিদ্যার চর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। ইঁহাদের এই সাধু চেষ্টার ফলে সেদেশে বৃক্ষপালনবিদ্যা এমন উন্নতি লাভ করিয়াছে যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের বিবেচনায় এই প্রথার সহিত প্রাচীন ভারতের বানপ্রস্থ-আশ্রমের তুলনা করা যায়। তাঁহারাও বৃদ্ধবয়সে সংসার হইতে ছুটী লইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইতেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় বিজ্ঞান বহির্মুখী, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ছিল অন্তর্মুখী; কাজেই সে দেশের বৃদ্ধগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, কিন্তু আমাদের দেশের বৃদ্ধগণ আত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন।

চতুর্থ আশ্রম যতি বা সন্ন্যাস। যখন অতিবৃদ্ধ হওয়ায় আর বনে বাস করিতে পারিতেন না তখন বানপ্রস্থ আশ্রমী পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু আর সংসারে লিপ্ত হইতেন না। তাঁহার মন তখন বড় উচ্চ সুরে বাঁধা। তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মশূন্য, মুক্ত ও সিদ্ধ পুরুষ। তিনি তখন জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিতেন না, কিন্তু ভৃত্য যেমন বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন থাকিয়া জীবনকাল বা মরণকাল প্রতীক্ষা করিতেন। যাহাতে কোনও জীবের প্রাণনাশ না হয়, সেইজন্য পথ দেখিয়া পদবিক্ষেপ করিতেন এবং বস্ত্রাদি দ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করিতেন। সত্য কথা

* ভারত গবর্ণমেণ্টও পঞ্চান্ন বৎসর বয়সেই কর্ম্মচারীগণকে পেন্সন দিয়া থাকেন।

বলিতেন এবং মনকে পবিত্র রাখিতেন। অবমানজনক বাক্যসকল সহ্য করিয়া থাকিতেন, কাহাকেও অপমান করিতেন না এবং কাহারও সহিত শত্রুতা করিতেন না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশল বাক্য প্রয়োগ করিতেন। সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিতেন; কোনও বিষয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না—সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইতেন। কেবল আত্মসহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহ-সংসারে বিচরণ করিতেন।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃত্যকো যথা ॥ ৪৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ৪৬
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ৪৭
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ৪৮
অধ্যাত্ম রতিতাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ৪৯
মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠক দেখিবেন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাস-আশ্রমে যেরূপ আচরণ বিহিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্মে, খৃষ্টধর্ম্মে ও চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সেইরূপ আচরণ সকলেরই পক্ষে অবলম্বনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ঐ-সকল নিয়ম পালন করিতে হইলে কিরূপ পদে পদে হাস্যাস্পদ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আত্মরক্ষার্থ ও সমাজ-রক্ষার্থ সংসারী ব্যক্তিকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয় এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়। এক গালে চড় মারিলে অপর গাল ফিরাইয়া দেওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ও অন্যায়।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সন্ন্যাসী তাঁহার দীর্ঘ জীবনে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা কি তাঁহার সহিতই নষ্ট হইয়া যাইত, পরবর্ত্তী বংশ কি তাহার উত্তরাধিকারী হইত না? হইত বৈ কি। এই-সকল জ্ঞানী বৃদ্ধের চরণতলে বসিয়া লোকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিত। তাঁহাদের অমূল্য উপদেশই পুরাণ উপপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়া আজিও হিন্দু গৌরবের অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে।*

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অরণ্যবাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ:—কলিকাতা-বাসী ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতায় বাটী বিক্রয় করিয়া মানভূম জেলার অন্তর্গত পার্ব্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই স্থানেই সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাঁহাকে কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ দেন ও সাহায্য করেন। ধান্য পাকিয়া উঠিলে, পর্ব্বত হইতে হরিণের পাল নামিয়া ধান্য নষ্ট করিতে থাকায়, হরিণ তাড়াইবার জন্য ক্ষেত্রনাথ মাচা বাঁধিয়া রাত্রিতে পাহারার ব্যবস্থা করিলেন ও কলিকাতা হইতে তিনটি বন্দুক ক্রয় করিয়া আনিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক টোটাদার বন্দুক দেখিতে আসিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বন্দুক ছোড়া শিখিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রনাথ শুনিয়া বলিলেন, আগে শস্য সব খামারে উঠুক তারপর বিবেচনা করা যাইবে।]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্রনাথের আউশ ধান্য কাটা হইয়া যথাসময়ে খামারে উঠিল। খামারবাড়ীর বিস্তৃত উঠান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করা হইল। আউশ ধান্যগুলি মাড়াই ঝাড়াই করাইয়া ক্ষেত্রনাথ তৎসমুদায় ভাণ্ডারে রাখাইলেন। গো-মহিষাদির আহার্য্য খড় ও বিচালীর অভাব হইয়াছিল; সে অভাবও আপাততঃ মিটিয়া গেল। এক্ষণে আমন ধান্যগুলির যত্নবিধানে লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি মনোনিবেশ করিল। কিন্তু আশ্বিন মাসের মধ্যে সুচারু বৃষ্টিপাত না হওয়ায়, কোথাও কোথাও ধান্য মরিতে ও শুকাইতে লাগিল। প্রজারা বৃষ্টির অভাবে অজন্মার আশঙ্কা

* In cities he (the Yati) had to impart the knowledge he had acquired, during a long and meritorious life, on domestic, social, religious and other matters, to younger people. It is the lectures of these venerable old people, cast into the shape of books, that have come down to us, after many a revision, as Puranas and Upapuranas.—MM. Haraprasad Sastri

করিয়া ভীত হইতে লাগিল, এবং চারিদিকেই হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

নন্দাজোড়ের জল বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে, আমন ধান্যগুলি রক্ষা করা ক্ষেত্রনাথের পক্ষে কঠিন কার্য্য হইল না। অল্প আয়াস ও চেষ্টাতেই ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে নন্দার জল পরিচালিত হইল। ক্ষেত্রনাথের একগাছি ধান্যও শুকাইয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিল না। প্রজাবর্গ ক্ষেত্রনাথের বুদ্ধি ও কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং তাহারাও অন্যান্য জোড়ের উপর বাঁধ বাঁধিয়া জল আট্‌কাইবার চেষ্টা করিল। কেহ কেহ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইল; কিন্তু অনেকেই কৃতকার্য্য হইল না। তাহা দেখিয়া, যে যে প্রজার ক্ষেত্রে নন্দার জল পরিচালিত হইতে পারে, ক্ষেত্রনাথ সেই সেই প্রজাকে নন্দার জল লইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এই প্রদেশের লোকেরা স্বভাবতঃই অলস, নিশ্চেষ্ট, দূরদর্শনহীন ও অমিতব্যয়ী। ইহারা ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে জানে না। যতক্ষণ গৃহে আহার্য্য থাকে, ততক্ষণ ইহাদের কোনও চিন্তা নাই! আহার্য্যের অভাব হইলে, ইহারা ঘটী বাটী, গহনা, এবং এমন কি, কোদাল কুড়ুল পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া যাহা পায়, তদ্দ্বারা কিছু দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। যখন আর কোনও উপায় থাকে না, তখন কেহ কেহ চুরী ডাকাতী আরম্ভ করে, কেহ বা বিদেশে চাকরী করিতে যায়, এবং কেহ কেহ বা আড়কাঠির হাতে পড়িয়া আসাম কাছাড়ের চা-বাগানে নীত হয়। ফলতঃ, অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ হইলে, এই প্রদেশের লোকের কষ্টের অবধি থাকে না, এবং যাঁহারা ধনধান্যবান্, তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক ভাবে জীবন যাপন করেন।

মাধব দত্ত মহাশয় এই প্রদেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ চাষী। তিনি তাঁহার ধান্যাদি শস্য বাঁচাইবার নিমিত্ত তাঁহার জমীর স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে, তিনি সেই পুষ্করিণীসমূহ হইতে জল সেচন করিয়া শস্য রক্ষা করেন। বর্ত্তমান বৎসরেও, তিনি শস্য রক্ষার নিমিত্ত পুষ্করিণীসমূহ হইতে জলসেচন করিলেন। তাঁহার ধান্যগুলির রক্ষার সম্ভাবনা হইলে, ক্ষেত্রবাবু ধান্য রক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা দেখিবার ও জানিবার জন্য তিনি একদিন বল্লভপুরে আসিলেন। কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, তিনি ইদানীং বহু দিন বল্লভপুরে আসিতে পারেন নাই। এক্ষণে বল্লভপুরে আসিয়া, ক্ষেত্রনাথ কি উপায়ে নন্দার জল আবদ্ধ করিয়া শস্য রক্ষা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও তাঁহার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরিণের উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত আলু, কপি, কার্পাস, গম, যব প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রসমূহ ভ্রমণ করিয়াও তিনি এরূপ বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করিলেন যে তাহা বর্ণনীয় নহে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি ক্ষেত্রনাথের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইলেন, এবং বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু, চাষ কর্‌তে কর্‌তে আমি বুড়ো হলাম; কিন্তু আপনি বোধ হয় এর আগে কখনও চাষ করেন নাই। আপনি অল্প দিনের মধ্যেই কৃষিকার্য্যে যেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আমি অবাক্ হয়েছি; লেখাপড়া শিখ্‌লে বুদ্ধি যে চারিদিকেই খেলে, আর কোন কাজই আট্‌কায় না, তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ দেখ্‌লাম। আপনার কাছে সকলকেই সব বিষয় শিখ্‌তে হবে। আপনি কার্পাসের যে সুন্দর চাষ করেছেন, তা দেখে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আর এদেশের মাটিতে আলু, কপি, মটরও যে এমন সুন্দর জন্মে, তা আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাই হোক, আপনি আমাদের এই অঞ্চলে এসে বাস করায় আমরা ধন্য হয়েছি। আপনার আগমন আমাদের পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।"

ক্ষেত্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন "আপনি কি বল্‌ছেন, দত্ত মশাই! আমি আপনাদের আশ্রয়েই এই দেশে এসেছি। আমি এসব কাজে একেবারে নূতন; কিছু জানি না। আপনার উপদেশে ও লখাই সর্দ্দারের বুদ্ধিতেই আমি সব কাজ কর্‌ছি। গ্রামের প্রজারাও আমাকে বিলক্ষণ সাহায্য করেছে। আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। এ বৎসর এক নূতন জাতীয়

কার্পাস-বীজ এখানে বুনেছি। যদি কার্পাস ভাল হয়, তা হ'লে আপনাদেরকেও বীজ আনিয়ে দেব। এখন এ বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে, প্রজাদের ধান ম'রে যাচ্ছে, আর তাদের মনে বড় ভয় ও ভাবনাও হয়েছে। হবারই কথা। দেবতা কৃপা না করলে, এবৎসর তাদের অর্দ্ধেক ফসলও হবে না। কিন্তু একটা কথা সর্ব্বদাই আমার মনে হয়। আমরা যে এত কষ্ট পাই, তা কেবল আমাদেরই দোষে। দেখুন, ভগবান্ এ অঞ্চলে কত ছোট ছোট নদী দিয়েছেন। সেই সমস্ত নদীর মধ্যে সর্ব্বদাই জল ব'য়ে যাচ্ছে। এই জলটিও দেবতার কৃপাধারা। কিন্তু দেবতার এই কৃপাধারা আমরা অবহেলায় হারাচ্ছি। পাহাড়ের ঝরণার জল জোড়ে পড়ছে, জোড়ের জল নদীতে পড়্ছে, আর নদীর জল সমুদ্রে পড়্ছে;—অর্থাৎ দেবতার কৃপাধারা সর্ব্বদাই ব'য়ে যাচ্ছে। কই, আমরা তো কখনও সেই কৃপা-লাভের জন্য চেষ্টা করি না? আমি নন্দাজোড়ের জল আটক্ করেছি ব'লে, আজ দেবতার কৃপায় আমার ধানগুলির রক্ষা হ'ল। কিন্তু প্রজারা তো কেউ তা আটক্ ক'রে রাখ্বার কথা একটীবারও ভাবে নাই? আমি মনে করেছি, আগামী বৎসর সকল প্রজাকেই সমস্ত জোড়ে বাঁধ দিতে বল্ব। তা হ'লে অনাবৃষ্টির সময় দেবতার অকৃপার কথা ভেবে কষ্ট পেতে হবে না। আপনি কি বলেন?"

দত্ত মহাশয় বলিলেন "প্রজাদেরকে তার জন্য আর কিছু বল্তে হবে না। তারা আপনা-আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত দেখে কাজ করবে।"

ক্ষেত্রনাথের অনুরোধে দত্ত মহাশয় সেবেলা তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্নভোজন করিলেন। দত্ত মহাশয় কথায় কথায় ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "পূজো এ বৎসর কার্ত্তিক মাসে। কিন্তু সময়ও নিকট হ'য়ে এল। আমি প্রতি-বৎসর মার প্রতিমা এনে তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকি। সেই সময়ে, এই অঞ্চলে আমাদের যে-সকল স্বজাতি ও কুটুম্ব আছেন, তাঁরাও অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে পদধূলি দেন। এই অসভ্য ও জঙ্গল দেশে বাস ক'রে আমরাও অসভ্য হ'য়ে গেছি। কল্‌কাতায় ও আমাদের দেশে যে রকম জাঁকজমকের সহিত পূজো হয়, এখানে তার কিছুই হয় না। আমরা কেবল ভক্তি ক'রে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিই মাত্র। আপনাকে আমার বল্‌তে সাহস হচ্ছে না; কিন্তু পূজোর কয় দিন আপনি সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে এলে, আমরা সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হব। গৃহিণী একদিন এখানে এসে মেয়ে-ছেলেদেরকে নিমন্ত্রণ ক'রে যাবেন। দেখুন, আমরা এক রকম বনবাসীই হয়েছি; এ অঞ্চলে আমাদের দেশের লোক বড় বেশী নাই। যে দুই দশ জন আছেন, তাঁরা নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। সকলের সঙ্গে সব সময়ে দেখাসাক্ষাৎও হয় না। কারুর বাড়ীতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ হ'লে কখনও কখনও আমরা একত্র হই। এদেশে আমাদের দেশের মতন পূজা পার্ব্বণ বা উৎসবও কিছু নাই। দেখুন না, আমাদের এত বড় পরগণার মধ্যে কেবল রাজার বাড়ীতে আর দুই তিনটি স্থানে দুর্গা-পূজো হয়। কিন্তু সে সমস্ত স্থানে এরূপ বীভৎস কাণ্ড হয় যে, আমরা কিছুতেই মনে সোয়াস্তি পাই না। মদ মাংস তো আছেই; তার উপর মহিষ বলি। পূজোর সময় এক-একটী স্থানে চল্লিশ পঞ্চাশটি মহিষ বলি হয়। সে কি বীভৎস দৃশ্য! যেন রক্তের নদী ব'য়ে যাচ্ছে! আমি সাত্ত্বিক ভাবেই মার পূজো করি। আমাদের বাড়ীতে কেবল কুম্‌ড়ো ও আক বলি হয়। আমাদের বাড়ীতে যে পূজো হয়, তা দেখ্বার মতন নয়। তবে বৌমা এখানে একলাটি আছেন; আর ছেলেরাও কারুর সঙ্গে বড় একটা মিশ্‌তে পায় না। বিশেষতঃ পূজোর সময়টি এই উৎসবশূন্য গ্রামে তারা নিরানন্দে কাটাবে। এই জন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।"

ক্ষেত্রনাথ মাধবদত্ত মহাশয়ের বিনয়পূর্ণ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন "দত্ত মশাই, এ দেশে প্রথম পদার্পণ করেই আমরা আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। পূজোর সময় আপনার বাড়ী যাব, তার আর কথা কি? কেবল নিমন্ত্রণ করবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণীকে কষ্ট ক'রে এখানে আস্‌তে হবে না। তবে তিনি একদিন এখানে এমনই বেড়াতে এলে আমরা

সকলেই সুখী হব। বাড়ীতে সর্ব্বদাই আপনাদের কথা হয়। পূজোর সময় ছেলেমেয়েরা তো আপনার বাড়ী যাবেই, আমরাও গিয়ে মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আস্‌ব।”

এইরূপ আলাপের পর মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রনাথের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বৃষ্টির অভাবে ধান্য মরিতে আরম্ভ হওয়ায় চারিদিকেই হাহাকার উঠিল। মা আনন্দময়ীর আগমনে কোথায় লোকের মনে আনন্দ ও উৎসাহ হইবে, না, তৎপরিবর্ত্তে সকলের চিত্ত ঘোর বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। একটী পশলা বৃষ্টি হইলেই, বার-আনা রকম ফসল বাঁচিয়া যায়। সেই একটী পশলা বৃষ্টির জন্য কৃষককুল সর্ব্বদা আকাশ পানে চাহিতে লাগিল। অনেক স্থলে ইন্দ্রপূজা হইল। যেসকল ব্যক্তি মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা বৃষ্টিপাত করাইতে পারে বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহারাও মাঠের মাঝে ও পাহাড়ের উপর বসিয়া অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল। ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পর একটী নগ্না নারীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রাজপথে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং দেবতা ও রাজার উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ করিলেই দেবতা জলবর্ষণ করিবেন। এইরূপ অনেকবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইল বটে, কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গেল না।

সহসা মহালয়ার দিনে সন্ধ্যার পর আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। আকাশপ্রান্তে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল ও মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। বারিপাত হইতে দেখিয়া সকলের মনে আনন্দের উদয় হইল। ক্ষেত্রনাথও আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নন্দার বাঁধ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্কাও অনুভব করিলেন। তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, লখাই সর্দ্দার অন্যান্য মুনিষগণের সহিত জাগিয়া বসিয়া আছে, এবং বৃষ্টি থামিলেই নন্দার বাঁধ দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিবামাত্র লখাই সর্দ্দার মুনিষগণকে লইয়া নন্দার বাঁধ দেখিতে গেল। ক্ষেত্রনাথ ও মনোরমা তাঁহাদের শয্যাগৃহ হইতেই নন্দার বন্যা-জলের ভীষণ কল্লোল এবং জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই মনে করিলেন, রাত্রির মধ্যেই বাঁধ ভাঙ্গিবে, কিংবা নন্দাতীরবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্রগুলি জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে।

লখাই সর্দ্দার প্রভৃতি নন্দার নিকটে গিয়া দেখিল, পর্ব্বতের গাত্র হইতে হড়্ হড়্ শব্দে জল নামিয়া নন্দা-গর্ভে পড়িতেছে। সেই জলে নন্দা উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। নন্দার জলরাশি সমগ্র বাঁধটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ভীমদর্পে ও প্রচণ্ড শব্দে তটিনীগর্ভে প্রপতিত হইতেছে। নন্দার উর্দ্ধদিকে লখাই যে-সকল বাঁশের আড়ালি পুঁতিয়াছিল, তদ্দ্বারা স্রোতের বেগ প্রতিহত হইয়া অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু জলরাশি স্বাধীন-ভাবে প্রবাহিত হইতে না পারিয়া, নন্দার উভয় তটের বহু দূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। লখাই তটের ধারে ধারে গিয়া দেখিল যে আলু, কপি প্রভৃতির ক্ষেত্র এখনও জলে আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু যদি আরও বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জল উঠিয়া ফসল একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। লখাই সর্দ্দার মুনিষগণের সহিত প্রায় সমস্ত রাত্রি নন্দার তটে বসিয়া রহিল। আর বৃষ্টিপাত না হওয়ায়, নন্দার জল ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ক্ষেত্রনাথ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া নন্দার বাঁধের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, বাঁধটি দুই এক স্থলে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; দুই এক স্থলের শালের খুঁটি উৎপাটিত হইয়াছে এবং নন্দার বন্যা অনেকটা কমিয়া গেলেও, এখনও বাঁধের উপর দিয়া প্রবলবেগে জল প্রবাহিত হইতেছে। আলু ও কপির ক্ষেত্রে জল না উঠিলেও, অনেকগুলি কপির চারা বৃষ্টির জলে নষ্ট হইয়াছে। জলস্রোত মন্দীভূত হইলে, লখাই সর্দ্দার বাঁধটি সংস্কার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

বৃষ্টিপাতে ক্ষেত্রনাথের যৎসামান্য ক্ষতি হইলেও,

প্রজাসাধারণের প্রভূত মঙ্গল হইল, যে ধান্য একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, কেবল তাহাই নষ্ট হইল; অবশিষ্ট ধান্য রক্ষা পাইল। মা আনন্দময়ীর শুভাগমন-সময়ে সকলের মনে বিষাদের ছায়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা তিরোহিত হইয়া গেল।

দেবীপক্ষের দ্বিতীয়ার দিনে মাধবদত্ত মহাশয়ের গৃহিণী সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া মনোরমাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য গোষানে করিয়া বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। মনোরমা তাঁহার যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক দিনের পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়ায় অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের মধ্যে বাক্যালাপ হইতে লাগিল।

মাধবদত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যাটির নাম শৈলজা। বয়ঃক্রম নয় বৎসর ও দেখিতে অনিন্দ্যসুন্দরী। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বল্লভপুরে আসিবার সময় যখন মনোরমা প্রভৃতি দত্ত মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাঁহারা শৈলজাকে দেখেন নাই। শৈল তখন বৈদ্যবাটীতে তাহার মাতুলালয়ে গিয়াছিল। তাই আজ সহসা তাহাকে দেখিয়া মনোরমা চমৎকৃত হইলেন। এমন ফুট্‌ফুটে সুন্দরী মেয়ে মনোরমা আর কখনও কোথাও দেখিয়াছেন কি না, তাঁহার তাহা মনে হইল না। যেমন তাহার মুখের গঠন, নাক, চোখ ও গায়ের রং, তেমনই তাহার আনন্দময় মধুর স্বভাব। মনোরমা শৈলজার সঙ্গে তাহার মামাবাড়ী সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন। মনোরমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শৈল, কোন্ দেশটি তোমার ভাল লাগে,—তোমার মামাবাড়ী, না তোমাদের এই দেশ?"

শৈল বলিল "সে দেশও ভাল, এদেশও ভাল। মামাবাড়ীতে গঙ্গা আছে। গঙ্গার উপর দিয়ে কত নৌকো কত ইষ্টিমার যায়, সে দেখ্‌তে ভারি চমৎকার। আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজই কত নৌকো ও ইষ্টিমার দেখ্‌তাম। মামাবাবুর সঙ্গে আমি একবার ইষ্টিমারে চেপে কল্‌কাতা গেছ্‌লাম। কল্‌কাতা মস্ত সহর। কত বড় বড় বাড়ী, কত লোক, কত দোকান, কত জিনিষ! চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভালুক, সিংহী, বাঁদর, সাপ, কত কি আছে। যাদুঘরেও মরাজন্তু আছে। কল্‌কাতায় বিদ্যুতের আলো আছে; সেখানে হাওয়া-গাড়ী আপনিই চলে। গঙ্গার উপরে পুল আছে। সেই পুলের উপর থেকে কত জাহাজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মামাবাবু বলছিলেন যে ঐ সব জাহাজ সমুদ্র পার হ'য়ে বিলাত যায়। সমুদ্র গঙ্গার চেয়ে মস্ত বড়; কোনও দিকে ডাঙ্গা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, আর তার ঢেউ এক-একটা ঘরের মত উঁচু। মামাবাবু জাহাজে চেপে যখন রেঙ্গুনে গেছ্‌লেন, তখন সমুদ্রে এমন ঝড় আর ঢেউ উঠেছিল যে, আর একটু হ'লেই জাহাজ ডুবে যেত।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া শৈলজা সহসা নীরব হইল। সে যেন তাহার মানসচক্ষে উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিল।

মনোরমা শৈলজার কথা শুনিয়া অতিশয় আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার সুমধুর বাক্যবিন্যাস এবং বাক্য বলিবার সুমধুর ভঙ্গী দেখিয়া মনোরমার হৃদয় তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। মনোরমা শৈলজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, শৈল, কল্‌কাতায় যে-সব জিনিষ দেখে এলে, এখানে তো সে-সব নেই; তা হ'লে এদেশ কেমন ক'রে ভাল হ'ল?"

শৈলজা বিষম সমস্যায় পড়িল। সে অল্পক্ষণ ভাবিয়া বলিল "আমার মামাবাড়ীতে আর কল্‌কাতায় কোথাও পাহাড় নেই, শালের বন নেই, ফাঁকা জায়গা নেই; আর কারুর বাড়ীতে ধানের মরাই নেই, গরু নেই; সেখানে দুধ কিনে খেতে হয়, চাল কিনতে হয়। দুধ যেন জলের মতন, খেলে গা বমি বমি করে। সেখানে সকলে কেবল খাবার খায়, আর কেউ মুড়ি খায় না—"

শৈলজার বাক্য শেষ হইতে না হইতে মনোরমা হাসিয়া উঠিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে শৈলজার জননীও হাসিয়া উঠিলেন। শৈলজা অপ্রতিভ হইয়া জননীর অঞ্চলে মুখ লুকাইল। তাহার জননী মনোরমাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া শৈল জননীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া জননীকে নিবারণ করিবার জন্য তাহার সুকোমল হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। জননী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "থাম্, থাম্, ও

কি করিস্ শৈল ?” তার পর মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “শৈল মুড়ি খেতে বড্ড ভাল বাসে। মামাবাড়ীতে মুড়ি খেতে পায় না ব'লে শৈল মামাবাড়ীর কত নিন্দে করে।” শৈল সেখানে আর থাকিতে পারিল না; সে তাড়াতাড়ি জননীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া আব্দারের স্বরে “যাও” এই কথাটি বলিয়া জননীর পৃষ্ঠে একটি ছোট কিল বসাইয়া দিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। জননী তিরস্কারসূচককণ্ঠে বলিলেন “শৈল, আবার দুষ্টুমি করছিস্; এখানে ব'স্; কোথায় ছুটে যাস্?” কিন্তু শৈল দ্রুতপদে তৎপূর্ব্বেই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

মনোরমা ও দত্তগৃহিনী উভয়েই অনেকক্ষণ হাসিলেন। তার পর দত্তজায়া মনোরমাকে বলিলেন “শৈলর এই নয় বছর যাচ্ছে; এখানে বন জঙ্গলের দেশে ভাল ছেলে পাওয়া যায় না; কোথায় যে শৈলকে দেব, তাই আমাদের ভাবনা হয়েছে। ওর মামারা সেইজন্য ওকে বৈদ্যবাটীতে নিয়ে গেছল। এখনও কোথাও কিছু ঠিক হয় নাই।” তার পর তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন “তুমি শৈলকে তোমার বউ কর না গো!” মনোরমা দত্তজায়ার কথা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন বটে; কিন্তু সহসা এই কথার কোনও একটা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলেন না; কিন্তু কিছু তো একটা উত্তর দেওয়া চাই, এই ভাবিয়া বলিলেন “সে তো ভাগ্যির কথা; অমন সুন্দর টুকটুকে বউ হ'লে তো আমি খুব খুসীই হই। কিন্তু নগিনের বয়স এই সতর বছর; উনি এত শীগ্গির কি তার বে' দেবেন?” তারপর মনোরমা বলিলেন “আচ্ছা, আমি তাঁকে বলব।”

ইহাঁরা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে গৃহপার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান হইতে সুরেন, নরু, শৈল একরাশি গ্যাঁদাফুল ও কয়েকটি গোলাপ ফুল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নরু আসিয়াই মাকে বলিল “মা, এই দ্যাখ, কত ফুল এনেছি। বড়দা' আমাদেরকে এই ফুলগুলি তুলে দিলে। আর এ-কে (শৈলকে দেখাইয়া) কত বড় একটা গোলাপ ফুল তুলে দিয়েছে, দ্যাখ।” এই বলিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

মনোরমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন “কে, নগিন ফুল তুলে দিয়েছে, না,কি? নগিন বুঝি বাগানে রয়েছে?” এই বলিয়া মনোরমা একটু মুচ্কে হাসিয়া ফেলিলেন। দত্তজায়াও মনোরমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দত্তজায়া মনোরমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই গ্রামবাসী তাঁহাদের পুরোহিতের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকেও নিমন্ত্রণ করিয়া সন্ধ্যার সময় নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রদেশপ্রবাসী পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইঁহাকে সকলে সাধারণতঃ “ভট্টাচার্য্য মহাশয়” বলিয়াই সম্বোধন করেন; সুতরাং আমরাও তাহাই করিব। নিকটবর্ত্তী চারি পাঁচটি গ্রামে ইঁহার যজমান আছে। শাস্ত্রে ইঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য থাকায়, মানভূম জেলার অনেক জমীদারের বাটীতেও ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে, এবং শ্রাদ্ধাদি বৃহৎ ক্রিয়া ও ব্যাপারে সর্ব্বদাই ইঁহার নিমন্ত্রণ হয়। বর্দ্ধমান জেলায় ইঁহার আদি বাস ছিল, পরে দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে তাড়িত হইয়া এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার দুই চারি ঘর কুটুম্ব এবং জ্ঞাতিও এই গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বসবাস করিয়াছেন। ইনি গৃহে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া কতিপয় ছাত্রকে শাস্ত্র অধ্যাপন করেন, এবং তাহাদের ভরণ-পোষণও করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন যজমানেরা ইঁহাকে কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। সেই ভূমির উপসত্ত্ব, জমীদারগণের নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি এবং পৌরোহিত্য-লব্ধ উপার্জ্জন দ্বারা ইনি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরনাথ, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শিবনাথ এবং কন্যাটির নাম সৌদামিনী। পুত্রেরাও পিতার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পৌরোহিত্য-কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া ইনি এখন আর কঠোর পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটীতে যে দুর্গোৎ-

সব হয়, তাহাতে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরনাথ পৌরোহিত্য করেন এবং ইনি তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠপুত্র শিবনাথ অন্য একটী গ্রামের দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণী, কতিপয় বৎসর হইল, পরলোকগমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার একটী বিধবা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ এবং অনূঢ়া কন্যা সৌদামিনী তাঁহার সংসারের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ঠাবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ; এই কারণে সৌদামিনীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইলেও, উপযুক্ত পাত্রাভাবে তিনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। সৌদামিনী পিতার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। সে বাল্মীকির মূল রামায়ণ এবং দুই একটী পুরাণ নিত্য পাঠ করিয়া থাকে, এবং প্রত্যহ শিব-পূজা না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করে না।

ক্ষেত্রনাথ সপরিবারে বল্লভপুরে আসিয়া বাস করিলে, সৌদামিনী মনোরমার সহিত পরিচিত হয়। সৌদামিনী এরূপ সুশীলা, সলজ্জা, মধুরস্বভাবা ও সুন্দরী যে, সে অল্পদিনের মধ্যেই মনোরমার প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়ে। সৌদামিনী আহারাদির পর প্রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্নসময়ে মনোরমাদের বাটীতে আসিয়া কখনও কোনও পুস্তক পাঠ করিত, কখনও গল্প করিত, এবং কখনও বা মনো-রমার গৃহকার্য্যে সহায়তা করিত। মনোরমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী দেখিতে ঠিক্ সৌদামিনীর মত। সেই কারণে, মনোরমা তাহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাহার ছেলেরাও তাহাকে মাসী-মা বলিয়া ডাকিত। এইরূপে সৌদামিনীর সহিত মনোরমার বিল-ক্ষণ সৌহার্দ্দ্য হয়। সৌদামিনীর অনন্যসাধারণ গুণা-বলীতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষেত্রনাথও তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন।

দত্ত-গৃহিণী যেদিন বল্লভপুরে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া-ছিলেন, তাহার পরদিন অপরাহ্নকালে, সৌদামিনী মনোরমাদের বাটী যাইতেছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, “কাছারী-বাড়ী” গ্রামের বহির্ভাগে একটী সুবৃহৎ উচ্চ প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। “কাছারী-বাড়ী” যাইবার জন্য একটী কাঁচা রাস্তা গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া ধান্য-ক্ষেত্রসমূহের ভিতর আঁকিয়া বাঁকিয়া উচ্চ-নীচ ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তাটির সংস্কার কখনও হয় নাই। রাস্তার মধ্যে কোথাও খাল, কোথাও গর্ত্ত। বর্ষাকালে সেই খাল ও গর্ত্ত সমূহে জল দাঁড়াইয়া থাকে, এবং অনেক স্থল গভীর কর্দ্দমেও পূর্ণ হয়। দুই তিন দিন পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হওয়ায়, রাস্তার মধ্যবর্ত্তী খাল ও গর্ত্ত-সমূহে জল দাঁড়াইয়াছে এবং অনেক স্থল কর্দ্দমেও পূর্ণ হইয়াছে। গতকল্য দত্ত-গৃহিণীর মুখে সৌদামিনী শুনিয়াছিল যে, তিনি মনোদিদিকেও (মনোরমাকে সৌদামিনী এই নামেই ডাকিত) নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং মনোদিদি তাঁহার ছেলেদের সহিত পূজার সময় তাঁহাদের বাটী যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সৌদামিনী আজ দুই তিন বৎসর দুর্গাপূজা দেখে নাই। যদি মনোদিদি মাধব-দত্ত মহাশয়ের বাটী যান, তাহা হইলে, সৌদামিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইবে। প্রধানতঃ এই কথা বলিবার জন্যই আজ সৌদামিনী “কাছারী-বাড়ী” যাইতেছে।

মধুর শরৎকাল; সুনীল আকাশ; সূর্য্যের তেজ অনেকটা ক্ষীণ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কনক-কিরণ-মালা পর্ব্বতগাত্রে, হরিৎ-ক্ষেত্রে ও বৃক্ষচূড়ে নিপতিত হইয়া এক অপার্থিব শোভার বিস্তার করিতেছে। ঝির্ ঝির্ করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র-সমূহে ধান্যের গাছগুলি বৃষ্টির জল পাইয়া সরস, সতেজ ও প্রফুল্ল হইয়াছে; তাহাদের মনোরম হরিৎ-শোভা নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। পথের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভীর জলাশয়গুলির নির্ম্মলজলে সুঁদি শালুক প্রভৃতি ফুল ফুটিয়াছে। কোথাও কুশ ও কাশ কুসুমিত হইয়া তাহাদের শুভ্র-শোভায় পথ আলোকিত করিতেছে। সৌদামিনী শারদ-প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে মনোদিদির গৃহাভিমুখে যাইতেছে। সম্মুখে পথের মাঝে একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত জল ও কর্দ্দমপূর্ণ। সৌদামিনী তাহা উত্তীর্ণ না হইয়া বামপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পথ ধরিয়া উচ্চ প্রান্তরের উপর উঠিল। এই প্রান্তরটি পার হইলেই কাছারী-বাটী। ক্ষেত্রনাথ এই প্রান্তরে অড়হর বপন করিয়াছিলেন।

অড়হরের গাছগুলি বৃষ্টির জলে সতেজ হইয়া বৈকালিক পবন-হিল্লোলে আনন্দে যেন নৃত্য করিতেছিল।

সৌদামিনী প্রান্তরের উপর উঠিয়া পথের পার্শ্বে কতিপয় স্থলপদ্ম-বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইল। সেই বৃক্ষগুলি এই সময়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। সৌদামিনী মনোদিদির ছেলেদের জন্য কয়েকটি স্থলপদ্ম তুলিতে ইচ্ছা করিয়া একটী বৃক্ষের শাখা আনত করিল, এবং বামহস্তে তাহা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক একটী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা অঞ্চলে রাখিতে লাগিল।

সেই সময়ে অনতিদূরে রাস্তার উপরে টুং টুং টুং করিয়া সহসা ঘণ্টাধ্বনি হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া সৌদামিনী রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, একজন সাহেব একটী সাইকেল-গাড়ীতে চড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে সেই দিকে আসিতেছেন। রাস্তার উপর দুই তিনটি গরু বসিয়া ছিল। তাহাদিগকে সরাইবার জন্যই তিনি ঘণ্টার শব্দ করিয়াছিলেন। গরুগুলি সাইকেল্ দেখিয়া ও ঘণ্টাশব্দে চকিত হইয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধান্যের ক্ষেত্রের দিকে পলায়ন করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সাহেব পথের মধ্যবর্ত্তী জলকর্দ্দমপূর্ণ সেই গর্ত্তের নিকট আসিয়া সহসা রুদ্ধগতি হইলেন ও সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সাহেব সুন্দর যুবাপুরুষ, তাঁহার পরিচ্ছদ সুন্দর ও পরিষ্কৃত; কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদের নিম্নভাগে কর্দ্দম ছিটাইয়া লাগিয়াছে। সাহেব বাম হস্তে সাইকেলটি ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন, পরে আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন "আরে, এই জলকাদাটাই পার হওয়া মুস্কিল দেখছি।" সৌদামিনী সাহেবের মুখে বাঙ্গলা কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে ভালরূপে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, আগন্তুক সাহেবী-পরিচ্ছদ-পরিহিত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। সৌদামিনীর মনে একটু সাহস হইল, আবার লজ্জাও উপস্থিত হইল। সে বামহস্ত দ্বারা স্থলপদ্মের যে শাখাটি ধরিয়া ছিল, সহসা তাহা ছাড়িয়া দিল। বৃক্ষশাখা সৌদামিনীর কোমল করপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া যেন উল্লাসের সহিত স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। শাখাসঞ্চালনের শব্দ হইবা মাত্র আগন্তুক সহসা সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্র আগন্তুক মনে করিলেন, পদ্মবনে যেন স্বয়ং পদ্মালয়া বিরাজিতা! এমন ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ, এমন মুখের গঠন, এমন চক্ষু, এমন নাসিকা, এমন অধরোষ্ঠ, এমন শ্রী তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই। আগন্তুক বিস্ময়ে অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ সৌদামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সৌদামিনীর চক্ষুও তাঁহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। আগন্তুককে তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সৌদামিনী লজ্জিতা হইল এবং চক্ষু আনত করিয়া সেই স্থান হইতে অপসৃত হইবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে আগন্তুক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ও গো, আপনি বল্‌তে পারেন, ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী কোন্ পথ দিয়ে যাওয়া যায়?" সৌদামিনীর একটু সাহস হইল। সে প্রথমে আগন্তুকের বাক্যের কোনও উত্তর প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; পরে কি যেন ভাবিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বলিল "আপনি ঐ রাস্তা দিয়েই যান।" সৌদামিনীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আগন্তুক চমৎকৃত হইলেন; পরে একটু হাসিয়া বলিলেন "এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, তা তো ঐ গ্রামের লোকের মুখেই শুনেছি। কিন্তু এখন এই জল কাদা ভেঙ্গে যাওয়াই তো মুস্কিল। ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী যাবার আর কোনও ভাল রাস্তা নাই কি?" সৌদামিনী আগন্তুকের সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিল এবং তাঁহার এই সামান্য সঙ্কট মোচন করাও কর্ত্তব্য মনে করিল। সে একটু হাসিয়া বলিল "আপনি ঐ পথে যদি যেতে না পারেন, তবে এই পথে আসুন।" এই বলিয়া সে স্থলপদ্মবনের পার্শ্বে প্রান্তরমধ্যস্থিত মানুষ চলিবার পথটি অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। আগন্তুক যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি সাইকেল্ সহ কোনও রূপে রাস্তা হইতে উচ্চ প্রান্তরের উপর উঠিলেন। তিনি উপরে উঠিবামাত্র, সৌদামিনী বলিল "আপনি এই সরু পথটি ধ'রে যান। ঐ বাড়ী।" যুবতী কে, তাহা আগন্তুক ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন না। আকার-প্রকারে তাঁহাকে উচ্চবংশসম্ভূতা বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু তিনি সধবা

কি কুমারী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মনে একটা ধাঁধা লাগিল। আগন্তুক যুবতীর সলজ্জ, সদয়, সাহসপূর্ণ অথচ নির্দ্দোষ ব্যবহারে এতই চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার যৎসামান্য পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ক্ষেত্রবাবু কি আপনার কেউ হন?" যুবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল "আমরা বামুন।" আগন্তুক যেন আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বটে, এখানে বামুনও আছে? কয় ঘর?" সৌদামিনী বলিল "চার ঘর।" আগন্তুক সহসা বলিয়া ফেলিলেন "তবে, আপনি বুঝি কুলীনের মেয়ে?" সৌদামিনী এই প্রশ্নে বিরক্তি ও লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া অধোবদন হইল। তাহার চক্ষু দুটী আগন্তুককে তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। আগন্তুক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আপনি আমায় ক্ষমা করুবেন। এদেশে বাঙ্গালী এত কম যে, আপনাকে সেই কারণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।" যুবতীকে শেষের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়া আগন্তুক যে ভাল কাজ করেন নাই, তাহা তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটি যেন সহসা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, সেখানে আর অধিকক্ষণ থাকা অনুচিত মনে করিয়া ও তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোনও রূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তিনি বাম হস্তে সাইকেলটি ধরিয়া যুবতীপ্রদর্শিত পথে গমন করিলেন।

আগন্তুক চলিয়া গেলে সৌদামিনী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। এই আগন্তুকটি কে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তিনি কেন তাহাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? সৌদামিনীর মনে বড় লজ্জা হইতে লাগিল। সে মনোরমাদের বাড়ী যাইবে কি না, তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল; এমন সময়ে গ্রামের এক দল বালক কোলাহল করিতে করিতে ছুটিয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। সাইকেলে চড়িয়া সাহেবকে আসিতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাহেব দ্রুত গতিতে তাহাদিগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আইসেন। বালকেরা রাস্তার মধ্যবর্ত্তী সেই জলপূর্ণ গর্ত্তের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং স্থলপদ্মবনে সৌদামিনীকে দেখিতে পাইয়া বলিল "বামুনপিসী, সাহেব কুনৃঠে গেল?"* সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "সাহেব খাল পার হ'য়ে চ'লে গেছে।" তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল "সাহেব কিস্‌তরে খালটো পার্‌হাইল?"† সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "সাহেব গাড়ীসুদ্ধ খাল ডিঙ্গিয়ে পার হ'য়ে গেল।" বালকেরা আরও বিস্মিত হইয়া বলিল "বামুনপিসী, তুই দেখলি?" সৌদামিনী হাসিয়া বলিল "হাঁ রে, দেখেছি বই কি?" তখন বালকেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল "কেমন কল দেখ্‌লি? সাহেবটো কলের গাড়ী লিয়ে হনুমানের মতন লাফাঁয়ে সাগর ডিঙ্গহাইল।"‡ তাহাদের কথা শুনিয়া সৌদামিনী উচ্চ হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিল না।

বালকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সৌদামিনীর মনের লজ্জা ও সঙ্কোচ সহসা তিরোহিত হইয়া গেল। সে অঞ্চলে স্থলপদ্মগুলি লইয়া মনোরমাদের গৃহে উপস্থিত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি ক্ষেত্রনাথের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সুরেন ও নরু তাঁহাকে দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গেল ও পিতাকে সংবাদ দিল। একজন সাহেব সাইকেলে চাপিয়া আসিয়াছেন, ইহা শুনিবামাত্র ক্ষেত্রনাথ মনে করিলেন, হয়ত ডেপুটী কমিশনার সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়া বল্লভপুরে আসিয়াছেন। সেই জন্য তিনি তাড়াতাড়ি একটা কোট গায়ে দিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, বন্ধু সতীশচন্দ্র! ক্ষেত্রনাথের আহ্লাদ ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি হাসিয়া বলিলেন "কে, সতীশভায়া না কি? আরে, এস এস। কোন খবর নেই, চিঠিপত্র নেই, হঠাৎ যে!"

---

* সাহেব কোথায় গেল?

† সাহেব কিরূপে খালটি পার হইল?

‡ সাহেব কলের গাড়ী নিয়ে হনুমানের মতন লাফিয়ে সাগর ডিঙ্গিয়ে পার হ'ল।

সতীশচন্দ্র সাইকেল্‌টি দেওয়ালের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া বলিলেন "কেন, তুমি আমার চিঠি পাও নাই? আমি পরশু যে তোমাকে চিঠি লিখেছি!"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, পরশু লিখেছ? সেই চিঠি হয়ত আরও দুই দিন পরে পাব। এখান থেকে পোষ্ট আফিস্ দুই ক্রোশ দূরে। পিয়ন মশাই অবসরমত যখন এই দিকে আস্‌বেন, তখন চিঠিখানা দিয়ে যাবেন। আরে ভাই, সভ্য জগতের সঙ্গে কি আমার আর কোনও সহযোগ আছে? আমি একদম্ বনবাসী হয়েছি। পথে আস্‌তে তো তোমার কোনও কষ্ট হয় নাই? আমাদের এই অঞ্চলের যে চমৎকার পথ!"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তা আমার পাণ্টলুন আর সাইকেল্‌টার দশা দেখেই কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছ। পথে যা কিছু কষ্ট হয়েছিল, তা তোমাদের এখানে এসেই দূর হ'য়ে গেছে।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "যাই হোক্, এখন তুমি পোষাকটা ছেড়ে ফেল। আমি একখানা কাপড় আনিয়ে দিচ্ছি। (সুরেন্দ্র সেখানে দাঁড়াইয়া আগন্তুককে দেখিতেছিল; ক্ষেত্রনাথ তাহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে কাপড় আনিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে গেল)। "তার পর? সঙ্গে তোমার কেউ নাই না কি?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আছে; চাকর আর চাপরাসী। তারা একখানা গরুর গাড়ীতে আমার বিছানা ও ট্রঙ্ক নিয়ে আস্‌ছে। আস্‌তে বোধ হয় সন্ধ্যা হ'বে। যে রাস্তা! তোমার এখানেই পূজার ছুটীর কয়টা দিন কাটানো যাবে, এই মনে ক'রে একেবারে পাকা বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌ছি। বুঝ্‌লে ভায়া?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "এ তো ভারি আনন্দের কথা। এখন তুমি পোষাক ছেড়ে ফেল। সুরেন, কাপড়-খানা দে।"

সুরেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরু দক্ষিণ হস্তে এক গাড়ু জল, বামস্কন্ধে একটী ধোয়া তোয়ালে, ও বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্যে একটী প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, এবং গাড়ু ও তোয়ালে সতীশবাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল "আপনি হাতমুখ ধোন।"

নরুর আতিথেয়তা ও সাহস দেখিয়া সতীশচন্দ্র অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ক্ষেত্তর, এই দুটী তোমার ছেলে না কি? বাঃ, চমৎকার তো! কি গো, তোমার নাম কি?"

নরু বলিল "আমার নাম? আমার নাম ছিরি নরেন্দ্র নাথ দত্ত।" তার পর হাসিয়া বলিল "সকলে আমাকে নরু বলে।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "সকলে তোমায় নরু বলে? তোমার বেশ নাম তো? ছিরি নরেন্দ্র নাথ দত্ত'র চেয়ে তোমার নরু নামটাই ভাল।

নরু সেই কথা শুনিয়া আহ্লাদে দন্তবিকাশ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নরুর সাহস ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সে স্থলপদ্মটি তাহার দক্ষিণ হস্তে লইয়া বলিল "এই দেখুন, কেমন ফুল!"

সতীশ বলিলেন "বাঃ, চমৎকার ফুল তো? এটির নাম, স্থলপদ্ম?"

নরু বলিল "হাঁ, মাসীমা এটি আমায় দিয়েছে। মাসীমা অনেক ফুল এনেছে। আপনি একটা নেবেন?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তোমার মাসীমার কাছে থেকে আমার জন্য একটা ফুল নিয়ে এস।"

নরু আহ্লাদসহকারে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গেল।

নরুর সরলতা ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্র পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "তোমাদের এখানে স্থলপদ্মের খুব ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "হাঁ, এই সময়টা স্থলপদ্মেরই সময়। কিন্তু এখানে চমৎকার বনফুলও আছে।"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কই, বনফুল তো কোথাও নজরে পড়্‌ল না। কিন্তু স্থলপদ্ম দেখ্‌লাম। তোমাদের এখানের স্থলপদ্মের একটা অদ্ভুত গুণ! স্থলপদ্ম কথা কয়, পথ দেখিয়ে দেয়, পথিকের প্রাণ রক্ষা করে!"

ক্ষেত্রনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি যে হঠাৎ কবি হ'য়ে প'ড়্‌লে দেখ্‌ছি। ব্যাপার কি?"

সতীশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন "কবিত্ব নয়, ভায়া,

সত্য কথা। ব্যাপার সব পরে বল্‌ব। আগে একটু ঠাণ্ডা হই।"

নরু অন্তঃপুর হইতে বিষণ্ণবদনে বহির্গত হইয়া সতীশ বাবুকে বলিল "মাসীমা ফুল দিলে না। আমায় মুখ ক'রে বল্‌লে, ভারি দুষ্টু ছেলে।"

সতীশচন্দ্র নরুর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ভারি অন্যায়! তোমার মাসীমা কেন তোমায় দুষ্টু ছেলে বল্‌লেন? তোমার মাসীমাই ভারি দুষ্টু; কেমন নরু?"

সতীশবাবুর কথা শুনিয়া নরুর মুখে আর হাসি ধরিল না। সে সতীশবাবুর কথায় সায় দিয়া বলিল "থামুন তো, আমি মাসীমাকে ব'লে আস্‌ছি।" এই কথা বলিয়া সে অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ্‌ছি, নরুর মাসীমা এইবার আমার উপর চট্‌বেন। তোমার শ্যালীও বুঝি এখানে আছেন?"

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন "না, আমার শ্যালী নয়। আমার স্ত্রীর পাতানো সম্বন্ধ। ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যা,—এখানকার পুরোহিতের মেয়ে।"

সতীশচন্দ্র বিস্ময়ে বলিলেন "ওঃ, ইনিই বুঝি তবে সেই অনূঢ়া কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমাদের এই অঞ্চলের সচল স্থলপদ্ম?"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "কি রকম? তুমি এঁকে জান্‌লে কিরূপে?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "তা পরে ব'ল্‌ব। এখন বড় খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার যোগাড় কর।"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "গৃহিণী নিশ্চিন্ত নেই। তোমার খাবার প্রস্তুত হ'ল ব'লে। সুরেনকে বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়েছি। সে এখনি এসে খবর দেবে। আমিও দেখে আস্‌ছি।" এই বলিয়া ক্ষেত্রনাথ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

যথাসময়ে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের অন্তঃপুরের অদ্ভুত প্রাচীর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং যথেষ্ট আমোদও অনুভব করিলেন। সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ক্ষেত্তর, সত্যসত্যই অরণ্যবাস কর্‌বার ক্ষমতা তোমার আছে। এই অদ্ভুত প্রাচীর-গঠনই তার প্রমাণ।" ক্ষেত্রনাথ সেই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "ভায়া, আগামী বৎসর পূজার ছুটীর সময় যখন এখানে আস্‌বে, তখন দস্তরমত পাকা প্রাচীর দেখ্‌তে পাবে।"

অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় সতীশচন্দ্রের জন্য আহার-সামগ্রী সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। গরম গরম লুচি, মোহনভোগ, বেগুনভাজা, ফুলকপির ডাল্‌না, বিলাতী কুমড়োর ছক্কা, একটী পাত্রে উপাদেয় ক্ষীর ও টাট্‌কা ছানার সন্দেশ—এই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য দেখিয়া সতীশচন্দ্র বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। ক্ষেত্র-নাথ কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলেন "তুমি অসঙ্কোচে খাও; সব জিনিষই বাড়ীতে তৈয়ের হয়েছে। কেবল বেগুন ভাজা ও তরকারী তোমার জন্য সদু ঠাক্‌রুণ তৈয়ের করেছেন।"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "তোমার গৃহিণী তরকারী প্রস্তুত ক'রে দিলেও আমার কোনও আপত্তি ছিল না।" তৎপরে ঈষৎ অনুচ্চকণ্ঠে ক্ষেত্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সদু ঠাকুরুণটি কে?"

ক্ষেত্রনাথও অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন "শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী; নরুর মাসীমাতা; আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের কন্যা।"

সতীশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন "ওঃ. তোমাদের গ্রামের সেই সচল স্থলপদ্মটি!"

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন "তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব?"

সতীশচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা, আমি তোমায় ব'লে দিচ্ছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "ক্ষেত্তর, এই ফুলকপি তোমার বাগানের বুঝি? ওহে, তুমি অরণ্যে বাস ক'রেও সহরের লোকের চেয়ে সুখে আছ, দেখ্‌ছি। পুরুলিয়াতে এখনও ফুলকপি আমদানী হয় নাই। বাঃ, কপির ডাল্‌নাটি চমৎকার হয়েছে তো?"

ক্ষেত্রনাথ অতর্কিত ভাবে থাকায় সতীশচন্দ্রের চাতুর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সরলভাবে বলিলেন "তবে তোমায় আর একটু ডাল্‌না দিয়ে যাক্‌।"

সহসা রন্ধনশালায় ভূষণশিঞ্জন, পদশব্দ ও বস্ত্রের খস্‌খস্ শব্দ শ্রুত হইল। সৌদামিনী কপির ডাল্‌না লইয়া সতীশচন্দ্রের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, তাহাও বুঝা গেল! পরিশেষে মনোরমার বাক্যেই হউক, আর যে কারণেই হউক, সৌদামিনী সাহসে বুক বাঁধিয়া একটী পাত্রে কপির ডাল্‌না লইয়া বাহির হইল। সেই সময়ে সতীশচন্দ্র ঘাড় তুলিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লইলেন।

সৌদামিনী তরকারী পরিবেষণ করিয়া চলিয়া গেলে, সতীশচন্দ্র গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন "ভায়া, ইনিই তোমাদের গ্রামের সেই সচল স্থলপদ্ম।"

ক্ষেত্রনাথ সতীশের চতুরতা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন "তুমি ভয়ানক দুষ্টু! এত চতুরতা শিখেছ?"

সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "নরুর মাসী-মা বলেই এতখানি সাহস কর্‌লাম! মাপ কর্‌বে।"

(ক্রমশ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

শীতসহিষ্ণুতা

বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীরা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা আর যে বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, কষ্টসহিষ্ণুতায় যে নিকৃষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি এখনও পল্লীগ্রামের লোকে সহরের লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টসহিষ্ণু। আমাদের গ্রামের একটী লোক, এখন তাহার বয়স সত্তরের উপর, বহুদিন হইল কৃষ্ণনগর হইতে মোকদ্দমা সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ছাতাটী এক দোকানে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কাজেই ছাতাটী আনিবার জন্য পুনরায় কৃষ্ণনগরের দিকে রওনা হইলেন এবং গভীর রাত্রে উহা সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। সমস্ত দিনে তাঁহাকে সেদিন প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ হাঁটিতে হইয়াছিল। এরূপ ঘটনা তখন নিত্যই ঘটিত। এখন কিন্তু অনেকের কাছে দিনে পঞ্চাশ মাইল পথ হাঁটাটা বিশ্বাসজনক ঘটনা বলিয়াই মনে হয় না। শুধু পথশ্রমের কথা নহে, এখনকার লোকে তেমন উপবাস করিতে পারেনা, রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না, শীতও সহ্য করিতে পারেনা।

শীতের ভয়ে বাঙ্গালীরা (শুধু বাঙ্গালীই বা কেন. ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা) একেবারে জুজু। শীতকালে তাঁবুতে কিয়ৎকাল বাস করিতে গেলেই ত মহা বিপদ। সেবার দিল্লীদরবারের সময় তাঁবুতে বাস করিয়া অনেক এদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন; দুই একজন মারাও গিয়াছিলেন শুনিয়াছি। সাহেবরা কিন্তু তাঁবুতে বাস করাকে একদম ভয়ই করেনা, এবং স্থানটী মনোরম হইলে উহারা তাহা পছন্দই করে। শীতকালে আমি অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাটীতে দেখিয়াছি যে হিমের ভয়ে সন্ধ্যা না হইতে হইতেই, গৃহের জানলাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং দরজা জানলার ফাটলগুলিকে উত্তমরূপে নেকড়া বা তুলা দ্বারা বন্ধ করা হয়। বাহির হইতে এরূপ ঘরে ঢুকিলে একটা কুৎসিত গন্ধ পাওয়া যায়; গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কিন্তু তাহার মধ্যে নির্ব্বিকার ভাবে বাস করে। এরূপ লোকে যখন কোন কারণে বাহিরে হিমের ভিতর আইসে তখন তাহাদের সাজের ঘটা দেখিলে হাস্য সংবরণ করা দুরূহ।

তবে শরীরটাকে যে একবারেই মোমের পুতুলের মত করা ভাল যে শরীর দুইক্রোশ পথ চলিলেই মচকাইয়া যায়, একটু রোদ লাগিলেই কাহিল হইয়া পড়ে, বৃষ্টিতে গলিয়া যায় কিম্বা শীতে জমিয়া যায়, সেরূপ শরীর কিছু পূর্ব্বে শ্লাঘার বিষয় হইলেও, এক্ষণে বোধ হয় আর সেরূপ কেহ মনে করেনা। সাহিত্যে নূতন করিয়া সুদৃঢ় শরীরের প্রশংসা করা হইয়াছে। বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণীর শিক্ষা তাহার নিদর্শন। সাহিত্যে যে আদর্শ গঠিত হইয়াছে ক্রমশঃ তাহা লোকমধ্যেও প্রচারিত হইতেছে।

লোকমতের এরূপ পরিবর্ত্তন একটী প্রধান শুভলক্ষণ। মানুষে চিরকালই Hypnotism, Suggestion বা বশীকরণ বিদ্যার দাস। Suggestion বা আভাষ দ্বারা মানুষের যে শারীরিক যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার গতিও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা বর্ত্তমান কালের শারীরবিধানবিৎগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট স্বীয় শারীরবিধান-

শাস্ত্রে ঐরূপ একটী দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। আমরা যদি নিজেদের মনকে সতেজ রাখিতে পারি তাহা হইলে অনেক শারীরিক ও মানসিক বিপদ হইতে নিস্তার পাইব। অর্থাৎ শীতাতপ সহ্য করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাবিতে শিখিতে হইবে যে শীতাতপে আমাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না—আমাদের শরীর বেশ দৃঢ় ও সবল হইয়াছে।

তদ্ব্যতীত আর কতকগুলি নিয়ম বা উপায় আছে; সেগুলি অবলম্বন করিলে অনেক সহজে শীতাতপ প্রভৃতি সহ্য করা যায়। ইংরাজদিগের সাধারণ লোকেও এরূপ বিষয়ের আলোচনা করে এবং অনেকে এতৎসম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারও করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও এসম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমি এই প্রবন্ধে শীত সহ্য করিবার যে-সকল উপায় আছে তাহার আলোচনা করিব।

(১ম) পরিচ্ছদের সাহায্যে যে শীত নিবারণ করা যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রচুর শীত-বস্ত্র এবিষয়ের বিশেষ সহায়ক। যেখানে বহুসংখ্যক দ্রব্য লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে সেখানে লেপ বা কম্বল বা শালকে থলির মত করিয়া সেলাই করিয়া তন্মধ্যে শরীর প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া এবং মাথায় একটা গরম কাপড় জড়াইয়া মাঠের ঘাসের উপর শুইয়া থাকা চলে। ভ্রমণকারী প্রভৃতির মধ্যে এরূপ থলির প্রচলন বেশী। ভিজা জমির উপর শুইতে বাধ্য হইতে হইলে তদুপরি একটা অয়েল-ক্লথের তেলা দিকটা পাতিয়া তাহার উপর শুইতে হয়। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণকে অনেক সময় কাদার উপর এইরূপ ভাবে শুইয়া থাকিতে হয়।

(২য়) অগ্নির তাপের সাহায্যে শীতের কষ্ট দূর হয় তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। নেপোলিয়নের সৈন্যগণ রুশিয়ার দারুণ শীতে, খোলা মাঠে আগুন জ্বালিয়া উহার চারিধারে, আগুনের দিকে পা রাখিয়া নিদ্রা যাইত। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীগণ ভ্রমণের সময় তাহাদের সেই সময়কার আড্ডার নিকট অগ্নি রাখিয়া দেয়। উহাতে শীতের সহিত, অন্যান্য জন্তুর ভয়ও নিবারিত হয়। যুদ্ধ-কালে সৈনিকগণ খড়ের গাদা, শুষ্ক ঘাসের স্তূপ, সারের স্তূপ প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীত হইতে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করে।

(৩য়) প্রচুর ভোজনের দ্বারাও শীত নিবারণ করা যায়। আমরা—বাঙ্গালীরা এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিনা। আমরা যেসকল খাদ্য খাই তাহার অল্প অংশ শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য ব্যয়িত হয় এবং অধিকাংশ ভাগই শরীরের ভিতর তাপ উৎপাদন করে। গ্রীষ্মকালে অধিক ভোজন অপ্রয়োজন, কারণ, তখন শরীরের তাপ অধিক ক্ষয় হয় না। শীতকালে কিন্তু শরীরের তাপ অধিক ক্ষয় হয়। এজন্য তৎকালে তাপোৎপাদক পদার্থ অধিক পরিমাণে ভোজন করা সঙ্গত। গ্রীষ্মকালে গুরু-ভোজন করিলে শরীর-যন্ত্রকে অত্যধিক মাত্রায় তাপ শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য গুরুপরিশ্রম করিয়া বিকল হইতে হয়। শীতকালে কিন্তু গুরুভোজন একান্ত প্রয়োজন।

তৈলময় পদার্থ ও প্রটীন (Protein) বা ডিম্বের শ্বেতাংশ সদৃশ পদার্থের, তাপ উৎপাদন করিবার শক্তি অন্য খাদ্যের অপেক্ষা অধিক। এজন্য শীতের সময় প্রচুর ঘৃত, চর্ব্বি, তৈল ও মাংস প্রভৃতি ভোজন হিতকর। গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে লোকে নিদারুণ শীতের সময় প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি ভোজন করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও শীতের সময় খোলা মাঠে বা তাঁবুতে বাস করিতে হইলে, প্রচুর পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। লুচি, পোলাও, খিচুড়ী ও মাংস এই সময়ে বিশেষ উপকারী। আর্থিক কারণ বশতঃ যাঁহারা লুচি, পোলাও বা মাংস প্রভৃতি মূল্যবান খাদ্য ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহা-দের পক্ষে খিচুড়ী ব্যবহারে প্রায় একইরূপ ফল দিবে। খিচুড়ীর খরচ ভাতের অপেক্ষা বেশী নহে। ভাত গ্রীষ্ম-কালের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য কিন্তু শীতের পক্ষে উহা উপযোগী নহে।

(৪র্থ) জলসংযম শীত নিবারণের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। এটী আমার বিবেচনায় একটী নূতন উপায়। এসম্বন্ধে আমি অনেক পরীক্ষা করিয়াছি ও ভাবিয়াছি। বিষয়টী নূতন বলিয়া এতৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।
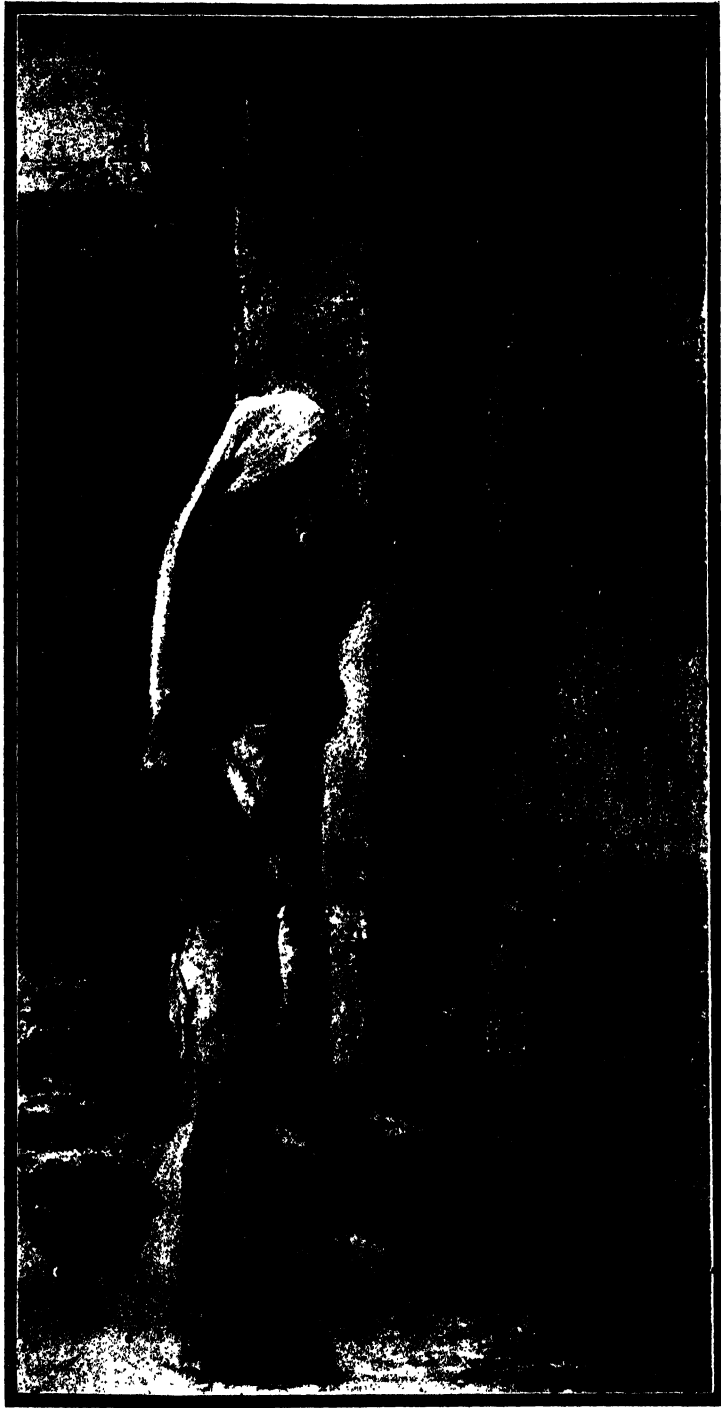
দেবদ্বারে।

(শ্রীযামিনীরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে।)

খাদ্য ও পরিধেয় প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত না থাকা সত্ত্বেও মানুষের যে শীত-সহিষ্ণুতা অনেক বেশী হইতে পারে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ডারউইন এক অসভ্য জাতীয়া স্ত্রীলোককে নগ্নদেহে সন্তান লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তখন খুব শীতল বায়ু বহিতেছিল অথচ উহাতে তাহাদের যে কোনও কষ্ট হইতেছিল এমন বোধ হয় নাই। এদেশের অনেক সন্ন্যাসী শীতাতপসহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। ভাস্করানন্দস্বামী নিদারুণ শীতের সময়ও নগ্নদেহে শীতল পাথরের উপর পড়িয়া থাকিতে পারিতেন। তাহাদের এই শীত সহ্য করিবার শক্তি কি প্রকারে আসিয়াছে?

শারীরবিধান-শাস্ত্র দেখাইয়াছে যে মানুষের শরীরের তাপসাম্য রাখিবার ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। অতি উত্তপ্ত গৃহে মানুষের দেহে তাপমান যন্ত্র দিলে যে তাপ দেখা যাইবে, অতি শীতল গৃহেও সেই তাপ দেখা যাইবে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে আমাদের শরীরকে থার্ম্মোমিটার যন্ত্র দ্বারা দেখিলে তাপ-পরিমাণ প্রায় ৯৮ ডিগ্রি দেখাইবে। শীত কিম্বা গ্রীষ্মের দিনে উহার কোনও প্রভেদ হইবেনা।

শরীর দ্বিবিধ উপায়ে এই তাপসাম্য রক্ষা করে। যখন খুব শীত পড়িয়াছে তখন শরীর, হয় দেহের মধ্যে অধিক পরিমাণ তাপ সৃষ্টি করে, নয় ত দেহ হইতে যাহাতে খুব কম পরিমাণ তাপ বাহির হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করে।

শারীরবিধান-শাস্ত্র যাঁহারা সামান্যরূপ মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে শরীরগঠনকারী কোষগুলির (cells), বিশেষতঃ মাংসকোষগুলির (muscle cells), মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কার্য্য করিবার সময় কিয়ৎ পরিমাণ তাপ উদ্ভূত হয়। এই তাপ রক্তে সংক্রমিত হইয়া শারীরিক তাপ সৃষ্টি করে। খুব শীতের সময় কোষগুলি অধিক মাত্রায় তাপ সৃষ্টি করিয়া শরীর রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে। খুব বেশী শীত পাইলে লোকে হী হী করিয়া কাঁপিতে থাকে। ঐ কম্পন মাংসপেশী সমূহের অসংযত সঙ্কোচন ও প্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শীতের সময় শারীরিক পরিশ্রম করিলে—খানিকটা ছুটাছুটী করিলে শরীর যে বেশ গরম হয় তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। খুব বেশী পরিশ্রম করিলে গ্রীষ্মকালের মত ঘর্ম্ম হইতে থাকে। আমরা শীতকালে খুব গরম কাপড় চোপড় গায়ে চাপাইয়াও শীত অনুভব করি, অথচ ঝি চাকরেরা অতি সামান্য মাত্র কাপড় গায়ে দিয়া শীতকাল কাটাইয়া দেয়। উহারা যে আমাদের অপেক্ষা শীতজনিত ব্যাধি প্রভৃতিতে অধিক ভুগে এমন নহে। তাহাদের শীত অনায়াসে সহ্য হইবার কারণ এই যে তাহারা যে-সকল কার্য্যে ব্যাপৃত তাহার অধিকাংশই মাংশপেশী সমূহের কার্য্য। তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত চলিতে হইতেছে, ঘুরিতে হইতেছে, হাত পা নাড়িতে হইতেছে। এই-সকল কার্য্যের ফলে প্রতিনিয়ত তাপ উদ্ভূত হইতেছে; উহাই তাহাদের শরীরকে উত্তপ্ত রাখে। শিক্ষিত বাঙ্গালী যে ইংরাজের মত শীত সহ্য করিতে পারে না তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে ইংরাজের অভ্যাসগুলি কিছু active বা মাংশপেশীর শ্রমজনক, আর শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভ্যাস প্রায়ই তদ্বিপরীত। বাঙ্গালী চুপচাপ সমস্তদিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া হয় পড়াশুনা করিবে নয় ত বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিবে। ইংরাজ কিন্তু ঐরূপভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিবে না, সে ঐ সময়ের মধ্যে নানা ছুতায় অন্ততঃ দশবার ঘুরিয়া আসিবে। কাজেই ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যখন উহাদের একের দেহে মাংসপেশীগুলির আলস্যের ফলে অতি অল্পমাত্র তাপই উদ্ভূত হইতেছে, সেই সময়ে অন্যের চলাফেরার দরুণ তাহার দেহমধ্যে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হইবে।

তবে ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতির দৃষ্টান্তে ইহা বুঝা যায় চুপচাপ বসিয়া থাকিয়াও শরীরকে শীতসহ করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শরীরের মধ্যে খাদ্যের দ্বারা বা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন তাপের মাত্রা কম হয়, কাজেই যাহাতে শরীর হইতে অধিক পরিমাণ তাপ বাহির হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃতির এ বিষয়েরও ব্যবস্থা আছে। রক্ত তাপ বহন করিয়া থাকে। চর্ম্মই বাহ্যজগতের সহিত সংস্রবে আসে।

চর্ম্ম যখন কোনও শীতল পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন ঐ পদার্থ চর্ম্মের তাপ কিয়ৎপরিমাণে অপহরণ করে। যখন চারিদিকের বায়ুমণ্ডল শীতল, তখন চর্ম্ম হইতে অনেক তাপ বিকিরিত হইয়া বাহিরে যায়। চর্ম্ম এবং চতুর্দ্দিকস্থ বস্তুসমূহের তাপবৈষম্যও যত অধিক, শরীর হইতে তাপের অপচয়ও তত বেশী। যদি চর্ম্মে তত তাপ না থাকে কিম্বা চতুর্দ্দিকের বস্তুনিচয় অপেক্ষাকৃত অধিকতর তাপযুক্ত হয়, তাহা হইলে শরীর হইতে তাপের অপচয় অধিক হইবে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রক্তই তাপের বাহক। অতএব চর্ম্মে যদি কোনও কারণে রক্তের ন্যূনতা ঘটে তবে চর্ম্ম হইতে অধিক তাপের অপচয় ঘটিবে না।

চর্ম্মস্থ রক্তবাহী নলগুলি (শরীরের প্রায় অন্যান্য অংশেরও) এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে ভিন্ন কারণে উহাদের ব্যাস হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে। অর্থাৎ উক্ত নলগুলির রক্তধারণ করিবার ক্ষমতা অল্প বা অধিক হইতে পারে। নলগুলি যখন সঙ্কুচিত হয় তখন চর্ম্মে অল্প রক্ত ধরে এবং নলগুলি যখন প্রসারিত হয় তখন চর্ম্মে অধিক রক্ত ধরে। গ্রীষ্মের দিনে নদী বা পুষ্করিণীতে ঘণ্টা দুই সাঁতারের পর উঠিলে দেখা যায় যে চর্ম্মের বর্ণ সম্পূর্ণরূপ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে; হাতপায়ের আঙ্গুলগুলি রক্তহীন ও উহাদের চামড়া নানাস্থানে চোপসাইয়া গিয়াছে। উহার কারণ এই যে জলের শৈত্যের সংস্পর্শে চর্ম্মস্থিত নলগুলি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে; চর্ম্মে এক্ষণে অতি অল্পমাত্রই রক্ত আছে; চর্ম্মস্থ অধিকাংশ রক্ত শরীরের অভ্যন্তরস্থ অন্য রক্তবাহী নলগুলির মধ্যে গিয়া জমিয়াছে। চর্ম্মে এক্ষণে রক্ত কম থাকার দরুণ, শীতলজলের সংস্পর্শে শরীরের তাপ অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া যাইতে পারে না। শুধু যে শীতল জলের সংস্পর্শেই ঐরূপ হয় তাহা নহে, শীতল বায়ুর সংস্পর্শেও চর্ম্মের রক্তবাহী নলগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; এইরূপে শরীর হইতে অধিক তাপ ক্ষয় হইতে পারে না।

শীতকালে ঐ জন্য চর্ম্মের বর্ণ ঈষৎ ফ্যাকাসে থাকে; তখন উহাতে অধিক রক্ত থাকে না। কিন্তু তখন খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম করিলেই শরীরে অধিক তাপ জমে; ও সেই তাপ বাহির করিয়া দিবার জন্য ত্বকের দিকে রক্তের গতি হয় এবং রক্তাধিক্য বশতঃ উহা বেশ লাল হইয়া উঠে। এই কারণেই শীতকালে অল্প পরিশ্রমের পর অনেক লোককে বেশ সুন্দর দেখায়।

শরীরে তাপের আধিক্য হইলে ত্বকের দিকে রক্তের গতি হয়; ত্বক তখন উষ্ণ থাকে ও উহা হইতে তাপ শীঘ্র শীঘ্র বিকিরিত হইয়া যায়। কিন্তু তাপের পরিমাণ যখন অত্যন্ত অধিক হয় তখন আর ঐ উপায়ে সানায় না। তখন চর্ম্মস্থ ঘর্ম্মনির্ম্মাণকারী যন্ত্রগুলি বিপুল বেগে কার্য্য করিতে থাকে ও প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শরীর আর্দ্র হইয়া পড়ে। ঘর্ম্ম যখন শরীর হইতে উপিয়া যায় অর্থাৎ উহা যখন বাষ্পীভূত হয়, তখন উহা শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণ তাপ অপহরণ করে ও শরীর শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে।

অতএব শরীরের তাপের অপচয় বন্ধ করিতে হইলে যাহাতে অধিক ঘর্ম্ম নিঃসরণ না হয় কিম্বা ত্বকের দিকে রক্তের অবিরাম গতি না হয় অর্থাৎ যাহাতে ত্বকের রক্তবাহী নলগুলি সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের তর্কপ্রণালী যথার্থ হইলে ভাস্করানন্দস্বামীর বা ডারউইন-দৃষ্ট রমণীর ত্বকস্থিত রক্তবাহী নলগুলি নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকিত। কি উপায়ে ত্বকস্থ নলগুলি এরূপ অবস্থায় রাখা যায়?

শারীরবিধানশাস্ত্রের একটী স্থূল কথা এই যে শরীরের অভ্যন্তরস্থ রক্তের আয়তন সকল সময়েই সমান থাকে। অধিক জল খাইলে, জল রক্তকে তরল করিয়া উহার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। রক্ত এই জলকে শরীর হইতে যে-কোনও উপায়ে বাহির করিয়া দিবে। ঘর্ম্মের সহিত, মূত্রের সহিত, এবং প্রশ্বাসের সহিত শরীরস্থ জল বাহির হইয়া যায়। কাহারও ঘর্ম্মের সহিত অধিক জল নিঃসৃত হইতে পারে, কাহারও মূত্রের সহিত, কাহারও প্রশ্বাসের সহিত অধিক জল নিঃসৃত হইতে পারে। প্রায়শঃ দেখা যায় শীতের দিনে, যখন চর্ম্মের রক্তবাহী নলগুলি সঙ্কুচিত থাকে, তখন মূত্রের সহিত অধিক জল নিঃসৃত হয়। কিন্তু জলের মাত্রা শরীরে অধিক হইলে

কেবলমাত্র মূত্রযন্ত্র সমস্ত জল বাহির করিয়া দিতে পারিবে না, তখন ত্বককেও তাহার সাহায্য করিতে হইবে।

উপরের অত কথা বলিবার অর্থ এই যে শরীরে জলাধিক্য হইলে শরীর হইতে ঘর্ম্ম মূত্র প্রভৃতি নিঃসৃত পদার্থের (excretion) মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। শরীরে জলাধিক্য হয়, অধিক জল খাইলে বা অধিক জলযুক্ত খাদ্য খাইলে।

একটু বিচার করিলে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে ঘর্ম্ম মূত্রাদি শরীর হইতে বাহির হইবার কালে শরীরের তাপ অপহরণ করে। শরীরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে জলের তাপপরিমাণ মাত্র ১৫°C ছিল, তাহা ঘর্ম্ম বা মূত্রের আকারে শরীর হইতে যখন বাহির হয় তখন উহার তাপপরিমাণ ৪০°C হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান যাঁহারা সামান্য মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন যে একই পরিমাণ জল যদি শরীর হইতে মূত্রের আকারে বাহির না হইয়া ঘর্ম্মের আকারে বাহির হয়, তবে উহা অধিকতর পরিমাণ তাপ দেহ হইতে অপহরণ করিবে। মূত্র একবারেই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, ঘর্ম্ম কিন্তু শরীরে লিপ্ত থাকিয়া উহা হইতে উপিয়া যাইবার সময় প্রচুর তাপ হরণ করে। প্রশ্বাসের সহিত যে জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া যায় তাহাও শরীর হইতে প্রচুর তাপ অপহরণ করে।

অতএব শরীরের তাপক্ষয় নিবারণের একটী উপায় হইতেছে শরীর হইতে যাহাতে অধিক মাত্রায় জল ঘর্ম্ম এবং প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া না যায়। এবং উহার একটী উপায় হইতেছে—অধিক জল পান না করা এবং অধিক জলযুক্ত খাদ্য আহার না করা।

বাঙ্গালীর ভাতে ও ঝোলে এবং তাহারা যে প্রকারে ডাল প্রস্তুত করে উহাতে, প্রচুর পরিমাণ জল থাকে। রুটী, লুচি, পাঁউরুটি প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম জল থাকে।

যাহারা প্রচুর আহার করে ও হজম করিতে পারে তাহাদের পক্ষে প্রচুর জলপানে কোন ক্ষতি নাই। কারণ ঘর্ম্মের দ্বারা তাহাদের যে তাপ অপচয় হইবে আহারের দ্বারা তাহা পোষাইয়া যাইবে। বরং তাহাদিগের পক্ষে প্রচুর জলপান অত্যাবশ্যক। অধিক খাদ্য (বিশেষতঃ মাংসাদি খাদ্য) শরীরের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া নানাবিধ দূষিত পদার্থের সৃষ্টি করে; সেগুলিকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রচুর জলপানের আবশ্যক। কিন্তু আমরা এক্ষণে প্রচুর বা পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে কিরূপে শীত হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তাহারই আলোচনা করিতেছি। এপক্ষে জলসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিয়ম। উদরে খাদ্য থাকিলে জলপানে দোষ নাই, কিন্তু খালিপেটে জলপান সমূহ অনিষ্টকর; উহা মানুষকে শীত-অসহিষ্ণু করিয়া তুলে।

ক্ষুধার সময় আহার করাই শ্রেষ্ঠ বিধান। জল পানের দ্বারা উদর পূরণের চেষ্টা বৃথা। অথচ অনেক দরিদ্রকে তাহাই করিতে হয়। ক্ষুধায় আহার না জুটিলে জল পান খুব কম মাত্রায়ই উচিত, অধিক মাত্রায় নহে।

আমার জলসংযম সম্বন্ধীয় মত কিছুকাল হইতে প্রচার করিয়া আসিতেছি। আমার এক ডাক্তার বন্ধু একদিন বলিলেন "আপনার ও মত ভুল। ষ্টেটসম্যানে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; বিলাতের এক বড় ডাক্তার বলিয়াছেন প্রচুর জল পান অত্যন্ত হিতকর, উহা না করায় অনেক রোগ হইতেছে।" আমি তাঁহাকে বলিলাম "আমিও কয়েক বর্ষ হইল এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম যে প্রচুর জল পান করিলে রক্তের দূষিত পদার্থসকল ধৌত হইয়া বাহির হইয়া রক্ত সাফ হয়। রক্ত সাফ করিবার অভিপ্রায়ে আমি প্রচুর জল পান আরম্ভ করিলাম, শেষে সর্দ্দি কাশীতে কিছুকাল কষ্ট পাইয়া এবং উদরী হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া ঐ মত পরিত্যাগ করিলাম। তদবধি আমার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে বিলাত ও বঙ্গদেশ এক স্থান নহে এবং বিলাতের সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিচারে এ দেশে প্রয়োগ করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে।" এখন বুঝিতেছি যে বিলাত শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার লোকেরা স্বভাবতঃই অতি অল্প মাত্র জল পান করিয়া থাকে। আর সেখানকার লোকেরা ভয়ঙ্কর মাত্রায় মাংস খায়। মাংস শরীরের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া ইউরিক এসিড প্রভৃতি দূষিত পদার্থ সৃষ্টি করে। ঐসকল

দুষিত পদার্থ বিদুরিত করিবার জন্য প্রচুর জল পানের আবশ্যক। বঙ্গদেশের লোকেরা কিন্তু অতি অল্পই প্রোটীন বা ডিম্বের শ্বেতাংশ সদৃশ খাদ্য ব্যবহার করে ; কাজেই তাহাদের শরীরে অধিক Purin Base জমে না। কাজেই তাহাদের রক্ত সাফের জন্য প্রচুর জল পানের আবশ্যক নাই। এই গরম দেশে স্বভাবতই তাহারা অত্যধিক মাত্রায় জলপান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই।

উপরে আমি deductive প্রণালীর তর্ক দ্বারা শারীর-বিধান-শাস্ত্রের কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হইতে শীত-সহিষ্ণু হইতে গেলে জলসংযমের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছি। অভিজ্ঞতার দ্বারাও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রমাণগুলিরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

(১) শীতপ্রধান দেশের লোকেরা খুব কম জল খায়।

(২) আমরাও গ্রীষ্মকালে যে পরিমাণ জল খাই শীতকালে তাহার তুলনায় অতি কম জল খাই।

(৩) আমি ও আমার পরামর্শানুযায়ী আরও কতিপয় ব্যক্তি জল কম খাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত সকল কথাগুলিই সত্য। *

(৪) শারীরবিধানশাস্ত্রের পরীক্ষার জন্য যেসকল প্রাণীকে উপবাসী রাখা যায় তাহারা অতি কম জল খায়।

সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য যেরূপ ভাবে জল-সংযম করিলে শীত-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায় তাহার কয়েকটী নিয়ম দিতেছি :—

(১) সাধারণ বাঙ্গালীরা অত্যন্ত অধিক জল খায়। তাহাদিগকে যদি উহার মাত্রা সিকি পরিমাণ কমাইয়া দিতে বলা হয় তাহা হইলে কোনও ক্ষতি হইবে না বরং কিছু লাভই হইবে। সংক্রামক-রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা কমিবে ও শীততাপসহিষ্ণুতা বাড়িবে।

(২) সাধারণ লোকের প্রথম তৃষ্ণার সময় জল না খাইলে ক্ষতি নাই। প্রথম খানিকটা তৃষ্ণায় কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঐ কষ্ট বাড়িতে থাকে না, উহা ক্রমশঃ একে-বারে কমিয়া যায়। এইরূপ তৃষ্ণাহীন অবস্থা অনেকক্ষণ থাকে। ইহার পর পুনরায় যখন নূতন করিয়া তৃষ্ণা আসে তখন জলপান একান্ত আবশ্যক।

(৩) উদরে যখন খাদ্য থাকে তখন জল পান করায় অপকার নাই। কিন্তু শূন্য উদরে জলপান অহিত করে। এজন্য প্রাতঃকালে খালি পেটে জল খাইতে লোকে নিষেধ করে। কিন্তু কোন কোন লোকের প্রাতঃকালেও উদরের সমস্ত খাদ্য জীর্ণ ও দেহমধ্যে গৃহীত হয় না। তাহারা উদরকে সঙ্কুচিত করিলে সেখানে খাদ্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে, সেখানে এক প্রকার বেদনা অনুভব করে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে শূন্য-উদরে জল পান হিতকর।

(৪) জল একেবারে চোঁ চোঁ করিয়া পান করা অপেক্ষা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পান করা ভাল। প্রথমোক্ত প্রণালীতে তৃষ্ণা নিবারণের পূর্ব্বেই প্রচুর জল উদরস্থ হইতে পারে। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুদিগের নানা গোলযোগে জলসংযম করিতে হইত। "এখানকার জল খাইতে নাই, কাপড় চোপড় ছাড়িতে হইবে" ইত্যাদি নানা ভজকটর মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে অনেক স্থলে তৃষ্ণা-সত্ত্বেও জল না খাইয়া থাকিতে হইত। ঐরূপ ব্যবস্থার সহিত তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক শীতাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতার কোনও সম্পর্ক আছে কি না তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য।

(৫) যাহারা কাজের লোক তাহারা কাজের সময় অধিক জল খায় না ; অপেক্ষাকৃত অলস লোকেই পুনঃ পুনঃ জল খাইয়া থাকে। শ্রমজীবীরা পরিশ্রমের কালে জল খায় না। ফুটবল খেলিবার সময়েও কেহ জল খায় না। আমি দেখিয়াছি এক সাহেব ও এক বাঙ্গালী একই-বিধ কার্য্যে গ্রীষ্মকালে প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপৃত ছিলেন। বাঙ্গালীটী আমাকে বলিতেছিলেন "সাহেব জল না খাইয়া আছে কেমন করিয়া, আমি এরই মধ্যে ছয় গ্লাস জল খাইয়াছি।"

(৬) আমি কোন দিন ভিজিলে বা অন্য কোনও

* আমার জলোপবাস সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি আমার "ম্যালেরিয়া" নামক পুস্তিকায় সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি বলিয়া তাহা এস্থলে পুনঃ লিখিত হইল না।

রূপে ঠাণ্ডা লাগিলে, অত্যাচারের মাত্রানুসারে অল্প বা সম্পূর্ণরূপে জলোপবাস করিয়া থাকি। আমি উহাতে খুব ভাল ফল পাইয়াছি এবং যে কয়জন আমার কথানুযায়ী পরীক্ষা করিয়াছে তাহারা সকলেই ভাল ফল পাইয়াছে।

(৭) খুব পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত দেহের উপর শীতল বাতাস লাগিলে অনেকের ঠাণ্ডা লাগে। এজন্য তাহারা তখন প্রচুর বস্ত্রাদি চাপা দিয়া থাকে। উহার পরিবর্ত্তে ঘণ্টা দুই জল না খাইলে একইরূপ ফল লাভ হয়।

উপরোক্ত পরীক্ষাগুলিতে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কাশ্মীরের মুসলমানী শিল্প

১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনা অনুসারে কাশ্মীরের লোকসংখ্যা ১১, ৫৭, ৩৯৪। ইহার মধ্যে ১০, ৮৩, ৭৬৬ মুসলমান ও ৬০, ৬৮২ হিন্দু, আর ১২, ৬৩৭ জন শিখ। অপরিচ্ছন্নতা ছাড়া মুসলমানেরা নামে মাত্র মুসলমান। আচার ব্যবহার, আদব কায়দা প্রায় সবই তাহাদের হিন্দুদের মত। তাঁহাদের মসজিদের আকৃতিও অন্য দেশের মসজিদের আকার হইতে ভিন্ন ধরণের। এমন কি যেখানে হিন্দুর দেবালয় ঠিক সেখানেই মুসলমানের মসজিদ। তাহারা জন্মেও মক্কার কথা মুখে আনে কি না সন্দেহ। ঋষি, বাবা, পীরজাদা প্রভৃতিকেই তাহারা ভক্তি করে ও জিয়ারতে দেবতাকে পূজা করে। তাহাদের মধ্যে সেখ, সৈয়দ, পাঠান এই তিন প্রকার ভাগ দেখিতে

কাশ্মীরী গান ও নাচ ব্যবসায়ী।

কাশ্মীরী বেদিয়া।

পাওয়া যায়। সেখের সংখ্যাই বেশী আর সেখবংশীয়দের অধিকাংশই হিন্দুর বংশধর। ব্রাহ্মণদের মধ্যেকার কৌল, বট, আইতু, ঋষি, মন্ত, গণই প্রভৃতি ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেকার মাগ্‌রু, তন্ত্র, দর, ডাঙ্গার, রৈণা, রাঠোর, ঠাকুর, নায়েক প্রভৃতি উপাধি এখনও মুসলমানধর্ম্মী হিন্দুর বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কৃষিজীবী দুই প্রকার মুসলমান আছে। উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দংশে পাঠান উপনিবেশের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ড্রাংঘামের কাকিখেল আফ্রিদির বিষয় বেশ কৌতুহল-জনক। তাহারা তাহাদের প্রাচীন পাঠান আচার পদ্ধতি এখনও বজায় রাখিয়াছে ও পশ্‌তু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। নানারূপ বেশভূষা করিয়া ঢাল তলোয়ার লইয়া তাহারা বিচরণ করে। তাহাদের বিশ্বাস তাহাদের মত সাহসী, শক্তিসম্পন্ন জাতি আর এ জগতে নাই। বাস্তবিক যখন তাহারা রাগিয়া যায় তখন অতিশয় বুদ্ধিমান ও শক্তিসম্পন্ন লোকেরও তাহাদের সহিত পারা কঠিন। তাহারা হাঁটিয়া বনে যাইয়া তলোয়ার দিয়া, অথবা অশ্বারোহণে বর্শা লইয়া ভল্লুক শিকার করে। পূর্ব্বকালে কাশ্মীরের সৈন্যবিভাগে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে লওয়া হইত ; তাহার নিদর্শন-স্বরূপ এখনও তাহারা অনেক নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছে।

আর এক প্রকার কৃষিজীবী মুসলমান আছে, তাহাদের নাম ফকার—অর্থাৎ ব্যবসাদারী ভিক্ষুক। তাহাদের নিজেদের গ্রাম আছে, গ্রীষ্মকালে গ্রামে আসিয়া চাষ আবাদ করে, আবার শীতের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষায় বাহির হয়। নিজেদের এই ব্যবসার জন্য তাহারা কুণ্ঠিত তো নয়ই, বরং গর্ব্বিত, আর জনসাধারণও তাহাদিগকে অপছন্দ করে না। বেচনওয়াল নামক অপর একশ্রেণীর ভিক্ষাজীবী পরিবারের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি সম্পন্ন

কাশ্মীরের তাঁতি ও তাঁতগড়া
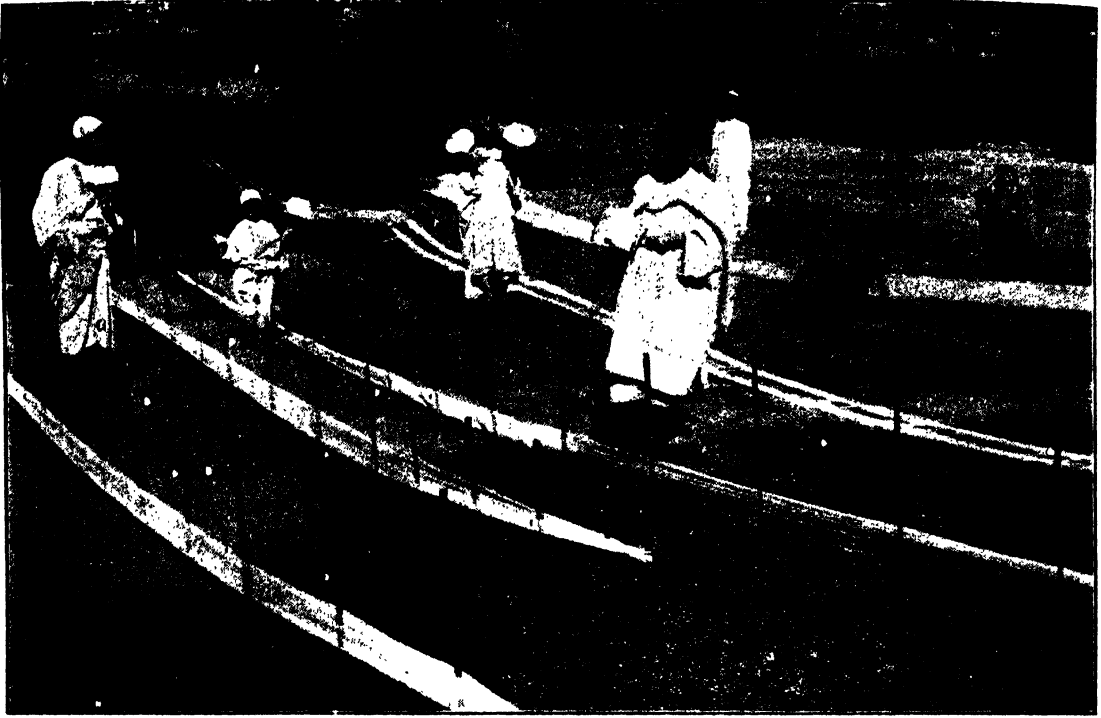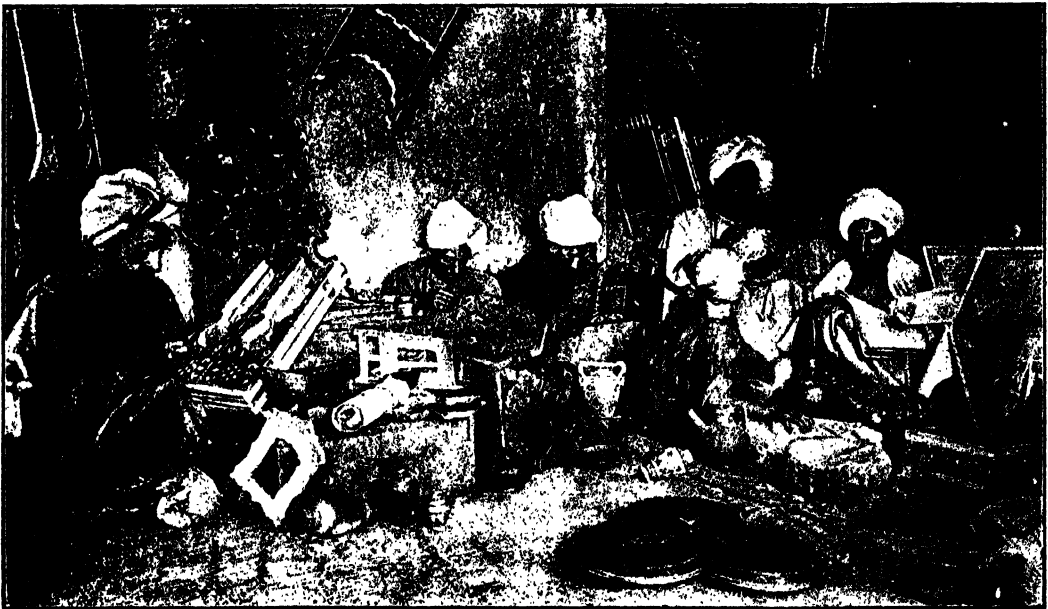
কাশ্মীরী কাগজীরা কাগজমণ্ড হইতে বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বিচিত্র বর্ণের নক্সা আঁকিতেছে।

কাশ্মীরী দর্জ্জি টেবিলক্লথের উপর কারুকার্য্য করিতেছে।

কাশ্মীরী দারুশিল্পের নমুনা।

হয়। এই বেচনওয়াল মুসলমান কাশ্মীর উপত্যকার প্রায় সব যায়গাতেই দেখা যায়।

পেশা হিসাবে সমস্ত মুসলমান সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে—জমিদার (কৃষিজীবী) ও তইফদার (শিল্পী)। তইফদার শ্রেণীর লোকেরাই বাজারের তরিতরকারির উদ্যানরক্ষক, রাখাল, মাঝি, মুচী, গ্রামের নীচকার্য্যের চাকর ইত্যাদি। জমিদার শ্রেণীর কেহই কখনও তইফদার শ্রেণীতে বিবাহ করে না। জমিদারদের

কাশ্মারী স্বর্ণকার।

মধ্যে ডুম, গালাওয়ান, বেতাল, ও ভাণ্ড, এই চারি শ্রেণী আছে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রয়োজনীয়তার হিসাবে ডুমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহারা তাহাদের বংশের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস দেয়। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি একজন হিন্দু রাজা ছিলেন; তাঁহার অনেক ছেলে ছিল; পুত্রের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ভয়ে তিনি তাহাদিগকে দেশময় ছড়াইয়া দেন। কিন্তু অনেকে বলেন যে, ইহারা প্রাচীন চক নামক দুর্দ্ধর্ষ হিন্দু পণ্ডিতদিগের বংশধর। এই পণ্ডিত শ্রেণী পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে জইন-উল-আবিদিনের সময় প্রবল হইয়া পড়ে। জইন ইহাদিগকে জোর করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন, কিন্তু পরবর্ত্তী দুর্ব্বল রাজাদের সময় পুনরায় আসিয়া তাহারা কাশ্মীরে প্রতিপত্তি করিয়া লয়। তাহারা সাহসী ও অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ছিল। গ্রামের চৌকীদারী ইহারাই করিয়া থাকে। পূর্ব্বে তাহারা সরকারের লভ্য শস্যাংশের রক্ষক ছিল। তাহারা সরকারী কার্য্য করিবার সময় খুব বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করে, কিন্তু অন্য সময় তাহারা এরূপ অবিশ্বাসী ও দুর্দ্দান্ত যে তাহা কহতব্য নহে। সুবিধা পাইলেই তাহারা গ্রামে উৎপাত করিবেই।

গালাওয়ানেরা অশ্বরক্ষক। অত্যাচারিতা ও চঞ্চলতাপ্রিয়তা তাহাদের রক্তের প্রতিকণিকার সঙ্গে যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমে তাহারা কেবল ঘোড়াই চরাইত। কিন্তু যখন দেখিল যে ঘোড়া চুরিতেও লাভ আছে তখন চুরি করিয়া নিজেদের ঘোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল ও একটী অপকর্ম্মী জাতিরূপে পরিণত হইল। শিখরাজত্বের সময় (১৮১৯-৪৬) তাহারা জনসাধারণের ভীতির কারণ ছিল। এই-সকল দস্যুদিগের সর্দ্দার নামে খ্যাত খায়রা গালাওয়ানকে শিখ শাসনকর্ত্তা মিয়ানসিংহ হত্যা করেন। বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গুলাব সিংহ ইহাদিগকে তাড়াইয়া বুঞ্জিতে লইয়া যান। তথাপি কাশ্মীরে ইহাদের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট।

বেতালেরা বেদিয়া জাতীয়। তাহারা সাধারণতঃ চামড়া ট্যান ও মুচীর কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে, উচ্চ ও নীচ। এক জাতীয়েরা মৃত জন্তুর মাংস খায় না, আর এক জাতীয়েরা খায়। সেইজন্য প্রথম জাতীয়দিগকে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া গণ্য করা হয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে করা হয় না। হিন্দুর বংশধর বলিয়া কাশ্মীরী মুসলমানদিগের মধ্যেও "অস্পৃশ্যতা"র সংস্কার এখনও রহিয়াছে। তাহারা তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে মসজিদে প্রবেশ করিতে দেয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য বেদিয়াদের মত কাশ্মীরী বেদিয়ারাও

কাশ্মীরী সেকরারা রূপার বাসনে কারুকার্য্য করিতেছে।

কাশ্মীরী চা-দানী।
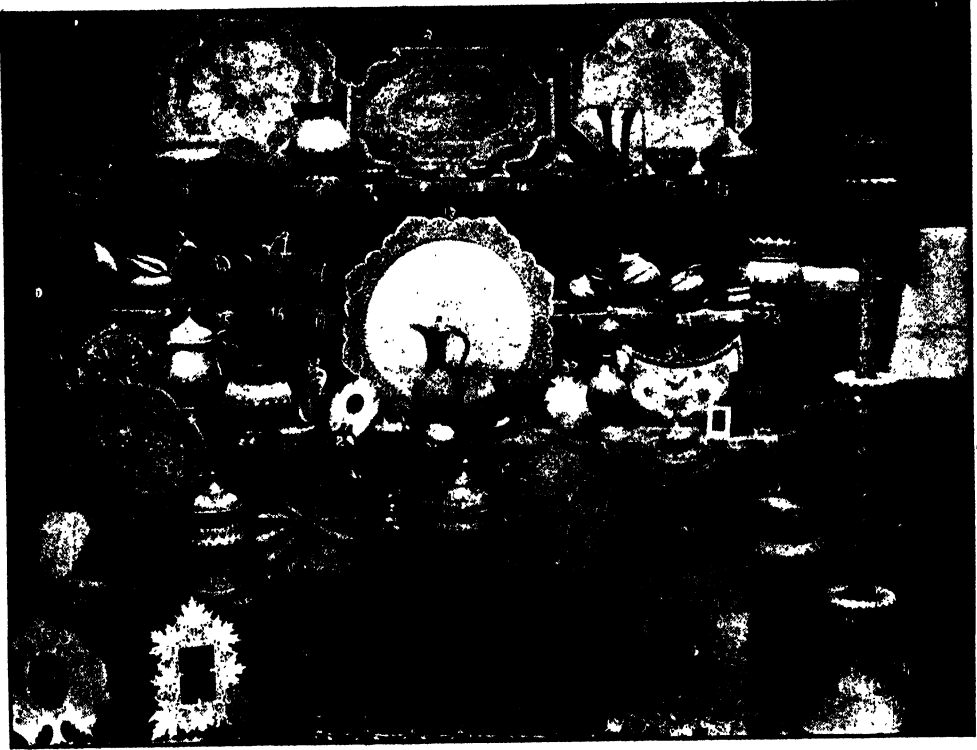
কাশ্মীরের ধাতু শিল্প।

ভবঘুরে জাতি। দেশে সব যায়গাতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও গ্রামের বাহিরে, কখনও ঢালু পুর্ব্বতগাত্রে, মাটীর দেওয়াল ও সমতল-ছাদ-দেওয়া ক্ষুদ্র-দরজা-বিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা কিছুদিনের জন্য থাকে। চামড়া তৈয়ারীই তাহাদের প্রধান কাজ। উচ্চ জাতীয়েরা বুট, সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে, আর নিম্নশ্রেণীয়েরা নানারূপ ব্যবসায় করিয়া থাকে। কাশ্মীরের সকলের চেয়ে নীচ জাতীয়দের অবস্থা আমাদের দেশের চণ্ডাল বা দাক্ষিণাত্যের পারিয়াদের মত। চামড়া ও খড় একসঙ্গে জড়াইয়া তাহারা বারকোষ, থালা, কুলা ইত্যাদি প্রস্তুত করে এবং ঝাড়ুদারের কাজও করিয়া থাকে। কৃষক হিসাবে তাহারা গৃহপালিত পশ্বাদি পালন করে, ও দস্যু হিসাবে হাঁস মুরগী চুরি করিয়া বেড়ায়। এত কাজ যাহাদের তাহারা কি বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া একযায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে?

তাহাদের স্ত্রীলোকেরা এই অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও অনুপম সুন্দরী হইয়া থাকে। তাহাদের দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত সুদৃঢ় সুঠাম দেহের সৌন্দর্য্য ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদের মধ্যেও সুন্দর দেখায়। কখনও তাহারা নগরে নগরে যাইয়া নাচ গান করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে।

বৎসরে তাহারা একবার লালবাবার মন্দিরে সমবেত হয়। শ্রীনগরের সহরতলীতে ডালহ্রদের নিকটে এই লালবাবার মন্দির। এইখানেই তাহাদের জাতীয় জীবনের সকল বিষয় স্থিরীকৃত হয় এবং বিবাদ বিতণ্ডার সালিসী মীমাংসা ও বিচার হয়। ইহারা অনেকটা সাধারণতন্ত্রীদের মত।

ভাণ্ড ভাটেরা গায়কশ্রেণী। তাহারা নাচিয়া গাহিয়া কবিতা গান ইত্যাদি রচনা করিয়া ও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহারা বেশ সুন্দর অভিনয় করিতে
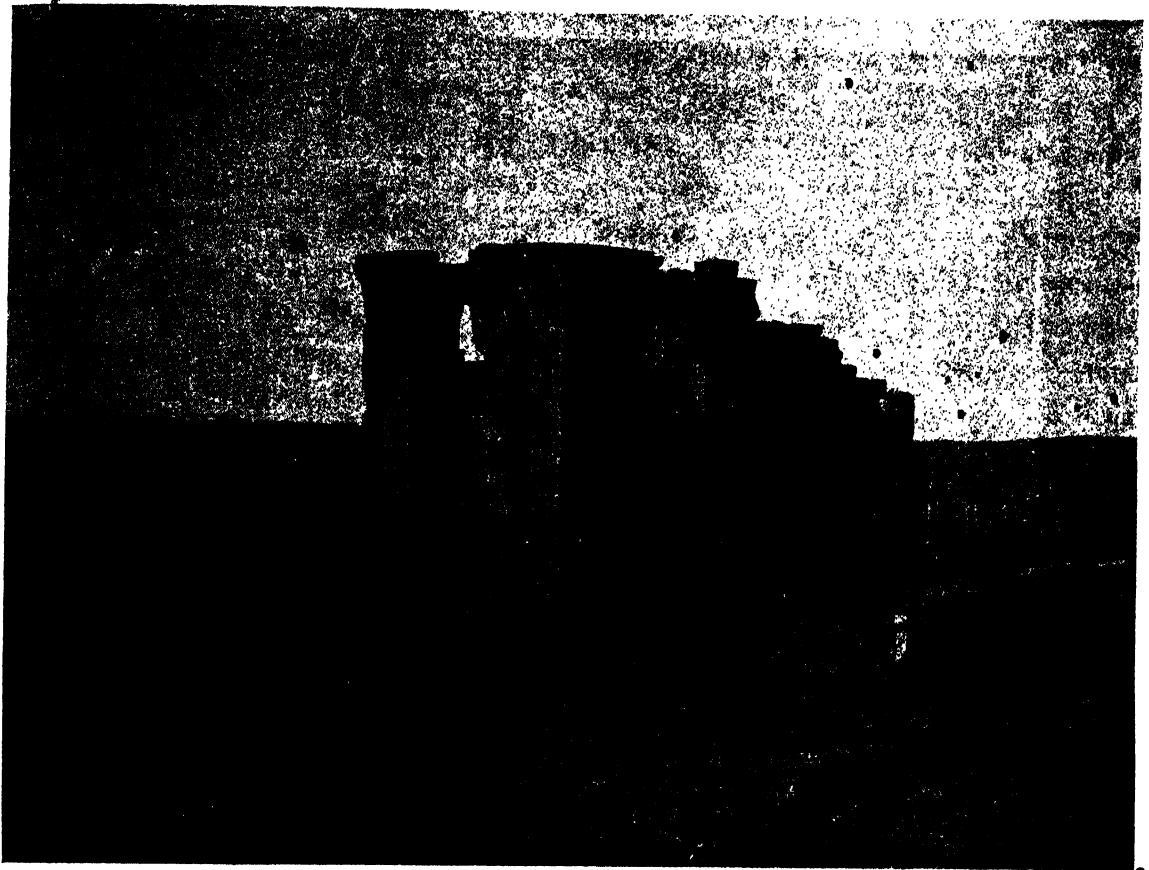
মার্ত্তণ্ড-মন্দির।

পারে এবং না ভাবিয়া ক্রমাগত রচনা করিয়া যাইতে পারে। কেহ তাহাদের কিছু করিলে তাহারা তাহার বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদ করিয়া গানরচনা করিয়া থাকে।

হাঁজীরা কাশ্মীরে সবচেয়ে নামজাদা। হাঁজী মাঝিরা বলে যে তাহারা হিন্দু বৈশ্যশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বৈশ্য বলিয়া তাহাদের বংশগর্ব্ব আছে। নৌকার সর্দ্দার মাঝি অন্যান্য দাঁড়ি মাঝির উপর বিরক্ত হইলে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গালি দেয়।

হাঁজীদের মধ্যে ডাঙ্গার, দর ও মাল প্রধান পদবী। তাহাদের মধ্যে ব্যবসায় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ আছে। যেমন ;—

১। বেম্ব- হাঁজী—ইহাদিগকে ডালহ্রদের উদ্ভচর বলিলেই হয়। বস্তুতঃ তাহারা উদ্যানরক্ষক। হ্রদে যাহারা ভাসন্ত বাগানে শাকসবজী উৎপাদন করে ইহারা সেই জাতীয়।

২। গাড়ী হাঁজী—ইহারা উলার হ্রদ হইতে পানিফল সিঙ্গারা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

৩। মাঝি হাঁজীরা প্রায় ৮০০মণ পর্য্যন্ত মাল নৌকায় বোঝাই করিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া বেড়ায়।

৪। ডাংগ হাঁজী—ইহারা ডোঙ্গা রাখে, ইহাতে করিয়া আরোহীদিগকে পারাপার করে।

৫। গাদ হাঁজী—ইহারা মাছ ধরে।

৬। হাক হাঁজী—নদীতে যে-সকল কাঠ ভাসিয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিয়া বেচিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

এই ছয় শ্রেণীর হাঁজী হইতে, বিশেষতঃ চতুর্থ শ্রেণী ডাংগহাঁজীর মধ্য হইতে, নামজাদা অসৎকর্ম্মে প্রসিদ্ধ নৌকাওয়ালা হাঁজী শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা মজাদার গল্প বলিতে খুব মজবুত।

নাঙ্গারেরা গ্রাম্য শিল্পী। ইহারা চাকরের, নাপিতের, রুটীওয়ালার, কসাইয়ের, ধোপার, কলুর, গোয়ালার, নস্য-প্রস্তুত-কারকের, তুলা-ধুনুরীর ও মুটের কাজ করে। গ্রামের ছুতারের, মিস্ত্রীর, কুমারের, তাঁতীর, কামারের, দর্জ্জীর, ও রংসাজের কাজই ইহারা বেশী করে। অনেক যায়গাতেই এখন ইহারা এই সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে মন দিতেছে। কেবল তাহাদের মধ্যের তাঁতিরাই কৃষিকার্য্যে মন দিতে পারিতেছে না। তাহারা বলে তাঁতির কাজ করিতে করিতে তাহাদের হাত পা সব নরম হইয়া গিয়াছে, কৃষিকার্য্যরূপ শক্তকাজ এখন আর তাহারা করিতে পারে না।

সহরে ছুতার, রাজমিস্ত্রী, দর্জ্জির খুব প্রতিপত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকের আর এই সুশিল্পের উপর তেমন আগ্রহ নাই। যাঁহারা দুদিনের জন্য কেবল বেড়াইতে যান তাঁহারাই যাহা উৎসাহ দেন। দারু-শিল্পেরও অবনতি ঘটিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে বস্ত্র-শিল্পেরও অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আর তাহারা সেই বিশ্ববিশ্রুত কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত করে না, কেবল ভ্রমণকারীদের জন্য টেবিলক্লথ মশারী ইত্যাদি দুচারখানা খেলো অথচ রংচঙা জিনিস তৈয়ারী করে। পশমী কম্বল যথেষ্ট পরিমাণে বুনে। বিলাতী পশম দিয়া পট্টু ইত্যাদি করাই তাহাদের এখন প্রধান ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শালের শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১০০০ টাকার শাল রপ্তানী হইয়াছে। অথচ কিছুকাল পূর্ব্বে এক-একখানা শালই হাজার টাকার বেশি দামে বিকাইত। এখন বেশী মূল্যে শাল প্রস্তুত হয় না, সৌখীন ক্রেতা নাই। তাহা কেবল দর্শকের নয়ন পরিতৃপ্তির জন্য প্রাচীন শিল্পগরিমার ভগ্নস্তূপরূপে কলাভবনে স্থান পাইয়াছে।

ধাতুশিল্প, দারুশিল্প ইত্যাদি এখনও উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে পারে। কাশ্মীরের সকল প্রকার কারুকার্য্য একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

কাশ্মীর বহুকাল ধরিয়া বস্ত্র, দারু, ধাতু প্রভৃতি বহু শিল্পে যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিরালা উপত্যকায় কিরূপে এত প্রকার শিল্পের আবির্ভাব হইল? কাশ্মীরই বা কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাল, ধাতু ও দারু শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল? ইহার কারণ ভূস্বর্গের অষ্টম শতাব্দীর রাজা ললিতাদিত্য। ইনি মধ্য এশিয়ার রাজাদিগকে ও কান্যকুব্জাধিপতি প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট যশোবর্ম্মণকে আক্রমণ করেন। দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া তাঁহার অভিযান চলে। সমতল ভারত-ক্ষেত্র ও মধ্য এশিয়া হইতে তিনি বহুবিধ শিল্প ও বহু শিল্পী কাশ্মীরে আনয়ন করেন। তিনি পরিহাসপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া সৌন্দর্য্যে গরীয়ান করিয়া তুলিবার জন্য বহুশিল্পী নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমানে-ধ্বংস-করকবলিত মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরও পুনর্নির্ম্মাণ করান। চীনরাজের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। বোধ হয় চীন হইতেও তিনি শিল্পী আনাইয়াছিলেন। তাঁহার বংশ-ধরেরাও অনেকে দেশের শিল্পের উৎসাহ দান করেন। তারপর মুসলমান শিল্পের সহিত ইহাদের কিছু সংশ্রব ঘটে। এইরূপে বিবিধ শিল্প জাগিয়া উঠে।

এখন শিল্পের শোচনীয় অবস্থা। রাজপক্ষও উদাসীন। ইহাদের উন্নতি করিতে হইলে রাজার ও দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। তবেই দেশ গরীয়ান ও ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, লোকেও খাইয়া পরিয়া বাঁচিবে।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

কালিদাসের সীতা

(সমালোচনা)

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী প্রণীত, কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ৫৪+৶৹ পৃষ্ঠা, মূল্য অনুল্লিখিত।

"অনেক স্থলে কালিদাস মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নূতনচিত্রসমা-বেশে বিচিত্রতর, মৌলিক ও অপূর্ব্ব ভাবোন্মেষে নবীনতর, অপূর্ব্ব রসাবতারণায় মধুরতর ও নূতন রশ্মিপাতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। ... (রঘুবংশের) কালিদাসবর্ণিত সীতাচরিত্র এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (৩ পৃঃ)।" গ্রন্থকার নিজ সন্দর্ভে এই

কথাটিই আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের নামেও প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, কালিদাস সীতার চরিত্র কিরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন গ্রন্থকার তাহাই সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। রামের জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত রামায়ণ-বৃত্তান্ত কালিদাস ১০ম হইতে ১৫শ সর্গে সংক্ষেপে অথচ অতি-রমণীয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে এক-একটি শ্লোকের মধ্যে তুলিকার এক-একটি টানে এরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহাতেই হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। রামায়ণ-কথা তাঁহাকে অনেক সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে; না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না; কিন্তু তাহা হইলেও স্থানে স্থানে এক-একটি বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া বিস্তৃত বর্ণনা করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রসঙ্গত অন্যান্য সর্গে সীতার কিছু কিছু উল্লেখ থাকিলেও চতুর্দ্দশ সর্গের নির্ব্বাসন প্রসঙ্গের কয়েকটি শ্লোকেই তাঁহার চরিত্র-অঙ্কনে কালিদাসের যাহা কিছু করিবার ছিল, করিয়াছেন। কালিদাসের সীতাকে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইলে এই স্থানেই বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করা উচিত। গ্রন্থকার কিন্তু এই স্থলেই সংক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়াছে, বর্ণনীয় বিষয়ও বড় শোকাবহ, সুতরাং সংক্ষেপে সে বিষয়ের অবতারণা করিতেছি" (৪২ পৃঃ)। তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য আমরা আরো অধিক স্থান দিতে ন্যায়ত সম্মত ছিলাম। 'শোকাবহ' বিষয়ের যদি যথাযথভাবে তিনি অবতারণা করিতেন তাহা হইলে সেই শোকের মধ্যে তিনিও আনন্দিত হইতেন, আর আমরাও তাহা হইতে বঞ্চিত হইতাম না। তিনি নিশ্চয়ই জানেন—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্,
কিঞ্চ তেষু যথা দুঃখং ন কোঽপি স্যাৎ তদুন্মুখঃ।"

তিনি চতুর্থ হইতে ১০ম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয় পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারিতেন, কালিদাসের সীতাকে বুঝিবার জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না।

ত্রয়োদশ সর্গে রামচন্দ্র সীতাকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া বিস্তৃতভাবে সমুদ্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সীতা তাঁহার একটি কথায়ও উত্তর প্রদান করেন নাই। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"ইহার দুইটি কারণ থাকা সম্ভব। (১) হইতে পারে যে, প্রতীচ্য মহাকাব্যের নায়কদের মত সংস্কৃত মহাকাব্যের বর্ণনায় বিভিন্ন বক্তা আসিয়া কাব্যরস বিচ্ছিন্ন করে না। (২) আবার ইহা হওয়াও সঙ্গত যে, সচরাচর প্রণয়-সম্ভাষণে স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা অপ্রগল্ভ। এই মহাকবির আর একটি অতুলনীয় কাব্যে এ কথার প্রমাণ আছে। তিনি মেঘদূতে বিরহী যক্ষের বিরহদুঃখ প্রতিশ্লোকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সে সব স্থলে যক্ষপত্নীর মুখে কবি ত একটি শ্লোকও দেন নাই।" (১৪ পৃঃ)। প্রথম কারণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—বিভিন্ন বক্তা আসিলেই যে, রসচ্ছেদ হয় তাহা নহে। বিশেষত প্রকৃত স্থলে মধ্যে মধ্যে সীতার প্রত্যুত্তর রসের পরিপুষ্টিই করিত। সংস্কৃত মহাকাব্যের বর্ণনায় যে, বিভিন্ন বক্তা থাকেন না, তাহাও ত দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণের উল্লেখে মেঘদূতের দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। মেঘদূতে যক্ষপত্নীর উত্তর দিবার অবসর কোথায়? কোথা হইতে কাহাকে কি উত্তর দেওয়া তাঁহার সম্ভব ছিল? স্ত্রীজাতি প্রণয়সম্ভাষণে কোন কোন স্থলে পুরুষের অপেক্ষা অপ্রগল্ভ হইলেও একবারে যে নীরব হইয়া থাকিবে তাহার কারণ নাই। উত্তরচরিতে চিত্রদর্শন প্রসঙ্গে সীতার এক-একটি ছোট-ছোট উত্তর কত সুন্দর। তাহাতে কি সীতাকে প্রগল্ভা মনে হয়?

গ্রন্থকার ত্রয়োদশ সর্গের সুপ্রসিদ্ধ সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা প্রায় সমস্তই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া পাঠকগণের নিকট কবির কবিত্বকে ধরিয়া দিয়াছেন। ইহাতে স্থানে স্থানে অতি গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হয়। এই সর্গের একাদশ শ্লোকটী এই :—

"মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভিঃ
ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোল-সংসর্পিতয়া য এষাং
ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্।"

গ্রন্থকার ইহার ভাবানুবাদ করিয়া দিয়াছেন :—

"কোথায় মাতঙ্গাকার নক্রেরা সমুদ্রফেনধবলিতকপোল হইয়া শোভা পাইতেছে—যেন তাহাদের কর্ণে চামর শোভিত হইল।" মূল কবিতার সৌন্দর্য্য ইহাতে একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহা মার্জ্জনীয় নহে। এই কবিতার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাও ভাল লাগিল না।

রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গের নাম "সীতা পরিত্যাগ।" কালিদাসের সীতা এই স্থানেই পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থকার এই স্থলের সমালোচনায় বলিতেছেন—"কিন্তু রঘুবংশের পুষ্পকরথ বর্ণনার পর সীতানির্ব্বাসনের রসবৈপরীত্য সমধিক বিস্ময়কর।" (২৯ পৃঃ)। কেন? আমরা ত কোন অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাইতেছি না। উত্তরচরিতের আলেখ্যদর্শনের সহিত রঘুবংশের এই স্থানের সুবহু সাদৃশ্য আছে। এই অংশে উভয় কাব্যের রামচরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন (৩০ পৃঃ)—"ভবভূতির রাম যেখানে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন, কালিদাস সেখানে আসন্ন সীতানির্ব্বাসনের শোকে বিদীর্ণহৃদয় রামচন্দ্রকে কিরূপ অটল, অচল, নির্ব্বাতপ্রদেশের জলধিবক্ষের ন্যায় বিক্ষোভশূন্য বর্ণনা করিয়াছেন—কিরূপ সুদৃঢ় ধৈর্য্যকঞ্চুকে তাঁহার চরিত্র সংবৃত করিয়াছেন।" সত্য বটে, ভবভূতির রাম কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন, কিন্তু তিনি যে-স্থানে ছিলেন, সেখানে যদি কাঁদিয়া বুক না ভাসাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা পাষাণ হইতেও কঠোর বলিতাম। সীতার ঐরূপে আসন্ন নির্ব্বাসনে রামচন্দ্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে তিনি নির্জ্জন বিশ্রামভবনে; কেবল পার্শ্বে গভীর সুপ্তিমগ্না সীতা। সীতার ন্যায় পত্নীর পরিত্যাগে বিদীর্ণ হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস যদি সেই স্থানে বহির্গত হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে আমরা খুব স্বাভাবিকই বলিব। ভবভূতির রামচন্দ্রকে যদি আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট দেখিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই দোষের কথা হইত, কিন্তু ঘটনা ত তাহা নহে। সেই সেই অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তনের পর সহসা সীতার ঐরূপ অপবাদ ও প্রজারঞ্জনের দায়িত্বে যাহা সম্ভব, যাহা উচিত, ভবভূতি তাহাই দেখাইয়াছেন। রামের হৃদয় যে, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। সীতানির্ব্বাসনে রামচন্দ্র যদি কেবল অচল-অটল বিক্ষোভহীন হইয়া থাকিতেন তবে তাঁহাকে আমরা কঠোর বলিতাম। ভবভূতি তাঁহার রামের অন্তরের শোক, ক্ষোভ, ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সমস্তই দেখাইয়াছেন। অপরপক্ষে কালিদাস এই ঘটনা বর্ণনায় দ্রুতগামী হইলেও রামকে কেবল অচল-অটল-ভাবেই বর্ণনা করেন নাই। তিনিও বলিতেছেন (১৪.৩৩) তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছিল :—

"বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে॥"

তিনিও নিজের তেজ হারাইয়াছিলেন, তাঁহারও নানারূপ বিকার হইয়াছিল (১৪.৩৬) :—

"স সন্নিপাত্যাবরজান্ হতৌজা
শুচিক্রিয়া দর্শনলুপ্তহর্ষান্।"

ইহাই ত স্বাভাবিক। কালিদাস অপেক্ষা ভবভূতির এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, ভবভূতি রামের ঐ বিকারকে পরিস্ফুটরূপে দেখাইবার উপযুক্ত অবসর পাইয়াছিলেন, আর কালিদাস তাহা পান নাই; কালিদাস দ্রুততরভাবে ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া যাইতেছেন, আর তাহারই মধ্যে নিজের বিশ্ববিমোহিনী তুলিকার এক-একটি রেখাপাতে অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছেন।

ভদ্রের (উত্তরচরিতে দুর্ম্মুখের) মুখে সীতার কলঙ্ক-কথা শ্রবণ করিয়া রাম তাহা উপেক্ষা করিবেন, অথবা নিরপরাধা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া প্রথমে "দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ" হইয়া পড়িলেন। অনন্তর—

"নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তি বাচ্যং
ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাদ্
যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥" ১৪.৩৫

যখন তিনি দেখিলেন যে, সীতার পরিত্যাগ ভিন্ন কিছুতেই সে অপবাদের নিবৃত্তি হয় না, তখন তাহাই নিশ্চয়পূর্ব্বক তাঁহার পরিত্যাগের দ্বারাই তাহা অপনোদন করিবার ইচ্ছা করিলেন, কারণ যাঁহারা যশোধন, তাঁহাদের নিকটে নিজের দেহেরও অপেক্ষা যশ গুরুতর বলিয়া মনে হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কথা আর কি বলা যাইবে।

এ স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (৩৪ পৃঃ)—"এখানে দুইটি বিষয়ের জন্য কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিব। প্রথম এই যে, রামসীতার আদর্শ প্রেম কবির কাছে কি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সুখের মধ্যে পরিগণিত ও তত্তুল্য অসার—এই জগতে অতুলনীয় দাম্পত্য-প্রেম অসার ইন্দ্রিয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিশ্চয়ই কি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে পৌঁছায় নাই? দ্বিতীয়, কালিদাসবর্ণিত রাম, সীতা হেন বস্তুকে অক্লেশে নিজের শরীরের অপেক্ষা নিম্নতম স্থান দিতে পারিলেন—(নচেৎ কবি কালিদাসের এ "অপি স্বদেহাৎ" শব্দ-প্রয়োগের 'অপি' কথার সার্থকতা কি?)—"

অভিযোগ গুরুতর। কিন্তু বস্তুত তাহা টিকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কালিদাস-বর্ণিত রাম সীতাকে তত লঘু বলিয়া মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গটি একটু ভাল করিয়া অবধানের সহিত দেখিতে হইবে। সীতার সহিত রামের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাঁহাদের পরস্পরের কি গাঢ় বন্ধন, তাঁহাদের উভয়েরই যে, এক আত্মা, তাঁহারা যে পরস্পরকেও নিজের এক অভিন্ন আত্মা বলিয়া মনে করেন, চতুর কবি তাহা চতুর বাক্যবিন্যাসে সুব্যক্তভাবে বলিয়াছেন। আমরা ইহার সমর্থনের জন্য ভদ্রের সেই অপবাদ-বার্ত্তা প্রকাশের পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিব:—

"কলত্রনিন্দাগুরুণা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্য্যয়েণ।
অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে॥
কিমাত্মনির্বাদকথামুপেক্ষে জায়াম দোষামুত সন্ত্যজামি।
ইত্যেক পক্ষাশ্রয় বিক্লবত্বাদাসীৎ স দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ॥"

১৪.৩৩,৩৪।

সীতার সহিত রামের সম্বন্ধ "বৈদেহিবন্ধু" এই পদটির দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, রাম বৈদেহীর বন্ধু,—দয়িত, মিত্র, বা বল্লভ-মাত্র নহেন, তাঁহাদের বন্ধন রহিয়াছে। দেহের সহিত আত্মার বিয়োগ যেমন সুদুঃসহ, ইহারা ত্যাগ সহ্য করিতে পারে না; সীতা ও রামেরও সেইরূপ, রাম সীতার ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না; এই জন্য তিনি তাঁহার বন্ধু। অভিজ্ঞগণ বলেন—"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ।" কালিদাস এখানে "বৈদেহিবন্ধু" শব্দটি প্রয়োগ করিয়া ইহাই বুঝাইতেছেন বোধ হয়। রাম বৈদেহিবন্ধু বলিয়াই তাঁহার "হৃদয়ং বিদদ্রে"—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। অপবাদটি সীতার হইয়াছিল, কিন্তু রাম এখানে বলিতেছেন—"কিমাত্মনির্বাদকথামুপেক্ষে"; আত্মনির্বাদকথা, আমার আত্মার অপবাদের কথা, সীতার অপবাদের কথা নহে।

ইহার পর আর একটি গুরুতর কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা যদি রামচন্দ্রকে একজন বহুগুণসম্পন্ন, পরম-প্রণয়ী সাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে "অপি স্বদেহাৎ" ইত্যাদি কথায় তাঁহার উপর দোষবর্ষণ করিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি ত বস্তুত সেরূপ নহেন। তাঁহার দুই দিকে দুই কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তিনি আমাদের নিকটে যুগপৎ উভয়রূপে উপস্থিত রহিয়াছেন, একদিকে তিনি পরম-প্রেমিক পতি, এবং অপরদিকে প্রজারঞ্জক রাজা। দুইটি কর্ত্তব্যের একটিকে বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। প্রজা-রঞ্জন-যশের বিলোপসাধন করিলে তাঁহাদের পবিত্র বংশ কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে। তিনি উভয়পক্ষ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন রাজাকে প্রজারঞ্জন করিতেই হইবে, এবং তাহা দ্বারা রবিপ্রসূত রাজর্ষিবংশকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। এ যশ তাঁহার চাই, ধর্ম্মত তাঁহাকে—জগতের আদর্শ রাজগৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে—এ যশ অর্জ্জন করিতে হইবে। ধর্ম্মসিংহাসনে সমারূঢ় নরপতির নিকটে ইহার অপেক্ষা নিজের দেহও কিছু নহে, তাহাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ইহাই ক্ষত্রিয় নরপতির ধর্ম্ম। কালিদাস এই জন্যই আলোচ্য শ্লোকে 'যশোধন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, রাম বা তাদৃশ অপর কোন শব্দের উল্লেখ করেন নাই। এখানে কঠোর রাজধর্ম্মের কথাই কবি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। "ত্যাগেন পত্ন্যাঃ" এই 'পত্নী' শব্দের উল্লেখেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। যজ্ঞে সহ-ধর্ম্মাচরণ করেন বলিয়াই স্ত্রীকে পত্নী বলা হয়, তিনি ধর্ম্মের সাধন। ধর্ম্মাচরণের বিবিধ সাধনের মধ্যে স্ত্রী অন্যতম। রাজধর্ম্ম-পালন-তৎপর রাম সীতাকে একটি সাধারণ ধর্ম্মসাধন মনে করিয়া এবং প্রকৃত রাজধর্ম্মপালনরূপ ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ কোন আবশ্যকতা না দেখিয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। দেহ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়বিষয় সমস্তই ধর্ম্মের সাধন, কিন্তু দেহ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবিই অন্যত্র বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।" অতএব ধর্ম্মসাধন-রূপে দেহ পত্নী অপেক্ষা অবশ্যই গুরুতর।

কালিদাস সীতাকে এখানে ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় বলিয়াছেন। ইহাতে দোষ কি? ইহা দ্বারা ত সীতাকে লঘু করা হয় নাই। ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ যদি 'ইন্দ্রিয়ের জন্য' হইত তাহা হইলে ঐরূপ দোষ হইতে পারিত,—বলিতে পারা যাইত সীতা রামচন্দ্রের কেবল ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, এবং এজন্যই অতি হেয়। ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে অনুভব করিতে পারা যায় তাহাকেই বুঝায়। সীতা ইন্দ্রিয়ার্থ, সীতার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সদ্বৃত্ত প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই দ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়। কামগন্ধহীন নিরবদ্য দাম্পত্য-প্রেমও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ভোগ্য।

"অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু
লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।" (১৪.৪০)

গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"পত্নীপ্রাণ রামচন্দ্রের মুখে এ কি উত্তর?" ঠিকই উত্তর হইয়াছে, আমাদিগকে মনে

রাখিতে হইবে, তিনি এখানে রাজসিংহাসনারূঢ় "প্রজাপ্রাণ" হইয়া সম্মুখে রহিয়াছেন।

"কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ॥"১৪.৬২

লিখিত হইয়াছে "কবি সুকৌশলে এই এক শ্লোকে সীতার দেবীচরিত্রে একটু মানবিকতার আভাস দিয়াছেন।" আমরা ইহার তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

গ্রন্থকারের ভাষা অত্যন্ত দোষবহুল। কয়েকটি স্থান নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল :—'নিমজ্জিতা' (৫ পৃঃ), 'বিসর্জ্জিতা' (৩৭ পৃঃ)। এখানে যথাক্রমে নিমগ্না * ও বিসৃষ্টা হওয়া উচিত ছিল। শ্রুতিকটু হইলে লেখক বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিবেন, না করিতে পারিলে সেখানে তাঁহার অশক্তি বুঝিতে হইবে। এইরূপে আরো কয়টি পদ অনিপুণ লেখকদের লেখায় দৃষ্টিগোচর হয়, যথা—বৃষ্ট স্থানে 'বর্ষিত,' বৃতস্থানে 'বরিত,' ইত্যাদি। আমরা সংস্কৃত শব্দগুলিকে এইরূপ দূষিত করিবার পক্ষপাতী নহি। 'সৃজন,' 'বয়ন' চলিয়া গিয়াছে, চলুক; তাহার স্থানে 'সর্জ্জন' ও 'বান' লিখিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

"যে স্থানে......প্রেমিক-দম্পতি নির্বিবাদে সাহচর্য্যরূপ স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন, সে স্থানই বনপ্রদেশ (৯ পৃঃ)"। এখানে 'নির্বিবাদ' স্থানে 'নির্ব্বিঘ্ন,' এবং 'সে স্থানই বনপ্রদেশ' স্থলে 'সে স্থান বনপ্রদেশই' লেখা সঙ্গত ছিল। এই 'ইকারের' যথাযথভাবে প্রয়োগে আজকাল অনেককে অসাবধান দেখা যায়।

মণিমাণিক্যখচিত "রাজপালঙ্ক ও রাজভোগ অপেক্ষা কোন্ অংশে সমৃদ্ধতর (১০ পৃঃ) ?" এখানে যে ভাষার প্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতে 'রাজপালঙ্ক' না লিখিয়া 'রাজপল্যঙ্ক' লেখা উচিত ছিল। এইরূপ ৩৭ পৃষ্ঠায় 'মসীমলা' না লিখিয়া 'মসীমালিন্য' লিখিলে ভাল হইত।

"শ্লথভুজবন্ধনে আশ্লিষ্ট সম্মিলিতকপোল যখন এই দম্পতি...... (১০পৃঃ)" ইত্যাদি বাক্যটিকে 'তখন' শব্দের উল্লেখে অপর একটি বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয় নাই। "যাহার সহিত জীবনের...... (১২)" ইত্যাদি বাক্যটিও দুষ্ট।

"রামের মত পত্নীবৎসল স্বামী ও ব্রতসাধনের ধন পতিব্রতা সীতার সহিত পুনর্মিলন (১২পৃঃ)।" এখানে 'ও' পদটি উঠাইয়া 'স্বামীর' লেখা উচিত ছিল। অথবা 'সহিত' পদটি তুলিয়া দিতে হয়। 'ব্রতসাধনের ধন' ইহার এখানে কোন সার্থকতাই নাই, নিরর্থক। 'পত্নীবৎসল.' এখানে 'বৎসল' শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। যেখানে স্নেহের সম্বন্ধ সেখানেই 'বৎসল' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

'স্রোতোপথ রোধ কর', (১৩পৃঃ) এ পদে সন্ধির নিয়মকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

'মন্দানিলের দ্বারা বাজনিত' (২১পৃঃ), সম্ভবত লেখকের এখানে অভিপ্রেত পদ 'ব্যজনিত'। ইহাও অদ্ভুত।

৪৭পৃঃ 'অনাথিনী' না লিখিয়া অনাথা লেখাই সঙ্গত ছিল।

গ্রন্থে এইরূপ আরও ত্রুটি আছে। তাহা হইলেও আমরা ইহা পড়িয়া স্থানে স্থানে, বিশেষত ৪২ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আনন্দ লাভ করিয়াছি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* এস্থলে ণিজন্ত প্রয়োগও চলিতে পারে, তাহাতে 'নিমজ্জিত' পদ অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু অনেককে অসমুচিতভাবে এই পদটি প্রয়োগ করিতে দেখা যায় বলিয়া সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণ জন্য এখানে উল্লিখিত হইল।—সমালোচক।

আসর অবসান

(গল্প)

(১)

বিপুল রাজ্যের জটিল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে, মন্ত্রণাসভার যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইতে ও বিচারাসনে আইন ও বিবেকের দ্বন্দ্ব বন্ধ করিতে সম্রাট আকবরের একমাত্র সম্বল ছিল তানসেনের গানের তান। তানসেন দান করিত সসাগরা পৃথিবীর অদেয়, স্নিগ্ধ করিত তপ্ত চিত্তের দগ্ধ মনস্তাপ, যুক্ত করিত স্বর্গ মর্ত্ত দুই রাজ্যের বিপুল ব্যবধান। সঙ্গীতের ঝঙ্কারে কোন্ এক শান্তিপূর্ণ ক্লান্তিশূন্য দেশের আভাস আসিয়া আকবরের তন্ময় মন স্পর্শ করিত। সঙ্গীতের অবসানে সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু রণিয়া রণিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে কোথায় মিলাইয়া যাইত! অপরিতৃপ্ত আকবর শাহ অসহ্য মনোবেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিত 'ফের গাও'।

(২)

তখনও সূর্য্যদেবের প্রথম কিরণরশ্মি পূর্ব্বগগন রাতুল রাগে রঞ্জিত করিয়া তোলে নাই, তখনও জগৎ ক্ষুদ্র শিশুটির মতো তামস জননীর ক্রোড়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রায় নিমগ্ন। অর্দ্ধ বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি অপনোদনেচ্ছু সম্রাট উষাভ্রমণে বিনির্গত। দুই একটি নিশাচর পক্ষী চীৎকারে গোলাপী গগনে শব্দের বুটি বসাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল এবং কুলায়স্থিত প্রভাতী পক্ষী পক্ষ ঝাপটিয়া প্রভাতী তান ধরিতে সমুৎসুক।

প্রাসাদ ছাড়িয়া প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গন ছাড়িয়া মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যের শ্রেণী, তার পর পাদপশ্রেণী, ক্রমে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আর তারই বক্ষ বহিয়া পয়োধরের ধারার ন্যায় স্রোতস্বিনী যমুনার ধার। সহসা কিন্নর-বিনিন্দিত সঙ্গীত-ঝঙ্কার আকবরের কর্ণরন্ধ্রে আসিয়া ঝঙ্কৃত হইল। হৃদয়-হরা, মন-উতলা-করা, অজানা-দেশ-নির্দ্দেশ-করা এ রাগিনী কাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত! দিল্লীশ্বরের শ্রেষ্ঠ গায়ক তানসেনের কণ্ঠস্বর, দিল্লীশ্বরের সমক্ষে, আজ ইহার নিকট লজ্জায় ম্রিয়মাণ নিষ্প্রভ হইয়া যেন মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহিল। তানসেনকে পরাস্ত করে, এমন

কোকিলকণ্ঠ কে ? তানসেনের গানকে হতমান করে এ কি গান ?

নাদ নগর বসায়ে
সুরপট মহল ছায়ে,
উনপঞ্চাশ কোটি তান
অচ্ছর বিশ্রাম পায়ে।
গীত ছন্দ তত বিতত
ডমরুকা ধুন আলাপ
তান তালকে কিবাড়
খরজ সুরপট রিঞ্জির
ত্রিবট খুঙ্গী তামে
ধুরপদ মধ ছিপায়ে।

বাত্যান্দোলিত তরঙ্গোপরি কলহংসের ন্যায় শুভ্র টৌড়ী-রাগিনী সুর-সপ্তক-তরঙ্গের উপর হেলায় নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে এবং বিচ্ছুরিত বিজুলী সম মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিয়া পড়িতেছে ! সে নৃত্যভঙ্গি যমুনার জলকে সংক্রামিত করিয়া তুলিল, সে কণ্ঠস্বর নিদ্রিত বিহঙ্গমকে জাগ্রত করিয়া তাহার কণ্ঠে বাণী ফুটাইয়া দিল, বৃক্ষশাখে কোকিল উদ্দাম ঈর্ষাভরে উচ্ছ্বসিত চীৎকার শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ হইতে উচ্চে চড়াইয়া শুধাইল "কেও—কেও—কেও ?" কুতূহলী অরুণরাজ উষারাণীর পশ্চাৎ হইতে স্মিত নয়নে গোপন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়া লইলেন কাহার সঙ্গীতে তাঁহার হৃদয়রাণী আজ এত মুগ্ধা; আকবরশাহও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন—গায়ক অন্য কেহ নহে স্বয়ং তানসেন! সম্রাট পুলকিত হইলেন, কিন্তু প্রাণে একটা অভিমানভরা ক্ষোভের দংশন হইতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না—এমন মর্ম্মস্পর্শী মধুর গান তানসেন ত কখনও দিল্লীশ্বরের সমক্ষে করে নাই !

(৩)

অদ্য সঙ্গীত-সভা কোমল বেশ পরিত্যাগ করিয়া বিচার-সভার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্রাটের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।—"তানসেন! সঙ্গীতে তোমার শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য দিল্লীশ্বরের নিকটই প্রকাশ্য, অন্য কোথাও নহে। তোমার পূর্ণ সামর্থ্য আমার নিকট গোপন রাখিয়া আমাকে প্রতারণা করিয়াছ তুমি।"

সম্রাটের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে কাঁপিয়া উঠিল অনেকেই —কাঁপিল না কিন্তু তানসেন। দৃঢ়তর অথচ সংযত স্বরে তানসেন উত্তর করিল "জাঁহাপনা! আপনি দিল্লীশ্বর— শুধু দিল্লীরই ঈশ্বর মাত্র। আমার প্রত্যহগীত সঙ্গীত দিল্লীশ্বরসমক্ষে গীতোপযোগী। কিন্তু অদ্য প্রভাতে আমার সঙ্গীতের শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং জগদীশ্বর! সে সঙ্গীত সামান্য দিল্লীশ্বরের নিকট আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত করিবার আপনার বা আমার প্রয়াস ব্যর্থ মাত্র, দেবের ভোগে মানবের অভিলাষ ধৃষ্টতামাত্র।"

মেঘনাদের প্রতাপ-পরিচায়ক মেঘমন্দ্রের ন্যায় দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রচারিত হইয়া গেল "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ! অঙ্গরক্ষীর কক্ষবিলম্বিত ক্রুদ্ধ অসি ধৈর্য্য হারাইয়া কোষমধ্যে ঝনৎকারে গর্জ্জিয়া উঠিল ! কিন্তু সম্রাট ? সম্রাটের দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে সকলই স্তব্ধ হইল। লজ্জায় আনত ও কৃতজ্ঞতাকাতর সজল নয়নে, আত্মধিক্কারে সঙ্কুচিত অথচ তৃষ্ণায় উধাও ও উন্মুক্ত হৃদয়ে, আগ্রহাতিশয্যে ক্ষিপ্র অথচ বিহ্বলতায় জড়িত পদে উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া সম্রাট আকবর শাহ তানসেনকে আপনার নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। নিমীলিত নেত্রে পরস্পর পরস্পরে মিশিয়া গেলেন।

যখন নয়ন মেলিলেন তখন আসর অবসান হইয়াছে —রহিয়াছে শুধু শূন্য গৃহে দুটি পূর্ণ প্রাণ !

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়।

রঙের লুকোচুরি

জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইতে সামান্য কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অহর্নিশি কঠোর সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে যে যতদিন জয়ী হইতে পারে, জগতে তিষ্ঠিয়া থাকার পক্ষে তাহার আয়ুও ততদিন। খাদক আপনার উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত যেরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে,

খাদ্য ঠিক সেইরূপ সংগ্রামেই লিপ্ত থাকিয়া তাহার আক্রমণ এড়াইবার প্রয়াস পায়। এবং এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া স্বকীয় আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করে। যে-সকল কারণে খাদ্য ও খাদকের মধ্যে এইরূপ আত্মরক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয়, রঙের লুকোচুরি তন্মধ্যে একতম প্রধান স্থানীয়। মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধি-ও-জ্ঞান-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীবের পক্ষে আত্মরক্ষার অপরবিধ বহু উপায়ের মধ্যে এই উপায়ের কার্য্যকারিতা তেমন উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবজন্তুর মধ্যে উহার প্রয়োজন তাহাদের জীবনরক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। তাই, ইতর জাতীয় প্রাণীর রাজ্যে এই লুকোচুরি-খেলা অহর্নিশিই চলিতেছে। এবং প্রকৃতি দেবী স্বয়ং এই কার্য্যের নিমিত্ত তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর দেহে স্থান ও কালের উপযোগী বিভিন্ন রঙের তুলিকা বুলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন।
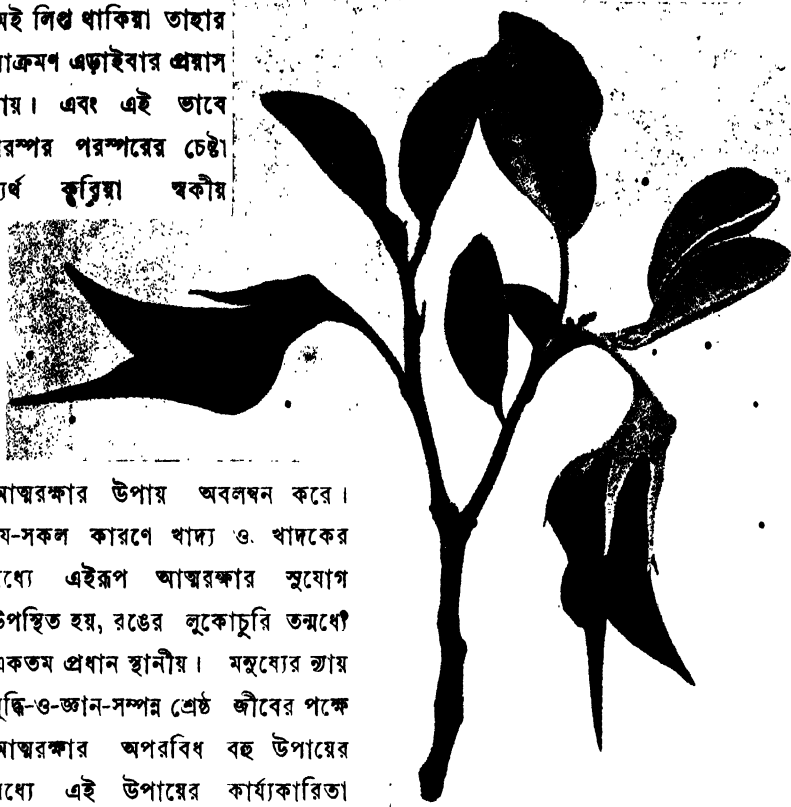
টিয়াপাখীর অনুরূপ মটর ফুল।

জীবজন্তুর গাত্রে বিবিধ বর্ণের সমাবেশ দেখিয়া মহামনীষী ডারউইন স্থির করেন যে এই রঙের খেলা কেবল যৌন-সম্মিলনের প্রলোভন-উপায় মাত্র। কিন্তু তিনি অপুষ্ট কীড়ার গাত্রেও রং দেখিয়া সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তুল্য পণ্ডিত ওয়ালেসের শরণাপন্ন হইলেন। ওয়ালেস বলিলেন, এই যে রঙের খেলা ইহা খাদক জীবের পক্ষে সাবধানের নিশানা—যে জীব বিচিত্র বর্ণের তাহা অখাদ্য, প্রকৃতির এই সঙ্কেত রঙের খেলায় প্রকাশ পাইতেছে। থেয়ার প্রমুখ পণ্ডিতেরা বহু পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়াছেন যে রঙের খেলা খাদককে সাবধান করিবার নিশানা বা সঙ্কেত নহে, বরং উল্টা; উহা খাদ্য জীবের আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার উপায় মাত্র।

যে সিংহ মরুভূমির অধিবাসী, আত্মরক্ষার নিমিত্ত লুকাইয়া শিকার ধরিবার পক্ষে তাহার গায়ের রং তৎস্থানোপযোগী হওয়া আবশ্যক; আবার যে-সকল ক্ষুদ্র প্রাণী দৈহিক বলে পশুরাজের আক্রমণ রোধ করিতে অসমর্থ, রঙের লুকোচুরি দ্বারা কৌশলে তাহাদের আত্মরক্ষা সম্ভবপর,—এই জন্য মরু প্রদেশের পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণীর দেহই বালুকা-ধূসর। চির তুষারাচ্ছন্ন মেরুস্থলের ভল্লুক, শৃগাল, পেচক প্রভৃতি জন্তুর বর্ণ শুভ্র এবং নিশাচর প্রাণীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা অন্ধকারের অনুরূপ গাঢ়, ঐ কারণেই। জীবজন্তু যে তাহার আবেষ্টনের বর্ণই কেবল অনুকরণ করে তাহা নহে; উদ্ভিদের মধ্যে যেমন জীবজন্তুর আকার অনুকৃত হয়, জীবজন্তুও তেমনি অনেক সময় উদ্ভিদের অনুকরণ করিয়া আত্মগোপন করে। সুমাত্রা বোর্ণিও প্রভৃতি বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে লেমুর নামক উড্ডয়নক্ষম বানর গাছে গুটিসুটি হইয়া একটি বড় ফলের মতন হইয়া ঝুলে; তাহার কটা চামড়ার উপর

টিয়াপাখীর অনুরূপ মটর ফুল।

পাতা-পোকা, পাতার মধ্যে বেমালুম আত্মগোপন করিয়া আছে।

লেমুর বানর, গাছে বড় একটি ফলের ন্যায় ঝুলিতেছে।

পাতা-পোকা।

ফুটকি থাকাতে তাহাকে আরো বেশি ফল বলিয়া ভ্রম হয়।

সর্ব্বশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, অথচ সন্তানপালন প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদেরই আত্মরক্ষার উপায় অধিক থাকা প্রয়োজনীয়। পক্ষীজাতীয় এই-সকল 'অবলা অখলা'কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনেকস্থলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাদের গায়ের রং হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছেন। যেস্থলে বিহঙ্গিনী এ বিষয়ে

বিধির কৃপালাভে বঞ্চিত রহিয়াছে, সেস্থলে তাহারা স্বয়ং বৃক্ষকোটরে বা মৃত্তিকানিয়ে বাসস্থাপন করিয়া সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবার আয়োজন করিয়া থাকে। গাঙের ও বিলের মাছরাঙা, দলঘুঘু, কাঠ-ঠোকরা, তিরতিরি প্রভৃতি রঙীন পক্ষী এ বিষয়ের নিদর্শন। গাং-মাছরাঙার পালক ও ঠোঁটের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ইহাদের ডিম্ব দুগ্ধ-ধবল। ইহাদের দেহের

পাতাপোকার কীড়া।

টিটিভ, টিটির, মাণিকজোড় প্রমুখ কতিপয় পক্ষীর স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই দেহ বিচিত্র, কিন্তু উহাদের ডিম্বের বর্ণ স্বভাবতঃ প্রস্তর-সদৃশ থাকায় তাহা রক্ষা করিবার পক্ষে তাহাদিগকে বিশেষ শঙ্কিত থাকিতে হয় না। এই জাতীয় পক্ষী সাধারণতঃ মৃত্তিকার তলে ডিম্ব প্রসব করে এবং যতক্ষণ স্ত্রীপক্ষী ডিমে তা-দিতে থাকে, পুংপক্ষীটী দূরে থাকিয়া পাহারার কার্য্য করে। ডিম্বটীকে শত্রুর
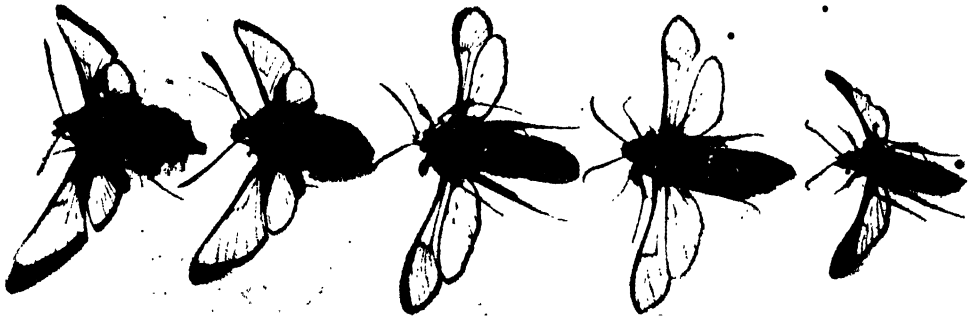
হুলশূন্য পতঙ্গ, বোলতা ভিমরুল মৌমাছির রূপ অনুকরণ করিয়াছে।

ও ডিম্বের ঐরূপ বর্ণ সহজ-গোপ্য না হইলেও, ইহারা দ্বীপের উচ্চভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করিয়া আত্মগোপনে সমর্থ হয়। এই প্রকারে বিলের মাছরাঙা, জলাশয়ের তটভাগস্থ মূষিকাদির গর্ত্তে, দলঘুঘু বালুকাময় ভূমির ছিদ্রমধ্যে, কাঠঠোক্‌রা বৃক্ষ-কোটরে এবং তিতির পাখী যে-কোন ফাটল বা ছিদ্রমধ্যে ডিম্ব প্রসব করিয়া আত্মরক্ষা ও শাবক-রক্ষার উপায় বিধান করিয়া থাকে। রঙের লুকোচুরি দ্বারা আত্মরক্ষা ও শাবক-রক্ষা সহজ বলিয়া সচরাচর বিহঙ্গিনীর বর্ণ অনুজ্জ্বল দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে দুএক ক্ষেত্রে পুংপক্ষী অপেক্ষা স্ত্রী-পক্ষীর রূপমাধুর্য্য অধিকতর হওয়ায় আত্মগোপনের সম্ভাবনা অল্প ঘটে, সে স্থলে ডিমে তা-দেওয়া ও শাবক পালনের ভার পুংজাতির উপর ন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়।

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে পিতামাতা উড়িয়া গিয়া স্থানান্তরে বসে। তখন ডিম্বটীকে মৃত্তিকা-খণ্ড হইতে পৃথক করিয়া চেনা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যে-সকল পক্ষীর রং স্বভাবতঃ লুকোচুরি খেলিবার উপযোগী, তাহারা অধিক সময় পর্য্যন্ত ডিমে তা-দিতে অভ্যস্ত। ঘুঘু, টিয়া, হাঁস প্রভৃতি পক্ষী এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ডিমে তা-দেওয়ার সময়ে এই-সকল পক্ষীকে টানিয়াও সরাইয়া দেওয়া কঠিন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পক্ষীর গায়ের রং পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত এমন ভাবে মিলাইয়া যায় যে, ডিমে তা-দেওয়ার সময়ে ইহাদিগকে চেনাও সহজ নহে। টিয়ার রং উহাদের বাসস্থান ছাতিম প্রভৃতি বৃক্ষের সবুজ গুঁড়ি ও ডালপাতার বর্ণের সহিত অভিন্ন; সুতরাং ডিমে তা-

দেওয়ার সময়ে উহারা সহজে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। ছাতার ও চেগা পাখীর অবয়ব অনেকটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়। কাষ্ঠখণ্ডের সহিত উহাদের গাত্রের এইরূপ সাদৃশ্য থাকায় উহারা শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণের মধ্যে

গোলাপ গাছের কাঠি-পোকার কীড়া।

ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ফলে, ডিমে তা-দেওয়ার সময়ে উহাদিগকে কাষ্ঠখণ্ড বলিয়াই ভ্রম হয়। এই জাতীয় পক্ষীর পিতামাতার ন্যায় শাবকের রংও তাহাদের আত্মগোপনের উপযোগী এবং ঐ বিষয়ে উহাদের চতুরতাও যথেষ্ট। কোন শত্রুর আগমন বুঝিতে পারিলেই এই জাতীয় পক্ষীশাবক মাটীর সঙ্গে লাগিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে এবং তাহার পিতামাতা চীৎকার করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা কখনও শত্রুর গায়ের উপর পড়িয়া, কখনও আহতের ন্যায় ভূমিতে গড়াইয়া, শাবককে শত্রুর দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পায়। ইতিমধ্যে ছানাটিও মাটীর সঙ্গে একরূপ মিশিয়া গিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘাসবনের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করে। এইরূপে শত্রুকে ভুলাইয়া শাবক-রক্ষা করার রীতি ময়নার মধ্যেও দেখা যায়। শত্রুর আগমন লক্ষ্য করিতে পারিলে ইহারা পূর্ব্বেই স্থানান্তরে উড়িয়া গিয়া সাপ ও ব্যাঙের গর্ত্তের উপর বসিয়া ডিমে তা-দেওয়ার অভিনয় করে। ফলে, ইহাদের প্রতারণায় পড়িয়া শত্রুকেই অনেক সময়ে উল্টা বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

ডাহুক, পানিকৌড়ী প্রভৃতি কয়েক রকম পাখীর আত্মগোপনের ক্ষমতা অত্যধিক। এ বিষয়ে ইহারা যেন স্বভাবজাত-সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কোনরূপ শত্রুর আক্রমণ বুঝিতে পারিলেই ইহারা জলাশয়ের তটমধ্যস্থ গর্ত্তে বা তৎসন্নিহিত ঝোপে লুকাইয়া থাকে কিংবা জলে নামিয়া ডুবের পর ডুব দিয়া আত্মগোপনের প্রয়াস পায়। কোন গর্ত্তে বা ঝোপের মধ্যে ইহারা যখন লুকাইয়া থাকে তখন ইহাদের সত্তা পর্য্যন্ত সহজে অনুভূত হয় না।

গোলাপ-গাছের কাঠিপোকা।

শুধুমাত্র স্বভাবজাত রঙের লুকোচুরি দ্বারাই যে এই-সকল জন্তুর প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে, তাহা নহে; অনেক স্থলে ইহারা স্বেচ্ছাক্রমে বর্ণচুরি করিয়াও আত্মরক্ষার
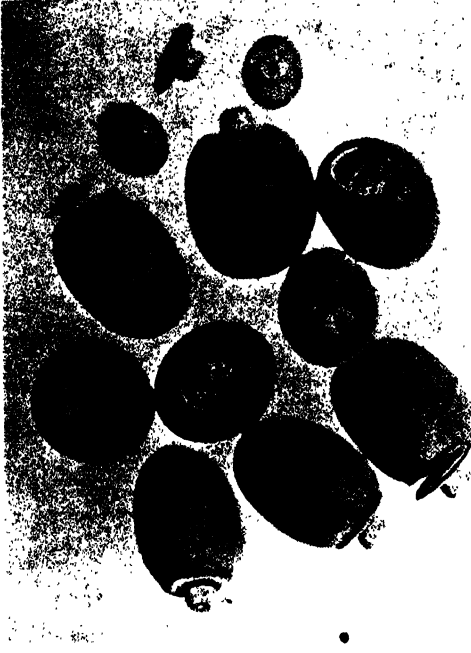
কাঠি পোকার ডিম (বর্দ্ধিতাকার)। ডিমের মুখে এক একটি ঢাকনি ছিপি থাকে। কীড়া পুষ্ট হইলে ছিপি ঠেলিয়া বাহির হয়।

উপায় বিধান করিতে পারে। এ বিষয়ে কীটপতঙ্গাদির দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক কীট শুষ্ক তৃণ, সবুজ ঘাস, পক্ক পত্র প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়া, অথবা-হুল বা বিষযুক্ত অপর কোন কীটের বর্ণচুরি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। পাতা-পোকা যখন পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকে তখন তাহাকে চেনা দুষ্কর; পুং পতঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রী পতঙ্গের আকার অধিক পত্রসদৃশ, কারণ স্ত্রীকীটকে ডিম্ব প্রসব ও সন্তান পালনের জন্য অনেক দিন এক স্থানে নিশ্চল হইয়া থাকিতে হয়। বাগানের বেড়া ইত্যাদির গায়ে এক প্রকার কীট পাওয়া যায়, তাহারা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শক্ত ও নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহাদের ডিম-গুলিও শস্য-বীজের ন্যায়। ইহারা দিবাভাগে কোন প্রকার নড়িয়া চড়িয়া খাদ্য আহরণের চেষ্টা পর্য্যন্ত না করায় ইহার সত্তা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারেনা, সুতরাং ইহারা অক্লেশে শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। আথাল পোকা নামক কীটের বর্ণ ও আকার উভয়ই হুবহু কাষ্ঠের চ্যালার কুটি'র (জ্বালানি কাঠের টুকরার) ন্যায়। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় যে-সকল দরিদ্র বালিকাকে কয়লা কুড়াইতে দেখা যায়, তাহারা উহাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই জ্বালানি কাঠ ভাবিয়া টুকরীতে তুলিয়া রাখিবে। এ দেশের পেয়ারা গাছে জারাইল ও চাটা নামক যে কীট দেখা যায়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের কাণ্ডস্থ চিহ্ন-বিশেষের ন্যায় বোধ হয়। চেলা, বিছা প্রভৃতি অনেক সময়ে পুরাতন বাঁশ, ইকার (নলবিশেষ) ও হোগলা-পাতার বেড়ার মধ্যে বাস করে; উহাদের বর্ণও তাই তাহার ন্যায় কটা; অধিকন্তু উহাদের গায়ে বিষাক্ত লোম ও হুল থাকায় আত্মরক্ষার উপায় আরো অধিক

পেয়ারা গাছের ছালের রঙের অনুরূপ জারাইল বা চাটা পোকা।

সহজ হয়। মাঠ-ফড়িং, কয়া প্রভৃতি পোকার রং ম্লান বা তিলের পাতা ও ডাঁটার ন্যায়। এই-সকল কীট সাধারণতঃ এই-সকল ওষধিই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। সোনাপোকা প্রভৃতি কতকগুলি কীটের বর্ণ এত অধিক উজ্জ্বল যে, তাহা সহজে লক্ষ্য করা যায় না।

গুটীপোকা প্রজাপতির আকার ধারণ করিবার অব্যবহিত পরে, দুর্ব্বল অবস্থায়, কয়েকদিন পর্য্যন্ত বিশেষ সতর্কতা সহকারে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করে। এই জন্য ইহাদের আশ্রয়ান্বেষণে যথেষ্ট নির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় যে-সকল পতঙ্গের বর্ণ সবুজ তাহারা বৃক্ষপত্র আশ্রয় করিয়া বাস করে। এণ্ডি পোকার বর্ণ ভেরেণ্ডা গাছের ন্যায় বলিয়া তাহারা ঐ গাছকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একপ্রকার গুটী-প্রজাপতি দেখা যায়, উহার বর্ণ কাঁচা নলের ন্যায় হরিতাভ। এই পতঙ্গ শৈশবাবস্থায় কাঁচা নলগাছে বাস করিতে অভ্যস্ত। ঐ প্রদেশে নব পল্লবের ন্যায় আর একপ্রকার গুটীপোকা আছে, বর্ণের

প্রজাপতির অসমান ডানা ছিন্নপত্রের অনুকরণ করে।

প্রজাপতির কীড়া সাপের মাথার অনুকরণ করিয়া আত্মগোপন করিতেছে।

সাদৃশ্যহেতু তাহা পল্লব আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে। এতদ্দেশের ঝিঁঝি পোকাকেও ঐ প্রকার কীটের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। লাক্ষাস্রাবী লাহা বা ঝুরি পোকা লাক্ষারসের ন্যায় লোহিতবর্ণ। আত্মগোপনের পক্ষে ঐ রসই উহাদের প্রধান সহায়। অনেক প্রজাপতি কীড়া অবস্থায় সাপের মাথার আকার ধারণ করিয়া শুষ্ক কাঠখণ্ডে লাগিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের খাদক শত্রুরা ভয়ে তাহাদের কাছেও ঘেঁসে না।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রজাপতির উপরের পাখা দুটী বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট। ঐরূপ বর্ণ সহজে শত্রুর দৃষ্টিগোচর হইতে পারে বলিয়া ইহারা বিশ্রামের সময় ঐ পাখা দুখানি উর্দ্ধে তুলিয়া খাড়াভাবে বুজাইয়া রাখে। এই অবস্থায় পাখার যে দুই দিক বাহিরে প্রকাশিত হয় তাহার রং নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের; সুতরাং ঐ রঙের উপযোগী কোন স্থল আশ্রয় করিয়া ইহারা সহজেই আত্মগোপনে সমর্থ হয়। কমলা রঙের একপ্রকার প্রজাপতির উপরের পাখার তলদেশ শাকের ন্যায় নীলাভ হরিৎ। উহারা বিশ্রামের সময় শাকসবজিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অনেক প্রজাপতি শীতঋতুতে নিভৃত স্থানে বাস
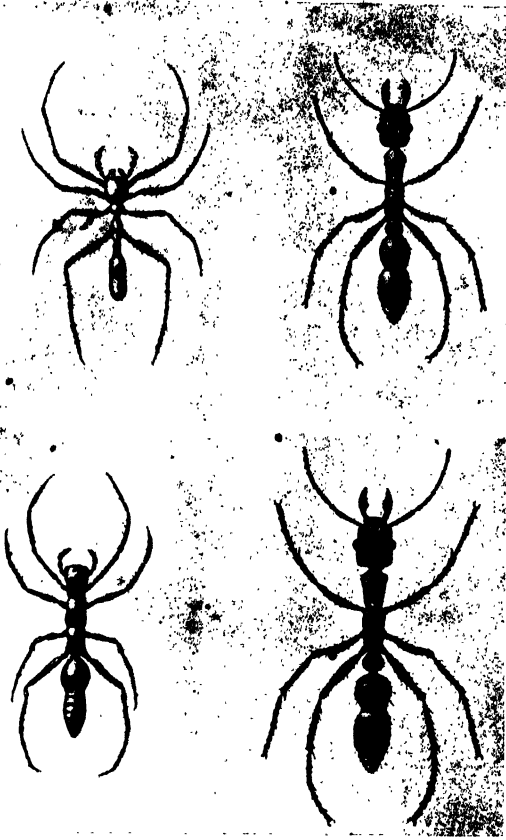
পিপীলিকার ছদ্মবেশে মাকড়শা।

করিতে অভ্যস্ত। উহাদের মধ্যে ময়ূরপুচ্ছী ও কমঠবর্ণী পতঙ্গ অন্ধকার গর্ত্ত বা গৃহ-কোণ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। এই জাতীয় প্রজাপতির পালকের তলদেশ কৃষ্ণ ও কটা বর্ণের হওয়ায় ঐরূপ স্থানই উহাদের আত্মগোপনের পক্ষে উপযোগী। আবার উড়িবার সময় প্রজাপতির উজ্জ্বল নীল পাখা রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশের তলে একেবারে গা-ঢাকা হইয়া মিলাইয়া যায়। ঘুণপোকার নীচের পাখা বিচিত্রবর্ণে উজ্জ্বল। তাই, বিশ্রামের সময় উহারা উপরের পাখা মেলিয়া উহা ঢাকিয়া রাখে। হরিদ্রাবর্ণের রেখা-বিশিষ্ট এক প্রকার কীট বাহ্যতঃ বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি হুলধারী পতঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের হুল বা বিষ কিছুই নাই। অনেক মাকড়সা পিপীলিকা, ছোট গেঁড়ি-গুগলি বা দুর্গন্ধ কীটের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বোলতা, পাখী প্রভৃতি খাদকদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে। মাকড়সারা শুধু আকার অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অনুকৃত প্রাণীর চলনভঙ্গী পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লয়। অবয়ব ও রঙের ছদ্মবেশই উহাদের জীবনরক্ষার প্রধান সহায়। একপ্রকার প্রজাপতির বর্ণ বিশেষ জমকালো, কিন্তু আহারের পক্ষে নিতান্ত তিক্ত বা তাহার গন্ধ ন্যক্কারজনক। তাই পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী উহাদিগকে দেখিয়াও আহার করিতে উৎসুক নহে। উহাদের দেহের এইরূপ উজ্জ্বল বর্ণই উহাদিগকে অন্যান্য পতঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া চিনাইয়া দিয়া রক্ষার কারণ হইয়াছে। এই জাতির বহির্ভূত আর এক প্রকার প্রজাপতি পক্ষীদের সুখাদ্য হইয়াও অখাদ্য পতঙ্গের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট হওয়ায় উহাদেরই নামে পরিচিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ বর্ণচুরি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতিই সমধিক শক্তিসম্পন্না, পুংপতঙ্গ অপেক্ষাকৃত সবল বলিয়া স্বীয় শ্রেণীর স্বাভাবিক বর্ণই লাভ করিয়াছে। প্রজাপতি যখন পাখা মেলিয়া

মাকড়শা গন্ধপোকা গুবরে পোকা প্রভৃতি কীটের রূপ অনুকরণ করিয়াছে।
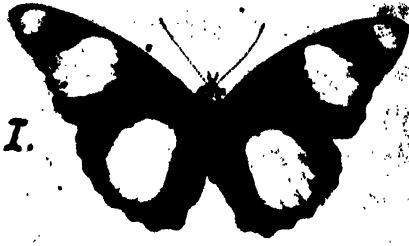
প্রজাপতির ছদ্মবেশ।
১ নং পুং-প্রজাপতি আকার পরিবর্ত্তন করে না। ২ ও ৩ নং সুখাদ্য স্ত্রী-প্রজাপতি ৪ ও ৫ নং অখাদ্য প্রজাপতির রূপ অনুকরণ করে।

ফুলের উপর বসে তখন তাহাকে ফুল বলিয়াই ভ্রম হয়; তাহার পাখার কিনারা অসমান, তাহাতে অনেক সময় বৃক্ষপত্র হইতে তাহাকে পৃথক করা যায় না।

রঙের লুকোচুরি খেলিবার পক্ষে ভারতের কলিমা-ইনাচী (Kallima Inachis) এবং মলয়দ্বীপের কলিমা পরলেক্ত (Kallima Paralekta) জাতীয় পতঙ্গের আকার ও আচরণ উভয়ই আশ্চর্য্যজনক। এই জাতীয় পতঙ্গের উপরের পাখা দুখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উহাতে গাঢ় নীলবর্ণের উপর কমলারঙের প্রশস্ত ডোরা টানা আছে। ঐ পাখার তলদেশের বর্ণ, বিভিন্ন পতঙ্গের পক্ষে ধূসর, পাটকিলে, গৈরিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার এবং উহা দেখিতে অবিকল শুষ্ক পত্রের ন্যায়। এই পাখার প্রান্তভাগ সূচ্যগ্র এবং তন্নিম্নস্থ পাখা দুখানির শেষাংশও সরু লেজের ন্যায় প্রসারিত। উভয় পাখার সূক্ষ্মাংশ যেস্থলে মিলিত হইয়াছে সেস্থানের মধ্যদেশ হইতে একটী শিরা বক্রাকারে এমন ভাবে বাহির হইয়াছে যে, তাহাকে বৃক্ষপত্রের মধ্যভাগস্থ বৃন্তগ্রন্থির ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই শিরাটীর গায়ে লাগিয়া আবার কয়েকটী উপশিরা আড়া-আড়ি ভাবে বিলম্বিত আছে। কোন একটী পত্র শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে তাহার গায়ে যেরূপ শ্বেতকৃষ্ণবর্ণের অসংখ্য দাগ পড়ে, এবং ব্যাঙের ছাতার ন্যায় একপ্রকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এই পাখার উপর তদ্রূপ চিহ্নেরও অভাব নাই। সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই ইহাকে শুষ্কপত্রের ন্যায় লক্ষিত হয়। কলিমা ইনাচী ও কলিমা পরলেক্ত শ্রেণীর পতঙ্গ কোন স্থানে বসিবার সময়ে এই পাখাগুলি আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া উহার নিম্নভাগস্থ সূক্ষ্মাংশ গাছের সঙ্গে লাগাইয়া রাখে এবং পাখার অন্তরালস্থিত পদদ্বয় দ্বারা বৃক্ষদেহ আঁকড়াইয়া ধরে। মৃত ও শুষ্ক বৃক্ষাদি ব্যতীত কোন পুষ্প বা সবুজ তৃণাদির উপর ইহারা কখনও বসে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাবে বিশ্রাম করিবার সময়ে ইহাদিগকে অবিকল শুষ্কপত্রের ন্যায় দেখিতে হয়।

পক্ষী ও কীটপতঙ্গের ন্যায় জলজন্তু ও সরীসৃপ প্রভৃতি

শিকারী ফড়িঙে রঙ্গের লুকোচুরি।
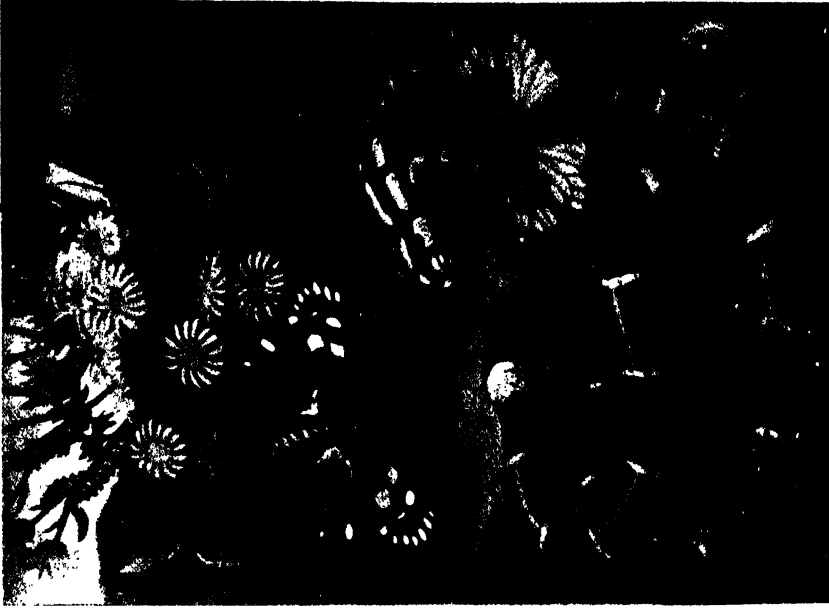
সরীসৃপ ও পতঙ্গে সাবধানকারী রং।

প্রাণীর মধ্যেও রঙের লুকোচুরির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। গোসাপ, কুম্ভীর প্রভৃতির গাত্র জলে-পড়া গাছ, প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকা-স্তূপের অনুরূপ। বহুবিধ জলজন্তু ও মাছের আকার তাহাদের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের ও পদার্থের অনুরূপ বর্ণে ও পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকে; সী-ড্রাগন নামক সামুদ্রিক জন্তুর গায়ে সামুদ্রিক উদ্ভিদ দাম ঘাসের সদৃশ দোদুলা পাখা থাকে এবং তাহার রংও বিচিত্র, এই জন্য তাহারা সহজেই দল-ঘাসের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। বিবিধ বর্ণে চিত্রিত লালমাছ প্রভৃতি প্রবাল-স্তূপের মধ্যে লুকাইয়া সহজেই বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। বহুরূপী কৃকলাশ ইচ্ছানুসারে বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত অভিন্ন হইতে পারে। লাউলতা বা লাউডগা সাপ কচু ও লাউগাছের উপর যখন অবস্থান করে তখন কাহার সাধ্য তাহাকে সাপ বলিয়া চিনিতে পারে? এই-সকল প্রাণীর এইরূপ বর্ণচুরি ইহাদের উদররক্ষা ও আত্মরক্ষা উভয়েরই মূল। য়ুরোপ ও আমেরিকায় একরূপ করাতে-কাঁটা-ওয়ালা টিকটিকি দেখা যায়, তাহাকে অনেক সময় কাঁকড়া-বিছে বা কটকটে-ব্যাং বলিয়া ভ্রম হয়। ম্যাডাগ্যাস্কার দ্বীপে এক প্রকার টিকটিকির বর্ণ অবিকল গাছের ছালের ন্যায় হয়। অনেক শামুক অপেক্ষাকৃত বলবান শামুকের রূপ অনুকরণ করে; অনেকের রং প্রস্তরধূসর, যখন পাথরের ফাটলে থাকে তখন আর চেনা যায় না; অনেক শামুক তাহার খাদ্য উদ্ভিজ্জের বর্ণ গ্রহণ করে, এবং ঋতু পরিবর্ত্তনে খাদ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রবর্ণও পরিবর্ত্তন করে। এক প্রকার শামুক পিঠের খোলার উপর গাছের আঠা লাগাইয়া ধুলা মাটি কুটা কাঠির উপর গড়াগড়ি দিয়া দিয়া ভোল ফিরাইয়া ফেলে। কেবল মাত্র পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াই যে জীবজন্তুর দেহ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা নহে। উহার অঙ্গসমূহের পারম্পর্য্য যাহাতে সহজে দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে তজ্জন্য উহা নানাবর্ণে রঞ্জিতও হইয়াছে। একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ যতই কৃষ্ণ হউক না কেন, অন্ধকার গৃহে রাখিলে উহার অবয়বের আভাস পাওয়া যায়; তদ্রূপ একটা শ্বেতবর্ণ পদার্থকেও তীব্র আলোকের মধ্যে রাখিলে তাহার আকারের গঠন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। কিন্তু ঐ পদার্থের দেহে লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের কয়েকটা রেখা ও ফোঁটা থাকিলে উহার আকারের অবিচ্ছিন্নতা নষ্ট হয়; ফলে দৃষ্টি মাত্রেই উহার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। জীবজন্তুর দেহও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হওয়ার উদ্দেশ্য ঐরূপ।
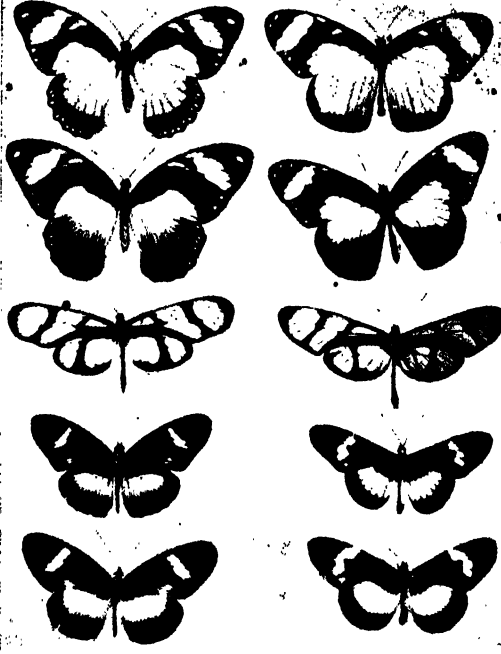
প্রজাপতির ছদ্মবেশ।

৬ হইতে ১১ পর্য্যন্ত নম্বরের প্রজাপতি তাহাদের বর্ণগৌরবেই তাহাদের শত্রুদিগকে জানাইয়া দেয় যে তাহারা অখাদ্য; ৭ক হইতে ১১ক পর্য্যন্ত নম্বরের প্রজাপতি সুখাদ্য হইয়া অখাদ্যের ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে। ৬ নম্বরের পুংপ্রজাপতি ৭ নম্বরের স্ত্রী-প্রজাপতিরই সমজাতীয় কিন্তু ৭ক হইতে ১১ক পর্য্যন্ত ৬ হইতে ১১ নম্বরের প্রজাপতির আকারের অনুরূপ আকারের হইলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয়।

কালিমা ইনাচী প্রজাপতি।

আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পী ও প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এবট্ থেয়ার ও তৎপুত্র জেরাল্ড্ থেয়ারের মতে, প্রাণীদেহের এইরূপ বিচিত্র বর্ণ একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের প্রতিরূপ, অন্যদিকে তেমনি জড়-জগতের বিভিন্নাংশের আলো ও ছায়ার অনুকৃতি। তাঁহাদের মতে জল, স্থল, আকাশ, পর্ব্বত, বন, মরু প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যের চিত্রই পশুপক্ষীর গাত্রবর্ণের মধ্যে অঙ্কিত। বস্তুতঃও তাই। একটী নেকড়ে বাঘের বর্ণের মধ্যে বনভূমির আলোছায়ার একত্র সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়; খরগোসের লেজের বর্ণ আকাশের সহিত অভিন্ন; এবং পেচকের গাত্র অন্ধকার বনদেশের চারু চিত্রবিশেষ। *ময়ূরের গাত্র চিত্রবিচিত্র বলিয়াই সকলে জানেন, কিন্তু ঐ চিত্র যে কিসের প্রতিরূপ, তাহা বোধ হয় অনেকেরই* ধারণা হয় না। কোন বনভূমির বৃক্ষের পত্রান্তরাল দিয়া সূর্য্যরশ্মি নি... আসিয়া প... হইলে ... কিরণে চতুর্দ্দি... ডালপালা, ... পাথর ইত্যাদি... শোভা হয়, ময়ূরে... দেহ তৎসমুদায়েরই প্রতিচ্ছবি।

যে প্রাণী যে স্থানের অধিবাসী তাহার সাধারণ ... তৎস্থানের ন্যায়ই হইয়া থাকে। জলচরের বর্ণ জলের ন্যা... খেচরের বর্ণ আকাশের ন্যায় এবং উভচরের দেহ জ... স্থল ও আকাশের অনুরূপ। ইহার উপর ঐ-সকল প্রাণি... মূল বাসস্থলে আলো ও ছায়ার যে বর্ণচ্ছত্র পতিত হ... তাহাও উহাদের দেহে চিত্রিত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বি... দৃশ্যের সহিত আলো ও ছায়ার এরূপ বর্ণানুকৃতিই ইতর... প্রাণীর আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার মূল। যে প্রাণী সংস্থা... ও অবস্থানের সুযোগে ঐরূপ বর্ণচুরির অধিকতর সুবিধ... পায়, আত্মগোপন দ্বারা আত্মরক্ষার সম্ভাবনাও তাহা... পক্ষে অধিক হইয়া উঠে। কোন একটী ক্ষুদ্র পক্ষী যখ... বাজের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন বুঝিতে হইবে ঐ পক্ষী... সংস্থান ও অবস্থান উভয় সম্বন্ধেই এরূপ অসুবিধাজনক... অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যাহাতে তাহার পক্ষে রঙে... লুকোচুরি দ্বারা বাজের দৃষ্টি এড়াইবার সুযোগ হয় নাই।

মানবীয় চিত্রাঙ্কনপদ্ধতিতে আলো-ও-ছায়া-সন্নিবেশে... যে বিধি আছে, জীবজন্তুর অঙ্গ চিত্রিত করিবার সময়ে... প্রকৃতি তাহার বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন... তদনুসারে প্রাণীদেহের যে অংশ আলোকের দিকে... থাকে তাহাতে ছায়াসম্পাত ও যে অংশ ছায়ার অভিমুখে... থাকে তাহাতে আলোকবিন্যাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার ফল এই হয় যে, জন্তুটীকে দূর হইতে দেখিলে তাহার অবয়ব আরোহ-ও-অবরোহক্রমজনিত পারম্পর্য্য হারাইয়া সংস্থানভূমির ন্যায় আস্তীর্ণ বোধ হয়। ইহাতে *আত্মগোপন করা ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত একাত্ম হওয়ার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। এই জন্যই* জলচর, বনচর, খেচর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর বর্ণ তত্তৎস্থানোপযোগী বিভিন্ন

কালিমা ইনাচী প্রজাপতি বৃক্ষপত্রের অনুকরণ করিয়া গাছে বসিয়া আত্মরক্ষা করে। কোনগুলি পাতা ও কোনগুলি প্রজাপতি ?

আসে তখন উহার ঘাড়ের রং ভুমিতলস্থ সবুজ তৃণের বর্ণ চুরি করিয়া উহাকে শস্পাদির পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তোলে। ঐ অবস্থায় উহার মাথার ঝুঁটিটি বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত পুষ্পকেশর বা তৃণাগ্রভাগের সাদৃশ্য লাভ করিয়া আত্মগোপনের অধিকতর সহায়তা করে। অনেক সময়ে ঐ ঝুঁটি পক্ষীটীর মস্তকের আকার লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যও করে। ইহার পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণাভ সবুজ পত্রের অনুরূপ এবং পক্ষদ্বয় বৃক্ষবল্কল বা পাথরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পেখম ধরিলে ইহার লেজটীকে কুসুমাকীর্ণ বনপ্রদেশের একাংশের ছবি বলিয়াই মনে হয়। অধিকন্তু চলন্ত অবস্থায় উহার চন্দ্রকগুলির উপর আলোক-তরঙ্গের ন্যায় বর্ণের যে দ্যুতি ঝিলিক দিয়া বেড়ায় তাহা দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া পক্ষীটীকে নিশ্চল বলিয়া প্রতীত করে। ইতাবসরে পক্ষীটী যথাস্থানে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

বনচর পশুপক্ষী প্রভৃতির গাত্রে সচরাচর দুই রকম চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একরকম সূক্ষ্ম

প্রকার। কোন কোন জন্তু যে বহুবর্ণবিশিষ্ট তাহার কারণ এই, উহারা মূলতঃ যে-স্থানের অধিবাসী সে স্থানের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও বিচিত্র। তাই উহাদের বর্ণগত সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য এইরূপ বিধান হইয়াছে। ময়ূরের দৃষ্টান্তে এই কথাটী বিশদরূপে বুঝা যাইতে পারে। ময়ূর যখন গাছের উপর থাকে তখন নীচ হইতে লক্ষ্য করিলে উহার নীলবর্ণ গলদেশই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ বর্ণ পত্রান্তরাল-মুক্ত আকাশের বর্ণেরই প্রতিচ্ছবি। আবার উহা যখন নীচে নামিয়া

ভাবে ফুল, পাতা, কাঠ, পাথর, ঘাস ইত্যাদির অনুরূপ ; অন্য প্রকার বৃক্ষকাণ্ড, বৃক্ষশাখা, বৃক্ষবল্কল ইত্যাদির স্থূল প্রতিচ্ছবি। গ্রাউস্ পাখীকে রঙের হিসাবে লেদার নামক একপ্রকার তৃণের ডাল, পাতা, ফুল ইত্যাদির সমন্বয় বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মী পেঁচার গায়ে বৃক্ষ-বল্কলের স্থূল আকার অঙ্কিত। শ্বেতকুক্কুট ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত প্রকৃতির অনুরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাই উহাদের বর্ণ বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা অনুকরণ করে।

সী ড্রাগনের গায়ে সামুদ্রিক উদ্ভিদ দামের অনুরূপ পাখ্না।

প্রাণীর দেহে সূক্ষ্ম চিহ্ন অপেক্ষা স্থূল চিহ্ন থাকাই অনেকাংশে নিরাপদ। উহাতে তাহাদের আত্মগোপনের পন্থা সহজ হয়। গিলিমট পাখীর গাত্রের একাংশ স্থূলভাবে কৃষ্ণ ও অপরাংশ শ্বেতবর্ণ হওয়ায় আকাশে উড়িবার কিংবা পর্ব্বতাদির উপর বিশ্রাম করিবার সময়ে ইহারা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে বৃক্ষাশ্রয়ী ও বনচর পশুর গাত্র চিত্রবিচিত্র। সিংহ, ক্যাঙ্গারু, খরগোস প্রভৃতি যে সকল পশু মুক্ত পথে বিচরণ করে, তাহাদের দেহ অনেকটা একরঙা; কিন্তু চিতা, জিরাফ প্রভৃতি বনচারী পশুর গাত্র রঙিন রেখাবিশিষ্ট। জিরাফের দেহ অবিকল নল ও তৎপার্শ্বস্থ ছায়াসঙ্কুল স্থানের ন্যায় হরিৎ ও ধূসর বর্ণের ক্রম-সন্নিবেশে চিত্রিত। ব্যাঘ্রদেহের হরিতাভ ও কৃষ্ণবর্ণ ডোরা বনপ্রদেশের চারাগাছ ও তৎপার্শ্বস্থ ছায়ার প্রতিচ্ছবি। চিতা, জাগুয়ার প্রভৃতির রং পত্রাবকাশমুক্ত সূর্য্যরশ্মি-সংপৃক্ত ছায়ার ন্যায়। মধ্যপ্রদেশের আউন্স নামক পশু বৃক্ষহীন পার্ব্বত্যভূমির অধিবাসী, তাই উহার রং সর্ব্বত্রই প্রস্তরসদৃশ ধূসর। পামা ও সিংহের অনুরূপ একপ্রকার জন্তুর দেহ শৈশবাবস্থায় বিশেষ চিহ্নবিশিষ্ট থাকে; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিহ্ন লুপ্ত হইয়া উহাকে খাকীরঙা করিয়া তোলে। সম্ভবতঃ এই জাতীয় পশু অত্যল্পকাল পূর্ব্বে বনচারী ছিল, তাই অদ্যাপি শৈশবাবস্থায় বর্ণসম্বন্ধে আদিম বাসস্থানের প্রভাব এড়াইতে পারে

করাতে টিকটিকি সম্মুখ হইতে কাঁকড়া-বিছার ন্যায়; পশ্চাৎ হইতে কটকটে-ব্যাঙের মতন;
পার্শ্ব হইতে কৃকলাশ বা ছোট্ট কুমীরের প্রতিরূপ।

দেহের বর্ণবৈচিত্র্যে বর্ণচ্ছত্রের নর্ত্তনতরঙ্গ শত্রুর দৃষ্টি-বিভ্রমের যে সহায়তা করে, ময়ূরের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বেই তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রজাপতি, বন্য কুক্কুট প্রভৃতি প্রাণী এই ভাবে রঙের লুকোচুরি খেলিয়া আত্মরক্ষার অধিকতর সুবিধা পায়।

না, কিন্তু পরিণত বয়সে মুক্তপথে বিচরণশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-বৈষম্যের হস্ত হইতে মুক্তি পায়।

শুধু মুক্তস্থলের অধিবাসী হইলেই যে জীবজন্তু একরঙা হইয়া থাকে, তাহা নহে, অন্যান্য কতকগুলি কারণেও ইহাদের মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত একাত্ম হইয়া আত্মগোপনের সুযোগ প্রদানার্থই ইতরজন্তুর গাত্রে বর্ণ সংযোজিত হয় ; সুতরাং যে স্থলের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে বর্ণবাহুল্যের অভাব হয়,সে স্থলে জন্তুর দেহও বৈচিত্র্যহীন-বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ নখ, বৃহৎ শৃঙ্গ, দৃঢ় ক্ষুর ও গাঢ় লোম বর্ত্তমান থাকায় যাহাদের বিপদাশঙ্কা কম, এবং হাতী, গণ্ডার, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি যে-সকল প্রাণী স্বভাবতঃ বলদৃপ্ত, তাহাদের রং প্রায়শঃই বাহুল্য-বর্জ্জিত হয়। ঐ সকল প্রাণী শৈশবাবস্থায় সর্ব্বদা পিতামাতার

শামুকের ছদ্মরূপ ; পিঠে আঠা মাখাইয়া ধূলা কাঁকর লাগাইয়াছে।

রক্ষণাধীনে থাকে এবং পরিণত বয়সে দৈহিক শক্তিতে আপনি আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তাই উহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় না। বরাহ, কাক প্রভৃতি নিরামিষাশী প্রাণীর দেহও অনেকাংশে একবর্ণবিশিষ্ট। আহার্য্য সংগ্রহে ইহাদের লুকোচুরি খেলিবার তেমন প্রয়োজন হয় না বলিয়াই উহারা ঐরূপ রঙের অধিকারী। শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশে কাকপক্ষীর স্বাভাবিক ধূর্ত্ততাই যথেষ্ট, তার উপর কৃষ্ণাবয়ব ও ধূসর গলদেশ ও বক্ষঃস্থল উহাকে পত্রান্তরালে লুকাইয়া রাখিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। হিমালয়, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের কয়েক জাতীয় শূকর মাংসাশী ; নিরামিষাশী শূকরের তুলনায় তাই তাহাদের বর্ণ চিত্রবহুল। বিড়াল ও কুকুর নিরামিষ আমিষ উভয়েরই পক্ষপাতী, রঙের সম্পর্কে ইহাদের দেহও তাই বিচিত্র। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে, সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ মার্জ্জারেরও উদরের নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ হরিতাভ বা পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট।

বানরজাতি সাধারণতঃ ফলমূল ও কীটপোকা খাইয়া জীবনধারণ করে। ঐ-সকল আহার্য্য সংগ্রহের জন্য উহাদিগকে তেমন বেগ পাইতে হয় না, তাই উহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নিশাচর মাংসাশী প্রাণীর হস্তে আপনাদের বিপদাশঙ্কা আছে বলিয়া আত্মগোপনের জন্য ইহাদের রঙ গাছের প্রতিচ্ছবি ও রাত্রির ন্যায় গাঢ় হইয়াছে। অধিকাংশ বানরেরই দেহ গাঢ় বা ফিকে পাণ্ডুবর্ণের উপর হরিতাভ বা পাটকিলে রঙবিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ। সিংহলে একপ্রকার বানর আছে, তাহারা রঙের সাদৃশ্যপ্রযুক্ত তালগাছে দলকে দল লুকাইয়া থাকিতে পারে। আফ্রিকার কৃষ্ণ বানরগুলির লোমের উপর গোলাকার যে চিহ্ন দেখা যায় তাহা উহাদের বাসস্থল বৃক্ষগাত্রস্থ চিহ্নের প্রতিরূপ। ঐ জাতীয় বানরের লেজ ও মুখের শ্বেতবর্ণও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের একাংশের ছবি।

বাঘের গায়ের রং পারিপার্শ্বিক বনের অনুরূপ, ও তাহার মুখে আলো ছায়ার প্রতিরূপ।

মাংসাশী প্রাণী তৃণজীবীর ঘোর শত্রু। তাই উহাদের বাসস্থান এক হইলেও, দেহের রঙ অনেকাংশে পরস্পরের বিপরীত। হরিণ, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর দেহ হরিৎ ও শ্বেতবর্ণের মিশ্রণে সুচিত্রিত ; কিন্তু ব্যাঘ্রপ্রমুখ মাংসাশী প্রাণীর গাত্রে হরিতের পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণেরই সমাবেশ দেখা যায়। এই দুই জাতীয় প্রাণীর গাত্রস্থ ঐরূপ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ আলো ও ছায়ার প্রতিরূপ, সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন।

গেছো চিতার বর্ণ গাছের ডালপাতার সুসদৃশ।

বনের মধ্যে জাগুয়ারের আত্মগোপন।

হরিণ অনেক সময়েই জলের সন্নিহিত স্থলে বনভূমিতে বাস করে, তাই উহার দেহ বনচ্ছায়ার অনুরূপ কালো বা আলো-ছায়ার প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত। ভারতের ফোঁটা-ফোঁটা দাগওয়ালা হরিণগুলি বনপ্রদেশের অধিবাসী, তাই উহাদের দেহে আলো-ছায়ার চিহ্ন বর্ত্তমান। কিন্তু ফিকে রঙের হরিণ বসন্তকাল ব্যতীত বনে না থাকায় বসন্তশ্রীর সঙ্গে ফোঁটাযুক্ত হয় ও শীতঋতুতে একরঙা হইয়া থাকে। কৃষ্ণসার দিবাভাগে নিবিড় বনে

বাস করে এবং রাত্রে অন্ধকারের সুযোগে জলপান করিতে বাহির হয়। উহাদের কৃষ্ণ বর্ণ উহাদের এই অভ্যাসের অনুকূল। এক প্রকার হরিণের বর্ণ এরূপ পাটকিলে যে উহারা মাথা নীচু করিয়া ঘাস খাইবার সময়ে উহাদিগকে উইয়ের ঢিবির মত দেখায়। গেজেল পর্য্যায়ের মৃগের দেহ হরিতাভ। কোন কোন সময় উহাদের মস্তকে বা পৃষ্ঠে একটা সাদা দাগও দেখা যায়। ঐ রং দুইটীর সমবায়ে

জিরাফের অঙ্গে বনপ্রদেশের আলো ছায়ার প্রতিরূপ।

এই প্রাণীকে বালুর স্তূপ ও তৎপার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কুডুজাতীয় হরিণের নীলাভ বর্ণ কুয়াসার ন্যায় এবং গায়ের ডোরা ও মুখের শ্বেতচিহ্ন বনের একাংশে সূর্য্যকিরণসম্পাতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই প্রাণীর বক্রশৃঙ্গ, সকলজাতীয় হরিণের শৃঙ্গেরই ন্যায়, শুষ্ক শাখার অনুকরণে গঠিত।

বাবলাগাছের নিকট দাঁড়াইলে জিরাফের দেহস্থ বিভিন্ন রঙের ডোরাগুলি বৃক্ষাবকাশ-মুক্ত সূর্য্যরশ্মির পার্শ্বে ঐ বৃক্ষের সাদৃশ্য লাভ করে। বন্য ভেড়া ও ছাগ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর দাঁড়াইলে উহার সহিত তাহাদের বর্ণ এত সহজে মিশিয়া যায় যে তাহাদের পৃথক সত্তা অনুভূত হয় না। মধ্য এসিয়ার বন্য ছাগ ও টাটু ঘোড়া ধূসর বর্ণের সুযোগে তত্রত্য বালুকাময় প্রদেশে এবং উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার ছাগ কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া স্বীয় বাসস্থান বনভূমিতে সহজে আত্মগোপন করিতে পারে।

সুদান, সোমালীল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের ঘোড়ার সর্ব্বাবয়ব জেব্রার অঙ্গের ন্যায় শ্বেত ও কৃষ্ণরেখায় মণ্ডিত। ঐ রেখার শ্বেতাংশে আলোর ক্রিয়া যেরূপ অধিক হয়, কৃষ্ণাংশে তদ্রূপ না হওয়ায় প্রাণীটীর দেহের কতকাংশ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে; ফলে, উহার শরীরের আকার সমগ্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষ্ণবর্ণে আলোর প্রতিক্রিয়া যে এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রমে সহায়তা করিতে পারে, ম[illegible]বরাজ্যের পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যেও তাহার নিদর্শন হয়ত অনেকে পাইয়াছেন।

বিলাতের যে-সকল মহিলা অস্থিচর্ম্মসার তাহারা কৃষ্ণপরিচ্ছদের আবরণে রূপের লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়; রোগা মুষ্টিযোদ্ধা স্কচগণ অনেক সময়ে কৃষ্ণসজ্জায় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীকেও খেলায় হারাইয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, কৃষ্ণবর্ণের উপর আলোকরশ্মি উপযুক্ত-রূপে প্রতিফলিত হইতে না পারায় উহা যে-পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহার আকার সুস্পষ্ট প্রকটিত হইতে পারে না। একটী সহজ দৃষ্টান্তে এ কথাটী আমরা পরিস্ফুট করিতেছি। একটি ধূসরবর্ণের ছিপির গায়ে একটী পিন আঁটিয়া উহা একদিকে দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলে এবং অপরদিকে ঐরূপভাবে সংস্থিত আর একটী ছিপির আশে পাশে কৃষ্ণবর্ণ মাখাইয়া দিলে, প্রথমোক্ত ছিপি যেরূপ সহজে দৃষ্টিগোচর হইবে শেষোক্তটী তদ্রূপ হইবে না,—এমন কি, কৃষ্ণভূমির উপর সংস্থিত ছিপিটী সামান্য দূর হইতে দেখিলেও একরূপ অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণবর্ণের উপর আলোর এইরূপ প্রতিক্রিয়ার দরুণই ইতর প্রাণীর উদরের তুলনায় পৃষ্ঠভাগের বর্ণ অধিকতর গাঢ় হইয়া থাকে। কাঠবিড়াল, উদ প্রভৃতির উদরনিম্নের

শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ গোপন রাখিবার পক্ষে অধিকতর সহায়তা করে। বাঘ, নেকড়ে, জাগুয়ার, হরিণ প্রভৃতি জন্তুর দেহের শ্বেতাংশও ঐ ভাবে কৃষ্ণাংশ গোপন করিবার কার্য্য করে। উত্তরপূর্ব্ব আফ্রিকার কুডুজাতীয় ও ভারতের দাগওয়ালা হরিণের কণ্ঠনালী, ঘাড় ও বক্ষঃস্থলে যে শ্বেতচিহ্ন আছে তদ্দ্বারা উহার মস্তক ও গলদেশের কৃষ্ণাভ অংশ ঢাকা পড়ে। ঐরূপে উহার অধমাঙ্গের শ্বেত চিহ্ন বুক ও কুঁচকির কৃষ্ণাংশ এবং উৰ্দ্ধোষ্ঠ ও চিবুকের শ্বেতচিহ্ন নাক ও মুখের কৃষ্ণবর্ণ গোপন রাখিবার সহায়তা করে। শুশুকের পৃষ্ঠদেশ ধূসরবর্ণ ও উদর শ্বেত। জলে যে সামান্য সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হইলে জলের যে বর্ণ হয়, ঐ ধূসর বর্ণ তাহারই প্রতিরূপ। ঐ জন্তুর উদরস্থ শ্বেতবর্ণ ঐ ধূসরবর্ণকে গুপ্ত রাখিবার যথেষ্ট সহায়তা করে। এই জন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও রঙের লুকোচুরি দ্বারা অনেক সময়ে সুবৃহৎ তিমিমাছকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। শিলমাছের বর্ণও এইরূপ। ইহাদের নাসিকাগ্রভাগ হইতে যে ফ্যাকাসে চিহ্নটী লম্বমান আছে তাহা একদিকে যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় দৃষ্ট হয়, অপরদিকে উহার উপরই আলোর প্রতিক্রিয়া অধিক ঘটায় দেহের কৃষ্ণভাগ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কোন কোন হরিণের পশ্চাৎভাগ চারকোণা শাদা ডোরায় চিত্রিত। হরিণ দণ্ডায়মান হইলে ঐ অংশের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু উপবেশন করিলে চরণ ও উদরের শ্বেতবর্ণের সহিত মিলিয়া উহা শুভ্র জড়পদার্থের ন্যায় অনুভূত হয়। চীনদেশের গন্ধগোকুল জাতীয় একপ্রকার প্রাণীর নাক, চোখ, কান, গাল, মুখ প্রভৃতির উপর সাদা চিহ্ন থাকায় রঙের বিশেষ প্রকটনে উহাকে বাঘের ন্যায় দেখায়। ঐ বলূটিবকের নাক ও কপাল শ্বেতবর্ণ এবং জেম্স্‌বকের মস্তক জেব্রার দেহের ন্যায় শ্বেতকৃষ্ণ রেখাবিশিষ্ট। এই সকল প্রাণী যখন শিকার-অন্বেষণে জঙ্গলে ওৎ পাতিয়া বসে তখন উহাদের মুখের শ্বেতাংশ মুখের অন্যান্য ভাগকে সুস্পষ্ট হইবার পক্ষে বাধা জন্মায়। তৃণজীবী প্রাণী যখন শক্রর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখের দিকে কুঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং নাক, মুখ, চোখ ফুলিয়া উঠে। ঐ অবস্থায় উহাদের মুখের বা দেহের যে-কোন শ্বেত অংশ সুপ্রকটিত হইয়া অন্যান্য অংশকে হীনপ্রভ করিয়া তোলে। ফলে, উহার আকৃতির অনেকাংশ লুপ্ত হইয়া উহাকে বাহ্যতঃ জড়পদার্থের অনুরূপ দেখাইয়া বিভ্রম ঘটায়।

হরিণের অঙ্গে বনপ্রদেশের আলোক বিন্দুর প্রতিরূপ।

তৃণজীবীর লেজের গোড়ায় বা মলদ্বারের আশে-পাশে প্রায়ই শ্বেত, লাল প্রভৃতি বর্ণের নানারূপ চিহ্ন দেখা যায়। মাংসাশী প্রাণীর দেহে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই যে, মাংসাশী প্রাণী স্বতঃই বলদৃপ্ত হওয়ায় উহাদের মধ্যে একে অন্যের সাহায্যাপেক্ষী না হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। কিন্তু তৃণজীবী প্রাণীর পক্ষে সে সুবিধা প্রায়শঃই না থাকায় অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয় এবং ঐ অবস্থায় উহাদের পলায়নের আবশ্যক হইলে ঐরূপ চিহ্ন বিপদকালীন সঙ্কেতের কার্য্য করিয়া থাকে। পলায়নের সময়ে তৃণজীবীগণ প্রায়ই লেজ খাড়া করিয়া দৌড়াইতে থাকে এবং একে অন্যের অনুসরণ করে। ঐ সময়ে লেজের গোড়ার শ্বেত বা রক্ত চিহ্ন দেখিয়া উহারা পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিবার পক্ষে অধিকতর সুবিধা পায়। পলায়নকালে মাঞ্চুরিয়ার একজাতীয় মৃগের লেজের গোড়ার লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে, তাহাতে উহার চতুর্দ্দিকস্থ শ্বেতচিহ্নটী বৃহৎ দৃষ্ট হয়। বসন্তমৃগ পলায়নের সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে লেজের গোড়ার লোম খাড়া করিয়া তৎপার্শ্বস্থ শ্বেতচিহ্নের প্রসার ঘটাইতে পারে। যে-সকল প্রাণীর লেজের গোড়ার ন্যায় উদরনিম্নেও শ্বেতচিহ্ন আছে, পলায়নের সময়ে লেজ খাড়া হইলে ঐ উভয় শ্বেতাংশ মিলিত হইয়া সুদৃশ্য সঙ্কেতের কার্য্য করে। বানর সবুজ গাছপালার উপর বাস করে। শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণই ঐরূপ রঙের গাছপালার মধ্যে স্পষ্টতরভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, অধিকাংশ পক্কফলের রঙের দৃষ্টান্তেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই বানরের লেজের নিম্নাংশে লালবর্ণের চিহ্ন বর্ত্তমান। পলায়নের সময় বানর যখন লেজ খাড়া করিয়া ছুটিতে থাকে তখন উহাদের লেজনিম্নস্থ ঐ রক্তচিহ্ন সঙ্কেতস্বরূপে একে অন্যকে অনুসরণ করিতে আহ্বান করে।

গন্ধগোকুলের মুখে আলো ছায়ার প্রতিরূপ।

এইরূপ যে দিক দিয়াই আমরা প্রাণীদেহের বর্ণবিচার করি, সেই দিকেই উহার কোন-না-কোন সার্থকতার পরিচয় পাই এবং উহারই মধ্যে ইতর জীবের আত্মরক্ষার সন্ধান পাইয়া বিস্মিত হই। এই রঙের লুকোচুরি জীবরাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ইহাতেই উহার জীবনরক্ষা হইতেছে। একদিনের জন্যও যদি প্রাণীজগতের এই লুকোচুরি খেলা থামিয়া যায়, তবে অধিকাংশ জন্তুর আত্মবিলোপ ঘটিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না।

হরিণের পশ্চাৎ-দেশে পলায়ন-সঙ্কেত শাদা দাগ।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সকল দেশেই দেখা যায় যে যশোপার্জ্জনের নিমিত্ত জনসমাজে বিষম সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অনবরত চলিলেও মধ্যে মধ্যে অনাড়ম্বর, নীরব ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মীরও অভাব হয় না। বঙ্গদেশে ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুধী-সমাজে অতি স্বল্প পরিজ্ঞাত। ইহার মুল কারণ, ইনি একজন নীরব কর্ম্মী ছিলেন ও খ্যাতি লাভের জন্য তাঁহার কোনো উৎকণ্ঠা বা চেষ্টা ছিল না। তিনি লুকাইয়া দেশের ও দশের কাজ করিতে বরাবরই ভাল বাসিতেন। নবীন বাবু পল্লীগ্রামে থাকিয়া নীরবে দেশের উন্নতির জন্য নানারূপে চেষ্টা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের মন্দিরে মহা সাধনা দ্বারা পুণ্য লাভ করিয়া সাধনোচিত নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলি জেলার অন্তর্গত ডুমুরদহের জমিদার-বংশসম্ভূত। এই বংশ নবাবি আমলের জমিদার—ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নবাব সরকারে উচ্চ উচ্চ পদ লাভে গৌরবান্বিত ছিলেন। বংশবিস্তার হেতু নবীন বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ ডুমুর-দহের নিকটে ভাগীরথীর অপর পারে মুরাদপুর বা মুরাতিপুর নামক গ্রামে আসিয়া বাস সংস্থাপন করেন। মুরাতিপুর কাচড়াপাড়া হইতে এক ক্রোশ উত্তরে, ও যে ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মেলার জন্য প্রসিদ্ধ, সেই ঘোষপাড়া উক্ত মুরাতিপুরের একটি পাড়া মাত্র।

১৮২৪ খৃঃ শ্রীপঞ্চমী সরস্বতী পূজার দিন নবীন বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺ পিতাম্বর রায় ("রায়" নবাবদত্ত উপাধি) এবং মাতার নাম ৺ সরস্বতী দেবী। বাল্যকাল হইতেই নবীন বাবুর স্বভাবদত্ত বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং মতামত প্রকাশে নির্ভীকতা সকলকেই বিস্মিত করিত। কিছু দিন হুগলি কলেজে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ মৃত উকিল ঈশানচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঐ সময়ে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। নবীন বাবুর পিতা জমিদারী কার্য্যে দক্ষ ছিলেন এবং কলিকাতার কোন জমিদারের হালিসহরে স্থিত মহলের নায়েব ছিলেন। ইংরাজি লেখাপড়ার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রলোক যেমন হইতেন তিনিও সেইরূপ উর্দ্দু ও পারশী ভাষাবিৎ ছিলেন। নবীনকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। রাজকৃষ্ণ বাবু জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কিন্তু নবীনকৃষ্ণ বাল্যকালেই ঘোষপাড়াস্থিত খৃষ্টান মিসনারিদিগের সংসর্গে আসাতে একাগ্রচিত্তে ইংরাজি বিদ্যা অর্জ্জনে ব্রতী হইলেন। পরে তিনি কলিকাতায় উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষার জন্য আসিলেন ও পিতার পরিচিত কোন ধনী লোকের গৃহে অনাদৃত ভাবে থাকিয়া প্রাণপণ ক্লেশে বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে রত হইয়া বহুদিন যাপন করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ষোল হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে হইবে। কাচড়াপাড়া-নিবাসী তাৎকালীন কবিকুল-চূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় নবীন বাবুকে একদিন তত্ত্ববোধিনী সভায় লইয়া গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। এই সময় হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার নবীনকৃষ্ণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজি ভাষায় নবীন বাবু এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং সেক্সপীয়রের অনন্ত মাধুর্য্যবর্ষী কবিতামালা তিনি এমন চমৎকার ভাবে অনর্গল বলিতে পারিতেন, যে, সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন তাঁহাকে সাদরে সেক্সপীয়রের একখানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থাবলী উপহার দেন। এই স্থলে একটি কথার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন। যে বংশে অনেকে সুশিক্ষিত, সে বংশের একটি বালকের পক্ষে সুশিক্ষিত হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়, বরঞ্চ সুশিক্ষিত না হইলে লজ্জার বিষয় হয়। যে প্রদেশে বা যে গ্রামে অধিকাংশ লোক শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে, সে গ্রামের বালকেরা শিক্ষিত হইবে না কেন? কিন্তু নবীন বাবুর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার পিতা বা ভ্রাতা বা গ্রামস্থ অপর কেহই ইংরাজি বা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, কেহই ইংরাজি শিক্ষা দানে উৎসাহশীল নহেন, সে ক্ষেত্রে স্বয়ং উদ্দাম সহকারে ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষায় নিযুক্ত হওয়া কত দূর গৌরবের কথা তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। অক্ষয় বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি পোপ হইতে যে

লাইনটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও আমরা তাহা প্রয়োগ করিতে পারি—By Heaven and not a master taught.

এই সময়ে শান্তিপুরের জমিদার ৺ রাজচন্দ্র রায় মহাশয় সুপ্রীম কোর্টের একটি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া নবীনকৃষ্ণকে দিয়া একটি নথীর ইংরাজি হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া লন ও বালক নবীনকৃষ্ণের অসামান্য দক্ষতা দর্শনে তদবধি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করেন ও শান্তিপুরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে স্ববংশীয় ৺ ঈশানচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র রায় ও ব্রজলাল রায় মহাশয়গণের শিক্ষক রূপে নিয়োজিত করেন। রাজচন্দ্র বাবু একজন বিশিষ্ট পারস্যভাষাবিৎ ছিলেন। তাঁহার নিকট নবীন বাবু সংস্কৃত পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা উত্তমরূপে শিখেন। শেষে তাঁহার ইংরাজী, সংস্কৃত, পারস্য, উর্দ্দু, আরবী, ও হিন্দি ভাষায় এরূপ অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল যে স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্তের পর তাঁহাকে "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার" সম্পাদকের গৌরবান্বিত উচ্চ আসনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীবর্গ অধিষ্ঠিত করেন। সে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের কথা, তখন নবীন বাবুর বয়স ৩১ বৎসর।

স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তিপুরে কয়েক বৎসর উত্তমরূপে কার্য্য করার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নবীন বাবু "সংবাদ-প্রভাকরে" গদ্য ও পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার" সহকারী সম্পাদক হন। অক্ষয়-কুমার তাঁহাকে সহোদরের অপেক্ষা শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে বিমল ও অতুল বন্ধুতা জন্মিয়াছিল তাহা একান্তই বিরল। অক্ষয়কুমারের কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে নবীনবাবুর কিছু কিছু

লেখা পাওয়া যায়। "উপাসক-সম্প্রদায়" রচনাকালে নবীনবাবু অক্ষয়বাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। নবীন বাবুর তিনখানি গ্রন্থ সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। (১) প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক or Natural Theology in Bengalee। এই বইখানি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এবং চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষায় উত্তীর্ণ হন, এ কথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে নবীনবাবুর স্মৃতিসভায় তিনি স্বমুখে স্বীকার করেন। (২) জ্ঞানাঙ্কুর ১ম ভাগ—বোধ হয় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্য নির্ব্বাচিত ছিল। এবং (৩) জ্ঞানাঙ্কুর ২য় ভাগ—ইহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন তিনি একখানি ভারতবর্ষের ভূগোলবিবরণ লিখিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের ইতিহাসের একখানি প্রশ্নোত্তর পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। "The Great Rent Case" বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের যে মামলা ভারতবিখ্যাত, সেই মোকদ্দমার সময়ে, তিনি সুপ্রীম কোর্টে বসিয়া আদালতের ঘটনাবলী ও বক্তৃতামালা হুবহু বাঙ্গালা ভাষায় রিপোর্ট (Report) করিয়া যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহা দেখিয়া তদানীন্তন বঙ্গীয় ছোটলাট সার ফ্রেডেরিক হালিডে তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তেজস্বী নবীনকৃষ্ণ বলেন, "আমার সামান্য গুণের উৎসাহ দেওয়ার জন্য লাট বাহাদুরকে শতবার ধন্যবাদ করিতেছি, কিন্তু আমি বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা, ধর্ম্মান্দোলন ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আমি গভর্ণমেন্টের কার্য্য করিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া দেশের সমূহ ক্ষতি করিতে পারিব না।" এই কথাগুলি বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিবার মতন। প্রত্যুতঃ, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে সেকালে স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিপ্রভাবে জেলার কালেক্টার হইতে পারিতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক সময়ে তিনি আইনও পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু ওকালতি পরীক্ষা দেন নাই। বহুতর বড় বড় উকিল অনেক সময় তাঁহার অসাধারণ আইন-জ্ঞান দেখিয়া, English and Roman Law বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেন। হুগলীর প্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র, সি-আই-ই ও যশোহরের সুবিখ্যাত প্যারীলাল গুহ প্রভৃতি উকিল, এবং সূর্য্যকুমার সেন, রামচরণ বসু, শ্যামাধব রায়, প্রভৃতি বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাঁহার আইন-জ্ঞান দেখিয়া বহুবার তাঁহার পরামর্শ লইয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের উকিল হইলে তিনি হয়ত পরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত বা অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ জজ হইতে পারিতেন। ডাক্তারি বিদ্যাও তিনি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার যে জীবনচরিত আমি লিখিতেছি তাহাতেই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

এস্রাজ ও সেতার বাজাইতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একজন সুরসিক মজলিসি লোক আজকাল পাওয়া নিতান্তই দুর্ঘট।

তিনি ১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। মহর্ষি এই সময়ে অধিকাংশ কাল হিমালয় শৈলে বাস করিতেন। তখন নবীনকৃষ্ণ বহুতর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কুতব মিনার সম্বন্ধে একটি ও যবদ্বীপে হিন্দুদিগের বাস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছিল, এবং ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তৎকালের একমাত্র অসামান্য ধীসম্পন্ন অক্ষয়কুমার ব্যতীত অপর কাহারও রচনার মধ্যে ঐরূপ লেখা পাওয়া দুষ্কর। সামাজিক সংস্কার, ভগবানের নিকট সুমধুর প্রার্থনা ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ঐ সময়ে তত্ত্ববোধিনীতে তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশ কার্য্যে তিনি ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন; বহুকাল উহার সহযোগী সম্পাদকও ছিলেন। পরে ঐ পত্রিকা যখন ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের হস্তে আসে তৎকালে কিছুকাল উহার সম্পাদক ছিলেন। রহস্য-সন্দর্ভ, বামাবোধিনী পত্রিকা, বঙ্গবাসী, বঙ্গনিবাসী, সুরভি ও

পতাকা এবং শেষ বয়সে সঞ্জীবনী ও ভারতীতেও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। ইংরাজি কাগজ "হিন্দু পেট্রিয়টের" তিনি ৮।৯ মাস কাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর এড়ুকেশন গেজেটেরও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত অনুবাদ কার্য্যে তিনি সবিশেষ সাহায্য করেন এবং "হুতুম পেঁচার নক্সার" মধ্যেও তাঁহার অনেক রচনা আছে, সেকথা তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু বেহালার শ্রদ্ধেয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে স্বয়ং বলিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। নবীনবাবু কালীপ্রসন্নবাবুকে তাঁহার বিপুল ধনের সদ্ব্যবহার করিতে নিয়তই প্রোৎসাহিত করিতেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উষার কনক রাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন কীর্ত্তিমান্ দেবেন্দ্রনাথ বৈদিক ভিত্তির উপর এক নব সংস্করণের বেদান্তধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তখন উহার প্রচারকার্য্যে নবীনবাবু তাঁহার একজন প্রধান সহায় ছিলেন। ভবানীপুর, বেহালা, কলিকাতা, ঘোষপাড়া, ডুমুরদহ, বলাগড়, রাণাঘাট, উলা, শান্তিপুর, চুঁচুঁড়া, কালনা, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, বনগ্রাম, যশোহর, সাতক্ষীরা ইত্যাদি অঞ্চলে তিনি বহুতর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রকে তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, নতুবা কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ শৈলনিবাসে দিন যাপন করিতেছিলেন। একথা স্বয়ং নবীনবাবু বিশ্বকোষে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি খরধার তরবারি লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে আজ প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বের কথা। সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তাঁহার প্রবল উৎসাহ ছিল এবং নিজে দরিদ্র হইয়াও স্বীয় গ্রামে একটী উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ও একটী ক্ষুদ্র বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় অবসরপ্রাপ্ত সবজজ্ আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত হরিলাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ তিনি ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে হইতে দেন নাই—শুধু কথায় নহে কাজেও তিনি তাঁহার মত খাটাইতেন।

তিনি স্বয়ং জমিদারবংশীয় ছিলেন এবং জমিদারী কার্য্যে একজন অদ্বিতীয় কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা সার রাধাকান্ত, নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার-বাবুদিগের এবং সাতক্ষীরার প্রখ্যাতনামা বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের ষ্টেটের ম্যানেজার থাকিয়া তিনি উক্ত ষ্টেটসকলের যথাসাধ্য উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যেমন যশঃপ্রার্থী ছিলেন না, অর্থ রক্ষা করিতেও সেইরূপ আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না;—কপর্দ্দকশূন্যভাবে পরলোকে গমন করিয়াছেন। গোল্ডস্মিথের ন্যায় অর্থের অভাব প্রযুক্ত অহরহ দারুণ ক্লেশের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়াছিলেন। তিন-চারিশত টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিককাল কোথাও থাকিতে পারিতেন না, কারণ পরাধীনতা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার মুখের দুইটি চিত্তজয়ী প্রধান কথা এখনও আমাদের স্মৃতিপথে তৎকালাপেক্ষা আরও শতগুণ শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া নিরবধি প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—কথা দুইটি এই—

১। The world goes one way,
And I go the other.

২। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বং আত্মবশং সুখং।

তিনি সরলতার অবতার ছিলেন। তাঁহার দোষ ও গুণ উভয়ই উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিভব ও ঐশ্বর্য্য পূজার এবং এই বিসদৃশ রাজসিকতার মহা পার্ব্বণের দিনে তাঁহার ন্যায় অসমসাহসিকতা অতুল স্পষ্টবাদিতা ও অসামান্য তেজস্বিতা আর আমরা অল্পই দেখিতে পাই।

তাঁহারা তিনটি বন্ধু ছিলেন,—ঠিক যেন এক বৃন্তের তিনটি ফুল, এক অভিন্ন গোলাপের তিনটি চমৎকার মনোরম পাপ্‌ড়ি—সে তিন জন অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দকৃষ্ণ বসু। শেষোক্ত মহাত্মা বঙ্গের একজন অদ্বিতীয় মনীষী ও অসাধারণ মনস্বী ছিলেন, তাঁহার মত পণ্ডিত, সেরূপ অত্যধিক ভাষাবিৎ, সংসারের কুটিলতার লেশস্পর্শহীন, অনাবিল শতদলের

মত প্রাণ-প্রসূনে অলঙ্কৃত অনাড়ম্বর ও নিরহঙ্কার লোক আর আজকাল দেখা যায় না। আনন্দবাবু রাজা স্যার রাধাকান্তের দৌহিত্র। নবীনবাবু তাঁহাকে প্রায় দুই হাজার টাকা ঋণ দিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের গভর্ণমেণ্টের চাকরির সুবিধা করিয়া দেন। এরূপ বন্ধুত্ব আজকাল আর কয়টা মিলে? নবীনবাবু শেষ জীবনে শোভাবাজার রাজবাটীস্থিত আনন্দবাবুর গৃহেই অধিক দিন যাপন করিতেন। তথায় গৌরদাস বসাক এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর তর্কশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। সেকালের বহু বিজ্ঞ লোকে রহস্য করিয়া বলিতেন, "ইঁহাদের তিন বন্ধুর আনন্দ কি কম? উহা অক্ষয় এবং নবীন আনন্দ, ইহারা অক্ষয়, নবীনানন্দ!" প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিমূর্ত্তির মত' তিন বন্ধু মিলা ভার।

নীল বিদ্রোহের সময় তিনি স্বদেশবাসীর দুঃখ দৈন্য দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শত বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় জ্বালা অনুভব করিতেন এবং তৎসম্পর্কে বহু পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি অল্প শ্রম করেন নাই। Jury Notification, Local Self Government Act, Ilbert Bill Agitation ইত্যাদির কালে তিনি বক্তৃতা ও রচনাদির দ্বারা দেশমাতৃকার যথাসাধ্য সেবা করিয়া গিয়াছেন। Bengal Tenancy Bill পাশের সময়ে তিনি British Indian Association কর্ত্তৃক উক্ত সভার ডেলিগেট নিযুক্ত হইয়া বঙ্গের কয়েকটি জিলায় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বক্তৃতাদি দ্বারা দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করেন।

শেষ বয়সে বিশ্বকোষে কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে—১। কর্ত্তাভজা ২। কবি ৩। কবিকঙ্কন ৪। কবিরঞ্জন ৫। কৃত্তিবাস ৬। কুমারহট্ট ৭। কাঞ্চনপল্লী ৮। উলা ৯। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১০। কোরান ১১। কেশবচন্দ্র সেন ১২। কালীপ্রসন্ন সিংহ—এই কয়টি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনন্দ বাবু ও নবীন বাবু এই দুই বন্ধুতে যুবক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে নব আশায় সঞ্জীবীত করিয়া তুলেন।

শেষ বয়সে নবীন বাবু অনেকটা রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন ও Age of Consent Billএর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতীয়ানার স্রোত ফিরাইতে সদাই বদ্ধপরিকর ছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর মুরাতিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রী বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

পত্তন

দিল্লীতে নব রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকা যাইবে কি P. W. D.র বড়-সাহেবকে তলব দেওয়া হইবে এই বিতণ্ডার ঢেউ আমাদের মানসিক জড়তার উপরে কোনদিন আসিয়া আঘাত করে নাই;—উচ্চশিক্ষার উচ্চ ডালে মন আমাদের পরমসুখে জ্ঞান-ফল ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত, ভারতীয় স্থপতিগণের কপাল, ভারত স্থাপত্য-শিল্প ও সেই শিল্পের বিজয়-ধ্বজার সহিত ভাঙিয়া পড়ুক তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু হায়, যে বৃক্ষের ডালে আমরা ভর দিতে চাহি সেই বৃক্ষ যে বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরের সুদৃঢ় প্রস্তরভিত্তিকে বিদীর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজের এবং আমাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছে সেটা সুনিশ্চিত। এমন একদিন আসিবে যেদিন দেখিব আমরা সম্পূর্ণ সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছি অথচ সভ্যতার যে প্রধান লক্ষণ স্থাপত্য এবং শিল্প বিষয়ে কৃতিত্ব, তাহার চিহ্নমাত্র আমাদের নাই; আমরা দাঁড়ে বসিয়া মুখস্থ বুলি আওড়াইতেছি কিন্তু নিজের বাসাটা পর্য্যন্ত নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছি। উচ্চশিক্ষার উচ্চতার সঙ্গে আমাদের পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিস্তম্ভের চূড়া যদি উচ্চতর হইয়া না ওঠে তবে কোন্ লাভ? ফলন্ত গাছ শুখাইয়া দিয়া, মাথার উপরে ছাত ফাটাইয়া আমার সাধের উচ্চশিক্ষার পরগাছা বজায় থাক—এইটাই যদি আমাদের মনোগত অভিপ্রায় হয় তবে বলিয়া রাখি প্রলয়-ঝড় যেদিন আসিবে সেদিন দেখিবে যে পরগাছার মূলে এমন কিছু নাই যেটাকে আঁকড়িয়া সে নিজেকে এবং পরমুখাপেক্ষী আমাদের খাড়া রাখিতে পারে।

এমন লোক আমরা দেখিয়াছি যে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের মাথা এবং নিজের আশপাশের সামগ্রীগুলা দেখিবার ক্ষমতাটারও ইহকাল পরকাল খাইয়া বসিয়াছে। আমরাও ঠিক সেইরূপই করিতেছি। বিশ্বব্যাপিনী কোন-এক বিশ্ববিদ্যাকে দেখিবার আশায় শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তি এতই সূক্ষ্ম করিয়া আনিয়াছি যে বিশ্বকর্ম্মা যে আমাদের কাছেই ছিলেন এবং এখনও সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন এটা আমরা ধারণার মধ্যেই আনিতে পারিতেছি না। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যা অথবা আর-একটা-কিছু—আমাদিগকে যে-লোকে বাস করিতে হইবে, যাহা লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইতে আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া এমন একটা লোকান্তরের দিকে আমাদের লইয়া চলিয়াছে যেখানে মানুষ নিজের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হারাইয়া না-স্বর্গ না-মর্ত্তের মাঝে কক্ষচ্যুত একটা উৎপাত গ্রহের মত কেবলি ঘুরিতে ঘুরিতে নিজেকে ছাই করিয়া লোপ করিয়া দিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকে। আমরা যে নিজেকে কক্ষচ্যুত হইতে দিয়া গৃহহারা হইতে বসিয়াছি, এবং এইভাবে আরও কিছুকাল চলিলে আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের মন্দির মঠ, আমাদের মতে গঠিত হইতে না দিয়া P. W. D.র বড়-সাহেবদের মতে গঠন করিয়া চলিলে অল্পকালের মধ্যেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে আমাদের যাহা ছিল, যাহা এখনও আছে এবং যাহা পরেও থাকা উচিত তাহার যে কিছুই থাকিবে না, ইহাই হ্যাভেল সাহেব তাঁহার নব-প্রকাশিত Indian Architecture নামক গ্রন্থের * পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট ও সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

আগ্রার তাজ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীকমন্দিরের ছাঁচে গঠিত অধুনিক ও সুসভ্য লক্ষারের পোষ্টআফিস পর্য্যন্ত আমাদের স্থাপত্য-কীর্ত্তির আদ্যন্ত ইতিহাস চিত্রের পর চিত্র দিয়া তিনি এমন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন যে বিশ্বকর্ম্মার ইন্দ্রসভায় আর P. W. Dর সেনেট্‌ হাউসে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতের যে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলা ঠিক আমাদের, সেইগুলাকেই ফার্গুসন্ প্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে মত দিয়া আমরা কতকাল আমাদের নয় বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছি;—আর আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়, ইহাই একজন সাহেব আমাদের হইয়া জগতে ঘোষণা দিতেছেন। ইহার পর আমরা আর যেন নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান-সমিতি ও মূর্ত্তিভঞ্জন গঠন করিতে না চলি। স্থাপত্যশিল্পে আমাদের যাহা ছিল তাহা বুঝিয়া লইতে, যাহা আছে তাহা বজায় রাখিতে, হ্যাভেল সাহেব শিল্পভাণ্ডারের চাবি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন; সুসভ্য আমরা হয় তো সে হাতের নিধি পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইব! বিশ্বকর্ম্মার রথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছে, শিক্ষিত আমরা হয় তো বা তখন টাউন হলে স্মৃতিসভা নয় তো শিক্ষা-ভিক্ষা লইয়া ব্যস্ত আছি। এমনি করিয়াই আমরা আমাদের ইহকাল পরকাল ও অক্ষয় কীর্ত্তি বজায় রাখিতেছি, বোধ হইতেছে।

হ্যাভেল সাহেবের পুস্তকখানি শুধু চোখ বুলাইয়া পড়িয়া যাইবার সামগ্রী নয়। তাহাতে ভারতীয় স্থাপত্যের চিত্র পরম্পরার অন্তরাল হইতে, শিল্পে আমাদের যাহা ছিল, তাহার যাহা এখনও আছে এবং তাহার যাহা আসিতেছে তাহার ত্রিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে। এই তিন দেবতার যথাযথ ভাগ না বুঝাইয়া দিয়া আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছি। শিব ছাড়িয়া শক্তিকে আনিতে গেলে যে বিপদ, বিশ্বকর্ম্মাকে ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে গেলেও সেই বিপদ!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* Indian Architecture: its Psychology, Structure and History from the First Muhammadan Invasion to the Present Day. Crown 4to, cloth. Rs. 26-4. With Numerous Illustrations. By E. B. Havell.

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার দৃষ্টান্ত

ইতিপূর্ব্বে আষাঢ় মাসের "মানসী"তে ও শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা ও নূতন ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোকে তাহার মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আষাঢ়ের "মানসী"তে "আদিশূর ও কুলশাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে আমি এইমাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অদ্যাবধি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দেশের অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আদিশূর সম্বন্ধে সুদীর্ঘ উপাখ্যানমালার রচনা করিয়াছেন তাহা মূল্যহীন। সার সত্যের অনুসন্ধান ঐতিহাসিক মাত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত, আভিজাত্য-অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যের নাম করিয়া যে উপাখ্যানমালা রচিত হয় তাহা ক্ষণেকের জন্য ইতিহাস নামে পরিচিত হইলেও চিরকাল সে আখ্যা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ইতিহাস সম্বন্ধে প্রতীচ্য নিদর্শনই জগতের আদর্শ। প্রাচ্যে যে ইতিহাস নাই তাহা নহে, চীনে ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, মুসলমান-বিজয়ের পরে বিজিত মুসলমান জগতের যে সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায় প্রতীচ্যে মধ্যযুগে অনেক দেশে সেইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। কিন্তু চীনের ইতিহাস আছে বলিয়া, মুসলমান-বিজিত পারস্যের ইতিহাস আছে বলিয়া যে প্রাচ্যে সকল দেশে সকল যুগের ইতিহাস আছে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। প্রাচ্যের অনেক দেশেরই মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; অনেক দেশে মুসলমান বিজয়ের সময়ে বা তাহার পরে প্রাচীন সাহিত্যের সহিত প্রাচীন ইতিহাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই-সকল দেশে প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপাদানসমূহ এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং মনীষীগণের চেষ্টায় অনেক স্থানে লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে।

আমাদিগের দেশে লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের যথেষ্ট উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কেহ কেহ তাহা অবলম্বন করিয়া দুই একখানি ইতিহাসও রচনা করিয়াছেন। লোকাভাবে ও অর্থাভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলি সযত্নে সংগৃহীত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যথোচিত বিশ্লেষিত ও আলোচিত হয় নাই। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং অল্পদিন মধ্যেই তাহার যে ফল দেখা যাইতেছে তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার জন্য যে উপাদান পাওয়া যায় তাহা চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—

(১) প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি।

(২) বিদেশীয় পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা।

(৩) জনপ্রবাদ ও দেশীয় সাহিত্য।

(৪) দেশীয় ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থসমূহ।

শেষোক্ত তিন শ্রেণীর উপাদান সমূহ ইতিহাস রচনার কালে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। কোন কোন দেশীয় ঐতিহাসিকের মতে কুলশাস্ত্র পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত, অর্থাৎ দেশীয় কুলশাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ ভারতবাসী কর্ত্তৃক রচিত ইতিহাসগ্রন্থ স্বরূপে গণিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কুলগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থজাতির মধ্যে, এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুতজাতির মধ্যে কুলগ্রন্থের অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যে কারণে কুলশাস্ত্রের সৃষ্টি, তৎসম্বন্ধে অধিকাংশ কুলশাস্ত্রই বিশ্বাসযোগ্য। বঙ্গদেশীয় কুলগ্রন্থ সমূহে এবং রাজপুতজাতির ভট্ট ও চারণগণের গ্রন্থসমূহে যে পুরুষপরম্পরা বিবৃত আছে তাহার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রাজপুতজাতির কুলশাস্ত্রে এবং বঙ্গদেশীয় ঘটকগণের কুলগ্রন্থসমূহে যে-সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ বা ইঙ্গিত আছে, তাহার অধিকাংশই অমূলক এবং কৃত্রিম। ইহা আমার নিজের অনুমান বা মত নহে, ভারতবর্ষের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মাত্রেই এই মতাবলম্বী। রাজপুতজাতির কুলগ্রন্থসমূহ যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় দেশবিখ্যাত ঐতিহাসিকও স্বীকার

করিয়াছেন। ভট্ট ও চারণগণের কুলগ্রন্থ সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে দুই একটি উদাহরণ দিলাম :—

(ক) আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে বিখ্যাত শিশোদীয় কুলসম্ভব চিতোর ও উদয়পুরের মহারাণাগণ এতদিন সূর্য্যবংশসম্ভব বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ জনৈক নাগর ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(খ) যোধপুরের রাঠোর রাজবংশ ভারতবর্ষে কান্যকুব্জরাজ জয়চ্চন্দ্রের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত। নূতন আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে যে গোবিন্দচন্দ্র, জয়চন্দ্র প্রভৃতি কান্যকুব্জরাজগণ রাঠোরবংশীয় নহেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত যোধপুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিংহ বা সীহের কোনই সম্পর্ক ছিল না।

বঙ্গদেশে যে-সমস্ত কুলগ্রন্থ প্রচলিত আছে বা আবিষ্কৃত হইতেছে তৎসমুদয়ে যে-সকল ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বা উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে, যতক্ষণ তাহা প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর উপকরণের দ্বারা সমর্থিত না হয়। অর্থাৎ শুধু কুলগ্রন্থেই যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। বঙ্গদেশীয় কুলগ্রন্থ সমূহে পুরুষপরম্পরা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত আছে তাহারও অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু তৎসমুদয়ে বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা আছে তাহা অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গত আষাঢ় মাসের "মানসী"তে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে তিনটি কারণের জন্য বঙ্গদেশীয় কুলগ্রন্থ সমূহ ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। এই তিনটি কারণ :—

(১) চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দ্দন-দেবের তারিখযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কার।

(২) শামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কার।

(৩) বিজয়সেনের নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার।

প্রথমটি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে দনুজমর্দ্দনদেব লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র বা প্রপৌত্র হইতে পারেন না, সুতরাং সেনরাজবংশের সহিত চন্দ্রদ্বীপরাজবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয়টি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে কুলগ্রন্থে আবিষ্কৃত শামলবর্ম্মার বংশ-পরিচয় সর্ব্বৈব মিথ্যা, এবং তৃতীয়টি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে শূরবংশের সহিত সেনবংশের বিবাহ-সম্বন্ধ বিষয়ে কুলগ্রন্থের আখ্যায়িকা অমূলক। ভবিষ্যতে যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা কুলশাস্ত্রের প্রমাণ সমূহ নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে তাহা ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। ঐতিহাসিকের আদর্শ অতি উচ্চ, সে আদর্শের অবমাননা করিয়া কেহ অদ্যাবধি ইতিহাস রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন :—

"The historian's duty is to separate the true from false, the certain from the uncertain, and the doubtful from that which cannot be accepted......Every investigator must, before all things, look upon himself as one who is someone to serve, on a Jury."—The Maxims and Reflections of Goethe.

এই সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভিনসেণ্ট্ এ, স্মিথ্ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The application of t ese principles necessarily involves the wholesale rejection of mere legend as distinguished from tradition, and the omission of many picturesque anecdotes, mostly folk-lore, which have clustered round the names of the mighty men of old in India."—(Early History of India, p. 4.)

"ভারতবর্ষ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ; তাহাতে তিনি কুলগ্রন্থসমূহের ঐতিহাসিক অংশের অসারতা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিপন্ন হইবার পরেও কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বসুজ মহাশয় বলিতেছেন

"কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, পাশ্চাত্য আদর্শে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন হইতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাপক ঐ-সকল অমূল্য গ্রন্থের অনাদর করিয়া আসিতেছি।...ইহার উপর আবার কতক-

গুলি নব্য ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের চশমায় আর্য্যজাতির ঐ-সকল শেষ নিদর্শনের অসারতা লক্ষ্য করিতেছেন এবং তাঁহাদের অনভিজ্ঞ লেখনীর সমালোচনার গুণে ঐ-সকল গ্রন্থের ঐতিহাসিকতার উপর কাহারও কাহারও আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। নব্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সমালোচনা ও আশঙ্কা যে অমূলক, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যই এই প্রবন্ধটী উপস্থিত করিতেছি।"

বসুজ মহাশয় অবজ্ঞা করিলেও "বৈজ্ঞানিক" প্রণালীই সভ্য জগতে সত্য প্রণালী বলিয়া গৃহীত এবং এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বত্র সত্য উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রচুর ফল লাভ করা যাইতেছে। বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া লিখিত গুজবের উপর নির্ভর করিবার কি ফল তাহা পাঠক বুঝিতেই পারেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেখানে আবশ্যক সেখানে "চশমা" বর্জ্জন করিলে প্রায়ই ঝাপ্‌সা দেখা যায়। তাহার দৃষ্টান্ত বসুজ মহাশয় নিজেই দিয়াছেন। নব্যপ্রত্নতাত্ত্বিকগণের আশঙ্কা অমূলক কি না, বঙ্গদেশীয় জনসাধারণ তাহার বিচার করিবেন। আট বৎসর পূর্ব্বে ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের ৭-৩৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার কুলশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত শ্যামলবর্ম্মা ও বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কুলশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া বসুজ মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে সেনবংশীয় ত্রিবিক্রম নামক রাজার পুত্র বিজয় সেন, বিজয়সেনের দুই পুত্র, মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা। শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গদেশে আসিয়া ৯৯৪ শকাব্দে বিক্রমপুরে নূতন রাজ্য স্থাপনা করিয়াছিলেন। শ্যামল বর্ম্মার মাতার নাম বিলোলা। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্যামল বর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে কুলশাস্ত্রে শ্যামলবর্ম্মার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম জাতবর্ম্মা (জাত্র, জৈত্র, জোত্র বা জালবর্ম্মা নহে), তাঁহার পিতামহের নাম ব্রজবর্ম্মা এবং তাঁহারা যাদববংশসম্ভূত। কুলশাস্ত্রে যিনি শ্যামলবর্ম্মার বংশপরিচয় "প্রক্ষেপ" করিয়াছিলেন তিনি আর একখানি কুলগ্রন্থ হইতে শ্যামলবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি "আবিষ্কার" করিয়াছিলেন। তখন শ্যামলবর্ম্মার সেনবংশে উৎপত্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ সাধারণের সম্মুখে পৌ[ঁছে] নাই। কাজেই বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনখানির ন[কল] "সেনবংশকুলকমল" স্থানে "ধর্ম্মবংশকুলকমল" [ও] "বিশ্বরূপ সেন" স্থানে "শ্যামলবর্ম্ম" বসাইয়া নিজে[ই] শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন সাজাইয়া "আবিষ্কর্ত্তার" হা[তে] ধরা দিবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। পাঠ[ক] বিনা চশমায় এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিবেন। বি[স্তু] ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে যখন কুলশা[স্ত্রের] ঐতিহাসিক অংশের অসারতা প্রতিপন্ন হইল তখন হই[তে] প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলি[তে] আরম্ভ করিয়াছেন যে পূর্ব্বে তিনি যে পুঁথি পাইয়াছিলে[ন] তাহা ভ্রমে পরিপূর্ণ, "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি টালানিবাসী ৺ গুরুচ[রণ] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে একখানি তালপ[ত্রে] লিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন। ইহা ঈশ্বর-কৃ[ত] বৈদিক কুলপঞ্জিকা। এই গ্রন্থে শ্যামলবর্ম্মার যে পরি[চয়] আছে তাহা এবং বসুজ মহাশয় কর্তৃক আট বৎসর পূ[র্ব্বে] একই গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত শ্যামলবর্ম্মার পরিচয় এক[ত্র] প্রদত্ত হইল :—

প্রথম পুঁথি।

ত্রিবিক্রম মহারাজ সেনবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গাসলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনকতারিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকং॥
আসীৎ স এব-রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ॥
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্র সমদ্যুতিঃ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষকরাবুভৌ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশ-নিবাসিনঃ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ॥

দ্বিতীয় পুঁথি।

ত্রিবিক্রম মহারাজ শূরবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো দেশে কাশীসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা-পুরী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গা-সলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতোষিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না কনকসেনকং॥

আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পুর্য্যাং মহামতিঃ।
কন্যা তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্র সমদ্যুতিঃ॥
প্রিয়াং তস্যাং হি যৌ পুত্রৌ মল্ল-শ্যামলবর্ম্মকৌ।
সা এব জনয়ামাস ক্ষৌণী-রক্ষকরাবুভৌ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ॥

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবজ্ঞা করিবার ইহাই ফল। আসলের সঙ্গে পাঠ না মিলাইয়া "খান্তানকল" মুদ্রিত করা এবং একমাত্র সেই শ্রেণীর সাক্ষীর কথায় এতবড় গুরুতর বিষয়ে নূতন মত প্রচার করার শাস্তি কালের গতিতে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। উভয় পুঁথিই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক "আবিষ্কৃত" এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। আট বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ বসুজ মহাশয়ের নিকটেই শুনিয়াছিলেন যে সেনবংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রমের পত্নী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিজয়সেনের বিলোলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে মল্লবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মা নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। "শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন।" আট বৎসর পরে বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত শ্যামলবর্ম্মার পরিচয় সর্ব্বৈব মিথ্যা তখন বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথির বিবরণ মুদ্রিত হইল। বেলাবো তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে শ্যামলবর্ম্মার মাতার নাম বীরশ্রী, তিনি বিশ্ববিজয়ী চেদীরাজ কর্ণের কন্যা ও গাঙ্গেয়দেবের পৌত্রী। বসুজমহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুঁথি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে শূরবংশীয় মহারাজ ত্রিবিক্রম মালতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে কর্ণসেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। কর্ণের বিলোলা নাম্নী এক কন্যা ছিল, এই কন্যার গর্ভে মল্ল ও শ্যামলবর্ম্মা নামক দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বসুজ মহাশয় যদি বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই নূতন পুঁথির আবিষ্কার-বার্ত্তা প্রচার করিতেন তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতাম। কিন্তু বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে এই নূতন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরে কোন দুষ্টবুদ্ধি, অর্থলোলুপ, অধ্যাপকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঈশ্বরকৃত বৈদিক কুলপঞ্জিতে বিজয়সেনের পরিবর্ত্তে শ্রীকর্ণসেনের নাম প্রক্ষেপ করিয়া উদারচেতা, দয়ার্দ্রহৃদয় বসুজমহাশয়কে প্রতারিত করিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর বৈদিক ব্যতীত অপরাপর বৈদিক কুলশাস্ত্র-প্রণেতাও বলিয়া গিয়াছেন যে শ্যামলবর্ম্মার পিতার নাম বিজয়সেন :—

(১) রামদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক রচিত "বৈদিক কুলমঞ্জরী" :—

বিধোঃ কুলেঽজনি নৃপতিস্ত্রিবিক্রমঃ স্ববিক্রম-প্রতিহত-বৈরীবিক্রমঃ।
ত্রিবিক্রমঃ স্বানিতয়েব লোলয়াঽনুরূপয়া স পরিবভৌ তয়া শ্রিয়া॥
নাম্না বিজয়সেনং স জনয়ামাস নন্দনং।
স্ফুরন্নয়গুণোপেতং তেজোব্যাপ্তোদিগন্তরং॥
রাজাভূৎ সোঽপি ভূপেন্দ্রো দেবেন্দ্রসদৃশস্তদা॥
প্রজা সংপালয়ন্ সম্যক শশাস পৃথিবীং মুদা।
মহিষ্যামথ মালত্যাং গুণবত্যাং স ভূমিপঃ।
মল্লশ্যামলবর্ম্মাণৌ জনয়ামাস নন্দনৌ॥

(২) "গৌড়দেশে শ্যামল নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ ছিলেন। সেই মহীপাল বহু প্রচণ্ড নৃপতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি শূরবংশীয় বিজয়ের পুত্র, অতি প্রভাবশালী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া ৯৯৪ শকাব্দে শুভ তিথিতে রাজা হইয়াছিলেন। কাশীরাজ গজ, অশ্ব, রথ, রত্নাদি ও বিষয় বৈভবাদি পুরস্কার সহ নিজ ভদ্রানাম্নী কন্যা তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।" (পাশ্চাত্য-বৈদিক কুলপঞ্জিকা।)

এই-সকল কুলগ্রন্থের প্রমাণ সত্ত্বেও ঈশ্বরকৃত বৈদিক কুলপঞ্জীর নূতন পুঁথির প্রমাণ কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। বসুজমহাশয় প্রবন্ধের পাদ-টীকায় ইহার জন্য ত্রুটী স্বীকার করিয়াছেন :—

"মূল পুঁথিতে এই নামটি অস্পষ্ট থাকায় পরবর্ত্তী অপর বৈদিক কুলপঞ্জীকারগণ কেহ 'বিমলসেন' কেহবা 'বিজয়সেন' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের কুলপঞ্জীর পূর্ব্বে আমিও যে নকল পাইয়াছিলাম এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বৈদিক বিবরণ-প্রসঙ্গে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে 'বিজয়সেন' নামই উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসে অল্প জ্ঞান থাকায় তিনি মূল পুঁথির পাঠ কাটিয়া উদ্ধৃত শ্লোকের

এইরূপে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ......পূর্ব্বে মূল পুঁথিখানি হস্তগত না হওয়ায় এই ভ্রমসংশোধন করিবার সুযোগ আসে নাই। এজন্য শ্যামলবর্ম্মা সম্বন্ধে অনেক জাল কথা লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রমস্বীকার করিতেছি।" (ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পাদটীকা, পৃঃ ৩২)।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে অজ্ঞাতনামা কুলগ্রন্থে প্রাপ্ত শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রকাশকালে উক্ত বসুজ মহাশয়ই বলিয়াছিলেন—

"দুইশত বর্ষের হস্তলিপি অপর বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম।

এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেনবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রশাসনের পাঠ উভয় মিলাইয়া দেখিলে সহজেই সকলে জানিতে পারিবেন যে, উভয়েই যেন এক ছাঁচে ঢালা।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২, পাদটীকা)।

এখন যখন বেলাবো তাম্রশাসনের দোষে শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশের পরিবর্ত্তে যাদববংশের রাজা হইয়া পড়িলেন, তখন ভ্রমসংশোধন করিবার জন্য নূতন একখানি কুলগ্রন্থে শ্যামলবর্ম্মার আর একখানি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি আবিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় হয় নাই কি? ঈশ্বর বৈদিকের নূতন কুলগ্রন্থে শ্যামলবর্ম্মার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইতিহাসে দুইজন শ্যামলবর্ম্মা পাওয়া যাইবে, একজন শ্যামলবর্ম্মা, অপর জন সামলবর্ম্মা, একজন কলচুরিবংশীয় কর্ণদেবের দৌহিত্র, ও গাঙ্গেয়দেবের প্রদৌহিত্র, অপর জন শূরবংশীয় বিজয়সেন, বিমলসেন বা শ্রীকর্ণসেনের দৌহিত্র ও ত্রিবিক্রমের প্রদৌহিত্র। একজনের মাতার নাম বীরশ্রী, তাহা কর্ণের অপর কন্যা যৌবনশ্রীর নামের সহিত মিলিয়া যায়; অপরের মাতার নাম বিলোলা; সুতরাং ঈশ্বরের নূতন পুঁথি ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে কষ্টকল্পনার আবশ্যক। এই জন্যই বুঝি বসুজ মহাশয় বলেন :—

"আবার তাম্রশাসনে যে-সকল প্রয়োজনীয় বিষয় নিতান্ত অস্পষ্ট, কুলগ্রন্থের সাহায্যে সেই-সকল অংশ বিশদভাবে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে।"

আবার বসুজ মহাশয় "ভারতবর্ষের" ৩১ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলিয়াছেন :—

"শ্যামলবর্ম্মা" (১ম পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি) পাঠই আছে। ইহাতে মনে হয় যে, এরূপ কোন তাম্রশাসন ঈশ্বর বৈদিকের নয়নগোচর হইয়াছিল।"

এইস্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে বেলাবো তাম্রশাসনের কোন স্থানেই 'শ্যামলবর্ম্মা' লিখিত নাই।

যে-কোন পাঠক কলিকাতায় চিত্রশালায় আসিয়া বেলাবো তাম্রশাসনের বিংশতি পংক্তিটি দেখিয়া যাইতে পারেন। চশমার সাহায্য আবশ্যক হইবে না।

বসুজ মহাশয়ের মতে শ্যামলবর্ম্মাই বর্ম্মবংশের প্রথম রাজা, কারণ তাহা না স্বীকার করিলেই কুলপঞ্জিকার মর্য্যাদা থাকে না। সকল কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট লিখিত আছে যে মল্লবর্ম্মার ভ্রাতা শ্যামলবর্ম্মা গৌড়ে আসিয়া প্রথম রাজ্যস্থাপন করেন। কুলপঞ্জিকার মান রক্ষা করিতে গিয়া বসুজ মহাশয় অনেক কথাই বলিয়াছেন, যথা :—

(১) "এই পরিচয়-মধ্যেও জাতবর্ম্মা কোন স্থানের রাজা ছিলেন তাহা পাওয়া যাইতেছে না।"

(২) "বজ্রবর্ম্মা যাদবীসেনাগণের সমরবিজয়যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ কিন্তু শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা 'জগতে প্রথম মঙ্গল নামধেয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই 'প্রথম মঙ্গল নামধেয়' শব্দ দ্বারা বুঝিতেছি যে তিনিই বঙ্গে প্রথম রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। কুলপঞ্জীতেও তাই শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গবিজেতা ও এই বংশের প্রথম নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।"

(৩) "এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে কর্ণদেবের জামাতা ও শ্যামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মাই সম্ভবত: অধিনায়ক ছিলেন"

বলা বাহুল্য, অনুমানগুলি বসুজমহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত। জাতবর্ম্মা যে গৌড়ে বা বঙ্গে বর্ম্মবংশের প্রথম রাজা তাহা বেলাবো তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, সহস্র অনুমানেও তাহা টলাইবার উপায় নাই। শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে "ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

বসুজ মহাশয়ের মতে ঈশ্বর বৈদিক কাশীর নিকটে যে স্বর্ণরেখাপুরীর নাম করিয়াছেন তাহাই সিংহপুর। বসুজ মহাশয়ই পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন যে সিংহপুর হিওয়েন্‌-চং কর্ত্তৃক বর্ণিত সাং-হো-পু-লো। তাঁহার স্মরণ করা উচিত যে কাশ্মীরের পাদমূল হইতে ভাগীরথীতীর বহুদূর। শ্যামলবর্ম্মার মাতামহ কর্ণদেব কর্ণাবতী নামে যে নগরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা হইতে যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যখন কুলগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগের এইমাত্র স্মরণ ছিল যে তাঁহারা কর্ণাবতী হইতে আসিয়া-

ছেন এবং শ্যামলবর্ম্মা নামে কোন রাজা তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। বেলাবো তাম্রশাসন হইতে এই প্রমাণিত হইতেছে যে বৈদিক কুলশাস্ত্রের অবশিষ্ট ঐতিহাসিক অংশগুলিও "প্রক্ষিপ্ত"।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মধ্যযুগের ভারতীয়-সভ্যতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(De La Mazeliere র ফরাসী গ্রন্থ হইতে)

১

মোগলদিগের শাসনতন্ত্র।—প্রধান সেনাপতিগণ।—বিভিন্ন কালবিভাগ। সামন্ততন্ত্র ও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার।—কেন্দ্রীভূত শাসনকার্য্য ও হিন্দুদিগের তুষ্টিসাধন। সৈনিক-বিভাগের বন্দোবস্ত ও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার। অরাজকতা; রাজপুরুষগণকর্তৃক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন; হিন্দুদিগের বিদ্রোহ।—বৃহৎ ব্যয়-ভার।—সামন্ততন্ত্রাধীন সৈন্য। আমীর ও মনসবদার। চিরস্থায়ী সৈন্য।—রাজ্যশাসন। সম্রাটের প্রতিনিধিগণ। প্রাদেশিক শাসনকর্তা।—বিচারকার্য্য।—রাজকোষ।

ভারতীয় "নবজীবনের" সাধারণ লক্ষণগুলি বিবৃত করিয়াছি;—এক্ষণে তাহার কার্য্য সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে; শাসনতন্ত্র, রাজদরবার, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, পরম্পরাক্রমে আলোচনা করিতে হইবে, এবং দেড়শত বৎসরকাল শ্রীসমৃদ্ধি লাভ করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতন কিরূপে সংঘটিত হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* * *

প্রথমে মোগলদিগের শাসনতন্ত্র আলোচনা করা যাক্। এই শাসনতন্ত্র বিবিধ উপাদানে গঠিত ঃ—

আরব-প্রথাসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত কালিফ্-সাম্রাজ্যের বিধিব্যবস্থাদি, ইস্লাম্-ধর্ম্মের উপদেশ-অনুশাসন, পারস্য ও বৈজান্শিয়ার ঐতিহ্য। এমন কি, ঘজ্নী-বংশের সাম্রাজ্য এবং তৎপরবর্ত্তী রাজ্যগুলিও এই-সকল প্রথা ও বিধিব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

জঙ্গিস্-খান ও তৈমুরলং যে-সকল্ নিয়মের রেখাপাত করিয়াছিলেন বস্তুত সেই মোগলীয় নিয়মগুলি বিশেষ করিয়া চীনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় ঃ—সম্রাট—ঈশ্বরের পুত্র; সম্রাট প্রজাগণের সর্ব্বশক্তিমান্ পিতা। সম্রাট্ স্বয়ং পূর্ব্বপুরুষগণের সনাতন প্রথার দ্বারা পরিচালিত। এই পিতৃতন্ত্রশাসনপ্রণালী কালসহকারে, এক রাজার অধীন কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্রে পরিণত হইল। কিন্তু রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা,—রাজ্যের অন্তর্গত রাজপুরুষদিগের সংখ্যা, উহাদিগের বদ্ধমূল অভ্যাস ও সংস্কারাদির দ্বারা নিয়মিত হইত।

যে সামন্ততন্ত্র আরবদিগের ও মধ্য-এসিয়ার লোকদিগের স্বভাবসিদ্ধ ছিল সেই সামন্ততন্ত্রই নবম শতাব্দীতে ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়।

হিন্দুদিগের আচারব্যবহার, বিধিব্যবস্থা, জাতিভেদ-প্রথা, ও ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ-অধিকার;—এই-সকল বিবিধ উপাদান কাল্ সহকারে শাসনতন্ত্রের মধ্যে মিশিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং এই শাসনতন্ত্র জনসমাজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এই ক্রমবিকাশের বৃহৎ রেখাগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ—

প্রথমতঃ মধ্যযুগের মর্ম্মভাব, সামন্ততন্ত্র, বিশেষতঃ বিজিতগণের প্রতি অত্যাচার—ইহাই উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন মুসলমান গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

দিওয়ান-সংগ্রাহক হিন্দুদিগের নিকট হইতে রাজকর আদায় করে। উহারা নতমস্তকে ও অতীব নম্রভাবে এই রাজকর দিয়া থাকে। যদি কর-সংগ্রাহক উহাদের মুখে নিষ্ঠীবন দিতে চাহে তবে উহারা বিনা-আপত্তিতে তাহাও গ্রহণ করে। এই-সকল অবমাননায়, এই নিষ্ঠীবন প্রয়োগে, কাফেরদিগের নিকৃষ্ট পদবী, ও অধীনতা পরিসূচিত হয়। উহাতে করিয়া একমাত্র সত্যধর্ম্ম ইস্লাম-ধর্ম্মের মহিমা বর্দ্ধিত করা হয় এবং অন্যান্য মিথ্যা ধর্ম্মকে নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। স্বয়ং ঈশ্বর কাফেরদিগকে অবজ্ঞা করিতে আদেশ করিয়াছেন। কেননা, তিনি বলিয়াছেন ঃ—উহাদিগকে ভয় করিবে না, উহাদিগকে পদতলে রাখিবে। ধর্ম্মাদিষ্ট কর্ত্তব্য বিবেচনায়, অবজ্ঞার সহিত হিন্দুদিগের প্রতি ব্যবহার করিবে। উহারা মহম্মদের বিষম শত্রু। মহম্মদ উহাদিগকে হত্যা করিতে বলিয়াছেন, উহাদের দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে বলিয়াছেন, উহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। মহম্মদ নিজমুখে এই কথা বলিয়াছেন ঃ—"হয় উহারা ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করুক, নয় দাস হইয়া থাকুক, নচেৎ উহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।" কেননা, আমাদের সম্প্রদায়ের প্রধান—স্বয়ং ইমান্-ই-আজম্ হিন্দুদিগের নিকট হইতে মাথা-গুণ্‌তি কর আদায় করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অন্যান্য ব্যব-

হারবেত্তাগণও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—"হয় ইস্‌লাম নয় মৃত্যু" (১)।

ষোড়শ শতাব্দীতে,—নবজীবনের ভাব, কেন্দ্রীভূত রাজ্য, মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত রাজার অসীম প্রভুত্ব।

"আইন্‌-ই-আকবরী"তে এইরূপ দেখা যায় :—

মানব-স্বভাবের অসীম বৈচিত্র্য। সর্ব্বদাই আভ্যন্তরিক ও বাহ্য গোলযোগ। পদযুগল ভারাক্রান্ত হইলেও, ধনলুব্ধতা ডাক বসাইয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; লঘুমস্তক ক্রোধ স্বীয় বল্‌গা ছিন্ন করিতেছে...তাই এ গোলযোগ নিবারণের জন্য এক উপায় আছে :—ন্যায়পরায়ণ রাজার স্বৈরশাসন। যিনি আশা ও ভয়ের উদ্রেক্ করিতে পারেন এইরূপ প্রভু ব্যতীত গৃহেরও শৃঙ্খলা থাকে না, কোন প্রদেশেরও শৃঙ্খলা থাকে না। তাই এই পৃথিবীতে নির্ব্বোধদিগের তুমুল কোলাহল। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন এক প্রভুর প্রভুত্ব থাকা চাই। নচেৎ মানুষের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান, ধর্ম্ম, আর কে রক্ষা করিবে? সন্ন্যাসীরা বলিবে, অতিলৌকিক প্রভুত্ব আবশ্যক। কিন্তু সাংসারিক কাজের লোক মাত্রই বলিবে :—একমাত্র রাজার ইচ্ছাই সর্ব্বেসর্ব্বা। (২)

স্বীয় পূর্ব্ববর্ত্তীগণের বিপরীতে প্রথম-মোগল-সম্রাট্‌গণ হিন্দুদিগের তুষ্টিসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন :—

আবুল-ফজল্ বলেন,—কর-সংগ্রাহক, কৃষকের মিত্র হইবেন এবং তাহাদের সহিত ব্যবহারে এই দুইটি নিয়ম অবলম্বন করিবেন :—কর্ম্মে উৎসাহ, ও সততা। তিনি এমন-এক স্থানে তাঁহার বাস-গৃহ স্থাপন করিবেন, যেখানে মধ্যবর্ত্তীর সাহায্য ব্যতীত তাঁহাকে সকলেই দেখিতে পায়; কৃষক অভাবে পড়িলে, তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন, তাহাকে আগাম কিছু অর্থ ধার দিবেন, এবং উহা তাহার নিকট হইতে ক্রমশঃ আদায় করিবেন। (৩)

প্রথমে "নবজীবনের ভাব"; তাহার পর, যে ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহাকে "সংস্কারের" ভাব বলা যাইতে পারে। অবশ্য এ নামটি আসলে ঠিক্ নহে। বস্তুতঃ "নবজীবনের" পর, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎপীড়ন, বিজয়-নীতির অনুসরণ, এবং প্রতিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে সমস্ত শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে, শাসনকর্ত্তা ও রাজকর্ম্মচারীগণ, কেন্দ্রগত শাসনশক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপন আপন প্রদেশ ও জিলাকে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রে পরিণত করিতে লাগিল।

পরিশেষে, অরাজকতা, ও নূতন শত্রুর বিজয়াভিযান আরম্ভ হইয়া কালিফ্-সাম্রাজ্যের ন্যায় মোগল-সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি হইল।

* * *

"আইন-ই-আক্‌বরী"তে আবুল-ফজল, সম্রাট্ ও রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—

১। রাষ্ট্রের অভিজাতবর্গ (আবুল ফজল ইহাদিগকে মহাভূতের অন্তর্গত অগ্নির সহিত তুলনা করিয়াছেন)। সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রগাঢ় রাজভক্তি রণক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে;—নিজের প্রাণ তাঁহাদের নিকট এতই তুচ্ছ। এই ভাগ্যবান্ রাজসভাসদ্‌দিগকে অনল-শিখার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগই তাঁহাদের একমাত্র মহিমাজ্যোতি, শত্রুবিনাশই তাঁহাদের সর্ব্বগ্রাসী অনল। অভিজাতবর্গের প্রধান—ওয়াকীল অর্থাৎ সম্রাটের প্রতিনিধি কর্ম্মকর্ত্তা; স্বীয় বিজ্ঞতার প্রভাবে তিনি উৎকর্ষের চতুর্থসীমায় উপনীত হইয়াছেন। সমস্ত রাষ্ট্রকর্ম্মে ও গৃহকর্ম্মে তিনি রাজার সহকারী...তিনি কর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতি ও পদাবনতির কর্ত্তা; তিনিই কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ ও কর্ম্ম হইতে প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব ওয়াকীল বহুদর্শী বিজ্ঞ লোক হইবেন, উদারচিত্ত হইবেন, মিষ্টভাষী, দৃঢ়চিত্ত ও মহানুভব হইবেন...অপক্ষপাতী হইবেন...সকল কথা ওজন করিয়া বলিবেন...

তিনি খুব গোপনীয় বিষয়েরও খোঁজখবর রাখিবেন; তাঁহার উপর যে কাজের ভার, সেই-সকল কার্য্যসাধনে তৎপর হইবেন; কার্য্যের বহুলতা তাঁহার চিত্তকে যেন বিক্ষুব্ধ করিতে না পারে।

...যদিও তিনি রাজস্ব আদায় করেন না,—রাজস্বের প্রধান কর্ম্মচারীগণ, রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়—তিনি তাহার একটা চুম্বক হিসাব রাখেন।

রাষ্ট্রের অভিজাতবর্গের মধ্যে, সম্রাটের নিজস্ব-কোষরক্ষক, সীলমোহর-রক্ষক, রাজদরবারের কোষরক্ষক (বক্‌শী), আদব-কায়দা অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা—এই-সকল পদও ধর্ত্তব্য। (৪)

২। দিগ্বিজয়ের সহায়গণ। (আবুল ফজল, ইহাদিগকে মহাভূতের অন্তর্ভূত বায়ুর কোটায় ধরিয়াছেন)। ইহারা কর-গ্রাহক; ইহারা সেই সব কর্ম্মচারী যাঁহারা সংগৃহীত রাজস্ব কোষবদ্ধ করেন এবং প্রয়োজন-অনুসারে ব্যয় করিয়া থাকেন; তাঁহাদের শ্রম ও

---

(১) তারিখ্-ই-ফিরুজ-শাহী (চতুর্দ্দশ শতাব্দী)—পৃঃ ২৯০—Blockmann কর্তৃক উদ্ধৃত।

(২) আইন-ই-আকবরী—ভূমিকা ও অন্যান্য অংশ দ্রষ্টব্য।

(৩) আইন-ই-আকবরী—Garett-এর অনুবাদ।

(৪) এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের নাম আইন্-ই-আকবরীতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—"মীর-মাল্" (সম্রাটের নিজস্ব কোষ-সচিব), সীলমোহর-রক্ষক, "মীর-বক্‌শী"—(দরবার-সচিব), "দার-বেগী" (ইনি দরখাস্ত পেষ করেন), "কুর্‌বেগী"—(সম্রাটের রাজচিহ্নাদির বাহক), মীর-তোজক (আদব্-কায়দা-অনুষ্ঠানের কর্ত্তা), "মীর-বহরী" (প্রধান পোতাধ্যক্ষ), "মীর-বর্" (অরণ্য-পরিদর্শক), "মীর-মঞ্জিল" (দরবারের প্রধান রসদ-সরবরাহ-কর্ত্তা), "খোয়ালসালার" (সম্রাটের পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক), "মুন্‌শী"—(প্রাইভেট সেক্রেটরি), "কুশবেগী"—(বাজপক্ষীগণের তত্ত্বাবধায়ক), "আখ্‌তাবেগী" (অশ্বশালার পরিদর্শক)।

কর্ম্মচেষ্টা বায়ুর সদৃশ; কিন্তু ইহা কখনও বা চিত্তপ্রফুল্লকর শীতল মলয়ানিল; কখনও বা মহামারী-উৎপাদক জলন্ত দূষিত বায়ু। উজীর বা দিওয়ানই এই বিভাগের কর্ত্তা; আর ব্যয় সম্বন্ধে ইনিই সম্রাটের সহকারী; ইনি কোষাধ্যক্ষ, ইনিই সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর করেন...দ্বিতীয়-পদস্থ রাজস্ব-গ্রাহক (মোস্তফী), সামরিক ব্যয়সক্রান্ত কর গ্রাহক, রাজদরবারের ব্যয়সংক্রান্ত কর-গ্রাহক,—ইহারা উজীরের আজ্ঞাধীন। (৫)

(৩) রাজার পারিষদ্‌বর্গ (আবুল-ফজল, ইহাদিগকে মহাভূত জলের কোঠায় ফেলিয়াছেন)। জ্ঞানালোক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যুগধর্ম্মের জ্ঞান, মানবচরিত্রের গভীর অনুশীলন, স্বাধীনচিন্তা ও শিষ্টতা—এই-সকল গুণ থাকায় ইহারা রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছেন। ইহাদের জ্ঞান-বৃষ্টি ক্রোধাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। ইহাদের চরিত্রগত মাধুর্য্য, মানুষের হৃদয় হইতে দুঃখের ধূলারাশি বিদূরিত করে এবং এতদ্দেশবাসীদিগের দাবদগ্ধ প্রান্তর-ভূমির উপর শৈত্য-বিস্তার করে। এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত—"সদর" (প্রধান বিচারপতি, ও সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ); "মীর-আদল" (বিচারপতি); "কাজী" (তদন্তকারী বিচারপতি); চিকিৎসক, জ্যোতিষী, কবি, দৈবজ্ঞ।

রাজার খাস প্রধান কর্ম্মচারী পাঁচজন:—প্রধান সেনাপতি ("খান-খানান্"), এই উপাধিটি কচিৎ কাহাকেও প্রদত্ত হইত; "ওয়াকীল" (প্রধান মন্ত্রি বা রাজ-প্রতিনিধি); "উজীর" (কোষ-সচিব); "বকৃশী" (দরবার-সচিব); "সদর" (প্রধান বিচারপতি)। যৎকালে আকবর, শা-জাহান্ ও ঔরংজেব যদৃচ্ছাক্রমে দেশ-শাসন করিতেন, সেই সময়ে স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজার সাক্ষাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ উজীর ও বকৃশী রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। উক্ত সম্রাট্‌গণের পূর্ব্বে, কোষ-সচিব ও দরবার-সচিবকে কেহ ভয় করিত না; তাঁহাদের পরেও কেহ ভয় করিত না। প্রত্যুত, অশান্ত সামরিক অভিজাতবর্গের প্রকৃত প্রধান ছিলেন—"ওয়াকীল"। হুমায়ুনের রাজত্বকালে, আকৃবর যখন নাবালক ছিলেন, তখন বয়রমের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ছিল। পরে হঠাৎ একটা রাষ্ট্রনৈতিক সাহসের চাল্ চালিয়া, তরুণ সম্রাট্ নিজ প্রভুত্ব ফিরিয়া পান। সেই সময় হইতে, ঔরংজেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত, ওয়াকীলেরা সাধারণ মন্ত্রী মাত্র ছিলেন—ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করা যাইতে পারিত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ওয়াকীলেরা রাজপ্রাসাদের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সম্রাটের নামে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অশক্ত রাজকুমারদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

"ওয়াকীল" যেরূপ অভিজাতবর্গের প্রধান, "সদর" সেইরূপ উলেমাদিগের প্রধান ছিলেন; মুসলমানধর্ম্মের শাস্ত্রীয় মতাদি সম্বন্ধে ও ব্যবহারশাস্ত্রসম্বন্ধে সদরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাটের শুভাগমনের সংবাদ কেবল তিনিই ঘোষণা করিতে পারিতেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা "সদর", স্বধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ডদিগের প্রতি কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন-দণ্ড ও মৃত্যু-দণ্ড পর্য্যন্ত বিধান করিতেন। মসজিদ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদির সম্পত্তির রক্ষক ও কর্ম্মাধ্যক্ষ "সদর",—ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য যাহাদিগকে ভক্তি করিতেন অথবা দুঃখদুর্দ্দশার জন্য যাহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিতেন তাহাদিগকে তিনি মৌরসী জমি ("সয়ূরঘাল") দান করিতেন। আকৃবর আমীরদিগের ঔদ্ধত্য যেরূপ দমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ উলেমাদিগেরও ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সদর আবদুন্নবীকে মক্কায় চালান করা হইয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আসিলে, বলপূর্ব্বক পরস্বাপ-হরণ অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত এবং পরে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন। "সয়ূরখাল"-স্বত্বাধিকারীগণ স্বকীয় স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই-সকল ভূমির পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্যকর বঙ্গদেশে তাহারা অন্য ভূমি প্রাপ্ত হয়। "নবধর্ম্মে" দীক্ষিত আকৃবরের সদরেরা আকৃবরের একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী ও অনুগত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর অধিপতিগণও উহাদের নিকট হইতে ঐরূপ বশ্যতা আদায় করিয়াছিলেন; অষ্টাদশ শতাব্দীতে, সংশয়বাদ এতটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, ওয়াকীল ও অভিজাতবর্গের দাবীদাওয়া সদর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৫) এই দ্বিতীয়শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের তালিকা:—
দ্বিতীয় পদস্থ দিওয়ান বা "মুস্তোফি", সাহিব-ই-তৌজী (সৈন্যের বেতন-বণ্টনকারী), আওয়ার্জা-নবীস (দরবারের ব্যয়নির্ব্বাহক), "মীর-সামান" (দরবারের আসবাবের কর্ত্তা), "নাজির বুয়ুতাৎ" (সম্রাটের কারখানাদির কর্ত্তা), "দিওয়ান-ই-বুয়ুতাৎ" (রাজ-কোষের মুন্সী), ওয়াকিয়া-নবীস (বিবরণী-লেখক), "আমিল" (খাস-খামার জমির রাজস্বগ্রাহক)। (আইন্-ই-আকবরী—ভূমিকা)।

পঞ্চশস্য

ইতিহাসে সাহিত্য (Theodore Roosevelt, Outlook, New York) ঃ—

গত বর্ষের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বোষ্টনের মার্কিন-ঐতিহাসিক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে মার্কিন যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কর্ণেল থিওডোর রুসভেল্ট "ইতিহাসে সাহিত্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন যে ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসাবে শুষ্ক ও নীরসভাবে আলোচনা না করিয়া সাহিত্য-রসে অভিষিক্ত করিয়া দেখা আবশ্যক ;—কেননা ইতিহাস জিনিষটা বিজ্ঞানের অঙ্গ নহে, তাহা সাহিত্যেরই অঙ্গবিশেষ। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিউইয়র্কের "আউটলুক" পত্রিকা হইতে সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

* * "ইতিহাস জিনিষটা বিজ্ঞান না সাহিত্যের অঙ্গ এবং সেটাকে কোন্ হিসাবে চর্চ্চা করিতে হইবে তাহা লইয়া কিছুদিন যাবত বেশ একটা আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ আন্দোলনের যে অবস্থা এ আন্দোলনটিরও ঠিক তাহাই হইয়াছে; আন্দোলনকারীগণ আলোচ্য বিষয়টির মূল ছাড়িয়া তাহার শাখাপ্রশাখা লইয়া তর্ক করিয়া মরিতেছেন। সে যাহাই হউক আসল কথাটা দাঁড়াইতেছে এই, যে, আজকাল যে একদল লোক ইতিহাসটাকে একেবারে বিজ্ঞানের একটা অঙ্গ বলিয়া দাবী করিতেছেন,—তাঁহাদের সেই দাবীর মধ্যে কতখানি সত্য আছে? বাস্তবিকই কি ইতিহাস বিজ্ঞানের অঙ্গমাত্র? তাহার মধ্যে সাহিত্যের কি কোনই স্থান নাই? প্রথমেই গ্রীসের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে প্রাচীনকালে, ইতিহাসের সহিত কবিতা কি পুরাণের কোনই প্রভেদ ছিল না, তখন এ-সমস্তই এক জিনিস ছিল। রোমের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে সেখানেও এক সময়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস, কবিতার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে তখনও কোনো বিরোধ জাগে নাই। তাহার পর আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের প্রাচীনকালের মত তেমন বনিবনাও না থাকিলেও দর্শনের সহিত তাহার যথেষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। এখনও পর্য্যন্ত কাব্যের মধ্য দিয়া দর্শনের উচ্চতত্ত্ব প্রচার হইতেছে। তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবিকুলগুরু গেটের কাব্য। দর্শনবিদ্যায় কান্ট, গেটে অপেক্ষা অনেক অধিক পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু তথাপি গেটে মানবের চিত্ত ও চিন্তাকে যতখানি অধিকার করিতে পারিয়াছেন কান্ট ততখানি পারেন নাই ;—কেননা গেটে ছিলেন কবি। তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া তিনি দর্শনতত্ত্ব প্রচার করিয়া বহু লোকের চিত্ত অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনীং সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তিনি তাঁহার কাব্যরসে সরস করিয়া দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই বহু গদ্যলেখক দার্শনিক অপেক্ষা তাঁহার তত্ত্ব বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে—এবং বহু লোককে শিক্ষা দিয়াছে। দর্শনও যেমন ইতিহাসও ঠিক তেমনি বিজ্ঞানের অঙ্গ। সুতরাং দর্শনকে যদি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ব্যাখ্যা ও প্রচার করিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সুগম ও সহজবোধ্য হয় তাহা হইলে ইতিহাসের বেলা যে তাহার বিপরীত হইবে—একথা কখনই মনে করা যায় না। মোট কথা দর্শনই হউক আর ইতিহাসই হউক, যে জিনিসটি যত বেশী চিত্তাকর্ষক করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারা যাইবে, ততই তাহা অধিক কাজে লাগিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু ভাবুকতা দিয়া ইতিহাস গঠিত হয় একথা ভাবিলে অন্যায় হইবে। নিছক ভাবুকতা দিয়া কখনই ইতিহাস হইতে পারে না। গভীর গবেষণা, ধৈর্য্য ও স্থিরচিত্ততা না থাকিলে, ভাবুকতা ও কল্পনাশক্তি যতই প্রখর হউক না কেন, তাহা ইতিহাস প্রণয়নে কোনই কাজে লাগে না। শুদ্ধমাত্র নিরবচ্ছিন্ন ভাবুকতা এবং ভাষার চাকচিক্য ও লালিত্য লইয়া ইতিহাস লিখিতে বসিলে, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কল্পনার খেলাই অধিক পরিমাণে দেখা দেয়, এবং ইতিহাস না গড়িয়া কার্লাইলের "ফরাসী বিপ্লবের" মত একটা গুরুগম্ভীর গোছের 'রোমান্স' হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে হইয়াছে এই, যে, যাঁহারা বাস্তবিক বিশেষভাবে ইতিহাসচর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুধু যে 'রোমান্টিক' ধরণের ইতিহাস-রচনা-পদ্ধতির বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন তাহা নহে ;—ইতিহাস-রচনা-পদ্ধতি যদি বেশ সজীব ও সরস হয় তাহা হইলেই তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভাবেন যে ইতিহাসের মধ্যে কল্পনা বা রসের কোনো স্থান নাই,—সরস হইলেই ইতিহাসের ঐতিহাসিকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এটি তাঁহাদের মস্ত ভুল। কল্পনাশক্তিকে যদি প্রকৃতভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা হইলে তাহা ঐতিহাসিক সত্যকে না ঢাকিয়া তাহাকে আরো উজ্জ্বল, আরো সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। প্রকৃত সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক সমস্ত ইতিহাসের সত্য ও তথ্যকে করতলন্যস্ত-আমলকবৎ করিয়া কল্পনাবলে অতীতের পুঞ্জীকৃত ধূলিস্তূপ উড়াইয়া অতীতকে আমাদের চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবেন; তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী এমন হইবে যে তাহা যেন পাঠকের মনে ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে। যে ঐতিহাসিক যত অধিক সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিতে পারিবেন, ইতিহাসপ্রচারে তিনিই তত অধিক সফলকাম হইবেন। অনেকের বিশ্বাস আছে যে বিজ্ঞান কিম্বা ইতিহাস নীরস না হইলে তাহা জ্ঞানলাভের সহায়তা করে না। এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সুস্পষ্টভাবে লোকের সম্মুখে ধরেন না। ইহাতে কিন্তু তাঁহাদেরই ক্ষতি। কেননা সাধারণে তাঁহাদের আবিষ্কৃত বা ব্যাখ্যাত তথ্য জানিবার জন্য কখনই নীরস বৈজ্ঞানিক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করে না। সুতরাং যতদিন না কেহ সেগুলিকে সরস করিয়া তুলে, ততদিন সে-সব তথ্য গুহার অন্ধকারেই বসবাস করে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। লামার্ক (Lamarck) এবং কপে (ope) ডারউইন (Darwin) ও হাক্সলের (Huxley) বহু পূর্ব্বেই Theory of Evolution বা "ক্রমবিকাশবাদের" আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেটিকে চিত্তাকর্ষক ও সরস করিয়া ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের না থাকায়, সাধারণের নিকট—এমন কি বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতেও—তাহা তেমন প্রতিষ্ঠা পায় নাই। কিন্তু ডারউইন ও হাক্সলে যখন তাঁহাদের সরস ও সহজবোধ্য ভাষায় "ক্রমবিকাশবাদের" তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন সমস্ত সভ্যজগতে একটা আন্দোলন সুরু হইয়া গেল। তাঁহাদের লেখনীর গুণে আজ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ক্রমবিকাশবাদের মত একটি দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। "বিবর্ত্তনবাদ" সম্বন্ধে তাঁহাদের পুস্তকগুলি এখন অনেকেরই পুস্তকাধারে দেখা যায়, কিন্তু লামার্ক ও কপের পুস্তক হাজারের মধ্যে একজন,—পড়া দূরে থাকুক—দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। লামার্ক

রূপে যদি সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহাদের রচনার মধ্যে যদি ভাবুকতা ও কল্পনাশক্তির সমাবেশ থাকিত, তবে তাঁহারা আজ বিজ্ঞানরাজ্যে ডারউইন ও হাক্সলের অনেক উপরে স্থান পাইতেন। যদিও অনেক ঐতিহাসিক সম্বন্ধে এই কথা খাটে, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে ঐতিহাসিক গবেষণায় এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সাধারণের পক্ষে কখনই সরস করা যাইতে পারে না। সরস করিয়া লিখিবার ক্ষমতা না থাকিলেও—যাঁহারা ইতিহাসের কোনো একটি বিশেষ দিক লইয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত—তাঁহারা যে ইতিহাসগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহাদের কাজকে অবহেলা করিলে কখনই চলিবে না। কিন্তু যিনি অনুসন্ধান ও গবেষণার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া, কল্পনাশক্তির সাহায্যে অতীতকে আবার আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বর্তমানের মত সজীব করিয়া তুলিতে পারিবেন তিনিই ভবিষ্যৎযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তাঁহার লেখনীর বিচিত্র শক্তিতে প্রাচীন মিসর ও ভারতের, ব্যাবিলন ও সিরিয়ার, গ্রীস ও রোমের প্রত্যেকটি ধূলিকণা প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিবে। কিন্তু শুধু রাজারাজড়া বা আমীরওমরাহের ভূষণবাহনের বর্ণনায় ভবিষ্যতের ইতিহাস ভারাক্রান্ত হইবে না; ভবিষ্যৎযুগের ঐতিহাসিকেরা প্রাচীনকালের সাধারণ নরনারীর চিত্র, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। তাহাদের শ্রমের যন্ত্র, যুদ্ধের অস্ত্র, তাহাদের প্রেমের গান, তাহাদের উৎসব ও খেলাধূলা, এ সমস্তের কোনটিই তিনি উপেক্ষা করিবেন না। তিনি তাঁহার প্রতিভাশিখাতে ইতিহাসের সমস্ত লুপ্ত ও গুপ্ত স্থান উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন। * * তাহা হইলেই ইতিহাস বিচিত্র শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া সাহিত্যেরই একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম।

মেটারলিঙ্কের গৃহিণীর কাহিনী (New York 'American'):—

মেটারলিঙ্ক আধুনিক য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ রসভাবগভীর কবি ও নাট্যকার।

মেটারলিঙ্ক-গৃহিণী বিবাহের পূর্ব্বে অপেরার গায়িকা ছিলেন। তিনি কিরূপে বেলজিয়মের এই স্বনামধন্য কবি ও নাট্যকারকে স্বামীরূপে লাভ করিয়াছিলেন তাহা উপরি উক্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে বলিয়াছেন :—

"আমি প্যারীর অপেরায় গান গাহিতেছিলাম। বেশ নাম করিয়াছিলাম। তিন বৎসরের জন্য একটা চুক্তি করিয়াছি, এমন সময় আমি আপনাদের এমার্সন-রচিত একখানি দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকের অনুবাদ পড়িলাম। অনুবাদক মেটারলিঙ্ক।

"মেটারলিঙ্কের ভূমিকা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বার বার সেটি পড়িলাম। মনে মনে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি এ যেন সেই কথাই পড়িতেছি। বইখানির কথা এবং তৎপশ্চাতে যে মন সেই মনের কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন সারারাত ঘুমাই নাই।

"আমি ভাবিলাম, 'তিনি আমার; আমার স্বামী; তিনি আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহাকে ভালোবাসিব। তাঁহাকেও আমাকে ভালো বাসিতে হইবে নিশ্চয়।'

"মেটারলিঙ্ক ব্রসেল্‌সএ থাকিতেন। সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলাম। বড় কঠিন কাজ। তাঁহাকে জানেন এমন একটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন মেটারলিঙ্ক একটি বর্ব্বর বিশেষ, লোককে তিনি ঘৃণা করেন, বিশেষত রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম মানুষকে।

মেটারলিঙ্ক।

"আমি রঙ্গমঞ্চের একজন কৃত্রিম নারী, কিন্তু তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা হইয়াছিল তাহা খাঁটি, অকৃত্রিম।

"তার পর, বন্ধু কহিলেন, 'আপনি মনে মনে মেটারলিঙ্কের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি সেরূপ ন'ন। তাঁহার বয়স অনেক, একমুখ লম্বা দাড়ি। তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন।'

আমি নিরাশ হইলাম, কিন্তু তবুও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা হইল। বন্ধুকে বলিলাম, 'যদি তাঁকে স্বামীরূপে না পাই তো তাঁহাকে কন্যার মত ভালোবাসিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করিব।'

"একটা পার্টি দেওয়া হইল। আমিও নিমন্ত্রিত হইলাম। সে মুহূর্ত্ত কখনো ভুলিব না—যখন দেখিলাম মেটারলিঙ্ক বলিষ্ঠ সুন্দর যুবক, একজন মানুষের মত মানুষ।

"আমি চীৎকার করিয়া পাগলের মত তাঁহার দিকে ছুটিয়া গেলাম। তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। আমি যেন একটি ক্ষুদ্র বাঘিনীর মত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

"খুব নূতন রকম পোষাক করিয়াছিলাম। পশ্চাতে বিলম্বিত আঁটোসাঁটো কালো গাউন পরিয়াছিলাম, এবং দুই চোখের মাঝে একখানি হীরক ঝুলাইয়া দিয়াছিলাম। আর কোনো অলঙ্কার নয়, আর কোনো রঙও নয়। হৃদয়ে আমার আগুন ধরিয়াছিল, চোখ আমার জ্বলিতেছিল, কপোল জ্বলন্ত অঙ্গারের মত রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল।

"তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'তুমি, তুমি, তুমি আমার।' তিনি ভীত হইয়াছিলেন, আমার দুঃসাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তখন বোঝেন নাই যে উহা আমার প্রেম, বনের মাঝে ঝড় যেমন করিয়া জাগে তেমনি করিয়া আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে, অন্তর একেবারে তোলপাড় করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতেছে। তিনি অদ্ভুত পুরুষ। কিন্তু বড় লাজুক, বড় ভীরু।

"অবশেষে আমার সম্বন্ধে তিনি ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমার ও আমার জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। যা' সত্য তাহাই বলিলাম। যাহারা সত্য কথা বলে তাহাদের জীবনে লুকাইবার কিছু নাই।

"তাঁহাকে বলিলাম, আমার দুইটি প্রকৃতি। একটি রঙ্গমঞ্চের—আনন্দে ভরপুর, বাস্তবের প্রতি উদাসীন, খামখেয়ালী, সুখপ্রিয়; অপরটি গৃহিণীর প্রকৃতি—বাস্তব নারীর প্রকৃতি, যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে ও করিবে, যে বিশ্বাসী অনুরক্ত সহিষ্ণু ও দয়ালু হইবে। উভয় প্রকৃতিই অকৃত্রিম। প্রত্যেকটিতেই সময়ে সময়ে আমি সুখী হই, কিন্তু একটি অপরটির উপর প্রাধান্য করুক ইহাই আমি চাই। আমি চাই সেই বাস্তব নারীর প্রাধান্য হউক যে তাঁহার 'দর্শন' পড়িয়া রাত কাটাইয়া দ্যায়, যে জগতে বৃথাই বাঁচিতে চাহে না।

"মেটারলিঙ্ক তাঁহার অদ্ভুত পাখীর ধরণে শুনিতে লাগিলেন। এ-সব যে সত্য তা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এটি তাঁর নূতন অভিজ্ঞতা বটে—এই পর্য্যন্ত। আমি মনে আঘাত পাইলাম।

মেটারলিঙ্ক-পত্নী।

"আমি বলিলাম, 'আপনি আমায় অবিশ্বাস করিতেছেন? আচ্ছা আমায় ছাড়ুন্ দেখিবেন আমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে।

"আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল, কিন্তু প্রেম আমার হৃদয়ে জাগিয়াই রহিল। তিন মাস ধরিয়া প্রত্যেক দিন আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি, আমার প্রতিদিনের প্রত্যেক চিন্তার খুঁটিনাটি সব কথা বলিয়াছি। সে-সব চিঠি তাঁহার কাছে এখনো আছে, তিনি বলেন সেগুলি কখনো ত্যাগ্ করিবেন না।

"আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না, সাক্ষাৎ করিবও না স্থির করিয়াছিলাম। আমার কথা আমার পত্র ব্যক্ত করিত। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই।

"অবশেষে তিন মাস পরে তিনি আমার কাছে আসিলেন—সে তিন মাস আমি তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবি নাই—সেই অবধি আমরা উভয়ে উভয়কে চিরদিনের জন্য ভালোবাসিয়াছি।

"কিন্তু তাঁহার প্রতি আজ আমার যে অসীম ভালোবাসা, তাহার কথা আমি তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই।

"আমার একটি শিশু,—একটি মাত্র শিশু যাহাকে আমি চাহিয়াছিলাম—তিনি হইতেছেন আমার স্বামী। প্রত্যেক অসাধারণ পুরুষের মত তিনিও একটি বয়স্ক শিশু।

"যাঁহার যত বুদ্ধিমত্তা তিনিই কোনো কোনো বিষয়ে তত শিশুভাবাপন্ন। সন্তান থাকুক বা নাই থাকুক পত্নীকে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে তাহার স্বামীই তাহার সবার-বড় শিশু।"

মেটারলিঙ্ক-গৃহিণী চিতাচর্ম্ম পরিয়া বোষ্টনে আসিয়াছিলেন। পারীতেও এই পরিচ্ছদে তিনি অনেক সময় বাহির হন। কপালে তাঁহার ছোট শিকলি দিয়া একখানি হীরক বিলম্বিত ছিল।

তিনি অভিনেত্রী ও গায়িকা। স্বামীরচিত নাটক ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়া থাকেন।

তিনি বলেন—নারী যাহাকে খুসি তাহাকে ভাল বাসিবে, তা সে একজন হোক বা একশ জনই হোক, ক্ষতি নাই। তাঁহার স্বামী কথায় এই মতের অনুমোদন করিলেও Aglavaine and Selysette নামক নাটকে স্বীকার করিয়াছেন যে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এ মত টিকিবে না।

সু।

রমণীর প্রসাধন (The Literary Digest) :—

রমণীর হৃদয় দয়ার আধার বলিয়া তাঁহাদের একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁহারা জানিয়া হোক বা না জানিয়া হোক কত প্রাণীর জীবন নাশ করিয়া যে নিজেদের প্রসাধন করেন তাহা একবার খতাইয়া দেখিলে রমণীর দয়ার খ্যাতিটা নিতান্তই মুগ্ধ কবির চাটুবাদ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের চরণকমল লক্ষ লাক্ষাকীটের রক্তরাগে রঞ্জিত হয়; পালকভূষণা য়ুরূপা রমণীর সজ্জার জন্য শুভ্র কোমল পালক-বিশিষ্ট পক্ষীকুল জগৎ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন আইন করিয়া অনেক জীবকে রমণীর

স্বর্গীয় পাখী (Bird of Paradise)। এই বড় জাতের সুন্দর স্বর্গীয় পাখী রমণীর সজ্জার জন্য প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

করুণার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইতেছে। মুক্তা রমণীর প্রিয় অলঙ্কার। মুক্তার লাবণ্য দেখিয়াই তাঁহারা মোহিত, ভাবিয়া দেখেন না যে মুক্তা শুক্তির বুকের রক্তে উজ্জ্বল। এই মুক্তা সমুদ্রগর্ভ হইতে তুলিয়া রমণীর বরণীয় অঙ্গ সুসজ্জিত করিবার জন্য কত লোকের প্রাণান্ত হইতেছে। দয়াবতীরা যদি একবার এই সব কথা ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে অনেক প্রাণ বাঁচিয়া যায়। মুক্তার যে লাবণ্য দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ তাহা বাস্তবিক শুক্তির ব্রণ; তাহা রাসায়নিকের চক্ষে চুন-কয়লার মিশ্রণ (carbonate of lime);

ইগ্রেট পক্ষী। আমেরিকার অধিবাসী; রমণীর প্রসাধনের জন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে।

জড়বিজ্ঞানবিদের চক্ষে মুক্তার লাবণ্য আলোকতরঙ্গের গতির বাধার ফল (interference of light-waves); জীবতত্ত্ববিদের নিকট মুক্তা কীটের কবর। শুক্তি বেচারা কীটের উৎপাত হইতে নিজেকে বাঁচাইতে গিয়া রমণীর তুষ্টি-লোলুপ মানুষের হাতে মারা পড়ে। শুক্তির বুকের মধ্যে মুক্তার সন্ধান প্রথমে পায় চীনারা। আগে লোকের বিশ্বাস ছিল যে বালুকাকণা বা প্রবাল স্পঞ্জ প্রভৃতি জীবকণা শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে শুক্তির শরীরে যে অস্বস্তি হয় তাহা নিবারণের জন্য শুক্তি একরূপ লালারস দিয়া সেই আগন্তুক পদার্থের উপর প্রলেপ দিতে থাকে; এবং তাহার ফলে মুক্তা গড়িয়া উঠে। এরূপ বিরুদ্ধ-পদার্থ-আবরক মুক্তা একেবারে হয় না যে এমন নয়; কিন্তু এরূপ ঘটে খুব সামান্য, এবং যেরূপে উৎপন্ন মুক্তাও তত বড় বা সুন্দর হয় না। চীনারা অনেক সময় অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি জীবন্ত শুক্তির দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়; শুক্তি সেই বুদ্ধমূর্ত্তির উপর মুক্তার প্রলেপ দিয়া দিয়া মূর্ত্তিটিকে উজ্জ্বল লাবণ্যময় করিয়া তোলে। এই সমস্ত জড়কণায়-প্রলিপ্ত মুক্তা প্রায়ই সম্পূর্ণ গোল হয় না; অর্দ্ধবৃত্তাকার ও শুক্তির গায়ে সংলগ্ন আঁচিলের মতো হয়। আসল নিটোল গোল মুক্তা একরূপ কীটের আক্রমণ হইতে হয়; সেই কীট শুক্তিকে আক্রমণ করিলে শুক্তি আত্মরক্ষার জন্য কীটের অঙ্গ ঘেরিয়া লালার প্রলেপ লাগাইতে থাকে, এবং
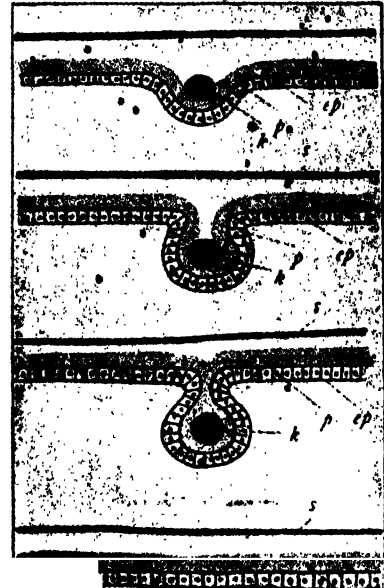
মুক্তা গঠনের ক্রম।
ep ঝিনুকের খোলার বহিস্ত্বক; *k* বাহিরের কোনো বস্তুকণা;
mp মুক্তার আবরণ; *p.* ঝিনুকের উজ্জ্বল অংশ;
pi মুক্তার আবরণের উজ্জ্বল অংশ; *s* খোলা।

কীটটির কবর মুক্তার আকার ধারণ করে। কোনো শুক্তির লাল শুভ্র; তাহার মুক্তা হয় শুভ্র। কাহারো লালা গোলাপী; তাহার মুক্তা গোলাপী। ঝিনুকের উপরের দিকে পোকা আক্রমণ করিলে সেখান হইতে কালচে পাটল রঙের রস নির্গত হয়; এবং সে মুক্তাও কালচে পাটল রঙের হয়। কখনো কদাচিৎ এক-একটা সম্পূর্ণ কালো মুক্তাও পাওয়া যায়।

জৈব পদার্থের মতো মুক্তারও রোগ ও মৃত্যু হয়। রুগ্ন মুক্তার উজ্জ্বলতা হ্রাস হইয়া রং ঘোলাটে ও দাগী হইয়া পড়ে। প্রাচ্য দেশে ইহার আবার চিকিৎসাও আছে; কিন্তু তাহা পুরুষানুক্রমিকা

গুপ্ত রহস্য, জানিবার জো নাই। সম্ভবত মুক্তাধারিণীর অসুখের ফলে দেহ হইতে নিঃসৃত কোনো রকম এসিডের সংস্রবে মুক্তার বর্ণ ম্লান হইয়া পড়ে। অনেক দিন অব্যবহারেও মুক্তার উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া যায়; দেহে ধারণ করিলে দেহনিঃসৃত তৈল লাগিয়া মুক্তা উজ্জ্বল লাবণ্যময় থাকে। এই মুক্তাতত্ত্ব লইয়া য়ুরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক (Moebius, Filippi, Dubois, Biedermann, Dr. Wilhelm Berndt প্রভৃতি) জীবন ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন।

চারু।

প্রণয়-কবিতার বিলোপ (London Daily News):—

একজন রমণী লেখিকা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রণয়কবিতা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কবিতা-পুস্তকালয় (Poetry Bookshop) কর্তৃক প্রকাশিত একখানি কবিতাসংগ্রহ-পুস্তকে (Georgian Poetry) গত দুই বৎসরে লিখিত তরুণ কবিদের কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহ-পুস্তকে একটাও প্রণয়কবিতা নাই। ধুলা, ধূম, ছেঁড়া ন্যাকড়া, মাছ, চা প্রভৃতি উদ্ভট পদার্থ কবিকল্পনা উদ্বোধিত করিয়াছে, কিন্তু প্রণয়-মাধুর্য্য কোনো কবিরই সৃজনশক্তিকে স্পর্শ করে নাই; তরুণ কবির কবিতায় সকলেই স্থান পাইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে শুধু রমণী।

যে রমণী ও প্রণয়ব্যাপার ষোড়শ শতাব্দীর কবিচিত্তকে মুগ্ধ পাগল করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এখনকার কবিদের কাছে একেবারেই আমল যে পাইতেছে না ইহার কারণ কি? ইহার কারণ স্বয়ং রমণীই। রমণী এখন অত্যন্ত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে; রমণী পুরুষের সহিত পাশাপাশি বসিয়া আপিসে কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিতেছে; রমণী পুরুষের সঙ্গে ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলে, বাগানে টেনিস খেলে, মাঠে গোল্‌ফ খেলে; রমণী পুরুষের সহিত কমিটীতে বসিয়া তর্ক করে, বচসা করে, বিচার করে; রমণী সাফ্রেজিষ্ট হাঙ্গামা করিয়া পুরুষের সঙ্গে মারামারি করে, হাতাহাতি করে। সুলভ জিনিসের মোহ থাকে না; রমণীর রহস্য-আবরণ খসিয়া পড়াতে তাহার মহিমাও বিলুপ্ত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে ঝগড়া ও বোঝাপড়া করিতে করিতে প্রণয় রসিকতা কল্পনা ভাবুকতার আর অবসর থাকিতেছে না। সেই জন্য এখন কোনো কবি জানলা-ভাঙনি বেলিণ্ডা বা কারাবাসিনী প্রিসিল্লার মধ্যে কোনো মাধুর্য্য কোনো অনুপ্রেরণা খুঁজিয়া পাইতেছে না। রমণীরা সস্তা হইয়া কাজের-লোক হইয়া সব মাটি করিয়া ফেলিতেছে। কোনো কবির আর উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার বেদনা সহ্য করিয়া কবিতা লিখিবার অবকাশ নাই;—কবি তাঁহার প্রেয়সীকে যদি বলিলেন গোধূলির আবছায়ায় নিকুঞ্জের লতাবিতানে এসো সখী এসো। তবে কবিপ্রিয়া ঘড়ি ধরিয়া সূর্য্যাস্তের সময় হিসাব করিয়া ঠিক জায়গাটিতে হয়ত কবির আগেই গিয়া হাজির আছেন। এখন আর তাঁহার প্রসাধন করিতে বিলম্ব হয় না, কবিকে বলিতে হয় না "যেমন আছ তেমনি এস আর কোরো না সাজ।" এখন আর রমণী আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনার ভয় রাখেন না। এমন সহজে-পাওয়া অতিপরিচিত জিনিসের প্রতি কি মানুষের আর টান থাকে? তখন কল্পনার ভাগটুকু উবিয়া গিয়া কেবল মাধুর্য্যহীন, মহিমাশূন্য, ভাবরিক্ত মানবীটি অবশিষ্ট থাকে। দান্তের বেয়াত্রিচে ছিল, পেত্রার্কের লরা ছিল; চণ্ডিদাসের রজকিনী রামী ছিল, বিদ্যাপতির লছিমা দেবী ছিল; চিরদিনই কবিদের কাব্যের উৎস রমণী; কবিপ্রেয়সীরা দুর্লভ অজ্ঞাত রহস্যাবৃত আপন মহিমায় আপনিই মহিমান্বিত ছিল বলিয়া কবিদের আরাধ্যা দেবীর স্তুতিগানে প্রণয়কবিতায় ভাবরসের দৈন্য হয় নাই।

চারু।

পশুপক্ষীর স্মরণশক্তি—

হস্তীর স্মরণশক্তির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পোষা হাতী মধ্যে মধ্যে বনে পলাইয়া যায় এবং পুনরায় কয়েক বৎসর পর প্রভুর গৃহে ফিরিয়া আসে এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। কোনও একটী হাতী জঙ্গলের ধার দিয়া যাইতে যাইতে মাহুতকে ফেলিয়া বনে পলায়ন করে। ১৮ বৎসর পর উক্ত হস্তীর মালিক ইহাকে একদল ধৃত বন্য হস্তীর ভিতর দেখিয়া চিনিতে পারেন। তিনি একটি পোষা হাতীতে চড়িয়া পলাতক হাতীর কান ধরিয়া বসিবার জন্য ইঙ্গিত করেন। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ হাতীটা পরিচালকের আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপবেশন করিল। হস্তীটী সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পরিচালকের যাবতীয় ইঙ্গিত ও আদেশ স্মরণ রাখিয়াছিল। প্লিনি বলেন—যে-মাহুত একবার কোনও হাতীকে বাল্যকালে পরিচালনা করে বয়োবৃদ্ধি হইলেও সে হাতী উহাকে চিনিতে পারে।

অশ্বেরও স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রখর। এক বিদেশী ভদ্রলোকের একটী ঘোড়া ছিল। রাত্রিকালে দূরবর্ত্তী গ্রামান্তর হইতে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সেই অশ্ব নির্ব্বিঘ্নে ক্রোশাধিক পথ শকট টানিয়া নগরস্থ তাঁহার বাসায় উপনীত হইত। অপর একটী অশ্ব সুদীর্ঘ আট বৎসর ভিন্ন স্থানে বাস করিবার পরও লণ্ডনে প্রত্যাগত হইয়া জেটী হইতে উহার প্রভুর বাসায় তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল; এবং ইহাকে মুক্ত করা মাত্র আট বৎসর পূর্ব্বের ব্যবহৃত গৃহে বিশ্রামার্থ গমন করিয়াছিল।

কুকুরের স্মরণশক্তির বিষয় আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি। আমাদের বাড়ীতে একটা কুকুর ছিল; আমি বাড়ী গেলে সেটাকে প্রচুর খাবার দিতাম। কুকুরটা নূতন আগন্তুক দেখিলেই তাহাকে কামড়াইতে আসিত। কিন্তু ২।৩ বৎসর পরেও আমি বাড়ী গেলে সে আমায় চিনিতে পারিয়া লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। ডারউইনের একটী কুকুর সুদীর্ঘ ৫ বৎসর পরেও প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছিল। এবং তাঁহার আদেশ মান্য করিয়াছিল।

পক্ষীদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ইহাদের প্রত্যেক কাজেই স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর কোনও বিশেষ সময়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নির্দ্দিষ্ট শাখায় আসিয়া নীড় বাঁধা, নানারূপ বাক্য ও স্বর অনুকরণ করিতে পারা ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ই স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক। পূর্ব্বকালে কপোত দ্বারা ডাক পাঠান হইত। কপোতের স্মরণশক্তির গুণেই সে কার্য্য সমাধা হইত। ডাক্তার সামুয়েল উইল্‌স্ বলেন "আমি যখন প্রথম একটী কাকাতুয়া পুষি সেটী তখন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না। সুতরাং কিরূপে ক্রমে ক্রমে ইহা নানারূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিল আমি তাহা উত্তমরূপে অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার শিখিবার প্রণালীর সহিত আমাদের শিশুদের শিখিবার রীতির আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিয়া আমি

বেশ্রয়াঘিত হইয়াছি। কাকাতুয়াটী এখন অতি সুন্দররূপে নানা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে এবং কোনও ব্যক্তির স্বর হুবহু অনুকরণ করিতে সমর্থ। এমন কি মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম অতি গম্ভীর স্বর হঠাৎ অতি কোমলে পরিণত করিতে জানে। আমার পোষা কাকাতুয়াটী অনবরত চর্চ্চা ও অনুশীলন না রাখিলে কয়েক মাসের ভিতরই সমস্ত শিক্ষা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু একটা নূতন বাক্য শিখাইতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক হইত ভুলা বাক্যটী স্মরণ করাইতে তত সময় লাগিত না—সহজেই তাহা পুনরায় আবর্ত্ত করিতে পারিত। কোনও নূতন বাক্য শিখাইতে হইলে তাহা বারংবার কাকাতুয়ার নিকট সজোরে উচ্চারণ করিতে হইত। পক্ষীটী ততক্ষণ কর্ণকুহর ঘুরাইয়া যথাসম্ভব বক্তার নিকটে আসিয়া মনোযোগের সহিত তাহা শুনিত। এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই বাক্যটী উচ্চারণের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিত। প্রথম প্রথম কোনও প্রকারেই ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিত না; কিন্তু কয়েক দিবস ক্রমাগত চেষ্টার পর সে-বাক্য হুবহু নকল করিয়া বলিতে পারিত। কোনও বাক্য ভুলিবার বেলা ঠিক শেষ শব্দটি সর্ব্বাগ্রে ভুলিয়া বসিত। কিন্তু প্রথম কয়েকটি শব্দ তত সহজে ভুল হইত না। মানুষের শিক্ষা ও ভুলিবার রীতিও ঠিক এই রূপই; বাল্যে-মুখস্থ-করা বিষয় শীঘ্র ভুলা যায় না, বয়সের শিক্ষা সহজেই ভুলা যায়।"

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

কাজের পড়া (Great commonplaces of Reading : Lord Morley) :-

লর্ড মর্লে বলেন "আমরা যাহা পড়ি তাহার সমস্তটুকু যদি কাজে লাগাইতে চাই তাহা হইলে এমন ভাবে সেটি আয়ত্ত করা উচিত যাহাতে আপনার কথায় সেটি প্রকাশ করিতে পারি।"

কি করিলে অধ্যয়ন সার্থক হয় সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি চমৎকার উপদেশ দিয়াছেন:—

(১) যাহা পড়া যায় তাহার সার মর্ম্ম লেখা উচিত।

(২) সার উইলিয়াম্ হ্যামিল্টনের মতে বইয়ে দাগ দেওয়া খুব ভাল, এইজন্য বিভিন্ন রংএর পেন্সিল বা কালি ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাহার দ্বারা কোনো বিষয়ের যুক্তি এবং দৃষ্টান্তের অংশ আলাদাভাবে দাগ দেওয়া যাইতে পারে, এবং ইহাতে করিয়া আপনা-আপনি চুম্বক এবং অংশবিভাগ (analysis) হইয়া যায়।

(৩) গিবন, ওয়েবষ্টার এবং লর্ড ষ্ট্যাফোর্ড কোনো বিষয় পড়িবার আগে সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিজে কি জানেন একবার মনে মনে আলোচনা করিয়া লইতেন। এ রকম করিলে নূতন কিছু পাইলেই সেটা মনে বসে, এবং বই শেষ হইলে বুঝা যায় কি পরিমাণে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইল।

(৪) সব বই দুইবার করিয়া পড়া ভাল, কারণ একবার পড়ায় কোনো কোনো কথা মনোযোগ এড়াইয়া যায় বা কোনো কোনো বিষয়ে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইতে পারে। যে-সব বই ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িতে হয় তাহা দ্বিতীয়বার পড়ার আগে একটা অবকাশ দেওয়া উচিত, কারণ সময় পাইলে চিন্তাগুলি স্পষ্টতর এবং সুপরিণত হইয়া উঠে। যে-সব বই একবার পড়ার উপযুক্ত তা দুবার পড়ারও উপযুক্ত এবং সাহিত্যের বইগুলি যতবার পড়া যায় ততই ভাল।

(৫) বিখ্যাত দার্শনিক লকের মতে একখানা নোটবুকে বিষয় অনুসারে ভাগ ভাগ করিয়া ভাল ভাল জায়গা লিখিয়া রাখা উচিত। মর্লে বলেন সেই-সব উদ্ধৃত স্থানগুলিরও এক-একটা হেডিং দেওয়া ভাল, এইরূপ করিলে সেই-সব জায়গার প্রতি মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু গিবন এ প্রথার বিরোধী, তিনি বলেন ইহাতে যে-পরিমাণে সময় নষ্ট হয় ততটা উপকার হয় না—তার চেয়ে দুবার করিয়া কোনো জিনিষ পড়িলে সেটা বেশী মনে থাকে।

(৬) লেখকের কোনো মত বা যুক্তি বিরুদ্ধ-সমালোচনার উপযুক্ত হইলে খালি তাই করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। এই ভুলটী আমায় কি শিক্ষা দিতেছে? লেখকের যুক্তিটা এমনতর ভুল হইবার কারণ কি? লেখক কেমন করিয়া এ জায়গায় রুচি-বহির্ভূত কথা লিখিলেন? এইরূপ আলোচনা করিলে পাঠক সুধীজনোচিত প্রশান্ততা, গাম্ভীর্য্য, গভীরতা, বিচারে দাক্ষিণ্য এবং অন্যের ও নিজের চিন্তার মধ্যে অধিকতর প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন।

(৭) কখনো কখনো দেখা যায় কোনো একটা মতেরই দুটা দিক থাকে—লেখক হয়ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিকের কথা বলেন। এ-সমস্ত জায়গায় লেখককে বিরুদ্ধ কথা বলিবার দোষে দোষী না করিয়া পাঠক দুই দিকের সামঞ্জস্যটি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিবেন।

এ রকম করিয়া পড়িতে গেলে অনেকটা খাটিতে হয় বটে কিন্তু তাহা না করিলেও বই পড়িয়া যথার্থ কোনো উপকার হয় না। এ সম্বন্ধে এবং কি কি বই পড়া উচিত সে সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা W. Stead's Books and How to Read them পড়িলে উপকৃত হইবেন। ফ্রেডেরিক হ্যারিসন, সার জন লাবক (লর্ড আভেবারি) প্রভৃতিও এ বিষয়ে উপাদেয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন কথা—

Bulletin de l'Ecole francaise d'Extreme Orient, tome 12, fasc. 3—উক্ত পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় ক্ষোং পেঞ্-এর খমের চিত্রশালার একটি বিশদ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকার প্রণেতা শ্রীযুক্ত পার্মাতিয়ে। ক্ষোং পেঞ্-এর চিত্রশালায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও প্রাচীন খমের লেখমালা, অনেকগুলি ভাস্কর্য্য, কয়েকটি মুর্ত্তি এবং স্থাপত্যখণ্ড সংগৃহীত আছে। এতদ্ব্যতীত পুরাতন কাম্বোজের শিল্পকলার পরিচায়ক ধাতব কার্য্যও এই সংগ্রহে বর্ত্তমান আছে। অনেকগুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিও এই তালিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:—শিব, উমা, গণেশ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গরুড়, হরিহর, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এখানে বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেকগুলি সংশ্লিষ্ট দেবমূর্ত্তিও তালিকায় দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের অনেকগুলি মূর্ত্তি বিভিন্ন মুদ্রায় প্রদর্শিত হইয়াছে। খণ্ডস্থাপত্যগুলির মধ্যে কতকগুলি স্বল্পোত্থিন্ন ও অপর কয়েকটি সু-উত্থিন্ন। চিত্র ও ধাতব কার্য্য সমূহ প্রাচীন ও অভিনব শিল্পকলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিবার কারণ আছে।

Epigraphia Indica, Vol. II pt. 3—উক্ত পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় ডাক্তার জাকোবি চোল ও পাণ্ড্যরাজগণের তারিখ সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি কয়েকটি

তাম্রশাসনের উপর প্রতিষ্ঠাপিত। এই-সকল তাম্রশাসন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ অধ্যাপকের নিকট পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। আমাদিগের তারিখের সারণীর যে কিঞ্চিৎ সংশোধন আবশ্যক তাহা অধ্যাপক তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

Epigraphia Indica, Vol II, pt. 2.—উক্ত সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মাড়বার দেশের চাহমান কালের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। কেবল আবিষ্কৃত লেখমালাকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। প্রকাশিত লেখগুলি তারিখানুযায়ী গ্রথিত এবং মূল মসীলিপি হইতে সঙ্কলিত।

Indian Antiquary: Dec., 1912.—উক্ত সংখ্যায় সম্পাদক-লিখিত "আজীবিক" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অশোকের স্তম্ভলেখমালায় আমাদিগের সহিত আজীবকদিগের প্রথম পরিচয়। ডাক্তার কর্ণ ও বুলার ইহাদিগকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালন করিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ আছে। হুল্‌ৎজ্‌ ইহাদিগকে জৈন বলিয়াছেন কিন্তু ইহাদিগকে এইরূপ অভিহিত করিবার কোনও উপযুক্ত কারণ তাঁহার নাই। ইহাদিগের যে একটা বিশেষ সম্প্রদায় ছিল এবং এই সম্প্রদায় যে জৈন ও শ্রমণ ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সে বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাদিগের মক্‌খলি গোশাল নামে একজন গুরু বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society, 1912, pt. 4.—আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জে, আর ম্যাক্‌লীন্‌ লিখিত "ওজনের পুরাতত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ। প্রবন্ধকার দেখাইয়াছেন যে মানবের জ্ঞানোন্মেষের সহিত আয়তন ও আকারের জ্ঞানই বিশেষভাবে জড়িত। এই আয়তন ও আকারের জ্ঞান পরে গুরুত্বজ্ঞানে বিকাশ-লাভ করে। মিশরের প্রাচীনকাহিনী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে স্বর্ণপ্রচলনের সহিত ইহার বিশুদ্ধতার বিচার করিবার উদ্দেশ্যে ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরে ইহাই বর্ত্তমান "ওজনে" পরিণতি লাভ করে। ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ দ্বিতীয় থোতমিসের সময় হইতে প্রচলিত হয়। মিশরীয়দিগের মধ্যে মানদণ্ড প্রচলনের প্রমাণ তাহাদের "মৃতকগ্রন্থে" প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীকগণ মিশরীয়দিগের নিকট মানদণ্ড ব্যবহার শিক্ষা করেন এবং জেনোফনের গ্রন্থ হইতে আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার।

ইতো পরিবারের অনুশাসন (Japan Magazine):

সকাল সকাল উঠিবে। বেলা পর্য্যন্ত ঘুমানো লজ্জার কথা। সকল সময়ে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগ রাখিবে, কারণ হঠাৎ দুর্ঘটনা বা পীড়া হইতে পারে।

মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে। ভিক্ষুককে সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইবে না। বাড়ীতে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই। মানুষের নিমন্ত্রণেই তাহারা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা মূর্খেরই শোভা পায়।

বাড়ীতে শান্ত হইয়া থাকিবে। বাড়ীর একজন সহিষ্ণু হইলে সকল গোলযোগ থামিয়া যাইবে।

ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করিতে শেখ। ভালো পোশাক পরিলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না।

প্রত্যেক পরিবার স্ব স্ব অবস্থা অনুযায়ী মিতাচারী হইবে, কিন্তু কদাচ কৃপণ হইবে না।

যাহারা সফলতা লাভ করিয়াছে এবং যাহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছে উভয়ের নিকটই শিক্ষা লাভ কর। অকৃতকার্য্য যাহারা হইয়াছে তাহারাও আমাদের শিক্ষক।

প্রকৃত প্রস্তাবে নিজে নিজের ভরণপোষণ করা কঠিন কাজ। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তাহা হইতে খরচপত্র চালানো নিজে-নিজের-ভরণপোষণ-করা নয়।

রমণীর সৌন্দর্য্য অনেক সময় দেশের অধঃপতনের কারণ হয়। সুন্দরী স্ত্রীকে আমল দিতে নাই। পত্নী নির্ব্বাচন করিবে তাহার হৃদয় দেখিয়া, মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নহে। খাশুড়ী যেমন বধূও তেমনি হয়।

পেটুক হইও না। ভুক্তদ্রব্য ভালরকম পরিপাক হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার আহার করিবে না। অনিয়মিত আহার হইতেই পীড়ার উৎপত্তি।

চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুখস্বচ্ছন্দে কাটানোর বিশেষ কোনো মূল্য নাই। বরং অল্প বয়সে কষ্ট পাইয়া বৃদ্ধবয়সে শান্তিভোগ করা ভালো। প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত বীর উভয়েই কষ্ট সহ্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। সহিষ্ণুভাবে ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হইয়া থাকিবে।

সৌভাগ্য অধ্যবসায়ের ফল। অন্য উপায়ে ইহা লাভ করা যায় না।

ভোরের বেলা উঠিয়া যাহারা একান্তমনে কাজে লাগিয়া যায় বিধি তাহাদের উপর সদয়। অলস কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যক্তিরা যতই কেন দেবতাদিগকে ডাকুক না তাঁহারা কখনই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না।

সাধারণ আহারই যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশী কিছুই বিলাস-সামগ্রী।

যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও উপকারলাভ ও অসৎ উপায়ে অর্থলাভ দুর্ভাগ্য বই আর কিছুই নয়। মূল্যবান কিছু রাস্তা হইতে কুড়াইও না; অনুচিত লাভ করিও না। অসদুপায়ে প্রাপ্ত অর্থ ভাসা মেঘের মত, যে-কোনো মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইতে পারে।

সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কর। তোমার ব্যবসায় যতই সামান্য হোক না কেন তাহা ভালো করিয়া সম্পাদন করিবে। অপহৃত দ্রব্য কখনোই মধুর নয়।

প্রভু হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত, পরিবারের সকলেরই একই প্রকার আহার করা উচিত। এইরূপে অনেক অনাবশ্যক খরচ বাঁচিয়া যায়।

সংযমেই সুখ। মূর্খেরাই সীমা লঙ্ঘন করে। কলহ করিও না। ইহাতে ভালোর চেয়ে মন্দ হইবে বেশী। সব কাজ নিজে করিবে, কুড়েমী করিয়া অন্যের উপর নির্ভর করিও না।

ছেলেপুলেকে স্নেহ করিবে। তাহাদের শিক্ষাদানে অবহেলা করিবে না।

দিনরাত কাজ করিবে। ধনী দরিদ্র সকলেরই নিজ নিজ কাজ আছে। মোরগ সময় বলিয়া দ্যায়, কুকুর বাড়ী পাহারা দ্যায়, এবং বিড়াল ইঁদুর ধরে। পৃথিবীতে সকলেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে।

সু।

জাপানের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার (Japan Magazine):

চিকামাৎসু মোনজায়েমোন্ ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে চোশু প্রদেশান্তর্গত হাগি নামক ক্ষুদ্র গ্রামে সামুরাই-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থানেই স্বদেশপ্রেমিক বীর জেনারল্ কাউণ্ট্ নোগির জন্ম হইয়াছিল। কথিত আছে বাল্যকালে তিনি একবার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি একাধিক ওমরাহ-পরিবারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ—সম্ভবত অবাধ্যতা—কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া 'রোনিন্' বা ভবঘুরে ভাড়াটিয়া যোদ্ধাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

কিওতোর ওমরাহদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে অভিনয়ের জন্য তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ওসাকার একটি নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া সেই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি নাটক রচনা করেন।

জাপানের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

প্রথম দৃষ্টিপাতে অনেকের নিকটেই তাঁহার রচনা প্রচুর কথা-বার্ত্তায়-ভরা রোমান্স্ বলিয়াই বোধ হইবে—নাটক বলিয়া আদৌ মনে হইবে না। কিন্তু বিস্তবিকই তাঁহার রচনাকে নাটক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম দৃশ্য হইতে শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত প্লটের গতি সুনির্দ্দিষ্ট—ঘটনাসন্নিবেশ ও দৃশ্যাবলীর জাঁকজমকেও নাট্য-কলার অভাব নাই।

তাঁহার নাটকগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—ঐতিহাসিক ও সামাজিক। তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঁচ অঙ্কে এবং কতকগুলি তিন অঙ্কে সমাপ্ত।

চিকামাৎসু বহু নাটক রচনা করিয়াছিলেন—সহস্র-পৃষ্ঠাব্যাপী এক ভলুমে তাঁহার ৫১ খানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য রচনা আছে। শুনা যায় কোনো কোনো নাটক তিনি একরাত্রের মধ্যে লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার রচনায় চরিত্র-চিত্র উৎকর্ষ লাভ করে নাই, জীবনের গূঢ়তত্ত্বগুলিও প্রকাশিত হয় নাই—আছে কেবল হত্যা ও রক্তারক্তির ছড়াছড়ি। গদ্যপদ্যে লেখা হইলেও, পদ্যে কবিত্বশক্তির একান্ত অভাব, ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, চরিত্র-বিকাশের কোনো চেষ্টা নাই, পিতৃভক্তি রাজভক্তি প্রভৃতি গুণের অন্তরালে ব্যক্তিত্ব হারাইয়া গেছে। তখনকার জনসমাজ বোধ হয় ঐতিহাসিক নাটকই পছন্দ করিত, কিন্তু চিকামাৎসুর ঝোঁক ছিল সামাজিক নাটকের উপর, কারণ তাঁহার অধিকাংশ নাটকই সামাজিক ব্যাপার লইয়া রচিত। অধিকাংশই প্রেমকাহিনী—নারীর একনিষ্ঠ প্রেম ও সাহসের প্রশংসায় পূর্ণ।

তাঁহার একখানি সুবিখ্যাত নাটকের নাম কোকুসেন্যা কাস্সেন্। কোকুসেন্যা একজন বিখ্যাত জলদস্যু—তাহার পিতা চীনা, মাতা জাপানী। চীনের মিং বংশের যুদ্ধে সে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। নিম্নে নাটকখানির সারাংশ বিবৃত হইল—

[প্রথম অঙ্ক]

নানকিং রাজসভা। সর্ব্বশেষ মিং নৃপতি মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট। তাতারের রাজদূত উপহার লইয়া আসিলেন, ও মিং নৃপতির প্রিয় মহিষীকে স্বীয় প্রভুর জন্য প্রার্থনা করিলেন। মহিষী তখন সন্তানসম্ভবা, রাজ্যের উত্তরাধিকারীর জন্ম হইবে—কেমন করিয়া তাতার-রাজের প্রার্থনায় সম্মত হওয়া যায়? দূত চটিয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিবার জন্য একজন মন্ত্রী ছোরা দিয়া একটি চক্ষু কাটিয়া বাহির করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত আধারে দূতকে উপহার দিলেন। দূত শান্ত হইলেন—উৎপাটিত চক্ষু লইয়া হৃষ্টচিত্তে বিদায় হইলেন।

এইবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। নৃপতির কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রকোষ্ঠ। দুই শত তরুণী সঙ্গিনী লইয়া নৃপতি আবির্ভূত হইলেন। তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের হস্তে প্রস্ফুটিত প্লামের শাখা ও অপরার্দ্ধের হস্তে চেরি-শাখা। তাহারা রঙ্গমঞ্চের দুই ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল। নৃপতি ভগ্নীকে মন্ত্রীর মহান্ ত্যাগের (চক্ষু উৎপাটন করিবার) কথা শুনাইলেন ও কিছুকাল পূর্ব্বে মন্ত্রী তাঁহাকে (ভগ্নীকে) বিবাহ করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তিনি প্রস্তাব করিলেন যে প্লাম-ও-চেরি-শাখা-ধারিণী নারীদলের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া এ বিষয়ে মীমাংসা হোক। রাজকুমারী সম্মত হইয়া প্লাম-শাখাধারিণী রমণীদলের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহারা নৃপতির সহিত ষড় করিয়া যুদ্ধে হারিয়া গেল। এমন সময় এক সশস্ত্র বর্ম্মপরিহিত যোদ্ধা ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিলেন—এইরূপে তর্কের মীমাংসা করিলে রাজ্য ধ্বংস হইবে সে কথা নৃপতিকে বলিলেন, এবং যে মন্ত্রী চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিয়াছিল তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন। ঠিক সেই সময় চক্কানিনাদ হইল, তাতার সৈন্য প্রাসাদ ঘিরিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে তাতারদের আসল উদ্দেশ্য হইল মিং সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর

জন্মে বাধা দেওয়া। এমন সময় যোদ্ধার পত্নী তাঁহার শিশুকে লইয়া প্রবেশ করিলেন ও শিশুকে রাখিয়া রাজভগ্নীর সহিত পলায়ন করিলেন। যোদ্ধা বাহির হইয়া অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া লাখ লাখ শত্রু তাড়াইয়া দিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার অবর্ত্তমানে এক বিশ্বাসঘাতক নৃপতিকে হত্যা করিয়াছে। রাজ্যের উত্তরাধিকারীর মাতাকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি স্বীয় শিশুকে বর্ম্মায় বাঁধিয়া রাজমহিষীকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে পলাইলেন। পথিমধ্যে মহিষী শত্রুর গুলিতে নিহত হইলেন, শিশুটি কিন্তু বাঁচিয়া গিয়াছিল। শত্রুর চোখে ধুলা দিবার জন্য যোদ্ধা স্বহস্তে নিজ শিশুকে বধ করিয়া মহিষীর পাশে রাখিয়া রাজকুমারকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন।

[দ্বিতীয় অঙ্ক]

জাপানের অন্তর্গত হিরাদো নামক স্থান। সমুদ্রতীরে কোকুসেঙ্গা পত্নীর সহিত ঝিনুক কুড়াইতে কুড়াইতে দেখিতে পাইল একখানা নৌকা তাহাদের দিকে আসিতেছে। দেখা গেল সেই নৌকায় রাজভগ্নী চীন হইতে ভাসিয়া আসিয়াছেন। সে তাঁহার কাহিনী শুনিয়া পত্নীর নিকট তাঁহাকে রাখিয়া মিং বংশের পুনঃস্থাপনের জন্য চীন যাত্রা করিল। পথিমধ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধা মাতাকে পিঠে করিয়া সে একাকী ব্যাঘ্রকে পরাভূত করিল। সে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের টিকি ছাঁটিয়া দিয়া জাপানী নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছিল।

[তৃতীয় অঙ্ক]

নূতন সেনাদল লইয়া কোকুসেঙ্গা দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, ও বৃদ্ধা মাতাকে সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য ভিতরে পাঠাইল। দুর্গাধ্যক্ষ কান্কি বলিয়া পাঠাইল যে, সে স্ত্রীলোকের কথায় তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে না। কোকুসেঙ্গা সে কথা শুনিয়া লম্ফ দিয়া দুর্গপরিখা পার হইয়া কান্কির সম্মুখীন হইল। পুরুষদিগকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য রমণীরা আত্মহত্যা করিয়া মরিল।

[চতুর্থ অঙ্ক]

চীনের পর্ব্বতময় নিভৃত প্রদেশের দৃশ্য। যোদ্ধা রাজশিশুকে লইয়া উপস্থিত। শিশু এখন একাদশ বৎসর বয়স্ক বালকে পরিণত হইয়াছে। কোকুসেঙ্গার পত্নী ও পিতা চীনরাজের ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া জাপান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল—অমনি গভীর খাতের উপর মেঘের সেতু প্রকাশিত হইল। তাহার উপর দিয়া তাহারা পরপারের পর্ব্বতে পলায়ন করিল। শত্রু যেই সেতুর উপর দিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গেল অমনি ঝড় উঠিয়া সেতু উড়াইয়া দিল—পাঁচশত শত্রু গভীর খাতের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

[পঞ্চম অঙ্ক]

কান্কি, কোকুসেঙ্গা ও যোদ্ধা যুদ্ধের পরামর্শ আঁটিতেছিল এমন সময় কোকুসেঙ্গার পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন—বয়স তাঁহার ৭৩ বৎসর—তাঁহার দ্বারা আর কোনো কাজ হইবে না। তাই তিনি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া মরিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বৃদ্ধকে এ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য তাহারা সকলে ধাবিত হইল।

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। স্থান—নান্কিং]

বৃদ্ধ পিতা ফটকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া শত্রুকে এক এক জন করিয়া আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিল। তাতার-রাজ দুর্গের ছাদের উপর হইতে ব্যাপার দেখিয়া বৃদ্ধকে ধরিয়া সহরের মধ্যে আনিতে আদেশ দিলেন। কোকুসেঙ্গা দলবল সহ প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। সে তাতার-রাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু জনৈক যোদ্ধা তাহার পিতার গলদেশে অসি স্পর্শ করাইলে নিরস্ত হইল। যোদ্ধা ভান করিয়া কোকুসেঙ্গার পিতাকে তাতার-রাজের হস্তে সমর্পণ করিতে গেল ও তর্কবিতর্কের মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া রাজাকে বাঁধিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। রাজকর্ম্মচারী ও শরীররক্ষীগণও সকলেই নিহত হইল। অবশেষে বন্দী অবস্থায় তাতার-রাজ জাপানে নীত হইলেন।

এইখানে নাটকের সমাপ্তি।

উপরে লিখিত চুম্বক হইতে নাটকের গুরুত্ব অল্পই উপলব্ধি হয়। নাটকখানির চমৎকার ভাষা ও অর্থপূর্ণ বক্তৃতারও কোনো আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায় না। নাটকের অঙ্গীভূত অনেক ঘটনা যে অসম্ভব, ভাষা ও অভিনয় করিবার ভঙ্গী দর্শককে সে কথা ভাবিবার অবসর প্রদান করে না।

ওরাওঁদের প্রতিবেশী

ওরাওঁদের দেশে এমন গ্রাম খুব অল্পই আছে যেখানে কেবলমাত্র ওরাওঁদেরই বাস। ওরাওঁ-গ্রামসমূহের ভূস্বামীরা অধিকাংশস্থলেই হিন্দু, এবং কচিৎ কোন কোন স্থলে মুসলমান। তাহারা অনেক স্থলে ঐ-সকল গ্রামেই বাস করে। চাষই ওরাওঁদের প্রধান এবং কার্য্যতঃ একমাত্র উপজীবিকা। তাহারা কাপড় বোনা, ঝুড়ি প্রস্তুত করা, কুম্ভকারের ও কামারের কাজ, প্রভৃতি অপমানজনক মনে করে। সুতরাং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের সামান্য যে-সব জিনিষের দরকার হয়, তাহা যোগাইতে অন্যান্য জাতীয় লোকের প্রয়োজন হয়। এই জন্য অধিকাংশ ওরাওঁ-গ্রামে তাহাদের লাঙ্গলের ফাল প্রস্তুত বা মেরামত করিবার জন্য ২।১ ঘর লোহার, তাহাদের গরু চরাইবার জন্য ২।১ ঘর আহীর বা গোয়ালা, তাহাদের জন্য হাঁড়ি, কলসী, ভাঁড় এবং ঘর ছাইবার খোলা, প্রভৃতি গড়িবার জন্য ২।১ ঘর কুমার, তাহাদের কাপড় বুনিবার জন্য ২।১ ঘর হয় জোলা না হয় চীকবড়াইক, তাহাদের জন্য ঝুড়ি তৈয়ার করিবার নিমিত্ত দুই একঘর তুরি; মাহালী বা ওড়, এবং তাহাদের সামাজিক আমোদপ্রমোদ ও উৎসবে বাদ্য বাজাইবার জন্য এবং অন্যান্য প্রকারে তাহাদের সেবা করিবার জন্য দুই এক ঘর ঘাসী এবং গোড়াইত দেখা যায়।

ওরাওঁ যুবক যাহারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। বাঁ দিকের দাড়ি-ওয়ালা লোকটি একজন মুসলমান জোতদার।

এই সব নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা হিন্দুতে পরিণত জাতি ছাড়া, ছোটনাগপুরে ওরাওঁদের পাশাপাশি খাঁটি আদিম কয়েকটি জাতিকেও বাস করিতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে মুণ্ডা, খাড়িয়া, কোড়োয়া এবং অসুরেরা প্রধান। মুণ্ডা ও খাড়িয়ারা সভ্যতায় ওরাওঁদের সমস্তরে অবস্থিত। ইহারা মানসিক ও সামাজিক উৎকর্ষের যে নিম্নস্তরে অবস্থিত, কোড়োয়া ও অসুরেরা তাহা অপেক্ষাও আদিম অনুন্নত অবস্থায় অবস্থিত। যাহাই হউক, এই আদিম জাতিরা ওরাওঁ-গ্রামসকলের অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই-সকল জাতির কথাই বলিব যাহাদের সাহায্য ব্যতীত ওরাওঁদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই হইতে পারে না এবং যাহাদিগকে কাজেকাজেই আদর্শ ওরাওঁ-গ্রাম্য-সমাজের অঙ্গীভূত বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। এই-সব জাতির মধ্যে আহীর, লোহার, গোড়াইত, ঘাসী, মাহালী, তুরী, কুমার এবং জোলা * উল্লেখ-যোগ্য।

১ আহীর।—যে-সকল ওরাওঁগ্রামে বা তাহাদের নিকটে জঙ্গল এবং পশু-চারণ ভূমি আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ একটি আহীর পরিবার আছে। গ্রামবাসীদের গো-মহিষ চরান ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা গ্রামের আহীরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কাজের জন্য আহীর প্রত্যেক জোড়া বলদের জন্য বলদের মালিক ওরাওঁএর নিকট বৎসরে ৩০ সের হইতে এক মণ করিয়া ধান পায়। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস,

ওরাওঁ দেশের একজন জমিদার।

* ছোটনাগপুরের জোলারা মুসলমান ধর্ম্মের শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসী ঐ শ্রেণীর মুসলমান তাঁতিশ্রেণী

ওরাওঁ ও খাড়িয়া কোদাল ও টাঙ্গি লইয়া কাকর খুঁড়িয়া জড়ো করিতেছে।

অর্থাৎ একবার শস্যকর্ত্তন হইতে পরবর্ত্তী বীজবপনের সময় পর্য্যন্ত, আহীরের উপর চাষের বলদের ভার থাকে। তবে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ওরাওঁকৃষক ঐ সময়েও চাষের বলদগুলিকে রাত্রিকালে নিজগৃহের গোহালঘরে রাখে, ও উহাদিগের যথেষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। বার্ষিক ধান্য ছাড়া আহীর সাধারণতঃ তাহার রক্ষণাধীন প্রত্যেক গাভীর দুই দিনের মধ্যে এক দিনের দুধ এবং প্রত্যেক মহিষীর তিন দিনের মধ্যে এক দিনের দুধ পায়। ছোটনাগপুরের গাভী এবং মহিষীগুলি নিকৃষ্ট জা'তের,—দুধ অত্যন্ত কম দেয়।

ওরাওঁ-ও-মুণ্ডা-গ্রামবাসী আহীরদের মধ্যে খুববেশী কোল রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়;—সম্ভবতঃ তাহারা পূর্ব্বে বাস্তবিক কোন অসভ্য আদিম জাতি ছিল; কালক্রমে হিন্দুসমাজ-ভুক্ত হইয়াছে। তাহারা মুরগীর মাংস, এবং শুনা যায় যে কখন কখন শূকর-মাংসও খায়; কিন্তু গোমাংস তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা কখন কখন তাহাদের পৌরোহিত্য করে; কিন্তু কেবল পতিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই এই কার্য্য করে। ছোটনাগপুরের কুম্হার (কুম্ভকার) এবং কুরমিদের মত আহীরদিগকেও মাহাতো বলা হয়। রাঁচীজেলার কোন কোন গ্রামে, গ্রামের গো-মহিষের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হইলে, আহীরকে বড় অদ্ভুত ও কৌতুকজনক আচরণ করিতে হয়। গো-মহিষের গলায় কখন কখন যেরূপ কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘণ্টা বাঁধা হয়*, আহীরের কোমরে পশ্চাৎদিকে গ্রামবাসীরা তদ্রূপ একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেয়। এইরূপে সজ্জিত হইয়া আহীরকে নিকটবর্ত্তী গ্রামের দিকে দৌড়িতে হয়; কতকগুলি গ্রামবাসী লাঠি হাতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া যায়। উদ্দিষ্ট গ্রামের সীমায় পৌঁছিয়াই আহীর ঘণ্টাটা খুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় এবং যত শীঘ্র পারে পলায়ন করে।

হইতে বিশেষ কোন বিষয়ে পৃথক্ নহে। এই জন্য তাহাদের কোন বৃত্তান্ত আমরা দিলাম না। চিত্রে যে জোলার চেহারা দেওয়া গেল, তাহাকে ছোটনাগপুরের জোলাদের একটি ভাল নমুনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

* ওরাওঁদের বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে ২৫ নং দ্রব্যের ছবি দেখুন।
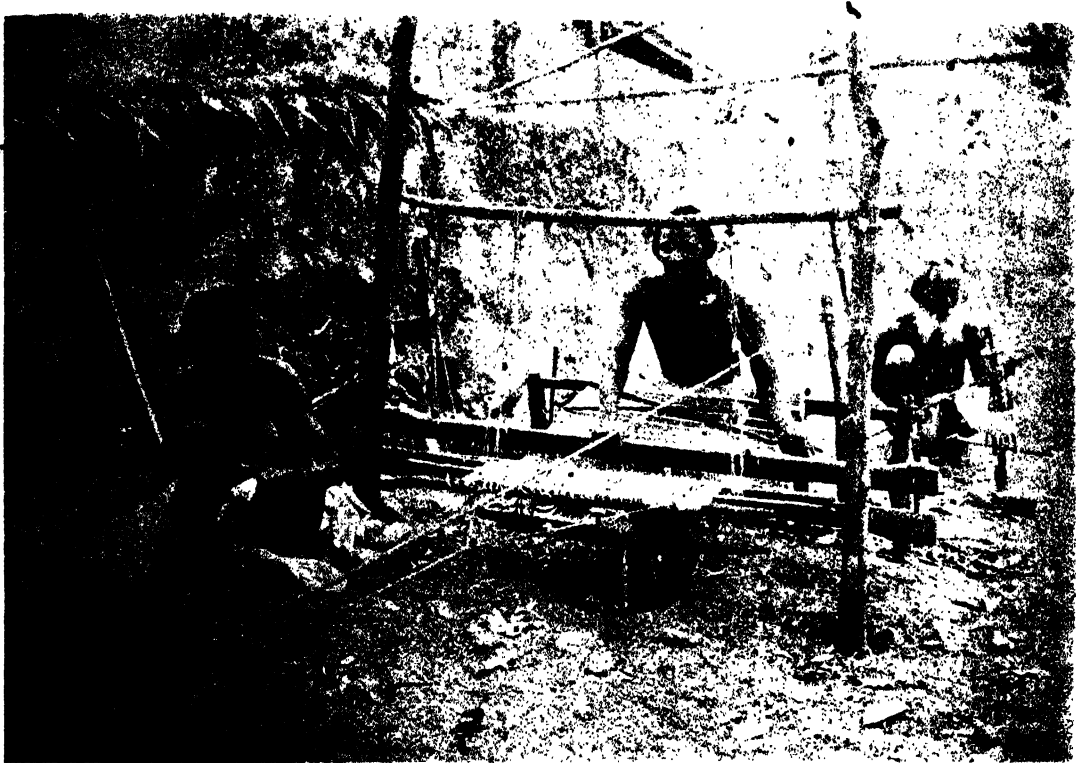
ওরাওঁদের তাঁত। ডাহিন দিকের বৃদ্ধ লোকটি মুসলমান জোলা; অপর দুইজন তাহার সহকারী হিন্দুভাবাপন্ন পাঁড় (তাঁতি)।

যেখানে ঘণ্টাটা পরিত্যক্ত হইয়াছে, গ্রামবাসীরা সেইখান পর্য্যন্ত আহীরকে তাড়া করিয়া যায়, এবং তাহার পর নিরুদ্বেগ চিত্তে নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া আসে; কারণ তাহাদের মনে তখন এই বিশ্বাস জন্মে যে গোমহিষের মড়ক এখন ঐ ঘণ্টার সহিত তাহাদের গ্রাম হইতে পরবর্ত্তী গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে গ্রাম্য আহীরকে জমীদারের পানীভরা বা জলবাহকের কাজ করিতে হয় এবং জমীদার ও তাহার কর্ম্মচারীরা গ্রামে আসিলে তাহাদের জন্য জল বহিতে হয়।

লোহার।—ওরাওঁ-গ্রাম্যসমাজের পক্ষে আহীর অপেক্ষাও লোহার বা কর্ম্মকার অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কারণ, যদিও কোন কোন গ্রামে ওরাওঁ চাষী বাড়ীর ছেলেদের দ্বারা, বা, তদ্রূপ সঙ্গতি থাকিলে, বেতনভোগী একজন ভৃত্য (ধাঙ্গড়) দ্বারা, গোমহিষের চারণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সারিয়া লয়, কিন্তু লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কুঠারাদি হাতিয়ার মেরামতের কার্য্য সেরূপ উপায়ে চলিতে পারে না। আহীরের মত লোহারও যে যে চাষীর কাজ করে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে বৎসরে লাঙ্গল প্রতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য (সাধারণতঃ এক মণ) পারিশ্রমিক স্বরূপ পায়। এই বার্ষিক পারিশ্রমিক ছাড়া, সে লাঙ্গল ব্যতীত অন্য হাতিয়ার প্রস্তুত বা মেরামত করার জন্য স্বতন্ত্র মজুরী পায়। লোহারের প্রত্যেক "যজমান" নিজের নিজের লোহা দেয়। ওরাওঁদেশের এই গ্রাম্য লোহারেরা আংশিকভাবে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত কোলজাতীয়; চলিত কথায় তাহারা কোল-লোহার বা 'লোহরা' নামে পরিচিত। খাঁটি হিন্দু লোহারদিগকে 'সাদলোহার' বলা হয়। লোহারেরা নিজেই নিজের পৌরোহিত্য করে।

গোড়াইত।—প্রায় প্রত্যেক ওরাওঁ গ্রামে এক এক ঘর গোড়াইত আছে। লোহারদের মত ছোটনাগপুরের

ছোটনাগপুরের একটি গ্রামের অভ্যন্তর-দৃশ্য।

গোড়াইতেরা একটি হিন্দুত্বপ্রাপ্ত আদিম জাতি। গ্রাম্য গোড়াইতেরা গ্রামের "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো", বলিলেই তাহাদের যথাযথ বর্ণনা করা হয়। তাহাকে জমীদারের এবং গ্রামের মোড়লের নিকট খবর লইয়া যাইতে হয়, বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপের সময় ঢাক বাজাইতে হয়, এবং আরও নানাবিধ কাজ করিতে হয়। সে চিরুণী প্রস্তুত করে, তুলা ধুনে, এবং ওরাওঁ বালিকাদিগকে উল্কি দিবার জন্য গোড়াইত স্ত্রীলোকদিগকে ডাকা হয়। কোন কোন যায়গায় যেখানে এরূপ নদী আছে যে বর্ষাকালে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না, সেখানে গোড়াইত পাটনীর কাজ করে এবং শালগাছের ডোঙ্গায় করিয়া বাঁশের লগি ঠেলিয়া মানুষ পারাপার করে। কোথাও কোথাও গোড়াইতকে গ্রাম্য কোটোয়ারের কাজ করিতে হয় অর্থাৎ প্রজাদিগকে জমীদারের নিকট ডাকিয়া আনিতে, চিঠি বহিতে, এবং গ্রামে জমীদার বা তাহার কর্ম্মচারীরা আসিলে তাহাদের জন্য জ্বালানী কাঠ ও খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়। অন্যান্য গ্রাম্য কর্ম্মচারীর ন্যায় গোড়াইতেরাও প্রত্যেক চাষীর নিকট নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান পায়। কতকগুলি গ্রামে গোড়াইতের 'গোড়াইতি ক্ষেত' নামক এক এক খণ্ড নিষ্কর জমী আছে। তাহাদের প্রতিবেশী ওরাওঁদের মত গোড়াইতেরা মুরগী শূকর ও গোমাংস খায় এবং প্রচুর পরিমাণে মদ খায়।

ঘাসী।—অনেক ওরাওঁগ্রামে এক বা একাধিক ঘর ঘাসী দেখা যায়। যদিও তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তথাপি তাহাদিগকে গোশূকর-মাংসভোজী ও ঘোর মদ্যপায়ী আদিম দ্রাবিড় জাতীয় বলিয়াই বোধ হয়। তাহারা মাছ ধরিতে খুব ভালবাসে। তাহারা
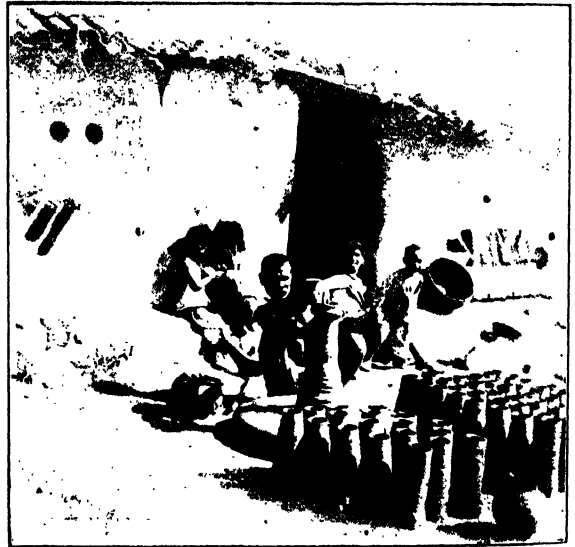
কুম্হার চাকে ঘর ছাইবার খোলা তৈয়ার করিতেছে।

বাঁশের কাজও করে। পুরুষেরা বেশ বাঁশী ও সানাই বাজাইতে পারে, এবং তজ্জন্য বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক আনন্দোৎসবে তাহারা বাজনা বাজাইতে নিযুক্ত

হয়। স্ত্রীলোকেরা ধাত্রী ও শুশ্রূষাকারিণীর কাজ করে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে ঘাসীদের লজ্জা হয় না। চোর বলিয়া এই জাতির খুব বদনাম আছে। তাহারা নামে মাত্র হিন্দু; ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য করে না।

(বাঁশ) মাহালী, তুরী, এবং ওড় বা ওড়েয়া।—ইহারা স্থানভেদে বিভিন্ন নাম ধারণ করিলেও একই জাতি বলিয়া অনুমান হয়। ওরাওঁদেশে এই-সব জাতির লোকেরা ঝুড়ি নির্ম্মাণ করে এবং বাঁশের কাজ করে।

কোড়োয়াদের কুটির।

তাহারা খাঁটি আদিম নিবাসীদের বংশজাত বলিয়া বোধ হয়। যদিও তাহারা ন্যূনাধিক হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গরু, শূকর, মুরগী ও মদ খাইতে তাহাদের আপত্তি হয় না। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য এখনও তাহারা পায় নাই।

কুম্‌হার।—এপর্য্যন্ত যে-সকল জাতির বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে, কুম্ভকার-কুম্‌হারেরা তাহাদের চেয়ে সামাজিক হিসাবে উচ্চতর স্তরের জাতি। তাহাদের মুখাবয়ব সুন্দরতর, ব্রাহ্মণেরা (যদিও খুব উচ্চশ্রেণীর নয়) তাহাদের পৌরোহিত্য করে, এবং তাহারা নিষ্ঠার সহিত গোঁড়া হিন্দুমতের অনুবর্ত্তন করে। কিন্তু সুযোগ ঘটিলে তাহারা মুরগীর মাংস খাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। ছোটনাগপুরের কুম্‌হারেরা একমাত্র চাকের দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করে না; তাহাদের কৌলিক হাঁড়িগড়া ব্যবসা দ্বারা যে সামান্য আয় হয়, সংসার প্রতিপালনের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া তাহারা চাষ করিয়াও কিছু উপার্জ্জন করে। অপেক্ষাকৃত বড় গ্রামগুলিতেই—সাধারণতঃ যথায় জমীদারেরা বাস করে—দুই এক ঘর কুম্‌হার বাস করে। এইরূপ অনেক গ্রামে কুম্‌হার এক খণ্ড চাকুরান জমী পায়, তাহার নাম "খাপর ক্ষেতা" অর্থাৎ খাপ্‌রা করিবার জন্য যে জমী দেওয়া হয়। এই জমীর বিনিময়ে তাহাকে জমীদার ও তাহার কর্ম্মচারীদিগকে বিনামূল্যে হাঁড়ি খোলা ইত্যাদি দিতে হয়। যে-সব গ্রামে কুম্‌হার নাই, তথাকার ওরাওঁদের ঘর ছাইবার খাপ্‌রার দরকার হইলে, অন্য গ্রাম হইতে কুম্‌হার আনাইতে হয়। সাধারণতঃ একজন সহকারী সহ কুম্‌হার চাকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হয়। তাহারা যতদিন থাকে, ততদিন গৃহস্বামীকে তাহাদিগকে থাকিবার যায়গা ও আহার দিতে হয়, এবং খাপরার জন্য হাজার দরে মূল্য দিতে হয়। কিন্তু দরিদ্রতর ওরাওঁদের ইহা সাধ্যের বহির্ভূত। রাঁচির নিকটস্থ পরগণাগুলিতেই ওরাওঁরা খাপরার চালের ঘরে বাস করিতে পারে। কিন্তু জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পার্শ্বে, যেখানে বাঁশ এবং ঘর ছাইবার মত একপ্রকার লম্বা ঘাস যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেখানে ঐ ঘাসের ছাওয়া, চেরা বাঁশের দেওয়ালযুক্ত ঘরের সংখ্যাই বেশী। ছোটনাগপুরের বন্য জাতিরা, যেমন কোড়োয়া, বিশেষতঃ ডিহ্‌ কোড়োয়া বা গ্রাম্য কোড়োয়া হইতে পৃথক্ পাহাড়িয়া কোড়োয়া নামক শাখা, বন্য ঘাসে ছাওয়া নিকৃষ্ট রকমের পর্ণকুটীরে বাস করে।

এই-সব জাতিরা ঠিক ওরাওঁদের মত ঘরকন্নার

ওরাওঁ খৃষ্টানদের বাড়ী—খড়ে ছাওয়া, ছ্যাঁচা বেড়ার দেওয়াল।

বাসনকুসন, চাষের যন্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার করে, এবং তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ওরাওঁ স্ত্রীলোকদের মত গহনা পরে। এই-সব জিনিসের একটি ছবি দেওয়া হইল। আহীর, কুম্‌হার, ভোগ্‌তা, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ওরাওঁ গহনা ছাড়া নাকে ও কানে আরও কিছু অলঙ্কার পরে। তাহারও কিছু নমুনা ছবিতে দেওয়া গেল।

এই সব লোকদের ধর্ম্মবিশ্বাস ন্যূনাধিক পরিমাণে ভূতপ্রেতপূজা নামে অভিহিত হইতে পারে। তাহারা সকলেই সংখ্যায়-ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান অনির্দ্দিষ্ট "বীর" বা অন্য শক্তি এবং মূর্ত্তিহীন নানা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে। তাহাদের মানুষের উপকার অপেক্ষা অপকার করিবার ইচ্ছাই বেশী। ইহারা ঝড় বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য অনর্থ ঘটায়, মানুষ ও জন্তুসকলকে সামান্য ও কঠিন নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত করে, এবং বিপদ ও মৃত্যু ঘটায়। ওরাওঁদের মত এই-সব জাতির কুলক্ষণ সুলক্ষণ, স্বপ্ন, ডাইনীদের ক্ষমতা, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার আছে; তাহারা মানুষ ও পশুদের রোগ দূর করিয়া পরবর্ত্তী গ্রামে তাড়াইয়া দিবার জন্য ওরাওঁদের মত ক্রিয়াকলাপ করে, কুদৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য একই রকম কবচ ও মন্ত্র ব্যবহার করে, এবং যখন মানুষকে ভূতে পায় ও মৃগী মূর্চ্ছাদি রোগ জন্মায়, তখন ভূত তাড়াইবার জন্য একই রকমের উপায় অবলম্বন করে। তাহাদের পূজিত দেবতা ও উপদেবতা সকলও প্রায়ই এক। দেবতাদের মধ্যে গাঁওদেওতী (গ্রাম-দেবতা) বা দেবী মাঈ, বুড়হা-বুড়হী বা পূর্ব্বপিতৃমাতৃ-দেবতাগণ, বড়-পাহাড়ী (সাঁওতাল ও মুণ্ডাদের মরাঙ্গ-বুরু) এবং সূর্য্যদেবের পূজা সকলেই জানে। পূজার পদ্ধতি, অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে, নৈবেদ্য, বা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে যে-সব পশু বা পক্ষী বলি দেওয়া হয় তাহাদের রং কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পৃথক্ রকমের দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির বিশেষ দেবতা আছে; কিন্তু তাহাতে অন্য জাতিদের এই-সকল

ওরাওঁদের বাদ্যযন্ত্রাদি।
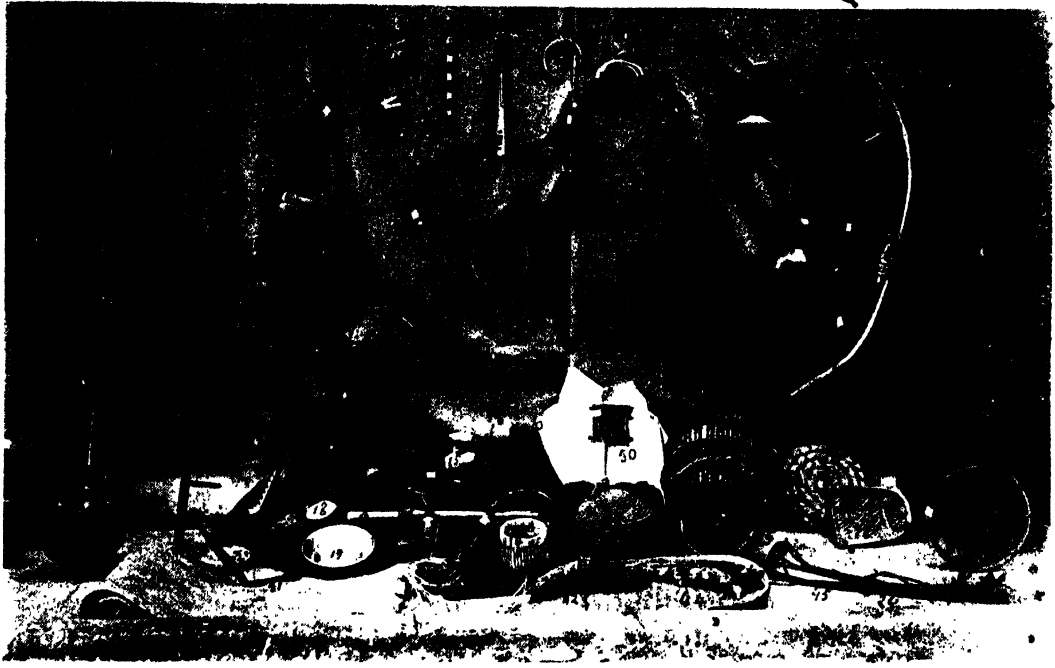
১-২—কেন্দেরা (একতারা ও দুইতারা)। ৩—সাহনাই (সানাই)। ৪—মুরলী। ৫—মান্দার বা মাদল। ৬—টাঙ্গিয়া (ছোট পরশু)। ৭—গুলেল (ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের জন্য ধনু)। ৮—ধনু। ৯,১০—গির্গো (মাছ ধরিবার ঘুনি)। ১১—বাঁস লাসা ঠেঙ্গি (আঠা-কাঠি)। ১২—বীড়া (বসিবার বিড়ি বা বিড়া)। ১৩—সূপ্পী (ছোট কুলা)। ১৪—টোকী (ছোট বাঁশের ঝুড়ি)। ১৫—পিতলের লোটা। ১৬—দড়ি সহিত লাউয়ের তুম্বা। ১৭—মালোয়া ও চমুকা (দীপ ও দীপাধার)। ১৮—ছিপনী (পিতলের তরকারীর থালি)। ১৯—থারিয়া (পিতলের ভাতের থালা)। ২০—পেটী (খড়ের পেটিকা)। ২১ খিজুর (বন্য খেজুর-পাতার বালিস)। ২২—তালপাতার চাটাই। ২৩—ধুরুয়া। ২৪—বাংঘী (কাধে রাখিয়া দুইদিকে সিকা ঝুলাইয়া জিনিষ লইয়া যাইবার চেরা বাঁশের বাঁখ)। ২৫—গরুর গলায় ঝুলাইবার কাঠের ঘণ্টা। ২৬—তোরপোর (যুদ্ধ-তাণ্ডবে পরিবার টুপি)। ২৭—তড়কী (½ ইঞ্চি পুরু একপ্রকার কানফুল)। ২৮—তড়কা বা তরপত (রঙ্গান ও গোলাকারে গুটান তালপাতার কানফুল বিশেষ)। ২৯—মালা (এক প্রকার হার)। ৩০—কাঙ্গী (কাঠের চিরুণী) ৩১—মালা (লম্বা-পশমী-সূতা-বিশিষ্ট হার বিশেষ)। ৩২—হাঁসলী (নিরেট পিতলের অর্দ্ধচন্দ্রাকার গলার অলঙ্কার বিশেষ)। ৩৩—পঁইরী (পায়ে পরিবার নিরেট পিতলের অলঙ্কার বিশেষ)। ৩৪—ডোরী (খোঁপা বাঁধিবার জন্য থোপাযুক্ত পশমী দড়ি)। ৩৫—ঝুটিয়া (পায়ের আঙুলে পরিবার ৪টি অঙ্গুরী ও তাহাদিগকে আঙুলে বাঁধিবার ২টি তামার তার)। ৩৬—তড়কা তরপত (২৮এর মত, কিন্তু ফুলদার নয়)। ৩৭—চিল্লি তায়না (চুল আটকাইয়া রাখিবার জন্য যুবকদিগের পরিহিত পিতলের গোলাকার অলঙ্কার)। ৩৮—কার্‌ধানী (চামড়ার দড়ির কোমরবন্দ)। ৩৯—কবচ। ৪০—তড়পত (পাতার একপ্রকার কানের গহনা)। ৪১—হাঁসুয়া (ঘাস কাটিবার কাস্তে)। ৪২—সূপ (কুলা)। ৪৩—খাম আলু বা আরু (আলু বিশেষ)। ৪৪—আর এক রকম আরু। ৪৫—বাঁশের ছাতা। ৪৬—ঠোটা (পাখী মারিবার কাঠের ফলা-যুক্ত তীর)। ৪৮—ঠোটা (পাখী মারিবার লোহার ফলাযুক্ত তীর)। ৪৮—চিয়ারী (ছোট শিকার মারিবার লোহার তীর)। ৪৯—পত্রা (দুটুক্‌রা কাপড়কে জুড়িয়া একটুক্‌রা করিবার সেলাইয়ের যন্ত্র)। ৫০—বৈঠি (বঁটি)। ৫১—কিয়া (নস্যদানী)।

বিশেষ দেবতাদিগকে ভক্তি (বা ঠিক্ বলিতে গেলে ভয়) করিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় না। যেমন, গোড়েয়া ভূত বিশেষ ভাবে আহীরদের ঠাকুর, কিন্তু ওরাওঁ এবং অন্যান্য জাতিরা এই ভূতের উদ্দেশে বলি দেয়। প্রাকৃতিক প্রধান প্রধান পদার্থ ও শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা, নানাস্থানচারী "ভূলা" নামক যাযাবর উপদেবতাদের পূজা, যে-সব নরনারীদের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, মুয়া, চুরিল, বাঘাউৎ প্রভৃতি নামে পরিচিত তাহাদের আত্মার পূজা, তুষ্টিসাধন অথবা দমন ছোটনাগপুরের সকলজাতির ভূতপ্রেত-পূজা-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। যাহাদিগের, পূজা

ছোটনাগপুরের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক।

ছোটনাগপুর অধিত্যকার স্থানীয় ধর্ম্মবিশ্বাস বলা যাইতে পারে এই প্রকার একশ্রেণীর উপদেবতার উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এরূপ অনেক যায়গা আছে, যেখানে কোন সতীর * মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ বা তদ্রূপ কোন অসামান্য ও ভীতি-উৎপাদক ঘটনা ঘটাতে, স্থানগুলি লোকের চক্ষে পবিত্র হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ কোন অদ্ভুত আকারের শৈল, বা অসাধারণ কোন নৈসর্গিক দৃশ্যও এই সরল লোকদের হৃদয়ে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করে। এ-সব স্থলে ওরাওঁগণ, মৃত সতীর আত্মা, বা জলপ্রপাত ও শৈলাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই অর্চ্চনা করে।

রাঁচি। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

* যেমন লোহারডাগা থানায় হেণ্ডলাসো এবং জোভী গ্রামে আছে।

আগুনের ফুলকি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—কর্ণেল নেভিল ও তাঁহার কন্যা মিস লিডিয়া ইটালিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া ইটালি হইতে কর্সিকা দ্বীপে বেড়াইতে যাইতে-ছিলেন; জাহাজে অর্সো নামক একটি কর্সিকাবাসী যুবকের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইল। যুবক প্রথম দর্শনেই লিডিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়া ভাবভঙ্গিতে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বন্য কর্সিকের প্রতি লিডিয়ার মন বিরূপ হইয়াই রহিল। কিন্তু জাহাজে একজন খালাসির কাছে যখন শুনিল যে অর্সো তাহার পিতার খুনের প্রতিশোধ লইতে দেশে যাইতেছে, তখন কৌতূহলের ফলে লিডিয়ার মন ক্রমে অর্সোর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কর্সিকার বন্দরে গিয়া সকলে এক হোটেলেই উঠিয়াছে, এবং লিডিয়ার সহিত অর্সোর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছে।

অর্সো লিডিয়াকে পাইয়া বাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে ভুলিয়াই বসিয়াছিল। তাহার ভগিনী কলোঁবা দাদার আগমনসংবাদ পাইয়া স্বয়ং তাহার খোঁজে শহরে আসিয়া উপস্থিত হইল; দাদা ও দাদার বন্ধুদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। কলোঁবার গ্রাম্য সরলতা ও ফরমাস-মাত্র গান বাঁধিয়া গাওয়ার শক্তিতে লিডিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলোঁবা মুগ্ধ কর্ণেলের নিকট হইতে দাদার জন্য একটা বড় বন্দুক আদায় করিল।

অর্সো ভগিনীর আগমনের পর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সে লিডিয়ার সহিত একদিন বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে কলোঁবা তাহাকে প্রতিহিংসার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। লিডিয়া অর্সোকে একটি আংটি উপহার দিয়া বলিল যে এই আংটিটি দেখিলেই আপনার মনে হইবে যে আপনাকে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে, নতুবা আপনার একজন বন্ধু বড় দুঃখিত হইবে। অর্সো ও কলোঁবা বিদায় লইয়া গেলে লিডিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে অর্সো তাহাকে ভালো বাসে এবং সেও অর্সোকে ভালো বাসিয়াছে; কিন্তু সে একথা মনে আমল দিতে চাহিল না।

অর্সো নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে চারিদিকে কেবল বিবাদের আয়োজন; সকলের মনেই স্থির বিশ্বাস যে সে প্রতিহিংসা লইতেই বাড়ী ফিরিয়াছে। কলোঁবা একদিন অর্সোকে তাহাদের পিতা যে জায়গায় যে জামা পরিয়া যে গুলিতে খুন হইয়াছিল সে সমস্ত দেখাইয়া তাহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।]

(১৩)

অর্সো বাড়ী আসিয়া দেখিল যে তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া কলোঁবা একটু ভীত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে ফিরিতে দেখিয়াই সে তাহার স্বাভাবিক বিষণ্ণ শান্তভাব ধারণ করিল। সন্ধ্যার পর খাইবার সময় তাহারা নানান বিষয়ে গল্প করিতে লাগিল; ভগিনীর শান্ত ভাবে সাহস পাইয়া অর্সো তাহাকে ফেরারী আসামীদের সহিত সাক্ষাতের বিষয় বলিল এবং শিলিনা মেয়েটি তাহার কাকা ও কাকার বন্ধুর নিকট হইতে কিরূপ নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেছে তাহা লইয়া একটু শ্লেষ করিতেও ছাড়িল না।

কলোঁবা শুনিয়া বলিল—ব্রান্দো খুব সাচ্চা লোক। কিন্তু গিয়োকান্তো লোকটার শুনেছি মতের কোনো স্থিরতা নেই।

—ও এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ সমান, যেমন তোমার ব্রান্দো তেমনি গবাকান্ত, দুজনেই ত সমাজের শত্রু, আইন কানুনের ধার ধারে না। একটা পাপ করে' এখন নিত্য নূতন পাপ করতে তাদের আর আটকায় না; তবে বনের বাইরেও যেমনতর লোক আছে তাদের চেয়ে ওরা বেশি খারাপ নয়!

এই কথায় তাহার ভগিনীর মুখ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অর্সো বলিতে লাগিল—হাঁা সত্যি, এরা খুনে হ'লেও ওদের আত্মসম্মানের বোধ আছে। অদৃষ্টের ফেরেই তারা আজ সমাজ থেকে তাড়িত, কোনো রকম নীচ কাজের জন্য ততটা নয়।

এক দণ্ড উভয়েই নীরব।

কলোঁবা ভাইকে কাফি ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল—দাদা, শুনেছ, কাল রাতে পাল-বাতিস্ত-পিয়েত্রী ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা গেছে?

—পিয়েত্রী লোকটা কে?

—এই গাঁয়েরই একজন লোক, মাদ্‌লিন্ পিয়েত্রীর সোয়ামী—সেই যে খুনের পর বাবার নোটবুক নিয়ে এসেছিল। সে তার সোয়ামীর মৌতে আমায় এক আধটা গান গাইবার জন্যে বলতে এসেছিল। তুমিও চল না, ওরা আমাদের পড়শী, গেলে হানি কি, ওরা খুব খুসি হবে, আমাদেরও ভদ্রতা দেখানো হবে।

—চুলোয় যাক্ তোর মৌতের গান! তোর সব তাতেই কলোঁবা বাড়াবাড়ি! আমার বোন অমনি হট হট করে লোকের বাড়ী গান গেয়ে বেড়াবে, এ আমি পছন্দ করিনে।

কলোঁবা বলিল—দাদা, যার যেমন অবস্থা সে তেমনি করেই মরা লোকের সৎকার করে। মৌতের গান করা আমাদের বাপপিতমর আমল থেকে চলে আসছে, পুরোণো রীতি মেনে চলাই ত উচিত। মাদ্‌লিন্ বেচারী গরিব, এমন সঙ্গতি নেই যে কীর্ত্তনীয়া ভাড়া করে আনে; বুড়ী ফিয়োর্দিস্পিনা দেশের মধ্যে ডাকসাইটে মৌত-গাইয়ে, তার অসুখ, আসতে পারবে না। এখন কারো ত গান গেয়ে বেচারীর কাজটা উদ্ধার করে দিতে হবে। বিপদের সময় সাহায্য করলে দোষ কি? আরো মরা লোকটারও যাতে সদ্‌গতি হয় তাও ত দেখা উচিত।

—তুই কি মনে করিস যে, যে-গানের মাথা নেই মুণ্ডু নেই তেমন একটা বিতিকিচ্ছি গান না গাইলে মরা লোকটা পরলোকের পথ চিনে যেতে পারবে না? তোর যদি নেহাৎ ইচ্ছে হয়ে থাকে শ্রাদ্ধের দিন যাস, আমি না হয় তোর সঙ্গে যাব। কিন্তু গান টান গাওয়া!—সে হবে টবে না বলে দিচ্ছি। এ রকম অলবড্ডে-পনা তোর বয়সে শোভা পায় না, তোকে আমি ব্যগ্রতা করে বলছি। লক্ষ্মীটি!

—দাদা, আমি যে কথা দিয়েছি! দেশের রীতি যখন গান গাওয়া তাতে আর দোষ কি? অন্য কেউ গাইবারও নেই!

—দেশের রীতি! ছাই রীতি!

—আমিই কি সুখে সাধে গাই দাদা। আমার মৌতের গান গাইতে ভারি কষ্ট হয়। আমাদের সকল বিপদ সকল দুঃখ আমার মনে পড়ে' যায়। কাল আমার ভারি অসুখ করবে। তবু আমায় গাইতেই হবে। দাদা, আমায় অনুমতি দাও। আজাক্‌সিয়োর হোটেলে একটা ইংরেজ ছুঁড়িকে আমোদ দেবার জন্যে তুমিই না আমাকে দিয়ে গান তৈরি করিয়ে গাইয়েছিলে? অথচ তারা

আমাদের এই পুরোণো রীতিটাকে বিদ্রূপের চক্ষে মজার ব্যাপার বলেই দেখে। আর আজ এক গরিব বেচারীর শোকের দিনে আমি গিয়ে একটা গান গাইলে তারা শোকে সান্ত্বনা পাবে কিনা, তাই আজ আমি গাইতে পারব না!

—তোর যা খুসি করগে যা। যে গানটা সখ করে' বাঁধা হয়েছে সেটা গেয়ে লোককে না শোনালে মন মানবে কেন?

—না, তা নয়। আমি আগে থাকতে গান বেঁধে গাইতে পারিনে। আমি শবের সামনে দাঁড়িয়ে, যে গেল আর যারা থাকল তাদের কথা ভাবি; ভাবতে ভাবতে চোখে যখন জল ভরে' ওঠে তখন মনের মধ্যে যে কথা আসে তাই আমি সুর করে গেয়ে যাই।

এই কথাগুলি কলোঁবা এমন সরল ভাবে বলিয়া গেল যে এ কথায় তাহার কবিত্বশক্তির অহঙ্কারের আভাষ বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না।

অর্সো হার মানিয়া ভগিনীর সহিত পিয়েত্রীর বাড়ী গেল।

বাড়ীর বড় ঘরটিতে একখানা খাটিয়ার উপর শব শোয়ানো আছে; শবের মুখের ঢাকা খোলা; খাটিয়ার চারিধারে সারি সারি অনেকগুলি মোমবাতি জ্বলিতেছে; ঘরের জানলা দরজা খোলা। শবের শিয়রে তাহার বিধবা স্ত্রী দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহার পশ্চাতে কয়েক জন স্ত্রীলোক ঘরের একদিক ভরিয়া দণ্ডায়মান; ঘরের অপর দিকে পুরুষেরা নিস্তব্ধ বিষণ্ণ মুখে খোলা মাথায় শবের দিকে চাহিয়া স্থির নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া আছে। যে-কেহ নূতন লোক ঘরে আসিতেছে সেই নিঃশব্দে সন্তর্পণে খাটিয়ার কাছে গিয়া মৃতদেহকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে মাথার ইঙ্গিতে সান্ত্বনা ও সহমর্ম্মিতা জানাইয়া সমবেত জনতার এক পার্শ্বে গিয়া নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক এক জন গিন্নিবান্নি ধরণের লোক আক্ষেপ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল—"আহা! এমন সোনার সংসার ছেড়ে কোথায় চল্লে? স্ত্রীপুত্তুর জাজ্বল্যমান, তোমার কিসের অভাব ছিল? আর মাস খানেক থেকে যেতে পারলে না, পৌত্তুরের মুখ দেখে যেতে? আহা রে!"

একজন খুব লম্বা-চৌড়া জোয়ান লোক, সেই পিয়েত্রীর ছেলে, মরা বাপের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—বাবা, মরলে যদি ত এমন করে রোগে ভুগে মরলে কেন? কারো হাতে খুন হ'তে ত আমরা খুনের শোধ নিতে পারতাম!

ঘরে ঢুকিতেই এই কথা অর্সোর কানে গেল। তাহাকে দেখা মাত্র জনতা দ্বিধা ভিন্ন হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল, এবং মৌত গায়িকার আগমনে জনতার মধ্যে উত্তেজনার ঘন গুঞ্জন ধ্বনিত রণিত হইতে লাগিল। কলোঁবা বিধবাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সে মুখের ঘোমটা পিছন দিকে সরাইয়া দিয়া একদৃষ্টে শবের দিকে চাহিয়া রহিল এবং দেখিতে দেখিতে শবের মতোই বিবর্ণ ম্লান হইয়া সে গাহিতে লাগিল—

(আজি) তোমারি জন্য হে পুণ্যবান্
স্বর্গ দুয়ার খোলে।
স্বর্গে তোমার আত্মার লাগি'
আরামের দোলা দোলে।
শীতাতপ কিছু নাই সেই ঠাঁই,
নাই সেথা হানাহানি;
বেঁচে থাকা শুধু যন্ত্রণা, হায়,—
মরণ তরণ মানি।
কাস্তে কুঠার লাঙলে তোমার
প্রয়োজন নাই আর,
ছুটির খবর পৌঁছেছে, ওগো
পড়েছে ছুটির বার।
আত্মা তোমার শান্তি লভুক্
সলিলে ভাবনা ডালি,
পুত্র তোমার রয়েছে যখন
রাখিবে গৃহস্থালি।
শালগাছ কাটে কাঠুরিয়া বনে,
কাটে সে ঘেঁসিয়া গোড়া,
দুদিন না যেতে মাথা তোলে তেজে
নূতন শালের কোঁড়া!

লোকে ভাবে যাহা হ'ল নির্ম্মূল
সেই ফিরে তোলে মাথা,—
ছাতা ধরে সেই সবার উপর
সবুজ পাতায় গাঁথা;
বনস্পতির পীঠস্থানেই
জাগে গো বনস্পতি;
(মোরা) পুরাতনে স্মরি,—নূতনেরে বরি'—
সুস্থির করি মতি।

এইখানে মাদ্‌লিন্ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং দুতিনজন মর্দ্দলোক যারা পাখী শিকারের মতো অনায়াসে মানুষ খুন করিতে পারে তাহারাও তাহাদের রোদ-পোড়া গালের উপর হইতে বড় বড় অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিতে লাগিল।

কলোঁবা কিছুক্ষণ ধরিয়া তেমনিই গাহিতে লাগিল—কখনো মরা লোকটিকে সম্বোধন করে, কখনো তাহার পরিবারের লোকদিগকে কিছু বলে এবং কখনো বা মৃত ব্যক্তির জবানী তাহার শোকার্ত্ত আত্মীয় বন্ধুদিগকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দেয়। তখনি তখনি গান বাঁধিয়া গাহিবার উত্তেজনায় ও একাগ্রতায় তাহার মুখ গম্ভীর উদার ভাব ও স্বচ্ছ গোলাপী আভা ধারণ করিয়াছিল, এবং ইহার তুলনায় তাহার দন্তের শুভ্রতা ও বিস্ফারিত চক্ষুতারকার উজ্জ্বলতা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যেন বাঘিনী। যে জনতা তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছিল তাহার মধ্যে দুই চারিটা দীর্ঘশ্বাস, এক আধটা চাপা কান্নার ফোঁপানি ছাড়া আর টুঁ শব্দ হইতেছিল না। অর্সোর এই বুনো গানের সামান্য কবিত্ব শুনিয়া ভাবান্তর হওয়ার কথা নয়; কিন্তু সেও অপর সাধারণের ন্যায়ই নিজেকে সেই গানের শোকে আচ্ছন্ন অভিভূত বোধ করিতেছিল। ঘরের এক কোণে গিয়া সে পিয়েত্রীর ছেলের মতনই উচ্ছ্বসিত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল।

অকস্মাৎ জনতা চঞ্চল হইয়া দ্বিধা হইয়া গেল এবং কয়েকজন অপরিচিত লোক ঘরে প্রবেশ করিল। লোকেরা তাহাদিগকে জায়গা ছাড়িয়া দিবার জন্য যেরূপ ঠেলাঠেলি করিয়া নিজেরা ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া জটলা পাকাইতে লাগিল এবং সকলে তাহাদিগকে যেরূপ সম্মান সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যে এই দরিদ্র-গৃহে তাঁহাদের পায়ের ধূলা বড় সহজে সচরাচর পড়ে না, আজ তাঁহারা দয়া করিয়া এই গৃহে পদার্পণ করিয়া গৃহস্থকে সম্মানিত কৃতার্থ ও ধন্য করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মৌতের গানের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা বশতঃ কেহই একটিও কথা বলিল না। যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ছিল তাহার বয়স আন্দাজ বৎসর চল্লিশ; তাহার কালো রঙের পোষাকে লাল রঙের ফিতে আঁটা—মাতব্বর অফিসারের উর্দ্দি; তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক ধরণধারণ, এবং বেপরোয়া ভাব; দেখিলেই বোধ হয় সে ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহার পশ্চাতে একজন কোল-কুঁজো বুড়ো, পেট-রোগা মতন খিটখিটে চেহারা, এক জোড়া সবুজ চশমা দিয়া তাহার ভয়চঞ্চল দৃষ্টি ঢাকিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। তাহারও পোষাক কালো রঙের, গায়ের চেয়ে ঢের বড়, ঢলঢলে, যেন অপরের চাহিয়া লইয়া পরা, এবং সেও অনেক কালের পুরাণো। সে সর্ব্বদাই ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশে পাশেই থাকিতে চেষ্টা করিতেছে, যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের ছায়ায় লুকাইয়া সে আপনাকে নিরাপদ করিতে চায়। তাহার পশ্চাতে দুজন লম্বাচৌড়া জোয়ান ছোকরা প্রবেশ করিল, তাহাদের মুখের রং রোদ-পোড়া, একজোড়া গোঁপের ঝোপে গাল দুটা ঢাকা, চোখ দুটো গর্ব্বে তাচ্ছিল্যে ভরা, দৃষ্টিতে একটা কৌতুক কৌতুহলের লীলা-চঞ্চলতা। অর্সো নিজের গাঁয়ের কোনো লোককেই চিনিত না; কিন্তু সবুজ-চশমা-পরা বুড়োটাকে দেখিবা মাত্র তাহারা মনটা ছাঁত করিয়া উঠিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ঘেঁসিতে সাহস দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে কিছুমাত্র গোল হইল না। এ ব্যক্তি উকিল বারিসিনি, পিয়েত্রানরার দারোগা। সে তাহার ছেলেদের সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে মৌতের গান শুনাইতে আনিয়াছে।

অর্সোর মনের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল; পিতার শত্রুর সহিত আজ একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া তাহার অন্তর রুদ্ররসে ভরিয়া উঠিল, এবং যে সন্দেহ সে এতদিন জোর করিয়া আমল না দিয়া

দূরে ঠেকাইয়া রাখিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ তাহাকে যেন পাইয়া বসিল।

আর কলোঁবা? যে ব্যক্তির প্রতি সে অনন্ত ঘৃণা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রতস্বরূপ পোষণ করিতেছে তাহাকে দেখিয়া তাহার মুখে একটা কেমন কুটিল ক্রুর ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বিবর্ণ হইয়া উঠিল; তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ ভগ্ন হইয়া আসিল; গানের কথা ভাঙা গলা হইতে ওষ্ঠে আসিয়াই মরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নূতন উদ্যমে গাহিতে লাগিল—

(ওরে!) শিক্‌রে পাখীর শোক্ লেগেছে,
কে দ্যায় সান্ত্বনা?
(সে যে) শূন্য নীড়ে ডুক্‌রে কাঁদে,
দারুণ যন্ত্রণা।
(হায়) দাপ্‌টে বেড়ায় বনের ঘোড়া
মরম না বোঝে,
(আজ) শিক্‌রে পাখী শোকের ভরে
দুই আঁখি বোজে।

এইখানে একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল; গানের উপমাটা নবাগত যুবক দুজনের নিতান্তই অপ্রযুক্ত মনে হইতেছিল।

(ও সে) সাম্‌লে এ ভাব মেল্‌বে পাখা
রক্তে ধোবে ঠোঁট,
(আজ) নূতন শোকের চোট লেগেছে—
বুকে চাকুর চোট।
(আজ) পরের ঘরে শোক এসেছে,
কান্না অবিশ্রাম;
(হায়) সবাই কাঁদে, আমার চোখেই
নেই রোদনের নাম!
(ওগো) কাঁদ্‌বে কেন অনাথ মেয়ে
কাঁদ্‌বে কেন সে?
(এ যে) সুখের মরণ আপন ভিটায়
প্রাচীন বয়সে।
(এই) অনাথ মেয়ে আপন বাপের
জন্যে কাঁদে আজ,
(ওগো) মাথার পরে পড়েছে যার
বিনা-মেঘের বাজ।
(ওগো) পিছন থেকে গুপ্ত খুনী
গুপ্তী মেরেছে,—
(আহা) ঝোপের যত সবুজ পাতা
রক্তে ভেরেছে।
(সেই) রক্ত-মাখা পাতার রাশি
করেছি সঞ্চয়,
(আর) দু'হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিছি
সারাটা দেশময়।
(সেই) নিরপরাধ জনের রক্ত
দিইছি ছড়িয়ে,
(আর) দিইছি সঙ্গে শক্ত শপথ
মন্ত্র পড়িয়ে।
(ওগো) খুনীর রক্তে ধোয়াও দেশের
কলঙ্কী অঙ্গ.
(ওগো) কে ধোয়াবে আজকে দেশের
রক্ত-কলঙ্ক।
(ওগো) শিক্‌রে পাখীর শোক লেগেছে
দারুণ যন্ত্রণা.
(আজ) অনাথ মেয়ে ডুক্‌রে কাঁদে,
কে দ্যায় সান্ত্বনা!

গান শেষ করিয়াই কলোঁবা একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল; সকলে শুনিতে পাইল সে কাঁদিতেছে। সমাগত রমণীরা কাঁদিতে কাঁদিতে গায়িকার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; পুরুষেরা দারোগা ও তাহার ছেলেদের উপর রুষ্ট দৃষ্টি হানিতে লাগিল; মৃতের শ্রাদ্ধকে এমন করিয়া পণ্ড করার বিরুদ্ধে বৃদ্ধেরা আপত্তির মৃদু গুঞ্জন তুলিল। মৃতের পুত্র ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া দারোগাকে সত্বর সেখান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য রূঢ়স্বরে মিনতি জানাইল। কিন্তু দারোগা অনুরোধের অপেক্ষায় ছিল না; সে তখন দরজায় পৌঁছিয়াছে এবং তাহার ছেলে দুটো একেবারে বাহির হইয়া গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটও মৃতের পুত্রকে দুচারটি সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া

তাড়াতাড়ি তাহার সঙ্গীদেরই অনুসরণ করিল। অর্সো ও ভগিনীর নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যুবক পিয়েত্রী তাহার কয়েকজন বন্ধুকে বলিল—ওদের সঙ্গে যাও। খবরদার ওদের যেন কিছু না হয়!

দু-তিন-জন যুবক তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের জামার বাঁ আস্তিনের ভিতর লম্বা লম্বা ছোরা লুকাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং অর্সো ও তাহার ভগিনীকে তাহাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-মোচন

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের সারমর্ম্ম :—স্বামী ফিদিয়ার সহিত স্ত্রী লিজার মোটে বনিত না—নিত্য দুইজনে ঝগড়া-খিটিমিটি বাধিত। লিজা মাতৃগৃহে চলিয়া গেল। সেখানে বাল্য-সুহৃদ ভিক্তরের আশ্বাসে ও সান্ত্বনায় সে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইল। ভিক্তর লিজাকে বরাবরই ভালো বাসিত। তবে ফিদিয়া ছিল তাহার বন্ধু, তাই লিজার সহিত ফিদিয়ার বিবাহে আত্মপ্রেম সে কোনমতে দমন করিয়া রাখিয়াছিল। ওদিকে ফিদিয়া স্ত্রীর গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া বেদিয়া-গৃহে বন্ধু-মজলিসে মদ খাইয়া গান শুনিয়া আমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। বেদিয়া-কন্যা মাশা তাহাকে ভালবাসিত—তাহার সুখে সুখ ও তাহার দুঃখে দুঃখ বোধ করিত। এমনই ভাবে ফিদিয়ার দিন কাটিতেছিল; কিন্তু পাঁচজনের অনুরোধে সে বুঝিল, লিজাকে বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে সে-ও মুক্তি পাইয়া ভিক্তরকে বিবাহ করিয়া জীবনে সুখের স্বাদ পায়! মুক্তি দিতে গেলে কিন্তু ডাইভোর্সের আশ্রয় গ্রহণ এবং সমস্ত অপরাধ ফিদিয়াকেই ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিতে হয়—অথচ সে এমন কোন অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য লিজা আদালত হইতে ডাইভোর্সের আদেশ পাইতে পারে। সুতরাং আদালতে মিথ্যা হলপ করা ছাড়া ফিদিয়ার উপায়ান্তর নাই, তাহাতে সে একান্ত নারাজ। অগত্যা সে স্থির করিল, আত্মহত্যা করিয়া লিজাকে মুক্তি দিবে। এমনই সঙ্কল্প করিয়া যখন সে আত্মপ্রাণ-বিনাশের উদ্যোগ করিয়াছে, তখন মাশা সহসা আসিয়া পড়িয়া তাহাতে বাধা দিল। সমস্ত শুনিয়া মাশা কহিল, মরিবার বা মিথ্যা হলপ লইবার কোন প্রয়োজন নাই। সে সাঁতার জানে না; নদীর তীরে আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ রাখিয়া মাশা-প্রদত্ত পোষাক পরিয়া কোথাও যদি সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, তাহা হইলে লোকে জানিবে, জলে ডুবিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তখন লিজা-ভিক্তরের বিবাহেরও সকল অন্তরায় কাটিয়া যাইবে। ফিদিয়া এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইল। লোকে জানিল, সে মরিয়াছে এবং ভিক্তরের সহিত লিজার বিবাহও দিব্য নিরুদ্বেগে ঘটিয়া গেল।

ফিদিয়া ছদ্মনামে নানাস্থানে ঘুরিয়া দিন কাটাইতেছিল। সহসা নেশার ঝোঁকে একদিন এক হোটেলে সে আপনার জীবন-কাহিনী জনৈক বন্ধুর নিকট বিবৃত করিতেছিল; আর্ত্তেমিব্‌ নামে এক ভাগ্যান্বেষী যুবা অলক্ষ্যে থাকিয়া সে কথা শুনিয়া পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া ফিদিয়াকে ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেয় এবং এ ব্যাপারের তদন্তের জন্য কারেনিন ও লিজাকেও ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার খাসকামরায় তলব করে।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাজিষ্ট্রেটের খাস্‌-কামরা।

মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার বন্ধু মেনিকভ্‌ গল্প করিতেছিল; পার্শ্বে পেস্কার নথী-পত্র গুছাইতে ব্যস্ত।

মাজিষ্ট্রেট। না, না, এ-সব তা হলে সে বানিয়ে বলেছে। সত্যিই ত আর আমি কাঠ-গোঁয়ার নই—মিথ্যে করে তোমার কাছে আমার নামে লাগিয়েছে!

মেনিকভ্‌। লাগানো হোক্‌ আর যাই হোক, তোমার ব্যবহারে সে মনে ভারী কষ্ট পেয়েছে! মেয়েমানুষ—

মাজিষ্ট্রেট। আহাহা, তুমি বুঝছ না, মেয়েমানুষ বলেই ত আমি অনেক সময় কত সয়ে গেছি—(ঘড়ি দেখিয়া) নাঃ, এখন এ কথা থাক্‌—দু'চার মিনিটে ত শেষ হবার নয়। তার চেয়ে বরং আজ কোর্টের পর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাব' খন, সেখানে এর মোকাবেলা হবে—কি বল? আমাকে এখন একটা মজার মকদ্দমা তদ্বির করতে হবে। খাস-কামরায় সকলকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি। (পেস্কারের প্রতি) ডাকো ওদের—

পেস্কার। তিনজনকেই?

মাজিষ্ট্রেট। না, না,—আগে মাদাম্‌ কারেনিনা, ওরফে মাদাম প্রোতোসাভা—

মেনিকভ। ওহো, সেই ফিদিয়ার ব্যাপার!

মাজিষ্ট্রেট। হাঁ—তুমি কি করে জানলে?

মেনিকভ। হুঁঃ,—এ আর কে না জানে? সহরময় টী-টী পড়ে গেছে! তা এখন আসি—মোদ্দা সন্ধ্যার পর আজ সেখানে যাওয়া চাই-ই, নইলে একটা মেয়েমানুষের প্রাণ বাঁচে কি না বাঁচে—বুঝলে?

মাজিষ্ট্রেট। যাব, যাব।...আঃ, এই মকদ্দমাটা এক

লক্ষ্মীছাড়া! এ ত সবে তদন্তের গোড়া—তবু বেশ বুঝছি, এর মধ্যে বেশ একটু রগড় আছে! চললে?

মেনিকভ। আর না চলে কি করি, বল? (প্রস্থান)

(পেস্কার বাহিরে গিয়া লিজাকে ডাকিয়া আনিল।

লিজার প্রবেশ; তাহার গাত্রে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ, মুখ ঈষৎ অবগুণ্ঠনাবৃত)

মাজিষ্ট্রেট। এই যে, আপনি এসেছেন। ঐ চেয়ারটায় বসুন। (লিজা বসিল) দেখুন, বাধ্য হয়ে আপনাকে কতকগুলো কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে হবে, তার জন্য আমি যথেষ্ট দুঃখিত জানবেন। কি করব বলুন, —এ আমার কর্ত্তব্য! আপনি সেগুলির সঠিক উত্তর দিলে কাজ শীঘ্রই মিটে যাবে। অবশ্য তার জবাব দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছা; জবাব দিতে আপনি বাধ্য নন্। তবে আমার মনে হয়, কোন কথা গোপন না করে সব আগাগোড়া খুলে বললেই ঝঞ্ঝাট চোকে, আর সকলের পক্ষেই ভালো হয়।

লিজা। আমি কোন কথাই গোপন করব না। কি জিজ্ঞাসা করবেন করুন।

মাজিষ্ট্রেট। (কাগজ টানিয়া দেখিয়া) আপনার নাম—? লিজা কারেনিনা ওরফে লিজা প্রোতোসাভা। আচ্ছা! ঠিকানা—ও সব ঠিকই লেখা আছে—দেখুন দেখি—(কাগজ দেখাইল)

লিজা। (দেখিয়া) ঠিক হয়েছে।

মাজিষ্ট্রেট। এখন আপনার নামে কি চার্জ্জ হয়েছে জানেন? আপনি আপনার প্রথম স্বামী বর্ত্তমানে, এবং তিনি বর্ত্তমান আছেন জেনেও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছেন—

লিজা। না, আমি জানতুম না।

মাজিষ্ট্রেট। কি জানতেন না?

লিজা। যে, আমার প্রথম স্বামী বেঁচে আছেন।

মাজিষ্ট্রেট। বটে! তার উপর, আপনি নিজের পথ মুক্ত করবার জন্য আপনার প্রথম স্বামীকে ঘুষ দিয়েছিলেন, যার জন্য তিনি নিজের এই মিথ্যা আত্মহত্যা রটিয়েছেন—

লিজা। এ সব মিছে কথা।

মাজিষ্ট্রেট। বেশ! আপনাকে আর গোটা তিন-চার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আচ্ছা, মনে করে দেখুন দেখি, গত জুলাই মাসে আপনি তাঁকে বাঁর শ' রুবল্ পাঠিয়েছিলেন কি না?

লিজা। সে টাকা তাঁরই, আমার কাছে ছিল। তাঁর জিনিস-পত্তর-বেচা টাকা। যখন তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই রইল না, তখন সে টাকা আমি কি বলে আর নিজের কাছে রাখি—?

মাজিষ্ট্রেট। তা ঠিক! আচ্ছা, ভেবে দেখুন দেখি, মনে পড়ে কি না—ঐ টাকাটা আপনি তাঁকে ১৭ই জুলাই তারিখে পাঠিয়েছিলেন,—অর্থাৎ যে দিন তিনি নিরুদ্দেশ হন, তার ঠিক দু'দিন পূর্ব্বে—?

লিজা। হাঁ হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই।

মাজিষ্ট্রেট। আপনি আদালতে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত দিয়েছিলেন, কেমন? আপনার উকিলের পরামর্শে সে দরখাস্ত হঠাৎ তুলে নিলেন, কেন?

লিজা। তা আমার ঠিক মনে নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লিজার মুখের পানে চাহিয়া) মনে নেই? আচ্ছা, তার পর পুলিশ যখন আপনাকে একটা জলে-ডুবে-মরা লাস দেখিয়েছিল, তখন আপনি সে লাস আপনার প্রথম স্বামীর বলে সনাক্ত করেছিলেন?

লিজা। আমার মন তখন এমন হয়ে গিয়েছিল যে আমি সে লাসের দিকে ভালো করে দেখিও-নি। আমার মনে তখন সেই বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে এতটুকু সন্দেহও হয়নি।

মাজিষ্ট্রেট। তা হলে সে লাস আপনি পরীক্ষা করেন নি, মনের আপনার ঠিক ছিল না বলে? এ আমি বুঝ্লুম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি রাগ করবেন না—আমার কর্ত্তব্য কঠিন, তা ত বলেইছি—আচ্ছা, আপনার প্রথম স্বামী সারাতভে থাকতেন না?

লিজা। হাঁ।

মাজিষ্ট্রেট। তা সেই সারাতভে প্রতি মাসে কিছু করে টাকা পাঠাতেন কেন? আর কার কাছেই বা সে টাকা পাঠাতেন?

লিজা। সে টাকা আমার স্বামী—ভিক্টর কারেনিন

পাঠিয়েছিলেন,—কাকে তা আমি বলতে পারি না। তিনি আমায় তা কখনো বলেনও নি। তবে এ টাকা যে আমার প্রথম স্বামীকে পাঠানো হয়নি, এ কথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি। আমাদের সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বেঁচে নেই।

মাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, কিন্তু দেখুন,—কি করব—? আইনের শিকলে আমার হাত-পা বাঁধা—হয়ত আপনি আমাকে পশুর মত নিষ্ঠুর মনে করছেন, আমার শরীরে এতটুকু মায়া-মমতা নেই, ভাবছেন! কি করব? আপনার দুঃখে যে আমার প্রাণ যথার্থই ব্যথিত, তাতে আপনি সন্দেহ করবেন না। কিন্তু আমরা আইনের দাস। এ'ও দেখ্‌ছি, আপনার এই প্রথম স্বামীটি আপনাকে শুধু দুঃখ-দুর্দ্দশায় ফেলেই নিশ্চিন্ত হন নি, এই দারুণ ঘৃণা-লজ্জার পাকেও বেশ করে জড়িয়ে দিয়েছেন।

লিজা। অথচ আমি তাঁকে বড় ভালো বাসতুম।

মাজিষ্ট্রেট। নিশ্চয়! তা ছাড়া আপনি তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে পথ ধরেছিলেন, ভেবেছিলেন, সে পথ সোজা, সে পথে এতটুকু কাঁটা-খোঁচা নেই। এ কথা জুরিতেও বিশ্বাস করবে—সেই জন্যই আমি আপনাকে বলেছি—কোন বিষয় গোপন না করে সমস্ত খুলে বলাই একমাত্র সদুপায়।

লিজা। সমস্তই আমি বলেছি—কিছু গোপন করিনি, মিথ্যা এ জীবনে আমি কখনো বলিনি—আজই বা কেন বলব? (কাঁদিয়া ফেলিল) এখন আমি যেতে পারি?

মাজিষ্ট্রেট। আর-একটু আপনাকে অনুগ্রহ করে থাকতে হবে তবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার আর কিছু নেই। এখন আপনি যে এজাহার দিলেন, সেটুকু একবার পড়ে নিন্‌—দেখুন, তাতে কিছু ভুল আছে কিম্বা কোন কথা ছাড় পড়েছে কি না—(পেস্কারের প্রতি) ভিক্তর কারেনিনকে ডাকো।

(পেস্কার ভিক্তরকে ডাকিয়া আনিল; ভিক্তরের প্রবেশ)

মাজিষ্ট্রেট। বসুন।

ভিক্তর। আপনাকে ধন্যবাদ। থাক্! দাঁড়াতে আমার কষ্ট হবে না। আপনি এখন কি চান? আমায় কি করতে হবে?

মাজিষ্ট্রেট। আমি এ ব্যাপারের তদন্ত করছি—জানেন ত, আপনার নামে কি চার্জ্জ? আপনি কি অপরাধ করেছেন?

ভিক্তর। অপরাধ করেছি! কি অপরাধ?

মাজিষ্ট্রেট। অপরাধ গুরুতর। আর-একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন।...আপনি বসুন না—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?

ভিক্তর। থাক্—কোন দরকার নেই।

মাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, তাই হোক্! আপনার নাম?

ভিক্তর। ভিক্তর কারেনিন।

মাজিষ্ট্রেট। পেশা?

ভিক্তর। মন্ত্রি-সভার সদস্য।

মাজিষ্ট্রেট। বয়স?

কারেনিন। আটত্রিশ বছর। আরো পরিচয় চাই।

মাজিষ্ট্রেট। আপনি যখন ফিদিয়ার স্ত্রী লিজাকে বিবাহ করেন, তখন জানতেন যে, ফিদিয়া প্রোতোসাভ বেঁচে আছেন?

কারেনিন। না,—তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন বলেই আমি জানতুম।

মাজিষ্ট্রেট। তবে আপনি ফিদিয়ার মৃত্যুর পরও সারাতভে কার কাছে মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন?

কারেনিন। সে কথার উত্তর আমি দেব না।

মাজিষ্ট্রেট। না দেন, আমি বাধ্য করাতে পারি না। আচ্ছা—১৭ই জুলাই তারিখে ফিদিয়াকে আপনি বারশ' রুব্‌ল্ পাঠিয়েছিলেন, কেন?

কারেনিন। সে টাকা আমার স্ত্রী আমায় দেন, ফিদিয়াকে পাঠাবার জন্য।

মাজিষ্ট্রেট। আপনার স্ত্রী?

কারেনিন। হাঁ—ও টাকা ফিদিয়ার জিনিষ-পত্র-বেচা—আমার স্ত্রী বলেন, ও টাকা ফিদিয়ার প্রাপ্য—তাই পাঠিয়েছিলুম।

মাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, আর একটা কথা আছে। ডাইভোর্সের জন্য আদালতে দরখাস্ত করে সে দরখাস্ত ফের তুলে নেওয়া হল, কেন?

কারেনিন। ফিদিয়ার পরামর্শে—সে আমায় চিঠিও লিখেছিল, দরখাস্ত উঠিয়ে নেবার জন্য।

মাজিষ্ট্রেট। সে চিঠি আছে—? দেখাতে পারেন?

কারেনিন। না—সে চিঠি হারিয়ে গেছে।

মাজিষ্ট্রেট। তাই ত—যে সব আনলে প্রমাণ হত যে আপনাদের কথা সত্য—তাই হারিয়ে ফেলেছেন?

কারেনিন। আর-কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?

মাজিষ্ট্রেট। আমার উপর রাগ করা মিছে—আমি আমার কর্ত্তব্য করছি মাত্র। আপনাদের কর্ত্তব্য, আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা। এ কথা মাদামকে আমি বলেছি, আপনাকেও বলছি। আপনাদের উচিত, সব কথা প্রকাশ করে বলা—এতটুকু গোপন করবেন না—বিশেষ, যখন ফিদিয়াও এজাহার দেবে—

কারেনিন। আমি শুধু একটি নিবেদন করতে চাই—আপনি উপদেশ না দিয়ে আপনার কর্ত্তব্যটুকু করে গেলেই আমি কৃতার্থ হব। ..তা হলে আমরা এখন যেতে পারি? (লিজার নিকট যাইয়া তাহার বাহু ধরিল)

মাজিষ্ট্রেট। না, আর একটু আপনাদের থাকৃতে হচ্ছে। (কারেনিন চমকিয়া উঠিল) না, না, ভয় নেই—আপনাদের গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিচ্ছি না—যদিও তা করলে আমার তদন্তের সুবিধা হত! কিন্তু না, সে পথে আমি যাব না। তবে ফিদিয়াকে ডেকে পাঠাই? আপনাদের সামনে তাকে আমি সব জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনারা বসুন। (পেস্কারের প্রতি) ফিদিয়া প্রোতোসাভকে ডাকো। (পেস্কার ফিদিয়াকে ডাকিয়া আনিল; ফিদিয়ার প্রবেশ)

ফিদিয়া। (লিজা ও ভিক্তরকে দেখিয়া) এই যে তোমরা এখানে। ভেবো না, আমি আজ ইচ্ছা করে তোমাদের এই কলঙ্কের মাঝে টেনে এনেছি। আমার অভিপ্রায় ভালোই ছিল, পাক-চক্রে এই সব ঘটল। যদি দোষ করে থাকি, আমায় ক্ষমা করো—

মাজিষ্ট্রেট। এখন আমার কথার জবাব দিন—

ফিদিয়া। জিজ্ঞাসা করুন।

মাজিষ্ট্রেট। নাম?

ফিদিয়া। সে ত জানেনই।

মাজিষ্ট্রেট। তবু বলতে হবে।

ফিদিয়া। ফেদর প্রোতোসাভ।

মাজিষ্ট্রেট। পেশা? জাতি? বয়স?

ফিদিয়া। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না? এ-সবে কি প্রমাণ হবে বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করুন না।

মাজিষ্ট্রেট। সাবধান। এমনভাবে কথা বলবে না—যা জিজ্ঞাসা করব, সোজা কথায় তার জবাব দাও।

ফিদিয়া। বেশ, যখন আপনার লজ্জা নেই, তখন বলছি। আমি মস্কো ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েট—বয়স চল্লিশ—আর কি চান?

মাজিষ্ট্রেট। আপনি যে নদীর ধারে আপনার পোষাক-টোষাক রেখে জলে না নেমে নিরুদ্দেশ হয়ে যান, এ কথা মিষ্টার কারেনিন ও তাঁর স্ত্রী কি জানতেন?

ফিদিয়া। না। আমি আত্মহত্যা করব বলেই স্থির করেছিলুম। আমার সে সঙ্কল্পের কথা এঁদের চিঠি লিখে জানিয়েওছিলুম। আর আত্মহত্যা করতুমও—কিন্তু—। যাক্, সে কথা খুলে বলবার দরকার দেখছি না। আসল কথা, ওঁরা জানতেন না যে, আমি নিরুদ্দেশ হয়েছি মাত্র, জলে ডুবিনি।

মাজিষ্ট্রেট। আগে পুলিশের কাছে যা বলেছ, তার সঙ্গে এ-সব মিলছে না ত! তার মানে কি?

ফিদিয়া। কে, পুলিশ! ওহো,—রাজভবের গারদে এক পুলিশ এসেছিল আমার কাছে—বটে! তখন আমার হুঁস ছিল, না, জ্ঞান ছিল? মদে ভোঁ হয়ে ছিলুম, তখন নেশার ঝোঁকে যা মনে এসেছিল, তাই বলে গেছি। কি বলেছি, তা কি কিছু মনে আছে? কিছু না। এখন সে নেশার ঘোর কেটে গেছে—মাথা সাফ আছে। যা বলব, সত্যই বলব। ওরা জানত না, ভাবতেও পারে নি যে আমি বেঁচে আছি, জলে ডুবে মরিনি। ওরা জানত, আমার সব শেষ হয়ে গেছে। আঃ, আমি কি এতে কম তৃপ্তি পেয়েছিলুম, ওদের দুঃখ দূর করেছি, ওদের সুখী করেছি! সবই বেশ চলে যেত—যদি না সেই হতভাগাটা, সেই লক্ষ্মীছাড়া আর্ত্তেমিব এর মধ্যে আসত। যাক্, যখন সব প্রকাশ হয়েই পড়েছে, তখন কাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয় ত আমাকেই করুন। দোষ আমারই—এরা নির্দ্দোষ,—কিছু জানে না।

মাজিষ্ট্রেট। তোমার মন ভালো, তা বুঝতে পারছি, কিন্তু আইন কড়া - উপায় নেই। তোমায় এঁরা টাকা পাঠিয়েছিলেন কেন,—জান ?

(ফিদিয়া নিরুত্তর রহিল)

বল ;—সে টাকা সারাতভে সেমেনব বলে একটা লোকের নামে পাঠানো হত। কেমন ?

(ফিদিয়া তথাপি নিরুত্তর) কি ! জবাব দিচ্ছ না যে ! তাহলে আমি লিখব যে আসামী ফিদিয়া এ-সব কথার কোন জবাব দেয়নি। জবাব না দিলে এ-সব তোমার বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে, তা মনে রেখো—শুধু তোমার বিরুদ্ধে নয়, এঁদের বিরুদ্ধেও যাবে। বুঝেছ ?

ফিদিয়া। (ক্ষণেক স্তব্ধভাবে মাজিষ্ট্রেটের পানে চাহিয়া) আপনার লজ্জা হচ্ছে না ? এতটুকুও না ? অন্য লোকের জীবনের গোপন রহস্য জানবার জন্য এ কৌতুহল অনধিকার-চর্চ্চা, নেহাৎ কাপুরুষতা। হাকিমের আসনে বসে দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে নির্ব্বিচারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। কিন্তু ঐ এক-একটি প্রশ্ন মানুষের কোমল মনে কতখানি ঘা দিচ্ছে, তা বুঝছেন না ! আপনি বিচার করতে বসেছেন, কিন্তু কাদের বিচার করছেন, তা জানেন ? যারা মনুষ্যত্বে মায়া-মমতায় আপনার চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ,—তাদের !

মাজিষ্ট্রেট। (রূঢ় স্বরে) শোন—

ফিদিয়া। আপনি অনর্থক বাজে প্রশ্ন করে কষ্ট পাবেন না—আমি নিজে সব বলে যাচ্ছি—(পেস্কারের প্রতি) তুমি লিখে যাও। আদালতের অন্ততঃ একটা এজাহারে মানুষের মত কথা কিছু থাক্। আইন নয়, নজীর নয়, সাক্ষ্য নয়—মন-গড়া পুঁথির কথা নয়—মানুষের প্রাণের খানিকটা পরিচয় লেখা থাক্ ! শুনুন—এই ত তিনটি প্রাণী আমরা—লিজা, ভিক্তর আর আমি। আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা জটিল দাঁড়িয়েছিল—সকলের মনে তুমুল ঝড় চলেছিল—ধর্ম্মের ঝড়, বিবেকের ঝড়—সে ঝড়ের আভাস হাকিমের আইনে-বাঁধা মন কি জানবে, কি বুঝবে ! সে জানে, কেতাবের ধারা, সাক্ষ্য নেওয়া, আর নথী মোটা করা ! শুনুন, এ ঝড় থামাবার শুধু একটিমাত্র উপায় ছিল। সেই উপায় ধরলুম,—ব্যস্, ঝড় থেমে গেল। ওরা সুখী হল, আমায় আশীর্ব্বাদ করলে—আমিও ওদের সুখ ভেবে সুখী হলুম। ঠিক করেছি, বেশ করেছি—আমি সে পুরোণো জীবন থেকেই খসে পড়লুম। সবই বেশ চলে যাচ্ছিল—ফিদিয়ার অভাব কেউ বোধ করেনি। তার পর হঠাৎ এক বেয়াদব্ এসে সব জেনে ফেললে—সে আমার পরিচয় পেয়ে তা খাটিয়ে দু'পয়সা উপার্জ্জন করবার জোগাড় করলে—আমায় বাগাতে পারলে না। আমি তাকে দূর করে দিলুম। সে এল আপনাদের কাছে—বিচারকের কাছে, ধর্ম্ম-রক্ষকের কাছে। আর আপনারা লক্ষ্মীছাড়া বিচার-যন্ত্রের চাকা ধরে বসে আছেন, অমনি সে চাকা ঘুরিয়ে দিলেন—যারা আপনাদের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা করে, তাদের ধরে এনে বিচারের নামে নিষ্ঠুর জল্লাদের কাজ সুরু করে দিলেন। কেন ? না, এই আপনাদের পেশা, এর বিনিময়ে দুটো টাকা পাবেন, সেই টাকায় আপনাদের পেট ভরবে, আপনাদের সখের খরচ মিলবে—

মাজিষ্ট্রেট। সাবধান ! তুমি এমনভাবে কথা কইলে গুরুতর শাস্তি পাবে, জেনো।

ফিদিয়া। শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন ! কাকে ? আমাকে ? আমি ত মরা মানুষ—যে মরেছে, তাকে আবার শাস্তির ভয় কি দেখান্ ? কি শাস্তি দেবেন ? ছুরি দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবেন ? কয়েদ দেবেন ? দিন ! আমার মনের মধ্যে দিন-রাত আগুন জ্বলছে—প্রলয়ের আগুন। তার জ্বালার উপর আপনার ছুরির ফলা ত প্রলেপের কাজ করবে।., কয়েদ— ?

ভিক্তর। আমরা যেতে পারি ?

মাজিষ্ট্রেট। হাঁ, এই যে, আপনারা যে এজাহার দিয়েছেন, তাতে সইটা করে দিন, তা হলেই—

ফিদিয়া। ছুটি ! ব্যস্ ! হাঃ হাঃ হাঃ—হারে হতভাগ্য জীব—!

মাজিষ্ট্রেট। এই—কে আছ ? এ আসামীকে নিয়ে যাও। আমি ওর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এখনি সই করে দিচ্ছি। পেস্কার—

পেস্কার। হুজুর—

ফিদিয়া। (লিজা ও কারেনিনের প্রতি) আমায় তোমরা মাপ করো—

ভিক্তর। (ফিদিয়ার দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া) তুমি কোন দুঃখ করো না, ফিদিয়া—এ অদৃষ্টের পরিহাস—তোমার অপরাধ নেই।

(লিজা প্রস্থান করিল ; ফিদিয়া সসম্ভ্রমে, নতশিরে তাহাকে অভিবাদন করিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

আদালত-গৃহের সম্মুখস্থ সরু পথ।
দ্বারের নিকট প্রহরী দণ্ডায়মান।

(ছিন্ন-জীর্ণ-বেশধারী পেত্রোবিচ আসিয়া আদালত-গৃহে প্রবেশ-চেষ্টা করিল)

প্রহরী। এইয়ো—খবরদার্! ভিতর যাবার হুকুম না আছে।

পেত্রোবিচ। এঁ্যা—কেন নেই? আদালতে সবাই যেতে পারে—কেউ আট্‌কাতে পারে না—আইনে লেখা —কেন যাব না?

(ভিতরে কোলাহল উঠিল)

প্রহরী। না যেতে পাবে। হাকিমের হুকুম আছে মোশা—

পেত্রোবিচ। চোখ্ রাঙ্গাও কাকে হে বাপু? জানো, কার সঙ্গে তুমি কথা কচ্ছ?

(একজন নব্য উকিলের প্রবেশ)

উকিল। আপনি কি চান্ মশায়! কোন কাজ আছে?

পেত্রোবিচ। না, কাজ বিশেষ নেই। মামলা দেখতে এসেছি—তা এ ব্যাটা কিছুতে যেতে দেবে না। বলে, হুকুম নেই, ভিতর মৎ যাও!

উকিল। বটে! তা এ ধার দিয়ে ত বাইরের লোকের যাবার হুকুম নেই। আর এখনি কোর্ট টিফিনে উঠবে—সময় হয়েছে।

(উকিল গমনোদ্যত ; প্রিন্স সার্জ্জিয়সকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

পেত্রোবিচ। একবার আমি আদালতের মধ্যে যাবই—যেমন করে হোক্।

প্রিন্স। মামলার খবর কি মশায়?

উকিল। আসামীর কৌন্সুলির বক্তৃতা সুরু হয়েছে। পেত্রুসিন বক্তৃতা কর্‌ছেন।

প্রিন্স। আসামীদের ভাব-গতিক কেমন?

উকিল। চমৎকার! কারেনিন আর লিজার মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, যেন তারাই হাকিম, আসামী নয়। পেত্রুসিনও বেশ বলছেন।

প্রিন্স। আর ফিদিয়া?

উকিল। সে খুব গরম হয়ে উঠেছে। হবার কথাই ত! বাদীর কৌন্সুলি যখন বক্তৃতা কর্‌ছিলেন, দু-চারবার সে তাঁকে বাধা দিয়েছিল—নিজের কৌন্সুলিকেও রেয়াৎ করে নি। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা ঝাঁজ বেরুচ্ছে।

প্রিন্স। আচ্ছা, ধরুন, অপরাধ প্রমাণই হল—তা হলে কি রকম শাস্তি হতে পারে?

উকিল। সে বলা বড় শক্ত, বুঝলেন কি না। জুরির বিচার—কার মনে কি ধারণা হয়, তার কি ঠিক আছে, কিছু? তা—আপনি ভিতরে যাবেন?

প্রিন্স। হাঁ—একবার যেতে চাই।

উকিল। আপনি প্রিন্স সার্জ্জিয়স ত?

প্রিন্স। হাঁ।

উকিল। (প্রহরীর প্রতি) এই, এঁকে যেতে দাও। যান্ আপনি—বাঁ দিকে চেয়ার খালি আছে।

প্রিন্স সার্জ্জিয়স ভিতরে প্রবেশ করিল।

পেত্রোবিচ। কি? এই ত একজন তোফা ভিতরে গেল—আর আমার বেলা শুধু হুকুম নেই—না?

উকিল। তা হলে আসি, মশায়—

(প্রস্থান)

পেতুস্কভের প্রবেশ

পেতুস্কভ। কি হে, পেত্রোবিচ যে! কত ক্ষণ? মকদ্দমার খপর কি?

পেত্রোবিচ। শুনলুম আসামীদের কৌন্সুলির বক্তৃতা সুরু হয়েছে। ভিতরে যাচ্ছিলুম—তা এ তালপাতার সেপাই ব্যাটা পথ আটকাচ্ছে।

প্রহরী। এইয়ো—ইখানে গোলমালটি করিয়ো না, সাব। ইটা কছারি—আপনার শ্বশুর-ঘর নয়। (সহসা

দ্বার খুলিয়া পেক্রসিন ও অন্যান্য উকিল এবং বহু নরনারী আদালত-গৃহ হইতে বাহিরে আসিল)

১ নারী। নাঃ, চমৎকার বলেছে। শুনে আমারই চোখে জল এসেছিল।

২। নভেল-নাটক পড়েও মন এত অধীর হয় না।

৩। কিন্তু মেয়েটা ওকে কি বলে' ভালো বাসত? ঐ ত চেহারা—

৪। মুখখানা দেখেছ? মাগো, যেন কি!

৫। চুপ, চুপ, ওরা আস্‌ছে।

(উকিল ও নর-নারীগণের প্রস্থান)

(লিজা ও কারেনিন এবং তৎপশ্চাতে ফিদিয়ার প্রবেশ)

ফিদিয়া। কে,—পেত্রোবিচ যে! এসেছ? (নিকটে আসিয়া) এনেছ?

পেত্রোবিচ। এনেছি। (কাগজে-মোড়া একটা দ্রব্য ফিদিয়ার হাতে দিল)

ফিদিয়া। (তাহা পকেটে রাখিয়া) কি বীভৎস ব্যাপার!

(কারেনিন লিজা প্রভৃতির প্রস্থান)

পেক্রসিন। শোন ফিদিয়া, অগাধ জলে একটু যেন থই পেয়েছি বলে মনে হয়। কিন্তু তুমি অমন মেজাজ গরম কর্‌ছিলে কেন? যা বলবে, ঠাণ্ডা হয়ে বলো।

ফিদিয়া। আর ভয় নেই—আমি একটি কথাও আর কব না। কেমন—তাহলে হবে ত?

পেক্রসিন। তাহলে ভালোই হয়। যাক্, তুমি ভেবো না। আমার ত মনে হচ্ছে, আমরা জিতে যাব। আমার কাছে যা-যা বলেছ, সেই সব কথা আদালতে খুলে বল। বুঝলে?

ফিদিয়া। আমি আর-কিছু বলতে চাই না। ঢের হয়েছে।

পেক্রসিন। সে কি! কেন?

ফিদিয়া। আর ভালো লাগে না—আমার বিরক্তি ধরে গেছে। আচ্ছা, একটা কথা শুধু আমায় বলুন দেখি,—খুবই যদি খারাপ দাঁড়ায় ত কি হতে পারে?

পেক্রসিন। সে ত বলেইছি। সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসন।

ফিদিয়া। তিন জনেরই ঐ দশা?

পেক্রসিন। না, তুমি আর তোমার স্ত্রী লিজার শুধু।

ফিদিয়া। আর যদি জুরিতে দোষী সাব্যস্ত না করে?

পেক্রসিন। তা হলেও এই ভিক্তরের সঙ্গে বিয়েটা খারিজ হয়ে যাবে।

ফিদিয়া। অর্থাৎ বেচারী লিজা আবার আমার কবলে পড়বে!

পেক্রসিন। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি! কিন্তু তুমি এর মধ্যেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? হুঁঃ, তা হলে চলে কি? ঐ ত বলেছি, আমার কথা শোন—চাঙ্গা হও—সঠিক ব্যাপার সমস্ত আদালতে খুলে বল। বুঝলে—(চারিধারে কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ সমবেত দেখিয়া বিরক্তভাবে) যাই, আমি একটু জিরিয়ে নি—আবার এখনি বক্তৃতে হবে ত! নজীর কটাও ঠিক করে রাখি গে। মোদ্দা ফিদিয়া, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

ফিদিয়া। আচ্ছা, ঐ যা বললেন, তা ছাড়া আর কোন দণ্ড হতে পারে না?

পেক্রসিন। না। (প্রস্থান)

ফিদিয়া। আর কেন? এই ঠিক সময়—ঠিক পথ—(সতর্কভাবে পেত্রোবিচ-প্রদত্ত কাগজের মোড়ক খুলিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল; ও নিজের বুক লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিল। মুহূর্ত্তে গুলি তাহার বক্ষ বিদ্ধ করিল। ফিদিয়ার দেহ ভূতলে পড়িল) এবার আর মিথ্যা নয়। লিজাকে একবার কেউ ডেকে দাও। লিজা—

(পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া শশব্যস্তে হাকিম ও জুরিগণ ছুটিয়া আসিল; পশ্চাতে লিজা, কারেনিন, পেত্রোবিচ, পেতুস্কভ, প্রিন্স সার্জ্জিয়স ও মাশা প্রভৃতির উদ্‌গ্রীবভাবে প্রবেশ)

লিজা। (ছুটিয়া গিয়া ফিদিয়ার ভূলুণ্ঠিত শির আপন বক্ষে তুলিয়া লইল) ফিদিয়া, ফিদিয়া, এ তুমি কি করলে? কেন করলে?

ফিদিয়া। এ ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না, লিজা, তোমায় মুক্তি দেবার আর কোন উপায় ছিল না। আমায় ক্ষমা কর।...না, না, তোমার সুখের জন্য আত্মহত্যা করিনি,—নিজেও আমি আর জলতে পারি

বিরাম চাই,—বিশ্রাম! তাই এ কাজ করেছি, লিজা।... তুমি কোন দুঃখ করো না—

লিজা। ওগো, তুমি ভালো হও—আমায় মাপ কর। আমি তোমার—

(ডাক্তারের প্রবেশ; ঝুঁকিয়া ফিদিয়ার হৃদয়-পরীক্ষায় উদ্যত)

ফিদিয়া। আর কেন? কিছু বাকী রাখিনি। ভিক্তর, বন্ধু, বিদায়! ও কে? মাশা! মাশা, এবার তোর দেরী হয়ে গেছে—আটকাতে পারলি না! দেখ্, আজ আমার কি সুখ! কি আনন্দ! তোদের সবাইকে আজ ছুটি দিয়ে চললুম। (মৃত্যু)

সমাপ্ত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

গীতাপাঠ

কৃষক ধান্যের চাসা—ভাষক ভাষার চাসা। ভাষকের লাঙ্গল লেখনী। ধান্যের অধিদেবতা লক্ষ্মী—ভাষার অধিদেবতা সরস্বতী। সরস্বতী লক্ষ্মীর দিদি হ'ন, আর সেই সূত্রে ভাষক কৃষকের দাদা হ'ন। আমি তাই মনে করিতেছি যে, আমার সম্মুখস্থিত ভুবনডাঙ্গাগ্রামের কৃষক ভায়া'রা যেরূপ প্রণালীতে চাস-কার্য্য নির্ব্বাহ করে—আমার হাতের চাসকার্য্যটি এবারে আমি সেইরূপ প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিব। তাহারা যেমন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কর্ষিত ক্ষেত্রে ধান্যের বীজ বপন করিয়া ধান্যবৃক্ষ অঙ্কুরিত করিয়া তোলে, এবং তাহার পরে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সেই নবাঙ্কুরিত ধান্যবৃক্ষ স্বস্থান হইতে মূলসমেত উঠাইয়া লইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিয়া তাহাতে যথোচিত পরিমাণে ধান্য ফলাইয়া তোলে, আমি তেমনি—গীতাপাঠের উপক্রমণিকা-ভাগে ত্রিগুণতত্ত্বের ধান্যবৃক্ষটি যতটা-পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছিলাম—তাহা সর্ব্বসমেত সেখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া এই উপসংহার-ভাগের সরস ভূমিতে রোপণ করিয়া তাহাতে অভীষ্ট ফল ফলাইয়া তুলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

উপক্রমণিকা-ভাগে আমি ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়া বাঁধিয়া ছিলাম এইরূপে :—

কবি-শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে—ইহা সকলেরই জানা কথা; এটাও তেমনি জানা উচিত যে, সৎশব্দ হইতে সত্তা এবং সত্ত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—দেখা উচিত যে, কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সত্তা এবং সত্ত্বের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা-দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে-কোনো বস্তুর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পায় তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সে-বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ—সত্তার প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে—সেটি হ'চ্চে সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্ ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি সদ্‌বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে। আমরা প্রতিজনে আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তার সঙ্গের সঙ্গী। "আমি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এই বর্ত্তিয়া-থাকা ব্যাপারটি আমি যেমন আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইহারই নাম আত্মসত্তার প্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এ-যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি তেমনি সর্ব্বকালেই যেন বর্ত্তিয়া থাকি" আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার এই যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ—এই আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতিজনের আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে। আত্মসত্তাতে যদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে ঐ শুভ ইচ্ছাটি (অর্থাৎ বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা) আমাদের অন্তঃকরণের

মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তার সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর, সেই গতিকে এটা আমরা বেস্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতরে সত্ত্ব আছে—আমরা সৎপদার্থ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই এ-কথাটা বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রকাশ এবং আনন্দই সত্ত্বগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে—এই তো তাহা দেখিলাম;—এখন রজস্তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্। নানা কবির নানা কবিতা আছে কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই কবিতা দেশ-কালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন এই অর্থে ব্যষ্টি-কবিতা। পক্ষান্তরে, কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তাঁহার কবিতা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের কবিতা এই অর্থে সমষ্টি-কবিতা। কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন—তিনি প্রকৃতি-দেবী স্বয়ং। কাব্যানুরাগী বিদ্বজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো নিকটে অবিদিত নাই যে, কালিদাসের কবিতাতেও শেক্সপিয়রীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না—শেক্সপিয়রের কবিতাতেও কালিদাসীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রকৃতিদেবীর কণ্ঠ-নিঃসৃত নানারসপূর্ণ সমষ্টি-কবিতা যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিত্বরসের অভিব্যঞ্জক— ব্যষ্টি-কবিতা সেরূপ নহে; ব্যষ্টি-কবিতা কবিত্বরসের দেশকালপাত্রোচিত ছিটাফোঁটা মাত্রেরই অভিব্যঞ্জক। কবিতা-সম্বন্ধে এ-যেমন আমরা দেখিলাম, সত্তা-সম্বন্ধেও তেমনি আমরা দেখিতে পাই এই যে, এক-শাখার পুষ্প যেমন অপর কোনো শাখার নহে, তেমনি আমার সত্তাও তোমার নহে, তোমার সত্তাও আমার নহে, আর, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির যদি নাম কর তবে তাহার সত্তা তোমারও নহে—আমারও নহে। ব্যষ্টি-সত্তা-মাত্রই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেইজন্য ব্যষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণ ব্যতীত—মিশ্রসত্ত্ব ব্যতীত—অবাধিত সত্ত্বগুণের—শুদ্ধ-সত্ত্বের—পরিচায়ক নহে। পক্ষান্তরে, যেমন সকল-শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, আর সেইজন্য বৃক্ষের পুষ্পরাজিই সমষ্টিপুষ্প, আর, সকল-শাখার সকল পুষ্পই সেই সমষ্টি-পুষ্পের অন্তর্ভূত, তেমনি, প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা তাঁহার সত্তাই সমষ্টি-সত্তা এবং আর আর সকল-সত্তাই সেই সমষ্টি-সত্তার অন্তর্ভূত। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টিসত্তাই অবাধিত সত্ত্বগুণের—অবাধিত প্রকাশ এবং আনন্দের—অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। ব্যষ্টিসত্তা কিন্তু সেরূপ নহে;—ব্যষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণেরই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি—(১) প্রকাশ এবং (২) আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশ'কে বাধাপ্রদান করে কে? অবশ্য অচৈতন্য-বা-জড়তা এবং অবসাদ-বা-স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দ'কে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ-বা-পীড়ানুভব এবং অশান্তি-বা-প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তমোগুণ এবং রজোগুণ। বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের আর এক নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। তমোগুণ যে কী-অর্থে তমোগুণ তাহা তমঃশব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে—তমোগুণ প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোগুণ কী-অর্থে রজোগুণ তাহাও রজঃশব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশানুযায়ী কার্য্য কাপড়কাচা তো ছিলই, তা ছাড়া তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল বস্ত্র-রঙানো; আর সেইজন্য সংস্কৃত ভাষায় ধোপা'র নাম রজক—বস্ত্র রঞ্জন করে (কিনা রঙায়) এই অর্থে রজক। রঙ্ সম্বন্ধে জর্ম্মাণ-দেশীয় মহাকবি গেটের একটী সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র সামান্যত তিনভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হ'চ্চে—একদিকে সাদা, আর এক দিকে কালো, আর দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত নীল পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ্। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, কালো রঙ্ রঙ্ই নহে—তাহা অন্ধকারেরই আর-এক নাম। সাদা রঙ্ কালো রঙের ঠিক উল্টা পিঠ; সুতরাং তাহাও প্রকৃতপক্ষে রঙ নহে। সাদা রঙ্ বিচিত্র বর্ণরাজির

লয়স্থান ;—তাহা শুভ্র আলোক-মাত্র। বর্ণক্ষেত্রে যেমন তিনভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণ-ক্ষেত্রের এধারে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক, ওধারে রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন, এবং দুয়ের মধ্য-স্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রঞ্জন। অথবা, যাহা একই কথা—একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের প্রকাশ-জ্যোতি, আর-এক দিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তান্ধকার, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রাগদ্বেষাদি প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। তাহার মধ্যে দ্বেষ তমোগুণ-ঘ্যাঁসা রজোগুণ—তাই 'তাহা অন্ধকার-ঘ্যাঁসা' নীলবর্ণের সহিত উপমেয়; অনুরাগ সত্ত্বগুণ-ঘ্যাঁসা রজোগুণ—তাই তাহা আলো-ঘ্যাঁসা পীতবর্ণের সহিত উপমেয়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সদাশিব মহাদেব দ্বেষকে গিলিয়া খাইয়াছেন, তাই তিনি নীলকণ্ঠ; আর, গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরিধানবস্ত্রে অনুরাগের রঙ ধরিয়াছে, তাই তিনি পীতাম্বর। রজোগুণের নিজমূর্ত্তি, কিন্তু, রাগ। তা'র সাক্ষী, রজোগুণের প্রধান যে-দুইটি অন্তরঙ্গ—কাম আর ক্রোধ—উভয়েই রাগধর্ম্মী। কাম তো রাগধর্ম্মী বটেই, তা ছাড়া—বঙ্গভাষায় ক্রোধের আর-এক নাম রাগ। আত্মসত্তা যখন আত্মেতর সত্তা দ্বারা রঞ্জিত হয়, আর সেইগতিকে যখন জ্ঞাতা পুরুষ কামোন্মত্ত বা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পাগলের ন্যায় জ্ঞানশূন্য এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, তখনকার সেই যে প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের অবস্থা, তাহারই নাম রাগাতিশয্য। রজোগুণের সাক্ষাৎ নিজমূর্ত্তি এই যে রাগ, ইহা লালরঙের সহিত উপমেয়। লাল শব্দ আলক্ত (অর্থাৎ আল্‌তা) শব্দের অপভ্রংশ তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আলক্তও যা—আরক্তও তা—একই। ফলে ;—লাল, রক্ত, রাঙা, রাগ, রঞ্জন, রজঃ—সবাই যে এরা একই মূল ধাতুর সন্তানসন্ততি, তাহা উহাদের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয়। যদি মূর্ত্তিমান রজোগুণ দেখিতে চাও তবে একটা ঠাণ্ডা প্রকৃতির বৃষের সম্মুখে লাল রঙের নিশান ঝাঁকাইয়া চট্‌পট্ বৃক্ষা-রোহণ কর, তাহা হইলেই রহস্যটা দেখিতে পাইবে। অতএব, লাল রঙের সহিত রজোগুণের খুব যে নিকট সম্পর্ক, তাহাতে আর ভুল নাই। অতঃপর সত্ত্বাদি গুণ-তিনটির পরস্পরের সহিত পরস্পরের বনি-বনাও কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্। একটু পূর্ব্বে আমরা দেখি-য়াছি যে, ব্যষ্টি-সত্তা মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। তা ছাড়া, সত্ত্বগুণের বাধা জন্মায় কে কোন্ দিক্ দিয়া—তাহাও আমরা দেখিয়াছি; দেখিয়াছি যে, সত্ত্বগুণের প্রধান দুইটি অবয়বের—প্রকাশ এবং আনন্দের—প্রথমটির (কিনা প্রকাশের) প্রতিদ্বন্দ্বী তমোগুণ বা অসাড়তা এবং জড়তা; দ্বিতীয়টির (কিনা আনন্দের) প্রতিদ্বন্দ্বী রজোগুণ বা দুঃখ এবং অশান্তি। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজস্তমোগুণের এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ তো আছেই, তা ছাড়া রজস্তমোগুণের আপনা-আপনির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়-যে কম তাহা নহে। রজোগুণের ক্ষুধাকাতর ক্রোধোন্মত্ত কুকুর-দুটার সঙ্গে তমোগুণের ভোগতৃপ্ত সুখোপবিষ্ট বিড়াল-দুটার—দুঃখ এবং অশা-ন্তির সঙ্গে অসাড়তা এবং জড়তা'র—যে, কিরূপ আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ব্যষ্টি-সত্তার অধিকার-ক্ষেত্রে ত্রিগুণের তিনটিই অপর দুইটির প্রতিদ্বন্দ্বী; এক কথায়—তিনটিই তিনটির প্রতিদ্বন্দ্বী। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা এ যাহা বলিলাম, তাহা ব্যষ্টি-সত্তার সম্বন্ধেই খাটে—সমষ্টি-সত্তার সম্বন্ধে খাটে না। আমার ভিতরে আমার আপনার সত্তা যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তোমার সত্তা সেরূপ না; তথৈব, তোমার ভিতরে তোমার আপনার সত্তা যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, আমার সত্তা সেরূপ না। তবেই হইতেছে যে, তোমার-আমার উভয়েরই মধ্যে আত্মসত্তার খদ্যোত-প্রকাশ পরসত্তার অপ্রকাশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত—সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা বাধাগ্রস্ত। তোমার-আমার ভিতরে সত্ত্বগুণ শুধুই যে কেবল তমোগুণ দ্বারা বাধাক্রান্ত তাহা নহে—রজোগুণ দ্বারাও তাহা পদে পদে বাধাক্রান্ত; আমাদের আত্মসত্তা যে-অংশে আমাদের জ্ঞানগোচরে লব্ধপ্রকাশ সেই অংশে তাহা সত্ত্বগুণ; বহির্ব্বস্তুসকলের আত্মসত্তা যে-অংশে অপ্রকাশ, সে-অংশে তাহা তমোগুণ; আর, আমাদের আত্মসত্তা যে অংশে বহির্ব্বস্তুসকলের অপরিস্ফুট আত্মসত্তা দ্বারা রঞ্জিত হয় সেই অংশে তাহা

রজোগুণ। "আমি আছি" এটা যেমন আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ে উপলব্ধি করি, "আমাদের বাহিরে নানা রঙের নানা বস্তু আছে" এটা তেমনি আমরা বহিরিন্দ্রিয়ে উপলব্ধি করি। পরন্তু তদ্ব্যতীত—বহিরিন্দ্রিয়গোচর ঐ সকল নানা রঙের নানা বস্তুর কাহার ভিতরে কী আছে না আছে—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কিছুই আমরা জানি না। আমাদের মন কিন্তু "জানি না" বলিতে বড়ই নারাজ; মন তাই "এটা আমি জানি না" না বলিয়া অনুমানের স্কন্ধে ভর করিয়া বলে "সম্ভবত এটা এই।" অহঙ্কার কিন্তু "সম্ভবত" কথাটা পছন্দ করে না। অহঙ্কার "সম্ভবত এটা এই" না বলিয়া গায়ের জোরে বলে "নিশ্চয়ই এটা এই।" বুদ্ধি বা বিজ্ঞান অহঙ্কারের ঐ "নিশ্চয়ই" কথাটার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আলোচ্য সিদ্ধান্তটাকে বিচারের তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া এবং পরীক্ষার কষ্টিপাথরে কষামাজা করিয়া বলে "এ সিদ্ধান্তটার এই অংশটুকু প্রামাণিক—বাকি অংশ আনুমানিক। পরীক্ষার অনল-দহনে যখন শেষোক্ত অংশ পরিশোধিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অংশের অঙ্গের সামিল হইবে, তখন আলোচ্য সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞসমাজে নিখুঁত খাঁটি সত্য বলিয়া সমাদৃত হইবে।" বিজ্ঞান কিন্তু মনে মনে এটা বিলক্ষণই জানে যে, আলোচ্য সিদ্ধান্তটার প্রামাণিক অংশটি মুষ্টিমেয়—বাকি অংশ অগাধ এবং অপরিমেয়; সুতরাং পরীক্ষাও কোনো জন্মে শেষ হইবে না—নিখুঁত খাঁটি সত্যও কোনো জন্মে অনুসন্ধাতার করায়ত্ত হইবে না। তা ছাড়া বিজ্ঞানের সেবকদিগের সকলেরই এটা দেখা কথা যে, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের যে কোনো অংশ যতই কেন পাকাপোক্ত প্রামাণিক সত্য করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করানো হোক্ না—নূতন নূতন পরীক্ষার নূতন নূতন আলোকে তাহার মধ্য হইতে নূতন নূতন গলদ্ বাহির হইয়া পড়িতে থাকা অনিবার্য্য। এই রকম অজ্ঞাতকুলশীল বহির্ব্বস্তুসকলের তমসাচ্ছন্ন আত্মসত্তা ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আমাদের জ্ঞানোজ্জ্বল আত্মসত্তার বৈঠকঘরে ধুলাপায়ে আনাগোনা করিতেছে—দিন নাই, সন্ধ্যা নাই, রাত্রি নাই! আমাদের আত্মসত্তার জ্ঞানচক্ষুটিকে ধুলায়-ধুলায় অন্ধীভূত করিয়া ইহাদের কার্য্যই হ'চ্চে—পায়ে পড়িয়া কাজ গুছানো, গায়ে পড়িয়া বন্ধুতা পাতানো, এবং দায়ে ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়ানো। রজোগুণের এইরূপ দুর্মোচ্য মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়া আমাদের আত্মসত্তার বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ (এক কথায়—সত্ত্বগুণ) সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া যায়। ব্যষ্টি-সত্তার অধিকার-ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ এইরূপ-যে রজস্তমোগুণ দ্বারা বাধাক্রান্ত হয়;—আত্মার বিমল আনন্দ দুঃখ-এবং-অশান্তি দ্বারা—আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতি অজ্ঞান-অন্ধকার-এবং-জড়তা দ্বারা—এইরূপ যে আক্রান্ত হয়; তাহার গোড়ার কারণ এই যে, ব্যষ্টি-সত্তার অধিকার-ক্ষেত্রে আত্মসত্তা এবং পর-সত্তা উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। পক্ষান্তরে সমষ্টি-সত্তার নিজাধিকারে, সমস্ত আত্মসত্তা এবং পরসত্তা একীভূত হইয়া এক মহতী আত্মসত্তায় পর্য্যবসিত;—সমষ্টিসত্তার পরও নাই—প্রতিদ্বন্দ্বীও নাই। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসত্তা পরম পরিশুদ্ধ সত্তা;—তাহা রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, এক কথায়—শুদ্ধসত্ত্ব। বেদান্তাদি শাস্ত্রের এটা একটা সুপ্রসিদ্ধ কথা যে, শুদ্ধসত্ত্বে পরমাত্মার মহাজ্ঞান, মহাশক্তি এবং মহানন্দ নিখুঁত পরিষ্কার-রূপে প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি ॥ গীতাপাঠের উপক্রমণিকা ভাগে যে-রকম করিয়া আমি ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম তাহা (কতক কতক পরিশোধন এবং কতক কতক পারিবর্দ্ধন করিয়া) দেখাইলাম; এখন, বিগত অধিবেশনে শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে তোমার-আমার মধ্যে যে-বিষয়টির বোঝাপড়া চলিতেছিল, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। কিয়ৎপূর্ব্বে মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে কয়েক ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তদুপলক্ষে যাহা আমি বলিয়াছিলাম তাহা তোমার স্মরণ না থাকিতে পারে—এইজন্য এখানে তাহা আর একবার বলা শ্রেয় বোধ করিতেছি। কথাটা এই :—

শান্তিপর্ব্বের ৩১৮ অধ্যায় হইতে যে-কয়েক ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, তাহার ভিতরে সাংখ্য-দর্শনের সমস্ত কথাই আদ্যোপান্ত মানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে নূতন একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই যে,

জ্ঞাতা পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভূত হ'ন, তখন একদিকে যেমন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, আর একদিকে তাঁহার পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান বাধামুক্ত হইয়া যায়; তাহা যখন হয় তখন সেই বাধা-বিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরমাত্মা প্রকাশিত হ'ন, আর তাহাতেই জ্ঞাতা পুরুষের মুক্তি হয়। এ-প্রকার মুক্তিকে কৈবল্য-মুক্তি বলা সাজে না এইজন্য—যেহেতু উহা কেবল-মাত্র পঞ্চবিংশে (অর্থাৎ জীবাত্মাতে) পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা দূরে থাকুক্—ষড়্‌বিংশের (অর্থাৎ পরমাত্মার) দর্শনই উহার সারসর্ব্বস্ব।

আমার এই কথাটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই :—

"তুমি যাহাকে বলিতেছ পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান তাহার জ্ঞেয় বিষয় কী? পরমাত্মা স্বয়ং কি তাহার জ্ঞেয় বিষয়? তাহা তুমি বলিতে পার না এই জন্য—যেহেতু জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই জ্ঞাতা পুরুষ, তা'বই—কোনো আত্মাই ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয় বিষয় নহেন।"

ইহার উত্তরে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম "পরে তোমাকে আমি দেখাইব যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় —বিশুদ্ধ সত্ত্ব।" তখন তোমাকে যাহা আমি "পরে বলিব" বলিয়াছিলাম, এখন সেই কথাটি তোমাকে আমি খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছি- প্রণিধান কর।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তার সঙ্গে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা মিলাইয়া দেখিলে একটি বিষয়ে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় খুবই সুস্পষ্ট; সে প্রভেদ এই যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তার উপরে একান্তপক্ষে নির্ভর করে—পরন্তু জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তার উপরে মূলেই নির্ভর করে না। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, জাগ্রৎ-কালের বাস্তবিক সত্তাই জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়—স্বপ্ন-কালের কাল্পনিক সত্তা বাস্তবিক সত্তার ছায়া মাত্র, আর সেই জন্য—যেখানে পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞেয়বস্তুসকলের কথা হইতেছে—সেখানে স্বপ্নের জ্ঞেয় বস্তুসকল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এখন আমি বলিতে চাই এই যে, বাস্তবিক সত্তাই সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থের অন্তরতম সারাংশ বা সত্ত্ব, আর, সেইজন্য তাহার নাম হইয়াছে "সত্ত্বগুণ।"

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

কোনো একটি গোষ্পদে যদি কর্দ্দমাক্ত জলও থাকে, তবে সে জলেরও যেমন অন্তরতম সারাংশ—বিশুদ্ধ জল, তেমনি, কোনো একটি অজ্ঞ বালকের মনোমধ্যে যদি ভ্রমসংকুল জ্ঞানও থাকে তবে সে জ্ঞানেরও অন্তরতম সারাংশ—বিশুদ্ধ জ্ঞান। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান—যাহা আপামর-সাধারণ সকল-মনুষ্যেরই মনে অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহার জ্ঞেয় বিষয় কী? এটা যখন স্থির যে, বাস্তবিক সত্তা সকল-জ্ঞানেরই মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা যতই কেন কাল্পনিক হউক্ না, তাহা বাস্তবিক সত্তার খাইয়াই মানুষ; আর সেইজন্য তাহার অস্থি-মজ্জা যে, বাস্তবিক সত্তার মাতৃদুগ্ধে পরিগঠিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা এক হিসাবে যেমন বাস্তবিক—জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা এক হিসাবে তেমনি কাল্পনিক। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"

ইহার অর্থ :—

যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল! রঘুপতির অযোধ্যা-পুরী কোথায় গেল! এই-সকল কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শুনিয়া মনকে স্থির কর;—এটা জানিও নির্ঘাত বেদবাক্য যে, জগৎ অসৎ। তুমি হয়তো বলিবে যে, "মায়াবাদের আদিগুরু শঙ্করাচার্য্য তো তাহা বলিবেনই।" তা যদি

বলো—তবে সেক্‌স্‌পিয়র্‌ তো আর মায়াবাদী ছিলেন না—তিনি কি বলিতেছেন শ্রবণ কর ঃ—

ঝটিকা-নাটকের প্রধান নায়ক প্রস্পেরো মায়াবলে তাঁহার স্নেহের বরকন্যা দুজনাকে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় একটা অদ্ভুত নাট্যলীলার দৃশ্য দেখাইয়া, দৃশ্যটার অন্তর্ধান-কালে বলিতেছেন—

Our revels are now ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air :
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on.

ইহার অর্থ ঃ—

আমাদের উৎসবামোদ এখন ফুরাইল। এই যে-সব নট নটী দেখিলে (পূর্ব্বে যেমন আমি তোমাদিগকে বলিয়া-ছিলাম) ও'রা গন্ধর্ব্ব-অপ্সরার জাত্‌ ;—দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেল। এই মূলশূন্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারটার ন্যায়—অভ্রলিহ প্রাসাদশৃঙ্গসকল, জাঁকালো ঢঙের রাজঅট্টালিকা-সকল—ধীর গম্ভীর দেবালয়-সকল, এমন কি—সসাগরা পৃথিবী স্বয়ং, হাঁ—পৃথিবীর যাঁরা রাজ-রাজেশ্বর তাঁরা সুদ্ধ—সবই লয় পাইবে ; ঐ অন্তঃসার-শূন্য বহিঃশোভন দৃশ্যটার মতো পরিক্ষীণ হইয়া অবসান প্রাপ্ত হইবে—বাষ্পটুকুও কাহারো অবশিষ্ট থাকিবে না। যাহা দিয়া স্বপ্ন পরিগঠিত হয়, সেই রকমের আমরা পদার্থ।

উদয়গিরির তত্ত্বজ্ঞকেশরী এবং অস্তগিরির কবিকেশরীর দোঁহার সঙ্গে দোঁহার কোলাকুলির যখন এইরূপ ঘটা, তখন অন্যে পরে কা কথা ! এটা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, যে-ব্যক্তি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ইন্দ্রের অমরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার জ্ঞানে দৃশ্যমান্‌ অমরাপুরীটা যেমন জলজ্যান্ত বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়—রামচন্দ্রের আমলে অযোধ্যাবাসীদের জ্ঞানে রাম-রাজ্য তেমনি জলজ্যান্ত বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত ; আবার, এটাও তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, নিদ্রাবসানকালে অমরাপুরীর স্বপ্নদর্শক যেমন "কোথায় গেল সে অমরাপুরী" বলিয়া হায় হায় করিতে থাকে—অধুনাতনকালে তেমনি অযোধ্যাবাসীরা (বিশেষতঃ তুলসীদাসের চেলারা) "কোথায় গেল সে রামরাজ্য" বলিয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাই বলি যে, স্বপ্নের অমরাপুরী যেমন স্বপ্নকালে বাস্তবিক ; আর জাগ-রণকালে যেহেতু কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এইজন্য জাগরণকালে তাহা অবাস্তবিক ; তেমনি, ত্রেতাযুগের রামরাজ্য ত্রেতাযুগে বাস্তবিক ; আর, কলি-যুগে যেহেতু কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এই জন্য কলিযুগে তাহা অবাস্তবিক। প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই ঃ—

এটা খুবই সত্য যে, স্বপ্নের জ্ঞেয় বস্তুসকলের সত্তার তুলনায় জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা যার পর নাই বাস্তবিক ;—এটাও কিন্তু উহা অপেক্ষা বেশী বই কম সত্য নহে যে, জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তার তুলনায় যেমন স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা অবাস্তবিক, তেমনি, বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তার যে একটি আদর্শ আপামর সাধারণ সকলমনুষ্যেরই অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহার তুলনায় জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা অবাস্তবিক। এখন এটা বলিবা-মাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জাগ্রৎকালের মিশ্রজ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয়বিষয় যেমন মিশ্র বাস্তবিক সত্তা, অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয় বিষয় তেমনি বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তা ; আর, এই বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তার নামই—রজোস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত শুদ্ধ সত্ত্ব।

বেশী কচ্‌লাইলে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত হইয়া যায় ; তাই সংস্কৃতজ্ঞ ভট্টাচার্য্যমহলে এইরূপ একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টং, যাহা স্বল্প তাহাই মিষ্ট।

এই সাধুসম্মত পাকা কথাটি শ্রদ্ধার সহিত শিরোধার্য্য করিয়া আজ আমি এইখানেই পাঠ বন্ধ করিলাম।

আগামী অধিবেশনে দেখাইব যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ঐ যে মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়—শুদ্ধ সত্ত্ব, উহা সামান্য বস্তু নহে, উহা গীতাশাস্ত্রোক্ত সেই পরা প্রকৃতি যাহা বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পল্লী কবির বন্যা সঙ্গীত

আমার সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে একখণ্ড টুকরা কাগজে 'বান-ভাসীর গান' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সন ১২৩০ সালে, পঞ্চকোট হইতে অম্বিকার ঘাট পর্য্যন্ত দামোদর নদের যে দেশপ্লাবী প্রবল বন্যা হইয়াছিল, এই পল্লী-কবির সঙ্গীতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। নব্বই বৎসর পূর্ব্বে রচিত পল্লীকবির এই ছড়া বা গান, এখনও স্থানে স্থানে লোকমুখে রক্ষিত হইয়া বর্ণিত ঘটনার জীবন্ত সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে—এতদ্ব্যতীত ইহা অন্য কোনরূপ বিশেষত্ব বা কবিত্বের দাবী করিতেছে না। এরূপ কবিতা ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কায়স্থ-কবি নফর দাস, বীরভূম জেলার অন্তর্গত খয়রাশোল থানার মধ্যে বড়রা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাঠশালার শিক্ষকতা করিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ঘটনাবলম্বনে তাঁহার রচিত আরও ছড়া বা গান এখন লোকমুখে প্রচলিত আছে।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বান-ভাসীর গান

নদী সে দামোদরে, বড়াকরে, করছে আনাগোনা।
দু'ধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥
এলো বান পঞ্চকোটে—
এলো বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
দুড়্ দুড়্ শব্দে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর॥
মিশায়ে নালাখোলা—
মিশায়ে নালাখোলা, বানের খেলা, নদীর হলো বল।
দামোদরে জড় হলো চৌদ্দ তাল জল॥
নদীতে আঁট্‌বে কত
নদীতে আঁট্‌বে কত, শত শত, নৌকা ভাসে জলে।
প্রলয়-কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া—
ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া, গোপের পাড়া, ভাঙ্গলো বাবইজোড়।
তার পুর ভাঙ্গিল যে নপুর বল্লভপুর॥
যত সব ডুবলো গোলা—
যত সব ডুবলো গোলা, হাতে খোলা, নিলেক মহাজন।
দামোদরের বল দেখে উঠলো সিঙ্গেরণ (১)॥
চল্‌লো বান যোজন জুড়ে—
চল্‌লো বান যোজন জুড়ে, ত্বরা করে, যেমন টাঙ্গন ঘোড়া।
আদগাঁ ভুলুই (২) ভাঙ্গে মেজে ময়সাড়া (৩)॥
করলে ঢিপেপুরী—
করলে ঢিপেপুরী, আহা মরি, কি করলে ঠাকুর।
তারপর! ভাঙ্গিল গিয়ে পুবড়া মদনপুর॥
চল্‌লো বান পূর্ব্বমুখে—
চল্‌লো বান পূর্ব্বমুখে, আপন সুখে, চল্‌লো দামোদর।
দু'ধার মিশিয়ে ভাঙ্গে কাঞ্চন-নগর॥
বাবুদের কাঠগোলাতে—
বাবুদের কাঠগোলাতে, নাটশালাতে, প্রবেশ কর্‌লো বান।
বাঁকার সনে সালিশ ক'রে ভাঙ্গলো বর্দ্ধমান॥
বাজারে নৌকা চলে—
বাজারে নৌকা চলে, কুতূহলে, প্রলয় দেখি বান।
যে যেখানে আছে পলায় ছাড়ি বর্দ্ধমান॥
ভাঙ্গলো রাণীর হাটা—
ভাঙ্গলো রাণীর হাটা, দালান কোঠা, জজসাহেবের কুঠি।
রাজবাড়ী ছাড়ি বান জান গুটি গুটি॥
এবারে বান বাহির হলো—
এবারে বান বাহির হলো, রাত পোহালো চল্‌লো মাঠে মাঠে।
গঙ্গায় মিশায় বান অম্বিকার ঘাটে॥
বারশ' ত্রিশ সালে—
বারশ'' ত্রিশ সালে, বরষা কালে, ভাঙ্গলো নফর দাস।
কেও হলো পাতুড়ে রাজা—কারো সর্ব্বনাশ॥

১। রাণীগঞ্জের নিকটস্থ ক্ষুদ্র নদী। ২। 'রামায়ণ,' 'দুর্গাপঞ্চরাত্র,' 'আত্মবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা সুবিখ্যাত প্রাচীন কবি জগদ্রাম রায়ের নিবাস ভূমি। ৩। রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া যাইবার রাস্তায় দামোদরের অপর তীরবর্ত্তী বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গ্রামসমূহ।

শক্তিপূজায় ছাগাদি বলিদান বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত

কলিকাতার সন্নিহিত ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ দক্ষিণেশ্বরের নাম অনেকেই অবগত আছেন। এই স্থানটী কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম ভূম্যধিকারিণী রাণী রাসমণির জমিদারীর অন্তর্ভূত। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী রাসমণির স্বামী রায় রাজচন্দ্র দাস মাড়ের জন্ম হয়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাণী রাসমণি দাসীকে বিবাহ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজচন্দ্র বাবু পরলোক গমন করিলে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তদীয় সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বোক্ত রাণী রাসমণির হস্তগত হয়। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও চতুরা ছিলেন। তিনি স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে তদানীন্তন বহু ধূর্ত্তের কবল হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিয়া বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে দেবতাপ্রতিষ্ঠা অন্যতম। রাণী রাসমণি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে) দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মিঃ জেমস্ হেষ্টি সাহেবের কুঠী-বাড়ী ৫৪॥ সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা খেরাজী ভূমি ৪২৫০০ সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পণে ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর পরলোক গমনের এক বৎসর পরে ঐ ভূমিতে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিষ্ণুমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, দ্বাদশ-মন্দিরে যোগেশ্বরাদি দ্বাদশ শিব, নবরত্নমন্দিরে নিস্তারিণী কালী-মূর্ত্তি ও লক্ষ্মীনারায়ণ-শিলা প্রভৃতি স্থাপন করেন। ঐ দেবসেবা ও অতিথিসেবার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীত দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত শালবাড়ী-পরগণা দান করেন। উহার বার্ষিক আয় তখন খরচ-খরচা বাদে ১২০০০ বারো হাজার টাকা ছিল। সম্ভবতঃ এখন ঐ আয় অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাণী রাসমণি শৈব, শাক্ত, কি বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা তাঁহার অধস্তন বংশীয়েরা বলিতে পারেন না, তবে তিনি সাধারণ বাঙ্গালী মহিলার ন্যায় সকল দেবতাতেই ভক্তিমতী ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতা হইতে আট নয় মাইল উত্তরে ঠিক ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। ভাগীরথীর গর্ভ হইতেই ঘাট বাঁধা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে শিবমন্দির, মধ্যে কালীমন্দির, অদূরে বিষ্ণুমন্দির, সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, পুষ্পোদ্যান, নানাবিধ রসাল ফলের বাগান, ভাগীরথীর লহরীলীলা প্রভৃতির জন্য স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। নিগমকল্পের পীঠমালায় দক্ষিণেশ্বর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত "কালীক্ষেত্র" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং দক্ষিণেশ্বর হিন্দুর একটী তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণনীয় (১)। দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব পূজারী মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস একটী উদার ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ (রামকৃষ্ণ-প্রচারকসম্প্রদায়) পৃথিবীর বহু উপকার সাধন করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে বহু দেশ দেশান্তরের তীর্থযাত্রী ও দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের রাজপ্রতিনিধির মহিষী দক্ষিণেশ্বর সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর জনপদ হইতে যে-সকল পর্য্যটক নরনারী ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় দক্ষিণেশ্বর সন্দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। এখন এই দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারিগণের অধিকারে রহিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা দক্ষিণেশ্বর-ক্ষেত্রের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম, এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দক্ষিণেশ্বরে কালী তারা ভৈরবী প্রভৃতি শক্তি-দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ-সকল দেবতার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা উপলক্ষে ছাগাদি পশু বলি প্রদান করা হইয়া থাকে। এই বলিদান কার্য্য কত দিন হইতে চলিতেছে, তাহা ঠিক জানা যায় না; রাণী রাসমণির জীবৎকালে বলিদানের নিয়ম ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাণী রাসমণির পরলোক গমনের পর এক সময়ে কিছু দিনের জন্য ছাগাদি-পশু বলি বন্ধ

(১) "দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরা।
কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্রমভেদোঽস্তি মহেশ্বর ॥"
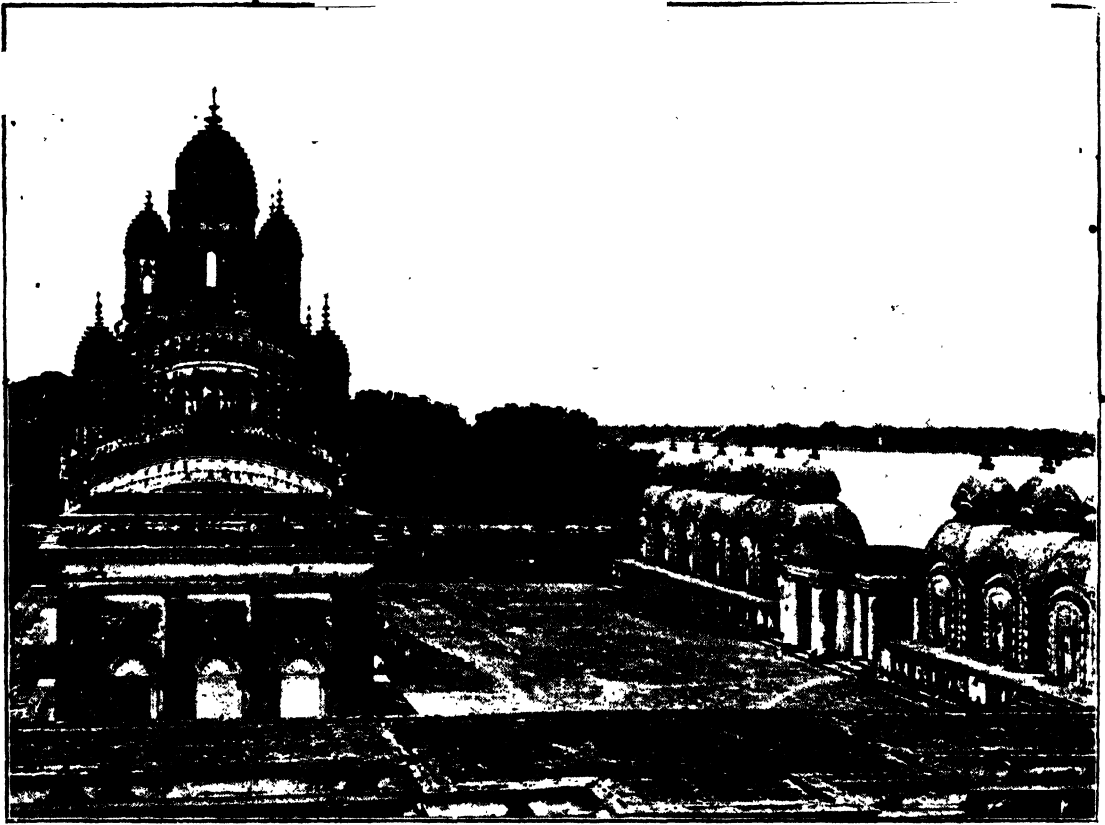
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী।

ছিল। কিন্তু ঐ সময়ের পর হইতে পুনরায় চলিতেছিল। দক্ষিণেশ্বরের কালিকার সম্মুখে যে শুধু সেবকগণের (রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারিগণের) প্রদত্ত ছাগাদি পশু বলি প্রদত্ত হয়, তাহা নহে, বাহিরের লোকেও অনেক পশু এখানে আনিয়া বলি প্রদান করে। এই বলিদানের দৃশ্য বড়ই হৃদয়বিদারক। যখন সারি সারি ছাগগুলিকে স্নান করাইয়া হাড়িকাঠের নিকট দাঁড় করান হয়, সেই সময়ে তাহাদের ঘন ঘন কম্প, ভীত ভীত দৃষ্টি, পরক্ষণে হাড়িকাঠের মধ্যে বলপূর্ব্বক গলদেশ প্রবেশ করাইয়া খড়্গাঘাত! সেই বধ্যমান ছাগদিগকে কাতর ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না, অনেক তীর্থযাত্রী কাঁদিয়া আকুল হন।

রাণী রাসমণির পুত্র ছিল না, চারি কন্যা তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন। প্রথমা কন্যা স্বর্গীয়া পদ্মমণি দাসীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম দাস মহাশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি বিষ্ণূপাসক এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। বলরাম বাবু মৎস্য মাংস আহার করেন না, নিরামিষ দেবপ্রসাদে শরীর ধারণ করেন। পূর্ব্বোক্ত বলিদান-কালে ছাগ-শিশুর ক্রন্দনে তাঁহার করুণার উদ্রেক হয়। এই নৃশংস প্রথা যাহাতে দক্ষিণেশ্বর হইতে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য বহুদিন হইতে তিনি চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। এতদিন দেবসম্পত্তি রিসিভারের (receiver) হস্তে ছিল, তজ্জন্য তিনি এই ছাগবলির বিরুদ্ধে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বলরাম বাবুর এখন দুই পুত্র বিদ্যমান—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাস ও শ্রীমান্

অজিতনাথ দাস। ইঁহারা শিক্ষিত ও নীতিমান্। শ্রীমান্ অজিতনাথ আমার ছাত্র। শ্রীমানের হিন্দুস্কুলে ও প্রেসিডেন্সিকলেজে অধ্যয়নকালে শ্রীমান্‌কে আমি উত্তমরূপ জানিতাম। ১৮৩২ শকাব্দের (১৯১০ খৃষ্টাব্দের) বৈশাখমাসে শ্রীমান্ অজিতনাথ জিজ্ঞাসা করেন—"বিনা পশু বলিতে শক্তিপূজা হইতে পারে কি না?" উত্তরে আমি বলি "হইতে পারে"। তাহার পর, শ্রীমান্ তাঁহার পিতার মনোভিলাষের বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাকে একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিতে বলেন। কারণ, বলরাম বাবু শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দু, শাস্ত্রের অনুশাসন ব্যতীত তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাহার পর, আমি এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, আমরা উভয়ে প্রায় একমাস কাল এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। শক্তিপূজায় পশুবলির অনুকূলে ও প্রতিকূলে পুরাণ ও তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐ-সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা করিয়া প্রতীতি জন্মে—

সাত্ত্বিকী পূজা কেবল জপ হোম এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা বিধেয়।

"সাত্ত্বিকী জপহোমাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

রাজসী ও তামসী পূজায় পশুবলির বিধি আছে, কিন্তু অনেক শাস্ত্রকার উহার নিন্দা করিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ পশুবলির নিষেধ করিয়াছেন।

অতএব ছাগমাংসের স্বাদুতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সংযত রসনা ও সাত্ত্বিক বুদ্ধি লইয়া বিচার করিতে গেলে শক্তিপূজায় পশুবলি যে একেবারেই কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। তাহার পর, যে ব্যবস্থাপত্রখানি প্রস্তুত করা হয়, নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল।

ব্যবস্থাপত্রম্

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং শক্তিমন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠাপিত-কালিকামূর্ত্তিপূজনং ছাগাদি-পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানমন্তরেণ কৃতং কিমপি বৈগুণ্যমাবহতি ন বা—

ইতি প্রশ্নে

"ক্রমস্তু বলিদানস্য স্বরূপং রুধিরাদিভিঃ।
যথা স্যাৎ প্রীতয়ে সম্যক্ তথা বক্ষ্যামি পুত্রকৌ॥"

ইত্যাদি

"বলিদানেন সততং জয়েৎ শত্রূন্ নৃপান্ নৃপঃ॥"

ইত্যাস্ত কালিকাপুরাণ-বচন-জাতেন ছাগাদি-পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদানাসামর্থ্যে কুষ্মাণ্ডেক্ষুদণ্ডাদিদানস্য পশুঘাতপূর্ব্বক-বলিদানানুকল্পত্ব প্রতিপাদনাৎ—

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসনতৎপরাঃ।
তৎ পূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ॥
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসাঃ পশুঘাতনম্।
আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
কাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ॥
দৈবে পিত্র্যে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনম্।
কল্পকোটিশতং শম্ভো রৌরবে স বসেদ্ ধ্রুবম্॥
যো মোহাম্মানসৈদে হিংত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব।
একবিংশতিকৃত্বশ্চ তত্তদ্‌যোনিষু জায়তে॥
যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্বা কুর্য্যাৎ শোণিতকর্দ্দমম্।
স পচেন্নরকে তাবদ্ যাবল্লোমানি তস্য বৈ॥
হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈবচ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ॥"

ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় পার্ব্বতীবচনজাতেন পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদানসহিতপূজাদেঃ দুরন্তনরকাদিলক্ষণপ্রত্যবায়-জনকত্বেনাকর্ত্তব্যত্বোপদেশাৎ—

"বৈধহিংসা ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসাতু রাজসী।"

ইতি শ্রাদ্ধবিবেকটীকাকৃদ্ গোবিন্দানন্দ-ধৃত বৃহন্মনু-বচনেন বৈধহিংসায়া রাজসত্বেন সাত্ত্বিকাধিকারিণং প্রতি সুতরাং প্রতিষিদ্ধত্ব-প্রতিপাদনাচ্চ—

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং শক্তিমন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠাপিত-কালিকামূর্ত্তি-পূজনং ছাগাদি-পশুঘাতপূর্ব্বক-বলিদানমন্তরেণ কৃতং ন কিমপি বৈগুণ্যমাবহতি প্রত্যুত সমুপদর্শিত-পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় পার্ব্বতীবচনজাতেন ছাগাদিপশুঘাতপূর্ব্বক বলিদান সহিত দেবতাপূজনে কৃতে তেষাং নরকাদিলক্ষণপ্রত্যবায়াবগতেঃ তৈঃ কদাপি ছাগাদি পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদান সহিতং পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্ত্তিপূজনং নৈব কর্ত্তব্যমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদামুত্তরম্। শকাব্দাঃ ১৮৩২। জ্যৈষ্ঠস্য পঞ্চমদিবসীয়া লিপিরিয়ম্।

শ্রীহরিঃ
শরণম্

[মহামহোপাধ্যায় (১)]
তর্কভূষণোপাধিক
শ্রীপ্রমথনাথদেবশর্ম্মণাম্
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
ন্যায়রত্ন-তর্কনিধ্যুপাধিক
শ্রীপ্রসন্নকুমারদেবশর্ম্মণাম্
ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।

(১) তর্কভূষণ মহাশয় পরে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্যাকরণাচার্য্যোপাধিক
শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদশর্ম্মণাম্
পাণিনীয় ব্যাকরণ বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যাপাকানাম্।
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীকুমুদবান্ধব দেবশর্ম্মণঃ।
সাহিত্যাচার্য্যোপাধিক
শ্রীপঞ্চাননশর্ম্মণাম্।
শ্রীহরিঃ
শরণম্
[মহামহোপাধ্যায়]
বিদ্যাভূষণোপাধিক
শ্রীসতীশচন্দ্রশর্ম্মণঃ।
বিদ্যাভূষণোপাধিক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণাম্
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
শাস্ত্রী ইত্যুপনামক
শ্রীবহুবল্লভশর্ম্মণাম্
বেদাধ্যাপকানাম্।
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীতারাপ্রসন্নশর্ম্মণাম্।
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীমন্মথনাথ শর্ম্মণঃ (২)।
শ্রীরামঃ
[মহামহোপাধ্যায়]
তর্কবাগীশোপাধিক
শ্রীকামাখ্যানাথ শর্ম্মণাম্।
[মহামহোপাধ্যায়]
তর্কদর্শনতীর্থোপাধিক
শ্রীগুরুচরণ শর্ম্মণাম্
ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথশর্ম্মণঃ।
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীদেবেশচন্দ্রশর্ম্মণঃ।

(২) উপরি লিখিত স্বাক্ষরকারিগণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ঐ সময়ে উক্ত কলেজের বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী মহাশয় কাশীতে যাওয়ায় তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে পারি নাই। পরে তাঁহার সহিত এতৎসম্বন্ধে কথা হইলে, তিনি জানান যে "পশুবলি-নিষেধ-ব্যবস্থায় তাঁহার সম্পূর্ণ মত আছে।" ঐ সময়ে পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি একটী স্বতন্ত্র মত লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ঐ রূপ স্বতন্ত্রমত গ্রহণে প্রতিবন্ধক থাকায় তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। ঐ সময় তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন—"ছাগমাংস চর্ব্বণের জন্যই বিধাতা আমাদের এইরূপ দন্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায়, দেবীপূজায় ছাগবলি কর্ত্তব্য এবং ছাগমাংস আমাদের অবশ্য ভক্ষ্য।" এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পরে "মহামহোপাধ্যায়" হইয়াছেন।

শ্রীদুর্গা
কৃতিরত্নোপাধিক
শ্রীদুর্গাসুন্দরশর্ম্মণাম্
বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়-
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
শ্রীরামো জয়তি
ন্যায়বাগীশোপাধিক
শ্রীনকুলেশ্বরদেবশর্ম্মণাম্
কলিকাতান্তর্গত কালীঘাটাখ্যতীর্থবাসিনাম্।
সাংখ্যবেদান্ততীর্থোপাধিক
শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মণাম্
কলিকাতা—ভবানীপুরস্থ ভাগবতচতুষ্পাঠী-
দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
হরঃশরণম্
তর্কতীর্থোপাধিক
শ্রীপার্ব্বতীচরণশর্ম্মণাম্
বাগ্‌বাজার-নিবাসিনাম্।
শিরোমণ্যুপাধিক
শ্রীশিবনারায়ণশর্ম্মণাম্
সামবাজার-নিবাসিনাম্।
রঘুনাথো জয়তি
স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীচণ্ডীচরণশর্ম্মণাম্
গরানহট্ট-নিবাসিনাম্।
স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্মণাম্
হাল্‌সীবাগান-নিবাসিনাম্।
ওঁতৎসৎ
শাস্ত্রী ইত্যুপনামক
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মণাম্
কলিকাতাস্থ রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়াধ্যাপকানাম্
ব্যাকরণোপাধ্যায় কাব্যতীর্থানাম্
ন্যায়মীমাংসাদি-শাস্ত্রেষ্বপি
বিবিধপরীক্ষোত্তীর্ণানাম্
শ্রীচন্দ্রিকাদত্তশর্ম্মণাম্
বিশুদ্ধানন্দ-বিদ্যালয়াধ্যাপকানাম্।
শ্রীদুর্গাশরণম্
তর্করত্নোপাধিক
শ্রীরামগোপালশর্ম্মণাম্।
ভাগবতরত্নোপাধিক
শ্রীহরিদাস শর্ম্মণাম্
হাতিবাগান-নিবাসিনাম্।
কাশীনাথঃ শরণম্
স্মৃতিরত্নোপাধিক
শ্রীতারকনাথশর্ম্মনাম্
হাতিবাগান-নিবাসিনাম্।
শাস্ত্রী ইত্যুপাধিকস্য
শ্রীহরিদেবশর্ম্মণঃ
বিশপ্‌ কলেজ ইত্যাখ্য বিদ্যালয়াধ্যাপকস্য

শ্রীরামঃ
স্মৃতিকণ্ঠোপাধিক
শ্রীভূতনাথশর্ম্মণাম্
অগ্‌বাজারনিবাসিনাম্।
স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীভগবতীচরণশর্ম্মণাম্
বাদুরবাগাননিবাসিনাম্।
শ্রীরামো জয়তি
কাব্যনিধ্যুপাধিক
শ্রীধীরানন্দশর্ম্মণাম্
কলুটোলানিবাসিনাম্।

(নবদ্বীপ।)

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

[মহামহোপাধ্যায়]
শ্রীরাজকৃষ্ণশর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
ন্যায়রত্ন কবিভূষণোপাধিক
শ্রীঅজিতনাথশর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ-নিবাসিনঃ।
শ্রীসূর্য্যোজয়তি
জ্যোতিষার্ণবোপাধিক
শ্রীবিশ্বম্ভরশর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্
জ্যোতির্ব্বিদাম্।
শ্রীহরির্জয়তি।
স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীযোগীন্দ্রনাথশর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-চৈতন্য-চতুষ্পাঠীস্থ
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
বিদ্যাভূষণোপাধিক
শ্রীনিরঞ্জন শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীসিতিকণ্ঠশর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-হরিসভাধ্যক্ষাণাম্।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

[মহামহোপাধ্যায়]
সার্ব্বভৌমোপাধিক
শ্রীযদুনাথশর্ম্মণাম্
নবদ্বীপবাস্তব্যানাম্।

শ্রীশ্রীকালী
শরণম্

ন্যায়াচার্য্য শিরোমণ্যুপাধিক
শ্রীসীতারাম শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।

গদাধরো জয়তি
ন্যায়রত্নোপাধিক
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীদুর্গামোহনশর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
তর্করত্নোপাধিক
শ্রীউমেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।
গদাধরো জয়তি
কাব্যরত্নোপাধিক
শ্রীনগেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

তর্কভূষণোপাধিক
শ্রীআশুতোষ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-পাকাটোলাখ্য-বিদ্যালয় ন্যায়-
শাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
শ্রীগুরুদেবো জয়তি
চূড়ামণ্যুপাধিক
শ্রীতারাপ্রসন্ন শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

স্মৃতিভূষণোপাধিক
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননীসভা-সম্পাদকানাম্।

শ্রীহরিঃ
শরণম্

নবদ্বীপ-নিবাসী—বাচস্পত্যুপাধিক।
শ্রীসিতিকণ্ঠশর্ম্মণঃ
বর্দ্ধমানাধিপতে বিজয়-চতুষ্পাঠীস্থ-স্মৃতি-
শাস্ত্রাধ্যাপকানাম্।
স্মৃতিরত্নোপাধিক
শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মণাম্
নবদ্বীপ-নিবাসিনাম্।

(ভট্টপল্লী)

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমানাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।

শ্রীদুর্গা
শ্রীবীরেশ্বরস্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।
শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ দেবশর্ম্মণঃ
ভট্টপল্লী-নিবাসিনঃ।
শ্রীরামেশ্বরবিদ্যারত্ন দেবশর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।

শ্রীকাশীপতি স্মৃতিভূষণদেবশর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।
শ্রীকুঞ্জবিহারি ন্যায়ভূষণ শর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।
শ্রীবীরেশ্বর তর্কভূষণদেবশর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।
শ্রীরামময় বিদ্যাভূষণ দেবশর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীবাস্তব্যানাম্।
শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থদেবশর্ম্মণাম্
ভট্টপল্লীনিবাসিনাম্।
শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থদেবশর্ম্মণঃ
ভট্টপল্লীবাস্তব্যস্য।

(কাশী)

শ্রীদুর্গা
[মহামহোপাধ্যায়]
ন্যায়রত্নোপাধিক
শ্রীরাখালদাস শর্ম্মণাম্
৺কাশী-নিবাসিনাম্।

শ্রীদুর্গা
তর্কাচার্য্যোপাধিক
শ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম্
৺কাশী-নিবাসিনাম্।
বিদ্যাসাগরোপাহ্ব
শ্রীজয়কৃষ্ণ শর্ম্মণাম্
কাশী-নিবাসিনাম্।
অহিংসনমেব সর্ব্বথা শাস্ত্রয়েদং
সর্ব্বগোচর ইতি।
[মহামহোপাধ্যায়]
ভাগতাচার্য্যস্বামী
শ্রীকাশিকাবাসী।
সম্মতোয়মর্থঃ
কাশীস্থ শাকদ্বীপীয় বেদান্তাধ্যাপক
শ্রীঅনন্তরামশর্ম্মমিশ্রস্য।
শ্রীবিশ্বেশ্বরো বিজয়তেতরাম্
ত্রিপাঠ্যুপনামক
শ্রীদেবনাথ শাস্ত্রিণঃ
কাশী-নিবাসিনঃ।
শ্রীবিশ্বেশো বিজয়তে
তত্ত্বরত্নোপাধিক
শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মণাম্
কাশী-নিবাসিনাম্।
তর্করত্নোপাধিক
শ্রীশ্রীশঙ্কর দেবশর্ম্মণাম্।
কাশী-নিবাসিনাম্।
শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি
ত্রিপাঠ্যুপনামক
শ্রীগয়াদত্ত শাস্ত্রিণঃ
কাশীনিবাসিনঃ।

(হরিদ্বার)

সম্মতোঽর্থঃ
তর্কশাস্ত্র্যুপাধিক
শ্রীরামকৃষ্ণশর্ম্মণঃ
হরিদ্বারস্থস্য।
সম্মন্যুতেঽমুমর্থং
শ্রীগোবিন্দশর্ম্মা শাস্ত্রী
হরিদ্বারস্থ শ্রীবালব্রহ্মচারি-নির্ম্মিত পাঠশালা-
ধ্যাপকঃ।
সম্মতিরত্র
কৃষ্ণানন্দতীর্থস্বামিনাম্
হরিদ্বারস্থ ঋষিকুলনিবাসিনাম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা হিংসা-ত্যাগং সম্মন্যুতে।
[মহামহোপাধ্যায়]
ভারতভূষণ-বিদ্যাদিবাকর-
কেশবানন্দস্বামিনঃ
কনখলস্থ মুনিমণ্ডল মহাবিদ্যালয়-প্রধানাধ্যক্ষস্য।
সম্মতিরত্র
চিদ্ঘনানন্দস্বামিনঃ
কনখলস্থ চেতনদেবাশ্রম-বাসিনঃ।
সম্মন্যুতে
দণ্ডি-স্বামী
মাধবাশ্রমজী
হরিদ্বারস্থ বাচস্পতি-পাঠশালাধ্যাপকঃ
হরিদ্বারনিবাসী
বেদপাঠ্যুপনামক
শ্রীবিশ্বনাথশর্ম্মা
সম্মতিং দদাতি।
সম্মন্যুতে অমুমর্থং
পণ্ডিত রঘুবীরদত্তঃ
হরিদ্বারস্থ গণেশী-ভক্ত পাঠশালাধ্যাপকঃ।
সম্মতিরত্র
শিবনারায়ণোপনামক
শিবানন্দব্রাহ্মচারিণাম্
হরিদ্বারস্থ ঋষিকুল-নিবাসিনাম্।

(কাশী)

শ্রীহরিঃ
শরণম্
পশুঘাতমন্তরেণাপি কৃতা সাত্ত্বিক-কালীপূজা
সিধ্যতি ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।
অত্র প্রমাণম্
সাত্ত্বিকী জপ-যজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
ইতি স্কান্দ-ভবিষ্যপুরাণবচনম্।
শ্রীশিবো জয়তি
[মহামহোপাধ্যায়]
ন্যায়পঞ্চাননোপাধিক
শ্রীকৃষ্ণনাথশর্ম্মণাম্
পূর্ব্বস্থলী-বাস্তব্যানাম্
ইদানীং কাশীনিবাসিনাম্।

সম্মতোঽয়মর্থঃ
[মহামহোপাধ্যায়]
শ্রীরামকৃষ্ণশাস্ত্রিণঃ
কাশিকাবাসিনঃ।
সম্মন্যতে
[মহামহোপাধ্যায়]
শ্রীগঙ্গাধরশাস্ত্রী [সি, আই, ই,]
কাশীনিবাসী।
সম্মতোঽর্থঃ
মৈথিল শ্রীজয়দেবমিশ্রস্য
দরভঙ্গাধীশ-সংস্থাপিত
কাশীস্থ-পাঠশালাধ্যাপকস্য।
সম্মতোঽর্থঃ
[মহামহোপাধ্যায়]
সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রিণাম্
কাশিকা-নিবাসিনাম্।
সম্মন্যতে
শ্রীচন্দ্রভূষণশর্ম্মা শাস্ত্রী
কাশীস্থ হিন্দু কলেজ-
সংস্কৃত-বিভাগাধ্যক্ষঃ।

ব্যবস্থাপত্রের বঙ্গানুবাদ।

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক এবং শক্তি-মন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত কালিকা-মূর্ত্তি-পূজা ছাগাদি পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদান ব্যতীত অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে কোন পাতক হয় কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইলে,

উত্তর—

"হে পুত্রগণ। বলিদানের ক্রম, স্বরূপ এবং যেরূপে রুধিরাদি দ্বারা দেবীর প্রীতি সম্পাদিত হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিব" ইত্যাদি

* * * *

এবং বলিদান দ্বারা সর্ব্বদা শত্রু নৃপতিদিগকে জয় করিবে এই পর্য্যন্ত যে কালিকাপুরাণের বচনাদি সমূহ আছে, তদ্দ্বারা ছাগাদি পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানে তত্তৎ দেবতার প্রীতিরূপ ফলের কথা উক্ত হইলেও উহার (নিত্যত্ব নাই) কাম্যত্ব অর্থাৎ কামনা-মূলকত্ব-হেতু,—

এবং

"কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড এবং আসব মদ্য, এ সমস্তই (দেবীর) তৃপ্তি বিষয়ে ছাগবলির তুল্য এইরূপ কথিত আছে।"

এই প্রকার কালিকাপুরাণের অন্য বচন দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, ছাগাদি পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদানে অসমর্থ হইলে পশুঘাত পূর্ব্বক বলিদানের অনুকল্পে কুষ্মাণ্ড ইক্ষুদণ্ড দান দ্বারা পূজা চলিতে পারে এই হেতু;—

শ্রীপার্ব্বতী বলিয়াছেন—

"যাহারা আমার (অর্থাৎ দেবীর) অর্চ্চনা এই কথা বলিয়া প্রাণিহিংসায় তৎপর হয়, সেই পূজা আমি অপবিত্র মনে করি, যে দোষে অর্চ্চনাকারীদিগের অধোগতি লাভ হয়। হে শিব। তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার জন্য পশু হনন করিয়া থাকে, তজ্জন্য কোটিকল্প পর্য্যন্ত তাহাদের নরকে বাস হয়, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আমার নাম করিয়া অথবা যজ্ঞেতে যে পশু হত্যা করে, কোথায়ও গিয়া সে সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না, কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। দেবকার্য্যে পিতৃ-কার্য্যে অথবা নিজের জন্য যে প্রাণিহিংসা করে। হে শম্ভো। শত-কোটিকল্প তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। হে সদাশিব। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত প্রাণিহত্যা করে, সে একবিংশতিবার সেই প্রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব যজ্ঞে যজ্ঞে পশুহত্যা করিয়া রুধির দ্বারা পৃথিবীকে কর্দ্দমাক্ত করে, সেই ব্যক্তি, নিহত পশুর শরীরে যত সংখ্যক রোম, ততদিন নরককুণ্ডে পচিয়া থাকে। বধ-কর্ত্তা (আঘাতকারী), সেই কার্য্যের কর্ত্তা (যজমান), উৎসর্গকর্ত্তা (পুরোহিত), যে পশুকে বধকালে ধরিয়া থাকে, ইহারা সকলেই তুল্যরূপ নরকগামী হয়।"

ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় পার্ব্বতীকর্ত্তৃক উক্ত বচনসমূহ দ্বারা পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদান সহিত পূজায় দুরন্ত নরকজনক পাপ জন্মে, অতএব কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ উপদেশ হেতু—

"বৈধহিংসা কর্ত্তব্য নহে, বৈধহিংসাও রজোগুণের কার্য্য।"

এইরূপ শ্রাদ্ধবিবেকটীকাকার গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্মনুবচন দ্বারা বৈধহিংসাও রজোগুণের কার্য্য, অতএব সাত্ত্বিকাধিকারীদের পক্ষে নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হওয়ায়—

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক এবং শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্ত্তি পূজা ছাগাদি পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদান ব্যতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, পক্ষান্তরে প্রদর্শিত পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় পার্ব্বতীবচনসমূহ দ্বারা ছাগাদি পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদান সহিত দেবতা অর্চ্চনা করিলে অর্চ্চনাকারীদের নরকজনক পাপ হয় এইরূপ অবগত হওয়ায় তাঁহাদের কখনও ছাগাদি পশুঘাত-পূর্ব্বক বলিদান সহিত পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত কালিকামূর্ত্তি পূজা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের উত্তর।

শকাব্দ ১৮৩২। ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

ব্যবস্থাপত্র, উহার অনুবাদ এবং স্বাক্ষরকারিগণের নামমালা উদ্ধৃত হইল। এইবার শক্তিপূজায় পশুবলি-বিষয়ে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান প্রধান অধ্যাপকের সহিত যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপকগণ ও এই মহানগরীর চতুষ্পা-ঠীর অধ্যাপকবর্গের অনেকেই বিনা বাক্যব্যয়ে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। দুই চারিটী অধ্যাপকের সহিত এ বিষয়ে যে সামান্য আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তত উল্লেখযোগ্য নহে।

নবদ্বীপে গিয়া নবদ্বীপ বিবুধজননী-সভার সম্পাদক আমার অনুজকল্প শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণের সহিত প্রথমে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাটীতে গমন করি। আমি যে বলি-নিষেধ-ব্যবস্থার অভিমত গ্রহণ করিতে গিয়াছি এ কথাটি ব্যক্ত হইবামাত্র পূর্ব্বাহ্নে যেন বায়ুবেগে নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় প্রচারিত হইয়া-ছিল, আমি ৯টার পূর্ব্বে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় বুড়াশিবের কোঠায়, পোড়ামাতলায়, গঙ্গার ঘাটে, উহা লইয়া পুরুষ ও রমণীদের মধ্যে যে আলোচনা

হইতেছে তাহা শুনিতে পাইয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমরা অপরাহ্ণ দুইটার সময় তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হই, তখন তিনি ছাত্রদের পড়াইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"আসুন, আমি সমস্তই শুনিয়াছি, দেখি ব্যবস্থাপত্রখানি কিরূপ লিখিত হইয়াছে।" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন "ব্যবস্থাপত্রখানির রচনা উত্তম হইয়াছে, এ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই। এ বিষয়ে একটী গল্প শুনুন—স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নাম বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত এখন বর্ত্তমান।" আমি বলিলাম, "শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত আমার সহাধ্যায়ী, শৈশবে আমরা একসঙ্গে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতাম।" তাহার পর, তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিলেন, "তবে ত আপনার জানাই আছে। সেই তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় এক সময়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহার কৃত ন্যায়ের গ্রন্থ এখনও অধীত অধ্যাপিত হইয়া থাকে। তাঁহার বহুসংখ্যক ধনী শিষ্য ছিল, পুত্র পৌত্র ও দৌহিত্র প্রভৃতিতে বংশও বিস্তৃত ছিল। অতি ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব করিতেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় আমার গুরু (অধ্যাপক) এবং আমরা ঐ বংশের পুরোহিত। দুর্গাপূজায় তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের বাটীতে বরাবর ছাগবলি হইত। সপ্তমী পূজার দিন একটী ও অষ্টমী নবমীতে অধিক সংখ্যক বলি প্রদত্ত হইত। একবার দুর্গাপূজায় সপ্তমীর দিন বলিদানের জন্য একটী কৃষ্ণবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট অল্পবয়স্ক ছাগ আনা হইল। ছাগটী ষষ্ঠীর দিন বিকালে বাটীর ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের প্রদত্ত নূতন তৃণ, বেলের পাতা প্রভৃতি খাইয়া আনন্দে দিন কাটাইল। একদিনের মধ্যেই যেন ঐ ছাগশিশু বাটীর বালক বালিকাদের ভালবাসা আকর্ষণ করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে ঢাক বাজিয়া উঠিল, ছাগশিশুটী উদাসভাবে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। শিশুদের যত্নপ্রদত্ত কচি ঘাস, বেলের পাতা স্পর্শও করিল না। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার মধ্যে সপ্তমী পূজা শেষ হইল, এইবার বলির আয়োজন হইতে লাগিল। যথাসময়ে ছাগটীকে স্নান করাইয়া লম্বা দড়ি সহ খোঁটায় বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, হাড়িকাঠ পোঁতা হইল, খাঁড়াইত খড়্গখানি সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। খড়্গ পূজা হইতেছে, এইবার ছাগ উৎসর্গ হইলেই বলিদান হইবে। এমন সময়ে একটী বালক উৎসাহে, কর্ত্তাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যেই খোঁটা হইতে দড়ি খুলিয়া দিল, অমনি ছাগটী কোথায় লুকাইল, আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলে ব্যস্তসমস্তভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কোথায়ও ছাগ পাওয়া গেল না। এদিকে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় গঙ্গাস্নানান্তে চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া ও একখানি নূতন গরদের যোড় পরিয়া নিমন্ত্রিতদের আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। তিনি যখন কয়েকটী বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে ছাগশিশু সেই ভিড়ের মধ্যে সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহার পায়ের মধ্যে আসিয়া লুকাইয়াছিল। কেহই তাহা দেখিতে পায় নাই। ছাগ হারাইয়াছে শুনিয়া যেই তিনি অগ্রসর হইবেন অমনি তাঁহার পায়ে কি একটা ঠেকিল, নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সেই ছাগশিশু তাঁহার চোখে পড়িল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। অবসন্ন এবং ভীত ছাগশিশুটি একদৃষ্টে অতি কাতরভাবে তাঁহার নয়নের দিকে তাকাইয়া রহিল। করুণায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বিনা পশুবলিতে দেবীপূজা হয়, তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু প্রচলিত আছে বলিয়া এতদিন তুলিয়া দেই নাই। জগজ্জননীর কৃপায় আজ আমি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছি। এই বিপন্ন ভীত শরণাগত জীবকে প্রাণ থাকিতে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না, এবং মায়ের পূজায় আর কখনও আমি পশুবলি দিব না। তোমরা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও কখনও তোমরা দেবীপূজায় পশুবলি দিবে না। পুত্রগণ বলিলেন সেকি? আপনি যাহা নিষেধ করিলেন তাহা আমরা করিব ইহা কি কখনো সম্ভব হইতে পারে? আমরা প্রাণান্তেও দেবীপূজায় পশুবলি দিব না। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বিক্রেতার বাটীতে ছাগটী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন মূল্য ফেরৎ লইব না, অধিকন্তু তোমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিতেছি, তুমি চিরকাল এই ছাগটীকে পালন করিবে, কাহাকেও বিক্রয় করিও না। বিক্রেতা তাহাতে সম্মত হইল। সেই হইতে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের বাটীতে শক্তিপূজায় ছাগবলি উঠিয়া গেল।"

গল্প শেষ হইলে তর্কপঞ্চানন মহাশয় আগ্রহ সহকারে ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষরিত করিলেন। তাহার পর, চাবুচারাপাড়া ও ব্যাদড়াপাড়ার আর কয়েকটী অধ্যাপকের স্বাক্ষর করাইয়া আম্পুলেপাড়ায় গেলাম। সেখানকার শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া কাঁসারিসড়কে শ্রীযুক্ত অজিতনাথন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলাম। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন;— "আমরা বিষ্ণুপাসক, আমাদের ত এ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করায় কোন আপত্তিই নাই। তন্ত্রসার-গ্রন্থের প্রণেতা

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আগমেশ্বরীতলার আগমেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও জপ হোম এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা তাঁহার উপাস্য দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা বরাবর বিনা বলিতে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখন কার্ত্তিকী অমাবস্যায় (দীপান্বিতার দিন) আমি স্বয়ং জপ হোম ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা আগমেশ্বরীর পূজা করি, তাহাতে ছাগবলির অনুকল্পে কুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষুদণ্ড প্রদত্ত হয় না।" ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও বলিলেন ;—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও সহস্রাক্ষ দুই সহোদর। আগমবাগীশ তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন, সহস্রাক্ষ বৈষ্ণব। ন্যায়রত্ন মহাশয় সহস্রাক্ষের অধস্তন বংশধর। তাঁহার স্বাক্ষর হইলে বাটী অভিমুখে যাইতেছি, পথে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি একটী বাড়ীর রকে বসিলেন। ইঁহারা আগমবাগীশের দৌহিত্রবংশ, ঘোর তান্ত্রিক। ইঁহার পিতা ৺ভর্গদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর ঘোর নিশায় শ্মশানে শব-সাধনা পর্য্যন্ত করিতেন। চূড়ামণি মহাশয় আমার সহাধ্যায়ী। আমি শৈশবে ইঁহার নিকট পাঠ বলিয়া লইতাম, সুতরাং ইঁহাকে অধ্যাপকের তুল্য সম্মান করিয়া থাকি। ইনি ব্যবস্থাপত্রের মর্ম্ম শুনিয়াই স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত হইলেন, আমি উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। পাঠ করিয়া বলিলেন "আঃ বলির এত নিন্দা কেন ? 'বিনা বলিতে শক্তিপূজা হইতে পারে' এইটুকু লিখিলেই ত যথেষ্ট হইত ? আমি কোন কথা বলিলাম না, তাহার পর, তিনি বিনা অনুরোধেই স্বাক্ষর করিলেন। আমি বলিলাম "যাক্ আমার একটা সন্দেহ ছিল, এ ব্যবস্থাপত্রে হয় ত আপনি স্বাক্ষর করিবেন না, সে সন্দেহ দূরীভূত হইল।" চূড়ামণি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "ওরূপ সংশয়ের কারণ ?" আমি বলিলাম "তান্ত্রিকতা যে আপনাদের আজন্মসিদ্ধ।" তিনি বলিলেন "সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন আর আমি শক্তিপূজায় বলির পক্ষপাতী নহি, বিনা বলিতে কত পূজা করাইয়া থাকি।"

তাহার পর, বাটীতে ফিরিয়া দেখি অগ্রজ মহাশয়ের নিকট কয়েকটী অধ্যাপক বসিয়া গল্প করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বলির বিরোধী। তাঁহারা এবং অগ্রজমহাশয় স্বাক্ষর করিলেন। সায়ংকালের পূর্ব্বে পুনরায় বাহির হইলাম। পাকা-টোলের অধ্যাপক নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় ও আমি তর্কভূষণ মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ বাসা অভিমুখে যাইতেছি, পথে কাঁসারি-সড়কে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের জন্মভূমি ঢাকাজেলার অন্তর্গত মেতরা গ্রাম। মেতরার ভট্টাচার্য্যেরা ঘোর বামাচারী এবং অর্দ্ধকালীর সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন "মহাশয় ! এসব কি হচ্চে, শক্তিপূজায় পশুবলি নিবারণের জন্য এত চেষ্টা কেন ? একটা জীব সামান্য একটু খড়্গের আঘাত সহ্য করিয়া যদি সূর্য্যমণ্ডলে চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস কি জন্য ?" তাহার পর, তিনি পশুবলির অনুকূলে বচনসকল আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও বিরোধী বচনসকল বলিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিল, ক্রমে রাস্তায় লোক জড় হইতে লাগিল। সায়ংকাল উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া আমি বলিলাম "সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হইতেছে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত একবার যাইতেই হইবে, সেই সময় এ-সব কথা হইবে।" তাহার পর, তিনজনেই গঙ্গার ঘাটে স্বায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলাম। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে ও তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণে আমার কিছু বিলম্ব হইল। রাত্রি ৮॥ টার সময় স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি অনেক গৃহস্থের মন্ত্রদাতা গুরু, সুতরাং নবদ্বীপে বেশ বড় বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ধানের গোলা ও তন্ত্রোক্ত করবীর পুষ্পের বৃক্ষে সুশোভিত। জ্যোৎস্নাশীতল গ্রীষ্মের রজনীতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া অনেক কথোপকথন হইল। প্রসঙ্গক্রমে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কারক-দের কথা উঠিল। আমি শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত লিখিয়াছি অবগত হইয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অতি আগ্রহ-সহকারে উহা পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার রচিত একখানি বেদান্তসংক্রান্ত গ্রন্থ তখনি আমাকে উপহার প্রদান করিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সহিত প্রথম আলাপে আমি তাঁহার প্রকৃতি বুঝিতে পারি নাই, শেষে দেখিলাম তিনি একজন প্রশস্তহৃদয় অধ্যাপক। তিনি বলিলেন "বিনা জীববলিতে যে সাত্ত্বিকী কালীপূজা হয়, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই, তবে ব্যবস্থাপত্রখানিতে পশুঘাতের অত্যন্ত নিন্দা আছে শুনিয়াই আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম। থাকুক নিন্দা, আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিব না।" তাহার পর, তিনি স্বাক্ষর করিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বাটীর অতি নিকটে তাঁহার বাসভবন। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় তাঁহার এবং আর দুইটী অধ্যাপকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিলাম। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন "শাক্ত হইলেই যে দেবীপূজায় ছাগবলি দিতে হইবে, তাহার কারণ কি ? অনেক শাক্তের বাটীতে কালীপূজায় ছাগবলি হয় না।"

নবদ্বীপের কার্য্য একরূপ শেষ হইল। পরদিন কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুই একদিনের মধ্যেই ভট্টপল্লীতে গমন করিলাম। আমার এক বন্ধুর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার মতগ্রহণকার্য্য শেষ হইল। ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অধিকাংশ বিষ্ণুপাসক, সুতরাং তাঁহারা ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর-কালে কোনই আপত্তি করেন নাই। নবদ্বীপে যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ হয়। আমি সময় পাইয়া এইবার একাকী কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের কলিকাতার প্রতিবেশী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরিস্থ তাঁহার কাশীবাসের বাটী পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য পাণ্ডাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি সেখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি এক নব্য নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে সঙ্গে দিয়া আমাকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্যবস্থাপত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যখন স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কয়েকটী নব্য অধ্যাপক তাঁহাকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভক্তিভাজন ন্যায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে বিলক্ষণ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন "এই ব্যবস্থাপত্রখানি ঠিক শাস্ত্রানুগত, সুতরাং ইহাতে স্বাক্ষর করায় কোনই বাধা নাই"। তাঁহার বাটীতে আরও দুই তিনটী অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার পর, কাশীস্থ দরভঙ্গা পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক কনোজিয়াদের শীর্ষস্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমারশাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে গমন করি। তিনি ব্যবস্থাপত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন "এই ব্যবস্থাপত্রখানি আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত, আপনারা লিখিয়া দিতে পারেন—"শিবকুমারশাস্ত্রীরও ইহাই মত" কিন্তু আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না। আমি ভট্টাচার্য্যের (শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের) অনুরোধে একখানি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছি, আমার হৃদয় হইতে সে ক্ষত এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, এ অবস্থায় কিছুদিন কোন পত্রেই আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না।" পরে ঐ স্থানেই একটী পণ্ডিতের মুখে শ্রুত হইলাম,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তকখানি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত-উপাধি পরীক্ষার বেদান্ত-দর্শনের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ কাশীনরেশকে জানান যে "ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে অসংযত ভাষায় বৈদান্তিকদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। আমরা অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক, ঐ পুস্তকের পঠন পাঠন আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের ধর্ম্মহানিকর। অতএব বঙ্গেশ্বরকে অনুরোধ করিয়া ঐ পুস্তক বেদান্তের পাঠ্যতালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হউক। ঐ পুস্তকের রচয়িতা নৈয়ায়িক, তাঁহার পুস্তক কেন বেদান্তের পাঠ্য তালিকায় স্থান পাইবে?" কাশীনরেশ বঙ্গেশ্বরকে পত্র লেখেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা, সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রতি ইহার মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। এই সময় কাশীস্থ নৈয়ায়িকগণের পক্ষ হইতে ও বৈদান্তিকগণের পক্ষ হইতে মত সংগ্রহ করা হয়। মহামহোপাধ্যায় শিবকুমারশাস্ত্রী বৈদান্তিক হইয়াও ভট্টাচার্য্যের (রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের) অনুরোধে নৈয়ায়িকগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। এদিকে কলিকাতা সংস্কৃতবোর্ডে এ বিষয় লইয়া বহু তর্ক বিতর্কের পর, ফল-কথা বেদান্তের পাঠ্যতালিকা হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" নামক গ্রন্থ উঠিয়া যায়। শিবকুমারশাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত জিগীষু, তাঁহার পক্ষ পর্য্যুদস্ত হওয়ায় প্রথম তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগে, দ্বিতীয়তঃ তিনি নৈয়ায়িকগণের পক্ষে মত দেওয়ায় কাশীনরেশ একটু অসন্তোষও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উভয় কারণে শাস্ত্রীমহাশয় দুঃখিত ছিলেন, তজ্জন্য স্বাক্ষর করিলেন না, নচেৎ শক্তিপূজায় বলিদানের তিনি সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

তাহার পর, কাশী কুইন্‌স কলেজের বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভাগবতাচার্য্যের নিকট গমন করিলাম। ভাগবতাচার্য্য মহাশয় রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, তিনি বৈষ্ণব মতোক্ত আচার অনুষ্ঠান লইয়া দিবসের অনেক সময় অতিবাহিত করেন। আমি উপস্থিত হইলে অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টাচার সহকারে আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং ব্যবস্থাপত্রখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন "আপনারা অতি সাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হায় দেব-আরাধনার নামে এই জীবহিংসা কবে পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে? শমদমতিতিক্ষা-সম্পন্ন হইয়া যে আরাধনার বিধি, তাহাতেই কিনা এইরূপ নৃশংস ভাবে পশু-ঘাত! ইহাতে মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, না আসুরিক দুষ্ট ভাবের উদ্রেক হয়? এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেই যে আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল, তাহা আমি মনে করি না, এই কার্য্যে যে-কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

আপনি বলুন আমি আপনাদের আর কি সাহায্য করিতে পারি ?" উত্তরে আমিও সংস্কৃতভাষায় বলিলাম "আপাততঃ আপনার সম্মতি ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, আপনাদের শুভ ইচ্ছা থাকিলেই আশা করি আমরা এ-বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিব।" তাহার পর, ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া পূর্ব্বস্থলীর সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, আমাদের অন্যতম অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গুরু এবং খুল্লতাত। পূর্ব্বস্থলী অবস্থান কালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও তাঁহার নিকটেও অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি আমাকে দেখিয়াই কুশল জিজ্ঞাসার পর ব্যবস্থাপত্রখানি আদ্যন্ত দুইবার পাঠ করিলেন, তাহার পর বলিলেন "এ ব্যবস্থাপত্রে আমি সম্মতি দিতে পারিব না।" আমি বলিলাম "কারণ?" ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় একটু উঁচু গলায় বলিলেন "কারণ আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে বৈধ হিংসার দারুণ নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সাত্ত্বিকী কালী পূজায় বলির প্রয়োজন নাই, ইহা কি আপনার অভিমত নহে?" তিনি বলিলেন "কেন মত নয়? সাত্ত্বিকী পূজা যে বিনা বলিতে হইতে পারে, তাহা ত আমি "শ্যামাসন্তোষ" নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছি, তাহাতে ত আমার সহিত কোন বিরোধ নাই, বিরোধ হইতেছে পশুঘাতের নিন্দায়।" আমি বলিলাম "এ-সকল বচন কি শাস্ত্রীয় নহে?" তিনি বলিলেন "শাস্ত্রীয় বই কি! তবে ঐ-সকল পুরাণের বচন বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে রচিত।" আমি বলিলাম "এ-সকল কথা ত সাহেবেরা বলে, আপনি বলেন কি করিয়া! পণ্ডিতসমাজে ত বেদ অনাদি, বেদার্থ স্মরণ করিয়া ঋষিরা স্মৃতি এবং পুরাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্ত্র সাক্ষাৎ মহাদেবের মুখনিঃসৃত, এইরূপ বিশ্বাস চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।" আমার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন "হাঁ হাঁ, বৌদ্ধ-মত না বলিয়া না হয় সাংখ্য-মত বলিলাম।" তাহার পর, ঐ বিষয়ে আরও অনেক কথা হইল কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় একটুকুও নরম হইলেন না। অবশেষে আমি বলিলাম "শাস্ত্রে পশুঘাতের বিধি নিষেধ, নিন্দা প্রশংসা সমস্তই আছে, সে বিষয়ে আপনার সাক্ষাতে কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। ভাবুন, কয়েকটী ছাগশিশুকে স্নান করাইয়া বলিদানার্থ হাড়িকাঠের নিকট আনিয়া দাঁড় করান হইয়াছে, ছেত্তা খড়্গ উদ্যত করিয়া আদেশের অপেক্ষায় আছে, যজমান আপনার নিকট বিধান প্রার্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, ছাগশিশুগুলি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া একবার ছেত্তার দিকে একবার আপনার দিকে কাতরনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। আপনার মুখের একটী মাত্র বাক্যের উপর ঐ হতভাগ্য জীবগুলির জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। এ অবস্থায় আপনি কি প্রকার বিধি প্রদান করিবেন, তাহাই জানিতে চাই।" প্রথমে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কথাগুলি নীরবে শুনিলেন, পরক্ষণেই চটিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন 'আমি জিদ্ করিয়া তাঁহার দয়া আকর্ষণ করিতে যাইতেছি।' একটু উঁচু গলায় বলিলেন "দেখ শাস্ত্রের আদেশ বড় কঠোর, সেখানে দয়া স্নেহ নাই, বক্তৃতাও কোন কার্য্যকারিণী হয় না। আমাদের ত দয়া করিতে বলিতেছ, সিংহ ব্যাঘ্রাদির বেলায় কি করিবে, তাহারা কি তোমার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পাঁতি মানিয়া চলিবে! শত চেষ্টা করিলেও তাহারা ছাগাদি বধে বিরত হইবে না।" আমি বলিলাম "শাস্ত্রের আদেশ কঠোর ত বটেই, দুর্ব্বলদের প্রতি অধিক কঠোর, তাহা না হইলে যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি দুঃখ করিয়া বলিবেন কেন?

> "দৃশ্যন্তে হি নরা লোকেঽবলবন্তো বলাধিকৈঃ।
> ঈশ্বরৈর্দুর্ব্বলো বধ্যঃ ক্রতৌ পশুরিবাবলঃ॥"

সিংহ ব্যাঘ্রেরা ছাগমাংসের লোভ পরিত্যাগ করিবে, সে ত বহু দূরের কথা, জ্ঞানী মানবেরাই পারেন না। যে শাস্ত্রে ছাগ বলির ব্যবস্থা আছে, সেই শাস্ত্রেই সিংহ ব্যাঘ্র বলিরও ব্যবস্থা আছে।* কিন্তু কখনও শুনি নাই যে কেহ এ পর্য্যন্ত সিংহ কিংবা ব্যাঘ্র বলি দিয়াছে।" তাহার পর, আমি যখন নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতেছি, তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "শরৎ তুমি মনে কিছু করিও না, আমি যাহা বলি শুন, আমি সংক্ষেপে একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছি, উহাতেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে। 'ছাগাদি বলি ব্যতীত কালীপূজা হইতে পারে' ঐ ব্যবস্থাপত্রে এ কথা থাকিবে কিন্তু পশুঘাতের নিন্দা থাকিবে না।" আমি

---

* সাধকৈস্তু বলিদানেষু মতাঃ সর্ব্বসুরস্য তু।
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহা মৎস্যা নববিধা মৃগাঃ॥
মহিষো গোধিকা গাবশ্ছাগো বভ্রুশ্চ শূকরঃ।
খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকা সরভো হরিঃ॥
শার্দ্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরং তথা।
চণ্ডিকা ভৈরবাদীনাং বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
(কালিকাপুরাণ)

সিংহস্য সরভস্যাথ স্বগাত্রস্য চ শোণিতৈঃ।
দেবী তৃপ্তিমবাপ্নোতি সহস্রং পরিবৎসরান্॥
(কালিকাপুরাণ)

বলিলাম "আগে ভাবিয়া দেখি।" যাইবার কালেও বলিয়া দিলেন 'আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যেওনা'।

তাহার পর, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। বিদ্যার্ণব মহাশয় আমার সহাধ্যায়ী, নবদ্বীপে পূজ্যপাদ ৺কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে তাঁহার সহিত আমরা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতাম। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হইল। শিবচন্দ্র দাদা এখন ঘোর তান্ত্রিক সাধক, বড় বড় রুদ্রাক্ষ, শুভ্রস্ফটিক ও অন্যান্য মালায় গলদেশ নিমজ্জিত, গৈরিক বসন পরিধান করেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর, ব্যবস্থাপত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন "ভাই মনে কিছু করিও না, এ ব্যবস্থাপত্রে আমি সম্মতি দিতে পারিব না। কারণ ইহাতে পশুঘাতের অত্যন্ত নিন্দা আছে। পিতা পিতামহ কালীপূজায় ছাগবলি দিয়া গিয়াছেন, আজ আমি কেমন করিয়া লিখিব 'যাহারা কালীপূজায় ছাগ বলি প্রদান করে, তাহাদিগকে ঘোর কুম্ভীপাক নরকে পচিতে হয়?' তবে এখন প্রকৃত বলি হয় না, শাস্ত্রোক্ত বলিদানের নিয়ম এই—বলিদানের ছয় মাস পূর্ব্বে সুলক্ষণাক্রান্ত সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বা সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট একটী ছাগ-বৎস নির্ব্বাচন করিয়া তাহার দীক্ষার জন্য একটী শুভদিন নির্ণয় করিতে হইবে। সেই দিনে স্নান করাইয়া ঐ ছাগের কর্ণে পশুগায়ত্রী দিতে হইবে। তাহার পর হইতে প্রত্যহ পবিত্র বিল্বপত্র নবতৃণ ইত্যাদি ভোজন করাইয়া প্রতিপালন করিবে; ছয় মাস প্রতিপালিত হওয়ার পর তাহার মাতার নিকট ছাড়িয়া দিবে। মাতা এবং পুত্র যদি পরস্পরকে পরস্পরে না চিনিতে পারে তাহা হইলে যজমান মনে মনে সঙ্কল্প করিবেন, আমি দেবীকে এই ছাগটী উপহার প্রদান করিব। তাহার পর, পূজার দিনে যজমান ছাগটীর যথাবিধি স্নান উৎসর্গ শেষ করিয়া হাড়িকাঠের নিকট উপস্থিত করিবেন। ঐ সঙ্কল্পিত ছাগ আপনা হইতেই হাড়িকাঠের মধ্যে গলা দিবে, তখন তাহাকে ছেদন করিয়া মুণ্ড এবং রুধির দেবীকে উপহার প্রদান করিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "দেবী পূজায় এরূপ ছাগবলি কি হইয়া থাকে?" শিব দাদা বলিলেন "না"। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মসলা বাটিয়া রাখিয়া ছাগ বলি দেওয়াটা কিরূপ কার্য্য?" তিনি বলিলেন—"ঐরূপ ছাগবলিকে "বলি" বলা উচিত নহে, উহা "পশুহত্যা"।" তাহার পর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সাত্ত্বিকী কালীপূজায় বলির প্রয়োজন আছে কি না?" তিনি বলিলেন "সাত্ত্বিকী কালীপূজা যে বিনা বলিতে সম্পন্ন করিতে হইবে ইহা ত সর্ব্ববাদিসম্মত। তুমি ঐরূপ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া আন, আমি তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছি।"

তাহার পর, বাঙ্গালীটোলা পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্র-পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী দ্রাবিড়প্রদেশীয় অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, অধুনা কাশীনিবাসী। শাস্ত্রীমহাশয় প্রত্যহ অগ্নিহোত্র করেন, অগ্নিহোত্রশালায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। ইঁহার প্রস্তর-নির্ম্মিত বাড়ীটী ঠিক দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণভবনের অনুরূপ। চতুঃশাল, দ্বিতল গৃহ, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, দক্ষিণদিকে হোমশালা, প্রাঙ্গণে তুলসীবেদী জুঁইফুলের গাছ ও একদিকে কয়েকটী দুগ্ধবতী হোমধেনু। শাস্ত্রীমহাশয় হিন্দী বুঝেন কিন্তু আমার সহিত তাঁহার প্রায় একঘণ্টাকাল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হইল। তিনি একখানি উর্ণানির্ম্মিত বসন পরিধানপূর্ব্বক গামছা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিয়া একখানি মৃগচর্ম্মে বসিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র শেষ হইয়াছে, হোমশেষ ভস্মের তিলক তখনও ললাটে ও সর্ব্বাঙ্গে শোভা পাইতেছে। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আদরসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং একখানি কৃষ্ণসারচর্ম্ম সরাইয়া দিয়া বলিলেন—"উপবিশ্যতামত্র কৃপয়া।" আমি উপবেশন করিয়া আমার প্রার্থনা সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞাপন করিলাম এবং ব্যবস্থাপত্রখানি হস্তে দিলাম; আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সংস্কৃতভাষায় বলিলেন "কালীপূজার মর্ম্ম আমরা কিছু বুঝি না, উহা আপনারাই বুঝেন, আপনারাই করেন। কালীপূজাই হউক আর যে পূজাই হউক সাত্ত্বিকী পূজা যে বলি ব্যতীত সিদ্ধ হয়, এবিষয়ে আমার মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্রখানিতে যজ্ঞে যে বৈধহিংসা করা হয়, তাহারও নিন্দা আছে, অতএব এ ব্যবস্থাপত্রে আমি সম্মতি দিব কি করিয়া? আমরা যাজ্ঞিক, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশু আলম্ভন করিয়া থাকি। যদিও বেদে নানাবিধ পশু আলম্ভনের বিধি আছে, তথাপি যেখানে কোন বিশেষ পশুর নাম না থাকে, সেখানে পশু অর্থে ছাগকেই গ্রহণ করা হয়। আমরা যজ্ঞে যে পশু আলম্ভন করি, তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র। আমরা এক আঘাতে পশুচ্ছেদন করি না। যাগারম্ভের পূর্ব্বে একটী কৃষ্ণবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট সুলক্ষণাক্রান্ত ছাগ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যথাবিধি স্নান করাইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আনা হয়। বামহস্তে ছাগ ও দক্ষিণহস্তে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ছাগদেহে উদ্বর্ত্তন (বলপূর্ব্বক ঘর্ষণ) করিতে করিতে যখন ছাগটী অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা উহার দেহ হইতে মাংসখণ্ড কর্ত্তনপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করা হয়।" আমি বলিলাম "যজ্ঞে এরূপ পশু আলম্ভনের প্রণালীটী বধ্যমান পশুর পক্ষে অধিক যন্ত্রণাদায়ক।" তিনি বলিলেন "তাহা

নিশ্চয়, কিন্তু কোন উপায় নাই, আমরা মনুষ্য-বাণী দ্বারা পরিচালিত হই না, বেদই আমাদের একমাত্র অনুশাসক। বৈদিকবিধি নৃশংসই হউক, আর করুণাপূর্ণই হউক, উহাই আমাদের শিরোধার্য্য।" তাহার পর, আমি অন্য সময়ে সাক্ষাৎ করিব বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। ইনি তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, কাশীস্থ কুইন্স কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এখন পেন্সনপ্রাপ্ত। তাঁহারও ঐ এক আপত্তি—"এই ব্যবস্থাপত্রে যজ্ঞীয় পশুহিংসারও নিন্দা আছে, অপর একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করুন।" কি করি? পরদিন ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করাইলাম এবং উহাতে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের, সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী ও গঙ্গাধর শাস্ত্রীর স্বাক্ষর লইয়া শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণশাস্ত্রীর নিকট গমন করিলাম। ইনি মহারাষ্ট্রীয় কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ, কুইন্স কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এখন পেন্সনপ্রাপ্ত। ইহাঁর ডাকনাম তাতিয়া শাস্ত্রী। গঙ্গার প্রবাহের অতিসন্নিহিত সুন্দর দ্বিতলবাটী, প্রাঙ্গণে দুগ্ধবতী ধেনু বিরাজমানা। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া বসাইলেন। ব্যবস্থাপত্রখানি পাঠ করিয়া প্রথমে একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর, সংস্কৃতভাষায় বলিলেন "বাঙ্গালা-দেশের উপর দিয়া সংপ্রতি সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে বাঙ্গালীর শতকরা নিরনব্বই জন মৎস্য মাংসভোজী, তাঁহারাই আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছাগ বলি প্রতিষেধে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।" আমিও সংস্কৃতে বলিলাম "শতকরা নিরানব্বইজন বলিবেন না, ব্রাহ্মণ-জাতীয় বিধবা ও অন্যান্য উচ্চজাতীয় বিধবারা সকলেই হবিষ্যাশী এবং পুরুষদের মধ্যেও অনেকে মৎস্য মাংস ভোজন করেন না।" শাস্ত্রী বলিলেন "আচ্ছা বলুন দেখি ভট্টাচার্য্য শৈশবে এবং যৌবনে মৎস্য মাংস ভোজন করিতেন কি না?" (কাশীতে হিন্দুস্থানী মহল্লায় 'ভট্টাচার্য্য' বলিলে একমাত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়কেই বুঝায়)। আমি উত্তরে বলিলাম "তাঁহার বাড়ী ভাটপাড়া, আমার বাড়ী নবদ্বীপ, আমি কি প্রকারে জানিব, তিনি শৈশবে এবং যৌবনে মৎস্য মাংস আহার করিতেন কি না?" পুনরায় শাস্ত্রী বলিলেন "মৎস্যমাংস-ভোজীরাও যে ব্রাহ্মণ, একথা আমি পরিবারদের কোন প্রকারেই বুঝাইতে পারি না।" আমি বলিলাম "কেন, দক্ষিণভারতেও ত কোন কোন ব্রাহ্মণের মধ্যে মৎস্যমাংস না থাকুক, মাংস এবং পলাণ্ডু লসুন ভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে।" শাস্ত্রী বলিলেন "না, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা কখনও মৎস্যমাংস স্পর্শ করেন না।" তাহার পর, প্রথম ব্যবস্থা-পত্রে সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী ও গঙ্গাধর শাস্ত্রীর স্বাক্ষর না দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার পর, দরভাঙ্গা পাঠশালার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র ও সেণ্ট্রাল্ হিন্দুকলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ শাস্ত্রীর নিকট গমন করিলে তাঁহারা বলিলেন "সাত্ত্বিকী কালীপূজাতে বলির প্রয়োজন নাই, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত কিন্তু শুনিয়াছি মহারাজ দেবীর প্রসাদীকৃত ছাগমাংস পাক করিয়া আহার করেন।" প্রথমোক্ত পণ্ডিতমহাশয়ের প্রভু দরভঙ্গার মহারাজ ও দ্বিতীয়োক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রভু কাশীনরেশ। আমি বলিলাম "এ ব্যবস্থাপত্রে মহারাজগণের মাংসভোজনের কোন প্রতিষেধক কথাই নাই, তবে আপনারা ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন?" উত্তরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণশাস্ত্রী বলিলেন "মহারাজগণের অন্তঃকরণ যে কোন্ উপলক্ষে কি আকার ধারণ করে তাহা ত বলা যায় না।" অনেকক্ষণ ভাবিয়া তাঁহারা উভয়েই স্বাক্ষর করিলেন।

পরদিন হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি গাড়ীতেই কাটিল, পরদিন (দশহরার দিবস) তিনটা বিশমিনিটের সময় হরিদ্বার ষ্টেসনে নামিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া স্নানাদি করিলাম। পরদিবস প্রাতঃস্নান করিয়া এক্কায় আরোহণপূর্ব্বক কনখলে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার সুধীবর্গ সকলেই পরম সন্তোষ-সহকারে এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তত্রত্য মুনি-মণ্ডল-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভারতরত্ন-বিদ্যাদিবাকর-মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কেশবানন্দস্বামী আমার প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। সুন্দর সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যানের মধ্যে মহাবিদ্যালয়ের পরম রমণীয় সৌধ। কয়েকটী অধ্যাপক আছেন, তন্মধ্যে স্বামীজীই প্রধান। অট্টালিকার সুপ্রশস্ত কুট্টিমে নানা চিত্রবিচিত্র গালিচা পাতা হইয়াছে, মধ্যে অধ্যাপক চতুর্দ্দিকে অন্তেবাসিগণ অধ্যয়নে নিরত। কেশবানন্দস্বামী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, সুঠাম শ্যামতনু, যেন একটী পাথরের গোপালের মত বসিয়া আছেন। সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন হইল। তিনি বলিলেন "আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে ব্যবস্থাপত্রে সম্মতি-দান ত সামান্য কথা, বলুন আমাকে আর কি করিতে হইবে? এ বিষয়ে আমি সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ প্রথম ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কেশবানন্দ অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন, বেদ, উপনিষদ্, ব্যাকরণ,

কাব্য, অলঙ্কার, সকল শাস্ত্রেই তাঁহার গভীর অধিকার। আসার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ইতঃপূর্ব্বে আমি যে-সকল কাশ্মীরী শাস্ত্রী দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গ, আপনাকে শ্যামতনু দেখিয়া মনে হইতেছে কাশ্মীরে শ্যামবর্ণ মনুষ্যও আছেন।" তিনি বলিলেন "হাঁ কাশ্মীরে শ্যামবর্ণ মানুষও যথেষ্ট, তবে ঐ দেশের আদিমনিবাসী পণ্ডিতগণ সকলেই প্রায় গৌরাঙ্গ, আমরা দক্ষিণীব্রাহ্মণ, কাশ্মীরের উপনিবেশী, আমাদের মধ্যে সকল বর্ণের লোকই আছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা কোন্ সময়ে কি উপলক্ষে কাশ্মীরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহার কোন ইতিহাস জানা আছে কি ?" তিনি বলিলেন "দিগ্বিজয় যাত্রাকালে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার যে-সকল শিষ্য কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে ভগবানের কেদারযাত্রাকালে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অদ্বৈত-বাদ প্রচারার্থ রমণীয় কাশ্যপীভূমিতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পরে স্বদেশ হইতে পরিবারাদি আনয়ন করিয়া কাশ্মীরে বাস করেন।" তাহার পর, কেশবানন্দ স্বামীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় একায় আরোহণ করিয়া হরিদ্বারের দক্ষিণসীমান্তস্থিত ঋষিকুল পাঠশালায় আগমন করিলাম। ভাগীরথীতীরস্থ প্রান্তর মধ্যে এই পাঠশালা অবস্থিত। এখানকার বিদ্যার্থিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংস্কৃত-ভাষায় সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস পাঠ করে। অধ্যাপকেরা হরিদ্বারে গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পাঠশালার পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী প্রবাহের সন্নিহিত বনপ্রান্তে পাঠশালার স্বত্বাধিকারীদের নির্ম্মিত তৃণময় কুটীরে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দতীর্থস্বামী বাস করেন। আমি উপস্থিত হইলেই তাঁহার শিষ্য শিবানন্দ ব্রহ্মচারী আমাকে সেই প্রশস্ত কুটীরের মধ্যে চৌকীতে লইয়া বসাইলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসিল, আমি তাহাদের হস্ত হইতে পাখা লইয়া নিজেই বাতাস করিতে লাগিলাম। একটু পরেই এক শিষ্য বড় একটী শাদা পাথরের গ্লাস-পূর্ণ সরবৎ লইয়া আসিল। আমি বলিলাম "আমার একাদশী, একেবারে সায়ংকালে ফলমূল দুগ্ধ আহার করিব. সুতরাং এখন কিছু পান করিব না।" কিন্তু তীর্থস্বামীমহাশয় বলিলেন "রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছ, একটু ঠাণ্ডাই পান করিয়া সুস্থ হও, ইহাতে তোমার ব্রতভঙ্গ হইবে না।" কি করি পূজ্যব্যক্তির অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়, সরবৎ পান করিলাম। কনখলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত দেশীয় চিনি, ঘোল, লেবুর রস, অজ্ঞাত-নামা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষমূলের রস ও ভাগীরথীর অতি শীতল জল পরিস্রুত করিয়া লইয়া এই পানীয় প্রস্তুত করা হইয়াছে। শীতল সুস্বাদু ও সৌরভযুক্ত পানীয় পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। পুরীর পুরুষোত্তম মন্দিরের বাসুদেবরামানুজদাস স্বামীও একবার আমাদিগকে এইরূপ পানীয় পান করাইয়াছিলেন। শিবানন্দব্রহ্মচারী দেবাক্ষরে মুদ্রিত ব্যবস্থাপত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের ব্যবস্থাপত্র ?" শিবানন্দ বলিলেন "বাঙ্গালী দেবীকো পূজামে বক্‌রা চড়াতেহেঁ, উন্‌কো নিষেধকী বাস্তে পাত্‌রা বানায়া হুয়া, উসমে আপ্‌কো সম্মতি মাঙ্গ্‌তে হেঁ।" তীর্থস্বামী ত শুনিয়া অবাক্, দেব-আরাধনায় প্রাণিহত্যা! ইহার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিলেন না। হিংসা দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয় এবং সেই অবস্থায় যে দেব আরাধনা হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিলেন। আমি স্বামীজী ও তাঁহার প্রধান শিষ্য শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পুনরায় একা আরোহণ করিয়া অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় বাসায় পৌঁছিলাম। সাতটা হইতে একা সঙ্গে একাওলাকে বিদায় দিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। অপরাহ্ণ চারিটা বাজিল, এইবার ব্যবস্থাপত্র লইয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। আমাদের পুরাতন বন্ধু, নবদ্বীপের পাকাটোলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, পঞ্জাব জলন্ধর-নিবাসী পণ্ডিত রামকৃষ্ণতর্কশাস্ত্রী এখন হরিদ্বারে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলাম। তর্কশাস্ত্রী আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি ছাত্রদিগকে বলিলেন "যাও আজ তোমাদের শিষ্টানধ্যায় হইল।" তাহার পর, অনেক কথোপকথন হইল, ব্যবস্থাপত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন "উত্তম কথা, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। চলুন অগ্রে অন্যান্য পণ্ডিতের সম্মতি গ্রহণ করা যাউক। প্রাতঃকালে সকলেই আপন আপন পূজা পাঠে ব্যস্ত থাকেন, মধ্যাহ্নে বড় ধূপ, এই সময় অধ্যাপকগণের সহিত কথোপকথনের অনুকূল।" ক্রমে কয়েকটী সংস্কৃত পাঠশালায় গমন করিলাম। হরিদ্বারের অধ্যাপকবর্গ সদাচার ও সদনুষ্ঠান-নিরত এবং অকপট, তাঁহারা আমার সহিত সংস্কৃতভাষায় আলাপ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং ব্যবস্থাপত্র পাঠ ও আমার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আমার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিলেন, তাহা আমি লিখিতে পারিলাম না। এই ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি দূরে থাকুক, অনেকে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

সর্ব্বশেষে আমরা বালব্রহ্মচারী-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় উপস্থিত হইলাম। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড হইতে

একটী সরল রাজপথ গঙ্গার ধারে ধারে হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া কনখল অভিমুখে গিয়াছে। সেই রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে এই পাঠশালাটী অবস্থিত। সুন্দর উদ্যান-মধ্যে অধ্যাপনা-মন্দির ও ছাত্রাবাস। প্রাঙ্গনে একটী যজ্ঞ-বেদী, উহার উপরে গোলাকার-চূড়াযুক্ত তৃণময় আচ্ছাদন। বালব্রহ্মচারী স্বয়ং একাদশী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটী হোমের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। চারিদিকে চারিজন ব্রতী অধ্যাপক সুমধুর স্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন, ব্রহ্মচারী আহুতি প্রদান করিতেছেন। তর্কশাস্ত্রী এবং আমি উপস্থিত হইলে একজন অধ্যাপক সংস্কৃত ভাষায় আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, প্রশস্ত সতরঞ্চে গিয়া আমরা বসিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল। পণ্ডিতগণ আসিয়া বসিলেন। তাঁহারা কেবল ব্যবস্থাপত্রখানি পাঠ করিতেছেন এমন সময়ে বালব্রহ্মচারী সেখানে আগমন করিলেন। পণ্ডিতগণের মুখে শুনিলাম বালব্রহ্মচারীর বয়স অশীতি বর্ষের ন্যূন নহে, কিন্তু দেখিলে মনে হয় প্রৌঢ় বয়সে কেবল উপনীত, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ হইতে যেন জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। তিনি হিন্দীতে বলিলেন "ও কি করিতেছেন, উহাদের নিকট শাস্ত্রের কথা কি বলিতেছেন, উহারা কি পণ্ডিত? না, না, উহারা পর্দাকা নফর হ্যায়, ঘরমে বাইজীকা পাওমে তেল লাগাতে হৈঁ, হিঁয়া বেদান্ত পড়াতে হৈঁ।" ফলকথা, বালব্রহ্মচারী স্বয়ং অকৃতদার, তিনি ইচ্ছা করেন, পৃথিবীর সকল লোকই অকৃতদার হইয়া থাকুক, বিবাহিত লোকের উপর তিনি বড় চটা, অনেক রাজা এবং ধনী তাঁহার ভক্ত, ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এক-একজন অধ্যাপককে মাসিক ২৫৲ ৩৫৲ টাকা বৃত্তি দেন। যখন তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া আসেন তখন বিবাহিত কি অবিবাহিত বলেন না, দুই এক মাসের পরই গলির মধ্যে একটা একতালা ঘর খোঁজেন। ব্রহ্মচারী বলেন "তোমরা বেদ বেদান্ত পড়িয়াছ, পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছ, তোমরা কেন রমণীর দাসত্ব কর, তোমরা বৃত্তি লও, খাও খেলো ও মৌজমে রহ।" প্রকৃত পক্ষেও ব্রহ্মচারীর আশ্রমটী বড় শান্তিময়, নিকটে লোকালয় নাই, পূর্ব্বদিক্ দিয়া ভাগীরথী কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া দ্রুতগমন করিতেছেন, পাঠশালায় বসিয়াই গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ঐ পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী প্রভৃতির স্বাক্ষর লইয়া সায়ংকালে প্রত্যাগমন করিলাম

আমি হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলে এই ব্যবস্থা-পত্রের মূল ইংরাজী অনুবাদ সহ স্বর্গীয়া রাণী রাসমণিদাসীর বর্ত্তমান দৌহিত্র কলিকাতা ইটালির জমিদার শ্রীযুক্ত বলরামদাস মহাশয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে বলি উঠাইয়া দিবার জন্য আবেদন করেন। অনেক বাদানুবাদের পর মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এই মীমাংসা হইয়াছে যে "রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যখন যাঁহার দেবসেবার পালা উপস্থিত হইবে, তাঁহার ইচ্ছা ও ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে তিনি সেবা সম্পন্ন করিতে পারিবেন।" এই মীমাংসার পর সর্ব্বপ্রথম গত ১লা বৈশাখ হইতে আগামী ৩১ চৈত্র পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল বলরাম বাবুর পালা, অতএব এই এক বৎসর কাল আর দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দিরে ছাগশিশুর কাতর ক্রন্দন শ্রুত হইবে না, পশু বলির পরিবর্ত্তে জপ যজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা মহামায়ার পূজা অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করি, অন্যান্য সেবকগণও দুর্ব্বল অসহায় জীবগণের প্রতি করুণা প্রকাশপূর্ব্বক এই প্রথা উঠাইয়া দিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী।

বন্যার গান

(পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় লিখিত)

বন্যার জলে দেশ ভাসাইল
ভাঙ্‌ল এবার বাসাখান;
এখন, হাওরের (১) জল ডিঙার কোলে,
ক্ষুধার জ্বালায় যাবে প্রাণ।
পাটের ক্ষেতে পাঁচ হাত জল
ডগাটীও তার করুছে তল,
ধানের ক্ষেতে যায় না দেখা
সবুজ ঘাসের পাতাখান।
এয়িরে এবার বানের টান॥

যখন, মাঠ ডুবাইল ঘাট ডুবাইল,
বস্তীখানাও আধা-ভাসা
তখন মোরা ঘরের ভিটে
টঙি বেঁধে কল্লাম্ বাসা;
হালের ছিল দামড়া-দু'টী (২)
হাঠু জলে গাড়্‌লাম খুঁটি,
বন্ধ করুল জাবর্-কাটা
ফুরাইল রে তাদের আশা!
হায়রে মোরা গরীব চাষা!

(১) পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তৃত মাঠ। উহা বর্ষায় জলে ডুবিয়া সমুদ্রের ন্যায় দেখায়।

(২) দামড়া—বলদ গরু।

দারুণ বাদল পড়ল ছাপি'
চালাখানা মোর ভাস্‌ল এবার জলে,
ছেলে দু'টী মোর—হায়রে কপাল!
রৈল তায় বাদুরের মত ঝু'লে!
ডিঙাখানা হাতের কাছে
বান্দা ছিল মাঁদার গাছে
আণ্ডা-বাচ্চা তু'লে তায়
ভাস্‌লাম অকুল জলে!
এই ছিল এবার কপালে!

হাঠ ঘাট মাঠ বস্তি ভিটা
জলের তলে ডুব্‌ল সবাই
ঢেউটী কোথাও পায় না বাধা
ক্ষুধার জ্বালা কি দিয়ে মিটাই!
বিলের যত গাছ-গাছালি
শালুক্‌-শাপ্‌লা পদ্মের নালি (৩)
তা'ও পড়েছে অগাধ জলে
ডুব্‌ দিলেও ত পাই না রে ভাই!
এবার, পেটের জ্বালা কি দিয়ে মিটাই!

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বন্দীদেবতা *

পাত্র ও পাত্রী।

বলমূর্ত্তি	...	} দেবতার অনুচর।
হঠকার	...	
বিশ্বকর্ম্মা	...	দেবশিল্পী।
প্রমাথী	...	গ্রীক্‌-পুরাণোক্ত দেবতা বিশেষ।
বরুণ	...	স্বর্গ-রাজ্যের আদিম রাজা।
ইলা		
দেবদূত		

সিন্ধুচারিণী অপ্সরাগণ (সাধারণী বাক্)।

[দৃশ্য—সমুদ্র-বেষ্টিত জনহীন পর্ব্বত; গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই]

বলমূর্ত্তি, হঠকার, বিশ্বকর্ম্মা ও প্রমাথী।

(হঠকার ও বলমূর্ত্তি প্রমাথীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আছে।)

বলমূর্ত্তি

এতক্ষণে শাকদ্বীপে; বিপুলা পৃথ্বীর প্রান্তদেশে;
এ মাটিতে কোনো দিন পদাঙ্ক পড়েনি মানবের।
এইবার দেবশিল্পী, সাধ তুমি কর্ম্ম আপনার,—
বাঁধ এ পর্ব্বত-গাত্রে দেবদ্রোহী এই দেবতারে'
দ্যৌপিতার আজ্ঞা-বলে। মূঢ় সে দুশ্চেষ্টা তার কত
নব নর-সৃষ্টি লাগি'! বিধি ঠেলি' স্বতন্ত্র বিধাতা!
বলয়িত শৃঙ্খলের প্রত্যেক বলয় কর দৃঢ়।
অমর সে অগ্নিশিখা,—সমস্ত শিল্পের যাহা আদি
স্বর্গের গর্ব্বের নিধি,—অপহরি' তব গৃহ হ'তে
মর্ত্ত-মানবেরে দেছে; এই তার শাস্তি সমুচিত,—
দেবদল একযোগে করেছে বিধান; ভবিষ্যতে
দেবেন্দ্রের ক্ষমতার আগে শিখিবে সে নম্র হ'তে
হ্রস্ব হবে মর্ত্ত্য-প্রীতি, খর্ব্ব তার হবে বিশ্ব-প্রেম।

বিশ্বকর্ম্মা

হে প্রবল দেবদল, কঠোর বিধান তোমাদের
এইখানে হোক্ সমাধান; বাঁধা তারে নাহি বাঁধে।
অত শক্ত নহে মোর মন, হঠকারে রুচি নাই;
সঙ্কোচে শিহরি ডরে সমধর্ম্মী দেবেরে বাঁধিতে
পর্ব্বতের এ অর্ব্বুদে,—সংক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার এই নীড়ে।
তবু বাঁধি বাধ্য হ'য়ে; দ্যৌপিতার দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ
বিলম্বের নাহি অবকাশ। মর্ম্ম করি' বর্ম্ম-দৃঢ়
এ কর্ম্ম সাধিতে হ'বে মোরে।

হে প্রমাথী! দেবাত্মজ!
অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলজালে তোমারে হে বাঁধি বাধ্য হ'য়ে
এ পর্ব্বতপৃষ্ঠে আমি, নাই যেথা মানুষের স্বর,—
মানুষের মূর্ত্তি যেথা ভেটিবে না আঁখি কোন দিন,—
অসহ্য সূর্য্যের তাপে অনাবৃত রহি' দীর্ঘ দিন
দিনে দিনে কান্তি পুষ্টি হারাবে যেথায়, হে শ্রীমান্
বৈকালের আশাপথ চেয়ে, কতক্ষণে আসিবে সে
মণিময় অঞ্চলে মুছাতে দগ্ধ দিবসের গ্লানি।
রাত্রি, পুনঃ, ফেলিলে নিশ্বাস পর্ব্বতের হিমপৃষ্ঠে
শাদা হ'য়ে যাবে সব ক্ষণেকের তরে, মুহূর্ত্তেকে
সদ্যঃতুষারের স্পর্শে; নিমেষে আবার মিলাবে সে
প্রাচী'র কিরণজালে। নিত্য নব নব যন্ত্রণায়
উঠিবে অস্থির হ'য়ে। মুক্তি দিতে পারে যে তোমায়
সে জন জন্মেনি আজো। মানবের মঙ্গল সাধিয়া
এই ফল। তুচ্ছ করি দেবরোষ এই প্রতিফল।
তবু তুমি দেবাত্মজ। মঙ্গলার্থী মর্ত্ত্য মানবের!
সুরনরে এ মিত্রতা অনুমত নহে দেবতার।
তাই এই নির্ব্বাসন, অতিষ্ঠ অ-নন্দ-লোকে স্থান;
তন্দ্রাহীন, স্বস্তিহীন হাহাকারে কল্পান্ত কাটিবে
তবু ক্ষান্ত হবে নাক' দেবেন্দ্রের চিত্ত ক্ষমাহীন।

বলমূর্ত্তি

ক্ষান্ত হও দেবশিল্পী। অর্থহীন করুণা-উচ্ছ্বাস!
কেন এ বিলম্ব মিছে? ঘৃণা কি কর না তুমি নিজে

---

(৩) শালুক্—একপ্রকার কণ্টকময় জলজ ফল।
শাপ্‌লা—কুমুদ।

* Prometheus Desmotes (or Prometheus Bound), by Æschylus.

দেবের অরুচি এই ঘৃণ্য দেবতারে ?—যে করেছে
কলঙ্কিত দৈবশক্তি, শক্তিমান্ করি' মানুষেরে,—
মর্ত্ত্যে সঁপি দৈবতেজ,—দেব-গর্ব্বে দিয়া জলাঞ্জলি ?

বিশ্বকর্ম্মা

জ্ঞাতিত্বের সখিত্বের বন্ধন সুদৃঢ় বলদেব !

বলমূর্ত্তি

আর দেবেন্দ্রের আজ্ঞা ? জান না কি তার কত বল ?
অমান্য সে পরে কি করিতে ? সে ভয় প্রবল নহে ?

বিশ্বকর্ম্মা

করুণার কমস্পর্শ পৌঁছে নি নির্ম্মম তব প্রাণে।

বলমূর্ত্তি

তোমারি ও করুণার বলে—কোন্ সে লভিল মুক্তি ?
বৃথা শক্তি অপব্যয়ে ইষ্টলাভ হয় না কাহারো।

বিশ্বকর্ম্মা

অরুচি নৈপুণ্যে মোর—অরুচি এ শিল্প-পটুতায়।

বলমূর্ত্তি

বটে ? কিসের অরুচি ? শিল্প তব করিল কি দোষ ?
তোমার নৈপুণ্য নহে আজিকার ব্যসনের হেতু।

বিশ্বকর্ম্মা

তবু ভাবি, ভাল হ'ত অন্যে নিলে এ কাজের ভার।

বলমূর্ত্তি

সুনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্ট সবার ; স্বাধীন দেবেন্দ্র শুধু ;
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সকলেরি কর্ম্মক্ষেত্র গণ্ডী দিয়ে ঘেরা।

বিশ্বকর্ম্মা

সত্য তব জিহ্বায় সারথী, বলিবার নাই কিছু।

বলমূর্ত্তি

হেন দ্বিধা কেন তবে প্রমাথীরে শৃঙ্খলে বাঁধিতে ?
এ দ্বিধা না করে যেন দেবেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ।

বিশ্বকর্ম্মা

প্রস্তুত সমস্ত আছে, ইচ্ছা হয় দেখ নিজ চোখে।

বলমূর্ত্তি

বাঁধ তবে মণিবন্ধে ; সবলে আঁটিয়া দাও হাতে ;
পর্ব্বতে প্রোথিত কর সশৃঙ্খল লৌহ গজালান।

বিশ্বকর্ম্মা

এ পর্য্যন্ত লৌহকীল সুপ্রথিত ; এও অল্প নয়।

বলমূর্ত্তি

হান' জোরে, আরো জোরে ;—শ্লথ হ'য়ে না আসে ক্রমশঃ ;
কৌশলী ও, উদ্ভাবিবে পালাবার অচিন্ত্য উপায়।

বিশ্বকর্ম্মা

দুই বাহু দৃঢ় বদ্ধ ; খুলিবার রাখি নাই পথ।

বলমূর্ত্তি

উত্তম ! বুঝুক্ এবে কত তুচ্ছ শকতি উহার
কত তুচ্ছ কূটবুদ্ধি—দৌস্পিতার প্রভাবের কাছে।

বিশ্বকর্ম্মা

হায় বন্ধু ! অনিন্দ্য ভেব না তুমি এ দণ্ডবিধান।

বলমূর্ত্তি।

ত্বরা কর বিশ্বকর্ম্মা ; বক্ষে ধর জগদ্দল শিলা ;—
দুই পার্শ্বে দাও আঁটি' বজ্রসার গজালান দু'টা।

বিশ্বকর্ম্মা

প্রমাথী !, তোমার ক্লেশে ক্লেশ পাই তোমার দুর্ভোগে।

বলমূর্ত্তি

এখনো হ'ল না সারা ? দেবেন্দ্র-বিরোধী দেবতারে
এখনো জানাও সমব্যথা ? সাবধান, বিশ্বকর্ম্মা !
পরদুঃখে আর্দ্র তুমি,—নিজ দুঃখে কাঁদিয়ো না শেষে।

বিশ্বকর্ম্মা

বড় শোচনীয় দৃশ্য ! দেখ, হায়, বড় ভয়ঙ্কর।

বলমূর্ত্তি

আমি শুধু দেখিতেছি দুষ্কৃতির যোগ্য পুরস্কার।
ত্বরা কর, ত্বরা কর, দাও বেড়ী চরণে উহার।

বিশ্বকর্ম্মা

বেড়ী দিতে হাত নাহি ওঠে ; কেন বল বারম্বার ?

বলমূর্ত্তি

কেন বলি ? কর্ত্তব্য বলিয়া ; উচ্চকণ্ঠে করি আজ্ঞা
ত্বরান্বিত হও তুমি, বেড়ী দিয়া বাঁধ বিদ্রোহীরে।

বিশ্বকর্ম্মা

এই দেখ, বাঁধি আমি ; বিন্দুমাত্র বিলম্ব না হ'বে।

বলমূর্ত্তি

হান জোরে মুদ্গর তোমার কীলকের অগ্রভাগে
বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার,—সূক্ষ্মভাবে দেখিছে যে সব।

বিশ্বকর্ম্মা

যেমনি মূরতি তব তেমনি বচন, দুই রুক্ষ।

বলমূর্ত্তি

ভাল, ভাল, দেবশিল্পী ! সুখে থাক্ মৃদুতা তোমার।
নির্দ্দয় কর্ত্তব্যে আমি ; তা' বলে কর' না তিরস্কার।

বিশ্বকর্ম্মা

নিষ্ঠুর-নৃশংস কর্ম্ম হ'ল শেষ, চল, ফিরে যাই।

বলমূর্ত্তি

এইবার গর্ব্ব কর ধৃষ্টতার দুঃসাহস ল'য়ে—
মর্ত্ত্য মানবেরে দাও দেবত্ব হরিয়া দেবতার।
এখন কে করে রক্ষা ? মানুষ মুকতি দিক্ এসে !
বৃথা তব বুদ্ধির গরব ; কে বাঁচাবে দৈব কোপে ?

(প্রস্থান)

প্রমাথী

হে আকাশ দেব-আত্মা ! ক্ষিপ্রগতি ওহে মরুদ্গণ !
নিত্য-ধারা নদীনদ ! ফেন-হাস্য-সঙ্কুল সাগর !
জীবধাত্রী ওগো পৃথ্বী ! লোকসাক্ষী দীপ্ত দিনকর !

জনে জনে ডাকি আমি সাক্ষী থাক তোমরা সবাই !
দেখ ওগো ! দেখ দেবতার শাস্তি দেবতার হাতে ;
কল্প যুগ মন্বন্তর ধরি কী কঠোরে যাবে দিন,
কী দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটিবে প্রহর, দণ্ড, পল।
বসেছে নূতন ইন্দ্র স্বর্গ-সিংহাসনে ; তার সৃষ্টি
এই বেড়ী, এই-সব কুৎসিত শৃঙ্খল, হা অদৃষ্ট !
ওঠে আজি আর্ত্তনাদ ক্ষুব্ধ মোর ব্যথিত আত্মার
বর্ত্তমান বিচারিয়া,—ভবিষ্যের ভাবী আশঙ্কায়।
কবে পূর্ণ হ'বে কাল ? কবে হবে দুঃখ অবসান ?...
কেন বা জিজ্ঞাসা করি ? দিব্য-দৃষ্টি-বলে দেখি সব,—
দুর্লক্ষ্য ভবিষ্য হেরি ; অতর্কিতে স্পর্শিতে না পারে
মোরে কোন দুঃখ কভু। দুর্দ্দিনে রহিতে হবে স্থির,
সহিতে হইবে দুঃখ, ভবিতব্য অলঙ্ঘ্য যখন
তখন প্রচেষ্টা মিছা ; মুখরতা মৌনীতা সমান
মর্ত্ত্য মানবের লাগি' বক্ষে বহি এই দুঃখভার ;
শূন্য-গর্ভ শমী-শাখে গোপনে রাখিয়া অগ্নিশিখা
সমস্ত শিল্পের যাহা আদি স'পিয়াছি মানুষেরে,—
সেই তুচ্ছ অপরাধে, নিদারুণ এই শাস্তি মোর—
শৃঙ্খলিত নির্ব্বাসিত বিজন পর্ব্বতে সুদুর্গম
বৃষ্টি রৌদ্রে অনাবৃত। হা ধিক্ ! হা ধিক্ হায় !...
ও কি ও ? কিসের ধ্বনি ? কিসের এ সুরভি নিশ্বাস
পরশিছে—পশিছে অন্তরে ? মর্ত্ত্য বা অমর হও,—
কিম্বা হও পিতৃলোকবাসী,—আমার দুঃখের সাক্ষী,—
যে এসেছ এ পর্ব্বতে,—দেখে যাও বন্দী দেবতারে
—দেবেন্দ্রের ঘৃণাপাত্রে,—দেবসভা-সভ্যের অরুচি
দেখে যাও,—দণ্ডিত দেবতা—মানুষের হিত সাধি'।
আহাহা ! এসেছে কাছে ! দোলে হাওয়া মুহুর্মুহু কার
পক্ষবিধুননে যেন ; কে আসে কী মনে করি', হায় !
আজি শুধু শঙ্কা জাগে নিগৃহীত বন্দীর হিয়ায়।

সাধারণী বাক্

ত্যজ সংশয়, নাই ওগো নাই ভয়,
আমরা বন্ধু বৈরী তোমার নয় ;
পিতার কথায় এসেছি এ গিরি-চূড়ে,
লঘু দুটি পাখা মেলিয়া এসেছি উড়ে।
গুহাতলে ছিনু ; শিকলের শুনি ধ্বনি
ছুটিয়া এসেছি মনে পরমাদ গণি'।
দ্রুত আসিয়াছি,—আসি নি পাদুকা পরি'
সে কথা এখন বলিতে সরমে মরি।

প্রমাথী

হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! কি আর বলিব বল্
চির-যৌবনা ! চির-কুমারীর দল !
অথির লহর নিতি যার আসে ধেয়ে,—
তোরা অপ্সরা,—সেই সাগরের মেয়ে ;
এই দিকে আয়,—দেখে যা আমার দশা
শিকল বেড়ীতে সকল শরীর কশা।
বন্দী হইয়া পাহাড়ে পাহারা আছি,
এ পদ কখনো লয় নাই কেহ যাচি।

সাধারণী বাক্

আহা ! বটে বটে, দেখেছি বুঝেছি সব,
আঁখি ভ'রে আসে বরষার বৈভব ;
অঙ্গে তোমার বজ্র-শিকল দেখে
দৃষ্টির সীমা ছেয়ে আজ আসে মেঘে।
বাহুতে চরণে বেড়ী সে ধরেছে আঁটি'
রৌদ্রে, বাতাসে, হিমে হয় দেহ মাটি।
স্বর্গে এখন হয়েছে নূতন রাজা,
তাঁহার নিয়মে কথায় কথায় সাজা।

প্রমাথী

মৃত্তিকাতলে মৃত্যুর অধিকারে
ক্রোধে সে বাঁধিয়া রেখেছে শিকল-ভারে ;
বেড়ী দেছে পায় রাক্ষসী রোষে রুষি',
শাস্তিতে মোর হয় নি কেহই খুসী।
দেবতা মানব নয়নের জলে ভাসে,
অন্তরীক্ষে শত্রুরা শুধু হাসে।

সাধারণী বাক্

দেবলোকে হেন দেবতা কি কেউ আছে
তোমার দুখে যে দুখী নয় মনোমাঝে ?
তোমার হতাশ মুরতি নিরীক্ষণে
রুদ্র পুলক জেগে যার ওঠে মনে ?
—ছাড়ি দেবরাজ—এমন কি কেউ আছে
সমবেদনায়—চক্ষু না তিতিয়াছে ?
দেবরাজ শুধু শাসিবারে দেবদলে
শাস্তিবিধান করেন শাসন-ছলে।
এমনি শাসন পেষণ চলিবে, চলিবে এ বাড়াবাড়ি,
যতদিন কোনো নূতন শকতি দণ্ড না লয় কাড়ি'।

প্রমাথী

একদিন হেথা তাঁরেও আসিতে হ'বে
শাসিছেন যিনি গরবে দেবতা-সবে।
মন্ত্রণা-তরে হবে হেথা আগমন
টলিবে যেদিন স্বর্গ-সিংহাসন।
হেরি ভবিষ্য দিব্য-দৃষ্টি-বলে
সে দিন আমারে ভোলাতে নারিবে ছলে ;
তুচ্ছ করিব ভ্রূকুটি, মিষ্ট কথা,
ইন্দ্র-পাতের সুগোপন যে বারতা
বলিব না তাঁরে ; যে অবধি নিজ করে
বেড়ী না খোলেন, আমার তুষ্টি-তরে ;

ক্ষমা না চাহিলে অনুতাপানলে দহি'
শান্ত হ'বে না পরাণ, দিনু এ কহি'।

সাধারণী বাক্

পরাণে তোমার অসীম সাহস জাগে,
দীপ্ত তোমার হৃদয় রোষের রাগে ;
স্বাধীন তোমার জিহ্বা,—বাখানি তারে,—
বল্গা না মানে,—ঘৃণা করে কুণ্ঠারে।
বিপদ-বিষাদ-বেদনার বশ নয়,
আমরা কোমলা,—আমাদের ভয় হয় ;
নূতন বিপদ সাধ ক'রে ডেকে আনা
স্বর্গপতির ক্রোধ বাড়ে,—করি মানা।

প্রমাথী

বাড়ুক্ সে ক্রোধ—নম্র হইতে হবে
অত্যাচারীর আসন টলিবে যবে ;
অবজ্ঞা-ভরে অপরের অধিকারে
যিনি দ্যান্ হাত, ফল পেতে হবে তাঁরে ;
ঝঞ্ঝা উঠিলে উদ্ধত ওই শির
হবে অবনত ; নড়িবে টনক স্থির।
বলের দর্পে যে করিছে অপমান
টুটিলে প্রভুতা দিবে সে প্রভূত মান ;
ক্রোধের আগুন সলিলে ডুবায়ে, তবে,
'বন্ধু' বলিয়া আমারে সাধিতে হবে।

সাধারণী বাক্

বটে, বটে, আহা !...বল তুমি...বল এবে
কোন্ অপরাধে এ দশা ? না পাই ভেবে।
কেন এ শাস্তি ? বল আমাদের আগে
বলিতে তা' যদি অধিক ব্যথা না জাগে।

প্রমাথী

বর্ণিতে সে ব্যথা পাই, ফুটিয়া না কহিলেও ব্যথা ;
উভয় সমান মোর,—দুই দিকে যন্ত্রণা সমান।
স্বর্গে যবে তর্ক ওঠে—বিদ্রোহের বিষম জল্পনা
যবে চক্রী দেবদল চক্রান্ত করিয়া শনৈশ্চরে
করি' সিংহাসন-চ্যুত, দেবেন্দ্রে চাহিল রাজ্য দিতে
হঠকার-সহকারে, কেহ পুনঃ খড়্গহস্ত হ'য়ে
দাঁড়াইল—দেবেন্দ্রের বর্দ্ধমান ক্ষমতা-বিরোধী,
তখন কহিয়াছিনু আমি, অকর্ত্তব্য হঠকার।
সে মন্ত্রণা মানে নাই কেহ, কেহ করে নাই গ্রাহ্য,
বলদর্পে দর্পিত সংসার ; সবে কহে, কেড়ে লব ;
বহুপূর্ব্বে এই ভাবী কথা, শুনেছিনু মাতৃমুখে ;
অদিতি জননী মোর বহুবার বলেছেন মোরে,—
স্বর্গরাজ্য প্রাপ্য কভু নহে হঠকারে ; সুকৌশলে
সুলভ সে চিরকাল। কহিলাম যবে এ বচন
পরম অবজ্ঞাভরে চাহিল না কেহ মোর পানে।

কি কর্ত্তব্য অতঃপর ? লইলাম পক্ষ দেবেন্দ্রেরি।
আমারি মন্ত্রণা-বলে, পূর্ব্ব-ইন্দ্র রসাতলে আজি,
নিরুদ্ধ স্বগণ সহ, এই দেখ তার প্রতিদান,—
শিরোপা দিয়েছে শাস্তি উপকৃত স্বর্গের কুরাজা !
আশ্চর্য্য !...আশ্চর্য্য কিবা ? পররাজাহারীর হৃদয়ে
নিঃশ্বসিছে নিশিদিন অমেধ্য অশুদ্ধ—অবিশ্বাস,—
ম্লান করি'—নষ্ট করি' পূর্ব্বকৃত উপকার-স্মৃতি।
জিজ্ঞাসিছ—'হেন শাস্তি কেন মোরে দিল ?' কহি শোন
সিংহাসনে আরোহিয়া বহুমান করিল বিধান
স্বগণ দেবতা-গণে ; সুদৃঢ় করিতে রাজ্যপদ,।
কিন্তু দুঃখী নরকুলে কোনো বর দিল না কৃপণ ;
কহিল সে, ধ্বংসি' নরে নবজীব করিব সৃজন।
এ কথার প্রতিবাদ আমি ভিন্ন করিল না কেহ।
সাহসে নরের পক্ষ লয়ে,—রক্ষিনু বিনাশ হ'তে—
দুর্ভাগা অজ্ঞের দলে। তার ফলে এই শাস্তি মোর
সহনে যা সুদুঃসহ, দর্শনে যে অতি-ভয়ঙ্কর।
মানুষেরে কৃপা করি' কৃপার অযোগ্য হয়ে গেছি।
আছি গিরি-পৃষ্ঠে বাঁধা দেবেন্দ্রের কুকীর্ত্তির ধ্বজা।

সাধারণী বাক্

দুঃখ দেখি' গলিবে না দেবেন্দ্রের বজ্রসার হিয়া ;
গঠিত অন্তর তাঁর বজ্র-শিলা-লৌহ-উপাদানে।
দুঃসহ তোমার ক্লেশ দেখিতে না পারি মোরা হায়,
দেখিয়া ব্যথিত হিয়া আকুলি-ব্যাকুলি শুধু করে।

প্রমাথী

এ দৃশ্যে বেদনা পায় শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের মন।

সাধারণী বাক্

এই তব অপরাধ ? আর কিছু ছিল না কি দোষ ?

প্রমাথী

মানুষের অদৃষ্টে রেখেছি দৃষ্টির বাহিরে তার।

সাধারণী বাক্

ক'রেছ রোগের শাস্তি—এর চেয়ে সান্ত্বনা কি আর ?

প্রমাথী

প্রেরিয়াছি অন্ধ আশা মানবের হৃদয়-মন্দিরে।

সাধারণী বাক্

করিয়াছ উপকার মৃত্যুভীত মানব-কুলের।

প্রমাথী

আরো আছে ; অগ্নি-মন্থনের মন্ত্র শিখায়েছি নরে
দয়াবশে।

সাধারণী বাক্

মৃত্যুধর্ম্মী করে ভোগ দীপ্ত দিব্যদান ?

প্রমাথী

তার বলে করিবে সে নব নব শিল্প উদ্ভাবন।

সাধারণী বাক্

এই তব অপরাধ ? এরি লাগি' দেবেন্দ্রের রোষ ?
এই মর্ম্মন্তুদ ব্যথা অবিশ্রাম ভুঞ্জ এরি তরে ?
শাস্তির কি নাহি সীমা ? নাহি ছেদ ? নাহি উপশম ?

প্রমাথী

মন হয় মুক্তি দিবে ; নহিলে এমনি যাবে দিন।

সাধারণী বাক্

মন তার কে ফিরাবে ? কে পারে তা'? কোনো আশা নাই?
দোষী তুমি, ভুল নাই ;—যদিও তা বলা নাহি সাজে
আমাদের ; মুখে বাধে, মনে বাজে বলিতে ওকথা ;
আর বলিব না 'দোষী'। ভুলে যাও, ফেলেছি যা' ব'লে।
হে প্রমাথী ! দেখ দেখি ভেবে, কিসে হয় উপশম
এই তব যন্ত্রণার ? কিসে হয় নিবৃত্তি দুখের ?

প্রমাথী

দুঃখের কণ্টক-জাল পায়ে গায়ে জড়ায়নি যার
কী সহজ তার পক্ষে বিপন্নেরে উপদেশ-দেওয়া !
অদৃষ্টে যে এত আছে,—আগে হ'তে জানিতাম তাহা ;
স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ,—মানবেরে দেবত্ব প্রদান,—
এ সব তাহারি ফল। যেচে নিছি দণ্ড নিজ শিরে।
সব জানিতাম আমি,...তবু, হায়, পারিনি জানিতে
ত্রিশূন্যে রহিতে হবে পর্ব্বতের অর্ব্বুদে ঝুলিয়া,—
জলহীন মরুমাঝে তিলে তিলে হবে তনুক্ষয়।
হা ধিক ! হা ধিক ! হায় ! কিন্তু বৃথা শোক,...শান্ত হও ;
কাতর হ'য়োনা, মোর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হেরিয়া।
গিরির অপর পৃষ্ঠে আছে মোর ভবিষ্যৎ লেখা,—
দেখে এস অবতরি'। রাখ এই মিনতি আমার
মরমী তোমরা সবে, আমার ব্যথার ব্যথী হও ;
মর্ম্মাহত ক্লিষ্ট আমি সমবেদনার বাঞ্ছা করি।
দুঃখ জোয়ারের জল,—ফুলিয়া ফুলিয়া সদা চলে,—
নব নব হৃদয়ের তট খুঁজে খুঁজে নিশিদিন।

সাধারণী বাক্

অনিচ্ছুক নহি মোরা যেতে ; রাখিব তোমার কথা।
চলিলাম লঘু পদে স্বচ্ছ সমীরের ক্ষেত্র দিয়া
পক্ষী সম পাখা নাড়ি। এই মোরা উত্তরিনু এসে
তোমার নির্দ্দিষ্ট ঠাঁয়ে ; জানিবারে তব ভাগ্য-কথা।

(বরুণের আবির্ভাব)

বরুণ।

হে প্রমাথী আসিয়াছি আমি,—তরঙ্গ-তুরঙ্গে চড়ি ;—
লাগাম না পরে তবু হুকুম যে মানে সেই অশ্বে,—
আসিয়াছি তব পাশে ; সমব্যথা জানাতে তোমায়।
টেনেছে রক্তের টান, রহিতে নারিনু স্থির হ'য়ে।
দেবতার দুর্দ্দশায় উদাসীন রহিব কেমনে
দেবতা হুইয়া আমি ; চাটুবাণী এ জিহ্বা জানে না ;
যাহা কহি, করিয়ো প্রত্যয় ;—কহি সে অন্তর হ'তে।
প্রিয় বন্ধু তুমি মোর ; কহ মোরে কী করিতে হবে
তোমার মঙ্গল-হেতু ; তব তরে সর্ব্ব শক্তি মোর
নিয়োগ করিব আমি ; শুনিতে না হয় যেন কভু
বন্ধুনিষ্ঠ আছে কেহ বৃদ্ধ এই বরুণের চেয়ে।

প্রমাথী

হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! হায় !...হে বরুণ ! কেন তুমি হেথা ?
এসেছ দেখিতে ক্লেশ ? কেমনে বা এলে সিন্ধু তাজি,—
তাজি তব গুহা-গুম্ফা প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত ?
কেন বা আসিলে বন্ধু লৌহ-লিপ্ত পর্ব্বতের 'পরে ?
এসেছ জানাতে ব্যথা ? এস বন্ধু, দেখে যাও চোখে
দেবেন্দ্রের বন্ধুর দুর্দ্দশা ; দেখ তাঁর বন্ধুপ্রীতি !
যাহার সাহায্য-বলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তাহার
সেই আজি অবনত কৃতঘ্নের জঘন্য পীড়নে।

বরুণ

দেখেছি, বুঝেছি সব, বলিবারে চাহি কিছু এবে ;
প্রমাথী ! মনস্বী তুমি, বুঝে চল দেবেন্দ্রের মন।
আপনারে জান তুমি, জান তুমি আপন ক্ষমতা,
বুঝে চল। চল, বন্ধু, নূতন ইন্দ্রের মন বুঝে।
ইন্দ্রের আসন উচ্চে ; তবু যদি পৌঁছে তার কানে
তোমার পরুষ ভাষা,—জাগে যদি রুদ্র রোষ তার,—
তবে সে এমন শাস্তি দিবে,—বর্ত্তমান এ যন্ত্রণা
যার তুলনায় খেলা। নিগৃহীত তুমি স্বস্তিহীন
বাড়ায়োনা নিজ শাস্তি ; চিন্তা কর মুক্তির উপায় ;—
কুবচনে কিবা কাজ ?—স্পর্দ্ধা বলি' মানিবে সে লোকে।
হয় তো ভাবিছ তুমি—'নির্জীব বৃদ্ধের উপদেশ',—
অগ্রাহ্য কোরো না বন্ধু বহু দুঃখ জিহ্বা-কণ্ডূয়নে।
নিত্য-ঋজু চিত্ত তব নম্র হ'তে শেখেনি দুর্দ্দিনে,—
দুঃখমাঝে করি বাস হয়তো নূতন দুঃখ চাও,
তবু ধর বাক্য মোর,—কণ্টকে করনা পদাঘাত,
বিঁধিবে সে নিজ পায়ে। সুকঠোর দ্যৌষ্পতির মন
নহে সে কাহারো বশ। শান্ত হও, ক্ষান্ত হৌক্ ভাষা।
চলিলাম দেবলোকে, উদ্ধারের উপায় দেখিতে ;
দেখি, যদি চেষ্টাবলে পারি দিতে অব্যাহতি তোমা'
এই যন্ত্রণার হাত হ'তে। থাক বন্ধু শান্ত হ'য়ে
পরুষ বচন ত্যজি'। জ্ঞানী তুমি, তুমি কি জান না ?—
রসনার আস্ফালন সর্ব্ব বিপদের অগ্রদূত।

প্রমাথী

ভাগ্যবান্ তুমি বন্ধু ! মম চির-কর্ম্ম-সঙ্গী হ'য়ে
মুক্ত তবু আছ দোষে। ত্যজ বন্ধু আমার ভাবনা,—
করিয়ো না বৃথা চেষ্টা, ফলোদয় হবে না তাহাতে ;

অমোঘ ইন্দ্রের আজ্ঞা, টলিবে না নিয়ম তাহার ;
মিছে কেন যাবে সেথা, হয়তো বিপাকে যাবে পড়ি।

বরুণ

বুদ্ধি তব বহির্মুখী—পরের বেলায় দিব্য খোলে,
অবুঝ নিজের বেলা শুধু। বারণ কোরোনা মোরে
দেবলোকে যাই আমি, আশা আছে হব সিদ্ধকাম,
দেবেন্দ্রে প্রসন্ন করি, লব তব মুক্তিবর মাগি'।

প্রমাথী

সাধু! তব ইচ্ছা সাধু; শুভার্থী-সুহৃদ্ তুমি মোর,
ও কথা ভুলিয়া যাও, দেবলোকে হবেনাক' যাওয়া ;
বৃথা চেষ্টা মোর লাগি, বৃথা শ্রম, হবে নাক' লাভ ;
যা আছে অদৃষ্টে হোক, ইন্দ্রে তুমি যেয়োনা সাধিতে ;
দুঃখ সে আমারি থাক, অংশ তার চাহিনাক' দিতে।

বরুণ

অনন্ত নাগের কথা আজ শুধু মনে ওঠে মোর
স্বর্গ মর্ত্ত্য স্কন্ধে যে বহিছে অহর্নিশি,—গুরুভার।
দুঃখ হয় দেখে তারে, একদিন শতশীর্ষ তুলি
যুদ্ধ যে করেছে ভয়ঙ্কর—দেবেন্দ্রের বিপক্ষেতে।
সর্প-জিহ্বা মেলি হায় করিয়াছে গরল-উদ্গার
সৃষ্টিনাশা,—অগ্নি-চক্ষে চাহিয়াছে স্বর্গ দহিবারে,—
আজ সেই নষ্টবীর্য্য, রয়েছে নজর-বন্দী হয়ে।

প্রমাথী

বিজ্ঞ তুমি বন্ধুবর, তোমারে কী শিখাইব আমি ?
সব জানো, সব বোঝো ; বিপন্ন কোরো না আপনারে।
সহিতে পারিব আমি ধৃষ্ট অদৃষ্টের নির্য্যাতন
যতদিন দেবেন্দ্রের উপশান্ত নাহি হয় ক্রোধ।

বরুণ

জান না কি রুষ্ট জনে মিষ্ট কথা পরম ঔষধ ?—

প্রমাথী

কৌশলে প্রযুক্ত হ'লে ;—নহিলে বাড়ায় শুধু রোষ
ক্ষোভে স্ফীত হৃদয়ের।

বরুণ

চেষ্টায় কী আছে দোষ ?
চেষ্টার কী ক্ষতি বল ?

প্রমাথী

মিথ্যা শ্রম মর্য্যাদার হানি।

বরুণ

তাই হোক। জ্ঞানীজন রহে যবে অজ্ঞের মতন
তখনি সে বড় কাজ করে ; যাই আমি দেবলোকে।

প্রমাথী

সবাই ভাবিবে মনে, এ কেবল আমারি কৌশল।

বরুণ

এ বড় দারুণ কথা ; ফিরে যেতে হ'ল সিন্ধুতলে।

প্রমাথী

মোর লাগি কোরো না শোচন, রুষ্ট হবে দেবরাজ।

বরুণ

স্বর্গের নূতন ইন্দ্র ?

প্রমাথী

সাবধান! পাবে সে শুনিতে।

বরুণ

যা' বলেছ ; তোমার শাস্তির স্মৃতি সতর্ক করিবে।

প্রমাথী

যাও তবে, থেক সাবধান ; মতি যেন থাকে স্থির।

বরুণ

যাই তবে ; গতিবেগ বাড়ে মোর তোমার কথায়।
উদ্যত তুরঙ্গ মোর এরি মধ্যে মেলিয়াছে পাখা
সাঁতারিতে বায়ুস্রোতে, আরামে ফিরিতে মন্দুরায়।

(প্রস্থান)

সাধারণী বাক্

তোমার লাগিয়া হুতাশে নিশাস পড়ে,
বুকের ভিতর প্রাণ যে কেমন করে ;
তোমার লাগিয়া নয়নে বহিছে ধারা
জল-ভর-ভারে বর্ষা-নদীর পারা।
মৃদু শাসনের ইন্দ্র না ধারে ধার,
কঠিন তাহার হৃদয় বজ্রসার ;
দুঃখে দহিয়া খাঁটি করি' লয় মন,
অনাস্বাদিত দুখে দহে দেবগণ।
ধরণী ব্যাপিয়া উঠিয়াছে কোলাহল
অন্তঃকোপে অস্ফুট-বিহ্বল ;
চারিদিকে শুধু প্রাচীন মানের হ্রাস,
বদন-ব্যাদান করিছে সর্ব্বনাশ।
তুমি গুমরিছ দুখের প্রহর গণি
এশিয়ার বুকে উঠিছে প্রতিধ্বনি।
আরব দেশের গ্রামে গ্রামে ওঠে গাথা
শাকদ্বীপের ব্যথা দিয়া যাহা গাঁথা।
হেথা তুমি, হোথা বলী অনন্ত নাগ,
পিয়ে দেবতার রোষের গরল-ভাগ ;
অত বল নিয়ে বহিয়া মরিছে বোঝা,
অবসর নাই, না পায় হইতে সোজা।
উচ্ছ্বসি কাঁদে নদীনদ তার দুখে,
ঢেউ আছাড়িছে প্যারাবার ফেনমুখে,
আঁধার পাতাল আঁধার করেছে মুখ,
শুধু হাহাকার, কারো মনে নাই সুখ।

প্রমাথী

গর্ব্বী বলে মৌনী নহি, হে সুন্দরী! কিশোরী! অপ্সরী!
অত ক্ষুদ্র নহে মন ;—গর্ব্বী ব'লে নহি নিরুত্তর।

এই নির্ব্বাসন-ব্যথা আমারে করেছে মুহ্যমান।
এই নব্য দেবদল,—প্রতিষ্ঠিত আমারি চেষ্টায়,—
আমারেই দেয় পীড়া! জান সব.......কি ক'ব বিবরি?
জান সবে মানবেরে? আমি তারে মনস্বী করেছি,—
জ্ঞানদীপ চিত্তে তার জ্বালি,—ছেদিয়াছি অন্ধকার।
নরের করি না নিন্দা; দীন দেখি' হয়েছিল দয়া;
অপূর্ণে করেছি পূর্ণ আপনার বিভূতি প্রদানে।
চক্ষু কর্ণ সব ছিল,—দেখিত শুনিত নরজাতি,
সব কিন্তু স্বপ্ন সম, ছায়া সম ভাতিত সংসার
অসম্বদ্ধ, অর্থহীন। জানিত না গৃহের নির্ম্মাণ,—
জন্তু ছিল,—গুহাবাসী। জানিত না, বর্ষ, ঋতু, মাস,
বসন্ত কুসুম-গন্ধী, পক্কফল-সমৃদ্ধ নিদাঘ
চিনিত না; অসম্বদ্ধ কার্য্যে তার না ছিল শৃঙ্খলা।
আমি তারে শিখায়েছি চন্দ্রমায় মাসের ইঙ্গিত,
সুশৃঙ্খল সব কাজ নক্ষত্রের উদয়াস্ত হেরি।
শিখায়েছি বর্ণমালা, শিখায়েছি গণিত-বিজ্ঞান,
ধৃতি দিছি ধরিয়া রাখিতে হৃদয়ের পটে বিদ্যা;
স্মৃতি দিছি জ্ঞান-ধাত্রী। মোর মন্ত্রে বৃষ তার বশ,
সহকর্ম্মী মানবের! মোর মন্ত্রে অশ্ব বহে এবে
বায়ুগতি রথ তার। নৌগঠন শিখায়েছি আমি,
হালের পালের বলে সিন্ধুজয়ী করিয়াছি নরে।
দিনে দিনে করেছি মানবে সর্ব্ব-বিদ্যা-বিভূষিত।
এত বিদ্যা এত বুদ্ধি লয়ে বন্দী হ'য়ে আছি বসে;
নাহি শুধু সেই বিদ্যা—নিজে যাহে মুক্ত হ'তে পারি।

সাধারণী বাক্

আচ্ছন্ন তোমার মন, মতিভ্রমে দুঃখের উদ্ভব;
বৈদ্য যেন ব্যাধিগ্রস্ত, ঔষধ না পিয়ে চিত্ত তব।

প্রমাথী

শোনো আগে সব কথা;—হ'তে হবে বিস্মিত নিশ্চিত;
কত বিদ্যা সৃজিয়াছি,—আয়ুর্ব্বেদ আবিষ্কার মম।
পূর্ব্ব কালে ব্যাধি হ'লে মৃত্যু ছিল মুক্তি মানুষের,
না ছিল যন্ত্রণাহারী প্রাণপ্রদ অরিষ্ট আসব
না ছিল ভেষজজ্ঞান। আমি নরে চিকিৎসা শিখায়ে
প্রলেপ দিয়াছি ক্ষতস্থানে। মৃগয়ার মৃগ সম
ব্যাধিরে বিঁধিছে তীক্ষ্ণ বাণে অহর্নিশি নরকুল।
শিখায়েছি সামুদ্রিক, শিখায়েছি শাকুন্ত-বিদ্যায়,
স্বপ্নে এবে অর্থ খোঁজে—অর্থ খোঁজে পাখী উড়ে গেলে।
যজ্ঞে পশু দিয়া বলি শিখায়েছি ছেদিতে তাহায়
ভাগে ভাগে; বুক, ক্লোম, অন্ত্র, পিত্ত, পশুকা বিভেদে
শিখায়েছি কোন্ অংশে কোন্ দেবতার বাড়ে প্রীতি।
শিখায়েছি খনিবিদ্যা, স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহের ব্যাভার।
মানবের হাতে দিছি ধরিত্রীর ভাণ্ডারের চাবী।
গর্ব্বীরা করুক গর্ব্ব; আবিষ্কার সকলি আমার;
প্রমাথী পৃথিবী মথি' সর্ব্ব বিদ্যা স'পেছে মানবে।

সাধারণী বাক্

মর্ত্ত্য মানবের প্রীতি সীমা যেন ছাড়ায়ে না ওঠে,
ভুলিয়ো না নিজ দশা,—আছ তুমি কী ঘোর সঙ্কটে
বুঝে চল, বুঝে চল; আশা আছে পাবে পরিত্রাণ;
বন্ধন মোচন হবে, ইন্দ্র সম হবে শক্তিমান্।

প্রমাথী

এ পন্থা আমার নয়, অদৃষ্টের এ'নহে ইঙ্গিত,
অত্যাচারে অপমানে জর্জ্জরিত হবে যবে প্রাণ
তখনি আমার মুক্তি। মিছে যুক্তি, মিথ্যা এ জল্পনা;
"অবশ্য" যাহার নাম সে কি হয় কৌশলের বশ?

সাধারণী বাক্

"ভবিষ্য" কাহার বশ তবে?

প্রমাথী

অদৃষ্ট ভগিনী তিন
আর সে নিঋ'তি—ভবিতব্য এদেরি অধীন, জানি;

সাধারণী বাক্

দেবেন্দ্র কি এদের অধীন?

প্রমাথী

তাঁরো নাই অব্যাহতি।

সাধারণী বাক্

তাঁর তো অনন্ত রাজ্য; কী করিবে অদৃষ্ট তাঁহার?

প্রমাথী

জানিয়া সে কাজ নাই, সুধায়ো না সে কথা আমায়।

সাধারণী বাক্

কেন তাহা লুকাইছ? সে কথা কি এত গোপনীয়?

প্রমাথী

ও আলাপ আর নয়; সময় হয় নি প্রকাশের;
স্বর্গরাজ্য লয়ে কথা,—মন্ত্রগুপ্তি আছে প্রয়োজন;
আমার বন্ধন-মুক্তি,—বিজড়িত সে মন্ত্রণা সাথে।

সাধারণী বাক্

মন যেন মোর নাহি হয় বিদ্রোহী,
বজ্রধর সে বজ্রে না যান্ দহি;
আকাশের রাজা দ্যৌষ্পতি তাঁর নাম
যজ্ঞ-বৃষের শোণিত করেন পান।
তাঁর পূজা-দিনে হব আমি তৎপর
পূজা-উদ্যোগে হইব না মন্থর;
যজ্ঞ-ভবনে প্রলাপ যেন না কহি
তাঁরে ভজি সাধু-সন্ত-সমাজে রহি।
জীবনে যখন আশা আসি' জ্বালে বাতি,—
জয়ের হরষে নয়নের বাড়ে ভাতি।

এ হরষ-ভাতি চোখে কি তোমার জাগে ?
ছিন্ন হয় লোহ হেরি' তোমা' পুরোভাগে।
কণ্ঠে শিকল—মাংসে কামড়ি রহে,—
জানিলে না তবু ভয় যে কাহারে কহে ;
মানুষের লাগি' তুমি অসাধ্য সাধ'
বিপক্ষের আগে বজ্রে হৃদয় বাঁধ।
মিছে উৎসাহ মিছাই তোমার স্নেহ
যাঁর লাগি' সহ—তারা তো দেখে না কেহ ;
স্বল্পায়ু নর—কী করিতে পারে তারা ?
স্বর্গ কাড়িবে—এ আশা কেমন ধারা ?
বাতুলের আশা—বাতাসে রেখ না কাঁদি '—
তোমার দুঃখে আমরা সবাই কাঁদি।
বিষাদের সুর গলিয়া মিলায়ে যায়।
প্রেমের রাগিণী জেগে ওঠে সাহানায় ;
মলিন জগতে অমলিন আলো হাসে,
উজ্জল-বরণী ইলা আসে ! ইলা আসে !

(ইলার প্রবেশ)

ইলা

হা ধিক্ ! কোথায় এনু ?—অনুর্ব্বর বর্ব্বরের দেশে ?
ওগো বন্দী ! ওগো বন্ধু ! ওগো ! ওগো শৃঙ্খল-বেষ্টিত !
বল, মোরে, কোথা এনু ? কুগ্রহ কোথায় লয়ে যায় ?
উহু ! সেই ব্যথা ফের ! সেই মূর্ত্তি ! অগ্নিচক্ষু সেই !
ধরিত্রী ! মা ! ঢেকে ফেল ; অসহ্য করাল দৃষ্টি ওর ;
ঢেকে ফেল অন্ধকারে। মৃত কেন আসে পিছে পিছে ?
মরুপ্রান্তে মারে ঘুরাইয়া ? অনশনে ক্লিষ্ট আমি।
হা ধিক্ ! অভাগী আমি। ভ্রান্তিগুলা মূর্ত্তি ধরে আসে !
ওগো দেব ! স্বর্গপতি ! কি দোষ করেছি আমি তব ?
কেন মোরে দুঃখ দাও ? আতঙ্কে কি ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাব ?
দেবেন্দ্র ! মিনতি রাখ ; একেবারে হত্যা কর মোরে,
জীবন্ত সমাধি দাও, বজ্রে গেঁথে ফেল বজ্রধর !—
ফেলে দাও সিন্ধুজলে—হাঙরের মকরের গ্রাসে।
সুখ হ'তে স্বস্তি ভাল ; বন্ধ কর ভূতের উৎপাত ;—
উদ্ভ্রান্ত এ আবর্ত্তন বসুধার পৃষ্ঠে অবিশ্রাম।

সাধারণী বাক্

শুনিছ ? কে করে হাহাকার ? শুনিছ না নারীর রোদন ?

প্রমাথী

শুনিতেছি, শুনিতেছি ; এণাঙ্ক রাজার কন্যা কাঁদে,—
যার রূপে মুগ্ধ স্বর্গপতি,—কাঁদে সে উদ্ভ্রান্ত চিতে ;
পড়েছে শচীর কোপে ; তাই ফিরে অস্থির হইয়া।

ইলা

ওগো ! এ বিজন দেশে কে উচ্চারে পিতৃনাম মম ?
কই তুমি ? কথা কও ! কে তুমি ? বল তা' দুখিনীরে
কোন্ হতভাগ্য তুমি উচ্চার গোপন সত্য কথা
এই হতভাগিনীর কানে ? জান তুমি ব্যাধি মোর !
যে ব্যাধির তাড়নায় উদ্ভ্রান্ত ফিরেছি দেশে দেশে
অনশনে ; দৈব রোষ খেদাইয়া আসে মোর পিছে।
হা ধিক্ ! কে আছে হেন সহেছে যে মম সম ক্লেশ ?
বল, ওগো ! জান যদি বল, আর কী অদৃষ্টে আছে ?
কী মন্ত্র কী ওষধিতে হবে রুষ্ট কুপিত নিয়তি ?

প্রমাথী

জানিতে যা ইচ্ছা তব, প্রকাশিয়া কহিব সকল ;—
বন্ধুজনে বন্ধু সম ; করিব না হেঁয়ালি-রচনা।
প্রমাথী সম্মুখে তব, মানবের চির-হিতকারী।

ইলা

ওগো মূর্ত্ত বিশ্বপ্রেম ! ওগো চির-নরহিতব্রত !
এ দশা তোমার কেন ? হেন দণ্ড কোন্ অপরাধে ?

প্রমাথী

দুর্ভাগ্যের কথা মোর বলিয়া চুকেছি বহুবার।

ইলা

হে প্রমাথী ! আমারে কি করিবে না তব দুঃখভাগী ?

প্রমাথী

কী শুনিবে ? কর প্রশ্ন।

ইলা

কে তোমারে বেঁধেছে পর্ব্বতে ?

প্রমাথী

দেবেন্দ্রের ইচ্ছা, আর দেবশিল্পী বিশ্বায়ের হাত।

ইলা

অপরাধ ?

প্রমাথী

আর নয় ; শুনেছ যা' যথেষ্ট শুনেছ।

ইলা।

বল তবে, অভাগীর কবে হবে ভ্রমণের শেষ ?

প্রমাথী

না জানিয়া আছ ভাল ; থাক্ ইলা, কাজ নাই জেনে।

ইলা

যে দুঃখ অদৃষ্টে আছে,—বল মোরে কিছু লুকায়ো না।

প্রমাথী

পূরাইব মনস্কাম, কিন্তু অনিচ্ছায়।

ইলা

বিলম্ব কি ?

বল, বল।

প্রমাথী

প্রাণে তব দুঃখ দেওয়া,—দারুণ একাজ।

ইলা

ভাবিয়ো না আমার ভাবনা, ভাল নাহি লাগে।

প্রমাথী

হায় !
বিষম আগ্রহ তব, শোনো তবে ভাবী দুঃখ-কথা।

সাধারণী বাক্

রহ, রহ ; আমরা শুনিব এই দুঃখের কাহিনী
আমরা ব্যথার ব্যথী ; আমাদের কর' না বঞ্চিত।
অতীত দুঃখের কথা বিবরিয়া বলুক বালিকা,
তুমি বোলো ভবিষ্যৎ।

প্রমাথী

রাখ, ইলা ! এই অনুরোধ ;
তোমার সগোত্র এরা, শুনিবার আছে অধিকার।
লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, আত্মজনে দুঃখ-নিবেদনে ;
পাবে তুমি সমব্যথা ; সমবেদনার অশ্রুজল
বিন্দু বিন্দু বিন্দু ঝরি ভরিয়া তুলিবে শুষ্ক প্রাণ।

ইলা

মম সম বিপন্নের অসম্মতি শোভা নাহি পায়।
শোনো তবে পূর্ব্বকথা,—শোনো কহি—কিবা অলঙ্কারে।
বলিতে বিদরে বুক, শুনিতে চেয়েছ সবে, শোনো।
যে ঝড় বহিয়া গেছে মাথার উপরে সর্ব্বনাশা—
আত্মবন্ধু, বিত্ত, রূপ, হরি',—কেমনে বর্ণিব তাহা ?
পিতৃগৃহে রাত্রে নিতি বায়ুদেহী স্বপ্নে কহে আসি'
"ভজ, বালা, দ্যৌস্পতিরে, কতদিন এমন করিয়া
রক্ষিবে যক্ষের ধন ? দেবলোকে তোমার লাগিয়া
নির্ম্মিত বাসরঘর ; স্বর্গপতি চাহেন তোমায় ;
তাঁরে তুমি করিয়ো না হেলা ; পূর্ণ কর বাঞ্ছা তাঁর।"
এমনি সে প্রতিরাত্রে ; পিতারে কহিতে হ'ল শেষে
নিত্য জ্বালাতন হ'য়ে। গ্রহাচার্য্যে পাঠালেন পিতা
দেবতার মন্দিরেতে, জানিতে আমার ভবিষ্যৎ।
কহিল সে ফিরে এসে, "দৈববাণী করেছে আদেশ
মোরে নির্ব্বাসিতে দূরে। নহিলে জাগিবে দেবরোষ।
ধ্বংস হবে রাজ্য, রাজা ; বজ্র হানিবেন বজ্রধর।"
স্নেহশীল পিতা মোর বর্জ্জিলেন মোরে অনিচ্ছায় ;
চলিলাম গৃহহারা, নিরাশ্রয়া নিরালয় বনে ;
লুপ্ত হ'ল রূপ মম, কুণ্টকে ভরিল সর্ব্ব তনু ;
ছুটিনু অস্থির হ'য়ে, ভীমরুল ছুটিল পশ্চাতে ;
সঙ্গে সঙ্গে চলে ছুটি শতচক্ষু দেবতার দূত।
ছুটিলাম বিরাম না মানি, দেশে দেশান্তরে, হায়।
এই সে কাহিনী মোর। ভবিতব্যে আরো যদি থাকে
দুঃখ জ্বালা, অকপটে প্রকাশিয়া বল তা আমায়,
অর্থহীন দয়াবশে বৃথা আশা দিয়ো না, দেবতা !
ঘৃণা করি চাটুবাক্য ; অতথ্য অপথ্য বলি' মানি।

সাধারণী বাক্

আর নয়, আর নয়। ক্ষান্ত হও বিধি-বিড়ম্বিতা !
জনমে শুনিনি কভু আজিকার মত দুঃখ-কথা।
দুর্গতি, দারুণ দুঃখ, মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, সন্তাপ
এক সাথে সন্ধি করিয়াছে, বিফল করিতে যেন !
হায় অভাগিনী ইলা, দুঃখে তোর এখনো শিহরি।

প্রমাথী

এরি মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ? শোনো আগে সমগ্র কাহিনী।

সাধারণী বাক্

বল, বল, হে প্রমাথী ! ভবিতব্য দাও দেখাইয়া ;
ভাবী ব্যথা জেনে গুরু, লঘু হ'বে ব্যথা বর্ত্তমান।

প্রমাথী

শুনিয়াছ পূর্ব্বকথা ; এবে, শোনো, কহি ভবিষ্যৎ।
শোনো এণাক্ষের কন্যা ! কী দুঃখ যে ইন্দ্রাণীর কোপে,
একাগ্র হৃদয়ে শোনো, কর নিজ পন্থা নিরূপণ।
প্রথমে ত্যজি' এ গিরি, যাবে তুমি উপল-বিষম
প্রাচ্য-দেশে ; সেথা হতে ধনুর্ব্বিদ শক-অধিকারে,—
রথ যাহাদের গৃহ। দূরে দূরে রহিয়ো এদের
কাছ হ'তে। তার পর বর্ব্বর সে কৌলবের দেশে,—
শস্ত্র-নিরমাণে পটু ; কিন্তু তারা নহে আতিথেয়।
তার পর ক্ষিপ্রধারা মহানদ-তীরে ;—অগাধ সে,—
যেয়োনা সে পার হতে ; তীরে তীরে যেয়ো ককেশাসে
তুঙ্গ সে পর্ব্বতরাজ,—শিখর নক্ষত্র-কামী যার।
নামিয়া দক্ষিণে তার উত্তরিবে নারীদেশে তুমি,
পুরুষের শত্রু তারা। যত্নে কিন্তু তুষিবে তোমারে
নারী বলি ; আগ্রহে দেখায়ে দিবে পথ। তারপর
এশিয়ায় যাবে তুমি য়ুরোপার ত্যজি অধিকার
কূল যেথা পাবে ইলা ! ইলাবৃত-বর্ষ হবে নাম
তব নাম অনুসারে। দুঃখ দিবে স্বর্গের কু-রাজা।
হায় দুর্ভাগিনী ইলা ! তোমারে যে করিছে কামনা
বড় রূঢ় চিত্ত তার। পীড়া দিবে হ'লে ব্যর্থকাম
জেনো স্থির, এবে শুধু যন্ত্রণার আরম্ভ তোমার।

ইলা

হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! হায় !

প্রমাথী।

এখনি গুমরি' উঠ কেঁদে
করিবে কি বাকী যদি কহি' ?

ইলা

আরো আছে এ অদৃষ্টে ?—

প্রমাথী

দুঃখের সমুদ্র আছে,—অপার অগাধ কূলহীন।

ইলা

কেন তবে বেঁচে থাকা ? ভৃগুপাতে যাক্ এ জীবন
শেষ হোক সব জ্বালা। তিলে তিলে মরণের চেয়ে
মরা ভাল একেবারে, পারিনা সহিতে দুঃখ আর।

প্রমাথী

তবু, ইলা, দুঃখ তব সুদুঃসহ নহে মম সম,
অমর দেবতা করি গড়ে নাই অদৃষ্ট তোমায়,—
মৃত্যু আছে দুঃখহারী। আমার যাতনা অন্তহীন,
যতদিন ইন্দ্রপাত নাহি হয়,—হায়!—ততদিন।

ইলা

হবে তবে ইন্দ্রপাত ? ইন্দ্রের প্রভুত্ব হ'বে লোপ ?
হেন দিন কবে হবে ? খুসী আমি হব ধ্বংসে তার ;
কেন বা হবনা খুসী ? সেই মোর যাতনার মূল।

প্রমাথী

ইন্দ্রপাত সুনিশ্চিত ; বিশ্বাসে আশ্বস্ত হও তুমি।

ইলা

কে সাধিবে সেই কর্ম্ম—কে কাড়িবে রাজদণ্ড তার ?

প্রমাথী

সাধিবে আপনি সেই, বিপরীত বুদ্ধির তাড়নে।

ইলা

কৌতুহল বাড়ে মোর, বল ওগো! বল বিবরিয়া।

প্রমাথী

নারী-হেতু নষ্ট হবে।

ইলা

দেবী না মানবী সেই নারী ?

প্রমাথী

কি হবে জানিয়া তাহা ? সে কথা নহেক প্রকাশের।

ইলা

পত্নী নেবে রাজ্য হরি' ?

প্রমাথী

প্রসবিবে পুত্র পিতৃদ্রোহী।

ইলা

'এ শঙ্কটে নাহি ত্রাণ ?

প্রমাথী

আমারে না মুক্তি দিলে—নাই।

ইলা

ইন্দ্রের আদেশ ঠেলি' মুকতি কে দিবে বা তোমায় ?

প্রমাথী

তোমারি বংশের কেহ, তোমারি সে বংশের সন্তান!

ইলা

আমার ? আমার পুত্র ?—মুক্তিদান করিবে তোমায় ?

প্রমাথী

দশ পুরুষের মধ্যে তৃতীয় যে, সেই।

ইলা

প্রহেলিকা!
আবিষ্টের মত ভাষা, বুঝিতে না পারি আমি কিছু।

প্রমাথী

বুঝিতে চেয়ো না, নারী! কাজ নাই ভবিষ্যৎ শুনি।

ইলা

দয়া করে বলিতে চাহিলে,—সে দয়া লইবে কেড়ে ?

প্রমাথী

কি শুনিবে ? বল তাহা ; দুই কথা নারি প্রকাশিতে।

ইলা

কি কি কথা ? বল ফিরে,—বেছে নিতে দাও অবসর।

প্রমাথী

কহিব কি তব ভাগ্য ? কিম্বা মোর মুক্তির উপায় ?

সাধারণী বাক্

প্রথমটি বল ওরে ; দ্বিতীয়টি শুনিব আমরা।
হে প্রমাথী কথা রাখ, ঠেলনা মিনতি আমাদের,
ইলারে শোনাও,—ওর দুখের যা আছে অবশেষ।
তোমারে কে মুক্তি দেবে,—তার কথা বল আমাদের।

প্রমাথী

এতই আগ্রহ যদি—শোনো তবে, কহিব সকল।
প্রথমে তোমার কথা, ইলা ; যাহা বলি রেখ মনে গেঁথে
পার হয়ে নীল জল দুই মহাদেশের সঙ্গমে
যাবে তুমি পূর্ব্বমুখে, সূর্য্যের পদাঙ্ক দেখে দেখে
পৌঁছিবে প্রান্তরে এক—যেথা রহে যাতুধানী যত
লোলচর্ম্মা, লম্বগ্রীবা ; ভুজঙ্গে কবরী তারা বাঁধে।
সূর্য্যাকর ম্লান সেথা, চন্দ্র সদা অমা-আলিঙ্গনে।
বহুসহোদরা তারা,—হেরে বিশ্ব এক চক্ষু দিয়া,
একদন্তা বিভীষণা। মরে নর তাদের দৃষ্টিতে।
সতর্ক করিয়া দিনু, যেও ত্বরা সে দেশ ত্যজিয়া।
পালে পালে ফেরে সেথা লুব্ধমুখ যমের কুক্কুর,—
কালদংষ্ট্রা যার নাম,—যাবে চলি তাদের এড়িয়া।
বহুদূর যাবে চলি', দ্রুতগতি যেথা নীলনদ
চলেছে দু'কূল প্লাবি, কৃষ্ণকায় মানুষের দেশে
পথ দেখাইবে নদ, চলে যেও নীল ধারা ধরি'।
সেথাই তোমার স্থিতি, হবে সেথা সন্তান সন্ততি
পুষ্ট হবে বংশলতা, বহুশাখা-বিস্তৃত বিশাল।
কহিলাম ভবিতব্য তব, স্পষ্ট তো বুঝেছ সব ?
না বোঝো তো বল মোরে, অবসর আশাতীত মোর।

সাধারণী বাক্

বাকী যদি থাকে কিছু উদ্ভ্রান্ত সে ভ্রমণের কথা,—
বল তবে। নহিলে আরম্ভ কর দ্বিতীয় কাহিনী,—
তোমার নিজের কথা,—আমরা যা' চেয়েছি শুনিতে।

প্রমাথী

বলেছি ইলার কথা,—ভবিতব্য ধরেছি আঁকিয়া ;
উঁহার প্রত্যয় লাগি' কহি কিছু অতীত গণনা,—
সত্য কিনা মোর কথা, মনে মনে দেখুক্ বিচারি'।
শোনো অবহিত মনে। লঙ্ঘি গিরি পৌঁছিলে যখন
দেবস্থান মৌলীশ্বরে—নিত্য যেথা হয় দৈববাণী,—
"ভবিষ্য ইন্দ্রাণী" বলি' সম্বোধিল তোমারে সেথায়
অদৃশ্য কাহার কণ্ঠ। পালাইলে তুমি সেথা হ'তে
ভীত মনে। সেই হ'তে ভীমরুল লাগিল পিছনে।
স্ত্রী-সাগর-তটে এলে,—এবে যাহা তব নামাঙ্কিত।
তারপর এ পর্ব্বতে তব পদার্পণ।—মনে পড়ে ?
তোমার তুষ্টির লাগি' কহিনু এ ভূতপূর্ব্ব কথা ;
প্রাকৃত জনের মত বর্ত্তমান দেখিনে কেবল,
স্পষ্ট ভূত-ভবিতব্য বর্ত্তমান সম মোর চোখে।
এবে শোনো অন্য কথা ; নীল-নদ সাগর-সঙ্গমে
আছে এক মহাপুরী ;—শান্তি তুমি লভিবে সেথায়,
দেবরাজ-কুতূহলী ! দেবেন্দ্রের হস্তের পরশে।
ইন্দ্রের প্রসাদে তুমি কৃষ্ণকায় বীর পুত্র পাবে,
রাজা হবে নীল-ক্ষেত্রে সেই মহাবীর ; তারপর
পঞ্চম পুরুষে তার পলাইবে কন্যা পঞ্চাশৎ
দেশ ছাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে,—পঞ্চাশ ভায়ের তাড়নায়।
রুষ্ট হবে দেবতারা,—তাহাদের ঘৃণ্য আচরণে ;
মরিবে পঞ্চাশ ভাই অন্ধকারে ভগিনীর হাতে।
একজন রবে বাঁচি,—বংশে তার হবে বহু রাজা ;
বিস্তর সে বংশ-কথা, বিস্তারের নাহি প্রয়োজন।
সেই বংশে একদিন জন্মিবে আমার মুক্তিদাতা,—
বজ্র ধরিবারে পটু। সে করিবে বন্ধন-মোচন ;—
শুনিয়াছি মাতৃমুখে ;—মাতা মোর ত্রিলোক-পূজিতা।

ইলা

হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! হায় ! সেই ব্যথা ! সেই অগ্নিশূল !
দ্রাবকের মত জ্বলে বুকে ; ভয়ে মোর কাঁপে হিয়া,
থরথরি ; ঠিকরে আঁখির তারা মুমূর্ষুর মত।
কেবল তাড়ায়ে ফেরে, একদণ্ড হ'তে নারি স্থির !
জিহ্বা নাহি মানে বশ, যন্ত্রণায় হৃদয় প্রলাপী।
(প্রস্থান)

সাধারণী বাক্

"সমানে সমানে পরিণয়ে সুখোদয়"
জ্ঞানী বিবেচক সকলে এ কথা কয়।
ছোট হ'য়ে ভাল নয়কো বড়র আশা,
সে আশা কেবল রাঙা বোলতার বাসা।
কপালে কি আছে ? বলিতে তা কেবা পারে ?
ইন্দ্রের নারী নাহি চাই হইবারে।
ইলারে দেখিয়া মন হ'ল ভয়যুক্ত,
ইন্দ্রাণী রচে সতীন-বধের সূক্ত !
মানুষের প্রেম ইলা করিয়াছে হেলা,
তাই তারে লয়ে দেবতার এই খেলা ;
তাই গৃহহারা ফিরে আজ পথে পথে।
ইন্দ্রাণী তারে ব্যথা দেয় নানা মতে।
আমি যেন খুসী থাকি মানুষের ঘরে,
দেবতারা যেন মোরে না কামনা করে ;
দেবতার সাথে যুঝিতে শকতি নাই,
ইন্দ্রের ছল আমরা কি বুঝি, ভাই।

প্রমাথী

ইন্দ্রের পতন হবে ; দর্প কারো নহে চিরদিন ;
এই লালসার ফলে, গর্ব্বী ইন্দ্র যাবে রসাতলে।
নির্ঋতির অঙ্কে শোবে, পূর্ব্ব ইন্দ্রগণের শাপেতে।
দেবলোকে অপ্রকাশ,—দেবতার অবিদিত ইহা,
অধঃপাতে যাবে ইন্দ্র, সতর্ক করিতে কেহ নাই ;
আমি জানি...আমি পারি।...থাকুক্ উন্মত্ত অহঙ্কারে
বক্রশিখা বজ্র ধরি' নিরাপদ ভাবুক্ নিজেরে,...
কিন্তু ব্যর্থ হ'বে বজ্র...নিবারিতে নারিবে পতন।
আজি সে বলের গর্ব্বে বাড়াতেছে শত্রু চতুর্দ্দিকে
নিজেরে অবধ্য ভাবি ; রুদ্ধ রোষ রুদ্র হ'য়ে ওঠে
দিনে দিনে,—একদা যে ম্লান করি' দিবে বজ্রশিখা,
বরুণের ত্রিদণ্ড খসিবে তরঙ্গের উদ্বেজক—
সেই রুদ্র রোষের সংক্ষোভে। সেই দিন দেবরাজ
বুঝিবেন,...কী প্রভেদ আজ্ঞাদানে...আজ্ঞার পালনে।

সাধারণী বাক্

অন্তর যা' চাহে তব জিহ্বা তব কহিছে তাহাই।

প্রমাথী

অন্তর যা' চাহে মোর,—হবে তাই—তাহাই ঘটিবে।

সাধারণী বাক্

বলিছ কী ? কী ঘটিবে ? ইন্দ্র হবে অন্যের অধীন।

প্রমাথী

লুপ্ত হবে ইন্দ্রপূজা, গ্রাহ্য কেহ করিবেনা তারে।

সাধারণী বাক্

কী কহিছ ? ভয় নাই ? এতখানি দুঃসাহস ?

প্রমাথী

আমার কিসের ভয় ? বিধিবশে মৃত্যুহীন আমি।

সাধারণী বাক্

বৃদ্ধি হবে নির্য্যাতন,—

প্রমাথী

তাই হোক, তাই আমি চাহি।

সাধারণী বাক্

প্রতিবিধিৎসারে যারা মান্য ক'রে চলে,—জ্ঞানী তারা

প্রমাথী

যাও তবে ; কর গিয়ে দেবেন্দ্রের চরণ লেহন
তুষ্ট করি চাটুভাবে কুরগে প্রসাদ ভিক্ষা, যাও !
আমি তারে তুচ্ছ গণি ; অপদার্থ মানি আমি তারে।
স্বল্পায়ু প্রভুত্ব তার—ক'রে নিক পারে যত দিন।
স্বর্গের সাম্রাজ্যগর্ব্ব লুপ্ত হ'তে বেশী দিন নাই।
চিহ্নমাত্র রহিবে না।...দেখ হোথা আসে দেবদূত,—
নব-রাজা স্বর্গ-রাজ্যে...তারি দূত...চির-বশংবদ,...
আসিতেছে এই দিকে, জানি না কি আনে সমাচার।

(দেবদূতের প্রবেশ)

দেবদূত

ওহে পুরাতন ধূর্ত্ত ! দেবদ্বেষী ! স্বর্গের অরুচি !
ঘৃণ্য মানুষের বন্ধু ! অগ্নিচোর অদেয়ের দাতা !
রুষ্ট স্বর্গে দেবরাজ গর্ব্বস্ফীত প্রলাপে তোমার ;—
ইন্দ্র পতনের কথা—কী করিছ জল্পনা হেথায় ?—
খুলিয়া বলিতে হবে, বলিবেনা হেঁয়ালি তোমার ;
হেঁয়ালি না চাহে ইন্দ্র, স্পষ্ট বল ইষ্ট যদি চাও !

প্রমাথী

সাধিয়াছ দৌত্যকার্য্য উচ্চকণ্ঠে মহা আড়ম্বরে
ওহে দূত ! উপযুক্ত ভৃত্য তুমি তোমার প্রভুর।
নূতন প্রভুত্ব তোমাদের। জানি আমি জানি তাহা।
তা'বলে ভেবনা মনে, স্বর্গরাজ্য চির-নিরাপদ ;
জেনো মনে উচ্চ বলি' বেদনার নহে সে অতীত।
এ জীবনে দুইবার ইন্দ্রপাত দেখিয়াছি আমি ;
দেখিব তৃতীয় বার ;—বর্ত্তমান ইন্দ্রের পতন ;—
আকস্মিক উপপ্লবে—ডুবে যাবে অকীর্ত্তি-অতলে।
ভেবেছ কি ভয় করি নব্য এই দেবতার দলে ?
ভুল, ভুল ; মোর কাছে ভয়ে-ভক্তি হবে না আদায়,
বজ্রেও সে শক্তি নাই ; চলে যাও, পেলে তো উত্তর।

দেবদূত

এত দম্ভ ইন্দ্র-আগে ?—দণ্ডও হয়েছে সমুচিত।

প্রমাথী

আমার দুর্দ্দশা ভাল তোমার ও দাস্য-সুখ চেয়ে,
পর্ব্বতের প্রজা শ্রেয় দেবেন্দ্রের পীঠমর্দ্দ হ'তে।
রুক্ষ মান বাক্য মম ?—রুক্ষ সে তোমারি অবিনয়ে।

দেবদূত

দিব্য আছ ! আছ বেশ ! মনে হয় যন্ত্রণায় পাও তুমি সুখ !

প্রমাথী

সুখ পাই ?—শত্রুর এমন সুখ ইচ্ছি' দেখিবারে
ওরে ক্ষুদ্র শত্রু মোর !

দেবদূত

আমারে দুষিছ কি লাগিয়া ?
আমি কি দুঃখের হেতু তব ?

প্রমাথী

বাক্যব্যয়ে নাহি ফল ;
দেবতা—সবাই ঘৃণ্য, অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন সবাই ;
শুভার্থী তাদের ছিনু, তবু শাস্তি করেছে বিধান।

দেবদূত

তুচ্ছ নয় ব্যাধি তব — এ দেখি বিষম বাতুলতা।

প্রমাথী

শত্রুজনে ঘৃণা যদি হয় বাতুলতা,—তাই হোক্,—
হেন ব্যাধি হেন বাতুলতা কামনার নিধি মোর।

দেবদূত

বন্দী বলে ক্ষমা করি ;—নহিলে কে এ দর্প সহিত ?

প্রমাথী

হা ধিক্ !—

দেবদূত

গ্লানির ভাষা ; দেবেন্দ্র না জানে আত্মগ্লানি।

প্রমাথী

সময় শিখায় সব।

দেবদূত

তোমারে সে শিখায় নি কিছু।

প্রমাথী

ঠিক্ ! ঠিক্ ! নহিলে ভৃত্যের সাথে করি বাক্যব্যয় ?

দেবদূত

তা' হ'লে দিলে না তুমি দেবেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর ?

প্রমাথী

সময় হয়নি তার, শিষ্টাচার করা যাবে পরে।

দেবদূত

কেন মোরে তুচ্ছ কর ? আমারে কি পেয়েছ বালক ?

প্রমাথী

বালক কি ? শিশু তুমি ; বুদ্ধিহীন বালকেরও চেয়ে,
আমার মনের কথা বাহির করিয়া নেবে তুমি !
নির্য্যাতনে হবে না সে, হবেনা সে কৌশলে ইন্দ্রের।
বন্ধনে না মুক্ত হ'লে খুলিবনা যুক্ত ওষ্ঠাধর।
হানুক্ সে বজ্র তার বিদ্যুতের সাথে মোর মাথে
শিলাবৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে করুক। প্রশ্নে তবু দিবনা উত্তর।
স্বর্গরাজ্য যে কাড়িবে—সে নাম না কব ঘৃণাক্ষরে।

দেবদূত

মুক্তি তুমি পেতে চাও এমন ব্যাভারে ? ভেবে দেখ।

প্রমাথী

যথেষ্ট হয়েছে দেখা।

দেবদূত

গর্ব্ব—মূঢ় ! নম্র কর মন ;
ভুলনা দুঃখের শিক্ষা ; স্পর্দ্ধা ছাড়—ছাড় আড়ম্বর ;

প্রমাথী

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস মন্ত্রণা তোমার, দেবদূত !
আঘাতিছে পর্ব্বতেরে ; ক্ষুব্ধ মন, তবু সে অটল।
ভেবনা ত্যজিব ঘৃণা দ্যোস্পতির বজ্রদণ্ড-ভয়ে।
নারীর নম্রতা নাই আমার সঙ্কল্প-দৃঢ় মনে,
শিখিনি চাহিতে ক্ষমা যোড় হাতে হয়ে দণ্ডবৎ
ঘৃণিত শত্রুর কাছে। ধিক্ থাক্ সে দৌর্ব্বল্যে, ধিক্ !
হেন হীন দুর্ব্বলতা মোরে যেন কভু না পরশে।

দেবদূত

বদ্ধবৈর দেখি তব মন,—উপদেশ নাহি মানে,
নাহি গলে মিনতিতে। সদ্যধৃত তুরঙ্গের মত
দুর্ব্বিনীত তব চিত্ত-নাহি মানে রশ্মির সংযম।
কিন্তু যবে অহঙ্কার তুচ্ছ করে যুক্তির শাসন,
তখনি সে হীনবল,—তখনি সে মজে ব্যর্থতায়।
শোনো এবে হে প্রমাথী ! বাক্যে মোর যদি কর হেলা
নামিবে প্রলয় মেঘ, ঝঞ্ঝা এসে পীড়িবে তোমায়,
অগ্নিবৃষ্টি হবে শিরে, কষ্ট পাবে প্রবল বন্যায় ;
বিদ্যুতের পাখা-ভরে বজ্র এসে ফাড়িবে পাহাড়,—
দগ্ধ দেহে রবে পড়ি। দীর্ঘকাল স্তম্ভিত বিমূঢ়,
ধ্বংস মাঝে। শ্যেন পাখী নিত্য আসি' চঞ্চুতে বিঁধিবে
তোমার হৃৎপিণ্ড রাঙা,—মাংস-গন্ধে আকৃষ্ট প্রত্যহ।
পাবে না আরাম-অবকাশ দণ্ড-[illegible] বেলা
তুমি দিনান্তেও কভু ;—মর্ত্তে যদি না নামে দেবতা
স্বেচ্ছায় আলাপ হেতু,—স্বস্তিহীন এ গর্ত্তের মাঝে।
ভাল করে ভেবে দেখ সব ;—নহে ইহা কথা মাত্র,
মিথ্যা কথা নাহি জানে সত্যবাক্ ইন্দ্রের রসনা,
জিহ্বা যার অদৃষ্ট স্থজিছে। সাবধানে দেখ ভেবে ;
অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে সুযুক্তি কর' না বিসর্জ্জন।

সাধারণী বাক্

যা বলেছে যথার্থ সে,—মিথ্যা তো বলেনি দেবদূত,
বলেছে সে নম্র হ'তে ; নম্র হ'লে তোমারি মঙ্গল।
যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি ; কর ওগো ! সুযুক্তি গ্রহণ।
এ যে সরমের কথা,—ভুল ক'রে ভুল ধ'রে থাকা !

প্রমাথী

জানা আছে, জানা আছে, এ কিছু নূতন তত্ত্ব নয় ;
শত্রুতে চরম কষ্ট দিবে শত্রুজনে,—সাধামত,—
বিচিত্র কী ? আমারে দণ্ডিত করি বীভৎস উল্লাস
ভুঞ্জিবে সে ; তাই হোক্। বজ্রদূত বিদ্যুতের সাথে
ঝঞ্ঝারে সে দিক্ ছাড়ি। প্রলয়ের জ্বালুক আগুন,
জীবধাত্রী ধরিত্রীরে উপাড়িয়া ফেলুক সাগরে,
সাগরে সংক্ষুব্ধ করি' আকাশের নক্ষত্র নিবাক,
আমারে ঝড়ের পৃষ্ঠে পাঠাক সে অন্ধ-রসাতলে,
তবু আমি মৃত্যুহীন, মৃত্যুহীন প্রতিজ্ঞা আমার।

দেবদূত

উন্মাদের উক্তি ইহা ; শোনো সবে প্রলাপের ভাষা।
মত্ততা নহে তো কী এ ? ছাড়া পেলে-ও কি শান্ত হয় ?
তোমরা বিদায় হও ;—সমবেদনার আর নাহি
অবকাশ ; কি করিবে হেথা রহি' ? পালাও পালাও ;
এখনি উঠিবে ঝড়,—মূর্চ্ছা যাবে বজ্রের গর্জ্জনে।

সাধারণী বাক্

এ কী বল ? এ কী কথা কও ? সুযুক্তি এ নহে কভু।
ভাল বল নাই তুমি, এ কথা ঠেলিলে ঠেলা যায়।
হীন হ'তে বলনাকো,—প্রবৃত্ত ক'র না হীন কাজে,
যা' ঘটে ঘটুক তাই, হেথা মোরা রব ওরে ঘিরে ;
বিপদের মাঝখানে ফেলে চলে যেতে নাহি পারি ;
বিশ্বাসঘাতক নহি, ঘৃণা করি বিশ্বাসঘাতকে।

দেবদূত

সতর্ক করিয়া দিনু, কর যাহা খুসী তোমাদের ;
অদৃষ্টে দিয়োনা গালি পড় যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে,
দেবরাজ দ্যোস্পতিরে তখন কোরোনা যেন দোষী
নির্দ্দোষের উৎপীড়ক বলি, মজিতেছ নিজ দোষে।
সতর্ক করিয়া দিছি, জালে পড় পড়িবে স্বেচ্ছায়।

প্রমাথী

না, না, মিথ্যা কথা নয়, টলে পৃথ্বী হয় অনুভব —
বাস্তবিক ওঠে দুলে ! দ্বিগুণিত বজ্রের আক্রোশ,—
ক্ষুব্ধ রোষ ঝলসিছে,—গরজন গাঢ়-সুগম্ভীর ;
ঘূর্ণিবায়ে ঘোরে ধূলি, আঁধি ওঠে করি আঁধিয়ার !
যুদ্ধ করে মরুদ্‌গণ,—তরঙ্গের ভীষণ সংক্ষোভ !
চৌদিকে হলুহলা-ধ্বনি,—সমুদ্রে আকাশে একাকার !
প্রবল ঝঞ্ঝার বেগ ভেঙে পড়ে আমারি মাথায় !
দেখ মা ! অদিতি তুমি, অন্তরীক্ষ দেখ নিরখিয়া
নীলিম সৈকতে যার আলোকের তরল প্রবাহ,—
দেখ চেয়ে ; দেখ, দেখ, কত আমি সহি অত্যাচার !

যবনিকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মঞ্জুর

(গাথা)

বৃদ্ধা পৌষ শীত-জর্জ্জর, শিরে কুহেলির জটা,
মিটমিট করি' মেলিয়া আকাশে ঝাপ্সা দৃষ্টি কটা ;
প্রভাত প্রদোষে লতা-পাতা-ঘাসে শিশিরের জাল বোনে—
কভু উদাসীন রোদে পিঠ দিয়া বসি' রয় আনমনে।

বিড়্ বিড়্ বকি' লাঠি ঠক্ঠকি' কভু ঘন নাড়ে মাথা,
খস্‌খস্ করি' অমনি খসিয়া পড়ে সে গাছের পাতা ;
কভু ক্রোধে সারা যেন জ্ঞানহারা, নাসিকায় শ্বাস পড়ে—
বিশ্বজগৎ উত্তরবায়ে থর্‌থর্ করি' নড়ে !

এল শীতকাল—খেজুরের গাছে ভাঁড়টি হয়েছে বাঁধা,
আঙিনার কোল ভরিয়া ফুটেছে গৃহের দুলাল গাঁদা ;
সকালে কুয়াসা, বৈকালে ধোঁয়া—সাথে উত্তর-বায়,
মাথার উপরে সারি দিয়া সাঁঝে হাঁসেরা উড়িয়া যায়।

এ হেন সময়ে গ্রামের প্রান্তে বেদেদের ছাউনিতে
সহসা উঠিল মহা কোলাহল, কেহ নারে থামাইতে ;
রাজার পাইক শুনায়েছে আসি' বেজায় হুকুম কড়া,
বর্ব্বরদল তাই চঞ্চল, কণ্ঠ হয়েছে চড়া !

কয়দিন হ'ল এসেছে ইহারা, ছাউনি ফেলেছে মাঠে,
সেই হ'তে ভয়ে মেয়েরা একেলা চলেনা দীঘির ঘাটে ;
গৃহী-গৃহস্থ শশব্যস্ত ঘটি-বাটি সাবধানে,
জননীরা ভয়ে আগলায় শিশু প্রমাদ গুণিয়া প্রাণে !

পুরুষ ও নারী—সতেরটি লোক বুড়া-বেদিয়ার দলে—
সতেরটি লোক মাথা গুঁজি' রয় তিনটি তাঁবুর তলে ;
সাতটি অশ্ব, ন'টী গর্দ্দভ, বারোটি ছাগল, আর
'রঙ্গু' বলিয়া ছাগশিশু এক সঙ্গের সাথী তার।

জাতিতে বেদিয়া, পেষা সে ভ্রমণ—ভ্রমণই জীবনযাত্রা,
দেশে দেশে ফিরে, যতদিনে যার ফুরায় আয়ুর মাত্রা ;
গৃহধনজন—যা কিছু সঙ্গে, হাতিয়ার শুধু সাথী—
দীর্ঘ বরষা, তারি ভরসায় কাটায় দিবসরাতি !

ক্ষুধার খাদ্য বনের জন্তু, অন্নের নাহি ঠিক,—
কভু মিলে কভু মিলেনাক যাহা -গণেনা তা' নির্ভীক ;
চিরবারমাস সদা যার বাস অরণ্য মাঝখানে,
হাতের লক্ষ্য মিলায় ভক্ষ্য, শুধু তাই তারা জানে।

সবে দুবছর ঘোরেনি এখনো, ফিরে' এই গ্রামে আসা,
শ্মশানের পারে বাতাড়ের ধারে তেমনি বাঁধিয়া বাসা ;
পল্লী যুড়িয়া শঙ্কিত-হিয়া—সন্দেহ কানাকানি,
বুড়া জমীদার ভাবে—এ আবার কি পাপ এল না জানি !

বিশেষতঃ সেই বহুবাল্যের স্মৃতি মনে পড়ে ঘুরি'—
পিতার চিন্তা মাতার কান্না -বাড়ী হ'তে ছেলে-চুরি ;
সেই খোঁজ সেই খানাতল্লাসি, সন্দেহ কত-মত—
বহুদিন ধরি' পুলিশের সেই শাস্তি-শাসন যত !

সে ত বহুকাল ; অর্ধ-শতাব্দি গিয়াছে তাহার পরে ;
সেকালের লোক বিলুপ্তশোক গিয়াছে লোকান্তরে ;
তবু সেই হ'তে সন্দেহ এক আছে সবাকার প্রতি—
সাধু সন্ন্যাসী বেদিয়া ফকির—ভেদ নাই এক রতি।

আরো সে কারণ, বৃদ্ধের দলে 'ঘুর্ণী' বলে' যে মেয়ে
ছাগল নাচিয়ে পথে-পথে ফিরে তুর্কী গজল গেয়ে—
জমীদারসুতা 'ঝরণা'র সাথে মিল আছে নাকি তার !
দুজনে যাহারা দেখেছে, তাহারা তাই বলে বারবার।

যাউক সে কথা—নাহি যার মাথা, নিকাশ যাহার নাই,
সে সকল এবে ভাবিয়া কি হবে ? এখন যাহা উপায়—
কোনমতে সব দূর করে' দেওয়া—আপন এলাকা হ'তে
আজই দরবারে উপায় তাহার হইবেই কোনমতে।

(২)

সূর্য্য তখন অস্তে ব্যস্ত বাঁশ্‌সা মেঘের পারে,
ইক্ষুর আঁটি লইয়া কৃষক ফিরিছে বনের ধারে ;
সারি-দেওয়া-দেওয়া লঙ্কার ক্ষেতে আঁধারে লুকায় লাল,
হিমে-ভিজা-ধূলা পল্লীর পথে ফিরিছে গরুর পাল।

শিকার সারিয়া পুরুষ জোয়ান ফিরিছে বেদের ঘরে,
রমণীরা ফিরে ডালা-কুলা বেচি' 'বাখান-পাড়া'র চরে ;
কেহ বা ফিরিছে 'বাত ভাল করি', কেহ-বা মন্ত্র পড়ি'
প্রণয়-রোগের ওষুধ বিলায়ে, বিকায়ে শিকড়-জড়ি।

'দড়াবাজি' সেরে' ছোকরার দল ফিরে কাঁধে বহি বাঁশ,
'ধনেশ'-পাখীর তেলের বদলে আনি' বসনের রাশ ;
শেয়ালের শিং, বাদুড়ের জিভ্, কালো-নেউলের দাঁত
বিক্রয় সারি' প্রৌঢ়া জনৈক ফিরিল—তখন রাত।

ঘাগ্‌রাটি আঁটা, কেশে বাঁধা জটা, কাঁচলিটি কসা' বুকে,
হিল্লোলে-ভরা দেহবল্লরী নোয়ায়ে সকৌতুকে
ঘুর্ণী তাহার ঘুন্টির হার বাঁধিছে ছাগের গলে—
বুড়া মঙ্গুর—আঁখি স্নেহাতুর, হেরে বসি' ভূমিতলে।

এমনি সময় জমীদারদূত চারিজন লাঠিহাতে
আসিয়া দাঁড়া'ল—রাজার হুকুম যাইতে হইবে সাথে ;
কড়া আঁখি আর চড়া কথা ক্রমে বিবাদ বাঁধা'ল শেষে—
বুঝায়ে-থামায়ে উঠিল বৃদ্ধ লাঠি-হাতে মৃদু হেসে।

(৩)

রাজা মহাশয় যেথা বসি' রয় সন্ধ্যার দরবারে,
বুড়ারে লইয়া হাজির করিল—প্রহরী দাঁড়া'ল দ্বারে ;

বুড়া মঞ্জুর বিস্ময়াতুর নোয়ায়ে পলিত শির,
মৃদু হাসি' ধীরে কুর্ণিশ করে' দাঁড়ায়ে রহিল স্থির।

চিবায়ে তখন রাজা ধীরে কন—মঞ্জুর তব নাম ?
বেদিয়ার দলে কতদিন বাস—কোথায় আদিম ধাম ?
প্রতি বৎসরই আস' হেথা দেখি, মৎলবখানা কি ?
চুরি পেশা বটে ? দলেবলে সব পুলিসে ধরায়ে দি !

কি বলিবে বল, নতুবা শিকল পড়িবে এখনি পায় ;
তবু কথা নাহি—নতমুখে চাহি' বুড়া রহে নিরুপায় !
নির্ব্বাক দেখি' রাজা কহে, একি ? ত্বরিত জবাব চাই—
পুলিস কিন্তু আনিব এখনি—সত্য যদি না পাই।

জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি, আজি বা বলিব কেন' ?
তোমা চেয়ে রাজা আমার বয়স কম নয় তাহা জেন ;
তবু আজ যেন সত্য বলিতে কণ্ঠ উঠিছে কাঁপি'—
কেন অকারণ শুধাও রাজন, আমিও তা' রাখি চাপি'।

শুধু এইটুকু বলিবারে পারি, নাহি কোন অপরাধ ;
আজি গৃহহীন, ছিল একদিন—বিধাতা সেধেছে বাদ !
ভালই হয়েছে—সব দেশ দিয়ে এক দেশ নিল কাড়ি'—
যে ক'দিন বাঁচি, যেখানেই থাকি—সেই মোর ঘর-বাড়ি।

পাকা জুয়াচোর হবে নিশ্চয়, তত্ত্বের কথা বলে—
প্রশ্ন যা করি জবাব দেয় না, আর এক পথে চলে !
দুটি সোজা কথা চাহি শুধু আমি—বল্ তুই শুধু কে—
ছাগল নাচিয়ে পথে-পথে ফিরে, কে বা হয় তোর সে ?

শোন তবে আজ, শোন মহারাজ—যে কথা বলিনি কা'রে,
বিচারের ভয় করিনা তোমার—সে হবে আরেক দ্বারে ;
শুনেছি যা কানে, বলি তা এখানে, আমি তোরি বড় ভাই
বেদিয়ার দলে চুরি গিয়াছিনু—কবে তাহা মনে নাই !

সর্দ্দার বলি' মানিতাম যারে—তারি মুখে এক দিন
শুনেছি এ কথা ; সত্য-মিথ্যা জানেনা ভাগ্যহীন !
ঐ মাঠে আর ঐই শীতকালে, দশটি বছর আগে
শুনিয়াছি ইহা ; গিয়াছে সে চলি'—কথা তার মনে জাগে !

নিজ পরিচয় কি যে বিস্ময় বেদনা জাগা'ল প্রাণে,
আমি জানি আর অন্তর্যামী যদি কেউ থাকে, জানে।
তারি পর থেকে লুকাইয়া দেখে' শিখিয়াছি লেখাপড়া,
আর-তা কি হবে ? জীবন-নদীতে জাগিছে মরণ-চড়া !

এই বাড়ীঘর লোকলস্কর—আমারও পারিত হ'তে,
তা' না হয়ে কিনা বর্ব্বর হয়ে চলিয়াছি কোন্ পথে !
সেই হ'তে ভাই, মনে সুখ নাই ; তবু ঘুরে-ঘুরে' আসি—
দূরে থেকে তবু অজানা আপনে দেখি—তাই ভালবাসি।

আর ক'টা দিন ? চুকিয়াছে ঋণ - যাব আর এক দেশে,
মনে হয় সেই সন্ধ্যার হাওয়া লাগিছে ললাটে এসে !
এ জীবনে ভাই, কভু কোনো-দিন দাঁড়াইনি তোর পথে—
এক অনুরোধ—প্রথম ও শেষ, রাখ ভাই কোনমতে।

সহসা সেথায় কোথা হ'তে এল পরীর মতন মেয়ে—
ছাগশিশু নিয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে—ঘূর্ণী সে, দেখি চেয়ে !
কাঁদি কয় বুড়ো—ছিল একজন, সেও ছেড়ে গেছে মোরে,
যাবার সময় বেঁধে রেখে গেছে—ঐটুকু মায়াডোরে।

থামিল যখন, রাজার তখন জ্ঞান এল যেন ফিরে'—
বেদের দুহিতা-মাঝে যেন হেরি' আপন দুহিতাটিরে !
তাড়াতাড়ি উঠি' কাছে এল ছুটি'—পুনরায় গেল ফিরে' !
রাজ-দরবার হ'ল চুরমার—কবাট পড়িল ধীরে !

(৪)

সেদিন রাত্রে ভারি দুর্য্যোগ, জলঝড় সারারাতে ;
একে শীতকাল, তায় কন্‌কনে উত্তর বায়ু সাথে।
ভীষণ আঁধার—ঢাকা চারিধার নিরন্ধ্র কালো মেঘে,
বজ্রের ডাক—প্রলয়ের শাঁখ মেঘেতে উঠেছে জেগে'।

বুড়া জমীদার করে হাহাকার, নিদ্রা নাহিক চোখে ;
থেকে-থেকে কয়—আর কিছু নয়, কি বলিবে সব লোকে !
ঘুরে-ফিরে' আসে ঝরণার পাশে, চুপ করে' দেখে মুখ—
কন্যা বলিয়া কেঁদে উঠে হিয়া, গুরুগুরু করে বুক !

রাত্রি তখনো রয়েছে—যখন বাহিরিলা একা পথে,
প্রহরীরা সব সাথে যেতে চায়, ফিরাইলা দ্বার হ'তে।
ঝটিকা তখনো হাঁকে ঘনঘন—ধরিয়া এসেছে জল ;
বিদ্যুতালোকে পড়িল সে চোখে—অদূরে শ্মশানতল !

অতি দ্রুত পায়ে উতরিল বাঁয়ে, প্রান্তর-পরপারে—
দাদা—বলি' জোরে চীৎকার করে' ডাকিল বনের ধারে—
কেবা কোথা হায় ! চিহ্নও নাই, আবার আসিল জল ;
মাথার উপরে হাসি' হা-হা করে' উড়িল হাঁসের দল !

———

বিলাতের চিঠি

আমাদের বিদ্যালয় দেখ্‌বার জন্যে ইংরেজ অতিথির ভিড় হচ্চে। কিন্তু তাঁরা দেখ্‌বার চেষ্টা করলেও ত দেখতে পারেন না। তাঁরা যে এণ্ট্রেন্স স্কুল দেখবার চোখ নিয়ে আসবেন—কিন্তু আমাদের এ ত স্কুল নয়। আশ্রমের ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে নেই। তাঁরা আশ্রমকে ইংরেজি ভাষায় hermitage বলে তর্জ্জমা করে থাকেন। তাঁরা জানেন এ-সমস্ত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের উপকরণ, মানবসভ্যতার মধ্যযুগের জিনিষ—এখনকার কালে সে-সমস্তই ঐতিহাসিক আবর্জ্জনা-কুণ্ডের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে—এখনকার ঝকঝকে নতুন জিনিষ হচ্চে প্রায়মারী ইস্কুল, সেকণ্ডারি ইস্কুল, বোর্ড অফ এডুকেশন। এঁরা চিরকালের জিনিষকে সকল কালের মধ্যে অখণ্ড করে দেখতে জানেন না। এঁরা নিজেদের বানানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গবাক্ষের ভিতর দিয়ে শাশ্বত কালকে কৃত্রিমভাগে বিভক্ত করে দেখেন—এবং মনে করেন মানুষ গুটিপোকার মত এক একটি বিশেষ ভাবের গুটি বেঁধে তার মধ্যে এক একটি বিশেষ যুগ যাপন করে, তার পরে তার থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন সম্পূর্ণ নূতন ডানা নিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং পুরাতন গুটি অনাবশ্যক পড়ে থাকে। মানুষ যেন যুগে যুগে কেবল সভ্যতার চকমকি ঠুকছে—তার একটি স্ফুলিঙ্গ অন্য স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে স্বতন্ত্র। কিন্তু ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানবজীবনের সমগ্রতাকে দেখাই হচ্চে যথার্থ দেখা। মধ্যযুগ আজ মানুষের মধ্যেই আছে, নইলে মধ্যযুগেও থাকতে পারত না—তবে বাহ্যরূপের হয়ত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হতে পারে। প্রাণের ক্রিয়া রাত্রিবেলাকার নিদ্রার মত মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্নতাকে আশ্রয় করে—তখন মনে হয় বুঝি সে বিলুপ্ত হল, কিন্তু জাগরণের দিনে দেখতে পাই মৃত্যুর আবরণের মধ্যে অতি যত্নে সে রক্ষিত হয়েছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে একদা সাধকেরা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগসাধনাকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন—দীর্ঘকাল য়ুরোপ তাকে Mysticism নাম দিয়ে তার ভাঙা কুলোর মধ্যে ঝেঁটিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এককালে মানুষ যাকে সর্ব্বান্তঃকরণের ব্যাকুলতা দিয়ে স্বীকার করেছে অন্যকালে তাকে অসত্য এবং অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জ্জন করবে এ হতেই পারে না। একদিন সে জেগে উঠে দেখে মধ্যযুগের সত্য এ যুগেও আছে; আত্মার যে ক্ষুধা তখন যে অমৃত স্তন্যের জন্যে কেঁদেছিল আজকের দিনের নূতন প্রভাতে তার সেই কান্না সেই স্তন্যকেই চাচ্চে। একদিন আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তার মূল আশ্রয় ছিল পরাবিদ্যা—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকেই মুখ্য লক্ষ্য করে সমস্ত বিদ্যাকে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়া হত। মা
জ্ঞানকে ভক্তিকে শুভবুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা হত
অবশ্য তখন জ্ঞানের উপকরণ এত বহুবিস্তৃত ছিল
এখন অনেক শিখ্‌তে হয় বলে শিক্ষা ব্যাপারকে
করতে হয়েছে? কিন্তু মানুষের প্রকৃতিকে ত
করে ফেলা যায় না—হাত বেড়েছে বলেই ত পা
শুকিয়ে ফেলে চলে না। বিদ্বান্ মানুষ বা ব্যবস
মানুষেরই খাতিরে পরম মানুষের চরম লক্ষ্যকে ত কো
একটা মধ্যযুগের জীর্ণ বস্তার মধ্যে অনাবশ্যক ছাপ
ফেলে রাখা যায় না। এই জন্যে আশ্রমেই মানুষ
শিক্ষা করতে হবে, ইস্কুলে নয়। তাঁর মুখ্য প্রয়োজ
সঙ্গেই তাঁর গৌণ প্রয়োজনকে মিলিয়ে দেখতে হবে
বিচ্ছিন্ন করতে গেলেই মানুষের মর্ম্মে আঘাত দেও
হবে—তাতে এমন সকল সমস্যার সৃষ্টি হবে কো
কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যার সমাধান সম্ভবপর হতে পা
না। এখনকার ইস্কুল বিদ্যাশিক্ষার কল। কিন্তু ক
মধ্যে ত জীবনের সৃষ্টি হয় না,—মানুষের জীবন-প্রবাহ
চিরজীবনের পথে পরিপূর্ণ করে তোলাই হচ্চে শিক্ষ
লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বর্ত্তমানযুগ কিছুকালের
বিস্মৃত হয়েছে বলেই যে সে প্রাচীন যুগের চেয়ে
হয়ে উঠেছে এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তা
পুনর্ব্বার বুঝতে হবে তার সেই প্রয়োজন আছে এ
তাকে তদুপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। আম
দের আত্মার সেই নিগূঢ় প্রয়োজন-বোধই আশ্রম
আশ্রয় করেছে এবং নানা প্রকারে এখানে আপন
বাসা বাঁধছে। এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের গভী
যোগ, কেননা এখানে উভয়েই ছাত্র—এখানে বিদ্যা
সঙ্গে ধর্ম্মের ভেদ নেই, কেননা উভয়েই এক লক্ষ্যে
অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর স্রোতের ম
সমগ্র ভাবে সচল; স্নানাহার পাঠাভ্যাস খেলা উপাস
সমস্তই সাধনার পথে প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক
শিক্ষাদান করচেন সে তাঁর ব্যবসায়গত কর্ত্তব্য
নৈতিক কর্ত্তব্য নয়, সে তাঁর সাধনা—তাঁর দ্বারা তি
তাঁর হৃদয়গ্রন্থি মোচন করচেন, ভূমা উপলব্ধির পথ
প্রশস্ত করচেন। একথা বলতে পারি যে আমাদে
আশ্রমে এই সাধনাকে অবাধ করে তুলেছি। বি
আমাদের বীজমন্ত্র এই—ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য—আম
ভূমাকে জানতে এসেছি। আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা
জিজ্ঞাসার অঙ্গ। একথা হঠাৎ কোনো ইস্কুল-পরিদর্শক
বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু একথা আমাদের প্র
ককে সুস্পষ্ট করে বুঝতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকু

———

পুস্তক-পরিচয়

স্থপতি-বিজ্ঞান (Engineering in Bengalee)—

প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত। রায়সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এল্, সি, ই প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা, ডিমাই ১৬, মূল্য আট আনা। গ্রন্থকর্ত্তার বিশ্বকর্ম্মার দ্বিতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা ডিমাই ১৬, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

প্রথমখণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবৃত হইয়াছে:—

ইট, সুরকি, বালি, চুন, সিমেণ্ট, ও মশলা, খোয়া, পলস্তরা, হোয়াইটওয়াশ বা চূনকাম, কাঠ, রং, ইটের গাঁথনি, খিলান, centering বা কালিব; ছাদ, মেজে, বনিয়াদ, পুল, রাস্তা, লোহা, এবং কতকগুলি আবশ্যকীয় তালিকা।

দ্বিতীয় খণ্ডে বাটী তৈয়ার করিবার ডিজাইন বা নক্সা, স্পেসিফিকেসন্ ও এষ্টিমেট, ইটের পুল এবং কালভার্ট, লোহার পুল, ঝুলান পুল, নৌকার পুল, তোলা পুল, screw pile পুল, গার্ডারের পুল, পুষ্করিণী খনন, কূয়া খননের বিষয় লেখা আছে।

প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ "প্রত্যেক মধ্যশ্রেণীর লোকের পক্ষে যাঁহাদের বাটী ও ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের এই পুস্তক আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে জন-সাধারণে ইহার আবশ্যকতা প্রতীয়মান হইলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

এই পুস্তক পাঠে যে সাধারণের কতকপরিমাণে উপকার হইবে তাহা স্থির নিশ্চিত এবং তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ারিং না-জানা বশতঃ যে অনাবশ্যক অর্থ খরচ হইত সে সম্বন্ধে কিছু অর্থানুকূল্যও যে হইবে তাহাও ঠিক। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকরূপে যদি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ইহাকে নির্ব্বাচিত করেন, ত বড়ই ভাল কথা। কারণ এ প্রকার পুস্তকের যত আদর হইবে ততই দেশের কল্যাণ।

তবে এখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে, বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যান করিলে পুস্তকের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইত। বড়ই সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। ভাষা সহজ, কিন্তু জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে। ইহা যেন সেকেলে ধরণের পুস্তক। আধুনিক নূতন নূতন অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি ইহাতে এক রকম দেওয়াই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

খিলান ছাদ, খোয়া, বনিয়াদের কক্ষা (footings), Reinforced Concrete Roofing, এসবগুলি ভাল করিয়া লিখিলে লোকের বিশেষ উপকার হইত।

কূয়া খননে কোন্ কোন্ কাঠ তলার চাকীতে ব্যবহৃত হয় তাহার উল্লেখ নাই। লোহার curb কি ভাবে করা হয় তাহা লেখা উচিত ছিল।

এষ্টিমেট প্রসঙ্গে ভাল একটী বসতবাটীর বিস্তারিত এষ্টিমেট ও চুম্বক দেওয়া উচিত ছিল।

নক্সা ডিজাইনের প্রসঙ্গে একটী ভাল বসতবাটীর ও বাঙ্গলার (Bungalow) ডিজাইন, প্লান, সেক্সন, ও এলিভেসন্ দেওয়া উচিত ছিল। তারপর আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Sanitation), জলনালী (Drainage), জলের কল (Waterworks), স্নান করিবার জন্য ঘাট, ও বাঁধ (Embankment)এর বিষয় মোটেই লেখা নাই। এগুলি ক্রমশঃ ভবিষ্যতে দিলে পুস্তকের উপকারিতা ও বৃদ্ধি পাইবে।

পরিশেষে ইহাই বক্তব্য যে এই পুস্তক পাঠে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আশাকরি অন্যান্য কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এই প্রকার পুস্তক লিখিয়া দেশের অভাব মোচন ও মুখোজ্জ্বল করিবেন।

শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী।

"বৈজ্ঞানিকী"—

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত, এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান্ প্রেস্ এবং কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট পার্বালিসং হাউস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা।

অধ্যাপক জগদানন্দ রায় সর্ব্বজনবিদিত বৈজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার। তিনি বহুদিন হইতে বিজ্ঞানের নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, তাহার উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষাদাতা। নানা সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পত্রেরও ইনি লেখক। বিজ্ঞান-জানা লোক আজকাল দুর্ল্লভ নয়, কিন্তু বিজ্ঞান জানিয়া অবৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠককে বাঙ্গালায় লিখিয়া বুঝাইতে পারেন এ প্রকার সুলেখক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রকৃতই দুর্ল্লভ। মধুর বৈজ্ঞানিক ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রকাশ করিবার শক্তি জগদানন্দ বাবুর অদ্ভুত। যাঁহারা বিজ্ঞান জানেন না, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিবেন। এই পুস্তক ব্যতীত গ্রন্থকার আরও কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, সকলগুলিরই ভাষা সরল ও মধুর এবং পুস্তক পাঠে আলোচিত বিষয়গুলি পাঠক অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন।

বাঙ্গালা ভাষায় "বৈজ্ঞানিকী"র ন্যায় পুস্তকের বড়ই অভাব ছিল। অদ্যাপি কেহই এই শ্রেণীর পুস্তক রচনা করেন নাই। এখন জগদানন্দ বাবুই সেই অভাব পূরণ করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক ভাল গ্রন্থের প্রকাশ হয় কিন্তু তাহাদের অধিক প্রচার হয় না। যাহাতে "বৈজ্ঞানিকী" সহজে বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তাহা করিতে হইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য না করিলে বিস্তার-কার্য্য সহজ হইবে না। Intermediate Scienceএর পরীক্ষার্থীদিগকে যে-সকল বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয়, এই পুস্তকখানি তাহাদের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এই পুস্তক পাঠ্য হইলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ছাত্রেরা যেমন ইতিহাস ও কাব্যাদির স্বাদ গ্রহণ করে, এই পুস্তক পাঠে সেই প্রকারে বিজ্ঞানের মর্ম্ম বাঙ্গালার ভিতর দিয়া বুঝিবে। তা, ছাড়া যে-সকল বিজ্ঞানের তত্ত্ব তাহাদের কলেজের পাঠ্য-বহির্ভূত, এই পুস্তক পাঠে তাহারা সেগুলিরও সহিত পরিচিত হইবে। এই প্রকারে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিস্তৃত হওয়া কি কম লাভের কথা? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে মনোযোগী হইবার জন্য মিনতি করি।

আমাদের সাধারণ ইংরাজী বা বাঙ্গালা বিদ্যালয়গুলির চালকবর্গ এই শ্রেণীর পুস্তক যাহাতে বালকগণের হাতে দিতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হউন, ইহাও অনুরোধ করিতেছি। এই উপায়েই আমাদের দেশে সহজে বিজ্ঞানের বিস্তার হইবে।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।